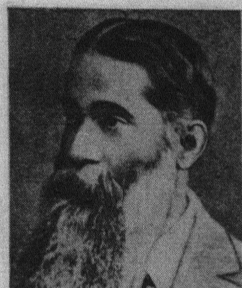
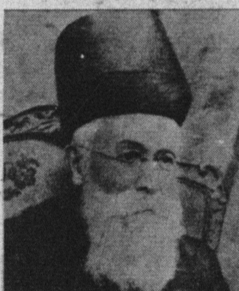
প্রথম সংস্করণ ১ বৈশাখ ১৩৯৭ থেকে ষষ্ঠ মুদ্রণ আষাঢ় ১৪১৩ পর্যন্ত
মুদ্রণ সংখ্যা ১১৬০০
সপ্তম মুদ্রণ শ্রাবণ ১৪১৫ মুদ্রণ সংখ্যা ১০০০

প্রকাশক সাহিত্য অকাদেমী
নিউ দিল্লী
মুদ্রক শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯
প্রাপ্তিস্থান
বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগ
৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা-৭
বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট। কলিকাতা-১২

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতিবৃন্দ
১৮৮৫-১৯৮৫


উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়


দাদাভাই নৌরজি


বদরুদ্দিন তায়বজি

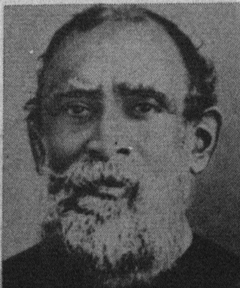

জর্জ ইয়ুল


উইলিয়ম ওয়েডারবার্ন


ফিরোজ শা মেহতা


পি· আনন্দ চার্লু


আলফ্রেড ওয়েব


সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়


আর· এম· সায়ানি

অমিতাভ ও সুদক্ষিণাকে


সি· শঙ্করণ নায়ার

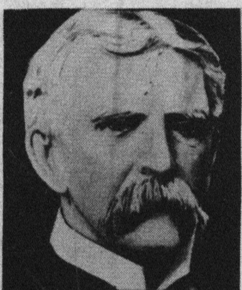

আনন্দমোহন বসু


রমেশচন্দ্র দত্ত


এন· জি· চন্দ্রভারকর


দিনশ ই ওয়াচা

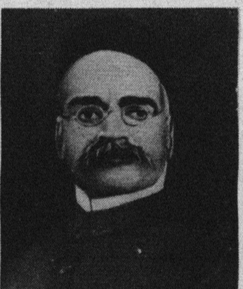

লালমোহন ঘোষ


হেনরি কটন


গোপালকৃষ্ণ গোখলে

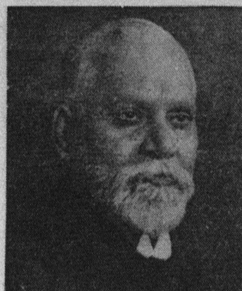

রাসবিহারী ঘোষ


মদনমোহন মালব্য


বিষেণ নারায়ণ দার


আর· এন· মুধোলকর

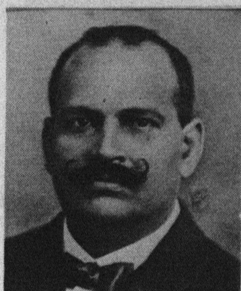

নবাব সৈয়দ মহম্মদ


ভূপেন্দ্রনাথ বসু


সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ


অম্বিকাচরণ মজুমদার


অ্যানি বেশান্ত


সৈয়দ হাসান ইমাম


মতিলাল নেহরু


সি· ভিজিয়া রাঘবচারিয়ার

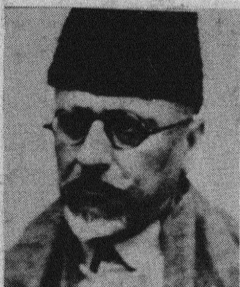

লাল লাজপত রায়

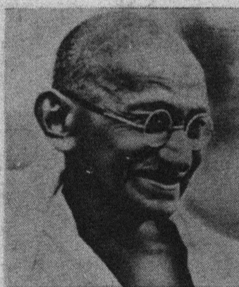

হাকিম আজমল খান


চিত্তরঞ্জন দাশ

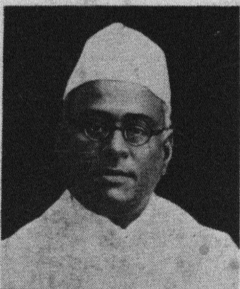

মৌলানা মহম্মদ আলি

সূচী

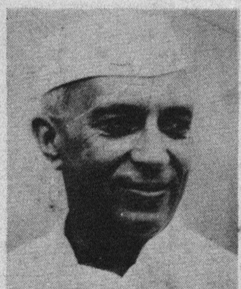

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ


মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী


সরোজিনী নাইডু


শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার

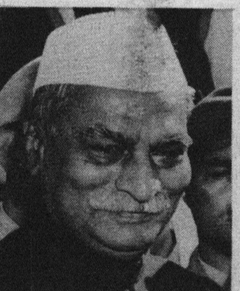

এম· এ· আনসারী


জওহরলাল নেহরু


সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল

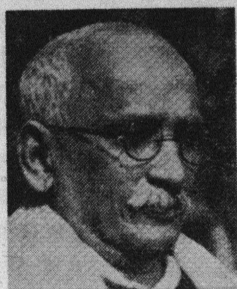

শেঠ রণছোড়লাল

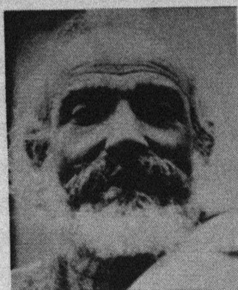

নেলী সেনগুপ্তা

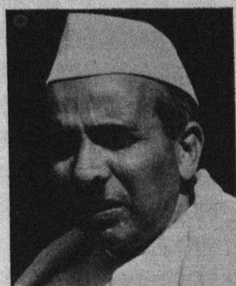

ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ


সুভাষচন্দ্র বসু


আচার্য জে· বি· কৃপালনী

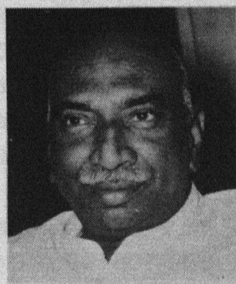

পট্টভি সীতারামাইয়া

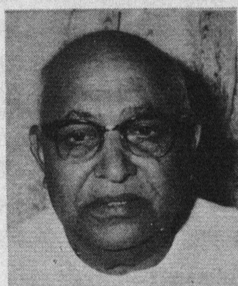

পুরুষোত্তম দাস ট্যান্ডন


ইউ· এন· ডেবর

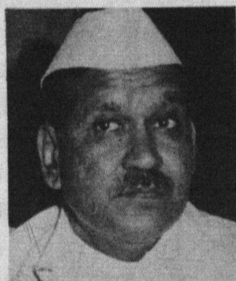

নীলম সঞ্জীব রেড্ডী

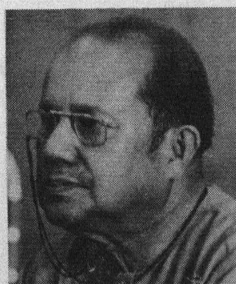

ডি· সঞ্জীবায়া


কে· কামরাজ


এস· নিজলিঙ্গাপ্পা


জগজীবন রাম


শঙ্করদয়াল শর্মা


দেবকান্ত বড়ুয়া


ইন্দিরা গান্ধী


রাজীব গান্ধী

ভূমিকা

ঘটনার পৌর্বাপর্য মোটামুটি বক্ষা করলেও এই ইতিহাস বর্ণনাত্মক নয়, বিশ্লেষণাত্মক। কোনো ঘটনাই পৃথকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ নয়। একটা বৃহৎ প্রেক্ষাপটে, অনেক ঘটনাব সঙ্গে অন্বয়ের বা দ্বন্দ্বেব ফলে, তার ঐতিহাসিক মূল্য নির্ধারিত হযে থাকে। আমাব প্রেক্ষাপটে জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি, সামাজিক স্তরভেদ, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, বাজনৈতিক শক্তিবিন্যাস, সাংস্কৃতিক ধ্যানধাবণা—সব কিছুব স্থান আছে। স্থাপত্যগত তাব কাঠামো না বুঝলে তথ্যেব অরণ্যে পথ হারানো অসম্ভব নয।

প্রথমেই বলে রাখা ভাল, আমাব বিষযবস্তু স্বাধীনতা সংগ্রামে কংগ্রেসেব ভূমিকা। প্রসঙ্গত অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কথা উঠেছে, কারণ তাবাও নানা সময়, নানাভাবে সেই সংগ্রামে যোগ দিয়েছে বা তাব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। যখনই বিপ্লবী দল বা কম্যুনিস্ট পার্টি স্বাধীনতা আন্দোলনে কংগ্রেসেব সহযোগিতা করেছে বা বিবোধিতা করেছে, তখনই পাদপ্রদীপের আলো তাদের ওপব পড়েছে। লক্ষ্য ও উপায নিযে তাদেব আদর্শ আলাদা, তাদেব কর্মপদ্ধতিও আলাদা। শতবর্ষেব ভাবতীয ইতিহাসেব সামগ্রিক চিত্র তুলে ধবা বর্তমান গ্রন্থেব উদ্দেশ্য নয, গ্রন্থকাবেব শক্তিবও বাইরে। ফবাসী বিপ্লবের দশ বছবেব সামূহিক ইতিহাস যদি লেফেভব ও সবুলের মত মহান ঐতিহাসিকেব অসাধ্য হয, তবে কংগ্রেসেব ইতিহাস লিখতে গিযে কোন সাহসে আমি অন্যান্য দলের ইতিহাস লিখতে বসব?

এমনিতে কংগ্রেসেব শতবর্ষেব ইতিহাস লেখাই যথেষ্ট কঠিন। একদিন ভাবতেব জাতীয কংগ্রেস গ্রামের তৃণমূল থেকে শহবেব সৌধশীর্ষ পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। তাব পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখতে গেলে স্থানীয ঘটনাব ওপব অনেক বেশি জোব দিতে হবে। বস্তুত কেমব্রিজ গোষ্ঠী এই কাজ করতে গিয়ে একদা আমাদেব চোখ ধাঁধিযে দিযেছিলেন। স্থানীয প্রতিষ্ঠান, স্থানীয নেতা, স্থানীয় কর্মকাণ্ডেব ওপব জোব দিযে তাঁরা আমাদেব জাতীযতাবাদী সংগ্রামকে প্রায উড়িযে দিযেছেন।

কেমব্রিজ গোষ্ঠী প্রতিপন্ন কবতে চাইছেন প্রধানত দুটো জিনিস—(১) ব্রিটিশ বাজেব উদ্যোগ, সাম্রাজ্যিক স্বার্থে নিযন্ত্রিত হলেও, ভাবতীয বাজনীতিকে সচল ও সক্রিয করেছিল। বাজা, জমিদার, উচ্চবিত্ত শ্রেণীব সঙ্গে বাজেব সহযোগিতাব ভিত্তি ছিল কব ও খাজনাব বিনিমযে স্থানীয় ব্যাপাবে অসপত্ন কর্তৃত্ব। উনিশ শতকেব মধ্যপাদ থেকে ক্রমবর্ধমান সাম্রাজ্যেব দাবি সেই ছেড়ে দেওয়া এলাকায উত্তবোত্তর হস্তক্ষেপ কবলে অসন্তোষেব সৃষ্টি হয়। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, প্রতিনিধিত্বমূলক আইন সভা প্রভৃতি সুযোগ দিয়ে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত তাকে সীমাবদ্ধ বাখা হয়েছিল। উপরন্তু বিজলেব মত ঝানু আমলার পরামর্শে বর্ণহিন্দু, মুসলিম, শিখ, তফসিলী সম্প্রদায ইত্যাদি জাতপাতেব ও সম্প্রদায়ের কাল্পনিক category দ্বাবা ভারতীয় জনগণের মধ্যে বিভেদের ছোট বড প্রাকাব বচিত হয়েছিল। কিন্তু এর ফলে স্থানীয, প্রাদেশিক ও জাতীয স্তবে ভাবতীযদেব মধ্যে এক ধরনের যোগসূত্র স্থাপিত হল, যাব পরিণাম—জাতীয়তাবাদ। (২) সেই জাতীযতাবাদের

মধ্যে ইডিওলজির স্থান নেই। সুরাটের দক্ষযজ্ঞের পেছনে নিছক কংগ্রেসমঞ্চ দখলের লড়াই ছিল—চরমপন্থী ও নরমপন্থীর ইডিওলজির সংঘাত নয়। গান্ধীজির বড়ো বড়ো আন্দোলন ছোট ছোট অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে মাঝে মাঝে ধামাচাপা দিত। কিন্তু ১৯২২-২৩-এ স্বরাজীদের আইনসভা প্রবেশের দাবি কোন আদর্শের ভিত্তিতে তোলা হয়েছিল? তাঁদের সিদ্ধান্ত—"Imperialism built a system which interlocked its rule in locality, province and nation; nationalism emerged as a matching structure in politics." জাতীয়তাবাদ যেন সাম্রাজ্যবাদী নীতি বিবর্তনের আদর্শহীন প্রতিক্রিয়া মাত্র।

এই গ্রন্থ শুরু হয়েছে নেমিয়ারপন্থী কেমব্রিজ ইতিহাস দর্শনের প্রতিবাদ দিয়ে। জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের বিরোধিতা উঠেছে 'নিম্নবর্গপন্থী' ঐতিহাসিকদের কাছ থেকেও। সম্প্রতি প্রকাশিত পিটার মার্শালের Bengal: The British Bridgehead গ্রন্থে স্বীকার করা হয়েছে যে কেমব্রিজ গোষ্ঠী ঘোষিত সহযোগিতার পথ সব সময় এবং সব অঞ্চলে কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। সাব-অলটার্ন গোষ্ঠীর প্রধান প্রবক্তা রণজিৎ গুহ Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India ও তাঁর সহযোগীরা ছয় খণ্ডে প্রকাশিত Subaltern Studies-এ সেই সব বিদ্রোহ (insurgency)-এর তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেন। এলিট-নেতৃত্বের গুরুত্ব বরবাদ করে তাঁরা নিম্নবর্গের সচেতন নেতৃত্ব (গ্রামসচির 'multiple elements of conscious leadership but no one of them....predominant'), স্বকর্তৃত্ব (autonomy)-কে বড়ো করে দেখাতে চাইছেন। Subaltern Studies-এর তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকায় গুহ বলছেন, "We are opposed as much of the prevailing practice in historiography and the Social Sciences for its failure to acknowledge the Subaltern as the maker of his own destiny." এটা প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে 'elitist paradigm' বা উচ্চবর্গীয় আদর্শ-এর প্রতিবাদী হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। "Negativity is therefore the very raison d'etre as well as the constitutive principle of our project." তাঁরা সহজ জাতীয়তাবাদী ব্যাখ্যা সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাস ব্যাখ্যার মতই (কারণ উভয়ই "one sided and blinkered historiography") নস্যাৎ করবেন, আবার কেমব্রিজ গোষ্ঠীর মত সব আদর্শবাদের 'বাংতাওলা মোড়ক' ছিন্ন করবেন—এমন ঘোষণা প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় পড়েছি। তাঁদের মতে জাতীয় সংগ্রাম ঔপনিবেশিকতাবাদ ও ভারতীয় জনগণের সংগ্রাম নয়, বিদেশী ও স্বদেশী এলিটদের সঙ্গে নিম্নবর্গের সংগ্রাম। আশ্চর্য নয়, বামপন্থী ঐতিহাসিক বিপান চন্দ্র মন্তব্য করছেন, "The Subaltern school's characterization of the national movement bears a disturbing resemblance to the imperialist and neo-imperialist characterization of the national movement. This approach is also characterized by a generally ahistorical glorification of all forms of popular militancy and consciousness and an equally ahistorical contempt for all forms of initiative and activity by the intelligentsia, organized party leaderships and other elites."

নিম্নবর্গীয় ইতিহাস রচনার প্রয়াস আমাদের জ্ঞানের পরিধি ব্যাপকতর ও গভীরতর

করলেও তার মধ্যে অনেক ফাঁক রয়েছে। প্রথমত, নিম্নবর্গ-এব কোন পরিষ্কার ও যুক্তিগ্রাহ্য সংজ্ঞা তাঁরা দিতে পারেননি। আদিবাসী বিদ্রোহকে অধিক গুরুত্ব দিতে গিয়ে অন্যান্য শ্রেণীর প্রতিবাদকে লঘু করা হয়েছে। এদের উপজাতিক, খণ্ডজাতিক বিভেদ স্বীকৃত। দ্বিতীয়ত, অনেক ক্ষেত্রে এলিট নেতৃত্ব (বিশেষত গান্ধী নেতৃত্ব)-এব মাধ্যমেই নিম্নবর্গ তাব আশা, আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্নকে রূপ দিতে চেয়েছে—সে প্রত্যক্ষ সত্য প্রায় অস্বীকৃ৽। উচ্চবর্গীয় নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতা ঘোষণায় সাবঅলটার্ন ঐতিহাসিকগণ বজনী পাম দত্তেব মতই সোচ্চার। তৃতীয়ত, স্ট্রাকচারালিজমের আঙ্গিক নির্বিচারে প্রযোগ কবতে গিযে হয প্রথাগত তথ্য, ব্রিটিশ বা উচ্চবর্গীয় discourse অপবাদ দিয়ে, বর্জন করা হযেছে না হয recursive reading দ্বারা বিকৃত করা হযেছে। যেমন 'বদমাশ' বললেই বুঝতে হবে গ্রামীণ প্রতিবাদে অংশগ্রহণকারী, 'ডাকাতে গ্রাম' বললেই বুঝতে হবে রাষ্ট্রেব সৈন্যবাহিনীব বিরুদ্ধে বিদ্রোহী গ্রাম। নাম, পোশাক, বণহুঙ্কার উচ্চবর্গীয়দেব কাছ থেকে ধাব নিযে নিম্নবর্গ সব প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা ওলটপালট কবতে চেয়েছিল, তাই তাদেব ঐতিহাসিকবা উচ্চবর্গীয় discourse ওলটপালট কবে প্রতিবাদের ভাষা উদ্ভাব কবতে চাইছেন। বলা বাহুল্য, এ ধরনের ইতিহাস দর্শন এক ধরনেব বুদ্ধিব খেলা—সত্যেব মুকুব নয।

এই দুই মতবাদ ছাড়া সাধাবণ বামপন্থী ব্যাখ্যাও বিবেচনা করেছি। একদা তা ছিল অতিমাত্রায় যান্ত্রিক। ভারতবর্ষের মত বৃহৎ, বিচ্ছিন্ন, জাত-ভাষা-ধর্ম-অঞ্চল নানাবিধ দ্বন্দ্বে বিদীর্ণ দেশে যান্ত্রিক মার্ক্সবাদী শ্রেণীভিত্তিক বিশ্লেষণ যে সব সময কবা যায না এবং তার ভিত্তিতে জাতীয সংগ্রামেব বিভিন্ন পর্বের বিচাব খাটে না এ কথা আমি স্মবণ কবিযে দিয়েছি। জাতীয় সংগ্রামে নরমপন্থী ও 'জাতীয় বুর্জোযা'ব ভূমিকা নিযে এখনও বিপান চন্দ্র ও অন্যান্য বামপন্থীদের বিতর্ক চলেছে। ১৯৪৫-৪৭ সালে গণবিপ্লব কতটা সম্ভব ছিল বা সফল হত তা নিযেও বিপান চন্দ্রের মত সুমিত সবকাব প্রভৃতি ঐতিহাসিকের সঙ্গে মেলে না। দ্বিতীয় দল কংগ্রেসেব ইডিওলজিকে ভান বা মুখোশ মনে কবেন—অনেকটা কেমব্রিজ গোষ্ঠীব মতই। গান্ধীকে তাঁরা বুঝবার চেষ্টা করেন না, প্রথমদিকেব নেহরুকে প্রশ্রয দিলেও পরের দিকে নিন্দার্হ মনে করেন, বল্লভভাইকে ধনিক শ্রেণীর মুখপাত্র মনে কবেন, সুভাষ বসুকে এক সময় ব্যবহার করে পরে পরিত্যাগ করেন।

আমার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা পুরাতন জাতীযতাবাদীব কংগ্রেস ভজনা এবং কেমব্রিজ গোষ্ঠী, নিম্নবর্গীয় ঐতিহাসিক গোষ্ঠী, যান্ত্রিক মার্ক্সবাদী বা তার শোধিত সংস্করণেব কংগ্রেস নিন্দা উভয় পথই পবিহাব করেছে। উল্লেখপঞ্জীতে চোখ বুলোলে বোঝা যাবে—যত দূব সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করেছি। হতে পাবে নিম্নবর্গীয়বা আমাকে empiricist আখ্যা দেবেন, তবু তাঁদের মত একটি উপাদানের ভিত্তিতে বিশাল এক সিদ্ধান্তের সৌধ গড়ার সাহস আমাব নেই। উপাদানের অভাব নেই, প্রকৃতিও বহুবিধ। ববং তাদেব জটিল জটাব জালে পথ হারানই স্বাভাবিক। এই গ্রন্থে যখন যে ধবনেব উপাদান প্রাসঙ্গিক মনে হযেছে, গ্রহণ করেছি। বিশেষ জোব পড়েছে সংখ্যাতাত্ত্বিক উপাদানেব ওপব। সহজবোধ্য সারণীতে বা অন্যভাবে উপস্থাপিত সংখ্যা জাতীয় সংগ্রামের অনেক পর্বেব ওপর যে আলোকপাত কবে প্রথাসিদ্ধ রাজনৈতিক দলিল বা নেতাদেব ব্যক্তিগত চিঠিপত্রও তা কবে না। প্রথম মহাযুদ্ধের সমকালীন ও অব্যবহিত পবেব দ্রব্যমূল্য, আমদানি রপ্তানি, স্টারলিং এবং টাকার বিনিময় হারের হ্রাস বৃদ্ধি রাওলাট ও অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমিকা রচনা করেছে। ১৯৩০-৩১-এর আইন অমান্যের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী মান্দ্যের ভূমিকা অনুরূপ। শেষ পর্বে ভারতীয় উদ্যোগে ব্যবসা বৃদ্ধি ও মূলধন বিনিয়োগ, ব্রিটিশ ব্যবসা সংকোচন ও স্টাবলিং

পাওনার সমস্যা প্রভৃতির অপরিসীম রাজনৈতিক মূল্য সংখ্যাতত্ত্বে উদ্ভাসিত। রাজনৈতিক দলগুলি নানা নির্বাচনে কিভাবে শক্তি বৃদ্ধি বা ক্ষয় করছে, বিশেষত মুসলিম লীগ বাংলা ও পঞ্জাবে এবং কেন্দ্রে কিভাবে শক্তিবৃদ্ধি করছে, কিভাবে তফসিলী সম্প্রদায়ের অনুপ্রবেশ রাজনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট করছে—তাও দেখান হয়েছে সংখ্যাতত্ত্ব প্রয়োগে। বাংলার কৃষকশ্রেণীর উচ্চ-নীচ বিন্যাস, পূর্ব ও পশ্চিমবাংলায় কৃষক সংহতির পার্থক্য, বিশেষ কারণে ভূমিহীন ক্ষেতমজুরের সংখ্যাবৃদ্ধি ভালোভাবে না বুঝলে কৃষক-প্রজা দল বা লীগের অভ্যুদয়, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বা বাংলা ভাগের দাবি বোঝা যাবে না। মোটের ওপর, সংখ্যাতত্ত্ব এই গ্রন্থের অন্যতম প্রধান উপাদান।

তাই বলে আমি economic determinism-এ বিশ্বাসী মনে করলে ভুল হবে। জাতীয়তাবাদের ইডিওলজি ভারতে একটা বিশেষ মাত্রা পেয়েছিল। ভারতীয় সংস্কৃতিতে অজ্ঞ কেমব্রিজগোষ্ঠী তা উপেক্ষা করেছেন, আবার নিম্নবর্গীয় সংস্কৃতি বিশ্লেষণে নিপুণ রণজিৎ গুহরা উচ্চবর্গীয় সংস্কৃতিকে অপ্রাসঙ্গিক মনে কবেছেন। অথচ আমাদেব জাতীয়তাবাদ ইতালী, জার্মেনী, আর্যল্যান্ডের জাতীযতাবাদের মতই প্রথম পর্বে সাংস্কৃতিক রূপ নিয়েছিল। কিন্তু সে সংস্কৃতি ছিল high culture—তার পেছনে ছিল প্রথমে লুপ্তোদ্ধৃত বেদান্ত, পরে মহাভারত ও ভাগবত, শেষে বেদ। পাশ্চাত্যশিক্ষিত ভাবতীয চিন্তানায়করা বার্ক দ্বাবা প্রভাবিত হযে ঐতিহ্যের মূল্য দিতে শিখেছিলেন। মাৎসিনি থেকে দেশপ্রেম। তারপব জার্মান রোমান্টিকদেব মত দেখা দিল ভাবতীয় ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মধ্যে ভারতীয় সত্তাব আদি ও অবিকৃত রূপেব অনুসন্ধান। জার্মানবা যেমন নেপোলিয়নীয় সাম্রাজ্যেব প্রতিবাদে ফরাসী জাতীয়তাবাদের সর্বজনীন মডেল প্রত্যাখ্যান করে খাঁটি টিউটনিক মডেলে প্রত্যাবর্তন করতে চাইছিল, আমাদেব চিন্তানাযকবাও তেমনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিবাদে ব্রিটিশ ধ্যানধাবণার অন্ধ অনুকবণ ত্যাগ কবে আপনমূলে ফিরে যেতে চাইলেন। নরমপন্থীরা প্রধানত তার অর্থনৈতিক ধ্যানধারণা (laissez faire) প্রত্যাখ্যান করলেন,' চরমপন্থীবা তাব সব কিছুই। শবৎচন্দ্র 'শেষ প্রশ্ন'-এ আশুবাবুব মুখ দিয়ে এঁদের কথাই বলাচ্ছিলেন—"সেই ব্রহ্মচর্য, সেই সংযম সাধনা, সেই পুবনো বীতি-নীতির প্রবর্তন—এ সবই কি আমাদেব সেই অতীত দিনটির পুনঃ প্রতিষ্ঠাব উদ্যম নয় ? তপোবনেব যে আদর্শ কেবল আমাদেবই ছিল, পৃথিবী খুঁজলেও কি আব কোথাও এব জোড়া মিলবে অজিত ? আমাদের সমাজকে যাঁবা একদিন গড়েছিলেন, আমাদের সেই প্রাচীন শাস্ত্রকর্তাবা ব্যবসায়ী ছিলেন না, ছিলেন সন্ন্যাসী ; তাঁদেব দান নিঃসংশযে, নত শিবে নিতে পারাই হল আমাদেব চরম সার্থকতা।" সে যুগে কেউ বিবেকানন্দেব আত্মসমীক্ষা নিয়ে কমলের মত প্রশ্ন করেনি, "লুপ্ত বস্তুর পুনরুদ্ধাব মাত্রই যে ভাল তাব প্রমাণ নেই। মোহের ঘোবে মন্দ বস্তুবও পুনঃ প্রতিষ্ঠা সংসারে ঘটতে দেখা যায়।" চবমপন্থীবা বলতে চেয়েছিলেন, ভারতের জ্ঞান, ভারতেব সমাজ ব্যবস্থা, বিশেষত ভাবতেব ধর্ম—ভাবতেব প্রাণ, তাদের জন্যই স্ববাজ সাধনা, তাদের বাদ দিযে স্বাধীনতা অর্জন করাও পবাজযেব নামান্তর। সে ধর্ম দয়ানন্দেব অসহিষ্ণু, বিধর্ম-বিদ্বেষী, সংগ্রামী আর্যধর্ম। তাতে আর্যেত্তব পৌরাণিক ধর্মকে প্রতীক রূপে ব্যাখ্যা করতে হয, আর মুসলিম, শিখ ও খ্রিস্টান ধর্ম—অপাঙক্তেয়। যা কিছু বিদেশী তাই বস্তুবাদী যন্ত্রসভ্যতাব পাপ স্পর্শে কলুষিত এমন ধারণা ভারতকে পেয়ে বসে—অথচ রামমোহন থেকে বিবেকানন্দ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে মূঢ় অতীত বন্দনার সংস্কার থেকে, দেশের নিদারুণ দারিদ্র থেকে, মুক্তিব উপায় মনে কবতেন।

গান্ধীর মধ্যে এই আর্য শ্রেয়োমন্যতা, বর্ণাশ্রমিক নিষ্ঠুরতা, সাম্প্রদাযিক সংকীর্ণতার স্থান

নেই, তবু 'হিন্দ-স্বরাজ'-এর বিশ্ববীক্ষায অরবিন্দযুগেব ছাযা পড়েছে। গান্ধী দর্শনেব বিস্তৃত আলোচনা করেছি—তাঁব লক্ষ্য ও উপাযেব প্রকৃতি বোঝাবার জন্য, তাদেব পরস্পর-নির্ভরতা প্রতিপাদনের জন্য। তিলকেব গীতাব ব্যাখ্যা ও গান্ধীব গীতাব ব্যাখ্যা দুই যুগের পার্থক্য চিহ্নিত করেছে। তবু (অহিংস হলেও) অসহযোগের ভাবনা চবমপন্থাব উত্তরাধিকাব। ববীন্দ্রনাথের বিশ্বচেতনার সাথে এব দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী—তাই সে বিতর্ক উল্লেখ কবেছি। কিন্তু বিতর্কটা শুধু গান্ধী-ববীন্দ্রনাথেব মধ্যে নয়, একদিকে পুবোনো বিপ্লবীদের সঙ্গে অন্যদিকে স্বরাজীদেব সঙ্গে—যাঁবা সশস্ত্র যুদ্ধে ইংবেজদেব হটিযে কিংবা আইনপরিষদের ভেতব থেকে শাসনতন্ত্র বানচাল কবে সংগ্রাম চালাতে চেযেছিলেন। এই দুই প্রতিপক্ষ শেষ পর্যন্ত টিকে ছিল। সুভাষ বসু হযে ছিলেন প্রথম পক্ষেব প্রতিভূ, ভুলাভাই, বাজাজিরা—দ্বিতীয় পক্ষেব। গান্ধীব আবেদন ছিল বৃহত্তব জনগণেব কাছে, প্রথম দিকে খিলাফতী ও পরে জাতীযতাবাদী মুসলমানের কাছে, সর্বোপবি নতুন প্রজন্মেব তরুণ নেতা—জওহবলাল, বল্লভভাই, বাজেন্দ্র প্রসাদদেব কাছে।

কলকাতা কংগ্রেস (১৯২০) থেকে মাউন্টব্যাটেনেব আগমন (১৯৪৭) পর্যন্ত নানা উত্থানপতনেব মধ্য দিয়ে গান্ধীই কংগ্রেসকে ভেতব বা বাইবে থেকে নেতৃত্ব দেন। বীরভজনাব তাগিদে নয, শুধু সেই বাস্তব কাবণে, গান্ধী এই গ্রন্থেব কেন্দ্র বিন্দু। কিন্তু তাঁব সহকর্মীবা বা বিবোধী নেতাবা, দেশ জোড়া তাঁব অখ্যাত, অজ্ঞাত সৈনিকবা কেউই উপেক্ষিত হননি। যখনই গান্ধী কোন ভুল নীতি নিযেছেন তাব কঠোব সমালোচনা কবেছি, আবাব যখন তাঁব কাজেব অন্যায় নিন্দা কবা হযেছে, জবাব দেবাব চেষ্টা কবেছি। কেমব্রিজ গোষ্ঠীব জুডিথ ব্রাউন গান্ধীব ওপব পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণা কবেছেন, কিন্তু শুধু শক্তিব লড়াই-এব ওপব জোর দিযেছেন বলে ও ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদেব ব্রিটিশ শাসকদেব চোখে দেখেছেন বলে তাঁব প্রতিবাদ কবতে বাধ্য হযেছি। কিন্তু কংগ্রেসেব মধ্যে দেশবন্ধু, নেহরু, সুভাষ ও জযপ্রকাশ প্রভৃতি নেতা এবং বাইবে বিপ্লবী ও কম্যুনিস্টবা কম সমালোচনা কবেননি। সব সময অন্যায করেছেন তাও নয। তবে ওতব-চাপানেব অন্যতম কাবণ ভুল বোঝাবুঝি। গান্ধীব জীবনদর্শনেব কথা বলেছি। অনেক সহকর্মী তা মেনে নেননি। গান্ধীব কার্যক্রমের একটা বিশেষ স্টাইল ছিল। যেমন,আন্দোলন কখন শুরু কবতে হবে ও কখন থামাতে হবে তা বোধি বলে বুঝলেও তাব সাংগঠনিক দিকটা বা বিভিন্ন সংগ্রামী নীতি ও কৌশলেব দিকটা তিনি কোনদিন পরিষ্কাব ভাবে ছক কবে নেননি। ফলে অকালে অনেক সময পশ্চাদপসবণ কবতে হযেছে। সব শ্রেণীকে নিযে একটা সার্বিক বাজনৈতিক আন্দোলন গড়তে চেযেছিলেন তিনি। সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি আন্দোলন তাঁব প্রাগাধিকাবেব প্রথমেই স্থান পাযনি। তাঁব অনুগততম শিষ্য নেহরু বাজনৈতিক সংগ্রামকে প্রথম স্থান দিলেও অর্থনৈতিক বিপ্লবেব লক্ষ্য কোন দিন বিস্মৃত হননি, বরং একটু একটু কবে কংগ্রেসকে সে দিকে টানতে চেযেছেন। সুভাষ বসু চাইছেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেব সুযোগ নিযে সর্বাত্মক সংগ্রাম। কম্যুনিস্ট পার্টি তো ১৯২০ সাল থেকেই গান্ধীকে লেনিনেব ভূমিকায দেখতে চাইছেন। অন্যদিকে দক্ষিণপন্থীবা এসবের মধ্যে দেখছেন জাতীয় সংহতি ও কংগ্রেসী ঐক্যেব অবলোপ। গান্ধীকে এই বিপবীতমুখী টানেব মাঝখানে থেকে ভারসাম্য রাখতে হয়েছিল। সেজন্যই ব্রিটিশবা তাঁকে ১৯৪৬ পর্যন্ত সমীহ কবত। উদাবপন্থী সাপ্রু জযাকবও। ধনিক ও বণিক দলেব নেতা—ঠাকুবদাস, বিড়লারাও। ১৯২০ ও ১৯৩০-এব আন্দোলনে কৃষকদের শ্রেণীস্বার্থ বঞ্চিত না হলেও তারাই ছিল ১৯৪২-এব আন্দোলনের অন্যতম সৈনিক। তবু নেহরু ও সুভাষ তাঁদের

সভাপতির ভাষণে এবং কম্যুনিস্ট পার্টি তাঁদের বিভিন্ন রচনায়/আন্দোলনে গান্ধী নেতৃত্বের সীমাবদ্ধতা (constraints)-র প্রতি ইঙ্গিত করে ঠিকই করেছিলেন। ধনিকরা যতটা উপকৃত হল, এমন কি বড়ো কৃষকরা, অন্য কৃষক ও শ্রমিক তা হয়নি। এই ফাঁকি কংগ্রেসী আন্দোলনকে ক্রমশই দুর্বল করেছিল, কিছুটা হিন্দু-মুসলিম বিদ্বেষের কারণও হয়েছিল।

প্রসঙ্গত মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদ হিন্দু-মুসলিম সমঝোতার নানা চেষ্টা, মুসলিম লীগের রাজনীতি, জিন্নার অভ্যুত্থান ও ক্রমবর্ধমান প্রভাব, পাকিস্তান আন্দোলন ও দেশভাগে জিন্নার দায়িত্ব আলোচিত হয়েছে। কংগ্রেসী রাজনীতি গান্ধী নেতৃত্বে খানিকটা সংহতি পেলেও মুসলিম রাজনীতি বহুদিন পর্যন্ত আঞ্চলিক নেতৃত্ব-নির্ভর ছিল। মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশ ও মুসলিম সংখ্যাগুরু প্রদেশ মুসলিম স্বার্থ এক চোখে দেখত না। মুসলিম নেতৃত্ব কংগ্রেসী নেতৃত্বের থেকে ঢের বেশি elitist তো ছিলই, উপরন্তু লীগও ছিল নানা দল উপদলে বিভক্ত। ১৯৩৪ সালের পূর্বে জিন্না লীগের নেতৃত্ব পাননি। পরেও বাংলার ফজলুল হক বা পঞ্জাবের সিকান্দার হায়াৎ খান জিন্নার বশম্বদ ছিলেন না। সিন্ধু ও সীমান্ত তো কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলত। ১৯৩৭-এর নির্বাচনে জিন্নার শোচনীয় ব্যর্থতা লক্ষণীয়। কি মন্ত্রবলে তিনি ১৯৪০-৪৬-এর মধ্যে লীগের অবিসংবাদী নেতা হলেন, কি পরিস্থিতিতে 'পাকিস্তান'-এর মত অব্যাখ্যাত এবং অবাস্তব এক ভাবনা ১৯৪০-৪৬-এর মধ্যে মুসলিম ঐক্যসূত্র হয়ে দাঁড়াল তা নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছি। সম্প্রতি জিন্নার দায়িত্ব স্খালনের জন্য অনেক প্রচেষ্টা চলেছে। আয়েষা জালালের মত শোধনবাদী ঐতিহাসিকও তাঁর 'ক্যারিসমা' এড়াতে পারেননি। আমার মত ভিন্ন এবং করাচী ও অন্যত্র প্রাপ্ত দলিলাদি দ্বারা তা প্রতিষ্ঠিত করেছি। দেশভাগের জন্য অবশ্যই তিনি একা দায়ী নন—সব সম্প্রদায়ই দায়ী, নেতৃত্বের ব্যর্থতাও দায়ী, সবচেয়ে বেশি দায়ী বোধহয় ব্রিটিশ বিভাজন নীতি এবং উচ্চবর্গীয় হিন্দুদের নিম্নবর্গীয় মুসলিমদের দাবিদাওয়া পূরণে অনীহা। অনেকটা সেই কারণে জাতীয়তাবাদী মুসলিমদের সামান্য প্রয়াসও বিঘ্নিত হয়।

ব্রিটিশ নীতিকে, কেমব্রিজ গোষ্ঠীর মত 'prime mover' না মনে করলেও তাকে গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ আমাদের জাতীয় সংগ্রামে তারাই ছিল প্রতিপক্ষ। ভারতীয় সমাজ যে pluralist বা বহু স্তরে বিভক্ত এ খবর তাঁদের মত কেউ জানতেন না। এক হাতে তাঁরা নীচু স্তরের আন্দোলন দমন করেছেন, অন্য হাতে উঁচু স্তরে বিভেদের বীজ বপন করেছেন। প্রথমে হিন্দু ও পরে মুসলিম সহযোগিতার পথ বেছে নিয়ে তাঁরা বিভেদটাকে পাকা করেছেন। মুসলিমরা শিক্ষায় ও চাকুরিতে পিছিয়ে পড়েছে, দোষ দিয়েছে হিন্দুদের ; মুসলিম কৃষকরা ব্রিটিশ করনীতির শিকার হয়েছে, দোষ পড়েছে হিন্দু জমিদার-জোতদারের ঘাড়ে। তারপর এসেছে প্রকাশ্যে মদত দেওয়ার পালা। মিন্টো-মর্লে সংস্কার থেকে ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা পর্যন্ত এই বিভাজননীতি ক্রিয়াশীল। বস্তুত স্যার সৈয়দ আহমদ, আগা খান, ঢাকার ও বগুড়ার নবাব, স্যার আবদার রহিম, মহম্মদ সাফি, সিকান্দার হায়ৎ খান, জাফরুল্লা খান, শেষে মহম্মদ আলি জিন্না, নাজিমুদ্দিন, সুরাবর্দি—যখন যাকে তোলবার দরকার হয়েছে তখনই বড়লাট/ছোটলাট সচেতন ভাবে তা করেছেন। সবচেয়ে মদৎ দিয়েছেন কার্জন, মর্লে, রিডিং, উইলিংডন, লিনলিথগো ও ওয়াভেল এবং বিলেতের রক্ষণশীল দল সর্বদা। শেষোক্ত দুই বড়লাট ও চার্চিলের সহযোগিতায় জিন্না গান্ধীর সমকক্ষ হয়েছেন, শেষে গান্ধীকে চালে মাৎ করেছেন।

এই গ্রন্থের অন্যতম রাজনৈতিক ঘটনাবলীর জন্য প্রভূত ও বিচিত্র উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে যার মধ্যে প্রধান সরকারী চিঠিপত্রের চেয়েও ব্যক্তিগত চিঠিপত্র। বড়লাট

ভারতসচিবদের এবং ছোটলাট/আমলারা বড়লাটদের যা লিখতেন তা গোপনীয় ছিল, কখনও প্রকাশ কবার কথা ছিল অকল্পনীয়। তাই তাতে সত্যকার, ভেতবকাব, ইতিহাস বেশি পাওয়া যায়। গান্ধীর ও নেহরুর সুবক্ষিত ও সম্পূর্ণ রচনা সংগ্রহ ছাড়া শুধু এ· আই· সি· সি· ফাইল থেকে কংগ্রেসেব ইতিহাস লেখা যেত না। জিন্নাব চিঠিপত্র সব পাওয়া যায়নি——তবু তাঁব ও লীগেব অন্যান্য নেতাব চিঠিপত্র যতদূব সম্ভব ব্যবহাব কবেছি। বিপ্লবীরা স্বভাবতই এ ধবনেব কাগজপত্র বাখতে পাবেননি। তাঁদেব (অনেক সময় পবস্পব বিরোধী) স্মৃতিকথার ওপব নির্ভর করতে হয়েছে। টেগার্ট-পত্নী সংকলিত তাঁর জীবনী আমার আবিষ্কাব। সুভাষচন্দ্র এবং প্যাটেলেব চিঠিপত্রও খণ্ডিত। গোয়েন্দা দফতরেব দলিলপত্র সবসময় নির্ভরযোগ্য না হলেও মাঝে মাঝে আশাতীত সংবাদ দিয়েছে। জার্মান প্রবাসকালীন সুভাষচন্দ্রেব কর্মকাণ্ড ভিয়েনা থেকে প্রকাশিত এক জার্মান সংকলন থেকে নিয়েছি। ১৯৪৩-৪৫-এর বহু ঘটনা পেয়েছি আমাব আবিষ্কৃত ছোটলাট কেসিব ডায়েরি থেকে।

এই বাহ্য রাজনৈতিক মতবাদ ও কার্যাবলীব পেছনে যে মনস্তত্ত্ব ক্রিয়া কবে আমাব বচনায় তাও কিছু কিছু বিশ্লেষণ কবাব চেষ্টা কবেছি। আমি অবশ্যই মার্কিন psycho-history লিখিনি, তা সম্ভব বলেও মনে করি না। তবু মাঝে মাঝে তা ঘটনাব ওপর আলোকপাত কবে। মানুষ সাধাবণত যুক্তিবাদী হলেও অযৌক্তিক কাজ কবে না তা নয়, আবেগ দ্বাবা পরিচালিত হয না তা নয। তাব পেছনে ক্রোধ, ঈর্ষা, জয়েব বাসনা ও পবাজযের ভয কাজ কবে। স্বাধীনতা সংগ্রামেব সুব খুব উঁচু গ্রামে বাঁধা হলেও তাব থেকে স্খলন পতন মানবিক নিযমেই ঘটেছে। জনগণ যখন থেকে বঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হল তখন থেকে যূথমনস্তত্ত্ব (লেফেভরেব বা রুদেব crowd psychology) কাজ কবতে শুরু কবেছে। গান্ধী যে তিনটি গণ-আন্দোলনেব পবিকল্পনা কবেছিলেন তাব দুটিতে তিনি নেতৃত্ব দিতে পেবেছেন। শেষটিতে নয। জনগণ তাঁব ইচ্ছামত চলেনি। এদেব তিনি রাজনৈতিক মুক্তি সংগ্রামে আহ্বান করেছিলেন বটে কিন্তু এবা বাজনৈতিক লক্ষ্যেব সঙ্গে আপন অর্থনৈতিক অভাব অভিযোগ দাবিদাওযা মিশিয়ে ফেলল। আবাব জনগণের সব স্তরেব দাবিও এক রকমের ছিল না। লাগল অন্তর্বিরোধ। মধ্যবিত্ত কংগ্রেস নেতৃত্ব ধনিক ও শ্রমিকেব, জমিদাব ও কৃষকেব, বড়ো চাষী ও ছোট চাষী/ ভূমিহীনেব বিরোধ মেটাতে পারেনি। তাব সঙ্গে যোগ দিয়েছে প্রাদেশিক নেতৃত্ব ও জাতীয় নেতৃত্ব নিযে বিবোধ। গোখলে ও তিলকের, সুবেন্দ্রনাথ ও চিত্তরঞ্জনেব দ্বন্দ্ব প্রতিফলিত হযেছে জাতীয় কংগ্রেসেব রঙ্গমঞ্চে। আবার জাতীয় নীতি নিয়ে বিবোধ দেখা দিযেছে দেশবন্ধু, মতিলাল ও গান্ধীব মধ্যে, গান্ধী ও নেহরুব মধ্যে, গান্ধী ও সুভাষেব মধ্যে।

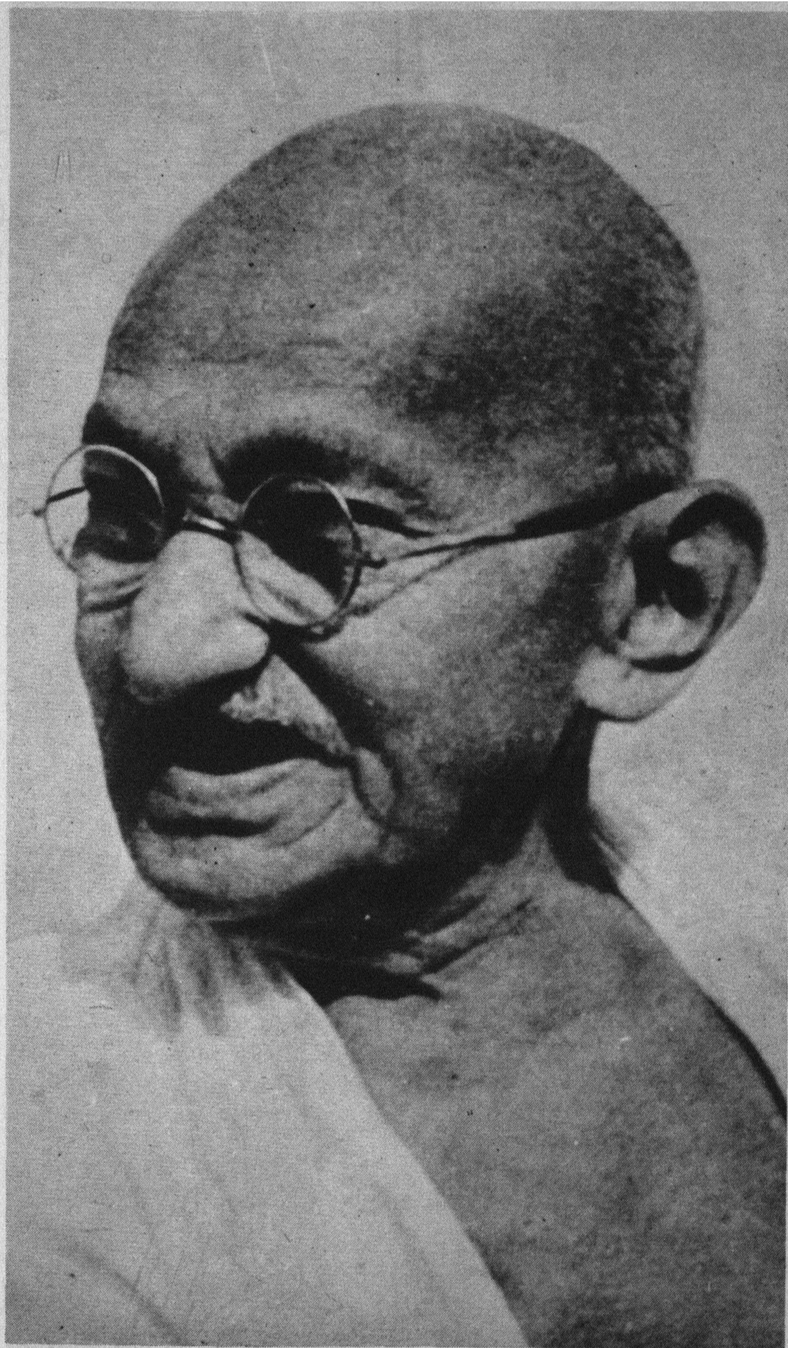
তথাপি জাতীয় সংগ্রামকে একটা ঐক্য দিতে পেরেছিল সেদিনকাব কংগ্রেস, কাবণ সব ব্যক্তিগত, জাতপাতগত, শ্রেণীগত বিরোধের চেয়ে বড়ো হযে উঠেছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও ঔপনিবেশিক শোষণ থেকে মুক্তি পাবার তাগিদ। ভাবতবর্ষেব মত খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত দেশ 'বন্দেমাতবম্' বলে মরা গাঙে তরী ভাসিযে ছিল। ত্যাগব্রতে দীক্ষা নিযে, বিঘ্ন হতে শিক্ষা নিয়ে, দুঃখকে মহান বিত্ত বলে মেনে, মৃত্যু নিশ্চিত জেনে, আসমুদ্র হিমাচল প্রবল ব্রিটিশ শক্তিকে বলেছিল, "বিধির বিধান কাটবে তুমি এমনি শক্তিমান কি তুমি, এমনি শক্তিমান ?" কংগ্রেসের নেতারা দেশবাসীকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, "ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে।" মৃত্যুঞ্জয বীর্যের বার্তা বহন করাই ছিল কংগ্রেসের ভূমিকা। সেদিন বিপ্লবী ও সাম্যবাদী, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র, চাষী, মজুব ও আদিবাসী, নিম্নবিত্ত কৃষক ও

কোটিপতি শিল্প মালিক, বাঙালী ও পাঞ্জাবী, হিন্দু ও মুসলমান সে ডাকে সাড়া না দিযে পারেনি। কংগ্রেসের বিশাল মণ্ডপে সবাই জড়ো হয়েছিল মুক্তিযজ্ঞে হবিঃ অর্পণ কবতে। তারপর হয়তো এক এক কবে মুসলমান, কৃষক, শ্রমিক, বিপ্লবী, সাম্যবাদী সবে গেছে। তবু একজন বজ্রানলে বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা চলেছিলেন। সে কংগ্রেস আব নেই। কালের প্রভাবে তা জীর্ণ, সাংগঠনিক অনৈক্যে বিদীর্ণ, নৈতিক শিথিলতায় আচ্ছন্ন, গণসংযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন। তবু তার পরিণতির আলোকে সে দিনেব কংগ্রেসকে দেখা ঐতিহাসিক ভ্রান্তি হবে। সে কংগ্রেস আমাদের পরাধীনতার লজ্জা দূব করেছে। বেখে গেছে আমাদের জন্য মুক্তবন্ধ সমাজ গডাব দায়ভাগ।

'দেশ কংগ্রেস সংখ্যা'য় ও পবে সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় এই গ্রন্থ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করাব জন্য সম্পাদক সাগবময় ঘোষকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই। গ্রন্থাকারে প্রকাশেব সময় কিছু পরিবর্জন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করা হযেছে। আনন্দ পাবলিশার্স পুস্তকাকারে প্রকাশের ভার নিয়ে আমাকে মুক্তি দিযেছেন। কর্মকর্তা বাদল বসু প্রকাশনার সুব্যবস্থার জন্য ধন্যবাদার্হ। 'দেশ'-এব তানাজী সেনগুপ্ত ও আনন্দ পাবলিশার্সের শোভন বসু নানা সাহায্য করার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। বহু ছাত্র, অধুনা অধ্যাপক, নানা ভাবে সাহায্য করেছে। এই গ্রন্থে দুটি মানচিত্র সংযোজিত হয়েছে। অনিবার্য কাবণে ব্রিটিশ ভাবতেব মানচিত্র বাংলায় ও স্বাধীন ভাবত ও পাকিস্তান-এব মানচিত্র ইংরেজিতে দেওযা হল। আমাব বহু দিনের পঠন-পাঠন চিন্তার ফসল এই গ্রন্থ ভুলত্রুটি সত্ত্বেও যদি জাতীয সংগ্রামেব ইতিহাস বুঝতে সাহায্য কবে—ধন্য হব।

পি ৪১৬, ব্লক জি, নিউ আলিপুব
কলকাতা

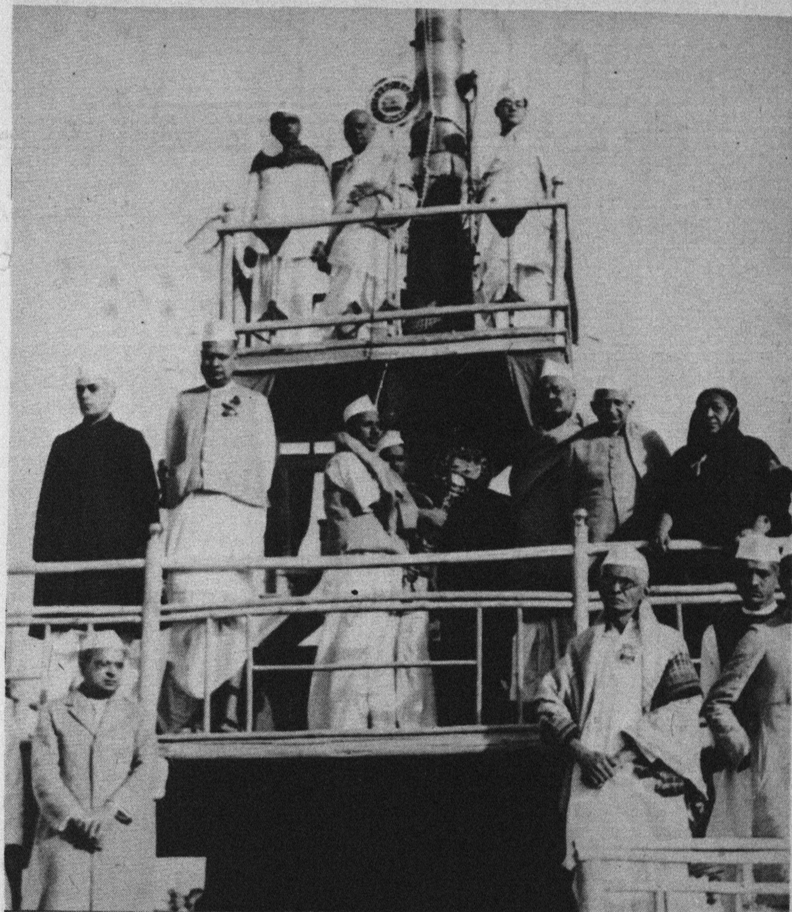
অমলেশ ত্রিপাঠী



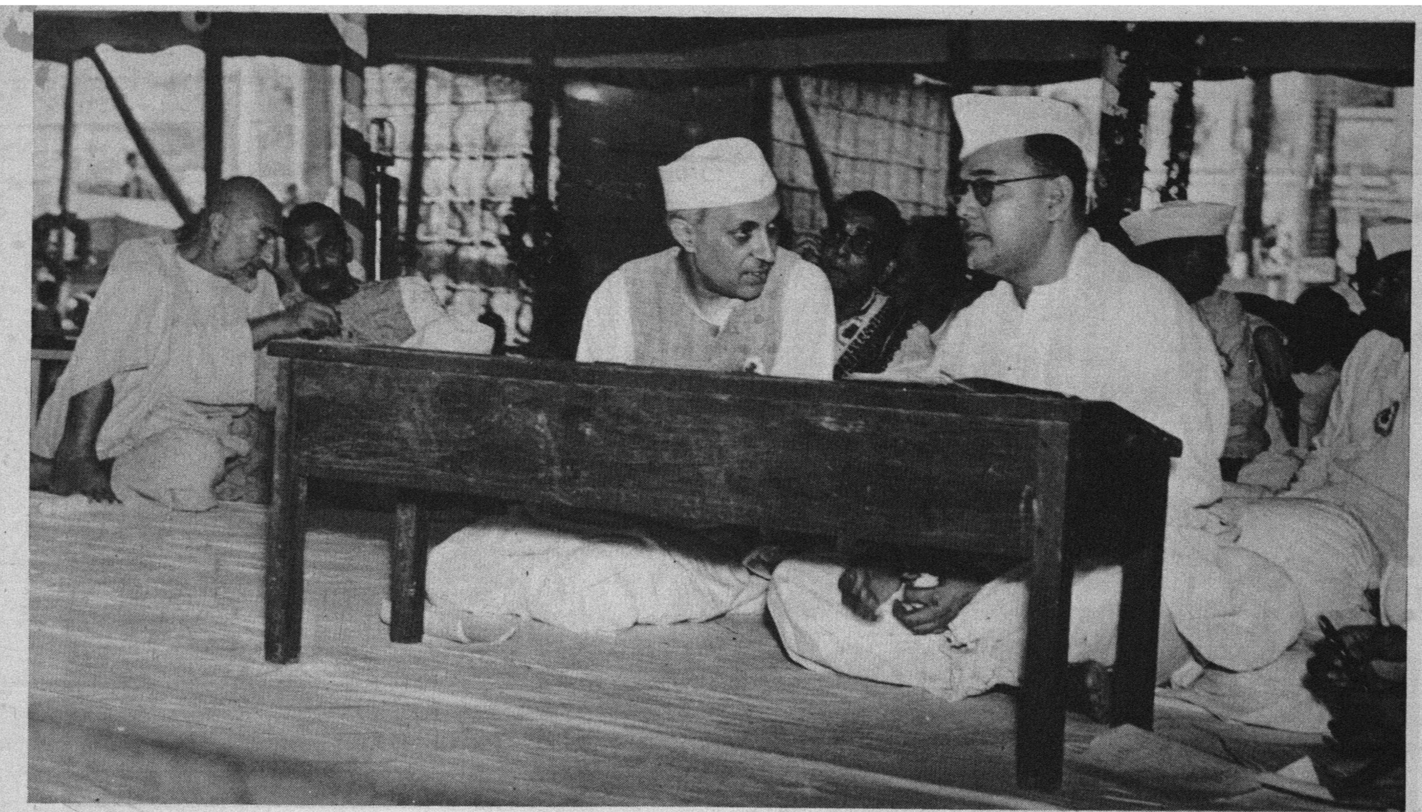
জাতির জনক



এ· আই· সি· সি· ১৯৩৭, কলকাতা



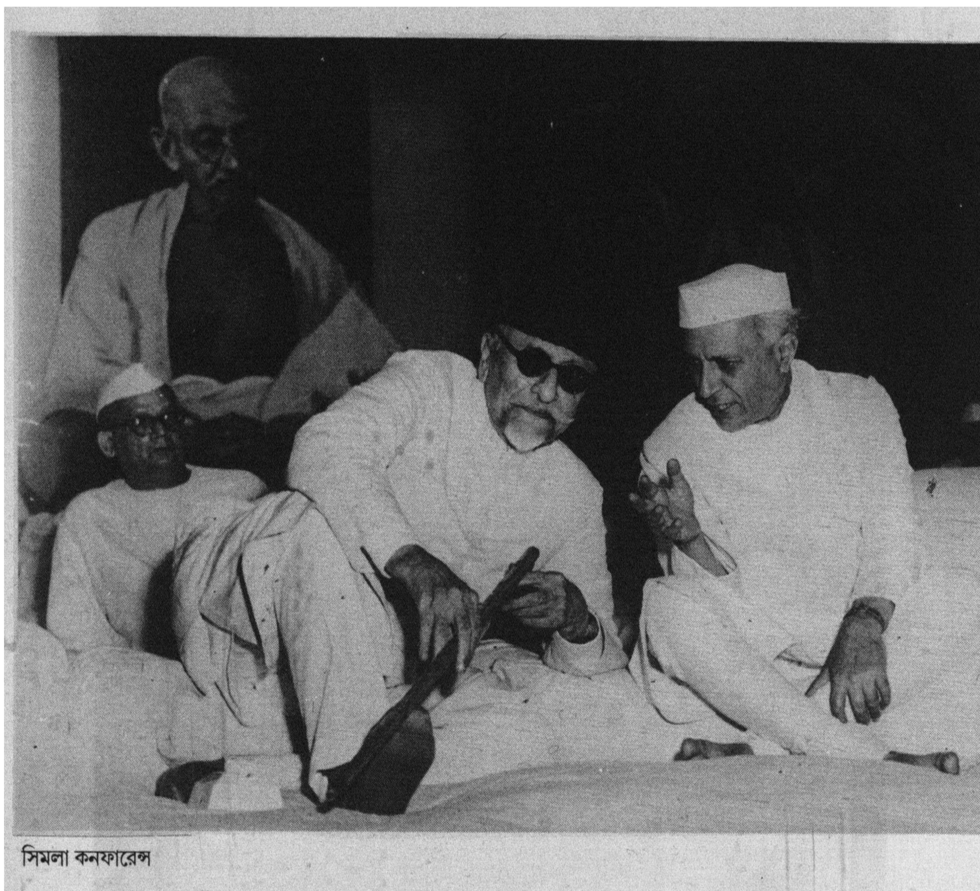
এ· আই· সি· সি· ১৯৩৮, হরিপুরা



এ· আই· সি· সি· ১৯৩৯, ত্রিপুরী



এ· আই· সি· সি· ১৯৪২, বোম্বাই



সিমলা কনফারেন্স



নোয়াখালিতে গান্ধীজি



ক্ষমতা হস্তান্তর ও ভারতবিভাগ ঘোষণা, ২ জুন ১৯৪৭

স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রীরূপে নেহরুর শপথ গ্রহণ ১৫ আগস্ট ১৯৪৭

প্রথম পর্ব

॥ ১ ॥

'বন্দেমাতবম্' মন্ত্রেব উদ্‌গাতা বঙ্কিমচন্দ্র 'বিবিধ প্রবন্ধে' দুঃখ কবে লিখেছিলেন, "ভাবতবর্ষেব এমনই অদৃষ্ট, যেখানে কোন প্রদেশীয লোক সর্বাংশে এক, যাহাদেব এক ধর্ম, এক ভাষা, এক জাতি, এক দেশ, তাহাদের মধ্যেও জাতিব একতা জ্ঞান নাই। জাতি প্রতিষ্ঠা নানা কাবণে ভারতবর্ষে অনেকদিন হইতে লোপ পাইয়াছে।" তাঁর মতে ব্রিটিশাধিকাবেব পূর্বে শুধু দুবাব—মারাঠা ও শিখদের মধ্যে—জাতীয়তাব উন্মেষ ঘটেছিল। "যে সকল অমূল্যবত্ন আমরা ইংবেজেব চিত্তভাণ্ডাব হইতে লাভ কবিতেছি, তাহাদেব মধ্যে দুইটি—স্বাতন্ত্র্যপ্রিযতা এবং জাতিপ্রতিষ্ঠা—ইহা কাহাকে বলে, তাহা হিন্দু জানিত না।" মৃণালিনী ও সীতারামে তিনি দেখিয়েছেন হিন্দুবা আঞ্চলিক স্বাধীনতা অর্জনে নিজ দোষে বিফল হয়েছিল। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায ও নবীন সেনেব কাব্যে, হিন্দু মেলাব নানা গানে আমবা এই ক্ষোভেব প্রতিধ্বনি শুনি। ১৯২৫ সালে প্রকাশিত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাযেব আত্মজীবনীব নাম বিনা কাবণে *A Nation in Making* (নির্মীয়মাণ জাতি) বাখা হযনি। বহুদিন পর্যন্ত ভাবতীযেবা নিজেদেব বাঙালী, শিখ, বাজপুত, মাবাঠী বা তামিল বলে পবিচয দিত, আজও মনে মনে তাই ভাবে বলে পঞ্জাব, আসাম নিযে বিস্ফোবণ ঘটে, শুধু জাতীয সংহতি নয, জাতীয সত্তাও বিপন্ন হয। আলিবর্দিব আমলে বাঙালীদেব চোখে মাবাঠীবা ছিল বর্গীদস্যু, উনিশ শতকেব শেষে উত্তব প্রদেশেব কাযস্থ ও মুসলমানবা বাঙালীকে বলত বিদেশী। ১৯০৮ সালে লেখা 'সমস্যা' প্রবন্ধে ববীন্দ্রনাথ মন্তব্য কর্বেছিলেন, "যে দেশে একটি মহাজাতি বাঁধিযা ওঠে নাই সে দেশে স্বাধীনতা হইতেই পাবে না। স্বাধীনতা কাহাব স্বাধীনতা? ভাবতবর্ষে বাঙালি যদি স্বাধীন হয তবে দাক্ষিণাত্যেব নাযব জাতি নিজেকে স্বাধীন বলিয়া গণ্য কবিবে না" বঙ্গভঙ্গেব যুগে বাঙালী জাতীযতাবোধ তাঁকে অনুপ্রাণিত কবলেও পবে জনগণঐক্যবিধাযক ভাবত ভাগ্য বিধাতাব কাছে আবেদন জানাতে হযেছিল।

অস্ট্রিযাব চান্সলাব মেটাবনিখ ইটালী সম্বন্ধে অবজ্ঞাভবে বলেছিলেন, "a mere geographical expresssion." ইংবাজবাও ভাবত সম্বন্ধে অনুৰূপ মন্তব্য কবত আঠারো শতকে। সাম্রাজ্যেব মাধ্যমে ঐক্য ও সংহতি স্থাপন ভাবতে ব্রিটিশবাজেব বহুবিঘোষিত কীর্তি। হেস্টিংস থেকে মাউন্টব্যাটেন এবং প্রায সব ভাবত সচিবেব (বিশেষত চার্লস উডেব) ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে ও সরকারী ডেসপ্যাচে, পার্লামেন্টেব বক্তৃতায, বেসরকারী সাহেবদেব বচনায ভাবতেব যে ভাবমূর্তি রচিত হযেছিল তা সতীদেহেব মত খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত। যখনই কোন শাসনতান্ত্রিক সংস্কাবেব কথা উঠেছে, তখনই ক্যানিং বা ডাফবিন, মিন্টো বা মন্টেগু, বার্কেনহেড বা স্যামুযেল হোব এই মৌল দুর্বলতাব অজুহাতে ভাবতীয়দেব আত্মনিয়ন্ত্রণেব দাবি অগ্রাহ্য কবেছেন। এ ব্যাপাবে আদম-সুমাবি তাঁদেব প্রভূত সাহায্য কবেছিল। কখনো হিন্দু সমাজের জাতিভেদ, কখনো সাম্প্রদাযিক কলহ,

কখনো ভাষাবিরোধ (হিন্দী বনাম উর্দু), কখনো বা জমিদার, মহাজন, উকিল শ্রেণীর অত্যাচার পাদপ্রদীপের সামনে তুলে ধরে ব্রিটিশ রাজের বিধি-নির্দিষ্ট ভূমিকাকে স্পষ্ট করা হয়েছে। অপক্ষপাতী শাসন ব্যবস্থা, পাশ্চাত্য শিক্ষা, ক্রমপর্যায়ে প্রদত্ত আইনপ্রণয়নের অধিকারের মাধ্যমে বহুধা বিভক্ত ভারতীয় সমাজকে এক সূত্রে গেঁথে ও আধুনিক শিল্পোদ্যোগ, যোগাযোগ, বিশ্বজোড়া বাজারের ব্যবস্থা করে ইংরাজরাই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পথ প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন এমন একটা আত্মতুষ্টি ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত প্রকট ছিল। নিজ গুণে তাঁরা যা জোড়া লাগিয়েছিলেন, নিজের দোষে আমরা তা ভেঙেছি এমন অপবাদ দিয়েই তাঁরা বিদায় নিয়েছিলেন।

অধুনাবিখ্যাত কেমব্রিজ গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকবৃন্দ সাম্রাজ্য ও জাতীয়তাবাদের যে নয়া ব্যাখ্যা দিচ্ছেন তাতে white man's burden-এর মহিমা উচ্চগ্রামে কীর্তিত না হলেও বিচ্ছিন্নতা ও বিভেদের ওপর জোর পড়েছে অনেক বেশি। তা শুধু এখন অঞ্চল বা প্রদেশে আবদ্ধ নেই, প্রতি গ্রামে গঞ্জে প্রসারিত। ১৯৫৩ সালে গ্যালাহার ও রবিনসন 'The Imperialism of Free Trade' শীর্ষক নিবন্ধে এই মতবাদের গোড়াপত্তন করেন ও ১৯৬১ সালে Africa and the Victorians গ্রন্থে আফ্রিকার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। ষাটের দশকে গ্যালাহারের প্রেরণায় অনিল শীল এবং পরে উভয়ের কতিপয় শিষ্য আধুনিক ভারতের ক্ষেত্রে ব্যাপকতর পরীক্ষা নিরীক্ষা চালালেন। তার ফলে ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত Locality, Province and Nation নামক সংকলনে প্রাথমিক মত কিছুটা পরিমার্জিত হয়। ১৯৭৪ সালের ফোর্ড বক্তৃতাবলীতে ও ১৯৮১ সালের Nationalism and the Crisis of Empire 1919-1922 প্রবন্ধে গ্যালাহারের ব্যাখ্যা পূর্ণ রূপ পায়। এই সব প্রচেষ্টার প্রচারিত উদ্দেশ্য সাম্রাজ্য ও জাতীয়তাবাদের বস্তুনিষ্ঠ, নির্মোহ বিশ্লেষণ হলেও, তার প্রেক্ষাপটে ঠাণ্ডা লড়াই (cold war)-এর মনস্তত্ত্ব কাজ করছিল। তখনো সাম্রাজ্যগৌরব নিয়ে রোমান্টিক দীর্ঘশ্বাস ফেলার সময় আসেনি, কিন্তু হবসন-লেনিন প্রবর্তিত সাম্রাজ্যবাদের মার্কসীয় ব্যাখ্যা খণ্ডন করার তাগিদ দেখা দিয়েছে। একই সঙ্গে ভারতীয় ঐতিহাসিকদের জাতীয়তাবাদের ব্যাখ্যাকে তাচ্ছিল্য করার বাসনাও উদিত হল। উভয় লক্ষ্যভেদ করার জন্য তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন আচার্য লুই বল নেমিয়ারের পদ্ধতি।

অষ্টাদশ শতকের ব্রিটিশ রাজনীতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে নেমিয়ার কোন মহৎ আদর্শবাদের সন্ধান পাননি। তিনি দেখেছিলেন শাসকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ গোষ্ঠীর স্বার্থসংঘাত, পৃষ্ঠপোষক ও অনুগৃহীতের সম্পর্ক, নিছক ক্ষমতার খেলা। পরে সমসাময়িক পূর্ব ইউরোপের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে তাঁকে জাতীয়তাবাদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে হয়। তাঁর মনে হল জাতীয়তাবাদ যুক্তিবোধবর্জিত, আবেগপ্রবণ ও নৈরাজ্যপ্রসূত। ইতালীয় সমাজতাত্ত্বিক পেরেটোর এলিটবাদ ও ফ্রয়েডের অযৌক্তিকতার মনস্তত্ত্ব (psychology of the irrational) তাঁকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু তাঁর নিজস্ব তিক্ত অভিজ্ঞতা এতে ইন্ধন জোগায়। তাঁর পিতা ছিলেন পোল্যান্ডের ক্ষুদ্র ইহুদী ভূম্যধিকারী। হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যের পতনের পর নেমিয়ারকে স্বদেশ ত্যাগ করে ইংল্যাণ্ডে পুনর্বাসন নিতে হয়। এই মর্মন্তুদ বেদনার জন্য তিনি পূর্ব ইউরোপের জাতীয়তাবাদকে দায়ী করেছিলেন। তদুপরি যে ইংল্যান্ডে তিনি নতুন করে শেকড় গাড়তে চাইলেন, সেখানে উদারতন্ত্রের স্বর্ণযুগ শেষ হয়ে গেছে। এসেছে এলিয়টের 'পোড়োজমির' যুগ। এই পরিবেশে নেমিয়ারের ইতিহাস দর্শন অনিবার্য ভাবে এলিটপন্থী, রক্ষণশীল ও জাতীয়তাবিরোধী হল। সাম্রাজ্যের অবসান ও ঠাণ্ডা লড়াই-এর পরিবেশে কেমব্রিজ গোষ্ঠী

নেমিয়ারকে গুরু রূপে বরণ করবেন এতে আশ্চর্য কি।

কেমব্রিজ মতবাদের একটা সংক্ষিপ্তসার দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। ভাবতীয়দেব মধ্যে অনৈক্য প্রথমাবধি ব্রিটিশ (তথা অন্য ইউরোপীয়) বণিকদেব চোখে পড়েছিল। ব্রিটেন থেকে কোনও দিন এত মূলধন বা সামরিক সাহায্য আসেনি যা দিয়ে আসমুদ্রহিমাচল বাণিজ্য বা সাম্রাজ্য বিস্তার করা যায়। তাই কোম্পানীর কর্মচারীরা কোম্পানীব ও নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থে ভারতীয়দের সঙ্গে সমঝোতা করতে বাধ্য হয়। তারা দেখেছিল প্রত্যেক অঞ্চলে, এমন কি তালুকে, ভারতীয় পণ্য সংগ্রহ ও বিলাতী বা এশীয পণ্য বিক্রয় করতে গেলে স্থানীয় সহযোগিতা আবশ্যক। আরও দেখেছিল, সম্পদ, প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা নিয়ে সর্বত্র ভারতীয়দের সঙ্গে ভাবতীয়দের তীব্র প্রতিযোগিতা চলেছে। এখানকার মাটিতে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা পেতে হলে এদের একাংশকে পক্ষে নিতে হবে, যদিও অনিবার্যভাবে অপরাংশেব বিবাগভাজন হতে হবে। কি সাম্রাজ্যবাদ কি জাতীয়তাবাদ এই সহযোগিতা ও বিবোধিতাব ইতিহাস। স্থানীয় স্তরে সহযোগিতার নীতি ক্রমশ প্রসারিত হয়ে সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হয। তেমনি স্থানীয় বিবোধিতা প্রথমে আঞ্চলিক ও পরে ভারতীয জাতীযতাবাদে পরিণত হয। সাম্রাজ্যের কিছু নীতি, যেমন ইংবেজী শিক্ষা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র, তালুককে প্রদেশেব সঙ্গে এবং প্রদেশকে দেশের সঙ্গে যুক্ত কবে। এবই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ স্থানীয় রাজনৈতিক গোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত হয প্রাদেশিক সমিতি, আবাব তাব থেকে জাতীয কংগ্রেস। ভাবতীয বাজনীতিব কোন নিজস্ব সাধারণ লক্ষ্য নেই, সামান্য পটভূমিকা নেই। শক্তিশালী ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র কবে তা ঘুবেছে। তাব বৃহত্তব বঙ্গমঞ্চে ঘটেছে স্থানীয় বাদবিসম্বাদেব পুনবভিনয। বাংলায় কৃষ্ণদাস পাল ও সুবেন ব্যানার্জীর দল, পঞ্জাবে মহাত্মা ও কলেজ দল, মহারাষ্ট্রে ডেকান সোসাইটি ও পুনা সার্বজনিক সভাব নেতৃত্ব নিয়ে গোখলে ও তিলকেব দল যে কলহে লিপ্ত হযেছিল তাই প্রসারিত হযেছে কংগ্রেসেব সভামণ্ডপে। ক্ষমতা বক্ষা ও ক্ষমতা দখলেব জন্য এক অঞ্চলেব গোষ্ঠী অন্য অঞ্চলেব সমধর্মী গোষ্ঠীব সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। শেষ অবধি কংগ্রেস একটা "নডবড়ে কোযালিশন" থেকে গেছে। বৃহত্তব জনগণেব সমর্থন লাভেব জন্য তাব হাতিয়াব ছিল বাক-চাতুর্য, বিপক্ষকে পবাভূত করাব জন্য সদসৎ কলাকৌশল। ক্ষুদ্র গোষ্ঠী, ক্ষুদ্র স্বার্থ, ক্ষুদ্র জযপবাজয, ক্রমাগত দলবদল ও নতুন চক্রগঠনেব ইতিহাসকে গৌববময সংগ্রাম বলা চলে না।

ব্রিটিশ শক্তিও ছিল আসলে দুর্বল। এত বড সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয অর্থবল, অস্ত্রবল, লোকবল, এমনকি শেষেব দিকে মনোবলও তাব ছিল না। যতদিন তাব শাসন ছিল পবোক্ষ, স্থানীয সহায় সম্পদ বণ্টনে তা প্রত্যক্ষ ভাবে হস্তক্ষেপ কবেনি, ততদিন সহযোগিতা পেয়েছে। যখনই কোন কাবণে—বাজস্ব বাড়াতে গিযে, যুদ্ধেব ব্যয মেটাতে বা প্রগতিব খাতিবে—তা স্থানীয অধিকাবে প্রত্যক্ষ ভাবে নাক গলিযেছে, তখনই জোবদাব প্রতিবোধেব সম্মুখীন হযেছে। প্রথম মহাযুদ্ধ ও শাসনসংস্কাব থেকে পতনেব শুরু, দ্বিতীয মহাযুদ্ধ ও ক্ষমতা হস্তান্তরে তাব শেষ। ভাবত জোড়া অসংখ্য দাবাব ছকে জয পবাজযেব ভাবসাম্য বাখতে না পেবে ইংবাজকে বিদায নিতে হয। নইলে, গ্যালাহাবেব ভাষায, পিকউইক ছাড়া সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীযতাবাদ এই দুই "খড়েব পুতুলেব লড়াই"কে কে প্রকৃত সংগ্রাম বলবে? জাতীযতাবাদ সম্বন্ধে তাঁব অবজ্ঞা সুপবিস্ফুট। এত বড় বৈপ্লবিক কার্যকলাপেব ইতিহাস বিস্মৃত হযে তিনি মন্তব্য কবেছেন, "We have no Dublin post offices in our story..."

অনিল শীল তাঁকে "the most English Irishman" আখ্যা দিয়েছেন।

নেমিয়ারের মত তিনিও ছিলেন অনিকেত—কি আপন দেশ আয়ার্ল্যান্ড কি পুনর্বাসনভূমি ইংল্যান্ড, কারও ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁর নাড়ীর যোগ ছিল না। কি করে জাতীয়তাবাদের প্রবল উন্মাদনা উপলব্ধি করতে পারবেন তিনি ? আধা ভারতীয় আধা ইংরেজ শীলের অবস্থা বেশি ভাল নয়। কোন কিছু বৃহৎ বা মহৎ মূল্যবোধকে এঁরা সন্দেহের চোখে দেখেছেন। মানব চরিত্র সম্বন্ধে এঁদের ধারণা ছিল হব্‌সের অনুরূপ—nasty, poor, brutish and short—জৈব, হীন, স্বল্পস্থায়ী। আদর্শবাদের মুখোশের তলায়, বৈপ্লবিক উগ্রতার আড়ালে চলে ব্যক্তি এবং দলের সমঝোতা ও আদানপ্রদানের ক্রূর খেলা। আদর্শবাদ সম্বন্ধে নেমিয়ার লিখেছেন—"Idealism and Idealist are misnomers...when bestowed merely because self-interest or ambition is not writ large on the surface." বারবার এ উক্তির প্রতিধ্বনি কেমব্রিজ গোষ্ঠীর ইতিহাসে শুনতে পাই। অনিল শীল বলছেন, "Ideology provides a good tool for fine carving, but it does not make big buildings."

কিন্তু সত্যই কি তাই ? মানুষের কাজ থেকে মানুষের চিন্তাকে, ধ্যানধারণাকে কি বিচ্ছিন্ন করা চলে ? ডারউইন যেমন বিবর্তনবাদ থেকে ঈশ্বরকে বাদ দিয়েছিলেন, নেমিয়ারের অনুসরণে গ্যালাহার-শীল সম্প্রদায়ও তেমনি ঐতিহাসিক প্রগতি থেকে মানুষের মহৎ স্বপ্নকে বাদ দিয়েছেন। নেমিয়ারের সমালোচনায় অধ্যাপক হারবার্ট বাটারফিল্ড বলেছিলেন, "human beings are careers of ideas as well as repositaries of vested interests..." সূক্ষ্ম ও জটিল পথে মানুষের স্বার্থবুদ্ধি বৃহত্তর শুভবুদ্ধির সঙ্গে জড়িয়ে যায়। যান্ত্রিক মার্কসবাদী ও নেমিয়ার-পন্থীদের একই সঙ্গে সমালোচনা করে ক্রিস্টোফার হিল বলেছিলেন, ইতিহাস তো শুধু ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতাহীনদের লড়াই নয়। দলীয় স্বার্থকে জনসাধারণের গ্রহণীয় করার জন্যই ইডিওলজি তৈরি হয় না। "I do not believe that material conflicts are the only ones deserving serious analysis." বস্তুর জন্য লড়াই ইতিহাসের অনন্য বিবেচ্য বিষয় হতে পারে না।

কেমব্রিজ গোষ্ঠীর কাছে ইডিওলজি ও আদর্শবাদ যেমন অবাস্তব তেমনি অবাস্তব দেশের জন্য আত্মবলিদান। গ্যালাহার, শীল, জনসন, জুডিথ ব্রাউন যখন দেশব্যাপী জরিমানা, পিটুনি কর, সম্পত্তি ক্রোক, নির্বিচার লাঠি ও গুলি চালনা, পুলিশ হাজতে অকথ্য অত্যাচার, নির্জন কারাবাস, ফাঁসির মঞ্চে জীবনদান সব ভুলে গিয়ে অসংখ্য জ্ঞাত ও ততোধিক অজ্ঞাত নরনারী বৃদ্ধবৃদ্ধার আত্মবলিদানকে অগ্রাহ্য করেন, তখন মনে হয় এ ধরনের বিশ্লেষণে কোথায় একটা মারাত্মক ভুল রয়েছে। নেতারা না হয় ভাবী মন্ত্রিত্ব বা ব্যবসার সুবিধা বা ভালো চাকুরির লোভে দুঃখ বরণ করেছেন, জনগণও কি তাই ? বারদোলি, মেদিনীপুরের কৃষক, বোম্বাই-এর শ্রমিক, অন্ধ্রের আদিবাসী, সীমান্ত প্রদেশের খুদাই খিদমদগার ? কোনও একটা মন্ত্রে (যতই অবাস্তব হোক) উদ্বুদ্ধ হয়ে, কোনও একটা স্বপ্নে (যতই অসম্ভব হোক) আবিষ্ট হয়ে, সাময়িক সুখ সুবিধার কথা তারা ভুলেছিল।

> বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
> এর যত মূল্য সে কি ধরার ধুলায় হবে হারা।

তাছাড়া নেতারা এলিট বলেই কি সর্বদা স্বার্থপর হবেন ? চাকুরিতে উন্নতি হল না বলে ব্যর্থতার ঝাল মেটাতে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন 'আনন্দমঠ' ? এটা কি তথ্য হিসাবেও নির্ভুল ?

তাছাড়া কিসের ঝাল মেটাতে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'রাজাপ্রজা'র অসামান্য প্রবন্ধাবলী ও পরে 'সভ্যতার সংকট'? শরৎচন্দ্র—'পথের দাবী'? ভদ্রলোকের কাছে চাকুরিই যদি একমাত্র মূল্যবোধ হয়ে থাকে তবে আই সি এস-এর লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে অরবিন্দ কেন অশ্বারোহণের পরীক্ষা দিলেন না বা সুভাষচন্দ্র কেন সব পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়েও পদত্যাগ করলেন? রূপকথার রাজপুত্রের মত ভাগ্যবান জওহরলালই বা কেন উত্তর প্রদেশের কৃষক পল্লীতে রাত্রি যাপন করলেন? আবার ক্ষুদিরামের মত স্বল্পবিত্ত কিশোর পরলেন ফাঁসির মালা? এঁরা না হয় উন্মাদ তরুণ, কিন্তু শান্তমস্তিষ্ক, প্রাজ্ঞ, প্রৌঢ় চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহরু, রাজেন্দ্র প্রসাদ, বল্লভভাই প্যাটেল বিপুল আয়ের নিশ্চিত আশ্রয় হেলায় ত্যাগ করলেন কিসের আশায়? মন্ত্রীদের প্রাপ্য বেতন (গগনেন্দ্রনাথের অনবদ্য কার্টুনের ভাষায়—চৌষট্ হাজার) তো এঁদের এক মাসের আয়। আসল কথা, বেতারযন্ত্রে যেমন সব তরঙ্গ ধরা পড়ে না, নেমিয়ার তথা গ্যালাহার-শীল পদ্ধতিতেও তেমনি জাতীয়তাবাদের তাৎপর্য ধরা পড়ে না।

এঁদের ইতিহাসে ব্রিটিশ নীতির কিছু দিক (প্রায় সবই ভালো) তুলে ধরা হয়েছে—যেমন পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রসার, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ইত্যাদি। এগুলি নাকি অচল ভারতীয় ইতিহাসে গতির সঞ্চার করেছিল। হয়তো ভারতের আভ্যন্তরীণ বাজারের সীমাবদ্ধতা মূলধন সঞ্চয় ও বিনিয়োগে বাধা দিয়েছিল, হয়তো তকুগাওয়া আমলের জাপানের মত আঠারো শতকের ভারতে উন্নত কৃষি, শান্তি ও শৃঙ্খলা ছিল না। তবু প্রাক-ব্রিটিশ ভারতের অনগ্রসরতা ও অনৈক্যের ওপর জোর দিতে গিয়ে এঁরা ঔপনিবেশিক অর্থনীতি ও সরকার প্রণোদিত বিভেদনীতির সর্বনাশা ভূমিকা সুকৌশলে এড়িয়ে গেছেন। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভারতবর্ষের উৎপাদন পদ্ধতিতে, তথা সমাজে, ভাঙচুরের মধ্য দিয়ে পরিবর্তন আনছে, মার্কস তা বুঝেছিলেন। যদিও রজনী পাম দত্ত বা মানবেন্দ্র রায়ের যান্ত্রিক মার্কসবাদ পুরো মানা যায় না এবং সোভিয়েট ভারতবিদ্ পাভ্লভ, কোমারভ, লেভ্কোভস্কি প্রভৃতির বিশ্লেষণে সরলীকরণের ঝোঁক দেখা যায়, তবু ঔপনিবেশিক শোষণের ব্যাপারটা তো দাদাভাই নৌরজি, মহাদেব গোবিন্দ রানাডে ও রমেশচন্দ্র দত্তের মত নরমপন্থীদের চোখও এড়িয়ে যায়নি। বিলাতী পণ্যের বাজার তৈরি করার জন্য গৃহীত অবাধ বাণিজ্যনীতি, স্বদেশী শিল্প-সংহার, সম্পদ নিষ্কাশন (drain), মাল বা সৈন্য চলাচলের জন্য ব্যয়বহুল রেলপথ, লগ্নীর বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্রিটিশ মূলধনের আধিপত্য, ঊর্ধ্বগামী রাজস্বের চাপে ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য ও আনুষঙ্গিক দুর্ভিক্ষ, জনসংখ্যার বাহুল্য, আংশিক শিল্পায়ন, কৃষিজমির দ্রুত হস্তান্তর, কৃৎ কৌশলের দৈন্য ও বিনিয়োগের স্বল্পতার ফলে উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস, জমিদার-জোতদার-ধনী কৃষকের শোষণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের ভ্রান্ত প্রয়োগে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি, ঔপনিবেশিক অর্থনীতির উক্ত কুফলগুলির ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া কি দেশের সর্বস্তরে অসন্তোষের আগুন জ্বালায়নি? তাই কি জাতীয়তাবাদের মূল প্রেরণা নয়?

শীল বা ব্রুমফিলড্ প্রধানত উচ্চবর্ণ, উচ্চশিক্ষিত, শহরবাসী মধ্যবিত্তকে ব্রিটিশের প্রতিপক্ষ খাড়া করেছেন। কিন্তু ব্রিটিশাধিকারের আদিপর্ব থেকে কোথাও রাজা-তালুকদার-পলিগারের মত অভিজাত, কোথাও পাইকচুয়াড়ের মত আশ্রিতবর্গ, কোথাও সাধারণ চাষী, কোথাও বা সাঁওতাল, কোল, মুণ্ডার মত আদিবাসী ইংরাজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে গেছে। ১৭৬৫ থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত ২৯টি বিদ্রোহের উল্লেখ করেছেন ক্যাথলিন গাফ। এই সব বিদ্রোহ ছিল মূলত কিষাণ আন্দোলনের অগ্রদূত। শিল্পবিকাশের বিকৃতি, নীচুহার ও যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে শ্রমিক আন্দোলন হয়তো তেমন জোরদার

হয়নি। তবু অল্পবিত্তর তারাও সাম্রাজ্যবিরোধী শিবিরে যোগ দিয়েছিল। আরউইন থেকে ওয়াভেল এ বিষয়ে সতর্ক ছিলেন।

নিম্নবর্গের সাম্প্রতিক ইতিহাসে নানা কথা স্পষ্ট হচ্ছে। রণজিৎ গুহ সম্পাদিত পাঁচ খণ্ডের Subaltern Studies-এ বলা হয়েছে যে এতদিন ধরে জাতীয় আন্দোলনের এলিট নেতৃত্বকে অযথা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। স্বকীয় বিদ্রোহী চেতনায় উদ্বুদ্ধ নিম্নবর্গের একটা সমান্তরাল ভূমিকা ছিল। তাদের ভিন্ন লক্ষ্য ছিল, নিজেদের নেতা ছিল, আন্দোলনের স্বতন্ত্র পদ্ধতি ছিল। অবশ্য গুহ ও তাঁর সহযোগীবৃন্দ জাতীয় স্তরের এলিট নেতা ও নিম্নবর্গকে একটু বেশি কৃত্রিম ভাবে পৃথক করে দেখেছেন। নানা ভাবে উভয়ের কর্মধারা ও রাজনৈতিক চৈতন্যের মধ্যে সেতু রচিত হচ্ছিল। মাঝে মাঝে সেতুবন্ধের প্রকৃতি পরিবর্তনের ফলে উভয়ের রাজনীতি নতুন রূপও নিচ্ছিল। কৃষক বিপ্লবে জাতের গুরুত্ব স্বয়ং নাম্বুদ্রিপাদ স্বীকার করেছেন। এক হিন্দুধর্ম যেমন উচ্চবর্গের ব্রাহ্মণকে ও নিম্নবর্গের দেবী আন্দোলনকারীদের বেঁধে রেখেছিল গুজরাটে, তেমনি এক ইসলাম বেঁধে রেখেছিল উচ্চবিত্ত মুসলিম জমিদার ও দরিদ্র মুসলিম তাঁতীকে মুবারকপুরে। দরিদ্র কৃষক ও আদিবাসীরা গান্ধীর বাণী স্বকীয় অভাব, অভিযোগ, কল্পনা ও স্বপ্নের আলোকে কি ভাবে ব্যাখ্যা করেছিল তা কয়েকটি প্রবন্ধে বিশদ করা হয়েছে। ফরাসী ঐতিহাসিকদের অনুসরণে সংঘ মানসিকতার (collective mentality) দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে আর কয়েকটি প্রবন্ধ। তবু সে মানসিকতার পরিবর্তন নির্দেশে Subaltern Studies যথেষ্ট নয়। তারা একটা ব্যাপার স্পষ্ট করেছেন—স্বাধীনতা সংগ্রাম রূপ নাটকে মধ্যবিত্তই একমাত্র নায়ক নয়।

কেমব্রিজ গোষ্ঠীর মতে ইংরেজ শাসন, বাণিজ্য ও শিক্ষা বিভিন্ন সময়ে ও পরিমাণে বিস্তৃত হওয়ায় জাতীয়তাবোধ বিকাশে একটা আঞ্চলিক বৈষম্য দেখা দিয়েছিল। ঔপনিবেশিক শোষণের ক্ষেত্রেও অনুরূপ পার্থক্য লক্ষণীয়। ব্রিটিশ ধনতন্ত্রের মুষ্টি বাংলাদেশে যেমন দৃঢ় ছিল, পশ্চিম ভারতে ততটা ছিল না। এ জন্যই আধুনিক শিল্প ও বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশ সম্ভব হয়েছে বোম্বাই-গুজরাট অঞ্চলে, আর বাংলার অর্থনীতি ভূমি ও বৃত্তিনির্ভর থেকে গেছে। তবে পশ্চিমাঞ্চলে ধনিক ও বণিক শ্রেণীর সঙ্গে শাসক শ্রেণীর সম্পর্ক সব সময় প্রতিকূল ছিল না। তার মধ্যে সহযোগিতা ও বিরোধিতার টানাপোড়েন দেখা যায়। লীটন ও এলগিনের আমলে আমদানী শুল্ক হ্রাস ও উৎপাদন শুল্ক বাড়ানো নিয়ে প্রবল প্রতিবাদ তারা জানিয়েছিল এবং তাতে কংগ্রেসের শক্তি বাড়ে। কিন্তু আমদানী বাণিজ্যের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত তারা স্বদেশী ও গান্ধীবাদী আন্দোলন কালে অল্পকালের মধ্যেই বয়কট ব্যাপারে অনীহা দেখাতে থাকে। অ্যানড্রুজ ও ঠাকুরদাসের কাগজপত্র তার প্রমাণ। এঁরা সকলেই আম্বালাল সারাভাই ও ঘনশ্যামদাস বিড়লার মত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন না। বিড়লাও কতটা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন বলা কঠিন। বড়ো ব্যবসায়ীর সহজাত সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা কে জিততে যাচ্ছে তা বুঝতে পেরেছিলেন তিনি।

কংগ্রেস বুর্জোয়া না মধ্যবিত্তদের প্রতিষ্ঠান এ নিয়ে বেশ কিছুদিন বিতর্ক চলেছিল। একদা বামপন্থীরা কংগ্রেসকে বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিভূ মনে করতেন। প্রথম যুগের কংগ্রেস সম্বন্ধে সেকথা বলা যায় না। সি এস বেইলির প্রতিবেদন (১৮ জুন ১৮৯৯)-এ দেখি কংগ্রেসের তহবিলে প্রথমদিকে যাঁরা মোটা অঙ্কের অর্থ সাহায্য করতেন তাঁরা বুর্জোয়া নন, মধ্যবিত্ত তো নয়ই, বরং দ্বারভাঙার মহারাজার মত বিরাট জমিদার বা ভিজিয়ানাগ্রাম, বরোদার মত দেশী রাজন্যবর্গ। স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম দু বছরের ব্যয়ভার বহন

করেছেন নাটোর, মৈমনসিং, গৌরীপুর, নাড়াজোল, ঢাকা ও উত্তরপাড়ার জমিদার। তিলকের রসদদার ছিলেন বড়ো বড়ো মারাঠা সর্দার ও জায়গীরদার যাদের অন্যতম- —নাটু ভ্রাতৃদ্বয়। লাজপৎ ও অজিৎ সিংকে সাহায্য করতেন পঞ্জাবের ভূস্বামী রামভুজ দত্ত চৌধুরী। মাদ্রাজে পাই রামনাদের রাজার নাম। কংগ্রেস যে প্রথমদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সমর্থন করত তার কারণ এখানেই। আবার অন্যদিকে দেখি উত্তরপ্রদেশের তালুকদার শ্রেণী সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তীকালে ব্রিটিশ রাজের পূর্ণ সহযোগিতা করছে। ১৮৯০ সালে ছোটলাট হারকোর্ট বাটলার বলেছিলেন "The Taluqdars are Oudh."

আবার যাদের আমরা মধ্যবিত্ত বৃত্তিজীবী বলছি, তাদের স্বরূপই বা কি? সক্ষ্মতর বিশ্লেষণ দ্বারা সি এ বেইলি The Local Roots of Indian Politics : Allahabad 1880-1920 গ্রন্থে দেখাচ্ছেন এলাহাবাদের ইংরাজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত উকিল ও অন্য বৃত্তিভোগী স্বদেশী নেতারা আসলে শেঠিয়া শ্রেণীর (ব্যাংকার, বণিক, জমিদার) অনুগৃহীত মুখপাত্র মাত্র। এখানে জাতপাত ভাষার ঐক্যের চেয়ে বড়ো পৃষ্ঠপোষক-অনুগৃহীতের সম্পর্ক। ডি এ ওয়াশব্রুক The Emergence of Provincial Politics The Madras Presidency, 1870-1920 গ্রন্থে দেখাচ্ছেন মাদ্রাজের উকিল শিবস্বামী আয়ার ছিলেন রামনাদরাজের মুখপাত্র। বোম্বাই এর রাজনীতিতে শেঠেদের প্রাধান্যের কথা তুলেছেন ক্রিস্টিন ডবিন। তবে এ সিদ্ধান্ত পুরো মানা যায় না। আইনজীবী হলেও ফিরোজ শা মেহতা কারও অনুগৃহীতের মত চলবেন একথা ভাবা দুষ্কর। ওয়াচা ও দাদাভাই নৌরজির পত্রসংকলনে তার প্রমাণ মিলবে। গোখলের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মেহতা, কোন শেঠিয়া নয়, এবং সে প্রভাব গোখলে কাটিয়ে ওঠেন। বাংলার রাজনীতির অন্যতম কর্ণধার আনন্দমোহন বসু ছিলেন একাধারে জমিদার, শিক্ষাব্রতী ও ব্যারিস্টার, অন্য কর্ণধার সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন শিক্ষাব্রতী ও সম্পাদক। সুরেন্দ্রনাথ মহারানী স্বর্ণময়ীর কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন, কিন্তু কোনদিন তার মুখপাত্ররূপে চলেননি। অর্থাৎ যদিও জমিদার, বণিক, মধ্যবিত্ত সকলে মিলে কংগ্রেস সৃষ্টিতে হাত লাগিয়েছিল, গান্ধী যুগের আগে বণিকদের দান নগণ্য বললেও চলে। সেই প্রথম তাঁরা তিলক স্বরাজ ফাণ্ডে এক কোটির প্রায় অর্ধেক তুলে দেন।

১৮৫৮ সালে ব্রিটিশ সরকারের সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ শুধু বিদ্রোহ দমনে কোম্পানীর ব্যর্থতার জন্যই নয়, তা বহুদিনের অনুসৃত নীতির পরিণাম। তার চেয়েও বড়ো পরিবর্তন এল অর্থনীতির ক্ষেত্রে। তাও ঠিক ১৮৫৮ সাল থেকে শুরু হয়নি। ১৮১৩ ও ১৮৩৩ সালের মধ্যে কোম্পানীর ভারত ও চীন বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার বিলুপ্ত হয় এবং অবাধ বাণিজ্য নীতি প্রবর্তিত হয়। সিপাহী বিদ্রোহের ব্যয় মেটাতে বিলাতী দ্রব্যের ওপর আমদানী শুল্ক অল্প বাড়ালেও ল্যাঙ্কাশায়ারের চাপের কাছে ভারত সরকারকে নতি স্বীকার করতে হয়। দ্বিতীয় পরিবর্তন আসে রেলপথ এবং চা, পাট, কয়লা প্রভৃতি শিল্পে উদ্বৃত্ত ব্রিটিশ মূলধন নিয়োগে। প্রথমটার ফল প্রাচীন বস্ত্র শিল্পের দ্রুত অবনতি ও কাটুনি-তাঁতী সম্প্রদায়ের জীবিকা-সঙ্কট। মরিস ডি মরিসের মতে ক্ষতির পরিমাণ অযথা বাড়ানো হয়েছে, বিলাতী কাপড় শুধু বর্ধিত চাহিদা মিটিয়েছে। উত্তরে জাপানী পণ্ডিত তক মাচি বলছেন, সস্তায় বিলাতী সুতো পেলেও যান্ত্রিক তাঁত ও অন্যান্য সুবিধার অভাবে দেশী তাঁতীর লাভ হয়নি। এ ছিল এক অসম যুদ্ধ। অমিয় বাগচী বিহারের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন শিল্পনির্ভর পরিবারের সংখ্যা দিন দিন কমছে। অন্যদিকে কৃষ্ণমূর্তি দেখাচ্ছেন তাঁতীরা ব্যাপকভাবে কৃষিজীবিকা গ্রহণ করেছিল এমন প্রমাণ নেই। দ্বিতীয় পরিবর্তনের

ফলে দেশী উদ্যোগ শুধু বস্ত্র শিল্পে সীমাবদ্ধ হয়। চা, পাট, কয়লা ছিল পুরো ইংবেজদেব হাতে।

এসব বিতর্কিত বিষয ছাড়া অন্য ফলগুলিব কথা ভাবা যাক। ১৮১৩ সালেব আগে কোম্পানীর লভ্যাংশ, কর্মচাবীদেব সঞ্চয, ব্যক্তিগত বাণিজ্যের মুনাফা ইওবোপ পাঠানো হত ভারতীয পণ্যের মাধ্যমে। তাব মধ্যে মুখ্য ছিল নানা ধরনের সূতী বস্ত্র, রেশম ও বেশমী কাপড় এবং নীল। শিল্প বিপ্লবেব ফলে ভাবতীয বস্ত্র বিদেশেব বাজারে মাব খেল, সংবক্ষণেব অভাবে দেশেব বাজাবে। নীলেব দাম বড়ো বেশি ওঠানামা কবত। ১৮২৫ থেকে ১৮৪৭ যে তিনটি বাণিজ্য সঙ্কট দেখা দেয় তাব কাবণ নীলে ফাটকা। চীনেব মাধ্যমে যে পবোক্ষ রপ্তানী হত তার মধ্যে আফিম প্রধান হয়ে ওঠে, কিন্তু চীন সবকাবেব বাধা লঙ্ঘন কবতে গিয়ে দু দুটো যুদ্ধ ঘটে। ১৮৩৩ সালেব পর এক বপ্তানী সঙ্কট দেখা দেয। আমদানী বাণিজ্যেব দ্রুত বৃদ্ধি (প্রায দশ গুণ) এতে ইন্ধন জোগায। ভাবতকে নতুন নতুন বপ্তানীব কথা ভাবতে হয—যেমন চা, পাট, পাটজাত শিল্প, চিনি, চামডা, এমন কি খাদ্যশস্য। ভাবতকে শুধু আমদানীব বদলা দিলেই চলত না, অন্যান্য দেশেব সঙ্গে বাণিজ্যে ব্রিটেনের যে ঘাটতি দেখা দিত তাও পূবণ কবতে হত। তাব ওপব ছিল Home charges—যা একদিক দিয়ে পবাধীনতাব মূল্য শোধেব মত।

এই বিপুল বহির্বাণিজ্য ও শিল্পেব কর্তৃত্ব প্রথম থেকেই ছিল প্রবাসী ইংবাজ ও স্কটদেব হাতে।

সারণী—১

সাল	জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর সংখ্যা	সংগৃহীত পুঁজি (কোটি টাকা)
১৮৮০-৮১	৪৭৫	১৪·৯
১৮৮৯-১৯০০	১৩৪০	৩৫ ৪
১৯১৩-১৪	২৭৪৪	৭৬·৬

১৯১১ সালে সাহেবদেব হাতে ৬৫২টা চা-বাগান (মাত্র ৩০টা ভাবতীয), ৪৮টা চটকল ও ৫৩টা কয়লা কোম্পানীব কর্তৃত্ব ছিল। তাদেব মূলধন জোগাতে যে ব্যাঙ্ক ও নিবাপত্তার জন্য যে বীমা ব্যবস্থা গঠিত হল,[১] যে বেলপথ ও বাষ্পীয জাহাজের প্রযোজন হল তাও গেল সাহেবদের হাতে। বেলপথের লভ্যাংশ শোধের দায় পডল ভারত সবকারেব কাঁধে। অথচ রেল, ইঞ্জিন, কামবা সবই আসত বিলেত থেকে। অর্থাৎ কিনডলবার্জার রপ্তানীউদ্বৃত্ত অর্থনৈতিক প্রগতিকে যে সব শর্তে সাহায্য কবতে পারে দেখিয়েছেন, তার কোনটাই পূর্ণ হল না।

দ্বিতীয়ত সিপাহী বিদ্রোহ দমন করতে ভাবত সবকাব প্রায় দেউলিয়া হতে বসেছিল। ১৮৫৬ সালে সৈন্যবাহিনীর খরচ ছিল ১ কোটি ১৫ লক্ষ পাউণ্ড। ১৮৫৯ সালে তা বেড়ে হল ২ কোটি ৯৯ লক্ষ পাউণ্ড। এ বিপুল ব্যয়ভার মেটাতে সরকারকে বিলেত থেকে প্রভূত ঋণ নিতে হল যার বার্ষিক সুদেব পবিমাণই ২০ লক্ষ পাউণ্ড। একই কারণে এল বহু শ্বেতাঙ্গ সৈন্য। তাদের মাইনে, ভাতা, পেনশন সব কিছুর ব্যবস্থা করতে হল। বিদ্রোহের পব মধ্যে মধ্যে সে বাহিনীকে সাম্রাজ্য রক্ষাব তাগিদে পাঠানো হত সুদূর প্রাচ্য থেকে ভূমধ্যসাগর। তার ব্যয় নগণ্য ছিল না। প্রশাসন ব্যবস্থাও যথেষ্ট সম্প্রসারিত হয়েছিল। কিন্তু বিদেশী কর্মচারীর সংখ্যা না বাড়িয়ে দেশী কর্মচারীর নিয়োগ করাব কথা বিদ্রোহেব পরিপ্রেক্ষিতে

অভাবনীয় ছিল। নৈবেদ্যের ওপব চূড়াব মত বিবাজ কবত ইণ্ডিয়া অফিসেব ব্যযভাব। বাণিজ্য সম্পর্ক বহিত এসব ব্যযেব নাম দেওযা হযেছে Home charges. এ বাবদ প্রতি বছব যে ভাবতীয সম্পদ বপ্তানীব মাধ্যমে বিলেত যেত তাব কোন প্রতিদান মিলত না বলে ভাবতীয অর্থনীতিবিদরা এব নাম দিযেছেন সম্পদ-নিষ্কাশন বা drain of wealth. ১৮৯৭-৯৮ সালে এব পবিমাণ ছিল ২৫ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। এব যথার্থ হিসেব বাব কবা দুষ্কব। কিন্তু হ্যাবি জনসন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে হ্যাবড-ডোমাব পদ্ধতি প্রযোগ কবে দেখিয়েছেন দীর্ঘদিন এ বকম চললে অর্থনৈতিক অগ্রগতি ব্যাহত হয। নানা ব্যয মেটাতে ভাবত সবকারকে ভূমিরাজস্ব বাড়াতে হল , আযকব, লাইসেন্স-কব প্রবর্তন কবতে হল , এমন কি ম্যাঞ্চেস্টাবেব আপত্তি সত্ত্বেও আমদানী শুল্ক ফেব বসাতে হল , ডালহৌসিব আমল থেকে কিছু উন্নয়নেব কাজ (খাল, রাস্তা, প্রাথমিক শিক্ষা) হাতে নিযেই তাব জন্য বসাতে হল ক্যানাল কর, রোড ও শিক্ষা সেস। ১৮৭৩-এর পব টাকাব বিনিময মূল্য দ্রুত কমতে থাকে এবং ১৮৯৪ পর্যন্ত সঙ্কট চলে। সেজন্য বাজেটে অতিবিক্ত ব্যয়ববাদ্দ প্রয়োজন হল। তাই এলগিনেব আমলে আমদানী শুল্ক পুনবায বসানো হল কিন্তু ম্যাঞ্চেস্টাবের আপত্তি এড়াতে ভাবতীয উৎপাদনেব ওপব বসানো হল সমহারে শুল্ক। তাতে ভাবতীয শিল্পপতিদের মনে দেখা দিল বিরূপ প্রতিক্রিযা এবং জাতীযতাবাদ পেল তাদের সমর্থন।

উনিশ শতকেব শেষার্ধে কবনীতি প্রায সকল শ্রেণীকে অসন্তুষ্ট করেছিল। তাব মধ্যে সবচেযে সোচ্চাব ছিল পশ্চিম ভাবতেব সদ্যসৃষ্ট শিল্পপতিবৃন্দ ও আযকব-বিরোধী মধ্যবিত্ত। ১৮২৫, ১৮৩০-৩৩ ও ১৮৪৭-৪৮ সালেব বাণিজ্য সঙ্কটে বাংলাব বণিকবা মাব খেযে পিছু হটে যায কিন্তু পশ্চিম ভাবতেব পার্শী বণিকবা চীনেব সঙ্গে ও গুজবাটী বণিকবা পশ্চিম এশিযাব সঙ্গে বাণিজ্য চালাতে থাকে। ১৭৩৬ থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত বোম্বাই বন্দরে ২৬৭টি জাহাজ তৈবি হয। প্রথমদিকে ব্রিটিশ বণিকদেব সহযোগী হলেও আমেবিকার গৃহযুদ্ধ-প্রসূত কাঁচা তুলার বিবাট চাহিদাব কৃপায তাদেব প্রচুব লাভ হয এবং তাবাই বোম্বাই ও আমেদাবাদে প্রথম যান্ত্রিক বস্ত্র শিল্পেব পত্তন কবে। ১৮৬৫ সালেব মধ্যে বোম্বাইতে কারখানাব সংখ্যা দাঁড়ায দশে (যদিও অধিকাংশই সুতোব কল ছিল)। এসব কলে এত মোটা সুতো তৈবি হত যে ভাবতীয বাজাবে বিলাতী সুতো বা কাপড়েব সঙ্গে পাল্লা দেওযাব কথাই উঠে না। তাদেব আসল বাজাব ছিল দূব প্রাচ্য ও পূর্ব এশিযাব দ্বীপপুঞ্জ। ম্যাঞ্চেস্টারেব প্রথম আপত্তি ওঠে ১৮৭৪ সালে। কিন্তু বাজস্ব বাঁচাতে নর্থব্রুক সুতোব ওপব ৩½% ও কাপড়েব ওপর ৫% আমদানী শুল্ক বজায বাখেন। এ নিয়ে ভারতসচিবের সঙ্গে বিবোধেব ফলে তিনি পদত্যাগ কবেন। পার্লামেন্টে বক্ষণশীল দলেব নির্বাচন সম্ভাবনা (১৮৭৯) ব্যাহত হচ্ছে এই অজুহাতে ভাবতসচিব চাপ দিলে লীটন ৩০ সুতোব কমে তৈবি বিলাতী কাপড়েব ওপব শুল্ক প্রত্যাহাব কবেন। ১৮৯৪ সালে ভাবত সবকাব বিলাতী কাপড ও সুতোব ওপব ৫% শুল্ক বসায. কিন্তু সেই সঙ্গে. ভাবতসচিবেব নির্দেশে. বিশ ও তদূর্ধ্ব সুতোব ওপব ৫% উৎপাদন শুল্কও। অর্থসচিবেব আপত্তি অগ্রাহ্য হয। ১৮৯৬ সালে আমদানী ও দেশী সুতোব ওপব কর বিলোপ কবা হয বটে কিন্তু বিদেশী বস্ত্রেব ওপব ৩½% আমদানী শুল্ক এবং দেশী বস্ত্রেব ওপব একই হাবে উৎপাদন শুল্ক বসান হয়।[২] যেখানে ভাবতীয মিল মালিকবা শিশু বস্ত্রশিল্পেব সংবক্ষণ চাইছিল সেখানে তাবাই হল ল্যাঙ্কাশাযাবের লোভের শিকাব। ফলে তাবা কংগ্রেসেব প্রতি ঝুঁকল। বযকটেব কথা আগেই উঠেছিল, এখন তিলকেব নেতৃত্বে শুধু বযকটই হল না, বিলাতী বস্ত্রেব বহ্ন্যুৎসবও

হয়ে গেল।

কেবল মিল মালিকরাই নয়, কোনও কোনও ক্ষেত্রে জমির মালিকরা এবং সর্বত্র কৃষকরা অসন্তুষ্ট হচ্ছিল। রাজস্বের হার বাড়ানো হচ্ছিল, তা আগেই বলেছি। হোলট মেকেঞ্জি, বার্ড ও টোমাসন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে এবং গাবিনস্ অযোধ্যায় রাজস্ব বন্দোবস্তকালে রিকার্ডোর তত্ত্ব প্রয়োগ করেছিলেন। নানা পরীক্ষার পর 'সাহারানপুর নীতি' দ্বারা স্থির হয় যে নীট খাজনার অর্ধাংশ রাজস্বস্বরূপে ধার্য হবে। নীট খাজনার অর্থ হল কৃষিজ দ্রব্যের মূল্য থেকে কৃষকের শ্রমের মূল্য ও উৎপাদনের খরচ বাদ দিয়ে যা বাকী থাকে। বলা বাহুল্য এ হার বড় বেশি এবং অযোধ্যার বন্দোবস্তের সঙ্গে গণ-অভ্যুত্থানের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল। বোম্বাই অঞ্চলে প্রিঙ্গল, গোল্ডস্মিড ও উইনগেট রিকার্ডোর তত্ত্ব প্রয়োগ করেছিলেন। ১৮৭২ সালে যখন উইনগেটের বন্দোবস্ত সমাপ্ত হল তখন রাজস্বের হার ৩২ শতক বেড়ে গেছে।[৩৩] ফ্রিকেনবার্গ স্বীকার করেছেন যে মাদ্রাজের রায়তওয়ারী বন্দোবস্তের মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রত্যেক রায়তের সঙ্গে আলাদা চুক্তিদ্বারা রাজস্ব বৃদ্ধি করা।[৩৪] অবশ্য মাদ্রাজ অঞ্চলে বাংলার মত এমন বড়ো জমিদারও ছিল না যাদের সঙ্গে মানরো বন্দোবস্ত করতে পারতেন। প্রথম থেকেই খাজনার হার ছিল চড়া। ১৮২২ সালে সেচবিহীন ও সেচসেবিত এলাকায় খাজনার হার যথাক্রমে মোট উৎপাদনের ⅓ ও ½ করা হয় বটে, তবে দীর্ঘদিন ধরে মন্দামান্দা চলায় রায়তদের ওপর করভার বাড়ে। এছাড়া ছিল রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীদের ব্যক্তিগত মর্জি। কোন কোন জেলা (কোয়েমবাটুর ও থাঞ্জাভুর) ছিল ভাগ্যবান আবার কোন জেলা (কুরনুল) দুর্ভাগা। রমেশচন্দ্র দত্তের রায়তওয়ারী বিরোধী মত অনেকাংশে খণ্ডন করলেও ধর্মাকুমার স্বীকার করেছেন যে দরিদ্র চাষীদের অবস্থা খারাপ হয়েছিল। তাছাড়া ব্যাপক হারে লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত শুরু হলে মিরাসদার সম্প্রদায়ও ক্ষুব্ধ হয়। রাজস্ব নীতি কোন কোন স্থানে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বীজ বপন করে। মালাবার ও কোচিনে ব্রাহ্মণ ও নায়ার জেনমিদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করার ফলে মুসলিম কানমদাররা ক্ষুণ্ণ হয়।

মাদ্রাজে মানরো, উত্তর প্রদেশে বার্ড ও পশ্চিম ভারতে উইনগেট আদর্শগত ভাবে জমিদারি প্রথার বিরোধী ছিলেন। পুরনো আমলের মালিকরা এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কৃষিবাণিজ্যিকরণের ফলে ও জমির বাজার তৈরি হওয়ায় জমির হস্তান্তর দ্রুত হয়। ঋণগ্রস্ত কৃষককুল বহু জায়গায় মহাজনের কাছে জমি বন্ধক রাখতে বাধ্য হয় ও শেষে বন্ধকী জমি হারিয়ে খাজনায় বা ভাগে জমি নেয়। আমেরিকার গৃহযুদ্ধ শেষে পশ্চিম ভারতে তুলোর কারবার প্রচণ্ড মার খায়। তার ফলে তুলাচাষীরা ('কুনবি') মহাজন ('বনি')-এর দ্বারস্থ হতে বাধ্য হয়। জমির দাম বাড়ায় মহাজন মামলা করে জমির দখল নিতে থাকলে বহিরাগত 'বনি'দের ওপর স্থানীয় কৃষকরা খেপে যায়। ১৮৭৫ সালে দাক্ষিণাত্যে যে বড়ো কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয় অবস্থাপন্ন কুনবিরা তার নেতৃত্ব দিয়েছিল। কৃষক অসন্তোষের সুযোগ নিয়ে বলবন্ত ফাড়কে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।

স্টোকস, কেসিংগার প্রমুখ ঐতিহাসিক জমির মালিকানার ব্যাপক পরিবর্তনের কথা অস্বীকার করেছেন। স্টোকসের মতে ১৮৬০ থেকে ১৯০০ সাল ছিল ধনী কৃষকের স্বর্ণযুগ। ওয়াশব্রুক, নীল চার্লসওয়ার্থ ও পি জে মাসগ্রেভ বলছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধনী কৃষকরাই ছিল মহাজন, কোন বাইরের লোক নয়। শস্যের বাজার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তারা শক্তি ও সম্পদ বাড়াচ্ছিল। জর্জ ব্লিনের হিসেব (এগ্রিকালচারাল ট্রেণ্ডস ইন ইণ্ডিয়া, ১৮৯১-১৯৪৬) মতে ১৯০১-১৯৩৭ সালের খাদ্যশস্য উৎপাদক জমির এলাকা বেড়েছে মাত্র ১৬% আর নগদ টাকায় বিক্রেয় শস্য উৎপাদক জমির এলাকা বেড়েছে অনেক

বেশি হারে যেমন আখে—৬৯%, তুলায়—৫৯%, তৈলবীজে—৩৬%, পাট চাষে—১৪% (পাট শুধু পূর্ববঙ্গে সীমাবদ্ধ বলে)। এর অর্থ—ভাল জমি, সার, সেচ নগদ টাকায় বিক্রেয় শস্যেই বেশি নিযুক্ত হচ্ছে। উত্তর প্রদেশে কৃষি বাণিজীকরণ প্রক্রিয়ায় দুটি পর্যায় ছিল। মাজের্দ সিদ্দিকি জোর দিয়েছেন খাদ্যশস্যের পণ্যীকরণের ওপর, শহীদ আমিন আখ চাষে পুঁজির আধিপত্যের ওপর। মহারাষ্ট্রে লম্বা আঁশের তুলো বুনতে বেশি ঋণ দরকার। আবাদী ঋণ ছাড়াও দরকার পেটখরচ চালাবার ঋণ। তা গোনা হত ২০০-৩০০% হারের সুদে। বোম্বাই-এর বাজারে বিক্রীর জন্য চাই মধ্যস্থ। চাষীর টিকি বাধা পড়ল মহাজন ও ব্যাপারীর হাতে। বর্ধিষ্ণু ও গরীব চাষীর পার্থক্য বাড়ে।

দাক্ষিণাত্যের বিদ্রোহের প্রায় সমসাময়িক ছিল পাবনার কৃষক বিদ্রোহ। এর আগে নীল বিদ্রোহ (১৮৫৯-১৮৬০)-এর কালে লক্ষ্য ছিল অত্যাচারী নীলকর ও তাদের সমর্থক রাজকর্মচারী। এখন লক্ষ্য হল দেশী জমিদার। যাটের দশকে জমিদাররা বার বার আবওয়াব বাড়াতে থাকায় জোতদার ও ধনী কৃষকদের নেতৃত্বে মাঝারি ও গরীব চাষীরা সংঘবদ্ধ হয়। পাবনা থেকে উত্তর ও পূর্ববঙ্গের অনেক স্থানে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। জমিদারদের প্রতিষ্ঠান ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন এর বিরোধিতা করলেও মধ্যবিত্তদের প্রতিষ্ঠান ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ধনী কৃষকদের পক্ষ নেয়।[৩৭] এখন থেকে ১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন বিধিবদ্ধ হওয়া পর্যন্ত প্রজার স্বত্ব, খাজনার পরিমাণ, বৃদ্ধির নিয়ম নিয়ে নানা বাদানুবাদে রাজনৈতিক আসর সরগরম হয়ে ওঠে। বিংশ শতকের প্রথমে পঞ্জাবের রাওলপিণ্ডি প্রভৃতি অঞ্চলে খাজনা বাড়ে, বারি-দোয়াব খালের জলের ওপর কর বাড়ে, মহাজনরা ঋণী কৃষকদের জমি কিনতে থাকে, কলোনাইজেশন বিলের ফলে লয়ালপুর, শিয়ালকোট, ফিরোজপুর ও লাহোরে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। ছোটনাগপুর ও অন্ধ্রের আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে সমস্যাটা অন্য রূপ নেয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা তাদের ছিলই না, অথচ কৃষির বাণিজ্যায়ন যৌথ মালিকানার ঐতিহ্যকে বিপন্ন করেছিল। বহিরাগত ('দিকু' নামে পরিচিত) মহাজন, বানিয়া, নানা ধরনের ঠিকাদারদের লুব্ধ দৃষ্টি পড়েছিল কুমারী ভূমির ওপর। নানা আইনের মাধ্যমে সরকার অরণ্যের অধিকার হরণ করতে থাকে। বর্তমানের বেদনা আদিম কৌম জীবনের স্মৃতি ও ভবিষ্যতের স্বরাজ্যের স্বপ্নের সঙ্গে মিশে সাঁওতাল, মুণ্ডা, গোদাবরী অঞ্চলের রামপা প্রভৃতি আদিবাসীদের বিদ্রোহে প্রণোদিত করে।

কিন্তু ব্রিটিশ নীতি দেশী শিল্পপতি, কৃষক ও আদিবাসীদের যতই বিক্ষুব্ধ করুক, তাদের প্রতিবাদ কোন দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ নেয়নি। শিল্পপতিদের সহযোগিতার ঐতিহ্য প্রায় শেষ পর্যন্ত প্রবাহিত ছিল। কৃষক ও আদিবাসীরা মাঝে মাঝে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ফেটে পড়েছে বটে কিন্তু অন্তর্নিহিত শ্রেণী, জাতি বা উপজাতি বিভেদ, আঞ্চলিকতা অন্যান্য শ্রেণীর সহযোগিতার অভাব ইত্যাদি কারণে অল্পকালেই ব্রিটিশ শক্তির হাতে পরাভূত হয়েছে। রণজিৎ গুহ Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India-তে জোর দিয়ে বলছেন এদের রাজনৈতিক চেতনা ছিল এবং যোগ্য নেতৃত্বের অভাবও হয়নি। কিন্তু নানা ত্রুটি ও দুবলতার কথা তিনি স্বীকার করেছেন। সকল শ্রেণী নিয়ে, সমস্ত অঞ্চল জুড়ে, দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ গড়ার মানসিকতা, শিক্ষা, আর্থিক সামর্থ্য, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, নীতির নমনীয়তা—এদের ছিল না। এদের বাস্তববোধ তীব্র হলেও মাঝে মাঝে তা আচ্ছন্ন করেছে অবচেতনের স্তর থেকে উঠে আসা আদিম এক স্বর্ণযুগের স্মৃতি। যে সব গুণের কথা বললাম তা অল্পবিস্তর দেখা গেল মধ্যবিত্ত, ইংরেজীশিক্ষিত,

উচ্চবর্ণের সম্প্রদায়ের মধ্যে। পেছনে ছিল বহুদিনের ঐতিহাসিক প্রস্তুতি। এরা সব সময়ই ব্যক্তিগত, শ্রেণীগত বা আঞ্চলিক স্বার্থের শেকলে বাঁধা পড়েনি, মোটামুটি সব শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করেছে। এরা প্রথমপর্ব ছাড়া পশ্চিমী রাজনীতির নকলনবীশী করেনি। ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে এদের নিবিড় যোগ ছিল। কখনো যুক্তি, কখনো অতীতের ঐতিহ্য, কখনো ভবিষ্যতের স্বপ্ন, কখনো বা বণিকসুলভ লেনদেনের মনোভাব এবং পরমুহূর্তে আদর্শবাদী আত্মোৎসর্গ, কখনো হিংসা কখনো অহিংসা—যখন যে পদ্ধতি কাজে লাগে তা প্রয়োগ করার স্থিতিস্থাপকতা মধ্যবিত্তের মধ্যেই সর্বাধিক লক্ষণীয় ছিল বলে তারাই স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্রণীর ভূমিকা নেয়।

মুদ্রানির্ভর অর্থনীতির আবির্ভাব ও মধ্যবিত্তের উৎপত্তি নিয়ে নানা রসিকতা পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক মহলে চালু আছে। ভারতের ক্ষেত্রে বাঁকেবিহারী মিশ্রের বিশ্লেষণ মধ্যবিত্তদের একান্তভাবেই ব্রিটিশ রাজত্বের সঙ্গে যুক্ত করেছে।[১১] এ ধারণা পুরো সত্য নয়। সি এ বেইলি **Rulers, Townsmen and Bazzars** গ্রন্থে দেখিয়েছেন অষ্টাদশ শতকে মাঝারি ও ছোট শহরের জনসংখ্যা কমেনি বরং বেড়েছে এবং তাতে আমলাশ্রেণীর ভদ্রলোক ও একটা সংঘবদ্ধ বণিকগোষ্ঠী ঘাঁটি গেড়ে বসেছে।[১২] এরাই ব্রিটিশ বাণিজ্য ও শাসনজাল বিস্তারের সুযোগ নেয়। এদের সঙ্গে ভূমির সম্পর্ক ছিল না মনে করা ভুল। কর্ণওয়ালিসের বন্দোবস্তের সুবিধা বণিক, মহাজন, সেনাবাহিনীর ঠিকাদার, লবণ আফিম রাজস্ব বোর্ডের কর্মচারী অনেকেই নিয়েছিল। একথা ঠিক যে পুরোনো জমিদারকুল নির্মূল হয়নি। সিরাজুল ইসলাম দেখিয়েছেন অন্য জমিদার এবং জমিদারের আমলারাও নীলাম ধরত। তবু ভূমিসম্পর্কহীন আমলারা যে জমিদারী নীলামের সুযোগ নেয়নি সেকথাও ঠিক নয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় প্রজার দেয় খাজনা প্রায় ঊর্ধ্বতম সীমায় নির্দিষ্ট হয়েছিল। তার চেয়ে বাড়ালে সে জমি ছেড়ে চলে যেত, কারণ জনসংখ্যার তুলনায় কৃষিজমির পরিমাণ তখনো ঢের বেশি। কিন্তু উনিশ শতকের প্রথম তিন দশকে অকৃষি-পতিত-জলা জমি ব্যাপক ভাবে কৃষিজমিতে রূপান্তরিত হয়। কৃষিপণ্যের মূল্যের ঊর্ধ্বগতি তার অন্যতম কারণ। পরে জনসংখ্যার চাপও কিছু সাহায্য করে। যাই হোক, প্রজাদের দেয় খাজনা ও জমিদারের দেয় রাজস্বের মধ্যে ফারাক ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং জমিতে অর্থ বিনিয়োগ লাভজনক হয়।[১৩] শহরের চাকুরে বা অন্য বৃত্তিজীবী বাঙালী নিলামে জমি কেনে বা পত্তনি প্রথায় জমি বন্দোবস্ত নেয়। ১৯১৮ সালে বাখরগঞ্জের জেলা গেজেটিয়ারে জ্যাক বলছেন মালিক ও আসল চাষীর মধ্যে অন্তত আট স্তর মধ্যস্বত্বাধিকারী রয়েছে।

১৮৫৯-এর বিখ্যাত 'খাজনা আইন' দখলদারী (occupancy) রায়তদের কিছু সুবিধা দিলেও খাজনার হার নির্ধারণের ব্যাপারটা গোলমেলে থেকে যায়। ১৮৬৫ সালে 'গ্রেট রেন্ট কেসের' ফুলবেঞ্চের সিদ্ধান্তের পরও মূল্য, উৎপাদনের পরিমাণ ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক পরিসংখ্যানের অভাবে কলেক্টারের রায়ই শেষ কথা হয়ে দাঁড়ায়। এটাতে জমিদারেরই সুবিধা হয়। দখলদারীস্বত্ব অর্জন বন্ধ করার জন্য জমিদার চাষীদের এক জমি থেকে আর এক জমিতে ক্রমাগত সরিয়ে দিত। এসব রায়তরা আবার ইচ্ছামত জমি হস্তান্তর করতেও পারত না। পাবনা কৃষক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রমেশচন্দ্র দত্ত **Peasantry in Bengal**-এ লেখেন যে ১৮৫৯ সালের আইন প্রজার দখলি স্বত্ব কায়েম করতে সক্ষম হয়নি। অন্য এক নিবন্ধে তিনি খাজনার চিরস্থায়িত্ব দাবি করেন। 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র এ মত সমর্থন করেছিলেন। ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের আগে প্রজার জোত বিক্রয় বা বন্ধক রাখা বা বন্দোবস্ত দেওয়ার ক্ষমতা এবং খাজনাবৃদ্ধি নিয়ে

জমিদাব পক্ষে সওয়াল চালায ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিযেশন এবং প্রজাপক্ষে দাবি' তোলে ইণ্ডিযান অ্যাসোসিযেশন। বাংলাব ছোটলাট ক্যাম্বেল প্রমুখ সবকারের উর্ধ্বতন কর্মচাবীবা জমিদারদেব খাজনাবৃদ্ধি, আবওযাব বৃদ্ধি প্রভৃতিব বিবোধিতা কবছিলেন। তাঁবা চাইছিলেন জোতদাবদেব (এবা অনেক সময মহাজন ও শস্য ব্যাপাবীও ছিল) বক্ষা কবতে পাবলে মূলধন গঠন ও উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হবে। যাই হোক, এসব আন্দোলনেব পশ্চাতে শহুবে বৃত্তিজীবী মধ্যবিত্তদেব হাত স্পষ্ট। তাবা সঞ্চিত অর্থ দিযে জোত কিনছিল এবং আপন সুবিধা বাড়াতে চেষ্টা কবছিল। বুর্ডিলন মন্তব্য কবেছেন যে উকিল, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, ডাক্তাব সবাই দখলদাবী জমি কিনছে। এদেব সুবিধাব জন্য ১৮৮৫ সালেব আইনে নানা পবিবর্তন আনা হয। স্থিব হয যে জমিদাব খাজনা বাড়াতে পাববে পুবনো খাজনাব ১২½% হাবে, কিন্তু পনেব বছবেব মধ্যে খাজনা আবাব বাড়ানো চলবে না। তবে মামলা কবে আদালতেব নির্দেশে খাজনা বাড়ানো চলতে পাবে। দখলি স্বত্ব সম্বন্ধে স্থিব হয যে কোন জমিদাবেব অধীন প্রজা বাবো বৎসবেব বেশি কোন জমি যদি চাষ কবে থাকে তবে তাকে দখলিদাব প্রজা বলে স্বীকাব কবতে হবে। অর্থাৎ এক জমি থেকে অন্য জমিতে সবিযে লাভ হবে না। এই আইনেব ফলে আইনদ্বাবা সংবক্ষিত স্বত্ব আব একটা বাডল মাত্র। বেশিব ভাগ চাষীই তাব আওতাব বাইবে থাকল।

তবে মধ্যবিত্ত মাত্রই ভূমিব সঙ্গে জড়িত ছিল না। সিপাহী বিদ্রোহেব পব তাবা চাকুবিব ক্ষেত্র বাড়াবাব দাবি তুলেছিল। বেন্টিঙ্কেব আমলে মুনসেফ ও পবে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটি কলেক্টাবেব চাকুবি দিযে হিন্দু কলেজেব বিদ্রোহী ছাত্রদেব বশে আনাব চেষ্টা হয। কিন্তু ১৮৫৩ সালে যখন প্রতিযোগিতামূলক সিভিল সার্ভিস পবীক্ষা চালু হল তখন বোর্ড অব কন্ট্রোলেব সভাপতি চার্লস উড তা ভাবতেব মাটিতে গ্রহণ কবতে অবাজি হলেন। তাঁব মতে ভাবতীয শিক্ষাব্যবস্থা আদৌ এব অনুকূলে নয। তাছাড়া এই চাকুবিব জন্য প্রযোজনীয সাধুতা ও চাবিত্রগুণ "কলকাতাব বুলিমুখস্থ কবা বাবুদেব" নেই।[১৪] সিপাহী বিদ্রোহেব সময যে শিক্ষিত বাঙালী প্রকাশ্যে ইংবাজেব জয চেযেছিল তাবা সবিস্ময়ে দেখল যে সে গুণ আছে অযোধ্যাব বিদ্রোহী তালুকদাবেব ' ভাবতে সিভিল সার্ভিস পবীক্ষা নেওযা তো হলই না উপবন্তু তাতে ঢোকাব উর্ধ্বতন বযঃসীমা ২২ থেকে ২১ ও পবে আবো কমিযে ১৯ বছব কবা হল। যে মুষ্টিমেয ধনী সন্তানেব বিলেত গিযে পবীক্ষায বসাব সঙ্গতি ছিল (যেমন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুব বা বমেশচন্দ্র দত্ত) তাবা অত অল্পবযসে বিলেতেব বিশ্ববিদ্যালয বা পাবলিক স্কুলেব ছাত্রদেব সঙ্গে পাববে কি কবে? শুধু ভাবতীযদেব জন্য লীটনেব আমলে স্ট্যাটুটাবী সিভিল সার্ভিস প্রবর্তিত হয। ১৮৮৭ সালে মোট ভাবতীয কভেনান্টেড সিভিলিযানেব সংখ্যা দাঁড়ায় বাবোতে, আব ১৮৮৬ পর্যন্ত স্ট্যাটুটাবী সিভিলিযানেব সংখ্যা ছিল ৪৮।[১৫]

এ তো গেল সবচেযে উঁচুপদেব চাকুবিব কথা। অন্যান্য কম বেতনেব পদেব ব্যাপাবেও অসন্তোষ ঘনীভূত হল। ১৮৫৭ সালে দেশে তিনটে বিশ্ববিদ্যালয স্থাপিত হওযায উচ্চ শিক্ষিতেব হাব দ্রুত বাড়ছিল। ১৮৬৪-৮৫-ব মধ্যে ব্রিটিশ ভাবতে এন্ট্রান্স পাশ কবেছিল ৪৮,২৫১, এফ-এ-১২,৫১৮, বি-এ-৫,১০৮, ও এম-এ-৭০৮। বলা বাহুল্য বাংলা এ বিষযে অগ্রণী ছিল। এখানে ১৮৮৭ সালে আর্টস কলেজেব সংখ্যা ছিল ১৬, ১৮৯১-তে তা দাঁড়ায ৩৪। ছাত্রসংখ্যা বাড়ে চাবগুণ। সব সেবা প্রেসিডেন্সী কলেজেব ছাত্রদেব মধ্যে উচ্চবিত্ত পবিবাব থেকে পাঁচ শতকেবও কম ছাত্র আসত, একথা স্বীকাব কবেছেন অধ্যক্ষ সাটক্লিফ। সবকাবী শিক্ষা অধিকর্তাব ১৮৮৩-৮৪ সালেব বার্ষিক প্রতিবেদনে দেখি ২০০

টাকা থেকে ৫০০০ টাকার বার্ষিক আয় সম্পন্ন পরিবার থেকে অধিকাংশ কলেজ (৭৮%) ও হাইস্কুলের (৬৭%) ছাত্র আসত।[২৬] উচ্চশিক্ষা ছাড়া মধ্যবিত্তের উপায় ছিল না। এক শিক্ষা অধিকর্তা বলেছেন, "They must either be educated or go to the wall."

বোম্বাইতে কলেজের সংখ্যা ৫ থেকে বেড়ে হয় ৯, ছাত্রসংখ্যা বাড়ে পাঁচ গুণ। মাদ্রাজের পরিসংখ্যান বলে কলেজের সংখ্যা ১১ থেকে ৩৫ এবং ছাত্রসংখ্যা প্রায় নয় গুণ বাড়ে। আর্টস কলেজের আধিপত্য প্রমাণ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা কত পিছিয়ে ছিল।

১৮৭০ সালে বিলেত থেকে নির্দেশ এল উচ্চশিক্ষা খাতে টাকা ব্যয় না করে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে করতে হবে। এর অবশ্যম্ভাবী ফল উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগের প্লাবন। ১৮৭০-৮৪ সালের মধ্যে বাংলায় কলেজগামী ছাত্রসংখ্যা তিন গুণ বাড়ে মুখ্যত ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও কম মাইনের কল্যাণে। ১৮৮৩-তে সব সরকারী স্কুল মিলিয়ে ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৭৫০ আর একমাত্র মেট্রোপলিট্যান ইনস্টিট্যুশনে ১০০০। পরে আনন্দমোহন বসু স্থাপিত সিটি স্কুল-কলেজ ও সুরেন্দ্রনাথের রিপন স্কুল-কলেজ এই ঐতিহ্য সম্প্রসারিত করে। বোম্বাইতে ডেকান এডুকেশান সোসাইটি একই কাজ করছিল। তাদের ফার্গুসন কলেজ (১৮৮৫) সরকারী এলফিনস্টোন কলেজের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়। মাদ্রাজের পচায়েপ্পা কলেজ (১৮৪২) বণিকদের অবদান।

ইংরাজী পড়ুয়াদের সংখ্যা বাড়ল কিন্তু কোথায় এত চাকরি? ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে বা সুদূর দক্ষিণে বাণিজ্য, শিল্প ও দেশীয় রাজন্যবর্গের দরবারে জীবিকা কিছু কিছু মিলত কিন্তু পূর্বাঞ্চলে তার সম্ভাবনা ছিল না। সিভিল সার্ভিসের কথা আগেই বলেছি। সরকারী নীতির জন্য ডেপুটির পক্ষে শাসন বিভাগের ওপরে ওঠা দুরূহ ছিল। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রকে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারীর পদে পাকা করা হয়নি। ডাক, তার, রেল, লবণ, আফিম প্রভৃতি বিভাগের তখনো ইংরেজ ওপরওয়ালা এবং মধ্যস্তরে ইঙ্গ-ভারতীয়ের আধিপত্য। ১৮৬৭ সালে ৭৫ টাকা বা তদূর্ধ্ব মাস মাইনের চাকুরির সংখ্যা ছিল ১৩,৪৩১ যার অর্ধেকের বেশি ছিল এদেরই হাতে। ১৮৬৭ থেকে ১৮৮৭ চাকুরির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২১,৪৬৬। এর মধ্যে হিন্দুদের ভাগ ৩৮% থেকে বেড়ে হয় ৪৫%, মুসলমানদের ভাগ ৭%। অথচ তখনো বড় চাকুরিতে ইংরেজদের ভাগ—২৯% ও ইঙ্গ ভারতীয়ের ১৯%।

বেসরকারী শিক্ষা প্রসারের ফলে অনেকেই শিক্ষকবৃত্তি অবলম্বন করে। তেমনি সংবাদপত্রের প্রসার সাংবাদিকতাকে আকর্ষণীয় করল। সে যুগের বহু সাংবাদিক জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন বা প্রেরণা দেন। নীলকর অত্যাচারের বিরুদ্ধে 'হিন্দু পেট্রিয়ট', দাক্ষিণাত্যের রাজস্ব বৃদ্ধির প্রতিবাদে 'মারাঠা' ও 'কেশরী', সিভিল সার্ভিস, স্বায়ত্তশাসন ও প্রজাস্বত্ব আইনের ব্যাপারে 'সোমপ্রকাশ' ও 'বেঙ্গলী', স্বদেশী আন্দোলনের সময় 'বন্দেমাতরম্', 'সন্ধ্যা' ও 'যুগান্তর' এক গৌরবময় আদর্শ স্থাপন করে। সাংবাদিক ভারতেন্দু হরিশচন্দ্র হিন্দী সাহিত্যের অন্যতম জনক ছিলেন।

কিন্তু সবচেয়ে বেশি সংখ্যক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত আইন ব্যবসায়ের দিকে আকৃষ্ট হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮৭৪-৭৮-এর ডাক্তারী ছাত্রের সংখ্যা ছিল ৪২৬, ১৮৮৪-৮৮-তে কমে দাঁড়ায় ১৬৩-তে। ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ৩৪ দাঁড়ায় ২১-এ। অথচ আইনের ছাত্রসংখ্যা ৩১৩ থেকে বেড়ে হয় ৫৮৭। হিন্দু পেট্রিয়টের ১৮৮২-র ২৩ অক্টোবর সংখ্যায় দেখা যাচ্ছে ১৮৫৮-৮১-র মধ্যে পাশ করা ১৭১২ স্নাতকদের মধ্যে ৪৬৬ জন আইন ব্যবসায় নিয়েছে। বোম্বাই ও মাদ্রাজে অবস্থা এতটা সঙিন হয়নি।

সরকার পক্ষে শিক্ষিতের হারের সঙ্গে পাল্লা দেবার ইচ্ছা ছিল না। বরং দেখি জাতি ও

সম্প্রদায়ভিত্তিক বৈষম্যনীতি চালু হচ্ছে। বাঙালী বাবু, চিৎপাবন ও তামিল ব্রাহ্মণ, পঞ্জাবী ক্ষত্রী ও অরোরা ক্রমশই কর্তাদের বিষনজরে পড়ছে। মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদ এতে উসকানি দেয়। হাণ্টার কমিশনের সামনে স্যার সৈয়দ আহমেদ যে প্রতিবেদন দেন তাতে মুসলিম চাকুরিপ্রার্থীর সমস্যাই প্রাধান্য পেয়েছিল। উত্তর প্রদেশে আবার তিনকোনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয় কায়স্থ, বাঙালী ও মুসলমানদের মধ্যে। তামিল অব্রাহ্মণ ও মারাঠীরা (জটিরাও ফুলের প্রেরণায়) মাথা চাড়া দিতে থাকে। ব্যাপক শিল্পায়ন ঘটলে এদের অনেককেই সুযোগ দেওয়া যেত কিন্তু ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে তা সম্ভব হয়নি। শিল্পায়ন ছিল আংশিক ও ছোট ছোট গণ্ডীতে (enclave)এ সীমাবদ্ধ। বাংলার শিল্প ও বাণিজ্য ছিল ইংরাজ ও স্কটদের হস্তামলক, সেখানে বাঙালীদের উচ্চাশা মাঝারি স্তরের কেরানীগিরির ওপরে উঠতে পারত না। তেমনি বোম্বাইতে পার্শী, গুজরাটী ও মুসলিম ব্যূহ ভেদ করা পুণার ব্রাহ্মণ বা মারাঠীদের পক্ষে অসম্ভব ছিল।

সংক্ষেপে বলা যায়, মধ্যবিত্তদের প্রথম দাবি হয় অধিক সংখ্যক চাকরি, দ্বিতীয় বাণিজ্যে সংরক্ষণ নীতি ও স্বদেশী শিল্প বিস্তার, তৃতীয়, সর্বস্তরে ব্যয়বৃদ্ধি ও করবৃদ্ধির প্রতিবাদ, চতুর্থ, ভূমি রাজস্বের ও খাজনার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। এগুলি অভিজাত থেকে কৃষক কোনো ভাবতীয়ের কথাই বাদ দেয়নি। শেষ পর্যন্ত দাবি আদায় করতে তারা সক্রিয় কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক পথ নেয়। প্রথমে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, পরে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় বিধানসভার অধিকতর সভাপদ এবং শেষে শাসনযন্ত্রে অধিকতর কর্তৃত্ব লাভ রাজনৈতিক আন্দোলনের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। স্বাভাবিক কারণেই অগ্রণী ভূমিকা নেয় তিন প্রেসিডেন্সীর তিন রাজধানী—কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ। ব্যতিক্রম দেখি বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে, সেখানে পুণায় এক সমান্তরাল আন্দোলন লক্ষ্য করি। মনে রাখতে হবে পুণা ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শেষ প্রতিদ্বন্দ্বী মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র।

॥ ২ ॥

প্রেসিডেন্সী শহর ত্রয়ীর প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির সামাজিক পটভূমিকা নিয়ে অনেক আলোচনা চলছে।[১৭] মিলটন সিংগারের ভাষায় কলকাতা পাটলীপুত্র বা উজ্জয়িনী বা কাঞ্চীর মত মূল সম্ভূত নয়, অপর সম্ভূত (heterogenetic)। সোজা ভাষায়—এখানে পুরোনো ঐতিহ্যের সঙ্গে নবাগত (এবং বিদেশী) এক ঐতিহ্যের টানাপোড়েন চলেছে। বিদেশী ঐতিহ্য ও ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে বিকৃত। আজও আমরা এ দুটো ধারাকে মেলাতে পারিনি। কলকাতায় যাদের 'ভদ্রলোক' বলা হয়েছে, তারা কিন্তু দুটো বড়ো ভাগে বিভক্ত ছিল (১) প্রধানত দক্ষিণ রাঢ়ী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ এবং তন্তুবায়বণিক শ্রেণীর অভিজাত পরিবার, (২) মধ্যবিত্ত। প্রথম দল ঘটক ও পণ্ডিত সমাজের সাহায্যে গোত্র তৈরি করত, কুলগ্রন্থ লেখাত,টাকা ছড়িয়ে মৌলিক থেকে কুলীন হত, গোষ্ঠীপতিত্ব নিয়ে দলাদলি করত। উদাহরণস্বরূপ শোভাবাজারের দেবদের সঙ্গে হাটখোলার দত্তদের বা শেঠবসাকদের সঙ্গে অন্য তন্তুবণিকদের দলাদলি উল্লেখ করা যায়। এর থেকে বেরিয়ে আসত কতকগুলি দলের সমাহার—যাদের বলা হত সভা বা সমাজ। অভিজাত গৃহস্থরা ছিল পরস্পর নির্ভর। মধ্যবিত্তদের কোন নির্দিষ্ট সামাজিক গোষ্ঠীতে ফেলা যায় না। এরা বিদেশী শাসন ও অর্থনীতিপ্রসূত বিভিন্নবৃত্তি এবং ভূমির সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে সবসমর্থ জাতের কথা ওঠে না।

উভয় ভাগই ভদ্রলোকের প্রতিষ্ঠা চাইলেও তাদের রাজনৈতিক দাবিদাওয়া এবং

আন্দোলনের রীতিনীতি আলাদা ছিল। বেনিয়ানগিরি ও জমিদারীর কল্যাণে অভিজাতদের সঙ্গে সরকারী বেসরকারী ইংরেজদের সম্পর্ক অনেক নিবিড় ছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তাদের মুখপাত্র ছিল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন (১৮৫১)। অস্ট্রেলিয়ার অধ্যাপক জন ম্যাকগুইয়ার যন্ত্রগণকের সহায়তায় দেখিয়েছেন এই প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের শতকরা ৮৫ ভাগ ধনী, ৬৮ ভাগ হয় জমিদার নয় ব্যবসায়ী, বেশির ভাগই রাঢ়ী ব্রাহ্মণ ও সুবর্ণবণিক। এরা ছিলেন মূলত গোঁড়া হিন্দু (অথচ হিন্দু কলেজের ছাত্র !)। প্রথম ষোল বছর রাধাকান্ত দেব ছিলেন উক্ত প্রতিষ্ঠানের সভাপতি, পরে ঠাকুর, সিংহ ও ঘোষাল পরিবার। সভ্যদের চাঁদার হার (পঞ্চাশ টাকা) মধ্যবিত্তদের পক্ষে বড় বেশি ছিল। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠান বোম্বাই ও মাদ্রাজে স্থায়ী শাখা স্থাপন করতে পারেনি বা সাধারণ ভারতীয়ের স্বার্থ বা অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট হয়নি।

কলকাতা পৌরসভায় ভারতীয় প্রতিনিধির সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বা বিচারবিভাগে জাতি-ভিত্তিক পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে বা সিভিল সার্ভিসের ব্যাপারে প্রস্তাব নিলেও এঁরা শ্রেণীস্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা দেখা দিলেই পিছিয়ে যেতেন। নির্বাচনের চেয়ে মনোনয়নই এঁরা পছন্দ করতেন, লবণ কর বাড়িয়ে আয়কর কমালে এঁদের আপত্তি ছিল না, যে কোন প্রজাস্বত্ব আইনের ঘোর প্রতিবাদ করতেন এঁরা। এমন কি কারখানা-আইন-বিষয়ক বিতর্কে শিশু শ্রমিক নিয়োগও এঁরা সমর্থন করেছিলেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও কৃষ্ণদাস পালের মত মধ্যবিত্ত এদের পৃষ্ঠপোষিত মুখপাত্র।

মধ্যবিত্তরা প্রথমে ইণ্ডিয়ান লীগ ও পরে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে আপন দাবি-দাওয়া তোলে। ১৮৬০ সাল থেকেই এ ধরনের প্রতিষ্ঠানেরপ্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন বিদ্যাসাগর ও দ্বারকানাথ মিত্র। ইণ্ডিয়ান লীগের কর্মকর্তাদের ৬৮% ছিল মধ্যবিত্ত, ৩৮% আইনজীবী, ১৪% ছোট বা মাঝারি জমিদার এবং ঐ সংখ্যক শিক্ষক ও কর্মচারী। এঁদের অর্ধাংশ এসেছিলেন পূর্ব বঙ্গ থেকে—অনেকেই গোঁড়া হিন্দু নয়, বরং ব্রাহ্ম বা খ্রীস্টান-ঘেঁষা। মোটামুটি কলকাতার সমাজপতিদের আওতার বাইরে হলেও শম্ভু মুখার্জি বা অক্ষয় সরকারের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বৌবাজারের দত্তরা। মজার ব্যাপার, শীঘ্রই অভিজাতরা এর মধ্যে অনুপ্রবেশ করেন এবং এর চরিত্র বদলে যায়। শিশিরকুমার ঘোষকে কেন্দ্র করে নেতৃত্ব নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়। ১৮৭৫ সালের ২২ ডিসেম্বর ব্রাহ্ম সভ্যরা দল বেঁধে পদত্যাগ করলে এঁরা দুর্বল হয়ে পড়েন। পৌর রাজনীতির বেশি এঁরা কোনদিন এগোননি।

সে তুলনায় ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন আরও মধ্যবিত্তভিত্তিক। কর্মকর্তাদের মধ্যে শিক্ষক ছিলেন ৩৩%, আইনজীবী ৩৫% এবং আইনজীবীদের মধ্যে আবার বিলেত ফেরৎ ব্যারিস্টারের সংখ্যাধিক্য লক্ষণীয়। এখানে কলকাতার বাইরের লোকের প্রতিপত্তি ছিল বেশি, গোঁড়া হিন্দুর সংখ্যা আরো কম এবং ব্রাহ্মের সংখ্যা ঢের বেশি। ৫৪% কর্মকর্তাই কোন না কোন ব্রাহ্ম সমাজ থেকে এসেছিলেন, তবে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অবদানই সর্বাধিক (৪৮%)। এঁদের অনেকেই প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র। অর্থাৎ শিক্ষা, বৃত্তি, মানসিকতা এঁদের অনেক বেশি সংহতি দিয়েছিল। নানা স্কুল কলেজ, প্রেস, ব্রাহ্ম সমাজের মত প্রভাবশালী সংস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ থাকায় জনমত, বিশেষত ছাত্র ও যুব মত, এঁরা সংগঠন করতে পারতেন অনেক ভালোভাবে। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের উদ্বোধনীর দিন সুরেন্দ্রনাথের ছাত্ররা লীগ সমর্থকদের প্রচণ্ড চীৎকারে থামিয়ে দেয়। ইলবার্ট বিল আন্দোলনে ছাত্রেরাই ছিল সব চেয়ে সোচ্চার। জজ নরিস শালগ্রাম শিলাকে সাক্ষ্য রূপে

আহ্বান করলে সুবেন্দ্রনাথ যখন তীব্র প্রতিবাদ জানালেন এবং হাইকোর্ট অবমাননার দায়ে তাঁর কাবাদণ্ড হল তখন ছাত্রদের (যার পুরোভাগে ছিলেন স্বয়ং আশুতোষ মুখার্জী) তীব্র ধিক্কারে ইংলিশম্যান সম্পাদক জে· ফ্যারেল সিপাহী বিদ্রোহের কথা স্মরণ করেন। মফস্বলের সঙ্গে এই সভার যোগ ছিল বলে কলকাতার প্রগতিশীল চিন্তাধারা ও আন্দোলন পদ্ধতি মফস্বলেও ছড়িয়ে পড়ে। কৃষকশক্তি সম্বন্ধে এঁরাই প্রথম সচেতন হন এবং তাদের দলে আনার জন্য চাঁদার হার এক টাকা করা হয়। ভারত সরকার যখন (১৮৮১) খাজনা সম্পর্কিত আইনের খসড়া প্রকাশ করে জনমত যাচাই করছিলেন তখন এঁরা বেশ কিছু কৃষকসভা করেন। ১৮৮৪ সালের খসডার প্রতিবাদও জানান এঁরা। তবু এঁদের কৃষকবন্ধু মনে কবা ঠিক হবে না। দখলদারী প্রজার অধীন কোর্ফা প্রজা, ভাগচাষী ও ভূমিহীন চাষী সম্বন্ধে এঁরা নীরবই ছিলেন।

ব্রিটিশ অর্থনৈতিক শোষণ ও একাধিপত্যের বিরুদ্ধে এটা সচেতন প্রতিবাদ—রজত রায়ের এ মন্তব্য মানা শক্ত।[১৮] মধ্যবিত্তদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল : আই· সি এস· পরীক্ষা ভারতেও নিতে হবে এবং তাতে প্রবেশের বয়স বাড়াতে হবে, পৌরসভা ও আইন সভায় অধিকতর আসন দিতে হবে। ১৮৭৬ সালেব পৌর আইনের ৭২ জন পৌর কমিশনারের মধ্যে $\frac{২}{৩}$ অংশের নির্বাচনের ব্যবস্থা হয়। তখন থেকে এঁদেব লডাই বাধে অভিজাত পরিচালিত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে। ১৮৫৭-১৮৮৫-র মধ্যে বডলাটের আইন পরিষদে সব মনোনীত সদস্যই ছিল অভিজাত ভূম্যধিকারী এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে যুক্ত। ইংরাজবা দেখেছিল এঁরাই সমাজপতি, এঁদের মনোনয়ন করলে ভারতীয় সমাজ পক্ষে রইবে। বডলাট নর্থব্রুককে লেখা ছোটলাট টেম্পলেব চিঠিতে (৩০ জুন ১৮৭৫) এ কথা স্পষ্ট। ছোটলাটেব আইন পরিষদে ইংরাজী জানা অভিজাত ও মধ্যবিত্ত উভযের স্থান ছিল, যদিও প্রথমেব সিংহ ভাগ।

কবপোরেশনেব রাজনীতি নিয়ে উভয়ের মধ্যে গোলমাল লাগল। ১৮৭৬-এব পব নির্বাচিত পৌব কমিশনাবদের মধ্যে ৩৫% ছিল অভিজাত, মধ্যবিত্ত ৬০%। নির্বাচিত আইনজীবীর সংখ্যা ৯% থেকে বেড়ে হয় ৩৭%। কোন কোন মধ্যবিত্ত অভিজাতদেব লোক হলেও শিক্ষায় দীক্ষায়, ধর্ম ও সামাজিক চিন্তায় এঁরা ছিলেন স্বাধীন। প্রথম দিকে অভিজাত প্রতিনিধিরা একবাব ইংরেজদেব সঙ্গে অন্য বাব মধ্যবিত্তদেব সঙ্গে মৈত্রী গডতেন। পরে পৌব বাজনীতি ইংরেজ ও মধ্যবিত্তের বণভূমিতে পরিণত হয়। ছোটলাট ইডেন ও রিভার্স টমসন ব্যাপারটা আদৌ পছন্দ করেননি। ১৮৮৮ ও ১৮৯৯ সালে এদেব ক্ষমতা খর্ব কবতে দু' দু'বার পৌর আইন বদলানো হয়।

কলকাতার বাইবে ও বাংলার বাইরে শাখা স্থাপন করে ইণ্ডিযান অ্যাসোসিয়েশন প্রাক্তন অভিজাত রাজনীতিব ক্ষুদ্রগণ্ডী অতিক্রম করল। ১৮৭৬ সালে এর শাখা ছিল মাত্র দশটি ; ১৮৮৫ সালে তা দাঁড়ায় আশীতে। পববর্তীকালে জেলা বার অ্যাসোসিয়েশন, মফস্বল ম্যুনিসিপ্যালিটি ও লোকাল বোর্ডের মাধ্যমে জনসংযোগ স্থাপন করা সহজ হয়। ১৮৭৬ ও ১৮৭৯-তে উত্তব ভাবত পরিক্রমা করে সুরেন্দ্রনাথ অ্যাসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য প্রচার করেন। ইতিমধ্যে সব চেয়ে বিতর্কিত বিষয় হয়ে উঠেছিল, লীটনের নানা দমনমূলক নীতি—অস্ত্র আইন, দেশী ভাষার সংবাদপত্র আইন, ইত্যাদি। আয়কর, অবাধ বাণিজ্যনীতি, বরোদার রেসিডেন্টকে বিষপ্রয়োগে হত্যাব চেষ্টায় গায়কোয়াড়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ, পুলিশের অত্যাচার, কৃষ্ণাঙ্গদের অহেতুক নির্যাতন নিয়ে দেশী ভাষার সংবাদপত্র নিজস্ব মতামত প্রকাশ করতে শুরু করলে ভারত সরকার চিন্তিত হয়ে ওঠেন। যদিও বড়লাট

নর্থব্রুকের মতে ইংল্যাণ্ডের খবরের কাগজ বেশি দায়ী [১৯]; ছোটলাট ক্যাম্বেল তাঁকে সংবাদপত্র-নিরোধ আইন প্রণয়নের পরামর্শ দেন।[২০] লীটন প্রথম থেকেই তা কার্যকর করার কথা ভাবেন। ১৮৭৭ সালের ৪ঠা জুন তিনি ভারতসচিব সল্‌সবেরিকে লিখলেন, "শত্রুতা দূর করার সর্বোত্তম উপায় হল শত্রু নির্মূল করা।" ১৮৭৮-এর ১লা মার্চের চিঠিতে তাঁর সংকল্প দৃঢ়তর হতে দেখি এবং ঐ মাসেই তিনি দেশী সংবাদপত্র দমন আইন পাস করেন। নর্থব্রুককে লেখা (২৫ এপ্রিল ১৮৭৮) চিঠিতে তিনি আরেকটি কারণ দেখিয়েছেন—দেশী সংবাদপত্র গুজব ছড়াচ্ছে যে রাশিয়া ও তুরস্ক মিলে ভারত থেকে শীঘ্রই ব্রিটিশদেব বিতাড়িত করবে। এ সব গুজব প্রশ্রয় দেয়া ঠিক হবে না।

যাই হোক, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন লীটনের নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। লীটনের দিল্লী দরবারের পর সুরেন্দ্রনাথ নেটিভ প্রেস অ্যাসোসিয়েশন গঠন করেন এবং তাতে পুণার প্রতিনিধিরাও যোগ দেয়। বিলাতের লিবারেল দলের সঙ্গেও যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ১৮৭৯ সালে এঁদের প্রতিনিধি হিসাবে লালমোহন ঘোষ বিলাত যান সিভিল সার্ভিসের ব্যাপারে আবেদন জানাতে। সুরেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীর ভাষায়, "অ্যাসোসিয়েশন এক সর্বভারতীয় আন্দোলনের কেন্দ্র হোক এই চিন্তা আমাদের মনে কাজ করছিল। মাৎসিনির প্রেরণা-প্রসূত ঐক্যবদ্ধ ভারত ভাবনা, অন্তত সমগ্র ভারতকে এক সাধারণ মঞ্চে উপস্থাপন করার ভাবনা, বাংলার ভারতীয় নেতাদের মন আচ্ছন্ন করেছিল।" এর পরিণতি হল ১৮৮৩ সালে কলকাতায় জাতীয় কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন।

শতাব্দীর প্রায় মধ্যপর্ব পর্যন্ত বোম্বাই শহরে ইংরাজী শিক্ষার প্রসার অপেক্ষাকৃত কম ছিল এবং সভা-সমিতি সংগঠনে বা আন্দোলনে ইংরাজী শিক্ষিতদের আগ্রহ লক্ষিত হয়নি। ১৮২৬ সালের পর ডিরোজিওর প্রেরণায় নব্যবঙ্গ দল যেমন তৎপর হয়ে ওঠে তেমনি অধ্যাপক দাদাভাই নৌরজির প্রেরণায় নবীন বোম্বাই-এর জন্ম হয় এলফিনস্টোন কলেজে ১৮৪৮ সালে। আর. সি. পটবর্ধনের সম্পাদনায় দুই খণ্ডে প্রকাশিত দাদাভাই-এর পত্রাবলী ও ১৯১০-এ প্রকাশিত তাঁর রচনাবলীর 'আত্মজীবনীর এক অধ্যায়'-এ দাদাভাই-এর বিচিত্র অবদান সম্বন্ধে আমরা নানা তথ্য পেয়েছি। স্ত্রীশিক্ষা, মাতৃভাষায় শিক্ষা, ধর্মসংস্কার, সংবাদপত্রের সাহায্যে জনমত গঠন তার মধ্যে অন্যতম। ১৮৫২ সালের আগস্টে স্থাপিত হল বোম্বে অ্যাসোসিয়েশন। ক্রিস্টিন ডবিন দেখিয়েছেন এর কর্মকর্তারা ছিলেন পার্শী, গুজরাটী বানিয়া ও মুসলিম বণিক যাদের সামগ্রিক নাম ছিল শেঠিয়া।[২১] সভাপতি ছিলেন সে যুগের বণিক চূড়ামণি—জগন্নাথশঙ্কর শেঠ। ১৮৬০ সালের মধ্যেই এই প্রতিষ্ঠান থেকে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর দল বিতাড়িত হয় এবং 'রাস্ত গোফতর' (দাদাভাই), 'ইন্দুপ্রকাশ' ও 'নেটিভ ওপিনিয়ান' (বিষ্ণুরাম মাণ্ডলিক) প্রভৃতি পত্রিকার মাধ্যমে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দাবি প্রচার করতে থাকে। ১৮৬৬ সালে নৌরজি বিলেতে ইস্ট ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন। তার বোম্বাই শাখা (১৮৬৯) মধ্যবিত্তদের আশ্রয়স্থল ছিল। ইতিমধ্যে শেঠিয়া ও মধ্যবিত্তের বিরোধ বাধে পৌরসভার করনীতি নিয়ে। শেঠিয়ারা বিপুল ভূসম্পত্তির মালিক, তারা চাইতো জনসাধারণের ওপর করভার চাপিয়ে নিজেরা বাঁচতে। ১৮৭১ সালে বিষ্ণুরাম মাণ্ডলিক ছোট ব্যবসাদার, দোকানদার করদাতাদের নেতৃত্ব দিলেন। পৌর আইন (১৮৭২) আলোচনার সময় ফিরোজ শা মেহ্‌তা, বদরুদ্দিন তায়েবজি, কাশীনাথ ত্রিম্বক তেলাং নির্বাচন নীতির পক্ষে আন্দোলন জোরদার করলেন। কিন্তু আইন তৈরি হল বৃহৎ সম্পত্তির মালিকদের অনুকূলে। অধিকাংশ শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ভোটই ছিল না। ১৮৮২-তে সদস্য সংখ্যা ও ভোটাধিকার সম্প্রসারিত না হওয়া পর্যন্ত পৌরসভায় শেঠিয়া কর্তৃত্ব অটুট ছিল।

১৮৭৯ সালে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা লীটনের শুল্ক নীতির প্রতিবাদ জানিযে শিল্পপতিদের সমর্থন পান। ১৮৮৫ সালে তাঁরা তৈরি করলেন সম্পূর্ণ নিজেদেব প্রতিষ্ঠান—বোম্বে প্রেসিডেন্সী য়ুনিয়ন। তবু বোম্বাই-এর বাইরে এর কোনও শাখা ছিল না। এব দাম দিতে হল। পুণা হয়ে দাঁড়াল বোম্বাই-এর সবচেয়ে বড়ো প্রতিদ্বন্দ্বী।

হিন্দু পাদপাদশাহীর কেন্দ্র পুণার ব্রাহ্মণদের (বিশেষত চিৎপাবন শ্রেণীর) বৈপ্লবিক সম্ভাবনা ১৮৭৯ সালেই রিচার্ড টেম্পলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কেন তারা উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমে ভারতীয় রাজনীতিতে এত গুরুত্ব পেল সে বিষয়ে গর্ডন জনসনের বিশ্লেষণ অবশ্যপাঠ্য।[২২] রত্নগিরি, কোলাবা ও পুণা অঞ্চলে এদেব সংখ্যা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। সাতারা আসে পরে। তাদের অমিত অধ্যবসায় ও উচ্চাশার কথা কর্তৃপক্ষ জানতেন। সাধাবণত শহরবাসী, শিক্ষিত, উচ্চাশী চিৎপাবন যেকোন বৃত্তি অবলম্বন কবতো, বিশেষ করে সরকারী চাকুরি। পেশোয়াদের আমলে তাদের উত্থান—ব্রিটিশ আমলেও তা ব্যাহত হয়নি। তারা সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় ইংরাজী শিখল এবং শাসন বিভাগেব অধস্তন কাজকর্ম প্রায় একচেটিয়া করে নিল। বৃত্তির মধ্যে এদের বিশেষ ঝোঁক ছিল সাংবাদিকতার প্রতি।

১৮৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় পুণা সার্বজনিক সভা। তাব প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মারাঠা সর্দার নাটু ভ্রাতৃদ্বয় এবং অন্যতম সদস্য ছিলেন বিখ্যাত স্বদেশী সমর্থক গোপালহবি দেশমুখ। ১৮৭০ সালে নতুন করে ঐ নামেই এক সমিতি গঠিত হল গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে। প্রত্যেক সদস্যকে অন্তত পঞ্চাশজন প্রাপ্তবয়স্কেব প্রতিনিধি হতে হত। সদস্যেব তালিকা বিশ্লেষণ কবলে দেখা যায় সর্দাব, জমিদার, ব্যবসাদাব, অবসরপ্রাপ্ত কর্মচাবী, উকিল, সাংবাদিক, শিক্ষক সবাই বয়েছেন। এঁদের অধিকাংশই হিন্দু এবং ব্রাহ্মণ। ১৮৭৮ থেকে ১৮৯৬ কর্মকর্তাদেব মধ্যে চিৎপাবনেব সংখ্যাধিক্য চোখে পড়ে। সবচেয়ে উৎসর্গিত কর্মী ছিলেন জি· ভি· যোশী ('সার্বজনিক কাকা' নামে পবিচিত) আব মস্তিষ্কস্বরূপ ছিলেন তদানীন্তন মহাবাষ্ট্রেব সবচেয়ে শিক্ষিত ও কৃতী সন্তান—মহাদেব গোবিন্দ রানাডে। এ সভাব কার্যকলাপ শুধু আবেদন নিবেদনেই আবদ্ধ ছিল না। স্বদেশী প্রচাবে যোশী আত্মনিযোগ করেন। ১৮৭২ ও ১৮৭৬-৭৮-এব দুর্ভিক্ষেব সময় ব্যাপক ত্রাণকার্যে নেমেছিলেন সভ্যবা। কৃষকদের দুরবস্থা অনুসন্ধানেব এক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়, ১৮৭৫-এব ডেকান রায়টেব পূর্বে খাজনা বন্ধ আন্দোলন কবা হয ও তাব মাধ্যমে মফস্বলেব সঙ্গে যোগ স্থাপিত হয। পঞ্চাযেৎ (ন্যায়সভা)-এব সাহায্যে এঁবা বহু স্থানীয বিবাদ মেটাতেন। বোম্বাই-এব বর্ণবিষযক বিধি, লাইসেন্স ট্যাক্স, লীটনেব দমননীতিব সমালোচনা তো ছিলই।

এঁবা মধ্যবিত্ত আন্দোলনেব সীমা অতিক্রম কবেন। পথের মোড়ে, হাটে বাজারে, সহজ মারাঠী ভাষায়, গানেব সাহায্যে জনসাধাবণেব মধ্যে দেশপ্রেম প্রচাব কবা হত। সভাব ত্রৈমাসিক পত্রিকায প্রকাশিত রানাডের প্রবন্ধাবলী তদানীন্তন অর্থনৈতিক সমস্যা বিশ্লেষণে অসাধাবণ কৃতিত্ব দেখায়। শীঘ্রই রাজপুরুষদেব সন্দেহ জাগে। ১৮৭৮ সাল থেকে এঁদেব রাজদ্রোহী বলে বিবেচনা করা হতে থাকে এবং বানাডেকে পুণা থেকে নাসিকে ও নাসিক থেকে ধুলিযায বদলি কবে তাঁব প্রভাব ক্ষুণ্ণ কবাব চেষ্টা হয। ১৮৮০ সালে আমলাতন্ত্র রানাডের হাইকোর্ট জজেব পদে নিয়োগে বাধা দেয। বোম্বে কাউন্সিলেব সদস্য ব্যাভেনসক্রাফট লেখেন, "আযর্ল্যাণ্ডে পার্নেল যা দাক্ষিণাত্যে রানাডেও তাই।" তবু এঁবা যে ইণ্ডিযান অ্যাসোসিযেশনেব সভ্যদেব চেয়ে উগ্রতব কিছু ছিলেন তা বলা চলে না। ১৮৭৬

সালের দিল্লী দরবারের প্রাক্কালে সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে এঁদের মত বিনিময় হয় এবং নেটিভ প্রেস অ্যাসোসিয়েশনের গঠনের ব্যাপারে আলোচনা করতে যোশী কলকাতা আসেন। এ সময় ভারতীয় প্রতিনিধিদের একটা বাৎসরিক সম্মেলনের কথা ওঠে। ১৮৭৮ সালে পুণার সার্বজনিক সভা এরকম প্রস্তাবও দেন। তাতে যা কর্মসূচির উল্লেখ ছিল আশ্চর্যভাবে তা কংগ্রেসের প্রথম বিশ বছরের কর্মসূচির অনুরূপ। বোম্বে অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে সার্বজনিক সভার যুক্ত অধিবেশনে (মার্চ, ১৮৭৮) ব্রিটিশ নীতির কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক (যেমন হোমচার্জ ও আমদানী শুল্ক) নিয়ে ঐকমত্য হয়। কৃষকদের সম্বন্ধে উৎসাহ দেখালেও সার্বজনিক সভা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বাইরে কিছু ভাবতে পারেনি। দাক্ষিণাত্যের বৃত্তিজীবী ব্রাহ্মণদের স্বার্থ ভূমির সঙ্গে জড়িত ছিল (যেমন ছিল বাংলার মধ্যবিত্তের)। কৃষি সমস্যার সমাধানকল্পে এঁদের ত্রৈমাসিক পত্রিকায় লেখা হয়েছিল, "দরিদ্র, মূলধনহীন চাষীদের হাতে জমি দেওয়া সম্ভব নয়, কৃষির উৎকর্ষের জন্য চাই মূলধন।" দ্বিতীয়ত সভা পরিচালনায় ব্রাহ্মণদের প্রতিপত্তি শীঘ্রই অব্রাহ্মণদের ঈর্ষা উদ্রেক করে। রোজালিণ্ড ও' হ্যানলন-এর **Caste, Conflict and Identity: Mahatma Jatirao Phule and Low Caste Protest in 19th Century Western India** গ্রন্থে পাই জটিরাও ফুলের নেতৃত্বে স্থাপিত হয় সত্যশোধক সমাজ (১৮৭৩)। ১৮৮৮ সালে ফুলে শূদ্রদের সার্বজনিক সভার সঙ্গ বর্জন করতে বলেন, পরের বছর—কংগ্রেস বর্জন। এখানে স্যার সৈয়দ আহমদের সঙ্গে তাঁর মিল লক্ষণীয়। তৃতীয় দিক থেকে সভার কাজের প্রতিবাদ ওঠে। চিপলোঙ্কারের 'নিবন্ধমালা' ঔপনিবেশিক শাসনকে সব দুঃখদুর্দশার জন্য দায়ী করে। তাঁর জ্বালাময়ী রচনা (বঙ্কিমের 'কমলাকান্ত'-কে স্মরণ করায়) তিলক প্রভৃতি তরুণ নেতাকে উদ্দীপিত করে। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত ডেকান এডুকেশন সোসাইটি ও ফার্গুসন কলেজ (১৮৮৫), সংবাদপত্র—'কেশরী' ও 'মারাঠা' (১৮৮১)—তরুণদের সংগ্রামমুখী কর্মসূচির ইঙ্গিত দেয়। রানাডে প্রথম মারাঠী ঐতিহ্যের গৌরবময় ইতিহাস তুলে ধরেন, আর চিপলোঙ্কার ও তিলক তাকে দেন ব্রিটিশবিরোধী তাৎপর্য। 'মারাঠা'র প্রথম সংখ্যায় (২ জানুয়ারি, ১৮৮১) শিবাজীকে জাতীয়তার জনক রূপে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ১৮৯৬ সালের শিবাজী উৎসব। পঞ্চমত পুণার রাজনীতিতে সমাজ সংস্কারের গুরুত্ব নিয়ে বিভেদ দেখা দেয়। আগারকারের স্ত্রীশিক্ষা পরিকল্পনায় আপত্তি জানালে এবং রখমবাই মামলায় রানাডের বিরোধিতা করলে ১৮৯০ সালে তিলককে ডেকান এডুকেশন সোসাইটি ছাড়তে হয়। তার দু' বছর আগে তিলক 'মারাঠা' ও 'কেশরী'র কর্তৃত্ব কেড়ে নিয়েছিলেন। ১৮৯১ সালে **Age of Consent Bill** নিয়েও মতভেদ দেখা দেয়। এভাবে একদিকে রানাডে, আগারকর ও গোখ্‌লে, অন্য দিকে তিলকের নেতৃত্ব নিয়ে বিবাদে পুণার রাজনীতিতে ভাঙন ধরে। ১৮৯৫ সালে সার্বজনিক সভায় তিলকের অবিসংবাদিত কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়।

মাদ্রাজ ইংরেজী শিক্ষা প্রসারে কলকাতা থেকেও এগিয়েছিল। ১৮৬৪ ও ১৮৮৬ সালের মধ্যে মাদ্রাজের এনট্রান্স পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কলকাতার তুলনায় বেশি ছিল, স্নাতক প্রায় সমসংখ্যক। মাদ্রাজের মধ্যে আবার তামিলভাষী অঞ্চল অন্যান্য অঞ্চল থেকে এগিয়েছিল। তবে কলকাতা ও বোম্বাই শহরের মত মাদ্রাজ শহরের প্রাধান্য দেখি না। তামিলভাষী তাঞ্জোর, তিনিভেলি ও ত্রিচি, তেলুগুভাষী গোদাবরী উপত্যকা, মালায়ালী-ভাষী মালাবার বেশ অগ্রসর ছিল। কলেজের ছাত্র সংখ্যার প্রায় ৭৫ শতক ছিল ব্রাহ্মণ। মাধ্যমিক শিক্ষায় ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ সমতুল। ১৮৭৯-'৮৪-র মধ্যে অব্রাহ্মণরা ক্রমশ গুরুত্ব পাচ্ছিল। কি মাদ্রাজে কি মালাবারে ভূম্যধিকারী ও কর্মচারীদের সন্তানরাই

উচ্চ শিক্ষার জন্য ব্যাকুল হয়েছিল। মাদ্রাজ নেটিভ অ্যাসোসিয়েশনের জন্ম হয় কলকাতাব ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের শাখারূপে (২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫২)। কিন্তু অল্পদিন পরেই নামবদলে তা স্বাধীন সত্তা ঘোষণা করল এবং সনদের ব্যাপারে পৃথক দাবিপত্র পেশ করল। তার মধ্যে অন্যতম দাবি ছিল উৎপীড়ন দ্বারা রাজস্ব আদায় বন্ধ করতে হবে। মাদ্রাজের ভূম্যধিকারী বা বণিক নেতারা বাংলা বা বোম্বাই-এর নেতাদের মত ধনী বা শিক্ষিত ছিলেন না বলে ১৮৬২ সালের মধ্যে উক্ত অ্যাসোসিয়েশন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। আইন, শিক্ষা, সাংবাদিকতা প্রভৃতি বৃত্তির প্রসার বিলম্বিত হওয়ায় মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের অভ্যুদয় বিলম্বিত হয়েছিল। ১৮৭০-এর দশকে অন্যান্য অঞ্চলের কর্ম-চাঞ্চল্য, ১৮৭৬-৭৭-এর দুর্ভিক্ষ, লীটনের দমনমূলক নীতি মাদ্রাজের শিথিল পালে হাওয়া লাগাল। এই ব্যাপারে উইলিয়াম ডিগবির দান স্মরণীয়। সুব্রহ্মণ্য আয়ার, বিজয়রাঘবাচারি, রঙ্গিয়া নাইডু, আনন্দ চার্লু, রামস্বামী মুদালিয়ার প্রভৃতি নবীন নেতাদের অধিকাংশই ছিলেন আইনজীবী। তাঁরা মাদ্রাজেব ছোটলাট গ্র্যান্ট ডাফের হিন্দু-বিদ্বেষী শাসননীতিতে খুবই উত্তেজিত হয়েছিলেন। আবার রিপনের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসননীতিতে উৎসাহিত হয়ে তাঁরাই নেটিভ অ্যাসোসিয়েশনকে পুনরুজ্জীবিত করলেন। ১৮৮৩-৮৪ সালে এঁরা যে তিনটি কর্মসূচি নেন তার সবকটি রিপন-কেন্দ্রিক। প্রবীণ ও নবীন নেতাদেব দ্বন্দ্ব শুরু হয় সরকারী কর্মচারী কারমাইকেলের বিদায়-সংবর্ধনা নিয়ে। প্রতিবাদে নবীনরা মাদ্রাজ মহাজন সভা স্থাপন করেন (১৬ মে ১৮৮৪)। শীঘ্রই মফস্বলের সঙ্গে এঁদের যোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। মাদ্রাজ তখন থিয়োজফি প্রচারের প্রধানকেন্দ্র। তার মাধ্যমে ভাবতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে সম্ভ্রম এবং সর্বভারতীয় সংহতি বোধ জাগ্রত হয়েছিল। রিপনের বিদায় সভায় যোগ দিতে ১৮৮৪-র শেষে এঁরা বোম্বাই যান এবং সেখানকাব নেতাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। আনন্দ চার্লুর স্মৃতিকথায় আছে, সর্বভাবতীয় বাৎসরিক সভার প্রস্তাব আনেন দাদাভাই স্বয়ং এবং তেলাং মাদ্রাজকে পরের বছর সে সভা আহ্বান করতে অনুরোধ জানান। সামর্থ্যের অভাবে মাদ্রাজ তাতে রাজি হয়নি। এর পরপরই মাদ্রাজে মহাজন সভাব অধিবেশন বসে এবং আডেয়ারে থিওজফি কনভেনশ্যন। থিওজফিপন্থীরা রাজনৈতিক কর্মসূচির বিরোধিতা করায় মাইলাপুরে রঘুনাথ বাও-এর বাড়িতে সর্বভারতীয় সভার প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ইণ্ডিযান মিররেব সম্পাদক নবেন্দ্রনাথ সেন। কলকাতা ফিরে এসে তিনি এ ব্যাপারে উৎসাহ জাগাবার চেষ্টা করেন।

॥ ৩ ॥

এখানেই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম নিযে বিতর্কের শুরু। ১৮৮৬ সালে কর্নেল অলকট, ১৮৮৮-তে রঘুনাথ রাও, ১৮৮৯-তে নরেন্দ্রনাথ সেন দাবি করেন যে থিওজফিস্টরাই কংগ্রেসের জন্মদাতা। ১৯১৫-তে অ্যানি বেসান্ত এ মত সমর্থন করেছিলেন। পাল্টা দাবি ওঠে অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউমের পক্ষে। যাঁবা হিউমকে জাতীয় কংগ্রেসের জনক রূপে স্বীকার করেছেন তাঁদেব মধ্যে রয়েছেন প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চম সভাপতি উইলিয়াম ওয়েডারবার্ন, কংগ্রেসের সরকারী ঐতিহাসিক পট্টভি সীতারামায়া থেকে কংগ্রেসের কঠিনতম সমালোচক বামপন্থী বজনী পাম দত্ত। প্রায় দু দশক পূর্বে ভারতীয় অভিলেখ কমিশনের সভায় সরকারী ও ব্যক্তিগত চিঠিপত্র বিশ্লেষণ করে এ সিদ্ধান্ত অমূলক প্রমাণ করেছিলাম। পরে অনিল শীল ও বৃটন মার্টিন স্বীকার করে

নিয়েছেন।

ওযেডাববার্নের ভাষায়, লীটন আমলেব শেষদিকে সবকাবের অন্যতম সচিব হিউমেব হাতে এমন সব কাগজপত্র আসে যাতে তাঁব বিশ্বাস হয যে ভাবতে গণবিদ্রোহ আসন্ন। এটা দানা বাঁধলে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী নেতৃত্ব দেবে। বিদ্রোহেব ফল মঙ্গলজনক হবে না মনে কবে তিনি ভাবতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা শুরু কবেন এবং বিশেষ কবে যুবকদেব মনোভাব অন্যদিকে ঘুবিযে দিতে চান। ১৮৮৩ সালেব ১লা মার্চ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদেব উদ্দেশ্যে এক খোলা চিঠিতে তিনি তাদেব দেশপ্রেম ও ত্যাগস্বীকাবে উদ্বুদ্ধ কবেন। একটা সর্বভাবতীয প্রতিষ্ঠানেব প্রযোজনীযতা উপলব্ধি কবেছিলেন তিনি। প্রথমে তাঁর মনে হযেছিল প্রাদেশিক সমিতিগুলি বাজনীতি করুক, সর্বভাবতীয সম্মেলন কববে সামাজিক সমস্যা বিচাব। সেখানে প্রাদেশিক ছোটলাট সভাপতিত্ব কববেন এবং ভাবতীয নেতা ও আমলাতন্ত্রেব মধ্যে সহযোগিতাব মনোভাব গডে উঠবে।

এব পববর্তী ঘটনা উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যাযের লেখা Introduction to Indian Politics (1898) গ্রন্থে পাই। হিউম তাঁব পবিকল্পনা বডলাট ডাফবিনেব কানে তুললেন। তিনি এ ধবনেব সমাজ সংস্কাব সভাব কার্যকারিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুললেন। ভাবতবর্ষে যেটা দবকাব সেটা হল সবকাবী নীতিব দাযিত্ববান সমালোচনা, তাকে আবো ভাল কবাব প্রস্তাব নিযে বিতর্ক। এ ধবনেব সভায প্রাদেশিক লাটেব উপস্থিতি বাধা হযে দাঁডাবে। হিউম নিজেব ও ডাফবিনেব প্রস্তাব ভাবতীয নেতাদেব সামনে উপস্থিত কবলেন—কোনটা কাব না জানিযে। তাঁবা ডাফবিনেব প্রস্তাব গ্রহণ কবলেন। ঠিক হল ২৫ থেকে ৩১ ডিসেম্বব (১৮৮৫) পুণায বসবে সেই সর্বভাবতীয সম্মেলন। হিউম তাব নাম দিযেছিলেন Indian National Union মাদ্রাজ ও কলকাতা ঘুবে জনমত সংগ্রহ কবে হিউম বিলেতে গেলেন লিবাবেল নেতাদেব সঙ্গে পবামর্শ কবতে। পুণায কলেবা দেখা দেওযায শেষ মুহূর্তে সম্মেলনেব স্থান সবিযে নেওযা হল বোম্বাই শহবে। সেই সম্মেলনেব নাম বদলে বাখা হল Indian National Congress. অ্যানি বেশান্তেব How India wrought for Freedom গ্রন্থে (১৯১৫) আমবা প্রথম কংগ্রেসেব এক জীবন্ত চিত্র পাই।

কিন্তু ব্যাপাবটা ঠিক এভাবে ঘটেনি। বাঙালী নেতৃত্বেব, বিশেষত সুবেন্দ্রনাথেব ভূমিকা, এতে ছোট কবে দেখান হযেছে। হিউমের মনে সর্বভাবতীয সম্মেলনেব কথা উঠবাব আগে সুবেন্দ্রনাথ তা ভেবেছিলেন। ১৮৮২ সালেব ২৭ মে তাঁব কাগজ 'বেঙ্গলী'-তে আমবা প্রথম National Congress কথাটি পাচ্ছি। এর উদ্দেশ্য হবে—"(to) prepare the way for concerted action in reference to political matters among the different political bodies scattered throughout the country." সুবেন্দ্রনাথ আরও বলেন, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন এমনি এক কংগ্রেসেব আযোজন কবছে। প্রথম কংগ্রেসেব প্রায দু বছব আগে তাঁব জাতীয কনফাবেন্সেব প্রথম (কলকাতা) অধিবেশনকে জাতীয কংগ্রেসের মহডা বলা চলে। আব ভারতীয নেতারা কোনকালেই ডার্ফবিন বা আমলাদের সঙ্গে জ্ঞানে বা অজ্ঞানে ষডযন্ত্রে লিপ্ত হননি। হিউমেব নানা স্বকপোলকল্পিত উক্তি ও তাব ওয়েডাববার্ন-উমেশ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত ভাষ্য ইতিহাস বলে চলছে। তার ওপব নির্ভর কবতে গিয়ে রজনী পাম দত্তও ভুল কবেছেন।

হিউম উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার কাছ থেকে র‍্যাডিক্যাল চিন্তাধারা পেয়েছিলেন। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের বেড়াজালে আটকে পড়ে তাঁর মধ্যে একটা প্রচণ্ড ভীতির সঞ্চার হয। সব সময তিনি এবংবিধ গণবিদ্রোহের দুঃস্বপ্ন দেখতেন। অবশ্যই ভারতীয়দেব প্রতি বন্ধুভাবে

তিনি ছিলেন অবিচল। এর প্রমাণ ১৮৭২ এব ১লা আগস্ট নর্থব্রুককে লেখা তাঁর চিঠি। বাজস্ব, কৃষি ও বাণিজ্য বিভাগে প্রায় আট বছর সচিব পদে থাকাকালে ভারতীয় কৃষকদের দুঃখদুর্দশা, বৈপ্লবিক সম্ভাবনা সবই তাঁব চোখে পড়েছিল। তাদেব সম্বন্ধে উদাবতন্ত্রী নীতি প্রয়োগ কবতে গিয়ে তিনি অনেক আমলাব বিবাগভাজন হন। চাকুবি নিয়ে বেষারেষি এতে ইন্ধন জোগায। শেষে তাঁব বডলাটেব কাউন্সিলেব সভ্য হওযাব পথ বন্ধ কবে দেওযা হয। লীটন তাঁকে উত্তবপ্রদেশে বদলি করে দিলে তিনি অবসব গ্রহণ করেন। থিওজফিব প্রতি তাঁব আকর্ষণ খানিকটা হতাশাপ্রসৃত। যে সব 'গুরু' 'চেলা'দেব কাছ থেকে নানা খবব পেয়ে হিউমকে দেন (হিউম যাকে সাত খণ্ডেব নথিপত্র বলছেন) তাঁবা থিওসফিব বিশেষ সংজ্ঞায় 'গুরু'। তাঁদেব নানা অপ্রাকৃত বহস্যময ক্ষমতা। বহুদূব থেকে 'চেলা' মাবফৎ তাঁবা খবব পান। ১৮৮৩-তে তাঁরা তিব্বত থেকে খবব পাঠাচ্ছিলেন যে এক বিবাট বিপদ ঘনিয়ে আসছে। অবশ্যই তখন হিউম বিপনকে সাবধান করেন। আসলে বিপনেব স্বাযত্তশাসন প্রস্তাব (১৮ মে ১৮৮২) তাঁকে আবাব সক্রিয বাজনীতিব দিকে টানল। বুদ্ধিমান বিপন হিউমেব অভিজ্ঞতা ও ভাবতীয নেতাদেব সঙ্গে সৌহার্দ্য কাজে লাগাতে চান। শীঘ্রই ইলবার্ট বিল নিয়ে যে বিতর্ক শুরু হল তাতে তাঁব প্রয়োজন হল। ১৮৮৩-ব গোড়ায (২ ফেব্রুযাবি) কোর্টনি ইলবার্ট ভাবতীয সিভিলিযানদেব মফস্সলেব ইউবোপীয অপবাধীদেব বিচাব ক্ষমতা দিতে চেয়ে এক বিল আনেন। এব আগে ফৌজদাবি কার্যবিধি অনুযাযী নিজে সাহেব না হলে কোন ম্যাজিস্ট্রেট, দাযবা জজ বা জে পি সাহেবদেব বিচাব কবতে পাবতো না। ইলবার্ট চেয়েছিলেন শুধু অযৌক্তিক জাতিভিত্তিক বাধা দূব কবতে। ভাবতীয জজদেব শ্বেতাঙ্গ অপবাধীদেব মৃত্যুদণ্ড দেবাব অধিকাব দেওযা হযনি। হেবিযাস কর্পাসও বজায ছিল। কিন্তু এব ফলে অ্যাংলো ইণ্ডিযান মহলে এমন উষ্মা ও উত্তেজনাব সৃষ্টি হয যে কেউ কেউ তাকে 'শ্বেত বিদ্রোহ' আখ্যা দিয়েছেন। এবাবকাব আন্দোলন মেকলে ও বীটনেব আনা 'কালা কানুন' নিয়ে আন্দোলনকেও ছাড়িয়ে গেল। কিন্তু ইঙ্গ-বঙ্গ সম্প্রদাযেব আসল লক্ষ্য ছিল রিপন-প্রবর্তিত উদাবতান্ত্রিক শাসননীতি। ফিটজেমস স্টিফেনেব 'টাইমস' পত্রিকাব চিঠিতে (১ মার্চ ১৮৮৩) ও বেযাবিং-এব 'নাইনটিনথ সেঞ্চুবি' পত্রিকাব প্রবন্ধে (অক্টোবব, ১৮৮৩) একথা পবিষ্কাব। বক্ষণশীলদেব আশঙ্কা হচ্ছিল যে বিপন কালা আদমিদেব গদীতে বসাতে চাইছেন। এবা 'ইউবোপীযান অ্যাণ্ড অ্যাংলো ইণ্ডিযান ডিফেন্স অ্যাসোসিযেশন' গঠন কবল এবং দেশে বিদেশে বিলেব বিরুদ্ধে প্রচাব চালালো। এমনকি, কটনেব মতে, এবা নাকি বিপনকে বন্দী কবে বিলেতে পাঠাবাব যড়যন্ত্রেও লিপ্ত হয।

বিলাতে তখন লিবাবেল সবকাব, তবু তাবা বা পার্লামেন্টেব লিবাবেল সদস্যবা বিপনকে এমন দ্বিধাগ্রস্ত সমর্থন জানালো যে বিপন হতাশ হয়ে ইঙ্গভাবতীযদেব সঙ্গে সমঝোতায এলেন। ঠিক হল যে শ্বেতাঙ্গদেব বিচাবকালে সমসংখ্যক শ্বেতাঙ্গ ও ভাবতীয জুবী থাকবে। এই নতি স্বীকাবেব ফলে ভাবতীযদেব মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রযা দেখা দিল। 'হিন্দু পেট্রিযট' (খুবই অনুগত) বলল—"এটা অসম্মানজনক শান্তি"। 'রইস অ্যাণ্ড বাযত' (পত্রিকা) লিখল, "এ লজ্জার তুলনা নেই।" 'ব্র্যানসনিজম' (ইঙ্গ-ভারতীযদেব নেতা ব্র্যানসনেব নামানুসারে) প্রসঙ্গে 'লোকবহস্য'-এ বঙ্কিমচন্দ্রেব অপূর্ব ব্যঙ্গচিত্র স্মবণীয। কলকাতা-বোম্বাইয়েব তীক্ষ্ণধী নেতাবা বুঝলেন বেশি প্রতিবাদ করে লাভ নেই ববং বিপনেব পেছনে সর্বশক্তি নিয়ে না দাঁড়ালে সব সংস্কারই বাতিল হয়ে যাবে। একমাত্র উত্তর—ঐক্যবদ্ধ সর্বভারতীয রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন। হিউম বিপন ও ভারতীয়

নেতাদের মধ্যে দৌত্য করতে এগিয়ে এলেন। রিপনের বিদায়-সংবর্ধনা (নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৮৮৪)র সুযোগ নিলেন তিনি। হিউম, চিপলোঙ্কার, নৌরজি, রানাডে ও মেহতার মধ্যে ১৯ জানুয়ারি ১৮৮৫ এ বিষয়ে কিছু কথা হল। ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল য়ুনিয়ন গঠনের প্রস্তাব উঠল।

ইতিমধ্যে বাংলায় অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। ১৮৮৩-র মে মাসে আদালত অবমাননার অভিযোগে জজ জে· এফ· নরিস সুরেন্দ্রনাথকে দু মাস জেল দিয়েছেন। রায় বেরোলে ছাত্ররা হাইকোর্টের জানালা ভেঙে পুলিশকে পাথর মেরে, ছাত্র আন্দোলনের নতুন নজীর সৃষ্টি করেছে। কলকাতায় হরতালও হয়ে গেল। হিন্দু-মুসলিম-শিখ ঐক্যের এমন অভূতপূর্ব নিদর্শন 'ইংলিশম্যান'-এর সম্পাদকের শ্যেন দৃষ্টি এড়ায়নি। সুরেন্দ্রনাথের মুক্তির পর ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন জাতীয় ফাণ্ডে টাকা তোলার সিদ্ধান্ত নিল। বিভিন্ন প্রাদেশিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানেব প্রতিনিধি নিয়ে বাৎসরিক সম্মিলনীর কথা আবার উঠল। (১৮৮২ সালে একেই সুরেন্দ্রনাথ 'জাতীয় কংগ্রেস' আখ্যা দেন)। আনন্দমোহন বসুর আহ্বানে ১৮৮৩-র ২৮ ডিসেম্বর ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় একশত প্রতিনিধি কলকাতার অ্যালবার্ট হলে মিলিত হলেন। 'ন্যাশনাল কনফারেন্স' বসল।

অনিল শীলেব মতে, এ সম্মেলন আদৌ প্রতিনিধিত্বমূলক ছিল না। কিন্তু এর গুরুত্ব সেখানে নয়। এই সম্মেলন বসাতে পাবাটাই প্রথম বড় কথা। দ্বিতীয়ত, এর গৃহীত প্রস্তাবগুলির সঙ্গে ঠিক দু বছর পরে গৃহীত কংগ্রেসেব প্রস্তাব তুলনা করলে দেখা যাবে প্রায় হুবহু মিলে যাচ্ছে। প্রস্তাবের মধ্যে ছিল ইংল্যাণ্ড ও ভাবতে একই সঙ্গে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা গ্রহণ, ঐ সার্ভিসে ঢোকাব সর্বোচ্চ বয়স বাড়িয়ে ২২ বছব করা, স্ট্যাটুটাবী সিভিল সার্ভিসের জন্য পবীক্ষা ব্যবস্থা, প্রশাসন ও বিচাব বিভাগের বিযুক্তি, অস্ত্র আইন বাতিলকবণ, সামরিক ব্যয় হ্রাস, আইন পবিষদে অধিক সদস্য নির্বাচন, ইত্যাদি।

মজার ব্যাপার, নিজের প্রস্তাবিত ইণ্ডিযান ন্যাশনাল য়ুনিযান নিয়ে কথা বলতে হিউম যখন কলকাতা এলেন (মার্চ, ১৮৮৫), তখন নবেন্দ্রনাথ সেন ও উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়েব সঙ্গে আলোচনা করলেন—আনন্দমোহন বসু বা সুরেন্দ্রনাথেব সঙ্গে নয়। বসুব ডায়েরি (২২ মার্চ ১৮৮৫)-তে হিউমের সঙ্গে সাক্ষাৎকারেব কথা আছে, কিন্তু সর্বভাবতীয় সম্মেলনের কোন প্রস্তাবের উল্লেখ নেই। নভেম্ববের শেষাশেষি সুবেন্দ্রনাথ জানতে পারেন যে পবের মাসে পুণায় হিউম-প্রস্তাবিত সম্মেলন বসছে। তখন তিনি কলকাতায় ন্যাশনাল কনফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশনের আয়োজনে ব্যস্ত। তাঁর বা তাঁর দলেব পক্ষে জাতীয কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে যোগদান সম্ভব ছিল না। তাহলে কি হিউম তাঁদের বাদ দিতে চেয়েছিলেন? এবকম ষড়যন্ত্র থেকে নবেন্দ্রনাথ, উমেশচন্দ্র এবং মনোমোহন ঘোষকেও বাদ দেওয়া যায় না।

রজনী পাম দত্ত আর এক গভীরতর ষডযন্ত্রের উল্লেখ করেছেন—সেটা হিউম, কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ও বডলাট ডাফরিনের মধ্যে। তাঁর সিদ্ধান্তের ভিত্তি স্বল্প—উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা। এর আংশিক সমর্থন এসেছে এস· আর· মেহবোত্রার **The Emergence of the Indian National Congress** (১৯৭১) পুস্তকে। তাঁর সিদ্ধান্তের ভিত্তি বিপনকে লেখা হিউমের ১৩ জানুয়ারি, ১৮৮৯র চিঠি। মেহরোত্রার মতে হিউম এ ব্যাপারে ডাফরিনের মত চেয়েছিলেন এবং বোম্বাই-এর ছোটলাট লর্ড রিএ (Reay)-র সভাপতিত্বের প্রস্তাব ছাড়া অন্য ব্যাপারে সম্মতিও পেয়েছিলেন। কিন্তু এর অনেক আগে রিএকে লেখা ডাফরিনের চিঠি (১৭ মে ১৮৮৫) প্রমাণ করে যে ডাফরিন এ

ধরনের সম্মেলনের প্রস্তাব সন্দেহের চোখে দেখেছিলেন। তাঁর ভাষায়, "হিউমকে বুদ্ধিমান ও ভদ্র মনে হলেও তাঁর মাথায় ছিট রয়েছে ("seems to have got a bee in his bonnet")।" এ কথা ঠিক যে, আগের সাক্ষাৎকারে হিউম এ রকম সম্মেলনের প্রস্তাব পেড়েছিলেন এবং রিএকে সভাপতি করার কথাও বলেছিলেন। কিন্তু ডাফবিন তাঁর উভয় প্রস্তাবই অগ্রাহ্য করেন। তাঁর ভাষায়, "এ ধরনের সভার কাজই হবে সরকারী নীতি বা কাজের সমালোচনা, বা এমন দাবিরচনা যা সরকারের পক্ষে পূরণ করা অসম্ভব...আমি তাঁকে বলেছি এমন পরিকল্পনার সঙ্গে প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে জড়িত করা অদ্ভুত হবে।" তাছাড়া হিউম যাই বলুন এবং উমেশচন্দ্র যাই লিখুন না কেন, ডাফরিন কোনদিন চাননি এ ধরনের সভা বাজনৈতিক আলোচনায় নামুক। হিউম নিজে সমাজ সংস্কারে আলোচনা আবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন তাও মনে হয় না। তিনি যে এ বিষয়ে বেশ সতর্ক ছিলেন তার প্রমাণ চিপলোঙ্কারকে লেখা ২৭ নভেম্বব, ১৮৮৪ ও ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৫-ব চিঠি এবং বহরামজি মালাবারিকে লেখা ১ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৫-র চিঠি। সমাজ সংস্কার থেকে দূবেই থাকতে চেয়েছিলেন তিনি।

ডাফরিন যদি কংগ্রেসেব মত কোন প্রতিষ্ঠান হোক চাইতেন তাহলে ১৮৮২-র ৩০ নভেম্বর সেন্ট অ্যানড্রুজ ডে ডিনাব বক্তৃতায় তাকে "অণুবীক্ষণিক সংখ্যালঘুদেব প্রতিনিধি" বলে উপহাস করতেন না। রিপন তো এই ভীষণ ভাষণ শুনে চমকে গিয়েছিলেন এবং হিউমের কাছে ঐ বছরের ২৫ ডিসেম্বরের চিঠিতে কৈফিয়ৎ চেয়েছিলেন। অর্থাৎ ডাফরিন সম্বন্ধে অনেক মনগড়া কথা হিউম বলতেন, উমেশচন্দ্রদেব কাছেও বলেছেন। তাবই ওপর ভিত্তি করে উমেশচন্দ্র কংগ্রেসের জন্মকাহিনী লেখেন এবং সীতাবামায়া, বজনী পাম দত্ত সবাই তা বিশ্বাস কবে বসেন।

আসলে ডাফরিন কোনও দিন এরকম প্রতিষ্ঠানতো চানইনি, পবেও তাকে সমালোচনার দৃষ্টিতেই দেখেছেন। ভাবত সচিব কিম্বার্লিকে লেখা এক চিঠিতে (২৯ এপ্রিল ১৮৮৬)-তে তিনি সুবেন্দ্রনাথের দলকে আইরিশ হোমরুলাবদেব সঙ্গে তুলনা করেছেন, তাদেব মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন "bastard disloyalty"। ওয়াচা দাদাভাইকে যে চিঠি লেখেন (৩০ মে ১৮৮৫) তাতে হিউম-ডাফবিন প্রসঙ্গে সন্দেহ লক্ষ্য কবি। হিউম নিজেব ধারণা অন্যের ওপর চাপাতে চেয়েছিলেন এ সম্বন্ধে আমাব বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। হয়তো বা ডাফবিনের প্রশ্রয় আছে বলে তিনি ভাবতীযদের বিশ্বাসভাজন হতে চেয়েছিলেন।

আগেই বলেছি, সুরেন্দ্রনাথেব দলকে এত বড ব্যাপারটা জানাবাব কোনও চেষ্টা হিউম করেননি। ৫ই ডিসেম্বর-এর 'হিন্দু' পত্রিকায় পুণায ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল য়ুনিয়নের অধিবেশন বসছে এ খবর প্রকাশিত হলে তাঁরা বিস্মিত হন। কিন্তু তখন ন্যাশনাল কনফারেন্সের প্রস্তুতি অনেক দূর এগিয়ে গেছে, তাঁদের যোগ দেওয়া সম্ভব হয়নি। পুণায কলেরা দেখা দেওয়ায় শেষমুহূর্তে সভার স্থান বোম্বাই-এর গোকুল দাস তেজপাল সংস্কৃত কলেজ হলে সরিয়ে নেওয়া হয়। অধিবেশনের প্রথম দিন (২৮ ডিসেম্বর ১৮৮৫) উপস্থিত ছিলেন বাহাত্তর জন প্রতিনিধি—অধিকাংশই বোম্বাই (৩৭) ও মাদ্রাজের (২২)। হিউমেব দেওয়া নাম বদলে রাখা হয় ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল কংগ্রেস। সভাপতি পদে বৃত হন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

অতঃপর হিউমকে 'ভারতীয় কংগ্রেসের জনক' আখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। তাঁর ভারত প্রীতি, সংগঠন প্রতিভা, লিবারেল দল ও বডলাটদের সঙ্গে হৃদ্যতা বিস্মৃত না হয়েও বলা যায়, তিন প্রেসিডেন্সীতে, বিশেষ কবে বাংলায়, রাজনৈতিক চেতনা যেভাবে অগ্রসর হচ্ছিল এবং রিপনেব শাসন সংস্কারের ফলে আশায় ও ইলবার্ট বিলে পরাজয়ের ফলে হতাশায়

যেভাবে উদ্দীপিত হয়েছিল তাতে হিউম না থাকলেও কোন না কোন সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানেব জন্ম হত। হয়তো তাব কেন্দ্র হত কলকাতা, কর্তা—সুরেন্দ্রনাথ। বাংলা দলকে বাদ দেওয়াব চেষ্টা প্রথমেই বিভেদের বীজ রোপণ করতে পারত কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের বিচক্ষণতার ফলে তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। ১৮৮৬ সালে কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন কলকাতায বসে এবং সুবেন্দ্রনাথ সদলে যোগ দেওযায় কংগ্রেস সত্যই জাতীয় কংগ্রেসে পবিণত হয।

বোম্বাই-এব অধিবেশনে যে নটি প্রস্তাব গৃহীত হয় তাব অনেকগুলি ১৮৮৩-র ন্যাশনাল কনফারেন্সেও গৃহীত হযেছিল এবং তাবও আগে বিভিন্ন প্রাদেশিক সভাব অধিবেশনে ও পত্র-পত্রিকায আলোচিত হয়েছিল। প্রথমটিতে ভারতীয় প্রশাসন পর্যালোচনাব জন্য এক বাজকীয় কমিশন গঠনেব দাবি কবা হয়। দ্বিতীযটিতে ভাবত সচিবের কাউন্সিল বিলোপ। তৃতীযটিতে বর্তমান আইন সভায নির্বাচনেব ব্যবস্থা, উত্তব পশ্চিম প্রদেশ/অযোধ্যায এবং পঞ্জাবে আইন সভা প্রবর্তন ও সবকাবী কাজকর্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলাব দাবি জানানো হয। চতুর্থ প্রস্তাবে ছিল ভাবতে ও ইংল্যাণ্ডে একই সময়ে আই সি এস পবীক্ষা গ্রহণ ও প্রার্থীদেব বয়ঃসীমা বৃদ্ধিব দাবি। পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রস্তাবে সামবিক ব্যয হ্রাস চাওয়া হল। সপ্তমটিতে জানানো হয উত্তব ব্রহ্ম অধিকাবেব বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। অষ্টম প্রস্তাবে বলা হল কংগ্রেসেব আলোচ্য প্রস্তাবগুলি যেন বিভিন্ন জনসভায আলোচিত ও গৃহীত হবাব পব প্রাদেশিক বাজনৈতিক সভাব মাধ্যমে পাঠানো হয। শেষ প্রস্তাবে পববর্তী অধিবেশনেব স্থান ও কাল ঘোষণা কবা হয।

কেউই এগুলিকে বৈপ্লবিক আখ্যা দেবে না। বস্তুত দু দশক ধবে নবমপন্থী নেতাবা এধবনেব প্রস্তাবে ইংল্যাণ্ডেব পার্লামেণ্ট ও জনগণেব কাছে আমলাতন্ত্রেব বিরুদ্ধে আবেদন নিবেদন জানিযে যান। ১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত যে সব প্রস্তাব গৃহীত হযেছিল তা বিশ্লেষণ কবলে প্রথম পর্বেব কংগ্রেসের চবিত্র ও কর্মপদ্ধতি স্পষ্ট হযে উঠবে।

শাসন সংস্কারেব ব্যাপারে ভাবত সচিবেব কাউন্সিল লোপ কবাব প্রস্তাব প্রথম কংগ্রেসেই গৃহীত হযেছিল। ১৯০৫ সালে তাব সঙ্গে এক বিকল্প যোগ কবা হল—তিনজন ভাবতীযকে উক্ত কাউন্সিলেব সভ্য কবতে হবে এবং কমনস সভায প্রতি প্রদেশ থেকে দুজন কবে প্রতিনিধি নিতে হবে। বলা বাহুল্য দুটি প্রস্তাব কিছু পবস্পব-বিবোধী। ১৮৮৫, ১৮৯৩ ও ১৮৯৭ সালে ভাবতেব সর্বোচ্চ আইন পবিষদ ও প্রাদেশিক আইন পবিষদগুলিব সম্প্রসাবণ, তাদেব অন্তত অর্ধেক সদস্যেব নির্বাচন এবং উত্তব পশ্চিম অযোধ্যা প্রদেশ ও পঞ্জাবে আইন পবিষদ প্রবর্তনেব প্রস্তাব নেওযা হযেছিল। ১৯০৫-এ দাবি এল বডলাটেব শাসন পবিষদে দুজন ভাবতীয এবং বোম্বাই ও মাদ্রাজেব ছোটলাটের শাসন পবিষদে একজন কবে ভাবতীয সদস্য নিতে হবে। প্রথম কংগ্রেসে প্রস্তাব নেওযা হয প্রাদেশিক আইন পবিষদে বাৎসবিক ব্যযববাদ্দ পেশ কবতে হবে, প্রশ্ন তুলতে দিতে হবে এবং পবিষদের সংখ্যাগবিষ্ঠেব মত অগ্রাহ্য কবলে তাব বিরুদ্ধে কমনস সভাব এক স্থায়ী কমিটিব কাছে আবেদন জানানো চলবে। এত সব দাবি জানানোব পব ১৮৮৬ ও ১৮৮৯ সালে কংগ্রেস পবোক্ষ নির্বাচনেব নীতি মেনে নেয়। এই পবস্পববিবোধিতাব সুযোগ নিলেন ভাবত সচিব লর্ড ক্রস তাঁর ১৮৯২ সালেব শাসনসংস্কাব বিলে। ডাফবিন যে উদ্দেশ্যে ১৮৬১ সালেব শাসনতন্ত্রেব সংস্কার চেয়েছিলেন তা ক্রসকে লেখা ১৮৮৭ সালেব ২ মার্চের চিঠিতে সুস্পষ্ট। বৃত্তিজীবী মধ্যবিত্তদেব সংগঠিত ও সোচ্চার হতে দেখে তিনি অভিজাত ভূম্যধিকারী ও বাজাবাজডাব প্রতিনিধি বেশি নিযে একটা ভারসাম্য আনতে চেযেছিলেন।

সে জন্যই তিনি দ্বিস্তর পরিষদের প্রস্তাব দেন। ল্যান্সডাউন ক্রসকে আরেক চিঠি (১৮৮৯, ১লা জানুয়ারি)-তে জানান, তিনি কোন ভৌগোলিক অঞ্চলের বা জনসংখ্যার আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব চান না, তিনি চান বিভিন্ন "শ্রেণী ও টাইপের" প্রতিনিধিত্ব। ক্রস বা প্রধানমন্ত্রী সলসবেরি কেউই পরোক্ষ নির্বাচন চাননি।

১৮৯২-র সংস্কার অনুযায়ী ল্যান্সডাউন যে সব বিধি চালু করলেন তাতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের সভ্য সংখ্যা কিছু বাড়ানো হলেও গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রথা প্রবর্তিত হয়নি। মিউনিসিপ্যালিটি ও জেলা বোর্ড কর্তৃক প্রেরিত তালিকা থেকে সরকারই শেষ মনোনয়ন করতেন। সরকারী সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় থাকবে, পরিষদে বাজেট নিয়ে ভোটাভুটি হবে না, সভারা কোন প্রস্তাব আনতে বা সরকারী প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে পারবেন না এবং সর্বোপরি বড়লাটের যে কোন আইন বা রেগুলেশান করার ক্ষমতা থাকবে—এই সব অগণতান্ত্রিক প্রথাও চালু থাকল। অর্থাৎ আইন পরিষদের পরামর্শ দেওয়ার বেশি কোন অধিকার স্বীকৃত হয়নি। এমন কি স্বাধীন সত্তাও নয়। এভাবে কংগ্রেসের শাসন সংস্কার বিষয়ক বিভিন্ন প্রস্তাব নাকচ হয়ে গেল।

কংগ্রেসের দ্বিতীয় দাবি ছিল বিভিন্ন রাজকর্মে অধিকতর ভারতীয় নিয়োগ। প্রথম কংগ্রেসে বিলেত ও ভারতে একই সঙ্গে আই সি এস পরীক্ষার দাবি জানানো হয়, নিয়োগের সর্বোচ্চ বয়ঃসীমা ২৩ বছর করতে এবং স্ট্যাটুটারী সিভিল সার্ভিসের আইনকানুন আরো উদার করতে বলা হয়। সিভিল সার্ভিস কমিশন পরামর্শ দেন বয়ঃসীমা বাড়ানো হোক, স্ট্যাটুটারী সিভিল সার্ভিস তুলে দেওয়া হোক এবং ১০৮টি পদ, যা এতকাল সিভিলিয়ানদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, তা প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের সঙ্গে যোগ করা হোক। কিন্তু সব পদ প্রাদেশিক সার্ভিসে আসতে ঢের সময় লাগতো। ১৮৮৯ ও ১৮৯২-তে গোখলে এ ব্যাপারে তাঁর উষ্মা প্রকাশ করেন "আমাদের দেশের পদের জন্য দেশেই যদি পরীক্ষা নেওয়া না হয় তবে ন্যায় ও সাম্যের অর্থ কি জানি না।" নানা সমালোচনার ফলে কমনস্ সভা ১৮৯৩ সালের ২ জুন ভারত ও ব্রিটেনে একযোগে আই সি এস পরীক্ষার প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। কিন্তু ভারত সচিব কিম্বার্লি শাসনের জন্য ন্যূনতম য়ুরোপীয় কর্মচারীর প্রয়োজন অজুহাত দেখিয়ে তা কার্যকর করেননি।[২৫] ফলে ১৮৯৫ সালে কংগ্রেস প্রতিবাদ জানালো। কিন্তু এখনও তা সমূহ পদের এক তৃতীয়াংশের বেশি ভারতীয়দের জন্য সংরক্ষণের দাবি তুললো না। ওয়েলবি কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে গোখলে একে "moral drain" আখ্যা দিয়েছিলেন। ১৯০০ সালের কংগ্রেস পুলিশ, ডাক্তারী, পূর্ত, রেল, আফিম, শুল্ক ও অন্যান্য বিভাগে আরো ভারতীয় নেবার দাবি তোলে। সর্বাধিক পরিতাপের বিষয় শিক্ষাবিভাগে বহু যোগ্য ভারতীয় থাকা সত্ত্বেও বড়ো বড়ো কলেজের অধ্যক্ষ পদ ইংরেজদের জন্যই সংরক্ষিত ছিল। এর শিকার হন স্বয়ং জগদীশচন্দ্র বসু।

কংগ্রেসের সমালোচনার তৃতীয় বিষয় ছিল সামরিক ব্যয়বাহুল্য। ১৮৮৫-তে ১১০০০ নতুন ইংরেজ সৈন্য নিযুক্ত হলে তার প্রতিবাদ ওঠে। ভারতীয় সৈন্য নিয়োগ করলে ব্যয় সংকুলান হবে এমন যুক্তি দেখানো হয়। ১৮৯২-র অধিবেশনে বলা হয় সাম্রাজ্যের স্বার্থে ভারতীয় বাহিনী ব্যবহার করা হচ্ছে বলে সামরিক ব্যয়ের একটা অংশ ইংল্যাণ্ডের বহন করা উচিত। বঙ্কিম লিখেছিলেন, "ইংলণ্ডের গৌরবার্থ আবিসিনিয়ায় যুদ্ধ হইল, ব্যয়ের দায়ী ভারতবর্ষ।" এরকম বিভিন্ন সময়ে চীন থেকে ক্রিমিয়া, নিউজিল্যাণ্ড থেকে মাল্টা ভারতীয় বাহিনীকে ব্যবহার করা হয়েছিল। ১৮৯৫ সালের কংগ্রেস এলগিনের ব্যয়বহুল সীমান্তনীতি বিষয়ে আপত্তি তোলে। ১৮৮৬-তে ভারতীয় সৈন্য নিয়োগের সুপারিশ করা

হয়, পরের বছর অফিসার পদের জন্য। অফিসারদের প্রশিক্ষণদানের জন্য সামরিক কলেজ স্থাপনের প্রস্তাবও ওঠে। কিন্তু জেনারেল রবার্টস অসন্তুষ্ট বাঙালী ও মারাঠীর হাতে অস্ত্র সমর্পণ করতে রাজি হননি। কিম্বার্লির আপত্তিতে ভারতীয় অফিসার (মাত্র দুটি রেজিমেন্টে) নিয়োগের প্রস্তাব বাতিল হয়। তাদের রাজকীয় কমিশন দেবার প্রস্তাব এলগিনই নাকচ করে দেন। ভারতে গোখ্‌লে ও বিলেতে দাদাভাই এ নিয়ে অনেক আন্দোলন চালান। ওয়েলবি কমিশনের সামনে গোখ্‌লের সাক্ষ্য (১৮৯৭) স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কমিশন কিন্তু মূষিক প্রসব করে। ব্রিটেনের দেয় সামরিক ব্যয়ের অংশ ছিল নগণ্য। একথা কার্জনও স্বীকার করেছিলেন। টাকার বিনিময় হার হ্রাসের জন্য ব্রিটিশ কর্মচারীরা যা ক্ষতিপূরণ বাবদ পায় তা ঐ অর্থের চেয়ে ঢের বেশি।[২৪]

শেষ পর্যন্ত সমস্ত বিতর্ক কেন্দ্রীভূত হয় ঔপনিবেশিক শাসনের অর্থনৈতিক কুফলের ওপর। এতে অংশ নেন সব নরমপন্থী নেতা—বিশেষত: দাদাভাই, রমেশ দত্ত ও গোখলে। জন ডিকিনসন, মেজর ইভানস বেল, জন ব্রাইট প্রভৃতি কোম্পানীর সমালোচক ও ক্লিফ লেসলি, ফ্রেডরিক লিস্ট প্রভৃতি অর্থনীতিবিদদের প্রভাবে তাঁরা বলেন, ব্রিটিশ ক্লাসিকাল অর্থনীতি ভারতের ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশভাবে প্রয়োগ করতে গিয়ে দুর্দশা ডেকে আনা হয়েছে। এতে দেশের সম্পদ বাইরে চলে গেছে, দেশজ শিল্প ধ্বংস হয়েছে, ক্রমাগত দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে লক্ষ লক্ষ মৃত্যু ঘটেছে, রাজস্বের ক্রমবর্ধমান চাপে জনগণের দারিদ্র্য চরমে উঠেছে। বিদেশী রাজত্ব, সম্পদ নিষ্কাশন ও দারিদ্র্য এক সূত্রে গ্রথিত।[২৫] এ সম্বন্ধে যে প্রতিবাদ উঠেছে তা গ্রাহ্য নয়।[২৬]

১৮৭১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ইস্ট ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের সভায় দাদাভাই এক পরিসংখ্যান দাখিল করেন। তাতে পাই ভারতের বাৎসরিক জাতীয় আয় তিরিশ কোটি পাউণ্ড, রাজস্ব পাঁচ কোটি পাউণ্ড এবং সম্পদ-নিষ্কাশনের পরিমাণ এক কোটি কুড়ি লক্ষ পাউণ্ড। ডিগবির মতে ১৮৩৪ থেকে প্রতি বছর গড়ে তিন কোটি পাউণ্ড নিষ্কাশিত হয়েছে। দাদাভাই পরে দেখান, ভারতীয়দের গড় বার্ষিক আয় দাঁড়িয়েছে মাত্র কুড়ি টাকা। ১৯০১ সালে কার্জনও একে তিরিশ টাকার ওপর নিয়ে যেতে পারেননি। গোখলে দেখান ভারতের জাতীয় ঋণ ১৮৬২-১৮৭০-এর মধ্যে বেড়েছে ৭ কোটি ২০ লক্ষ টাকা, ১৮৭১-৮১'এর মধ্যে—৫০ কোটি টাকা ও ১৮৮১-৯৪'র মধ্যে ৭০ কোটি টাকা। তিনি ও রমেশচন্দ্র হোমচার্জ বাবদ পাউণ্ডে দেয় অর্থের পরিমাপ করেছিলেন। তাঁদের সিদ্ধান্ত ফাঁপানো মনে হলে আধুনিক জন ম্যাক্‌লেনের হিসাব—২৫ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা—মানতে আপত্তি না হওয়াই উচিত। এর জন্য দায়ী ছিল মাথাভারী প্রশাসনিক ব্যয়, অস্বাভাবিক সামরিক ব্যয় (সামগ্রিক ব্যয়ের ৩৫%), রেলওয়ের গ্যারান্টিকৃত লভ্যাংশ বাবদ ব্যয়, ঋণের সুদ বাবদ ব্যয়। ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার ও সিপাহী বিদ্রোহ দমনের জন্য যে খরচ হয়েছিল তার প্রতিটি পেনী জুগিয়েছে ভারত স্বয়ং।

প্রতিকারস্বরূপ নরমপন্থীরা চান (১) করভার কমাতে হবে, (২) ভারতকে শিল্পায়িত করতে হবে, (৩) অবাধ বাণিজ্যনীতি বর্জন করতে হবে। ১৮৮৭ সালের কংগ্রেসে আয়করের নিম্নতর সীমা ১০০০্ টাকা স্থির করার দাবি ওঠে, তাছাড়া বিলাতী কাপড়ের ওপর শুল্ক বসানোর দাবি। কিন্তু ব্রহ্ম যুদ্ধ, সীমান্ত যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, টাকার বিনিময় মূল্যের ক্রমাবনতি সরকারকে করভার বাড়াতে বাধ্য করল। ১৮৮৬ সালে আয়কর পুনঃপ্রবর্তিত হল, লবণের ওপর কর মন পিছু দু টাকা থেকে আড়াই টাকা করা হল। ১৮৯৪ সালে বিলাতী বস্ত্র ও সুতোর ওপর শুল্ক বৃদ্ধির সঙ্গে সমতা রাখার জন্য ভারতীয় মোটা সুতোর

উৎপাদনের ওপর কর ধার্য হল। কংগ্রেসের দীনশা ওয়াচার তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও ১৮৯৬ সালে বিলাতী ও দিশী কাপড়ের ওপর সমহারে শুল্ক বসল। 'ইংলিশ হিস্টরিক্যাল রিভু'র সাতাত্তরতম সংখ্যায় পিটার হারনেটি এ বিষয়ে বিশদ বিশ্লেষণ করেছেন।[২৭]

এ সময় টাকা ও পাউণ্ডের আনুপাতিক মূল্য নিয়ে বিতর্ক বাধে। ১৮৯৩ সালে সরকার কৃত্রিম উপায়ে টাকার মূল্য এক শিলিং চার পেন্স ধার্য করলে ওয়াচা তাকে '১৮৯৩-র অপরাধ' আখ্যা দিলেন। এর ফলে খাজনার ও সুদের আসল মূল্য বেড়ে গেল অথচ কৃষিপণ্যের প্রকৃতমূল্য গেল কমে। কৃষক (এবং ঋণী) কুলের প্রচণ্ড ক্ষতি হয়ে গেল। কংগ্রেস প্রতিবাদ করতে ভোলেনি।

এরপর মনে রাখতে হবে কংগ্রেস বস্ত্রশিল্পপতি ও কৃষকদের ব্যাপারে সমান সচেতন ছিল।

রাজস্বের সঙ্গে কৃষি ব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্বন্ধ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আমলাদের মতে ভারতীয় কৃষি জন স্টুয়ার্ট মিলের 'স্থাণুস্তর' উত্তীর্ণ হয়েছিল। কৃষিজমির পরিমাণ বেড়েছিল ৫০% থেকে ১০০%, সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হয়েছিল, কৃষির বাণিজীকরণ অনেক দূর এগিয়েছিল। এর ফলে জমিদার-চাষী ও খাতক-মহাজনের সম্পর্কের ক্রমাবনতি ঘটলেও সরকার তাকে অগ্রগতির অনিবার্য শর্ত মনে করতেন। সরকারের মনোভাব কিছুটা পিতৃসুলভ ছিল। দখলীদার রায়তদের কিছু সুবিধা তা দিয়েছিল এবং দাক্ষিণাত্যের প্রজাবিদ্রোহের পর সহজে ঋণ পাওয়ার ব্যবস্থাও করেছিল। কিন্তু কোনও সময় মৌল কৃষি ব্যবস্থা সম্বন্ধে গভীর চিন্তা করা হয়নি, টেম্পল ও স্ট্রেচির রচনায় তার ভূরি ভূরি প্রমাণ মেলে। টেম্পলের মতে জমিদারীর রাজনৈতিক মূল্য রয়েছে। তাছাড়া কৃষকদের বেশি সুবিধা দিলে কৃষিতে লগ্নী কমে যাবে। চাষীর হাত থেকে জমি হস্তান্তর বেড়ে যাচ্ছে জেনেও লী ওয়ার্নার তা সমর্থন করেন, কারণ এর ফলে "সঞ্চয়ী, পরিশ্রমী ও কৌশলী" ভূম্যধিকারীর উদয় হবে। সরকারের কাজ সুদের হার কমিয়ে রাখা ও আইনের সাহায্যে সাউকরদের সংযত রাখা।

১৮৯১ সালে কংগ্রেস রাজস্বের উচ্চহার, ত্রিশশালা বন্দোবস্ত, রাজস্ব আদায়ের কঠোর পদ্ধতির প্রতিবাদ জানায়। বিভিন্ন প্রস্তাবে বলা হয় যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিকাশ ও কৃষিলগ্নি ব্যাহত হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে ঋণ জোগাবার জন্য কৃষি ব্যাঙ্কের দাবি তোলা হয় (১৯০২)। 'বঙ্গদেশীয় কৃষক'-এ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অসাম্যের কারণ প্রতিপাদন করেন বঙ্কিমচন্দ্র "আমরা বলি যে এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমীদারের সহিত না হইয়া প্রজার সঙ্গে হওয়াই উচিত ছিল। তাহা হইলেই নির্দোষ হইত। তাহা না হওয়াতেই ভ্রমাত্মক, অন্যায় এবং অনিষ্টজনক হইয়াছে।" এর ফলে পরাণ মণ্ডলের কি দশা হয়েছে তা 'সাম্য' গ্রন্থে দেখি। রমেশচন্দ্র দত্তও তাঁর ১৮৭৩ সালের রচনায় এবং কার্জনকে লেখা চতুর্থ খোলা চিঠিতে কৃষকদের খাজনা চিরস্থায়ী করার পরামর্শ দেন। রানাডে প্রাসীয় ব্যবস্থা আমদানি করতে চেয়েছিলেন। তাতে অধিকাংশ চাষী ছোট কিন্তু স্বাধীন জোতের মালিকে পরিণত হত, যদিও যুঙ্কার (Junker) -এর মত কতিপয় বড় জমিদারও থাকত। জি ভি যোশী রায়তওয়ারি এলাকায় তা চাননি। মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও ১৮৮৯ ও ১৯০২ সালে কংগ্রেস ভারত সচিবের শর্তে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রসার দাবি করে। রমেশচন্দ্রের খোলা চিঠির জবাবে (১৮ জানুয়ারি, ১৯০২) কার্জন তাঁর সব যুক্তি নস্যাৎ করে দিলেন।

কৃষির উন্নতির সঙ্গে কুটির শিল্প যুক্ত করে দেখেছিল কংগ্রেস। ১৮৮৭-তে আধুনিক কৃৎকৌশলে শিক্ষাদান দাবি করা হয়। ১৮৯৮ সালে জাপানী আদর্শে শিল্প স্থাপনের প্রস্তাব

নেওয়া হয। ১৯০১ থেকে প্রতি বছর কংগ্রেস অধিবেশনের সঙ্গে স্বদেশী শিল্প প্রদর্শনী বসত। ১৮৯১-তে লালা মুরলীধর বিলাতী বিলাসদ্রব্য বর্জনেব এবং ১৮৯৮-তে মদনমোহন মালব্য দেশী শিল্পদ্রব্য ব্যবহাবের আহ্বান জানান। আমরা বঙ্গভঙ্গের পূর্বেই স্বদেশী ও বয়কটেব মৃদু মেঘমন্দ্র শুনি।

নেতাবা অধিকাংশই আইনজীবী ছিলেন বলে স্বভাবতই আইন ও বিচার বিষযক সমস্যা কংগ্রেসের আলোচ্য ছিল। ১৮৯২ সালে জুবী নোটিফিকেশনেব বিরুদ্ধে তাঁরা সোচ্চার হন। শেষে জজ প্রিন্‌সেপেব নেতৃত্বে স্পেশ্যাল কমিশনেব প্রতিবেদনের ফলে উক্ত নোটিফিটেশন প্রত্যাহৃত হয় এবং বাংলাব সাতটি জেলায় আগে যে সব ফৌজদাবী মামলাব জুবী বিচাব হত সে ব্যবস্থা অপবিবর্তিত থাকে। ১৮৮৬-তে কংগ্রেস প্রশাসন ও বিচাববিভাগেব পৃথকীকবণ দাবি করে। পুণাব প্লেগ অফিসাব ব্যাণ্ড ও আযার্স্টেব হত্যাব পর সরকাব যখন বাংলা (১৮১৮), মাদ্রাজ (১৮১৯) ও বোম্বাই (১৮২৭)-এব বহুদিন অব্যবহৃত বেগুলেশন আইন পুনঃ চালু করল এবং হত্যাকাবী চাপেকাবদেব পৃষ্ঠপোষক সন্দেহক্রমে নাটু ভ্রাতৃদ্বযকে দেশান্তবে পাঠাল, কংগ্রেস (১৮৯৭) তখন তাব তীব্র প্রতিবাদ জানায। মানবিক অধিকার লঙ্ঘনেব বিরুদ্ধে সেদিন শুধু সুবেন্দ্রনাথেব কম্বুকণ্ঠই শোনা যাযনি, ববীন্দ্রনাথেব মধুবকণ্ঠও তীক্ষ্ণতব হয়েছিল। সিডিশন বিল পাশ হবাব আগেব দিন টাউন হলে তিনি পডেছিলেন 'কণ্ঠরোধ'।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ১৮৫৯ সালে যে অতিসীমিত আবেদন জানিয়েছিল তাব থেকে অনেক দূব এগোলেও কংগ্রেসেব প্রতিবাদেব সুব ও আন্দোলনেব পদ্ধতি বেশি এগোয়নি। চরমপন্থীরা একে "ভিক্ষুকেব বাজনীতি" বলে ব্যঙ্গ কবাব আগেই বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তেব মুখ দিযে বলেছিলেন "জয বাধে কৃষ্ণ। ভিক্ষা দাও গো'। ইহাই তাহাদেব পলিটিকস্।" এ ধবনেব সাবমেয সুলভ "আবেদন নিবেদন প্রতিবেদনেব" স্থলে তিনি দেখতে চেয়েছিলেন "বৃয জাতীয়" পলিটিকস।

কংগ্রেসেব মঞ্চে ও কাউন্সিলকক্ষে নবমপন্থীবা যে দ্ব্যর্থহীন ভাষায সাম্রাজ্যবাদেব অর্থনৈতিক শোষণেব দিক তুলে ধবেছিলেন তা শুধু চবমপন্থী নয গান্ধীবাদীদেব চিন্তাধাবাব অচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁডায। তবু তাদেব দুর্বলতা ছিল যথেষ্ট। প্রথম দুর্বলতা আভ্যন্তবীণ। কলকাতা কংগ্রেস (১৯০৬) পযন্ত বোম্বাই গোষ্ঠীব ফিবোজশা মেহ্‌তা ও দীনশা ওযাচাব কঠিন হস্তে কংগ্রেসের কর্তৃত্ব ন্যস্ত ছিল। বাংলার সুবেন্দ্রনাথ ও মাদ্রাজের আনন্দ চার্লুব সঙ্গে সমঝোতা করে তাঁরা আপন প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ বেখেছিলেন। দাদাভাই-এব কাছে লেখা (৪ নভেম্বর ১৮৮৪) চিঠিতে ওযাচা ও মেহ্‌তার দাম্ভিক ব্যবহাবের প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। ১৮৯৯ সালে কংগ্রেসের শাসনতন্ত্র রচিত হলেও তা কার্যে পবিণত হযনি। ফিবোজ শা শুধু ওয়াচার সঙ্গে গোখ্‌লেকে যুগ্মসচিব নিযুক্ত কবেছিলেন। মাদ্রাজ কংগ্রেসে (১৯০৩) মেহ্‌তার আপত্তিতে নতুন শাসনতন্ত্রেব প্রস্তাব পিছিযে দেওযা হয। ম্যাকলেন এব মধ্যে ব্রাহ্মণ্য, ইংরাজী শিক্ষা ও সম্পদগর্বের সঙ্গে জনগণ সম্বন্ধে ভীতিও লক্ষ্য কবেছেন।[২৮] বস্তুত তখনকাব (এমনকি আজও) বাজনীতি ছিল শক্তিমান ব্যক্তিত্ব-কেন্দ্রিক। তিলকের চারদিকে ও গোখলেব চাবদিকে যেমন পুণায আলাদা বৃত্ত গডে উঠেছিল তেমনি আলাদা বৃত্ত বোম্বাইতে মেহ্‌তা-ওয়াচাকে ঘিরে, বাংলায় সুরেন্দ্রনাথ-ভূপেন বসুকে কেন্দ্র করে, ইত্যাদি। অরবিন্দ এজন্যই ঠাট্টা কবে বলেছিলেন "ব্যানার্জী, বনার্জী ও লাল মোহন ঘোষদের বিজাতীয় কংগ্রেস"। গর্ডন জনসন এর পশ্চাতে অনুচরদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও পারস্পরিক বিদ্বেষ বা ভীতিব খেলা দেখেছেন (যা আজও সত্য)।[২৯] কংগ্রেসের প্রকৃত

ঐক্য যে প্রাদেশিক ও গোষ্ঠী স্বার্থ বিসর্জনে এবং সামগ্রিক স্বার্থানুসরণে এ বোধ জন্মাতে অনেক দেরি হয়েছে। আজও কি হয়েছে?

ঐতিহ্যপন্থী, ইংরেজী শিক্ষাবঞ্চিত (কিন্তু দেশী ভাষায় শিক্ষিত) জনগণের এক বৃহদাংশকে কংগ্রেসের সামিল করে বাল গঙ্গাধর তিলক রানাডে-মেহ্‌তা-গোখলের বজ্রমুষ্টি শিথিল করার চেষ্টা করলেন। একদিক দিয়ে এটা পুণা ও বোম্বাই-এর মধ্যে কর্তৃত্বের লড়াই, অন্যদিকে গণতান্ত্রিক কংগ্রেসের জন্য লড়াই। এর কেন্দ্র হল রানাডের সমাজ সংস্কার স্পৃহা। রানাডে সমাজ সংস্কারকে রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিপূরক তথা অচ্ছেদ্য অঙ্গ মনে করতেন। তাই প্রতি বছর কংগ্রেস অধিবেশনের পরপর তাঁর ন্যাশনাল সোস্যাল কনফারেন্সের অধিবেশন বসত। তিলক নিজে যে কট্টর প্রাচীনপন্থী ছিলেন তা নয়, কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও সমাজ সংস্কার মিশিয়ে ফেললে গোঁড়া রক্ষণশীলরা (এবং তারা সমাজের একটা বড় অংশ) কংগ্রেস পরিহার করবে এবং তাতে আন্দোলন অযথা শক্তি হারাবে এমন আশঙ্কা তাঁর ছিল। তাছাড়া বিদেশী রাজশক্তিকে আইনের মাধ্যমে ওপর থেকে সমাজসংস্কার চাপিয়ে দিতে দিলে তাকে দৃঢ়তর করা হবে। যাইহোক, রানাডের দল ১৮৯১ সালে সহবাসবিষয়ক আইনকে সমর্থন জানালে তিলক সংস্কারক ('সুধারক')-দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন ও বহু পুরাতনপন্থী, দেশীয় ভাষায় শিক্ষিত, এমনকি অশিক্ষিত লোকের সমর্থন পেলেন। সমর্থনের ভিত্তি সম্প্রসারিত করার জন্য তিনি ১৮৯৩ সালে মহাসমারোহে গণপতি পূজার আয়োজন করেন ও ১৮৯৬ সালে 'শিবাজী উৎসব' প্রবর্তন করেন। ১৮৯৫ সালে পুণায় কংগ্রেস বসলে চাপেকরদের মত উগ্র তরুণদের সাহায্যে তিনি ন্যাশনাল কনফারেন্স বন্ধ করে দিলেন।[৩০]

দ্বিতীয় দুর্বলতা ছিল মুসলিমদের কংগ্রেস বর্জন। প্রথম যুগের নেতাদের ধর্মনিরপেক্ষতা অতীব প্রশংসার্হ। বদরুদ্দিন তায়েবজির অনজুমান গঠনে ও আইন পরিষদে রহমৎউল্লা সায়ানির নির্বাচনে হিন্দু ও পার্শীরা প্রভূত সাহায্য করেছিল। কিন্তু তাদের সর্বৈব চেষ্টা মুসলিম সম্প্রদায়কে কংগ্রেসের পতাকাতলে আনতে পারেনি। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে স্যার সৈয়দ আহমেদ মুসলিম রাজনীতিকে ব্রিটিশ সহযোগীর ভূমিকায় দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেছিলেন। নানা মুসলিম এডুকেশন কনফারেন্সে বক্তৃতায়, এডুকেশন কমিশনের সামনে সাক্ষ্যদান ও আইন পরিষদের বিতর্কে (বিশেষত উত্তরপ্রদেশ স্বায়ত্তশাসন বিষয়ক আইনের ওপর বিতর্কে) অগ্রসর ও সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমাজের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া অসম্ভব এই যুক্তিতে স্যার সৈয়দ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা, কংগ্রেসের মত গণপ্রতিষ্ঠান বা কোন নির্বাচনমূলক শাসনসংস্কার সযত্নে পরিহার করতে বলেছিলেন মুসলিমদের। এমন কি তাঁরই মুখে প্রথমে দ্বিজাতিতত্ত্বের স্পষ্ট উল্লেখ পাই। ১৮৮৮ সালের এলাহাবাদ কংগ্রেসে মুসলিম প্রতিনিধির সংখ্যা ২২২ হলেও, ছোটলাট কলভিনের ভাষায়, কোন সম্ভ্রান্ত বা সম্পন্ন মুসলিম তার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তায়েবজি যখন স্যার সৈয়দকে কংগ্রেসের ভেতরে থেকে মুসলিম স্বার্থরক্ষা করতে আহ্বান জানালেন, সৈয়দ তার উত্তরে (২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৮) লিখলেন, "এই অন্যায়ভাবে নামিত জাতীয় কংগ্রেস কেবল আমাদের সম্প্রদায়ের পক্ষেই ক্ষতিকর নয়, সমগ্র ভারতের পক্ষে ক্ষতিকর। ভারতকে এক জাতি মনে করে এমন যে কোন ধরনের কংগ্রেসে আমার আপত্তি রয়েছে।" কংগ্রেসের প্রতিটি প্রস্তাবই মুসলিমদের পক্ষে ক্ষতিকর মনে করতেন তিনি, এমনকি কংগ্রেসপ্রভাব ক্ষুণ্ণ করার জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে চরও পাঠিয়েছিলেন।[৩১]

পরে আমরা দেখব তিলক, লাজপৎ রায়, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ নেতা হিন্দু-সংহতির জন্য

হিন্দু ধর্ম ও ঐতিহ্যকে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতাবাদে ইন্ধন জুগিয়েছিলেন। কিন্তু বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্ম তাঁরা দেননি। বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আরও ভিত্তিহীন। দয়ানন্দ স্বামীর ভাবধারা ও কার্যকলাপে সাম্প্রদায়িকতার ছোঁয়া লেগেছে, কিন্তু তাব অনেকটাই স্যার সৈয়দেব প্রতিক্রিয়া।

নবমপন্থীদের তৃতীয় দুর্বলতা ছিল ঔপনিবেশিক শোষণ বিষয়ে সজাগ হলেও চরম দাবিদ্র্যে নিপীড়িত, জাতপাতের জটিল সংস্কারে আবদ্ধ, অশিক্ষায় অন্ধ জনসাধারণ সম্বন্ধে তাঁরা কোনো সুষ্ঠু নীতি গ্রহণ করতে পারেননি। কৃষকদের সমস্যা সমাধান রানাডের পথে হত না। বমেশচন্দ্রের কল্পনা চিবস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রয়োজনীয় সংস্কারেব বেশি এগোয়নি। একই সঙ্গে বড়ো জমিদার ও দখলদারী রায়তকে খুশি রাখতে তাঁরা চেযেছিলেন—ইংবেজদের মতই। শুধু তিক্ত ভেষজকে কৃষি ব্যাঙ্ক, কুটির শিল্প ইত্যাদি মধুব অনুপান দিযে গ্রহণীয কবতে চেয়েছিলেন তাঁরা। পার্থ চ্যাটার্জি Bengal 1920-1947 The Land Question গ্রন্থে দেখাচ্ছেন এই দ্বন্দ্ব, দ্বিধা, অক্ষমতা বাংলাব কংগ্রেসকে কতো দুর্বল কবেছিল এবং শেষে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির জালে জড়িয়ে ফেলেছিল। কি করে যে রানাডে ইংরেজদেব কাছে দেশী শিল্পের সংবক্ষণ আশা করতেন তা বোঝা শক্ত। পবাধীন ভারত বিসমার্কেব জার্মেনীর মত শুল্ক নীতি নিতে পারে না একথা তিলক মুহূর্তেই বুঝেছিলেন। তাই বিদেশী বর্জন ও স্বদেশী গ্রহণ শেষ পর্যন্ত স্বরাজেব দাবিতে পবিণত হয।

১৮৮৫-১৯০৫-র মধ্যে উত্থাপিত সব কিছু দাবি যখন নাকচ হল বা অতি খণ্ডিতাকাবে গৃহীত হল তখন নরমপন্থীদেব বাজনৈতিক আদর্শ ও পদ্ধতি দুর্বল হযে পডল। তাব ভিত্তি ছিল ব্রিটিশ উদাবতন্ত্রে দুর্মর বিশ্বাস। কিন্তু কংগ্রেসের ব্রিটিশ কমিটি (১৮৮৯—) ও ভারতীয পার্লামেন্টারী কমিটি (১৮৯৩—) শত চেষ্টা সত্ত্বেও ইংল্যাণ্ডেব জনচিত্তে সাড়া জাগাতে পারেননি।

তাব একটা বড়ো কাবণ ভাবতেব জনচিত্তে কংগ্রেসের শিথিল মূল। ১৮৯৯ সালের আগে কংগ্রেসেব কোন গঠনতন্ত্র রচিত হয়নি। বিচিত্র ধরনের স্থানীয় দল থেকে প্রতিনিধি নির্বাচিত হত! অনেক সময প্রতিনিধিবা স্বনির্বাচিত হতেন। স্থানীয় কমিটি হয় নেই, না হয় অস্থায়ী। যেখানে বাৎসবিক অধিবেশন বসার কথা সেখানকাব কমিটিই আয়োজন কবত। কোন নিয়মিত আযের ব্যবস্থা ছিল না। এর ফলে কংগ্রেসেব বাৎসরিক সভায উপস্থিতির হাব ক্রমশ কমে যাচ্ছিল। ১৮৯৬ থেকে কমতে কমতে ১৯০২ (আমেদাবাদ)-এ তা দাঁড়ালো মাত্র ৪৭১-এ। লাজপৎ বায় ১৮৯৩ থেকে ১৯০০ কোন অধিবেশনে যোগ দেননি। ১৮৯৭ (অমরাবতী)-র অধিবেশন শেষে অশ্বিনী দত্ত কংগ্রেসকে "তিনদিনেব তামাশা" আখ্যা দিযেছিলেন। 'কেশরী'তে এর প্রতিধ্বনি শুনি ১৯০৩ সালে। তিলক বাবংবাব নতুন গঠনতন্ত্র দাবি করছিলেন। তাতে উত্যক্ত হয়ে দাদাভাই তাঁকে মৃদু তিবস্কাব করে বলেন, "কংগ্রেস ভেঙে গেলে লাভ হবে ইঙ্গ-ভারতীয়দের।" বোম্বাই (১৯০৪) অধিবেশনে মেহ্তাব প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও তিলকের দাবি বিষয় নির্বাচনী কমিটি মেনে নেয়। এসব তথ্য বডলাটের অজ্ঞাত ছিল না। ১৯০০ সালের ১৮ নভেম্বর কার্জন ভারতসচিব হ্যামিলটনকে লেখেন, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস কংগ্রেস ভেঙে পড়ছে এবং ভারতে থাকাকালীন আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা হবে তার শান্তিপূর্ণ মরণে সাহায্য করা।"[৩২]

॥ ৪ ॥

কংগ্রেসের মধ্যে নরমপন্থী চিন্তাধারার প্রতিবাদ উনিশ শতকের শেষ দু'দশক ধরে শোনা যাচ্ছিল। এর সবটাই যে রাজনৈতিক কারণে তা নয়। সিপাহী বিদ্রোহের পর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক সম্পর্কে একটা বড়ো পরিবর্তন লক্ষিত হচ্ছিল। এখন আমরা কারণ খুঁজতে সাংস্কৃতিক ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দেব। প্রথম দিকের নেতারা শুধু দ্বিভাষী ছিলেন না, ছিলেন দুই সংস্কৃতির সন্তান। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ও হিন্দু ধর্মের মহিমা সম্বন্ধে রামমোহন থেকে অরবিন্দ ভালোভাবেই সচেতন ছিলেন। পশ্চিমের প্রাচ্যবাদী (Orientalist) পণ্ডিতদের প্রাচ্য বিষয়ক ধারণা বা প্রাচ্য-প্রতীচ্যের দ্বন্দ্বের তত্ত্ব তাঁরা সম্পূর্ণ মেনে নিয়েছিলেন এবং নিজেদের ভাবনা সেই ছকে গড়ে তুলেছিলেন এডওয়ার্ড সেডের (Said) এহেন উক্তি মানা যায় না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের গবেষণার বিষয় ছিলেন বলে তাঁরা "non-active, non-autonomous, non-sovereign to itself" হয়ে যাননি। তার প্রধান কারণ, ভারতীয় সংস্কৃতির গভীরে প্রবেশ করার জন্য তাঁদের ওরিয়েন্টালিস্ট পণ্ডিতদের দ্বারস্থ হতে হয়নি। ইংরেজ অধিকারের পূর্বে ভারতের বহু স্থানে (যেমন বারাণসী, পুণা, উৎকল, মাদ্রাজ ও কেরল) সংস্কৃত পঠনপাঠনের ধারা অব্যাহত ছিল। বাংলায় বেদান্ত চর্চা লুপ্ত হলেও রামমোহন কাশী থেকে তা শিখে আসেন। ডেভিড কফের নানা যুক্তি সত্ত্বেও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ বা এশিয়াটিক সোসাইটিব ভূমিকা অযথা বাড়িয়ে দেখা ঠিক হবে না। দয়ানন্দ কি বেদাভ্যাস করেছিলেন ম্যাক্সম্যুলরের টোলে ? বিবেকানন্দ কি উপনিষদ পড়েছিলেন ডয়সেন সাহেবের পদতলে ? তাঁর পত্রাবলীতে দেখি কি কঠোর অধ্যাবসায়ে পাণিনি, ও পতঞ্জলি তিনি অধ্যয়ন করছেন শাস্ত্রের মর্মে প্রবেশ করতে। তাছাড়া তো ছিল রামকৃষ্ণের মত মহাপুরুষের উপলব্ধির প্রেবণা। সংস্কৃতে প্রায় স্বয়ং শিক্ষিত বঙ্কিমচন্দ্র সাহেব প্রাচ্যবিদদের বহু গবেষণা নির্মমভাবে ব্যঙ্গ করেছেন কৃষ্ণচরিত্র, লোকরহস্য, কমলাকান্তের দপ্তরে।

কিন্তু এহ বাহ্য। তাঁদের উদ্দেশ্যও ছিল ভিন্ন। সাহেবদেব ওরিয়েন্টালিজম "a kind of Western projection on to and will to govern the Orient" বা বেনা থেকে মার্ক্স, লেন থেকে সেসি, ফ্লবের থেকে নার্ভাল "saw the Orient as a locale requiring Western attention, reconstruction, even redemption"—সেডের এ উক্তি যথার্থ হতে পারে, কিন্তু ভারতীয় শ্রেষ্ঠ প্রাচ্যবিদদের পক্ষে তা খাটে না। তা মধ্যযুগীয় শাস্ত্র চর্চা থেকে গুণগতভাবে পৃথক ছিল। রামমোহনের ও বিবেকানন্দের বেদান্ত চর্চা নিছক নব্য-ন্যায়ের কচকচি বা ব্যক্তিগত মোক্ষ সাধনের পন্থা ছিল না। উপনিষদের মধ্যে তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন ভারতের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য। তার উৎসমুখ থেকে মৃতসঞ্জীবনী আহরণ করে ব্যক্তি ও সমাজকে উজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন তাঁরা। তেমনি বঙ্কিমচন্দ্র মহাভারত, গীতা ও ভাগবত থেকে পুরুষোত্তম (superman) শ্রীকৃষ্ণের জীবনাদর্শ আহরণ করেছিলেন নতুন যুগের আদর্শ নির্দেশ কবতে।

এখানেই তাঁদের সঙ্গে রেনেশাঁসের মানববাদীদেব মিল। পেত্রার্কা বা ব্রুনি বা অ্যালবের্তি প্রাচীন গ্রীস ও রোমের অন্ধ অনুকরণ(imitation) করতে চাননি। তাঁরা ক্ল্যাসিক্যাল সংস্কৃতির সাহায্যে জীবন ও পৃথিবী সম্বন্ধে প্রথাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গির মৌল রূপান্তব ঘটাতে চেয়েছিলেন। ডাচ পণ্ডিত হুইজিঙ্গার ভাষায়, "Europe, after having lived in

the shadow of antiquity, lived in its sunshine once more." মধ্য যুগ ক্ল্যাসিক শিল্প বা সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত ছিল না তা নয়, কিন্তু তার কাছে ক্ল্যাসিক অতীত ছিল একটা বাহ্য অলঙ্কার মাত্র। রেনেশাঁসের কাছে তা হল জীবন ও সৃষ্টির নতুন শৈলী—ভাসারির ভাষায়, maniera. মধ্যযুগের অনুভূতি মানবিক বা ঐহিক ছিল না বললে ভুল হবে, তবে তার প্রেরণা যে কেন্দ্র থেকে আসত তা নগর-রাষ্ট্র বা ইন্দ্রিয় পরবশ মানুষ নয়—স্বয়ং ঈশ্বর। শিল্প সমালোচক প্যানোফ্স্কি দেখাচ্ছেন ক্ল্যাসিকসের "অপরাজেয় সূর্যের" প্রতীক অ্যাপোলো মধ্যযুগে. "ন্যায়ধর্মের সূর্যের" প্রতীক খ্রীস্টে রূপান্তরিত হয়েছিলেন । রেনেশাঁসের মানববাদীরা এভাবে সব সাধনাকে এক পারমার্থিক সাধনার অঙ্গমাত্র মনে করতেন না, প্রত্যেক বিদ্যাকে তাব আপন গুরুত্বের জন্যই চর্চা করতেন।

রেনেশাঁসের সংস্কৃতি ধর্মনিরপেক্ষ বা নাস্তিক মনে করা বুর্খহার্টের পক্ষে ভুল হয়েছিল। এডগার উইনড (Edgar Wind) তাঁর Pagan Mysteries in the Renaissance গ্রন্থে লিখছেন, "রেনেশাঁস শিল্প এমন অনেক ভিনাসের মূর্তি তৈরি করে যাতে মাদোনা ও মডলেনের আদল স্পষ্ট।" উইটকোয়াব (Witkower) Architectural Principles in the Age of Humanism গ্রন্থে লিখছেন. "খ্রীস্টকে আগে ক্রুশবিদ্ধ মানবত্রাতা রূপে দেখা হোত, এখন দেখা হল সঙ্গতির সর্বাঙ্গসুন্দর প্রতীকরূপে।" প্যানোফস্কি Meaning in the Visual Arts গ্রন্থে দেখাচ্ছেন, ড্যুরার অ্যাপোলোকে অ্যাডামে এবং অ্যাডামকে খ্রীস্টে রূপান্তবিত কবেছিলেন। নিও-প্লেটোনিক ভাবধাবা মিকেলেঞ্জোলোর ভাস্কর্য ও চিত্রকলাকে কিভাবে প্রভাবিত কবেছিল তাব কথা অজানা নয়। জড থেকে অধ্যাত্মস্তরে উত্তবণের আকুতি সিসটাইন চ্যাপেলের ছাদ জোড়া,পূজা-বেদী জোড়া ফ্রেস্কোতে ঈভের সৃষ্টি থেকে কুমাবীমাতাব সৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে।

আব এক জায়গায বেনেশাঁস ও মধ্যযুগেব পার্থক্য ছিল—তা একাধাবে অতীতেব পুনরুদ্ধার ও প্রকৃতির আবিষ্কাব। লেওনার্দো দা ভিঞ্চি ক্লাসিক্যাল শিল্প বা শিল্পশাস্ত্র থেকে তাঁর আদর্শ নেননি শুধু, তিনি বৈজ্ঞানিকেব আগ্রহ. নিষ্ঠা ও নৈর্ব্যক্তিকতা নিযে প্রকৃতিব অন্তবে প্রবেশ করতে চেয়েছিলেন। উইনডসব প্রাসাদে বাজকীয সংগ্রহশালায তাঁর যে অমূল্য ড্রইংগুলি রয়েছে তা দেখলে মনে হয স্বযং প্রকৃতি যেন তাঁব অন্তর্বাস স্তরেব পব স্তব অনাবৃত কবছেন লেওনার্দোব বিমুগ্ধ চোখের সামনে। অথচ যখন তিনি 'শেষ ভোজনেব' প্যানেল আঁকছেন যেন শাবীবিক বাস্তবের সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক বাস্তব মিশে গেছে, আব সব ব্যাপ্ত করে বিবাজ কবছে এক মিস্টিক অনুভূতি।

অতীত ও বর্তমানেব, আধ্যাত্মিক ও ইহলৌকিকেব সেতুবন্ধন শ্রেষ্ঠ ভাবতীয চিন্তাব মধ্যেও লক্ষণীয়। অর্থ ও পরমার্থ, মানব ও ঈশ্বব, ব্যক্তি ও সমাজ, বহিঃ ও অন্তঃপ্রকৃতি উভয় কোটিকে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন তাঁবা ভাবতেব স্বকীয সমন্বয়ী প্রতিভা দিয়ে। প্রায় এক শতাব্দী ধবে বাংলার শ্রেষ্ঠ মনীষীদের উপনিষদ নিযে ভাবনাব একটা সমাজতাত্ত্বিক কারণ ছিল। বামমোহনে এব সূত্রপাত, বিবেকানন্দে পবিণতি। কিন্তু তাঁবা উপনিষদ বা বেদান্ত সূত্র পড়েছেন শঙ্কব-ভাষ্যেব ঠুলিতে চোখ বেঁধে নয়, বাইবেব পৃথিবী. যুগের প্রয়োজন, সব দিকে নজব বেখে।

পথিকৃৎ বলে বামমোহনেব কাছে নির্গুণ, নিবাকাব ব্রহ্মোপাসনাই সত্যধর্ম বলে মনে হয়েছিল। মূর্তিপূজা, অবতাববাদ, পুবোহিতেব শাসন, লোকাচাব তাঁর কাছে শুধু যুক্তিবিরুদ্ধ নয়, সাধারণ বুদ্ধিবিরুদ্ধ, বলে প্রতীযমান হযেছিল। নিবাকার নির্গুণ ব্রহ্মেব শাস্ত্রীয় প্রমাণ তিনি সংগ্রহ কবেছিলেন অদ্বৈতপন্থী উপনিষদগুলি থেকে। যজুর্বেদ বলেছেন, তাঁব

প্রতিমা নেই। মাণ্ডুক্য বলছেন, তিনি অচিন্ত্য, শুধু 'একাত্ম প্রত্যয়সার'। কঠ বলছেন, বাক্য, মন, চক্ষুব অগোচর তিনি। কি করে তা হলে মূর্তির মধ্যে তাঁকে ধরবো ? কেন উপনিষৎ বলছেন, "নেদম্ যদিদমুপাসতে"—যা পূজা করছ তা ব্রহ্ম নয়। রামমোহন তাই বৃহদারণ্যকের মহাবাক্য 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' অনুসরণ করে স্থির করেছিলেন—আত্মোপাসনাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা।

এ সব কথা মুষ্টিমেয় জ্ঞানমার্গী সাধকের পক্ষে প্রযোজ্য হলেও বিপুল জনসাধারণের পক্ষে অনধিগম্য। রামমোহন অধিকারীভেদ স্বীকার করতেন না বলে মনে হয়। কিন্তু তা অতি বাস্তব সত্য। নির্গুণ নিরাকারের ধ্যান কি দুরূহ গীতায় তা বারবার বলা হয়েছে। রামকৃষ্ণ দেখালেন, মূর্তিপূজা কেবল দুর্বলাধিকারীর আশ্রয় নয়, জ্ঞানমার্গীর পক্ষেও চিত্তশুদ্ধির সোপান। "যতক্ষণ দেহাত্মবোধ, আমি, তুমি বোধ আছে, ঈশ্বরকে ব্যক্তি বলে বোধ আছে, ততক্ষণ সগুণ ব্রহ্মকে মানতে হবে।" নির্গুণ ও সগুণ নিত্য ও লীলার খেলা—"নিত্য ধরে লীলা, আবার লীলা ধরে নিত্য।" সাধনার বিভিন্ন স্তরে কখনো দ্বৈত, কখনো অদ্বৈতেব প্রয়োজন হয়। ব্রহ্ম অবাঙ্মনসগোচর বলেই তাঁর স্বরূপ নিয়ে কলহ। একবার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হলে সব সংশয় ছিন্ন হয়ে যায়। ভক্তিবাদীর চোখে এই তো রাধা ও কৃষ্ণের বিরহ-মিলনকথা। রবীন্দ্রনাথ মূর্তিপূজার বিরোধী হলেও সীমা ও অসীমের বহস্যের কথা বাববার বলেছেন। গোরার সেই অনবদ্য উক্তি মনে পড়ে, "আকারের রহস্য কে ভেদ করতে পেরেছে ?"

বিবেকানন্দ উপনিষদ থেকেই গুরুর সমন্বয় সিদ্ধান্ত আরও বিশদ কবেছিলেন। ছান্দোগ্য বলছেন, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। ঈশা শুরুই করেছেন, 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম'। কঠ বলেছেন, ব্রহ্ম 'রূপম্ রূপম্ প্রতিরূপম্ বভূব'। বৃহদারণ্যক নেতি নেতি করেও স্বীকাব কবেছেন 'দ্বোবাব ব্রহ্মণো রূপ মূর্তঞ্চ বামূর্তঞ্চ।' ব্রহ্ম সৃষ্টিতে অনুস্যূত, ক্ষুর যেমন ক্ষুরাধারে। তিনি ও সৃষ্টি ওতপ্রোত—"এতস্মিন নু খল্বাক্ষরে গার্গি, আকাশ ওতশ্চপ্রোতশ্চ।" জীব ও জগৎ ব্রহ্মরূপ উর্ণনাভের ঊর্ণা, ব্রহ্মরূপ অগ্নিব স্ফুলিঙ্গ। তাই ঋকবেদ ব্রহ্মকে সহস্র শীর্ষ সহস্র চক্ষু, সহস্রপাৎরূপে দেখেছিলেন। শিব ও জীবেব স্বরূপত কোন পার্থক্য নেই।

বামমোহন থেকে বিবেকানন্দ পর্যন্ত উপনিষদ পাঠ থেকে কি শিখলেন ঊনবিংশ শতাব্দীব মনীষীরা ? শিখলেন, কোন কিছুই অবাস্তব নয়, সবই সেই পরমবস্তুর প্রকাশ বলে বাস্তব। মায়া শঙ্করকথিত অবিদ্যা নয়, ঈশ্বরের অনির্বচনীয় সৃষ্টিশক্তি। ঈশ্বর 'আনন্দরূপমমৃতম্', তাই জগতের আনন্দ যজ্ঞে আমাদেব সকলের নিমন্ত্রণ। তিনি অনন্ত জ্ঞান, তাই নানা পথে, এমনকি যুক্তি ও পরীক্ষাব পথে, তাঁকে খুঁজতে হবে। বিজ্ঞান ও যোগ প্রতিবাদী নয়, পরিপূরক। তিনি অরূপ হয়েও রূপে রূপে প্রতি রূপে বিভাসিত—তা হলে জাতি, বর্ণ, দেশ নিয়ে বিতর্কের বা বিবোধের অবকাশ কোথায় ? মানুষ বিত্ত দ্বারা তর্পণীয় নয, তাই ত্যাগ করেই ভোগ করতে হবে। এসব বিচার করে যাঁবা জীবন গঠন করবেন তাঁদের কাছে তপস্যাব অর্থ কৃচ্ছ্রসাধন নয়, লোকহিতে জীবনোৎসর্গ ; সংসার নয় মোহগর্ত, তা অহম্-এব উর্ধ্বে ওঠার সোপান ; কর্ম নয বন্ধনডোর, ফলত্যাগেব মাধ্যমে তা হয়ে ওঠে উপাসনার নৈবেদ্য ; ধর্ম আব অযৌক্তিক দেশাচাব থাকে না, হয় পূর্ণতার অনুধ্যান।

জাতীয়তাবাদ স্ফুরণের জন্য উপনিষদেব যুক্তি ও অধ্যাত্মচেতনা, কর্মোদ্যম ও ফলত্যাগ, আত্মবিশ্বাস ও ঐক্যবোধের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সমন্বয়বাদ বুদ্ধিজীবীদেব মর্মে প্রবেশ করার পূর্বে বড়ো হয়ে উঠেছিল জ্ঞানমার্গী নিবাকাব সাধনা এবং তা বৃহত্তর হিন্দুসমাজকে দূরে ঠেলে দিয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্মে

ভক্তিসঞ্চার করলেও তার মধ্যে ঠিক প্রাণ ছিল না, তাতে জনগণচিত্ত স্পর্শকারী আবেগের ছোঁয়া লাগেনি। জনগণের অধিকাংশ ছিল অনধিকারী। সংস্কৃত জ্ঞানের অভাবে উপনিষদ ছিল তাদের কাছে অলভ্য, পাশ্চাত্য শিক্ষার অভাবে বিচারবোধ সুপ্ত। তারা গড্ডলিকাবৎ পুরোহিত বা তাদের পৃষ্ঠপোষক ধনবান সমাজপতিদের নির্দেশে চলত—অন্ধেন নীয়মানা যথান্ধাঃ। এদের প্রতিভূ ছিল রাধাকান্ত দেবের ধর্মসভা, পরের দিকে দয়ানন্দের গৌরক্ষিণী সভা।

এ সব পিছুটানের কথা স্মরণ করে রামমোহন ও বিদ্যাসাগর সমাজসংস্কারকে শ্রুতি-স্মৃতির বচনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। ইচ্ছে করলেই তাঁরা শুধু পশ্চিমী যুক্তিবাদ বা উপযোগিতাবাদের দোহাই পাড়তে পারতেন। বিদ্যাসাগর তো মানবতার দোহাই দিয়েওছিলেন। তবু দেখি তিনি পরাশর সংহিতার বচনের ওপর নির্ভর করেছেন বেশি। তাঁবা দেখাতে চেয়েছিলেন সনাতন (চিরন্তন অর্থে) হিন্দুধর্মের সঙ্গে প্রচলিত দেশাচার লোকাচারের কোন সম্পর্ক নেই। সেগুলো বরং হিন্দু রাজত্ব ও হিন্দুধর্মের অবনতির সূচক। আজ যুগপ্রয়োজনে তা বর্জন করলেও সত্যকার ধর্মের গায়ে কোন আঘাত লাগবে না। রানাডে একইভাবে চিন্তা করেছিলেন।[৩৩] ব্যাপারটা অত্যন্ত স্পর্শকাতর বুঝে বিবেকানন্দ সমাজসংস্কারের ওপরে ধর্মসংস্কারের, ঠিক তাও নয়, প্রকৃত ধর্মবোধ উদ্দীপনের ওপর জোর দিয়েছিলেন।

কিন্তু কয়েক হাজার বছরের পুরোনো হিন্দু ধর্মের কোনটা সত্য? কতটা সত্য? রামমোহন ও বিবেকানন্দ বেছে নিয়েছিলেন বেদান্তের ঐতিহ্য, দয়ানন্দ বেছে নিলেন বেদেব। তিনি আর্যেতর কোন যুগকে, কর্মকাণ্ডের বাইরের কোন জীবনাদর্শকে, স্বীকার কবতেন না। শুধু বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম না, তিনি অদ্বৈততত্ত্ব, গীতাব ভক্তিবাদ, পুরাণেব মূর্তিপূজা, সবই বর্জন কবেছিলেন। ইসলাম ও খ্রীস্টধর্ম তো তাঁর আক্রমণেব মূল লক্ষ্য ছিল। তাঁব ঈশ্বর ইহুদীদের জেহোভাব মত রুদ্র, ভযঙ্কর। তিনি পাপের বিচাবক ও শাস্তিদাতা। তিনি আর্য ছাড়া আর কাউকে ত্রাণ কবেন না, ভালবাসেন না।[৩৪]

যাঁরা কোনও পরিবর্তন চাননি, বাহ্যিক আচাবকেই ধর্ম বলে আঁকড়ে ধরেছিলেন, তাঁরা বেছে নিযেছিলেন পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকেব বঘুনন্দন-সংকলিত স্মৃতির যুগকে। এখানে মনে রাখতে হবে বিদ্যাসাগর যে স্মৃতিব উপর সমাজসংস্কারেব ভিত্তি বচনা করেছিলেন তার সঙ্গে এব পার্থক্য আছে। সে স্মৃতি গুপ্তযুগে রচিত হযেছিল, বা তাব কিছু পরে, যখনও হিন্দুধর্মেব জীবনীশক্তি, বিস্তার শক্তি, বাইরের ভালো জিনিস গ্রহণ করার শক্তি এবং তা মূল প্রবাহের সঙ্গে মিলিয়ে নেবার শক্তি অবসিত হযনি। রঘুনন্দনের স্মৃতি রচিত হয়েছিল পাঠান যুগেব শেষে, মুঘল যুগের আদিতে। তখন হিন্দুর চিন্তাধারার গতিশীলতা স্তব্ধ হয়ে গেছে, সমন্বয প্রতিভা অবসিত, আত্মরক্ষার্থে তা কূর্মবৃত্তি অবলম্বন করেছে। চৈতন্যের ভক্তি আন্দোলন যে উদার, মানবিক ধর্মের ও মুক্ত, গতিশীল সমাজের স্বপ্ন বহন করে এনেছিল, তা বৃন্দাবন প্লাবিত করলেও নবদ্বীপকে স্পর্শ করতে পারেনি। বাঙালীর শক্তি সাধনা কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ও রঘুনন্দনের অচলাযতনে আশ্রয় নিল; বাঙালীব বৈষ্ণব ধর্ম গৌরনাগরবাদে ও সহজিয়া বৈষ্ণবাচাবে পবিণত হল।

নবদ্বীপের টোলে বেদান্তের ও নারদীয় ভক্তিসূত্রের ওপর উড়ল নব্যন্যায়ের বিজয় বৈজয়ন্তী। এই ধাবাই কলকাতাব দলপতিদের পৃষ্ঠপোষকতায় পুষ্ট হয়ে ধর্মসভার রক্ষণশীলতার রূপ নিল। আগে মুসলমানদের হাত থেকে আত্মবক্ষার তাগিদ কাজ করেছিল, এখন খ্রীস্টান, তথা পাশ্চাত্য, সংস্কৃতির হাত থেকে আত্মরক্ষার তাগিদ।

বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে আমরা চতুর্থ এক ঐতিহ্যের সন্ধান পেলাম ১৮৭০ সালের পর থেকে। এটা বেদ, বেদান্ত বা অবাচীন স্মৃতির ঐতিহ্য নয়, এব উৎস হল মহাভারত, গীতা ও ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব। এতে প্রযোজনীয় সমাজসংস্কারকে ওপর থেকে চাপিয়ে দেবার প্রয়াস নেই, আবার হাজার হাজার সই জোগাড় কবে তা বানচাল করার জেদও নেই। মিল ও কোঁৎ-এর তত্ত্ব প্রয়োগ করে বঙ্কিম হিন্দু ধর্ম বিশ্লেষণ কবে দেখালেন, এক নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্ম উপাসনা হিন্দু ধর্মের শেষ কথা নয়। "এই ধর্ম অতি বিশুদ্ধ, কিন্তু অসম্পূর্ণ।" ভক্তিশাস্ত্রই তাব শেষ কথা। দ্বিতীয়ত, এ ধরনেব উপাসনা সকলের জন্য নয়, মানবেব সব বৃত্তিও তাতে তৃপ্ত হয় না। আবার "হিন্দুধর্মে ঈশ্বব ভিন্ন দেবতা নাই।" 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে ও প্রচার পত্রিকায় 'দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি দেখালেন. বহু দেববাদ ও বিভূতি, দেশাচার ও লোকাচার ধর্ম নয়। ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশে ও সেই বিকশিত ব্যক্তিত্ব মানবহিতে উৎসর্গে হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব নিহিত। তিনি এব নাম দিলেন 'অনুশীলন' ধর্ম। নিম্নাধিকাবীব জন্য তিনি সাকার পূজাব প্রয়োজন মেনে নিলেন, বিশেষত তাতে মানুষেব চিত্তবঞ্জিনী বৃত্তি তৃপ্ত হয বলে। অবতাববাদের নতুন ব্যাখ্যা দিলেন তিনি। তাঁব অবতার মনুষ্যদেহে অবতীর্ণ ঈশ্বর নন, তাঁব অবতার সেই অনুশীলিত পুরুষোত্তম যিনি সুকঠিন প্রয়াসে পূর্ণতা লাভ কবেছেন এবং মানবহিতে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। এর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হলেন মহাভাবতেব শ্রীকৃষ্ণ। বুদ্ধ বা যীশুর মত তিনি সংসাব ত্যাগ কবেননি, সংসাবের সকল দুঃখ বীবের মত বহন করেছেন. সকল কর্ম কবেছেন নিবাসক্ত চিত্তে, যে যুদ্ধেব তিনি সারথি তা ধর্মযুদ্ধ, তাব উদ্দেশ্য ধর্মবাজ্য স্থাপন। গীতাব আদর্শ পুরুষকে ভারতীয় জনচিত্তে নতুন আলোয উদ্ভাসিত কবে বঙ্কিম ক্লৈব্যগ্রস্ত অর্জুনদের ডাক দিলেন কর্মফল ত্যাগ করে মহাভাবতের স্বপ্ন সফল কবাব জন্য নতুন এক কুরুক্ষেত্রেব দিকে অগ্রসব হতে। তাঁব এই দুঃসাহসিক কল্পনা পববর্তী যুগকে প্রভাবিত করেছিল। তিলক, অববিন্দ, লাজপৎ-এব মত হিন্দু চবমপন্থীরাতোঁবটেই, ব্রাহ্ম বিপিন পাল ও ক্যাথলিক ব্রহ্মবান্ধবও তার ব্যতিক্রম নন।

হার্বার্ট স্পেন্সাব- অনুসারী বঙ্কিমের দেশপ্রীতি কিন্তু মানবপ্রীতি (তাঁব ভাষায 'জাগতিকী প্রীতি')র সোপান মাত্র এবং সে মানবপ্রীতি আবাব ঈশ্বর ভক্তিব ফল। দেশপ্রীতি তাঁব কাছে শেষ কথাও নয়, ধর্মের বিকল্পও নয়। উভয়কে এক কবলে কি বিপত্তি দেখা দেয সে বিষয়ে সত্যানন্দের গুরু আমাদের সাবধান বাণী শুনিয়েছেন। কিন্তু সব সতর্কবাণী উড়ে গেল 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতের উন্মাদনায়। দেশকে দুর্গার সঙ্গে একাত্ম কবে দেখাব ফলে যে প্রবল আবেগ হিন্দু মানসে সঞ্চারিত হল তাই জাগাল মুসলিম মানসে তীব্র প্রতিক্রিয়া। বঙ্কিমকে মুসলিম-বিদ্বেষী মনে করা হল। কিন্তু 'সীতারামে' ফকির ও সীতারামেব কথোপকথন যাঁরা পডবেন তাঁরা দেখবেন বঙ্কিমের মানবপ্রীতিতে মুসলমানেব স্থানও আছে কাবণ মুসলমানও জগদীশ্বরের সৃষ্টি। যেখানে শুভবুদ্ধি ও সৎকর্মেব মাত্রা লঙ্ঘিত হয়েছে সেখানে হিন্দু মুসলমান কেউই তাঁর কশাঘাত থেকে রক্ষা পায়নি। 'বাজসিংহের' আলমগীর চরিত্র বা 'আনন্দমঠের' সন্তানদের কিছু মুসলিম-বিদ্বেষী শব্দ প্রযোগ দেখে আমবা ভুলে যাই পশুপতির উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ভবানন্দের ব্রতচ্যুতি, সীতারামের যৌনমোহ ও গঙ্গারামেব বিশ্বাসঘাতকতা তিনি ক্ষমা করেননি। ইংবেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধাবণ করাব যে দুর্জয সাহস মীরকাশিম দেখিয়েছিলেন তা রাজসিংহের বীরত্বের চেয়ে কম প্রশংসা পাযনি ; কতলু খাঁ জঘন্য, কিন্তু তার কন্যা আয়েষা 'রমণীরত্ন'। জেব উন্নিসার উত্তরণ যত সহানুভূতির সঙ্গে তিনি দেখিয়েছেন, শৈবলিনীর প্রতি ততটা নয়।

তবে এতসব কথা তলিয়ে বোঝার ক্ষমতা বা ইচ্ছা অরবিন্দের ছিল না। 'আনন্দমঠে'ব

সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে মায়ের তিনমূর্তি দেখিয়েছিলেন। তার মধ্যে "মা যাহা হইয়াছেন"—"হৃতসর্বস্বা তাই নগ্নিকা"—সেই কালীর মধ্যে অরবিন্দ দেখেছিলেন ব্রিটিশ শোষিত ভারতকে। পত্নী মৃণালিনী দেবীকে লেখা (৩০ আগস্ট ১৯০৫) চিঠিতে পড়ি, "মার বুকের উপর বসিয়া যদি একটা রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত হয়, তাহা হইলে ছেলে কি করে? নিশ্চিন্তভাবে আহার করিতে বসে...না মাকে উদ্ধার করিতে দৌড়াইয়া যায়?" 'আনন্দমঠের' কাহিনীকে তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে নতুন সন্তানদল গঠনের কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। বঙ্কিম সত্যানন্দের গুরুব মুখ দিয়ে যতই জড় বিজ্ঞানশিক্ষা প্রসারে ও জাতীয়তাবোধ জাগরণে ইংরেজদের প্রয়োজনীয়তাব কথা বলুন না কেন, অরবিন্দ তার গুরুত্ব দেননি। তিলক বা তিনি ইংরেজদের প্রতি সুবিচাব করতে বসেননি—নীতিবাদ প্রচারও তাঁদের লক্ষ্য ছিল না। বঙ্কিমের দু দশক পরে লেখা তিলকের গীতাভাষ্যে ধর্মরাজ্য স্থাপনার্থ ধর্মযুদ্ধে কোন পন্থাই অন্যায় বলে পবিত্যক্ত হয়নি। ১৮৯৭ সালেব শিবাজী উৎসবে আফজল খাঁব হত্যাকাণ্ড তিনি কৃষ্ণেব উক্তি দ্বারাই সমর্থন করেছিলেন।

বিবেকানন্দ সম্বন্ধেও চরমপন্থীরা একই ধরনের অপব্যাখ্যা করেছেন এবং একই উদ্দেশ্যে। 'যত মত তত পথে'র প্রবক্তা বামকৃষ্ণেব প্রিযতম শিষ্য বিবেকানন্দের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রকৃতি বুঝতে ও তাদেব সমন্বয় করতে কোনদিনই ভুল হযনি। পশ্চিমকে তিনি দিয়েছিলেন সত্য, ত্যাগ ও প্রেমের ঘনীভূত মূর্তি বামকৃষ্ণের অমব বাণী ও জীবনাদর্শ, অদ্বৈত ও যোগের তত্ত্ব; আবার প্রাচ্যে আনতে চেয়েছিলেন পশ্চিমেব বীর্য, কর্মোদ্যম, সুকঠিন শৃঙ্খলাবোধ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে দুঃখমোচনের নিবলস প্রযাস। তিনি এমন এক ধর্ম প্রচার করতে চেয়েছিলেন যা সকল ভূতেব মনের উপযোগী—"সমভাবে দর্শনমূলক, তুল্যরূপে ভক্তিপ্রবণ, সমভাবে মবমী এবং কর্মপ্রেরণাময়," যার লক্ষ্য বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতিব জয় এবং আত্মার ব্রহ্মস্বরূপ ব্যক্ত করা। পূর্ণ মানবগঠনের এই স্বপ্ন শুধু ভারতের জন্যই তিনি দেখেননি, বিশ্বের জন্য দেখেছিলেন। এখানে গোঁড়ামি, শ্রেয়োবোধ, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের স্থান নেই। ইউরোপকে সত্ত্বেব ও ভাবতকে রজের সাধনায় প্রবুদ্ধ করতে পারস্পরিক বোঝাপড়া, লেনদেন প্রয়োজন একথা বুঝেছিলেন বীর সন্ন্যাসী। অথচ চরমপন্থীরা তার ভুল ব্যাখ্যা করলেন। পশ্চিমের যে সব দোষ বন্ধুর মত তিনি দেখিয়েছিলেন, সেগুলির উপর জোর দেওয়া হল, আর "কলম্বো থেকে আলমোড়া"র বক্তৃতাবলীতে প্রাচ্যের যে সব দোষত্রুটি তিনি তীব্র কশাঘাতে জর্জর করেছিলেন তা চেপে যাওয়া হল। সন্দেহ নেই তিনি আমাদেব জাতীয়তাকে দিয়েছেন প্রবল পৌরুষ, অদ্বৈতের অভীঃমন্ত্র, শিখিয়েছেন "আমরা মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত"। তার চেয়েও বড়োকথা, বঙ্কিমের যে দেশ ছিল কবির কল্পনা, তাকে তিনি দিয়েছিলেন রক্ত, মাংস, মজ্জা। যে দেশ তাঁব শৈশবের ক্রীড়াভূমি, যৌবনের উপবন, বার্ধক্যের বারাণসী তা মূর্খ অন্ত্যজ, দরিদ্রের দেশ—তাকে অন্নদান, আরোগ্য দান, জ্ঞান দান করতে হবে। তবেই আসবে আত্মজ্ঞান। তখন যে শক্তির সৃষ্টি হবে তার সামনে জাতপাত, শ্রেণী, সাম্রাজ্য কোন বিভেদ, বাধাই টিকবে না। অরবিন্দ ও পাল এর গুরুত্ব বুঝলেন না; বললেন, মানুষ তৈরি করা ধর্মের চেয়ে বড়ো কথা স্বরাজ। রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান না হলে কোন সমস্যার সমাধানই হবে না; এবং সে সমাধান শুধু ইংরেজবহিষ্কারে নয়, পশ্চিমী সভ্যতার বহিষ্কারেই সম্পূর্ণ হবে। বিবেকানন্দ ধর্মের সঙ্গে রাজনীতি জড়াতে চাননি, নিবেদিতাকে এ বিষয়ে সাবধান করে দিয়েছিলেন; অথচ জনসমর্থন সংগ্রহ করতে অরবিন্দ ও তিলক হিন্দুধর্মকে কাজে লাগালেন এবং অন্য ধর্মের সমর্থন হারালেন। যে কুলি মজুর মেথরকে ঝোপড়ি থেকে

বেরিয়ে এসে নতুন সমাজ গড়তে আহ্বান করেছিলেন বিবেকানন্দ,তারা ভদ্রলোক ও উচ্চ জাতির (বিশেষত ব্রাহ্মণের) বহু পেছনে আসন নিল।[৩৫]

ইংরেজদের জাত্যাভিমানের পেছনে চরমপন্থীরা দেখেছিলেন টিউটনিক জাতিকুলের শ্রেয়োমন্যতা। আর্য শ্রেয়োমন্যতা জাহির করে উত্তর দিতে চেয়েছিলেন তাঁরা। এখানে তাঁদের গুরু দয়ানন্দ স্বামী। বঙ্কিম বেদকে হিন্দুধর্মের মূল বলে স্বীকার করলেও শীর্ষ বলে মনে করেননি। বিবেকানন্দ তো কর্মকাণ্ডকে 'অপরা বিদ্যা' মনে করতেন। অথচ দয়ানন্দের কাছে বেদ ঈশ্বরের বাণী, তার মধ্যে শুধু আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম ও শেষ কথা নেই, আছে জড়বিজ্ঞানের সকল তথ্য। বেদ ব্যাখ্যায় দয়ানন্দ ম্যাকসমূলারকে তো অবজ্ঞাই করতেন, এমনকি সায়নভাষ্যও সব জায়গায় মানেননি। তাঁর মতে ঋক্‌বেদ আদৌ প্রকৃতি দেবতার উদ্দেশ্যে ছন্দোবন্ধে নিবেদিত প্রার্থনা নয়, তা একেশ্বরবাদের প্রথম ও পূর্ণ রূপ, এবং তার পরে হিন্দুধর্মের যা কিছু বিবর্তন হয়েছে—বেদান্ত থেকে শুরু করে পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম—সবই ভ্রান্ত এবং বর্জনীয়। অরবিন্দ এর মধ্যে আর্য পৌরুষের অনমনীয় দৃঢ়তা লক্ষ্য করেছেন, যা সকল চিন্তাঝটিকার মধ্যে অচল, অটল। কিন্তু 'সত্যার্থপ্রকাশ'-এ আপন মত প্রতিষ্ঠা করার জন্য ভুল ইতিহাস ও মনগড়া মিথের যে সংমিশ্রণ দয়ানন্দ করেছিলেন তাও কি বৈজ্ঞানিক বলে মানতে হবে? দেবদেবীর মূর্তিপূজা বর্জন করে গোমাতার পূজা ব্যবস্থা করা কতখানি যুক্তিযুক্ত? কতখানি সম্ভব ছিল আধুনিক ভারতে শত শত তপোবন বানিয়ে অহোরাত্র বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান? বা ইংরাজী সাহিত্য বিজ্ঞান চর্চা বন্ধ করে গুরুকুল-সম্মিত সংস্কৃত শাস্ত্রপাঠ? হাজার বছর ধরে যে ইসলাম ভারতের মাটিতে বাসা বেঁধেছে, হিন্দুদের সঙ্গে সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান করেছে, তাদের বাদ দেওয়া বা তাদের সবাইকে ধর্মান্তরিত করাই কি ধর্ম হত? ইহুদীসুলভ অসহিষ্ণুতার চিহ্ন চরমপন্থীদের চিন্তায় রয়ে গেছে।

দয়ানন্দের দেখাদেখি অন্যরাও এ খেলায় যোগ দিলেন। তিলক আর্য আগমনের ইতিহাস চার হাজার খ্রীঃ পূঃ-এ নিয়ে গেলেন, তাদের আদি বাস উত্তর মেরুতে ছিল তা প্রমাণ করলেন। পঞ্জাবে আর্যধর্ম ছড়িয়ে পড়ল, লাজপৎ তা বরণ করলেন। আর্যসমাজীরা শুদ্ধির মাধ্যমে অহিন্দুদের হিন্দুত্ব দিতে গিয়ে মুসলিমদের সন্দেহভাজন হল। মোগল, আফগান, ইংরেজদের হাতে বারংবার পরাভূত পাঞ্জাবী পৌরুষ এই ভাবে মনস্তাত্ত্বিক ক্ষতি পূরণ আদায় করতে চাইল।

চরমপন্থীরা এমন এক আদর্শভারত রচনা করতে চেয়েছিল যার ধমনীতে আর্যরক্ত প্রবাহিত, যার ধর্ম হিন্দু ঐতিহ্যাশ্রিত, শ্রীকৃষ্ণের মত অতিমানব ও শিবাজীর মত যোদ্ধা গড়েছেন যার গৌরবময় ইতিহাস। রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি সব দিক দিয়ে তার অবদান প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ। বিপিন পাল বললেন, "বর্ণকে সহনীয় করেছিল আশ্রম", অরবিন্দ বললেন, "আত্মার কল্পনা সকল বিভেদপ্রবণতা দূর করবে;" উভয়ে বললেন, প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্র ব্যবস্থা, গ্রাম পঞ্চায়েৎ ব্যবস্থার মত মহৎ কিছু আজও পশ্চিমে গড়ে ওঠেনি। ১৯০৫ সালে শামা শাস্ত্রী আবিষ্কৃত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র হিন্দু রাজনৈতিক প্রতিভার চরম প্রমাণ। তাঁদের বিশ্বদর্শনে পশ্চিমী সভ্যতা বস্তুবাদের বিষে জীর্ণ। তাকে পুনরুজ্জীবিত করতে ভারতীয় অধ্যাত্মবিদ্যার ভেষজ চাই। বিবেকানন্দের আমেরিকা অভিযান পথ প্রস্তুত করেছে; স্বরাজ লাভ সে পথ প্রশস্ত করবে। পশ্চিমের স্বার্থেই চাই ভারতের স্বাধীনতা। রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন এ ধরনের বিশ্ববীক্ষার মোহে পড়েছিলেন, তার প্রমাণ—'ভারতবর্ষ', 'ব্যাধি ও প্রতিকার', 'ব্রাহ্মণ', প্রভৃতি প্রবন্ধ, 'নৈবেদ্যের' বহু কবিতা।

কিন্তু ১৯০৭ সালে প্রকাশিত 'গোরা' উপন্যাসে দেখি তাঁর মোহভঙ্গ হচ্ছে, অন্ধ, আত্মম্ভরী, প্রচারবাদী দেশপ্রেমের ঊর্ধ্বে এক উদার, সর্বজনীন, সমন্বয়বাদী, দেশপ্রেমের সন্ধান তিনি পাচ্ছেন।[৩৬]

॥ ৫ ॥

চিন্তার দিক থেকে চরমপন্থার যতই প্রস্তুতি থাকুক, কার্জনের নীতি তাকে দানা বাঁধতে সাহায্য করেছিল। ঊনিশ শতকের শেষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এক সংকটের মুখে পড়ে। তার প্রধান কারণ ফরাসী ও রুশ সাম্রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়াও তাকে জার্মান সাম্রাজ্যবাদের সম্মুখীন হতে হয় এবং পশ্চিমে আমেবিকা ও প্রাচ্যে জাপানের মত দুটি প্রবল শক্তির অভ্যুদয় হয়। কিপলিং-এব বহু কবিতায়, বিশেষত ভিক্টোরিযার হীরকজয়ন্তী অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে লিখিত Recessional-এ, এই উদ্বেগ ধরা পড়ে। যাঁরা এ দুর্যোগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পালে নতুন কবে হাওয়া লাগাতে চাইলেন তাঁদের মধ্যে কার্জন অন্যতম। ভারতসচিবের সহকারীরূপে তাঁর হাত দিয়ে ১৮৯২ সালেব শাসন সংস্কাব আইন পাশ হয়েছিল। তখন থেকেই তিনি কংগ্রেসবিরোধী, হিন্দুবিরোধী, খানিকটা বাঙালীবিরোধী মনোভাবেব শরিক। ধর্মপ্রচারকের যে বিশ্বাস ও উদ্যম নিয়ে শাসনযন্ত্র পবিচালনা করতেন তিনি তার মধ্যে শাসিতেব প্রতি সহানুভূতির কোন স্থান ছিল না। ভারতীয়দের চবিত্র, সততা ও কর্মক্ষমতা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল খুব খারাপ। কংগ্রেসকে তিনি মরণাঘাত দেবার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলেন।

স্বায়ত্তশাসনের প্রতীক কলকাতা পৌরসভার গঠনতন্ত্রের ওপব আঘাত হেনেই তাঁর অভিযান শুরু হ'ল। তার আগেই এ বিষয়ে এক বিল এসেছিল। তিনি তা সংশোধন করে যে নতুন বিল খাড়া করলেন তাতে সদস্য সংখ্যা দাঁড়ালো একশতের জায়গায় পঞ্চাশ। তার মধ্যে নির্বাচিত ভারতীয় ও মনোনীত ও নির্বাচিত সবরকমের ইংরাজদের সংখ্যা হবে সমান সমান—২৫ করে, কিন্তু সভাপতি হবেন একজন ইংরাজ। ইনিই আবার পৌরসভায় গৃহীত নীতি কার্যে পরিণত করবেন। কাউন্সিল ও সভাপতির মধ্যে থাকবে বারোজনের এক জেনারেল কমিটি, সেখানে নির্বাচিত ভারতীয়দের সংখ্যা মাত্র ৪। বলা বাহুল্য, এর মুখ্য উদ্দেশ্য, কলকাতার বহুব্যাপ্ত ব্রিটিশ বাণিজ্যিক স্বার্থ সংরক্ষণ—এবং তাও অনেকটা ভারতীয়দের দেওয়া করে। এর আরেকটা দিক ছিল। ১৮৯৩-৯৯ সালের মধ্যে যাঁরা বাংলাব আইন পরিষদে নির্বাচিত হয়েছিলেন, তাঁদের ঘাঁটি ছিল পৌরসভা ও মফঃস্বলের মিউনিসিপ্যালিটি। সুরেন্দ্রনাথ বিপদ বুঝতে পেরে সদলে পদত্যাগ করলেন।

দ্বিতীয় আঘাত পড়ে শিক্ষার ওপর। যে ব্যবস্থা চালু ছিল কেউ তাকে আদর্শ বলবে না। 'শিক্ষার হেরফের' ও 'তোতা কাহিনী'তে রবীন্দ্রনাথ তাকে ব্যঙ্গ করেছেন। প্রাথমিক শিক্ষার অবনতি, মাতৃভাষার মাধ্যম পরিহার, শিল্প শিক্ষার অভাব, যৌথ জীবনহীন (অনেক ক্ষেত্রে আবাসহীন) বিশ্ববিদ্যালয়, আইনজীবী-পরিকীর্ণ সেনেট, ব্যক্তিগত লাভের জন্য পরিচালিত দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ ও আইন কলেজ—এ-সব কথা রূঢ় হলেও সত্য। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পঠন-পাঠনের কোন ব্যবস্থাও ছিল না। কিন্তু প্রতিকারার্থ কার্জন যা নীতি নিলেন তা আরও মারাত্মক। সিমলায় তিনি যে শিক্ষা সম্মেলন ডাকলেন তাতে কোন ভারতীয় প্রতিনিধি ছিল না। যে শিক্ষাকমিশন গঠিত হ'ল তাতে প্রথমে কোন হিন্দু প্রতিনিধিও ছিল না। সবাই ভাবল পৌরসভার মত উচ্চশিক্ষাও হবে সরকারী

প্রতিষ্ঠান—বিশ্ববিদ্যার মুক্তঅঙ্গন নয়, আমলাতান্ত্রিক নৈপুণ্য প্রদর্শনের ক্ষেত্র। র‍্যালে (Raleigh) কমিশনের প্রস্তাবিত সংস্কার অনেকের উদ্বেগ সঞ্চার করল। সব দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ তুলে দিলে মফঃস্বলের ছেলেরা কোথায় পড়বে ? আইন কলেজ তুলে দিলে উচ্চাশী ভারতীয়দের স্বাধীন ব্যবসায়ের ক্ষেত্র কি সংকুচিত হবে না ? ন্যূনতম বেতনহারের ফলে গরীব ছাত্ররা বঞ্চিত হবে না ? গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এদেব কথা তুললে কার্জন সরকারী ফাইলে মন্তব্য করলেন, "আমরা তো এদেরই রাজনৈতিকভাবে দমন কবতে চাই।"

শিক্ষিত বাঙালীর প্রতিবাদে শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ ও সুরেন্দ্রনাথের আইন কলেজ টিঁকে গেল, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের যা শাসনতন্ত্র ঠিক হল তাতে ইউরোপীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ কায়েম হল। সেনেটেব ১০০ জন সভ্যের মধ্যে ৮০ জনের মনোনয়নের ভার পডল বডলাটের ওপর। ইউরোপীয সভ্যেব সংখ্যা হল ৫৪। সিণ্ডিকেটকে দেওয়া হল কলেজের স্বীকৃতি দান ও হরণের ক্ষমতা। সর্বোপরি রইলেন সাহেব শিক্ষাঅধিকর্তা। বিলের বিরোধিতা করে গোখ্‌লে বললেন, "এতে বিশ্ববিদ্যালয সরকাবী বিভাগে পরিণত হবে।" ১৯১৭ সালে স্যাডলাব কমিশন এ ভবিষ্যদ্বাণী সমর্থন কবেছিলেন।

নবমপন্থীদেব সহযোগিতা নীতি আবার লাঞ্ছিত হ'ল, Official Secrets Amendment Act-এ। এই আইনেব বলে অসামবিক গুপ্ত তথ্য প্রকাশনাব জন্য সংবাদপত্রকে দণ্ডনীয় করা হয়। কার্জন চেয়েছিলেন কোন অবস্থায় কেউ যেন আমলাতন্ত্রেব সমালোচনা না করে। এ নীতি প্রেস স্বাধীনতাব পবিপন্থী বলে তুমুল আপত্তি উঠল। চরমপন্থীরা বিনামূল্যে এক বিবাট প্রচাবমাধ্যম হাতে পেযে গেলেন।

নানা কারণে যে সব অসন্তোষ ঘনীভূত হচ্ছিল তা ফেটে পড়ল বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ কবে। নবমপন্থীদেব অবরোধ বিপুল আবেগেব বন্যায ভেসে গেল। অবশ্য কার্জনই বঙ্গভঙ্গেব প্রথম প্রস্তাব দেননি। যখন বাংলা প্রেসিডেন্সী ১৮৫৪ সালে এক স্বতন্ত্র প্রদেশে পবিণত হয তখনই তাব আয়তন ছিল ২,৫৩,০০০ বর্গমাইল, জনসংখ্যা ৪ কোটি ৬০ লক্ষ। ওড়িশাব দুর্ভিক্ষের সময় প্রশ্ন ওঠে এতবড প্রদেশের সুশাসনের জন্য কি কবা উচিত। জন লবেন্স তখন বডলাট। বাংলাকে বোম্বাই বা মাদ্রাজের মত করার বিরুদ্ধে মত দিয়ে তিনি বলেন, বাংলাব কিছু অংশ, যেমন আসাম ও তাব সন্নিহিত জেলাগুলিকে, আলাদা কবে দেওযা যেতে পাবে। ১৮৭৪ সালে বাংলাভাষী সিলেট, কাছাড ও গোযালপাডা জেলাসহ আসাম এক স্বতন্ত্র চীফ কমিশনারের অধীন প্রদেশ বলে ঘোষিত হ'ল। কিন্তু এই ক্ষুদ্র প্রদেশে কোন সিভিলিয়ান যেতে রাজি হ'ল না। তখন চীফ কমিশনাব উইলিয়ম ওযার্ড ১৮৯৬ সালে প্রস্তাব দিলেন চট্টগ্রাম বিভাগ এবং ঢাকা ও মৈমনসিংহ জেলাকে আসামের সঙ্গে যুক্ত কবা হোক। প্রবল প্রতিবাদের ফলে তা কার্যকব করা গেল না।

১৯০০ সালে কার্জন আসাম পবিভ্রমণে যান এবং চা-বাগানের মালিকবা চট্টগ্রামে চা বফতানীব সুবিধার্থ বন্দর গঠনের দাবি তোলেন। এরপর ১৯০২ সালে নিজামের কাছ থেকে বেবার পান তিনি। তখন তাঁর মনে চিন্তার উদয় হয় বেরার কি বোম্বাই-এব সঙ্গে, চট্টগ্রাম কি আসামেব সঙ্গে জুড়ে দেওযা উচিত ? তখনো বৈজ্ঞানিক সীমানাবিন্যাসেব প্রশ্নটা বড়ো ছিল, রাজনৈতিক দুবভিসন্ধি যুক্ত হযনি। ১৯০২ সালে সি পিব চীফ কমিশনার অ্যান্ড্রু ফ্রেজাবেব প্রস্তাব এল ওড়িশা ও সম্বলপুবকে মধ্যপ্রদেশের সঙ্গে জুড়ে দেওযা হোক। অন্যান্য আমলারা আলাদা প্রস্তাব দিলে ফ্রেজার (এখন তিনি বাংলার ছোটলাট)-কে ভালো করে খসড়া তৈরি কবতে বলা হ'ল। ১৯০৩ সালের শেষে নানা আলোচনার পব রিজলে

পত্ররূপে এই দ্বিতীয় প্রস্তাব প্রকাশিত হ'ল। ঠিক হল চট্টগ্রাম বিভাগ, পার্বত্য ত্রিপুবা, ঢাকা ও মৈমনসিং জেলা আসামে যাবে, ছোটনাগপুর যাবে মধ্যপ্রদেশে, বাংলা পাবে সম্বলপুর ও গঞ্জাম। এতে বাংলার লোক সংখ্যা কমবে এক কোটি নয় লক্ষ, আসাম প্রশাসনের সুবিধা বাড়বে, ওড়িশাবাসীরা এক শাসনাধীনে আসবে। নতুন দুটো কারণ দেখান হল—(১) কলকাতার বিপজ্জনক প্রভাব থেকে পূর্ববঙ্গ মুক্ত হবে, (২) মুসলিম অধিবাসীদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহাব কবা সম্ভব হবে। এখানেই আমরা সাম্প্রদায়িকতার সুর শুনতে পেলাম।

জন ম্যাক্‌লেনের মত অনেকেই রিজলে-পত্রের বিরোধিতার পেছনে পূর্ববঙ্গেব জমিদার, বণিক, উকিল ও সংবাদপত্রের স্বার্থেব খেলা দেখেছেন। হয়তো কিছুটা সত্য। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধিই যদি বঙ্গভঙ্গের আসল কারণ হয়, তবে বাংলাভাষী অঞ্চল বাদ না দিয়ে হিন্দী ও ওড়িয়াভাষী অঞ্চল বাদ দেওয়া হ'ল না কেন? ক্যাম্বেল ও কটনতো'সেই পরামর্শ দিয়েছিলেন। আর অবিভক্ত বাংলাকে বোম্বাই ও মাদ্রাজের মর্যাদা দিলে বাংলার ছোটলাট কাউন্সিলেব সাহায্যে কি আবো ভাল শাসন চালাতেন না? এতে কেন আপত্তি কবলেন বিজলে ও অন্যান্য সিভিলিয়ান? বাঙালীরা কাউন্সিলে ঢুকতে চাইবে রিজলেব এই ভয় কতটা সমূলক?

কার্জন বাঙালীর আপত্তিব পেছনে বাগাডম্বব ছাডা কিছুই দেখেননি। অস্থাযী ভাবত সচিবকে তিনি লিখলেন, "বাঙালীরা নিজেদেব এক মহাজাতি মনে কবে এবং এক বাঙালীবাবুকে লাটসাহেবেব গদীতে বসাতে চায়···বঙ্গভঙ্গেব প্রস্তাব তাদেব এই স্বপ্নেব সফল রূপায়ণে বাধা দেবে। আমবা যদি তাদেব আপত্তিব কাছে নতি স্বীকাব কবি তবে ভবিষ্যতে কোনদিনই বাংলা ভাগ কবতে পারব না এবং আপনাবা ভাবতেব পূর্ব পার্শ্বে এমন এক শক্তিকে জোবদাব কববেন যা এখনি প্রবল এবং ভবিষ্যতে বর্ধমান বিপদেব উৎস হযে দাঁড়াবে।"[৩৭]

ঠিক এই সময় তিনি পূর্ববঙ্গ সফব কবছিলেন। মুসলমানপ্রধান পূর্ববঙ্গ সমর্থন না কবলে বঙ্গভঙ্গ কার্যে পরিণত কবা সম্ভব ছিল না। তাই দেখি পবিকল্পনা আবো ব্যাপক রূপ নিচ্ছে। বিজলে, ফ্রেজাব ও ইবেটসনেব পবামর্শে তিনি বিজলে-পত্রে বর্ণিত জেলাগুলিব সঙ্গে জুড়ে দিলেন সমগ্র বাজশাহী বিভাগ (দার্জিলিং বাদে, কিন্তু মালদা-সহ) ও ঢাকাব বাকী জেলাগুলি। চট্টগ্রাম বিভাগ তো আগে থেকেই ছিল। বিজলেব মন্তব্য এ বিষযে আলোকপাত কবে: "সংযুক্ত বাংলা শক্তিশালী। বিভক্ত বাংলা বিভিন্ন দিকে আকৃষ্ট হবে। কংগ্রেস নেতাবা এ ভয় কবছেন। তাঁদের আশঙ্কা নির্ভুল এবং সেটাই এই প্রস্তাবেব সবচেয়ে বড়ো গুণ। আমাদেব অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ব্রিটিশ বাজত্বের বিরোধী এক সুসংহত দলকে টুকবো কবে দুর্বল কবে দেওয়া।"[৩৮] কার্জন ঢাকার বক্তৃতায় ঘোষণা করলেন—মুসলিমদেব হৃতগৌবব পুনরুদ্ধাবেব জন্য আলাদা প্রদেশ বচনাই তাঁর লক্ষ্য। ঢাকাব নবাব সলিমুল্লাকে নামমাত্র সুদে এক লাখ পাউণ্ড ধার দেওয়া হল। বঙ্গভঙ্গেব প্রস্তাবে সাম্প্রদায়িক মাত্রা সুস্পষ্টভাবে যুক্ত হ'ল। রিজলের মন্তব্যে তির্যকভাবে ও ফ্রেজারের মন্তব্যে প্রকাশ্যে ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ প্রভৃতি জেলাব চরমপন্থী কার্যকলাপেব প্রতি ইঙ্গিতও কবা হয়েছে। নতুন প্রদেশে তাদের দমন কবা সহজ হবে এমন আশা ছিল।

কার্জন কংগ্রেসের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য কবলেন। বঙ্গভঙ্গের শেষ প্রস্তাবে বাংলা হাবাল ১৫টি জেলা। ৯০ লক্ষ মুসলমান নিয়ে তার জনসংখ্যা দাঁড়াল ৫ কোটি ৪০ লক্ষে। নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশেব জনসংখ্যা হ'ল ৩ কোটি ১০ লক্ষ, তাব মধ্যে ১ কোটি ৮০ লক্ষই মুসলিম। কিছুটা টালবাহানা কবে ভাবত সচিব সম্মতি দিলেন। পূর্ণ প্রস্তাব

১৯-এ জুলাই ঘোষিত হল এবং ১৬ অক্টোবর কার্যে পরিণত হ'ল।

অদূরদর্শী কার্জন বোঝেননি যে কি মারাত্মক অস্ত্র তিনি চরমপন্থীদের হাতে তুলে দিলেন। সরকারী প্রস্তাব প্রকাশিত হবার আগেই 'সঞ্জীবনী' বিদেশী বর্জনের ডাক দিল। যেদিন বাংলার বুক চিরে কার্জনের আঁকা দাগ পাকা হয়ে গেল (১৬ অক্টোবর), সেদিন 'বন্দেমাতরম্' ও রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সঙ্গীত কণ্ঠে নিয়ে দলে দলে বালকবৃদ্ধযুবা অরন্ধন ও রাখীবন্ধনের মাধ্যমে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত কবল।

কিন্তু কিভাবে "বাংলার মাটি বাংলার জল" এক হবে? স্বদেশী আন্দোলন ত্রিধারায় প্রবাহিত হয়েছিল। প্রথম ধারাকে বলা যেতে পারে গঠনমূলক স্বদেশী। 'স্বদেশীসমাজ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এ ধবনের গঠনমূলক কাজেব কথা বিশদ করেছিলেন। তাঁব প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আত্মশক্তির উদ্বোধন। বয়কটকে তিনি মনে করতেন নঞর্থক—"বয়কট দুর্বলেব প্রয়াস নহে, ইহা দুর্বলের কলহ।"[৩৯] যদি গ্রামে গ্রামে সমবায় প্রথায় কৃষি, ব্যাঙ্ক ও বিক্রয ভাণ্ডার গড়ে ওঠে, যৌথ খামার তৈরি হয়, গ্রামীণ শিল্প শেখাবার বিদ্যালয স্থাপিত হয, সর্বোপরি জমিদার-মহাজন-আদালতেব পেয়াদা ও পুলিশ প্রতিরোধের নৈতিক শক্তি জেগে ওঠে তবে বাইবে ইংরেজ বাজের ঠাট বজায থাকলেই বা কি এসে যায়? বিলাতী কাপডেব চেয়ে সস্তায়, অন্তত সমান দামে, দেশী কাপড জোগাতে না পারলে বয়কট হবে দরিদ্রের ওপর অত্যাচার এবং শেষ পর্যন্ত তা সাম্প্রদায়িক কলহ ডেকে আনবে। "ভাবতেব সমাজ উচ্চনীচ নানা স্তরে বিভক্ত।" "আমাদেব বৈচিত্র্য আছে কিন্তু কোন ঐক্যের তত্ত্ব কাজ কবছে না।" এ অবস্থায় "শুদ্ধমাত্র ভাঙন, নির্বিচাব বিপ্লব কোনমতেই কল্যাণকব হইতে পাবে না।"[৪০]

স্বদেশী বলতে প্রফুল্লচন্দ্র বায় ও নীলবতন সবকাব কিন্তু বৃহদাকার ও আধুনিক শিল্পেব কথাই ভেবেছিলেন। এ সময় বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের মত স্বদেশী কাপডেব কল, উন্নত তাঁত, চীনামাটি, চামডা, দেশলাই ও সাবানেব কাবখানা, এমনকি জাহাজ নির্মাণেব উদ্যোগ গডে ওঠে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূলধন ও অভিজ্ঞতার অভাবে তা বিনষ্ট হলেও সফল ব্যতিক্রম—জামসেদজি টাটার লৌহ ও ইস্পাত কারখানা—আজও আমাদের গর্বেব বিষয়। স্বেচ্ছাসেবীব দল মাযের দেওয়া মোটা কাপড বাড়ি বাড়ি ফিবি কবত। আদর্শবাদেব কমতি না থাকলেও বিলাতী ব্যবসাযেব গাযে তা প্রবল বা দীর্ঘস্থাযী আঘাত হানতে পারেনি।

দ্বিতীয় ধারা বযকটকে প্রাধান্য দিয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ ও গোখ্‌লেব মত নবমপন্থীরা বযকটকে একটা সামযিক এবং বাজনৈতিক হাতিযাব রূপে দেখতেন। তাঁবা মনে করেছিলেন ল্যাঙ্কাশিযরের স্বার্থ ব্যাহত হলে, তা পার্লামেন্ট ও ভাবত সরকারেব ওপব চাপ দেবে এবং বঙ্গভঙ্গ প্রত্যাহৃত হবে। তিলক ও অববিন্দ কিন্তু বযকটকে এত সামযিক ও সীমাবদ্ধ প্রয়োজনে ব্যবহাব কবতে চাননি। তাঁবা একে মনে কবতেন স্ববাজলাভেব জন্য প্রয়োজনীয় আত্মিক প্রস্তুতি। তিলক এব নাম দিয়েছিলেন—"বহিষ্কাবেব যোগ।" তাছাড়া তাঁরা বয়কট বলতে শুধু কাপড, চিনি, নুন বর্জন বোঝেননি, তাঁরা চেয়েছিলেন শাসনেব সব ক্ষেত্রে—শিক্ষা, বিচার, পৌবসভা, আইন পবিষদ—তাকে প্রযোগ করতে। অরবিন্দ এব নাম দিযেছিলেন "নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ।" বয়কট অনেক কারণেই প্রত্যাশিত সাফল্য লাভ করেনি। কলকাতা বন্দবে আমদানীর সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায আমদানী বিলাতী কাপডেব মূল্য ১৯০৫-৬-এ ছিল ২১ ৪৪ কোটি টাকা, ১৯০৬-৭-এ ১৮·৬২ কোটি টাকা, ১৯০৭-৮-এ ২৩ ৭৩ কোটি টাকা এবং ১৯০৮-৯-এ ১৬ ২০ কোটি টাকা। সরকারী মতে ১৯০৮ সালের কমতির জন্য বিশ্বমান্দ্য দায়ী। পরের বছবই আমদানী বেড়ে হয় ২০ ২০

কোটি টাকা। মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী ও বিদেশী মিলমালিকদের ঝগড়া খানিকটা দায়ী। তিলক ও খাপার্ডের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও তারা বিলাতী বস্ত্র বিক্রয় বন্ধ করেনি। উত্তরপ্রদেশের নেতারা তো সরকারকে বলপ্রয়োগে বয়কট বন্ধ করতে অনুরোধ করেছিলেন। লবণ ও চিনির আমদানী তো বেড়ে গিয়েছিল।[৪১]

জাতীয় শিক্ষার পরিকল্পনা এই ব্যাপক বয়কটের অবশ্যম্ভাবী অঙ্গ। সতীশ মুখোপাধ্যায়ের ডন সোসাইটি এ নিয়ে আলোচনা শুরু করেছিল এবং রবীন্দ্রনাথ, গুরুদাস সবাই এতে যোগ দিয়েছিলেন। কার্জনের বিশ্ববিদ্যালয় আইন (১৯০৪) ও কার্লাইল সার্কুলার (১০ অক্টোবর ১৯০৫) জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনকে সক্রিয় করল। স্থাপিত হল জাতীয় শিক্ষা পরিষদ ও বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ; নরমপন্থীদের চেষ্টায় বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিট্যুট। প্রথমটির অধ্যক্ষরূপে অরবিন্দ বললেন, এ শিক্ষায় যে সাংস্কৃতিক জমি তৈরি হবে, তাতে উৎপন্ন হবে স্বাধীনতার ফসল। দেশের বাহ্য সম্পদ উন্নয়নের বা বৃত্তি শিক্ষার জন্য অরবিন্দ মাথা ঘামাতেন না। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় তিনি যখন পদত্যাগ করলেন, তখন ২৫টি মাধ্যমিক ও ৩০০ প্রাথমিক জাতীয় বিদ্যালয় সংগঠিত হয়েছে।

কিন্তু চরমপন্থীদের চোখে স্বদেশী, বয়কট, জাতীয় শিক্ষা গৌণ, মুখ্য—স্বরাজ। এ নিয়ে কলকাতা কংগ্রেস (১৯০৬)-এ তুমুল বিতর্ক হয়ে গেল। বারাণসী কংগ্রেস (১৯০৫)-এর সময় থেকে মহারাষ্ট্র ও বাংলার চরমপন্থী দলের বোঝাপড়া শুরু হয়। ১৯০৬-এর জুন মাসে তিলক কলকাতা এলে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হয়। আর এল মুধোলকর গোখ্‌লেকে লেখেন (১৪ সেপ্টেম্বর ১৯০৬), গোলমাল অনেকদূর গড়াবে। তিলককে সভাপতি করার প্রস্তাব ওঠে কিন্তু বোম্বাই দল কংগ্রেস বর্জনের ভয় দেখায়। গোখলে আশঙ্কা করেন যে গোলমালের ফলে মর্লের শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের কল্পনা ভেস্তে যাবে। নটেশনকে লেখা চিঠিতে (২রা অক্টোবর ১৯০৬) তিনি তিলকের "ষড়যন্ত্র করার তুলনাহীন ক্ষমতা" ও অবিবেকিতাকে দায়ী করেছেন। শেষে দাদাভাই নৌরিজিকে সভাপতি পদে আহ্বান করে নরমপন্থীরা বিপক্ষের মুখ বন্ধ করেন। পুরো বন্ধ যে হয়নি তার প্রমাণ ৩ অক্টোবরের 'বন্দেমাতরম্'-এ অরবিন্দের প্রবন্ধ।

দ্বারভাঙার মহারাজার বাড়িতে কংগ্রেসের সভা বসল। আগের বছরের সভাপতি রূপে গোখ্‌লে বঙ্গভঙ্গের সমালোচনা করেছিলেন এমনকি বয়কট পছন্দ না করলেও সাময়িক অস্ত্র হিসাবে তা ব্যবহার করতে রাজিও হয়েছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের লক্ষ্য বদলাতে তিনি সম্মত ছিলেন না। এদিকে চরমপন্থীরা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনে থেমে থাকতে রাজি নন। গোখ্‌লে মাদ্রাজ ও উত্তর প্রদেশের প্রতিনিধিদের পুরো, বোম্বাই, পঞ্জাব ও সি পি-র দুই তৃতীয়াংশ এবং বাংলার অর্ধেক ভোট পাবেন আশা করেছিলেন। কিন্তু খাপার্ডের ডায়েরি (২৪ ডিসেম্বর)-তে দেখি তিলক দলের লোকদের নিয়ে আলাদা সভা করেছেন এবং স্থির হয়েছে যে তাঁদের প্রস্তাব বিষয় নির্বাচনী কমিটি প্রত্যাখ্যান করলে তা পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে পেশ করা হবে। দ্বারভাঙার মহারাজা রোজকার ঘটনা জানাতেন বড়লাটের সচিব ডানলপ স্মিথকে। তাঁর ডায়েরিতে পড়ি, খাপার্ডে ও পাল ব্রিটিশ আশ্বাসে বিশ্বাস স্থাপন করেননি। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনে তাঁরা সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিলক ও মতিলাল ঘোষ প্রায় একই দলে। লাজপৎ রায় তাঁদের নরম করার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছিলেন। আর অজিত সিং চরমপন্থীদের পক্ষ নেন। ভোটাভুটি হলে পালরা জিততেন। কিন্তু মতিলালের চিঠিতে (জওহরলালকে—২৭ ডিসেম্বর ১৯০৬) জানি দাদাভাই ভোট হতে না দেওয়ায়

চরমপন্থীরা সভা ত্যাগ করে। পূর্ণ অধিবেশনে 'স্বরাজ' শব্দ ব্যবহার কবে দাদাভাই উভয় পক্ষকেই খুশি করাব চেষ্টা করেন। স্বরাজ বলতে নরমপন্থীরা বুঝল ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন, চরমপন্থীরা বুঝল—স্বাধীনতা। দাদাভাই-এর ব্যবহৃত পুরো কথাগুলি হ'ল **"Self Government or Swaraj like that of the United Kingdom or the Colonies."** যে যা মানে করে তাই। তার পর উঠল বয়কট প্রসঙ্গ। চরমপন্থীরা চাইল সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সর্বাঙ্গীণ বয়কট, নরমপন্থীরা কয়েকটি সীমিত ব্রিটিশ পণ্যের ব্যাপারে তার প্রয়োগ। স্বদেশীর ব্যাপারে নবমপন্থীদের বয়ান ছিল, "এমনকি স্বার্থত্যাগের দরকার হলেও", আর চরমপন্থী বয়ান ছিল, "যে কোন ত্যাগে স্বদেশী।" মালব্যের ভাষণে পরিষ্কার বোঝা যায় তিনি বাংলার বাইরে বয়কট আন্দোলন চাননি। তাঁর মত অনেকেই। চরমপন্থীরা দলে ভারী ছিল। দাদাভাইকে কেউ অপমান করেনি বটে তবে সুরেন্দ্রনাথ ও মেহ্‌তা তরুণদের হাতে লাঞ্ছিত হন। তিলকরা বোঝেন যদি তাঁদের মত প্রতিষ্ঠিত করতে হয় তবে নতুন এক দল গড়তে হবে। তাঁরা এ দলের নাম দিলেন **New Party**, পঞ্জাবে অজিত সিং গড়লেন 'ভারতমাতা সভা।'[৪২]

স্বদেশী আন্দোলনের পক্ষে জনমত সংগঠনের জন্য জেলায জেলায় সমিতি স্থাপিত হল। গৃহীত নীতি কার্যে পরিণত করার জন্য তৈরি হল জাতীয় স্বেচ্ছাসেবী দল। সমিতিব মধ্যে বিখ্যাত ছিল ববিশালেব 'স্বদেশ বান্ধব', ফরিদপুরের 'ব্রতী', মৈমনসিংহের 'সুহৃদ' (ও 'সাধনা')—আর সবচেয়ে বিখ্যাত ঢাকার 'অনুশীলন'। জেলা সমিতির অধীনে অনেক শাখাও স্থাপিত হয়। তবে কেন্দ্রীয় সমিতির কর্মকতাদেব তালিকা প্রতিপন্ন করে যে এগুলি মূলত ভদ্রলোকদের প্রতিষ্ঠান। যেমন স্বদেশ বান্ধব সমিতিব ৭৩ জন কর্মকর্তার মধ্যে ছিলেন সাতজন জমিদার, ঊনিশ জন উকিল, পনেব জন শিক্ষক। সাধারণ সভ্যদের মধ্যে ছাত্র, অল্পবয়েসী উকিল ও মধ্য স্বত্বাধিকারীর সংখ্যা ছিল বেশি। এব প্রাণপুরুষ অশ্বিনীকুমার দত্ত মুসলমানদের দলে আনার চেষ্টায় কিছুটা সফল হলেও হিন্দু ভদ্রলোকদেব অনীহা ও সরকাব পক্ষেব কূট চালের ফলে তা ব্যাহত হয়।

হিন্দু জমিদার, কর্মচাবী, মহাজন (ঢাকার সাহা) কর্তৃক নিপীড়িত মুসলিম জোতদার, প্রজা ও ভাগচাষীদেব মধ্যে সাম্প্রদায়িক উসকানি দেওযা সহজ ছিল। খাজনা বাড়িয়ে, মাথোট বসিয়ে, প্রতিমা পূজা বাবদ ঈশ্বরবৃত্তি চাপিয়ে তারা যৌথ স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধিতাই করেছিল। তাছাড়া মুসলিম নবাব, জমিদার, তালুকদারদের খুশি করতে মিণ্টো-মর্লে সাম্প্রদায়িক ভোট দানের ব্যবস্থা করেন। এদেরই প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগ (১৯০৬) জন্ম লগ্ন থেকেই স্বদেশীর শত্রু ছিল। মোল্লা ও মৌলভীদের অনেকেই সলিমুল্লার লোক ছিল এবং নদীয়া, ঈশ্বরগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার হাঙ্গামায় মদত দিয়েছিল। 'লাল ইস্তাহারের' মত প্রচার পুস্তিকা কম প্ররোচনামূলক নয়। জেলাশাসক হিউজ বুলার লিয়াকত হোসেনের প্রচার সাফল্যে শঙ্কিত হযে সাম্প্রদাযিক বিদ্বেষ ছড়াবাব কাজে ইব্রাহিম খাঁকে লাগান। কুমিল্লার জেলাশাসক গার্লিক সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের ব্যাপারে নবাবকে সমর্থন কবলে হাইকোর্ট তাঁর পক্ষপাতিত্বের প্রতি কটাক্ষ করেছিল। ছোটলাট হেয়ার তাঁর পূর্বসূরী ব্যামফিল্ড ফুলারের চেয়ে কম সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। তাঁর ও মিণ্টোর পত্রালাপ এ প্রসঙ্গে অনেক আলোকপাত করে।[৪৩]

তবু রবীন্দ্রনাথের সাবধানবাণী আজও কানে বাজে : "একথা বলিয়া নিজেকে ভুলাইলে চলিবে না যে হিন্দু মুসলমানের সম্বন্ধের মধ্যে কোন পাপই ছিল না, ইংরেজই মুসলমানকে আমাদের বিরুদ্ধে করিয়াছে···শনি তো ছিদ্র না পাইলে প্রবেশ করিতে পারে না ; অতএব

শনিব চেয়ে ছিদ্র সম্বন্ধেই সাবধান হইতে হইবে।" স্বদেশী নেতারা অনেকেই এই ছিদ্রেব সমস্যা সমাধান না করে বযকট জোর করে চাপাতে চেযেছিলেন। কেউ কেউ আবার স্বদেশী আন্দোলনকে সামনে রেখে গোপনে সন্ত্রাসবাদেব পথে পা বাড়ালেন।

তাঁদের নেতৃত্ব দিলেন অরবিন্দ ঘোষ—কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীনের মাধ্যমে। গোয়েন্দা বিভাগের ড্যালির মতে ১৯০০ সালে (অনেকের মতে ১৯০২) বরোদা থেকে তাঁর দূত যতীন ব্যানার্জী আসেন কলকাতাব অনুশীলন সমিতির প্রধান পি মিত্রের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে। ১৯০২ সালে তিনি নিজে আসেন এবং সে সময় মেদিনীপুরের কিছু নেতা—হেমচন্দ্র কানুনগো, সত্যেন বসু প্রভৃতিকে—দীক্ষা দিয়ে যান। গোয়েন্দা বিভাগের নিকসনের মতে বারীন বিভিন্ন জেলার অবস্থা পরিদর্শন করেন কিন্তু যতীন ব্যানার্জীর সঙ্গে কলহেব ফলে বাংলা ত্যাগ কবেন। ১৯০৪ সালে ঝগডা মেটাতে অরবিন্দ দ্বিতীয়বার বাংলায় আসেন। ড্যালির মতে বাবীন ফিরে আসেন ১৯০৫ সালে (নিকসনের মতে ১৯০৪ সালে) এবং বঙ্গভঙ্গের ফলে বৈপ্লবিক পরিস্থিতি দানা বাঁধছে দেখে অরবিন্দ নিজে আসেন পবেব বছব। অববিন্দেব নির্দেশে এক দল যুবক মণীন্দ্র লাহিড়ী, অবিনাশ চক্রবর্তী প্রভৃতিব আর্থিক সাহায্যে 'যুগান্তব' পত্রিকা প্রকাশনা শুরু কবেন। অরুণচন্দ্র গুহ Aurobindo and Yugantar গ্রন্থে লিখছেন, "...the starting of *Jugantar* was the beginning of Yugantar as a separate group—actively dedicated to the cause of a revolutionary movement."বাবীন 'যুগান্তর' নামে একটা উপদল তৈরি করেন এবং ছাত্র ভাণ্ডাব, আত্মোন্নতি সমিতি ও চন্দননগরেব পূর্ব স্থাপিত দলগুলিব সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন কবেন। ঢাকার অনুশীলন সমিতি আর্মস্ট্রং এব মতে ১৯০৫ এব ৩ নভেম্বর, (কিন্তু বার্ডেব মতে ১৯০৬ সালেব সেপ্টেম্বব মাসে) প্রতিষ্ঠিত হয। এব নেতা পুলিন দাশের অস্ত্রশিক্ষা সরলাদেবীর আখড়ায়। অসাধারণ কর্মপটু পুলিন অতি শীঘ্রই পূর্ববঙ্গ ও আসামে পাঁচশত শাখা খোলেন, যাব সদস্য সংখ্যা তিন হাজাবেব মত। ১৯০৬ সালে ববিশাল প্রাদেশিক কনফারেন্সে পুলিশেব বেপরোয়া লাঠি চালনাব প্রতিবাদে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ শুরু হয। ১৯০৭ সালে শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মাব সাহায্যে হেমচন্দ্র কানুনগো বোমা তৈবি শিখতে প্যারিস যান এবং ফেবেন ১৯০৮ সালের জানুয়ারি মাসে। ইতিমধ্যে ১৯০৭ সালে বিভিন্ন ডাকাতি, ঢাকার জেলাশাসক অ্যালেনকে হত্যাব চেষ্টা, দুবাব ছোটলাট ফ্রেজারের ট্রেন ওড়াবার চেষ্টা চলে। অন্যদিকে অরবিন্দদের মুরারিপুকুরের বাগানবাড়িতে 'যুগান্তব', 'বন্দেমাতরম্' ও ছাত্র ভাণ্ডাবের দল নিয়ে বারীন অস্ত্র সংগ্রহ ও শিক্ষাদান শুরু করেন। অজিত সিং-এর সদ্য প্রকাশিত আত্মজীবনী Buried Alive থেকে দেখা যায় গুরুদাসপুর, অম্বালা, ফিরোজপুরে সৈন্যদেরও উত্তেজিত করা হয়। রাওলপিণ্ডি ও লাহোবে ইংরেজদের ওপর হামলা হয়। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে বাঁকে দয়ালের গান—"পাগড়ি সাম্হালও জাত্তা, পাগড়ি সাম্হালও"।

বাংলায় এসব কাজের প্রাণপুরুষ ছিলেন অরবিন্দ, কিন্তু তাঁর কোনও ব্যাপক পরিকল্পনা ছিল বলে মনে হয় না। নিজে মিস্টিক স্বভাবের ছিলেন বলে তিনি বিশ্বাস করতেন মা (দেশমাতা ও কালী অবশ্যই সমার্থক) প্রয়োজনে সব জুগিয়ে দেবেন। কিন্তু তিনি শুধুই গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন না—নরমপন্থীদের হাত থেকে কংগ্রেসের কর্তৃত্বও কেড়ে নিতে চেয়েছিলেন। প্রকাশ্যে কংগ্রেসের মাধ্যমে এবং গোপনে বিপ্লবীদের মাধ্যমে তিনি যুগপৎ আক্রমণ করতে চেয়েছিলেন। প্রথমে মেদিনীপুর প্রাদেশিক কনফারেন্সে সুরেন্দ্রনাথকে পুলিশের সঙ্গে যোগসাজসের দায়ে অভিযুক্ত করে অভিপ্রায়ের ইঙ্গিত

দিয়েছিলেন তিনি। তাবপব সদ্যমুক্ত লাজপৎ রাযকে জানালেন পরবর্তী কংগ্রেসের সভাপতি হবার আহ্বান। গোখ্‌লে ও সুরেন্দ্রনাথের অনুরোধে লাজপৎ পিছিয়ে যেতে তিনি তিলকের নাম তুললেন।

ইতিমধ্যে নরমপন্থীরাও সংগ্রামের জন্য তৈরি হচ্ছিল। বোম্বাই প্রাদেশিক কনফাবেন্সে মেহ্‌তা বয়কট ও জাতীয় শিক্ষাব কথা উল্লেখ কবেননি। তিনি ও গোখ্‌লে ঠিক করেন নাগপুরে অধিবেশন ডেকে ও বাসবিহারী ঘোষকে সভাপতি করে তাঁবা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করবেন এবং তাব সাহায্যে কলকাতায গৃহীত প্রস্তাবগুলি আবো জোলো করে দেবেন। মর্লের শাসন সংস্কার সম্বন্ধে নিঃসংশয হবার জন্যই তাঁদের এত আয়োজন। তখন অভ্যর্থনা সমিতি সভাপতি নির্বাচন করত। চবমপন্থীবা সে সমিতি দখল করল এবং তার কার্যনির্বাহিক সমিতিতে নিজেদের লোক ঢুকিয়ে তিলকের নাম প্রস্তাব করতে চাইল। এব ফলে নরমপন্থীরা প্রমাদ গুনল ও নাগপুর থেকে অধিবেশন সরাতে চাইল। ১৯০৭-এর ২ অক্টোবব মেহ্‌তাকে এই পবামর্শ দিলেন মুধোলকার। একই পবামর্শ আসে বডলাটের ব্যক্তিগত সচিব ডানলপ স্মিথের কাছ থেকে। ওযাচাকে লেখা অ্যালফ্রেড নন্দীব (১১ অক্টোবব ১৯০৭) চিঠি থেকে তা জানা যায। ১০ নভেম্বব স্থাযী কমিটির সভায সুরাটে অধিবেশন স্থানান্তবিত করার প্রস্তাব উঠলে তিলক ও খাপার্ডে ভোট দানে বিবত থাকেন। ১৪ নভেম্বব ওযাচা গোখ্‌লেকে জানাচ্ছেন সুবাট বাজি হযেছে এবং তিনি বাসবিহাবী ঘোষেব সভাপতিত্ব পাকা কবে ফেলেছেন। একটি ছাড়া সব প্রাদেশিক কমিটি ও অভ্যর্থনা সমিতি বাজি হল। 'বন্দেমাতবমে' অববিন্দ লিখলেন, "মেহ্‌তা ঐন্দ্রজালিকের মত সুরাটে কংগ্রেস সবিযেছেন।" তাঁব দলের ক্ষোভ অনুমেয়।

তবুও প্রায় ১৬০০ প্রতিনিধির মধ্যে অন্ততঃ ৬০০ ছিল চবমপন্থী এবং সুবেন্দ্রনাথ বযকট ও স্বদেশী প্রস্তাবে মেহ্‌তাব বিরোধিতা কবতে বাজি ছিলেন। অন্যদিকে মেহ্‌তা চাইছিলেন কলকাতা কংগ্রেসের বিতর্কিত প্রস্তাবগুলি বাদ দিতে। সুরেন্দ্রনাথ বহু চেষ্টা করেও তাঁকে নরম করতে পাবলেন না। তবে তিনি রাসবিহারী ঘোষেব সভাপতিত্ব নিযে আপত্তি তুলতে নাবাজ হন। এই ছিল সুবাট দক্ষযজ্ঞের প্রেক্ষাপট।

২৬ ডিসেম্বর, ১৯০৭। অম্বালাল দেশাই আনুষ্ঠানিক ভাবে বাসবিহারীর নাম প্রস্তাব করলেন। সুবেন্দ্রনাথ সমর্থন করতে উঠলে গোলমাল শুরু হল ও সভা মুলতুবি বাখা হল। লাজপতেব মতে তিলক দুবার বাসবিহারীব সভাপতিত্ব মেনে নিতে রাজি হন যদি প্রস্তাবগুলি বিষয নির্বাচনী কমিটির হাতে ছেড়ে দেওযা হয়। তিলকের অনুচবরা এত নমনীয ছিলেন না। যাই হোক, রুশ কনসাল জেনারেলের রিপোর্টে দেখা যায় নরমপন্থীরা সমঝোতার প্রস্তাব নাকচ করলে ২৭ ডিসেম্বর তিলক সভাপতি অনুমোদনেব সংশোধনী তুলতে চাইলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মালভি তাঁকে বলতে না ডাকায় তিলক উঠে দাঁড়ালেন।

এতে রাসবিহারী ও মালভি আপত্তি জানালেন। এর মধ্যে অরবিন্দকে বিশ্রী ভাষায় গালাগাল দেওয়ার জন্য বাংলা দল আবও খেপে ছিল। যখন বাসবিহারী ভাষণ পডছিলেন এবং তিলক তাঁর নির্বাচনে আপত্তি জানাচ্ছিলেন তখন হঠাৎ একটা মারাঠী জুতো আছড়ে পড়ল মঞ্চের ওপর, মেহ্‌তার গা থেকে ছিটকে লাগল ব্যানার্জীর গায়ে। শুরু হল তাণ্ডব—লাঠালাঠি, চেয়ার ভাঙাভাঙি, মাথা ফাটানো এবং শেষ পর্যন্ত পুলিশের আগমন। বিদেশী সাংবাদিক নেভিনসন তার নিখুঁত বর্ণনা রেখে গেছেন।

অরবিন্দ পরে লিখেছিলেন, "আমি তিলকের সঙ্গে পরামর্শ না করেই হুকুম দিয়েছিলাম

কংগ্রেস অধিবেশন ভেঙে দিতে।" তাঁর ভাই বারীনের ভাষায়, "সবারই কাঁধে দক্ষযজ্ঞনাশী পিনাকীর এক একটি দানা সওয়ার হইয়াছে, সবাই পুরাতনের কালাপাহাড়! নূতনের নেশাখোর নবাস্বাদিত শক্তিসুরার মাতাল।" সুরাটের দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করার ব্যাপারে তিলকের খুব বেশি হাত ছিল না। বি· আর· নন্দ তাঁর গোখলে-জীবনীতে তিলকের প্রতি অন্যায় করেছেন।[৪৪]

অরবিন্দের দল তখন পুরোপুরি সন্ত্রাসবাদী কাজের দিকে ঝুঁকেছে। হেমচন্দ্র ফিরে এসেছেন। মুরারিপুকুরের কাজ চলেছে প্রায় পুলিশের চোখের ওপরে। কিন্তু কিংসফোর্ড হত্যার চেষ্টায় বিফল ক্ষুদিরাম ধরা পড়লে বাগানবাড়িতে তল্লাসি হল, অস্ত্রশস্ত্র ধরা পড়ল, অরবিন্দের দলের প্রায় সবাই গ্রেপ্তার হয়ে আলিপুরে বোমার মামলায় অভিযুক্ত হল। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে টেগার্টের এক অপ্রকাশিত জীবনী "Memoirs of an Indian Police Officer" অবিষ্কার করেছি। এটি সংকলন করেছেন টেগার্টের পত্নী কে· এফ· টেগার্ট (Mss. Eur. C 235/1). এতে বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে।বোমা নিয়ে 'কেশরী'তে প্রবন্ধ লেখার জন্য তিলকের ছ'বছর দ্বীপান্তর হয়ে গেল। কৃষ্ণকুমার মিত্র, অশ্বিনী দত্ত প্রভৃতি আরো কয়েকজন নির্বাসিত হলেন। সমিতিগুলির ওপর নামল রাজরোষ। আলিপুর মামলায় অরবিন্দ ছাড়া পেলেও বাকীরা হয় দ্বীপান্তর না হয় সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। ক্ষুদিরাম এবং নরেন গোঁসাই-এর হত্যার জন্য কানাই ও সত্যেন ফাঁসীর মঞ্চে জীবন দিলেন। ১৯১০-এর এপ্রিলে ছোটলাট বেকার অরবিন্দকে পুনরায় গ্রেপ্তার করার জন্য আবেদন করলে মিন্টো অনুমতি দেন। কিন্তু পূর্বাহ্নে খবর পেয়ে অরবিন্দ চন্দননগরের পথে পণ্ডিচেরী রওনা হয়ে যান। তাঁর পণ্ডিচেরী প্রয়াণে এ পর্বের অবসান ঘটল। সত্যকার ধর্মবোধ তাঁর মধ্যে জাগ্রত হচ্ছিল—তা "কারাকাহিনী" পড়লেই বোঝা যায়। তিনি ধর্মের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদকে খাপ খাওয়াতে পারছিলেন না।[৪৫] তবে বিপ্লববাদ নতুন মোড় নেয় যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে। পুলিন দাসের নেতৃত্বে ঢাকা অনুশীলন স্বদেশী আন্দোলনের কার্যসূচির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েনি। প্রথম থেকেই তার ভূমিকা ছিল এক সুকঠিন শৃঙ্খলাবদ্ধ গুপ্ত সন্ত্রাসবাদী দলের। ১৯১০-এ ছাড়া পাওয়ার পর পুলিন পুনরায় কারারুদ্ধ হন ও ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হন। নেতৃত্ব দেন মাখন সেন, নরেন সেন, প্রতুল গাঙ্গুলী প্রমুখ। ক্যাম্বেল কের (Kerr) উভয় দলের পার্থক্য তুলে ধরেছেন।[৪৬]

রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য দিয়ে এ প্রসঙ্গ শেষ করছি। "মধ্যমপন্থী ও চরমপন্থী এই উভয় দলই কংগ্রেস অধিকার করাকেই যদি দেশের কাজ করা বলিয়া একান্ত ভাবে না মনে করিতেন, যদি দেশের সত্যকার কর্মক্ষেত্রে ইঁহারা প্রতিষ্ঠালাভ করিতে থাকিতেন—দেশের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-অন্নের অভাব মোচন করিবার জন্য যদি ইঁহারা নিজের শক্তিকে নানা পথে অহরহ একাগ্রমনে নিয়োজিত করিয়া রাখিতেন, দেশহিতের সত্যকার সাধনা ও সত্যকার সিদ্ধি কাহাকে বলে তাহার স্বাদ যদি পাইতেন এবং দেশের জনসাধারণের সঙ্গে কায়মনোবাক্যে যোগ দিয়া দেশের প্রাণকে দেশের শক্তিকে প্রত্যক্ষ ভাবে উপলব্ধি করিতেন তাহা হইলে কংগ্রেস সভার মঞ্চ জিতিয়া লইবার চেষ্টায় এমন উন্মত্ত হইয়া উঠিতেন না।"[৪৭]

দুদিকের এই জিদ প্রমাণ করল যে কোন পন্থীই কংগ্রেসকে তেমন বড়ো করে দেখেনি। স্বার্থের পার্থক্য ও মতের অনৈক্য সহ্য করে সত্য রক্ষা ও মঙ্গলকে কাজে প্রতিফলিত করার শিক্ষা পেতে কংগ্রেসকে আরো দশ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। সে শিক্ষা এসেছিল মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর কাছ থেকে। জনগণের সমর্থন লাভের জন্য ধর্মকে কাজে

লাগিয়ে তাঁরা সাম্প্রদায়িক বিপত্তি ডেকে এনেছিলেন। আবার জনসাধারণ—যার মধ্যে কৃষকদের সংখ্যা সর্বাধিক—তাদের জন্যও চরমপন্থীদের কোন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ছিল না। গান্ধীর শক্তির পেছনে ছিল দেশব্যাপী কৃষক সম্প্রদায়ের সমর্থন এবং খিলাফৎ আন্দোলনের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য। তবু চরমপন্থীরা একটা কথা প্রাণ দিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন যে "আবেদন নিবেদনের থালা বহি বহি নতশির" নরমপন্থীদের কোনো রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নেই। এঁরাই প্রমাণ করলেন শর্তহীন সহযোগিতার নীতি ভ্রান্ত, তা মর্লের শাসন সংস্কারের বেশি কিছু আদায় করতে পারে না। তাঁরা বোঝালেন ইংরাজদের কাউন্সিল মায়ার ছলনা, তার মোহে পড়লে মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিতে হয়। তাঁরা দেখালেন ভারতের লক্ষ্য—পূর্ণ স্বরাজ এবং তা অর্জন করতে হবে বীর্য ও মৃত্যুর শুল্কে। নঞর্থক বয়কট ও সদর্থক স্বদেশীর সাফল্য যতই সীমিত হোক, গান্ধীকেও তা গ্রহণ করতে হয়।

সুরাটের অব্যবহিত পরে মিণ্টো মর্লেকে লেখেন, "কংগ্রেসের পতন আমাদের পক্ষে একটা বড় জয়।" তাঁর চেয়ে দূরদর্শী মর্লে উত্তর দেন, "আপাতপতন মনে হলেও চরমপন্থীরাই একদিন কংগ্রেস দখল করবে।" ১৯১৭ সালের পর তাই ঘটল। গান্ধীর আবির্ভাবে ভারতের ম্রিয়মাণ জাতীয় জীবনে আবার বেজে উঠল নব বসন্তের নতুন প্রাণের গান।

Then for whom is it ? sad question ;
Fate no clear reply concedes,
When in days of sheer misfortune,
One great nation, silent, bleeds.
But strike up new songs and livening
Stand no more thus bowed, aghast,
Earth engenders songs again
As she has for ages past.

(Chorus, Goethe, *Faust*, Part II Act III)

টীকা

১ । অমিয় বাগচী (সং), The Evolution of the State Bank of India The Roots 1806-1876, ২ খণ্ড (অক্সফোর্ড, ১৯৮৭), অমলেশ ত্রিপাঠী, Trade and Finance in the Bengal Presidency 1793-1833 (Oxford, 1979) ও ভারতীয় বিদ্যাভবন প্রকাশিত রমেশচন্দ্র মজুমদার (সং), British Paramountcy and Indian Renaissance খণ্ডে অমলেশ ত্রিপাঠীর ব্যাংকিং বিষয়ক অধ্যায় দ্রষ্টব্য। অতি সম্প্রতি বেরিয়েছে সব্যসাচী ভট্টাচার্য, ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি ১৮৫০-১৯৪৭ (কলকাতা, ১৩৯৬)

২ । গভর্নর জেনারেলকে ভারত সচিব, ৩১ মার্চ, ১৮৯৪, পার্লামেন্টারী কলেকশন নং ২৭৬, বেভিন্যু নং ৬৫, পৃঃ ২২২, ঐ ১৩ ডিসেম্বর, ১৮৯৪, তদেব, বেভিন্যু নং ১৬৯, পৃঃ ২৩০-৩১ , আর্থার রেডফোর্ড, ম্যাঞ্চেষ্টার মার্চেন্টস অ্যাণ্ড ফরেন ট্রেড ২ খণ্ড, পৃঃ ৪১; এলগিনকে ফাউলার, ২, ৮, ১১, ২৫ জানুয়ারী ও ৮ ফেব্রুয়ারী ১৮৯৫, এলগিন পেপার্স, Eur Mss. F 84 ; ভারত সচিবকে গভর্নর জেনারেলের তার ৬ ফেব্রুয়ারী ১৮৯৬, পার্লামেন্টারী কলেকশন্স নং ২৭৬, পৃঃ ২৯৭ , মারাঠা, কেশরী, বেঙ্গলী ইত্যাদির প্রতিবাদ এর জন্য অমলেশ ত্রিপাঠী, ভারতের মুক্তিসংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব (কলিকাতা ১৯৮৭), পৃঃ ৫৯-৬০; পিটার হারনেটি, 'দ্য ইণ্ডিয়ান কটন ডিউটিজ কনট্রোভার্সি ১৮৯৪-১৮৯৬', ইংলিশ হিষ্টরিক্যাল রিভ্যু, ৭৭ (অক্টোবর ১৯৬২), পৃঃ ৬৮৪-৭০২; ইরা ক্লিন, 'ইংলিশ ফ্রি ট্রেডারস অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়ান ট্যারিফস্, ১৮৭৪-১৮৯৬,' মডার্ন এশিয়ান ষ্টাডিজ, ৫,৩ (জুলাই ১৯৭১), পৃঃ ২৫১-৭১

৩ । রবীন্দ্রকুমার, ওয়েষ্টার্ন ইণ্ডিয়া ইন দ্য নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি—এ ষ্টাডি ইন সোস্যাল হিষ্টরি অব মহারাষ্ট্র (লণ্ডন, ১৯৬৮)

৩ক । আর ই ফ্রিকেনবার্গ, গুণ্টুর ডিষ্ট্রিক্ট ১৭৮৮-১৮৪৮ ইত্যাদি (অক্সফোর্ড, ১৯৬৫); ঐ (সং), ল্যাণ্ড কন্ট্রোল অ্যাণ্ড সোস্যাল ষ্ট্রাকচার ইন ইণ্ডিয়ান হিষ্টরি (ম্যাডিসন, ১৯৬৯)

৪ । ধর্মকুমার (সং), কেমব্রিজ ইকনমিক হিষ্টরি অব ইণ্ডিয়া, ২ খণ্ড (কেমব্রিজ, ১৯৮২) , 'ল্যাণ্ড ওনারশিপ অ্যাণ্ড ইকোয়ালিটি ইন ম্যাড্রাস প্রেসিডেন্সি ১৮৫৩/৪—১৯৪৬/৪৭,' I E S H R , 12. 3 (July-Sept 1975)

৫ । এরিক ষ্টোক্স, দ্য পেজাণ্ট অ্যাণ্ড দ্য রাজ ইত্যাদি (কেমব্রিজ, ১৯৭৮), ১, ৯, ১২ অধ্যায় বিঃ দ্রঃ , ঐ, কেমব্রিজ ইকনমিক হিষ্টরি, ২ খণ্ড, পৃঃ ৩৬-৮৬

৬ । টম জি কেসিংগার, বিলায়তপুর ১৮৪৮-১৯৬৮ সোস্যাল অ্যাণ্ড ইকনমিক চেঞ্জ ইন আ নর্থ ইণ্ডিয়ান ভিলেজ (বার্কলে, ১৯৭৪)

৭ । রবীন্দ্রকুমার, ডেভিড লো সম্পাদিত সাউণ্ডিংস ইন মর্ডান সাউথ এশিয়ান হিষ্টরি (লণ্ডন, ১৯৬৮) ষ্টোকসের সিদ্ধান্ত সমর্থন করেছেন। কিন্তু নীল চার্লসওয়ার্থ বলছেন এটা পুরো মানা যায় না। পূর্ব ও মধ্য দাক্ষিণাত্যে কৃষি জমির প্রসার, ইক্ষু ও তুলাচাষের বিস্তার, মালবাহন ও যাতায়াতের ব্যবস্থার উন্নতি হলেও কোনো পরিকাঠামোগত (structural) পরিবর্তন বা সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত হয়নি। নীল চার্লসওয়ার্থ, পেজান্টস অ্যাণ্ড ইম্পিরিয়াল রুল অ্যাগ্রিকালচার অ্যাণ্ড অ্যাগ্রেরিয়ান সোসাইটি ইন দ্য বোম্বে প্রেসিডেন্সী ১৮৫০-১৯৩৫

৮ । ডেভিড ওয়াশব্রুক, 'ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট অ্যাণ্ড সোশ্যাল ষ্ট্রাটিফিকেশন ইন রুর্যাল ম্যাড্রাস দ্য ড্রাই রিজিয়ন ১৮৭৮-১৯২৯' ক্লাইভ ডিউই ও এ জি হপকিন্স (সং) দ্য ইম্পিরিয়াল ইমপ্যাকট ষ্টাডিজ ইন দ্য ইকনমিক হিষ্টরি অব অ্যাফ্রিকা অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়া (১৯৭৮), পৃঃ ৬৮-৮২

৯ । নীল চার্লসওয়ার্থ, 'রিচ পেজান্টস অ্যাণ্ড পুওর পেজান্টস ইন লেট নাইনটিনথ সেঞ্চুরি মহারাষ্ট্র', তদেব, পৃঃ ৯৭-১১৩

১০ । পি জে মাসগ্রেভ, 'রুর্যাল ক্রেডিট অ্যাণ্ড রুর্যাল সোসাইটি ইন দ্য য়ুনাইটেড প্রভিন্সেস, ১৮৬০-১৯২০', তদেব, পৃঃ ১১৬-৩২ , 'সোস্যাল পাওয়ার অ্যাণ্ড সোস্যাল চেঞ্জ ইন দ্য য়ুনাইটেড প্রভিন্সেস ১৮৬০-১৯২০', কে এন চৌধুরী ও ক্লাইভ ডিউই (সং), ইকনমি অ্যাণ্ড সোসাইটি এসেজ ইন ইণ্ডিয়ান ইকনমিক অ্যাণ্ড সোস্যাল হিষ্টরি (নিউ দিল্লী, ১৯৭৯) পৃঃ ৩-২৫ , ই হুইটকোম্ব, অ্যাগ্রেরিয়ান কণ্ডিশনস ইন নর্দার্ন ইণ্ডিয়া, ১ খণ্ড, দ্য য়ুনাইটেড প্রভিন্সেস আণ্ডার বৃটিশ রুল, ১৮৬০-১৯০০ (বার্কলে, ১৯৭২)

১০ক । ব্লেয়ার ক্লিং, দ্য ব্লু ম্যুটিনি—দ্য ইণ্ডিগো ডিসটারবেন্সেস ইন বেঙ্গল ১৮৫৯-৬২ (ফিলা, ১৯৬৬) , কল্যাণকুমার সেনগুপ্ত, পাবনা ডিসটারবেন্সেস অ্যাণ্ড দ্য পলিটিক্স অব রেন্ট ১৮৭৩-৮৫ (নি দি, ১৯৭৪)

১১ । বি বি মিশ্র, দ্য ইণ্ডিয়ান মিডল ক্লাসেস দেয়ার গ্রোথ ইন মর্ডান টাইমস (দিল্লী, ১৯৬১)

১২ । সি এ বেইলি, রুলারস, টাউনসমেন অ্যাণ্ড বাজারস (কেমব্রিজ, 1983)

১৩ । বি বি চৌধুরী, পূর্ব ভারতের ওপর অধ্যায়াংশ, ধর্মকুমার (সং), কেমব্রিজ ইকনমিক হিষ্টরি অব ইণ্ডিয়া, ২ খণ্ড পৃঃ ৮৬-১৭৬, ৩২৪-২৯

১৪ । ক্যানিংকে স্যার চার্লস উড, ২৭ আগস্ট ১৮৬০, হ্যালিফ্যাক্স (উড) পেপার্স, (ইণ্ডিয়া অফিস), ৪ খণ্ড, পৃঃ ৮৪

১৫ । অমলেশ ত্রিপাঠী, ভারতের মুক্তিসংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব, পৃঃ ৫৭, ৯৫

১৬ । বি টি ম্যাককালি, ইংলিশ এড়ুকেশন অ্যাণ্ড দ্য অরিজিন অব ইণ্ডিয়ান ন্যাশানালিজম (নিউ ইয়র্ক, ১৯৪০) , অনিল শীল, দ্য এমার্জেন্স অব ইণ্ডিয়ান ন্যাশানালিজম কম্পিটিশন অ্যাণ্ড কোলাবোরেশন ইন দ্য লেটার নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি (কেমব্রিজ, ১৯৬৮), অ্যাপেণ্ডিক্স

১৭ । এস এন মুখার্জি-র প্রবন্ধ, লিচ, এডমাণ্ড অ্যাণ্ড মুখার্জী (সং), এলিটস্ ইন সাউথ এশিয়া (কেমব্রিজ, ১৯৭০)

১৮ । রজতকান্ত রায়, আরবান রুটস অব ইণ্ডিয়ান ন্যাশানালিজম প্রেসার গ্রুপস্ অ্যাণ্ড কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্টস ইন ক্যালকাটা সিটি পলিটিক্স, ১৮৭৫-১৯৩৯ (নিউ দিল্লী, ১৯৭৯)

১৯। সলস্‌বেরিকে নর্থব্রুক, ১৪ জুন, ১৮৭৫

২০। নর্থব্রুককে ক্যাম্বেল, ২৮ জুলাই ১৮৭২

২১। ক্রিস্টিন ডবিন, আর্বান লিডারশিপ ইন ওয়েস্টার্ন ইণ্ডিয়া-পলিটিক্স অ্যাণ্ড কম্যুনিটিজ ইন বম্বে সিটি ১৮৪০-১৮৫৫ (লণ্ডন, ১৯৭২)

২২। গর্ডন জনসন, 'চিৎপাবন ব্রাহ্মিনস্ অ্যাণ্ড পলিটিকস্ ইন ওয়েস্টার্ন ইণ্ডিয়া', লিচ, এডমাণ্ড অ্যাণ্ড মুখার্জী (সং), এলিটস্ ইন সাউথ এশিয়া (কেম্‌ব্রিজ, ১৯৭০)

২৩। ল্যান্সডাউনকে কিম্বার্বলি, ৯ জুন, ১৮৯৩, ল্যান্সডাউন পেপার্স, Eur Mss. D 558/IX/V, পৃঃ ৪৪

২৪। হ্যামিলটন (লর্ড জর্জ হ্যামিলটন, ভারত সচিব)কে কার্জন, ২৩ এপ্রিল, ১৯০২, Eur Mss. D 510/10, পৃঃ ৪৫২

২৫। বিপিনচন্দ্র, দ্য রাইজ অ্যাণ্ড গ্রোথ অব ইকনমিক ন্যাশানালিজম্ ইন ইণ্ডিয়া (নিউ দিল্লী, ১৯৬৬), 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশানালিষ্টস্ অ্যাণ্ড দ্যা ড্রেইন, ১৮৮০-১৯০৫' IESHR, vol II/No. 2 (April, 1965), পৃঃ ১০৩-৪৪

২৬। ভিন্ন মতের জন্য কে এন চৌধুরী, 'ইণ্ডিয়াজ ইন্টারন্যাশানাল ইকনমি ইন দ্য নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরি অ্যান হিষ্টরিক্যাল সার্ভে', মডার্ন এশিয়ান ষ্টাডিজ, ২, ১ (ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৮), পৃঃ ৩১-৫০; আধুনিক গণনার জন্য, টি মুখার্জী, 'দ্য থিওরি অব ইকনমিক ড্রেইন দ্য ইমপ্যাক্ট অব বৃটিশ রুল অন দ্য ইণ্ডিয়ান ইকনমি, ১৮৪০-১৯০০', কে ই বোল্ডিং ও টি মুখার্জী (সং), ইকনমিক ইম্পিরিয়ালিজম্ আ বুক অব রিডিংস (অ্যান আর্বার, ১৯৭২), পৃঃ ১৯৫-২১২

২৭। পাদটীকা ২ দ্রষ্টব্য।

২৮। জন ম্যাকলেন, ইণ্ডিয়ান ন্যাশানালিজম্ অ্যাণ্ড দ্য আর্লি কংগ্রেস (প্রিন্সটন, ১৯৭৭)

২৯। গর্ডন জনসন, প্রভিন্সিয়াল পলিটিক্স অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়ান ন্যাশানালিজম্ ইত্যাদি (কেম্‌ব্রিজ, ১৯৭৩)

৩০। অমলেশ ত্রিপাঠী, ভারতের মুক্তি সংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৭৪-৭৫, এস এ ওলপার্ট, টিলক অ্যাণ্ড গোখলে রেভল্যুশন অ্যাণ্ড রিফর্ম ইন দা মেকিং অব মডার্ন ইণ্ডিয়া (ক্যালিফোর্নিয়া, ১৯৬২), ৩ অধ্যায়।

৩১। সান মোহম্মদ (সং), সৈয়দ আহ্‌মেদ খান, রাইটিংস অ্যাণ্ড স্পিচেজ (বম্বে, ১৯৭২), পিটার হার্ডি, দ্য মুসলিমস অব বৃটিশ ইণ্ডিয়া (কেম্‌ব্রিজ, ১৯৭২), অনিল শীল, পৃঃ উঃ

৩২। হ্যামিলটনকে কার্জন, ১৮ নভেম্বর, ১৯০০, Eur Mss. D 510/6, পৃঃ ২৯৩-৯৪

৩৩। অমলেশ ত্রিপাঠী, বিদ্যাসাগর—ট্র্যাডিশনাল মডার্নাইজার (কল, ১৯৭৪)

৩৪। দয়ানন্দ সরস্বতী, সত্যার্থ প্রকাশ, চার্লস হিমেসাথ, ইণ্ডিয়ান ন্যাশানালিজম অ্যাণ্ড সোস্যাল রিফর্ম (অক্সফোর্ড, ১৯৬৪); কেনেথ জোন্স, আর্যধরম, হিন্দু কনসাসনেস ইন নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি পাঞ্জাব (ক্যালিফ, ১৯৭৬), শ্রীঅরবিন্দ, 'দয়ানন্দ অ্যাণ্ড দ্য বেদ', বেদিক ম্যাগাজিন, ১৯১৬

৩৫। অমলেশ ত্রিপাঠীর টোকিয়ো – কিয়োটো-তে ইন্টারন্যাশানাল কংগ্রেস অব হিউম্যান সায়েন্সেস ইন এশিয়া অ্যাণ্ড নর্থ আফ্রিকা ৩১তম অধিবেশনে (১৯৮৩) পঠিত—'দ্য রোল অব ট্র্যাডিশনাল মডার্নাইজারস বেঙ্গলস এক্সপিরিয়েন্স ইন দ্য নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরি'তে রামমোহন থেকে বিবেকানন্দ পর্যন্ত চিন্তাধারার পরিবর্তনের বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য। দ্য ক্যালকাটা হিষ্টরিক্যাল জার্নাল, ৮ম খণ্ড, নং ১-২, জুলাই ১৯৮৩—জুন, ১৯৮৪, পৃঃ ১-২৩

৩৬। চরমপন্থী ইডিওলজির জন্য ঐ, ভারতের মুক্তিসংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব, পৃঃ উঃ, প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়।

৩৭। ব্রডরিককে কার্জন, ১৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯০৪ কার্জন পেপার্স, ১৬৩ খণ্ড, ২ পর্ব, সংখ্যা ৯

৩৮। রিজলের নোট, ৭ ফেব্রুয়ারী ১৯০৪, হোম পাব প্রোসিডিংস (এ), ফেব্রুয়ারী ১৯০৫, নং ১৫৫ ও ৬ ডিসেম্বর ১৯০৪, ঐ, নং ১৬৪

৩৯। রবীন্দ্রনাথ, 'স্বদেশী সমাজ', বঙ্গদর্শন, ভাদ্র, ১৩১১

৪০। ঐ, 'অপমানের প্রতিকার', সাধনা, ভাদ্র, ১৩০১, 'পথ ও পাথেয়', বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫

৪১। অমলেশ ত্রিপাঠী, ভারতের মুক্তি সংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব, ৪ অধ্যায়, পৃঃ ১৪৩

৪২। তদেব, পৃঃ ১৭৯-৮০

৪৩। তদেব, পৃঃ ১৬৮-৬৯

৪৪। তদেব, পৃঃ ১৩৪-৩৫, ১৮৬

৪৫। তদেব, পৃঃ ১৪১-৪২, ১৮৭-৮৮

৪৬। ক্যাম্বেল কের, পলিটিক্যাল ট্রাবলস্ ইন ইণ্ডিয়া ১৯০২-১৭, অরুণচন্দ্র গুহ, অরবিন্দ অ্যাণ্ড যুগান্তর (কলকাতা, তারিখহীন), পৃঃ ৩৪-৩৫

৪৭। রবীন্দ্রনাথ, যজ্ঞভঙ্গ, রবীন্দ্ররচনাবলী, ১০ খণ্ড, পৃঃ ৬৩৭

দ্বিতীয় পর্ব

॥ ১ ॥

নরমপন্থীরা সুরাটের প্রতিশোধ নিল কংগ্রেসের নূতন গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করে। ১৯০৮-এর ১৮ ও ১৯ এপ্রিল এলাহাবাদে যে কনভেনশন কমিটি বসে তাতে বাংলা ও পঞ্জাবেব প্রতিনিধিদের আবেদন সত্ত্বেও মেহ্‌তার দল এমন গঠনতন্ত্র তৈরি করলেন যাতে চরমপন্থীরা কোনওদিন কংগ্রেসে ফিরে আসতে না পারেন। প্রথম ধারাতেই পরিষ্কার করে বলে দেওয়া হল কংগ্রেসের লক্ষ্য—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বশাসিত সভ্যরাষ্ট্রের সমতুল্য শাসনব্যবস্থা অর্জন এবং এর জন্য আইনসম্মত পন্থা নিতে হবে। যদি চরমপন্থীরা লিখিতভাবে এ-ধারা গ্রহণ করে তবেই তাদের সভ্যপদ দেওয়া হবে। তালুকা কংগ্রেস কমিটি থেকে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি গঠনে নির্বাচনী ব্যবস্থা সুপারিশ করা হল। কিন্তু কে এসব কমিটি গড়বে, কেই বা চালাবে ? বুঝতে অসুবিধা হয় না চরমপন্থীদের ঠেকানই আসল উদ্দেশ্য ছিল।

যে সরকারের প্রসাদলাভের জন্য এত করা সেই সবচেয়ে বড়ো আঘাত হানল। গোখ্‌লের আপ্রাণ চেষ্টায় মর্লে শাসনসংস্কার বিষয়ে আলোচনা শুরু করেন, কিন্তু মিণ্টো ও তাঁর সহকর্মীরা প্রতিপদে বাধা দেন ও শেষে তার মূলনীতি বানচাল করতে সমর্থ হন। প্রথমত ১৯০৬ সালের ১ অক্টোবর সিমলায় এক মুসলিম প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে মিণ্টো এমন সব প্রতিশ্রুতি দেন যাতে স্বতন্ত্র তথা সাম্প্রদায়িক ভোটদান প্রথা ও সংখ্যানুপাতিক প্রাপ্য আসনের বেশি আসন পাওয়া মুসলমানদেব পক্ষে সম্ভব হয়। মিণ্টো ও মর্লের ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে এ বিষয়ে অনেক তথ্য পাওযা গেছে এবং আমার 'জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব' গ্রন্থে সবিস্তারে আলোচিত হযেছে। আলিগড় কলেজের সম্পাদক মহ্‌সিন-উল-মুলক্‌কে মিণ্টো বলেন, হিন্দুদের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার সঙ্গে পাল্লা দিতে গেলে মুসলিমদেব নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠন চাই। তদনুসারে ১৯০৬ সালের শেষে ঢাকায় অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। আগা খাঁ, মুলক্‌ ভ্রাতৃদ্বয়, ঢাকাব নবাব-এর মত বিশিষ্ট রইস মুসলিমদের এই দল প্রথম থেকেই স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধিতা করে, এমন কি সাম্প্রদাযিক দাঙ্গায মদত দেয়। ওয়েডাববার্নকে লেখা (২০ মে ১৯০৭) চিঠিতে গোখলে অভিযোগ করেছিলেন, সরকারী কর্মচারীরাও এই হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

দ্বিতীয় আঘাত এল ১৯০৯ সালের শাসনসংস্কার আইন ও নির্বাচনবিধি মারফত। প্রথমটি রচনা কবেছিলেন মর্লে, যদিও বিভিন্ন মুসলিম প্রতিনিধি দল, মিণ্টো ও ইংল্যাণ্ডের রক্ষণশীল দল তাঁকে অনেক মৌলিক পরিবর্তন আনতে বাধ্য করেন। নির্বাচনবিধি তো সম্পূর্ণ ইঙ্গ-ভারতীয় আমলাদের রচনা। বস্তুত, মর্লে ও মিণ্টোর ঘোষিত নীতি ছিল "নরমপন্থীদের দলে টানো" (Rally the Moderates) কিন্তু নরমপন্থী বলতে মিণ্টো বুঝতেন দ্বারভাঙা ও গিধোড়ের মহারাজা আর মর্লে বুঝতেন গোখ্‌লে ও রমেশচন্দ্র দত্তকে।

মিণ্টো ও তাঁর আমলাদের ধারণা ছিল ১৮৯২ সালের শাসনসংস্কাবের সুবিধা নিয়েছে উকিলশ্রেণী এবং প্রতীকারার্থ জমিদার ও বণিকদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা দরকার। তাছাড়া সন্ত্রাসবাদের সামান্য উপক্রমে মিণ্টো সংস্কারবিষয়ক আলোচনা পিছিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। ১৯০৭ সালে লাহোরে ইউরোপীয়দেব ওপর আক্রমণ ও রাওলপিণ্ডির দাঙ্গার পর পঞ্জাবের ছোটলাট ইবেট্‌সনের কথায তিনি লাজপৎ রায় ও অজিত সিং-কে নির্বাসনে পাঠান। 'সন্ধ্যা', 'যুগান্তর', 'বন্দেমাতরম্' প্রভৃতি পত্রিকার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও এইসময় নেওয়া হয়। স্টিভেনসন মুরের প্রতিবেদন (১ মে ১৯০৮) থেকে জানা যায় যুগান্তর দলের সঙ্গে 'যুগান্তর' পত্রিকার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল।[১] 'সন্ধ্যা'-সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের জোরালো চল্‌তি ভাষায় ও তীব্র ব্যঙ্গের সুরে লেখা ফিরিঙ্গী বিদ্বেষী গদ্য পদ্য রচনা খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। 'বন্দেমাতরম' সম্পাদনার ভার বিপিনচন্দ্র পালেব হাত থেকে অরবিন্দের হাতে আসার পর তার সুব হয়েছিল অনেক বেশি চড়া।[২] মিণ্টো এসব পত্রিকাব কণ্ঠরোধ করতে চেযেছিলেন। অ্যান্ড্রু ফ্রেজার তো বিপিনচন্দ্রের নির্বাসন দাবিও করেছিলেন।[৩] কিন্তু গোখ্‌লে জানতেন লাজপৎ রায় নির্দোষ। তিনি তাঁর মুক্তির দাবি তুললে ক্রুদ্ধ মিণ্টো লেখেন, "মনে মনে তিনি (গোখ্‌লে) পালের মতই বিপ্লবী।"[৪] মিণ্টো চাইছিলেন গোখ্‌লে চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করুন। কিন্তু তা তিনি করবেন কেন ? শুধু যে এতে অকাবণ বিভেদেব সৃষ্টি হবে তাই নয়, জনচিত্তে কোন সাড়াই জাগবে না। গোখ্‌লে প্রস্তাবিত সংস্কাবকে গণতান্ত্রিক মনে করতেন না, পূর্বশর্তৰূপে বঙ্গভঙ্গ বদও চেয়েছিলেন।[৫]

সুরাটে কংগ্রেস ভেঙে গেলে সরকারেব কাছে গোখ্‌লেব মূল্য কমে গেল। নবমপন্থীরাও সুখী পরিবার ছিলেন না। গোখ্‌লে সুবেন্দ্রনাথকে "pompous and inefficient" আখ্যা দিচ্ছেন, মতিলাল ঘোষকে "sneak"[৬]। কিংসফোর্ড হত্যাব চেষ্টা ও মানিকতলার অস্ত্রাগার আবিষ্কারেব পব গোখ্‌লেকে একসিকিউটিভ কাউন্সিলে নিতে আপত্তি করেন মিণ্টো, কারণ "তিনিও একজন মারাঠা ব্রাহ্মণ", অর্থাৎ তিলকের মতই সাঙ্ঘাতিক।[৭] মজঃফরপুর বোমার সমর্থনে তিলকের ১২ মে ও ৯ জুনের (১৯০৮) প্রবন্ধ পড়ে, মর্লের আপত্তি সত্ত্বেও, তাঁর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করার নির্দেশ দেন মিণ্টো। তিলকের ছ বছবেব (মান্দালয়ে) নির্বাসন দণ্ড হয়। মিণ্টোব মতে, এমন দেশের জন্য আবার শাসন সংস্কার কি ? "চিরকালই একে ব্রিটিশ সামরিক শক্তি রক্ষা করেছে, ভবিষ্যতেও করবে।"[৮] এ ধরনের মনোভাব যাঁর তিনি শাসনসংস্কার সমর্থন করবেন কেন ?

মর্লে একে জারসুলভ নীতি মনে করতেন। লাজপৎ, পাল, অশ্বিনী দত্ত প্রভৃতির নির্বাসন বা ঢালাও সভাসমিতি সংবাদপত্র দমন তাঁর উদারতন্ত্রী বিবেকে বাধছিল। নানা টালবাহানার পর ভারত সরকার ১ অক্টোবর ১৯০৮-এব ডেসপ্যাচে যে প্রস্তাব পাঠালো তাতে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিল না। অন্যতম রচয়িতা রিজলের উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম ভূম্যধিকারী ও বণিক প্রতিনিধিদের দিয়ে উকিলশ্রেণীর বিরোধিতা কাটানো। পৃথক নির্বাচনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হল, মুসলিমদের জন্য আইন পরিষদে পাঁচটি আসন (একটি আপাতত মনোনয়নে) সংরক্ষিত করা হল।

এ সব তথ্য গোপন ছিল, তাই মাদ্রাজ কংগ্রেস (১৯০৮) মর্লে-সংস্কারকে স্বাগত জানায়। গোখ্‌লে চেয়েছিলেন সব সম্প্রদায়ই ভৌগোলিক অঞ্চল অনুযায়ী একযোগে ভোট দেবে। যদি এর ফলে কোনো সম্প্রদায়ের ক্ষতি হয় তবে পৃথক ভোটেব ব্যবস্থা করা যেতে পারে।[৯] ভারত সরকারের প্রস্তাবে ঠিক বিপরীত অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল, কারণ

সেইরকম প্রতিশ্রুতি সিমলা সাক্ষাৎকারে মিন্টো দেন। মর্লে এটা অগণতান্ত্রিক মনে করে মিশ্র নির্বাচনী কলেজের প্রস্তাব দিলেন। তা বানচাল করতে ভারত থেকে মিন্টো ও তাঁর সহকর্মীগণ এবং বিলেতে হাজির হয়ে আমীর আলি ও আগা খাঁর দল দুর্বল ভারত সচিবের ওপর চাপ সৃষ্টি করল। কার্জন ও রক্ষণশীল দল, ভারত সচিব কাউন্সিলের সদস্য থিওডোর মরিসন, টাইমস্ পত্রিকা সবাই আমীর আলিদের সঙ্গে সুর মেলান। সুযোগ বুঝে মিন্টো রাজনৈতিক কারণে নির্বাচন বাতিল করার অধিকার দাবি করে বসলেন। উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর জয় হল। মর্লে মিশ্র নির্বাচক মণ্ডলীর প্রস্তাব বর্জন করলেন। স্থির হল মুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা হবে ছয়। তাতে শুধুই সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচন হবে। সাধারণ আসন ও জমিদাব, বণিক প্রভৃতিব জন্য সংরক্ষিত আসন থেকে মুসলিমরা কিছু পেতে পাবে। তাছাড়া বড়লাট তাদের মনোনয়ন দেবেন। আমলারা এমনই নির্বাচন বিধি তৈরি করলেন যে প্রথম কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের ২৭টি নির্বাচিত আসনের মধ্যে মুসলমানবা পেল ৬টি সংরক্ষিত ও ৪টি অন্যান্য আসন। এর ওপরও বড়লাট দুইজনকে মনোনীত কবলেন![১০] উত্তরপ্রদেশের মুসলিমরা জনসংখ্যার ১৪% হয়েও ২০টি নির্বাচিত আসনের ৭টি পান। মুসলমানদের অধিকতর গুরুত্ব (Weightage) দিতে গিয়ে ভূম্যধিকারী নির্বাচন কেন্দ্রে খাজনার অঙ্ক, আয়করের পরিমাণ ইত্যাদি যোগ্যতা নির্ধারক ব্যাপারে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে দৃষ্টিকটু পার্থক্য করা হল। শিক্ষাগত যোগ্যতাব মাপকাঠিও মুসলিম পাল্লাই ভারী করল। এহেন বৈষম্য দেখে গোখ্‌লে দুঃখ কবেছিলেন, "মুসলিম প্রতিনিধিত্ব শুধু অন্যায্য হয়নি, ভয়াবহ ভাবে অন্যায্য হয়েছে।"[১১]

কিন্তু তখন বড়ো দেবি হয়ে গেছে। গোখ্‌লের উচিত ছিল অবাস্তব ঔদার্য্য না দেখিয়ে প্রথম থেকে মিন্টো, আমীর আলি ও আগা খাঁর দাবির প্রতিবাদ কবা। এই ছিদ্রপথেই দেশবিভাগেব শনি প্রবেশ কবেছিল। মতিলাল নেহরুব মত ঝানু লোকের বুঝতে অসুবিধে হয়নি তৃতীয়পক্ষ, ইংবেজ, জিতল।[১২]

নতুন সংস্কারের ফলে নরমপন্থীদের কোন আশাই পূর্ণ হল না। আইন পবিষদের প্রথম অধিবেশনের আগে সন্ত্রাসবাদ আবার মাথা চাড়া দিয়েছিল। মিন্টোব প্রাণনাশের চেষ্টা হল। নাসিকের কালেক্টাব জ্যাকসন, ভারত সচিবের সহকারী কার্জন ওয়াইলি, আলিপুর বোমা মামলার পাবলিক প্রসিকিউটর আশুতোষ বিশ্বাস ও গোয়েন্দা বিভাগেব শামসুল আলম সন্ত্রাসবাদীদের হাতে নিহত হলেন। পূর্ববঙ্গ ও আসামের সমিতিগুলিকে বে-আইনী ঘোষণা কবে (১৯০৯), সন্ত্রাসবাদীসভা দমন আইন (১৯০৭) সর্বত্র প্রয়োগ করে (১৯১১), কঠোর প্রেস আইন প্রবর্তন করে (১৯১০), ঢাকা ও হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা চালু করে, মিন্টো শাসনযন্ত্রকে অটল বাখতে চাইলেন। কিন্তু বোঝা গেল সন্ত্রাসবাদীরা নতুন ভাবে সংগঠিত হচ্ছে। এবার নেতৃত্ব দিলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।[১৩] বিশ্বাস হত্যার আসামী চারু বোস যতীন মুখার্জীর সহকর্মী ছিলেন। আলম হত্যায় অভিযুক্ত বীরেন দত্তগুপ্ত 'যুগান্তর'-এর প্রভাব স্বীকার করে বলেন—এ দলে তাঁকে আনেন যতীন মুখার্জী। তাঁর আরও বিশিষ্ট সহযোগীদেব মধ্যে নবেন ভট্টাচার্য, অতুল ঘোষ, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও হরিকুমার চক্রবর্তী উল্লেখযোগ্য। সমসাময়িক দমননীতির অনেক প্রমাণ পাই ভগিনী নিবেদিতার ১৯১০ সালে লেখা বিভিন্ন চিঠিপত্রে।[১৪]

দ্বিতীয়ত, সরকারীনীতি বা ব্যয়বরাদ্দ আলোচনায়, পরিপূরক প্রশ্ন বা বেসরকারী বিল উত্থাপনের ব্যাপারে এমন দুস্তব বাধা সৃষ্টি করা হল যে গোখ্‌লের পক্ষে সীমিত সমালোচনার ক্ষেত্রও ছিল না। রাজস্ব, ঋণ, সমরবিভাগ, দেশীয় রাজ্য, বৈদেশিক নীতি সম্পূর্ণভাবে

আলোচনা বহির্ভূত ছিল। সরকাবী ও বেসরকারী মনোনীত সভ্যগণ বাংলা ছাড়া সব প্রদেশেই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল এবং সরকার তাদের স্টীম রোলারের মত ব্যবহার করতেন। বাংলায় বেসরকাবী সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভাঁওতা মাত্র, কারণ তাদের মধ্যে চারজন ইউরোপীয় বণিক সমাজের প্রতিনিধি কোনওদিনই ভারতীয়দের সঙ্গে ভোট দেবেন না। বস্তুত, ছোটলাট কারমাইকেল ভদ্রলোক, মুসলিম ও ইউরোপীয় বণিক প্রতিনিধিদের দিয়ে রাজনৈতিক ভারসাম্য এনেছিলেন। সবাব ওপরে ছিল বডলাটের ভিটো প্রয়োগ ক্ষমতা। গোখ্‌লে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক বিল প্রত্যাহার করতে বাধ্য হলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশগুলি ভারত থেকে কুলি সংগ্রহ কবত। তিনি প্রস্তাব আনলেন এ কুপ্রথা (ইনডেন্‌চার) বন্ধ করা হোক। তাও প্রত্যাহার করতে হল। সন্ত্রাসবাদী সভাবিষয়ক বিলের ব্যাপারে (১৯১১) তাঁর সমালোচনা নিষ্ফল হল। সুরেন্দ্রনাথ স্বীকার কবলেন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পূর্ত কোন ব্যাপারেই ভারতীযদের নিয়ন্ত্রণ নেই। মর্লে-মিণ্টো সংস্কাব আমলে কেন্দ্রীয আইন পরিষদে আনীত ৫৯% বিল বিনা আলোচনায় গৃহীত হয়েছিল ও মাত্র পাঁচটি বেসবকারী বিল পাস হযেছিল। এটাই সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ যে সংস্কারেব ফলে কোনো গুণগত পরিবর্তন লক্ষিত হয়নি। তা পুরাতন 'দববাব প্রথা'ই থেকে গিয়েছিল। মর্লে একটা খাঁটি কথা পার্লামেণ্টে বলেছিলেন, "দাক্ষিণাত্যের গবমে ক্যানাডার ফারকোট বেমানান", অর্থাৎ পাশ্চাত্য ধাঁচের গণতন্ত্র ভাবতে অচল।

একথা ক্রমশই স্পষ্ট হতে থাকে যে নরমপন্থীদের বাড়ানো হাত সরকার-পক্ষ গ্রহণ করবে না এবং চরমপন্থীদের তাবা শক্ত হাতে দমন করবে। জুডিথ ব্রাউন যাকে 'সীমাবদ্ধতার বাজনীতি' (politics of limitation) আখ্যা দিযেছেন, তাতে সংকট দেখা দিয়েছিল। গুজরাট, বিহার, সি পি ও উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেসী রাজনীতির প্রায় বাইরে ছিল। কুন্‌বি, এজুভা, নমঃশূদ্রেব মত নিম্নবর্ণের স্থান সেখানে ছিল না। ওড়িয়া ও তেলুগুভাষীবা যথেষ্ট সংখ্যক হলেও আপনাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত কবতে পারছিল না, এমন কি ন্যায্য প্রাপ্য মর্যাদা পাচ্ছিল না। কৃষক সম্প্রদায কংগ্রেসী রাজনীতির আওতায় আসেনি। সৈয়দ আহ্‌মদের পরামর্শে মুসলমানরা প্রথম থেকেই একে বর্জন করেছিল আর মিণ্টো ও তাঁর আমলারা বিচ্ছিন্নতাবোধ প্রায় পাকা কবে ফেলেছিলেন। ১৯১৫ সালে কিছু অতৃপ্ত হিন্দু হিন্দু মহাসভা স্থাপন করেছিল। শুধু সংগঠনে নয়, লক্ষ্য এবং উপায় নির্ণয়ে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানেব সীমাবদ্ধতা সুস্পষ্ট। একদিকে নরমপন্থীদের অতিসাবধানী মনোভাব সংস্কারের ফলে প্রচণ্ড ধাক্কা খেল ; অন্যদিকে পরিকল্পনার অভাব, ধর্মোন্মাদনার প্রয়োগ, গণসংযোগে অনীহা, বিচ্ছিন্ন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চবমপন্থার দুর্বলতাই প্রকট করল। নতুন প্রজন্মের নেতা জওহরলাল নেহরু, বল্লভভাই প্যাটেল, রাজেন্দ্র প্রসাদ ইত্যাদির কাছে নরম ও চরম পন্থরী দ্বন্দ্ব প্রাক্-টিউডব যুগের শ্বেত ও রক্তগোলাপের দ্বন্দ্ব রূপে প্রতীয়মান হল। শেকস্‌পীয়র যেমন "রোমিও ও জুলিয়েট" নাটকে মুমূর্ষু টিবল্টের মুখ দিয়ে যুগের আকাঙ্ক্ষার বাণীরূপ দিয়েছিলেন—"A plague o' both your houses" —তেমনি মনোভাব দেখা দিয়েছিল তরুণ দেশপ্রেমীদের মধ্যে। তাঁরা চাইছিলেন অভিনব এক রাজনৈতিক পন্থা যা জীবনে জাগাবে নৈতিক মূল্যবোধ, সংগ্রামে আনবে বিপুল বিস্তার। আসন বণ্টন নিয়ে হিন্দু-মুসলিম কলহের তুচ্ছতা ভাসিয়ে, কংগ্রেস মঞ্চ দখলের লড়াইয়ের দৈন্য ঘুচিয়ে, সকল শ্রেণীর মানুষকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের সামিল করে, সত্যকার স্বরাজ আনবে। আবির্ভূত হবেন নতুন এক নেতা, যিনি নরম বা চরম কোন পন্থার সঙ্গে যুক্ত নন বলে ব্যর্থতার গ্লানিমুক্ত, যিনি নন কোন বিশেষ অঞ্চল, শ্রেণী, সম্প্রদায় বা

সংস্কৃতির প্রবক্তা, যিনি সকল ভারতীয়ের মুক্তির জন্য জীবন উৎসর্গ করতে পারেন বলেই সকলের মধ্যে সংগ্রামী উদ্দীপনা সঞ্চার করতে পারবেন। নতুন মন্ত্রে দীক্ষা দেবেন নতুন রণগুরু।

শুধু তরুণ হিন্দু নেতাদের মধ্যেই নয়, তরুণ মুসলিমদের মধ্যেও অনুরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষণীয়। আনসারি, আজাদ ও আলি ভ্রাতৃদ্বয় পুরোনো সৈয়দ-আহমেদ পন্থী রাজনীতিতে[১৫] আস্থা হারিয়েছিলেন। ফ্রান্সিস রবিনসনের **Separatism among Indian Muslims The Politics of the United Provinces' Muslims 1860-1923 (N.D. 1975)** ও ব্রুমফিল্ডের **Elite Conflict in a Plural Society Twentieth Century Bengal (Berkeley, 1968)** গ্রন্থে দেখি কি উত্তরপ্রদেশ কি পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজে নবীন-প্রবীণের দ্বন্দ্ব চলেছে। মিন্টো-মর্লের দেওয়া স্বতন্ত্র ভোটাধিকার তাদের সব দাবি মেটাতে পারেনি। অনেকে চেয়েছিল তা একেবারে লোকাল বোর্ড নির্বাচন পর্যন্ত সঞ্চারিত হোক। সদ্য আবিষ্কৃত মুসলিম সত্তার সুরক্ষার জন্য অনেকে চাইছিল আলিগড় কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা দিতে। লীগের কর্তারা ছিলেন অভিজাত, তাই লীগ রাজনীতিতে মুসলিম কৃষকদের স্থান তো ছিলই না, মুসলিম মধ্যবিত্ত, যেমন উকিল ফজলুল হক বা আল আজ্‌হার বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বা পত্রিকা সম্পাদক মহম্মদ আলিরও স্থান ছিল না।[১৬]

সরকারী নীতি এই অসন্তোষে ইন্ধন যোগায়। মিন্টো বুঝেছিলেন মুসলিমরা প্রাপ্যের চেয়েও বেশি পেয়েছে বলে হিন্দুরা অসন্তুষ্ট। হিন্দু মহাসভার প্রতিষ্ঠাই তার প্রমাণ। পাল্লা সমান রাঁখার জন্য এবং কিছুটা বাঙালী নরমপন্থীদের হাত করতে ও সন্ত্রাসবাদ প্রশমিত করতে, বঙ্গভঙ্গ বাতিল করালেন বড়লাট হার্ডিঞ্জ সম্রাট পঞ্চম জর্জের মুখ দিয়ে। হার্ডিঞ্জের ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে (কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীতে রক্ষিত) দেখি বাঙালীদের টুকরো করতে বঙ্গদেশ ভাগ করা হয়েছিল, কিন্তু তাদের মনোবল টুকরো হয়নি। দুই বঙ্গেই বাঙালী হিন্দু সংখ্যালঘুতে পর্যবসিত হয়েছিল—পূর্বে সাম্প্রদায়িক দিক থেকে, আর পশ্চিমে ভাষাগত দিক থেকে। এ ব্যবস্থা তারা মেনে নিতে পারে না। হার্ডিঞ্জ কার্জনের চেয়েও ধুরন্ধর রাজনীতিজ্ঞ। তিনি বাঙলাভাষীদের একত্র করলেন বটে কিন্তু নবগঠিত যুক্তবঙ্গে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হল। তাছাড়া বঞ্চিত ঢাকাকে তুষ্ট করার জন্য ও উত্তর ভারতের মুসলিমদের পক্ষে দিল্লীতে রাজধানী সরিয়ে নিলেন। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যও তদ্‌বির করেন তিনি, কিন্তু ভারত-সচিব রাজি হননি। মুসলিমরা চেয়েছিল ভারতের যে-কোন স্থানের মুসলিম কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় আনতে। অনুরূপ অধিকার বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয় দাবি করতে পারে ভেবে ভারত-সচিব সম্মতি দেননি।

মুসলিম অসন্তোষের তৃতীয় কারণ—ব্রিটিশ সরকারের বৈদেশিক নীতি। ১৯১১ সালে ইতালীর ত্রিপলি অভিযান ও ১৯১২-১৩ সালে বালকান যুদ্ধের সময় ব্রিটেন তুর্কী-পক্ষ নেয়নি। আলি ভ্রাতৃদ্বয় এই অভিযোগে 'কমরেড' ও 'হামদরদ্' পত্রিকা জমিয়ে ফেললেন।[১৭] এখন থেকে আন্তর্জাতিক ইসলামী আন্দোলনের ছায়া ভারতের মানচিত্রের ওপর পড়তে থাকে। তুরস্কে রেডক্রেসেণ্ট মিশন প্রেরণ, মুসলিম পুণ্যতীর্থ (মক্কা, মদিনা প্রভৃতি) রক্ষার জন্য আঞ্জুমান-ই-খুদম্-ই-কাবা গঠন, এ সবের মধ্যে খিলাফৎ আন্দোলনের প্রথম গোলা বর্ষিত হল। আলিগড়ের নেতৃত্ববিরোধী নবীন নেতারা আবদুল বারির ফিরিঙ্গি মহলের উলেমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। কানপুর মসজিদের অংশ ভাঙা নিয়ে দাঙ্গা,

পুলিশের গুলিচালনা, মুসলিম পত্রিকায় তার তীব্র সমালোচনা, প্রতিবাদে মহম্মদ আলির ইংল্যাণ্ড গমন সরকারকে হিন্দু চরমপন্থীদের কথা স্মরণ করিয়ে দিল। বস্তুত আলি ও আজাদের সমালোচনায় মাঝে মাঝে 'সন্ধ্যা' ও 'যুগান্তরের' প্রতিধ্বনি শোনা যেত। এরপর যখন প্রথম মহাযুদ্ধ বাধল ও আলিরা তুরস্কের পক্ষ নিলেন, তখন (এপ্রিল, ১৯১৫) তাঁদের গৃহবন্দী করা হল। এর প্রতিশোধ নিল নতুন দল লীগ কর্তৃত্ব দখল করে ও লীগের কর্মকেন্দ্র আলিগড় থেকে লখ্নউতে স্থানান্তরিত করে। শেষে স্থানীয় নির্বাচনে হেরে তারা কংগ্রেসের সঙ্গে আপোস করতে চাইল। নতুন লীগের লক্ষ্য হল—"ভারতবর্ষের পক্ষে উপযোগী স্বশাসন।"

অন্যদিকে ভেতরের ও বাইরের চাপে কংগ্রেসের নরম ও চরমপন্থী দল কাছাকাছি আসতে বাধ্য হল। ১৯১০-এর এলাহাবাদ কংগ্রেস গোখ্‌লের কার্যক্রম সমর্থন করে। গোখ্‌লের জীবনীকার বি আর নন্দ বঙ্গভঙ্গ রদে তাঁর কৃতিত্বকে অত্যন্ত বাড়িয়ে দেখেছেন। এ বিষয়ে মুখ্য ভূমিকা নেন হার্ডিঞ্জ, কিছুটা পঞ্চম জর্জ।[১৮] সরকারকে খুশি রাখতে অত্যধিক ব্যগ্র ছিলেন গোখ্‌লে। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে মালব্য হিন্দু-মুসলিম ভোট বৈষম্যের প্রসঙ্গ তুলতে চাইলে গোখ্‌লে বাধা দেন। সরকারী ব্যয়ানুমোদনের ওপর আলোচনার প্রস্তাবও তিনি প্রত্যাহার করেন। সামান্য সংশোধনের পর সন্ত্রাসবাদী সভা-বিরোধী বিলও মেনে নেন। এতেও অবশ্য কর্তৃপক্ষের মন ভেজেনি। রাজকীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সম্ভাব্য সদস্যরূপে গোখ্‌লের নাম উঠলে হার্ডিঞ্জ অর্থ-সদস্যকে লেখেন (১৮ জুলাই ১৯১২), "তুমি জান ভারতের যে কোন ব্যক্তির চেয়ে আমি গোখ্‌লেকে অবিশ্বাস করি..." বোম্বাই-এর ছোটলাট ক্লার্ককে তিনি লেখেন (১২ জুলাই ১৯১২), "তিনি (গোখ্‌লে) বিপজ্জনক লোক কারণ তাঁর রাজদ্রোহ আজ থেকে বিশ বছর পরে ফলপ্রসূ হবে।" আমলাতন্ত্রের বিরাগ কি ভয়ঙ্কর গোখ্‌লে কোনদিন তা বোঝেননি। তাছাড়া মহাযুদ্ধে লিপ্ত ভারতবর্ষের বিশ বছর অপেক্ষা করাও সম্ভব ছিল না।

কলকাতা কংগ্রেস (১৯১১)-এর সারি সারি শূন্য আসন যেন নরমপন্থীদের উপহাস করছিল। ১৯১২-তে বাঁকিপুর কংগ্রেসের অবস্থা আরও শোচনীয়। ২০৭ জন প্রতিনিধির ৫৩ জন ছিল বিহারী ও ৪২ জন বাঙালী। গোখ্‌লে আপোসের সূত্র খুঁজছিলেন। বাঁকিপুরে স্থির হয় জনসভার মাধ্যমে কংগ্রেস প্রতিনিধি নির্বাচিত হবে এবং সে-জনসভা বসবে বর্তমান কংগ্রেস কমিটির আহ্বানে। অর্থাৎ চাবিকাঠিটি থাকবে নরমপন্থী নেতাদের হাতে। তাতে অন্যপক্ষ রাজি হয়নি। যুদ্ধের কয়েক সপ্তাহ আগে তিলক ছাড়া পেলেন এবং চরমপন্থীদের মনোবল ফিরে এল। মতিলাল ঘোষ এসময় (১৫ নভেম্বর ১৯১৪) গোখ্‌লেকে লেখেন, "আপনি ও তিলক কলহ মিটিয়ে ফেললে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আবার আশা ফিরবে...." মাদ্রাজ কংগ্রেসের আগে অ্যানি বেশান্ত মধ্যস্থতার ভারও নিলেন। ভূপেন্দ্রনাথ বসুকে লেখা (১৪ ডিসেম্বর ১৯১৪) গোখ্‌লের চিঠিতে পড়ি তিলক সুব্বারাওকে জানাচ্ছেন, সাম্রাজ্যের মধ্যে স্বয়ংশাসনের লক্ষ্য মেনে নিলেও চরমপন্থীরা বর্তমান কংগ্রেস কমিটির মাধ্যমে ফিরতে চান না—আলাদা ও স্বাধীন নির্বাচন কেন্দ্র থেকে আসতে চান। তাছাড়া, সকল ক্ষেত্রে ব্রিটিশ বিরোধিতার নীতি তাঁরা নিতে চান। স্বশাসন না পেলে কি চাকুরির ব্যাপারে, কি আইন পরিষদে, কি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থায় তাঁরা অংশ নেবেন না, আইনের শেষ গণ্ডী পর্যন্ত বর্জননীতি অনুসরণ করবেন। গোখ্‌লে বুঝতে পেরেছিলেন, চরমপন্থীরা ফিরে এসেই পূর্বতন গঠনতন্ত্র প্রবর্তন করবে এবং দল ভারী করে নেতৃত্ব কেড়ে নেবে। ১৯ ডিসেম্বর (১৯১৪) গোখ্‌লে লিখছেন, "কংগ্রেসের স্বার্থের দিক

থেকে ওঁর (তিলকের) বাইরে থাকাই শ্রেয়ঃ।"

অতএব মাদ্রাজ কংগ্রেসেও আপোস হল না। বিফল চরমপন্থীরা গোখ্‌লের ঘাড়ে দোষ চাপালেন। তিনিও প্রতিবাদ করতে বাধ্য হলেন। এই প্রসঙ্গে অ্যানি বেশান্তকে লেখা গোখ্‌লের চিঠিতে (৫ জানুয়ারি ১৯১৫) পাই তিলক ও গোখ্‌লের পুরোনো কলহের আদ্যোপান্ত ইতিহাসের চুম্বক। "আমার প্রায় ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতায় জেনেছি....তাঁর (তিলকের) সঙ্গে ব্যবহারে ঔদার্য নয়, সতর্কতাই মূলনীতি হওয়া উচিত।"

১৯১৫-র ১৯ ফেব্রুয়াবি গোখ্‌লের অকালমৃত্যু হল। ফিবোজ শা মেহ্‌তা মারা গেলেন ৫ নভেম্বর। আগেই চলে গেছেন অন্যান্য নরমপন্থী নেতা—তেলাং, রানাডে, উমেশচন্দ্র, তায়াবজী, রমেশ দত্ত ও আনন্দ চার্লু। দাদাভাই নৌরজির মহাপ্রয়াণ আসন্ন। প্রথম সাবির নেতাদের মধ্যে ওয়াচা ও সুরেন্দ্রনাথ ছাড়া কেউ কর্মঠ ছিলেন না। তার চেয়েও বড়ো কথা, প্রথম মহাযুদ্ধেব ফলে ভারতেব জনজীবনে এমন একটা অর্থনৈতিক আঘাত লেগেছিল যা দরিদ্র কৃষকেব কুটীব থেকে ধনী বণিকেব প্রাসাদ পর্যন্ত আলোড়ন তুলল। ভারত সরকার বিব্রত বোধ করছিলেন। দুই কংগ্রেস যুক্ত হলে এবং মুসলিমদের একটা বড দল তাতে যোগ দিলে ব্রিটিশ সরকারেব ওপর প্রচণ্ড চাপ পডবে এটা পরিষ্কার। ১৯১৫ সালে কংগ্রেসেব প্রতিনিধি নির্বাচন ক্ষমতা অনেক ব্যাপকতব করা হল। মুঞ্জেকে লেখা চিঠিতে (৮ জানুঃ, ১৯১৬) দেখা যায তিলক আপোস করতে রাজি হযেছেন। তাতে ওয়াচাকে প্রমাদ শুনতে দেখি (জেমস মেস্টনকে ওযাচা, ৪ ডিসেম্বব, ১৯১৬)। তিনি বুঝেছিলেন বেশান্ত ও তিলকের দল একত্র হলে বোম্বাই ও নবমপন্থীদের সুদীর্ঘ কর্তৃত্বেব অবসান ঘটবে।

লখনউ কংগ্রেস (১৯১৬) কযেকটি কাবণে চিবস্মরণীয় হযে থাকবে। প্রথমত, আট বছর পরে নবম ও চবমপন্থীদেব পুনর্মিলন ঘটল। দ্বিতীয়ত, কংগ্রেস ও লীগের বাজনৈতিক সংস্কাব নিযে সমঝোতা হল। তৃতীযত, হোমরুল লীগের মাধ্যমে বেশান্ত ও তিলকের সারা ভারতে শাসন সংস্কারেব দাবি প্রচার কবা সম্ভব হল। ডি এ লো সম্পাদিত Soundings in Modern South Asian History গ্রন্থে এইচ এফ আওযেন দেখাচ্ছেন, কর্ণাটক, মহাবাষ্ট্র, বোম্বাই, সি পি-তে তিলকের লীগ ও অন্য প্রদেশে বেশান্তের লীগ কীভাবে অবহেলিত প্রদেশ, জাত, ভাষা ও বৃত্তিকে কংগ্রেস আন্দোলনের সামিল করেছিল। আন্দোলন আর শুধু ছাত্র ও উকিলদেব মধ্যে আবদ্ধ থাকছে না—গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছে। মনে বাখতে হবে বেশান্তের হোমরুল লীগেব অন্যতম প্রচারক রূপে গান্ধীজি জাতীয় বাজনীতিব রঙ্গমঞ্চেও প্রথম আবির্ভূত হন।[১৯]

কংগ্রেস ও লীগের সমঝোতার ফলে সরকারের কাছে একটা মিলিত দাবি পেশ করা সম্ভব হল। তাব মূল কথা—বিকেন্দ্রীকবণ, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, গণতান্ত্রিক (কিন্তু সাম্প্রদায়িক) নির্বাচন এবং ভাবতীয়করণ। (১) কেন্দ্রের হাতে থাকবে বৈদেশিক, রাজনৈতিক, সামরিক বিভাগ, শুল্ক, ডাক, তার ও রেল। প্রাদেশিক আইন পরিষদের কর বসানর ও ঋণ গ্রহণেব ক্ষমতা থাকবে। প্রাদেশিক সবকার সাধারণত আইন পরিষদের প্রস্তাব কার্যকর করবে। প্রাদেশিক লাটের শাসন পরিষদের অন্তত অর্ধেক নির্বাচিত সদস্য থেকে নিতে হবে। প্রাদেশিক আইন পরিষদে মুসলমানদের জন্য আসন নির্দিষ্ট হারে সংরক্ষিত থাকবে ও তাতে স্বতন্ত্র নির্বাচন হবে। (২) কেন্দ্রীয় আইন পবিষদের তৃতীয়-পঞ্চমাংশ ব্যাপক ভোটাধিকার ভিত্তিতে নির্বাচিত হবে। তাব এক-তৃতীয়াংশ আসন মুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে এবং তাতে স্বতন্ত্র নির্বাচন হবে। বড়লাটেব শাসন

পরিষদের ন্যূনতম অর্ধেক নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য থেকে নিতে হবে। (৩) ভারত সচিবের পরিষদ লুপ্ত হবে ও তাঁর মাইনে ব্রিটিশ রাজস্ব বহন করবে। তাঁর দুই সহকারী থাকবেন আর তার একজন হবেন ভারতীয়। (৪) অন্যান্য ডোমিনিয়ান যে মর্যাদা ও প্রতিনিধিত্ব পায়, ভারতকে তাই দিতে হবে। (৫) সামরিক বাহিনীতে ভারতীয় নিয়োগ নির্বাধ করতে হবে।

বড়লাটের কাছে মেস্টন মন্তব্য করছেন, "বহু বছরেব ভুল বোঝাবুঝির পর চরমপন্থী ও নরমপন্থীরা মিলিত হয়েছে, এবং সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, মুসলিমরা এদের দলে ভিড়েছে....সমস্ত মতের মিলন শিক্ষিত ভারতবাসীকে এমন একটা গর্ববোধ ও জাতীয় সংহতির অনুভূতি এনে দিয়েছে যা অবজ্ঞা করা অসম্ভব।"[২০] মন্তব্যের আংশিক সত্যতা স্বীকার করেও বলা চলে ঐক্যবোধ নিশ্ছিদ্র ছিল না। কলকাতায় প্রাথমিক আলোচনা হয় কিন্তু তাতে বাংলা ও উত্তরপ্রদেশের মুসলিম আসন সংখ্যা নির্দিষ্ট হয়নি। লখনউতে যখন চুক্তি সম্পাদিত হয় তখন উত্তরপ্রদেশের মুসলিম স্বার্থে বাংলা ও পঞ্জাবে মুসলিম স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করা হল। বাংলার মুসলিম সম্প্রদায় মোট জনসংখ্যার ৫২·৬% হলেও তাদের ভাগে পড়ল ৪০% আসন, পঞ্জাবের জনসংখ্যার ৫৪·৮% হলেও তারা পেল ৫০% আসন, অথচ উত্তরপ্রদেশে জনসংখ্যার মাত্র ১৪% হলেও তারা পায় ৩০% আসন। বিহারে ২৫%, বোম্বাইতে ৩৩·৩৩%, মাদ্রাজে ১৫% আসন সবই জনসংখ্যাব অনুপাতে বেশি। উত্তরপ্রদেশের ক্ষেত্রে এই অন্যায্য ঔদার্যেব বিরুদ্ধে আপত্তি তোলেন মালব্য ও চিন্তামণি। কিন্তু মতিলাল নেহরু ও তেজবাহাদুব সাপ্রুর সমর্থনে মুসলিমরা জয়ী হয়। পুরোনো লীগ নেতারাও খুশি হননি। রবিনসন লিখছেন : "এই চুক্তিকে সর্বভাবতীয় কংগ্রেস ও লীগের চুক্তি আখ্যা দেওয়া ঠিক হবে না—বলা উচিত, কংগ্রেস ও উত্তরপ্রদেশেব 'নবীন মুসলিম দলে'র চুক্তি।" এর ফল বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকম হল। ফজলল হকের নেতৃত্বে বাঙালী মুসলমানদের একটা দল চুক্তি সমর্থন করল, কিন্তু সেন্ট্রাল ন্যাশানাল ম্যাহোমেডান অ্যাসোসিয়েশন শতকরা পঞ্চাশ ভাগ আসন দাবি করল। ফ্র্যানচাইজ কমিটিব কাছে নবাব আলি চৌধুরী ৩৪টি আসনের জায়গায় ৪৪টি আসন চান। শেষে কিছু আসন সংখ্যা বাড়িয়ে মুসলিমদের ৪৫% আসন দেওয়া হয়। ব্রুমফিল্ড এই বিবাদের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। পঞ্জাবেব লীগ তো ভেঙেই গেল। মহম্মদ সফী প্রতিবাদী লীগ স্থাপন করলেন। ঐভাবে বোম্বাইতে জিন্নার দল সাহেব সুলেমান কাশিম মিথাব দল থেকে আলাদা হয়ে গেল। মাদ্রাজে উর্দুভাষী মুসলিমরা চুক্তি সমর্থন করল, তামিলভাষীরা নয়।

কিন্তু যে অসন্তোষ আরও গভীরচারী তা মহাযুদ্ধপ্রসূত। প্রথমত, জিনিসপত্রের দাম ক্রমাগত বাড়তে থাকে। ১৮৭৩ সালের মূল্যসূচক ১০০ ধরলে ১৯১৪ সালে তা থেকে বেড়ে হয় ১৪৭, ১৯১৫-তে ১৫২, ১৯১৬-তে ১৮৪, ১৯১৭-তে ১৯৬. ১৯১৮-তে ২২৫, ১৯১৯-তে ২৭৬ এবং ১৯২০-তে ২৮১।[২১] অর্থাৎ ১৯১৪ ও ১৯২০ সালের মধ্যে গড় দ্রব্যমূল্য প্রায় দু' গুণ বেড়েছিল। আহমদাবাদে সাধারণ চালেব দাম (একই মূল্যসূচক অনুসারে) ১৯১৪-এ ১৭২ থেকে ১৯১৮-তে ২৩৩-এ দাঁড়ায ; বাজরার দাম ২২০ থেকে ৪১০-এ ; গমের দাম ১৬৬ থেকে ২৫৯-এ। উত্তর বিহারে চালের দাম ১৯১৬ সাল পর্যন্ত বাড়ে, ১৯১৭ সালে বেশ কমে, আবার ১৯১৯ সালে খুব বাড়ে। ওড়িশায় ১৯১৫-তে চালের দাম চড়েছিল, ১৯১৬-১৮-তে পড়ে গিয়ে আবার ১৯১৯-২০-তে খুব বেড়ে যায়। চম্পারনে চালের দাম কমলেও নিত্যপ্রয়োজনীয় লবণ ও কেরোসিনের দাম বাড়ে। ১৯১১ সালে যে ধুতিব জোড়া ছিল এক টাকা বার আনা, ১৯১৮-তে তা হয় ৬ টাকা। অধ্যাপক রবীন্দ্রকুমার দেখিয়েছেন, লাহোবের (মুসলমান)

কারিগরের গড়পড়তা মাসিক আয় ১৯১৪ সালে ৫০ টাকা ছিল আর ব্যয় ৪৭৷৵। ১৯১৮ সালে ব্যয় দাঁড়ায় ৭৮ টাকা ৬ পাই। দুঃখ-দুর্দশা বাড়লে অসন্তোষ বাড়বে এ তো স্বাভাবিক। লক্ষণীয় যে গান্ধী আহমদাবাদ, কয়রা (খেড়া) ও চম্পারনে সত্যাগ্রহ নিয়ে পরীক্ষা চালান এই পরিপ্রেক্ষিতে এবং রাওলাট সত্যাগ্রহের সময় লাহোরের অশান্তির অর্থনৈতিক দিক সুস্পষ্ট।

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডে মিচেল ম্যাক্‌আলপিন দেখাচ্ছেন, ১৯১৬ থেকে ১৯২০ 'agricultural terms of trade'-এর অবনতি ঘটে এবং ১৯২১ থেকে ১৯২৫ সামান্য উন্নতি দেখা গেলেও ১৯৩১ থেকে ১৯৩৫ পর্যন্ত শোচনীয় মন্দা দেখা দেয়। কৃষিজাত দ্রব্য দিয়ে যতটা শিল্পজাত দ্রব্য কেনা যেত তার হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। কৃষিজাত দ্রব্যের পক্ষে সবচেয়ে দুর্বৎসর ১৯১৭, অন্যান্য দ্রব্যের পক্ষে ১৯১৮-২০। এখানেই নিহিত আছে কৃষক সম্প্রদায়ের অসন্তোষের বীজ।[২২]

ধনিক ও বণিক শ্রেণীও যুদ্ধের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যুদ্ধ বাধার সঙ্গে সঙ্গে জার্মেনির সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেল, পরে ব্রিটেনেরও ফ্রান্সের সঙ্গে বাণিজ্য ব্যাহত হল। ওয়াগানের অভাবে কয়লা যোগানের অসুবিধা হওয়ায় ও যুদ্ধকালীন নিয়ন্ত্রণ নীতির ফলে শিল্পোৎপাদন বেশ মার খায়। কাঁচা টাকার লেনদেনের ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়ে ও কিছু ব্যবসায়ী কাঁচা টাকার জন্য (Circulating Capital) শেয়ার বেচতে বাধ্য হয়। প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্কগুলি সাহেবদের যে সুবিধায় মূলধন যোগাত ভারতীয়দের সেভাবে নয়। সকলের ওপর, জাপানী প্রতিযোগিতার সঙ্গে পাল্লা দেবার মত কোন সংরক্ষণনীতি গৃহীত হয়নি। ক্লাইভ ডিউই এক প্রবন্ধে দেখাচ্ছেন, যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা রূপে ইণ্ডিয়ান ম্যুনিশন বোর্ড ভারতীয় শিল্পোদ্যোগকে সাহায্য করলেও ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমিশন (১৯১৬-১৮)-কে শুল্কনীতি নিয়ে আলোচনা করতে দেওয়া হয়নি।[২৩] যুদ্ধের সময় রূপোর দাম বেড়ে ১৯২০ সালের প্রথমে দাঁড়ায় ৮৯ পেন্স। ১৯১৭ সালে টাকার স্টারলিং মূল্য ছিল ১ শিলিং ৪ পেন্স, ১৯১৯-এর শেষে ২ শিলিং ৪ পেন্স। কিন্তু ১৯২১ সালে টাকার দাম কমে হয ১ শিলিং ৭ পেন্স,আরও পরে ১ শিলিং ৪ পেন্স। আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যের ওপর এই ওঠানামার প্রভাব যথেষ্ট। আমদানি বণিকরা কমে যাওয়া হারে বিলাতী কাপড় কিনতে রাজি ছিল না। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে আর্থিক ক্ষতির ভয়েই তারা গান্ধীর বয়কট আন্দোলনে সাময়িকভাবে যোগ দেয়। আবার বিনিময় হার বাড়লে রপ্তানি বণিকদের অসুবিধা। তারা ১৯১৯-২০ সালে বেশ বিপদে পড়েছিল। ঠিক কমবার সময় বয়কট শুরু হওয়ায় তারা বিব্রত হয় ও বয়কটের বিরোধিতা করে। এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নিদর্শন পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস। মিল মালিকদের সুবিধা স্বতঃসিদ্ধ। বয়কটের সুযোগ নিয়ে দেশী কাপড়ের বাজারের ভাগ ২৫% থেকে বাড়িয়ে ৪২% করতে সমর্থ হয় তারা। গান্ধীকে সমর্থন করলেই তাদের লাভ।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 'বৈপ্লবিক কর্মধারায়' (শব্দগুলি 'সন্ত্রাসবাদ' অপেক্ষা অধিকতর সঙ্গত। রাওলাট রিপোর্টেও 'রেভল্যুশনরি' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।) এক সঙ্কট দেখা দিয়েছিল। সন্ত্রাসবাদ সম্বন্ধে বিদেশীদের লেখায় চিরল, কের, রাওলাট থেকে জুডিথ ব্রাউন পর্যন্ত প্রায় একই ধরনের মন্তব্য পাই। ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত জুডিথ ব্রাউনের Modern India The Origins of an Asian Democracy গ্রন্থে বলা হয়েছে সন্ত্রাসবাদীরা বাস্তবজ্ঞানবর্জিত রোমান্টিক। তারা ছিল শিক্ষিত ও আভিজাত্যাভিমানী, অথচ ক্রমবর্ধমান মূল্য ও বেকার সমস্যার জন্য ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনিশ্চিত। "তারা ছিল কালী উপাসক, যিনি

পবিত্র মাতৃভূমির রক্তপিপাসু এবং বলিলোল্প প্রতীক।" অন্যদিকে 'অগ্নিযুগ' নিয়ে উচ্ছ্বাস ও হা-হুতাশের অন্ত নেই আমাদের দেশে। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী ছাড়া কোনও প্রথম সারির ভারতীয় এর মূলনীতির প্রতিবাদ করেননি, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রকাশ্যে করলেও গোপনে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন এবং সুভাষচন্দ্র অনেকাংশে এদের সাহায্যের ওপর নির্ভর করতেন। রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধী অবশ্য কোন সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে নামেননি। রবীন্দ্রনাথ এর মধ্যে দেখেছিলেন মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়। গান্ধী নীতি ও রাজনীতি, লক্ষ্য ও উপায়কে অবিচ্ছেদ্য মনে করতেন। তাঁর সত্যাগ্রহ দর্শনে হিংসার স্থান থাকতেই পারে না। ১৯০৭ সালের পর লেনিন সন্ত্রাসবাদের তীব্র বিরোধিতা শুরু করেন। তিনি এর মধ্যে পেটি বুর্জোয়া রোমান্টিকতার নিদর্শন দেখে গণ-বিপ্লবের মাধ্যমে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদ চেয়েছিলেন। মার্কসবাদীরা এ ব্যাপারে তাঁর অনুগামী। তবে ভাবতীয় মার্কসবাদী দল বহু নেতৃস্থানীয় সন্ত্রাসবাদী দ্বারা পুষ্ট হয়েছিল বলে তাঁদের নিন্দা কিঞ্চিৎ দ্বিধাগ্রস্ত। পৃথিবীব্যাপী সন্ত্রাসবাদের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন করে এর সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, কর্মপদ্ধতির মূল্যায়ন প্রয়োজন। পঞ্জাবের শিখ উগ্রপন্থী, শ্রীলঙ্কায় তামিল ইলম্, দার্জিলিং-এর স্বাতন্ত্র্যবাদী গোর্খা ও ঝাড়খণ্ডের স্বাতন্ত্র্যবাদী আদিবাসী আমাদের ভাবাতে বাধ্য করছে। আপাতত বলা যায় অরবিন্দেব নেতৃত্বাধীন প্রথম পর্বেব সন্ত্রাসবাদ থেকে মহাযুদ্ধকালীন সন্ত্রাসবাদেব কিছু পার্থক্য ছিল। মানবেন্দ্রনাথ বাযেব Memoirs-এ, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যাযেব 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি'তে, ভূপেন্দ্রকুমাব দত্ত, অরুণচন্দ্র গুহ, ত্রৈলোক্য মহাবাজ প্রভৃতি বচনায ও সবকারী নথিপত্রে ভাবত ও ভারতেব বাইবেব সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপেব বিবরণ বিশ্লেষণ কবলে বোঝা যায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সন্ত্রাস ও আত্মদানেব মাধ্যমে বিপ্লবী চেতনাসৃষ্টির চেষ্টা থেকে সন্ত্রাসবাদ উত্তীর্ণ হয়েছিল দলবদ্ধ সশস্ত্র প্রতিবোধেব পর্যাযে। আর তার মধ্যে জনসাধাবণের সার্বিক (বিশেষ করে অর্থনৈতিক) উন্নতির সম্বন্ধে একটা আগ্রহ দানা বাঁধছিল। হাওডা ষডযন্ত্র মামলা থেকে স্পষ্ট হয় যে, এব মধ্যে তিনটি নতুন মাত্রা যুক্ত হযেছিল—(১) দেশ (যেমন,রডা কোম্পানী) ও বিদেশ (যথা, জার্মেনী) থেকে অস্ত্র সংগ্রহ, (২) দেশে গেবিলাবাহিনী গঠন ও (৩) ভারতীয় সৈনাবাহিনীর মধ্যে (যেমন ১০ম জাঠ বেজিমেণ্ট) গুপ্ত প্রচার চালিযে বিভিন্ন স্থানে একযোগে সশস্ত্র অভ্যুত্থান। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে সুদূব সাংহাই পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল ষডযন্ত্রেব জাল। 'গদব' দলের নেতা হবদযাল, বার্লিনের স্বাধীনতা কমিটি, কাবুলের মহেন্দ্রপ্রতাপ, উত্তব ভাবতের রাসবিহারী বসু ও শচীন সান্যাল, ঢাকার হেমচন্দ্র ঘোষ এবং বাংলাব অন্যত্র যুগান্তব দলেব প্রায় সব সম্প্রদায়ের নেতা যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায এক অসম্ভব স্বপ্ন দেখেছিলেন। যতীন্দ্রনাথের দলে যোগ দিয়েছিলেন যতীন বায়েব উত্তরবঙ্গ দল, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের অধীনস্থ ববিশাল দল, হেমেন্দ্রকিশোব আচার্যের অধীনে মৈমনসিংহ দল ও পূর্ণ দাসের অধীনস্থ মাদারীপুব দল। বিপিন গাঙ্গুলীব আত্মোন্নতি, হরিকুমার চক্রবর্তীব চব্বিশ পরগনা দল, নরেন ভট্টাচার্য প্রভৃতি আগেই যোগ দেন।

বার্লিনের সঙ্গে ষড়যন্ত্রের নানা রকম বিবরণ আমরা পাই। আমি এক নতুন উপাদান উল্লেখ করছি—ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে রক্ষিত, চার্লস টেগার্টের পত্নী সংকলিত, টেগার্ট জীবনীর খসড়া (Mss Eur. C 235/1). টেগার্টের মতে এই ষড়যন্ত্রের নেতা ছিলেন পাঁচজন—যতীন মুখার্জী, নরেন ভট্টাচার্য, যাদুগোপাল মুখার্জী, ভোলানাথ চ্যাটার্জী ও অতুল ঘোষ। ১৯১৫ সালে বিভিন্ন সূত্র গ্রথিত করে ষড়যন্ত্রের আঁচ পান টেগার্ট। পরে জানা যায় যে জিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী জার্মেনী থেকে ফিরে এসে ব্যাটাভিয়ার জার্মান কনসালের সঙ্গে

যোগ স্থাপন করতে বলেন ও নরেন ভট্টাচার্য সে উদ্দেশে রওনা হয়ে যান। জার্মান কনসাল থিওডোর হেলফেরিচ (Helfferich) নামক জনৈক জার্মানের সঙ্গে নরেনের পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি বিপ্লবীদেব কলকাতার ঘাঁটি হ্যারি অ্যাণ্ড সন্সের দোকানে টাকা পাঠাতে থাকেন। তাঁর পরিকল্পনা ছিল ক্যালিফোর্নিযা থেকে অস্ত্র বোঝাই জাহাজ 'ম্যাভেরিক' জাভা হয়ে করাচী যাবে। নরেন তা বাতিল করে বাংলায় জাহাজটি পাঠাতে বলেন। যতীনের দল ঠিক করেন অস্ত্র এলে পূর্ববঙ্গ, বালেশ্বর ও কলকাতায় পাঠান হবে। ফোর্ট উইলিয়াম দখল করবেন নরেনের দল। ১৬ নং রাজপুত রাইফেল বাহিনীর সঙ্গে আগেই যোগাযোগ স্থাপিত হয়। পূর্ববঙ্গের বিপ্লবীদের শিক্ষা দেবেন 'ম্যাভেরিকে'র কর্মচারীরা। তারপরে তাঁরা যোগ দেবেন কলকাতার দলেব সঙ্গে। যতীন মাদ্রাজগামী রেলপথ উড়িয়ে দেবেন। যাদুগোপাল 'ম্যাভেরিকে'র অস্ত্র নামাবেন। স্থির হয অস্ত্র নামানো হবে রাযমঙ্গলে। কিন্তু জুলাই পর্যন্ত অপেক্ষা করেও জাহাজের দেখা মেলেনি।

৭ আগস্ট টেগার্ট হ্যারি অ্যাণ্ড সন্সের দোকানে অভিযান চালান ও 'ম্যাভেরিকে'র আগমনের জন্য ব্যবস্থা নেন। যতীন তা আন্দাজ কবতে পেরে জাভায তার পাঠান—"market low postpone transactions until information. C. Martin." এই মার্টিন (ওরফে নরেন্দ্রনাথ) ডব্ল্যু পেইন (ওরফে ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী)-এর সঙ্গে ব্যাটাভিয়া রওনা হয়ে যান। সাংহাইতে জার্মান কনসালের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে পেইন ধরা পড়ে স্বীকারোক্তি করলে পুলিশ সব জানতে পারে। কলকাতা ও যতীনের সঙ্গে যোগাযোগ বক্ষাকাবী বালেশ্বরের য়ুনিভার্সাল এম্পোরিয়ামেব খোঁজও পায তারা। বুড়িবালামেব খণ্ডযুদ্ধেব (৯ই সেপ্টেম্বর) বিশদ বিববণ পাই টেগার্ট জীবনীতে। গোপীনাথ সাহা নাকি বলেছিলেন টেগার্টেব গুলিতে যতীন্দ্রনাথেব মৃত্যু ঘটে। টেগার্টের মন্তব্য—"In the character of Jatin, Martin and most of the other enthusiasts the visionary was stronger than the realist, they pictured epic struggles and heroic battles taking place without such pedestrian accompaniments as the organization of transport, supplies, pay and medical aid. At the same time their driving power was immense." তবে তিনিও স্বীকার করেছেন, বর্মা-থাইল্যাণ্ড সীমান্তে যদি ১০,০০০ সৈন্য পরিকল্পনামত শিক্ষা নিতে পারত কিংবা অস্ত্র বোঝাই জাহাজ ভারতে আসতে পারত তবে প্রথম মহাযুদ্ধে ব্রিটিশরা হেরেও যেতে পারত। (Tegart Mss. p.128)। কিন্তু গদরপন্থী শিখরা ছিল সংখ্যালঘু, বর্মার সামরিক পুলিশকে বশে আনা যাযনি, সানফ্রানসিস্কো ও ব্যাংককের জার্মান এজেন্টরা গোলমাল করে ফেলে, ব্যাটাভিয়া থেকে সাংহাই যাওয়ার পথে জার্মান শিক্ষক সিঙ্গাপুরে ধরা পড়ে, চট্টগ্রামে অস্ত্র নামানো সম্ভব হয়নি। 'ম্যাভেরিকে'র দুর্ভাগ্যের কাহিনী তো সর্বজনবিদিত। এ বিষয়ে কিছু তথ্য পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখিত এক প্রবন্ধে (সাপ্তাহিক বসুমতী, ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫—২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬) পাওয়া যাবে। মুজফ্‌ফর আহমেদেব মতে, যুদ্ধ আরম্ভ হতেই নরেন যতীন্দ্রনাথকে এই পরিকল্পনা নিতে প্রণোদিত করেন। ('আমার জীবন ও ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি')। মনে হয়, একথা সত্য নয়।

যাই হোক, ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের মতে, যতীন্দ্রনাথ ইডিওলজির দিক থেকে উপনিষৎ, গীতা, বিবেকানন্দ ও অরবিন্দ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তাঁর কাছে স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল পশু স্তর থেকে সমাজকে দেব স্তরে ওঠাবার সাধনা। মানবেন্দ্রনাথ রায় (যতীনের সহকর্মী

নরেন্দ্রনাথ) আভাসে ইঙ্গিতে একথা স্বীকার করেছেন New Orientations গ্রন্থে। নেতার মৃত্যুর পর তিনি বেছে নিয়েছিলেন ভিন্ন পথ—সশস্ত্র প্রতিরোধ থেকে সাম্যবাদী গণবিপ্লবের স্তরে তাঁর উত্তরণ ঘটেছিল।

সশস্ত্র প্রতিরোধের অন্য ষড়যন্ত্রও হয়েছিল। রডা কোম্পানির ৫০টি মসার (mauser) পিস্তল ও প্রচুর গুলি চুরির ঘটনা নিয়ে ১৯১৪-১৫ সালে ডাকাতির সংখ্যা ছিল ১২, ১৯১৫-১৬ সালে ২৩, হত্যার সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৭ ও ৯।

পঞ্জাবের গদরপন্থীদের সাহায্যে রাসবিহারী বসু ও শচীন সান্যাল উত্তর-ভারতে এক অভ্যুত্থানের আয়োজন করেন। ভ্যানকুভার বন্দরে প্রবেশের অনুমতি না পেয়ে শিখ ও মুসলিম যাত্রীসহ 'কোমাগাতামারু' জাহাজ বজবজে নোঙর ফেললে ভারতীয় পুলিশের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হয় এবং বাইশ জন যাত্রী নিহত হয়। যুদ্ধ বাধার পর বহু প্রবাসী শিখ দেশে ফেরে এবং পুলিশ সন্দেহবশত তাদের অনেককেই গ্রেফতার করে। এসবের ফলে উত্তর-ভারতে যে গণ-অসন্তোষ দেখা দেয় রাসবিহারী ও শচীন তার সুযোগ নিতে চান। ঠিক হয় ১৯১৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ফিরোজপুর, লাহোর ও রাওলপিণ্ডির সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহ করবে, পরে বেনারস ও দানাপুরের ছাউনিতে তা ছড়িয়ে পড়বে। শেষ মুহূর্তে বিশ্বাসঘাতকতার ফলে এই পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। রাসবিহারী জাপান পালান, শচীনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়, পিংলের ফাঁসি। পঞ্জাব বাহিনীর আরও কিছু বিদ্রোহী নেতার একই দণ্ড হয়েছিল।

ভারতের বাইরে বিপ্লব প্রচেষ্টার প্রধান ঘাঁটি ছিল যুক্তরাষ্ট্র এবং জার্মেনী। সোহন সিং যোশ-এর মতে আমেরিকায় গদর দলের পত্তন করেন সোহন সিং ভাখ্না। কারুর মতে তারকনাথ দাস। মনে রাখতে হবে উর্দু ভাষায় 'গদর' (বিপ্লব) পত্রিকার প্রথম সংখ্যা বেরোয় ১৯১৩ সালের ১ নভেম্বর। তার থেকেই দলের নাম। বার্কলে থেকে প্রকাশিত জুবগেনস্‌মেয়ার্‌ ও ব্যারিয়ার সম্পাদিত Sikh Studies গ্রন্থে পত্রিকার উদ্ধৃতি মিলবে। বার্লিনের ইণ্ডিয়ান ইণ্ডেপেণ্ডেন্স কমিটির নেতা ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও লালা হরদয়াল (যিনি পরে যুক্তরাষ্ট্রে যান ও গদর দলের নেতৃত্ব নেন)। কাবুলে মহেন্দ্রপ্রতাপ, বরকতুল্লা ও ওবাইদুল্লা সিন্ধি এক অস্থায়ী সরকার স্থাপন করেন ১৯১৫ সালের ডিসেম্বরে। সিঙ্গাপুরে পঞ্জাবী ও শিখ বাহিনীতে বিদ্রোহ মাথাচাড়া দেয়।

ইংরেজরা এসব কার্যকলাপ কঠিন হস্তে দমন করেছিল। তাদের হাতে অন্যান্য আইন ছাড়া ছিল ভারত প্রতিরক্ষা আইন (D. O. R. A-র অনুরূপ)। যুদ্ধ শেষ হলে ভারত প্রতিরক্ষা আইনের মেয়াদ ফুরিয়ে যাবে বলে সরকার বিকল্প আইন চায় এবং প্রস্তুতি হিসাবে স্কচ বিচারপতি এস. এ. টি. রাওলাটকে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বাতলাবার অনুরোধ করে। রাওলাট কমিটির প্রতিবেদন অনুসারে যে আইন প্রণীত হয় তা পরে আলোচনা করা হবে। কিন্তু তার ফল সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের পক্ষে মারাত্মক হয়েছিল। জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন, সদা সতর্ক, বিপজ্জনক কার্যক্রম চালিয়ে যাবার পক্ষে দমননীতিই একমাত্র প্রতিবন্ধক ছিল না। সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে দলাদলি, যতীন্দ্রনাথের মত নেতার অভাব, রাসবিহারী ও নরেন্দ্রনাথের মত নেতার দেশত্যাগ, বিদেশ থেকে অস্ত্র ও অর্থ আগমনের সম্ভাবনা লোপ, ১৯১৭ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা (যা সানফ্রানসিস্কোর গদর ও অন্যান্য বিপ্লবীদের বিচারে প্রকট হয়), যুদ্ধজয়ী ব্রিটেনের বিশ্বব্যাপী গোয়েন্দাজাল এবং সর্বোপরি, অস্বাভাবিক, কিছু ক্ষেত্রে অমানবিক, জীবনের প্রতিক্রিয়ার ফলে একটা সংকট দেখা দেয়।[২৪]

॥ ২ ॥

গান্ধীজীর পথ ছিল সকলের থেকে আলাদা। নরমপন্থী সহযোগিতার নীতি বর্জন করে তিনি চরমপন্থী অসহযোগিতার নীতি নিলেন, আবার লক্ষ্যের ব্যাপারে বহুদিন তিনি নরমপন্থীদের অনুসরণ করলেন। প্রথমত, কলকাতা কংগ্রেস (১৯২০)-এর পূর্বে 'স্বরাজ' শব্দটি তিনি ব্যবহার করতে চাননি। দ্বিতীয়ত, স্বরাজের অর্থ শুধু ইংরেজ বহিষ্কার এমন কথা ১৯৪২-এর আগে স্পষ্ট করে বলেনওনি। রাষ্ট্রের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা নয়, রিপুর ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাই তাঁর মতে সত্যকার স্বরাজ। অন্যদিকে নরমপন্থীদের পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের আদর্শকে তিনি কোনদিন গুরুত্ব দেননি। কাউন্সিল ছিল তাঁর কাছে মায়া মাত্র (অরবিন্দের প্রতিধ্বনি)। নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিয়ে কলকাতা কংগ্রেসে মতবিরোধ, স্বরাজ পার্টির মতিলাল ও চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে বাদানুবাদ, ১৯৩৫-এর সংস্কার গ্রহণ সম্পর্কে অনীহা এবং সরকাব গঠনে আপত্তি, তীক্ষ্ণধী আইনজ্ঞ ও সংস্কারের আইনগত ত্রুটি আবিষ্কারে পটু গান্ধীর রাজনৈতিক আদানপ্রদান আপোসে বিরক্তি সবই এই মনোভাবের নির্দেশক। সন্ত্রাসবাদীদের অভয়মন্ত্র ও অমরবীর্য তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল কিন্তু হিংসা ও অসত্যের পথে স্বরাজ সাধনায় ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুপ্ত দলের মধ্যে সে-সাধনা আবদ্ধ রাখায় তাঁর ঘোর আপত্তি ছিল। কি নিজের কি দেশের জীবনে তিনি সর্বব্যাপী গণ-সংগ্রামের পথ বেছে নিয়েছিলেন। এখানে মার্কসবাদীদের সঙ্গে তাঁর একটা মিল ছিল। কিন্তু মার্কসবাদীদের মত তিনি সহিংস শ্রেণীসংগ্রামের নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর যুদ্ধে ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, জমিদার-কৃষক, ধনিক-শ্রমিক সমান ভাবে শরিক ; কারণ জাতি-ধর্ম-বৃত্তি-সম্পদ নির্বিশেষে সকলের এক শত্রু—সাম্রাজ্যবাদ, তার পিছনে ধনতন্ত্র এবং তারও পিছনে বস্তুবাদী শিল্পসভ্যতা। তাঁর অর্থনীতিতে বৃহৎযন্ত্রের স্থান নেই, কারণ তা মানুষকে দাসে পরিণত করে ; বড় রাষ্ট্রের স্থান নেই কারণ তা স্বতঃস্ফূর্ত সামাজিক সমবায়ের আদর্শকে খর্ব করে , শহরের আধিপত্য নেই কারণ তা গ্রামকে শোষণ করে. প্রাকৃতিক ও মানবিক ভারসাম্য নষ্ট করে ; সর্বোপরি মিথ্যা, হিংসা ও লোভের স্থান নেই, কারণ মানুষের আত্মিক স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করে তা পূর্ণ সত্যরূপী ঈশ্বরের অন্বেষাকে ব্যাহত করে। তিনিই বোধহয় পৃথিবীর শেষ আধ্যাত্মিক নৈরাজ্যবাদী (তাঁব ভাষায় 'রামরাজ্য' বাদী) যিনি খ্রীস্টের মত মাটির পৃথিবীতে ন্যায় ও প্রেমের রাজ্য ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন এবং খ্রীস্টের মতই ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন।

ব্যক্তি হিসেবে এরকম জটিল চরিত্র ইতিহাসে দুর্লভ। তাঁর মধ্যে বিচিত্র, অনেক সময় আপাতবিরোধী, চৈতন্যের স্তর লক্ষ কবি। কখনও তিনি ভিক্টোরীয় যুগের সুভদ্র উদারতন্ত্রী কখনো বা আপোসহীন নৈরাজ্যবাদী ; কখনও গীতার স্থিতপ্রজ্ঞ সন্ত কখনো বা কৌটিল্যসদৃশ ঝানু রাজনীতিজ্ঞ ; এই মুহূর্তে ঐতিহ্যাশ্রয়ী রক্ষণশীল হিন্দু, ধনিকের মুখপাত্র, পরমুহূর্তে বেপরোয়া সমাজসংস্কারক, সংগ্রামী কৃষকের সহযোদ্ধা ; একই সঙ্গে জাতীয়তাবাদী ও আন্তর্জাতিক ধ্যানধারণার মূর্ত প্রতীক। তাঁর বাস্তববুদ্ধির কাছে-ইংরেজরা বারবার হেরেছে, আবার তাঁর সরল বিশ্বাসের সুযোগও নিয়েছে বারবার। সংহতিকামী মুসলমানদের এমন বন্ধু কোনওদিন জোটেনি আবার বিভেদকামী হিন্দু, মুসলমানদের এমন বিরোধিতাও কেউ করেনি। বীর্যের সঙ্গে প্রশান্তির, ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে নিরাসক্তির অদ্ভুত মিশ্রণ এই চরিত্র নানা শ্রেণীর নানা স্বার্থের মানুষকে প্রবল ভাবে আকর্ষণ করেছে শুধু সর্বব্যাপী সততা ও ভালবাসার জোরে ; সৃষ্টি হয়েছে তাঁর **charisma,** তাঁর যাদু, যার রহস্য আজও বোঝা গেল না।

তাঁর জীবনদর্শনের পিছনে জন্মস্থান গুজরাটের জৈনধর্ম, পারিবারিক বৈষ্ণব প্রভাব, সাধু রাইচাঁদের সংস্পর্শ হয়তো কাজ করেছিল কিন্তু তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পশ্চিম থেকে পাওয়া বাইবেল, রাসকিন, থোরো ও টলস্টয়ের প্রেরণা। বিলেতে ছাত্রাবস্থায় তিনি এডুইন আরনল্ডকৃত গীতার ইংরাজী ভাবানুবাদ পড়েছিলেন। শেষে গীতাই তাঁর প্রধান আধ্যাত্মিক অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। লক্ষণীয় যে তাঁর গুজরাটী গীতাভাষ্য তিলকের মারাঠী ও অরবিন্দের ইংরেজী গীতাভাষ্য থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। শঙ্কর, রামানুজ থেকে শুরু কবে সর্বাধুনিক গীতাভাষ্যের সঙ্গে তার বিশেষ মিল নেই। গান্ধীর গীতার কুরুক্ষেত্র মানুষেব আপন অন্তর। সেখানে সু ও কু প্রবৃত্তি পাণ্ডব-কৌরবের ভূমিকায় অবতীর্ণ। সেখানে লক্ষ্য ও উপায় সমমূল্য, উভয়ই বিবেকবুদ্ধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আফ্রিকায় প্রবাসকালে ১৮৯৩ সালে তিনি পড়েন টলস্টযেব Kingdom of God is within You. ১৯১০ সাল পর্যন্ত স্বয়ং টলস্টয়ের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ রুশ নৈরাজ্যবাদীর প্রভাবকে দৃঢ়তর করে। ১৯০৪ সালে তিনি পড়েন, রাসকিনের Unto this Last যা তাঁকে কায়িক শ্রমের মর্যাদা ও আধ্যাত্মিক মূল্য সম্বন্ধে সচেতন করে। ১৯০৭ সালে তিনি থোরোর Civil Disobedience পড়েন, যা সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্যের রূপরেখা তাঁর মনে এঁকে দেয়। ১৯০৯ সালে তিনি লেখেন Hind Swaraj. তাতে যে বিশ্ব-বীক্ষা ও জীবন-দর্শনের সূত্র মেলে শেষদিন পর্যন্ত তার মৌল পরিবর্তন ঘটেনি।

কি ছিল 'হিন্দ স্বরাজ'-এ ? ছিল আধুনিক বস্তুবাদী সভ্যতা সম্বন্ধে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন (যা আগেই উঠেছে) এবং নিবসনে গান্ধীর নিজস্ব সমাধান। বস্তুত রোমাণ্টিক আন্দোলন এ বিষয়ে তাঁর পূর্বসূরী। শিল্পবিপ্লবের অসুন্দর ও অমানবিক দিকগুলি রোমাণ্টিক কবিদের এতই বিরূপ করে যে, কেউ কীটসের মত মধ্যযুগে, কেউ ওয়ার্ডসওয়ার্থেব মত প্রকৃতির ক্রোড়ে পলাযন করতে চান, কেউ বা শেলীর মত বা বায়বনের মত বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। নৈরাজ্যবাদীরাও ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরুদ্ধে নানাভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। ম্যাথু আরনল্ড পবিণত শিল্পবিপ্লবেব রূপ দেখে প্রশ্ন করেন, কেন এই 'sick hurry and divided aims'? ফরাসী প্রতীকী আন্দোলন, ১৮৯০-এর পরবর্তী এস্থেটিক বিদ্রোহ, আইরিশ কেল্টিক আন্দোলনের পুরোধা ইয়েটস এবং সর্বশেষে টি এস এলিযট নানাভাবে প্রকাশ করেছেন বিরাগ। কি দিয়েছে জড়বিজ্ঞানের বিস্ময়কব জয়যাত্রা ও কৃৎকৌশলের পবাকাষ্ঠা ? এলিযটেব ভাষায়—

> The endless cycle of idea and action,
> Endless invention, endless experiment,
> Brings knowledge of motion, but not of stillness;
>
> * * *
>
> Where is the Life we have lost in living?
> Where is the Wisdom we have lost in knowledge?
> Where is the Knowledge we have lost in information?
>
> The cycles of Heaven in twenty centuries
> Bring us farther from God and nearer to the Dust.

ঈশ্বরকে আমরা হারিয়েছি বস্তুর বিপুল স্তূপে। তাঁর স্থলে প্রথমে বসিয়েছি যুক্তিকে, পরে

ক্রমান্বয়ে অর্থ, শক্তি, জাতি ও দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে। তাতে কি সুখ শান্তি এল ? এই আত্মাহীন প্রগতির রথ একদিন পৌঁছবে 'পোড়োজমি' (Waste land)-তে। সম্ভয়োন্মাদ সমাজ জন্ম দেবে 'ফাঁপা মানুষ' ('hollow men') কে। সভ্যতা ফণিমনসায় আকীর্ণ মরুভূমি ('dry land, cactus land')-র চেহারা নেবে। কোথাও তৃষ্ণার জল মিলবে না।

কি এর সমাধান ? গান্ধী বললেন, বস্তুবাদ থেকে জন্ম শিল্পবিপ্লবের আবার তার থেকে সাম্রাজ্যবাদেব। এই পরধনলোভমত্ত সাম্রাজ্যবাদকে নিবস্ত কবতে হবে। কিন্তু মার্কস ও এঙ্গেলসের পথে তা হবে না। অহিংস শ্রেণীসংগ্রামের শেষে যে 'সর্বহারার রাষ্ট্রে'র অভ্যুদয় হবে তাও একদিন জড়িয়ে পড়বে বস্তুবাদেব নাগপাশে, বিরোধী শক্তি দমন করতে গিয়ে ধরবে সর্বগ্রাসীরূপ। এই সাম্রাজ্যবাদেব সঙ্গে লড়াই করতে হলে চাই সত্যের ও প্রেমের শক্তি। তাব অন্য নাম অহিংসা—কায়, মন, বাক্যে অহিংসা। এ লড়াই চিরন্তন মূল্যবোধ নিয়ে বিরাট এক পরীক্ষা। শুধু ব্যক্তির জীবনে নয়, রাজনৈতিক কর্মেও তাকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। রাজনীতি তখন বৃত্তি থাকবে না, শক্তিসাধনা থাকবে না, হবে আত্মিক মুক্তিব অন্যতম উপায। বাজনীতিকে ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করা ভুল, তবে এ ধর্ম কোন আনুষ্ঠানিক বা সাম্প্রদাযিক ধর্ম নয়। এ ধর্মকে বেদে বলা হয়েছে ঋত—অর্থাৎ নৈতিক বিশ্ববিধান। ইংবেজ ভাবতবর্ষে বিশ্ববিধানকে লঙ্ঘন কবছে, তাকে রুখতে হবে সত্যাগ্রহ দিয়ে। প্রেম হবে আমাদেব অস্ত্র, ত্যাগ ও দুঃখবরণ হবে বর্ম, লক্ষ্য হবে বিপক্ষেব মনোজয অথবা সত্যাগ্রহীব মৃত্যু। শবৎচন্দ্রেব 'মহাত্মাজী' প্রবন্ধ এ প্রসঙ্গে অবশ্য পাঠ্য।

জোযান বঁদুর Conquest of Violence: The Gandhian Philosophy of Conflict গ্রন্থে দেখিযেছেন, সত্যাগ্রহ গান্ধীব কাছে কোন অপরিবর্তনীয অন্ধ অনুশাসন ছিল না, ছিল নৈতিক সংগ্রামেব ভূমিকা বচনাব স্বাধীন পবীক্ষা-নিবীক্ষা। এব উদ্দেশ্য আপন মতামত জোর্ কবে চাপানো নয, বোঝাপড়ার সম্ভাবনা বচনা। সত্যেব একটা দিক দেখছি আমরা, বিপক্ষ দেখছে আব এক দিক। এক্ষেত্রে হিংসা ও অসত্যেব প্রযোগ চলতে পাবে না। সত্যাগ্রহী সর্বক্ষণ আপন মনোভাব পবীক্ষা কববেন, বিপক্ষকেও তাই কবতে বাধ্য কববেন। শেষে আসবে একটা নতুন ধরনের, উচ্চতর নৈতিক স্তরেব সম্পর্ক। উভযেব আংশিক দৃষ্টি মিলে গিযে সত্যকে প্রতিভাত করবে পূর্ণতব রূপে। এ-যুদ্ধে কেউ জযী নয, কেউ বিজিতও নয। সংগ্রামেব শেষে থাকবে না কোনো তিক্ততা বা অবসাদ।

> The inner freedom, from the practical desire;
> The release from action and suffering, release from the
> inner
> And the outer compulsion, yet surrounded,
> By a grace of sense, a white light still and moving
> ....both a new world
> And the old made explicit, understood
> In the completion of its partial ecstasy
> The resolution of its partial horror.
> (T. S. Eliot, Burnt Norton)

প্রথম থেকেই গান্ধী ছিলেন 'এলিটের', ছিলেন জনগণের। তাঁর ব্যক্তিত্ব দুই বিপরীত মেরুকেই শুধু স্পর্শ করত না, তাদেব এক কর্মসূত্রে গ্রথিত করতেও পারত। দক্ষিণ

আফ্রিকায় তাঁর মক্কেলের মধ্যে ছিল ধনী বানিয়া থেকে দরিদ্র, চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক, হিন্দু ও মুসলমান। তাদের মানবিক অধিকার নিয়ে শ্বেতাঙ্গ সরকারের সঙ্গে দীর্ঘদিন তিনি লড়েছিলেন এবং লড়াই-এর মধ্যেই শিখেছিলেন সংগঠন, প্রচার ও সংগ্রামের কলাকৌশল। মার্কসবাদের মতই গান্ধীবাদেও 'থিয়োরী ও প্র্যাকটিসের' অঙ্গাঙ্গী যোগ স্বীকৃত। কি করে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বোঝাপড়ার চেষ্টা করতে হয়, বিফল হলে লণ্ডনের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে হয়, তাও ব্যর্থ হলে আইন অমান্যের আশ্রয় নিতে হয়, কখন তা বন্ধ করতে হয়—আফ্রিকায় তার মহড়া হয়ে গিয়েছিল। তিনি বুঝেছিলেন নৈতিক সংগ্রামের প্রস্তুতি সুকঠিন। প্রথমে তৈরি করতে হবে নিজেকে, পরে মাঝারি নেতাদের, শেষে জনগণকে। আশ্রম ছিল তাঁর ও জনগণের মধ্যে সেতু। সেখানে দীক্ষিত হতেন মাঝারি সেনাপতিগণ সত্য ও অহিংসার মন্ত্রে। তাঁরা সংঘবদ্ধ সরল জীবন যাপন করতেন শুধু অর্থাভাব বা সংযমাভ্যাসের জন্য নয়, জনগণের কাছাকাছি থাকার তাগিদে ; সামান্য প্রয়োজনে উৎপাদন করতেন নিজেদেরই কায়িক শ্রমে। বলা বাহুল্য, এর পিছনে রবার্ট ওয়েন, রাসকিন ও টলস্টয়ের প্রেরণা ছিল। আফ্রিকায় গান্ধীর আশ্রমের নামই ছিল টলস্টয় ফার্ম। ভারতবর্ষেও তাঁর প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল সবরমতী ও ওয়ার্ধার আশ্রম। তাতে শিক্ষা লাভ করে শিষ্যরা ছড়িয়ে পড়তেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। খাদি আশ্রম, সুতাকাটুনী সঙ্ঘ, হরিজন সঙ্ঘ ইত্যাদি গঠন করে কোথাও তাঁরা বেকারদের সুতাকাটার কাজ দিতেন, কোথাও চরকার সুতা যোগাতেন তাঁতীদের, কোথাও তৈরি করতেন ঘানির তেল, ঘি ও মধু। জনসাধারণ শুধু পারিশ্রমিক বা শস্তায় ভোজ্য পণ্য পেত না, পেত বাঁচার নতুন সাহস। বন্যা বা দুর্ভিক্ষের দিনে, কখনো বা জমিদার, মহাজনদের সঙ্গে বিবাদের সালিশিতে, তারা আশ্রমবাসীদেব পেত আপন পাশে। সঙ্গে সঙ্গে চলত স্বরাজের বাণী প্রচাব। যেদিন গান্ধীজি আন্দোলনের ডাক দিতেন সেদিন বেরিয়ে পড়তেন আশ্রমের পরিচালক থেকে নবীনতম সভ্য—অঞ্চলের লোকদের কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত করতে। এঁরাই "গান্ধীমহাবাজেব শিষ্য—কেউ বা ধনী কেউ বা নিঃস্ব।" কংগ্রেসের জেলা ও প্রাদেশিক কমিটিতে এঁদের অনেকেই সভ্য হতেন। দুর্ভাগ্য আমাদেব, গান্ধীর সংগঠন থেকে কংগ্রেস বহুদূর সরে এসেছে ; আর তাই জড়িয়ে পড়েছে স্বার্থপর এলিট বাজনীতির দুষ্টচক্রে।

আপন হাতে কাটা সুতোয় বোনা খাটো ধুতি, সরল হিন্দী ভাষণ, তুলসীদাস, মীরা, কবীরেব লাগসই উদ্ধৃতি, লৌকিক উপমা রূপকের ব্যবহার, কৃষক-শ্রমিকের দুঃখ দুর্দশার গভীবে প্রবেশ কবাব সহজাত শক্তি ও সমস্যা সমাধানে বাস্তবানুগ সুস্পষ্ট উপদেশ তাঁর যে ভাবমূর্তি রচনা করেছিল তা বিদগ্ধজনের দৃষ্টি এড়ায়নি। নেহরুর Discovery of India তে প্রমাণ মিলবে—"টাটকা হাওয়াব একটা প্রবল প্রবাহের মত ছিলেন তিনি, আমাদেব জাগিয়ে দিলেন, গভীর নিঃশ্বাস নিলাম আমরা। তিনি ছিলেন আলোর ঝলকের মত যা অন্ধকার ভেদ করে আমাদের চোখের সামনের পর্দাগুলো খুলে দিল। ঝড়ের মত এলেন তিনি, তাতে কত কি যে উড়ে গেল—সব থেকে উড়ে গেল মানুষের চিন্তা ভাবনার পুরাতন পদ্ধতি। তিনি ওপর থেকে নেমে আসেননি, তিনি যেন ভারতের কোটি কোটি মানুষের ভেতব থেকে বেবিয়ে এলেন, তাদেরই ভাষায় কথা বললেন তাদেরই ভয়াবহ অবস্থাব প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ কবে। তাঁর শিক্ষার সার কথা—অভয় ও সত্য এবং কর্ম যা গণকল্যাণমুখী।" বিদেশী সি এফ অ্যানড্রুজ ববীন্দ্রনাথকে লিখলেন (২৮ অক্টোবর ১৯২০), " The entire force of depressed humanity in India—not Khilafat, not Punjab—but the whole misery of a continent,

oppressed and crushed by an outrageous system of imperial aggression."—গান্ধীর মধ্যে প্রকাশিত।

যখন আগের আমলের নেতারা পর পর তিনটি কংগ্রেস—কলকাতা (১৯১৭), বোম্বাই (বিশেষ অধিবেশন, ১৯১৮) ও দিল্লী (১৯১৮)-তে মণ্টেগুর শাসন সংস্কার প্রস্তাব নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত এবং নরমপন্থীরা আবার আলাদা হতে চলেছে, তখন গান্ধী গিয়ে দাঁড়ালেন ইংরেজ নীলকর প্রপীড়িত চম্পারনের চাষী, বর্ধিতহারে রাজস্ব দিতে অসমর্থ খেড়ার কৃষক এবং প্রাপ্য মজুরি/ভাতায় বঞ্চিত আহমদাবাদের শ্রমিকের পাশে। রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য ভাষায়, "এতদিনে সত্য এসে দাঁড়াল, বই থেকে একটা উদ্ধৃতিমাত্র নয়। মহাত্মা নাম, যা তাঁকে দেওয়া হয়েছিল, সেই তাঁর সত্য নাম। আর কে ভারতের এত লোককে তাঁর আপন রক্ত মাংস বলে মনে করেছিল?"

॥ ৩ ॥

ভারতসচিব মণ্টেগু ১৯১৭ সালের ২০ আগস্ট কমন্স সভায় সংস্কার বিষয়ে যে ঘোষণা করেছিলেন তাব একটা ছোট ইতিহাস আছে।[২৫] মেহরোত্রা ও রবের প্রবন্ধে দেখি খিলাফৎ আন্দোলন এবং লখনউ চুক্তির পর হোমরুল আন্দোলন শুরু হওয়ায কর্তৃপক্ষ চিন্তিত হন এবং মেস্টন ও ম্যারিসের পরামর্শে ১৯১৬ সালের ২৪ নভেম্বর শাসন সংস্কার বিষয়ক এক প্রস্তাব ইংল্যাণ্ডে পাঠানো হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারত যে পরিমাণ সাহায্য করেছিল তাকে অগ্রাহ্য করা চলেনি। প্রায় দশ লক্ষ ভারতীয় মিত্রসৈন্য দলে যোগ দেয়, ভারত সরকাব দুই থেকে তিন কোটি পাউণ্ড প্রতি বছর যুদ্ধেব জন্য ব্যয় করে, যুদ্ধজনিত ঋণের পরিমাণ ছিল ৭$\frac{১}{২}$ কোটি পাউণ্ড এবং ১৯১৭-ব মার্চে ব্রিটিশ যুদ্ধঋণের ১০ কোটি পাউণ্ডের দায় ভারত সরকারেব ওপব চাপানো হয়েছিল। এই পবিপ্রেক্ষিতে ও রাজনৈতিক চাপে ভারতীয়দেব দাবি উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। তবে উক্ত প্রস্তাবে ডোমিনিয়ানের উল্লেখ ছিল না। লক্ষ্য হিসাবে "ভাবতের পক্ষে উপযোগী স্বশাসন" এই কথাগুলি ব্যবহৃত হয়েছিল। প্রাদেশিক আইন পরিষদে নির্বাচিতের সংখ্যাবৃদ্ধি, এমন কি নির্বাচিতের সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুপারিশ করা হয়, কিন্তু তাদের ক্ষমতা বাড়াবার প্রস্তাব ছিল না। ইম্পিরিয়াল ওযাব ক্যাবিনেটে তিনজন ভারতীয় প্রতিনিধি পাঠানো হয়েছিল, তবে তাদের কোন মূল্য ছিল না। প্রস্তাবেব উত্তরে ভারতসচিব অস্টেন চেম্বাবলেন বড়লাট চেমসফোর্ডকে (২ মে ১৯১৭) লেখেন, কিছু নির্দিষ্ট ক্ষমতা, সত্যকার দাযিত্ব দিতেই হবে এবং বিস্তাবিত ভাবে না বললেও লক্ষ্য কি পবিষ্কার জানিয়ে দিতে হবে। এই মনোভাবের পিছনে ছিল ম্যারিস, কেব (প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জের সচিব) ও লায়োনেল কার্টিসের 'দ্য রাউণ্ড টেবল' সংস্থা। রাশিযার ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের উল্লেখ কবে বড়লাট ১৮ মে'র তারে জানান, নরমপন্থীদের হাতে রাখতে গেলে এখুনি লক্ষ্য ঘোষণা প্রয়োজন। মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যর্থতার দায়ে চেম্বারলেন পদত্যাগ করলে মণ্টেগু ভারতসচিব হন এবং ২০ আগস্ট শাসন সংস্কারের মূলনীতি ঘোষণা কবেন। অনেকের ব্যাখ্যায এর দ্বাবা ব্রিটিশ সবকার ইংল্যাণ্ড বা ডোমিনিয়ানদের আদর্শে ভারতে শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলেন। অন্তত কার্টিস সেই সময় ও লয়েড জর্জ পরে এ ব্যাখ্যা দেন। কিন্তু ব্যালফুর ও কার্জনের ওয়াব ক্যাবিনেট মেমোরেণ্ডাম[২৬] পড়লে বোঝা যায় বক্ষণশীল নেতাবা তা মনে করতেন না। ব্যালফুর 'স্বশাসন' শব্দটি পছন্দ করেননি বলে কার্জন 'দায়িত্ববান সরকার' শব্দ ব্যবহার করেন কিন্তু প্রচলিত অর্থে নয়।

কার্জন চেয়েছিলেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে দায়িত্ববান সহযোগিতা, তাব বেশি কিছু নয়। আবও দেখতে হবে প্রতিশ্রুতি হলেও তা ছিল শর্তসাপেক্ষ, এবং শর্ত পূর্ণ হচ্ছে কি না তা নির্ধাবণ করবে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট। অর্থাৎ, ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষা আবো ভালো ভাবে কায়েম কববাব জন্য কিছু কাঠামোগত বদল। মণ্টেগু ববং ভারত ভ্রমণের শেষে ওয়েস্টমিনস্টাব আদর্শেব দিকে বেশি এগোন। তাঁর রিপোর্টে পার্লামেন্টেব কর্তৃত্ব ও ভারতসচিবের খববদারী শিথিলতর করার কথা ছিল।

কলকাতা কংগ্রেসে (১৯১৭) প্রেসিডেন্ট অ্যানি বেশান্ত মন্তব্য কবলেন, এ ধরনেব প্রস্তাব ইংল্যাণ্ডেব পক্ষে দেওযা বা ভাবতেব পক্ষে গ্রহণ করা মর্যাদাহানিকব। বিপিনচন্দ্র পাল বলেন, এখুনি প্রাদেশিক সরকাবকে শাসনেব পূর্ণ দাযিত্ব দেওযা হোক। তিলক লখনউ চুক্তি মত অধিকাব পেলেই সন্তুষ্ট হতেন। শ্রীনিবাস শাস্ত্রীকে গান্ধী লেখেন (১৮ জুলাই ১৯১৮), দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা (ডায়ার্কি) প্রত্যাখ্যান কবা উচিত, প্রশাসনে ইংবেজদেব সংখ্যা ও সামরিক ব্যয কমিযে কবভার হ্রাস কবা উচিত এবং ভাবতীয শিল্পোদ্যোগ পবিপোষণ করতে হবে। তখনও তাঁব বিশ্বাস ছিল ফ্রান্সের বণক্ষেত্রে ভাবত তাব স্বাধীনতা অর্জন করবে। তাই মিত্রপক্ষেব জন্য সেনাসংগ্রহ চালিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি।

মণ্টেগু এবার ভারত ভ্রমণে এলেন। তখন পঞ্জাবেব সংখ্যালঘু হিন্দু, অন্য অঞ্চলেব সংখ্যালঘু মুসলমান, মাদ্রাজেব অব্রাহ্মণ, বোম্বাই-এব অনুন্নত জাত তাঁব কাছে নানা দাবি দাওযা পেশ করল। সবাই চায আলাদা ভোট। মণ্টেগু তাঁব প্রতিবেদনে ভাবতকে কতকগুলি রাষ্ট্রেব সমাহাব বলে বর্ণনা করলেন। সকলেব ওপবে থাকবে এক কেন্দ্রীয় সবকাব যা ক্রমে প্রতিনিধিত্বমূলক ও দাযিত্ববান হবে। সাম্প্রদাযিক ও বিশেষ স্বার্থকে স্বীকাব না করে উপায় নেই। এব প্রমাণ পেলাম বাংলায় ১৩৯টি আসনেব মধ্যে ২৬টি সবকাবী ও মনোনীত আসন, ৪৬টি সাধাবণ আসন ও ৪৬টি সাম্প্রদায়িক আসন ববাদ্দে।

বোম্বাইতে বসল কংগ্রেসেব বিশেষ অধিবেশন (২৯ আগস্ট—১ সেপ্টেম্বর ১৯১৮) মণ্টফোর্ড প্রতিবেদন আলোচনা করতে। হাসান ইমাম এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব কবেন। সুবেন্দ্রনাথ, সাপ্রু, চিন্তামণি এবং ওযাচা এই অধিবেশনে যোগ দেননি। তাঁদেব ভয় ছিল বেশি নিন্দে কবলে সংস্কাব ভেস্তে যাবে। জুডিথ ব্রাউন দেখাচ্ছেন, সব জায়গায লডাই হচ্ছিল জন-সমর্থন বিস্তার ও আঞ্চলিক নেতৃত্ব নিযে। যেহেতু সুবেন্দ্রনাথ মণ্টফোর্ড প্রস্তাব সমর্থন কবেন, সেইহেতু তাঁব প্রতিদ্বন্দ্বী চিত্তবঞ্জন দাশ তার বিবোধিতা কবেন। দাশ বললেন, মণ্টেগু "সত্যকার স্বরাজেব সিকিও দেননি।" মাদ্রাজে শিবস্বামী আয়ার ও নটেশনেব সঙ্গে বেশান্তের বিবাদ বাধল। শেষ পর্যন্ত বোম্বাই কংগ্রেস প্রস্তাব নিল, "সংস্কাব হতাশাব্যঞ্জক ও অমনোমত।" যদি পনের বছবেব মধ্যে কেন্দ্রে এবং ছ বছবের মধ্যে প্রদেশে পূর্ণ দায়িত্ববান সবকাব দেওযা হয় তবেই কংগ্রেস দ্বৈতশাসনের (dyarchy) নীতি গ্রহণ করতে পাবে। গান্ধী কংগ্রেস বা তার বিরোধী কোন দলেই যোগ দেননি, তবে তিলককে (২৫ আগস্ট ১৯১৮) জানান, সংস্কাব প্রস্তাবের মূলনীতি গ্রহণ কবা হোক, কোথায় তা আরো ভালো করা যেতে পারে দেখিয়ে দেওয়া হোক এবং তার জন্য লড়াই করা হোক। আসলে কোন দলের সঙ্গে তিনি নিজেকে জডিযে ফেলতে চাননি। সত্যাগ্রহ ছিল তাঁর মূলমন্ত্র অথচ বেশান্ত তা প্রত্যাখ্যান করেছেন আর তিলক মনে কবতেন তা দুর্বলের অস্ত্র।

১৯১৮ সালের ডিসেম্বরে দিল্লীতে বসল কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন। এবাব সভাপতি মদনমোহন মালব্য। দিল্লী কংগ্রেস দাবি করে এখুনি প্রদেশে দায়িত্ববান সরকার চালু করতে

হবে এবং কবে কেন্দ্রে দায়িত্ববান সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে সে তারিখ সংস্কার আইনেই উল্লেখ করতে হবে। আগস্ট থেকে ১৯১৯-এর জানুয়ারি গান্ধী গুরুতর অসুস্থ ছিলেন। তিনি দিল্লী আসতে পারেননি।

মাদ্রাজে রাজাগোপালাচারিব গৃহে আরোগ্যলাভ করার সময় সহসা তাঁর দৃষ্টি যেদিকে পড়ল তা সরকার প্রস্তাবিত সন্ত্রাসবাদ দমনকামী রাওলাট বিল। বোধিবলে গান্ধী বুঝতে পাবেন বাওলাট বিলেব বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতব্যাপী সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করা সম্ভব। অনেকদিন ধবে সীমিত ক্ষেত্রে সত্যাগ্রহেব পরীক্ষা তিনি চালাচ্ছিলেন। এখন তা সর্বভাবতীয় ক্ষেত্রে পবীক্ষা কববার সময় এল।

গান্ধী বুঝেছিলেন বর্তমান কংগ্রেস সত্যাগ্রহের দর্শন মেনে নেবে না এবং সম্মুখ সমবে তাঁব পক্ষে পুবোনো আমলের নেতাদের হাবানো অসম্ভব। তাই তিনি ভারতেব বিভিন্ন প্রাণ্তে সাধাবণ মানুষদের প্রতি যেসব অন্যায় চলছে তাব বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহনীতি পবীক্ষা কবতে ও সাফল্য দেখিয়ে জনমত পক্ষে আনতে চাইছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে তাঁব charisma কিভাবে গড়ে উঠছিল তা আলোচনা করা যেতে পারে।

চম্পাবনেব নীল সত্যাগ্রহেব কথা ধবা যাক। বেতিযার মহকুমাশাসক লিউইস চম্পাবনেব জেলাশাসক হেককককে লিখছেন, "আমবা নিজ নিজ মতানুসাবে গান্ধীকে আদর্শবাদী, ভাবোন্মাদ বা বিপ্লবী ভাবতে পারি। কিন্তু বায়তদেব কাছে তিনি মুক্তিদাতা এবং তাবা মনে করে তাঁব আশ্চর্য সব ক্ষমতা রযেছে। তিনি গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুবে বেড়াচ্ছেন, তাদের অভাব অভিযোগেব কথা শুনছেন এবং ভবিষ্যতেব স্বর্গবাজ্য নেমে আসবে এই স্বপ্নে মূর্খ জনগণেব কল্পনা উদ্দীপ্ত কবছেন।"[২৭] সরকাবী কাগজপত্রে দেখি প্রতাপগড অঞ্চলে কেউ তাঁকে ভাবছে মহাত্মা, কেউ পণ্ডিত বা ব্রাহ্মণ (যিনি এলাহাবাদে থাকেন), এমন কি 'দেওতা'। কেউ বলত তিনি তিন আনা গজে কাপড় বেচে ফেরেন আব তিনি সব বেদখলি বন্ধ কবে দিযেছেন।[২৮] শহীদ আমিন পূর্ব ইউ.পি-ব গোবক্ষপুর অঞ্চলে ১৯২১-২২ সালে গান্ধী সম্বন্ধে জনসাধাবণ কি ধবনেব কথা বলত তার বিশদ আলোচনা কবেছেন। তাতেও দেখি গান্ধীর আশ্চর্য ক্ষমতা নিযে জল্পনা কল্পনা।[২৯] সতীনাথ ভাদুডীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' (প্রথম চবণ)-এ দেখি যখন তাৎমাটুলিতে 'গান্হী' বাবাব বার্তা প্রথম এল, বাবুলাল ব্যাখ্যা কবে বলছে, "বড়া গুণী আদমি। ভৌকা বাওযা আব রেবণ গুণীর চাইতেও 'নামী'।... গানহী বাওয়া মাস-মছলী, নেশাভাঙ থেকে 'পরহেজ'। শাদি বিয়া কবেনি। নাঙ্গা থাকে বিলকুল।" বিলিতী কুমড়োব ওপর গানহী বাওয়াব 'মূবত'ও আবিষ্কৃত হল। আর ধুমধাম করে সে কুমড়োর পুজো হল। মিলিটারী ঠাকুরবাড়ির মোহান্তজী যখন রামসীতার মূর্তিব পাশে গান্হী বাবাব 'মূবত' বাখতে দিলেন না, সেদিন দরিদ্র তাৎমাদের কি দুঃখ। তারা তো ওঁর জন্য ঠাকুরবাড়ি বানাতে পারে না। তক্ষুনি তাদেব মনে পড়ল তুলসীদাসের বাণী—'নহি দরিদ্র সম দুখ জগমাঁহী।'—সতীনাথের মত এত সুন্দবভাবে গান্ধীর charisma-ব সঙ্গে অসহায় দারিদ্র্য সম্বন্ধে জনগণের অস্পষ্ট সচেতনতা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আশাকে কেউ যুক্ত করতে পারেনি। তবে তিনি এটাও ভোলেননি যে কিছু ধান্দাবাজ লোক (মাহ্‌তো ও ছড়িদার) 'ভক্ত' হয়ে যায়। শুধু কাল্পনিক ঢোঁড়াই নয়, বোম্বাই-এর শ্রমিক (পরে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় সোপর্দ) আল্‌বের জবানবন্দী এই প্রসঙ্গে পঠিতব্য। তিনি ভেবেছিলেন মহাজনদের অত্যাচার বন্ধ হবে, মজুরি বাড়বে, মালিকের শোষণ কমবে। তাঁর মত অনেকেই। জি ম্যাকডোনাল্ড যে বলছেন বিহাবে গান্ধীর পিছনে ছিলেন শহুরে উকিল, ছোট ব্যবসায়ী, ছোট জমিদার ও ধনী কৃষক—তার পুরোটাই ঠিক নয়।[৩০]

বৃজকিশোর ও বাজেন্দ্রপ্রসাদ, অনুগ্রহ নারায়ণ সিংহ ও শ্রীকৃষ্ণ সিংহ একই সঙ্গে উকিল ও ছোট জমিদার ছিলেন, এবং পরে বড় নেতা হয়েছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছেন তাৎমাদের, 'রংরেজ' সরকারের জন্য যাদেব রোজগার নেই, বহুদিন আগে যাদের বুড়ো আঙুল কেটে দেওযায় তাবা আব কাপড় বুনতে পাবে না। গান্ধীব charisma গড়ে তুলেছিল নিম্নবিত্ত, নিম্নবর্ণ, নিম্নবর্গেব স্বপ্ন ও কল্পনা।

গান্ধী তার কতটুকু পূর্ণ করতে পেবেছিলেন তা ক্রমে আলোচিত হবে। চম্পারন দিয়েই আবার শুরু কবি। জুডিথ ব্রাউন দেখাচ্ছেন ওপব ও নীচের চাপে কিভাবে প্রাদেশিক সবকাব চম্পাবন নিয়ে অনুসন্ধান কমিশন বসিয়েছিলেন এবং গান্ধী তার সভ্য হয়েছিলেন।[৩১] কমিশনের প্রতিবেদন[৩২] অনুযাযী যে আইন পাস হয় তাতে তিনকাঠিয়া প্রথা (প্রতি বিঘাব তিন কাঠা নীল চাষ কবতে হবে) বাতিল হয়ে যায় এবং খাজনাব হার ২০% থেকে ২৬% কমিযে দেওযা হয়। গান্ধী নীলকবদেব সঙ্গে বোঝাপড়া কবছিলেন কারণ, তাঁব মতে, নীলকব ও চাষীদেব এক সঙ্গে থাকতে হবে বলে চিরদিন তাবা ঝগড়া কবতে পাবে না। তবে নীলকবরা যাতে ভবিষ্যতে অত্যাচার না কবতে পাবে তার জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা কবা দবকার। প্রথমটা হল চাষীদেব মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, দ্বিতীযটা—চাষী ও নীলকবদেব মধ্যে মধ্যস্থতা কবাব জন্য স্থায়ী প্রতিষ্ঠান।

গুজবাটেব খেডা কৃষক আন্দোলন একবকম নয। এখানে বড জমিদাবী ছিল না। অধিকাংশ জোতদারী ছোট, আব কুন্‌বি জাতেব পটিদাব কৃষকরা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিযেব চেয়ে বেশি শক্তিমান। ১৯১৭ সালে অতিবর্ষণের ফলে খবিফ শস্য নষ্ট হয়ে যায়। যুদ্ধজনিত মূল্যবৃদ্ধি চাষীদেব দুর্দশা বাড়ায়।[৩৩] তাব ওপর দেখা দেয প্লেগ বোগেব আতঙ্ক। খেডার চাষীরা খাজনা কমাতে চাইল। সবকাব বললেন এসব হোমরুলারদের কীর্তি। হার্ডিম্যানের মতে ছোট পটিদাবদের স্থানীয় কর্তৃত্ব ও পটিদাব সম্প্রদায়ে বিশিষ্ট স্থান হারানোব আশঙ্কা ইন্ধন যুগিয়েছিল।[৩৪] গুজরাট সভার সভাপতিরূপে গান্ধী বোম্বাই সবকাবেব হস্তক্ষেপ চাইলেন (যেমন চম্পারনে)। কমিশনার খাজনা মকুবেব আবেদন এবং বোম্বাই-এর লাট অনুসন্ধানেব অনুবোধ অগ্রাহ্য করলে[৩৫] সত্যাগ্রহ শুরু হল ১৯১৮ সালের ২২ মার্চ—চলল ৬ জুন পর্যন্ত। দু হাজারেব মত সদস্য শপথ নিল তাবা সে বছব খাজনা দেবে না—এমন কি জমি বাজেযাপ্ত করলেও নয়।[৩৬] স্থানীয় জেলাশাসক লিখছেন, গান্ধী ঘুরে ঘুবে উৎসাহ না দিলে অনেকেই খাজনা দিত। গান্ধীর ভূমিকা ছাড়াও পটিদার সম্প্রদায়ের আভ্যন্তবীণ সংহতি কাজ করছিল। যারা খাজনা দিত তাদেব সামাজিকভাবে বর্জন করা হত। অনেকক্ষেত্রে সবকাবী কর্মচাবীদেব জল পর্যন্ত বন্ধ করে দেওয়া হত। এই মিলিত প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে সরকাব অস্থাবব সম্পত্তি ক্রোক বন্ধ করলেন, গবীব চাষীদের ওপর চাপ দেওয়া বন্ধ হল, এমন কি বাকী খাজনা দিলে বাজেয়াপ্ত জমি ফেরত দেওয়াও হতে লাগল। কিন্তু বোম্বাই সরকার নিরপেক্ষ অনুসন্ধানের নির্দেশ তো দিলেনই না, কর নেওয়া সম্পূর্ণ স্থগিতও করলেন না। ভারত সরকার হস্তক্ষেপ করতে বাজি হলেন না। যা পেয়েছেন তাতেই সন্তুষ্ট না হয়েও ৬ জুন গান্ধী সত্যাগ্রহ তুলে নেন। এর অন্যতম কারণ বারাইয়া দল বানিয়া ও পটিদারদের সম্পত্তি লুঠ শুরু করেছিল। খেড়া আন্দোলনের অধিকাংশ খরচ যুগিয়েছিল বোম্বাই-এর মূলজী জেঠা বস্ত্র বিপণির ব্যবসায়ীরা। সাহায্য করেছিলেন মোহনলাল পাণ্ডের মত স্থানীয় ধনী চাষী আর আহমদাবাদের উকিল—বল্লভভাই প্যাটেল, উচ্চশ্রেণীর পটিদার হয়েও ছেলেব বিয়েতে যিনি পণ নেননি, সুরাটের মহাদেব দেশাই (পরে গান্ধীর পুত্রসম সচিব), সংবাদপত্রের মালিক ইন্দুলাল যাজ্ঞিক

ও ধনপতি শঙ্করলাল ব্যাঙ্কার। শহুরে উচ্চশিক্ষিত সমর্থক ও নিগৃহীত গ্রামবাসীব মধ্যে সেতু ছিলেন কবমসাদের পটিদার বল্লভভাই প্যাটেল, যেমন চম্পারনে রাজেন্দ্র প্রসাদ। এখন থেকে গান্ধীর চিবশত্রু হলেন বোম্বাই-এব ছোটলাট লর্ড উইলিংডন, যাঁর মতে গান্ধী ছিলেন "সৎ কিন্তু বলশেভিক"। আরুইনের পর বড়লাট হয়ে এসে নির্মম হস্তে তিনি আইন অমান্য আন্দোলন দমন কববেন। পুবো সফল না হলেও খেড়া আন্দোলন গুজরাটের স্তিমিত জনজীবনে যে জোয়াব আনল তা বারদোলি সত্যাগ্রহের ভূমিকা রচনা করে।

আর এক ধরনের আন্দোলন চলছিল গুজরাটেরই আহ্মদাবাদে। এবাব শ্রমিকদের। যুদ্ধকালীন চাহিদা ও মূল্যবৃদ্ধির ফলে মিলমালিকদেব প্রভূত মুনাফা জুটলেও[৩৭] শ্রমিকদের দুঃখ ঘোচেনি। শ্রমিকদের উৎসাহিত করতে ও পবে প্লেগের ভয়ে তাদের পলায়ন বন্ধ করতে কিছু বোনাস দেবার ব্যবস্থা হযেছিল। কিন্তু ১৯১৮-ব ফেব্রুয়াবি মাসেব মাঝামাঝি হঠাৎ বোনাস দেওয়া বন্ধ কবা হল। মালিকরা শ্রমিক ধর্মঘটেব ঝুঁকি নিয়েছিলেন, কারণ, ওয়াগনেব অভাবে কযলা আসছিল না, এমনি মিল বন্ধ করতে হত। গান্ধী পূর্ব পবিচিত মিলমালিক অম্বালাল সারাভাই-এর কাছে প্রতিকাব চাইলেন।[৩৮] শ্রমিকদের দাবি ছিল ৫০% মজুবি বৃদ্ধি। মালিকপক্ষ ২০%-এর বেশি বাড়াবেন না। সালিশিতে কাজ না হওযায় ধর্মঘট ও লক আউট ঘোষিত হল। অম্বালালেব অভিযোগের উত্তরে গান্ধী বললেন, তিনি কোন শ্রমিককে জোর করে আটকে রাখেননি, শুধু যারা সত্যাগ্রহের শপথ ভেঙে কাজ করতে চায় তাদের বুঝিয়ে সত্যরক্ষা কবাচ্ছেন। শেষে তিনি অনশন আরম্ভ কবলেন। পুলিশের মতে ধর্মঘট ভেঙে যাচ্ছে দেখে এই নাটকীয় ঘোষণা। বস্তুত শ্রমিকদের অবিশ্বস্ত ব্যবহারই তাঁকে অনশনে প্ররোচিত করে। যাই হোক, মিলমালিকরা সালিসিসাপেক্ষ মাইনে বাড়াতে বাজি হল। সালিসে ৩৫% মজুবি বৃদ্ধির সুপারিশ কবা হয় (কোথাও বা ৫০%)। মহাদেব দেশাই-এব A Righteous Struggle গ্রন্থে এই সত্যাগ্রহেব বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে।'মনে রাখতে হবে বাজনীতিব উদ্দেশ্যে শ্রমিকদেব ব্যবহার করেননি গান্ধী বা মালিকদেব ক্ষতি করে শ্রমিকদের অন্যায আবদারও সমর্থন কবেননি। বাজনৈতিক, এমন কি দায়িত্বহীন অর্থনৈতিক, ট্রেড ইউনিয়ানিজম্ তিনি সমর্থন করতেন না। মালিক ও শ্রমিক পরস্পর-নির্ভর, 'প্রেমের রেশমী সুতোয তাদের বেঁধে রাখতে হবে'। ধর্মঘটের বিবোধী তিনি ছিলেন না ; তবে আলাপ-আলোচনা সালিসি, সবকিছু শান্তিপূর্ণ ব্যবস্থা বিফল হলেই সেটা হবে অন্তিম পদক্ষেপ। মার্কসবাদীরা এটা বুর্জোয়া ভাঁওতা ছাড়া কিছু মনে কবতে পাবেননি। কিন্তু অম্বালালকে লেখা গান্ধীর ১ মার্চ ১৯১৮ চিঠি প্রণিধান যোগ্য। "If you succeed, the poor, already suppressed, will be suppressed still more,.....and the impression will have been confirmed that money can subdue every one....Do you not see that your success will have serious consequences for the whole society?"[৩৯]

চম্পারন, খেড়া ও আহ্মদাবাদ সত্যাগ্রহ তার পদ্ধতির আংশিক সাফল্য প্রমাণ কবল ; তার চেয়েও বেশি প্রচার করল তাঁর ব্যক্তিগত charisma-র কথা। গান্ধী চাইলেন সর্বভারতীয় কোন দাবিতে সত্যাগ্রহ নীতির প্রয়োগ। সে সুযোগ করে দিলেন সবকাব রাওলাট আইন পাস কবে। কিংস বেঞ্চের জজ স্যার সিডনি রাওলাটের সভাপতিত্বে যুদ্ধোত্তরকালে সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা করার জন্য যে কমিটি গঠিত হয়েছিল তাঁদের প্রতিবেদনে (১৯ জুলাই ১৯১৮) কিছু নতুন দমনমূলক আইনের প্রস্তাব ছিল। তাব অন্যতম হল জুরি-ব্যতিরেকে রুদ্ধদ্বার আদালতে বিচার, সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের কাছ থেকে

মোটা অঙ্কের জামানত আদায়, অন্তরীণ্ ব্যবস্থা, বিনা বিচারে আটক, ইত্যাদি। পঞ্জাবে এই প্রস্তাবের নাম দেওয়া হল—"না উকিল, না আপীল, না দলিল।" ভারতসচিব আপত্তি জানিয়ে বড়লাটকে লেখেন (১ অক্টোবর ১৯১৮), "পৃথিবীর পেন্টল্যাণ্ডদের (মাদ্রাজের ছোটলাট পেন্টল্যাণ্ড অ্যানি বেশান্তকে আটক করার নির্দেশ দেন) বা ও' ডায়ারদের (পঞ্জাবের কুখ্যাত ছোটলাট) কোন লোককে বিনাবিচারে বন্দী করার সুবিধা করে দিতে আমি ঘৃণা বোধ করি।" তবু সরকারী প্রতিনিধিদের ভোটে ক্রিমিন্যাল ল এমার্জেন্সি পাওয়ারস বিল পাস হল (২১ মার্চ ১৯১৯)। শঙ্করণ নায়ার ছাড়া কোন ভারতীয় প্রতিনিধি এতে সম্মতি দেননি। পরে নায়ারও বড়লাটের শাসন পরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন। ভি জে প্যাটেল, মালব্য, সাপ্রু প্রভৃতি নেতারা প্রতিবাদ জানালেনই, সদ্যোরোগমুক্ত গান্ধীও বিরাগ প্রকাশ না করে পারলেন না। মালব্যের কাছে লেখা (৮ ফেব্রুয়ারি ১৯১৯) ও শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর কাছে লেখা (৯ ফেব্রুয়ারি ১৯১৯) চিঠিতে তিনি গভীর মর্মবেদনা উদ্‌ঘাটিত করলেন। যে রাজকে যুদ্ধে জেতাতে এই সেদিন পর্যন্ত তিনি সৈন্য সংগ্রহ করেছেন, সেই রাজ যুদ্ধশেষে, এমন তাড়াহুড়ো করে, এতো ভয়াবহ দমনমূলক আইন পাস করল—এ লজ্জা ও ক্ষোভ তিনি রাখবেন কোথায়? "নিজের কথা বলতে পারি, আমি সে শক্তিব বিধান শান্তিপূর্ণ উপায়ে মেনে নিতে পারব না যে শক্তি এ দুটি বিলের মত 'শয়তানী' আইন প্রস্তাব করতে পারে এবং আমার মত যাঁরা ভাবেন তাঁদের সংগ্রামে যোগ দিতে বলতেও দ্বিধা করব না।"[৪০]

প্রতিবাদে সমগ্র ভারতব্যাপী সত্যাগ্রহ শুরু করা স্থির হল। সত্যাগ্রহ সভা স্থাপিত হল এবং সত্যাগ্রহ শপথবাক্যও নির্দিষ্ট হল। প্রথমে ৩০ মার্চ ও পরে তা বদলে ৬ই এপ্রিল হরতাল ডাকা হবে স্থির হল। তা হবে আইন অমান্য আন্দোলনের ভূমিকা। বেশান্ত, খাপার্ডে, ওয়াচা. শাস্ত্রী ও সুরেন্দ্রনাথ আপত্তি জানালেন।[৪১] ভুল বোঝাবুঝির জন্য দিল্লিতে নির্দিষ্ট দিনের আগেই আন্দোলন শুরু হয়ে গেল এবং পুলিশ গুলি চালাল। দিল্লী আসার পথে ৯ এপ্রিল গান্ধীকে ট্রেনে গ্রেফতার করা হল। পঞ্জাবে কিচলু ও সত্যপাল গ্রেফতার হওয়ায় তুমুল বিক্ষোভ আরম্ভ হল, যার পরিণতি ১৩ই এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড। ভাবতসচিব স্বীকার করেছিলেন এটা 'preventive murder', ফারনো (Furneaux) তাঁর Massacre at Amritsar গ্রন্থে দেখিয়েছেন অন্তত এক হাজার নিরীহ ও নিরস্ত্র লোক সেদিন নিহত হয়েছিলেন জেনাবেল ডায়ারের অমানবিক আদেশে।[৪২] পঞ্জাবে সামরিক আইন জারি হল এবং জনসাধারণকে নানা অপমানজনক শাস্তি দেওয়া চলল। অ্যালফ্রেড ড্রেপারের Amritsar: The Massacre that Ended the Raj বইতে তার বহু নিদর্শন উল্লিখিত হয়েছে।

পঞ্জাবে মার্শাল ল ঘোষিত হবাব দুদিন পর রবীন্দ্রনাথ গান্ধীকে লেখা এক খোলা চিঠিতে সত্যাগ্রহ নীতির তীব্র সমালোচনা করেছিলেন:

"I know your teaching is to fight against evil by the help of the good. But such a fight is for the heroes and not for men led by impulses of the moment." এক অশুভ থেকে আর এক অশুভের জন্ম হয়। অপমানের পরিণাম প্রতিশোধ স্পৃহা। যাঁরা আত্মিক শক্তিতে বিশ্বাস করেন তাঁরা জানেন অমিত পার্থিব শক্তির অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোও একরকমের জয়। কিন্তু 'ভানুসিংহের পত্রাবলী'তে পড়ি, "আকাশের এই প্রতাপ আমি একরকম করে সইতে পারি কিন্তু মর্ত্যের প্রতাপ আর সহ্য হয় না।.... পাঞ্জাবের....দুঃখের তাপ আমার বুকের পাঁজর পুড়িয়ে দিলে"

(২৯ মে ১৯১৯)। বুকের পাঁজর পোড়ানো সেই জ্বালা নাইট উপাধি ত্যাগ করে বড়লাটকে লেখা চিঠির ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত।[৪৩] গান্ধী বললেন, এতো সত্যাগ্রহ নয়—'দুরগ্রহ', এ তাঁর 'হিমালয়প্রমাণ ভুল'। ১৮ই এপ্রিল সত্যাগ্রহ প্রত্যাহার করে নিলেন তিনি। হয়তো এতে রবীন্দ্রনাথের বিরূপ মন্তব্যই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এর আর একটা দিক ছিল। পঞ্জাবের' ওপর অত্যাচারের, বিশেষ করে জালিয়ানওলাবাগের হত্যাকাণ্ডের, পর ইংরেজ ও ভারতবাসী যে সংঘর্ষের পথ নিল তা থেকে কোনদিন ফেরা সম্ভব হল না। অ্যানড্রুজ রবীন্দ্রনাথকে (১ অক্টোবর ১৯১৯) যে চিঠি লিখেছিলেন, তাতে ভারতের প্রতিক্রিয়া চমৎকার ফুটে উঠেছে : "সে সময় থেকে সন্ত্রাসের রাজত্ব ভেঙে গেল, গভীরচারী ভয় যা তাদের (ভারতীয়দের) উপর মহামারীর মত ঝুলেছিল তা উড়ে গেল।" ব্রিটিশ ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যবাদিতাব ওপর বিলীয়মান বিশ্বাস সম্পূর্ণ বিলীন হলে সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বড়ো ভিত ভেঙে গেল।

রবীন্দ্রকুমার সম্পাদিত Essays on Gandhian Politics: The Rowlatt Satyagraha of 1919 গ্রন্থে আন্দোলনের আঞ্চলিক দিক নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।[৪৪] গুজরাট, পঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের কতিপয় অঞ্চল ছাড়া আন্দোলনেব ব্যর্থতা অনস্বীকার্য। প্রথমত, গান্ধী একে সম্পূর্ণ অহিংস রাখতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, এর ফলে সরকার রাওলাট আইন প্রত্যাহারও করেননি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আন্দোলনের পিছনে অর্থনৈতিক কারণ কাজ করছিল, রাজনৈতিক চেতনা নয়। খাদ্য, বস্ত্র ও কেরোসিনের উচ্চমূল্য মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সকলকেই স্পর্শ কবেছিল। বোম্বাই-এব সুতাকল শ্রমিকদের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রকুমার জাতপাতের সংহতির ওপর জোর দিয়েছেন।[৪৫] উত্তর প্রদেশের মুসলমানরা খিলাফতের ভবিষ্যৎ নিয়ে বেশি উদ্বিগ্ন হয়েছিল। পঞ্জাবের আন্দোলনের পটভূমিকায় ছিল যুদ্ধকালীন কর ও ঋণের চাপ এবং ব্যাঙ্কসংকট। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি তো ছিলই। গদব আন্দোলনের প্রভাব ও কোমাগাতামারু জাহাজে প্রত্যাগত শিখদের ওপর সৈন্য ও পুলিশের গুলি চালানোর কথা আগেই বলা হয়েছে। লাহোবের সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে রবীন্দ্রকুমাব দেখাচ্ছেন ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা দুর্দশা চরমে পৌঁছেছিল এবং মুসলমান কাবিগররা উর্ধ্বমূল্যের চাপে পিষ্ট হচ্ছিল। ১৮৯৭/৯৮ সালে বোম্বাই ও পুণায় প্লেগের আতঙ্ক যেমন চবমপন্থাকে সাহায্য করে, তেমনি ১৯১৮ সালের ব্যাপক ইনফ্লুয়েঞ্জা ভয়াবহ মৃত্যু ঘটিয়ে সত্যাগ্রহে ইন্ধন যোগায়। গোপালচাঁদ নারাঙ্গ, রামভুজ দত্তচৌধুবী প্রভৃতির নেতৃত্ব তার সুযোগ নেয়। আহ্মদাবাদে বণিক, বৃত্তিজীবী, শ্রমিকশ্রেণী ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সত্যাগ্রহে যোগ দেয়।

আবার বাংলা, মাদ্রাজ ও সি.পি-তে আন্দোলন দানা বাঁধেনি। বাংলার ছোটলাট রোনাল্ডসে'র My Bengal Diary-তে পড়ি চিত্তরঞ্জন দাশ রাওলাট সত্যাগ্রহ নিয়ে আদৌ মাথা ঘামাচ্ছেন না।[৪৬] মাদ্রাজে বেশান্তের (বা মাইলাপুর দলের) প্রতিক্রিয়া অনুরূপ। এঁরা ভেবেছিলেন হিংসা ও দমন একবার ছড়িয়ে পড়লে আসন্ন নির্বাচনে অসুবিধা হবে। তখনও এঁরা নির্বাচন বর্জনের সম্ভাবনা কল্পনাতেও আনতে পারেননি।

১৯১৯-এর মাঝামাঝি গান্ধী বুঝতে পারলেন, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সত্যাগ্রহ সফল করতে গেলে কংগ্রেসের বর্তমান নেতাদেব রাজি কবাতে হবে। সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা অসম্ভব বলে কংগ্রেস নেতৃত্বকে তিনি পার্শ্বদেশ থেকে আক্রমণ করার কৌশল নিলেন। তাঁর অস্ত্র হল খিলাফত আন্দোলন, আর সৈনাবাহিনী—ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম সম্প্রদায়, অর্থাৎ মুসলিম জনগণ।

ইতিমধ্যে অমৃতসর কংগ্রেস (১৯১৯)-এর সভাপতি মতিলাল নেহরু রাওলাট আইন, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ও সামরিক আইনজারির তীব্র প্রতিবাদ করলেন। পরের বছর কংগ্রেস সাব কমিটি (গান্ধী যার অন্যতম সভ্য ছিলেন)-এর রিপোর্ট প্রকাশিত হল ১৯২০ সালের ২৫ মার্চ।[৪৭] পঞ্জাবের অত্যাচারের নানা নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেও গান্ধী অমৃতসর কংগ্রেসে মন্টেগু সংস্কার গ্রহণের পক্ষে রায় দিলেন। তিলক ও চিত্তরঞ্জন কাউন্সিলে ঢুকে আইরিশ পদ্ধতিতে বাধা সৃষ্টি করতে চান। উক্ত কৌশলের বিরোধিতা করে গান্ধী বলেন, "আমি এর প্রতিবাদ করব এবং ভারতের প্রান্ত থেকে প্রান্ত ঘুরে বলব আমরা আপন সংস্কৃতির ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত হব, মর্যাদার আসন হারাব, যদি ব্রিটিশদের বাড়ানো হাত না গ্রহণ করি।"[৪৮] অদৃষ্টের পরিহাসে কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি কাউন্সিল বর্জনের সবচেয়ে বড়ো প্রবক্তা হয়ে দাঁড়ালেন।

॥ ৪ ॥

রাওলাট সত্যাগ্রহের ব্যর্থতা গান্ধীকে খিলাফৎ আন্দোলনের দিকে আকৃষ্ট করল। কি ছিল এই আন্দোলনের চরিত্র? কেনেথ ম্যাকফারসন্ একে উর্দুভাষী মুসলমানদের সত্তাসংকটপ্রসূত বলে ব্যাখ্যা করেছেন।[৪৯] গেইল মিনোল্টের মতে, বিভিন্ন মুসলিম নেতার ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য বিভিন্ন হলেও এর একটা সুস্পষ্ট জাতীয়তাবাদী দিক ছিল।[৫০] এ সি নিমিজার এর নিখিল ঐস্লামিক (Pan-Islamic) দিকটার ওপর জোর দিয়েছেন।[৫১] ঐস্লামিক প্রতীকের বহুল ব্যবহার চরমপন্থী পর্বের সাহিত্য ও কর্মে হিন্দু প্রতীকের ব্যবহারের সঙ্গে তুলনীয়। মিনোল্ট তা সত্ত্বেও এই আন্দোলনকে "a quest for Pan-Indian Islam" বলতে চান। ভারতীয় মুসলিমদেব ঐক্যসাধনই ছিল তার মূল লক্ষ্য। আঞ্চলিক, শ্রেণীগত, ভাষাগত নানা পার্থক্যের জন্য সে ঐক্য ব্যাহত হচ্ছিল। কিন্তু মুসলমান নির্বিশেষে কিছু ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী—যেমন কোরান, শরিয়া, উম্মা, মক্কা-মদিনার পবিত্র তীর্থ, মসজিদ, হজ ও খলিফা—যাদের কেন্দ্র করে মুসলিম সংহতি গড়ে তোলা যেতে পারে। স্থানীয় স্তরে কসবা ও মসজিদের মঞ্চ, উর্দু পত্রপত্রিকা, কবিতা, গান, মিছিল এতে সাহায্য করবে। মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা প্রভাবিত হয়েছিলেন হালির 'মুসাদ্দাস', শিবলি নোমানির Trouble in the Balkans, ইকবালের আরব অধিকৃত সিসিলির রোমান্টিক গৌরবগাথা ও বাল্কান যুদ্ধের সময় লেখা "সামা আওর সেয়ার" পড়ে। যে ইকবাল কয়েক বছর আগে 'তরানা-ই-হিন্দ'[৫২] ও 'নয়া শিবালা'[৫৩] লেখেন, তিনিই লিখলেন 'তবানা-ই-মিল্লি'। জাতীয়তাবাদ মানবতাবাদের পথে সবচেয়ে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা আর একমাত্র ইসলামই পারে তাকে অতিক্রম করতে। তিনি এমনও বললেন, "modern western thought is a direct descendant of the glorious medieval intellectual culture of Islam, disseminated through Spain and Sicily."[৫৪] ১৯১৮ সালে প্রকাশিত 'রসুজ-ই-বেখুদি' (The Mysteries of Selflessness) কবিতায় আওরঙ্গজেবকে প্রশংসা করে লিখলেন,'The last arrow in our quiver left/In the affray of faith with unbelief.../An Abraham in India's idol house'.[৫৫] বিনা কারণে একদা সুফী ইকবাল বেদান্ত ও সুফী অদ্বৈতবাদকে আক্রমণ করেননি। ফজলুব রহমান ইকবালকে "আধুনিক যুগের গভীরতম দার্শনিক চিন্তাবীর" বলে স্বীকার করেও

লিখেছেন, তাঁর চিন্তাধারা "*threw its overwhelming weight on the* revivalist side."[৫৬] ইংরেজ ঔপন্যাসিক ই এম ফরস্টার তাঁর রচনার ওপর নীটসে্র 'সুপারম্যান' ধারণার প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। তাঁর 'খুদি' মতবাদের সঙ্গে দয়ানন্দর তুলনা করলে অন্যায় হবে না। আর আমীর আলি Islam in Spain গ্রন্থে উম্মাইয়াদ স্বর্ণযুগের যে উদ্দীপক চিত্র এঁকেছেন তা চরমপন্থী পর্বে রচিত আর্যগরিমা ও রাজপুত-মারাঠা-শিখ শৌর্যভিত্তিক সাহিত্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

নিকি কেডি[৫৭] ও এলি কেদুবি[৫৮] দেখিয়েছেন জামাল-আল-দিন আফগানির প্রচার ইসলাম ও খলিফা সম্পর্কে বিপুল উৎসাহ সঞ্চার করেছিল। বাংলা বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে প্রথম দিকে জড়িত হলেও মৌলানা আজাদ ইরাক, মিশর, সিরিয়া ও তুরস্ক ভ্রমণকালে (১৯০৮) এই প্রভাবে পড়েছিলেন। আফগানি যেমন মহম্মদ ও ইহুদীদের মৈত্রীর ওপর জোর দিয়েছিলেন, তেমনি জোর দিলেন আজাদ হিন্দু-মুসলিম মৈত্রীর ওপর। এ পথে তাঁকে অনুসরণ করেন আনসাবি 'আল-আহ্‌কমল কুরানিয়ামবলৎ- অল কুরতানিয়া' গ্রন্থে। আফগানির চোখে বড হয়ে উঠেছিল খলিফার সমস্যা, খিলাফতীদের চোখে ভারতীয়দের—এবং উভয়ের সমাধান হতে পারে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পরাজয়ে। মহম্মদ আলি মনে করতেন ভারত স্বাধীন হলে সে তুরস্কের স্বাধীনতা আনতে সাহায্য করবে। ইসলামের প্রতি ও ভারতের প্রতি ভালবাসার মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব তিনি দেখেননি, মন্দ দেখেছিলেন "selflove and petty personal ambition"-এব মধ্যে।[৫৯] ভারতবর্ষের ইতিহাসের উদ্দেশ্য হল "solving a unique problem and working out a new synthesis, a Federation of Faiths."[৬০] ১৯১১ সালে যখন (সাপ্তাহিক) দ্য কমরেড্ কলকাতায় প্রকাশিত হল তার প্রথম সংখ্যায় মহম্মদ আলি লিখলেন .. "if the Muslims or the Hindus attempt to achieve success in opposition to or even without the co-operation of one another, they will not only fail but fail ignominiously." তাঁর ধারণা ছিল সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের উন্নতি হলে পৃথক নির্বাচনী প্রথার প্রয়োজন থাকবে না। ১৯১২ পর্যন্ত খিলাফতের প্রতি আনুগত্য ও ভারতের সংহতির প্রতি আনুগত্যের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব দেখা দেয়নি।

মুশিরুল হাসান দেওবন্দী শিক্ষা পদ্ধতিতে মুসলিম ধর্মীয় সত্তাব ওপর এই ক্রমবর্ধমান জোরের কথা উল্লেখ করেছেন।[৬১] দেওবন্দ প্রথমাবধি আলিগড়ী ব্রিটিশানুগত্যের বিরোধী ছিল এবং সা ওয়ালিউল্লার অনুসরণে ভারতকে দার-উল-হারব ভাবত।[৬২] যুদ্ধের সময় মৌলভী ওবেদুল্লা দেওবন্দী মৌলভীদের মারফত ব্রিটিশবিরোধী প্রচার চালান। এই ষড়যন্ত্রের নাম দেওয়া হয় 'রেশমী ষড়যন্ত্র'।[৬৩] ব্রিটিশ অধিকারের ফলে অর্থনৈতিক সমস্যা-প্রসূত ওয়াহাবি ও ফেরাজি আন্দোলন যেমন একদিন প্রথমে সাম্রাজ্যবিরোধী ও পরে সাম্প্রদায়িক রূপ নেয়, তেমনি খিলাফৎ সমস্যাপ্রসূত আন্দোলনও নিয়েছিল।[৬৪] বিদেশী খলিফার রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্যের সঙ্গে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রতি আনুগত্য খাপ খায়নি।

অনিবার্য কারণে বিপন্ন ইসলামের প্রতীক হয়ে দাঁড়ান খলিফা। এর সুযোগ নেয় পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বৃত্তির অগ্রগতির মুখে পিছু হটে যাওয়া উলেমার দল। তাদের নেতা ছিলেন লখনউ-এর ফিরিঙ্গিমহলের আবদুল বারি। বারির শিষ্য ছিলেন মহম্মদ আলিরা এবং প্রধানত এঁদেরই চেষ্টায় উত্তব প্রদেশের পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত নবীন মুসলমান ও উলেমাদলেব

যোগ স্থাপিত হয়। এই প্রসঙ্গে মহম্মদ আলির My Life A Fragment দ্রষ্টব্য। আঞ্জুমান-ই-খুদ্দম-ই-কাবা প্রতিষ্ঠা (১৯১২)-র সঙ্গে সঙ্গে আমরা তুর্কীমুখী মুসলিম সংগঠনের প্রমাণ পাই।

প্রথম মহাযুদ্ধ বাধার আগে মহম্মদ আলি ও আনসারি তুরস্কের মন্ত্রীর কাছে ও বারি সুলতানের কাছে আবেদন পাঠান জার্মেনীর পক্ষে যোগ না দিতে। কিন্তু তা না হওয়ায় ভারতীয় মুসলমানের ব্রিটিশ আনুগত্যে চিড় ধরল। এই প্রসঙ্গে আলিগড়ের তরুণ ছাত্র খলিকুজ্জমানের প্রতিক্রিয়া মুসলিম মানসের দ্বন্দ্ব ও বেদনা ফুটিয়ে তুলেছে।[৬৫] যদিও প্রধানমন্ত্রী অ্যাসকুইথ বলেন যে তিনি মুসলিমদের বিরুদ্ধে কোন ধর্মযুদ্ধে নামবেন না, তবু বড়লাট হার্ডিঞ্জ মুসলিমদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে শঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন।[৬৬] এ শঙ্কা নেহাত অমূলক ছিল না। আলি ভ্রাতৃদ্বয় তাঁদের কাগজ 'The Comrade' ও 'হামদরদ্' মারফত তুরস্কের প্রতি সহানুভূতি জানাতে থাকেন বলে ১৯১৫-র মে মাসে তাঁদের অন্তরীণ করা হয়। পরে একই অপরাধে হজরৎ মোহনি ও আবুল কালাম আজাদকে। ১৯১৭ ও ১৯১৮-র মুসলিম লীগ সম্মেলনের সুর নিশ্চিতভাবে সাম্রাজ্যবিরোধী হয়েছিল।[৬৭]

১৯১৬-তে চম্পারন সত্যাগ্রহের সময় সহকর্মী মজহরুল হকের অনুরোধে গান্ধী আলিভাইদের মুক্তির ব্যাপারে সচেষ্ট হন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক মঞ্চে (যথা ১৯১৭-র লীগ সভায়) তাঁদের হয়ে সওয়াল করেন। ১৯১৮-র শেষে মহম্মদ আলিকে তিনি লেখেন, "আপনার মুক্তিতে আমার আগ্রহ স্বার্থঘটিত। আমাদের উদ্দেশ্য এক এবং তা অর্জন করতে আপনার সাহায্য পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করতে চাই। মুসলিম প্রশ্নের যথাযথ সমাধানেই স্বরাজলাভ সম্ভব।"[৬৮] উদীয়মান রাজনৈতিক নেতারূপে অবশ্যই গান্ধীর স্বার্থ ছিল। তিনি দেখেছিলেন লখনউ চুক্তির মত সম্ভ্রান্ত,উচ্চশিক্ষিত,হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে ক্ষমতার ভাগ বাঁটোয়ারা ব্রিটিশ শক্তিকে নড়াতে পারবে না। সাধারণ মুসলিমদের সাহায্য ছাড়া মনোমত সংস্কার পাওয়াও সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, তাঁরই ভাষায়, খিলাফৎ আন্দোলনের মত "(হিন্দু মুসলিম ঐক্যের) এমন সুযোগ শত বৎসরের মধ্যেও মিলবে না।" বৃহত্তর মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছতে হলে বা তাদের কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে জমায়েত করতে গেলে চাই উলেমাদের সমর্থন। খিলাফত দাবি না মেনে নিলে তা পাওয়া যাবে না। নিজে ধার্মিক বলে গান্ধী অন্য সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি সদা সজাগ ছিলেন। তাই বিবেকের বাধাও ছিল না। "I feel that this question is greatest of all...for it affects the religious susceptibilities of millions of Mahommedans..."[৬৯]

কিন্তু তুরস্ক সাম্রাজ্য বা খলিফার শাসন সম্পর্কে তাঁর বিন্দুমাত্র জ্ঞান ছিল না। তিনি জানতেনও না এই খলিফার বিরুদ্ধে তরুণ তুর্কীরা ও আববরা বিদ্রোহ করেছিল, যদিও অ্যান্ড্রুজ তাঁকে সতর্ক করেছিলেন।[৬৯ক] অবশ্য টি ই লরেন্সের Seven Pillars of Wisdom যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন এই বিদ্রোহের অনেকখানি ব্রিটিশদের কীর্তি। তবু তার একটা স্বৈরতন্ত্রবিরোধী প্রগতিশীল দিকও ছিল। তা ছাড়া খিলাফতীরা প্রথমে হিন্দু-বিরোধী ছিলেন না বলেছি। গান্ধী ভাবতেও পারেননি যে এ ধরনের মৈত্রী তাৎক্ষণিক সাফল্য অর্জন করলেও উলেমাদের প্রাধান্য ভবিষ্যতে ধর্ম নিরপেক্ষতা বা সেক্যুলারিজমকে ঘা দেবে।

১৯১৮ সালের শেষে খলিফা তাঁর মধ্যপ্রাচ্যের বিস্তৃত সাম্রাজ্য হারিয়েছিলেন, এমন কি

ইস্তাম্বুলের ওপর তাঁর কর্তৃত্ব যেতে বসেছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে দলে দলে উলেমা লীগের দিল্লি অধিবেশনে (১৯১৮) যোগ দেয় এবং মুখ্যত তাদের চাপে বড়লাটের কাছে নিম্নলিখিত দাবি পেশ করা হয় : (১) খলিফার পার্থিব সাম্রাজ্য অটুট রাখতে হবে ; (২) আরব, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ও মেসোপটেমিয়া ('জজিরাৎ-উল-আরব')-র ওপর তাঁর আধিপত্য ক্ষুণ্ণ করা চলবে না ; এবং (৩) মক্কা, মদিনা প্রভৃতি তীর্থস্থানে বিধর্মীদের হস্তক্ষেপ চলবে না। একটি নিষিদ্ধ কবিতার দু'পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করলে তখনকার মুসলিম মনোভাব স্পষ্ট হবে—

ইসলাম আজ কুফরকে
নখে মেঁ আগয়া
বাদল সিয়া রংকা
কাবা পে ছা গয়া।

(ইসলামকে আজ আচ্ছন্ন করেছে বিধর্ম, কাবা ঢেকেছে অন্ধকার।)

খিলাফৎ কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি ও যৌথ সভাসমিতি সরকারকে বিব্রত করছিল। আবদুল বারির সঙ্গে গান্ধীর যোগাযোগ মার্চ মাসে স্থাপিত হয়। কিন্তু রাওলাট সত্যাগ্রহ প্রত্যাহার করার জন্য গান্ধীর মতিগতি নিয়ে বারিব মনে সন্দেহ জাগে। যাই হোক ১৯১৯-এর ২১ সেপ্টেম্বর সর্বভারতীয় খিলাফৎ সম্মেলন বসে। ১৭ অক্টোবর খিলাফৎ দিবস সফলভাবে পালিত হওয়ায়[৭০] তার পরবর্তী সম্মেলন বসল নভেম্বর মাসে— দিল্লীতে। এখানে দেখা গেল খিলাফতীরা নরম ও চরম দলে বিভক্ত। বোম্বাই-এর মিয়াঁ মহম্মদ ছোটানি ছিলেন প্রথম দলের নেতা, হজরত মোহনি দ্বিতীয় দলের। মোহনির পক্ষে ছিল উত্তর প্রদেশ, বাংলা ও দিল্লির প্রতিনিধিবৃন্দ। গান্ধী মোহনির বিলাতী বস্ত্র বর্জনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কবলেন। তা ছাড়া খিলাফৎ 'অন্যায়'-এর সঙ্গে পঞ্জাব 'অন্যায়'কে যুক্ত করতেও রাজি হলেন না। শেষে শুধু শান্তি উৎসব বর্জন করার সিদ্ধান্ত হল। গান্ধী বোম্বাই-এর নরমপন্থী বণিক গোষ্ঠীর পক্ষ নিয়ে বুঝিয়ে দিলেন কোনও চরমপন্থা নেবার বাসনা তাঁর নেই। তাঁর ভয় ছিল বাওলাট সত্যাগ্রহেব মত তা হিংসার প্রশ্রয় দেবে। গোয়েন্দা দফতরের মতে, শান্তি উৎসব বর্জন সফল হয়েছিল।[৭১]

১৯১৯-এর শেষে আলি ভাইরা ও আজাদকে মুক্তি দেওয়া হল এবং খিলাফৎ আন্দোলন চলে গেল চরমপন্থীদের হাতে। এর জন্য ব্রিটিশ সরকারের অনমনীয় মনোভাব দায়ী। বড়লাট চেমস্‌ফোর্ডের নির্বন্ধাতিশয্য সত্ত্বেও ব্রিটিশ বিদেশমন্ত্রী ব্যালফুর ও প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ ভারতীয় মুসলমানদের দাবি মানতে রাজি হলেন না। মহম্মদ আলি খিলাফতের পক্ষে প্রচারেব জন্য ইওবোপ গেলেন। কিন্তু লয়েড জর্জ স্পষ্টই বলে দিলেন, "খলিফার আরব প্রজাদের স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার রয়েছে।" গান্ধী ৭ই মার্চ ঘোষণা করলেন ১৯শে মার্চ (১৯২০) খিলাফৎ দিবস রূপে পালিত হবে, হরতাল দিয়ে শুরু এবং দাবি গৃহীত না হলে সত্যাগ্রহ। সত্যাগ্রহের কয়েকটি পর্ব নির্দিষ্ট করলেন তিনি— (১) ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত সম্মান ও উপাধি প্রত্যাহার ; (২) কাউন্সিল থেকে পদত্যাগ ; (৩) আসন্ন নির্বাচন বর্জন ; (৪) সৈন্যবাহিনী ও অন্যান্য সরকাবী চাকরি থেকে পদত্যাগ এবং (৫) সর্বশেষ খাজনা ও করদান বন্ধ।[৭২]

হিন্দু ও মুসলমান নেতাদের যুক্ত সভায় (২২ মার্চ ১৯২০) মালব্য বললেন, মুসলিমরা বিলাতী বস্ত্র বর্জন করবে না, অসহযোগের নীতিও মানবে না। খাপার্ডে ও তিলক বিরক্ত হয়ে সভা ত্যাগ করলেন। গান্ধীর নিজেরও ভয় ছিল মুসলমানরা অহিংসাব পথ অনুসরণ

করবে কিনা।[৭৩] অন্যদিকে মুসলিমদের মনে সংশয় ছিল হিন্দুরা যোগ না দিলে তারাই পদত্যাগ করে বোকা বনবে। সুবিধা নেবে হিন্দুরা।[৭৪] ১ থেকে ৩ জুন আবার এক যুক্ত সভা বসল এলাহাবাদে। মালব্য, মতিলাল, সপ্রু, বিপিন পাল ও লাজপৎ রায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু হজরত মোহনি বলে বসলেন, আফগান বাহিনী ভারত আক্রমণ করলে মুসলিমরা তাদের দলে যোগ দেবে। পঞ্জাবের ভৌগোলিক অবস্থান ও হিন্দুদের ভবিষ্যৎ ভেবে লাজপৎ তীব্র আপত্তি জানালেন। জিন্না স্পষ্টই বলছিলেন প্যান-ইসলামিক মনোভাব হিন্দু-মুসলিম সমঝোতা বিপন্ন করবে।[৭৫] বোঝা গেল কংগ্রেসের অধিকাংশ সভ্য তখনও অসহযোগকে আবশ্যিক বা কার্যকর মনে করেননি আর হিন্দু-মুসলিমদের পারস্পরিক সন্দেহ আবহাওয়াকে ঘুলিয়ে তুলছিল। এর ফলে স্থির হল সমস্ত কার্যসূচি খুঁটিয়ে দেখার জন্য কলকাতায় এক বিশেষ কংগ্রেস অধিবেশন ডাকা হবে। কিন্তু খিলাফতীরা ধৈর্য ধরতে পারছিল না। ১৯২০-এর ১৫ মে তুরস্কের সঙ্গে মিত্রপক্ষের সন্ধির খসড়া প্রকাশিত হবার পর তাদের শেষ আশা বিলীন হয়েছিল। 'ইয়ং ইন্ডিয়া'য় গান্ধী লিখলেন, "...if I were not interested in the Indian Mohammedans I would not interest myself in the welfare of the Turks any more than I am in that of Austrians or the Poles. But I am bound as an Indian to share the sufferings and trials of fellow Indians. If I deem the Mohammedan to be my brother it is my duty to help him in his hour of peril......if his cause commends itself to be just."[৭৬] কেন্দ্রীয় খিলাফৎ কমিটির অধিবেশনে স্থির হল ১ আগস্ট থেকে খিলাফৎ দাবিতে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হবে। শহুরে মুসলমানদের মধ্যে নানা কারণে দ্বিধা দেখা গেলেও গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র মুসলমানদের মধ্যে সাড়া জাগল। জুডিথ ব্রাউন স্বীকার করেছেন, গান্ধীর নেতৃত্বে প্যান ইসলামিস্টরা "reduced political issues to the level of tea-shop, the market-place and the mosque."[৭৭]

কলকাতা কংগ্রেসের অনুমোদন পাওযার জন্য গান্ধী খিলাফতী চাপ ব্যবহার করা ছাড়াও অন্য কৌশল নিলেন। পঞ্জাবের ব্যাপারে বেসরকারী অনুসন্ধান কমিটিব সভ্যরূপে তিনি বহু অত্যাচারের তথ্য পেয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি এতদিন 'পঞ্জাব অন্যায়'-এর প্রসঙ্গ তোলেননি। মে মাসের শেষে সরকারী হান্টার কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পর পার্লামেন্টে যে বিতর্ক হল তাতে তাঁর সব সংযম ভাঙল। লর্ডস সভা জেনারেল ডায়ারকে জালিয়ানওয়ালা হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ থেকে শুধু অব্যাহতি দিল না, বরং তাঁকে অভিনন্দন জানাল। 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকায় গান্ধীর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হল :

"বিস্ময় ও হতাশার সঙ্গে দেখছি সাম্রাজ্যের বর্তমান প্রতিনিধিগণ মিথ্যাচারী ও বিবেকহীন হয়ে গেছেন। ভারতবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে তাঁদের সত্যকার কোন চিন্তা নেই, ভারতীয়দের সম্মানকে তাঁরা তুচ্ছ মনে করেন।...যে সরকার এত মন্দ লোক নিয়ে গঠিত তার সম্বন্ধে আমি কোন মোহ পোষণ করতে পারি না।"[৭৮] ব্রিটিশরাজ এতদিনে 'শয়তানের সরকার' বলে তাঁর চোখে প্রতীয়মান হল। তিনি বিশেষ জোর দিয়ে বসলেন কাউন্সিল বর্জনের ওপর। বলা বাহুল্য, কলকাতা অধিবেশনে সমাগত অনেক প্রবীণ নেতার কানে এই সব আসন্ন নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে ভাল লাগল না। কলকাতা কংগ্রেসের এক মাস আগে মতিলাল নেহরু জওহরলালকে লিখছেন, তিনি কাউন্সিল বর্জনের ব্যাপারে গান্ধীর সঙ্গে একমত নন। "I am inclined to think that it

(Council) will give the cause immense strength, without sacrificing the principles of non-cooperation to get our people to return us and then to refuse to sit in the Councilor to obstruct its business."[৭৯]

॥ ৫ ॥

উনিশ শো কুড়ি সালের সেপ্টেম্বরের গোড়ায় কলকাতায় যে বিশেষ কংগ্রেস অধিবেশন বসল সে সম্পর্কে কংগ্রেসের নথিপত্র ছাড়াও জয়াকরের ব্যক্তিগত কাগজপত্র, খাপার্ডের রোজনামচা, দ্বারকা দাসের Gandhiji Through My Diary Leaves প্রাথমিক উপাদান বলে ধরা যেতে পারে। তা ছাড়া গোয়েন্দা দফতরের রিপোর্ট ও গভর্নরের মন্তব্য মূল্যবান। রিচার্ড গর্ডনের 'Non Cooperation and Council Entry 1919 to 1920' প্রবন্ধ[৮০] ও অধ্যাপক মঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত পি. এইচ. ডি. গবেষণা-নিবন্ধ অনেক আলোকপাত করেছে।

প্রাদেশিক প্রতিনিধিরা বিভিন্ন মত পোষণ করতেন বলে গান্ধীর সুবিধাই হয়েছিল। জিন্না ও বেশান্ত অবশ্যই ছিলেন তাঁর নীতির বিরোধী। কিন্তু তিলকের আকস্মিক মৃত্যুর ফলে মহারাষ্ট্রের নেতারা দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিলেন। খাপার্ডে ছিলেন সত্যাগ্রহের ঘোর বিরোধী এবং কেলকার কাউন্সিলে যোগ দিতে প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু তাই বলে তাঁরা বেশান্তের সঙ্গে হাত মেলাতে রাজি ছিলেন না। মাদ্রাজের সত্যমূর্তি কাউন্সিল বর্জন চাননি, কিন্তু তিনি বা রাজাগোপালচারি বা কস্তুরী রঙ্গ আয়েঙ্গার বেশান্তকে সমর্থন করবেন না। চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপিন পাল, মতিলাল ঘোষ সত্যাগ্রহ চাননি তা নয়, তবে তাঁরা চেয়েছিলেন কর্মসূচি তৈরি করার স্বাধীনতা প্রাদেশিক কংগ্রেসকে দেওয়া হোক। অন্যদিকে জিতেন্দ্রলাল ব্যানার্জি ও শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী কট্টর গান্ধীপন্থী ছিলেন। উত্তর প্রদেশে কেবল মতিলাল নন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী মালব্যও কাউন্সিলে যোগ দিতে চেয়েছিলেন। পঞ্জাবের লাজপৎ রায় অসহযোগ চাননি কিন্তু 'ট্রিবিউন' পত্রিকাগোষ্ঠী তার পক্ষে। ১৯২০-র ১৫ আগস্ট বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি "কাউন্সিলে ঢুকে অসহযোগ"-এর প্রস্তাব নেন। দাশ আরও মনে করতেন কেবল ব্যবসায়ীদের সুবিধার্থে বিলাতি দ্রব্য বর্জন নীতি বাদ দেওয়া ঠিক হবে না। স্বাধীনতার জন্য কি ক্রেতা কি বিক্রেতা প্রত্যেককেই ত্যাগ স্বীকার করতে হবে।

জয়াকরের ৩ সেপ্টেম্বর (১৯২০)-এর দিনলিপিতে দেখি অধিকাংশ প্রতিনিধি অসহযোগ সমর্থন করলেও গান্ধীর কার্যসূচি সমর্থন করছেন না। আবার ৫ সেপ্টেম্বর দেখি বিষয়-নির্বাচনী কমিটিতে প্রত্যেক দল থেকে গান্ধীর অনুগামীরাই নির্বাচিত হয়েছেন। কেন এমন হল ? এর একটাই উত্তর। গান্ধী তাঁর সঙ্গে প্রায় তিনশত মুসলিম খিলাফৎপন্থী প্রতিনিধি এনেছিলেন, এবং তাঁদের সাহায্যে বিষয়-নির্বাচনী কমিটি কুক্ষিগত করেন। ১৯২০-র ৫ আগস্টের গোয়েন্দা রিপোর্টও এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করে। ৫ সেপ্টেম্বর গান্ধী যে প্রস্তাব আনেন তার মধ্যে স্বরাজের দাবি গৌণ। কার্যক্রমের মধ্যে ছিল— (১) উপাধি বর্জন ; (২) সামরিক বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হলেও যুদ্ধব্যপদেশে বিদেশ গমন বর্জন, (৩) সরকারী সভা ও উৎসবে যোগদান বর্জন ; (৪) স্কুল, কলেজ ও আদালত বর্জন ; এবং (৫) কাউন্সিল নির্বাচন বর্জন।

কি কি বাদ পড়ল দেখা যাক। প্রথমত, স্বরাজ যে কংগ্রেসের লক্ষ্য একথার উল্লেখ কোথাও ছিল না। দ্বিতীয়ত, বিদেশী দ্রব্য বর্জনের কথা ছিল না। তৃতীয়ত, কর বা/ও

খাজনা বন্ধ করার নির্দেশও ছিল না। দাশের নির্বন্ধাতিশয্যে গান্ধী স্বরাজের দাবি যোগ করলেন। দাশ আরও চাইলেন কাউন্সিলে ঢুকে, আইরিশ ধাঁচে অসহযোগিতা চালিয়ে, ইংরেজদের ব্যাপকতর শাসনতন্ত্র সংস্কারে বাধ্য করতে। তা ছাড়া স্কুল কলেজ আদালত বয়কট তাঁর পছন্দ ছিল না। তাঁর অনুরোধে গান্ধী এ-সব প্রতিষ্ঠান বর্জনের প্রস্তাবে **'gradual'** বিশেষণ যুক্ত করতে রাজি হলেন। চরমপন্থীদের তুষ্ট করতে বিদেশী দ্রব্য বর্জনের প্রস্তাবও তাঁকে মানতে হল। তাঁর পক্ষে দাশ ও নেহরুর সম্মতি ছিল অত্যাবশ্যক—জিন্না, বেশান্ত ও দ্বারকা দাস প্রভৃতিকে তা ছাড়া ঠেকান যেত না। তবু কাউন্সিল বর্জনের ব্যাপারে তিনি অটল রইলেন।

৭ সেপ্টেম্বর বিপিনচন্দ্র এক সংশোধনী প্রস্তাব তুললেন। অসহযোগকে নীতিগতভাবে মেনে নিয়ে কার্যক্রম নির্ধারণের জন্য এক কমিটি গঠিতহোকএবং ইতিমধ্যে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা চালাবার জন্য এক প্রতিনিধি দল বিলেত পাঠানোহোক। গান্ধী সংশোধনী মানতে রাজি না হওয়ায় ভোট হল এবং মাত্র চার ভোটের ব্যবধানে তিনি জয়ী হলেন। তাও সম্ভব হল—হঠাৎ মতিলাল নেহরুর সমর্থন পেয়ে (খাপার্ডের দিনলিপি—৭ সেপ্টেম্বর, ১৯২০)। উত্তর প্রদেশের অনুচরদের পক্ষে রাখতে, কিছুটা-বা পুত্রের উপরোধে, মতিলাল গান্ধীর দিকে ঝুঁকলেন এরকম ইঙ্গিত এ. আই. সি. সি-র ১৯২২ সালের ৮ নং ফাইলে পাওয়া যায়। ফজলুল হক কিছুটা সৌকত আলির ভয়ে, কিছুটা আপন দল রাখতে, সম্মতি দেন। আসলে উত্তর ভারতের হিন্দীভাষী প্রতিনিধি, খিলাফতী ও কলকাতার মারোয়াড়ীদের ভোটে গান্ধী জেতেন।

প্রকাশ্য অধিবেশনে কিন্তু গান্ধীর প্রস্তাব বিপুল ভোটে (১৮৫৫-৮৭৩) জিতল।[৮১] বিবেচনার জন্য গান্ধীর প্রস্তাব ও বিপিন পালের সংশোধনী ছাড়া আর কোন প্রস্তাব ছিল না অর্থাৎ সত্যাগ্রহের বিকল্প নিয়ে ভোটাভুটির সুযোগ ছিল না। এর ফলে প্রায় অর্ধেক ভোটার ভোটদানে বিরত থাকেন।[৮২] দ্বিতীয়ত, এক বছরের মধ্যে স্বরাজ আনার প্রতিশ্রুতি অনেককেই আকৃষ্ট করে। সন্ত্রাসবাদীরা এক বছরের জন্য প্রতীক্ষা করতে রাজি ছিল। মারোয়াড়ীদের বিপুল সমর্থনও উল্লেখযোগ্য।[৮৩] মন্টেগুকে লেখা ছোটলাট উইলিংডনের চিঠিতে (১৫ সেপ্টেম্বর ১৯২০) মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এর খিলাফতী সমর্থনের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।[৮৪] গান্ধী ও পালের পক্ষে যে ভোট পড়ে তা তুলনা করে ব্রাউন দেখাচ্ছেন গান্ধী বোম্বাই, গুজরাট, উত্তর প্রদেশ, পঞ্জাব ও বিহারের অধিকাংশ প্রতিনিধির ভোট পান। বাংলায় তাঁর পক্ষে পড়ে ৫৫১, বিপক্ষে ৩৯৫। কেবল সি. পি. ও বেরার ছিল ঘোর গান্ধী-বিরোধী।[৮৫] পরিস্থিতি সামলে দিতে দাশ প্রস্তাব করলেন যে কার্যসূচি চূড়ান্ত ভাবে নির্ধারণ করার জন্য একটা সাব-কমিটি গঠিত হবে এবং বর্ষশেষে নাগপুর অধিবেশনে চরম সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তবে নিজেও কিছুটা পিছু হঠলেন তিনি। তাঁর নেতৃত্বে চব্বিশ জন বাঙালী আসন্ন নির্বাচন থেকে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করলেন।

কেন এই আপত্তি? ব্রুমফিল্ডের মতে বাঙালী ভদ্রলোক চিরদিন কাউন্সিলের রাজনীতি ও সন্ত্রাসবাদের মধ্যে দোদুল্যমান—গণআন্দোলনের ফলে তাদের সামাজিক মর্যাদা ও অর্থনৈতিক ভিত্তি বিনষ্ট হবে এমন আশঙ্কা তাদের মজ্জাগত। রজত রায়ের মতে গান্ধী ও দাশের বিরোধ প্রধানত সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের বিরোধ।[৮৬] তিনি দেখিয়েছেন কি ভাবে গান্ধীর কৃচ্ছ্রসাধন, গ্রামসংস্কারের ওপর ঝোঁক, চরখার বাতিক ও হিন্দুস্থানীর ওপর জোর বাঙালী ভদ্রলোকদের বিদগ্ধ নাগরিকতা ও পাশ্চাত্যপ্রভাবিত সংস্কৃতিতে ঘা দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ও সি. এফ. অ্যানড্রুজের চিঠি উদ্ধৃত করে আপন মত প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন

তিনি। কিন্তু তিনি মনে রাখেননি যে একঅর্থে চরমপন্থীরা গান্ধীকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছেন ও রবীন্দ্রনাথ গান্ধীর পূর্বসূরী। উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের প্রথম দশকে লেখা বহু প্রবন্ধে পশ্চিমের বস্তুসর্বস্ব, ভোগবাদী, উগ্র জাতীয়তাপন্থী সভ্যতা সম্পর্কে অরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথ যে-সব বিরূপ মন্তব্য করেছেন, গান্ধীর 'হিন্দ স্বরাজ'-এ তারই প্রতিধ্বনি শুনি। বোলপুরের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যে কঠোর জীবনযাত্রার ব্যবস্থা কবি করেছিলেন তার রসস্নিগ্ধ বিবরণ মুজতবা আলি, প্রমথনাথ বিশী, সুধীরঞ্জন দাশ প্রভৃতি আশ্রমিকের লেখায় পাওয়া যায়। চরখার ওপর অত্যধিক জোর দিতে অবশ্যই তিনি চাননি। তাঁর কবিসত্তা যে-কোন রঙরসহীন একঘেয়েমির বিরুদ্ধে চিরবিদ্রোহী। কিন্তু হিন্দী ভাষা সম্বন্ধে এক পত্রে তিনিই লিখেছেন, "Hindi is the only possible national language for interprovincial intercourse in India." তবে জোর করে হিন্দী চাপাতে তিনি চাননি। 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে যে আত্মশক্তি উদ্বোধনের কথা তিনি তুলেছিলেন, ১৯০৭ সালে পাবনা প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতিরূপে যে গঠনমূলক কর্মসূচি, গ্রামোন্নয়ন, হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতির রূপরেখা এঁকেছিলেন তা কি গান্ধীর কর্মসূচির পূর্বাভাস নয়? ১৯০৯ সালে রচিত 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগী (যিনি আবার 'মুক্তধারা'য় ফিরবেন) কি মহাত্মার প্রতিশ্রুতি বহন করেননি? কবির মতে যে দুর্গম ধর্মের পথে সর্বস্ব ত্যাগ করে পৌরুষের পাথেয় সংগ্রহ করতে হয়, অহংকার বিসর্জনে যার পরিতৃপ্তি, অন্যকে পরাস্ত করে নয়, নিজেকে পরিপূর্ণ করে যার সফলতা, গান্ধী তো সেই দুর্গম পথেরই যাত্রী। গান্ধীর যন্ত্র-সভ্যতা বিরোধিতা কি 'মুক্তধারা'র কুমার অভিজিতের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়নি? "যন্ত্র প্রাণকে আঘাত করছে। অতএব প্রাণ দিয়েই সেই যন্ত্রকে অভিজিত ভেঙেছে, যন্ত্র দিয়ে নয়।" 'মারনে ওয়ালা ইংরেজে'র ভিতরের পীড়িত মনুষ্যত্বকে কি জাগাতে চাননি তিনি? অ্যানড্রুজকে লেখা (৭ সেপ্টেম্বর ১৯২০) এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ নিজে স্বীকার করছেন, "ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের দ্বারা সর্বাগ্রে আমাদের নিজের জীবনে ও চিত্তে পূর্ণ সহযোগ স্থাপিত হওয়া চাই। তবেই অসহযোগ স্বতঃস্ফূর্ত হবে।...এই দুরূহ কাজে চাই ন্যায়নিষ্ঠ প্রেম। মহাত্মা গান্ধীর জীবনে তার প্রকাশ সবচেয়ে বেশি এবং সারা পৃথিবীতে একমাত্র তিনিই কেবল জনসাধারণের মনে তা সঞ্চার করতে পারেন।" পরে (২ মার্চ ১৯২১) আবার লিখছেন, "It is in the fitness of things that Mahatma Gandhi should call up the immense power of the weak that has been waiting in the heart of the destitute and insulted humanity of India. The destiny of India has chosen for its ally the power of soul and not that of muscle."[৮৭] তবে তাঁর ভয় ছিল ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ব্যাপক অসহযোগের ফলে আত্মিক অপচয় ঘটবে, আর "সাত্ত্বিক শক্তিকে তামসিক শক্তিতে পরিণত করা খুবই গর্হিত।" ১৮ সেপ্টেম্বর কবি লিখছেন, "প্রীতি ও সেবায় দেশের লোকের সঙ্গে সহযোগের আদেশ যদি তিনি দেন, আমি তাঁর পায়ের কাছে বসে তাঁর কথামত কাজ করতে রাজি আছি। ক্রোধের আগুন জ্বেলে দিয়ে তা ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দেবার কাজে আমার পৌরুষের ক্ষয় কিছুতেই করব না।" তাঁর আরও ভয় ছিল, স্বদেশপ্রেমিক ও নীতিবিদের কাছে সম্পূর্ণ মানুষটিকে বলি দেওয়া হবে। নেতিধর্মের নিষ্ক্রিয় রূপ হল কৃচ্ছ্রতা, বিবর্ণ বৈরাগ্য। "The complete man must never be sacrificed to the patriotic man or even to the merely moral man."[৮৮]

শেষে তাঁর মনে হয়েছিল পশ্চিম থেকে অপসরণ একরকমের আত্মঘাত। "Our

present struggle to alienate our heart and mind from the West is an attempt at spiritual suicide." কিন্তু একই সঙ্গে তাঁর মনে হচ্ছিল পাশ্চাত্য ভোগবাদ স্বরাজ নিয়ে মাতামাতির মতই ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশে বাধা দিচ্ছে। নিউ ইয়র্ক থেকে লেখা চিঠিগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পড়লে মনে হয় আমেরিকার লুব্ধ, প্রমত্ত, উপকরণবস্তু সভ্যতা সম্পর্কে গান্ধীর মতই তিনি বীতশ্রদ্ধ। ২৫ ডিসেম্বর কবি লিখছেন, "পশ্চিমের লোকের অপরিসীম আস্থা রয়েছে ঐশ্বর্যের উপর, সে ঐশ্বর্য ক্রমশ নিজেকে বাড়িয়ে চলে, অথচ তাতে পরাসম্পদ কিছু লাভ হয় কি ?" ১৯২০-২১ সালে আমেরিকা ভ্রমণ প্রসঙ্গে পড়ি, "হোটেলের জানালার কাছে রোজ ত্রিশ পঁয়ত্রিশ তলা বাড়ির ভ্রূকুটির সামনে বসে থাকতেম আর মনে মনে বলতেম, লক্ষ্মী হলেন এক, আর কুবের হ'ল আর—অনেক তফাৎ। লক্ষ্মীর অন্তরের কথাটি হচ্ছে কল্যাণ, সেই কল্যাণের দ্বারা ধন শ্রী লাভ করে। কুবেরের অন্তরের কথাটি হচ্ছে সংগ্রহ,সেই সংগ্রহের দ্বারা ধন বহুত্ব লাভ করে। বহুলত্বের কোন চরম অর্থ নেই।" যাঁরা ইতিহাসে প্রবহমানতার তাৎপর্য উপলব্ধি করেন তাঁরা দেখবেন নানা ভাবে এসব কথা বঙ্কিম, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ নিজে, আগেই বলেছেন। ইউরোপে যুদ্ধের সময় লেখা এলিয়ট ও পাউণ্ডের অনুরূপ উক্তি স্মরণীয়।

অথচ ১৯২১-এর মডার্ন রেভ্যুতে রবীন্দ্রনাথের 'Call of Truth' প্রবন্ধ এবং ইয়ং ইণ্ডিয়ায় গান্ধীর জবাব— 'The Great Sentinel' পড়লে মনে হতে পারে তাঁদের মধ্যে বিভেদ মৌলিক ও মেরু-প্রমাণ। এই বিভেদের একটা কারণ ছিল সাময়িক, অন্যটা দৃষ্টিভঙ্গিগত। মহাযুদ্ধের আগে থেকে উগ্রজাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে কবির মনে উষ্মা জাগছিল, যার বিস্ফোরণ ঘটে জাপানে ও আমেরিকায়, যার প্রকাশ Nationalism গ্রন্থে। একে তিনি "mad orgy of midnight" আখ্যা দিয়েছেন। এবং ভারতে তার অনুকরণ দেখে দুঃখ পেয়েছেন। তাঁর কাছে স্বরাজ মানব দেহমন আত্মার সর্বপ্রকার গ্রন্থিমোচনের সংগ্রাম, রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়। দ্বিতীয়ত, ১৯১৬ সাল থেকেই তাঁর চিত্তে বিশ্বভারতীর ভাবনা উদিত হয়েছিল। এক নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের প্রতি জন্মসূত্রে আনুগত্য (যাকে তিনি "idolatry of geography" বলতেন) ক্রমশ ক্ষীণ হচ্ছিল। তাঁর চেতনারাজ্যে জন্ম নিচ্ছিল বিশ্বমানব। চারদিকের অশান্তির ঘূর্ণাবর্ত থেকে নতুন বিশ্বের অনাগত মহামানবের জন্য মঙ্গলদীপটি সযত্নে রক্ষা করতে চাইছিলেন তিনি। অ্যানড্রুজকে তিনি লিখছেন, "Santiniketan must be saved from the whirlwind of dusty politics."[৮৯] পরে—"We must make room for man, the guest of this age, and let not the NATION of this age obstruct his path."[৯০]

তাঁর মনে হয়েছিল অসহযোগের ঝড়ে মঙ্গলদীপ নিবে যাবে, মহাত্মার রাজনীতি ভারতকে দ্বৈপায়ন করে তুলবে, পূর্ব পশ্চিমের মিলন ব্যাহত হবে। কিন্তু গান্ধীও কি, আর এক অর্থে, বিশ্বদেবতার উপাসক ছিলেন না ? তাঁর অন্য নাম—সত্য ও প্রেম, তাঁর প্রসাদ থেকে ইংরেজরাও বঞ্চিত নয়। পার্থক্য এই যে, কবি তাঁকে খুঁজছিলেন রসের সাধনায় আর গান্ধী কর্মের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের শঙ্কা ছিল গান্ধী আনন্দময়কে ভুলিয়ে দেবেন ; গান্ধীর শঙ্কা ছিল অন্নময়কে ভুললে আনন্দময়ের অভিসারে কে যাবে ? রবীন্দ্রনাথের ভয় ছিল দেশের বুদ্ধি ও বিদ্যাকে চাপা দিয়ে (অর্থাৎ স্কুল কলেজ বর্জন করে) শুধু বাধ্যতাকে আঁকড়ে ধরা স্বেচ্ছামৃত্যুর তুল্য। "কার কাছে বাধ্যতা ? মন্ত্রের কাছে, অন্ধ বিশ্বাসের কাছে।" গান্ধীর কাছে কিন্তু এ ছিল মুমূর্ষু ব্যক্তির ভিষকের নির্দেশের কাছে বাধ্যতা, যা কিনা পুনর্জীবনের পূর্বশর্ত।

আমাদের দুর্ভাগ্য, উভয়ের বিতর্ক এই উঁচু স্তর থেকে না দেখে নীরদ চৌধুরী গান্ধীবাদী সব আন্দোলনকেই Xenophobia'র প্রকাশ বলে ব্যাখ্যা করেছেন।[৯১] আপাতত নীরদবাবু ও ব্রুমফিল্ডের মন্তব্য ভুলে চিত্তরঞ্জন দাশের প্রতিক্রিয়া তলিয়ে দেখা যাক। জন্মসূত্রে অভিজাত না হলেও কর্মসূত্রে তাঁর পরিবার প্রতিষ্ঠিত ছিল। সংস্কৃতি সূত্রে তিনি ছিলেন ব্রাহ্মধর্ম প্রভাবিত আবার ব্যক্তিগত প্রবণতায় বৈষ্ণব ভক্তিবসে সিক্ত। আপন বৃত্তিতে এমন সাফল্য খুব কম বাঙালী অর্জন করেছেন, অথচ বিত্তের মোহ তাঁকে কখনো গ্রাস করেনি। সাধাবণের দুঃখে তাঁর কোমল হৃদয় চিরবিগলিত, সর্বস্ব ত্যাগে তিনি সবসময় প্রস্তুত। রাজনীতিতে তাঁর আদর্শ পুরুষ ছিলেন অরবিন্দ, যাঁর মামলার সওয়াল তাঁকে প্রথম পাদপ্রদীপেব সামনে নিয়ে আসে। কিন্তু তখনই তিনি বোঝেন এমন রোমাণ্টিক, কাণ্ডজ্ঞানহীন কর্মপদ্ধতি ইংরেজদের কাবু করতে পারবে না। তাঁর 'কাউন্সিলের রাজনীতি' গোখলের সহযোগিতা নয়, আবার প্রয়োজনে সন্ত্রাসবাদীদের সাহায্য নিলেও সন্ত্রাসবাদে তিনি বিশ্বাস করতেন না। গান্ধীর কার্যক্রম তিনি পুরো বর্জন করতে চেয়েছিলেন তাও ঠিক নয়। তাঁর মনে হযেছিল সত্যাগ্রহের জন্য দেশ তৈরি হতে ঢের দেরি, তার জন্য চাই দীর্ঘ ও ব্যাপক শিক্ষা। পূর্ণ প্রস্তুতির পূর্বে এমন কঠিন পরীক্ষায় তিনি নামতে চাননি। উপরন্তু স্বদেশী যুগের ব্যর্থতার স্মৃতি তিনি ভোলেননি। বিদেশী শিক্ষা, আদালত, কাউন্সিল বর্জন করার আগে সমান্তরাল স্বদেশী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে এই বাস্তববোধ তাঁর ছিল। কলকাতা অধিবেশনে পালেব সংশোধনী প্রস্তাব সমর্থন করতে গিয়ে তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন, কাউন্সিলের ভেতরে থেকেই তিনি অসহযোগ চালাতে চান। সত্যমূর্তি, জয়াকর প্রভৃতির মত তাড়াহুড়ো করে আন্দোলন শুরু করার বিপক্ষে ছিলেন তিনি। নাগপুব তাঁকে প্রত্যাক্রমণের জন্য তিন মাস সময় দিয়েছিল।

রিচার্ড গর্ডনের মতে কলকাতার পরই দাশ গান্ধীর সঙ্গে আপোসেব জন্য উদ্গ্রীব হন। তা ছাড়া নভেম্ববে নির্বাচন হয়ে যাওযায় কাউন্সিল তার গুরুত্ব হাবায। গর্ডনেব কথা মানা যায় না। দাশ তো শুধু প্রথম নির্বাচনেব কথা ভাবেননি। মণ্টেগুকে তিনি বুঝিযে দিতে চেয়েছিলেন দ্বৈতশাসননীতি অগ্রহণীয়। গান্ধীর মত (বা পূর্ববর্তী অরবিন্দেব মত) কাউন্সিলকে 'মাযা' বলে উড়িযে দেননি তিনি, তাকেও অস্ত্ররূপে ব্যবহাব কবতে চেযেছিলেন। তা ছাড়া অসহযোগেব কর্মসূচিকে গান্ধীর মত সীমাবদ্ধ কবে বাখতে চাননি তিনি, ব্যাপকভাবে প্রয়োগ কবতে চেয়েছিলেন। বাঙালী ভদ্রলোকের গণআন্দোলন ভীতি, যা ব্রুমফিল্ডের অন্যতম যুক্তি, তা অন্তত দাশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না। ১৯১৭ ও ১৯১৯ সালে তিনি বলেছিলেন, স্বরাজ কোনও শ্রেণীর জন্য নয়, সর্বসাধাবণের জন্য। নাগপুরের প্রস্তাবে শ্রমিক সংগঠন ও আইন অমান্য অন্তর্ভুক্ত কবে তিনি দেখিযে দিলেন গণআন্দোলনকে তিনি ভয় করেন না। জওহরলাল 'আত্মজীবনী'তে লিখেছেন, দাশ কলকাতাব কর্মসূচিকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন।

১৯২০ সালের অক্টোবরে বারাণসীতে আহূত সম্মেলনে তাঁর কর্মসূচিব আভাস মেলে। গান্ধী আন্দোলনের নৈতিক দিকেব ওপব জোর দিয়েছিলেন, দাশ—রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিকের ওপব। খিলাফৎ দাবি নিয়ে সত্যাগ্রহ প্রসঙ্গে কর বন্ধের কথা তুলেছিলেন গান্ধী—কিন্তু কলকাতা কংগ্রেসে সে বিষয়ে উচ্চবাচ্য করেননি। দাশ তা কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে চাইলেন। শ্রমিকদেরও তার শামিল কবতে হবে।[৯২] কংগ্রেস সংগঠনের পরিবর্তন চাইলেন তিনি, যাতে তার গণতান্ত্রিক মূল দৃঢ় হয়। হয়তো উদ্দেশ্য ছিল ভবিষ্যৎ নির্বাচনে সম্ভাব্য ভোটদাতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগস্থাপন; তবু গ্রাম থেকে

কেন্দ্রীয় কংগ্রেস পর্যন্ত এক সূত্রে গাঁথতে না পারলে ব্যাপক আন্দোলন সম্ভব হত না। গান্ধী প্রথম থেকেই বয়কটের বিরুদ্ধে, কারণ তা হিংসার মনোভাবপ্রসূত (এখানে তাঁব ববীন্দ্রনাথের সঙ্গে মিল)। দাশ আবার সেই বযকটকেই প্রধান অস্ত্ররূপে ব্যবহাব কবতে চাইলেন, কাবণ চরমপন্থীরূপে এ অস্ত্র তাঁর সুপবিচিত।

উভয়পক্ষই সদলবলে নাগপুব এলেন। বাংলাব গান্ধীবাদীদেব অর্থ যোগাল মারোয়াড়ীরা; বোম্বাই-এর দলের পিছনে ছিল খিলাফৎ সংখ্যাগরিষ্ঠতা, গুজবাট তো গান্ধীর জন্মভূমি; আর সি. পি.-ব সমর্থন তিনি ঘুরে ঘুবে যোগাড কবলেন। জার্নাল অব এশিয়ান স্টাডিজে গোপালকৃষ্ণ যে হিসেব দিযেছেন তাতে দেখি পশ্চিমাঞ্চলেব প্রতিনিধিদেব প্রায় ৮০% এসেছিল সি. পি. ও বোম্বাই থেকে, ৭২% প্রতিনিধি ছিল মুসলিম, আর বেশ কিছু ছিল মারোয়াড়ী।[১৩] দাশ তাঁব দলবল নিয়ে যেতে বহু অর্থ ব্যয করেছিলেন।[১৪] পুলিশ-সুপাব ও ডোনেলের মতে অর্ধশিক্ষিত গান্ধীবাদীবা সংখ্যার চাপেই বাঙালী শিক্ষিত প্রতিনিধিদেব পবাস্ত করেছিল। দাশেব দল ছিল সন্ত্রাসবাদী সমর্থনপুষ্ট। অনুশীলন দল পুবোপুরি তাঁর পক্ষে ছিল, তবে যুগান্তব দলেব সমর্থন নিযে অরুণ গুহ ও ভূপেন্দ্রকুমাব দত্তেব মতদ্বৈধ আছে। অরুণ গুহেব মতে, অল্প কয়েকজন অসহযোগেব বিপক্ষে ছিলেন। অধিকাংশই, যাঁরা অসহযোগের পক্ষে ছিলেন, তাঁদেব নেতৃত্ব দেন ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত। তবে তাঁরা হিংসাত্মক উপাযে বিশ্বাসেব কথা লুকিয়ে বাখেন নি, শুধু এক বছর তা থেকে বিরত বইবার প্রতিশ্রুতি দেন। ততদিন তাঁবা দল সংগঠন বা হিংসাত্মক কর্মে লিপ্ত হবেন না। বিষয-নির্বাচনী কমিটির প্রতিনিধিত্ব নিযে দু দল বাঙালীর মারামাবি প্রমাণ কবে যে দাশ তাঁব নিজেব প্রদেশেবও সর্বময কর্তা ছিলেন না।

জুডিথ ব্রাউনের ধাবণা গান্ধীর জয অবশ্যম্ভাবী ভেবে দাশ আত্মসমর্পণ করেন। জয়াকরও তাঁব আত্মজীবনীতে লিখেছেন, গান্ধীকে আপাতত মেনে নিয়ে বাংলায আপন নেতৃত্ব বজায় বাখতে চান দাশ।[১৫] তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, পবে সুযোগ বুঝে আন্দোলন আপন মনোমত পথে চালাবেন। জুডিথ ব্রাউনের মতে এ ধরনের হিসাব সব প্রাদেশিক নেতার মনে কাজ করছিল। মাদ্রাজেব নেতারা বেশান্তকে সমর্থন কবাব চেয়ে গান্ধীকে কবাই শ্রেয় মনে করেন—মহাবাষ্ট্রের নেতারা চন্দ্রভারকাবকে না করে গান্ধীকে। উভয প্রদেশে ব্রাহ্মণ বিরোধী দল গঠিত হয়েছিল এবং ব্রাহ্মণদেব ভয ছিল এরা প্রাধান্য পাবে। মাদ্রাজেব নির্বাচনে জাস্টিস দলের জয় প্রমাণ কবে যে ভয় নিতান্ত অমূলক ছিল না। নবোদ্ভূত রাজনৈতিক শক্তিকে গান্ধীই সংযত রাখতে পারবেন বলে অনেকে তাঁর পক্ষে যায়। ব্রুমফিল্ড বলেছেন, দাশ সংখ্যালঘু হয়ে যাবার ভয়ে ও সুবিধাবাদের টানে গান্ধীকে মানেন। এটা somersault, অন্যদিকে রিচার্ড গর্ডন দেখাচ্ছেন নাগপুর কংগ্রেসে দাশেবই জয় হয়। গৃহীত প্রস্তাবের খসড়া দাশের রচনা। রজতকান্ত বায় এই মত সমর্থন করেন।[১৬]

আমরা দেখাব এই উভয় মতই একপেশে। নাগপুরে গান্ধী বা দাশ কেউই জযী হননি। উভয়পক্ষ এক গোপন বৈঠকে মিলিত হয়ে মূল বিষয়গুলি সম্পর্কে একমত হন এবং নাগপুরেব পরিস্থিতিতে তাঁরা একে অপরকে বাদ দিয়ে চলতেও পারতেন না।

নাগপুরে তিনটি প্রশ্ন উঠেছিল—কংগ্রেসের লক্ষ্য কি হবে, কার্যক্রম কি হবে ও সংগঠন কি হবে। লক্ষ্যের ব্যাপারে জিন্না, পাল ও মালব্য বললেন, ব্রিটেনেব সঙ্গে একটা সম্পর্ক রাখতেই হবে। আলিরা, মোহনি ও শ্রদ্ধানন্দ বললেন, পূর্ণ স্বাধীনতা ও সাধারণতন্ত্রই লক্ষ্য হওয়া উচিত। গান্ধীর প্রস্তাব ছিল, "সর্বপ্রকাব বিধিসম্মত ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে ভারতের জনগণ কর্তৃক স্বরাজ লাভ।" দাশ 'স্বরাজ' শব্দটির আগে 'গণতান্ত্রিক' বিশেষণ যোগ করতে

চান। দ্বিতীয়ত খিলাফতীরা অহিংসার ব্যাপারে দ্ব্যর্থক কথা বলছিলেন, যার ইঙ্গিত, প্রয়োজন হলে হিংসার পথ নিতে তাঁরা দ্বিধা করবেন না। এ অবস্থায় দক্ষিণ ও বাম বিরোধিতার উপর জয়ী হতে গেলে, বিশেষত স্বরাজের ব্যাপারে নরমপন্থীদেরও পক্ষে রাখতে এবং অহিংসার ব্যাপারে আপন আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখতে, গান্ধীর পক্ষে মতিলাল নেহরু ও চিত্তরঞ্জন দাশের সমর্থন অপরিহার্য হয়ে উঠল।

দাশ তখন আপন শিবিরে অ্যাকিলিসের মত ক্ষুব্ধ অবস্থায় বিরাজমান। মহম্মদ আলির দৌত্যের ফলে সেখানে ২৯ ডিসেম্বর এক গোপন বৈঠক বসল। তাতে উপস্থিত ছিলেন দাশ, গান্ধী, নেহরু ও মহম্মদ আলি। স্থির হল দাশ লক্ষ্যের ব্যাপারে গান্ধীকে সমর্থন করবেন কিন্তু কার্যক্রমের ব্যাপারে দাশের মতামত শুনতে হবে। এই সাহায্য সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েই গান্ধী বলেন, "ভারতবর্ষের অগ্রগতিতে সাহায্য করলে তিনি ব্রিটেনের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন করবেন না কিন্তু ভারতের আত্মসম্মানে বাধলে তা ছিন্ন করতে দ্বিধাও করবেন না।"

চুক্তি মত কার্যক্রম তৈরি হয় দাশের বারাণসী প্রস্তাব ও আর কিছু নতুন দাবি নিয়ে। প্রকাশমকে লেখা চিঠিতে দাশ দাবি করেছেন খসড়ার অর্ধেকের বেশি তাঁরই তৈরি। গান্ধীর সম্পূর্ণ রচনাবলীর উনিশতম খণ্ডে গান্ধীকৃত প্রাথমিক খসড়ার ও চূড়ান্ত খসড়ার বয়ান রয়েছে—উভয়ের পার্থক্য লক্ষণীয়।[৯৭] চূড়ান্ত খসড়ায় দেখছি—স্কুল, আদালত বয়কটের পূর্বে gradual বিশেষণ অন্তর্হিত, কিন্তু জাতীয় বিদ্যালয়, সালিশীব্যবস্থা ইত্যাদি বিকল্পের উল্লেখ রয়েছে। ষোল বা তদূর্ধ্ব বয়সের ছেলেদের বিদ্যালয় বর্জনের আওতায় আনা হয়। উকিলদের তখুনি আদালত ছাড়তে নির্দেশ দেওয়া হয়নি। লাজপৎ রায় ও কস্তুরী রঙ্গ আয়েঙ্গারের আপত্তি এভাবেই খণ্ডিত হয়। অর্থনৈতিক বয়কটের পরিধি অনেক বাড়ানো হয়। ব্রিটিশ এজেন্সি হাউসের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ থেকে কর বন্ধ পর্যন্ত তার বিপুল বিস্তার। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনের প্রস্তাব নতুন। আন্দোলন চালাতে টাকা চাই, তার জন্য গঠিত হল তিলক স্বরাজ ভাণ্ডার। শ্রমিক সংগঠনের কোনো প্রস্তাব আগে ছিল না। তারও ব্যবস্থা হল। সত্যাগ্রহের সব অস্ত্র নিঃশেষিত হলে আইন অমান্য শুরু হবে তাও স্থির হল। আশ্চর্যের ব্যাপার, কোথাও কাউন্সিল বর্জনের উল্লেখমাত্র ছিল না। পরে মাদ্রাজে এক বক্তৃতায় দাশ বলেছিলেন, তাঁর অনুরোধে এ প্রসঙ্গ বাদ দেওয়া হয়। "বছরের মধ্যে স্বরাজ"—গান্ধীর এই প্রতিশ্রুতির পর এ নিয়ে বৃথা কলহের প্রয়োজন ছিল না। দ্বিতীয় নির্বাচনের ঢের দেরি ছিল।[৯৮]

কংগ্রেস সংগঠন ঢেলে সাজান হল। এ বিষয়ে গান্ধী নিলেন অগ্রণী ভূমিকা। স্থির হল প্রতি গ্রামে (তালুকায়) ও জেলায় কংগ্রেসের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হবে ; প্রতি প্রদেশ থেকে জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধি-সংখ্যা নির্দিষ্ট হবে ; বাৎসরিক অধিবেশন বসার পূর্বে নীতি-নির্ধারণের জন্য তিনশত সদস্য বিশিষ্ট নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি (A.I.C.C) তৈরি হবে আর সে নীতি কার্যকর করতে গঠিত হবে পনের জন সদস্য-বিশিষ্ট ওয়ার্কিং কমিটি। এইসব পরিবর্তনের ফলে তিন প্রেসিডেন্সীর কর্তৃত্বের অবসান ঘটল। অশিক্ষিত কৃষক, ছোট শহরের ব্যবসায়ী ও উকিল, শ্রমিক—কারুর পক্ষেই সভ্য হওয়া, এমন কি প্রতিনিধি হওয়া, সম্ভব হল বলে পুরোনো কর্তৃত্বে চিড় ধরল। দাশ, লাজপৎ, আয়েঙ্গার বুঝলেন ভবিষ্যতে নির্বাচন লড়তে এমন ব্যবস্থা অপরিহার্য। গান্ধী অবশ্য জোর দিলেন শৃঙ্খলার ওপর। তাঁর হাতে ওয়ার্কিং কমিটি এক প্রচণ্ড শক্তিশালী আয়ুধ হয়ে দাঁড়াল।

॥ ৬ ॥

উনিশ শো একুশ-এ নতুন সংগঠন, নেতা ও কর্মপন্থা নিয়ে শুরু হল ব্রিটিশবিরোধী প্রথম গণআন্দোলন। দীর্ঘ পনের বছর পরে আবার একসূত্রে বাঁধা পড়ল সহস্র সহস্র জীবন, সহস্র সহস্র কণ্ঠ গেয়ে উঠল 'বন্দেমাতরম্'। কংগ্রেসের কৌশল, গান্ধীর ভাষায়, ছিল 'hasten slowly'—অর্থাৎ আন্দোলনের তীব্রতা ধীবে ধীরে বাড়িয়ে তাকে আইন অমান্যের স্তরে নিয়ে যাওয়া। বেজওয়াদায় (৩১ মার্চ—১ এপ্রিল ১৯২১) ওয়ার্কিং কমিটি সিদ্ধান্ত নিল ৩০ জুনের মধ্যে এককোটি টাকার তিলক স্বরাজ ফাণ্ড, এক কোটি সদস্য ও বিশ লক্ষ চরখা সংগ্রহ করতে হবে। বোম্বাইতে এ আই সি সি অধিবেশন ২৮ থেকে ৩০ জুলাই বিদেশীবস্ত্র বর্জনের ডাক দেয় ও স্বদেশী কর্মসূচি সমাপ্ত হওয়া সাপেক্ষে আইন অমান্য পিছিয়ে দেয়। আরও স্থির হয় যুবরাজের আগমন উপলক্ষে আয়োজিত কোনও উৎসবে কংগ্রেস যোগ দেবে না। কলকাতার ওযার্কিং কমিটি (৫ অক্টোবব ১৯২১) প্রাদেশিক কমিটিব অনুমতি সাপেক্ষে ব্যক্তিগত আইন অমান্যের নির্দেশ দেয়। সামরিক ও অসামবিক সবকাবী কর্মচারীদের চাকুরি ছেড়ে দেবার অনুরোধও জানান হল। দিল্লীর ওয়ার্কিং কমিটি ও এ আই সি সি (৪-৫ নভেম্বর ১৯২১) প্রতি প্রদেশকে খাজনা বন্ধ সমেত আইন অমান্য শুরু করার অনুমতি দেয়, তবে প্রত্যেক ব্যক্তি, অন্তত অঞ্চলেব অধিকাংশের, স্বদেশী গ্রহণ সাপেক্ষে। গান্ধী নিজেই বারদোলিতে আইন অমান্য পরিচালনা করবেন স্থির হয়। যুবরাজের ভাবতভূমিতে পদার্পণ উপলক্ষে বোম্বাইতে হিংসার বিস্ফোরণ দেখে ২৩ নভেম্বর তা পিছিয়ে দেওয়া হয়। বছরের শেষে আহমেদাবাদ কংগ্রেসে গান্ধী আন্দোলনের একক পরিচালক মনোনীত হন। তিনি কিন্তু স্বরাজেব সংজ্ঞা দেননি—সে বিষয়ে, নেহরুর ভাষায়, ছিলেন "delightful vague."

সত্যাগ্রহ দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদের কথা আগেই বলেছি। রোম্যাঁ রোলাঁ গান্ধীকে সমর্থন করেন।[৯৯] এক বছরের মধ্যে স্বরাজ আসবে এমন বিশ্বাস ছিল শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের। রবীন্দ্রনাথ এ ধরনের "সংক্রামক বিশ্বাস প্রবণতায়" শিউরে ওঠেন। চিত্তরঞ্জন যখন ঘোষণা কবলেন, "শিক্ষা অপেক্ষা করতে পারে, স্বরাজ—নয়", তখন মডার্ন রেভ্যুর সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় উত্তর দেন, "যেন পূর্ণ শিক্ষা বিহীন স্বরাজ এক বছরে লাভ করা যায় বা একদিনের জন্য রক্ষা করা চলে!" স্কুল কলেজ বর্জনকে রবীন্দ্রনাথ "নিছক শূন্যতার নৈরাজ্য" আখ্যা দিয়েছিলেন। বিদেশী কাপড় অপবিত্র, তাই পোড়াতে হবে, শুনে কবি বলেন, "কোনো কাপড় পরা বা না পরার মধ্যে যদি কোনো ভুল থাকে তবে সেটা অর্থতত্ত্বের বা স্বাস্থ্যতত্ত্বের বা সৌন্দর্যতত্ত্বের ভুল—এটা ধর্মতত্ত্বের ভুল নয়।" অ্যানড্রুজ গান্ধীকে জানান, "যুবকদের মধ্যে অল্পই উৎসাহ সহকারে গ্রামোন্নয়নের কাজ করছে। চরখা বেশিদিন আকর্ষণ করতে পারবে না আর হিন্দুস্তানীর কোনো আবেদন নেই।"[১০০] ব্রুমফিল্ডের মতে শিক্ষা বয়কটের বিরোধিতা করে বাঙালী ভদ্রলোক আপন সংস্কৃতি-গর্ব প্রকাশ করছিল। এ কথা সত্য নয়! রোনালড্শের ডায়েরিতে পড়ি, আশুতোষ স্বদেশী যুগের অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতার উল্লেখ করছেন, সুরেন্দ্রনাথ ভয়াবহ অপচয়ের কথা ভেবে শিউরে উঠছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "tyranny over the minds of the people." অবিচলিত গান্ধী সব সংশয়ের উত্তরে বলেন, "চাষ কবার আগে ক্ষেত থেকে আগাছা (সরকারী ইংরেজী শিক্ষা) উপড়ে

ফেলা অত্যাবশ্যক।” স্বীকাব করতে হবে জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা হয়নি বললে চলে। বাংলায় যে ১৯০টি জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, ১৯২৪-এর মধ্যে তার ৭০টি মাত্র জীবিত ছিল। তা ছাড়া ১০%-এর বেশি ছাত্র সরকারী শিক্ষায়তন ছাড়েনি, অনেকে ফিবেও আসে। ব্যামফোর্ডের হিসাবে সারা ভারতে আর্টস কলেজের ছাত্রসংখ্যা ১৯১৯-এ ছিল ৫২,৪৮২, ১৯২১-২২-এ তা কমে দাঁড়ায় ৪৫,৯৩৩।

গান্ধী স্বদেশীকেই প্রাধান্য দিতেন, বয়কট চাপে পড়ে মেনে নিয়েছিলেন। চবখা ও দেশী মিলকে তিনি পরিপূরক মনে করতেন। ব্যবসায়ীদের বিদেশী কাপড আমদানি ও মিলমালিকদের বিদেশী সুতো ব্যবহার না কবতে অনুরোধ জানান তিনি। বোম্বাই-এর কিছু বড় ব্যবসায়ী—পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস, যমনাদাস দ্বারকাদাস ও ফিরোজ শেঠ্না—আপন স্বার্থে সত্যাগ্রহের বিরোধিতা করেন। ১৯২১-এর সেপ্টেম্বরে কলকাতার মারোয়াডী বণিক সমিতি বছরের শেষ পর্যন্ত বিলাতি কাপড় আমদানি না করাব প্রতিশ্রুতি দিন। কিন্তু গোয়েন্দা বিভাগের প্রতিবেদন অনুসারে অনেকেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন। সাম্প্রদায়িক বযকট কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হয়েছিল। এলাহাবাদের বস্ত্র ব্যবসায়ীদের মধ্যে দ্বিধা লক্ষ্য কবেছেন বেইলী।[১০১] গান্ধীকে বলতে হয়েছিল আমদানিকাবকদের যা ক্ষতি হবে তা পুষিয়ে দেওয়া হবে। সমস্যা দেখা দেয় জমে যাওযা কাপড নিয়ে। কংগ্রেসের নথিপত্রে দেখা যায় আপাতত তা গুদামে রেখে ভারতের বাইরের বাজারে পাঠাবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। বয়কট অনেকাংশে সার্থক হয় টাকা ও পাউণ্ডের বিনিময হার কমে গেলে। এক টাকার দাম যখন ২ শিলিং ছিল তখন ম্যাঞ্চেস্টারের সঙ্গে ভারতীয় আমদানিকাবকদের চুক্তি হয়েছিল। ১৯২১-এর প্রথমার্দকে টাকার দাম কমে হয ১ শিলিং ৩ পেন্স। এ হাবে কিনলে বস্ত্র ব্যবসায়ীদের ক্ষতি হত বলে তাবা আমদানি বন্ধ কবে দেয। পরে ম্যাঞ্চেস্টারেব সঙ্গে আপস হলে আবাব ব্যবসা শুরু হয়। স্বরাজের জন্য স্বেচ্ছায় ত্যাগ ববণেব চেয়ে বড হয়ে উঠেছিল লাভ-লোকসানের হিসেব। অবশ্য ১৯২০-এর ডিসেম্বব থেকে ১৯২১-এর জুন পর্যন্ত ব্রিটেন থেকে আমদানি চিনির মোট মূল্য ২·৩ কোটি টাকা থেকে কমে হয় ১·৪ কোটি, লোহা ও ইস্পাত—২·৮ কোটি থেকে ১·৮, কাপড়ের দাম—৬·৭ কোটি থেকে ১·৮ কোটি। ১৯২০-২১ ও ১৯২১-২২-এর মধ্যে বিদেশ থেকে মোট আমদানি বস্ত্রেব মূল্য ১০২ কোটি টাকা থেকে দাঁড়ায় ৫৭ কোটিতে।

অধ্যাপক সব্যসাচী ভট্টাচার্য এক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, মিলমালিকরা বয়কটের সুবাদে প্রচুর লাভ করে। যুদ্ধের পূর্বে ভারতীয় বাজারের ২৫% ছিল তাদের হাতে ; আন্দোলনের শেষে তা বেড়ে হয় ৪২%। শেয়ারের দাম ১৯১৮ সালে ১০০ ধরলে, ১৯২১-এ তা দাঁড়ায় ২৭৫-এ—অর্থাৎ তিন বছরে প্রায় তিন গুণ বাড়ে।[১০২] বহু মিল মোটাকাপড় বুনে তা খাদি বলে চালায়। বিদেশী সুতো ব্যবহার এবং মজুতদারিও বিরল ছিল না। ১৯২০ থেকে ১৯২২-এর মধ্যে মিলনির্মিত কাপড়ের পরিমাণ ১৫৬৩·১ মিলিয়ান গজ থেকে ১৭২০·৮ মিলিয়ান গজে দাঁড়ায়। এরা কংগ্রেস ভাণ্ডারে অনেক চাঁদা দিত বলে[১০৩] গান্ধীকে বলতে হয়—খাদির দাম খুব বেশি হলে মিলের কাপড় পরা যেতে পারে। তবে বরিশালের এক বক্তৃতায় তিনি লোভী মালিকদের নিন্দাই করেছিলেন। আসলে সংঘবদ্ধ লোভের সম্মুখে আদর্শবাদ অসহায় বোধ করছিল। মারোয়াড়ী এক বছর পরেই বিলাতী কাপড় আমদানি শুরু করে।[১০৪]

বাংলায় ইউরোপীয় মূলধনের অসপত্ন কর্তৃত্বের কথা আগেই বলেছি। এই মূলধনের অধিকাংশই লগ্নি ছিল পাটকল ও চা বাগানে। বাংলার সত্যাগ্রহীরা মুখ্যত এইসব বিদেশী

প্রতিষ্ঠানকে আক্রমণের লক্ষ্য হিসাবে বেছে নেয়। অধ্যাপক অমিয় বাগচী দেখিয়েছেন লগ্নিকৃত মূলধন ও লাভের অনুপাত যদি ১৯১৪ সালে ১০০ ধরা হয় তবে ১৯১৬ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৭৫০-এ। কমে গেলেও ১৯১৭ সালে তা ছিল ৪৯০। তুলনায় কাঁচা পাটের দাম ছিল অনেক কম। বলা বাহুল্য, এই জন্যই গ্রামীণ সত্যাগ্রহের ঝটিকা কেন্দ্র ছিল পূর্ববঙ্গ। ১৯২০-২১-এর মন্দার ফলে[১০৫] ও অন্যান্য কারণে কলকাতার চারদিকে শ্রমিক অসন্তোষ তীব্রতর হতে থাকে। গান্ধীবাদী শ্রমিক নেতারা (যেমন অ্যানড্রুজ) শান্তিব বাণী শোনালেও মহম্মদ ওসমানের মত খিলাফতী নেতাদের সুর ছিল চড়া।[১০৬] ১৯২০-ব জুলাই থেকে নয় মাসে বিভিন্ন চটকলে ১৩৭টি ধর্মঘট হয়,,১৯২১-এ ১৫০টি এবং ১৯২২-এ ৯১টি। দুটি মিলে দাঙ্গাও বাধে। বার্ন, জেসপ প্রভৃতি সাহেবি এনজিনিযাবিং কারখানায় ধর্মঘট ছড়িযে পড়ে ; ছড়িযে পড়ে রানীগঞ্জ, আসানসোল, ববাকবেব কয়লা খনি অঞ্চলে। লক্ষ্য ছিল অ্যানড্রু ইউল, বার্ড প্রভৃতি সাহেব মালিক কোম্পানি। অনেক ক্ষেত্রে মাবোযাডী প্রতিদ্বন্দ্বীরা মদৎ যোগায। নেতৃত্ব দেন বিশ্বানন্দ, দযানন্দব মত কিছু সাধু। গোয়েন্দা বিভাগেব মতে শ্রমিক সংগঠন ক্রমশ জোবদাব হচ্ছিল। ১৯২০-তে য়ুনিয়ানের সংখ্যা ছিল ৪০, ১৯২২-এ তা দাঁড়ায ৭৫-এ।

আসামের চা বাগানে বীতিমত শ্রমিক বিদ্রোহ ঘটেছিল। অধিকাংশ বাগানই ছিল সাহেবদের ; অধিকাংশ কুলি আসত বিহাব ও উত্তবপ্রদেশ থেকে। সহসা তাদের মধ্যে রটে যায়.গান্ধীবাজ স্থাপিত হযেছে এবং সব শোষণেব অবসান আসন্ন। চা-কব ও সরকারী কর্মচাবীদের যোগসাজসে তাদেব ওপব অবাধ অত্যাচাব তো হতই,[১০৬ক] দেশে ফেরাব জন্যও তাদেব অনুমতি লাগত। এখন নতুন এক দুরাশায বুক বেঁধে, গান্ধীর জযধ্বনি দিয়ে, দলে দলে কুলিরা অনুমতিপত্র ছাডাই দেশে ফিবে চলল। তাবা এল চাঁদপুবেব স্টীমার ঘাটে পদ্মা পার হবার জন্য। চা বাগানের ধর্মঘট প্রসঙ্গে ব্রুমফিলড্ কলকাতাব স্বদেশীবাবুদেব দোষী করেছেন।[১০৬খ] তার চেযে বেশি দোষ ছিল ভাবতীয চা সমিতিব প্রতিনিধি ও স্থানীয় মহকুমা শাসকের। তাঁদেবই ইঙ্গিতে সশস্ত্র গোর্খাবাহিনী চাঁদপুব স্টেশনে সমবেত কুলিদেব ওপর ২২ মে-ব রাত্রে আক্রমণ চালায। পূর্ববঙ্গে এব প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের নেতৃত্বে আসাম বেঙ্গল রেলওযেতে ধর্মঘট শুরু হল ও তা শীঘ্র ছড়িয়ে পডল পদ্মার সব স্টীমার ঘাটে। অবশ্য এর পেছনে বেলকর্মীদের মজুবি বৃদ্ধির দাবিও ছিল। চিত্তরঞ্জন স্বয়ং গোয়ালন্দে এলেন। এ ধবনেব ধর্মঘটে অ্যানড্রুজের আপত্তি ছিল।[১০৬গ] তিনি শুধু বিপন্ন কুলিদের জন্য ত্রাণ ব্যবস্থা কবতে চেয়েছিলেন। যখন অস্বাস্থ্যকর পবিবেশে তাদের মধ্যে কলেরা দেখা দিল, তিনি দাশের সাহায্য চাইলেন। দাশ তাদের টিকিটের ব্যবস্থা করতে চাঁদা তুলতে বাজি ছিলেন. কিন্তু ধর্মঘট তুলতে নয। শেষপর্যন্ত তাদের গোয়ালন্দে আনা হয়। মূলত অ্যানড্রুজ, দাশ. সেনগুপ্ত এবং স্বেচ্ছাসেবীদের অকৃপণ সাহায্য ও কুলিদেব দুঃখবরণ ধনতন্ত্রেব একটা কুৎসিত দিক জনসমক্ষে তুলে ধবল। কিন্তু গান্ধীবাদীরা, বিশেষত পদমবাজ জৈন প্রমুখ মারোয়াড়ীরা, আপত্তি জানাতে গান্ধী ইয়ং ইন্ডিয়া পত্রিকায় (২৫ জুন ১৯২১) 'আসামের শিক্ষা' শীর্ষক এক প্রবন্ধে লিখলেন, "আমরা ধন বা ধনিকদের ধ্বংস করতে চাই না, ধনিক ও শ্রমিকদেব সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করতে চাই। সহানুভূতি দেখানোর জন্য ধর্মঘট চালানো মূর্খতা হবে।" বেশ বোঝা যায় অসহযোগ আন্দোলনে শ্রমিক ধর্মঘট প্রয়োগ করতে তিনি অরাজি। কলকাতার এক সভায় (১১ সেপ্টেম্বব ১৯২১) তিনি তা বলেনও।

গান্ধীর অছিতত্ত্ব (trusteeship)-কে উপহাস করা হয়। কিন্তু গান্ধীব তত্ত্বেব পেছনে

একটা বাস্তববোধ কাজ করছিল। তিনি মনে করতেন বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে কোনো ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের বাদ দিয়ে চলতে পারে না। তিনি বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রবক্তা বা অর্থদাস ছিলেন বা তাদের চাঁদা ছাড়া কংগ্রেস চলত না—এ ধরনের সিদ্ধান্ত ইতিহাসের অতি সরলীকরণ। শিল্পপতিরা মনে করতেন গান্ধী একমাত্র নেতা যিনি উগ্র বামপন্থা থেকে কংগ্রেসকে রক্ষা করতে পারবেন। তার চেয়েও বড় কথা, গণতান্ত্রিক কংগ্রেসের সাহায্য ছাড়া ব্রিটিশ মূলধনের পুনরাক্রমণের হাত থেকে বাঁচা যাবে না। যুদ্ধের পর এর প্রস্তুতি চলছিল, ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত Associated Chamber of Commerce-এর মাধ্যমে। ১৯২৭ সালে FICCI প্রতিষ্ঠার পূর্বে দেশী ধনতন্ত্রের নিজস্ব কোন শক্তিশালী সংগঠন ছিল না।[১০৭] তাই কংগ্রেসের দিকে বিড়লার মত কিছু নয়া শিল্পপতি (যিনি ব্রিটিশব্যূহ ভেদ করে পাটের ব্যবসায় নেমেছিলেন) এগিয়ে ছিলেন। শাসককুলও বসে ছিল না। কংগ্রেস থেকে এদের সরিয়ে নেবার জন্য সরকার সুযোগ সুবিধা দেন এবং সেসব পেতে ব্যাকুল কিছু শিল্পপতির সাড়াও মেলে। উদাহরণ—দোরাবজি টাটা, ইব্রাহিম রহিমতুল্লা, কাওয়াসজি জাহাঙ্গীর ও টাটার সঙ্গে জড়িত তুলাব্যবসায়ী পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস। টাটার প্রভাবে ঠাকুরদাস ১৯২০ সালে 'অসহযোগ বিরোধী সমিতি' স্থাপন করেন। 'The Story of Tata Steel' গ্রন্থে ভেরিয়ার এলউইন দেখিয়েছেন নানা সমস্যায় জর্জরিত টাটাদের উপায় ছিল না। বস্তুত অসহযোগের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বড় বণিক ও শিল্পপতির কাছ থেকে আসেওনি। বিশের দশকে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে হয় তাঁরা নির্দল না হয় লাজপৎ-মালব্যের ন্যাশনালিস্ট পার্টির প্রতিনিধিরূপে আসেন।[১০৮] তবে লৌহশিল্প সংরক্ষণ, ভারতীয় বস্ত্রের ওপর উৎপাদন শুল্ক, মুদ্রামান, উপকূলবাহী জাহাজ পরিচালনার কর্তৃত্ব প্রভৃতি বিষয়ে দেশী ও ব্রিটিশ ধনিকদের মধ্যে বিরোধ ক্রমশ প্রকট হতে থাকে। মোট কথা, কংগ্রেসকে সাহায্য করার ব্যাপারে মনের দিক থেকে মার্কেন্টিলিস্ট ভারতীয় ধনিকরা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। সকলের দূরদৃষ্টি বিড়লার মত ছিলও না। রজতকান্ত রায় তাঁর ও অম্বালালের সঙ্গে গান্ধীর গুরু-শিষ্যের আধ্যাত্মিক সম্পর্কের ওপর অযথা জোর দিয়েছেন।

গান্ধী কৃষক বিদ্রোহেরও বিরোধী ছিলেন। উত্তরপ্রদেশের কথা ধরা যাক। ১৯২১ সালে (৬ মার্চ) তালুকদারদের উদ্দেশে স্থানীয় লাট হারকোর্ট বাটলার বলেছিলেন, "আপনারা দক্ষিণ অযোধ্যার তিনটি জেলায় সম্প্রতি বিপ্লবের মতো কিছুর আরম্ভ লক্ষ্য করে থাকবেন...." 'বিপ্লব' শব্দটি নিরর্থক নয়। এম. এইচ. সিদ্দিকি[১০৯], জ্ঞান পাণ্ডে,[১১০] কপিলকুমার[১১১], পিটার রীভস্,[১১২] ডব্লু এফ ট্রুলি,[১১৩] ধনাগারে[১১৪] ও নেহরুজীবনী রচয়িতা এস গোপাল[১১৫] প্রমুখ অনেকেই উত্তরপ্রদেশের কৃষক আন্দোলন নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন।

মূলকথাটা সংক্ষেপে বলেছিলেন বড়লাট রিডিং।[১১৬] তাঁর মতে মালিকরা হারানো জমি উদ্ধারের আশায় এবং নিম্নবর্ণের শ্রমিকরা চাষের জমি পাবার আশায় কিষাণ আন্দোলনের শামিল হয়েছিল। তাদের বিশ্বাস হয়েছিল গান্ধীমহারাজ তাদের জমি উদ্ধার করে দেবেন বা পাইয়ে দেবেন। এখানে ধনী কৃষকদের সংখ্যা ছিল ২৫%, মাঝারি কৃষকদের-২১% ও দরিদ্র কৃষকদের-৪৫%-এর কিছু বেশি। দখলদার রায়তদের সংখ্যা ছিল মাত্র ২%। একদা যাদের জমিজমা ছিল তারা বাণিজ্যিক কৃষি প্রসার ও জমির বাজারের উদ্ভবের ফলে নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। যৌথ জোত ভেঙে যাচ্ছিল ; একক জমিদারী প্রথার জন্ম হচ্ছিল ; রাজস্বের হার অত্যধিক ছিল বলে ঋণভার বাড়ছিল : ঋণশোধ করতে তালুকদার ও

মহাজনের হাতে জমি চলে যাচ্ছিল ; লাখেরাজ (মুয়াফি) জমি সবকার বাজেয়াপ্ত করছিল ; বড় জমিদারদের প্রতিনিধি (করিন্দা) বা ঠিকাদাররা অত্যাচার করছিল। প্রজাদের অসন্তোষের প্রধান কারণ ছিল—অতিরিক্ত খাজনা (rent), নজরানা, বেগার ও অন্যায় কর (তালুকদার হাতি বা মোটর চাপতেন আর খরচ তুলতে 'হাতিওয়ানা', 'মোটবওয়ানা' চাপাতেন), শস্যে দেয় খাজনার বদলে অর্থে দেয় খাজনার প্রবর্তন এবং সর্বোপরি কথায় কথায় বেদখলি। খাজনা বেশি দিতে গিয়ে গমের চাষ করতে হচ্ছে, মোটা দানা শস্যের চাষ কমাতে হচ্ছে, অথচ যুদ্ধের ফলে মোটা শস্যের দাম বাড়ছে বলে খাদ্যে টান পড়ছে। এ সব সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে জাতপাতের সমস্যা। উঁচু জাতের ব্রাহ্মণ-ঠাকুর প্রজা ও নিচুজাতের কুর্মি-মুবাও প্রজার জমি নিয়ে রেষারেষি বাড়ছিল। আহির, চামার, পাসি প্রভৃতি আরও নিচু জাত জমির দিকে হাত বাড়াচ্ছিল। প্রতাপগড়েব মত বিদ্রোহী অঞ্চলে ১৯২১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী মাত্র ৬·৬৬% রাজপুত ৯০% জমিব ওপব কর্তৃত্ব কবত। আব একটা রেষারেষির কাবণ—উঁচু জাতের চাষীরা নিচু জাতের চেযে খাজনা দিত কম হারে। যুদ্ধের পরবর্তীকালে উত্তরপ্রদেশের গ্রামাঞ্চল নানা দ্বন্দ্বের ফলে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছিল।

কিষাণ আন্দোলনেব দুটি ধারা ছিল। একটি ধাবা ওপর থেকে চাপানো। তাব নেতা ছিলেন কে ডি মালব্য ও পুরুষোত্তমদাস ট্যান্ডন। এদের সঙ্গে হোমরুল আন্দোলনের যোগ ছিল এবং শেষপর্যন্ত তাঁবা নতুন সংস্কার মেনে নিয়ে নির্বাচনী রাজনীতির দিকে ঝোঁকেন।

দ্বিতীয় ধারা প্রতাপগড ও রাযবেবিলির কুর্মি-মুরাও কৃষকদের মধ্যে থেকে উদ্ভূত। তাদের নেতা ছিলেন ঝিঙ্গুরি সিং, পরে বাবা রামচন্দ্র। জাতপাতের ঐক্যকে কাজে লাগান তাঁরা। এই ধাবার কিষাণরা ঘোষণা কবে—"আমবা গান্ধী ও সরকারেব পক্ষে।" গান্ধীর রামরাজ্যের কল্পনা তাদের উদ্দীপ্ত কবেছিল (অবশ্য বাবা বামচন্দ্রেব মাধ্যমে), তাদের 'নারা' তাই ছিল সীতারাম। রামরাজ্য বলতে তারা বুঝত ন্যাযের রাজ্য এবং সবকারের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা প্রথম পর্যায়ে লক্ষ্য কবা যায় না।[১১৭] ১৯১০-এর জুনে রামচন্দ্র এলাহাবাদে এসে জওহরলালের সঙ্গে দেখা কবে কিষাণদের দুঃখ দুর্দশাব কথা তাঁকে জানান ও সাহায্য চান।[১১৮] আগস্টে পুলিশ রামচন্দ্রকে গ্রেফতার কবলে বিপুল অহিংস প্রতিরোধের ব্যবস্থা হয় এবং রামচন্দ্রকে ছেড়ে দিতে হয। নেহরু, গৌরীশঙ্কর, মাতাবদল ও রামচন্দ্র প্রতাপগড়ে অযোধ্যা কিষাণ সভার পত্তন করেন (১৭ অক্টোবব ১৯২০)। বোঝা যায় তাঁরা নরমপন্থী ইউ পি কিষাণ সভার সঙ্গে আলাদা হতে চাইছেন। তবে ১৯২০-এর ডিসেম্বরে কিষাণ জমায়েতে যে চৌদ্দ দফা দাবি গৃহীত হয় তাতে হিংসার উল্লেখ ছিল না। কৃষকরা বিনা টিকেটে রেলে চড়ে ও রেলপথ অবরোধ করে প্রতিবাদ জানাচ্ছিল। জানুয়ারি (১৯২১)-তে হঠাৎ রায়বেরিলিতে পাসি ও ফকিররা হাটবাজার লুটে মদৎ দেয়। মুন্সিগঞ্জ, ফুরসৎগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে পুলিশ গুলি চালায়। বিভাগীয় কমিশনার হেইলি ব্রাহ্মণ-ঠাকুর জাতের ছোট মালিক ও কৃষকের ওপর আহির, চামার, লুনিয়া শ্রেণীর ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকের আক্রমণ আশঙ্কা করছিলেন।[১১৯] তাই ঘটে। রামচন্দ্রকে গ্রেফতার করা হলে ও তালুকদাররা আত্মরক্ষার্থ 'আমন সভা' স্থাপন করলে (পুলিশ তো ছিলই) বিদ্রোহ প্রশমিত হয়।

সিদ্দিকির মতে কিষাণদের মনে আত্মকর্তৃত্ব (autonomy) লক্ষ্য কবা যায না ; পুরাতন চিন্তাধারাই কাজ করছিল। ঠাকুরদিন সিং ও বাবা জানকীদাসেব হিংসাত্মক কাজ তিনি হব্‌স্‌বম্‌-কথিত 'সামাজিক দস্যুতা' (social banditry)-র কোঠায় ফেলতে চান। পাণ্ডের মতে কংগ্রেসী নেতারা কিষাণদের দাবিদাওয়া জাতীয়তাবাদী কর্মসূচির সঙ্গে মেলাতে পারেননি। গান্ধী ও নেহরু জমিদার-কিষাণ ঐক্য ও অহিংসার ওপব অযথা জোর

দিয়ে গেছেন। ফৈজাবাদে (১৯২১, ১০ ফেব্রুয়ারি) গান্ধী বাববার বলেন, "আমরা জমিদারদের সঙ্গে লড়তে চাই না…জমিদাররাও ক্রীতদাস। আমরা তাদের অনিষ্ট চাই না।"[১২০] সামাজিক বযকটেও তাঁর আপত্তি ছিল। পাণ্ডে বলছেন, গান্ধীর ঘোষণা শ্রেণী শোষণ ব্যবস্থা সমর্থন করেছিল। অন্যদিকে, যদিও কৃষকরা প্রথমে ভাবত কেউ রাজত্ব, কেউ বা দাসত্ব করার জন্য সৃষ্ট হয়েছে, পরে তাবাও ভাবতে শুরু করে যে শোষণ-প্রতিরোধে তাদের নৈতিক অধিকার রযেছে। ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক প্রতিরোধ ও রাজনৈতিক সংগ্রাম মিলে যাচ্ছিল।

বাংলার আন্দোলনের জন্য স্বেচ্ছাসেবী দল কিছু কৃতিত্ব দাবি করতে পাবে।[১২০ক] তাঁদের মধ্যে অনেকেই 'যুগান্তব' দলভুক্ত বিপ্লবী। ১৯২২-এ তাঁবা কংগ্রেসেব আটটি জেলা শাখা পবিচালনা কবতেন। দাশের নির্দেশানুযায়ী তাঁবা কৃষক ও শ্রমিক যুনিযান গঠনে হাত দেন। তবে শহরে কেরানি ও ছাত্রদেব বাইরে এঁদের বেশি প্রভাব ছিল না। তবু হাওডায় দাঙ্গা হয, কলকাতায দীর্ঘদিন ট্রাম ধর্মঘট চলে, বোম্বাই'তে যুবরাজ পদার্পণ কবলে পূর্ণ ও সফল হরতাল ডাকা হয়। ২৪ ডিসেম্বব (তাঁর কলকাতায় আগমনেব দিন) শান্তি বজায় বাখতে বাংলা সবকাব কংগ্রেস ও খিলাফতী স্বেচ্ছাসেবীদের ব্যাপক ধবপাকড শুরু কবে। দাশ ও তাঁর সহকর্মীবা অনেকেই গ্রেফতাব হন। মহিলাদেব দলে দলে যোগদান আন্দোলনে একটা নতুন আযতন আনে। তাঁদের নেতৃত্ব দেন দাশের সহধর্মিণী বাসন্তী দেবী।

১৯২১-এর নভেম্বর থেকে মফস্বলেব অনেক স্থানে আন্দোলন হিংসাত্মক রূপ নেয। মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানির অধীন ঝাড়গ্রাম, বাজশাহী ও মুর্শিদাবাদেব জমিদাবীতে আদিবাসীবা দাঙ্গা বাধায, হাট ও মাছেব ভেড়ি লুঠ করে, বনসম্পদেব ক্ষতিও কবে। রাজশাহীতে সোমেশ্বব চৌধুবী 'উটবন্দী' প্রজাদের পক্ষ নিযেছিলেন। তমলুক ও কাঁথিতে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল (জুডিথ ব্রাউনেব নমঃশূদ্র নয, মাহিষ্য)-এব যোগ্য নেতৃত্বে যুনিযন বোর্ডেব জন্য বর্ধিত চৌকিদাবী কব বন্ধ কবাব ডাক আসে। বীবেন্দ্রনাথ পূর্ব মেদিনীপুবেব বরেণ্য মুখপাত্র হযে উঠেছিলেন। জাতিগত পেশা ছেড়ে আইনে কৃতিত্ব দেখিযে এলিটদেব ও ১৯১৯-২০-ব বন্যাত্রাণ কার্যে জনগণেব প্রিয় হন তিনি। ১৯২১-এ বি. পি. সি. সি. সম্পাদক পদ তাঁকে রাজনৈতিক মর্যাদাও দিল। গান্ধীর ডাকে নেমেছিলেন তিনি রাজনীতিতে, মহেন্দ্রনাথ মাইতি ও শ্রীনাথ দাশের মত উকিল এবং নিকুঞ্জবিহাবী মাইতি ও প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত শিক্ষকসহ। প্রথমে গান্ধীর গঠনমূলক কর্মসূচি প্রচার, পবে জাতীয় বিদ্যালয় ও সালিশ বোর্ড স্থাপন ছিল এঁদের কাজ। ১৯২১ সালে যুনিযান বোর্ড চালু হলে তাই হয আক্রমণের লক্ষ্য। দফাদার ও চৌকিদাবদেব কাজের জন্য দাযী হলেও যুনিয়ান বোর্ড তাদের চাকুরি দিতে বা বরখাস্ত করতে পারত না। অথচ তাদেব মাইনে বা অন্যান্য কাজেব জন্য টাকা তুলতে বাড়ির মালিক বা ভাডাটেদেব ওপব বাৎসবিক অ্যাসেসমেন্ট বাড়াবার ক্ষমতা ছিল বোর্ডের। চৌকিদারী কর ৫০% বাড়িযে যুনিযান বোর্ড গঠিত হয়। তারই বিরুদ্ধে শাসমলের আন্দোলন। বি· পি· সি· সি· বা এ· আই· সি· সি· সম্মতি দেয়নি কিন্তু তা অসম্ভব জনপ্রিয় হয়—বিশেষত কাঁথিতে। সামাজিক বয়কটের চাপে বোর্ডের বহু সভ্য ও চৌকিদাররা ইস্তফা দিতে থাকে। কর অনাদায়ে বাজেয়াপ্ত অস্থাবর সম্পত্তি কেনার জন্য এগিযে আসে না কেউ। শেষে কর্মচারীদের পরামর্শে ১৭ ডিসেম্বরের এক নির্দেশে যুনিয়ান বোর্ডই তুলে দিতে হয়। এই আন্দোলন সফল হয় নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয় অধিবাসীদের সমস্বার্থ ও জাতেব ঐক্যেব জন্য। তাদেব অধিকাংশই ছিল মাহিষ্য।[১২০খ] খিলাফৎ প্রভাব চরমে ওঠে কুমিল্লায়; ওয়াহাবি-ঐতিহ্য কাজ করছিল

রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর ও বীরভূমে। কোথাও সেটেলমেণ্টের কাজ, কোথাও বনবিভাগের কাজ, কোথাও বা চৌকিদারী কর প্রতিরোধের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। বজত রায়ের মতে রংপুর, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামে মুসলিম সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র মালিক ও বড চাষীর প্রাধান্য সংহতি এনেছিল।[১২১] সুগত বসু নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় দেখেছেন (১) কৃষক সংহতি ; (২) ফেরাজী ঐতিহ্য এবং (৩) জমিদার ও মহাজনের মধ্যে ঋণঘটিত সম্পর্ক। যুদ্ধজনিত অভাবের জন্য বাজার ও চাল্এর গুদাম লুঠ হয়, গ্রামীণ ফড়ে ও মহাজনদের ওপর হামলা চলে। পরে চাষীরা কর ও খাজনা বন্ধ করতে চায়।[১২২]

অন্যদিকে সুমিত সরকারের মতে ১৯২১-২২ সালেব বাংলার আন্দোলনেব সঙ্গে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রভৃতি অর্থনৈতিক কারণের বিশেষ কোনো যোগ ছিল না। বরং ধানের ফলন খুব ভাল হয়েছিল ও কাঁচা পাটের দাম বাডছিল। ধান ভাল হওয়ায় কাঁথি অঞ্চলের কৃষকরা লাভবানই হচ্ছিল।[১২৩] এ সব বিতর্ক অনেকটা ফরাসী বিপ্লব কেন হল— দারিদ্র্য না সম্পদবৃদ্ধির ফলে— সেই ধরনের বিতর্ক। কোনও রাজনৈতিক আন্দোলনকে তাৎক্ষণিক কোন কারণ, এমনকি আর্থিক কারণ, দিয়ে ব্যাখ্যা করা অসমীচীন। প্রমাণ দেওয়া যায় 'সাব অলটার্ন' ঐতিহাসিক স্বপন দাশগুপ্তের জঙ্গলমহল এবং সমীপবর্তী বাঁকুড়া ও সিংভূমে ১৯২১-২৩-এর আন্দোলনের বিশ্লেষণ থেকে।[১২৪] তিনি এর পেছনে দেখেছেন আদিবাসী চৈতন্যের স্ফুরণ। ১৯২২-এ গান্ধীব কারাদণ্ডের পর এই অঞ্চলে কংগ্রেসী নেতৃত্ব ছিল না। আদিবাসীদের মনে 'দিকু' বা বহিরাগতদের সম্পর্কে একটা বিরূপতা অনেকদিন ধরে জমে ছিল। তাতে ইন্ধন যোগায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি। কাপড়ের দাম দুই থেকে তিন গুণ বাডে। তদনুপাতে গরীব আদিবাসীদেব ঋণের পরিমাণও বাডে। বিদ্রোহ গ্রামে (১৯১৮) হাট লুঠেব রূপ নেয। ১৯২১ সালে চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁর সহকর্মী সাতকড়িপতি রায়কে আন্দোলন সংগঠন করতে মেদিনীপুর পাঠান। প্রথমে সাহেবি কর্তৃত্বাধীন মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানিব বিরুদ্ধে অভিযান ও আদিবাসী কুলি ধর্মঘট দিয়ে শুরু হয়ে শেষে তা যুনিযান বোর্ড ও চৌকিদাবী কব বিরোধিতায পর্যবসিত হয।

কলকাতায যুবরাজের আগমন উপলক্ষে উত্তেজনা বাডে। সরকাবী দমননীতির প্রতিবাদে দাশ জেল-ভরো নীতির আশ্রয় নিলেন।[১২৫] তিনি জেলে যাবার পর ত্রিপুবা, চট্টগ্রাম, ঝাডগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে অবস্থা প্রায় আয়ত্তের বাইরে চলে যায। প্রদেশ কংগ্রেস এটা পছন্দ কবেনি। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তর ভয ছিল পূর্ববঙ্গে ক্রমবর্ধমান ব্রিটিশবিদ্বেষ যে কোন সময় হিন্দুবিদ্বেষে পরিণত হবে এবং জমিদার, ব্যবসায়ী, মহাজন সবাই বিপন্ন হবে।[১২৬] বি· পি· সি· সি· কার্যনিবহী কাউন্সিলের মত উপেক্ষা কবেই শাসমল য়ুনিয়ান বোর্ডের বিরোধিতা করেন। জেলা নেতাদের নির্দেশ অমান্য করেই মেদিনীপুরের নিম্নবিত্ত চাষীবা চৌকিদারী কর, এমনকি খাস জমির খাজনা দেওয়া বন্ধ করেছিল। বেগতিক দেখে স্থানীয় জোতদার ও সম্পন্ন কৃষকরা রাশ টেনে ধরে। ঝাডগ্রামেব সাঁওতাল কারুর কথা শুনত না। জেমস পেড়ির 'ট্যুর ডায়েরি'তে জনতার হাতে তাঁর নিগ্রহের অনেক বর্ণনা আছে। রংপুরের প্রজারা কাশিমবাজারেব মহারাজকে বলে তিনি রাজস্ব দিতে থাকলে তারাও খাজনা দেবে না।[১২৬ক] অর্থাৎ বারদোলি প্রস্তাব পাস না হলে বাংলার গ্রামাঞ্চলে খাজনা বন্ধ ঠেকানো শক্ত হত।

বিহারের চম্পারন, মজঃফরপুর প্রভৃতি অঞ্চলে কাছারি ও সরকাবী ঘরবাডি ভারতের জাতীয় সম্পত্তি বলে ঘোষণা করা হয় এবং কর্মচারীদের উর্দি সমর্পণ করতে আদেশ দেওয়া হয়। স্থানে স্থানে কর দেওয়াও বন্ধ হল। স্বরাষ্ট্র বিভাগের ক্রেইকের ভয় হয় গান্ধী স্বর্ণযুগ

আনবেন এমন ধারণা বাড়লে ব্রিটিশ রাজত্ব নিশ্চিহ্ন হবে।[১২৭] মুখ্য সচিব হ্যামণ্ডের চিঠিতে পড়ি ত্রিহুত বিভাগে রাজদ্রোহী সভাবিরোধী আইন চালু করতে হয়। ধোপাবা সাহেবদের কাপড় ধুত না। এমনকি সাহেবি পোশাক পরা লোকদের ঘোড়া গাড়িতে চড়াও বন্ধ হয়ে যায়। মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে পিকেটিং বিহার আন্দোলনের অন্যতম বিশেষত্ব।

পঞ্জাবে অসহযোগ আকালি আন্দোলনের রূপ নেয়। সেখানে গুরুদ্বারসমূহের প্রচুর সম্পত্তির ওপর দুশ্চরিত্র ও লোভী মোহান্তদের আধিপত্য নিয়ে শিখদের মনে অনেকদিন ধরেই ক্ষোভ জমছিল। ১৯২১-এব ১৩ এপ্রিল মণ্টেগুকে রিডিং লিখছেন, "The real quest is not the holy faith but the revenues derived from the Shrines." অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে সরকার-নিযুক্ত মোহান্ত অরুর সিং জেনারেল ডায়ারকে শিখপন্থের সাম্মানিক সদস্য হবার জন্য আহ্বান জানিয়ে পঞ্জাবের আহত পৌরুষকে জাগিয়ে তোলেন। ১৯২১-এর ২০ ফেব্রুয়ারি নানকানায় প্রায় একশত আকালি সত্যাগ্রহী মোহান্তর রক্ষীদের হাতে নিহত হলে এবং স্বর্ণমন্দিরের কোষাগারের চাবির দাবি প্রত্যাখ্যাত হলে আকালিরা দলে দলে গ্রেফতার বরণ করে। এদেব অধিকাংশই ছিল পঞ্জাবের জাঠ চাষী এবং নেতৃত্ব দেয় শিরোমণি আকালি দল ও এস· জি· পি সি সরকার বাবা খবক সিং এর হাতে তোষাখানার চাবি সমর্পণ কবে গোলমাল ঠেকায়। কিন্তু 'বাব্বর খালসা' নামক উপদল শেষপর্যন্ত সন্ত্রাসেব পথ নেয়। ১৯২৫-এর আইনবলে গুরুদ্বাবেব ওপর S.G.P.C.-র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত আকালি আন্দোলন চলেছিল। পবে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে তাব যোগসূত্র শিথিল হয়ে যায়।[১২৭ক]

গুজরাটের বারদোলি তালুকায় আন্দোলনের আর এক রূপ দেখি। কৃষ্ণদাসের Seven Months with Mahatma Gandhi প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। এখানে পটিদাবদের শ্রেণীগত স্বার্থ ও অহিংসানীতির মধ্যে কোনও বিরোধ দেখা দেয়নি। কঠোর শৃঙ্খলা না থাকলে নিম্নজাতের বা উপজাতি শ্রমিকরা ('কালিপবজ') হিংসার পথ নিতে পারত। খেড়ায় বরাইযাদের মধ্যে গোলমাল দেখা দিয়েছিল।

মাদ্রাজের আন্দোলন দ্বিধাগ্রস্ত বিজয়রাঘব আচারিযার হাত থেকে রাজগোপাল আচারিয়ার হাতে চলে যায়। এক তৃতীয়াংশ উকিল বৃত্তি বর্জন করলেও ৯২টির বেশি জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়নি। রাজধানীর বাকিংহাম কার্নাটিক মিল ও মাদুরার হার্ভে মিল কেন্দ্র করে শ্রমিক অসন্তোষ তীব্র হয়ে ওঠে। নেতৃত্ব দেন সিংগার ভেলু চেট্টিয়ার। ১৯২১-এর পুনে 'আদি দ্রাবিড়' নামের অস্পৃশ্য জাত ব্রিটিশ মালিকদেব পক্ষ নিলে উচ্চজাত ও খিলাফতী শ্রমিকদের সঙ্গে তাদের দাঙ্গা বাধে। চেট্টিয়ার কংগ্রেসী ও উদারপন্থী নেতাদের সমর্থন না পেয়ে সাম্যবাদের দিকে ঝোঁকেন। মাদ্রাজে প্রাধান্য পায় মাদক-বর্জন আন্দোলন। গোঁড়া ব্রাহ্মণ এবং গৌণ্ডার ও নাদার প্রভৃতি উঠতি নিচু জাত মাদকের বিরোধিতা করছিল।[১২৮] সরকার লাইসেন্স-কর বাড়ালে বিক্রেতাবাও প্রতিবাদের শামিল হয়। সরকারের মোট আয়ের পঞ্চমাংশ মাদক শুল্ক থেকে আসত, তাই পিকেটিং বন্ধ করতে সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল।[১২৯] ছোটলাট উইলিংডন জাস্টিস পার্টির সহায়তায় তা কিছুটা করেওছিলেন। রাজাগোপালাচারি বুঝতেন বিপক্ষ দলকে জব্দ করতে গেলে বয়কট চালিয়ে যেতে হবে। তাঁর বিপক্ষদলে ছিলেন রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার, সত্যমূর্তি ও শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার। এঁরা পরে স্বরাজ দলে যোগ দেন।

অন্ধ্রের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন ডুগ্গিরালা গোপালকৃষ্ণায়া, কোণ্ডা ভেঙ্কটাপ্পায়া, টি· প্রকাশম্, পট্টভি সীতারামায়া প্রমুখ। এঁদের পেছনে বণিক ও মাঝারি কৃষকদের সমর্থন

ছিল। ম্যুনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হলে করভার বাডবে বলে গুন্টুরের চিরলা-পারালা গ্রামের সকল অধিবাসী গ্রাম ছেড়ে নতুন এক বাসভূমির পত্তন করে। ১৯২১ ডিসেম্বর ও ১৯২২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে উপকূল এলাকায় খাজনাবন্ধ আন্দোলন জোরদার হয়। দলে দলে গ্রামীণ কর্মচারীও পদত্যাগ করে। এম· বেঙ্কটরঙ্গিয়ার **Freedom Struggle in Andhra Pradesh** গ্রন্থে দেখি গুন্টুরের জনৈক গ্রামবাসী বলছে, "গান্ধীস্বরাজ আসবে শোনা যাচ্ছে এবং আমাদের আর কোন কর দিতে হবে না।" ঝাডগ্রামের সাঁওতালদেব মত অন্ধ্রের পাহাডী উপজাতির লোকরা গরীব চাষীদের সঙ্গে মিলে বনবিধি লঙ্ঘন করতে থাকে। গান্ধীবাদী বেঙ্কটাপ্পায়া সামাজিক বয়কটের বেশি যেতে রাজি ছিলেন না। গুণ্ডেনরাম্পা পাহাডী জাতির নেতৃত্ব দেন সীতারাম রাজু। ডেভিড আরনল্ডের মতে পাহাড়ীদের সঙ্গে নিম্নভূমির লোকদের চিরন্তন বিবাদ, তাদের পরিস্থিতিগত সঙ্কীর্ণতা ও বাইরের লোক সম্বন্ধে আশঙ্কা বিদ্রোহকে স্তিমিত করে দেয়।[১৩০]

গান্ধীমহারাজেব ডাকে সারা ভারতে যে আবেগের বন্যা বয়ে গিয়েছিল তার পেছনে ছিল এক ন্যায়ের রাজ্য আবির্ভাবের আশা। মালাবারের মোপলা (বা মাপিলা) -অধ্যুষিত অঞ্চলেও তার ঢেউ লেগেছিল। কিন্তু ওখানকার সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি একটু জটিল ছিল। হিন্দু জেন্‌মি ও মহাজনদের অত্যাচারে মুসলিম প্রজারা (অধিকাংশই খাতক) অতিষ্ঠ হযে উঠেছিল। উনিশ শতকের আগেও তাদের মধ্যে একটা সংগ্রামী মনোভাব লক্ষিত হয়, যা বাংলার ওয়াহাবি-ফেরাজী আন্দোলনের সঙ্গে তুলনীয়। খিলাফৎ আন্দোলন এতে ইন্ধন যোগায়।[১৩১] খিলাফতী ইয়াকুব হাসান গ্রেপ্তাব হলে সুপ্ত আক্রোশ গিয়ে পড়ে রাষ্ট্রীয শক্তির প্রতীক পুলিশদের ওপর। বহু অঞ্চলে খিলাফতী সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হয়। রিডিং ভারতসচিবকে লিখেছিলেন, "গেরিলা যুদ্ধের প্রণালীতে প্রায় দশ হাজার লোক লড়াই কবছে।"[১৩২] প্রথমে সদয় হিন্দু জেন্‌মি বা দরিদ্র হিন্দুদের ওপর আক্রমণ করা হয়নি। মাপিলা নেতা—কুনহাম্মেদ হাজি এদিকে বিশেষ লক্ষ্য দিতেন। পরে হিন্দু জমিদার-মহাজন আক্রান্ত হওয়ায লডাইটা সাম্প্রদায়িক চেহারা নিল। কিন্তু কংগ্রেসের অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও সরকার তার কোনও প্রতিনিধিকে ঐ এলাকায় যেতে দেননি।[১৩৩] প্রায় ছয়শত হিন্দু নিহত হয ও আড়াই হাজার হিন্দুকে বলপূর্বক ধর্মত্যাগে বাধ্য করা হয়। শেযে কঠোর হস্তে সরকাব মোপলা বিদ্রোহ দমন করেন।

হিংসার এই উলঙ্গ, ব্যাপক প্রকাশে বাজাজী অসহযোগ বন্ধ করে দেবার কথা ভেবেছিলেন।[১৩৪] গান্ধীও শঙ্কিত হন।[১৩৫] গুন্টুবে তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও আইন অমান্য শুরু হয়।[১৩৬] এর পূর্বে দু দুবার[১৩৭] বারদোলির আইন অমান্য আন্দোলন পিছিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। যখন আবার তিনি বারদোলিতে আইন অমান্যের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন তখনই (৬ ফেব্রুয়ারি ১৯২২) শোনা গেল গোরক্ষপুবেব চৌরিচৌরায় জনতা বাইশজন পুলিশকে পুড়িয়ে মেরেছে। এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে গান্ধীস্বরাজেব স্বরূপ সম্বন্ধে জনসাধাবণের ধারণা পরিষ্কার ফুটে উঠেছে।[১৩৮] যদিও চৌরিচৌরায় তাদের নেতা ভগবান আহিরকে বেত্রাঘাতে জর্জরিত করে ও থানার সম্মুখে সমবেত জনতার ওপর গুলি চালিয়ে পুলিশ যথেষ্ট প্ররোচনা দিয়েছিল, তবু কংগ্রেসী স্বেচ্ছাসেবীদেব হিংসাত্মক কাজ বরদাস্ত করতে গান্ধী রাজি ছিলেন না। তখনই তিনি বারদোলি আন্দোলন প্রত্যাহার কবলেন। ১৯২২-এর ১২ ফেব্রুয়ারি ওয়ার্কিং কমিটি গণ সত্যাগ্রহ স্থগিত রেখে গঠনমূলক কর্মধারা, এক কোটি সদস্য সংগ্রহ, জাতীয় বিদ্যালয় এবং পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠা ও মাদক বর্জন প্রভৃতি গঠনমূলক প্রস্তাব গ্রহণ করল। অর্থাৎ গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত প্রথম আন্দোলনের ওপর যবনিকা

নেমে এল। বিমূঢ় জওহরলালকে গান্ধী লিখলেন, "The cause will prosper by this retreat. The movement had unconsciously drifted from the right path. We have come back to our moorings."[১৩৯]

॥ ৭ ॥

দাশের মত প্রবীণ ও জওহরলালের মত নবীন অনেক নেতাই বারদোলিতে গৃহীত প্রস্তাব মেনে নিতে পারেননি। এমনকি গান্ধীর পুত্রাধিক শিষ্য ও সচিব মহাদেব দেশাই লিখছেন, তিনি সম্পূর্ণ বিমূঢ়।[১৪০] গোয়েন্দা দফতরেব প্রতিবেদনে দেখি মহারাষ্ট্রের নেতা কেলকার বারদোলি অধিবেশনে তীব্র আপত্তি জানিয়েছিলেন।[১৪১] জেল থেকে লাজপৎ রায় লিখেছিলেন, "...We are simply routed"; মহম্মদ আলি— "Synonymous with surrender." দিল্লীর এ আই সি সি সভায় মুঞ্জে মন্তব্য করেছিলেন, "দেশের সম্মান ও গৌরব নিয়ে নেতারা ছিনিমিনি খেলছেন এবং বারদোলি প্রস্তাব তাঁদের অধঃপতনের গভীরতম সীমায় নামিয়েছে।"[১৪২] দাশ স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, এটা 'bungling'-এর নিদর্শন।

দাশের বিরক্তির কারণ ছিল। ১৯২১-এর ডিসেম্বর যুবরাজের কলকাতা আগমনের পরিপ্রেক্ষিতে রিডিং যে গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাব দেন, দাশ তার থেকে অনেক কিছু আশা করেছিলেন। গান্ধী টালবাহানা করায় এবং কয়েকটি অগ্রহণীয় পূর্বশর্ত আরোপ করায় বড়লাট প্রস্তাব তুলে নেন। দাশের মন্তব্য সুভাষচন্দ্র উদ্ধৃত করেছেন Indian Struggle গ্রন্থে। দাশ নাকি বলেছিলেন, "The chance of a life time had been lost..." লন্ডনের গান্ধীবক্তৃতায় (১৯৭৪)[১৪৩] আমি দেখিয়েছি দাশের আশার ভিত্তি খুব দুর্বল ছিল। যুবরাজের কলকাতা আগমন কালে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে রিডিং সে জন্য চেয়েছিলেন আন্দোলন স্থগিত হোক। মালব্য গোলটেবিল বৈঠকেব প্রস্তাব দিলে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস সম্বন্ধে মালব্যকে এক উড়ো আশা দিয়েছিলেন তিনি। অন্তত মালব্য তাই ভেবেছিলেন। স্তম্ভিত ভারতসচিবকে আশ্বস্ত করতে তিনি ১৮ ডিসেম্বর যে তারবার্তা পাঠান তাতে ডোমিনিয়ান সুদূর পরাহত লক্ষ্য বলে বর্ণিত হয়েছে। আপসের জন্য সদাব্যাকুল নরমপন্থী মালব্য সে বার্তা আলিপুর জেলে দেশবন্ধুর কাছে পৌঁছে দেন। তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন আজাদ ও সুভাষ। তাঁরা গান্ধীকে ১৯ ডিসেম্বর (১৯২১) ও মালব্য গান্ধীকে ২০ ডিসেম্বব (ঐ) এ বিষয়ে অবহিত করলে গান্ধী বৈঠক চলাকালে আন্দোলন স্থগিত রাখতে অস্বীকার করেন, তা ছাড়া পূর্বশর্ত আরোপ করেন যে শুধু সত্যাগ্রহী বন্দী নয়, খিলাফতী ও ফতোয়াবন্দীদেরও মুক্তি দিতে হবে।[১৪৪] আমেদাবাদ কংগ্রেস (ডিসেম্বর ১৯২১) বড়লাটের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ও বোম্বাই-এর সর্বদলীয় সম্মেলন (১৪ জানুয়ারি ১৯২২)-এ গান্ধীর দল বিরোধী মনোভাব গ্রহণ করে। বড়লাটেব উড়ো প্রতিশ্রুতিতে গান্ধী বিভ্রান্ত হতে রাজি ছিলেন না, তা ছাড়া খিলাফতী বন্দীদের ত্যাগ করতেও তিনি রাজি ছিলেন না। বড়লাটের চিঠিপত্র থেকে আমি প্রমাণ করেছি মালব্যাদি নরমপন্থীরা গান্ধীকে রাজি করাতে পারবেন কি না সে বিষয়ে তাঁর সন্দেহ ছিল। গান্ধী অরাজি হলে নরমপন্থীরা বিরক্ত হয়ে সরকারের পক্ষ নেবে, এমন কূট কৌশলও থাকতে পারে।[১৪৫] পরে ভারতসচিবকে তিনি স্পষ্ট আশ্বাস দেন, "আমি সংস্কার (১৯১৯) ব্যাপকতর করতে চাই না,

কারণ তার সময় আসেনি—এ ধরনের ঘোষণা করার আগে আমি বৈঠক শুরু করতাম না।"[১৪৬]

শুধু মডারেটদের নয়, মুসলিমদেরও তিনি পক্ষে নিয়ে এসেছিলেন। প্রথম থেকেই তাঁর ও গান্ধীর লড়াই চলছিল কে মডারেটদের স্বপক্ষে আনতে পারবেন। দ্বিতীয় লড়াই চলছিল ব্যাপকতর মুসলিম সমর্থন নিয়ে। পঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, বোম্বাই ও বাংলায় মুসলিমরা দলে দলে অসহযোগ আন্দোলনের শামিল হয়েছিল। আলি ও আজাদের ডাকে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাতশত ছাত্র বেরিয়ে গিয়ে জামিয়া মিলিয়া স্থাপন করেছিল। কুটিল ব্যবহারজীবী রিডিং বুঝেছিলেন এসব সত্ত্বেও হিন্দু-মুসলিম মৈত্রীর ভিত্তি দুর্বল।[১৪৭] মে মাসে গান্ধীর সঙ্গে তাঁর ছ-বার সাক্ষাৎকার হয়। সে সময় মহম্মদ আলির মাদ্রাজে প্রদত্ত হিংসা-উদ্দীপক বক্তৃতাবলী গান্ধীর সামনে তুলে ধরেন তিনি। আলি নাকি ভারত আক্রমণকারী আফগানদের সাহায্য করতে চান। ভালমনে গান্ধী আলিকে দুঃখপ্রকাশ করতে বা উক্তি অস্বীকার করতে বলেন। আসলে গান্ধীকে দিয়ে আলিকে ক্ষমা চাইয়ে নিযে উভয়ের মধ্যে (তথা হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে) ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করেন তিনি। রিডিং-এর পুত্র পিতার লেখা এক সমসাময়িক পত্র প্রকাশ করেছেন তাতে রিডিং-এর উদ্দেশ্য দিনের মত পরিষ্কার। তিনি লিখেছেন, "যদি মহম্মদ আলি গান্ধীর কথা শোনেন, তা হলে জনচক্ষে তিনি হেয় হবেন, নেতারূপে দুর্বল হবেন এবং তার ফলে বর্তমান শান্তি বিঘ্নকারী (খিলাফতী) আন্দোলন প্রশমিত হবে।"[১৪৮] হলও তাই। ক্রুদ্ধ আলি বললেন, তিনি কোন ক্ষমা চাননি, গান্ধীর পরামর্শ নেন, "**not to avoid prosecution but to allay Hindu suspicion and in particular to prove to Gandhi that we have no personal pique and enough humility and respect for our colleague and leader's advice.**" মণ্টেগুকে রিডিং জানাচ্ছেন, এ জন্য মুসলমানরা গান্ধীর ওপর বিরক্ত এবং হিন্দুরাও গান্ধীকে দোষ দিচ্ছে।"[১৪৯] তিক্ততা এড়াবার জন্য করাচীতে অনুষ্ঠিত খিলাফৎ সম্মেলনে যোগ দিলেন না গান্ধী।

আর এক চাল চাললেন রিডিং। করাচীতে শরিয়তের নামে মুসলিমদের সৈন্যদলে যোগদানে বিরত থাকতে আহ্বান জানান আলিরা এবং পরে স্বয়ং গান্ধী সকল সম্প্রদায়ের লোকদেব শুধু সৈন্যদল নয়, সরকারী চাকরি ছাড়তে বলেন। অথচ এই অপরাধে ১৪ সেপ্টেম্বর আলিদের আটক করা হয় এবং গান্ধীকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। গান্ধীর ত্রিচি বক্তৃতা (১৯ সেপ্টেম্বর) পড়ে রিডিং এব মনে হয় খিলাফতীদের সন্দেহ নিরসনের জন্য তিনি কারাবরণ করতে চাইছেন।[১৫০] শুধু যে যুবরাজেব আগমনের পরিপ্রেক্ষিতে রিডিং সে ঝুঁকি নিলেন না তা নয়, পারস্পরিক সন্দেহ বাড়ানোও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল।

মুসলিমদের আন্দোলন থেকে সরিয়ে নেবার জন্য রিডিং তুরস্কের প্রতি সহানুভূতি জানাতে ভারতসচিবকে বারংবার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। মহম্মদ সাফির মত নেতারা তাঁকে ধবেছিলেন তুরস্কের সঙ্গে একটা সম্মানজনক সন্ধি করা হোক। সাফি তাঁর ২ নভেম্বরের প্রতিবেদনে বলেন যে ইস্তাম্বুল ত্যাগ করলে, স্মার্না ও থ্রেস তুরস্ককে ফিরিয়ে দিলে ও পবিত্র তীর্থগুলি খলিফার হাতে তুলে দিলে তাঁরা অসহযোগ আন্দোলন থেকে মুসলমানদের নিবৃত্ত করতে পারবেন, অন্তত স্বরাজপন্থী ও খিলাফৎপন্থী মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারবেন। রিডিং সাফিকে পুরো সমর্থন করেন।[১৫১] ১৯২২-এর ২৮ ফেব্রুয়ারি এই মর্মে বিশেষ তারবার্তাও পাঠায় ভারত সরকার। মুসলিম সমাজের প্রতি তাঁর সহানুভূতির নিদর্শন স্বরূপ এই তারবার্তা প্রকাশের অনুমতি আদায় করেন রিডিং।

বড়লাটেব চাল না বুঝে অনুমতি দেবার জন্য পার্লামেন্টে হৈ চৈ বাধে ও ভাবতসচিব মণ্টেগুকে পদত্যাগ করতে হয়। তাতে রিডিং-এর আরও সুবিধা হয়। মুসলমানদের তিনি বোঝাতে চান তাদেব স্বার্থবক্ষায় ভারত সরকার কত সজাগ, এমনকি ভারতসচিবও আত্মত্যাগে পরাঙ্মুখ নন। পরবর্তী ভারতসচিব পীলকে লেখা চিঠিতে রিডিং-এর মনস্তত্ত্ব প্রকট।[১৫২] ফলও হয় আশামত। দক্ষিণপন্থী সাফি ও বামপন্থী বারি এবং মোহনি তাঁর ফাঁদে পড়েন। বারি তখুনি খিলাফৎ আন্দোলন বন্ধ করার নির্দেশ দেন। রাজনৈতিক বন্দীদেব তিন চতুর্থাংশ ছিল মুসলিম · তাদের বাগে আনতে পারলে অসহযোগ আপনি স্তিমিত হয়ে আসবে—এ ধারণা সত্য প্রমাণিত হল। আর একটা লক্ষণীয় ব্যাপার—গান্ধীকে এতদিন গ্রেফতার করা হয়নি, কিন্তু তারবার্তা প্রকাশের ঠিক দু দিন পরে তাই কবা হল। তখন তাঁব নূতন কবে আন্দোলন গড়ার শক্তি ছিল না। রিডিং-এর ভাষায়, গান্ধীকে তিনি "কাঁটার মুকুট"ও পরতে দিলেন না।

তবে বড়লাটের কূটনীতিই আন্দোলনের ব্যর্থতার একমাত্র কারণ নয়। নেহরু বারদোলি সিদ্ধান্তেব প্রতিবাদ করলে গান্ধী উত্তর দেন, "আমি তোমাকে নিশ্চিত ভাবে বলছি যে আন্দোলন সাময়িকভাবে প্রত্যাহার না কবলে আমরা অহিংসার পবিবর্তে হিংসাত্মক সংগ্রামই চালাতাম।"[১৫৩] জওহরলালেব প্রশ্ন তবু থেকে যায়— যদি চৌবিচৌরার মত অসংলগ্ন কোন ঘটনার জন্য আন্দোলন বন্ধ করতে হয়, তবে ভারত সবকাব এমনি ধবনের হিংসাত্মক ঘটনা ঘটিয়ে ভবিষ্যতের যে কোন আন্দোলনের মহড়া নেবে। সংশয় থাকা সত্ত্বেও তিনি গান্ধীর সিদ্ধান্ত মেনে নেন—কিন্তু সন্ত্রাসবাদীরা পুবাতন পন্থায় ফিরে যায়। দাশ ও মতিলাল হতাশ হয়ে অসহযোগ আন্দোলনকে বিধানসভার অভ্যন্তরে নিয়ে যেতে চান। আলিদেব মত উগ্র খিলাফতীরা গান্ধীর প্রতি আস্থা হারান এবং মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাব শিকাব হন। মালব্য, লাজপৎ ও শ্রদ্ধানন্দ প্রমুখ কিছুটা মৌলবাদী হিন্দু নেতা সংগঠন, শুদ্ধি প্রভৃতিব মাধ্যমে হিন্দু শক্তি জাগ্রত করতে গিয়ে হিন্দু সাম্প্রদাযিকতাকে প্রশ্রয় দেন। পশ্চাদপসরণের হতাশা কোহাট ও কলকাতায় বীভৎস দাঙ্গাব রূপ নেয়।

প্রশ্ন উঠেছে, অসহযোগের সঙ্গে খিলাফৎ আন্দোলন যুক্ত করে গান্ধী কি ঠিক কাজ করেছেন? মুশিরুল হাসানের Nationalism and Communal Politics in India গ্রন্থেব পঞ্চম অধ্যায় এই প্রসঙ্গে পঠিতব্য। সাফি, আগা খাঁ, জিন্না প্রমুখ পাশ্চাত্য শিক্ষা ও জীবনচর্যায় বিশ্বাসী নেতাদের অনুচরগণ ছিলেন সংখ্যায় স্বল্প। তাঁবা খিলাফৎ নিয়ে মাতামাতির বিরোধী ছিলেন। অন্যদিকে গান্ধী চান বৃহত্তর মুসলিম সমাজকে পক্ষে আনতে এবং বাবি, আনসারি, আলি ভ্রাতৃদ্বয়, আজাদ প্রমুখকে যোগসূত্র রূপে ব্যবহাব কবতে। কিন্তু তাঁদের সঙ্গেও মুসলিম জনসাধারণের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না বলে তাঁরা বাধ্য হন মৌলবাদী এবং স্থানীয় প্রভাব সম্পন্ন মোল্লা, মৌলভিদের সাহায্য নিতে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বৃত্তির ঠেলায় এরা ক্রমশ পিছু হটছিল। এখন সহসা প্রথম সারিতে ফিরে আসার ডাক পেল তারা। মুশিরুল দেখাচ্ছেন ১৯১৮ থেকে কিভাবে তাবা লীগ নেতৃত্ব দখল করাব চেষ্টা চালাচ্ছিল। তাদের 'মুত্তাফি কা ফতোয়া' সব মুসলমানকে অসহযোগ আন্দোলনের শামিল হতে নির্দেশ দেয। জিহাদ ও হিজরৎ তাদেরই পরিকল্পনা। কোরানের আয়াত থেকে বারংবার উদ্ধৃতি, জিহাদ ঘোষণা, কাফের হত্যার আহ্বান শ্রদ্ধানন্দেব ভাল লাগছিল না। গান্ধীকে জানাতে "মহাত্মাজী হাসলেন আব বললেন, 'এ সব ব্রিটিশ আমলাদের সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হচ্ছে।' উত্তরে আমি বললাম, 'এতে অহিংসার আদর্শ ক্ষুণ্ণ হবে এবং ভাঁটার ঢল নামলে মৌলভিরা এসব হিন্দুদের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করবে'।" শ্রদ্ধানন্দের আশঙ্কাই সত্য

প্রমাণিত হয়েছিল।

গান্ধী ভুলে গিয়েছিলেন যে ভারতীয়দের পক্ষে খলিফার রাজনৈতিক পুনর্বাসন অপ্রাসঙ্গিক। তাঁর বক্তব্য— "আমি যদি ভারতীয় মুসলমানদের ব্যাপারে আগ্রহী না হতাম তা হলে অস্ট্রীয় বা পোলদের মতই তুর্কীদের মঙ্গলে আমার আগ্রহ থাকত না। ...কিন্তু আমি যদি মুসলমানকে আমার ভাই মনে করি তবে তার বিপদের দিনে যথাসাধ্য সাহায্য করাই কর্তব্য—অবশ্য যদি তাদের দাবি ন্যায়সঙ্গত মনে হয়।"[১৫৪] মুসলমান ভাই হতে পারে, সেভাবে দেখাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তার খিলাফতী দাবি কতটা ন্যায়সঙ্গত বিচার কববে তুরস্কের মুসলমান, ভারতের হিন্দু নয়, এমনকি মুসলমানও নয়। কিভাবে খিলাফতী প্রচার উনিশ শতক থেকে কাজ করছিল সে বৃত্তান্ত আগেই দিয়েছি। আলিরা এ বিষয়ে নিঃস্বার্থও ছিলেন না। আলি ও আজাদের মনস্তত্ত্বও তর্কাতীত নয়। 'কমরেড' পত্রিকায় (২১ জুন ১৯১৯) মহম্মদ আলি লেখেন, "মুসলমানের সহানুভূতি তার ধর্মের মতই ব্যাপক। ইসলাম তাকে যে আদর্শ দিয়েছে জাতি বা দেশের জন্য সে তাকে বিসর্জন দিতে পাবে না।" 'আলহিলাল'-এ (২৩ অক্টোবর ১৯১৯) আজাদ লেখেন, "মুসলিমদের ঐক্যচেতনা সীমাবদ্ধ ভৌগোলিক বা জাতীয় সত্তা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়নি। তা মানুষের তৈরি সব বাধা লঙ্ঘন করে।.. ইওরোপ 'জাতি' বা 'স্বদেশ' ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হতে পারে, মুসলিমবা আত্মচেতনতার প্রেরণা পায় শুধু ঈশ্বর ও ইসলাম থেকে।"এব সোজা অর্থ—ভারতের মত বহু ধর্মবিশিষ্ট দেশে কোনো বাজনৈতিক সংহতি সম্ভব নয়, কেবল ধর্মীয় যুক্তরাষ্ট্র (federation of faiths) স্থাপিত হতে পারে। তাঁদের কাছে ব্রিটিশেব বিরুদ্ধে জিহাদের বিকল্প ছিল দার-উল-হারব্ থেকে হিজরৎ।

'মসলা-ই-খিলাফৎ' গ্রন্থে আজাদ লেখেন, আল্লার বিধানে একাধারে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সর্বাধিনায়ক খলিফাই উম্মা-সংহতির কেন্দ্র। কিন্তু 'ইয়ংটার্ক', আবব ও আরমেনীয় মুসলিম আন্দোলন পর্যালোচনা করলে মনে হয় সব মধ্যপ্রাচ্যস্থ মুসলমান খলিফার একাধিপত্য পছন্দ করত না। প্যান-ইসলাম মতবাদ 'শত্রুর শত্রু মিত্র' এই কৌটিল্যনীতি অনুযায়ী কংগ্রেসের মিত্র হতে পারে কিন্তু তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদ। তা ছাড়া খিলাফৎ আন্দোলন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক ভিত্তি নিযে আদৌ মাথা ঘামাযনি—মুসলিম চাষী. শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত সকলেই ঔপনিবেশিক শোষণের শিকার এমন চেতনা জাগ্রত করার প্রয়াস লক্ষিত হয় না। এইসব কাবণে মুসলিম মানসে অগ্রাধিকার পেয়েছে ভারতীয়তা নয়, অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ বিবোধিতাও নয়. ইসলামধর্ম। এ যেন এক প্রতিধর্মযুদ্ধ (counter-crusade)। এর ফলে মুসলিমদের বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠেনি, সঙ্কীর্ণ অতীতমুখী মৌলবাদই জোবদাব হয়েছে।[১৫৬] একা তিলক বা লাজপৎ নয়, খলিকুজ্জমানও একে সময়ের বিপবীত স্রোতে ভাসা বলে মনে করতেন। টয়নবিব ভাষায়, এও এক ধরনের archaism.। চরমপন্থী আন্দোলন কালে হিন্দুদের মধ্যে যে মিথ্যা জাতি ও বর্ণগর্ব, যে আর্যত্বাভিমান জন্মেছিল, খিলাফৎ আন্দোলন যেন মুসলিম মুকুরে তারই প্রতিবিম্ব। বৈদেশিক পবিস্থিতি সম্বন্ধে অজ্ঞতা মহাত্মা গান্ধীকে খিলাফতীদের সম্বন্ধে এক মিথ্যা ভাবালুতায় আবিষ্ট কবেছিল। কামাল আতাতুর্কেব অভ্যুদয় সম্বন্ধে তিনি (অনেকেব মত) অনবহিত ছিলেন। বিশ্ব রাজনীতি নিযে এমন অজ্ঞতার পবিচয তিনি ১৯৪২ সালেও দেবেন।

তবে তাদের অহিংসা সম্পর্কে তাঁব যথেষ্ট সংশয় ছিল।[১৫৭] এলাহাবাদে কেন্দ্রীয় খিলাফৎ কমিটির সভায় (১-৩ জুন ১৯২০), কলকাতা ও নাগপুব কংগ্রেসে বারবার অন্যান্য

হিন্দু নেতার সংশয় প্রকটিত হয়েছে। অসহযোগী হিন্দুদের অনেকেই কৌশলগত সাময়িক কারণে খিলাফতীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছিল। কিন্তু মহম্মদ আলির মনও নির্মেঘ ছিল না। তাঁরই ভাষায়, "আমি, শৌকত ও গান্ধী একই অহিংসা মঞ্চে দাঁড়িয়েছি—গান্ধী নীতির জন্য, আমরা চাল হিসেবে।" আজাদের চিন্তাধারা অনুরূপ খাতে বইত। এপ্রিল (১৯২১) মাসে মহম্মদ আলি বলেছিলেন, আফগানরা ভারত আক্রমণ করলে মুসলিমরা তাদের সঙ্গে যোগ দেবে (অবশ্য যদি তারা ভারতকে স্বাধীন করতে আসে ও ফিরে যায়)। ১৯২১-এর জুনে বারি বলেন, "আমরা সবসময় অহিংসা নীতি মানব এরকম কোনো প্রতিশ্রুতি দিইনি।"[১৫৮] গ্রামে গ্রামে জেহাদ ঘোষণা বা সেনাবাহিনীতে যোগদান 'হারাম' ও যোগ দিলে তাদের মুসলিম আদালতে বিচার হবে করাচী সম্মেলনে এই মর্মে নাদনির প্রস্তাব এবং আলিদের সমর্থন গান্ধীর পছন্দ হয়নি। মোপলা বিদ্রোহ হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক আরও তিক্ত করে। এ সময় মোহনি বলেন, হিন্দুরা সরকারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছে ; বারি বলেন, জোর করে কোন হিন্দুকে মুসলিম করা হয়নি। বলা বাহুল্য মালব্য ও মুঞ্জে কেউ তা মেনে নেননি। আমেদাবাদ কংগ্রেসে উগ্রপন্থী মোহনি অহিংসানীতিকে সোজা চ্যালেঞ্জ জানান। লীগের অধিবেশনে একই কাজ করেন আজাদ শোভানি। আনসারি, আজমল খাঁ ও সৈয়দ রাজা আলি উগ্রপন্থীদের কোনমতে ঠেকান। বারদোলি প্রস্তাব কংগ্রেস ও খিলাফৎ জোটে মরণাঘাত আনে।

খিলাফৎ প্রসঙ্গে পোল্যাক, অ্যানড্রুজ ও রবীন্দ্রনাথের আপত্তি স্মরণীয়। পোল্যাক লেখেন, "If Mohammad Ali's interpretation of Islam is correct...Islam is a world danger to be fought remorselesly by all other peoples."[১৫৯] অ্যানড্রুজ রবীন্দ্রনাথকে লেখেন, "I am out against empires altogether, and to agree to the Khilafat demand (for an Ottoman empire) would surely cut the ground under the Indian demand for independence." রোলাঁর ডায়েরিতে পাই রবীন্দ্রনাথের মতে "Gandhi was not working...for the unity of India but for the pride and force of Islam."[১৬০] স্বরাজের সুলভ সম্ভাবনায় ও আশু ফলের আকাঙ্ক্ষায় হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্য ভোলা ঠিক হয়নি। সমস্যার সমাধান—হিন্দু ও মুসলমানকে আপন আপন মানসিক অবরোধ কেটে বেরিয়ে আসতে হবে। "বিশেষ প্রয়োজন না থাকলেও হিন্দু নিজেকে মারে, আর প্রয়োজন থাকলেও অন্যকে মারতে পারে না। মুসলমান বিশেষ প্রয়োজন না ঘটলেও নিজেকে দৃঢ়ভাবে রক্ষা করে, প্রয়োজন ঘটলে অন্যকে বেদম মার দেয়··আসল কারণ তাদের সমাজের জোর আছে, হিন্দুর নেই।"[১৬১] হিন্দু ও মুসলমানকে শুধু মিলতে হবে না, সমকক্ষ হতে হবে। হিন্দুকে বদলাতে হবে অনুদার সামাজিক আচার, মুসলমানকে করতে হবে অসহিষ্ণু ধর্মমতকে সহনশীল।[১৬২] কতখানি দূরদৃষ্টি থাকলে বোঝা যায় জোড়াতালি দেওয়া রাজনীতি স্বরাজ আনতে পারবে না আর "বিদেশী বিদায় করলেও আগুন জ্বলবে এমনকি স্বদেশী রাজা হলেও দুঃখদহনের নিবৃত্তি হবে না।" আজ আমরা মর্মে মর্মে এই ঋষিদৃষ্টির সত্য উপলব্ধি করছি।

রজনী পাম দত্তকে অনুসরণ করে একদল বামপন্থী গান্ধীকে 'বিশ্বাসঘাতক' আখ্যা দিয়েছিলেন।[১৬৩] তখনকার ছাত্রনেতা শ্রীপদ ডাঙ্গে ও বাংলা কম্যুনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মুজফফর আহমদ অনেকটা একমত পোষণ করতেন।[১৬৪] দত্তের মতে অসহযোগ আন্দোলন প্রায় সফল হয়েছিল এবং সরকার ভয় পেয়েছিল। প্রমাণস্বরূপ তিনি

ভারতসচিবকে প্রেরিত বোম্বাই-এব ছোটলাটের এক তারবার্তাব উল্লেখ কবেছেন। দু দুবার বাবদোলি সত্যাগ্রহ পিছিয়ে দিয়ে এবং শেষবার চৌরিচৌরায় পুলিশ হত্যার অজুহাতে তা প্রত্যাহাব করে গান্ধী জনগণ, বিশেষ করে কৃষক শ্রেণীর প্রতি, বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। বারদোলি প্রস্তাব পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছেন যে তাব কয়েকটি অনুচ্ছেদ নিশ্চিতরূপে জমিদার শ্রেণীর অনুকূল ও কৃষক শ্রেণীর স্বার্থবিরোধী। গুন্টুর ও উত্তরপ্রদেশের কৃষক আন্দোলন স্থগিত বাখার অভিযোগও আনা হয়েছে। জ্ঞান পাণ্ডেব মতে যখনই কৃষক আন্দোলন অহিংসাবাদী কংগ্রেসেব শৃঙ্খলা ভেঙে প্রত্যক্ষভাবে উচ্চবর্গ (তথা বর্ণ) ও পরোক্ষভাবে ব্রিটিশ রাজকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে তখনি গান্ধী কঠিন হস্তে রাশ টেনে ধরেছেন। যে রামরাজ্যের স্বপ্ন তিনি জাগিয়েছেন তার পথ প্রস্তুত করতে গেলেই তিনি নিজে বাধা দিয়েছেন।

বাইরে থেকে দেখলে গান্ধী ও তাঁর শিষ্যদের উচ্চবর্গেব মুখপাত্র বলে মনে হবে। স্থানীয শোষক শ্রেণীর বিরোধিতা করলেই তাঁরা অহিংসার বাণী শুনিয়েছেন। নেহরুকেও বাদ দেওয়া যায না। কিন্তু একটু গভীরে গেলে গান্ধীব আপত্তির কাবণ বোঝা যাবে। তিনি এক নতুন ধরনেব সংগ্রাম চেয়েছিলেন যার নৈতিক চরিত্র অহিংসা দাবি করে। দ্বিতীয়ত, ভুললে চলবে না সে সংগ্রাম শ্রেণীসংগ্রাম নয়, জাতীযতাবাদী সংগ্রাম। যে মুহূর্তে তা শ্রেণীসংগ্রামের রূপ নেবে (যদি নেয়, কারণ মার্কস্ ও লেনিন যে সব পূর্ব শর্ত নির্ধারিণ কবেছিলেন ভাবতে তা উপস্থিত ছিল না) সেই মুহূর্তে তার জাতীয়তাবাদী ঐক্য ভেঙে যাবে। সেই বহুধাবিভক্ত আন্দোলন অচিরে মাৎস্যন্যাযে পবিণত হবে ও তাব বিরুদ্ধে দাঁড়াবে শুধু উন্নততব অস্ত্রসম্ভারে সজ্জিত শাসকদল নয়, সুসংহত দেশীয উচ্চবর্গ, কারণ উভযের মধ্যে স্বার্থেব গাঁটছড়া বাঁধা। পিটার রীভ্স উত্তবপ্রদেশেব 'আমন সভা'র উদাহরণ দেখিয়েছেন। আন্দোলন প্রথমে তীব্রতব রূপ নিলেও তা অচিবে পরাভূত হবে এবং ভবিষ্যতে নতুন করে সংঘবদ্ধ হবার আশাও বিঘ্নিত হবে পারস্পবিক সন্দেহের ফলে।

মুশকিল হল, বামপন্থীবা গান্ধীর উদ্দেশ্য ও উপায়ে বিশ্বাস করেননি, তাঁরা গান্ধীর আন্দোলনকে আপন বিপ্লবী লক্ষ্যে পৌঁছবার কাজে লাগাতে চান। গান্ধীব কাছে অহিংসা একটা সুবিধাবাদী কৌশলমাত্র নয়। যখন যেখানে হিংসা মাথা চাড়া দিয়েছে (যেমন যুবরাজের আগমন উপলক্ষে বোম্বাইতে) তিনি প্রতিবাদ করেছেন। এই কারণে আলি ও মোহনিব সঙ্গে তর্কযুদ্ধে নেমেছেন তিনি। চা-বাগানের কুলি ধর্মঘটে তাঁর আপত্তি ছিল। বাবা রামচন্দ্রের দলের বাড়াবাড়ি তিনি সহ্য করেননি। চৌরিচৌরাই প্রথম হিংসাত্মক ঘটনা নয়—তা "উটের পিঠে শেষ খড়ের বোঝা।" দুবার বারদোলি আন্দোলন পিছিযে দিয়ে, গুন্টুরের কৃষক আন্দোলন স্থগিত রাখতে বলে, আপন মনোভাব তিনি জানিয়েছিলেন। সহিংস কোন আন্দোলনের নেতৃত্ব তিনি দিতে চাননি। তিনি বুঝেছিলেন কোথাও মালাবারের মত হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষ বাধবে, কোথাও, গুন্টুরের মত, ব্রাহ্মণে-অব্রাহ্মণে কোথাও, বিহারের মত, কায়স্থ-ভূমিহারে বা উচ্চশ্রেণী ও গোয়ালায়। গভীর দুঃখে তিনি বলছেন, "এখন সত্য সম্বন্ধে আমার উপলব্ধি আরও গভীর হয়েছে। এক বছর আগে যা ছিল এখন তা থেকে অনেক বেশি সচেতন হয়েছি আপন ক্ষুদ্রতা সম্পর্কে।"

বামপন্থী সমালোচকরা আসলে চাইছিলেন ১৯১৭ সালের এপ্রিলের পব লেনিন যেমন স্বৈরাচারবিরোধী বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সামন্ত-বুর্জোয়াবিরোধী সর্বহারা বিপ্লবের সঙ্গে যুক্ত (telescope) করেছিলেন, গান্ধীও তেমনি সাম্রাজ্যবিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনকে সামাজিক বিপ্লবের সঙ্গে যুক্ত করুন। ডাঙ্গে লিখছেন, "While our

group decided to participate in the mass revolutionary programme of Mahatma Gandhi we wanted to push the revolution further through working class action in Bombay." কিন্তু ১৯২০-২২-এর ভারতবর্ষের বাস্তব পরিস্থিতি কি ১৯১৭-এব রাশিয়ার অনুরূপ ছিল ? চাইলেও কি গান্ধী লেনিনের ভূমিকা নিতে পারতেন ? পারলেও কি সফল হতেন ? প্রথমত, গান্ধী লেনিনের ভূমিকা নিতেই চাননি, লেনিন কি করছেন তা জানতেনই না। তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকা স্থির করে দিয়েছিল তাঁর নিজস্ব জীবনদর্শন (যা মার্কসবাদ নয়), দক্ষিণ আফ্রিকা ও যুদ্ধোত্তর ভারতের পরিস্থিতি, হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের টানাপোড়েন, অন্যান্য কংগ্রেসী নেতাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সমীকরণ ও মডারেটদের যতদূর সম্ভব হাতে বাখার প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, সফল তিনি হতেও পারতেন না। রুশসমাজে শ্রেণীভেদ স্পষ্টতর তো ছিলই, উপরন্তু জাতি, বর্ণ, ভাষা ও সংস্কৃতির বিরোধ এত তীব্র ছিল না। ব্রিটেন ও ভারত সরকার জারতন্ত্রেব মত দুর্বল, হতোদ্যম, লক্ষ্যহীন ছিল না। বারংবার পরাজয়ে জারতন্ত্র লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন হয়েছিল। তার কোষাগাব ছিল শূন্য, আমলাতন্ত্র বুদ্ধিতে দেউলিয়া, সৈন্যবাহিনী পলাতক। অন্যদিকে ব্রিটেন বিজেতার আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান, সৈন্য ও অস্ত্রসম্ভারে সমৃদ্ধ, উপনিবেশের কল্যাণে বিত্তবান। বোম্বাইয়ের লাটের একটা সাময়িক দুর্বলতাকে দত্ত যে জোর দিয়েছেন, রিডিং-এর কাগজপত্র পডলে তা দিতেন না। অপরদিকে গান্ধীর পেছনে না ছিল শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্ব (সংগঠন তখন সবে ভূমিষ্ঠ হয়েছে), না সোভিয়েতের মত সংস্থা, না সৈন্যবাহিনীর বড় একটা অংশ। এমনকি ভারতের সব অঞ্চলেও কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়নি। সংখ্যায় বিপুল হলেও ধনী, মাঝারি, ছোট, প্রান্তিক, ভূমিহীন—নানা উপশ্রেণীতে বিভক্ত ছিল তারা, ভাষা জাতপাত সম্প্রদায়ের বিরোধে বিদীর্ণ। তাদেব দুর্বলতা সম্পর্কে বামপন্থীদের চেয়ে গান্ধী বেশি জানতেন, তাই বেশি ভরসা করেননি। প্রখর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লেনিন এসব ভেবেই গান্ধীর ভূমিকার প্রশংসা করেছিলেন আর একদা-সন্ত্রাসবাদী মানবেন্দ্রনাথ রায় ভাবতে চাননি বলে গান্ধীকে "religious and cultural revivalist" আখ্যা দিয়েছেন.[১৬৫] আর 'ইম্‌প্রেকব' ও 'ভ্যানগার্ড' পত্রিকায় প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়ার মুখপাত্র বলে অভিহিত করেছেন।

তবে অসহযোগ আন্দোলন থেকে গান্ধী কয়েকটা শিক্ষা নিতে পারতেন। প্রথমত, দীর্ঘ প্রস্তুতি ছাড়া অহিংসাকে নীতি হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। বহু পরীক্ষার পব তাঁর নিজ জীবনে যা ধর্মে (বদ্ধমূল বিশ্বাসে) পরিণত হয়েছে, সাধারণের জীবনে তা একদিনের নির্দেশে বা এক বছরের পরীক্ষায় সফল হবে এমন আশা সন্তদের পক্ষেই সম্ভব। রবীন্দ্রনাথের মনে সংশয় ছিল (শরৎচন্দ্রেব ছিল না)। বারবার আইন অমান্য পিছিয়ে দিয়ে গান্ধী আপন সংশয় প্রকাশ করেছেন। কৌশলের দিক দিয়েও এটা ভুল। দ্বিতীয়ত, বণিকদের খেয়ালখুশি দান এবং মধ্যবিত্তের উচ্চাকাঙ্ক্ষী নেতৃত্ব ব্যবহার করে ছাত্রদের দ্বারা দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন চালানো যায় না। বৃহত্তর জনসমাজের সমর্থন আবশ্যিক। কলকারখানার শ্রমিক সংখ্যা নগণ্য ছিল বলে কৃষকদের আন্দোলনের শরিক করতেই হবে। কিন্তু তাদের দুঃখদুর্দশার পরোক্ষ কারণ পরাধীনতা বা ঔপনিবেশিক শোষণ এসব তত্ত্ব বোঝাতে সময় লাগে! দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, কর বা খাজনার চাপের মত প্রত্যক্ষ সমস্যার স্থায়ী সমাধান (যেমন, ভূমি হস্তান্তর, সেচ, সহজলভ্য কৃষিঋণ)-এর প্রতিশ্রুতি না পেলে তারা সুপরিচিত শোষক শ্রেণী—জমিদার ও মহাজনকে আঘাত হানবেই। ফৈজাবাদে গান্ধী বলেছিলেন—"জমিদাররাও দাস, আমরা তাদের সঙ্গে লড়তে চাই না।" এ কথা কৃষকরা

বুঝবে না। গণ-আন্দোলন অনেকটা ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত বা জলোচ্ছ্বাসের তুল্য—তা ভালোমন্দ বিচার না করেই সংহার করে। এই অন্ধ শক্তিকে চালনা কবে মানুষের দৈনন্দিন দুঃখের পুঞ্জীভূত তাডনা। তার সুযোগ নেয কিছু স্থানীয় নেতা, যাবা জমিদাবেব সামাজিক প্রভুত্ব বা আর্থিক প্রতিপত্তিতে ঈর্ষাতুর। তাদেব ব্যক্তিগত আক্রোশ সামাজিক কুসংস্কাব ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ উত্তেজিত করে আন্দোলনকে বিপথে নিয়ে যায। উন্মত্ততার শেষে আসে হতাশা—যা মানুষকে দেহ মন আত্মা সব দিক থেকে দুর্বল করে। বন্যার জল সবে গেলে দেখা দেয পাবস্পরিক সন্দেহ ও ভযেব পঙ্ককুণ্ড। মালাবারের কথা ধবা যাক। **Freedom Movement in Kerala**-র দ্বিতীয় খণ্ডে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত হিন্দুদের সংখ্যা ৯০০ বলা হয়েছে। অত অল্প হযতো নয়। রবার্ট হার্ডগ্রেভেব মত একে "সামাজিক প্রতিবাদ" বলে উড়িয়ে দেওয়া উচিত হবে না।[১৬৬] সন্দেহ নেই দক্ষিণ মালাবারে খাজনার চাপ ছিল অত্যন্ত বেশি। অনেক চাষীর আসল বাগ ছিল নাম্বুদ্রি জমিদাব ও নায়াব মহাজনের ওপর। তবু মজলিস-উল-উলেমার মত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও আলমুসালিয়াবেব মত নেতারা কিভাবে দরিদ্র চাষী ও ভূমিহীনদের বিপথগামী করেছে তাব বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে।[১৬৭]

গণ-আন্দোলনকে সীমার মধ্যে রাখতে গেলে শুধু নৈতিক বা রাজনৈতিক প্রশিক্ষণই যথেষ্ট নয়, জনসাধারণের প্রাথমিক সমস্যাগুলির দিকেও নজর দিতে হবে। অসহযোগ আন্দোলনের পর গান্ধী তাই গঠনমূলক কাজেব ওপর এত জোর দিয়েছিলেন। ১৯২৩-এ গুন্টুরে প্রথম রায়ত সমিতি স্থাপন করেছিলেন এন. জি. রঙ্গ। প্রকাশম্ ও কোন্ডা বেঙ্কটাপ্পায়া গোদাবরী অঞ্চলে এবং বল্লভভাই প্যাটেল বারদোলিতে কৃষকদের সংগঠিত কবেন তাদেব বিশেষ অভাব অভিযোগের ভিত্তিতে। তবু কোন সময়ই গ্রামীণ সমাজের দ্বন্দ্বের মোকাবিলা কবতে পারেনি কংগ্রেস। জমিদারকে ছাড়লেও জোতদার ও ধনী কৃষককে ছাড়েনি। বিশ্বমান্দ্য, সংঘবদ্ধ কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের বামপন্থা গ্রহণ ইত্যাদি কারণে সমস্যা জটিলতর হয়।

নিম্নবর্গের প্রধান ঐতিহাসিক রণজিৎ গুহ কৃষকবিপ্লবীদের সচেতনতার ওপর জোর দিয়েছেন। তাই যদি সত্য হয়, তবে উত্তরপ্রদেশে তাবা নিজেদের কৃতিত্ব গান্ধীতে আরোপ করল কেন? সুমিত সরকার বলছেন, এর মধ্যে গুরুবাদী ভারতের বহু হাজার বছরের সংস্কার প্রকট। তা হলে স্বীকার করতে হয় তাদের সচেতনতা দানা বাঁধেনি,পরনির্ভর ছিল। ধর্মের ভাষায় (code) রাজনৈতিক মতবাদ প্রচারের ব্যাপারে স্বদেশী ও অসহযোগ আন্দোলনের পার্থক্য বোঝাতে সরকার 'পূজা' ও 'সন্ন্যাস'-এর কথা তুলেছেন। তিলক ও অরবিন্দের রাজনীতি নাকি ছিল পূজা পর্যায়ের, আর গান্ধীর রাজনীতি সন্ন্যাসের। ফুকো (Focault) প্রমুখ স্ট্রাকচারবাদীদের আক্ষরিক অনুসরণে এ ধরনের পার্থক্য রচনা অতি কৃত্রিম। পূজার মধ্যে কি কৃচ্ছ্রসাধনের অঙ্গীকার নেই? সন্ন্যাসে ইষ্ট পূজার স্থান? গান্ধীর সন্ন্যাস পলায়নী মনোবৃত্তি প্রসূত নয়। এর চালিকাশক্তি হল পৃথিবীকে নতুন করে গড়বার ইচ্ছা—messianism। বস্তুত অরবিন্দের 'স্বরাজ্য', আদিবাসীদের 'চম্পা' ও গান্ধীর 'রামরাজ্য' একই স্বপ্নের সূত্রে গ্রথিত। নানা ব্যর্থতার পরও গান্ধী সম্বন্ধে জনগণেব আশা নির্মূল হয়নি। এর কারণ নাকি জনসাধারণ নিজেদেরই দোষী করেছে এবং আরও জোরে ঈশ্বর, ধর্ম ও গান্ধীর নেতৃত্ব আঁকড়ে ধরেছে। গান্ধীর মানসিকতার সঙ্গে এর মিল আছে, আবার নেই। তিনিও গভীরভাবে ঈশ্বরবিশ্বাসী কিন্তু তাঁর ঈশ্বর একাধারে রুদ্র ও দক্ষিণমূর্তি, মনোহর ও ভয়ঙ্কব। আর গীতার 'স্থিতপ্রজ্ঞ' যাঁর আদর্শ তাঁর কাছে লাভালাভ, জয়াজয়,

সমার্থক। পরাজয়ই হয় নতুন অভিযানের সোপান যদি আত্মা থাকে অপরাজিত। গীতাব দৃষ্টিতে বিচার করলে নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকরা তাঁকে কিছুটা হয়তো বুঝতে পারতেন।

॥ ৮ ॥

বারদোলি প্রস্তাব কংগ্রেসেব নেতাদের মধ্যে প্রচণ্ড বিতর্কের সৃষ্টি করল। লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে এ আই সি সি (৭-৯ জুন ১৯২২) আইন অমান্য সম্পর্কে এক অনুসন্ধানী কমিটি গঠন করে। এব সভ্য—রাজাগোপালাচারি, আনসাবি ও কস্তুরী রঙ্গ আয়েঙ্গার—আইন অমান্য পুনরায় শুরু করা অসম্ভব স্বীকার করলেও কাউন্সিল-বর্জন চালিয়ে যাওয়া সুপাবিশ করেন। বিরোধিতা করেন চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহরু, আজমল খাঁ ও ভি জে প্যাটেল। নভেম্বর পর্যন্ত এ বিষয়ে কোন ঐকমত্য হয়নি। এই পবিপ্রেক্ষিতে দাশ ও নেহরু মূলত গান্ধী-বিরোধী মহারাষ্ট্র দলের নেতা মুঞ্জে ও জয়াকরের সঙ্গে আলোচনা আবম্ভ করলেন। দাশ তখনও বন্দী। তিনি কাউন্সিলে প্রবেশ করে পাবনেলী পদ্ধতিতে শাসন সংস্কার বানচাল করার প্রস্তাব মতিলালের কাছে পাঠালেন। তাঁব দূত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত কলকাতা এ আই সি সি-তে (নভেম্বর ১৯২২) মতিলাল-আনীত উক্ত প্রস্তাব সমর্থনও করলেন। কিন্তু বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি এবং গযা কংগ্রেসে গান্ধীর দল জিতলে কংগ্রেস নির্বাচন-পন্থী (pro-changer) ও নির্বাচন-বিবোধী (no-changer) উপদলে বিভক্ত হয়ে যায়। গযা কংগ্রেসের সভাপতি দাশ পদত্যাগ কবেন এবং ১৯২৩-এর ১ জানুয়ারি মতিলাল নেহরুব সঙ্গে কংগ্রেস-খিলাফৎ-স্ববাজ পার্টি স্থাপন ঘোষণা কবেন। এ দল তাঁর ভাষায় "a party within the Congress, and as such an integral part of the Congress." কংগ্রেসের নীতির প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করা হল, খিলাফতীদের পক্ষে রাখার জন্য বিদেশী পণ্য, বিদ্যালয় ও আদালত বয়কট এবং গঠনমূলক কর্মসূচি বহাল রাখা হল, শেষ অস্ত্ররূপে আইন অমান্যও বইল। তাঁদেব মতে আইন সভায় যোগদান আইন অমান্যের নীতিকেই ভেতর থেকে সাহায্য করবে।[১৬৮] দাশেব ভাষায় · "The only successful boycott of the Councils is either to bend them in a manner suitable to Swaraj or to end them completely." দাশ হলেন দলের সভাপতি, মতিলাল—সম্পাদক।

এ ব্যাপারে দাশের পাশে দাঁড়ালেন যুগান্তর দলের বিপ্লবীরা। বি· পি· সি· সি·-তে ঢুকলেন ভূপতি মজুমদার, সত্যেন মিত্র, বিপিন গাঙ্গুলী, গোপেন রায়, অমরেন্দ্র চ্যাটার্জী ও মনোরঞ্জন গুপ্ত। এ· আই· সি· সি·-তে গেলেন অমরেন্দ্র চ্যাটার্জী, উপেন ব্যানার্জী, বিপিন গাঙ্গুলী ও সত্যেন মিত্র। গোয়েন্দা বিভাগের মতে দাশের সঙ্গে যুগান্তর বিপ্লবীদের চুক্তি হয় যে তারা সহিংস আন্দোলন শুরু করলেই স্বরাজ পার্টি তাদের সঙ্গ ত্যাগ করবে। সত্যেন মিত্র ও সুভাষ বসু হন স্বরাজ পার্টির সচিব।[১৬৯] প্রথমে অনুশীলন দল দূরে থাকলেও তার মুখপত্র 'শঙ্খ', বারীন্দ্রকুমার ঘোষের 'বিজলী' ও 'আত্মশক্তি' গান্ধীর সমালোচনায় কঠোর হয়ে ওঠে। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ঊনপঞ্চাশী' সেই সময়কার গান্ধী-বিরোধী সুর চমৎকার ধরেছে। গোয়েন্দা বিভাগের মতে ১৯২৩-এর জানুয়ারিতে দাশের অনুগামীদের সংখ্যা খুব বেড়েছিল।[১৭০] এর একটা কারণ 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'প্রবর্তক', 'সারথি' প্রভৃতি পত্রিকায় বিপ্লবীদের দেশপ্রেম ও আত্মদানের ব্যাপক প্রচার।

ফেব্রুয়ারিতে উভয় পক্ষের সমঝোতায় ঠিক হয় এপ্রিলের শেষ পর্যন্ত নির্বাচনী প্রশ্ন

তোলা হবে না। মে মাসে মতিলালকে দাশ লিখছেন, "বাংলা আমাদের মুঠোয় সে বিষয়ে আমার সন্দেহ খুব কম।"[১৭১] জুনে বিপ্লবীদের সাহায্যে বি পি সি সি দখল করলেন তিনি।[১৭২]

বোম্বাই এ আই সি সি (২৬ মে ১৯২৩)-তে আনসারি, সরোজিনী নাইডু ও আজাদ গয়া প্রস্তাবের পক্ষে প্রচার নিষিদ্ধ করতে চাইলে রাজাজী তা বেআইনি ঘোষণা করেন ও ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন। জওহরলালের চেষ্টায় দিল্লীতে কংগ্রেসেব বিশেষ অধিবেশন বসল সেপ্টেম্বর মাসে। সভাপতি আজাদ, মহম্মদ আলি ও বিঠলভাই মিটমাটের চেষ্টা করেন। আজাদের আত্মজীবনীতে পড়ি : "So long as the objective was the same, each group should be free to follow the programme which it considered best." নির্বাচনে যোগ দেবার ও ভেতর থেকে সংস্কার বানচাল করার অনুমতি পান দাশ। বছরের শেষে কাকিনাড়া কংগ্রেসে দাশের জয় সম্পূর্ণ হয়। তার আগেই বি পি সি সি তাঁর দখলে এসেছিল।

স্ববাজ দলের এলাহাবাদ সম্মেলনে স্থির হয় ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস হবে কংগ্রেসের তাৎক্ষণিক লক্ষ্য আর কৌশল হবে আগামী নির্বাচনে প্রার্থী দান। দাশের ভাষায, "আমি জনগণকে বিরোধিতার পথেই নিয়ে যাচ্ছি...আমি চাই আপনাবা কাউন্সিলে সংখ্যাগবিষ্ঠতা অর্জন করুন এবং জাতীয় দাবি তুলুন। আমি চাই আমলাতন্ত্রের সঙ্গে সব দিক থেকে লড়াই করতে—কাউন্সিলের ভেতর থেকে সরকার চালানো অসম্ভব করে, আর বাইরে থেকে অসহযোগ কর্মসূচি জোরদাব করে। এমন দিন আসবে যখন ভেতব ও বাইরেব সম্মিলিত সংগ্রাম আমলাতন্ত্রেব পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠবে।" এই কথাটাই ঘোষিত হয়েছিল মতিলাল বচিত নির্বাচনী প্রচারপত্রে—"immediate effective control of the existing machinery and system of Government."[১৭৩]

আগেই বলা হয়েছে নরমপন্থীরা লিবারেল ফেডাবেশন নামে এক সংগঠন তৈবি করে প্রথম নির্বাচনে দাঁডিয়েছিল। মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ডকে পরামর্শ দিযেছিলেন যত দূব সম্ভব শাসন ও আইন পরিষদের মধ্যে সৌহার্দ্য বজায় রাখতে, আর চাকবিতে বেশি ভারতীয় নিয়োগ করতে। তিনি সাবধান কবে দিযেছিলেন, "যদি ও'ডায়াবী প্রথায ভারত শাসন চালান হয় তা হলে ও'ডায়াবের পুরস্কারই জুটবে।"[১৭৪] উদারপন্থীদেব অনেকেই ছিলেন ধনী—হয় ব্যবহারজীবী, নয ব্যবসায়ী, নয জমিদার। জওহবলালের ভাষায় "bourgeoisdom in excelsis" হলেও এঁবা ব্যক্তি-স্বাধীনতা, সৈন্যবাহিনীর ভারতীয়করণ, আইনের চোখে সাম্য প্রভৃতি মূল্যের সংরক্ষণ ও প্রসারে দৃঢ়সংকল্প ছিলেন। ১৯০৮-এর ফৌজদারী (সংশোধন) আইন পার্ট টু ও ১৯১১-র রাজদ্রোহী-সভা নিরোধক আইন ছাড়া সব দমনমূলক আইন বাতিল করা হল। ১৯২৩ সালে ইলবার্ট বিলের জাতিবৈষম্যমূলক ধারাগুলি সংশোধন করা হল।[১৭৫] এমন কি হোম মেম্বাব পঞ্জাবে সামরিক আইনের বাড়াবাড়ির জন্য দুঃখপ্রকাশ করলেন। এ সবের পেছনে ল মেম্বার সাপ্রুর অবদান অনেক। এশার (Esher) কমিটির প্রস্তাবানুযায়ী ভারতীয়দের অধিকতর সংখ্যায় সামরিক বিভাগে কমিশন দেওয়া হতে থাকে।

মণ্টেগু যখন পদত্যাগ করলেন তখন ভিন্ন এক হাওয়া বইতে শুরু করল। উদারপন্থীদের আশা ছিল কিছুদিন দ্বৈত-শাসন (diarchy) চলার পর ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস মিলবে। ১৯২১-এর ২৯ সেপ্টেম্বর ভারতীয় আইনসভায় সর্বসম্মতিক্রমে বডলাটকে অনুরোধ করা হয় যেন তিনি ভারতসচিবকে ১৯২৯-এর আগেই শাসনসংস্কার পুনর্বিবেচনা করতে বলেন।

এতে সরকার পক্ষেরও সায় ছিল।[১৭৬] কিন্তু নতুন ভারতসচিব লর্ড পীল তাতে ঠাণ্ডা জল ঢাললেন। তাঁর (১৯২৩. জানুয়ারি) ডেসপ্যাচ রাজনৈতিক প্রগতির সম্ভাবনা নাকচ করে দিল। তার আগেই তাঁর মনোভাব জানা গিয়েছিল।[১৭৬ক] উপরন্তু ১৯২২-এর ২ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ যে বক্তৃতা দিলেন ('Steel frame speech' নামে বিখ্যাত) তাতে সাহেবী আমলাতন্ত্রের ভূয়সী প্রশংসা করা হল। এই বক্তৃতা, ভারতসচিবের ভাষায়, "designed to assist recruiting in this country and to encourage our British civil services". অনিচ্ছা সত্ত্বেও বড়লাট তা সমর্থন করতে বাধ্য হলে হৃদয়নাথ কুঞ্জরু, দ্বারকাদাস প্রমুখ উদারপন্থীবা বিরক্ত হলেন। সাপ্রু নাকি পদত্যাগও করতে চেয়েছিলেন। পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে সামরিক বাহিনীর পূর্ণ ভারতীয়করণের প্রস্তাব নাকচ হল। ভাইকাউণ্ট লী (Lee of Fareham)ব সভাপতিত্বে যে রাজকীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠিত হয় (১৯২৩) তা ভাবতীয়করণ নিযে মাথা ঘামায়নি।

বাজেট ঘাটতিব পবিপ্রেক্ষিতে করনীতি নিযেও মনকষাকষি শুরু হল। ১৯২২ সালে দশ বারো কোটি টাকা ঘাটতিব সম্ভাবনা দেখা দেয়। লবণ-কর বৃদ্ধিব প্রস্তাবে সরকাব ভোটে হেরে যায়। পবেব বছর দেখা গেল প্রত্যেকটি প্রাদেশিক সরকারে বাজেট ঘাটতি, কেউই কেন্দ্রীয় সবকাবকে দেয টাকা দিতে পাববে না। লবণ-কর দুগুণ বাড়ানোব প্রস্তাব উঠলে উদারপন্থীরা আবাব প্রতিবাদ জানালেন। কিন্তু হেইলি ও অর্থমন্ত্রী ব্ল্যাকেট তা উড়িয়ে দিলেন। আইনসভায় সবকাব ৫৯-৪৪ ভোটে হেরে গেল। কাউন্সিল অব স্টেট ঘুবে পুনবায় ঐ প্রস্তাব উত্থাপিত হলে আবাব হাবল ৫৮-৪৭ ভোটে। শেষে বিশেষ ক্ষমতাবলে বড়লাট তা ১৯২৪ সাল পর্যন্ত জারি কবলেন।[১৭৭] আইনসভা চাইছিল বিলাতী বস্ত্রেব ওপব শুল্ক বাড়াতে কিন্তু ল্যাঙ্কাশিযবেব প্রতিবাদে ভাবতসচিব রাজি হননি।[১৭৭ক]

শুধু কেন্দ্রীয় নয়, প্রাদেশিক আইনসভাগুলিও বিতর্ক ও বিবোধিতায় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। উত্তর-সামরিক মান্দ্য ও ভ্রান্ত মুদ্রানীতিব জন্য অর্থাভাব ঘনীভূত হচ্ছিল।[১৭৮] ব্যয় কমানোর জন্য ইনচ্‌কেপ্‌ কমিটি বসলেও সুবাহার আশা ছিল না. কাবণ ব্রিটেন সামবিক খাতে বরাদ্দ কমাতে বাজি ছিল না। মুশকিল বাধল মেস্টন অ্যাওয়ার্ড নিযে। মেস্টন স্থিব কবেছিলেন প্রাদেশিক সবকারগুলিকে প্রতি বছব কেন্দ্রকে প্রায দশ কোটি টাকা অনুদান দিতে হবে। নতুন কর না বসালে বা উন্নযনমূলক খাতে প্রচণ্ড কাটছাঁট না করলে সে টাকা দেওয়া সম্ভব নয়। উন্নয়নমূলক দফতরগুলি (যেমন শিক্ষা, স্বায়ত্তশাসন ইত্যাদি) ছেড়ে দেওযা হযেছিল ভাবতীয় মন্ত্রীদেব হাতে। তাঁদেব দফতরের ব্যয-সংকোচ করাব অর্থ মন্ত্রীদেব পৃষ্ঠপোষণেব ক্ষমতা-সংকোচ। তা ছাড়া জনসাধারণেরই বা কি প্রতিক্রিয়া হবে ? সব চেয়ে বড় কথা, অসহযোগীরা অবজ্ঞার হাসি হাসবে।

মেস্টন বিশেষ অবিচার করেছিলেন বাংলাব ক্ষেত্রে। বাংলাকে আয়কর থেকে সংগৃহীত অর্থের অর্ধাংশ এবং পাটের ওপব বসানো করের সবটাই কেন্দ্রকে দিতে হত। অথচ বছরে প্রায় দু কোটি টাকা ঘাটতি দেখা দিয়েছিল। ছোটলাট রোনাল্ডশে (পরে ভারতসচিব মার্কেস অব জেটল্যাণ্ড)র Essayez নামক গ্রন্থে ও রিডিংকে লিখিত (১২ জুলাই ১৯২১) পত্রে উক্ত সংকটের বিশদ বিববণ পাওয়া যাবে। মন্ত্রীরা ঘাটতি দেখে প্রথম বছরেই পদত্যাগ করতে চান। রোনাল্ডশে রিডিংকে লেখেন, "এ ধবনেব আর্থিক বন্দোবস্ত চললে.....বাংলার শাসনযন্ত্র আগাগোড়া নাড়া খাবে।"[১৭৯] অনেক অনুরোধে রিডিং তিন বছরের প্রাপ্য তেষট্টি লাখ টাকা কমান। মণ্টেগুও স্বীকাব করেছেন, "সব প্রদেশই টাকাব জন্য হাহাকার করছে.....সংস্কাবের সাফল্য সম্বন্ধে আমাদের সব আশা হয়ত বিপন্ন, এমন কি বিধ্বস্ত, হবে

আর্থিক অনটনের ফলে।"[১৮০]

রোনাল্ডশের উত্তরাধিকারী লর্ড লিটন্-এর **Pundits and Elephants** গ্রন্থে পড়ি তিনি প্রায় পদত্যাগ করে বসেছিলেন। দেড় বছর নতুন সংস্কার চালু হবার পর পানীয় জল সরবরাহ, মাধ্যমিক শিক্ষা প্রভৃতি যে সব উন্নয়নমূলক কর্মসূচি চূড়ান্ত হয় তাও নির্মম ভাবে ছাঁটাই করতে হল। শিক্ষামন্ত্রী প্রভাসচন্দ্র মিত্র ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কলহ সুবিদিত। জনমত মন্ত্রীদের সমস্যা বুঝতে চাইল না, নৈষ্কর্ম্যের জবাবদিহি চাইল। তার ফায়দা তুলল স্বরাজ দল।

সব প্রদেশেই ছোটলাটরা হস্তান্তবিত (transferred) দফতরেও কর্তৃত্ব চালাতেন। বোম্বাই-এর লাট লয়েডেব ওপর এজন্য অসন্তুষ্ট হলেন মন্ত্রী পরাঞ্জপে। উত্তব প্রদেশেব লাট ম্যারিসের হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে পদত্যাগ করলেন চিন্তামণি ও জগৎনাবায়ণ লাল। মাদ্রাজের উইলিংডন মন্ত্রীদের অধিকতর ক্ষমতা দিতে চান। রিডিং তা বাতিল করেন। বাংলার মন্ত্রীদের কি করুণ অবস্থা হয়েছিল, তা জানা যায়, মন্ত্রীদেব নানা আক্ষেপে। এখানে ইউবোপীয় কমিশনাব ও বিভাগীয় সচিবদের ধৃষ্টতা তো ছিলই, তদুপবি সুগঠিত ইউরোপীয দল একদিকে সুবেন্দ্রনাথেব উদারপন্থী দল ও অন্যদিকে আবদাব বহিম ও নবাব আলি চৌধুবীর সাম্প্রদায়িক দলের মধ্যে সমতা রক্ষা কবত। ক্ষমতায থাকবার জন্য উদারপন্থীদের অনেক অবাঞ্ছিত কাজ কবতে হত, এমন কি সাম্প্রদাযিক শক্তিব সঙ্গে সমঝোতাও। সুরেন্দ্রনাথ কলকাতা কর্পোবেশন বিলেব সমর্থন আদায কবেন ন বছবেব জন্য সাম্প্রদায়িক ভোট-দান প্রথা মেনে নিযে। আশিটি কমিশনাবের আসনেব মধ্যে পনেরোটি মুসলিমদেব জন্য সংবক্ষিত হয এবং তাব জন্য শুধু মুসলিমবাই ভোট দিতে পাবত।[১৮১]

বিডিং নরমপন্থীদের সম্বন্ধে মন্তব্য কবেছিলেন, " The moderate presents a very dull and dreary appearance as compared with the Swarajist." উদাবপন্থীদের অন্যতম দুর্বলতা—কংগ্রেস বা লীগেব মত তাদেব কোন জনসমর্থন ছিল না। তিন বছরের মধ্যে একবারও নিজেব কেন্দ্রে যাননি অনেকে। না ছিল বলিষ্ঠ সংগঠন, না সদস্যপদ নিযে নিয়মকানুন, না দলীয় কোষাগাব। এমন কি সেবকম নেতাও ছিলেন না যাঁব ত্যাগ ও দুঃখববণের দ্যুতিতে দল উদ্‌ভাসিত হতে পাবে। সংবাদ মাধ্যমে তাঁদেব যে চিত্র অঙ্কিত হচ্ছিল[১৮২] তা আমলাতন্ত্রের মতই মসীলিপ্ত। যে সবকারেব প্রসাদলাভেব জন্য তারা এত ক্ষতি স্বীকার করেছিল সে সরকাব হয নীরব দর্শক, না হয কঠোব সমালোচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। বড়লাট স্বীকাব করেছেন জনগণকে উপহাব দেবাব মত কোন সংস্কার তাদেব হাতে তুলে দেওয়া হয়নি। অন্য দিকে স্বরাজ দলে ছিলেন দাশেব মত উদ্যমী নেতা, বিপ্লবী ও কংগ্রেসী উভয় সংগঠন যাঁর মুঠোয়, আব যিনি জানেন গান্ধীব নামেব জাদু শ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীবীর মত ব্যবহার করতে।[১৮৩] তুরুপেব তাস ছিল হিন্দু-মুসলিম চুক্তি, যদ্দ্বারা দাশ ভোট ভাগ হতে দেননি।

দ্বিতীয় কাউন্সিলেব নির্বাচনে স্বরাজ দলের সাফল্য ছিল অবধাবিত। কেন্দ্রীয় আইনসভায় ১০১টি নির্বাচিত আসনের মধ্যে তারা পেল ৪৫টি। বাংলা আইন পবিষদে ৪৭, বোম্বাইতে ৩২, উত্তর প্রদেশে ২৯, আসামে ১৩ এবং সি পি-তে সংখ্যাগরিষ্ঠতা (৫৪-র মধ্যে ৪১) লাভ করল তারা। রিডিং লিখছেন, "ওরা প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে সরকাবের জোরালো প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াবে।"[১৮৪] কেন্দ্রে ইণ্ডেপেণ্ডেন্ট পার্টির সঙ্গে সমঝোতা করে ন্যাশানালিস্ট পার্টিরূপে তাদের শক্তি আবও বাড়ে।

ব্রুমফিল্‌ডের ভাষায় দাশ সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ও জনসাধারণের মধ্যে সেতু রচনা করেন।

জেলা ও প্রাদেশিক কংগ্রেসের কর্তৃত্ব অধিকার করতে বিপ্লবীদের তিনি কাজে লাগিয়েছেন সন্দেহ নেই, তবে নিজে তিনি বিপ্লবী মতবাদে বিশ্বাস করতেন এটা মনে করা ভুল। ব্রুমফিল্ড তাঁকে **'a leader being led'** বলেও ঠিক করেননি। মতিলাল, জয়াকর বা কেলকারের সঙ্গে বিপ্লবীদের কোন যোগই ছিল না। গান্ধীর মত দাশও গ্রামকেই দেশ গঠনের ভিত্তি করতে চেয়েছিলেন এবং তা প্রাদেশিক বা কেন্দ্রীয় স্বায়ত্তশাসনের চেয়ে বেশি জরুরী মনে করতেন। মুসলমান সম্বন্ধে হিন্দু ভদ্রলোকের যে ভীতিমিশ্রিত বিরাগ লক্ষ করা যায়, দাশ তার উর্ধ্বে বিরাজ করতেন। তার প্রমাণ হিন্দু মুসলমান প্যাক্ট। আলাপ-আলোচনা দরকষাকষি, সমঝোতা—ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সর্ববিধ সম্পর্কের রাস্তা খুলে রেখেছিলেন তিনি। আর কূটকচালি, দল ভাঙাগড়া প্রভৃতি পবিষদীয় রাজনৈতিক চালে বিশেষ পারদর্শিতা ছিল তাঁর। দাশ সম্বন্ধে গ্যালাহার বলতে বাধ্য হয়েছেন—**"the most brilliant opportunist in Indian politics, virtuoso of agitation, broker between irreconcilables, gambler for glittering stakes."**[১৮৫]

সি. পি-র ছোটলাট স্ববাজ দলেব নেতা মুঞ্জেকে মন্ত্রিসভা গঠন কবতে বললেন এবং তিনি প্রত্যাখ্যান করায় দু'জন মন্ত্রীকে মনোনয়ন দিলেন। স্বরাজ দল অনাযাসে এদেব বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবে জযী হল। নানা খাতে ব্যয়বরাদ্দ বন্ধ কবা ছাড়াও মন্ত্রীদেব বেতন বছরে দু টাকা করে ধার্য কবা হল। ছোটলাট তাঁর সংকটকালীন ক্ষমতা প্রযোগ করতে বাধ্য হলেন। মার্চে মন্ত্রীরা পদত্যাগ কবলে তিনি হস্তান্তরিত দফতর নিজ হাতে নিলেন। অর্থাৎ ডায়ার্কি বানচাল হল।

১৯২৩-এব নির্বাচনে বাংলা কাউন্সিলে ১৩৮ জন সদস্যের মধ্যে সাধাবণ আসন সংখ্যা ছিল ৩৯, সংবক্ষিত মুসলিম আসন—৪৬। দ্বিতীয় দল না ভাঙালে সংখ্যাগবিষ্ঠতা অসম্ভব দেখে দাশ মুসলমানদেব সঙ্গে এক চুক্তি করলেন (১৮ ডিসেম্বব ১৯২৩)। তিনি কথা দিলেন—স্বরাজ লাভেব পর আইন পবিষদে সংখ্যানুপাতে মুসলমানদেব আসন সংখ্যা নির্দিষ্ট হবে ও স্বতন্ত্র নির্বাচন বহাল থাকবে। মিউনিসিপ্যালিটি, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড প্রভৃতিতে তাবা পাবে ৬০% আসন। চাকুরিব ৫৫% তাদের জন্য সংবক্ষিত হবে ও যতদিন সে হাব না আসে ৮০% পর্যন্ত চাকুবি দেওয়া যেতে পারে। আপাতত কলকাতা কর্পোরেশনে তাদের অধিকতর সংখ্যায় নিয়োগ করা হবে, মসজিদের সামনে গানবাজনা বন্ধ করা হবে ও ঈদের সময় গোহত্যায় বাধা দেওয়া হবে না।[১৮৬] বাংলা প্রাদেশিক খিলাফৎ কমিটি, এমন কি 'মুসলমান'-এর মত কাগজও বলল—এটা লক্ষ্ণৌ চুক্তির চেযে ঢের ভাল। এই চুক্তির ফলে স্বরাজ দল অনেকগুলি মুসলিম আসন জিতল। তাদের মোট আসন সংখ্যা দাঁড়াল ৪৭-এ। এতদিনের প্রবীণ, অভিজ্ঞ, সর্বজনমান্য সুরেন্দ্রনাথও নবীন ডাক্তাব বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে পরাজয় বরণ করলেন। উনিশ জন নির্দল সদস্যের নেতা ছিলেন ব্যোমকেশ চক্রবর্তী। মন্ত্রীদের পেছনে ছিল ৩০ জনের একটা দল, আর ইউরোপীয় ইঙ্গভারতীয় ১৮ জন। মনোনীত ২৬ জনও তাদেব সমর্থন করত।[১৮৭] দাশ অবশ্যই মন্ত্রিত্ব প্রত্যাখ্যান করলেন। ব্যোমকেশকে পাত্তা না দিয়ে লিটন একটা জোড়াতালি দেওয়া কোয়ালিশন তৈরি করলেন যারা সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, ফজলুল হক ও গজনভির মন্ত্রিসভাকে সমর্থন জানাবে। ক্রুদ্ধ চক্রবর্তী দাশের সঙ্গে যোগ দিলেন। সুরেন মল্লিকের নির্বাচন আদালতের আদেশে বাতিল হলে তাঁর দফতর নিলেন মুসলিম মন্ত্রিদ্বয়। ফলে দু'জন নির্দল নরমপন্থী স্বরাজ দলের সংখ্যা বাড়াল। ১৯২৪-এর মার্চে বিরোধী দল পুলিশ ছাড়া সংরক্ষিত সব দফতরের

ব্যয়বরাদ্দ প্রত্যাখ্যান করল আর শুধু শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মচারীদের নয় স্বয়ং মন্ত্রিদ্বয়ের মাইনের অনুদানও নাকচ করে দিল।[১৮৮] লিটন স্বরাজ দলের বিরুদ্ধে উৎকোচ প্রদানের অভিযোগ এনেছেন।[১৮৯] কিন্তু নিজেও তিনি কম যান না। তাঁর মুখ্যসচিব পাল্টা ঘুষের কথা ভাবেন[১৯০] এবং ফজলল হকও তাই চেয়েছিলেন।[১৯১]

বিশেষ ক্ষমতাবলে লিটন মন্ত্রীদের বেতন বরাদ্দ করতে চান। কিন্তু রিডিং এটা সংস্কার বিধিবর্হিভূত বলে আপত্তি জানালে মন্ত্রীরা আপাতত বিনা বেতনে কাজ করতে রাজি হলেন।

একসিকিউটিভ কাউন্সিলার আবদার রহিম পরামর্শ দিলেন—এতে হবে না, মুসলিমদের দিয়ে একটা দল গড়তে হবে। তাই হয়। কিন্তু চতুর দাশ বেতন নিয়ে ভোট হবার আগেই আদালত থেকে ইনজাংশন আনেন। রুল বদলাবার পর ১৯২৪-এর আগস্ট মাসে নতুন করে উপস্থাপিত দাবি দ্বিতীয়বারের জন্য নাকচ হয়ে যায়। ৩৭ জন নির্বাচিত মুসলমানের মধ্যে ১৯ জনই বিপক্ষে ভোট দেন। মন্ত্রীরা এবার পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। হস্তান্তরিত বিভাগের ক্ষমতা গেল ছোটলাটের হাতে। কার্যত ডায়ার্কি বানচাল হল।

ইতিমধ্যে কলকাতা কর্পোরেশনের কর্তৃত্ব মেয়র দাশ ও প্রধান কার্যনির্বাহিক সুভাষচন্দ্র বসুর হাতে যাওয়ায় ইউরোপীয় বণিক-শিল্পপতি গোষ্ঠী খুব চিন্তিত হন।[১৯২] ডায়ার্কি ও ব্রিটিশ স্বার্থে লিটন আর এক চাল চালেন। বিপ্লবী দমন জরুরী হয়ে উঠেছে[১৯২ক] এবং দাশ তাতে মদৎ দিচ্ছেন এই অজুহাতে তিনি ১৯২৪-এর ২৫ ডিসেম্বর এক অধ্যাদেশ জারি করেন। তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল স্বরাজ দলে ভাঙন ধরান। ১৯২৫-এর জানুয়ারিতে উক্ত অধ্যাদেশ বিলরূপে উপস্থাপিত হলে কাউন্সিল ৬৬-৯ ভোটে অনুমতি দিতে আপত্তি করল। এবার লিটন মন্মথনাথ রায় চৌধুরী ও নবাব আলি চৌধুরীকে মন্ত্রী করেছেন। কিন্তু ক্রুদ্ধ চক্রবর্তীর দল ও ফজলল হককে হাত করে, কিছু সদস্যকে টাকা দিয়ে, বিরোধী পক্ষ এবারও তাদের বেতন নামঞ্জুর করেছিল (২৩ মার্চ ১৯২৫)। পরাভূত লিটন ১৯২৭ পর্যন্ত ডায়ার্কি মুলতুবি রাখতে বাধ্য হলেন।[১৯৩] দাশের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল। তাঁকে অসদুপায় নিতে হয়েছিল বটে কিন্তু শঠে শাঠ্যম্ নীতি অনুসরণ করে কাউন্সিলের ভেতরে ঢুকে শাসনসংস্কার বানচাল করতে পেরেছিলেন তিনি।

কেন্দ্রে স্বরাজ দল, কিছু স্বতন্ত্র সদস্য ও জিন্নার ইণ্ডেপেণ্ডেন্ট দল মিলে দাঁড়িয়েছিল ৭০ জনের ন্যাশানালিস্ট পার্টি। তার নেতা হলেন মতিলাল নেহরু। ১৯২৪-এর ৮ ফেব্রুয়ারি টি রঙ্গচারিয়ার প্রস্তাব আনলেন, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস প্রদানের ভিত্তিতে ১৯১৯-এর সংস্কার পরিবর্তিত করা হোক। মতিলাল সংশোধনী আনলেন—এতদুদ্দেশ্যে গোলটেবিল বৈঠক ডাকা হোক। বিতর্কের সময় তিনি বললেন, "আমরা, স্বরাজ দলের লোকরা, এখানে সহযোগিতা করতে এসেছি। যদি সরকার তা চান আমরা তাদের লোক হব, যদি না চান তা হলে আমরা স্বাধিকার রক্ষার্থ অসহযোগিতা করব।"[১৯৪] তাঁর নরম সুরের কারণ ছিল। ইণ্ডেপেণ্ডেটরা শর্ত করিয়ে নিয়েছিল যে সম্মিলিত দলের তৃতীয় চতুর্থাংশের ভোট ছাড়া বানচাল করার নীতি প্রয়োগ করা চলবে না। হোম মেম্বর হেইলির আপত্তি সত্ত্বেও মতিলালের সংশোধনী ৭৬-৪৮ ভোটে গৃহীত হয়।

ইতিমধ্যে ইংল্যাণ্ডে এসেছে র‍্যামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ডের সংখ্যালঘু শ্রমিক সরকার। তা জাতীয় দাবি প্রত্যাখ্যান করল। নতুন ভারতসচিব লর্ড অলিভিয়রের বক্তৃতায় ক্ষুণ্ণ হয়ে স্বরাজ দল বাজেটের আয় খাতে চারটি দাবি প্রত্যাখ্যান করল।[১৯৫] আমদানি শুল্ক নামঞ্জুর

হল ৭ ভোটে, আয়কর মাত্র ১ ভোটে, লবণকর ৯ ভোটে ও আফিম শুল্ক পাঁচ ভোটে। ফিনান্স বিল তিন ভোটের জন্য উত্থাপনেব সম্মতি পেল না। ভোটের অবস্থা দেখে বোঝা যায় নেহরুকে সাবধানে চলতে হচ্ছিল এবং বারংবাব ইণ্ডেপেণ্ডেন্টদের বোঝাতে হচ্ছিল স্বরাজ দল 'wreckers' নয়। ১৯২৪-এর দ্বিতীয়ার্ধে ইস্পাত শিল্প সংরক্ষণ বিলের জন্য যে সিলেক্ট কমিটি গঠিত হয় তাতে অংশ নিল স্ববাজ দল এবং তারই সাহায্যে বিলটি গৃহীত হয়। আসল ব্যাপাব. নেতা মতিলাল নেহরুব সঙ্গে জিন্না সাহেবের বনছিল না। জিন্নাকে ভাঙিয়ে নেবার চেষ্টা করছিলেন বড়লাট। তাঁর ভাষায়, **"Jinnah evidently thought that by the terms of the alliance he would be sitting in the driving seat of the motor car holding the steering wheel, with Motilal Nehru beside him powerless to control except by means of advice. The exact opposite resulted. Motilal Nehru was in the driving seat and Jinnah was scarcely even beside him; but his party inside the car, being driven along without realising whither they were going or what would happen."**[১৯৬] তা ছাড়াও বিডিং স্বরাজ দলের প্রতিনিধিদের লণ্ডনে গিয়ে ক্যাবিনেট কমিটির সঙ্গে আলোচনায বাগড়া দেন, এমন কি মুডিম্যান কমিটি থেকেও তাদের বাদ দেন। তিনি জিন্নাকে হাত করতে পেরেছিলেন। ১৯২৫-এর ২৫ ফেব্রুয়ারি মতিলাল রেলওয়ে বোর্ডের দাবি প্রত্যাখ্যান করার প্রস্তাব আনলে জিন্না প্রকাশ্যে তাঁর বিরোধিতা করেন ও সবকার বহু ভোটে জেতে।[১৯৭] একসিকিউটিভ কাউন্সিলের ব্যয়বরাদ্দ নাকচ হলেও বড়লাটেব গৃহস্থালিব ব্যয় ও সৈন্যবাহিনীর ব্যয় অনুমোদনে অসুবিধা হয়নি। এখানেও জিন্নার সহযোগিতার কথা স্বীকার করেছেন রিডিং।[১৯৮] লবণেব কর আট আনা ও পরে বারো আনায কমিয়ে আনতে চাইল স্ববাজীবা। আবার সরকাবকে বাঁচালেন জিন্না। বড়লাটের উল্লসিত ভাষায়, **".....for once we have the spectacle in the Assembly of the Government case being championed by independents and others..."**।[১৯৯]

দাশের ও মতিলালের অন্য এক প্রতিবন্ধক ছিলেন গান্ধী। জেল থেকে বেরুবার পর দীর্ঘদিন তিনি স্বরাজী কর্মপন্থার সরব সমালোচনা করেছিলেন। প্রথমে পুণায় গান্ধী, মতিলাল ও লাজপৎ রায়ের কথা হয়, পরে জুহুতে দাশ ও নেহরুর সঙ্গে। গান্ধী বলেন, তাঁর সঙ্গে স্বরাজীদের মতানৈক্য সামান্য নয়। কাউন্সিলে প্রবেশ বর্তমান সরকারে অংশ গ্রহণেরই শামিল, আইন প্রণয়নে বাধা দান হিংসারই নামান্তর, এতে গঠনমূলক কর্ম ব্যাহত হয়েছে, কাউন্সিল প্রবেশের অর্থ খিলাফৎ ও পঞ্জাবের পক্ষত্যাগ।[২০০] তবে দিল্লীতে কাকিনাড়া প্রস্তাবানুযায়ী তিনি স্বরাজীদের আপন পরীক্ষা করতে দিতে রাজি হন।[২০১] উত্তরে দাশ ও নেহরু বলেন, **'obstruction'**-এর অর্থ **"resistance to the obstruction placed in our path to Swaraj by the bureaucratic Government."** বাজেটে তাঁরা আপত্তি তুলবেন কাবণ তার এক সপ্তমাংশ মাত্র ভোটাধীন এবং অধিকাংশই সামরিক খাতে ব্যয় হয়। আমলাতন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্য যে প্রস্তাব বা বিল আনা প্রয়োজন তাও স্বরাজীরা আনবেন। তবে আইনসভার বাইরে গঠনমূলক কাজে তাঁদের আপত্তি নেই। জুনে গান্ধী স্বরাজীদের কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে বললেন। মতিলাল উত্তরে জানালেন স্বরাজীরা আপন কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত, তাদের পদত্যাগ করতে হবে কেন? আগস্টের শেষেও গান্ধী কংগ্রেসের সদস্য হবার শর্ত রূপে

খাদি-সংক্রান্ত নীতির ওপর জোব দিয়েছিলেন।[২০১ক]

দাশ সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনে আর এক বোমা ছুঁড়লেন বিপ্লবী গোপীনাথ সাহার বীরত্ব ও দেশপ্রেমের প্রশংসামূলক প্রস্তাব পাস করিয়ে।[২০২] গান্ধী এর মধ্যে অহিংসা নীতির ওপর প্রচ্ছন্ন আক্রমণ লক্ষ করবেন, এতে আশ্চর্য কি ! আমেদাবাদ এ আই সি সি (জুন ১৯২৪)-তে গান্ধী আপন কর্তৃত্ব পুনবায় প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন কিন্তু স্বরাজীরা তা বানচাল করল। তিনি প্রস্তাব আনলেন কংগ্রেসীদের বাধ্যতামূলক ভাবে সুতো কাটতে হবে এবং না কবলে শাস্তি পেতে হবে। স্বরাজীরা প্রতিবাদ জানিয়ে সভাকক্ষ ত্যাগ করলেন। গান্ধী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হলেন। আর এক প্রস্তাবে (ভুলক্রমে) ডে সাহেবকে হত্যা করাব অপরাধে গোপীনাথ সাহাকে নিন্দা করতে চান তিনি। অর্থাৎ সিরাজগঞ্জের পাল্টা প্রস্তাব। দাশ তীব্র আপত্তি জানান কিন্তু তাঁর সংশোধনী মাত্র আট ভোটে হেরে গেল। গান্ধী প্রকাশ্যে অশ্রু বিসর্জন করেন। এত অল্প ব্যবধানে জয়কে তিনি নৈতিক পবাজয়েব তুল্য মনে করলেন। গোয়েন্দা দফতর জানাচ্ছেন, “from a seemıng victory Gandhı has been forced into a retreat.”[২০৩] জনমতেব ওপব দাশ ও নেহরুর আধিপত্য স্থাপিত হল।[২০৪] গান্ধী বাস্তববাদী ছিলেন। পবিবর্তিত অবস্থা স্বীকার করে নিয়ে তিনি বিদেশী বস্ত্র ছাডা আর সব বর্জননীতি স্থগিত রাখলেন. সুতোকাটা. সাম্প্রদাযিক সৌহার্দ্য ও অস্পৃশ্যতা দূবীকবণের ওপব জোব দিলেন এবং স্ববাজীদেব কাউন্সিলে কাজ কবে যাবাব নীতি মেনে নিলেন।

সন্দেহ নেই, বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স জারি কবে ও স্ববাজ দলেব বিরুদ্ধে ব্যাপক ধরপাকডের নীতি গ্রহণ কবে সরকার স্বরাজী ও গান্ধীবাদীদেব কাছাকাছি এনে দেয়। গান্ধীজী স্ববাজবাদীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদের অপবাদ প্রত্যাখ্যান কবলেন. দমননীতিকে তিনি আখ্যা দিলেন, “weapon of uncivilised minority living among millions.” কলকাতায় এসে স্ববাজীদের সঙ্গে এক চুক্তি করলেন তিনি, কাউন্সিলে তাদের কাজকে কংগ্রেসেরই কাজ বলে মেনে নিলেন, পরে বোম্বে এ আই সি সি-তে তাদের কাজের প্রশস্তি গাইলেন, শেষে বেলগাঁও কংগ্রেসের সভাপতিরূপে স্বরাজী নেতৃবৃন্দের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। পাঁচ দফা বয়কট ও গঠনমূলক কাজে পূর্ণ বিশ্বাসী হয়েও তিনি বললেন—কাজ ও প্রভাব বিস্তারের দ্বারা স্বরাজীরা কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা অর্জন করেছে—“the Swaraj party represents a strong and growing minority ın the Congress.....(it) cannot be expected to surrender the advantage it posseses. After all it wants the advantage not for itself but for service of the country.” কংগ্রেস তো শুধু পরিবর্তনবিরোধীদের নয়, পরিবর্তনপন্থীদেরও। চরখা ও কাউন্সিলেব সহবাস তিনি মানতে রাজি।[২০৫] কংগ্রেস গঠনমূলক কাজের ভার নিল আর স্বরাজ্য পার্টি ‘কংগ্রেসের পক্ষে’ আইনসভাব কাজ। রিডিং বেলগাঁও কংগ্রেসে গান্ধীর সকরুণ পরিণতির ওপর মন্তব্য করছেন : “Gandhi is now attached to the tail of Das and Nehru. It is pathetic to observe the rapıd decline in the power of Gandhi and the frantic attempts he is now making to cling to his position as leader at the expense of practically every principle he has hitherto advocated.”[২০৬]

॥ ৯ ॥

গান্ধী গঠনমূলক কাজের ক্ষেত্র হিসেবে গ্রাম বেছে নিয়েছিলেন, দাশ বেছে নিলেন লোক্যাল বোর্ড, ম্যুনিসিপ্যালিটি ও করপোরেশন। রাজনৈতিক ক্ষমতার দিক থেকে দ্বিতীয়টার গুরুত্ব. বেশি। প্রথমত, এখানেই আমলাতন্ত্রের মূলোচ্ছেদ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, এখানেই ভারতীয়দের স্বায়ত্তশাসন যোগ্যতার পরীক্ষা। ১৯২৩ ও ১৯২৪ বিভিন্ন নির্বাচনে স্বরাজ দল উত্তর প্রদেশ ও বাংলায় উল্লেখযোগ্যভাবে এবং বিহার, ওড়িশা, গুজরাট ও মাদ্রাজে কিয়ৎ পরিমাণে সাফল্য অর্জন করে।[২০৭] ইউ.পি-র লাট ম্যারিস স্বরাজীদের কাজের প্রশংসা করেন। বাংলায় মেদিনীপুর, মৈমনসিংহ, দিনাজপুর, নদীয়া ও যশোরে তারা জেতে। বীরেন শাসমল মেদিনীপুর জেলাবোর্ডের সভাপতি হন। তাঁর অক্লান্ত চেষ্টায় পানীয় জল সরবরাহ ও ডাক্তারখানা স্থাপনের কিছুটা উন্নতি হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ব্যয় ১৯২৩ ও ১৯২৫-এর মধ্যে দ্বিগুণ বাড়ে।

কিন্তু গোলমাল দেখা দিল ১৯২৪-এ কলকাতা করপোরেশনের নির্বাচনের পর। সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে দাশ নিজেই মেয়রের পদ গ্রহণ করেন কিন্তু প্রধান কার্যনির্বাহিকের পদ নিয়ে বিরোধ বাধল সুভাষ বসু ও বীরেন শাসমলের মধ্যে। শুধু কলকাতার কায়স্থ গোষ্ঠীকে খুশি করতে আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েও মাহিষ্যবংশীয় শাসমলকে প্রধান কার্যনির্বাহিক করতে পারলেন না দাশ, রজতকান্ত রায়ের এ মন্তব্য পুরো সত্য নয়। মুসলমান দল ও যুগান্তর দল বসুকে সমর্থন করে।[২০৮] সর্বোপরি সুভাষের প্রতি বয়ঃজ্যেষ্ঠ দাশের প্রগাঢ় স্নেহ ও বিশ্বাস অকারণ ছিল না। ইউরোপীয় গোষ্ঠী অবশ্যই খুশি হয়নি, কারণ এতদিন কবপোরেশন ছিল তাদের স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্র। দাশের নয়দফা কার্যসূচি অনুসারে উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছিল। এর অধিকাংশই শহরের গরীবদের কল্যাণার্থে গৃহীত। অবশ্যই এর পেছনে মার্কসবাদ কাজ করেনি। করেছিল বিবেকানন্দ-র 'দরিদ্র নারায়ণ' ভাবনা।[২০৯] প্রাথমিক শিক্ষা. চিকিৎসা ও জল সরববাহের ক্ষেত্রে উন্নতি হয়েছিল। প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ১৯২৩-এ ছিল ১৯, ১৯২৭-এ তা দাঁড়ায় ১৫০ এবং ১৯৩১-এ ২২৫-এ।[২০৯ক] এর জন্য সুভাষের বন্ধু ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ধন্যবাদার্হ। খাঁটি দুধ সরবরাহের জন্য কো-অপারেটিভ দুগ্ধ সমিতি স্থাপনও উল্লেখযোগ্য। এখন থেকে অধিকাংশ কনট্রাক্ট ভারতীয়দের দেওয়া হতে থাকে। সরকারের সঙ্গে কনট্রাক্ট নিয়ে বাদানুবাদ শুরু হয়। সরকার স্বরাজীদের বিরুদ্ধে স্বজনপোষণ ও ঘুষ দেওয়ার অভিযোগ আনে। লিটন বলেন, হগমার্কেটের দোকানদাবদের কাছ থেকে তিলক স্বরাজ ভাণ্ডারের জন্য জোর করে চাঁদা আদায় করা হচ্ছে।[২১০] রিডিং তাঁকে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করেন। স্বরাজ দলের হিসেব দেখে গান্ধী তাদের সততার সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন।[২১১]

কিন্তু বাজেট বরাদ্দ নাকচ করে, গান্ধীকে বশ করে বা ম্যুনিসিপ্যালিটি-করপোরেশন ভাল চালিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত নাড়ানো যায় না। লিটন ডায়ার্কি চালাতে পারেননি, কিন্তু শাসন-যন্ত্র তাতে বিকল হয়নি। বাজেট বরাদ্দ পুরো নাকচ হলেও বড়লাটের তা বহাল করার সংস্কারসম্মত ক্ষমতা ছিল এবং তিনি তা প্রয়োগও করেন। জাতীয় দাবি নিয়ে ম্যাকডোনালড্ ও অলিভিয়ের কথাবার্তা বলতে চাইলে রিডিং তা বানচাল করে দেন। কেন্দ্রীয় আইনসভায় স্বরাজী ও ইণ্ডেপেণ্ডেন্টদের মধ্যে তিনি ফাটল ধরাতে পেরেছিলেন এবং ক্রমবর্ধমান হিন্দু-মুসলিম বিরোধে উৎসাহিত হয়েছিলেন। দাশের হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট

কাকিনাড়া কংগ্রেসে গান্ধীবাদীদের আপাত্তর ফলে গৃহীত না হওয়ায় মুসলমানরা বিরক্ত হয়েছিল।[২১২] মুশারফ হুসেন বাংলা আইন পরিষদে মুসলমানদের জন্য ৮০% সরকারী চাকুরি দাবি করে হিন্দুদের আরও উত্তেজিত করেন। দলের ওপর সন্ত্রাসবাদীদের চাপবৃদ্ধি দাশ পছন্দ করেননি।[২১২ক] আবার অর্ডিন্যান্স-রাজও নয়। ৭২ জন বন্দীর মধ্যে ৬০ জনই ছিলেন স্বরাজ দলের।[২১২খ]

এই পরিপ্রেক্ষিতে দাশ-লিটনের কথাবার্তা ব্যাখ্যা করতে হবে। রিডিং লিটনকে জানিয়েছিলেন দাশ হিংসা সমর্থন সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করলে কিছু শাসনতান্ত্রিক সুবিধা দেওয়া যেতে পারে। ভারতসচিব বার্কেনহেডকে লিটন ৩০ জুলাই লিখছেন, দাশের জীবনের শেষ বছরে (১৯২৫) দু'তিনবার এক দূতের মাধ্যমে দাশ তাঁর কাছে বার্তা পাঠান। তার ফলে স্টিফেনসনের সঙ্গে দাশের কথা হয়। শীতকালে তাঁর সঙ্গেও একবার দেখা হয়।[২১৩] ২০ নভেম্বর লিটন জানান, দাশ চান মন্ত্রীরা সচিব নিয়োগ করবেন, গ্রাম সংগঠনে মোটা অর্থ পাবেন এবং কিছু সংরক্ষিত দফ্‌তরের কর্তৃত্ব পাবেন। ২৮ নভেম্বরের তাঁর আর এক চিঠিতে পড়ি দাশ ও নেহরু নীতিগতভাবে বিরোধিতা তুলে নেবেন যদি সরকার আরও কিছু দফ্‌তর ভারতীয়দের হাতে ছেড়ে দেন এবং অধ্যাদেশবলে বন্দী কিছু নেতাকে জামিন নিয়ে মুক্তি দেন।[২১৪] ১৯২৫-এর ২৯ মার্চ দাশ হিংসার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিবৃতি দেন। এমনকি, লিটনের মতে, নিজে বাইরে থেকে, দলকে মন্ত্রিত্ব নিতে দেবেন এমন কথাও বলেন।[২১৫] পার্লামেন্টে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স নিয়ে বিতর্কে বার্কেনহেড দাশকে আরও একটু এগিয়ে আসতে আহ্বান জানান। তাঁর মতে দাশের কথাবার্তায় অনেক অস্পষ্টতা রয়ে গিয়েছে, তা সম্পূর্ণ নয়।[২১৬]

ফরিদপুর কনফারেন্সে দাশ দলের লোকদের সামনে কোনো বাস্তব ব্রিটিশ প্রস্তাব পেশ করতে পারেননি, অথচ হিংসামূলক কাজ বন্ধ করতে বলেছিলেন। সভাপতির ভাষণে তিনি ব্রিটেনকে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস (স্বরাজ নয়) দিতে অনুরোধ জানান।[২১৭] এতে বিপ্লবীরা তীব্র আপত্তি তোলেন। বাংলার অস্থায়ী ছোটলাট কের (Kerr) লেখেন তাঁর দল প্রায় দু'ভাগ হয়ে গেছে। তিনি আরও গোলমাল এড়াতে দার্জিলিঙ রওনা হয়ে গেছেন।[২১৮] রিডিং তখন বিলেত গেছেন। দাশের আশা—তাঁর প্রস্তাব যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে আলোচিত হবে এবং গৃহীত হবে। মতিলালকে মৃত্যুর তিন দিন আগেও তিনি লিখছেন, "**I believe something may come out of the Reading-Birkenhead conversations which are going on about India (between April and August). I fear that you do not attach any importance to them. You may be right but something tells one that they will make some kind of proposal to us.**"[২১৯]

মৃত্যুহীন প্রাণ দান করে কিন্তু অপূর্ণ আশা নিয়ে তিনি চলে গেলেন। তিনি জানতেও পারেননি যে বার্কেনহেডের সঙ্গে রিডিং ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করতে যাননি, মুডিম্যান কমিটির রিপোর্ট নিয়ে সরকারি নীতি কি হবে স্থির করতে গিয়েছিলেন। লিটন ভারত সচিবকে সাবধান করে দিয়েছেন কয়েকদিন আগে, দাশ এমন লোক নন যাঁর সম্বন্ধে খুব বেশি চিন্তা করেতে হবে। "**He has shown himself to be a leader who commonly follows, he dare not break with the extreme section of the party although I have no doubt that he is personally opposed to violent methods.**" কিন্তু তিনি যখন দলের কট্টর অনুচরদের চিন্তা বা কাজের ওপর

প্রভাব রাখতে পারছেন না[২২০], তখন ব্রিটেনের কাছে তাঁর সহযোগিতার মূল্য নেই। "As an opponent he has ceased to be formidable, as a friend he will be useless."[২২১] বার্কেনহেড তাঁর সঙ্গে একমত হন।[২২২] লিটন একটা নিষ্ঠুর সত্য কথা বলেছিলেন, "Politically speaking... C. R. Das died at Faridpur।[২২৩]

ব্যক্তিগত ট্রাজেডিতে দাশ ও গোখ্‌লে তুলনীয়।

দাশের অমূলক আশা স্বরাজপন্থী রাজনীতির দুর্বলতারই দ্যোতক। মর্লের কাছে গোখ্‌লের প্রত্যাশা যেমন প্রহসনে পরিণত হয়েছিল, তেমনি রিডিং-বার্কেনহেডের কাছে দাশের প্রত্যাশা। অথচ অতুলনীয় দেশপ্রেম, ত্যাগ, সংগঠনশক্তি, গণ-আবেদন সবই তাঁর ছিল। সহযোদ্ধারা ছিলেন নিজ নিজ ক্ষেত্রে কৃতী এবং নিবেদিত। তবু কেন এমন হল ? বাইরে থেকে বাংলা স্বরাজ দলের কর্মসমিতি গুণিজনের সমাহাব মনে হলেও তাঁদের অন্তর্দ্বন্দ্বই দুর্বলতার অন্যতম কারণ। তাঁর মৃত্যুর পর করপোরেশন ও দলের কর্তৃত্ব নিয়ে লজ্জাজনক কলহ তাব প্রমাণ। দ্বিতীয় কাবণ, লক্ষ্য অযৌক্তিক না হলেও উপায় অনেক ক্ষেত্রে অবাস্তব ছিল। হিন্দু-মুসলিম প্যাক্টের জন্য দেশবন্ধু শ্রদ্ধেয়, কিন্তু মন্ত্রীদের বেতন নামঞ্জুর করে ডায়ার্কির পতন ঘটাতে তাঁকে চাকুবি ও অর্থ দরাজ হাতে বিতবণ কবতে হয়েছিল। তৃতীয়ত, এই প্যাক্টের জন্য রক্ষণশীল হিন্দুদের বিবাগভাজন হন তিনি, অথচ প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিমদের আস্থা অর্জন করতে পারেননি। করপোরেশনে মুসলিমদের বেশি সংখ্যায় চাকুরি দেওয়ায় জি ডি বিড়লা গান্ধীর কাছে নালিশ করেন (যদিও ফল হয়নি)।[২২৪] 'মোহাম্মদী' ও 'মোসলেম হিতৈষী' অন্য সম্প্রদায়ের মনোভাবেব ওপব আলোকপাত করে। ব্রিটিশ ধনতন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত বাংলার অর্থনীতি এত চাকুবিই-বা যোগাবে কি করে ? সরকার ভালভাবেই জানতেন এমন 'সুবিধাবাদী বিবাহ' বেশিদিন টিকবে না। চতুর্থত, শ্রমিক সংগঠনের ব্যাপারে দেশবন্ধুর কোন সত্যকার উৎসাহ দেখি না। কৃষকদের ঋণমকুব বা ভাগচাষীদেব স্বার্থরক্ষায়ও তিনি ব্যর্থ হন দলীয় জমিদার-মহাজন শক্তির প্রতিবন্ধকতায়। বাংলার গ্রামাঞ্চলে শ্রেণীসংগ্রাম যে কোন সময সাম্প্রদায়িক সংগ্রামের রূপ নিত, দাশ সেই মৌল দ্বন্দ্বের নিরসন করতে পারেননি। পঞ্চমত, হিংসায় বিশ্বাস না কবলেও বাজনৈতিক কারণে তার প্রতিবাদও তিনি করতে পাবেননি, বরং গোপীনাথ সাহার পক্ষ নিয়ে সিরাজগঞ্জ ও এ আই সি সি-তে লড়াই করেছেন। এইচ ডব্লু হেল দেখাচ্ছেন কংগ্রেস সংগঠনে ঢুকে বিপ্লবীরা ১৯২৩ সাল থেকে পুরাতন পথে ফিরে যায়।[২২৫] এরই পরিণতি টেগার্ট সন্দেহে ডে-হত্যা। দাশ পলাতক বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীকে সাহায্য করেন ও তাঁব সহকর্মী সত্যেন মিত্রকে স্বরাজ দলের সম্পাদক নিযুক্ত করেন।[২২৬] এঁরা শেষপর্যন্ত ফরিদপুর কনফারেন্সে তাঁর বিরুদ্ধেই গিয়েছিলেন। কিন্তু মন্ত্রীদের বেতন না-মঞ্জুর করে দাশ যেমন আমলাতন্ত্রে মরণাঘাত হানতে পারেননি, বিপ্লবীবাদীদেব ক্রিয়াকলাপও ব্রিটিশ সরকারকে আলোচনার পথে আনতে পারেনি। বার্কেনহেড স্পষ্টই বলেছিলেন "The door to acceleration (of reforms) is not open to menace. Still less will it be stormed by violence." তিনি বরং স্বরাজীদের চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সর্বসম্মত এক শাসনতন্ত্র তৈরি করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

দুর্ভাগ্যবশত বাংলার স্বরাজ দল দাশের মৃত্যুর পর প্রায় ভেঙে যেতে বসল। দাশেব শূন্য আসন নেবেন কে ? তাঁরই সঞ্চিত ও ধারকরা টাকায় দল চলত ; তিনি নরম, গরম, হিন্দু, মুসলমান, গ্রাম ও শহর-এর একটা কাজচলা সমন্বয় তৈরি করতে পেরেছিলেন শুধু আপন ব্যক্তিত্ব ও ত্যাগের মহিমায় ; তাঁরই বুদ্ধি, বিচক্ষণতা ও সাহস গান্ধীর মত প্রতিপক্ষকে

নির্বীর্য করেছিল। অদৃষ্টের পরিহাস, সেই গান্ধীর শরণ নিতে হল দাশের উত্তরাধিকারী নির্বাচনে। গোয়েন্দা দফতরের মতে প্রথমে তিনি অরবিন্দকে ফিরে আসতে অনুরোধ জানান এবং তাতে ব্যর্থ হয়ে, আজাদের পরামর্শে, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মস্তকে স্বরাজ দলের নেতৃত্ব, কলিকাতা করপোরেশনের মেয়র পদ ও প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতিত্ব রূপ 'ত্রিমুকুট' পরিয়ে দেন। বলা বাহুল্য, বিভেদপ্রবণ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী বাঙালীদের অনেকেই এটা পছন্দ করেননি।[২২৭] সেই থেকে বাংলার কংগ্রেসী রাজনীতিতে যে দলাদলির বীজ রোপিত হল, আজ তা বিষবৃক্ষে পরিণত।

কেন্দ্রে দাশের ঐতিহ্য কিছুদিন বজায় রাখলেন মতিলাল নেহরু। বার্কেনহেড চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন ভারতীয় দলগুলি সর্বসম্মতিক্রমে একটা সংবিধান তৈরি করুক। এই চ্যালেঞ্জ বিরোধীদের একটা স্বল্পস্থায়ী ঐক্য দিয়েছিল। মুডিম্যান কমিটির (সংখ্যাগরিষ্ঠের) রিপোর্ট গ্রহণের সরকারী প্রস্তাবের যে সংশোধনী মতিলাল আনেন, অনেকেই তাকে দ্বিতীয় 'জাতীয় দাবি' আখ্যা দিয়েছেন। ৭২-৪৫ ভোটে তা গৃহীত হয়। জিন্নার মত লোকও বাজকীয় কমিশন নিয়োগের দাবি তোলেন। তবে অবস্থা বুঝে মতিলাল গোলটেবিল বৈঠকের ওপর জোর দেননি। তাঁর নরমপন্থীদের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ক্ষণিক ঐক্য ক্ষণেই ভেঙে গেল। কেন্দ্রীয় বিধানসভার বাচস্পতি নির্বাচনে জিন্না সমর্থন কবলেন বঙ্গচারিয়ারকে ও নেহরু বিটলভাইকে। মতিলাল স্কীন কমিটির সদস্য হলে কিছু স্বরাজী প্রশ্ন তোলেন অসহযোগিতার নীতি কি করে এসব কাজ সমর্থন করে? সি.পি-তে তাম্বে একসিকিউটিভ কাউন্সিলার হলেন। মদত দিলেন মুঞ্জে। মতিলাল পাল্টা আক্রমণ চালালেন। মহারাষ্ট্রের কেলকার ও জয়াকর মতিলালকে লিখলেন, "এখন সব ক্ষমতা, প্রভাব ও উদ্যোগ-সমন্বিত পদ দখল করাব সময় এসেছে।"[২২৮] ১৯২৫-এর ১ নভেম্বর নাগপুর সম্মেলনে 'responsive cooperation' প্রশ্নে মতিলাল ও মারাঠী নেতাদের বাদানুবাদ হল। তার আগে সেপ্টেম্বরে পাটনা এ· আই· সি· সি· তে 'নো চেঞ্জার' পট্টভি সীতারামায়ার সঙ্গে মতিলালের দারুণ ঝগড়া হয়ে গেছে। সরকার পক্ষের ব্যাসিল ব্ল্যাকেট সব কাজগুলোকেই সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা আখ্যা দিলেন।

বাংলায় দাশের উত্তরাধিকারী নির্বাচন প্রসঙ্গ আগেই তুলেছি। সেখানে অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্য আইন পরিষদের বাচস্পতি নির্বাচনে ও কবপোরেশনের অলডারম্যান নির্বাচনে স্বরাজ দল হার মানল।[২২৯] সেনগুপ্ত, শাসমল ও তুলসী গোস্বামীর দলাদলি শুরু হল। বিপ্লবীদের মধ্যেও অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল এবং এক একটা গোষ্ঠী এক এক পক্ষ নিল।[২৩০] কর্মীসংঘ নামক যুগান্তর-এর এক গোষ্ঠী সেনগুপ্তর পক্ষ নেয় কিন্তু তাদের সুরেশ দাশ ও অমবেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি ও পঞ্চপ্রধান[২৩০ক] নানাভাবে উত্যক্ত করেন। সেনগুপ্তকে বি পি সি সি-র সভাপতির পদ ছাডতে বাধ্য কবা হয়। তাঁরা শাসমলকে ডেকে আনেন কিন্তু বিপ্লবীরা তাঁকে কোনওদিন পছন্দ করতেন না। তিনিও কৃষ্ণনগর প্রাদেশিক সম্মেলনে সন্ত্রাসবাদের বিরোধিতা করেন। তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হলে যতীন্দ্রমোহন আপোস করলেন পঞ্চপ্রধান ও কর্মীসংঘের সঙ্গে। কিন্তু এঁদের চাপে তিনি হিন্দু মুসলিম প্যাক্ট বিসর্জন দেন ও মুসলিম স্বরাজীবা বিরক্ত হয়ে দলত্যাগ করে। পবে যুগান্তব ও পঞ্চপ্রধান (১৯২৭-এ মুক্ত) সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন জানায়, অনুশীলন সেনগুপ্তকে। উভয়ের বাদানুবাদ প্রতিফলিত হয় বিভিন্ন স্তরের নির্বাচনে, সংবাদ মাধ্যমে এবং মতিলালকে লেখা চিঠিতে—যাতে সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত হয়েছিলেন তিনি।[২৩১] ১৯২৮-এর মেয়র নির্বাচনে সুভাষচন্দ্র হার মানেন।[২৩২] কলকাতা কংগ্রেসের সময় একটা সাময়িক নিষ্পত্তি হয়। সেনগুপ্ত হন অভ্যর্থনা সমিতির

সভাপতি, বিধানচন্দ্র রায় তাঁর সচিব ও সুভাষচন্দ্র স্বেচ্ছাসেবী দলের সর্বাধিনায়ক। বসুর পেছনে এখন থেকে দেখা যায় হেমচন্দ্র ঘোষের অধীন বি ভি গ্রুপকে।

হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক চিড় খেল এতে। প্যাক্ট পরিত্যক্ত হওয়ায় সুরাবর্দিরা ইণ্ডেপেণ্ডেন্ট মুসলিম পার্টি গড়েন। হিন্দু-মুসলিম বিরোধের ফলে চক্রবর্তী-গজনভি ও মশারফ হোসেন-মিত্র মন্ত্রিসভা স্বল্পস্থায়ী হয়। স্যার আবদার রহিম সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে ইন্ধন দেন।[২৩২ক] লিটনের ইঙ্গিতে জেলার আমলারা মুসলিমদের সংঘবদ্ধ করতে এমনকি মুসলিম-নমঃশূদ্র রায়তদের ঐক্য গড়তে তৎপর হয়।[২৩৩] লোক্যাল বোর্ড ও ম্যুনিসিপ্যালিটির নির্বাচনে সাম্প্রদায়িকতা বাড়ে। নানা কারণে বাংলার বাইরেও উত্তেজনা বাড়ছিল। শেষে ১৯২৩-এ কোহাটে ও ১৯২৬ সালের এপ্রিলে কলকাতার ভয়াবহ দাঙ্গায় তা ফেটে পড়ে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সব রাজনৈতিক দরকষাকষি ও আপোস মূল্যহীন হয়ে পড়ে।[২৩৪]

এসব সংঘর্ষ মূলত খিলাফৎ আন্দোলনের ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়া। গান্ধীকে বন্দী করার পূর্বেই সাফি ও আগা খাঁর চেষ্টায় এবং বিডিং-এর প্রচ্ছন্ন সমর্থনে খিলাফতীরা কংগ্রেস ছেড়ে আসছিল। ১৯২৪ সালে কামাল আতাতুর্ক যখন খলিফার পদ তুলে দিলেন তখন হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির কোনো নৈতিক ভিত্তিও রইল না। খলিকুজ্জমান Pathway to Pakistan গ্রন্থে এই সময়কার বিভ্রান্তির চিত্র তুলে ধরেছেন। কংগ্রেসী মুসলিমদেব মধ্যেও 'প্রোচেঞ্জার' 'নো-চেঞ্জারে' বিবাদ বাধল। ফলে মুসলিম সংহতি বোধের প্রতীক—কুরবানি, মসজিদের পবিত্রতা, ইত্যাদি—বড়ো হয়ে উঠল। ১৯২৩-এ মালব্যের নেতৃত্বে হিন্দু মহাসভার উত্থান, শ্রদ্ধানন্দ কর্তৃক মালকানা রাজপুত গোষ্ঠীব হিন্দুকরণ, আর্যসমাজের নেতৃত্বে শুদ্ধি ও সংগঠন কিচলুকে প্রণোদিত করল সমান্তরাল তান্‌জিম ও জামিয়ৎকে তবলিগ আন্দোলনে।[২৩৫] মনে রাখা দরকার ১৯২৫-এ নাগপুরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রধানত ব্যাঙ্কাব, বণিক, উকিল, জমিদাররা (যেমন পঞ্জাবেব রাজা নরেন্দ্রনাথ ও বিহারের দ্বারভাঙার মহাবাজা) ছিলেন হিন্দু সংগঠনগুলিব পৃষ্ঠপোষক। মুশিরুল মুঞ্জের ডায়েরি থেকে দেখিয়েছেন তাঁর মতামত খুব উগ্র ছিল। তবু মনে বাখতে হবে এক হাতে তালি বাজে না। মোপলা বিদ্রোহ, সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন কিছু খিলাফতীর কার্যকলাপ, ইউ.পি.ও পঞ্জাবের কিছু ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ভুললে চলবে না। আগেই দেখিয়েছি খিলাফৎ আন্দোলনের সঙ্গে স্বরাজ আন্দোলন যুক্ত করে গান্ধী পবোক্ষভাবে মৌলবাদী উলেমাদেব প্রশ্রয় দিয়েছিলেন।

বারি পাদপ্রদীপের সামনে থেকে অপসৃত হয়ে ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন।[২৩৬] মহম্মদ আলিও বাদ যাননা। ফরওয়ার্ড তাঁব সম্বন্ধে ঠিকই লিখেছে—"a nationalist in the winter season and a communalist in summer।"[২৩৭] কোহাট দাঙ্গার পর গান্ধীব সঙ্গে শৌকতের বিতর্ক ভুললে চলবে না।[২৩৭ক] লাজপৎ আবার গান্ধীকে পক্ষপাতিত্বের জন্য দায়ী করেন।[২৩৮]

গান্ধী উভযপক্ষকে থামাবার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে একুশ দিনেব অনশনব্রত নিলেন। য়ুনিটি কনফারেন্সে কোন লাভ হয়নি।

১৯২৫-এ সবসুদ্ধ ষোল ও ১৯২৬-এ ২৫টি দাঙ্গা হয, যাব মধ্যে সব চেয়ে ভয়াবহ দাঙ্গা বাধে কলকাতায়।[২৩৯] মসজিদের সামনে আর্যসমাজী শোভাযাত্রা কালে বাদ্যভাণ্ড ২-১৫ এপ্রিলের দাঙ্গার তাৎক্ষণিক কারণ। 'মোহাম্মদী'র মাধ্যমে ফজলল হকের সাম্প্রদায়িকতা প্রচার যেমন দায়ী, তেমনি দায়ী দারোয়ান ও জমাদারদের ধর্মের জন্য প্রাণ দিতে মালব্যের

ডাক।[২৪০] সুরাবর্দির পাঠান গুণ্ডা আল্লাবক্স পেশওয়ারি ১৫ জুলাই-এর দাঙ্গা বাধায়।[২৪১] কলকাতা ডকে আবার দাঙ্গা হয় সেপ্টেম্বরে। দাঙ্গা পরে মফস্বলে ছড়িয়ে পড়ে।[২৪২] এর মধ্যে জন্মাষ্টমীর সময় ঢাকার দাঙ্গা কুখ্যাত। মৈমনসিংহের জেলাধিকারিক হিন্দু জমিদার ও মুসলিম তালুকদার-জোতদারদের প্রতিযোগিতা, বঙ্গীয় প্রজাসত্ত্ব আইন সংশোধনী বিলে হিন্দু বিরোধিতা, মুসলিমদের সংখ্যাবৃদ্ধি, আর্থিক সচ্ছলতা ও শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের বর্ধমান আগ্রহ প্রভৃতিকে দায়ী করেছেন। কিন্তু তিনিও মুসলিম মৌলবাদকে ছেড়ে কথা বলেননি।[২৪৩] ১৯২৬-এর সর্বাপেক্ষা দুঃখবহ ঘটনা শ্রদ্ধানন্দ হত্যা। এর জন্য উভয় পক্ষের প্রচার—পাল্টা প্রচার ও সংঘর্ষ দায়ী। মুঞ্জে "মোসলেম লাঠি"র পাশে "ব্রিটিশ মেশিনগান"ও দেখলেন।

ঘটনাপ্রবাহে সরকারের আনন্দ আর ধরে না। হারকোর্ট বাটলার রিডিংকে লিখলেন, **"Hindu and Mussalman hate each other so much that they have not much time to hate us."** ১৯২৬-এর নির্বাচনের ওপর সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের কালো ছায়া নামল। গান্ধী কোনদিনই কাউন্সিলী রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। এখন তাঁর মনে হল সর্বপ্রথম সাম্প্রদায়িক বা গোষ্ঠীভিত্তিতে নির্বাচন বন্ধ করতে হবে। **"A common electorate must impartially elect its representatives on the sole ground of merit."** চাকুরির সংস্থানও হবে গুণগত নিরিখে। ফজল-ই-হোসেনকে তিনি লিখলেন, মুসলমানদেব স্বতন্ত্র নির্বাচনাধিকার দিলে অন্য সম্প্রদায়, এমনকি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সম্প্রদায়ও তা চাইবে। **"This must mean ruin of nationalism."**[২৪৪] মহম্মদ আলি এ সব শুনে চটে গিয়ে জওহরলালকে লেখেন, এ সব মালব্যের কীর্তি।[২৪৫] গান্ধী পুরো ১৯২৬ সালে রাজনীতি থেকে সরে গেলেন। তাঁর কর্মসূচি হল খাদি প্রচার, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও গোরক্ষণ। রিডিং ও আরউইন ভাবলেন, আপদ বিদায় হল। কিন্তু আসলে এ বিদায় নয়, কুরুক্ষেত্রের পূর্বের অজ্ঞাতবাস।

কেন্দ্রীয় স্বরাজ দলেও ভাঙন ধরল। ১৯২৫-এর শেষেই মারাঠী 'রেসপনসিভিস্ট' দলের সঙ্গে মতিলালের ঝগড়া বেধেছিল। মতিলালের স্বৈরাচারী ব্যবহার ও বাদশাহী মেজাজে তিতিবিরক্ত হয়েছিলেন কেলকার ও জয়াকর। মতিলাল গান্ধীর কাছে নালিশ জানান, মারাঠীরা অসহযোগে নীতিতে আদৌ বিশ্বাসী নয়।[২৪৬] উত্তরে জয়াকর বলেন, সহযোগিতার বাকী আর কি রয়েছে?[২৪৭] বোম্বাইতে ও পরে কানপুব কংগ্রেসে (১৯২৫) এই দুই গোষ্ঠীর আপোস হল না। লক্ষণীয় যে উভয় গোষ্ঠীই গান্ধীর কাছে নালিশ করছেন। আরো লক্ষণীয় গান্ধী মতিলালের সঙ্গে সুর মিলিয়ে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের বিরোধিতা করছেন। ফলে কেলকার, জয়াকর ও মুঞ্জে স্বরাজ দল থেকে বেরিয়ে গিয়ে রেসপনসিভ কো-অপারেশন দল গড়েন। মালব্য ও রঙ্গচারিয়ার ইণ্ডেপেণ্ডেন্ট পার্টি ত্যাগ করেন। বোম্বাইতে (৩ এপ্রিল, ১৯২৬) উভয় গোষ্ঠীর ও উদারপন্থীদের যে আঁতাত তৈরি হয়—তার নাম দ্য ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল পার্টি।[২৪৮] আইনঅমান্য ও কর বর্জন এ দলেব কর্মসূচিতে স্থান পায়নি। এঁরা প্রয়োজনে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার জন্য তৈরি ছিলেন। সবরমতীতে আর একবার স্বরাজ দলের ঐক্য আনার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু আরুইন সানন্দে জানাচ্ছেন তা সফল হয়নি। এই ডামাডোলে স্বরাজীরা ১৯২৬-এর ৮ মার্চ কেন্দ্রীয় আইনসভা ছেড়ে আসে। তারা বাইরের লোকদের কাছে ঘরের বিবাদের কথা ফাঁস করতে চায়নি। ক্রুদ্ধ মতিলাল ছেলের কাছে লিখেছিলেন, **"The Malaviya-Lala gang aided by Birlas' money are making frantic efforts to capture the**

Congress."[২৪৯] জওহরলাল আত্মজীবনীতে লিখছেন, মালব্যের দল " a motley crowd of title-holders, big land-holders, industrialists and others."[২৫০] ১৯২৬-এর ২৮ মার্চ গান্ধী বিড়লাকে লেখেন, "When we compare the two creeds (of the Nationalist Party of Lalaji and Malavyaji and the Swarajya Party of Motilal) the Swarajya Party's creed is certainly more commendable though both are inferior to non-cooperation." [২৫০ক]

বলা বাহুল্য, ১৯২৬-এর শেষে যে নির্বাচন হল তাতে আসাম, বিহার ও মাদ্রাজ ছাড়া অন্যত্র স্বরাজপন্থীদের ভরাডুবি ঘটল। পঞ্জাবে. হিন্দুসভা স্বরাজীদের প্রধান প্রতিপক্ষ। লাজপত একটা নয়, দুটো কেন্দ্রে, স্বরাজীদের হারালেন। ইউ.পি.থেকে একমাত্র হিন্দু স্বরাজী জিতলেন—তিনি স্বয়ং মতিলাল।[২৫১] বাংলায়—বাজবন্দী মুক্তির দাবিতে স্বরাজীরা কিছু সুবিধা করলেও মুসলিম সমর্থন হারাল। মহারাষ্ট্র ও সি.পি-তেও সুবিধা হল না রেসপনসিভিষ্ট দলের বিরোধিতায। বড়লাট মন্তব্য করছেন, "The Mahomedan defection from the Swarajist Party in Bengal is very significant."[২৫২] সেখানে ৩৯টি মুসলিম আসনের ৩৮টিতেই সরকাব সমর্থকরা জেতে। বাংলায় ও সি.পি-তে পুনরায় ডায়ার্কি চালু হল। কেন্দ্রীয় আইনসভায স্বরাজীরা পেল মাত্র ৩৫টি আসন। কেন্দ্রে স্বরাজীদের উগ্রতা অনেকাংশে প্রশমিত হল। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিলের ব্যাপারে তারা সহযোগিতাও করল। সি.পি-তে তারা মন্ত্রিত্বও নিল। ভারতসচিব সোল্লাসে ঘোষণা করলেন, "The Swarajists are down. The Hindu-Muslim dissensions have destroyed Gandhi's dream."[২৫৩]

অবস্থা অতটা খারাপ হয়নি। গৌহাটি কংগ্রেস (১৯২৬) শুধু মন্ত্রিত্ব গ্রহণে আপত্তি জানাল না, অন্য দলকে মন্ত্রিত্ব গ্রহণে সমর্থন করতেও নয়। যে সব শর্ত কংগ্রেস দিল তা মোটামুটি ফরিদপুরে উপস্থাপিত দাশের শর্তের অনুরূপ, তবে নূতনত্বের মধ্যে, গান্ধীব কথা শুনে, দেশের পক্ষে কল্যাণকর প্রস্তাব ও বিল আনতে রাজি হল। গৌহাটিতে দেখা গেল রেসপনসিভিষ্ট, ইণ্ডেপেণ্ডেন্ট, নরমপন্থী স্বরাজী ও তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের সঙ্গে লড়াই করতে মতিলাল গান্ধীর ওপর নির্ভর করছেন।

এতে কংগ্রেসের মধ্যে ঐক্য ফিরে আসেনি। বোম্বে কাউন্সিলে কেলকার-জয়াকর গোষ্ঠীর সঙ্গে নরীম্যান গোষ্ঠীর মতদ্বৈধ হল। বাংলায় স্বরাজীরা শাসমলকে মেদিনীপুর কেন্দ্রে হারাল, কখনও যতীন্দ্রমোহনের পক্ষে, কখনও বিপক্ষে জড়িয়ে পড়ল, এমন কি আবদার রহিমের মত উগ্র সাম্প্রদায়িক নেতার সঙ্গে যোগ দিয়ে 'গজ-চক্র' মন্ত্রিসভার পতন ঘটাল। মাদ্রাজে স্বরাজীদের সাহায্যে সুব্বারাওয়ের মন্ত্রিসভা গঠিত হল। যেহেতু এ ধরনের সমর্থন গৌহাটি কংগ্রেসেব প্রস্তাব বিরোধী, অনেকে আপত্তি জানাল। তবু সত্যমূর্তি ও মুদালিয়ার মাদ্রাজের লাট গসচেনের সঙ্গে ভাব রেখে চললেন।[২৫৪] এ সব দেখে কে এম মুনশী মন্তব্য করেছিলেন, "At present, like a moth-eaten cloth, the Congress Committee is more holes than cloth."

কংগ্রেসের ঐক্য ফিরিয়ে আনতে হলে আবার তাকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার পথে ফিরে যেতে হবে—এ বোধ জওহরলাল, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার প্রভৃতি অনেক তরুণ নেতাদের হয়েছিল। গান্ধী তো জানতেন কাউন্সিলের রাজনীতির পরিণতি এমনি হবে। এপ্রিলে শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারকে তিনি লিখলেন, "The more I study the Council's work,

the effect of the entry into the Council upon public life, its repercussions upon the Hindu-Muslim question, the more convinced I become not only of the futility but the inadvisability of Council -entry."[২৫৪ক] দ্বিতীয় সমস্যা—হিন্দু-মুসলিম সংহতিসাধন। এখানেও গান্ধীর মনে হয়েছিল শুদ্ধি, সংগঠন, তানজিম, তবলিগ, এ সব অতি তুচ্ছ জিনিস বড় হয়ে উঠছে যৌথ কর্মযজ্ঞের অভাবে। হিন্দু ও মুসলিমদের কিছু কিছু দুর্বলতা আছে, আর তাব থেকে আসে ভয়, ভয় থেকে পারস্পরিক অবিশ্বাস। দুই সম্প্রদাযকে স্বরাজসাধনায় ও গঠনমূলক কাজে না মেলাতে পারলে দাঙ্গা চলবে। তিনি মিটিং করে প্রস্তাব নিয়ে এ সমস্যা সমাধান হবে বলে মনে করতেন না, তাই ১৯২৭ আগস্টের সিমলা বা নভেম্বরের কলকাতা ঐক্য সম্মেলনে যোগ দেননি।[২৫৫] গান্ধী মোটামুটি দাশের প্যাক্ট সমর্থন করতেন এবং পঞ্জাবে ও বাংলার মুসলমানদের জন্য উদাবতর ব্যবস্থার পক্ষে ছিলেন। কিন্তু লাজপৎ ও মালব্যেব সাহায্য না পেলে তা করবেন কি ভাবে?

১৯২৭-এব ২০ মার্চ জিন্নার সভাপতিত্বে দিল্লীতে মুসলিম নেতাদের এক সভা হয়। তাতে যৌথ ভোটদান প্রথা গৃহীত হয়। কিন্তু বাংলা ও পঞ্জাবের সংখ্যালঘু হিন্দু লোকসংখ্যার ভিত্তিতে আসন বণ্টনের প্রতিবাদ করে। সিন্ধুকে বোম্বাই থেকে স্বতন্ত্র করার মুসলমানদের প্রস্তাব জয়রামদাস দৌলতরাম নাকচ করে দেন। অন্যদিকে জিন্নার প্রস্তাবও লীগেব সকলে মেনে নেযনি। পঞ্জাবের ফজল-ই-হোসেন, সাফি, ইকবাল প্রভৃতি নেতা পৃথক নির্বাচন ত্যাগ করতে রাজি ছিলেন না। ফজল-ই আবার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রেও পৃথক নির্বাচন চালু করেন। তাঁর মহাজন বিরোধী আইন পশ্চিম পঞ্জাবে অরোরা স্বার্থ ব্যাহত করে। অবশ্যই হিন্দুসভা অরোরা পক্ষ নেয। বাংলাব আবদার রহিম ও সীমান্তের আবদুল কৈয়ুম ফজল-ই-দের সমর্থন করেছিলেন। ১৯২৭-এর (৩-৭ মে) লাহোরের দাঙ্গা পরিস্থিতি আরও ঘোরালো করে ও তা বিহার, ইউ পি, সি পি-তে ছড়ায়। জিন্না, আনসাবিদেব চেষ্টা বানচাল শুধু সাফি, ফজল-ই করেননি, মালব্য, মুঞ্জে, লাজপতও তাতে সাহায্য করেন।[২৫৬]

সাম্প্রদায়িকতার তুরুপ ব্যবহারে সফল হলেও নতুন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তির অভ্যুদয় ঘটছে টের পাচ্ছিলেন আরুইন। প্রথমত, কংগ্রেসের মধ্যে সংগ্রামী যুবশক্তির নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র। দ্বিতীয়ত, কংগ্রেসের বাইরে সাম্যবাদী চিন্তাধারা সক্রিয় হয়ে উঠছিল এবং তাদের নেতৃত্বে কৃষক-মজদুর আন্দোলন জন্মলাভ করছিল। ১৯২৭-এ ব্রাসেলসে অনুষ্ঠিত ঔপনিবেশিক শোষণ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে যোগ দেবার আগেই নেহরু সমাজতন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ১৯২০-২১-এ উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে স্বচক্ষে কৃষকদের যে দুর্দশা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন তার স্মৃতি ভুলবার নয়। সুভাষচন্দ্রের ট্রেড ইউনিয়ান সংক্রান্ত কার্যকলাপ দেশবন্ধুর ঐতিহ্যানুসারী। তৃতীয়ত, শচীন সান্যাল ও যোগেশ চ্যাটার্জির হিন্দুস্থান রিপাব্লিকান অ্যাসোসিয়েশন গঠন ও কাকোরি ট্রেন ডাকাতি বুঝিয়ে দেয় সন্ত্রাসবাদ মরেনি। এর সঙ্গে যুক্ত হয় ভগৎ সিং-এর দল। ১৯২৮-এ গঠিত হয় হিন্দুস্থান সোশ্যালিস্ট রিপাব্লিকান আর্মি।

॥ ১০ ॥

উনিশশো বিশ-এর ১৭ অক্টোবর মানবেন্দ্রনাথ রায় সুদূর তাসখন্দে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[২৫৭] তিনি, এবং অনেক সময় কমিনটার্ন, টাকা, বই, বা দূত পাঠিয়ে গান্ধীবাদে বীতশ্রদ্ধ তরুণদের, বিশেষত রায় তাঁর সন্ত্রাসবাদী-জীবনের সহকর্মীদের, মার্কসবাদী লেনিনবাদী চিন্তাধারার সংস্পর্শে এবং কমিনটার্নের প্রভাবমণ্ডলে আনার চেষ্টা করতেন। বাংলায় যে পার্টিকেন্দ্র স্থাপিত হয় তার প্রাণপুরুষ ছিলেন মুজফ্‌ফর আহমেদ।[২৫৮] বোম্বাই-এর ডাঙ্গে, নিম্বকার, নাদকার্নি, দেশপাণ্ডে, জোগলেকার প্রভৃতি তরুণ ১৯২১-এই গান্ধীবাদে আস্থা হারিয়েছিলেন, তাঁরাও মার্কসবাদী সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছিলেন। মাদ্রাজ ও লাহোরে আরও দুটি কেন্দ্র গড়ে ওঠে। বারদৌলি আন্দোলন পরিত্যক্ত হওয়ায় কৃষকরা গান্ধীর নেতৃত্ব সম্বন্ধে হতাশ হয়েছিল আর শ্রমিকদের সঙ্গে ১৯১৮ সালের পর থেকে তাঁর সম্পর্ক ছিল না। রায় বুঝতে পেরেছিলেন নবধর্মে দীক্ষিত হওয়ার জন্য বিরাট এক ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে আছে। কম্যুনিস্ট ইনটারন্যাশনাল আহমেদ ও ডাঙ্গের মধ্যে, এবং পরে বিভিন্ন প্রান্তের কম্যুনিস্টদের নেতাদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনে ব্রতী হয়েছিল। নানাভাবে অনুশীলন ও যুগান্তর দলের কিছু বিপ্লবী এঁদের সংস্পর্শে আসেন, যেমন বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত ও জীবনলাল চ্যাটার্জী। বিপ্লবীদের অবশ্য আসল উদ্দেশ্য ছিল অস্ত্র সংগ্রহ। রায় নানাভাবে চিত্তরঞ্জনকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন। তাঁর সুর ছিল চড়া গান্ধীবিরোধী।

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সঙ্গে কম্যুনিস্টদের কি ধরনের সম্পর্ক গড়ে উঠবে। এই প্রসঙ্গে মানবেন্দ্রনাথ রায় ও লেনিন ভিন্ন ধারণা পোষণ করতেন।[২৫৯] ১৯২০-এর আগস্ট মাসে কমিণ্টার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসে রায় যে থিসিস রাখেন লেনিন নিজের হাতে তা অনেকখানি বদলে দেন। ১৯২২-এর নভেম্বরে-ডিসেম্বরে কমিণ্টার্নের চতুর্থ কংগ্রেস উপনিবেশসমূহের কম্যুনিস্টদের নির্দেশ দেয় যে তারা যেন জাতীয়তাবাদী সংগ্রামে অংশ নেয়। ১৯২৪-এ পঞ্চম কংগ্রেস তাদের দল গঠন করতে বলে এবং সমাজবাদী আন্দোলন বজায় রেখে জাতীয় সংগ্রামে লিপ্ত হতে বলে। রায়ের নির্দেশে চমনলাল, ডাঙ্গে ও সিঙ্গারভেলু ট্রেড য়ুনিয়ান কংগ্রেস দখল করতে চেষ্টা পান। কলকাতায় ১৯২৪ সালে দাশের সভাপতিত্বে যে চতুর্থ AITUC-র সভা হয়, তাতে এঁদের অংশগ্রহণ করতে দেখি। গোয়েন্দা দফতরের কর্তা মন্তব্য করেন, কম্যুনিস্টরা সন্ত্রাসবাদী ও উগ্র জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে একটা বিপজ্জনক 'tactical position' পাবার চেষ্টা করছে।

মস্কো থেকে শিক্ষা নিয়ে নলিনী গুপ্ত ও অবনী মুখার্জী আগেই এসেছিলেন। শৌকত উসমানি ভারতে আসেন ১৯২২ সালে এবং সম্পূর্ণনন্দ ও জওহরলালের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ব্রিটেনে শিক্ষাপ্রাপ্ত পার্সি গ্ল্যাডিং ও জর্জ অ্যালিসন আসেন কাছাকাছি সময়ে। ১৯২৫-এ কানপুরের সম্মেলনে সি পি আই জন্ম নেয়।[২৬০] সরকার এতটা বাড়াবাড়ি সহ্য করতে না পেরে এদের কানপুর ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িয়ে ফেলে। তথাপি ব্রিটেন থেকে আসেন ফিলিপ স্প্র্যাট, বেন ব্র্যাডলি, ও সাপুরজি সাকলাতওয়ালা। রায়ের ভ্যানগার্ড পত্রিকা প্রায় অবাধেই আসত। এদেশের একদা-সন্ত্রাসবাদী ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (বিবেকানন্দর কনিষ্ঠ ভ্রাতা) ছিলেন একাই এক শো। তাঁর বহুবিস্তীর্ণ প্রভাবের কথা স্বীকার করেছেন সি পি আই (এম)-এর রাজ্য সভাপতি সরোজ মুখোপাধ্যায়।[২৬১] ডাঙ্গের 'সোস্যালিস্ট', আহমেদের 'নবযুগ', নজরুলের 'ধূমকেতু' প্রভৃতি পত্রিকা কম্যুনিজম প্রচারের

উল্লেখযোগ্য মাধ্যম হয়ে উঠেছিল। আহমেদের মতে নজরুল আবেদন করতেন "মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তরুণদের দরবারে।" যুগান্তর-পন্থীরা মনে করত 'ধূমকেতু' তাদেরই কাগজ।

বুদ্ধিমানের মত রায় পার্টির দুটো রূপ বজায় রাখতে চেয়েছিলেন—একটা বাইরের, যা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বামপন্থী পক্ষ হিসেবে কাজ করবে, তাকে আরো বেশি করে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী করবে ; অন্যটা গোপন, যা প্রধানত সীমাবদ্ধ থাকবে কৃষক ও শ্রমিকের মধ্যে এবং তাদের সাম্যবাদী চিন্তাধারায় ও কাজে উদ্বুদ্ধ করবে। প্রকাশ্য পার্টির নাম হবে হয় পিপলস্ পার্টি নয় ওয়াকার্স অ্যাণ্ড পেজান্টস পার্টি।[২৬২] এর কার্যক্রম হবে গয়া কংগ্রেসের জন্য তৈরি রায়ের মেনিফেস্টো মত। ১৯২৫-এর ১ নভেম্বর দাশের সহকর্মী হেমন্ত সরকার যে লেবার স্বরাজ পার্টি স্থাপন করেন রায় তাকে সমর্থন জানান। এর মুখপাত্র ছিল 'লাঙল', আর তার সম্পাদক ছিলেন কাজী নজরুল। ১৯২৬-এর ১২ আগস্ট 'লাঙলের' নবজন্ম হয় 'গণবাণী' রূপে এবং সম্পাদক হন মুজফ্ফর আহমেদ। ১৯২৬-এ বাংলায় ও পরে বোম্বাইতে পেজান্টস অ্যাণ্ড ওয়াকার্স পার্টি (পরে ওর্য়াকার্স অ্যাণ্ড পেজান্টস পার্টি) গড়ে ওঠে।[২৬৩] বোম্বাইতে সি পি আই স্থির করে (৩১ মে ১৯২৭) তারা কংগ্রেসের বাম পক্ষ গঠন করবে এবং চরম জাতীয়তাবাদীদের নিয়ে কংগ্রেসকে গণতন্ত্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবে ও ভারতের মেহনতী জনতার পক্ষে উপযোগী কর্মসূচি নিতে বাধ্য করবে। বাংলায় স্বরাজীদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ হয়নি মজফ্ফরের, কিন্তু জওহরলালকে নিয়ে সিঙ্গারভেলু, জোগলেকার, ডাঙ্গে প্রভৃতি 'ইণ্ডেপেণ্ডেন্স ফর ইণ্ডিয়া লীগ' স্থাপন করেন। এদেরই সমর্থনে নেহরু, আয়েঙ্গার ও বসু মাদ্রাজ কংগ্রেসে (১৯২৭) স্বাধীনতা প্রস্তাব তোলেন।

এত সব কর্মকাণ্ডের ফলশ্রুতি দেশব্যাপী শ্রমিক য়ুনিয়ান সংগঠন এবং বহু স্থানে, বিশেষত রেলওয়ে, কাপড়েব কলে ও চটকলে, শ্রমিক আন্দোলন। বাংলায ঢাকেশ্বরী কটন মিলের শ্রমিক য়ুনিয়ান, বেঙ্গল গ্লাস ওয়ার্কার্সি য়ুনিযন, মেথর, ট্রাম ও বাস ওয়ার্কার্সি য়ুনিয়ান প্রভৃতি সংগঠন এবং ডক শ্রমিক ধর্মঘট উল্লেখযোগ্য।[২৬৪] ১৯২৫-এ বোম্বাইতে ১১½% বেতন কাটার জন্য সূতাকলে যে ধর্মঘট হয় তা যেন সারা ভারতে পথপ্রদর্শক। এব পব অল ইণ্ডিয়া রেলওয়ে মেনস ফেডারেশন উত্তব পশ্চিম রেলওয়ে ধর্মঘট বাধায়। ১৯২৬-এ হয় বাংলার চটকল ধর্মঘট। ১৯২৭-এ ভারত জুড়ে রেল ধর্মঘট চলে, যাব মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বেঙ্গল নাগপুর বেলওয়ে কারখানাসমূহে ধর্মঘট। মাদ্রাজে ট্রাম ও রেল ধর্মঘট ছাড়া ছাপাখানায়, বার্মা অয়েল কোম্পানিতে ও কোয়েম্বাটুর সূতাকলে ধর্মঘট হয়।[২৬৫] বাংলা পার্টির দুজন সভ্য AITUC-র কর্ম সমিতিতে ঢোকে, বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে তিনজন পার্টি কর্মী নির্বাচিত হয়, দুজন যায় নিখিল ভাবত কংগ্রেস কমিটিতে। এরা এবং মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আগত পার্টি সভ্যরা মাদ্রাজ কংগ্রেসে (১৯২৭) নেহরু-আয়েঙ্গার প্রভৃতিকে মদত দিয়েছিল। এদের উপস্থাপিত মেনিফেস্টো অধিকারী সম্পাদিত ডক্যুমেন্টের তৃতীয় খণ্ড B-তে প্রকাশিত হয়েছে। বোম্বাই ও বাংলায় সভ্যরা আলাদা মিলিত হয়ে নিখিল ভারত ওয়ার্কার্সি অ্যাণ্ড পেজান্টস পার্টি গঠন স্থির করেন। কর্মসূচি A Call to Action নামক পুস্তিকায় বর্ণিত হয়েছিল।

তবে সাইমন কমিশন ঘোষণা এবং ন্যাশনালিস্ট ও স্বরাজ দলেব অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বও স্বাধীনতা প্রস্তাবের পেছনে কাজ করেছিল। ১৯২৬-এর ভারতীয় নির্বাচনের আগে রিডিং চেয়েছিলেন শাসনসংস্কার বিষয়ে যে কমিশনের প্রতিশ্রুতি মণ্টেগু দিযেছিলেন তা কয়েক বছর এগিয়ে এখুনি ঘোষণা করা হোক। ১৯২৭-এর প্রথম দিকে বার্কেনহেড ইংল্যাণ্ডের

রাজনৈতিক পরিস্থিতি মনে রেখে কমিশনের কথা পাড়লেন। ইংল্যাণ্ডের আসন্ন নির্বাচনে শ্রমিক দল জিততে পারে এবং জিতলে নিজেদের মনোমত কমিশন গড়তে পারে এই সম্ভাবনা আগেভাগে বিলুপ্ত করতে চান তিনি।[২৬৬] তিনি কমিশনে দু-একজন ভারতীয়কেও নিতে চান। না নিলে ভারতের প্রতি ব্রিটিশ অবজ্ঞা বড় বেশি প্রকট হবে, তা ছাড়া, নিলে, মতানৈক্য প্রায় নিশ্চিত এবং সরকারের বলার সুবিধে হবে—সংস্কারের সময় আসেনি।[২৬৭] মুডিম্যান, হেইলি ও ম্যাবিসের পরামর্শে আরুইন মহা ভুল করে বসলেন কমিশনে ভারতীয় নিতে আপত্তি জানিয়ে।[২৬৮] তাঁর মতে, পূর্ণ ব্রিটিশ কমিশনে উদারপন্থী, রেসপন্সিভিস্ট, পঞ্জাবের মত প্রদেশ, মুসলমান—কেউই আপত্তি করবে না। আর মুসলিমরা বর্জন না করলে হিন্দুরা ও কংগ্রেস কখনও প্রতিবাদ করবে না বা করলেও তা জোরদার হবে না।[২৬৯]

ভি· জে· প্যাটেল কিন্তু বড়লাটকে সম্ভাব্য বিতর্ক সম্বন্ধে সতর্ক করে দেন। চার পাঁচজন ভারতীয় নিলে জাতি বিদ্বেষের প্রশ্ন উঠত না। তবু আরুইন নভেম্বর মাসে লিখলেন, বিতর্ক উঠবেই এবং এখনই তার ঝুঁকি নেওয়া উচিত। মনে হয় স্বরাজ ও ন্যাশনালিস্ট দলের অন্তর্দ্বন্দ্ব, সাফির লীগের নিশ্চিত সমর্থন এবং উদারপন্থীদের সম্ভাব্য সমর্থন তাঁকে এরকম ভাবতে প্রণোদিত করে।

গান্ধী ও আরুইনের প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটেছিল ১৯২৭-এর ২ নভেম্বর। আরুইন পিতাকে লিখেছিলেন, "তাঁকে (গান্ধীকে) মনে হয়েছিল, বাস্তব রাজনীতি থেকে বহু দূরের লোক। তাঁর সঙ্গে কথা বলা এমন একজনের সঙ্গে বলা যিনি অন্য কোন গ্রহ থেকে পৃথিবীতে পক্ষকালের জন্য নেমে এসেছেন।"[২৭০] গান্ধীর মনে হয়েছিল "(বড়লাট) ভাল মানুষ কিন্তু তাঁর কোন ক্ষমতা নেই।" যাই হোক, গান্ধী, সাইমন কমিশন ও ভারতীয়দের সম্পর্কের মধ্যে যেতে চাননি। তাঁর দাবি ছিল অবিলম্বে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস ঘোষণা ও খুঁটিনাটি নিয়ে পরে ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা। 'হিন্দু' পত্রিকার মতে গান্ধী জানিয়ে দিয়েছিলেন ভারতীয়রা কমিশন বয়কট করবে। জিন্না বলেন অন্তত দুজন ভারতীয় সদস্য নিতে হবে। আলি ইমাম, মাহমুদাবাদের রাজা, আলিরা এবং আজাদ এমন শ্বেতাঙ্গ কমিশনে আপত্তি জানান। জিন্না সরকার-সমর্থক সাফির সঙ্গে ঝগড়া করেন ও আবদার রহিমের সঙ্গে কলকাতায় আলাদা লীগ অধিবেশন বসান। ফলে, রহিমের শত্রু, গজনভি, সাফির সঙ্গে যোগ দেন। মুশকিল এই যে, জিন্না পরে ভয় পেয়ে পিছু হঠে যান। আরুইনকে তিনি বোঝান, "তিনি গোলমাল না চালিয়ে রাখলে তাঁর শত্রুরাই জিতবে।"[২৭১] আরুইন আসল ভুল করেছিলেন উদারপন্থীদের সাহায্য পাবেন ভেবে। উদারপন্থীরা কয়েক বছর বঙ্গমঞ্চের পেছনে চলে গিয়েছিলেন। তাঁরা প্রত্যাবর্তনের এমন সুযোগ ছাড়বেন কেন? ১৬ নভেম্বর সাপ্রু, শিবস্বামী আয়ার ও অ্যানি বেশান্ত জিন্না এবং শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের সঙ্গে মিলিত হয়ে ঘোষণা করলেন, কমিশনের কাজে কোন অংশগ্রহণ করবেন না তাঁরা।

ইতিমধ্যে স্বরাজ্য দলের মধ্যেই গণ্ডগোল লেগেছিল। মতিলাল ইউরোপ গেলে কেন্দ্রে স্বরাজী দলের নেতা হন শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার। প্রকাশম, চেট্টি, ডোরাইস্বামী প্রভৃতি সভ্যরা আয়েঙ্গার-বিরোধী ছিলেন। দলের সচিব রঙ্গ আয়েঙ্গার পদত্যাগ করলেন। দেওয়ান চমনলাল ও তুলসী গোস্বামী রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিলের ব্যাপারে দুদিকে গেলেন। ন্যাশনালিস্ট পার্টিও বিভক্ত হয়েছিল। নেতা মালব্যের সঙ্গে সহকারী নেতা জয়াকরের বনিবনা ছিল না। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিল ও কটন ইয়ার্ন বিলের ব্যাপারে এই বিরোধ স্পষ্ট হয়। বড়লাট বলেছেন, এসব অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্য আইন সভার সিমলা অধিবেশন নিরুত্তাপ ছিল।

হিন্দু-মুসলিম গণ্ডগোলও মেটেনি। জিন্নার দিল্লি প্রস্তাবে কংগ্রেস স্বাগত জানায় কিন্তু পঞ্জাব ও বাংলার হিন্দু (সংখ্যালঘু) জনসংখ্যার ভিত্তিতে আসন সংরক্ষণ চায়নি। সিন্ধুকে বোম্বাই থেকে পৃথক করতে রাজি হননি জয়রামদাস দৌলত রাম। সিন্ধুর ধনী ব্যবসায়ী, জমিদার ও কর্মচারীরা (মুখ্যত লোহানা জাতের) শিক্ষা, চাকুরি ও ম্যুনিসিপ্যালিটির ওপর কর্তৃত্ব ছাড়তে নারাজ ছিল। মুসলমানদের মধ্যেও যে ঐক্য ছিল না আগেই দেখিয়েছি। জিন্নার যৌথ নির্বাচন প্রস্তাব অনেকেই মেনে নেয়নি। পঞ্জাবের প্রাদেশিক মুসলিম লীগ (সাফি, ইকবাল প্রভৃতি) স্বতন্ত্র নির্বাচনকে মুসলিমদের রক্ষাকবচ বলে মনে করত। আবদার রহিম বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগ অধিবেশনে একই কথা বলেন। উত্তর পশ্চিম সীমান্তের কোয়ায়ুম করেন তাব প্রতিধ্বনি। হিন্দুদের মধ্যেও অনুরূপ ভয় ছিল। বসুমতী, আনন্দবাজার পত্রিকা, অমৃতবাজার পত্রিকা প্রত্যেকেই বাঙালী হিন্দুর মনোভাব প্রকাশ করেছিল। ১৯২৭-এব লাহোর দাঙ্গা সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক ঘুলিয়ে তুলেছিল। সিমলা ও কলকাতার ঐক্য সম্মেলন সফল হয়নি। বড়লাট জানতেন একদিকে সাফি, ফজল-ই-ব মত মুসলিম, অন্যদিকে মালব্য, মুঞ্জে, লাজপতের মত হিন্দু সব বানচাল করে দেবে।[২৭৪] গান্ধী এসব সম্মেলনে যোগ না দিলেও স্পষ্ট ঘোষণা চেয়েছিলেন মুসলিমদের গোহত্যা বন্ধ কবতে হবে আর হিন্দুদেব বন্ধ করতে হবে মসজিদের সামনে বাদ্য।[২৭৫] মাদ্রাজ কংগ্রেসেব গৃহীত নীতি—পঞ্জাব ও বাংলায় মুসলিম আসন সংরক্ষণ—না মানা তাঁর মতে অনৈতিক হবে।[২৭৫ক]

সাইমন কমিশন বিবদমান ভাবতীয়দের মিলিত হবাব একটা সুযোগ করে দিল। প্রথমে মাদ্রাজ কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রস্তাব গৃহীত হল, পরে বার্কেনহেডেব যথাযোগ্য উত্তর[২৭৬] দেবার জন্য সর্বদলীয় সম্মেলন ডাকা হল, যেখানে হিন্দু ও মুসলিম প্রতিনিধিরা মিলে একটা সর্বসম্মত শাসনতন্ত্র রচনা করবে।

মজাব ব্যাপার, গোয়েন্দা বিভাগের কর্তা পূর্ণ স্বাধীনতা প্রস্তাবকে গুরুত্ব দিতে চাননি।[২৭৭] জওহরলালও নয়। আত্মজীবনীতে তিনি লিখছেন, "হয প্রস্তাবগুলি কেউ বোঝেননি, না হয় বিকৃত করে অন্য অর্থ করেছেন।" প্রথমত লক্ষ হিসেবে স্বীকৃত হলেও পূর্ণ স্বাধীনতা কংগ্রেসের শাসনতন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। দ্বিতীযত, প্রস্তাবের পরবর্তী ধারাতে ছিল স্বাধীনতার অর্থ প্রতিরক্ষা, অর্থ ও বৈদেশিক নীতির পূর্ণ কর্তৃত্ব এবং ব্রিটিশ শক্তির তাৎক্ষণিক অপসরণ—তাও গৃহীত হয়নি। শুধু ওয়ার্কিং কমিটিকে বলা হয়েছিল উদারপন্থীদেব সঙ্গে পরামর্শ করে স্ববাজী শাসনতন্ত্র বচনা করতে। কিন্তু গান্ধী এভাবে ব্যাখ্যা করেননি। মাদ্রাজ কংগ্রেসের অব্যবহতি ফল গান্ধী-নেহরু মনোমালিন্য।

জওহরলালকে গান্ধী লিখলেন, "খুব তাড়াহুড়ো কবে এই প্রস্তাব রচিত হয়েছে এবং না ভেবেচিন্তে গৃহীত হয়েছে....তুমি খুব দ্রুত চলেছ..... আমি জানি না এখনও তুমি অবিমিশ্র অহিংসায় বিশ্বাসী কি না। যদি মত বদলেও থাক, তুমি ভাবতে পার না যে অননুমোদিত ও বলগাহীন হিংসা দেশের মুক্তি আনবে।"[২৭৮] শুধু গান্ধীর মনে সংশয় জাগেনি, ভি· জে· প্যাটেল এবং আরো অনেকের মনে জেগেছিল।

জওহরলাল উত্তর দিলেন স্বভাব-বিরুদ্ধ কঠোর ভাষায়: "কোনো জাতীযতাবাদী প্রতিষ্ঠান কি ভাবে লক্ষ্যরূপে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস নিতে পারে? এ চিন্তাই তো আমার কণ্ঠরোধ করে।......আমরা যেন স্কুলের ছেলেদের বিতর্কসভায় পবিণত হয়েছি। রাগী শিক্ষকের মত আপনি আমাদের তিরস্কার করেছেন। কিন্তু আপনি এমন শিক্ষক যিনি আমাদের পড়াবেন না বা পরিচালনা করবেন না, কেবল, মাঝে মাঝে ভুল দেখাবেন।"

গান্ধীর 'হিন্দ স্বরাজ'-কে পরিহাস করে তিনি জানালেন—পশ্চিমকে ধ্বংসোন্মুখ, পূর্বকে শ্রেয়তর বা রামরাজকে লোভনীয়—কোনটাই তিনি মনে করেন না। শিল্পায়নই শুধু ভারতের দারিদ্র্য দূরীকরণে সক্ষম যদি অবশ্য তাকে ধনতন্ত্রের জীবাণুমুক্ত করা হয়।[২৭৯] এই পত্র যেন গান্ধী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সদ্য জাগ্রত আধুনিক যুবশক্তির বিদ্রোহ। বারদোলি প্রস্তাবের পর নেহরুর মনে গান্ধীর নেতৃত্ব সম্বন্ধে যত বাষ্প জমা হয়েছিল, এ যেন তার বিস্ফোরণ। গান্ধী তাঁর বামপন্থী অবস্থান পছন্দ করছেন না, এই বোধ ইন্ধন যুগিয়েছিল।

অবশ্যই এ কলহ স্থায়ী হয়নি। মর্মাহত গান্ধী শিষ্যকে আনুগত্য থেকে মুক্তি দিয়ে বলেছিলেন, "তোমার মত বীর সহকর্মী হারিয়ে আমি দুঃখিত, কিন্তু মহান ব্রত উদ্‌যাপনে সহকর্মীদেরও ত্যাগ করতে হয়।[২৮০] তিনি এসব পত্রাবলী প্রকাশ করবেন বলায় নেহরু রীতিমত ঘাবড়ে যান এবং ক্ষমা চেয়ে লেখেন, "আমি কি রাজনীতিতে আপনার সন্তান নই, যদিও হয়তো পলাতক ও ভ্রান্ত সন্তান?"[২৮১] নেহরুর জীবনীকার এস· গোপাল জানাচ্ছেন ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারের লোভে নেহরু নত হননি। তাঁর মনে হয়েছিল, গান্ধীবাদের দ্বারা "কোনো অজ্ঞাত উপায়ে" তাঁর নিজস্ব সমাজতান্ত্রিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। তিনি যদি ভারতের অর্থনৈতিক মুক্তি চান তবে গান্ধীর সঙ্গে বিরোধ করা চলবে না। তাঁর ধারণা হয়েছিল অভিজাত ও ধনীসন্তান বলে তিনি সাধারণের মনের কথা টের পান না, গান্ধী বোধি বলে টের পান। অতএব জনগণের ওপর প্রভাব খাটাতে গেলে গান্ধীর মাধ্যমেই তা করতে হবে। এরকম একটা হীনমন্যতা থাকা বিচিত্র নয়। তবু আমার মনে হয়, সাময়িক ভাবে গান্ধীর নীতি মেনে নিলেও, নেহরু তাঁকে অতীতাশ্রয়ী, কিছুটা রিভাইভ্যালিস্ট বলে ভাবতেন। ১৯৪৫ সালে নেহরুকে আর একবার 'হিন্দ স্বরাজ'-এর বিরুদ্ধে কটূক্তি করতে শোনা যাবে। তফাত এই, ১৯২৮ সালে গান্ধীকে তাঁর প্রয়োজন ছিল (তিনি তখনও কংগ্রেসের সভাপতি হননি), ১৯৪৫ সালে ছিল না।

সভ্যতা, সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম সম্বন্ধে গান্ধীর ধারণা, অসহযোগ প্রত্যাহার থেকে নানা উলটোপালটা কাজ ও কথা, নেহরুর সমাজতান্ত্রিক বোধকে আঘাত করছিল। ব্রাসেলস কনফারেন্সে ইওরোপীয় ও অ্যাফ্রোএশীয় সমাজতন্ত্রী নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে ও ঠিক তার কিছুদিনের মধ্যে রাশিয়া ভ্রমণের ফলে নতুন এক ধরনের সমাজ গড়ার সম্ভাবনা তাঁর গান্ধীবাদে অভ্যস্ত চিন্তার ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল। মনস্তত্ত্বের বিচারে বলা চলে আপন প্রাপ্তবয়স্কতা জাহির করার জন্য কারোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে চাইছিলেন তিনি। গান্ধী নিয়েছিলেন তাঁর কুলিশ-কঠিন পিতা মতিলালের স্থান। তাই তাঁর বিদ্রোহ শুধু সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নয়, পিতা ও পিতার বিকল্প (surrogate) গান্ধীর বিরুদ্ধেও।

গান্ধী বুঝতে পেরেছিলেন নেহরুকে বশে আনা যাবে। কিন্তু স্বাধীনতা লক্ষ্য বলে মানতে রাজি হলেও "সব সম্ভব উপায়ে"—এটা মানতে তিনি রাজি ছিলেন না। ১৯২০-র কংগ্রেসে "শান্তিপূর্ণ ও ন্যায়ানুগ উপায়"-এর প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, কারণ তাতে হিংসার সম্ভাবনা ছিল না। এর বাইরে গেলে হিংসার পথও উন্মুক্ত হবে। তিনি আদর্শচ্যুত হবেন।[২৮২] কিন্তু নেহরুও হিংসার পথে যেতে রাজি ছিলেন না। কম্যুনিজমের প্রতি আকৃষ্ট হলেও ইয়ুথ লীগে অন্য দলের স্থান করে দেন তিনি। বার্লিন থেকে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁকে বিপ্লবের নেতৃত্ব দিতে আহ্বান জানালে, তিনি উত্তর দেন, "যদি হিংসা আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, ভয় পাব না। কিন্তু আমি মনে করি আমাদের আন্দোলন অল্পবিস্তর শান্তিপূর্ণ পথে চলবে—প্রয়োজনে আইন অমান্য ও খাজনা বন্ধ চলতে পারে।"[২৮৩] আরো মনে রাখতে হবে কংগ্রেসকে তিনি সাম্রাজ্যবিরোধী লীগের পূর্ণ সদস্য করতেও চাননি বা

AITUC-কে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সঙ্গে যুক্ত করতে চাননি।[২৮৪] গোপাল ঠিকই বলেছেন, "সারা জীবন ধরে তিনি আধা উদারতন্ত্রী, আধা মার্কসবাদী অবস্থান রক্ষা করে চলেছিলেন....।"[২৮৪ক] তিনি নিজে স্বীকার করেছেন, "I am a typical bourgeois—communists have called me a petty bourgeois with perfect justification."[২৮৫] জোর করে সমাজতন্ত্র চাপানোর কথা কোনদিন তিনি ভাবেননি, শুধু তার পক্ষে জনমত গঠনের কথা ভেবেছেন। আসলে তিনি ছিলেন গান্ধীবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে সেতুস্বরূপ। এশিয়ায় জাতীয়তাবাদ যে সমাজতন্ত্রের চেয়েও বড়ো শক্তি তা শেষ পর্যন্ত তিনি স্বীকার করতেন।

সর্বদলীয় সম্মেলনেও নানা বিবোধ দেখা দিয়েছিল। মতিলাল ও সাপ্রু মিলে বহুকষ্টে এক শাসনতন্ত্রের খসড়া বচনা করলেন—তার মূল দাবি ছিল (১) অবিলম্বে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস ঘোষণা ; (২) যৌথ নির্বাচন কিন্তু কেন্দ্রীয় আইন সভায় এক-তৃতীয়াংশ আসন মুসলিমদের জন্য সংরক্ষণ ; (৩) লোকসংখ্যার ভিত্তিতে অমুসলিম প্রদেশে মুসলিম আসন সংরক্ষণ ; (৪) ওয়েটেজ প্রথা বিলোপ ; (৫) সীমান্ত, বালুচিস্তান ও সিন্ধুকে আলাদা প্রদেশরূপে স্বীকার ; (৬) প্রত্যক্ষ নির্বাচন ও বয়স্ক ভোটাধিকার ; (৭) মৌলিক অধিকার ঘোষণা ; (৮) ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ; (৯) কেন্দ্রে দায়িত্ববান সরকার (যার হাতে রেসিড্যুয়ারি ক্ষমতা থাকবে) ; (১০) পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও সংরক্ষিত বিভাগ লোপ এবং (১১) রাজন্যবর্গের ওপর কর্তৃত্ব।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, হিন্দু মহাসভা ও শিখ লীগের চাপে পড়ে মতিলাল বাংলা ও পঞ্জাবে মুসলিম আসন সংরক্ষণেব কথা বাদ দিলেন। মনে রাখতে হবে এ বিষয়ে জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র তাঁকে যে সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসেব দেখান তাতে উভয় প্রদেশে মুসলিমরা সংরক্ষণ ছাড়াই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করবে। মতিলাল ভেবেছিলেন পঞ্জাবের প্রাদেশিক কমিটি ও বাংলায় মৌলানা আজাদ সকলকে বুঝিয়ে[২৮৫ক] রাজি করাবেন। বাংলা ও পঞ্জাবে অনেক মুসলমান এটা মেনে নেবে, তবে অনেকেই নয়। আসলে মুসলমানরা পাঁচটা প্রদেশে মুসলিম শাসন বিষয়ে নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিল।তা ছাড়া চেয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রীয় গঠনতন্ত্র এবং প্রদেশের হাতে রেসিড্যুযারি ক্ষমতা অর্পণ। গান্ধী ডোমিনিযান স্ট্যাটাসেব ব্যাপারটা সমর্থন করলেও পঞ্জাব ও বাংলায় মুসলিম আসন সংরক্ষণ সমর্থন কবেছিলেন কারণ সে প্রতিশ্রুতি মাদ্রাজ কংগ্রেসে দেওয়া হয়েছিল। জওহরলাল ডোমিনিযান স্ট্যাটাস মানেননি কিন্তু আসন সংরক্ষণে আপত্তি জানিয়ে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদকে মদত দিয়েছিলেন।[২৮৬] শৌকৎ আলি এই নিয়ে মতিলাল, আনসারী ও গান্ধীব সঙ্গে ঝগডা করলেন।[২৮৬ক] মহম্মদ আলি মাহমুদাবাদেব বাজার কাছে হটে যাচ্ছিলেন, এই সুযোগে তিনিও দাদাকে অনুসরণ করলেন। ইউ· পি·-র মুসলমানরা শুধু সংরক্ষিত আসন চাইল না, স্বতন্ত্র নির্বাচন, ওয়েটেজ কোনটাই ছাডতে রাজি হল না। অন্যদিকে লাজপত বললেন, রিপোর্ট পরিবর্তন করা চলবে না[২৮৭] এবং মুঞ্জে আরো জোবে বললেন, একটি কমাও নয়।

ইউ· পি· মুসলমানদের আপত্তিকে গুরুত্ব দিতে হবে। তারা ভয় পাচ্ছিল যৌথ নির্বাচনের সঙ্গে বয়স্ক ভোটাধিকার মেনে নিলে মুসলমানরা "ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের তাঁবে" চলে যাবে। শব্দগুলো গুরুত্বপূর্ণ। ইউ· পি·-র মুসলিমরা সরকারী চাকরি, ম্যুনিসিপ্যালিটি, আইন পরিষদে জাঁকিয়ে বসেছিল। এখন যদি নূতন রীতিতে নির্বাচকদের সংখ্যা বেড়ে যায় তবে সে আধিপত্য তো বিপন্ন হবেই, চাষী-প্রজাদের পক্ষে আইন পাস হলে মুসলিম জমিদার নবাবরা করবেন কি ?[২৮৮]

জিন্নার দুর্ভাগ্য, এই সময় তিনি রুগণা স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য ইউরোপ গিয়েছিলেন। ফিরে এসে সকলের কাণ্ড দেখে তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। চিরকাল তিনি বিভিন্ন মুসলিম দলের মধ্যে মধ্যস্থতা করে আপন আধিপত্য বজায় রেখেছেন। পঞ্জাব কোনদিন তাকে মানেনি, বোম্বাইতে তাঁর অবস্থা সুবিধেব নয়। এখন ইউ· পি· মুসলিমরাও যদি চটে যায়, তাঁর নেতৃত্বই বিপন্ন হবে। তাই পঞ্জাব, বোম্বাই, ইউ পি--কে তুষ্ট করতে নেহরু রিপোর্টের মুখ্যত তিনটি মৌল পবিবর্তন দাবি কবলেন তিনি · (১) মুসলিমদের কেন্দ্রে এক-তৃতীয়াংশ আসন দিতে হবে ; (২) বাংলা ও পঞ্জাবে ১০ বছরের জন্য মুসলিমদের জন্য আসন সংরক্ষণ আবশ্যিক। বয়স্ক ভোটাধিকাব প্রবর্তিত হলে সে সময়সীমা বাডবে ; (৩) রেসিড্যুয়ারি ক্ষমতা প্রদেশকে দিতে হবে। জিন্না কংগ্রেসী অবস্থান থেকে সরে না গেলে মুসলিমদেব ওপর প্রভাব হারাবেন এ মন্তব্য স্বয়ং আরুইনেব।[২৮৯]

ইতিমধ্যে সাইমন কমিশন ভারতে এল এবং ৩০ অক্টোবর তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে পুলিশের লাঠির আঘাতে গুরুতব আহত হলেন লাজপত বায। ১৭ নভেম্বব তাঁর মৃত্যু হল। কযেকদিন পরে লখনউতে জওহরলাল ও গোবিন্দবল্লভ পন্থ পুলিশের হাতে প্রচণ্ড মার খেলেন। 'নবজীবন'-এ ও 'ইযং ইণ্ডিযা'-য় গান্ধী এব তীব্র নিন্দা কবলেন। এতদিন ধূমাযিত সন্ত্রাসবাদ সহসা প্রচণ্ড তেজে জ্বলে উঠল।

১৯২২ সালে চট্টগ্রামে যখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস বসে তখন বিপিন গাঙ্গুলী, হবিনাবাযণ চন্দ্র, সূর্য সেন, অনন্ত সিং প্রমুখ বিপ্লবীবা 'বেড বেঙ্গল পার্টি', (বা পুলিশের ভাষায় 'নিউ ভায়োলেন্স পার্টি') গঠন করেন। ফল, ১৯২৪-এ গোপীনাথ সাহাব টেগার্ট ভেবে ডে-নিধন। ১৯২৫-এ দক্ষিণেশ্বব ও শোভাবাজারে এই দলের এগারজন গ্রেফতার হয়। ১৯২৬-এব মে মাসে আলিপুর জেলে আই বি-ব বসন্ত চট্টোপাধ্যায নিহত হন এবং সেই অপরাধে অনন্তহরি মিত্র ও প্রমোদ চৌধুরীব ফাঁসি হয়। কাগজপত্রে জানা যায় দলের নেতা ছিলেন সূর্য সেন ও বিজন ব্যানার্জি। দক্ষিণেশ্বব ষডযন্ত্র মামলায ধবা পডে উত্তর প্রদেশের হিন্দুস্থান বিপাবলিকান অ্যাসোসিযেশন, নিউ ভাযোলেন্স পার্টি ও সূর্য সেনের মধ্যে যোগাযোগ আছে। ১৯২৪-এ গঠিত হিন্দুস্তান রিপাবলিকান অ্যাসোসিযেশনেব নেতাদেব মধ্যে শচীন সান্যাল, রামপ্রসাদ বিসমিল, যোগেশ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিব নাম পাওয়া যায। উত্তর প্রদেশের কাকোবি ষড়যন্ত্রের এবং ১৯২৫ সালেব ৯ আগস্ট ৮ নং ডাউন ট্রেন ডাকাতিব বীর ছিলেন চন্দ্রশেখর আজাদ, বিসমিল, রোশন সিং, রাজেন লাহিড়ী ও আসফাকউল্লা। চন্দ্রশেখর আত্মগোপন করেন, অন্যদেব ফাঁসি হয়। এঁদের সঙ্গে বাংলার যোগাযোগ চিঠির মাধ্যমে চলত। তাতে দেখা যায় রাসবিহারী বসু নাকি জাপান থেকে অস্ত্র পাঠাবার চেষ্টা করছেন। ১৯২৬-এর শেষার্ধে এঁবা যে বেশ সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন লিটনের কাগজপত্রে তার প্রমাণ পাওযা গেছে। কাকোরির পর লিটন ও তাঁব পরবর্তী অস্থায়ী ছোটলাট, হিউ স্টিফেনসন, বন্দী মুক্তিব ব্যাপাবে সাবধান হয়ে যান। পুলিশ কমিশনার টেগার্টও।[২৯০] লালাজীর মৃত্যুতে বিপ্লবী কাজে ঘৃতাহুতি পড়ল। ১৯২৮-এর ১৭ ডিসেম্বর লালাজীর মৃত্যুর জন্য দায়ী পুলিশ ডেপুটি সুপার সণ্ডার্সকে হত্যা করা হল। এর পেছনে ছিলেন ভগৎ সিং, সুখদেব, রাজগুরু ও চন্দ্রশেখর আজাদ, পরে যাঁদের বিরুদ্ধে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা চলে। পঞ্জাবের লাট হেইলি নও-জোওযান সভাগুলিকে সুচক্ষে দেখতেন না।[২৯১] ১৯২৮-এ ভগৎ সিং, অজয় ঘোষ, ফণী ঘোষ কর্তৃক হিন্দুস্তান রিপাব্লিকান অ্যাসোসিয়েশনের নতুন নাম হল হিন্দুস্তান সোস্যালিস্ট রিপাব্লিকান আর্মি।[২৯২] তাঁরা সমাজতন্ত্রকে লক্ষ্য হিসাবে মেনে নিয়েছিলেন। শিব বর্মা সম্পাদিত 'ভগৎ সিং-এর নির্বাচিত

বচনা'য এর নানা প্রমাণ মিলবে। তাঁদের গাওয়া গান "সর ফরোসি কি তামান্না অব্ হমারে দিল্ মে হ্যায়" ও "মেরা রঙ দে বাসন্তী চোলা" আজও আমাদের বিষণ্ণ করে।

হিংসার এই উগ্র প্রকাশ দেখে গান্ধী খুবই চিন্তিত হলেন। তা ছাড়া বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপের বিস্তারও তাঁর ভাল লাগছিল না।

॥ ১১ ॥

উনিশ শো ছাব্বিশ থেকে ১৯৩০-এব মধ্যে বৈপ্লবিক কর্মধারার দুটো প্রবাহ আলাদা খাতে বইলেও মাঝে মাঝে তারা খুব কাছাকাছি আসছিল। পুরোনো সন্ত্রাসবাদে সাম্যবাদী আন্তর্জাতিকের প্রভাব পড়তে শুরু করেছিল। এই পর্বের অপূর্ব ছবি ধরে রেখেছেন শরৎচন্দ্র ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত 'পথের দাবী'তে। মাঝে মাঝে মনে হয় ডাক্তার সব্যসাচী, নীলকান্ত যোশী, রামদাস তলওয়ারকর যে বহুবিস্তৃত কর্মকাণ্ডের নিযন্তা বা কর্মী ছিলেন তার লক্ষ্য শুধু ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়। ডাক্তার ইংবেজদের শুধু ভাবতেব শত্রু বলেই ঘৃণা করেন না, "সমস্ত মনুষ্যত্বেব এতবড পরম শত্রু জগতে আর নেই। স্বার্থেব দায়ে ধীরে ধীরে মানুষকে অমানুষ কবে তোলাই এদের মজ্জাগত সংস্কার। এই এদের ব্যবসা, এই এদেব মূলধন।" এসব কথা জগৎজোড়া ঔপনিবেশিক শোষণের প্রতি ইঙ্গিত। কুলিদের সামনে রামদাসের জ্বালাময়ী বক্তৃতা তো আরো স্পষ্ট : "এ যে কেবল ধনীব বিরুদ্ধে দরিদ্রের আত্মরক্ষাব লডাই। এতে দেশ নেই, জাত নেই, ধর্ম নেই, মতবাদ নেই—হিন্দু নেই, মুসলমান নেই,—জৈন, শিখ কোন কিছুই নেই—আছে শুধু ধনোন্মত্ত মালিক আর তার অশেষ প্রবঞ্চিত অভুক্ত শ্রমিক।" কিন্তু ভারতী এখনও অন্য সুরে কথা বলে। দুর্বল, পীড়িত, ক্ষুধিত ভারতবাসীব জন্য অন্নবস্ত্র চেয়েও সে রক্তাক্ত বিপ্লবের পথ নেবে না। সে ডাক্তারকে বলে, "পৃথিবী ঘুবে তুমি শুধু এই পথের খবরটাই জেনে এসেছ,··· কিন্তু বিশ্বমানবের একান্ত শুভবুদ্ধি, তাব অনন্তবুদ্ধির ধারা কি এমনি নিঃশেষ হয়ে গেছে যে এই রক্তরেখা ছাড়া আব কোন পথের সন্ধানই কোনদিন তার চোখে পড়বে না?" গান্ধীবাদের এই প্রতিক্রিয়ার উত্তবে ডাক্তাব বলেন, "আমি বিপ্লবী ·আমার মাযা নেই, দয়া নেই, স্নেহ নেই,—পাপপুণ্য আমার কাছে মিথ্যা পরিহাস। ···ভারতের স্বাধীনতাই আমার একমাত্র লক্ষ্য, আমাব একটি মাত্র সাধনা।" দেশের ভাল করার ভার তিনি নেননি, স্বাধীন করার ভার নিয়েছেন। আর বিশ্বব্যাপী বিপ্লবেব আগুন জ্বালালে হয়তো সে আগুন ভারতের ইংরেজ শাসনকেও পোড়াবে। ডাক্তার বলেন, চাষাভুষো নিয়ে তাঁর কারবার নয়—"তারা স্বাধীনতা চায় না, শান্তি চায়, যে শান্তি অক্ষমের, অশক্তের।" শ্রমিকদের নিয়ে তার কারবার। "শ্রমিক ও কৃষক এক নয় ভারতী।" তবে এলিটিস্ট নেতৃত্বে তিনি বিশ্বাসী। "আমার কারবার শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, ভদ্রসন্তান নিয়ে।" শাসনসংস্কার, ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস—এসব দাবি তাঁর কাছে হাস্যকর। "বিদেশী গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে চোখ রাঙিয়ে যখন তাঁরা (স্বরাজীরা) চরম বাণী প্রচার করে বলেন, আমরা আর ঘুমিয়ে নেই, আমরা জেগেছি। আমাদের আত্মসম্মানে ভয়ানক আঘাত লেগেছে। হয় আমাদের কথা শোন, নইলে বন্দেমাতরমের দিব্যি করে বলছি তোমাদের অধীনে আমরা স্বাধীন হবই হব।·····এ যে কি প্রার্থনা এবং কি এর স্বরূপ সে আমার বুদ্ধির অতীত। শুধু জানি, তাঁদের এই চাওয়া এবং পাওয়ার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নেই।" ছোটবড় প্রাচীরের বেড়া তুলে পৃথিবীকে সহস্র কারাকক্ষে ভাগ করে রাখেননি তাঁর বিধাতা। "উত্তর থেকে দক্ষিণে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে

যতদূর দৃষ্টি যায় বিধাতার রাজপথ একেবারে উন্মুক্ত হয়ে গেছে।.....এখন এক প্রান্তের অগ্ন্যুৎপাত অপর প্রান্তে স্ফুলিঙ্গ উড়িয়ে আনবেই আনবে ভারতী, সে তাণ্ডব দেশ-বিদেশের গণ্ডী মানবে না।" এ উক্তি হল স্তালিনের socialism in one country'র অব্যবহিত পূর্বেকার কমিনটার্নের বিশ্ববিপ্লবের থিসিস। তবে এতে পুরাতন দিনের সন্ত্রাসবাদের 'hangover' নেই তা নয়। ডাক্তারের কার্যকলাপে আমরা যেন মানবেন্দ্রনাথ রায়ের প্রতিচ্ছবি দেখি। কিছুটা যদুগোপালের ভাই ক্ষীরোদগোপালের ছায়া দেখা যায়।

আসল কম্যুনিস্ট দল শ্রমিক আন্দোলন ও ধর্মঘটকে আরও ব্যাপক করছিল। ১৯২৮-এর এপ্রিল থেকে বোম্বাই-এব ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজান্টাস পার্টি-স্থাপিত গির্নি কামগর য়ুনিয়ান সূতাকলে ছয় মাসব্যাপী ধর্মঘট চালিয়ে রেকর্ড সৃষ্টি করল। মিলে মিলে গঠিত গির্নি সমিতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এই ধর্মঘটের প্রধান দাবি মজুরী বৃদ্ধি হলেও এর সংগঠন ছিল ভাল। নরমপন্থী এন এম যোশীর মত নেতার স্থান নিয়েছিলেন কম্যুনিজমে দীক্ষিত ডাঙ্গে, মিরাজকব, জোগলেকর। বাংলার চটকল, রেল কারখানা ইত্যাদি ধর্মঘটের সামনে ছিলেন বঙ্কিম মুখার্জি, রাধারমণ মিত্রের মত কম্যুনিস্ট ঘেষা কংগ্রেসী, গোপেন চক্রবর্তী, ধরণী গোস্বামীর মত কম্যুনিস্ট ও শিবনাথ ব্যানার্জীর মত সমাজতন্ত্রী। পেছনে ছিলেন ব্রিটিশ কম্যুনিস্ট দলের স্প্র্যাট।[২৯৩] সরকারী হিসাবমত গির্নি কামগরের আন্দোলনের ফলে তিনবার দাঙ্গায় ১৮৪ জনের মৃত্যু হয়। আরুইন জানতেন যে অপ্রয়োজনীয় ছাঁটাই, কম মজুরী ও অস্বাস্থ্যকর আবাসনের জন্য শ্রমিক অসন্তোষ। তবু তিনি এর পেছনে রাশিয়ার প্রেরণা দেখলেন। পূর্ব-ভারত রেলওয়ে শ্রমিক সংগঠনেব নেতা কে সি মিত্র, স্প্র্যাট ও মুজফ্‌ফর আহমদের মস্কোর কাছে অর্থের জন্য আবেদন তাঁব হাতে পড়েছিল এবং তার সদ্‌ব্যবহার করেছিলেন তিনি।[২৯৪] কিন্তু বোম্বাই-এর লাট উইলসনের চিঠি পড়লে মনে হয় মালিকদের স্বার্থবক্ষাই সরকারের কাছে বৃহত্তর প্রসঙ্গ। বোম্বে মিল মালিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হোমি মোডি ও টাটাদের অস্বস্তি তাঁকে চিন্তিত করেছিল। আমাদের মনে বাখতে হবে, গান্ধী-প্রবর্তিত শ্রমিক-মালিক বোঝাপড়ার নীতি অনুসবণ করার ফলে আমেদাবাদে কোন শিল্পধর্মঘট হয়নি।[২৯৫] যাই হোক, আরুইন স্থির করলেন নেতাদের বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্র মামলা আনতে হবে। তা ছাড়াও কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে তিনি পাবলিক সেফটি বিল আনবেন। শুধু ভারতীয় কম্যুনিস্ট নেতারাই মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার (১৯২৯) আসামী ছিলেন না, ছিলেন স্প্র্যাট, ব্র্যাডলি ও হাচিনসনেব মত ব্রিটিশ নেতা, এমনকি কংগ্রেসের A. I. C. C-র আটজন সভ্য। ভি জে প্যাটেলের দৃঢ়তায় পাবলিক সেফটি বিল পাস না করতে পেরে আরুইন অধ্যাদেশ জারি করেন।

ঠিক একই সময় গুজরাটের বারদোলিতে বল্লভভাই প্যাটেল পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন অহিংস আইন অমান্য নিয়ে। বারদোলি তালুকে শতকরা বাইশ ভাগ খাজনা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। আরুইন স্বীকার করেছেন যে, বোম্বাই সরকারের আরও তৎপর হওয়া উচিত ছিল।[২৯৬] বারদোলি সত্যাগ্রহ চম্পারণ ও খেড়ার ধাঁচে একটা নির্দিষ্ট এলাকার কিছু বিশেষ অভিযোগ নিয়ে। পটিদার নেতা কুন্তর কল্যাণজী মেহতা প্যাটেলকে নেতৃত্ব দিতে আহ্বান জানান। প্যাটেল চেয়েছিলেন কোনো নিরপেক্ষ আদালত খাজনার হার নিয়ে বিচার করুক। পটিদার শ্রেণীভুক্ত বারদোলির জোতদাররা বাড়তি খাজনা দেওয়া বন্ধ করল। অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক, অল্পবাকি খাজনার জন্য বড় বড় সম্পত্তি নীলাম, এমনকি কারাদণ্ড বিনা হিংসায় তারা বরণ করল। পাতিল ও তালাতিরা পদত্যাগ করতে থাকল। আশ্চর্য ব্যাপার, চির নির্যাতিত 'কালি পরজ' সম্প্রদায়ও নীলামি জমি বন্দোবস্ত নিতে এগিয়ে এল

না। সরকার শেষে অনুসন্ধান করতে রাজি হলেও বর্ধিত হারে দেয় বকেয়া খাজনা জমা রাখতে বলে। প্যাটেল বলেন আগেকার হারে দেয় খাজনার বাড়তি এক পয়সাও দেওয়া হবে না এবং জনগণের প্রতিনিধি নিয়ে অনুসন্ধান কমিটি গঠন করতে হবে। বোম্বাই সরকার প্যাটেলকে গ্রেফতার করা মনস্থ করলে গান্ধী স্বয়ং রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। শেষপর্যন্ত ১৯২৮-এর ৬/৭ আগস্টে একটা আপোস হয়। সরকার ম্যাক্সওয়েল-ব্রুমফিল্ড্ কমিটিকে খাজনা বিষয়ে অনুসন্ধানের নির্দেশ দেন, স্যাড রেভিন্যু কোড অ্যামেণ্ডমেণ্ট বিল প্রত্যাহার করেন, সমস্ত অসমাপ্ত বন্দোবস্ত বাতিল করেন।[২৯৭]

অহিংস যুদ্ধে বারদোলি বিজয়ের মুকুট পরে ১৯২৮-এর কলকাতা কংগ্রেসে গান্ধী এলেন। তিনি জানতেন যুবশক্তি, কম্যুনিস্ট দল, সন্ত্রাসবাদী সবাই পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তুলবে। লখনউ থেকে দিল্লী এ আই সি সি-তে তরুণ নেতারা বারংবার এই প্রস্তাব তুলেছে। ১৯২৭ থেকেই মতিলাল জওহরলালকে সভাপতি করার আবেদন জানাচ্ছিলেন। কিন্তু গান্ধী ১৯২৭-এ আনসারিকে সভাপতি করেন ও ১৯২৮-এ মতিলালকে। বাংলা থেকেও মতিলালকে সভাপতি করার আবেদন এসেছিল। গান্ধী জানতেন মতিলাল তাঁর মানস-সন্তান—নেহরু রিপোর্টের জন্য, অর্থাৎ ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস লক্ষ্যের জন্য, আপ্রাণ লড়বেন। তাঁর সঙ্গে যোগ দেবেন উদারতন্ত্রীরা।

২৬ ডিসেম্বর (১৯২৮) গান্ধী প্রস্তাব তুললেন পূর্ণ স্বাধীনতাবিষয়ক মাদ্রাজ প্রস্তাব মেনে নিয়ে নেহরু কমিটি গৃহীত শাসনতান্ত্রিক খসড়া অনুমোদন করা হোক। শুধু শর্ত থাকুক যে ১৯৩০-এর ৩১ ডিসেম্বরেব মধ্যে সরকারকে তা গ্রহণ করতে হবে। না করলে কংগ্রেস পুনরায় কর-বর্জন সংবলিত অহিংস অসহযোগ আরম্ভ করবে। খসড়া পড়লে সন্দেহ থাকে না যে যুবশক্তিকে খুশি রাখার জন্য গান্ধী একই সঙ্গে নরম ও গরম সুরে কথা বলছেন। জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র কিছু সংশোধনী আনলেন যার মূল কথা—কোনও সময়সীমা নির্দেশ করা হবে না এবং কখনই প্রস্তাবের প্রতিলিপি বড়লাটকে পাঠানো হবে না। আরও লক্ষণীয়, কংগ্রেস শুরু হবার আগে ৫০,০০০ মিল শ্রমিক কংগ্রেস-মণ্ডপ কয়েক ঘণ্টার জন্য দখল করে রেখেছিল এবং পূর্ণ স্বরাজের ও ধনতান্ত্রিক শোষণ অবসানের প্রস্তাব নিয়েছিল। বাংলার সন্ত্রাসবাদীরাও তাতে মদৎ দিয়েছিল।

গান্ধী তাদের বুঝিয়ে শান্ত করেন। কিছু সংশোধন মেনেও তিনি নিয়েছিলেন। ২৮ ডিসেম্বর যে বয়ান পেশ করা হয় তাতে সময়সীমা এক বছর এগিয়ে আনা হয়, অর্থাৎ ১৯২৯-এর ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে পার্লামেণ্ট নেহরু রচিত শাসনতন্ত্র না মেনে নিলে অসহযোগ ইত্যাদি শুরু হবে। জওহরলাল এই বয়ানের সঙ্গে একমত হননি তবে, গান্ধীর ভাষায়, "উচ্চমনা বলে তিনি অপ্রয়োজনীয় তিক্ততা সৃষ্টি করতে চাননি।" বিষয় নির্বাচনী কমিটির সভায় উপস্থিতও তিনি ছিলেন না।

বাঙালীরা অবশ্য খুশি হয়নি। জওহরের অনুপস্থিতির ফলে হৃতবল সুভাষচন্দ্র নীরব ছিলেন এবং বিষয় নির্বাচনী কমিটি গান্ধীর দ্বিতীয় বয়ান ১১৮-৪৫ ভোটে গ্রহণ করে। কিন্তু ৩১ ডিসেম্বর প্রকাশ্য অধিবেশন বসলে সুভাষচন্দ্র অবিলম্বে পূর্ণ স্বরাজের দাবি উত্থাপন করলেন। বেশ কিছু সদস্য তাঁর দিকে চলে যাচ্ছে দেখে গান্ধী তাদের তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করলেন। বসু বললেন, বাঙালী প্রতিনিধিদের অধিকাংশের ইচ্ছানুযায়ী তিনি কাজ করেছেন। অরুণ গুহের লেখায় পড়ি, বিপ্লবীরা, বিশেষত সতীন সেন, সুভাষকে প্রণোদিত করেন। যুগান্তর দলের পত্রিকা "স্বাধীনতা" শুধু রাজনৈতিক নয়, অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও দাবি করছিল। যাই হোক, সুভাষের সংশোধনী ১৩৫০-৯৭৩ ভোটে হারল এবং ১লা

জানুয়ারি (১৯২৯) গান্ধীর দ্বিতীয় বয়ান প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হ'ল।[২৯৯] জওহরলালের সভাপতিত্বে কলকাতায় যে সমাজতন্ত্রী যুবকংগ্রেস হয় তাতে সাম্যবাদী সমাজের পূর্ব শর্তরূপে পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। অনেক উপরোধে তিনি কংগ্রেসের সচিব হতে রাজি হয়েছিলেন।[৩০০] তিনি যেন কিছুতেই ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস গলাধঃকরণ করতে পারছিলেন না।

মোটামুটি স্থির হল ১৯২৯ সালে কংগ্রেস গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করবে। ব্রিটিশ পণ্য বর্জন বা তাতে অগ্নিসংযোগ, মাদকদ্রব্য বর্জন, বিশেষ বিশেষ অন্যায় প্রতিরোধ (বারদোলি প্রথায়) চলবে। ধীরে ধীরে আন্দোলনের গতিবেগ বাড়াতে চেয়েছিলেন গান্ধী, কারণ কংগ্রেসের সংগঠন সবল ছিল না ; সক্রিয় সদস্য সংখ্যাও বেশি ছিল না, অর্থ তো নয়ই। ১৯২৯-এর ১ ফেব্রুয়ারি নেহরুকে গান্ধী লেখেন, "Put the Congress Committee in order: the Congress must be a living thing." কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা বছরের গোড়ায় ছিল মাত্র ৫৬,০০০। জওহরলালের অনলস প্রয়াসে ছ মাসে তা হয় পাঁচ লক্ষ।[৩০১] গান্ধী যুবশক্তিব উগ্রতার ও সাম্যবাদী ঝোঁক প্রশমিত করার জন্য জওহরলালকে ১৯২৯-এব কংগ্রেসেব সভাপতি হতে আহ্বান জানালেন।[৩০২] ১৯২৮-এ ঝরিয়ায় AITUC-ব নবম অধিবেশনে রাজনৈতিক আন্দোলনে শ্রমিকেব স্থান নিয়ে উত্তপ্ত বিতর্ক হয। কংগ্রেস চেয়েছিল তারা জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের অধীনে ও লক্ষ্যানুযায়ী চলুক, অন্যদিকে মানবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় মেনিফেস্টো শুধু ব্রিটিশ বিতাড়ন চাযনি, জাতীয় সভা (তিনি বোধহয় কনস্টিট্যুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলির কথা ভাবছিলেন)-র হাতে সার্বভৌম কর্তৃত্ব, ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ, ব্যাপক শিল্প জাতীয়করণ, ন্যূনতম মজুবী হার, দৈনিক অনধিক আট ঘণ্টা কাজ এবং শ্রমিকদের অধিকাব রক্ষার্থ লেবার কাউন্সিল চেয়েছিল।

গান্ধী কি এতদূরও যেতে চেয়েছিলেন ? বিঠলভাই প্যাটেল বডলাটকে জানাচ্ছেন, গান্ধী ব্রিটিশ সম্পর্ক আদৌ ত্যাগ করতে চান না এবং বিদেশ, স্ববাষ্ট্র এবং, সম্ভব হলে, আরক্ষা দফতর ছেড়ে দিলে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস মেনে নেবেন। আব সময়সীমা নির্দিষ্ট হয়েছে দলের ভাঙন এড়াবার জন্য। প্যাটেল আরুইনকে গান্ধী, মতিলাল ও সাপ্রুর সঙ্গে দেখা করতে বলেন।[৩০৩] আরুইন তাতে রাজি হননি। উদারপন্থী ও রাজন্যবর্গ ভয় পেয়েছে এবং সর্বদলীয় সম্মেলনে মতানৈক্য হয়নি দেখে তিনি অপেক্ষা করতে মনস্থ করেন।[৩০৪]

২৮ থেকে ৩১ আগস্ট (১৯২৮) নেহরু রিপোর্ট আলোচিত হয লখনউ সর্বদলীয় সম্মেলনে। আবাব সম্মেলন বসে ডিসেম্বরে, কলকাতায় কংগ্রেসের প্রাক্কালে। জিন্না এখানে কয়েকটি সংশোধনী (বা দাবি) পেশ করেছিলেন। জিন্না ছিলেন যুক্ত রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রবক্তা। অন্যান্য নেতাদের মত আপন আপন প্রাদেশিক স্বার্থ নিয়ে বেশি মাথা না ঘামিয়ে মুসলিম সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু সব প্রদেশের মুসলমানদের কথাই তিনি ভাবতেন। তখন পর্যন্ত শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার সমর্থন করছিলেন তিনি। অবশ্যই তাকে আইন পরিষদের কাছে দায়িত্ববান হতে হবে। তবে সংখ্যালঘু প্রদেশগুলির জন্য তিনি চাইছিলেন weighted representation আর পঞ্জাব ও বাংলার জন্য জনসংখ্যার ভিত্তিতে মুসলিম আসন সংরক্ষণ। তিনি নতুন করে চাইলেন বাড়তি ক্ষমতা(residuary powers) প্রদেশদের দেওয়া হোক। তার অর্থ—দুর্বল কেন্দ্র। মুডিম্যান কমিটির মাইনরিটি রিপোর্টের অন্যতম স্বাক্ষরকারী জিন্না কিন্তু চেয়েছিলেন এই বাড়তি ক্ষমতা কেন্দ্রকে দেওয়া হোক। বুঝতে অসুবিধা হয় না, তিনি অন্যান্য মুসলিম নেতাদেরও পক্ষে রাখতে চাইছেন। মুন্সী লিখেছেন জিন্না কলকাতায় এসেছিলেন "In a truculent

mood"[৩০৫] সাপ্রু সবাইকে বলেন ঠাণ্ডা মাথায় জিন্নার সংশোধনী বিচার করা হোক। এমনকি, যা তিনি চান দিয়ে ব্যাপারটায় দাঁড়ি টানা হক ("and be finished with it")।[৩০৬] সমসাময়িক বর্ণনা দিয়েছেন জামসেদ নাসেরওয়ানজী। জিন্নার সংশোধনী শুধু প্রত্যাখ্যাত হল না, কেউ কেউ প্রশ্ন তুললেন, মুসলমানদের হয়ে কথা বলার অধিকার জিন্নার আছে কি ? নাসেরওয়ানজী লিখছেন :

"পরের দিন তিনি ট্রেনে কলকাতা ত্যাগ করলেন এবং আমি তাঁকে স্টেশন ছাড়তে গেলাম। তিনি তাঁর প্রথম শ্রেণীর কুপে কামরার দরজায় দাঁড়িয়েছিলেন। আমার হাত জড়িয়ে ধরলেন। চোখে তাঁর জল। বললেন, 'জামসেদ, এখান থেকেই আমাদের ভিন্ন দিকে পথ বেঁকে গেল।'[৩০৭] খলিকুজ্জমানও সায় দিয়ে বলেছেন, সেই দিন দেশের ভাগ্য নির্দিষ্ট হয়ে গেল। "হিন্দু রাজনীতিজ্ঞদের অদূরদর্শিতা অনতিক্রমণীয়।"[৩০৮] কলকাতার পর অকংগ্রেসী মুসলমানরা আর যৌথ নির্বাচন কথাটা উচ্চারণ করেননি।

কিন্তু জিন্নার দাবি কি সত্যি যুক্তিসঙ্গত ছিল ? পঞ্জাবের হিন্দু, মুসলিম, শিখ প্রত্যেক সম্প্রদায়ই জিন্নাব প্রাথমিক দিল্লী-প্রস্তাবে আপত্তি জানিয়েছিল। শিখরা জনসংখ্যার ১৪% হলেও তারা ৩০% আসন চেয়েছিল কারণ তারাই ছিল পঞ্জাবের পূর্বতন শাসক। 'রাজ করেগা খালসা' এই বাণী তাদের কানে আজও বাজে। দ্বিতীয়ত,পঞ্জাবের মুসলমানরা তো বাংলার মুসলমানের মত জোতদার বা শোষিত চাষী-প্রজা ছিল না। তারা ছিল অনেক বেশি বিত্তবান ও অগ্রসর। হিন্দু-শিখদের তুলনায় মাঝারি চাকুরি তারাই বেশি করত। মুসলিম অভিজাতদের তো ব্রিটিশরা মাথায় তুলে রেখেছিল, তাদের সাহায্য ছাড়া সৈন্যবাহিনীর রংরুট সংগ্রহ করা যেত না। লাহোরের পশ্চিমে অধিকাংশ বড় জমিদার ছিল মুসলিম। সেচসেবিত গুজরানওয়ালা, লিয়ালপুর, মণ্টগোমারিতে তারা শিখদেব সমান হিস্যাদার।[৩০৯] মুসলিমদেব প্রধান ছিলেন ওমর হায়াৎ খান তিওযানা, ফিবোজ খান নুন, সিকান্দার হায়াৎ খান, এ ওয়াই কে দৌলতানা ও ফজল-ই-হোসেন। ১৯২৩ থেকে ফজল-ই-হোসেন পঞ্জাব ন্যাশানাল য়ুনিয়নিস্ট পার্টির নেতা হয়েছিলেন এবং গ্রামাঞ্চলের স্বার্থ বক্ষার্থ নানা আইন (Money-lenders Registration Bill, Punjab (urban property) Rent Regulation Bill) আনেন, যার ফলে শহুবে মহাজন ব্যবসায়ী বৃত্তিজীবী (অধিকাংশই আগরওয়াল, ক্ষত্রি, অরোরা জাতের হিন্দু) রেগে যায়। মুসলিম উচ্চশিক্ষা বাবদ ঢালাও খরচ করতে থাকেন তিনি এবং তাদের জন্য মেডিক্যাল কলেজে আসন সংবক্ষণ করেন। এর ওপবে আবার ম্যুনিসিপ্যালিটি ও জেলা বোর্ডে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচন প্রবর্তন করেন তিনি।

১৯২৫-এ মুসলিম ৫৩% জেলাবোর্ড নিয়ন্ত্রণ করছিল। ম্যুনিসিপ্যাল অ্যামেণ্ডমেণ্ট অ্যাক্ট হিন্দুদের ভাল লাগেনি। তারা লালা দুনিচাঁদ ও লালা গঙ্গারামের নেতৃত্বে ম্যুনিসিপ্যাল নির্বাচন (১৯২৩) বর্জন করেছিল এবং লাহোব, রাওলপিণ্ডি ও ফিরোজপুরে মুসলিমরা ম্যুনিসিপ্যালিটির কর্তৃত্ব দখল করলে প্রতিবাদস্বরূপ পদত্যাগ করেছিল। তাদের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান হল ফজল-ই অপসারণ। তাদের ভাবগত নেতৃত্ব দিলেন লালা লাজপত রায় ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিলেন পঞ্জাব হিন্দু সভার সভাপতি—রাজা নরেন্দ্রনাথ।[৩১০] ফজল-ই-র মাইনে কমাবার হিন্দু প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় মুসলিম ও ব্রিটিশ আমলা প্রতিনিধিদের মিলিত ভোটে। শুদ্ধি, সংগঠন, তানজিম, তবলিগ, পঞ্জাব ও তার বাইরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, মূলত, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার লড়াইকে, শহর ও গ্রামাঞ্চলের লড়াইকে, একটা সাম্প্রদায়িক চেহারা দেয়। বলা বাহুল্য সরকার এসব থামাতে বিশেষ যত্ন নেয়নি।

বার্কেনহেড বরং খুশি হয়েছিলেন ; রিডিংকে লিখেছিলেন, "I have placed my highest and most permanent hopes upon the eternity of the communal situation." পঞ্জাব সরকার ফজল-ই-কে পূর্ণ সমর্থন জানায়। ফজল-ই-কে সাহায্য করে গ্রামাঞ্চলের জাঠরা—লালচাঁদ ও ছোটুরাম। হেইলি বুঝেছিলেন একদিকে মুসলিম-জাঠ, অন্যদিকে হিন্দুর এই মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনিই দাঁড়িপাল্লার সমতা রক্ষা করবেন।[৩১১] তিনি মহাজনদের বিরুদ্ধে আনা আইন নাকচ করে দেন এবং ফজল-ই-কে সংরক্ষিত সফতর সমূহের কাউন্সিলার করে তাঁর চিরশত্রু মনোহরলালকে মন্ত্রী করেন।[৩১২] অতএব অল পার্টিজ কনফারেন্সে ফজল-ই বা জিন্নার প্রতিদ্বন্দ্বী সাফির হিন্দুদের সঙ্গে সমঝোতা করার কোনও ইচ্ছা ছিল না। জিন্না চেয়েছিলেন শুধু মুসলমান নয় ভারতীয় রাজনীতিতে তাঁর হৃত প্রভাব পুনরুদ্ধার করতে। ফজল-ই ও সাফি তাঁকে কেন মদৎ দেবেন ? অন্যদিকে লাজপত, মুঞ্জে, জয়াকর তাঁরাই বা কেবল ত্যাগ স্বীকার করবেন ? করতে গেলে পঞ্জাবের হিন্দু ও শিখরা, বাংলার হিন্দুরা মানবে কেন ?[৩১২ক] মতিলালের মতে জিন্নার দাবি "utter nonsense", তা ছাড়া জিন্না বা মহম্মদ আলি কেউই মুসলিমদের প্রতিনিধিত্ব করেন না। জয়াকর গান্ধীকে লেখেন,

"....the Mahommedans were divided on these demands, into four well-known groups. Three of them were against joint electorates at any price. It was therefore not clear on whose behalf Mr. Jinnah spoke and what bulk of the entire Mahommedan community would be placated if his demands were conceded."[৩১৩]

আরুইনও জিন্নাকে কোন গুরুত্ব দেননি। আলি ভাইরাই জিন্নাব ওপব প্রসন্ন ছিলেন না, পঞ্জাবের সাফি ও ফজল-ই-র বা বাংলার গজনভিব দল তো নয়ই। সাফি যখন দিল্লীতে এক সর্বদলীয় সম্মেলন ডাকলেন (৩১ ডিসেম্বর ১৯২৮ থেকে ১ জানুয়ারি ১৯২৯) এবং নেহরু-শাসনতন্ত্র প্রত্যাখ্যান করলেন, তখন তাঁর পাশে ছিল পঞ্জাবের সব মুসলমান, বাংলার ও উত্তর প্রদেশের অনেকে, সীমান্ত, সিন্ধু বালুচিস্তানের প্রায় সবাই।[৩১৩ক] অতএব জিন্নাকে খুশি করলেই হিন্দু-মুসলিম সমস্যার চিরকালীন সমাধান হত (পক্ষান্তরে দেশবিভাগ এড়ান যেত), একথা মানা যায় না। পিটার হার্ডির মত পক্ষপাতী ঐতিহাসিক বলছেন, তা করলে হিন্দু ও শিখরা নেহরু রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করত। ১৯২৯-এ গান্ধী দু দুবার জিন্নাকে এই কঠিন সত্য বোঝাতে গিয়ে পারেননি। আর একটা কথা আমরা ভুলে যাই, ব্যর্থকাম হয়ে জিন্না নীরব থাকেননি, সাফিদের সঙ্গে যোগ দিয়ে দিল্লী কনভেনশনের প্রস্তাবগুলিকে চৌদ্দ দফায় সুষ্ঠু রূপ দিলেন। ঝানু আইনজ্ঞ জিন্না বুঝেছিলেন এদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে না চললে আপাঙক্তেয় হতে হবে। এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের ১৯২৯-এর ১২ই মার্চের বিতর্ক স্মরণীয়। জিন্না ও সাফির বক্তব্যে পার্থক্য ছিল না। মতিলাল জোর করে তাঁদের থামিয়ে দেন। জিন্না আরও বুঝেছিলেন, এখন তাঁর প্রধান সেনাপতি বা Sole Spokesman হবার সময় আসেনি, কালহরণ প্রয়োজন। তিনি ইংল্যাণ্ডে স্বেচ্ছানির্বাসন নিলেন।

আনসারিও ব্যাপারটায় খুশি হননি। কলকাতা প্যাক্টে সবাই রাজি হয়, মাদ্রাজ কংগ্রেস তা গ্রহণও করে। এমন কি মালব্যও মেনে নেন। এখন ১৯২৯-এর প্রথম সব গোলমাল হয়ে গেল। এই অবস্থায় অসহযোগ অকল্পনীয়। তবু গান্ধী তাঁকে লিখলেন, "the third party—the evil British Power—has got to be sterilized."

১৯২৯-এর প্রথম থেকে কংগ্রেস বিদেশী বস্ত্র বিপণি পিকেটিং এবং বিদেশী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব শুরু করল। হোম সেক্রেটারি সব প্রাদেশিক সরকারকে কঠোর দমননীতি নিতে নির্দেশ দিলেন।[৩১৪] মহাত্মা গান্ধী কলকাতার এক পার্কে বক্তৃতা করার সময় বিদেশী কাপড় পোড়ান হল ও সেই অপরাধে তাঁকে স্থানীয় পুলিশের কাছে মুচলেকা দিতে হল।[৩১৫] জওহরলালকে মীরাট ষড়যন্ত্রের মামলায় জড়িয়ে ফেলার কথাও উঠেছিল। ওয়ার্কিং কমিটি ও এ আই সি সি-র সদস্যদের গ্রেফতার চলল। আইনসভার বাচস্পতি প্যাটেল এর শোধ নিলেন পাবলিক সেফটি বিলের অনুমতি প্রার্থনা নামঞ্জুর করে। আবার দেশের বহু জায়গায় শ্রমিক ধর্মঘট দেখা দিল। বোম্বাইতে গির্নি কামগর য়ুনিয়ানের ডাকে বস্ত্রশিল্পে ফের শুরু হল ধর্মঘট; পূর্বাঞ্চলে—কলকাতার আশপাশের চটকলে, জামশেদপুর গোলমুরি টিনপ্লেট ওয়ার্কশপ প্রভৃতিতে।[৩১৬] সুভাষ বসু বার্মা অয়েল কোম্পানির বজবজ শ্রমিক ধর্মঘটে ও পরে টাটার জামশেদপুর কারখানার ধর্মঘটে নেতৃত্ব দেন। গোয়েন্দা দফতরের পেট্রি মন্তব্য করেছিলেন, "কংগ্রেসের সাধারণ সদস্য ও শ্রমিকশ্রেণীর তো কোনও স্বার্থঘটিত ঐক্য নেই। দেখতে হবে কংগ্রেসী নেতারা কতটা শ্রমিক আন্দোলনকে শ্রেণীসংগ্রামের দিকে নিয়ে যান, কতটাই-বা কৃষকদের জমিদার-জোতদারদের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রণোদিত করেন।"[৩১৭] বিড়লা মনে করতেন, বসুর উদ্দেশ্য "is no doubt service to the labour but not necessarily inimical to the capitalist."[৩১৭ক]

আরুইন কোন বড় আন্দোলন চাননি, তিনি বরাবর সাপ্রু, মতিলাল প্রভৃতির সঙ্গে যোগ রাখতেন। ১৯২৯-এ ব্রিটেনে শ্রমিক-দলের জয় তাঁকে মীমাংসার একটা সুযোগ এনে দিল। আরুইন বিলেত গেলেন ও র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডেব ক্যাবিনেটকে বোঝালেন ভাবতীয় জনমত পক্ষে আনতে হলে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। বিরোধী রক্ষণশীল দলের নেতা বলডুইন জানালেন দলেব ও সাইমন কমিশনেব সঙ্গে আলোচনাসাপেক্ষে তিনি সম্মতি দিতে রাজি। সাইমন পরে বলেন তাঁর সঙ্গে আলোচনা করা হয়নি। রিডিং-এরও আপত্তি ছিল। তাঁর মনে হয় একবার বৈঠক বসলে পার্লামেণ্টের হাতে নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। লয়েড জর্জ সম্মতি দেন কৌশলগত কারণে। পরে তিনি পিছিয়ে যান ও সাইমনকে দিয়ে আপত্তি তোলান। ১৯২৬-এর বালফ্যুর ঘোষণার পর কমনওয়েলথ ও ডোমিনিয়ানের ক্ষমতা অনেক ব্যাপক হয়েছিল। ডোমিনিয়ান ও দায়িত্বশীল সরকার হয়েছিল সমার্থক। এই ওজর দেখিয়ে ভারতীয় নেতাদের সম্মতি আদায় করে পরিস্থিতির সামাল দেবার চেষ্টা করছিলেন আরুইন। বালফ্যুর ব্যাখ্যা কার্যকর করার ইচ্ছ তাঁর ছিল না। নেভিল চেম্বারলেনের ডায়েরি থেকে এই অভিসন্ধি আরোপ করা চলে।[৩১৮] তা ছাড়া বলডুইন, পীল, বার্কেনহেড প্রভৃতি শেষ মুহূর্তে ঘোষণা বন্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন।[৩১৯] ততক্ষণ বড় দেরি হয়ে গেছে। ১৯২৯-এর ৩১ অক্টোবর আরুইন ঘোষণা করেছেন, "It is implicit in the declaration of 1917 that the natural issue of India's constitutional progress, as there contemplated, is the attainment of Dominion Status."

যার প্রেক্ষাপট এরকম গোলমেলে তার পরিণতি কি আর হতে পারে! তবে ভারতীয় নেতারা এ সব খবর অনেক পরে পেয়েছিলেন—পার্লামেণ্টে বিতর্কের সময়। গান্ধী অহিংস সত্যাগ্রহীর আদর্শে শেষমুহূর্ত পর্যন্ত সংঘর্ষ এড়াতে চাইবেন আশ্চর্য কি! তিনি সহযোগিতার শর্ত দিলেন, গোলটেবিল বৈঠক ডাকা হবে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের দিনক্ষণ স্থির করতে নয়, তার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করতে। আরুইন ভাবলেন গান্ধী এ সব কড়া কথা বলছেন

জওহর, সুভাষের মত বামপন্থীদের টেনে রাখতে। তবু ভবিষ্যৎ ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা দূর করতে তিনি গান্ধী, মতিলাল, প্যাটেল ও সাপ্রুকে বললেন, গোলটেবিল বৈঠক কোন শাসনতন্ত্র রচনা করতে ডাকা হচ্ছে না।[৩২০] ইতিমধ্যে পার্লামেন্টের বিতর্ক, কাগজে বিভিন্ন নেতার চিঠিপত্র, বলডুইনের ধোঁয়াটে জবাব অনেকের মনে ব্রিটিশ অভিপ্রায় নিয়ে সন্দেহ উদ্রেক করেছিল।[৩২১] বিড়লা ও মতিলালের চিঠি তার সাক্ষ্য বহন করে।[৩২২]

জওহরলাল এত অস্বস্তি বোধ করছিলেন যে তিনি সচিবপদ ত্যাগও করেছিলেন। সবাই তখন বোঝান, সবকার দিল্লী ঘোষণা অগ্রাহ্য করবেই এবং আইনঅমান্য কার্যসূচি চালু হবেই।[৩২৩] আশ্বস্ত নেহরু আয়েঙ্গারকে জানান, সরকার কোনদিন কংগ্রেসের শর্ত মানবে না ও অচিরে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হবে।[৩২৪] সাপ্রু ও জিন্না উভয়েই আরুইনকে গান্ধীর সঙ্গে কথা বলতে অনুরোধ জানান। আরুইন বৈঠকে শাসনতন্ত্র রচনার পূর্ব প্রতিশ্রুতি দিতে রাজি হননি। গান্ধী বলেন, ব্যক্তিবিশেষের সততায় বিশ্বাস স্থাপন করলেও ব্রিটিশ অভিসন্ধি সম্বন্ধে সন্দেহ জাগছে।[৩২৫] যদি গান্ধী ও মতিলাল এই পরিস্থিতিতে বিদ্রোহী তরুণদের ওপর বেশি চাপ দিতেন তবে কংগ্রেস ভেঙে যেত। হেইলি সে আশাই করছিলেন। জওহরলাল এ আই টি ইউ সি-র সভাপতি রূপে গোলটেবিলের প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছিলেন। সুভাষবাবু তো আরো উগ্রপন্থী। গান্ধী কোন মূল্যেই কংগ্রেসের সংহতি বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি আরো বুঝেছিলেন কংগ্রেস অবিলম্বে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন শুরু না করলে তরুণ, কৃষক ও শ্রমিকরা আপোসকামী জাতীয় বুর্জোয়া নেতৃত্বের মুখোস খুলবার জন্য আন্দোলন শুরু করবে এবং অনিবার্যভাবে তা হিংসার পথে যাবে। উত্তর প্রদেশের সর্বত্র কৃষক বিক্ষোভ, বোম্বাই ও বাংলায় শ্রমিক বিক্ষোভ, পঞ্জাবে কীর্তি কিষাণ পার্টির অভ্যুদয়, সণ্ডার্স হত্যার জন্য ভগত সিং, রাজগুরু ও সুখদেবের বিশেষ ট্রাইব্যুনালে মামলার ফলে দেশব্যাপী উত্তেজনা, বড়লাট পাবলিক সেফটি বিল ও ট্রেডস ডিসপ্যুটস বিল বিশেষ অধিকার বলে পাস করায় ভগত সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত কর্তৃক আইনসভায় বোমা নিক্ষেপ—[৩২৬] সবই সে ইঙ্গিত দিচ্ছিল। গান্ধী তা অবজ্ঞা করতে পারেন না। গান্ধী নেতৃত্বের এই মধ্যস্থতার ভূমিকা ভুললে চলবে না। উদারপন্থীদের সঙ্গে রাখার জন্য যখন সম্ভব তখন তিনি তরুণ বিদ্রোহীদের বোঝাতেন, যখন সম্ভব নয় এবং নেতৃত্ব না দিলে আন্দোলন হিংসার পথ নেবে বুঝতেন, তখন পেছন ফিরে তাকাতেন না। তবে এটা সত্যাগ্রহীর আদর্শপ্রসূত, নেতৃত্ব হাতে রাখার মধ্যবিত্তসুলভ লোভ প্রসূত নয়।

১৯২৯-এর লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব গৃহীত হল। বিভিন্ন ব্রিটিশ দর্শকের জবানীতে স্পষ্ট হয়েছে লাহোর কংগ্রেস শুধু ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের সম্মেলন ছিল না, তার পেছনে ছিল সর্বশ্রেণীর ও স্তরের ভারতীয়ের দুঃখবরণের, ত্যাগ স্বীকারের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি। সভাপতির ভাষণে জওহরলাল নেহরু বলেন, ইউরোপীয় শাসনের মেয়াদ শেষ হয়ে এসেছে, ভবিষ্যৎ আমেরিকা ও এশিয়ার হাতে। হিন্দু, মুসলিম, শিখ এসব সাম্প্রদায়িক পার্থক্য বেশিদিন থাকবে না। সংগ্রাম শুরু হবে অর্থনৈতিক দাবিতে। এখন একমাত্র লক্ষ্য পূর্ণ স্বরাজ, যাতে সাম্যের ভিত্তিতে এক বিশ্বসমাজ গড়ে উঠতে পারে। যেহেতু ব্রিটিশ শাসন সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্রের পরিপোষক এবং গণশোষণনির্ভর, সে হেতু ভারত তার অধীনে থাকতে পারে না। ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের ফলে সত্যকার স্বাধীনতা পাওয়া যাবে না। তার জন্য চাই ব্রিটিশ সামরিক ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের অপসারণ। তিনি ঘোষণা করলেন, "আমি সমাজতন্ত্রী ও সাধারণতন্ত্রী।" কংগ্রেস হয়তো এখনই সমাজতন্ত্র নিতে পারবে না কিন্তু দারিদ্র্য ও বৈষম্য দূর করতে একদিন তা নিতেই হবে। অবশ্য সে লক্ষ্যে

পৌঁছতে ভারত তার নিজস্ব পদ্ধতি স্থির করতে পারে। সমাজতন্ত্র বলতে তিনি কি বোঝেন তাও খানিকটা জানা যায়—ন্যূনতম মজুরী, শ্রমদিবস হ্রাস, সমবায়িক ভিত্তিতে শ্রমিক কর্তৃক শিল্প নিয়ন্ত্রণ এবং কৃষকদের জন্য ভূমি-স্বত্ব। প্রয়োজন হলে হিংসাব আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে, তবে অহিংসাকে কৌশলগত কারণে নিতে হবে। আপাতত আন্দোলন আবম্ভ হবে ব্রিটিশ পণ্য বর্জন দিয়ে, শেষ হবে কব-বর্জনে—সম্ভব হলে সাধারণ ধর্মঘটে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের ওপর জোর দিলেও নেহরু রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে প্রাগাধিকার দিয়েছিলেন। গান্ধী প্রশংসা কবে বলেন, "A confirmed socialist who wanted for his country only what it could manage, a practical statesman who tempered his ideas to suit his surroundings."[৩২৭] গোপাল এ জন্য বলেছেন, নেহরুব ওপর পাশ্চাত্য মার্কসবাদের চেয়ে ইউটোপীয় গান্ধীবাদের প্রভাব ছিল বেশি।

১৯২৯-এর ৩১ ডিসেম্বর মধ্যরাত্রে বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে ইরাবতীব তীর প্রকম্পিত করে কংগ্রেস পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব নিল। তাব সঙ্গেই, গান্ধীর জেদে, বড়লাটের ট্রেন ওড়াবাব জন্য নিন্দা প্রস্তাবও গৃহীত হল।[৩২৮] মতিলাল স্বরাজীদের আইনসভা থেকে বেবিয়ে আসতে নির্দেশ দিলেন। ১৯৩০-এর ২৬ জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবস পালিত হল এবং স্বাধীনতার শপথ নিল কোটি কোটি ভারতবাসী। ১৯৩০-এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত গান্ধী-হৃদযের পরিবর্তন হবে আশা কবছিলেন। তা হল না। আপোসের সূত্র হিসাবে এগারদফা দাবি পেশ করলেন তিনি। আরুইন ভুল করলেন তাঁর বাড়ানো হাত গ্রহণ না করে। এইসব দাবি কতকগুলি নির্দিষ্ট অন্যায়ের বিরুদ্ধে এবং প্রায় সকলশ্রেণীর স্বার্থে রচিত। তিনি যেমন বুর্জোয়া শ্রেণীর জন্য বিনিময়হার পরিবর্তন, স্বদেশী পণ্য সংরক্ষণ ও কোস্টাল টরিফ রেজার্ভেশন চান, তেমনি কৃষকদের জন্য খাজনার হার ৫০% হ্রাস এবং সকলের জন্য মাদকবর্জন ও লবণ-কর লোপ। রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি, মামলা প্রত্যাহার, পেনাল কোডের ১২৪এ ধারা, ১৮১৮-র ৩ নং রেগুলেশন প্রভৃতি দমনমূলক আইন প্রত্যাহার, গোয়েন্দাবিভাগ বিলোপ এবং আত্মরক্ষার্থ আগ্নেয়াস্ত্র রক্ষার অধিকার সন্ত্রাসবাদী ও কম্যুনিস্ট সকলের সুবিধের জন্য। সামরিক ও উর্ধ্বতন চাকুরির বেতন হ্রাসের ফলে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য টাকা বাঁচত।[৩২৯]

১৪-১৬ ফেব্রুয়ারি কংগ্রেস কার্যনির্বাহিক সমিতি গান্ধীকে ইচ্ছামত আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার ক্ষমতা দিল। সৈয়দ মাহ্মুদ বললেন, মুসলিম সম্প্রদায় আইন অমান্যের বিরোধী। কম্যুনিস্টরা তো নানাভাবেই উপহাস করছিল। মালব্য চেয়েছিলেন সর্বদলীয় সভা; বেশান্ত—গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান। সব পিছুটান অগ্রাহ্য করলেন গান্ধী। তিনি ঘোষণা করলেন, লবণ আইন অমান্য করে আরম্ভ হবে তাঁর নূতন আন্দোলন। ঠাট্টার সুরে বড়লাট লিখছেন, "লবণ আইন অমান্য নিয়ে আমার রাতের ঘুম ব্যাহত হচ্ছে না।"[৩৩০] হওয়া উচিত ছিল। যখন ১২ মার্চ অর্ধনগ্ন ফকীর তাঁর জরাজীর্ণ হাতে দীর্ঘ যষ্টি তুলে নিয়ে সবরমতী থেকে সুদূর আরব সমুদ্রের উপকূলে ডাণ্ডি অভিমুখে যাত্রা শুরু করলেন, সমস্ত ভারতবর্ষ উত্তাল হয়ে উঠে তাঁর পায়ের সঙ্গে পা মেলাল। সে অপূর্ব ছবি ধরে রেখেছেন অমর শিল্পী নন্দলাল বসু। আর জওহরলাল নেহরু—"He was the pilgrim on his quest for truth, quiet, peaceful, determined and fearless, who would continue that quiet pilgrimage regardless of consequences."[৩৩১]

উনিশশো তিরিশের আইন অমান্য আন্দোলনে অভূতপূর্ব সাড়া মিলল। এর প্রধান কারণ অর্থনৈতিক। ১৯২০-২২-এর অহিংস অসহযোগের প্রাথমিক সাফল্যের সঙ্গে কারণগত এই মিল থাকলেও মূল পার্থক্যও ছিল। ১৯২০-২২ সালে শিল্পজাত দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধিই ছিল সংকটের কারণ, ১৯২৯-৩৩এ কারণ হল বিশ্বব্যাপী মান্দ্য, যার ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতের কৃষিজাত পণ্য প্রচণ্ড মার খেল, অথচ আমদানী শিল্পজাত পণ্যের দাম তুলনামূলকভাবে কমল না। পাট, তুলো, তৈলবীজ, গম জাতীয় খাদ্যশস্য, সব কিছুর প্রাথমিক উৎপাদকদের আয় কমে যাওয়ায় অভ্যন্তরীণ বাজারে চাহিদাও কমে গেল। অন্য দিকে খাজনা, কর, সুদ ইত্যাদি উৎপাদকদের দেয় অর্থের ভার বেড়ে গেলে তাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিল, এবং অনেকক্ষেত্রে তাদের অপারগতার ফলে উচ্চতর ভূমিনির্ভর শ্রেণীও সংকটে পড়ল। নিম্নের সারণীগুলিতে এর একটা সংখ্যাতাত্ত্বিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে।

সারণী—১

ব্রিটিশ ভারত থেকে রপ্তানীকৃত
মুখ্য পণ্যদ্রব্যের মূল্য (হাজার টাকায়)

বৎসর	কার্পাস	সুতো	তৈরি বস্ত্র	কাঁচা পাট
১৯২৪-২৫	৯১,৪৭,০৩	৩,৭০,১১	৭,৫৭,৩৬	২৯,০৯,৩০
১৯২৮-২৯	৬৬,৪১,৫২	১,৯৫,৬৭	৫,৮৩,৮৯	৩২,৩৪,৯২
১৯২৯-৩০	৬৫,২২,৬৭	১,৯০,২৪	৫,২৮,৪৩	২৭,১৭,৩৮

ব্রিটিশ ভারত থেকে রপ্তানীকৃত
মুখ্য পণ্য দ্রব্যের মূল্য (হাজার টাকা)

বৎসর	পাটজাত দ্রব্য	চাল	গম	তৈলবীজ	চা
১৯২৪-২৫	৫১,৭৬,৬৬	৩৭,২৩,০১	১৭,১৯,৫০	৩৩,১৬,৮৫	৩৩,৩৯,২৪
১৯২৮-২৯	৫৬,৯০,৪৯	২৬,৪৬,৮৫	১,৬৯,২৪	২৯,৬২,৫২	২৬,৬০,৪৪
১৯২৯-৩০	৫১,৯২,৬৮	৩১,৫০,৯২	২১,২৪	২৬,৪৬,৭৬	২৬,০০,৬৪

[স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাবসট্রাক্টস, ব্রিটিশ ভাবত, ১৯২৪-২৫—১৯৩৩-৩৪, টেবল ২১৩]

সারণী—২

ব্রিটিশ ভারতে আমদানীকৃত
পণ্যদ্রব্যের মূল্য (হাজার টাকায়)

বৎসর	বস্ত্রাদি	তৈরি পোশাক	লৌহজাত দ্রব্য	শিল্পের ভারী যন্ত্রাদি	রাসায়নিক দ্রব্যাদি
১৯২৪-২৫	৭২,৬৬,২০	১,৫৪,৩৯	৪,৯৮,৬৯	১৪,৭৪,০৭	২,০৮,৮৩
১৯২৮-২৯	৫৬,৯৫,৫৮	১,৮২,৯৯	৫,২৩,২৮	১৮,৩৬,০৪	২,৪৭,৯৪
১৯২৯-৩০	৫৩,৪৮,৯৭	১,৭১,২৪	৫,০৬,৬৫	১৮,২১,৮৫	২,৭৮,৭৪

ব্রিটিশ ভারতে আমদানীকৃত
পণ্যদ্রব্যের মূল্য (হাজার টাকায়)

বৎসর	ঔষধ	অন্য যন্ত্রাদি	সাইকেল
১৯২৪-২৫	১,৬৯,৬৪	৩,০২,১৬	৭৭,২৪
১৯২৮-২৯	২,০২,০৩	৪,৯১,১৭	১,২৯,২৫
১৯২৯-৩০	২,২৬,২৫	৫,৩৮,২০	২,১৮,৯৯

[স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাবসট্রাক্টস, ব্রিটিশ ভাবত, ১৯২৪-২৫—১৯৩৩-৩৪, টেবল ২০৯]

সারণী—৩

বছর	দ্রব্যের মোট রপ্তানীমূল্য (হাজার টাকায়)	দ্রব্যের মোট আমদানী মূল্য (হাজার টাকায়)
১৯২৪-২৫	৩,৯৪,৬৬,৫৩	২,৪৬,৬২,৫৪
১৯২৮-২৯	৩,৩০,১২,৭৯	২,৫৩,৩০,৬০
১৯২৯-৩০	৩,১০,৮০,৫৫	২,৪০,৭৯,৬৯
১৯৩০-৩১	২,২০,৪৯,২৬	১,৬৪,৭৯,৩৭

[স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাবসট্রাক্টস, ব্রিটিশ ভাবত, ১৯২৪-২৫—১৯৩৩-৩৪, টেবল নং ২০৪]

ভারতীয় মূল্যের ইনডেক্স নং
১৮৭৩ = ১০০

বৎসর	কৃষিপণ্য মূল্য	অকৃষিপণ্য মূল্য
১৯২৮	২৬৭	১৮২
১৯২৯	২৫২	১৮২
১৯৩০	২০৬	১৫৪
১৯৩১	১৪২	১২০
১৯৩২	১২৮	১১৬
১৯৩৩	১২৫	১১৩

সারণী—৪

১৮৭৩-এর মূল্যসূচক ১০০ অনুসারে দাম

বছর	চাল	গম	জোয়ার	বাজরা	রগি	ছোলা	বার্লি
১৯২৪-২৫	৩৩৫	২৪৬	২৩৯	২৩৯	৩৮০	১৯৫	২০৭
১৯২৮-২৯	৩৫৭	২৬৪	২৫৩	২৫৭	৩৫৬	২৯৫	২৭২
১৯২৯-৩০	৩৩৬	২৬২	২৯৪	৩৪৭	৩৪৭	৩৪০	২৮৪
১৯৩০-৩১	২৭৩	১৭৭	২০৭	২৬২	২৬২	২৩২	১৫৫

[স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাবসট্রাক্টস, ব্রিটিশ ভারত, টেবল নং ৩০১]

সারণী—৫

খাদ্যশস্যের মূল্য (টাকায় কত সের পাওয়া যায় হিসেবে)					
সময়		গম	বার্লি	ডাল	চাল
জুলাই	১৯২৮	৬·৯১	১০·৯৫	৮·৮২	৫·৪০
,,	১৯২৯	৭·২৫	৯·৫০	৭·৭৫	৪·৭৫
,,	১৯৩০	১১·৫০	১৬·৭৩	১১·১৬	৬·৪৫
ডিসেম্বর	১৯৩০	১৫·১৪	২৫·০৪	১৫·৩৪	১০·২৩

[ইউ পি অ্যাডমিনস্ট্রেশন বিপোর্ট ১৯২০-৩০ P XIX

কে· এন চৌধুরীর হিসাবে ১৯২০-২১ সালে আমদানী বস্ত্রের মূল্য মোট আমদানী মূল্যের ২৬·৪% শতক ছিল, ১৯৩০-৩১-এ তা কমে হয ১৩·৫%। আমদানী সুতোব মূল্য ৪% থেকে কমে হয় ১·৯%।

ক্লড মার্কোভিৎস ও কে· এন· চৌধুরী বলছেন, বপ্তানী কমে যাওযায় ১৯৩০-৩১ থেকে ভারতবর্ষকে সোনা রপ্তানী কবতে হয়েছিল।

ম্যাক্ আলপিন আরও পবিষ্কারভাবে দেখিয়েছেন, ১৯২১ থেকে ১৯২৯ এব মধ্যে কৃষিপণ্যের দাম ওঠা নামা করে বারবার কিন্তু ১৯২৯ থেকে একেবাবে দ্রুত হারে নামতে থাকে।[৩৩২]

ভারত সরকার এ কথা জানতেন এবং আরুইন খাদ্যের রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া নিয়ে দুশ্চিন্তাও প্রকাশ করেছেন। দুটি প্রদেশের কথা আলাদা আলোচনা কবা যাক। বাংলার যে সব মধ্যবিত্তের আয় নির্দিষ্ট ছিল তাবা দ্রব্যমূল্য হ্রাসেব সুবিধা পেয়েছিল। তবে এ যুগ তাদের কাছে স্বর্ণযুগ ছিল মনে কবা ঠিক হবে না।[৩৩৪] স্মৃতি জিনিসটার ওপব বেশি নির্ভর করা ঠিক নয়, তার চাতুরী সর্বজনবিদিত। দ্বিতীয়ত কতজন মধ্যবিত্ত বাঙালীর একটা বাঁধা আয় ছিল? কবি বুদ্ধদেব বসুর কাছে বর্তমান লেখক শুনেছেন মাস মাইনে ১২৫ দেখিয়ে তাঁদের দেওয়া হত ৭৫। দ্রব্যমূল্য যতই কম হোক এটা কোন ভদ্রলোকেব পক্ষে যথেষ্ট নয়। আর আদালতে ভিড় করা উকিলদের দুর্দশা স্বচক্ষেই আমি দেখেছি। বাংলার শিল্পজগৎ ছিল ইংরেজ ও মাড়োয়ারির কব্জায়। তারপর বাংলাব মাঝারি, ছোট ও কোর্ফা চাষী, বর্গাদার ও ভূমিহীন মজুরদের অবস্থা অনুমেয়। খাজনা ও ঋণের বোঝা বাড়ায় চাষীরা চড়া সুদে ঋণ পাবার চেষ্টা করে। কিন্তু ঋণের উৎস গেছে শুকিয়ে। জমিদার-মহাজন ও ব্যবসায়ী-মহাজন অবস্থা বুঝে দাদনের কারবার থেকে সরে যায়। বাংলার রেজিস্ট্রেশন বিভাগের বাৎসরিক রিপোর্ট পরম্পরা থেকে দেখা যায় ১৯৩০ সালে বিক্রয় সংখ্যা হঠাৎ বাড়লেও পরে তা কমে যায়। বন্ধকীর সংখ্যাও। এর কারণ কেউ বলছেন ১৯২৮ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধনী (যা ১৯২৯ থেকে কার্যকর হল)। কিন্তু বিশ্বব্যাপী মান্দ্য কম দায়ী নয়। জমি লাভজনক না হলে উর্ধবতম মালিক বা মহাজন কেন তা কিনবে?[৩৩৫] বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্কিং এনকোয়ারি কমিটি (১৯২৯-৩০) জমির উর্বরা শক্তি হ্রাসের কথা বলে গেছেন।

উত্তর প্রদেশেও খাদ্যের প্রভাব রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রেক্ষাপট রচনা করেছে। ৫ নং

সারণীতে, শস্যমূল্য হ্রাসের হিসেব দেওয়া হল।

এর থেকে পরিষ্কার ১৯৩০-এর শেষার্ধে শস্যমূল্য অতিদ্রুত পড়ে গেছল। তাছাড়া তুলো তামাক ও চিনির দামও বেশ কমেছিল।

১৯২৯-৩০-এর প্রাদেশিক ব্যাঙ্কিং এনকোয়ারি কমিটির রিপোর্টে দেখি আগ্রার তুলনায় জনবহুল রায়বেরিলির চাষীর অবস্থা অনেক খারাপ। অধিকাংশই তালুকদারের অধীন তারা—৭২%-এর কোন দখলী স্বত্বও ছিল না। তারপরের বছরে কৃষি পণ্যের দাম অর্ধেক নেমে যায়। অযোধ্যার ক্ষেত্রে ভালো রবিশস্যের ফলন কাল হয়ে দাঁড়ায়। ১৯০১-এর সূচক ১০০ ধরে ১৯২২-এর তুলনায় খাজনা বাড়ে ৩৮ থেকে ৩৯ পয়েন্ট।

১৯৩১-এর জুলাইতে হেইলি জানান যে খাজনা এত বেড়েছে যে তিনি প্রকাশ্যে তা বলতে চান না।[৩৩৭] তালুকদার, ব্রাহ্মণ ও বণিক মহাজনেরা ঋণের দায়ে জমি দখল করতে থাকে। নজরানা প্রথা সমানে চলেছিল। সব চেয়ে খারাপ অবস্থা হয় গ্রামীণ প্রজা, অধীনস্থ রায়ত ও দেনাদারদের। কিন্তু ছোট জমিদার ও ধনী চাষীরাও বাদ যায়নি। তাই ১৯৩০ সালে ইউ পি-র আন্দোলন এমন ব্যাপক রূপ নেয়।

জুডিথ ব্রাউনের মতে কংগ্রেসের কোন পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি ছিল না। লবণ আইন অমান্য ছিল অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া। ১৯২০-২২-এর মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বয়কটের ডাক দেওয়া হয়নি, কেবল ছাত্রদের সাহায্য করতে বলা হয়েছিল। মুসলমানরা নিজেদের জড়ায়নি। শিল্পশ্রমিকরাও নয়। ১৯৩০-এর আন্দোলন যেন কতকগুলি স্থানীয় আন্দোলনের শিথিল সমাহার। খাজনাবন্ধ প্রভৃতি ব্যাপারে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির হাতে দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।[৩৩৮] 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় জয়রামদাস দৌলতরাম লিখেছিলেন, "প্রত্যেক শহর প্রত্যেক গ্রামকে সমরক্ষেত্র হতে হবে...তবে মহাত্মা গান্ধীর আইন অমান্য বিষয়ক নীতি বা কংগ্রেসের প্রধান কর্মসূচির বাইরে যাওয়া চলবে না।" বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিক্রিয়া দেখে স্থানীয় নেতারা বিভিন্ন কার্যক্রম স্থির করলেন আব এই নিয়ে বাংলার সঙ্গে কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের মনোমালিন্য ঘটেছিল।[৩৩৯] হেইলি জানতেন কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সংগঠন বা পরিচালনায় বিশেষ হস্তক্ষেপ করতে পারছে না।[৩৪০] কেন্দ্রীয় কংগ্রেস অফিসের নিশ্চেষ্টতা দেখে জওহরলাল সৈয়দ মাহ্মুদকে লিখেছিলেন, "যদি যথেষ্ট কাজ না থাকে, তবে কর্মীদের শীর্ষাসন করতে বল—যা হোক কিছু করুক।" টাকার অভাব ছিল। বড় বড় দাতাদের মধ্যে রজব আলি, বি· দেশাই, মতিলাল নেহরু ও বিড়লার নাম পাচ্ছি।[৩৪১] কিন্তু বিড়লা আইন অমান্য খাতে টাকা দেওয়ার অস্বীকার করেছেন। তিনি ঠাকুরদাসকে যে চিঠি লেখেন (১৬ জানুয়ারি ১৯৩১) তাতে বোঝা যায় তিনি দুপক্ষেই আছেন এবং সরকার ও গান্ধীর মধ্যে মিটমাট তাঁর কাম্য।[৩৪২] আহমেদাবাদের সব শিল্পপতিরা অর্থ দেননি। অম্বালাল আন্দোলন আইন সঙ্গত কিনা সে বিষয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলেন।[৩৪৩] তবে গান্ধীর কথায় পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে মিলবস্ত্রের দাম তাঁরা বাড়াননি। কোন কোন প্রদেশের বণিক, বিহাবের জমিদারবা চাঁদা দেন। আর জুডিথ ব্রাউনের ভাষায়, কলকাতা করপোরেশন ছিল কংগ্রেসের 'স্বর্ণখনিস্বরূপ'। দোকানদার, কন্ট্রাক্টরের মত লোকরা অর্থ সাহায্য করতে বাধ্য হত। তবে লেখিকা ভুলে গেছেন তাঁরই জাতের শতসহস্র মহিলার লক্ষ লক্ষ টাকার অলঙ্কার দানের কথা।[৩৪৪]

দমননীতি প্রয়োগে দ্বিধা করেননি আরুইন। প্রায় সব কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান নিষিদ্ধ হয়, নেতাদের ব্যাপকভাবে গ্রেফতার করা হয়, বিদেশী বস্ত্র ও মাদক দ্রব্যের দোকানের সামনে পিকেটিং এবং সরকারী কর্মচারীদের বাধা দান ও খাজনা বন্ধে প্ররোচনা দানের বিরুদ্ধে দুটি

অধ্যাদেশ জারি হয়। ১৯৩০-এর ১০ অক্টোবর বেআইনি সমিতি অধ্যাদেশের বলে কংগ্রেসের সম্পত্তি, ঘরবাড়ি দখল চলে। এমনকি অননুমোদিত সার্ক্যুলার মারফত খবরেব কাগজেও কংগ্রেসী প্রচারের কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল। গান্ধী-আরুইন চুক্তি পর্যন্ত এক হিসাবে মোট বন্দী সংখ্যা ছিল ২৯,০৫৪। এ আই সি সি-র মতে, ৯২,০০০ লোকের কোন না কোন শাস্তি হয়।[৩৪৫]

তৎসত্ত্বেও স্থানে স্থানে আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে। জওহরলাল ও যতীন্দ্রমোহন গ্রেফতার হলে কলিকাতায় প্রায় জাতীয় অভ্যুত্থান ঘটে। করাচীতে জনসাধারণের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ বাধে। পেশওয়ারে ২৩ এপ্রিল আবদুল গফ্‌ফর খাঁর গ্রেফতারের পর যে গণ আন্দোলন হয় তাতে শত শত লোক পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারায়। গাড়োযাল রাইফেলস বাহিনী নিরস্ত্র জনতার ওপর গুলি চালাতে অস্বীকার করলে তাদের সামবিক বিচার হয়। ২৪ এপ্রিল গান্ধী ধর্শনা লবণ গোলা অভিযান ঘোষণা কবেন। সেদিন সরোজিনী নাইডুর নেতৃত্বে জনতা অমানুষিক আক্রমণেব মুখেও যে নির্ভীক শৃঙ্খলা শক্তি মর্যাদা ও দৃঢ় সংকল্প মনোভাব দেখিয়েছিল তা ইতিহাস হয়ে আছে।[৩৪৬] তাঞ্জোরেব উপকূলে লবণ আইন অমান্যে রাজাজি নেতৃত্ব দেন। ২৭ এপ্রিল মাদ্রাজ সমুদ্রতীরে এই আইন অমান্যের সময় সংঘর্ষ ঘটে। ৫ই মে গান্ধী নিজে গ্রেফতাব হন। তারপর শোলাপুর কয়েক দিনের জন্য স্বাধীন হয়ে যায়।

আরুইনের 'লম্বা পপি' কেটে ফেলাব নীতি সফল হয়নি। কিন্তু আন্দোলনেব তিনটি দুর্বলতা প্রকট হয়ে ওঠে। প্রথমত ১৯৩০-এর শরৎকালেব পব শহবাঞ্চলে আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসে, যদিও তা গ্রামাঞ্চলে প্রবল হয়। দ্বিতীয় উত্তব-পশ্চিম সীমান্তের বাইবে মুসলমানরা আন্দোলনে যোগ দেয়নি—এটা আরুইনের পক্ষে দারুণ স্বস্তির কাবণ। "It is worth remembering that at the moment Gandhi is our enemy and the Muslims our friends."[৩৪৭] মুসলিম বন্দীব সংখ্যা ছিল ১১৫২, যেখানে হিন্দু বন্দীর সংখ্যা—২৭,৩৫৪। তৃতীয়ত ১৯২৭ ও ১৯২৮-এ শ্রমিক আন্দোলন প্রবলাকার ধারণ করলেও ঠিক আন্দোলনের সময় (১৯৩০-৩১) তা প্রায় স্তব্ধ হয়ে যায়। বোম্বাই-র শ্রমিক নেতাদের বিভ্রান্তিব কাবণ বিশ্লেষিত হয়েছে।[৩৪৮] জি আই রেলওয়ের শ্রমিক নেতা রুইকার যোগ দেন কিন্তু দেশপাণ্ডে, জোগলেকার, রণদিভে প্রভৃতি নেতা ও গির্নি কামগব ইউনিয়ন এই বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে দূরেই থাকেন।

বাংলার কথা ধরা যাক। ফেব্রুয়ারি-মার্চে কলকাতা শহবে বিদেশী বস্ত্র বর্জন, বিলেতী কাপড় ও মদের দোকানে পিকেটিং জোর কদমে চলতে শুরু করে।[৩৪৯] এক্ষেত্রে মহিলা স্বেচ্ছাসেবীদের ভূমিকা অত্যুজ্জ্বল।[৩৪৯ক] মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীদের একদল সুভাষকে সমর্থনও করেছিল। কিন্তু ১৯২৯-এর শেষে গোয়েন্দা দফতরের মতে তার গতি স্তিমিত হয়ে এসেছে। কলকাতা বন্দরে বিদেশী বস্ত্র ও সুরার আমদানী কমলেও তার কারণ ততটা বয়কট নয়, যতটা ১৯২৭-২৮-এর অতিরিক্ত আমদানি।[৩৫০] জওহরলাল ও গান্ধীব গ্রেফতারের পর কলকাতা আবার উত্তাল হয়ে ওঠে। কম্যুনিস্ট পরিচালিত গাড়োয়ান ধর্মঘট এর গতি বাড়ায়।

মফস্বলে আন্দোলন যে খুব বাড়েনি তার প্রধান কারণ বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধন নিয়ে স্বরাজীদের প্রজাবিরোধী ভোট। দখলিদার স্বত্ব হাত বদল, মালিকদের দেয় সেলামি, ভাগচাষীদের অধিকার ইত্যাদি নিয়ে তাদের প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থান মফস্বলে বিরাগ সৃষ্টি করেছিল। বসু বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি সুষ্ঠুভাবে সংগঠিত করতে

পারেননি। যে সভ্য সংখ্যা ধার্য হয়েছিল তার অর্ধেকের বেশি আনা যায়নি। শাসমল বা সেনগুপ্তর মত মফস্বলে তাঁর প্রভাব ছিল না। যুবশক্তিই ছিল তাঁর সমর্থক। এবিষয়ে শরৎচন্দ্রের 'তরুণের বিদ্রোহ' উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। হুগলীর ভূপতি মজুমদার, চট্টগ্রামের সূর্য সেন ও ঢাকার হেম ঘোষের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। অন্যদিকে মফস্বলের গান্ধীবাদীদের মুখপাত্র ছিলেন সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, যাঁর 'ভারতে সাম্যবাদ' রামরাজ্যের মহিমা কীর্তন করেছে, জমিদারী প্রথার মধ্যে কোন ত্রুটি যা দেখেনি, দেখেছে উচ্চাদর্শ থেকে জমিদারদের অধঃপতনে। তাঁর বিরাগ ছিল ধনী জোতদার ও মধ্যস্বত্বাধিকারী প্রজাদের ওপর। গান্ধীর বিশেষ আশীর্বাদ পেয়েছিলেন সতীশবাবু সোদপুরের খাদি কর্মোদ্যোগে। তিনি ও সুরেশ ব্যানার্জি প্রথম লবণ আইন অমান্য সংগঠন করেন। হিতেশরঞ্জন সান্যাল বর্ণনা করেছেন মহাজন ও জোতদারদের বিপক্ষে কংগ্রেস কর্মীদের কাজ। আরামবাগে প্রফুল্লচন্দ্র সেন অতি দরিদ্র চাষীদের মধ্যে খাদি ও গ্রামীণ কল্যাণকর্মে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন, যেমন কুমারচন্দ্র জানা মেদিনীপুরের সুতাহাটায়, যাদব পাঁজা বর্ধমানে। পরে এধরনের কাজ শ্রেণীগত জমিদার বিরোধিতায় সাহায্য করেছিল।[৩৫১]

অধিকাংশ ক্ষেত্রে হিন্দু জমিদারের বিরুদ্ধে মুসলমান ও নমঃশূদ্র বর্গাদারদের যৌথ বা পৃথক (পাবনা, যশোর, খুলনা, ঢাকা) অভিযান আইন অমান্য আন্দোলনের সংহতি নষ্ট করে দেয়। আবুল মনসুর আহ্‌মদ উঁচু জাতের হিন্দুদের উন্নাসিকতা পছন্দ করেননি।[৩৫২] ঢাকা, ফরিদপুর, রংপুর, ত্রিপুরা, মৈমনসিং ও পাবনার পাট চাষে ক্রম-বর্ধিষ্ণু মুসলমান কৃষকরা ১৯২৯-এর নির্বাচনকালে ফজলুল হককে প্রজাপার্টি স্থাপনে মদত দিয়েছিল। বরেন্দ্র ভূমিতে জিতু সাঁওতালের নেতৃত্বে আদিবাসী বিদ্রোহের আলোচনা করেছেন তনিকা সরকার।[৩৫৩]

য়ুনিয়ান বোর্ড বিরোধী আন্দোলন ফের শুরু হয় বাঁকুড়ার কোন কোন স্থানে, মেদিনীপুরের উপকূলবর্তী অঞ্চলে। কাঁথিতে সাধারণ গ্রামবাসীরা যে সাহস ও অনমনীয়তা দেখায় তা ইতিহাস হয়ে আছে। সেখানকার দোকানদাররা পুলিশ ও সরকারী কর্মচারীদের কোন ভোগ্যপণ্য বিক্রয় করত না। কারু অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক হলে তা বহন করার লোক বা যান মিলত না। পেডি (মেদিনীপুরের কলেক্টার) লিখছেন, পাঁশকুড়ায় তাঁকে অপমান করা হয়েছে, পরের দিন মারাও হবে। চৌকিদারী কর দেবার অনুরোধ (আদেশ নয়) জানালে তিনি উত্তরে পান ব্যঙ্গ বিদ্রূপ। আর কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবীদেব দেওয়া হয় উত্তপ্ত অভ্যর্থনা। চেচুয়াহাট এলাকা সরকারী নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ফলে আরম্ভ হয় প্রচণ্ড দমননীতি—বেত্র প্রহার ও অন্যান্য দৈহিক নির্যাতন, গুলি ও নির্বিচার গ্রেফতার।[৩৫৪] সন্দেহ নেই যে গান্ধীর অহিংসানীতি এখানেই সব চেয়ে কঠিন পরীক্ষা পার হয়েছিল।

এরপর শুরু হয় কর বর্জন—আরামবাগ, বালুরঘাট, কাঁথি, বিক্রমপুর ইত্যাদি স্থানে। অনেক ক্ষেত্রে মহিলাদের ভূমিকা সর্বাগ্রে। গ্রেফতার, ফসল নষ্ট, গোলা ও বাড়ি লুঠ, অস্থাবর ক্রোক, অগ্নিদাহ, পিটুনি পুলিশ, কিছুতেই সেদিন গ্রামের লোক ভয় পায়নি।

গান্ধীর আন্দোলন যে তাদের মনে একটা ধর্ম আন্দোলনের রূপ নিয়েছিল তা পরিষ্কার। ধর্মপ্রেরণা ছাড়া অশিক্ষিত দরিদ্র মানুষ, বিশেষত নারী, এত কষ্ট সহ্য ও ত্যাগ স্বীকার করার শক্তি পেত না। য়ুনিয়ান বোর্ডের সভ্য ও চৌকিদারদের দলে দলে পদত্যাগও লক্ষণীয়। অনেক জায়গায় সরকারের কোন প্রতিনিধি ছিল না, জানাচ্ছেন পেডি। মেদিনীপুর সদর মহকুমার শাসক বলছেন, রাস্তা কেটে, বড় বড় গাছের বাধা বানিয়ে, সাঁকো ভেঙে, গর্ত খুঁড়ে তারা গ্রামগুলিকে প্রতিরোধের দুর্গ তৈরি করেছিল। সুতাহাটায় বা তমলুকে সহিংস আক্রমণের আশঙ্কা ছিল।[৩৫৫] ঘাটালের চেচুয়াহাটে তা সত্যি ঘটেছিল।[৩৫৬] পেডি

লিখছেন—"The best thing that could happen would be to have more shootings."[৩৫৭] স্বরাষ্ট্র সচিব এমার্সন বলছেন, "I would put Midnapur as the district where the prestige of Government has fallen more than in any other." স্বয়ং ছোটলাট একে 'অভ্যুত্থানের' মর্যাদা দেন।[৩৫৭ক] এই অঞ্চলে কৃষি অবস্থার ও সম্পর্কের অবনতি আইন অমান্য আন্দোলনের মূল প্রেরণা ছিল।[৩৫৭খ]

পঞ্জাবের অমৃতসরে দুবছর আগে গড়ে ২৫ লাখ টাকার বিলাতী কাপড় বিক্রী হত এখন হচ্ছিল মাত্র ২ লাখ। বিরাট ব্যবসায়ী সি এল নায়ারকে ব্যবসা বন্ধ করে দিতে হয়।[৩৫৮] জুলাই থেকে বোম্বাই-এর মুলজি জেঠা বাজার বন্ধ থাকে; অক্টোবরে খুলবার চেষ্টা পিকেটিং-এর জন্য বিফল হয়। তামিলনাড়ুতে বস্ত্র বয়কট ব্যর্থ হয়েছিল। দিল্লী ও কানপুরের বণিকরা অসন্তুষ্ট। আমেদাবাদের কথা আগেই বলেছি। এটা সত্য যে হ্রাসমান মূল্যের জন্য অনেক ব্যবসায়ী বিলাতী কাপড় আনতে চাননি। বোম্বাইতে বিরাট মজুত ভাণ্ডার গড়ে উঠেছিল। তাই তারা গান্ধীকে কথা দেয় এক বছরের জন্য আমদানী করবে না। "In their 'patriotic' gesture they have thus made a virtue of necessity—a very paying virtue."[৩৫৯] বছর না ফুবোতে ফুরোতে বোম্বাই-এর প্রতিনিধি দল মতিলালকে অনুরোধ করে সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে।[৩৬০] অন্যদিকে দেখি ম্যাঞ্চেস্টারের প্রতিনিধিরা ভারত সচিবের সঙ্গে দেখা করে মিটমাটের কথা বলছেন। ১৯২৮-এ ভারতে রপ্তানি হয়েছিল ৯ কোটি ২০ লাখ গজ কাপড আর ১৯৩০-এর আগস্টে মাত্র ৪ কোটি ৭ লাখ গজ। একটাব পর একটা কারখানা বসে যাচ্ছে, হাজাব হাজার শ্রমিক বেকার হচ্ছে।[৩৬১] ১৯৩১-এ গান্ধী-আরুইন চুক্তি ভারত ও ইংল্যাণ্ডেব বণিকরাই ত্বরান্বিত করে। এটা ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছে গান্ধীর পরাজয় নয়, ল্যাঙ্কাশিয়রেব কাছে আরুইনেরও পবাজয়।

সি. পি-তে বন আইন অমান্য হয় প্রধান কর্মসূচি। গোণ্ড জাতীয় আদিবাসী রমণীরা দলে দলে ঘাস ও কাঠ কেটে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানায়। ছোটলাট মন্টেগু বাটলার আরুইনকে লিখছেন, "আমাকে জোর পালটা আঘাত হানতে হবে এবং হয়তো গুলির আদেশ দিতে হবে কিন্তু নির্বিচারে বেত্রাঘাতের চেয়ে তা আরও সদয এবং কার্যকব। নতুন ছররা গুলি সব চেয়ে মানবিক, এত বেশি মানবিক যে জনতা বুঝতেই পারবে না।"[৩৬২] একজন সুশিক্ষিত, অতি উচ্চপদস্থ, ইংরেজ কিভাবে মনুষ্যত্ব হারায় এমন নমুনা বিবল। পুলিশ দু বার গুলি চালায়। মাধব শ্রীহরি অ্যানে, মুঞ্জে প্রভৃতি বেরারের বনবিধি লঙ্ঘনে যোগ দেন। সুরাবর্জন আন্দোলন জোরদার হয়েছিল জাত পঞ্চায়েতের হস্তক্ষেপে। ১৯২৯ থেকে ১৯৩০-এর মধ্যে সি পি-র মাদক শুল্ক ৪০% কমে যায়।

বিহারে পাটনায় ও বিপুরে লবণ আইন অমান্য দিয়ে আন্দোলন শুরু হয। পরে চৌকিদারি কর বর্জন বৃহত্তর ভূমিকা নিয়েছিল। অনেক স্থানে এর জন্য দাঙ্গা বাধে। চম্পারন, সারণ, মজঃফবপুর, মুঙ্গের, পাটনা ও শাহাবাদে জোর বিদেশী বস্ত্র ও মাদক বিপণিতে পিকেটিং চলে। ছোটনাগপুরে বঙ্গা ও সোমরা মাঝি নিম্নবর্গীয় দাবির সঙ্গে জাতীয় দাবিও জুড়ে দিয়েছিল। তানাভগৎ সম্প্রদায় কংগ্রেসকে সমর্থন করে। জুডিথ ব্রাউনের মতে বিহারের খাজনার চাপ অপেক্ষাকৃত কম থাকায় কৃষক আন্দোলন দানা বাধেনি। ইউ পি-র মত এখানকার আন্দোলনের নেতা ছিলেন ছোট জমিদার ও উকিল আর বড় জমিদাররা সরকারের পক্ষে।[৩৬৩] বিহারে মাদক শুল্ক থেকে মোট আয়ের ৩২% আসত। এখানেই কংগ্রেসীরা বড় আঘাত হানতে পেরেছিল। মহুয়া গাছ থেকে দেশী মদ

তৈরি করা খুব সহজ ছিল। জি ম্যাকডোনাল্ড দেখাচ্ছেন মুঙ্গেরের কোন কোন স্থানে প্রশাসন ভেঙে পড়েছিল।[৩৬৪] ব্যাপক দমননীতি আন্দোলনের মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়। সম্পত্তি ক্রোক ও ভারী জরিমানায় ভয় পায় জমির মালিক শ্রেণী ও প্রজা উভয়েই। ১৯৩০-এর অক্টোবর থেকে কৃষিপণ্যের দাম হু হু পড়তে থাকে ও ১৯৩১-এর শেষে ১৯২৯-এর দামের অর্ধেক হয়ে যায়। অনেক প্রজাই ১৯২০-এর দশকে বেশি খাজনায় জমি নিয়েছিল, তারা খাজনা দিতে পারছিল না।

পঞ্জাবের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সম্প্রদায় যোগ দেয়নি। গান্ধী ও মতিলাল শিখদের পক্ষে আনার চেষ্টা করেন, বিশেষ করে দিল্লীর শিশগঞ্জ গুরুদ্বারে গুলি চালনার পর। কিন্তু শিখদের মধ্যে দ্বিমত দেখা দেয়। তারা সিং গোষ্ঠী আন্দোলন সমর্থন করে, খরক সিং গোষ্ঠী নীরব থাকে; কম্যুনিস্ট ঘেঁষা নওজোওয়ান সভা ও কীর্তি কিষাণ দল গ্রামাঞ্চলে গোলমাল করে কিন্তু তারা কারারুদ্ধ হলে আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায়।[৩৬৫] তবু হিসারের প্রজারা খাজনা বন্ধ করে। রোতকে জাঠ ও নিম্নশ্রেণীর লোকরা মহাজন ও শস্য-মজুতকারীদের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছিল।

তামিলনাড়ুতে রাজাজি খাজনা বন্ধের দিকে যেতে চাননি বলে তাঞ্জোরেব কল্লার শ্রমিক ও দরিদ্র চাষী-অধ্যুষিত অঞ্চল পাশ কাটিয়ে ব্রাহ্মণ-অধ্যুষিত অঞ্চলে লবণ আইন অমান্য করতে গিয়েছিলেন। মাদ্রাজ শহরে জাতিবৈরীর এমন উগ্র প্রকাশ আগে দেখা যায়নি। লবণ সত্যাগ্রহ নিয়ে মাদ্রাজ সমুদ্রতীরে ২৭ এপ্রিল গুলি চলে। মাদক ও বিলাতী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং বাড়ে। আর্কটের বেকার তাঁতী, মাদুরার মান্দ্যপীড়িত চাষীরা যোগ দেয়। ডেভিড আরনল্ড বলছেন, মাদুরার সৌবাষ্ট্র সম্প্রদায়ের তাঁতীদের জাতে ওঠবার তাগিদ মাদক বর্জনের পেছনে কাজ করছিল। মাদক শুল্ক আদায় ২০% কমে যায়। লক্ষণীয় যে, কামরাজ নাদার আন্দোলনকে জোরদার করতে চান ও সত্যমূর্তির সঙ্গে যোগ দিয়ে রাজাজিকে হঠাতে চান। নাদারবাও নীচু জাতের ছিল এবং তালগাছ থেকে তাড়ি তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করত। হয়তো এখানে ছিল জাতে ওঠার তাগিদ ও ব্যবসার সুবিধার সংমিশ্রণ।[৩৬৫ক]

অসহযোগ আন্দোলনের সময় গুণ্টুর জেলার খাজনা বন্ধ আন্দোলন একটা ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিল। ব্রিয়াঁ স্টডার্টের মতে[৩৬৬] ১৯২৫-৩০-এর মধ্যে অন্ধ্রে কংগ্রেসী কাজকর্ম অনেক বেড়েছিল। তার প্রধান কারণ, সমুদ্রতীরস্থ অঞ্চল ছিল অনগ্রসর। ১৯২৬ সাল থেকেই এখানে খাদ্য ও কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতির দাম বাডছিল। তৎসঙ্গে ঋণ। লোকসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে ভূমিস্বত্বের মাথাপিছু পরিমাণও কমছিল। তবু মুখ্য রাজস্ব-আধিকারিক হোলডস্‌ওয়ার্থ কৃষ্ণা-গোদাবরীর বদ্বীপ অঞ্চলের জন্য ১৮$\frac{3}{4}$% খাজনা বৃদ্ধির সুপারিশ করেন। তিনি বলেছিলেন, জমির উর্ধ্ব মূল্য সত্ত্বেও (প্রায় তিনগুণ) জমি কেনার হিড়িক বেশি লাভের লক্ষণ। ৩৭% মত চাষীর দেনা ছিল না। আইনসভায় হোলডস্‌ওয়ার্থের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন দন্দু নারায়ণরাজু—যিনি পশ্চিম গোদাবরী অঞ্চলের রাজু সম্প্রদায়ের একজন উচ্চবিত্ত কংগ্রেসী নেতা ছিলেন। গ্রাম, ফিরকা, তালুক ও জেলা সর্বস্তরে প্রতিবাদসভা হয়। নারায়ণরাজুর সহযোগী ছিলেন ব্রাহ্মণ টি প্রকাশম্। কিন্তু গুণ্টুর ব্রাহ্মণ কোণ্ডা বেঙ্কটাপ্পায়া ও পূর্ব গোদাবরীর সত্যনারায়ণ বারদোলি ধাঁচে খাজনাবন্ধ আন্দোলন করতে চান। মাদ্রাজ সরকার রাজস্ববৃদ্ধির ব্যাপারে অনুসন্ধান কমিটি বসিয়ে বিদ্রোহ ধামা-চাপা দিতে চান। কিন্তু লাহোর কংগ্রেসের পর সত্যনারায়ণের দল প্রবল হয়ে ওঠে ও খাজনা বন্ধ আন্দোলন শুরু করে। প্রত্যেক জেলায় গান্ধীর ধাঁচে লবণ আইন অমান্যকারী

পদযাত্রা চলে। নেতাদের ব্যাপকভাবে গ্রেফতার করে কোনওরকমে মুখরক্ষার চেষ্টা হয়। মাদ্রাজের লাট স্যার জর্জ স্ট্যানলির কিন্তু আশঙ্কা দূর হয়নি।[৩৬৭] গান্ধী-আরুইন চুক্তিতে প্রতিবাদীরা খুশি হয়নি।

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সীমান্ত প্রদেশে আন্দোলনের সাফল্য উল্লেখযোগ্য। পেশোয়ার ও কোহাটে সেনা নামাতে হয়। বান্নুর গ্রামাঞ্চলে ও ডেরা ইসমাইল খাঁ শহরে কংগ্রেসের আবেদন অভূতপূর্ব সাড়া জাগায়। আগস্ট মাসে সমগ্র প্রদেশে সামরিক আইন জারি ও উপজাতি অঞ্চলে বোমাবর্ষণ করতে হয়েছিল। জুডিথ ব্রাউন যথারীতি সরকারী প্রতিক্রিয়ার ওপর বেশি জোর দিতে গিয়ে আবদুল গফ্ফর খান ও খুদা-ই-খিদমৎগার-এর ভূমিকা সম্বন্ধে নীরব। নির্বিচার গুলি চালনার পরও দুর্ধর্ষ পাঠানরা ধৈর্য হারায়নি, আর গাড়োয়ালী সৈন্য নিরস্ত্র জনতার ওপর গুলি চালাতে অস্বীকার করে সামরিক বিচারে শাস্তি পায়।

মালাবারে হিন্দু-মুসলিম বিরোধ ও জাতপাতের প্রচণ্ড কাঠিন্য সংহত আন্দোলনের পক্ষে প্রচণ্ড বাধা। শিক্ষা, সরকারী চাকরি ও অনেক ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলে ভূমিস্বত্বে নেয়ারদের আধিপত্য ছিল অবিসংবাদী। তাদের ও এজুভা, পুলায়া, পরায়া প্রভৃতি নিম্নবর্ণের মধ্যে পার্থক্য দুস্তর। তবু ১৯৩০-এর ১১ নভেম্বর কালিকটে সমুদ্রতীরে পি· কৃষ্ণ পিলাই জাতীয় পতাকার সম্মানরক্ষার্থে যে নির্যাতন সহ্য করেছিলেন তা প্রেরণা দেয়। আপন স্মৃতিকথায় সি· পি· আই (এম) নেতা নাম্বুদ্রিপাদ বলছেন, প্রথম লবণ আইন অমান্য ও পরে কাপড় ও মাদক পিকেটিং হয়। তাঁকে দোকানদার ও ক্রেতাদের যে উপহাস সইতে হয়েছিল তা হল "my first baptism in political confrontation in which we came face to face with our opponents."[৩৬৮]

গুজরাট ও ইউ· পি·-তে সত্যিকার তৃণমূল আন্দোলন হয় কৃষকদের মধ্যে। গুজরাটের কংগ্রেস সংগঠনের শক্ত ভিত্তি ছিল পটিদার সম্প্রদায়। ১৯৩০-এর মধ্যে প্রায় প্রতি গ্রামে কংগ্রেস আশ্রম স্থাপিত হয়। আর বারদোলির সাফল্যের পর গান্ধীর নিজের প্রদেশ তাঁকে অনুসরণ করবে এতে আশ্চর্য কি। ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সদস্য হেগ বোম্বাই ঘুরে এসে মন্তব্য করেছিলেন গুজরাটীরা মনে করছে দৃঢ়ভাবে সংকল্প বজায় রাখতে পারলে সরকার আত্মসমর্পণ করবে। ১৯২৯-৩০-এর জুলাই-সেপ্টেম্বরে অনাবৃষ্টি হল ও ফসল মার খেল। ১৯৩০-৩১-এ ফসল ভাল হল বটে কিন্তু ততদিনে মান্দ্যের প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। ১৯৩০-এর মে-তে দাম কমতে আরম্ভ করে, ১৯৩১-এ শীতকালে তলদেশ স্পর্শ করে। উচ্চাশী মালিকদের হতাশা সহজেই অনুমেয়। এখানে সরকারী চাকুরেদের ওপর সামাজিক বয়কট অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়। পঞ্চায়েতের নির্দেশে বরসাদ-এর পটিদার প্যাটেল,তালাত ও ছোট কেরানীরা চাকুরি ছাড়ে। ১৯৩০-এর শেষে এক হিসাবে দেখা যাচ্ছে আমেদাবাদ ও ব্রোচ জেলায় অনেকে পদত্যাগ প্রত্যাহার করলেও খেড়া ও সুরাটে তাদের সংখ্যা ছিল উল্লেখযোগ্য। ১০ মে ১৯৩০ বারদোলি আশ্রমের এক মিটিং-এ স্থির হয় তারা রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করবে। শীঘ্রই সারা গুজরাটে তা ছড়িয়ে পড়ে। এক একর পিছু ৩৷৷ টাকার জায়গায় ৫ টাকা খাজনা, তাও আদায়ের সময় এগিয়ে সরকার ফসল ক্রোক করার চেষ্টা করলে বরসাদের ও খেড়ার বহু গ্রামবাসী নিকটবর্তী বরোদায় আশ্রয় গ্রহণ করে। সুরাট অঞ্চলে খুব কম লোকই পড়েছিল।[৩৬৯] অন্যত্র জনগণ মুনিসিপ্যালিটি ও লোক্যাল বোর্ড আন্দোলনকে সমর্থন জানায়! ছোটলাট সাইকস জানান, থামাতে গেলে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হবে "inevitably involving military action and very far reaching political consequences[৩৭০] বোম্বাইতে গুজরাটী বণিকরা মান্দ্যের জন্য খুব

দুর্দশাগ্রস্ত হয়। অনেকে দেউলে হয়েছিল। ফলে প্রায় ৫০,০০০ কেরানীর চাকুরি যায়। ১৯৩০-৩১-এ বোম্বাই বন্দরে আমদানীর মূল্য ৩১% ও রপ্তানীর মূল্য ২৪% কমে যায়। বারংবার হরতালের ফলেও দীর্ঘ দিন কাপড়ের বাজার বন্ধ থাকায় দুর্দশা বেড়েছিল।

॥ ১৩ ॥

উনিশ শো কুড়ি-একুশ সালে উত্তরপ্রদেশে যে কিষাণ আন্দোলনে কংগ্রেস, বিশেষত জওহরলাল, জড়িয়ে পড়েছিলেন, তা শেষ পর্যন্ত রামচন্দ্রের গ্রেফতার ও পুলিশী দমননীতির আঘাতে স্তিমিত হয়ে আসে। এক দশকের মধ্যেই কংগ্রেস নেতারা বোঝেন যেইউ.পি-তে আইন অমান্য কৃষক সমর্থনের ওপর নির্ভরশীল। ১৯৩০-এর আন্দোলন তাঁরা শুরু করেন অর্থনৈতিক অবস্থার সাহায্য নিয়ে। কিন্তু জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডের মতে, তাঁরাই শেষ পর্যন্ত তা বাড়তে দেননি এবং এর জন্য ইউ.পি-তে আইন অমান্য আন্দোলন বিফল হয়।[৩৭২]

জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডের দৃষ্টি পড়েছে দুটি জেলার ওপর—আগ্রা ও রায় বেরিলি। আগ্রার অধিকাংশ জমি ছিল ছোট জমিদার ও ধনী চাষীর দখলে। অধিকাংশ কৃষকের দখলিদার স্বত্ব ছিল, কিন্তু খাজনা উচ্চহারে স্থির হওয়ায় কৃষিঋণের পরিমাণ ছিল উল্লেখযোগ্য, তবে জেলার বিভিন্ন এলাকায় তার চাপ বিভিন্ন। রায় বেরিলিতে তালুকদাররা ৬৬% জমির মালিক এবং তারা ছিল "notoriously bad harsh lanlords." এই এলাকায় চাষীদের রক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না, ভূমিহীন চাষীর সংখ্যাও বেশি। প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্কিং এনকোয়ারি কমিটি (১৯২৯-৩০)-র রিপোর্টে দেখি গড় গ্রামবাসী কোনওক্রমে দিন গুজরান করছে এবং দুর্বৎসরের জন্য কোনো সঞ্চয় নেই। রায় বেরিলির দুর্দশার আরও কারণ ছিল—যেমন জনবসতির ঘনত্ব, শহর ও শিল্পের অভাব, ফসলের হ্রাস-বৃদ্ধি। তার ওপর ১৯২৬-২৯-এর বন্দোবস্তের সময় খাজনা চাপ বেড়েছিল ১২% (আগ্রায় ৫½%)।

এর পর এল বিশ্বমান্দ্যের আঘাত। ১৯৩২ সালে ইউ.পি-র অর্থসচিব ব্লাণ্ট তার মর্মন্তুদ বর্ণনা দিয়েছেন।

এক বছরে দাম কমে গিয়েছিল ৫০%। যে সব ধনী চাষী তুলোর চাষ করত তারাও গম ও অন্যান্য খাদ্যশস্য উৎপাদকদের মতই মার খেল। মীরাট থেকে এলাহাবাদের মত দোয়াব জেলা আর অযোধ্যার দক্ষিণ-পূর্বের অনুর্বর জেলা, ছোট জমিদার ও ধনী চাষী, যারাই কিছু বেচে উঁচু হারের খাজনা, রাজস্ব বা সুদ দিত—কেউ বাদ গেল না।

রায় বেরিলির আন্দোলন ১৯৩০-এর শেষ থেকে ১৯৩১-এর শেষপর্যন্ত চলে, আগ্রার আন্দোলন ১৯৩০-৩১-এর শীত কালে। ১৯৩০-এর অক্টোবরে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি আগ্রায় খাজনা বন্ধর অনুমতি দেয়। দুটি গ্রাম—বারাউদা ও ভিলাওতি—দিয়ে শুরু হয়। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় পুলিশের অভিযান। গ্রামবাসীরা সদলে গ্রাম ছেড়ে চলে যায় ভানওয়ার সিং জাঠের নেতৃত্বে—খোলা মাঠে তারা দিনের পর দিন কাটিয়েছিল। বলা বাহুল্য, এই আন্দোলন হয়েছিল বারদোলির আদর্শে। বুদ্ধিমানের মত হেইলি নেতাদের (রায় বেরিলির নেতা ছিলেন কিদোয়াই) গ্রেফতার করেননি, বরং জমিদারদের খাজনা ছাড় দিতে অনুরোধ করেন। গান্ধী-আরুইন চুক্তি এই আন্দোলনে সাময়িক ছেদ টানে। জওহরলালের ধারণা ছিল গান্ধী আইন অমান্য সাময়িকভাবে বন্ধ করলেও অর্থনৈতিক কারণে স্থানীয় আন্দোলন বন্ধ করতে বলেননি। ১৯৩১-এর মার্চে মূল্য হ্রাস বজায় থাকায় এবং রবি ফসল নষ্ট

হওয়ায় গান্ধী বলেন, আন্দোলনেব প্রকৃতি বদলে গেছে। আর খাজনা বন্ধ নয়—এবার সরকারের সঙ্গে খাজনা হ্রাসের লড়াই।[৩৭৪] দখলদার প্রজাদের বলা হল, খাজনার ৫০% এবং স্ট্যাটুটারী প্রজাদের বলা হল, ৪০% করে খাজনা দিতে। স্বরাষ্ট্র সদস্য ক্রেরার হেইলিকে জানাচ্ছেন গান্ধী চান না কংগ্রেস সরকার ও প্রজাদের মধ্যে মধ্যস্থতার ভার নিক। জ্ঞান পাণ্ডে বলছেন ১৯২১-২২-এর মত এবারও কংগ্রেস কৃষকদের ডোবাল। হেইলি টাকায় দু আনার বেশি খাজনা মকুব করেননি।

আরুইনের সঙ্গে চুক্তির ব্যাপারে গান্ধী কতটা প্রভাবিত হন বণিক ও শিল্পপতির আবেদনে? আমরা আগেই দেখেছি চাপটা শুধু গান্ধীর ওপর পড়েনি, আরুইনের ওপরও পড়েছিল। আরুইনের ওপর সাপ্রু ও জয়াকবেব চাপও অবহেলার নয়। সাপ্রু ও জয়াকরকে মধ্যস্থতা করতে অনুরোধ জানান বোম্বাই-এর বণিককুল। তাঁরা বলেন, মান্দ্যের পরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলন বন্ধ হওয়া দরকার, কিন্তু ভারতীয় অর্থনৈতিক কর্তৃত্বের দাবি ব্রিটেনকে মেনে নিতে হবে। এঁদের মধ্যে ছিলেন বোম্বাই স্টক এক্সচেঞ্জের সভাপতি কে· শ্রফ, বুলিয়ান এক্সচেঞ্জের পরিচালক ভি· ঠাকুরদাস প্রভৃতি।[৩৭৫] আনসারি বলেন, গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেই যেন মতিলালেব সঙ্গে দেখা করা হয়। জুনের শেষে মতিলাল বোম্বাই গেলে ঠাকুরদাস জানান, বণিকের অবস্থা শোচনীয় হয়েছে। কিন্তু দাবি ছাড়তে রাজি হলেও তিনি চান দায়িত্ববান সরকার দিতেই হবে, আর ছাড়ের ব্যাপারে গোলটেবিল বৈঠকে আলোচনা হবে, দমননীতি প্রত্যাহার করতে হবে, বাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে।[৩৭৬] ৩০ জুন মতিলাল বন্দী হলেন এবং জয়াকর হতোদ্যম। নৈনি জেলে মতিলাল ও জওহরলাল একই কক্ষে থাকতেন এবং কে না জানে ছেলে বাবাকে বোঝাপড়া করতে দেবেন না? জিন্নার উক্তি স্মরণীয়, "Motilal is pulp in Jawaharlal's hands."

যাই হোক, ২৩/২৪ জুলাই সাপ্রু ও জয়াকর যারবেদা জেলে গান্ধীর সঙ্গে দেখা করলেন। গান্ধী বললেন, জওহরের কথাই হবে শেষ কথা। নেহরুদের তিনি যে চিঠি লেখেন তাতে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেবার পূর্ব শর্ত—(১) অন্তর্বর্তীকালে পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণ, (২) বৈঠকে ব্রিটেনের রক্ষাকবচ নিয়ে খোলা আলোচনা, (৩) আইন অমান্য বন্ধ হলেও বিলেতী কাপড় ও মদের দোকানে পিকেটিং চালু থাকবে, (৪) লবণ উৎপাদন চলবে, (৫) সব অহিংস বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে, (৬) বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ও জরিমানা ফেরত দিতে হবে, পদত্যাগী কর্মীদের পুনর্বহাল করতে হবে ও (৭) সব অধ্যাদেশ প্রত্যাহার করতে হবে। এইসব দাবি সম্বন্ধে ঐকমত্য না হলে তিনি বৈঠকে যাবেন না। শেষে তিনি লেখেন—লাহোর প্রস্তাব তিনি এখনও মানতে রাজি। জওহরলালের কথাই শেষ কথা।[৩৭৭]

জওহর মাঝপথে আন্দোলন থামাতে চাননি। নেহরুদের মতে, গোলটেবিল বৈঠক বসবার আগেই মুখ্য বিষয়গুলি নিয়ে ঐকমত্য দরকার। তাঁরা গান্ধী ও ওয়ার্কিং কমিটির অন্য সদস্যদের সঙ্গে আলোচনাও চান। গান্ধীকে জওহর লেখেন, "আমার দিক থেকে বলতে চাই, আমি লড়াই ভালবাসি।" রোজনামচায় তিনি গান্ধীব নমনীয়তায় হতাশা প্রকাশ করেছেন।[৩৭৮]

গান্ধী চিরকালই সকলকে (লিবারেলদের তো বটেই) নিয়ে চলতে চেয়েছিলেন। আন্দোলনের উদ্দেশ্য তো বিজয় নয়, ব্রিটিশরাজ সম্বন্ধে দেশের গভীর বিরাগ প্রদর্শন এবং ব্রিটিশ জনগণের বিবেক জাগরণ। ১লা আগস্ট তিনি জয়াকরকে বললেন, বিলেত গেলে তিনি সাম্রাজ্য থেকে বেরিয়ে আসার অধিকার দাবি করবেন আর ব্রিটেনের দাবি থাকলে তা

বিচার করবে স্বাধীন কোন ট্রাইবুন্যাল।[৩৭৯] স্পেশ্যাল ট্রেনে নেহরুদের যারবেদা জেলে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে ১৩ থেকে ১৫ আগস্ট গান্ধী, নেহরুদ্বয়, বল্লভভাই, সৈয়দ মাহমুদ, দৌলতরাম ও সরোজিনী নাইডু আলোচনায় বসলেন। সেই সময় জয়াকর বোম্বাই বণিকদের চিঠি পড়ে শোনান, মতিলাল শোনান তাঁর কাছে ঠাকুরদাসের আবেদন। নেতারা (খানিকটা গান্ধীর মতের বিরুদ্ধেই) স্থির করলেন, সন্ধির সময় হয়নি। গান্ধীর আগেকার শর্তের সঙ্গে তাঁরা যোগ করলেন—অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা দফতরের ওপর ভারতের জাতীয় সরকারের কর্তৃত্ব।

আরুইন খবর পাচ্ছিলেন আন্দোলনের গতি মন্দীভূত হচ্ছে তাই তিনি কড়া মনোভাব নিলেন। তখন নেহরু আরো কড়া প্রতিক্রিয়া দেখালেন। ৫ সেপ্টেম্বর মধ্যস্থরা আরুইনকে জানালেন আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে। বড়লাট কিন্তু ঠিকই ধরেছিলেন। সদ্যমুক্ত অসুস্থ মতিলাল যখন ওয়ার্কিং কমিটির স্বাধীন সদস্যদের সাপ্রু-জয়াকর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে বললেন, তখন আপত্তি তুললেন কার্যকরী সভাপতি খলিকুজ্জমান, নরীম্যান ও যতীন সেনগুপ্ত। আট দিনের জন্য মুক্ত অবস্থায় কাটিয়ে জওহরলাল তখন বুঝেছিলেন স্থানীয় অভাব-অভিযোগ নিয়ে জোরদার নেতৃত্ব না দিলে কিষাণ আন্দোলন চলবে না। প্রথম শ্রেণীর নেতারা কারারুদ্ধ হওয়ায় সাধারণ স্বেচ্ছাসেবীরা অসহায় বোধ করছিল। মুসলমানদের নিষ্ক্রিয়তা আরো দুর্বিসহ হয়ে উঠছিল। মহারাষ্ট্রের গ্রামাঞ্চলে আম্বেদকরের মহররা দূরে সরেছিল। প্রথম গোলটেবিল বৈঠক নরমপন্থীদের দুর্নিবারভাবে আকর্ষণ করছিল আবার হিংসার দিকে যাচ্ছিল কোলি ও গোণ্ড আদিবাসীরা, মাদুরার তাঁতিরা, সর্বোপরি বাংলার বিপ্লবীরা।

১৯১৯-২৯-এর মধ্যে বাংলায় মোট ৪৭টি সন্ত্রাসবাদী ঘটনা ঘটে, আর শুধু ১৯৩০-এই ঘটেছিল ৫৬টি। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, জালালাবাদের যুদ্ধ, লোম্যান হত্যা ও বিনয়-বাদল-দীনেশের রাইটার্স অভিযান।

চার্লস টেগার্টের পত্নীর সংকলিত টেগার্ট স্মৃতিকথায় পড়ি চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানের ছ জন নেতার কথা—সূর্য সেন, নির্মল সেন, অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল ও অম্বিকা চক্রবর্তী। টেগার্ট বলছেন,[৩৮১] এঁরা 'নিউ ভায়োলেন্স পার্টি'র সভ্য ছিলেন এবং 'হিন্দুস্তান রিপাবলিকান পার্টি'র সঙ্গে অভিন্ন। ১৯২৪ থেকে ১৯২৬ এঁবা বন্দী ছিলেন কিন্তু পুলিশের নিষেধ না শুনে সরকার এঁদের মুক্তি দেয়। বরিশাল ও চট্টগ্রামে অভ্যুত্থানেব সিদ্ধান্ত হয় কিন্তু কলকাতার প্রধান কার্যালয়ে অভিযান চালিয়ে প্রথমটাকে বন্ধ করা গেলেও দ্বিতীয়টা করা যায়নি। ষড়যন্ত্রীরা পুলিশ অভিযানের সম্ভাবনা জানতে পেবে ঠিক সময়ের সাত ঘণ্টা আগেই অভ্যুত্থান ঘটাতে সক্ষম হন। ১৯৩০-এর ১৮ এপ্রিল একই সঙ্গে পুলিশ আর্মারি ও ম্যাগাজিন, অক্সিলিয়ারী ফোর্স, হেড কোয়ার্টারের আর্মারি ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জ আক্রমণ কবা হয় এবং ট্রেন উড়িয়ে চট্টগ্রামের সঙ্গে বাংলার রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। তারপর নেতারা দলবলসহ শহরের উপকণ্ঠে পাহাড়ে আশ্রয় নেন এবং তাঁদের এক শাখাদল অস্ত্রশস্ত্রসহ কলকাতা আসেন। ২২ এপ্রিল জালালাবাদের অসম সাহসিক সংগ্রামের কথা আজ কাহিনীতে পরিণত হয়েছে। বহু সংগ্রামীর স্মৃতিকথা পরস্পর বিরুদ্ধ হলেও সংগ্রামের সত্যতা ছিল সূর্যের মত ভাস্বর।[৩৮১ক]

ঐ বছর শ্রীসঙ্ঘের বিনয় বোস পুলিশের আই জি লোম্যানকে হত্যা ও এস পি হাডসনকে জখম করেন। লেঃ কর্নেল সিমসনকে হত্যা করে ও অন্য দু'জন ইংরেজ কর্মচারীকে জখম করে, বিনয়-বাদল-দীনেশের আত্মদানের বিবরণ অনেক উপাদানে বিধৃত

হয়ে আছে।[৩৮২] এর পেছনে ঢাকার হেমচন্দ্র ঘোষের বি· ভি· (বেঙ্গল ভলানটিয়ার্স) গ্রুপ কাজ করেছিল।[৩৮৩] সূর্য সেনের দলে ছিলেন প্রীতিলতা ওহ্‌দেদার, কল্পনা দত্ত ও সুহাসিনী গাঙ্গুলী—অর্থাৎ শিক্ষিতা মহিলারা বেশ ভালভাবেই বিপ্লবী কাজে জড়িয়ে পড়েছিলেন।

সুমিত সরকার এক প্রবন্ধে বণিক ও শিল্পপতিদের চাপের ওপর জোর দিয়ে গান্ধী-আরুইন চুক্তি ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন।[৩৮৪] প্রমাণ কিছু আমরা আগেই দিয়েছি—যেমন জয়াকরের সঙ্গে বোম্বাই-এর বণিকদের আলাপ, মতিলালের কাছে ঠাকুরদাস প্রভৃতির আবেদন। কিন্তু যারবেদায় গান্ধীকে এসব জানানো হলেও তিনি খুব বিচলিত হননি। সুমিত লক্ষ্য করেননি যে, আরুইনের সঙ্গে ঠাকুরদাসের ও বিড়লার যথেষ্ট যোগাযোগ ছিল এবং আরুইন তাঁদের মাধ্যমে কংগ্রেসের অন্যান্য নেতাদের বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন। বেনকে তিনি লিখছেন, "The main factor, if any, likely to influence Congress decisions will be the attitude of the commercial community such as Purushottomdas and Birla."[৩৮৫] ১৭ জানুয়ারি আরুইন পারস্পরিক আস্থার ভিত্তিতে গান্ধীর সহযোগিতা চাইলেন। ১৯শে ম্যাকডোনাল্ড পরিষ্কার ভাষায় প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন, ফেডারেল অ্যাসেম্বলি, কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব স্বীকার করে নিলেন। ২৬ জানুয়ারি ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যদের মুক্তি দেওয়া হল। ঠিক পরের দিনই গান্ধীর সঙ্গে দেখা করলেন বোম্বাই-এর বণিকরা। গান্ধী এলাহাবাদ গেলেন, সেখানে বিড়লার চাপ পড়ল।[৩৮৬] এর মধ্যে আরুইন, উদারতন্ত্রী, বণিককুল সবাইকার হাত আছে। তবু এটাই সব কথা নয়। গান্ধীর দিক থেকে বাংলার ব্যাপক সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপে দুশ্চিন্তার কারণ দেখা দিয়েছিল।[৩৮৬ক] উদারপন্থীদের তিনি কোনওদিন অবহেলা করেননি। প্রথম গোলটেবিল বৈঠক থেকে সদ্যপ্রত্যাগত সাপ্রু, জয়াকর ও শ্রীনিবাস শাস্ত্রী তাঁকে বোঝালেন আলোচনায় সুফলের সম্ভাবনা রয়েছে। জাতীয়তাবাদী মুসলিমরা অন্যান্য সাম্প্রদায়িক মুসলিমদের নিষ্ক্রিয়তায় বিব্রত বোধ করছিল। তারাও চাইল মিটমাট। অন্যদিকে হিন্দু মহাসভা-ঘেঁষা মালব্য। একমাত্র জওহরলাল তীব্র আপত্তি জানাতে লাগলেন পিতার কাছে। কিন্তু মতিলালের মৃত্যু (৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩১) উগ্রপন্থী উপদলকে দুর্বল করেছিল। জওহরলাল দিশেহারা হয়ে পিতৃপ্রতিম গান্ধীর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়লেন। গান্ধী বিপক্ষকে শেষপর্যন্ত বিশ্বাস করতে চাইতেন। আরুইনের সম্বন্ধে তাঁর একটা দুর্বলতাও ছিল। তাই শুধু বুর্জোয়া চাপে নয়, নানা দিক বিবেচনা করে, তিনি বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎকার চাইলেন।[৩৮৭]

১৭ থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি ও ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ১লা মার্চ দুই পর্বে তাঁদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা চলল। শ্রীনিবাস শাস্ত্রী একবার আরুইনকে বলেছিলেন, "গান্ধী ঠিক নারীদের মত, তোমাকেই তাকে জয় করতে হবে···তাই দেখা করার আগে শুদ্ধ হয়ে, প্রার্থনা করে, সব চেয়ে গাঢ় রং-এর আধ্যাত্মিক পোশাক পর।" মনে হয় আরুইন সে উপদেশ শুনেছিলেন। তবু গান্ধী সহজে ধরা দেননি। তিনি পিকেটিং, লবণ-আইন ও পুলিশী নির্যাতনের কথা তুললেন। এমার্সন পুলিশী ব্যাপারে অনুসন্ধানের দাবি বাতিল করে দিলেন। ২৮-এ ফেব্রুয়ারি জওহরলাল বিজয়লক্ষ্মীকে লিখছেন, "সৌভাগ্যের ব্যাপার, কথাবার্তা শেষ হয়ে এসেছে, আবার জেলের জন্য তৈরি হতে হবে।" ৫ মার্চ বিধান রায়কে তিনি লেখেন, "দর কষাকষি দেখে শ্রান্ত ও অসুস্থ বোধ করছি।" কথাবার্তা ভেঙে যেতে বসল। আরুইনের বিশেষ আবেদনে একটা মিটমাট হয়। ৪ মার্চ ওয়ার্কিং কমিটিতে চুক্তির বিষয় উত্থাপিত হলে বল্লভভাই দাবি করলেন, গুজরাটের বাজেয়াপ্ত ও নীলামে বিক্রীত জমি

ফিরিয়ে দিতে হবে। অবাধ লবণ তৈরি, বন্দী মুক্তি ও পুলিশী জুলুম সম্বন্ধে অনুসন্ধান ছিল নেহরুর পূর্বশর্ত। আরুইন রাজি না হওয়ায়, সাপ্রুর পরামর্শে, চুক্তির সঙ্গে একটা মন্তব্য যোগ করা হল যে, সরকার অস্বীকার করলেও, গান্ধীর মতে নীলাম বিক্রয় বে-আইনী। গান্ধী বললেন, ওয়ার্কিং কমিটি সংশোধিত চুক্তি মানতে আপত্তি করলে তিনি রাজনীতি থেকে বিদায় নেবেন। জওহরলালের ডায়েরিতে পড়ি দিল্লিতে তিনি রাগের মাথায় বলে ফেলেন, "পিতা বেঁচে থাকলে এমনটি হত না", আর গান্ধী মর্মাহিত হন।[৩৮৯]

৫ মার্চ গান্ধী-আরুইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। তার শর্তাবলী মোটামুটি এরূপ :

১। কংগ্রেস আইন অমান্য স্থগিত রাখবে ও সরকার সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে ১৯৩১-এর ১ নং অধ্যাদেশ ছাড়া সব অধ্যাদেশ প্রত্যাহার করবে।

২। আইন অম্যান্যকারীদেব মুক্তি দেওয়া হবে, পিটুনি পুলিশ তুলে নেওয়া হবে।

৩। অবিক্রীত বাজেয়াপ্ত জমি ফেরত দেওয়া হবে ও যেসব গ্রামীণ কর্মচারী পদত্যাগ করেছিল তাদের পুনর্নিয়োগ সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা হবে।

৪। পুলিশী নির্যাতন নিয়ে অনুসন্ধান হবে না।

৫। বিলাতী পণ্যের বয়কট রাজনৈতিক অস্ত্ররূপে প্রয়োগ করা হবে না, আইন না ভেঙে শান্তিপূর্ণ পিকেটিং চলবে।

৬। খাবার জন্য লবণ তৈরি করা যেতে পারে।

৭। কংগ্রেস গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেবে কিন্তু তাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো, প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক সম্পর্ক প্রভৃতি ব্যাপারে ব্রিটিশ রক্ষাকবচ, সংখ্যালঘুদের স্বার্থ, আর্থিক বাজারে ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা ও স্বীকৃত দায়িত্ব মেনে নিতে হবে।[৩৮৯ক]

বলা বাহুল্য, শেষেব শর্তগুলি ব্রিটিশ মূলধনেব স্বার্থে। অর্থবিষয়ক সদস্য সুস্টার এ বিষয়ে আগেই আরুইনকে অবহিত কবেছিলেন। গান্ধীর ১ মার্চের মন্তব্যে পড়ি ঋণের ব্যাপারে বা সাম্রাজ্য ত্যাগের অধিকার ব্যাপারে প্রকাশ্য ঘোষণা কবতে তিনি চাননি। সাম্রাজ্যের মধ্যে ভারত ও ব্রিটেনের পূর্ণ সাম্য প্রতিষ্ঠিত হলে সাম্রাজ্যে থাকতে ও ভারতের স্বার্থবিরোধী না হলে রক্ষাকবচ মানতে তিনি রাজি হন। আরুইনের মতে তিনি চাইছিলেন—"independence with partnership"[৩৯০] গান্ধীর মতে স্বাধীনতার অর্থ সবসময় সম্পর্ক ছেদ নয়, দেখতে হবে সে সম্পর্কের ফলে উভয়পক্ষ লাভবান হবে কিনা। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ১৯২৯ ও ১৯৩১-এর অবস্থা এক নয়। ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস দেওয়া হবেই, শুধু তাকে পূর্ণ স্বাধীনতায় পরিণত করতে হবে। সংগ্রামে বলীয়ান কংগ্রেস গোলটেবিলে যাচ্ছে তাই করতে, ভিক্ষুকের মত ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস চাইতে নয়।[৩৯১]

জওহরলাল কিন্তু মনে করেছিলেন এই চুক্তিদ্বারা লাহোব প্রস্তাব থেকে পশ্চাদপসরণ করা হল। আত্মজীবনীতে এলিয়ট উদ্ধৃত করে তিনি লিখেছিলেন —

This is how the world ends
Not with a bang but a whimper.

কিছুদিন অন্তর্দ্বন্দ্বে দীর্ণ হয়ে শেষে তিনি গান্ধীর ব্যাখ্যা মেনে নিলেন।[৩৯২] সুভাষ বসু অবশ্য মানেননি। তাঁর ধারণা মতিলাল জীবিত থাকলে গান্ধী এমন আপোস করতে পারতেন না।[৩৯৩]

তবু সন্দেহ নেই, এই চুক্তি গান্ধীর রাজনৈতিক মর্যাদা বাড়াল। ২৬ জানুয়ারি পার্লামেন্টে বিতর্কের সময় রাগে, ক্ষোভে ফেটে পড়লেন চার্চিল, গান্ধী সম্বন্ধে বললেন, "Now

posing as a fakir of a type, well-known to the east, striding half-naked up the steps of the viceregal lodge...to parleyon equal terms with the representative of the King Emperor." মহাশক্তিধর রাজকে স্বীকার করতে হল কংগ্রেসেব সঙ্গে আলোচনা না করে ভারতের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিরূপণ করা যাবে না, স্বীকার করতে হল পিকেটিং প্রভৃতি বে-আইনী কাজ, লুকোতে হল দমননীতির পাশবিকতা। গান্ধীর পরম শত্রু উইলিংডন লিখলেন, এরপব জনগণের মনে হবে-"There seemed to be two kings of Brentford in India."[৩৯৪]

অন্য দিকে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ না দিলে কংগ্রেস জাতীয় ভূমিকা পালন কবত না এবং তা ১৯৩৯-এব মন্ত্রিত্ব ত্যাগ ও ভারত ছাড়ো আন্দোলনেব মত ভ্রান্ত পদক্ষেপ হত। অহিংস সংগ্রামেব ফলে দেশে-বিদেশে, বিশেষত মার্কিনমুলুকে, তাব সম্মান বেড়েছিল। ব্রিটেন সেটা অবহেলা কবতে পারেনি। কিন্তু বৈঠক প্রত্যাখ্যান করলে ভারত বৈদেশিক সহানুভূতি হাবাত ও মধ্যপন্থী বক্ষণশীলরা গোঁড়া চার্চিলকে আরও মদৎ দিত।

গান্ধী কি যে-কোন মূল্যে বোঝাপড়া চেয়েছিলেন? গুজরাট ও উত্তরপ্রদেশে কিষাণদেব প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার অপবাদ উঠেছে। গুজবাটের ব্যাপাবে হার্ডিম্যান স্পষ্টই বলেছেন, "The pact, rather than the police lathis, broke the Patidar morale." এতে সবকারী বাজেযাপ্ত জমি ফিরিয়ে দেবাব কথা ছিল না।[৩৯৫] উত্তরপ্রদেশে আমলারা গান্ধীকে বোঝায কংগ্রেসীরা জমিদারদেব বিরুদ্ধে কিষাণদের খেপাচ্ছে। মে মাসে সিমলায গান্ধী ও স্ববাষ্ট্র সচিব এমার্সনের মধ্যে যে সাক্ষাৎকার হয় তাতে এমার্সন বলেন সবকাব ও কিষাণদেব মধ্যে মধ্যস্থতা করার কোন অধিকার কংগ্রেসের নেই। কিন্তু গান্ধী বলেন কংগ্রেস গবীবের বন্ধু এবং চাষীদেব পরামর্শ নিশ্চয়ই দিতে পারে। নৈনিতাল সাক্ষাৎকারে হেইলি তাঁব সামনে এক বিপ্লবী কিষাণ আন্দোলনের জুজু তুলে ধরেন—তারা খাজনা দিচ্ছে না, হিংসাত্মক কাজে লিপ্ত হচ্ছে। গান্ধী বলেন, তাহলে খাজনার দাবি ন্যায্য কিনা অনুসন্ধান করা হোক। হেইলি তাতে রাজি হননি।[৩৯৬] ২৩ মের ইস্তাহারে গান্ধী দখলদারী কিষাণদেব টাকায় বাব আনা হাবে ও অন্যান্যদের টাকায় আট আনা হারে খাজনা দিযে দিতে বলেছিলেন। হেইলি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচেন। জওহরলাল অবশ্য তালুকদারদেব অন্যায় শোষণ ও শাসন সহ্য করতে রাজি হননি, শেষে তিনি ও গান্ধী সিমলা গিয়ে খাজনা নিয়ে একটা সাময়িক বোঝাপড়ার ব্যবস্থা কবেন। তা সত্ত্বেও খাজনা আদায়, বেদখলি চলতে থাকে। গান্ধী বিলেত যাওয়া বন্ধ করবেন কি না প্রশ্ন তুললে দেশের স্বার্থে জওহরলাল ইউ·পি· ব্যাপারটা নিয়ে জেদ ধরেননি।

যাই হোক, গুজরাটের অভিযোগের উত্তরে গান্ধী বলতে পারতেন বড় পটিদাররা খাজনা দিচ্ছিল ও মুসলমানরা নীলামে কিনছিল। উত্তরপ্রদেশের আন্দোলনের ভার নেহরু নিয়েছিলেন। পুলিশের যে চণ্ডনীতির কথা মাদলিন শ্লেডের রিপোর্টে বর্ণিত হয়েছে (এবং হেইলি-তালুকদারের যে মধুর সম্পর্কের কথা আমরা জানি তাতে তা আরও বেড়ে যেত) সেই পরিপ্রেক্ষিতে নেহরুকে গ্রেফতারের পর কতদিন আন্দোলন চলত? ভগৎ সিং-এর ফাঁসি মুকুব করতে পারেননি বলে নওজওয়ান সভা গান্ধীকে কালোপতাকা দেখায়।[৩৯৭] কিন্তু গান্ধী আরুইনকে বহুবার সে অনুরোধ করেও সফল হননি। অহিংসাবাদী বলে এটা তিনি নাও করতে পারতেন। মানুষ বলে করেছিলেন, সে কথা মনে রাখতে হবে। সারা জীবন কত সন্ত্রাসবাদীর প্রাণরক্ষা ও বন্দিত্বমোচন করেছেন সে কথা অনেক সময় ভুলে যাই

আমবা। বাংলায় আন্দোলন দীর্ঘায়িত হলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা জোবদাব হত। ঢাকা ও কিশোরগঞ্জ দাঙ্গা তার সম্যক প্রমাণ।[৩৯৮]

১৯৩০-এর করাচী কংগ্রেস নানা দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। সভাপতি বল্লভভাই প্যাটেল ছিলেন গান্ধীর অন্যতম অনুগত শিষ্য, গুজরাটেব অবিসংবাদী নেতা, 'বারদোলিব সর্দাব'। বরসাদ, সুরাট প্রভৃতি অঞ্চলেব কৃষক বিক্ষোভের পবিপ্রেক্ষিতে তাঁর সাহায্য জরুবী ছিল! সুভাষ বিরোধী হলেও বুঝতে পারছিলেন কংগ্রেসেব অন্তর্দ্বন্দ্ব বা বিভাজন সবকাবেব হাত শক্ত কববে।[৩৯৮ক] জওহবলাল গান্ধীকে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ জানাতে প্রস্তুত ছিলেন না কোনদিন। ভগৎ সিং-এর ব্যাপাবে উত্তেজনা টের পেযে এবং কিছুটা প্রাণ বাঁচাতে ব্যর্থ হবাব লজ্জায় গান্ধী ফাঁসিব প্রতিবাদে প্রস্তাব আনতে অনুমতি দেন। ২৯ মার্চ নেহরু আনীত সে প্রস্তাব গৃহীত হয়। গোলটেবিল বৈঠকে আলোচনাব ব্যাপাবে গান্ধীকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওযা হল কিন্তু পূর্ণ স্ববাজের লক্ষ্য না ভুলে। আপত্তি থাকা সত্ত্বেও নেহরুকেই প্রকাশ্য সভায় চুক্তিব সমর্থনে প্রস্তাব তুলতে হল। বাংলাব যতীন্দ্রমোহন, খান আবদুল গফফর খান, সত্যমূর্তি সমর্থন করলেন। তরুণদেব পক্ষ থেকে ইউসুফ মেহের আলি বিড়লা ও ঠাকুবদাসকে তীব্র আক্রমণ কবলেন। জওহরলাল এব জন্য দাম আদায কবলেন। তাঁকে ভাবতীযদেব মৌলিক অধিকাব সংবলিত প্রস্তাব তুলতে দিতে হল। গোযেন্দা দফতবেব মতে এ প্রস্তাব মানবেন্দ্রনাথ বাযের তৈবি। (তিনি কবাচীতে উপস্থিত ছিলেন।) কিন্তু অধিকাবগুলি বিশ্লেষণ করলে তাব মধ্যে সমাজতান্ত্রিক, বিশেষত সাম্যবাদী, কোন চরিত্র দেখা যায না। মানবেন্দ্রনাথ নিজে একে 'confused compromising with foreign imperialism and native feudalism', 'an instrument of deception' ইত্যাদি আখ্যা দিয়েছেন।[৩৯৯]

মৌলিক অধিকাবেব তালিকায বিশেষ উল্লেখ পেল রাজস্ব ও খাজনা হ্রাস, শ্রমিক য়ুনিযান প্রতিষ্ঠার অধিকাব, উত্তরাধিকার কব, প্রতিরক্ষা ও প্রশাসনিক ব্যয় হ্রাস, সুদের সীমা ও মুদ্রাবিনিময হারেব ওপব নিযন্ত্রণ, মুখ্য শিল্প ও খনিজ সম্পদের ওপব জাতীয় অধিকার ইত্যাদি। গান্ধীব এগার দফা দাবিব মধ্যে এর অনেকগুলি স্বীকৃত হয়েছিল।

গোপাল বলছেন, এর মধ্যে কোন তীক্ষ্ণ ধাব ছিল না। কোথাও জমিদারি প্রথা বিলোপেব উল্লেখ নেই, এমনকি গ্রামাঞ্চলে ঋণ মুকুবের কথা। সত্যকাব অর্থনৈতিক মৌলিক অধিকাব কি খেযে পবে বেঁচে থাকাব মত মজুবি ও ট্রেড য়ুনিযান গঠনেব বা সালিশী বিচারের অধিকার? জওহরলাল অবশ্য একটু অন্যভাবে দেখেছিলেন. বাঁদিকে বাজনীতি মোড নিচ্ছে, এর ফলে কংগ্রেসের একটা ইডিওলজি গড়ে উঠছে, তা আর শুধু বিপুল এক ছাতার মত সব ধরনের মতবাদকে প্রশ্রয় দিচ্ছে না।

সুভাষ ও নেহরু মেনে নেওয়ায় তরুণদের আপত্তি অপসারিত হল। সাপ্রুর চিঠিতে পড়ি যে বড় জমিদার, মহাজন, সরকারী কর্মচারীরা খুশি হয়নি। তাবা দেওয়ালেব লিখন পড়তে পাবছিল—যদিও ঝাপসা ভাবে।

গান্ধী চেয়েছিলেন শুধু কংগ্রেসের নয় অধিকাংশ ভারতীয় প্রতিনিধিরূপে লণ্ডন যেতে। তাই তিনি অল ইণ্ডিয়া মুসলিম কনফাবেন্সেব প্রতিনিধিদের সঙ্গে ৪ এপ্রিল দেখা করেন। তাঁরা জিন্নার চৌদ্দদফা দাবি নিয়ে জেদ ধরলে আনসারি ও শেরওয়ানি পৃথক ভোটাধিকার বিষয়ে প্রবল আপত্তি জানালেন। গান্ধী চিরকালই পৃথক ভোটের বিরোধী, জাতীয়তাবাদী মুসলিমদের কথা ফেলতে পারেন না তো বটেই। হিন্দু মহাসভার ওয়ার্কিং কমিটি ২৩ মার্চ প্রস্তাব নিল যে কোন সাম্প্রদায়িক ভোটাধিকার থাকা উচিত নয় বা ধর্মের ভিত্তিতে আসন

সংরক্ষণ। অন্যদিকে ফজল-ই-হোসেন ও ফিরোজ খান নুন পৃথক ভোট ও ওয়েটেজের দাবিতে অবিচল। এ বিষয়ে সাফি ও নুনের সঙ্গে আরুইনের কথাবার্তা ও ফজল-ইর মন্তব্য মুসলিম দাবি সম্বন্ধে মূল্যবান দলিল।[৪০১] সাফি পঞ্জাবে সম্মিলিত হিন্দু-শিখ সদস্যের ওপর পরিষ্কার মুসলিম গরিষ্ঠতা চান আর হিন্দু মহাসভা-আহূত এক হিন্দু-শিখ সম্মেলন এ দাবি নাকচ করে দেয়। মুঞ্জে পঞ্জাব ও বাংলায় চিরন্তন মুসলিম গরিষ্ঠতা (অর্থাৎ মুসলিম শাসন) স্বীকার আত্মঘাতী মনে করতেন। এ সব ব্যাপারে 'হাবাগোবা' (booby) গান্ধীকে তিনি বিশ্বাস করতেন না। কংগ্রেস ও ওয়ার্কিং কমিটি সিদ্ধান্ত নেয়—সাম্প্রদায়িক সমস্যা মিটুক না মিটুক, গান্ধীকে লণ্ডন যেতে হবে। এ সময় (জুলাই, ১৯৩১) কংগ্রেস সংখ্যালঘু স্বার্থ রক্ষায়—(১) মৌলিক অধিকার, (২) বয়স্ক ভোটাধিকার, (৩) জনসংখ্যার চতুর্থাংশের কম সংখ্যালঘুর জন্য আসন সংরক্ষণ, (৪) সীমান্ত ও বালুচিস্তানকে প্রদেশের মর্যাদা দান ও (৫) অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদেশসমূহকে সমর্পণে রাজি ছিল, কিন্তু পৃথক ভোটাধিকারে নয়। বর্তমান লেখকের মনে হয়, কংগ্রেস অনুদার ছিল না। দুভার্গ্যের বিষয় শৌকৎ আলিও গান্ধীকে ভুল বোঝেন। ভূপাল নবাবের মধ্যস্থতার চেষ্টা বিফল হয়। সৈয়দ মাহমুদ নেহরুকে লেখেন (২৭ জুন ১৯৩১), মুসলমানরা পৃথক ভোটের দাবি ছাড়বে না।

কর্তৃপক্ষের উস্কানি ভুললে চলবে না। গান্ধী যখন আনসারিকে সঙ্গে নিতে চাইলেন, আরুইনের উত্তরাধিকারী উইলিংডন তা নাকচ করে দিলেন।[৪০২] সংখ্যালঘুর ব্যাপারে সরকারের দুশ্চিন্তা নিয়ে সুন্দর একটা মন্তব্য করেছিলেন ওয়েজউড বেন—

"There is a great temptation to fall into the error under the guise of our duty to minorities. It may be a true prompting of conscience or may arise almost subconsciously from the knowledge of the fact that their support is of political value."[৪০৩]

পেছনে তাঁর চিরশত্রু উইলিংডনকে রেখে গান্ধী রওনা হলেন দ্বিতীয় গোলটেবিল বেঠকে যোগ দিতে। নিঃসঙ্গ কিন্তু নির্ভীক।

টীকা

১। হোম পল (এ) , জুন ১৯০৮, প্রসিডিংস ১২৬-২৯

২। জেমস ক্যাম্বেল কের, পোলিটিক্যাল ট্রাবল ইন ইণ্ডিয়া ১৯০৭-১৯১৭ (মহাদেবপ্রসাদ সাহা সংকলিত , ১৯৭৩), পৃঃ ৬৩-৭৯

৩। মর্লেকে মিন্টো, ২৭ জুন ১৯০৭, Eur. Mss. D 573, ১১শ খণ্ড, পৃঃ ১৪

৪। ঐ, ৭ আগস্ট ১৯০৭, তদেব, পৃঃ ৫৭

৫। গোখ্‌লের সঙ্গে আলোচনার ওপর ডানলপ স্মিথের নোট, ২৯ অক্টোবর ১৯০৭, ঐ, ১২শ খণ্ড, পৃঃ ২৮-২৯ , ওয়েডারবার্নকে গোখ্‌লে, ১৮ অক্টোবর ১৯০৭, গোখ্‌লে পেপারস্‌, জাতীয় অভিলেখাগার, নিউ দিল্লি

৬। গোখ্‌লের সঙ্গে আলোচনার পর ডানলপ স্মিথের নোট, ১৫ জানুয়ারি ১৯০৮, Eur. Mss. D 573, ১৩শ খণ্ড, পৃঃ ২৪

৭। মর্লেকে মিন্টো, ১১ জুন ১৯০৮, তদেব, ১৫শ খণ্ড, পৃঃ ১৯-২০

৮। ঐ, ২৭ মে ১৯০৮ তদেব, ১৪শ খণ্ড, পৃঃ ৯৩

৯। রিপোর্ট অব ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল কংগ্রেস, ১৯০৮, ২ নং প্রস্তাব, পৃঃ ১৩৭; ডেকান সভায় গোখ্‌লের ভাষণ, ১১ জুলাই ১৯০৯

১০। মর্লেকে মিন্টো, ৬.জানুয়ারী ১৯১০, Eur. Mss. D 573, ২২ খণ্ড, পৃঃ ৭, তিনি সম্ভাব্য হিন্দু প্রতিক্রিয়ার কথা জানিয়েছিলেন—ঐ, ২১ সেপ্টেম্বর ১৯০৯, তদেব ২১ তম খণ্ড, পৃঃ ৩৯-৪০ , স্নেহ মহাজন, ইম্পিরিয়ালিস্ট স্ট্র্যাটেজি অ্যাণ্ড মডারেট পলিটিকস, ইণ্ডিয়ান লেজিসলেচার অ্যাট ওয়ার্ক ১৯০৯-১৯২০ (দিল্লি, ১৯৮২), অ্যাপেনডিকস ১, পৃঃ ২৮৭-৯১

১১। ওয়েডারবার্নকে গোখ্‌লে, ৩ ডিসেম্বর ১৯০৯, গোখ্‌লে পেপারস্‌, পৃঃ উঃ

১২। জওহরলাল নেহরুকে মতিলাল নেহরু, ২৫ মার্চ ১৯০৯, মতিলাল নেহরু করেসপণ্ডেন্স, এন এম এম এল (নিউদিল্লী)

১৩। (ভারতসচিব) ক্রুকে (বড়লাট) হার্ডিঞ্জ,১৫ ডিসেম্বর ১৯১০, ক্রু পেপারস্‌, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

১৪। শঙ্করীপ্রসাদ বসু (সং), লেটারস অব সিস্টার নিবেদিতা, ২য় খণ্ড

১৫। শান মুহম্মদ, স্যার সঈদ আহ্‌মেদ খান (মীরাট, ১৯৬৯) , ডেভিড লেলিভেল্ড, আলিগড়স্‌ ফার্স্ট জেনারেশন (প্রিন্সটন,১৯৭৭), , হাফিজ মালিক, মসলেম ন্যাশানালিজম্‌ ইন ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড পাকিস্তান (ওয়াশিংটন, ১৯৬৩)

১৬। আবুল কালাম আজাদ, ইণ্ডিয়া উইনস ফ্রিডম,মোহামেদ আলি, মাই লাইফ, আ ফ্র্যাগমেন্ট, (লাহোর, ১৯৬৬), আফজল ইকবাল, মোহামেদ আলি (দিল্লী, ১৯৭৮) গ্রন্থে আলিগড় কলেজের অধ্যক্ষ আর্চবোলডের সঙ্গে তার বাদানুবাদ তুলে দিয়েছেন, পৃঃ ৪৭-৪৮

১৭। মোহামেদ আলি, মাই লাইফ, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৩৫-৩৬,শৌকত আলির ওপর প্রতিক্রিয়া—তদেব, পৃঃ ৪৯

১৮। ক্রুকে হার্ডিঞ্জ, ২৪ অগস্ট ১৯১১, ক্রু পেপারস্‌, পৃঃ উঃ,ভারত সরকারকে ভারত-সচিব, ১ নভেম্বর ১৯১১, পার্লামেন্টারী পেপারস্‌ 'সি' ৫৯৭৯, ১৯১১

১৯। এইচ এফ আওয়েন, টুওয়ার্ডস নেশন-ওয়াইড অ্যাজিটেশান অ্যাণ্ড অর্গানাইজেশন দ্য হোমরুল লেসন, ১৯১৫-১৮

২০। লর্ড চেমসফোর্ডকে জেমস মেস্টন, ৭ ফেব্রুয়ারী ১৯১৭

২১। যদি weighted index ধরা হয় তবে দাম বেড়েছিল

সাল	দ্রব্যমূল্য
১৯১৪	১৮৭
১৯১৫	১৮২
১৯১৬	১৮৫
১৯১৭	১৮৬
১৯১৮	২১৫
১৯১৯	৩০১
১৯২০	৩০২

N. K. Thingalaya, 'A Century of Prices in India', E P W, 25 January 1969

২২। কে এল দত্ত, রিপোর্ট অন দ্য এনকোয়ারি ইন্টু রাইজ অব প্রাইসেস ইন ইণ্ডিয়া (কলকাতা, ১৯১৪); মিচেল ম্যাকঅ্যালপিন, 'প্রাইস মুভমেন্টস অ্যাণ্ড ফ্লাকচুয়েশনস্‌ ইন ইকনমিক অ্যাকটিভিটি (১৮৬০-১৯৪৭)', ধর্মাকুমার (সং), দ্য কেমব্রিজ ইকনমিক হিস্টরি অব ইণ্ডিয়া, ২য় খণ্ড (দিল্লী সং), পৃঃ ৯০৩-০৪

২৩। কে এন চৌধুরী ও ক্লাইভ ডিউই (সং), ইকনমি অ্যাণ্ড সোসাইটি—এসেজ ইন ইণ্ডিয়ান ইকনমিক অ্যাণ্ড সোস্যাল

হিস্টরি (দিল্লী, ১৯৭৯)

২৪। এ সি বোস, ইণ্ডিয়ান রেভল্যুশনরীস অ্যাব্রড ১৯০৫-২২ (পাটনা, ১৯৭১), সোহন সিং যোশ, হিন্দুস্তান গদর পার্টি আ সর্ট হিস্টরি (নিউ দিল্লী, ১৯৭৭); উমা মুখার্জি, টু গ্রেট ইণ্ডিয়ান রেভল্যুশনরিজ (কলকাতা, ১৯৬৬), যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি (কলকাতা, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ), রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ, মাই লাইফ স্টোরি অব ফিফটি ফাইভ ইয়ার্স (দেরাদুন, ১৯৪৭), ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস (কলকাতা ১৯৫৩), অরুণচন্দ্র গুহ, ফার্স্ট স্পার্ক অব রেভল্যুশন ১৯০০-১৯২০ (দিল্লী, ১৯৭১), প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী, বিপ্লবী জীবনদর্শন (কলকাতা, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ), বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য (সং), ফ্রিডম স্ট্রাগল অ্যাণ্ড অনুশীলন সমিতি, ১ম খণ্ড (১৯৭৯), এমিলি সি ব্রাউন, হরদয়াল হিন্দু রেভল্যুশনারি অ্যাণ্ড র‍্যাশানালিস্ট (টাসকন, ১৯৭৫), জে সি নিক্সন, অ্যান অ্যাকাউন্ট অব দা রেভল্যুশনারী অর্গানাইজেশন ইন বেঙ্গল আদার দ্যান দ্য ঢাকা অনুশীলন সমিতি (কলকাতা, ১৯১৭), জে সি কের, পলিটিক্যাল ট্রাবল ইন ইণ্ডিয়া ১৯০৯০-১৭ ও অমলেশ ত্রিপাঠীর ভারতের মুক্তি সংগ্রামে চরমপন্থী পর্বের পরিশিষ্টের সারণী দ্রষ্টব্য।

২৫। সি এইচ ফিলিপস (সং), পলিটিকস অ্যাণ্ড সোসাইটি ইন ইণ্ডিয়া গ্রন্থে এস আর মেহরোত্রার নিবন্ধ, এস আর মেহরোত্রা, ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড দ্য কমনওয়েলথ ১৮৮৫-১৯২৯ (লণ্ডন, ১৯৬৫) পিটার রব ও অন্যান্য (সং), কল, প্রোটেস্ট অ্যাণ্ড আইডেনটিটি (লণ্ডন, ১৯৭৮)

২৬। স্যার আর্থার রামবোলড, ওয়াটারশেড ইন ইণ্ডিয়া ১৯১৪-১৯২২ (লণ্ডন, ১৯৭৯), পৃঃ ৯৫-৯৬

২৭। হেককে লিউইস, ২৯ এপ্রিল ১৯১৭, অ্যাপেনডিক্স ডি, প্রোসিডিং নং ৩২৩, হোম পল এ, জুলাই ১৯১৭ নং ৩১৪-৪০

২৮। হোম ডিপার্টমেন্ট, ডিপোজিট, ফাইল নং ১৩/২১

২৯। শহীদ আমিন, 'গান্ধী অ্যাজ মহাত্মা গোরখপুর ডিস্ট্রিক্ট, ইস্টার্ন ইউ পি, ১৯২১-২২', রণজিৎ গুহ (সং), সাব-অলটার্ন স্টাডিজ, তৃতীয় খণ্ড (দিল্লি, ১৯৮৪), পৃঃ ২৫ ও পররর্তী

৩০। জুডিথ ব্রাউন, গান্ধীজ রাইজ টু পাওয়ার ইণ্ডিয়ান পলিটিকস, ১৯১৫-১৯২২ (কেমব্রিজ, ১৯৭২), পৃঃ ৭৭ ও জি ম্যাকডোনাল্ড, 'য়ুনিটি অন ট্রায়াল, কংগ্রেস ইন বিহার, ১৯২৯-৩৯,' ডি এ লো (সং), কংগ্রেস অ্যাণ্ড দ্য রাজ (লণ্ডন, ১৯৭৭), পৃঃ ২৯৮

৩১। জুডিথ ব্রাউন, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৭০-৭২

৩২। রিপোর্ট অব দ্য চম্পারন এনকোয়ারি কমিটি, ৩ অক্টোবর, ১৯১৭, মহাত্মা গান্ধী, সম্পূর্ণ রচনাবলী, ১৩শ খণ্ড

৩৩। স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাবসট্রাকটস, ১৯১৭-১৮—১৯২৬-২৭, পৃঃ ৬১৮-২৪

৩৪। ডেভিড হার্ডিম্যান, পেজান্ট ন্যাশানালিজম অব গুজরাট, খেড়া ডিস্ট্রিক্ট, ১৯১৭-৩৪ (দিল্লি, ১৯৮১)

৩৫। মহাত্মা গান্ধী, সম্পূর্ণ রচনাবলী, ১৪শ খণ্ড, পৃঃ ২৫৯-৬০

৩৬। তদেব, পৃঃ ২৭৯

৩৭। কে এল গিলিয়ন, আমেদাবাদ, এ স্টাডি ইন ইণ্ডিয়ান হিস্টরি (বার্কলে, ১৯৬৮)

৩৮। অম্বালাল সারাভাইকে গান্ধী, ২১ ডিসেম্বর, ১৯১৭, সম্পূর্ণ রচনাবলী ১৪শ খণ্ড, পৃঃ ১১৫

৩৯। ঐ, ১ মার্চ ১৯১৮, তদেব, পৃঃ ২২৯-৩০

৪০। শ্রীনিবাস শাস্ত্রীকে গান্ধী, ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯১৯, তদেব, ১৫শ খণ্ড, পৃঃ ৮৭-৮৮

৪১। সাপ্রুকে শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, ৪ মার্চ ১৯১৯, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী পেপার্স, ৩০৫, এন এ আই (নিউ দিল্লী)

৪২। আর ফারনো, ম্যাসাকার অ্যাট অমৃতসর (লণ্ডন, ১৯৬৩)

৪৩। অমল হোম, '১৯১৯-এর পাঞ্জাবের হাঙ্গামায় রবীন্দ্রনাথ', দেশ, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ

৪৪। রবীন্দ্রকুমার (সং), এসেজ অন গান্ধীয়ান পলিটিক্স দ্য রাওলাট সত্যাগ্রহ অব ১৯১৯ (অক্সফোর্ড, ১৯৭১)

৪৫। ঐ 'দ্য বোম্বে টেক্সটাইল স্ট্রাইক ১৯১৯', আই ই সি এস এইচ আর (IECSHR), মার্চ, ১৯৭১

৪৬। জেটল্যাণ্ড কলেকশন, ইণ্ডিয়া অফিস, দিনলিপি ১০ এপ্রিল, ১৯১৯

৪৭। গান্ধী সরকারী হান্টার কমিটির সঙ্গে সহযোগিতা করতে চাননি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সি এফ অ্যাণ্ড্রুজ, ৩ ও ১৬ নভেম্বর ১৯১৯, সি এফ অ্যাণ্ড্রুজ পেপার্স, বিশ্বভারতী। তিনি যে কংগ্রেস এনকোয়ারি কমিটির রিপোর্ট রচনায় উল্লেখযোগ্য অংশ নিয়েছিলেন তার প্রমাণ মিলবে মতিলাল নেহরুর পত্রে। রিপোর্টে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডকে বলা হয়, "a calculated piece of inhumanity towards utterly innocent and unarmed men, including children, and unparalleled for its ferocity in the history of modern British administration" গান্ধী, সম্পূর্ণ রচনাবলী, ১৭শ খণ্ড, পৃঃ ১১৪-২৯২

৪৮। রিপোর্ট অব দ্য থার্টিফোরথ আই এন সি, ১৯১৯, পৃঃ ১২৩

৪৯। কেনেথ ম্যাকফারসন, দ্য মুসলিম মাইক্রোকজম ক্যালকাটা ১৯১৮-১৯৩৫ (উইজবাডেন, ১৯৭৪) পৃঃ ৬০ রফিউদ্দিন আহমেদ, দ্য বেঙ্গল মুসলিমস, ১৮৭১-১৯০৬ আ কোয়েস্ট ফর আইডেনটিটি (অক্সফোর্ড, ১৯৮১)-তে আগেকার অবস্থা বর্ণনা করে দেখিয়েছেন উনিশ শতকের শেষে মুইজুদ্দিন আহমদ লিখছেন 'তুরস্কের ইতিহাস', আব্দুল জব্বার লিখছেন 'মক্কা শরীফের ইতিহাস', কাজিম অল কুরেশির—'অশ্রুমালা' ও 'মহাশ্মশান', ও ইসমাইল হসেন সিরাজির—'অনলপ্রভা', অনেকটা হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধাঁচে, মুসলিম গরিমার অবসান নিয়ে বিলাপ। মাজউদ্দিন

আহমদের 'আমার সংসার জীবন' (১৯১৪) বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। মুসলমানরা ধুতি চাদর, নামের আগে শ্রী ব্যবহার ছেড়ে দিচ্ছিলেন, ভাষায় আনছিলেন আরবী-ফার্সী শব্দ। প্রত্যেক সেন্সাসে আশ্রফ শেখদের সংখ্যা বাড়ছিল। প্রধানত উচ্চশ্রেণীর মধ্যে এই Arabicization ও Ashrafization সীমাবদ্ধ থাকলেও ভবিষ্যতের পক্ষে তা ক্ষতিকর হয়েছিল।

৫০। গেইল মিনোল্ট, দ্য খিলাফৎ মুভমেন্ট বিলিজ্যাস সিমবলিজম অ্যান্ড পলিটিক্যাল মবিলাইজেশন ইন ইন্ডিয়া (অক্সফোর্ড, ১৯৮২)

৫১। এ সি নিমিজার, দ্য খিলাফৎ মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া ১৯১৯-১৯২৪ (লাইডেন.১৯৭২)

৫২। এই কবিতা আমাদের সুপরিচিত 'সারা জাঁহাসে আচ্ছা' ইত্যাদি।

৫৩। 'নয়া শিবালা'র কয়েক পঙক্তির ইংরেজী অনুবাদ দেওয়া হল।

I shall tell truth, O Brahman, but take it not as an offence,
Thy idols in the temple have decayed
Thou hast learnt from these images
to bear ill will
to thine own people,
And god has taught the Mullah the way of strife

For me, every particle of my country's
dust is a
divinity
Come, let us remove all signs of division and build a new temple in our land

quoted in Mujeeb, The Indian Muslims, P 484

৫৪। ফজলুর রহমান, ইসলাম (শিকাগো, ১৯৭৯), পৃঃ ২২০। 'বঙ্গ-ই-দারা' লেখা হয় ১৯২৪ সালে। তাতে স্পেন ও সিসিলির পূর্ব গৌরব স্মরণ করে মুসলিম পুনরুজ্জীবনের আশা ধ্বনিত হয়েছে। এর অনুবাদ আছে শেখ মহম্মদ ইক্রামের মডার্ন মুসলিম ইন্ডিয়া অ্যান্ড দ্য বার্থ অব পাকিস্তান (লাহোর) গ্রন্থে।

৫৫। হাফিজ মালিক (সং), ইকবাল, পোয়েট ফিলজফার অব পাকিস্তান (কলম্বিয়া, ১৯৭১), পৃঃ ৭৬

৫৬। ফজলুর রহমান, পৃঃ উঃ, পৃঃ ২২৫

৫৭। নিকি কেডি, আন ইসলামিক রেসপন্স টু ইম্পিরিয়ালিজম (বার্কলে, ১৯৬৮)

৫৮। এলি কেদুরি,আফগানি অ্যান্ড আবদু অ্যান এসে অন রিলিজাস আনবিলিফ অ্যান্ড পলিটিক্যাল অ্যাকটিভিজম ইন মডার্ন ইসলাম (লন্ডন ১৯৬৬)

৫৯। আফজল ইকবাল, লাইফ অ্যান্ড টাইমস্ অব মোহামেদ আলি (দিল্লী, ১৯৭৮), পৃঃ ৩৮

৬০। মোহম্মদ আলি, মাই লাইফ আ ফ্র্যাগমেন্ট (লাহোর, ১৯৬৬), পৃঃ ৩১-৩৩

৬১। মুশিরুল হাসান, 'রিলিজান অ্যান্ড পলিটিকস ইন ইন্ডিয়া', মুশিরুল হাসান (সং), কম্যুনাল অ্যান্ড প্যান-ইসলামিক ট্রেন্ডস্ ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া (দিল্লী, ১৯৮৫)।

৬২। জিয়াউল হাসান ফারুকি, দ্য দেওবন্দ স্কুল অ্যান্ড দ্য ডিমান্ড ফর পাকিস্তান (১৯৬৩), পৃঃ ৪৩-৪৬

৬৩। পি সি ব্যামফোর্ড, হিস্টরি অব নন-কোঅপারেশন অ্যান্ড খিলাফৎ মুভমেন্টস পৃঃ ১২৪

৬৪। ডবল্যু সি ক্যান্টওয়েল স্মিথ, মডার্ন ইসলাম ইন ইন্ডিয়া (২ সং, লাহোর, ১৯৪৭), পৃঃ ২৯৩। বাংলার মনিরুজ্জমান চৌধুরী, আক্রাম খাঁ ও ইসমাইল সামসুদ্দিন ব্রিটিশ শোষণের ওপর জোর দেন। অন্যদিকে 'ইসলাম দর্শন' পত্রিকা 'বন্দেমাতরম', 'গান্ধীজীকি জয়' প্রভৃতি ধ্বনির তীব্র প্রতিবাদ করে।

৬৫। চৌধুরী খলিকুজ্জমান, পাথওয়ে টু পাকিস্তান (লাহোর, ১৯৬১), পৃঃ ২৮

৬৬। চিবলকে হার্ডিঞ্জ, ১২ নভেম্বর ১৯১৪, হার্ডিঞ্জ Mss (৯৩)

৬৭। হোম পল বি,জানুয়ারি ১৯১৮, ফাইল নং ৪৮৭-৯০

৬৮। মহম্মদ আলিকে গান্ধী, ১৮ নভেম্বর ১৯১৮, গান্ধী, সম্পূর্ণ রচনাবলী, ১৫শ খণ্ড, পৃঃ ৬৩-৬৪

৬৯। তদেব, পৃঃ ২৯৬-৯৭

৬৯ক। মার্জোরি সাইকস, লাইফ অব সি এফ অ্যানড্রুজ, পৃঃ ১৫৪-৫৫।

৭০। হোম পল ডিপোজিট, নভেম্বর ১৯১৯, ফাইল নং ১৬, ফর্টনাইটলি রিপোর্টস।

৭১। ঐ, অ্যাপেন্ডিকস্, ১৯২০, ফাইল নং ১০৩

৭২। উইকলি রিপোর্ট ডি সি আই, ৫ এপ্রিল ১৯২০, হোম পল ডিপোজিট।

৭৩। জীবরাজ মেহ্‌তাকে গান্ধী, ১৯ মে ১৯২০

৭৪। গান্ধীকে আনসারি, ১ এপ্রিল ১৯২০, হোম পল ডিপোজিট, জুন ১৯২০, ফাইল নং ১১২

৭৫। হোম পল ডিপজিট, ফেব্রুয়ারি ১৯১৮, ফাইল নং ২৯ ও কিপ উইথ।

৭৬। গান্ধী 'খিলাফৎ ফারদার কোশ্চেনস আনসারড', ইয়াং ইন্ডিয়া, ২ জুন ১৯২০ গান্ধী, সম্পূর্ণ রচনাবলী, ১৭শ খণ্ড, পৃঃ ৪৭৫

৭৭। জুডিথ ব্রাউন, পৃঃ উঃ, পৃঃ ২২৯

৭৮। ইয়াং ইন্ডিয়া, ৯ জুন ১৯২০। রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেয়েছে অ্যানড্রুজের কাছে চিঠিতে, দেশ, ১৩৫৫ শারদীয়া সংখ্যা, সংযোজনী।

৭৯। জওহরলাল নেহরুকে মতিলাল নেহরু, ৫ জুলাই ১৯২০, জওহরলাল নেহরু পেপার্স, এন এম এম এল (নিউ দিল্লি)

৮০। গ্যালাহার, জনসন ও শীল (সং), লোক্যালিটি, প্রভিন্স অ্যাণ্ড নেশন, এসেজ অন ইণ্ডিয়ান পলিটিক্স ১৮৭০-১৯৪০ (কেমব্রিজ, ১৯৭৩), পৃঃ ১২৩-৫৩

৮১। দ্য বেঙ্গলী (১০ সেপ্টেম্বর ১৯২০)-র মতে ৫৮৭৩ রেজিস্ট্রিকৃত ভোটদাতাদেব মধ্যে ২৭৩৫ জন ভোট দেন। ছোটলাট রোনালড্‌সেব মতে গান্ধীব প্রস্তাব ১৮২৬-৮৮৪ ভোটে জেতে। মন্টেগুকে বোনালড্‌সে ২২ সেপ্টেম্বর ১৯২০, মন্টেগু পেপার্স, MSS EUR, D. 523 (31) আমবা ইয়াং ইণ্ডিয়া (১৫ সেপ্টেম্বব ১৯২০)-ব সংখ্যা নিলাম।

৮২। দ্য বেঙ্গলী (১০ সেপ্টেম্বব ১৯২০) মন্তব্য কবে এবকম ভোটেব কোন মূল্য নেই।

৮৩। বজতকান্ত রায়, সোস্যাল কনফ্লিক্ট অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল আনরেস্ট ইন বেঙ্গল ১৮৭৫-১৯২৭ (অক্সফোর্ড, ১৯৮৪)-তে মাবোয়াড়ীদেব আর্থিক ও অন্যান্য সাহাযোব উল্লেখ আছে, পৃঃ ২৩০। মন্টেগুকে রোনালড্‌সে, ২২ সেপ্টেম্বব ১৯২০, পৃঃ উঃ। দ্বাবকা দাসেব মতে ভোটের দিন উমব শোভানি ও শঙ্কবলাল ব্যাঙ্কার রাস্তা থেকে শ'খানেক সমর্থক ধবে আনেন। কানজি দ্বাবকাদাস, গান্ধীজী থ্রু মাই ডায়েরি লিভ্‌স ১৯১৫-১৯৪৮ (বোম্বে, ১৯৫০), পৃঃ ২৫

৮৪। মন্টেগুকে উইলিংডন, ১৫ সেপ্টেম্বব ১৯২০, MSS EUR. D523 (20)

৮৫। জুডিথ ব্রাউন, পৃঃ উঃ, পৃ ২৭০। ব্রুমফিলড্‌ ও অনগ্রসর প্রদেশগুলিব সমর্থনেব কথা উল্লেখ কবেছেন। 'দ্য বিজিওন্যাল এলিটস্‌ আ থিওবি অব মডার্ন ইণ্ডিযান হিস্টবি', IESHR, III, 3 (Sept 1966), পৃঃ ২৭৯-৯১

৮৬। বজতকান্ত বায, পৃঃ উঃ, পৃঃ ২৪৬ ও পববর্তী

৮৭। ববীন্দ্রনাথ ঠাকুব, লেটার্স ফ্রম অ্যাব্রড, পৃঃ ৭২-৭৩

৮৮। ঐ, পৃঃ ৫৫

৮৯। অ্যানড্রুজকে ববীন্দ্রনাথ, ৩ অক্টোবব ১৯২০, অ্যানড্রুজ পেপার্স, বিশ্বভাবতী; 'লেটার্স ফ্রম অ্যাব্রড' গ্রন্থেও পাওযা যাবে।

৯০। অ্যানড্রুজকে ববীন্দ্রনাথ, ২৫ নভেম্বব ১৯২০

৯১। নীবদ সি চৌধুবী, দাই হ্যাণ্ড গ্রেট অ্যানার্ক (লণ্ডন ১৯৮৭), পৃঃ ৪০-৪৯

৯২। ট্রেড যুনিযান কংগ্রেসেব জন্ম প্রসঙ্গে এস এ ডাঙ্গে, ফিফটি ইযার্স, ডক্যুমেন্টস (নিউ দিল্লি, ১৯৭৩), ১১শ খণ্ড, পৃঃ ৪। জি আব কাসলে ও অর্জুন আত্মাবামের জবানবন্দী, প্রোসিডিংস অব দ্য মীবাট ট্রাযাল

৯৩। গোপালকৃষ্ণ, 'দ্য ডেভেলপমেন্ট অব দ্য ইণ্ডিযান ন্যাশানাল কংগ্রেস অ্যাজ আ ম্যাস অর্গানাইজেশন ১৯১৮-২৩', জর্নাল অব এশিযান স্টাডিজ, XXV ৩, ১৯৬৬, পৃঃ ৪১৮-২১

৯৪। ফর্ট নাইটলি বিপোর্টস ফব ডিসেম্বব ১৯২০, হোম পল ডিপার্টমেন্ট, ফেব্রু ১৯২১, নং ৩৫, ৭৭

৯৫। এম. আব জযাকব, দ্য স্টোবি অব মাই লাইফ, ১ম খণ্ড ১৮৭৩-১৯২২ (বোম্বে, ১৯৫৮), পৃঃ ৩৭৪। এব সমর্থন কবেন চেমসফোর্ডকে বোনালডসে, ২৫ জানুয়ারি ১৯২১, চেমসফোর্ড পেপাবস, Mss EUR E 264 (I.O)

৯৬। ব্রুমফিলড, পৃঃ উঃ, পৃঃ ১৬৮; বজতকান্ত বায, পৃঃ উঃ, পৃঃ ২৬২-৬৩

৯৭। মহাত্মা গান্ধী, সম্পূর্ণ বচনাবলী, ১৯শ খণ্ড, পৃঃ ৫৭৬-৭৮

৯৮। মঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায, অপ্রকাশিত পি. এইচ ডি নিবন্ধ—'স্ববাজ্য পার্টি—ইটস বোল ইন ন্যাশানাল মুভমেন্ট উইথ স্পেশ্যাল এমফ্যাসিস অন বেঙ্গল।'

৯৯। কালিদাস নাগকে বোম্যাঁ বোলাঁ, ১৯ অক্টোবব ১৯২৫, বোলাঁ গান্ধী কবেসপণ্ডেস (গভ অব ইণ্ডিযা, ১৯৭৬), পৃঃ ৪৯, বোলাঁ ববীন্দ্রনাথেব অত্যধিক চবখানিন্দা পছন্দ কবেননি। ডাযেবি ১৮-১৯ ফেব্রুযাবি, ১৯২৫, ঐ, পৃঃ ৪৪

১০০। গান্ধীকে সি এফ অ্যানড্রুজ, ১৯ ফেব্রুয়াবি ১৯২১; গান্ধী সংগ্রহালয (নিউ দিল্লী)। ববীন্দ্রনাথকে তিনি আগেই লিখেছিলেন 'বিলাসে লালিত পবগাছা' বাঙালী উচ্চবর্ণ উচ্চবিত্ত বুদ্ধিজীবীব কাছে গান্ধীব তপস্যা অর্থহীন। ববীন্দ্রনাথকে অ্যানড্রুজ, ৫ অক্টোবব ১৯২০।

১০১। সি এ বেইলি, দ্য লোক্যাল রুটস অব ইণ্ডিযান পলিটিকস্‌ এলাহাবাদ ১৮৮০-১৯২০ (অক্সফোর্ড, ১৯৭৫), পৃঃ ২৬৩-৬৪

১০২। সব্যসাচী ভট্টাচার্য, কটনমিলস অ্যাণ্ড স্পিনিং হুইলস্‌, স্বদেশী অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়ান ক্যাপিটালিস্ট ক্লাস ১৯২০-২২, ইকনমিক অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল উইকলি, ২০ নভেম্বব ১৯৭৬

১০৩। তিলক স্ববাজ ভাণ্ডাবেব জন্য ধার্য এক কোটি টাকাব মধ্যে বোম্বাই শহব ৩৭½ লক্ষ তুলে দেয। তাব মধ্যে আবাব তিনজন বড ব্যবসায়ী দেন দশ লাখ কবে। কংগ্রেস একথা অস্বীকার কবে। ফর্টনাইটলি বিপোর্ট ফ্রম বম্বে ফর ফার্স্ট হাফ অব জুলাই ১৯২১, হোম পল, নং ১৮

১০৪। ভাবতসচিবকে বডলাট, ৫ নভেম্বব ১৯২১, বিডিং কলেকশন, Mss. Eur E238/4(I.O) ফর্টনাইটলি বিপোর্টস ফব ফার্স্ট হাফ অব অক্টোবব ১৯২১, হোম পল ১৯২১, নং ১৮

১০৫। ইনভেস্টবস ইণ্ডিযা ইয়াব বুকেব এই তথ্যেব চেযেও বড তথ্য দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং ইনফ্লুযেঞ্জার জন্য শ্রমিক সংখ্যা হ্রাস। হোম পল বি, নভেম্বব ১৯২০, নং ২৮১

১০৬। পঞ্চম জর্জকে বোনালড্‌শে, ১২ মে ১৯২০, জেটল্যাণ্ড কলেকশন, Mss Eur D 609(I O)

১০৬ক। আসাম প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদক এর্ন সি ববদলই লিখছেন তাদেব মাইনে ছিল ৬ টাকা, আব নানা অজুহাতে তা কেটে নেবার পর ২॥ টাকাব বেশি থাকত না। অথচ চালেব দাম ছিল টাকায পাঁচ সেব। গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গল পল কনফিডেন্সিয়াল, ফাইল নং ৩১২ অব ১৯২৫

১০৬খ। ব্রুমফিল্ড, পৃঃ উঃ, পৃঃ ১১৪ ও পরবর্তী গোয়েন্দা দফতবেব ওপব বেশি নির্ভব।

১০৬গ। গান্ধীজীকে অ্যানড্রুজ, ২১ জুন ১৯২১, ববীন্দ্রনাথকে অ্যানড্রুজ, ২৩ ফেব্রু ১৯২২

১০৭। স্ট্যানলি কোচানেক, বিজনেস অ্যাণ্ড পলিটিকস্ ইন ইণ্ডিয়া (বার্কলে, ১৯৭৪), পৃঃ ১০৮_৩০, ১৫৬-৯৬, বজতকান্ত বায়, ইনডাস্ট্রিয়ালাইজেশন ইন ইণ্ডিয়া (অক্সফোর্ড, ১৯৭৯), পৃঃ ২৯৭-৩০৯

১০৮। জি ডি বিড়লা, ইন দ্য স্যাডো অব দ্য মহাত্মা ইত্যাদি, (কলকাতা, ১৯৫৩), পৃঃ ১৩

১০৯। এম. এইচ. সিদ্দিকি, অ্যাগ্রেরিয়ান আনরেস্ট ইন নর্দার্ন ইণ্ডিয়া, ইউ. পি. ১৯১৮-২২ (নিউ দিল্লি, ১৯৭৮)

১১০। জ্ঞান পাণ্ডে, পেজান্ট রিভোল্ট অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়ান ন্যাশানালিজম্, ১৯১৮-১৯২২, রণজিৎ গুহ (সং), সাব অলটার্ন স্টাডিজ (অক্সফোর্ড), প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৪৩-৯৭

১১১। কপিলকুমাব, পেজান্টস্ ইন রিভোল্ট (মনোহর, ১৯৮৪)

১১২। পিটাব রীভস্, দ্য পলিসি অব অর্ডার, জার্নাল অব এশিয়ান স্টাডিজ, XXV, ২, ফেব্রুয়াবি ১৯৬৬

১১৩। ডব্লু এফ ক্রুলি, কিষাণ সভাজ অ্যাণ্ড অ্যাগ্রেবিয়ান বিভোল্ট ইন দ্য য়ুনাইটেড প্রভিন্সেস, ১৯২০-২১, মডার্ন এশিযান স্টাডিজ, ৫ম খণ্ড দ্বিতীয় ভাগ, এপ্রিল ১৯৭১

১১৪। ডি. এন ধনাগারে, পেজান্ট মুভমেন্টস ইন ইণ্ডিয়া ১৯২০-১৯৫০ (অক্সফোর্ড, ১৯৮৩)

১১৫। এস. গোপাল, জওহরলাল নেহরু আ বায়োগ্রাফি, ১ম খণ্ড (অক্সফোর্ড)

১১৬। ভাবতসচিবকে বিডিং, ১৩ অক্টোবব ১৯২১

১১৭। বামচন্দ্রেব প্রাথমিক পবিকল্পনার জন্য সিদ্দিকি, পৃঃ উঃ, পৃঃ ১১৮-১৯

১১৮। জওহবলাল নেহরু অ্যান অটোবিওগ্রাফি (লণ্ডন, ১৯৩৬) পৃঃ ৫১

১১৯। হাবকোর্ট বাটলাবকে হেইলি, ২৪ জানুয়াবি ১৯২১

১২০। হোম পল. ডিপজিট, ১৯২১, ফাইল নং ৮৭; গান্ধী, সম্পূর্ণ বচনাবলী, ১৯শ খণ্ড, পৃঃ ৪১৯-২০, ২০শ খণ্ড, পৃঃ ১৩৮-৪০

১২০ক। ১৯২১-এব আগস্টে সাবা ভাবতে ভলান্টিয়াব সংখ্যা ছিল ১৫,১৮৬। এব সঙ্গে সেবাসমিতিব ১৫,২৬৯ সদস্য যোগ কবাচ্ছে গোয়েন্দা বিভাগ। বাংলা ও বোম্বাই থেকে আসে এই ত্রিশ হাজাবেব প্রায় অর্ধাংশ। হোম পল ১৯২২, নং ৩২৭, পার্ট IV

১২০খ। এস এন বায়েব বিপোর্ট, ১ নভেম্বব ১৯২১, G B Local Self Govt Dept. (Local Boards) July 1922, Progs 36-39, Feb No L-2-U-5, Serial nos 1-7, হিতেশবঞ্জন সান্যাল, কংগ্রেস মুভমেন্টস্ ইন দ্য ভিলেজেস অব ইস্টার্ন মিডনাপুব ১৯২১-১৯৩১, গাবোরু ও থর্নাব (সং), আসি দু স্যুদ, পৃঃ ১৬৯, ১৭২; ঐ, কংগ্রেস ইন সাইথ ওয়েস্টার্ণ বেঙ্গল, দ্য অ্যান্টি য়ুনিয়ান বোর্ড মুভমেন্ট ইন ইস্টার্ন মিডনাপুব ১৯২১, সিসন অ্যাণ্ড ওলপার্ট (সং), কংগ্রেস অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালিজম্ ইত্যাদি (দিল্লী, ১৯৮৮)। পৃঃ ৩৫২-৭৬

১২১। বজতকান্ত বায, সোস্যাল কনফ্লিক্ট ইত্যাদি, পৃঃ উঃ, পৃঃ ২৮৭-৯৩। পবে তিনি বলেছেন, ত্রিপুবাব স্থানীয় জোতদাব মহাজনদেব বিরুদ্ধে প্রায় শ্রেণীসংগ্রাম শুরু হয। পৃঃ ২৯৯

১২২। সুগত বসু, ক্লাস, নেশন অ্যাণ্ড বিলিজন ইন পেজান্ট পলিটিকস্ ইস্টবেঙ্গল ফ্রম নন কো-অপাবেশন টু পার্টিশান, বেঙ্গল পাস্ট অ্যাণ্ড প্রেজেন্ট, C III, part I-II, নং ১৯৬-৯৭, জানু-ডিসে ১৯৮৪, পৃঃ ১৫-৪৫

১২৩। সুমিত সবকাব, দ্য কণ্ডিশানস্ অ্যাণ্ড নেচার অব সাব অলটার্ন মিলিট্যান্সি বেঙ্গল ফ্রম স্বদেশী টু নন কো-অপাবেশন ১৯০৬-২২, বণজিৎ গুহ (সং) সাব অলটার্ন স্টাডিজ (অক্সফোর্ড), তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৭১-৩২০। কিন্তু কাঁচা পাটেব দাম আদৌ বাড়ছিল না। ১৯১৪-র মূল্য নির্দেশক ১০০ ধবলে ১৯১৭-তে পাটেব দাম ৬৫, ১৯১৮-তে ৭৫, ১৯১৯-এ ১১৫ হযে আবাব ১৯২০-তে ১০৪ ও ১৯২১-এ ৮৩-তে দাঁড়ায

১২৪। স্বপন দাশগুপ্ত, ঐ চতুর্থ খণ্ড

১২৫। আই বি 'ওয়ান ইয়াব অব নন-কোঅপাবেশন', ঐ, ফর্টনাইটলি বিপোর্টস্ অব দ্য গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গল অন দ্য পলিটিক্যাল সিচুয়েশন

১২৬। ঐ, বিপোর্ট অন দা প্রগ্রেস অব দ্য নন কো-অপাবেশন মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল ১৯২২

১২৬ক। গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গল, পল কনফিডেন্সিযাল, ফাইল নং ১০০ (৭-২৪) অব ১৯২২

১২৭। বিহাব-ওড়িশাব মুখ্য সচিবকে এইচ. ডি. ক্রেইক, ডি ও নং ১০৬০, ২০ জুন ১৯২১, ফাইল নং ১৪৪। পল স্পেশ্যাল, জি ও বি ও ১৯২১

১২৭ক। হোম পল ১৯২২, নং ৪৫৯/II, গান্ধীব প্রতিবাদ, সম্পূর্ণ বচনাবলী, ১৯শ খণ্ড, পৃ ৩৯৬-৪০২; মোহিন্দাব সিং, দ্য অকালি মুভমেন্ট (দিল্লী, ১৯৭৮)

১২৮। ডেভিড আবনল্ড, দ্য গৌণ্ডাবস অ্যাণ্ড দ্য কংগ্রেস পলিটিক্যাল বেক্রুটমেন্ট ইন সাউথ ইণ্ডিয়া, ১৯২০-১৯৩৭, সাউথ এশিযা, IV (আগস্ট ১৯৭৪), পৃঃ ১-২০; ঐ, দ্য কংগ্রেস ইন তামিলনাড়ু ন্যাশনালিস্ট পলিটিকস্ ইন সাউথ ইণ্ডিয়া ১৯১৯-১৯৩৭ (মনোহব, ১৯৭৭)

১২৯। মন্টেগুকে উইলিংডন ১ মে ১৯২১, ১১ ফেব্রুয়াবি ১৯২২। উইলিংডন পেপার্স F 93/4(I O)

১৩০। ডেভিড আবনল্ড 'বেবেলিয়াস হিলমেন দ্য গুডেনবাম্পা বাইজিংস ১৮৩৯-১৯২৪' রণজিৎ গুহ (সং), সাব অলটার্ন স্টাডিজ (অক্সফোর্ড), প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৮৮-১৪২

১৩১। আব হিচকক, আ হিস্টবি অব দ্য মালাবাব বেবেলিযান, ১৯২১ (মাদ্রাজ, ১৯২৫) পৃঃ ১৯, হোম পল ১৯২১ নং ২৪১, পার্ট IA; হোম পল ১৯২২, নং ২৩ ও কিপ উইথ, নং ২৪১/IB, কনবাড উড্‌, পেজান্ট বিভোল্ট অ্যান

ইন্টারপ্রিটেশন অব মোপলা ভায়োলেন্স ইন দ্য নাইনটিস্থ অ্যাণ্ড টুয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরিজ', ডিউই অ্যাণ্ড হপকিনস (সং), দ্য ইম্পিরিয়াল ইমপ্যাক্ট ইত্যাদি (লণ্ডন, ১৯৭৮)

১৩২। মন্টেগুকে রিডিং, ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯২১ রিডিং কলেকশন পৃঃ উঃ

১৩৩। মন্টেগুকে উইলিংডন, ২৭ আগস্ট ১৯২১, উইলিংডন পেপার্স পৃঃ উঃ

১৩৪। সি রাজাগোপালাচারি রোজনামচা ১৬ ফেব্রু, ১৯২২, রাজাজিজ জেল লাইফ (মাদ্রাজ, ১৯৪১), পৃঃ ১০৭

১৩৫। গান্ধী,'মাই নোটস্'.সম্পূর্ণ রচনাবলী. ২১শ খণ্ড, পৃঃ ২০৪

১৩৬। এ আই সি সি ১৯২১-এর ৪ নভেম্বর স্থির করে কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে খাজনাবন্ধ সমেত আইন অমান্য আরম্ভ করা যেতে পারে। প্রধান শর্ত হল—উক্ত অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষের স্বদেশী গ্রহণ। গান্ধীর মতে গুণ্টুর তৈরি হয়নি। বেঙ্কটাপ্পায়াকে গান্ধী, ১৭ জানুয়ারি ১৯২২, সম্পূর্ণ রচনাবলী, ২২শ খণ্ড, পৃঃ ২১১-২৮

১৩৭। ১৯২১-এর ২৩ নভেম্বর ওয়ার্কিং কমিটি যুবরাজ আগমন উপলক্ষে বোম্বাই-এর হিংসাত্মক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বারদোলি সত্যাগ্রহ প্রথমবার পিছিয়ে দেয়। নরমপন্থীদের সঙ্গে কনফারেন্স হচ্ছে বলে ১৯২২-এর ১৭ জানুয়ারি তা দ্বিতীয়বার পেছন হয়

১৩৮। শহিদ আমিন, গান্ধী অ্যাজ মহাত্মা, রণজিৎ গুহ (সং), সাব অলটার্ন স্টাডিজ (অক্সফোর্ড ১৯৮৪), ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১-৬১

১৩৯। জওহরলালকে গান্ধী, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯২২, জওহরলাল নেহরু পেপার্স, এন এম এম এল, ফাইল নং G II, 1922 (ii)

১৪০। গান্ধীকে মহাদেব দেশাই, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯২২

১৪১। সুবাটের গোয়েন্দা দফতরের রিপোর্ট, হোম পল, ১৯২২, নং ৫৮০-II

১৪২। কৃষ্ণদাস, সেভেন মান্থস্ উইথ মহাত্মা গান্ধী, পৃঃ উঃ পঃ ২৪৫-৪৬। দিল্লীর এ আই সি সি সভায় বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিরা তীব্র নিন্দা করেন। ফর্টনাইটলি রিপোর্ট ফ্রম দিল্লী ফর সেকেন্ড হাফ অব ফেব্রুয়ারি ১৯২২ হোম পল, ১৯২২, নং ১৮।

১৪৩। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭৪ সালে প্রদত্ত এই বক্তৃতা 'Gandhi's second rise to power' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে ক্যালকাটা হিস্টরিক্যাল জর্নাল, প্রথম খণ্ড, নং ১ ও ২, জুলাই ১৯৭৬ ও জানুয়ারি ১৯৭৭ সংখ্যায়।

১৪৪। আজাদ ১৯২০-এর মাঝামাঝি 'হিজরৎ কা ফতোয়া' জারি করেন। আবদুল বারি ফতোয়া দেন ১৯২১-এর নভেম্বরে। পঞ্জাবের পীররা দেন আরও পরে। এইসব ফতোয়া অনুসরণ করে অনেক মুসলমান কারাবরণ করেছিলেন, অনেকে দেশত্যাগও করেছিলেন।

১৪৫। মন্টেগুকে রিডিং, ২৮ ডিসেম্বর ১৯২১, রিডিং কলেকশন, MSS Eur E 238, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড। এর মাইক্রোফিলম রয়েছে জওহরলাল নেহরু মেমোরিয়াল ম্যুজিয়াম, নিউ দিল্লীতে।

১৪৬। ঐ, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯২২, তদেব।

১৪৭। ১৯২১ মে-তে উভয়ের মধ্যে সিমলায় সাক্ষাৎকারের সময় মন্টেগুকে তিনি লিখেছিলেন, " he is like the rest of us, when engaged in a political movement he wishes to gather all under his umbrella and to reform them and bring them to his views He has consequently to accept many with whom he is not in accord, and has to do his best to keep the combination together This is particularly true of the Hindu-Muslim combination which I think rests upon insecure foundations " মন্টেগুকে রিডিং ১৯ মে ১৯২১, রিডিং কলেকশন, পৃঃ উঃ।

১৪৮। দ্বিতীয় মার্কেস অব রিডিং, রুফাস আইজ্যাকস, ফার্স্ট মার্কেস অব রিডিং (লণ্ডন, ১৯৪৫), পৃঃ ১৯৯-২০০

১৪৯। মন্টেগুকে রিডিং, ৭ ও ১৪ জুলাই, ১৯২১, রিডিং কলেকশন, পৃঃ উঃ। মন্টেগু লিখছেন, এসব উক্তি প্রত্যাহার "must have lett very unpleasent thoughts in their (Alis') minds which are all to the good " আফজল ইকবাল, মোহাম্মেদ আলি (দিল্লী, ১৯৭৮), পৃঃ ২৬৭

১৫০। মন্টেগুকে রিডিং, ২৯ সেপ্টেম্বর, ৬ ও ২৫ অক্টোবর, ১৯২১, রিডিং কলেকশন, পৃঃ উঃ।

১৫১। ঐ, ৩ নভেম্বর ১৯২১, তদেব।

১৫২। পীলকে রিডিং, ২৬ এপ্রিল ও ১৩ জুলাই, ১৯২২, তদেব।

১৫৩। জওহরলাল নেহরুকে গান্ধী, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯২২, সম্পূর্ণ রচনাবলী, ২২ খণ্ড, পৃঃ ৪৩৬

১৫৪। ঐ, ১৭শ খণ্ড, পৃঃ ৪৭৫

১৫৫। গান্ধী, ইয়ং ইন্ডিয়া, ২৮ এপ্রিল ১৯২০

১৫৬। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যাবে গার্গী চক্রবর্তীর গান্ধী : আ চ্যালেঞ্জ টু কম্যুনালিজম্ (নিউ দিল্লী, ১৯৮৭) গ্রন্থের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে। পৃঃ ৩৩-১১২

১৫৭। রাজিমাকে গান্ধী, ২৭ মার্চ ১৯২০, সম্পূর্ণ রচনাবলী, ১৭শ খণ্ড, পৃঃ ২৯৩

১৫৮। হোম পল. ১৯২১, ফাইল নং ৪৫১

১৫৯। অ্যানড্রুজকে পোল্যাক, ৭ জুলাই ১৯২০, বানারসীদাস চতুর্বেদী পেপার্স, I/B-497, জাতীয় অভিলেখাগার।

১৬০। রোমাঁ রোলাঁর ডায়েরি, ২১-২৯ জুন, ১৯২৬, পৃঃ উঃ।

১৬১। ববীন্দ্রনাথ ঠাকুব, কালান্তব, পৃঃ ২০৪
১৬২। ঐ, শান্তিনিকেতন, ৩য় বর্ষ, ১৩২৯, পৃঃ ৮৩-৮৪; 'The way to unity', Visvabharati Quarterly, July, 1923
১৬৩। বজনীপাম দত্ত, ইন্ডিযা টুডে অ্যান্ড টু মবো (লন্ডন, ১৯৪৮)
১৬৪। মুজফ্ফব আহমদ, 'কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন', লাঙল, ১ম খণ্ড, ১২শ সংখ্যা, ৪ চৈত্র, ১৩৩২, নির্বাচিত বচনা সংকলন (সেপ্টেম্বব, ১৯৮৬), পৃঃ ৬।
১৬৫। এম এন বায, মেমযার্স (দিল্লী, ১৯৬৪), পৃঃ ৩৬৯
১৬৬। রবার্ট হার্ডগ্রেভ, 'দা মাপিলা বেবেলিয়ান ১৯২১ পেজান্ট বিভোল্ট ইন মালাবাব', মডার্ন এশিযান স্টাডিজ, ২য খণ্ড, ফেব্রুযাবি ১৯৭৭, পৃঃ ৭১
১৬৭। ডি. এন. ধনাগারে, পৃঃ উঃ, তৃতীয অধ্যায়; মাধবন নায়াব, মালাবাব কলপম্, (১৯৭১)
১৬৮। হোম পল, কিপ উইথ, ফাইল নং ২৭৭ অব ১৯২৩
১৬৯। সিক্রেট আই বি বিপোর্ট ১ ও ৫, আগস্ট ১৯২০, আই বি বুলেটিন ফব উইক এণ্ডিং ১০ সেপ্টেম্বব ১৯২১
১৭০। হোম পল, ফাইল নং ২৫ অব ১৯২৩
১৭১। মতিলাল নেহককে চিত্তবঞ্জন দাশ, ৫ মে ১৯২৩, এ আই সি সি মিস্ ফাইল নং ১ অব ১৯২৩
১৭২। হোম পল, ফর্টনাইটলি বিপোর্ট এফ ২৫/১৯২৩ বেঙ্গল, ফার্স্ট হাফ অব আগস্ট (১৯২৩)
১৭৩। এ আই সি সি ফাইল দ্রঃ, ১৭১ পাদটীকা
১৭৪। চেমস্ফোর্ডকে মন্টেগু, ১ এপ্রিল ১৯২০
১৭৫। বিস্তাবিত বিববণেব জন্য, হাসি ব্যানার্জি, পলিটিক্যাল অ্যাকটিভিটি অব দ্য লিবাবেল পার্টি ইন ইণ্ডিযা (কলকাতা, ১৯৮৭), ২য অধ্যায। বিডিং নিজে জজ ছিলেন বলে অন্তর্বীণ বা দেশান্তবীকবণ পছন্দ কবতেন না। মন্টেগুকে বিডিং, ১৮ অক্টোবব ১৯২১, বিডিং কলেকশন, পৃঃ উঃ
১৭৬। লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি ডিবেটস, ১৯২১, ২য খণ্ড পৃঃ ১২৮২-৮৬
১৭৬ক। প্রস্তাবিত ডেসপ্যাচ পাবলিক নং ৩, বিডিংকে পীল, ২৯ আগস্ট ১৯২২-এব অন্তর্ভুক্ত।
১৭৭। লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি ডিবেটস্, ১৯২৩, ৩য খণ্ড, দ্বিতীয অংশ, পৃঃ ৩৯৭৬, ৩৯৮৪-৮৫, ৪০০০
১৭৭ক। বিডিংকে পীল, ৩০ মার্চ, ৬ ও ২৬ এপ্রিল, ১৯২২, বিডিং কলেকশান (ইণ্ডিযা অফিস), পঞ্চম খণ্ড
১৭৮।

বৎসব	দশ লক্ষ টাকা হিসেবে মোট সবকাবী ব্যয	মোট আয
১৯০০-১	৯৫৮	৮১৭
১৯১৭-১৮	২,৮৪৫	১,৩৯৭
১৯২১-২২	২,১৩২	১,৫১৬

জাতীয আযেব শতকবা হিসাবে

(১) সবকাবী ব্যয	(২) চলতি আয	(৩) কব থেকে আয	(৪) অন্য সূত্রে আয
১০	৮	৬	৩
১৬	৮	৫	৩
৮	৬	৫	১

১২৬ সাবণী, ধর্মাকুমাব (সং), দ্য কেমব্রিজ ইকনমিক হিস্টবি অব ইণ্ডিযা, ২য ভাগ (লংম্যান), পৃঃ ৯২৬; আন্তর্জাতিক বাজাবে রূপোব দাম দাঁডিযেছিল আউন্স প্রতি ৩৫ পেন্স। অথচ টাকাব দাম ধার্য কবা হযেছিল ২ শিলিং। টাকাব স্টাবলিং মূল্য ১ শিলিং ৪ পেন্স কবা উচিত হলেও কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট হাব চাননি। পীল চান ব্যবসাবাণিজ্য ও মূল্যস্তব আবো স্বাভাবিক হলে বিনিময হাব পবিবর্তন কবতে। এ বিষযে গুডএনাফেব প্রতিবেদন দ্রঃ, বিডিংকে পীল, ২৯ আগস্ট ১৯২২-এব অন্তর্ভুক্ত।
১৭৯। বিডিংকে বোনাল্ডশে, ২২ জুলাই ১৯২১, মন্টেগুকে বিডিং-এব ২৮ জুলাই ১৯২২-এব অন্তর্ভুক্ত। বিডিং কলেকশন, পৃঃ উঃ
১৮০। রিডিংকে মন্টেগু, ১৫ আগস্ট ও ১৭ নভেম্বব ১৯২১, মন্টেগু পেপার্স, Mss Eur D523 (মাইক্রোফিল্ম), জাতীয় অভিলেখাগাব, নিউ দিল্লী
১৮১। বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি প্রোসিডিংস, ১৯২৩, ১১শ খণ্ড, নং ২, পৃঃ ১২৪-২৫, ২৭১-৭২
১৮২। অলিভিয়েব (ভারতসচিব)-কে বিডিং, ৫ জুন ১৯২৪, রিডিং কলেকশন, পৃঃ উঃ
১৮৩। পীলকে বিডিং, ৬ জুলাই, ১৯২২, তদেব
১৮৪। ঐ, ১৪ ডিসেম্বর ১৯২৩, তদেব

১৮৫। জনসন, গ্যালাহাব ও শীল (সং), লোক্যালিটি, প্রভিন্স অ্যাণ্ড নেশন, পৃঃ উঃ পৃঃ ২৭৫
১৮৬। হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট (১৮ ডিসেম্বব ১৯২৩ প্রকাশিত) এবং বিভিন্ন শর্তাবলীব জন্য ব্রুমফিল্ড্, পৃঃ উঃ, পৃঃ ২৪৬
১৮৭। হাসি ব্যানার্জি, পৃঃ উঃ, পৃঃ ১২২
১৮৮। বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল প্রোসিডিংস, ১৯২৪, ১৪শ খণ্ড, নং ৫
১৮৯। লর্ড লিটন, পাণ্ডিতস্ অ্যাণ্ড এলিফ্যান্টস্ (লণ্ডন, ১৯৪২), পৃঃ ৫২
১৯০। ব্রুমফিল্ড্, পৃঃ উঃ, পৃঃ ২৫৩, পাদটীকা ৪২
১৯১। লিটনকে ফজলুল হক, ২ সেপ্টেম্বর ১৯২৪
১৯২। রজত রায়, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৩১৯-২১
১৯২ক। হোম পল F 379 1924 and Pt II কিন্তু বিপ্লবীবা বলছেন এসব দলছুট গোষ্ঠীর। পুলিশ তাব নাম দিয়েছে নিউ ভায়োলেন্স পার্টি। অরুণ গুহ বলছেন, অনেক সময় পুলিশ এদেব প্ররোচনা দিচ্ছিল এবং দাশ কোন কথাই জানতেন না।
১৯৩। বার্কেনহেডকে লিটন, ৪ জুন ১৯২৫, হ্যালিফ্যাক্স পেপার্স, C 152/1 (I O), পৃঃ ৯-১৫। লিটন সংবক্ষিত ও হস্তান্তরিত সব ক্ষমতাই নিযে নিতে চান।
১৯৪। লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি ডিবেটস, ১৯২৪, ৪র্থ খণ্ড, পার্ট ১, পৃঃ ৩৪৯, ৩৫৮, ৩৬৭-৭০, ৭৬৯
১৯৫। ঐ, পার্ট ২, পৃঃ ১৪১৮-১৯
১৯৬। অলিভিয়েবকে রিডিং, ১৩ মার্চ ১৯২৪, বিডিং কল, পৃঃ উঃ
১৯৭। বার্কেনহেডকে বিডিং, ২৬ ফেব্রুযাবি ১৯২৫, বার্কেনহেড কলেকশন, Mss Eur D 703
১৯৮। ঐ, তদেব
১৯৯। ঐ, ১৯ মার্চ ১৯২৫, তদেব
২০০। হোম পল, এফ ২৫/১৯২৪, ফর্টনাইটলি বিপোর্ট, বম্বে, এপ্রিল, দ্বিতীয়ার্ধ
২০১। গান্ধী, সম্পূর্ণ বচনাবলী, ২৩শ খণ্ড, পৃঃ ৪১৩-১৬
২০১ক। মতিলাল নেহরুকে গান্ধী, ৩০ আগস্ট ১৯২৪, (ফোটোস্ট্যাট) গান্ধী স্মাবক নিধি (এস এন) ১০১৪০
২০২। হোম পল এফ ২৫/১৯২৪, ফর্টনাইটলি বিপোর্ট, বেঙ্গল, জুন ১৯২৪, প্রথমার্ধ
২০৩। ঐ, বম্বে, জুন ১৯২৪, দ্বিতীয়ার্ধ। গান্ধীব 'Defeated and humbled', সম্পূর্ণ বচনাবলী, ২৪শ খণ্ড, পৃঃ ৩৩৪
২০৪। বার্কেনহেডকে রিডিং, ২০ নভেম্বব ১৯২৪, বিডিং কল, পৃঃ উঃ
২০৫। বেলগাঁও কংগ্রেসে সভাপতিব ভাষণ, সম্পূর্ণ রচনাবলী, ২৫শ খণ্ড, পৃঃ ৪৭১-৮৯
২০৬। বার্কেনহেডকে বিডিং, ১ জানুয়াবি ১৯২৫, বার্কেনহেড কল, পৃঃ উঃ
২০৭। হোম পল এফ ২৫/১৯২৩, ফর্ট নাইটলি বিপোর্ট, ইউ পি, মার্চেব দ্বিতীযার্ধ ও নভেম্ববেব দ্বিতীযার্ধ
২০৮। বজতকান্ত বায, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৩৩০-৩১, স্ববাজ দলবিবোধী উৎসেব ওপব পুবো নির্ভব। হেমন্ত সবকাব বলেছেন, দাশ আবও কাউকে কাউকে এ পদ দেবাব প্রতিশ্রুতি দেন। দেশবন্ধু স্মৃতি, পৃঃ ৫০। মুসলিম কাউন্সিলবা বোসকেই সমর্থন জানান। যুগান্তর দল শাসমল-বিবোধী ছিল।
২০৯। মঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায, অপ্রকাশিত গবেষণাপত্র পৃঃ উঃ।
২১০। বিডিংকে লিটন, ১০ জুলাই ও ১২ আগস্ট ১৯২৫, বিডিং কল, পৃঃ উঃ বজতকান্ত বায গোযেন্দা মত পুবো সমর্থন কবে ঠিক কবেননি। তাঁব মতে ঠিকাদাবদেব কাছ থেকে টাকা নিযে দাশ যুগান্তব দলকে দিচ্ছিলেন। অরুণ গুহ আপত্তি জানিযেছেন। অরুণচন্দ্র গুহ, অরবিন্দ অ্যাণ্ড যুগান্তর, পৃঃ ৫৭-৫৮
২১১। হোম পল এফ ১১২/১৯২৫, ফর্ট নাইটলি বিপোর্ট, বেঙ্গল, জুন প্রথমার্ধ
২১২। এম আব জয়াকর, দ্য স্টোরি অব মাই লাইফ, পৃঃ উঃ, দ্বিতীয খণ্ড, পৃঃ ১৭৬
২১২ক। হোম পল F379/1924
২১২খ। লিটনকে বিডিং, তাব, P no 1044, 14 Nov 1924, এ আই সি সি ফাইল F 11/1924
২১৩ বার্কেনহেডকে লিটন, ৩০ জুলাই ১৯২৫, বার্কেনহেড কল, পৃঃ উঃ মতিলাল নেহরু দ্য হিন্দুস্থান টাইমস পত্রিকায় তাঁর ও দাশের যে চিঠি পত্র প্রকাশ করেন তাতে মনে হয় দাশেব দিক থেকে আবেদন আসেনি। মধ্যস্থতা করেন উভয় পক্ষের এক বন্ধু টি এইচ থর্ন (Thorn), মতিলাল নেহরু, সিলেক্টেড ওয়ার্কস, ৪ খণ্ড, পৃঃ ৩১৫।
২১৪। বার্কেনহেডকে লিটন, ২৮ নভেম্বব, ১৯২৪, তদেব
২১৫। ঐ, ১৫ এপ্রিল, ১৯২৫, তদেব
২১৬। লিটনকে বার্কেনহেড, ৮ এপ্রিল, ৩০ এপ্রিল ১৯২৫, তদেব
২১৭। বার্কেনহেডকে লিটন, ১৪ মে, ১৯২৫, তদেব
২১৮। ঐ, ২১ মে, ১৯২৫, তদেব, ফবিদপুবে বিপ্লবীবা 'ভাববাব কথা' বলে এক পুস্তিকায দেশবন্ধু ও মহাত্মা গান্ধী উভয়ের রাজনীতিব তীব্র সমালোচনা করেছিল। I B 1925, Bengal Provincial and other Conferences at Faridpur দাশ চেয়েছিলেন সুভাষ বসু, অনিলবরণ বায় ও সত্যেন মিত্রকে মুক্তি দিলেই হবে। বিপ্লবীরা চেয়েছিল সকলের মুক্তি। গান্ধী তখন এক আপোস মীমাংসা করে দেন, যাতে স্থির হয় ১৯২৪-এর অক্টোবরেব অধ্যাদেশ অনুযায়ী যাদের বন্দী করা হয় শুধু তাদের মুক্তি দিলেই চলবে।
২১৯। নেহরুকে দাশ ২৩ (?) জুন, ১৯২৫। জয়াকব, দ্য স্টোবি অব মাই লাইফ, পৃঃ উঃ ২য খণ্ড, পৃঃ ৫৪৩। দাশ ১৬

জুন মারা যান তাই তারিখটা সম্ভবত ১৩ হবে।
২২০। আই বি ১৯২৫, ফর্ট নাইটলি রিপোর্ট অন দ্য পলিটিক্যাল সিচুয়েশন ইন বেঙ্গল।
২২১। বার্কেনহেডকে লিটন, ২১ মে ১৯২৫, বার্কেনহেড কল, পূঃ উঃ
২২২। লিটনকে বার্কেনহেড, ১১ জুন ১৯২৫, তদেব
২২৩। বার্কেনহেডকে লিটন, ১৮ জুন ১৯২৫, তদেব
২২৪। বিড়লাকে গান্ধী, ১১ আগস্ট ১৯২৪, সম্পূর্ণ রচনাবলী, ২৪শ খণ্ড, পৃঃ ৫৫৯
২২৫। এইচ ডব্লু হেল:, টেররিজম ইন ইণ্ডিয়া ১৯১৭-৩৬ (গভর্নমেন্ট অব ইণ্ডিয়া, রিপ্রিন্ট ১৯৪৭) পৃঃ ১৬ ও পরবর্তী
২২৬। হোম পল, ফাইল নং ৩৭৯ অব ১৯২৪। ১৯২৫-এ অনুশীলন দলের এক বিদ্রোহী উপদল ও চট্টগ্রামের নেতা সূর্য সেন এক নতুন দল গঠন করেন যার নাম 'নিউ ভায়োলেন্স পার্টি'। তা ছাড়া 'বিজলী', 'শঙ্খ', 'প্রবর্তক' এমনকি দাশের 'নারায়ণ' পত্রিকায় বন্দীদের জীবনী, বন্দীজীবন, দুঃসাহসিক পলায়নের রোমাঞ্চকর বৃত্তান্ত বেরোতে থাকে। আলিপুর জেলে রায়বাহাদুর ভূপেন চ্যাটার্জীর হত্যা ও সে অপরাধে প্রমোদ চৌধুরী ও অনন্তহরি মিত্রের ফাঁসি আরও উত্তেজনা সৃষ্টি করে। যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, পূঃ উঃ পৃঃ ৫১০-১২।
২২৭। আই বি ১৯২৫, 'দ্য স্বরাজ্য পার্টি'; সুরাবর্দীকে না করায় মুসলিমরা ক্ষুব্ধ হয়। বার্কেনহেডকে লিটন, ৯ জুলাই ১৯২৫, বার্কেনহেড কল, পূঃ উঃ
২২৮। মতিলাল নেহরুকে জয়াকর, ১৫ অক্টোবর ১৯২৫, এ আই সি সি পেপার্স। জয়াকর ১৯২৪ সাল থেকেই responsive cooperation চাইছিলেন। মতিলালকে জয়াকর, ১৫ জানুয়ারি ১৯২৪, জয়াকর পেপার্স।
২২৯। বার্কেনহেডকে স্ট্যানলি জ্যাকসন, ২৫ এপ্রিল ১৯২৭, বার্কেনহেড কল, পূঃ উঃ
২৩০। হোম পল ফেব্রুয়ারি, ১১২/IV অব ১৯২৬
২৩০ক। 'পঞ্চপ্রধান' হলেন নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, নলিনীরঞ্জন সরকার, তুলসী গোস্বামী, শরৎচন্দ্র বসু ও বিধানচন্দ্র রায়।
২৩১। হোম পল ফাইল নং ৪/২১ অব ১৯৩২
২৩২। বার্কেনহেডকে আরুইন, ৫ এপ্রিল ১৯২৮ বার্কেনহেড কল, পূঃ উঃ
২৩২ক। ব্রুমফিল্ড পূঃ উঃ, পৃঃ ২৭৫-৮০
২৩৩। হোম পল ১১২/IV অব ১৯২৬
২৩৪। বার্কেনহেডকে আরুইন, ২৮ এপ্রিল ১৯২৬ বার্কেনহেড কল, পূঃ উঃ। ১৯২৬-এর কলকাতার দাঙ্গায় সুরাবর্দী (আবদার রহিমের জামাই) যে ভূমিকা নেন, আবার সেই ভূমিকা নেবেন ১৯৪৬-এর কলকাতার দাঙ্গায়। বাংলা সরকার, পুলিস পি ১১-৯ (১-৩), এ ২৬-২৮, মার্চ ১৯২৬ দ্রঃ
২৩৫। রিচার্ড গর্ডন, 'দ্য হিন্দু মহাসভা অ্যাণ্ড দ্য ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল কংগ্রেস ১৯২৫ টু ১৯২৬', মডার্ন এশিয়ান স্টাডিজ, নবম খণ্ড, এপ্রিল ১৯৭৫, পৃঃ ১৭২, মুশিরুল হাসান, পূঃ উঃ, সপ্তম অধ্যায়
২৩৬। মহম্মদ আলিকে বারি ৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৩, মহম্মদ আলি পেপার্স
২৩৭। ফরওয়ার্ড, ২৭ ডিসেম্বর ১৯২৭
২৩৭ক। গান্ধীর মতে 'বানাযেঙ্গে কাবামে বিষ্ণুকা মন্দির'-এ ধরনের কবিতা লেখা ঠিক হয়নি, কিন্তু যে বিপুল সংখ্যায় হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করা হয়েছে তার জন্য খিলাফতীরা দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। শৌকত আলিকে গান্ধী ২৩ ফেব্রুয়ারী ১৯২৫, স্মারকনিধি, ফোটোস্ট্যাট, ১০৫২৪
২৩৮। যোশী (সং), লাজপত রায়, রাইটিংস অ্যাণ্ড স্পীচেস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭২। হিন্দু-মুসলিম উভয় সাম্প্রদায়িকতাকে ধিক্কার দিয়েছেন মুজফ্‌ফর আহমদ, গণবাণী, ১ খণ্ড ৮ম সংখ্যা, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯২৬
২৩৯। কলকাতা দাঙ্গার বিবরণ আছে রিপোর্ট অব জে ই আর্মস্ট্রং, কমিশনার অব পুলিস, লিটন পেপার্স, Mss.Eur. F160 (46)
২৪০। হোম পল ফাইল নং ১১/XXV অব ১৯২৬, ঐ নং ১৮
২৪১। হোম পল ২০৯ অব ১৯২৬
২৪২। পার্থ চ্যাটার্জি, 'অ্যাগ্রেরিয়ান রিলেশনস অ্যাণ্ড কম্যুনালিজম ইন বেঙ্গল ১৯২৬-১৯৩৫', রণজিৎ গুহ (সং), সাব-অলটার্ন স্টাডিজ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯-৩৮।
২৪৩। বাংলা সরকার পল ডিপার্টমেন্ট, পল ব্রাঞ্চ, ১৯২৬, নং ৫১৬ (১-১৪)
২৪৪। ফজল-ই হোসেনকে গান্ধী, ২ মার্চ ১৯২৫ (মহাদেব দেশাই-এর ডায়েরী থেকে)
২৪৫। জওহরলাল নেহরুকে মহম্মদ আলি, ১৫ জুন ১৯২৪, জওহরলাল নেহরু, আ বাঞ্চ অব ওল্ড লেটার্স, পৃঃ ৩৭
২৪৬। গান্ধীকে মতিলাল ২৫ নভেম্বর ১৯২৫, স্মারকনিধি, ফোটোস্ট্যাট ১০৬৬৫
২৪৭। মতিলালকে জয়াকর, ২৬ নভেম্বর ১৯২৫, ঐ, ফোটোস্ট্যাট, ১০৬৬৭
২৪৮। বার্কেনহেডকে আরুইন, ২ সেপ্টেম্বর ১৯২৬, হ্যালিফ্যাক্স কল, পূঃ, উঃ, ২য় খণ্ড পৃঃ ৯৩
২৪৯। জওহরলালকে মতিলাল, ২ ডিসেম্বর ১৯২৬, মতিলাল নেহরু পেপার্স (নিউ দিল্লী), ফাইল নং N-4 লাজপত আবার হিন্দু মহাসভার নির্বাচনী ফ্রন্টরূপে ইণ্ডেপেণ্ডেন্ট কংগ্রেস পার্টি গড়েছিলেন।
২৫০। জওহরলাল নেহরু, অ্যান অটোবিওগ্রাফি (লণ্ডন, ১৯৩৬), পৃঃ ১৫৭-৫৮
২৫০ক। বিড়লাকে গান্ধী, ২৮ মার্চ ১৯২৬, গান্ধী, সম্পূর্ণ রচনাবলী ৩০ খণ্ড, পৃঃ ১৯৬

২৫১। আইনসভা বা পরিষদ স্বরাজীদের সংখ্যা

	১৯২৩	১৯২৬
কেন্দ্রীয় আইনসভা	৪৯	৩৯
বোম্বাই	৩১	১১
বাংলা	৫২	৪১
ইউ পি	২৬	২১
সি পি	৩৬	১৭
বিহার-ওড়িশা	৩৬	১১
পঞ্জাব	১২	২
মাদ্রাজ	২২	৪৬

বার্কেনহেডকে আরুইন, ৩০ ডিসেম্বর ১৯২৬, পৃঃ ১৭৪-৭৯

২৫২। বার্কেনহেডকে রিডিং, ১ ডিসেম্বর ১৯২৬, হ্যালিফ্যাক্স কল, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৬৩-৬৪

২৫৩। আরুইনকে বার্কেনহেড, ২৪ ফেব্রুয়ারী ১৯২৭, হ্যালিফ্যাক্স কল, ১ম খণ্ড

২৫৪। সি জে বেকার, দ্য পলিটিক্স অব সাউথ ইণ্ডিয়া (দিল্লী, ১৯৭৬), পৃঃ- ৬৮-৭৭; ডেভিড আরনল্ড, দ্য কংগ্রেস ইন তামিলনাড়ু ইত্যাদি, পৃঃ উঃ। মাদ্রাজের স্বরাজী নেতারা নির্দল মন্ত্রীদের ফেলতে চাননি, কারণ তা হলে জাস্টিস দল মন্ত্রিসভা গঠন করবে। জাস্টিস দলকে তামিল ব্রাহ্মণরা যমের মত ভয় করত। সত্যমূর্তি মন্ত্রিত্ব সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে বলেন।

২৫৪ক। গান্ধী, সম্পূর্ণ রচনাবলী, ৩০ খণ্ড, পৃঃ ৩৭১

২৫৫। 'হিন্দু মুসলিম ইউনিটি', ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১ ডিসেম্বর ১৯২৭

২৫৬। বার্কেনহেডকে আরুইন, ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৭, বার্কেনহেড পেপার্স, পৃঃ উঃ

২৫৭। জি অধিকারী (সং), ডক্যুমেন্টস অব দ্য হিস্টরি অব দ্য কম্যুনিস্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়া, প্রথম খণ্ড (১৯১৭-২২), মানবেন্দ্রনাথ রায়, মেময়ার্স, পৃঃ উঃ, স্যাব সেশিল কে, কম্যুনিজম ইন ইণ্ডিয়া (১৯২৫), স্যাব ডেভিড পেট্রি, কম্যুনিজম ইন ইণ্ডিয়া ১৯২৪-১৯২৭ (কলকাতা, ১৯২৭)

২৫৮। মুজফ্‌ফর আহমদ, কম্যুনিস্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়া ইয়ার্স অব ফর্মেশন (১৯২১-১৯৩৩), ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি ও আমার জীবন। ১৯২৩-এ পুলিশের কাছে মুজফ্‌ফর আহমদ বলেন যে, রায়ের দূত নলিনী গুপ্ত তাঁকে দীক্ষা দিয়েছিলেন, হোম পল ফাইল নং ২১/১ অব ১৯২৪; পরে আত্মজীবনীতে তিনি নলিনী গুপ্তকে পুলিশের চর বলে অভিযুক্ত করেন এবং তাঁর প্রভাবও অস্বীকার করেন।

২৫৯। ই এইচ কার, দ্য বলশেভিক রেভল্যুশন ১৯১৭-১৯২৩, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৫২-৫৭, পৃঃ ৪৮০, মানবেন্দ্রনাথ রায়, মেময়ার্স, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৩৭৮-৮২, লেনিন, Sochinenya (সম্পূর্ণ রচনাবলী) ২৫তম খণ্ড, পৃঃ ২৮৫-৯০, ডাঙ্গেকে লেখা রায়ের চিঠি (৭ সেপ্টেম্বর, ২ নভেম্বর, ১৯২২) ও সিঙ্গারভেলুকে লেখা রায়ের চিঠি (২ নভেম্বর ১৯২২) তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছে।

২৬০। জি অধিকারী (সং), ডক্যুমেন্টস ইত্যাদি, পৃঃ উঃ, দ্বিতীয় খণ্ড (দিল্লী, ১৯৭৫)

২৬১। সরোজ মুখোপাধ্যায়, ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি ও আমরা (কলকাতা ১৯৮৫) পৃঃ ৭-৯

২৬২। মুজফ্‌ফর আহমদকে রায়, ১৩ মে ১৯২৩ (কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা, একসিবিট নং ৩৫)

২৬৩। ১৯২৬-এ ফেব্রুয়ারিতে কৃষ্ণনগরে কৃষক সম্মেলন হয়। সেখানে লেবার-স্বরাজপার্টির নাম বদলে পেজান্টস অ্যাণ্ড ওয়ার্কার্স পার্টি রাখা হয়। পার্টি গঠনে ছিলেন আহমদ ছাড়া হেমন্তকুমার সরকার প্রমুখ। এই প্রসঙ্গে মুজফ্‌ফর আহমদ, নূতন দল, গণবাণী, ১ম খণ্ড ১০ম সংখ্যা (১৪ এপ্রিল ১৯২৬) পঠিতব্য। নির্বাচিত রচনা সংকলন, পৃঃ উঃ, পৃঃ ২৫। বোম্বাই ও অন্যত্র এ ধরনের দল গঠিত হয় ১৯২৭-এ। ১৯২৮-এ এদের নাম বদলে হয় ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজান্টস পার্টি। সরোজ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ উঃ, পৃঃ ১৪

২৬৪। এই পার্টির বিস্তার সম্পর্কে জি অধিকারী (সং) ডক্যুমেন্টস ইত্যাদি, পৃঃ উঃ, তৃতীয় খণ্ড সি আঃ ১৯২৮, পৃঃ ৭৩ ও পরবর্তী।

২৬৫। হোম পল ১৯২৭, ফাইল নং ৩২/১৯২৭ জানুয়ারি-ডিসেম্বর, ফর্টনাইটলি রিপোর্টস ফ্রম ম্যাড্রাস, বেঙ্গল, ইত্যাদি। বোম্বাই-এর ছোটলাট স্প্র্যাটকে পেনালকোডের ১২৪ ধারায় অভিযুক্ত করেন হেগকে মনটিথ, ১৬/১৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৭ নং S D 1065, ফর্টনাইটলি রিপোর্ট ফ্রম বোম্বে, সেপ্টেম্বরের উত্তরার্ধ

২৬৬। দ্বিতীয় আর্ল অব বার্কেনহেড, লাইফ অব এফ ই স্মিথ, ফার্স্ট আর্ল অব বার্কেনহেড (লণ্ডন, ১৯৬০), পৃঃ ৫১১-১২

২৬৭। আরুইনকে বার্কেনহেড, ২৩ মার্চ ১৯২৭

২৬৮। কমিশন গঠন ব্যাপারে আরুইনের মন্তব্য, ১০ মে ১৯২৭—বার্কেনহেডকে আরুইন, ১১ মে ১৯২৭-এর অন্তর্ভুক্ত। হ্যালিফ্যাক্স কলেকশন, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১০০-০৭। আরুইনকে হেইলির ২৩ এপ্রিলের চিঠি ও ম্যারিসের ২৫ এপ্রিলের চিঠি, ঐ, পৃঃ ১১৩-১৭

২৬৯। বার্কেনহেডকে আরুইন, ২৬ মে ১৯২৭, ঐ পৃঃ ১২০-২১, ২ ও ১৬ জুন ১৯২৭, ঐ পৃঃ ১২৮ ও ১৩৪

২৭০। আর্ল অব বার্কেনহেড, হ্যালিফাক্স, দ্য লাইফ অব লর্ড হ্যালিফ্যাক্স (লণ্ডন ১৯৬৬), পৃঃ ২৪৭
২৭১। দ্য হিন্দু, ৯ নভেম্বব ১৯২৭
২৭২। জিন্না-আরুইন সাক্ষাৎকারেব ওপর নোট (৩১ অক্টোবব ১৯২৭), Eur Mss. C 152/29
২৭৩। বার্কেনহেডকে আরুইন, ২২ ডিসেম্বর ১৯২৭, হ্যালিফ্যাক্স কল, পৃঃ উঃ
২৭৪। বার্কেনহেডকে আরুইন, ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৭, তদেব , এ আই সি সি ফাইল নং G-64/1926—28
২৭৫। আনসারিকে গান্ধী ২৫ ডিসেম্বর ১৯২৭, স্মারকনিধি, ফোটোস্ট্যাট, ১২৩৯১
২৭৫ক। মতিলালকে গান্ধী ৩ মার্চ ১৯২৮, মতিলাল নেহরু পেপার্স (নিউ দিল্লী) ফাইল নং G-1
২৭৬। লর্ডস সভায় বার্কেনহেডের বক্তৃতা ১২ নভেম্বব, ১৯২৭
২৭৭। কোটম্যানেব নোট, পীলকে আরুইন, ১৫ নভেম্বর ১৯২৮-এর চিঠিতে অন্তর্ভুক্ত।
২৭৮। জওহরলালকে গান্ধী, ৪ জানুয়ারি ১৯২৮, জওহরলাল নেহরু, আ বাঞ্চ অব ওল্ড লেটার্স, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৫৫-৫৬
২৭৯। গান্ধীকে জওহরলাল, ১১ জানুয়াবি ১৯২৮, স্মারকনিধি, ফোটোস্ট্যাট, ১৩০৩৯
২৮০। জওহবলালকে গান্ধী, ১৭ জানুয়ারি ১৯২৮, সম্পূর্ণ রচনাবলী, ৩২ খণ্ড, পৃঃ ৪৬৮-৬৯
২৮১। গান্ধীকে নেহরু, ২৩ জানুয়াবি, ১৯২৮
২৮২। নেহরুকে গান্ধী, ২৪ এপ্রিল, ১৯২৮
২৮৩। বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে জওহবলাল নেহরু, ৫ ডিসেম্বর ১৯২৮, সিলেক্টেড ওয়ার্কস অব জওহবলাল নেহরু, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১১৭-১৮
২৮৪। তদেব, পৃঃ ৫৪
২৮৪ক। এস গোপাল, দ্য ফর্মেটিভ ইডিওলজি অব জওহবলাল নেহরু, কে এম পানিককাব (সং) ন্যাশানাল অ্যাণ্ড লেফ্ট মুভমেন্টস ইন ইণ্ডিয়া (নি দি ১৯৮০), পৃ ১-১৩
২৮৫। জওহবলাল নেহরু, টুওয়ার্ডস ফ্রিডম, ইত্যাদি (নিউ ইয়র্ক), পৃঃ ৩২৩
২৮৫ক। অ্যানি বেশান্তকে মতিলাল, জওহবলাল নেহরু, আ বাঞ্চ অব ওল্ড লেটার্স, পৃঃ ৬৪
২৮৬। সৈয়দ মাহমুদকে জওহরলাল নেহরু ৩০ জুন, ১৯২৮, সিলেক্টেড ওয়ার্কস, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫০-৫১
২৮৬ক। আনসাবিকে শৌকৎ আলি, ৬ সেপ্টেম্বব ১৯২৮, এ আই সি সি পেপার্স (১০৫), গান্ধীকে শৌকৎ আলি ২৩ অক্টোবব ১৯২৮, গান্ধী, সম্পূর্ণ বচনাবলী, ৩৮ খণ্ড, অ্যাপেনডিক্স II, তা ছাড়া জামা মসজিদে শৌকতেব বক্তৃতা, ২৬ অক্টোবব ১৯২৮, হোম পল, ফাইল নং ১ অব ১৯২৮, ফর্টনাইটলি বিপোর্ট ফব সেকেণ্ড হাফ অব অক্টোবিব , মহম্মদ আলিব বক্তৃতা, অল ইণ্ডিয়া খিলাফত কনফাবেন্স, কলকাতা ২৫ ডিসেম্বব ১৯২৮
২৮৭। মতিলাল নেহরুকে লাজপত বায, তাবিখহীন, ১৯২৮, এ আই সি সি পেপার্স
২৮৮। সাইমনকে হেইলি, ২৮ আগস্ট ১৯২৮, হেইলি পেপার্স (13-B)
২৮৯। বার্কেনহেডকে আরুইন, ৮ মার্চ ১৯২৮ হ্যালিফ্যাক্স কল, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৬
২৯০। হোম পল, ফাইল নং ৩২/জানুযাবি-ডিসেম্বব ১৯২৭
২৯১। আসলে এগুলিব নাম ছিল নওজওয়ান ভাবত সভা। প্রধান সভ্য ছিলেন ভগৎ সিং, ভগবতীচরণ, যশপাল, সুখদেব, জযচন্দ্র বিদ্যালঙ্কাব ইত্যাদি।
২৯২। শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, বন্দীজীবন (দিল্লী, ১৯৬৩), মন্মথনাথ গুপ্ত, ভগৎ সিং হিজ টাইমস্ (দিল্লী, ১৯৭৭) অজয ঘোষ, প্রবন্ধ ও বক্তৃতা সংকলন (মস্কো, ১৯৬২), যশপাল, (হিন্দী ভাষায) সিংহাবলোকন (লখনউ ১৯৫১), প্রথম খণ্ড, যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায, ইন সার্চ অব ফ্রিডম (কলকাতা, ১৯৬৭); বামপ্রসাদ বিসমিল, অটোবায়োগ্রাফি (হিন্দী), বাবাণসী চতুর্বেদী (সং), (দিল্লী, ১৯৬৬); বিশ্বনাথ বৈশম্পায়ন, অমব শহীদ চন্দ্রশেখব আজাদ (বেনারস, ১৯৭৬); নওজওযানেব ওপব গোযেন্দা দফতব—হোম পল এফ ১৩০ এবং কিপ উইথ, ১৯৩০।
বিপান চন্দ্র তাঁব (ন্যাশনালিজম অ্যাণ্ড কলোনিযালিজম ইন ইণ্ডিযাব বঙ্গানুবাদ) আধুনিক ভাবত ঔপনিবেশিকতাবাদ ও জাতীয়তাবাদ (কলকাতা, ১৯৮৭) গ্রন্থেব "১৯২০ দশকে উত্তব ভাবতে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী আদর্শগত বিকাশ" অধ্যায়ে দেখিয়েছেন, এদেব অনেকে, বিশেষত ভগৎ সিং, মার্ক্সবাদেব দিকে বহুদূব অগ্রসব হযেছিলেন। পৃঃ ২১৫-২৪১
২৯৩। বার্কেনহেডকে আরুইন, ১৩ জুন ১৯২৮, হ্যালিফ্যাক্স কল, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১২৬, গোয়েন্দাবিভাগেব প্রধান ডেভিড পেট্রিব মন্তব্য, তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১৬৮-৭০, বাংলাব বেল, চটকল ধর্মঘট প্রসঙ্গে জি অধিকাবী (সং) ডকুমেন্টস ইত্যাদি, তৃতীয় খণ্ড, C ১৯২৮, পৃঃ ৩৩২-৩৬৬ ও হোম পল ফাইল নং ১৭ অব ১৯২৯, বোম্বাই-এব সূতীকল ধর্মঘট প্রসঙ্গে, তদেব, পৃঃ ৩০১ ও পববর্তী
২৯৪। বার্কেনহেডকে আরুইন, ১৭ মে ১৯২৮, হ্যালিফ্যাক্স কল, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ১০৫, হোম পল ফাইল নং ১৮/IV ১৯২৮, মীবাট মামলায ডাঙ্গে স্বীকাব কবেছিলেন বাইবে থেকে কিছু টাকা ত্রাণবাবদ আসে কিন্তু তাব অধিকাংশ যায যোশীব হাতে। জি অধিকাবী, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৩১৪-১৫
২৯৫। দ্বিজেন্দ্র ত্রিপাঠী, 'দ্য কংগ্রেস অ্যাণ্ড দ্য ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কোয়েশ্চেন', এ সেন্টিনাবী হিস্টরি অব দা ইণ্ডিযান ন্যাশনাল কংগ্রেস, ২য খণ্ড, পৃঃ ৫০৮
২৯৬। বার্কেনহেডকে আরুইন, ১৯ জুলাই ১৯২৮, হ্যালিফ্যাক্স কল, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৬৩
২৯৭। ডেভিড হার্ডিম্যান, পেজ্যান্ট ন্যাশানালিস্টস্ অব গুজবাট, খেডা ডিস্ট্রিক্ট, ১৯১৭-১৯৩৪ (১৯৮১), অষ্টম

অধ্যায় । গান্ধী, সম্পূর্ণ রচনাবলী, ৩৭ খণ্ড, পৃঃ ৯৯-১০৬, ১১৩, ১৩১-৩২, ১৭৯-৮০, অ্যাপেনডিক্স I এবং II ; নরহরি পারেখ, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, ১ম খণ্ড, ২৬ অধ্যায়
২৯৮ । গান্ধী, সম্পূর্ণ রচনাবলী, ৩৮শ খণ্ড, পৃঃ ২৬৭-৭৩
২৯৯ । তদেব, পৃঃ ২৮৩-৩১৪
৩০০ । জওহরলাল নেহরু, সিলেক্টেড ওয়ার্কস, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৮৮
৩০১ । তদেব, সেকসন ৩ , গোপাল, জওহরলাল নেহরু · আ বায়োগ্রাফি, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১২২ ও পরবর্তী
৩০২ । গান্ধী, ইয়ং ইণ্ডিয়া, সেপ্টেম্বব, ১৯২৯, জওহরলাল নেহরু, সিলেক্টেড ওয়ার্কস, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ১৫৬-৬১
৩০৩ । আরুইনকে ভি জে প্যাটেল, ১১ জানুয়াবি ১৯২৯
৩০৪ । পীলকে বার্কেনহেড, জানুয়ারি ১৯২৯
৩০৫ । কে এম মুন্সী, পিলগ্রিমেজ টু ফ্রিডম (বোম্বে ১৯৬৭), পৃঃ ২৪
৩০৬ । জে আহমদ, মিডল ফেজ অব দ্য মুসলিম পলিটিক্যাল মুভমেন্ট (লাহোর, ১৯৬৯), পৃঃ ৯৪-৯৫
৩০৭ । হেক্টর বলিথো, জিন্না ক্রিয়েটার অব পাকিস্তান (কনেকটিকাট), পৃঃ ৯৪-৯৫
৩০৮ । চৌধুবী খলিকুজ্জমান, পাথওয়ে টু পাকিস্তান (লাহোব, ১৯৬১), পৃঃ ৯৮
৩০৯ । ডেভিড পেজ, পৃঃ ২১-২২
৩১০ । বি ক্রেগহর্ন, 'রিলিজন অ্যাণ্ড পলিটিক্স দ্য লিডারশিপ অব দ্য অল ইণ্ডিয়া হিন্দু মহাসভা ইন পঞ্জাব অ্যাণ্ড মহারাষ্ট্র (১৯২০-১৯৩০),' বি এন পাণ্ডে (সং), লিডাবশিপ ইন সাউথ এশিয়া (দিল্লী, ১৯৭৭), পৃঃ ৪০০-৪১৯
৩১১ । আরুইনকে হেইলি, ১৬ অক্টোবব ১৯২৮, হেইলি পেপার্স, ১৪-A
৩১২ । মুডিম্যানকে হেইলি, জানুয়াবি ১৯২।, তদেব, ১০-A
৩১২ক । জি এ আল্লানা, কায়েদ-ই-আজম জিন্না (লাহোব, ১৯৬৭), পৃঃ ২১৩
৩১৩ । গান্ধীকে জযাকব, ২৩ আগস্ট ১৯২৯, জযাকব পেপার্স, ফাইল নং ৪০৭, VI, পৃঃ ১৪৯-৫১
৩১৩ক । অল ইণ্ডিযা মুসলিম কনফাবেন্স আ ডক্যুমেন্টবি বেকর্ড (কবাচী, ১৯৭২)
৩১৪ । প্রাদেশিক সরকাবকে হোম সেক্রেটাবি, ২১ ফেব্রুয়াবি ১৯২৯, হোম পল এফ ১৬৮ অব ১৯২৯
৩১৫ । পীলকে আরুইন, ৪ এপ্রিল ১৯২৯, হ্যালিফ্যাক্স কল, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৭৯
৩১৬ । জওহবলাল নেহরু, সিলেক্টেড ওয়ার্কস, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৭২-৭৯। ১৯২৮-২৯-এ সবসুদ্ধ ২০৩টি ধর্মঘট ও লক আউটেব ফলে অন্নাধিক ৫ লক্ষ শ্রমিক জড়িত ছিল
৩১৭ । পেট্রিব মন্তব্য, হোম পল, ফাইল নং ২৫৭/১ অব ১৯৩০
৩১৭ক । ঠাকুবদাসকে বিড়লা, ১৬ জুলাই ১৯২৯, ঠাকুবদাস পেপার্স এফ এন ৪২
৩১৮ । কার্ল ব্রিজ, হোলডিং ইণ্ডিযা টু দ্য এম্পাযাব (দিল্লী ১৯৮৬) পৃঃ ৩১ ও পববর্তী
৩১৯ । স্নোডেনকে বলডুইন, ২৮ অক্টোবব ১৯২৯, বলডুইন পেপার্স ১০৩, এক এফ ১২৪-২৭ এবং ওয়েজউডবেন (ভারত সচিব)-কে আরুইন ৩১ অক্টোবব, ১৯২৯, হ্যালিফ্যাক্স কল, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১৫১-৫২
৩২০ । ঐ, ২৬ নভেম্বব ১৯২৯, তদেব, পৃঃ ১৭২
৩২১ । আরুইনকে ওয়েজউডবেন, ১৯ নভেম্বব, ১৯২৯-এব অন্তর্ভুক্ত চিঠিপত্র , পার্লামেন্টাবি ডিবেটস, হাউস অব লর্ডস, ৫ নভেম্বব ১৯২৯, ৭৫ খণ্ড, পৃঃ ৩৭২-৮৮, ৪০৩-০৭ , লর্ড টেম্পলউড (স্যাব স্যামুয়েল হোব), নাইন ট্রাবলড ইয়ার্স, পৃঃ ৪৫ ও পববর্তী , স্যাব জন সাইমন, বেট্রসপেক্ট, পৃঃ ১৫২-৫৩ , আরুইনকে সাপ্রু, ২৫ নভেম্বব ১৯২৯ ও ওয়াহিদ আহমদ (সং), জিন্না-আরুইন করেসপণ্ডেন্স ১৯২৭-৩০, পৃঃ ২৯-৩০ দ্রষ্টব্য
৩২২ । পুরুষোত্তম দাস ঠাকুবকে ঘনশ্যামদাস বিড়লা, ৩ নভেম্বব ১৯২৯, ঠাকুবদাস পেপার্স , জওহবলালকে মতিলাল, ৭ নভেম্বব ১৯২৯, জওহবলাল নেহরু পেপার্স, ১ XXII
৩২৩ । জওহরলালকে গান্ধী, ৬ নভেম্বব ১৯২৯ , টেলিগ্রাম, ১৮ নভেম্বব ১৯২৯, গান্ধী, সম্পূর্ণ বচনাবলী, ৪২তম খণ্ড, পৃঃ ১০১ ও ১৮১
৩২৪ । শ্রীনিবাস আযেঙ্গাবকে জওহবলাল নেহরু, ২০ নভেম্বব ১৯২৯, এ আই সি সি ফাইল G 117 অব ১৯২৯
৩২৫ । বড়লাট ও গান্ধীর কথোপকথনের মিনিট, ২৩ ডিসেম্বব ১৯২৯, সাপ্রুকে আরুইন, ২৭ ডিসেম্বর ১৯২৯-এব অন্তর্ভুক্ত, সাপ্রু পেপার্স, পৃঃ উঃ, ১১৯
৩২৬ । এম এন গুপ্ত, হিস্টবি অব দ্য বেভল্যুশনাবী মুভমেন্ট ইন ইণ্ডিয়া, পৃঃ ২৬৮ ও পববর্তী
৩২৭ । ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৯ই জানুয়াবি ১৯৩০
৩২৮ । ১৯২৯-এর ২৩ নভেম্বর, যশপাল বড়লাটেব ট্রেন ওড়াবার চেষ্টা কবেন কিন্তু কোনক্রমে তিনি বেঁচে যান কিন্তু এ কাজেব নিন্দাসূচক প্রস্তাব মাত্র ৮১ ভোটে জেতে, তাও গান্ধী কংগ্রেস ছেড়ে দেবেন হুমকি দেবাব পর । এই ভোট লাহোব কংগ্রেসের মনোভাব সুন্দব ভাবে ফুটিয়েছে
৩২৯ । এগার দফার দাবির জন্য গান্ধী, সম্পূর্ণ রচনাবলী, ৩৩ খণ্ড, পৃঃ ৪৫
৩৩০ । ওয়েজউডবেনকে আরুইন, ১০ ফেব্রুয়াবি ১৯৩০, হ্যালিফ্যাক্স কল, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৬
৩৩১ । ফোরওয়ার্ড, টেণ্ডুলকার, মহাত্মা, ১ম খণ্ড, (বোম্বে, ১৯৫১)
৩৩২ । ম্যাক আলপিন, কেমব্রিজ হিস্টরি অব ইণ্ডিয়া (২য় খণ্ড), পৃঃ উঃ, ১১ ১৪ নং রেখাচিত্র, পৃঃ ৮৯৮ , অ্যাপেনডিক্স

টেবল ১১A-১ পৃঃ ১০৩-৪

৩৩৩। ওয়েজউডবেন কে আরুইন, ২ আগস্ট ১৯৩০, হ্যালিফ্যাক্স কল,

৩৩৪। তনিকা সরকার, বেঙ্গল ১৯২৮-১৯৩৪ দ্য পলিটিক্স অব প্রোটেস্ট (অক্সফোর্ড, ১৯৮৭), পৃঃ ৮

৩৩৫। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা বয়েছে সুগত বসু, অ্যাগ্রেবিয়ান বেঙ্গল ইকনমি, সোস্যাল স্ট্রাকচাব অ্যাণ্ড পলিটিক্স্ ১৯১৯-১৯৪৭ (ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৯৮৬), পঞ্চম অধ্যায়। তিনি বি বি চৌধুবীব 'depeasantısation' মতবাদ সমালোচনা করেছেন।

৩৩৬। 'অ্যাগ্রিকালচারাল প্রাইসেস ইন দ্য য়ুনাইটেড প্রভিন্সেস', হেইলি কল ২৯ B

৩৩৭। ক্রেরারকে হেইলি ২৪ জুলাই ১৯৩১, হেইলি পেপার্স

৩৩৮। হোম পল, ১৯৩০, ফাইল নং ২৫৭/III, বোম্বে ফর্টনাইটলি বিপোর্ট, জুলাই ১৯৩০, হোম পল ১৯৩০, ফাইল নং ১৮/VIII.

৩৩৯। গ্যালাহার, কংগ্রেস ইন ডিক্লাইন, বেঙ্গল ১৯৩০ টু ১৯৩৯, জনসন, গ্যালাহার ও শীল (সং), লোকালিটি, প্রভিন্স অ্যাণ্ড নেশন, পৃঃ উঃ

৩৪০। আরুইনকে হেইলি, ২৫ জুন ১৯৩০

৩৪১। নোট বাই স্যার ডেভিড পেট্রি, ডি আই বি অন কংগ্রেস ফাণ্ডস, ২৬ মে, ১৯৩০, হোম পল ১৯৩১ ফাইল নং ৫/৪০। বিড়লা কিন্তু আইন অমান্য খাতে টাকা দেওয়া অস্বীকার করেছেন।

৩৪২। বিড়লা যে মিটমাট চাইতেন তাব প্রমাণ ঠাকুরদাসকে বিড়লা, ১৬ জানুয়ারি ১৯৩১, ঠাকুরদাস পেপার্স ফাইল নং ৪২/VIII। তাঁর মুখপাত্র ডি পি খৈতানও সোচ্চাব ছিলেন।

৩৪৩। ঠাকুরদাসকে সাবাভাই, ১৭ নভেম্বর ১৯৩০, ঠাকুবদাসেব উত্তব, ঐ, ফাইল নং ৪২/II

৩৪৪। আরুইনকে স্ট্যানলি জ্যাকসন, ৩০ জুন ১৯৩০, Mss Eur C 152 (24)

৩৪৫। হোম পল ১৯৩১, ফাইল নং ২৩-২৬। অন্য মত এ আই সি সি পেপার্স, ১৯৩১, ফাইল নং G-1

৩৪৬। ওয়েব মিলার, আই ফাউণ্ড নো পিস, পৃঃ ১৯২-৯৬

৩৪৭। ভাবত সচিবকে আরুইন, ২৪ মে ১৯৩০, হ্যালিফ্যাক্স কল পৃঃ উঃ

৩৪৮। বোম্বে হোম পল ৭/২০, ১৯৩৪ A. কমিন্টার্নেব ষষ্ঠ কংগ্রেস সকলকে নিয়ে সাম্রাজ্যবিরোধী ফ্রণ্ট গঠনেব বিরোধিতা করেছিল। জি অধিকারী (সং) ডকুমেন্টস ইত্যাদি, থিসেস অব দ্য অ্যাজিটপ্রপ অব দ্য ECCI দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৬০৬-৭১। প্রথম নিখিল ভাবত ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজান্টস কনফাবেন্স (ডিসেম্বব ১৯২৮) বিপোর্ট, ঐ পৃঃ ৭৪০-৭৫৭। কম্যুনিস্ট ইনটারন্যাশনালেব বক্তব্য, বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী ও পেটি বুর্জোয়া বৃহৎ ভূমি-মালিকদেব ব্যবস্থাব সঙ্গে যুক্ত, তাঁবা কৃষি বিপ্লবের বিবোধিতা কববেই। গির্নি কামগব পবিচালিত ধর্মঘটেব বড ত্রুটি ছিল নির্মমভাবে শোধনবাদী যোশীদেব মুখোশ খুলে না দেওয়া। সুভাষ বসু জামসেদপুব ধর্মঘটে বিশ্বাসঘাতকতা কবেছেন। ঐ, পৃঃ ৭৫৭-৬৫। নেহরুকে লীগ এগেইনস্ট ইম্পিবিয়ালিজম থেকে বহিষ্কৃত কবা হয়।

৩৪৯। আরুইনকে স্টানলি জ্যাকসন, ১২ ও ১৩ ফেব্রু হ্যালিফ্যাক্স কল পৃঃ উঃ

৩৪৯ক। সরলাবালা সরকার, হারানো অতীত, রচনা সংগ্রহ, ১ম খণ্ড (১৯৯০)

৩৫০। রিপোর্ট অন দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অব বেঙ্গল, ১৯২৮-২৯ (কলকাতা ১৯৩০)। এ বিষয়ে ভিন্ন মত দেখি পবেব বছরের রিপোর্টে। বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সেব সভাপতি লেয়ার্ড সাহেব বীতিমত চিন্তিত হন।

৩৫১। হিতেশরঞ্জন সান্যাল, অন্য অর্থ, সেপ্টেম্বব-অক্টোবব ও অক্টোবব-নভেম্বব, ১৯৭৪

৩৫২। আবুল মনসুর আহমদ, আমাব দেখা বাজনীতিব পঞ্চাশ বছব (২য সং, ঢাকা, ১৯৭০)

৩৫৩। তনিকা সরকাব, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৪৭ ও পববর্তী

৩৫৪। এ আই· সি সি পেপার্স G৮৬/১৯৩০, ল' অ্যাণ্ড অর্ডার ইন মিডনাপুব—বিপোর্ট অব দ্য নন অফিসিয়াল এনকোয়ারি কমিটি (কলকাতা, ১৯৩০)

৩৫৫। রিপোর্ট অন দ্য অ্যাডমিনস্ট্রেশন অব বেঙ্গল ১৯২৯-৩০, পৃঃ ১২, ফর্টনাইটলি বিপোর্টস, সেকেণ্ড হাফ অব জুন, ১৯৩০, হোম পল ১৮/VII/১৯৩০

৩৫৬। গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া, হোম পল ৪৮১/১৯৩০

৩৫৭। পেডিব পত্র, ১২ জুন, ১৯৩০, গভমেন্ট অব বেঙ্গল, হোম পল ২৪৮/৩০ অব ১৯৩০

৩৫৭ক। আরুইনকে স্টিফেনসন, ২৫ জুন ১৯৩০, Mss Eur C 152(24)

৩৫৭খ। আইন অমান্য বিষয়ে এ আই সি সি-র কাছে প্রতিবেদন, ৬ নভেম্বর, ১৯৩০ এ আই সি সি পেপার্স, ১৯৩০, ফাইল নং G-86; Law and order ın Midnapur 1930, Reports of the Non-offıcıal Enquıry Commıttee (Cal)

৩৫৮। নোট অন কংগ্রেস বয়কট প্রোগ্রাম বাই ডি আই বি ১৬ ফেব্রু ১৯৩১ হোম পল, ১৯৩১ ফাইল নং ৩৫/XI

৩৫৯। আর· এস· বাজপাই-এর নোট, বেনকে আরুইন, ১৪ মে ১৯৩০ এব অন্তর্ভুক্ত।

৩৬০। ডি খৈতানকে ঠাকুরদাস, ৮ অক্টোবর ১৯৩০, ঠাকুরদাস পেপার্স, পৃঃ উঃ

৩৬১। আরুইনকে বেন, ২২ আগস্ট ১৯৩০-এর অন্তর্ভুক্ত। Eur C 152(6) পৃঃ ১৮৮-৯২

৩৬২। আরুইনকে বাটলার, ৩০ জুলাই ১৯৩০, Mss Eur C 152 (25)

৩৬৩। বিহার ও ওড়িশা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট, পৃঃ XVI, XIX-XXI. ১১, ৯২।

৩৬৪। জি ম্যাকডেনাল্ড, য়ুনিটি অন ট্রায়াল , কংগ্রেস ইন বিহার, ১৯২৯-৩৯, ডি এ লো (সং), কংগ্রেস অ্যাণ্ড দ্য রাজ (১৯৭৭)। পৃঃ ২৯৬

৩৬৫। বেনকে আরুইনকে, ১৩ মার্চ, ১৪ মে ও ১২ জুন, ১৯৩০, Mss Eur C 152 (6)

৩৬৫ ক। ডেভিড আরনল্ড, দ্য পলিটিকস অব কোয়ালেসেন্স দ্য কংগ্রেস ইন তামিলনাড ১৯৩০-৩৭, ডেভিড লো, পৃঃ উঃ, পৃঃ ২৬৬

৩৬৬। ব্রিয়াঁ স্টডার্ট, দ্য স্ট্রাকচার অব কংগ্রেস পলিটিকস ইন কোস্টাল অন্ধ্র, ১৯২৫-৩৭, ডি এ লো (সং), পৃঃ উঃ, পৃঃ ১১১ ও পরবর্তী

৩৬৭। আরুইনকে জর্জ স্ট্যানলি, ২৯ জুন ১৯৩০, হ্যালিফ্যাক্স পেপার্স, পৃঃ উঃ

৩৬৮। ই· এম এস· নাম্বুদ্রিপাদ, রেমিনিসেন্সেস অব অ্যান ইণ্ডিয়ান কম্যুনিস্ট (দিল্লী ১৯৮৭) পৃঃ ৪১-৪২

৩৬৯। হোম পল ১৯৩০, ফাইল নং ২১৪ , বোম্বে ফর্টনাইটলি রিপোর্টস অক্টোবরের দ্বিতীয়ার্ধ ; হোম পল ১৯৩০, ফাইল নং ১৮/XI, ঐ নভেম্বর-এর প্রথমার্ধে, ফাইল নং ১৮/XII

৩৭০। আরুইনকে সাইকস, ২০ জুন ১৯৩০ Mss Eur F 150 (2)

৩৭১। ঐ ৪ জুলাই ১৯৩০ Mss.Eur.C 152 (25)

৩৭২। জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে, দ্য অ্যাসেনডেন্সি অব দ্য কংগ্রেস ইন উত্তর প্রদেশ ১৯২৬-৩৪ ইত্যাদি (দিল্লী, ১৯৭৮), চতুর্থ ও ষষ্ঠ অধ্যায় ; 'এ রুরাল বেস ফর কংগ্রেস দ্য য়ুনাইটেড প্রভিন্সেস ১৯২০-৪০,' ডেভিড লো (সং), পৃঃ উঃ, পৃঃ ১৯৯ ও পরবর্তী

৩৭৩। রিপোর্ট অন প্রেজেন্ট ইকনমিক সিচুয়েশন ইন দ্য য়ুনাইটেড প্রভিন্সেস, হেইলি পেপার্স, ২৯ C

৩৭৪। এমার্সনকে গান্ধী, ২৩ মার্চ ১৯৩১, গান্ধী, সম্পূর্ণ রচনাবলী, ৪৫ খণ্ড, পৃঃ ৩৩৪-৩৫

৩৭৫। ২২ জুলাই, ১৯৩০. জয়াকর পেপার্স, করেসপন্ডেন্স ফাইল নং ৭৭১ কাঁচা মালের দাম কমা সত্ত্বেও শিল্পায়নে পুঁজি বিনিয়োগ মন্দীভূত হয়েছিল। ১৯২৯-৩৩ গড় যন্ত্র আমদানী ৬ কোটি টাকার মত, অথচ তার আগের ও পরের চার বছরের গড় আমদানী যথাক্রমে ৬২ কোটি ও ৬ কোটি টাকা।

৩৭৬। মতিলালের গৃহীত ২৫ জুনের প্রস্তাব, ঐ

৩৭৭। মতিলালকে গান্ধী, ২৬ জুলাই ১৯৩০ নেহরুদের জন্য নোট, Mss Eur C 152 (25)

৩৭৮। গান্ধীকে জওহরলাল ২৮ জুলাই ১৯৩০, ঐ নেহরুর ডায়েরি, ১ আগস্ট ১৯৩০

৩৭৯। সাপ্রুকে জয়াকর, ৪ আগস্ট ১৯৩০ জয়াকর পেপার্স, কর ফাইল নং ৭৭০

৩৮০। সাপ্রু ও জয়াকরকে বন্দী সাত নেতা, ১৫ আগস্ট ১৯৩০, Mss Eur C 152(25)

৩৮১। Mss.Eur.C. 235/1(10) পৃঃ ২০০। অন্যান্য বর্ণনা হেল, পৃঃ উঃ ২৭-৩১ , হোম পল, ফাইল নং ১৮/V অব ১৯৩০, ফর্ট নাইটলিরিপোর্ট ফর বেঙ্গল, সেকেন্ড হাফ অব এপ্রিল। স্বয়ং বড়লাট লিখছেন " it is the first time for many years that Indians have carried out successfully a coup of this magnitude " বেনকে আরুইন ২৪ এপ্রিল ১৯৩০ C 152(6) পৃঃ ৯৬।

৩৮১ ক। অনন্ত সিং-এর 'অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম'-এর বহু কথা সংশয় জাগায়। তিনি এই অভ্যুত্থান (হেলের ভাষায় "amazing coup")-এর সংগঠন নিশ্চিদ্র ছিল বলে দাবি করেছেন, কিন্তু পরিকল্পনার মধ্যে বহু ত্রুটি ছিল। তিনটির কথা বলছি—ইংরেজরা যেখানে কামানবন্দুক রাখত সেখানে গুলিগোলা রাখত না, এটা সন্ত্রাসবাদীরা জানতেন না। দ্বিতীয়ত, রেলপথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হলেও চট্টগ্রাম বন্দরের জাহাজ থেকে বেতারে খবর পাঠানো যেতে পারে তাঁদের মাথায় আসেনি। তৃতীয়ত, পূর্বাহ্ণে রসদের ব্যবস্থা না করে জালালাবাদে মরণপণ প্রতিরোধ দানের চিন্তা করাই উচিত হয়নি। তা ছাড়া উলটো দিকের উচ্চতর টিলা থেকে ইংরেজদের আক্রমণ করতে দেওয়া কিরকম রণকৌশল বুঝি না। যেন মারার চেয়ে মরাটাই ছিল বড়। মাতৃভূমির জন্য এই আত্মদানের তুলনা নেই, তবু পরিকল্পনার অভাব পীড়াদায়ক।

৩৮২। হোম পল : ১৮—VIII ৩০ অব ১৯৩০, ফর্টনাইটলি রিপোর্টস অন বেঙ্গল, ডিসেম্বরের দ্বিতীয়ার্ধ ১৯৩০।

৩৮৩। হেমচন্দ্র ঘোষের স্মৃতিচারণ, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, ইণ্ডিয়া রেসেস্ট্স ফ্রীডম (সংসদ, ১৯৮৩)

৩৮৪। সুমিত সরকার, দ্য লজিক অব গান্ধীয়ান ন্যাশানালিজম্, ইত্যাদি, আই· এইচ আর, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম সংখ্যা (জুলাই ১৯৭৬), পৃঃ ১২৮ ও পরবর্তী

৩৮৫। বেনকে আরুইন, ৯ জানুয়ারি, ১৯৩১ Mss.Eur. C 125/6 পৃঃ ৩৭২

৩৮৬। নোট ফর আরুইন বাই ভোর, ৩১ জানুয়ারি ১৯৩১, Mss.Eur. C 125/26

৩৮৬ক। গান্ধী, সম্পূর্ণ রচনাবলী, ৪২ খণ্ড, পৃঃ ৪৩৫, ৪৩ খণ্ড, পৃঃ X

৩৮৭। আরুইনকে গান্ধী, ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩১ Mss Eur D 670

৩৮৮। বেনকে আরুইন, ২ মার্চ ১৯৩১, C125/6, পৃঃ ৩৯৪ ও বিভিন্ন অন্তর্ভুক্ত কাগজপত্র

৩৮৯। জেল ডায়েরি, ৪ মার্চ ১৯৩২, গোপাল থেকে উদ্ধৃত।

৩৮৯ক। G. of I., Home Dept. Political, 5 March 1931, S. 481/31

৩৯০। বেনকে আরুইন, ৯ মার্চ ১৯৩১, Mss.Eur. C 125/6, পৃঃ ৪১৬

৩৯১। ইয়াং ইণ্ডিয়া, ১৯ ও ২৬ মার্চ ১৯৩১। গান্ধী, সম্পূর্ণ রচনাবলী, ৪৫ খণ্ড পৃঃ ২৫০-৬, ৩০০

৩৯২। জওহরলাল নেহরু, সিলেক্টেড ওয়ার্কস পূঃ উঃ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৮১-৮২

৩৯৩। সুভাষচন্দ্র বসু, দ্য ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল ১৯২০-৪২, পৃঃ ২০৯

৩৯৪। হোরকে উইলিংডন, ২৮ আগস্ট ১৯৩১, Mss.Eur E 240, পঞ্চম খণ্ড, লেটার্স

৩৯৫। ডেভিড হার্ডিম্যান, দ্য ক্রাইসিস অব দ্য লেসার পটিদাবস্, ডেভিড লো (সং), কংগ্রেস অ্যাণ্ড দ্য রাজ, পূঃ উঃ, পৃঃ ৬২-৬৩

৩৯৬। গান্ধী-এমার্সন সাক্ষাৎকার বিষয়ে এমার্সনের মন্তব্য, হোম পল ৩৩/IX অব ১৯৩১ , হেইলিব মন্তব্য, ঐ ৩৩/XI অব ১৯৩১

৩৯৭। গান্ধী, সম্পূর্ণ রচনাবলী, ৪৫ খণ্ড, পৃঃ ৪৩৮-৪৬

৩৯৮। হোম পল ফাইল নং ১০/৪ অব ১৯৩০ , তনিকা সরকার, পূঃ উঃ, পৃঃ ১০৪-১৪, অমৃতবাজার পত্রিকা (৩ জুন ১৯৩০)-তে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল হিন্দু সভার সচিব যে বিবৃতি দেন তাতে হিন্দুদের ক্ষতির পরিমাণ ঢের বেশি বুঝতে অসুবিধে হয় না। কিশোরগঞ্জের দাঙ্গার লক্ষ্য ছিল হিন্দু মহাজন। তবে লুটপাট, গৃহদাহ, হত্যা অনুষ্ঠিত হয়। স্টেটসম্যান, ১৬ জুলাই ১৯৩০। মডার্ন রিভ্যু, জুলাই ১৯৩০-ও দ্রষ্টব্য। উল্লিখিত গোয়েন্দা ফাইলে হিন্দু মহাসভার প্রভাব বাড়ছে বলা হয়েছে।

৩৯৮ক। সুভাষচন্দ্র বসু, দ্য ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল, পূঃ উঃ, পৃঃ ২০৭-৮।

৩৯৯। হেইথকক্‌স, কম্যুনিজম্ অ্যাণ্ড ন্যাশানালিজম্ ইন ইণ্ডিয়া (প্রিন্সটন, ১৯৭১), পৃঃ ১৯০-৯১

৪০০। জয়াকরকে সাপ্রু, ৩ এপ্রিল ১৯৩১ সাপ্রু পেপার্স, সিবিজ-২

৪০১। বেনকে আরউইন, ২ এপ্রিল ১৯৩১ Mss.Eur C 125/6

৪০২। মুঞ্জের ডায়েরি, ১৭ মে ১৯৩১

৪০৩। আরউইনকে বেন, ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩১ Mss.Eur.C 125/6, পৃঃ ৩৪৭

তৃতীয় পর্ব

॥ ১ ॥

প্রথম গোলটেবিল বৈঠক (১২ নভেম্বর ১৯৩০-১৯ জানুয়ারি ১৯৩১)-এর জন্য আরুইন ব্রিটিশ ভারত থেকে আগা খাঁ, সাফি, জিন্না ও ফজল-ই-হোসেন প্রমুখ মুসলিম ; সাপ্রু, জয়াকর, শাস্ত্রী ও রামস্বামী আয়ার প্রমুখ উদারপন্থী এবং জাস্টিস পার্টি, হিন্দু মহাসভা, খ্রীস্টান প্রমুখ অন্যান্য সংস্থা থেকে—মোট ৫৭ জন প্রতিনিধি মনোনীত করেছিলেন। রাজন্যবর্গের ষোল জন প্রতিনিধির মধ্যে ছিলেন দুই সর্ববৃহৎ রাজ্য (হায়দ্রাবাদ ও মহীশূর)-র দুই প্রধানমন্ত্রী (আকবর হায়দারি এবং মির্জা ইসমাইল) ; পাতিয়ালা, বিকানীর, ভূপালের মত মাঝারি রাজ্যের বারোজন রাজা এবং ছোট রাজ্যসমূহের দুই মুখপাত্র। হায়দ্রাবাদের রেসিডেন্ট লেঃ কর্নেল টেরেস কিস (Keys)-কে যুক্তরাষ্ট্র ভাবনার (federal scheme)-এর জন্মদাতা বলা যায়। তাঁর মনে হয়েছিল ব্রিটিশ ভারত থেকে গণতন্ত্রের যে বন্যা নেমেছে তা প্রতিরোধ করতে গেলে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো অত্যাবশ্যক।[১] সাইমনের রিপোর্ট ও তার ওপর ভারত সরকারের ডেসপ্যাচ (২০ অক্টোবর ১৯৩০)-এ একই প্রস্তাব ছিল। হায়দারি ও ইসমাইল-এর প্রস্তাবের মধ্যে কিছু পার্থক্য ছিল। হায়দারি চান এক কক্ষবিশিষ্ট, পরোক্ষভাবে নির্বাচিত ফেডারেল সংসদ ও দায়িত্বহীন কেন্দ্রীয় সরকার। দ্বিতীয় জন চেয়েছিলেন—যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো, দ্বিতীয় কক্ষ বা সেনেট, যাতে শুধু ব্রিটিশ ভারত-বহির্ভূত অঞ্চলের প্রতিনিধিরা থাকবেন, ব্রিটিশ ভারতীয় প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত নিম্নতর কক্ষ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অধিকতর ক্ষমতা। তৃতীয় একটা মত ছিল মাঝারি রাজন্যবর্গের মুখপাত্র চেম্বার অব প্রিন্সেসের। তাঁরা চেয়েছিলেন ব্রিটিশ কর্তৃত্ব থেকে মুক্তি। তাঁরা প্রত্যেকেই উচ্চতর কক্ষ (সেনেট)-এ আসন চেয়েছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রস্তাব যখন প্রথম তোলা হয় তখন এ সব মতপার্থক্য ধামাচাপা দেওয়া হয়েছিল। হারকোর্ট বাটলার রিডিং-কে লিখেছিলেন, "Do they really know what they want ? It is difficult to pin jelly to a wall,"[২]

ব্রিটিশ ভারতের হিন্দু ও মুসলিম নেতারা সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানে বিফল হয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো আঁকড়ে ধরলেন। এ বিষয়ে, ডেভিড লো-র মতে, অগ্রণী ভূমিকা নেন সাপ্রু।[৩] তবে তাঁরা দুই কক্ষের ফেডারেল সংসদ ও দায়িত্ববান সরকারের ওপর জোর দেন। শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর ফেডারেশন সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল। তিনি ভেবেছিলেন, আগেকার দিনে যেমন সরকারী কর্মচারী ও বড়লাটের মনোনীত সদস্যরা গণতান্ত্রিক দাবি ঠেকাত, এখন তাই করবেন রাজ্যের দেওয়ানরা। মাঝখান থেকে দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে। চিন্তামণি আর্থিক ব্যাপারে এত রক্ষাকবচ ও বড়লাটের ক্ষমতা পছন্দ করেননি।

মুঞ্জে ভারতসচিব বেনকে জানান, সংখ্যালঘুর ব্যাপারে আগা খাঁ, সাফি ও জিন্নার কথা ভারতীয় মুসলিমরা (অর্থাৎ ফজল-ই-হোসেনের দল) শুনছে না। ফজল-ই-হোসেনের ১৮

আগস্ট ১৯৩০-এর মন্তব্যে আমরা জানতে পারি তাঁর দল কি চাইছিল :

(১) পৃথক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পঞ্জাব ও বাংলায় পরিষ্কার (এবং চিরন্তন) মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা (অর্থাৎ শাসন) ;

(২) সিন্ধুর পৃথকীকরণ ;

(৩) সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে সংস্কারের আওতায় আনয়ন ;

(৪) এই দুই নতুন প্রদেশের প্রতিনিধিসংখ্যা বাড়িয়ে কেন্দ্রে মুসলিম প্রতিনিধির সংখ্যা বৃদ্ধি ;

(৫) মন্ত্রিসভায় ও প্রশাসনে মুসলিমরা কি ভাগ পাবে সে সম্বন্ধে আগাম প্রতিশ্রুতি ।

পঞ্জাব সমস্যাই শেষপর্যন্ত সমাধানের দুর্লঙ্ঘ্যতম বাধা হয়ে দাঁড়ায় ।[৪] বেন বলেন, মুসলমান ও অমুসলমান ৫০% করে আসন ভাগাভাগি করলে একটা সমাধান হতে পারত কিন্তু শিখরা তা প্রত্যাখ্যান করেন ।[৫] আর সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানকে দায়িত্ববান কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্বশর্তরূপে দাবি করেন মুসলিম প্রতিনিধিরা ।

ইংরেজদের কি মনোভাব ছিল তার ভাল বিশ্লেষণ পাই কার্ল ব্রিজের Holding India to Empire গ্রন্থে । আরুইনের দূত হেইলি তাঁকে জানান, ব্রিটিশ রক্ষণশীল ও উদারপন্থী নেতারা মনে করেন কেন্দ্রে দায়িত্ববান সরকার থেকে পিছিয়ে আসার জন্য ফেডারেশনের মত এমন নীতি আর নেই । রাজন্যবর্গ যদি যোগ দেন তাহলে কেন্দ্রে দায়িত্ববান সরকার হলেও ব্রিটিশ স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে না । সাইমনেরও তাই মত । ফেডারেল স্ট্রাকচার কমিটিতে রিডিং আওয়াজ তোলেন সর্বভারতীয় ফেডারেশন ও রক্ষাকবচসহ কেন্দ্রীয় দায়িত্ববান সরকার । হোরের চিঠিপত্র থেকে জানা যায় তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল অর্থ ও প্রতিরক্ষা বিষয়ে ব্রিটিশ স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখা । চার্চিল অবশ্য যে কোন আলোচনার বিরোধী ছিলেন । একমাত্র বলডুইনই খানিকটা আরুইনকে সমর্থন করেছিলেন ।

কবে রাজারা যোগ দেবেন, কেন্দ্রে কত কক্ষের সংসদ হবে, নির্বাচনের পদ্ধতি কি হবে, অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ কে করবে কিছুই স্থির হয়নি প্রথম বৈঠকে । ফেডারেল স্ট্রাকচার কমিটির দ্বিতীয় রিপোর্টে প্রস্তাব দেওয়া হয বড়লাটের এক মন্ত্রিসভা থাকবে এবং তা যৌথভাবে সংসদের কাছে দায়িত্ববান হবে । অন্তর্বর্তীকালে বড়লাট প্রতিরক্ষা ও বিদেশ দফতরের ভার নেবেন । শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার্থ, বাজেট, ঋণ ও অন্যান্য আর্থিক দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁর বিশেষ ক্ষমতাও থাকবে । মুদ্রা ও বিনিময়নীতি নির্ধারণকল্পে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হবে । যতদিন না হয় সে বিষয়ে বড়লাট দায়িত্ব নেবেন । মন্ত্রীদের বরখাস্ত করতে হলে দুই কক্ষের অন্তত দুই তৃতীয়াংশের বিরুদ্ধ ভোট লাগবে । দ্বিতীয়ত, প্রদেশে ডায়ার্কির অবসান হবে এবং আইন ও শৃঙ্খলাসহ সমস্ত প্রাদেশিক বিষয়গুলি আইনসভার কাছে দায়িত্ববান সরকারের হাতে ন্যস্ত হবে । তবে ছোটলাটের হাতে থাকবে কিছু[৬] বিশেষ ক্ষমতা । তৃতীয়ত, সংখ্যালঘু সাবকমিটি স্থির করল পৃথক নির্বাচন চলবে । আম্বেদকর অনুন্নত হিন্দুদের জন্য তা দাবি করেন । ফ্রানচাইজ কমিটিতে বয়স্ক ভোটাধিকার নিয়ে মতদ্বৈধ হল ।

র‍্যামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ড ঘোষণা করেন বড়লাটের সভাপতিত্বে এক কমিটি ভারতে আলোচনা চালাবে, দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক বসবে লণ্ডনে এবং তাতে যেসব প্রস্তাব পাস হবে তা পার্লামেন্টের অনুমোদনের জন্য পেশ করা হবে ।

এই পরিস্থিতিতে আরুইন আর একবার কংগ্রেসকে রাজি করাতে চেষ্টা পান, যার পরিণতি—গান্ধী-আরুইন চুক্তি—আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি । দ্বিতীয় গোলটেবিল

বৈঠক এক অশুভ মুহূর্তে শুরু হয়েছিল। মান্দ্যের প্রথম পর্বে ব্রিটেনের রপ্তানি মূল্য অর্ধেক কমে গেলেও আমদানি প্রায় একই থাকে। যাকে আমরা 'terms of trade' বলি তা ব্রিটেনের পক্ষে গিয়েছিল। অস্বস্তিকর হয় বেকার সমস্যা। দ্বিতীয় পর্বে দেখা দিল ক্রমাগত বাজেট ঘাটতি। ব্যাঙ্কিং, জাহাজ পরিবহণ, বিদেশী মূলধন বাবদ যে সব 'অদৃশ্য' আয় হত তা কমে গেল। একটা আতঙ্ক দেখা দিতে লাগল। মে' কমিটির প্রতিবেদন তা বাড়িয়ে দিল। ১৯৩১-এর আগস্ট মাসে অর্থমন্ত্রী স্নোডেন যে বাজেট আনলেন তার ঘাটতির পরিমাণ ১৭০ মিলিয়ান পাউণ্ড। ১১ আগস্ট ব্যাঙ্কারবা ম্যাকডোনাল্ডকে জানালেন ব্রিটেনের মহাজনরা পাওনার দাবি এত বাড়িয়েছে যে পাউণ্ডের পতন শুরু হয়েছে। অর্থনীতির দিক থেকে বাজেট ঘাটতি বা বৈদেশিক লেনদেনের (balance of payments) ঘাটতির জন্য পাউণ্ডের সংকট হচ্ছিল এমন কথা বলা যায় না। বেকার সমস্যার সঙ্গেও এর আবশ্যিক যোগ ছিল না। এর জন্য দায়ী ইংল্যাণ্ডের ব্যাঙ্কাররাই। তাদের অধিকাংশ লগ্নি অস্ট্রিয়া ও জার্মেনীতে আটকা পড়েছিল, অন্যদিকে তাদের দেয় স্বল্পমেয়াদী পাওনা (যাকে short term liabilities বলা হয়)-র পরিমাণ ছিল ঢের বেশি। তারাই মুশকিল আসানস্বরূপ বাজেট সাম্য দাবি করতে থাকে। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ কেইনস্ ও শ্রমিক নেতা বেভিন রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য ১০% শুল্ক হার বৃদ্ধির কথা তোলেন। কেউ কেউ বলেন, বেকাব ভাতা কেটে ব্যয় কমান হোক। এতে বেভিনের দল রাজি হতে পারে না। নিজেব দোষ ঢাকতে ব্যাঙ্কাররা বলেন, সংকটের কারণ রাজনৈতিক, শ্রমিক সরকার যথেষ্ট বিশ্বাসভাজন নয়, এবং সব দল মিলে একটা জাতীয় সরকার গঠন করা দরকার। স্যামুয়েলের পরামর্শে, বলডুইনেব সম্মতিতে, ম্যাকডোনাল্ডের নেতৃত্বে শ্রমিকদের একটা ছোট উপদল জাতীয় সরকার গঠন কবল—হেণ্ডারসনেব নেতৃত্বে শ্রমিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ উপদল বাইবে থাকল। এই জাতীয় সরকারের ৪ জন মন্ত্রী নেওয়া হল রক্ষণশীল দল থেকে, ৪ জন মন্ত্রী শ্রমিক দল থেকে, ২ জন উদারপন্থী দল থেকে।

প্রথমত, এই ধবনের সাময়িক, সংকটকালীন সরকাব ভারতবর্ষের জন্য কোন সুদূরপ্রসারী সংস্কার রচনা করতে পারে না। তাব ওপব ছিল বক্ষণশীল দলেব ক্রমবর্ধমান প্রতিপত্তি। তাদের এড়িয়ে বা অগ্রাহ্য করে কোন নীতি নেওয়াই সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয়ত, মান্দ্যের পরিবেশে ভারত ও ব্রিটেনেব স্বার্থ-সংঘাত বেধেছিল। বৈঠক আরম্ভ হবার পূর্বেই হোর উইলিংডন (তখন বড়লাট)-কে লেখেন, "সকলেব দৃষ্টি এখন পাউণ্ডের দিকে এবং গোলটেবিল বৈঠকে ছেদ টানাই ভাল।" ভারত থেকে অর্থ দফতবের ভারপ্রাপ্ত সদস্য সুস্টার (Schuster) লিখলেন, টাকার বিনিময়মূল্য হ্রাস না করলে চলবে না। মান্দ্যেব পূর্বে লণ্ডনে (স্টারলিং-এ দেয়) হোম চার্জের ব্যয় মেটান হত ভারতবর্ষের বাড়তি রপ্তানি থেকে। ১৯৩০ সালে তা সম্ভব হ'ল না। উপরন্তু ভারতকে সে-জন্য ৩১ মিলিয়ান পাউণ্ড দেনা করতে হল। কাপড়ের ওপর আমদানি শুল্ক ১৫% ও পরে ২০% পর্যন্ত (বিলিতি কাপড় অবশ্য ৫% কর রেহাই পেত) বাড়িয়েও গান্ধীব আন্দোলনের ফলে শুল্ক রাজস্ব কমে গেল, ভূমি রাজস্বের অবস্থা সঙ্গীন হল। খাজনা না দিয়ে ভারতীয় কৃষক সোনা জমাতে লাগল। এই অবস্থায় হয় ব্রিটেনকেই ৫০ থেকে ১০০ মিলিয়ান পাউণ্ড ধার দিয়ে ভারতীয় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে তুলতে হবে এবং পাঁচ বছরের জন্য সব রক্ষাকবচ অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে (না করলে ধার দেবে কে ?), না হয় টাকার অবমূল্যায়ন ছাড়া পথ নেই। কিন্তু টাকার মূল্য ১ শিলিং ৪ পেন্স করলে ভারতীয় চাষী, ব্যবসায়ী প্রভৃতির লাভ হলেও ব্রিটিশ বেতন ও পেনশনভোগীদের ক্ষতি হবে, বিলাতি পণ্যের আমদানি কমে যাবে, ভারতীয় ঋণপত্রের

গ্রাহক জুটবে না। তার প্রভাব পড়বে স্টারলিং-এর ওপর।

ভারতসচিব হোর এসব কিছুই করতে রাজি ছিলেন না। বিলাতি বস্ত্র ব্যবসায়ের দিক থেকে ভারতীয় বাজারের গুরুত্ব প্রথম মহাযুদ্ধের পর অনেক কমে গিয়েছিল। ১৯১৩ সালে ব্রিটেনের সামগ্রিক রপ্তানির (মূল্য বিচারে) ১৩% যেত ভারতে, আর এর অর্ধেক ছিল বিলাতি কাপড়। ১৯৩০ সালে প্রথমটা কমে হয় ৯% আর কাপড়ের রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়ায় এক তৃতীয়াংশ।

বাসুদেব চ্যাটার্জীর (কেমব্রিজ) গবেষণা মতে অবস্থাটা ছিল নিম্নরূপ—

বছর	আমদানি বিলাতি কাপড়ের মূল্য (মিলিয়ান পাউণ্ডে)
১৯২৯	৩০
১৯৩০	১৫
১৯৩১	৫·৫[৮]

ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যে ব্রিটেনের বাড়তি আয় ১৯১৩ সালে ছিল ২১·৬ মিলিয়ান পাউণ্ড। ১৯৩০ সালে তা কমে দাঁড়ায় ৩·২ মিলিয়ান পাউণ্ডে। তবে কেয়ার্নক্রস ও কিন্‌ডারস্‌লির মতে ১৯৩১ সালেও যে ব্রিটিশ মূলধন ভারতের খাটছিল তার পরিমাণ ৪৫৮ মিলিয়ান পাউণ্ড এবং ১৯২৯-এ ভারতের স্টারলিং ঋণেব পরিমাণ ৩৫৪·৫ মিলিযান পাউণ্ড।[৯] ব্যবসার ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ না হলেও ব্রিটিশ ধনতন্ত্রের দিক থেকে মূলধনের পরিমাণটা নগণ্য নয় এবং সেটার জন্য রক্ষাকবচ দাবি করা স্বাভাবিক।

২০ সেপ্টেম্বর হোর সুস্টারকে বলেন খরচ কমাতে ও আয়কর বাড়াতে—কিন্তু টাকার অবমূল্যায়ন বা সিভিলিয়ানদের মাইনে কাটা চলবে না। "(A) break in the rupee would inevitably precipitate alarm as to sterling in an atmosphere which is already nervous."[১০]

এমনি অঘটন যে এই তারবার্তা পৌঁছবার পরের দিনই ব্রিটেন স্বর্ণমান ত্যাগ কবল ও পাউণ্ডের মূল্য প্রায় এক চতুর্থাংশ কমাল।[১১] ক্যাবিনেট টাকাকে স্টাবলিং-এর সঙ্গে বেঁধেও দিল। ভারতে নির্দেশ গেল—টাকার বদলে টাঁকশালে আর সোনা দেবে না। এর ফলে ভারতের জমা সোনা হুড় হুড় করে বেরিয়ে যেতে লাগল। ইঙ্গ-ভারত বেসরকারী বাণিজ্যে ভারতের লাভ হল বটে কিন্তু স্টারলিং ঋণশোধ অব্যাহত বইল, টমলিনসন বলছেন, এ নীতি ভারতের জমা সোনা অপহরণের জন্য গৃহীত হয়নি।[১২] হয়তো তাই, কিন্তু ব্রিটেন এই সোনা দিয়ে তার বৈদেশিক পাওনা মেটাল এবং পাউণ্ডের দাম ঠিক রাখল। আবার সব জায়গা থেকে মূলধনের স্রোত লণ্ডনের দিকে প্রবাহিত হল। সুস্টারের দেওয়া হিসেবে ১৯৩১-এর অক্টোবর ও ১৯৩২-এর মার্চের মধ্যে ভারত থেকে ৫৭ কোটি টাকা (= ৩২ মিলিয়ান পাউণ্ড)-র সোনা বেরিয়ে যায়। মনে হয় ভারতীয় স্বার্থ সাধিত হত ১৯২৯-এর মূল্যমানে ফিরে গেলে। ১৯৩১-এর শেষে পাইকারী দর ২৯% বাড়ালে জীবনযাত্রার ব্যয় মাত্র ১১$\frac{১}{২}$% বাড়ত, মজুরি ৩%-এর বেশি নয়।[১৩] দুঃখের বিষয় ব্রিটেনের অর্থমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেন এ দিকটা ভেবে দেখেননি।[১৪] বিরূপ প্রতিক্রিয়া অবশ্যই এসেছিল ভারত থেকে।[১৫] মোটের ওপর রাজনৈতিক সংস্কার নিয়ে সুদূরপ্রসারী ও পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার পক্ষে

পরিবেশ অনুকূল ছিল না। ভারত ও ব্রিটেনের অর্থনৈতিক স্বার্থে দ্বন্দ্ব বেধেছিল।

তৃতীয়ত, প্রথম বৈঠকে রাজন্যবর্গ ফেডারেশনের ব্যাপারে যে উৎসাহ দেখান, পরে তাতে ভাঁটা পড়ে। ভূপাল ও পাতিয়ালার মধ্যে রেষারেষি, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র রাজ্যের মধ্যে ঈর্ষা তো ছিলই, এর পর আবার রাজাদের দাবি কেবলই বাড়ছিল।

চতুর্থত, কানপুরের দাঙ্গার পর সাম্প্রদায়িক বিরোধ বেড়েছিল। ২৬ ও ২৭ মার্চ ১৯৩১ গান্ধী এই দাঙ্গার তীব্র সমালোচনা করলেও প্রাণভয়ে পলাতক মুসলিমরা বিদ্বেষ ছড়ায়। মুসলিম প্রতিনিধিদল প্রথম বৈঠকের সময়ই ব্রিটিশ রাজনৈতিক দল ও ব্যবসায়ী মহলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। স্বভাবতই এবারও তারা রক্ষণশীল দলের একটা বড় গোষ্ঠীর মদত পায়। হোরকে আগা খাঁ জানান, **"Responsibility at the centre is a leap in the dark."** ফজল-ই-হোসেন ব্রিটিশ সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি ছাড়া ফেডারেশন বাতিল করে দেন। শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর চিঠি ও জয়াকরের ডায়েরিতে পড়ি মুসলিমরা রক্ষণশীল দলের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে।

দ্বিতীয় বৈঠক শুরু হল ৭ সেপ্টেম্বর আর অক্টোবরের সাধারণ নির্বাচনে রক্ষণশীল দলের বিপুলসংখ্যক প্রতিনিধি জিতল। ম্যাকডোনাল্ডের জাতীয় সরকারের পেছনে ৪৭৩ জন এম পি-ই ছিল রক্ষণশীল। বলা বাহুল্য, শুধু ব্রিটিশ ব্যবসায়িক বা মূলধনি স্বার্থ নয়, সংখ্যালঘু স্বার্থরক্ষায় এদের প্রতিরোধের সামনে ম্যাকডোনাল্ডের ৩ জন শ্রমিক অনুচর ও ৬৮ জন উদারপন্থী কি করতে পারে? তা ছাড়া ব্রিটিশ ভারতের প্রতিনিধিদের নেতা ছিলেন আগা খাঁ, নেহরুর ভাষায়, যাঁর মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী, সামন্ততান্ত্রিক, ধনতান্ত্রিক, সাম্প্রদায়িক সব প্রতিক্রিয়া শক্তির সমাহার ঘটেছে।

বিলেতে এসে গান্ধী এই জটিল পবিস্থিতির সামাল দিতে পারছিলেন না। একদিকে সংখ্যালঘু ব্যাপারে (বিশেষত পঞ্জাবের ক্ষেত্রে) সিদ্ধান্ত না হলে এবং কেন্দ্রে হিন্দু রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিসংখ্যা কত ও নির্বাচন প্রথা কি হবে না জেনে মুসলিমরা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো মানতে রাজি হল না, অন্যদিকে সাপ্রু ও উদারপন্থী হিন্দুরা ফেডারেশন নীতি গৃহীত না হলে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন মানতে রাজি নয়।[১৬] ফেডারেল স্ট্রাকচার কমিটিতে গান্ধী ঘোষণা করলেন কংগ্রেসই ভারতের অনন্য মুখপাত্র। তিনি সৈন্যবাহিনী, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, বৈদেশিক সম্পর্কের ওপর নিয়ন্ত্রণ চাইলেন; দাবি করলেন ঋণ সম্পর্কে নিরপেক্ষ সালিশ ও সাম্রাজ্য ত্যাগের স্বাধীনতা। ভারতের প্রতিকূল হলে কোনও রক্ষাকবচ মানতে তিনি রাজি ছিলেন না। এই ব্যাপারে অন্যতম প্রতিনিধি বিড়লার পূর্ণ সমর্থন তিনি পান, কিন্তু সাপ্রুর নয়।[১৭] এক সময়, পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি সমর্থন শর্তে তিনি মুসলিমদের পৃথক ভোটাধিকার, মুসলিমদের জন্য কেন্দ্রে এক তৃতীয়াংশ আসন, সীমান্ত ও সিন্ধুপ্রদেশের পৃথকীকরণে রাজিও হন। কিন্তু তাঁর শর্ত ছিল শিখ ব্যতীত অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যৌথ ভোটাধিকারের আওতায় থাকবে। তা ছাড়া প্রথম নির্বাচনের পর সমস্ত ব্যাপারটা রেফারেণ্ডামে দেওয়া হবে। কিন্তু সমস্ত সংখ্যালঘু দল গান্ধীর শর্তে রাজি না হয়ে মুসলিমদের সঙ্গে যোগ দেয়।[১৭ক] পঞ্জাব সমস্যা নিয়ে ৭ অক্টোবর আলোচনা ভেস্তে যায়। গান্ধী ইংরেজদের ওপর দোষারোপ করেন।[১৮] তিনি বলেন, মুসলিম, অনুন্নত হিন্দু প্রভৃতির সমঝোতা (pact) ইংরেজদের কীর্তি। শেষে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী যদি সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা করতে পারেন, কংগ্রেস আপত্তি জানাবে না। তবে প্রকাশ্যে তিনি একথা বলবেন না।[১৯] এরকম মারাত্মক সুযোগ ম্যাকডোনাল্ডকে দেওয়া উচিত হয়নি তাঁর। তিনি কি জানতেন না প্রধানমন্ত্রী রক্ষণশীলদের পুতুল?

ফেডারেশনের সংগঠন নিয়েও মতবিরোধ ঘটল। সাপ্রু চান নিম্নকক্ষ প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হোক। পীলের তাতে আপত্তি। রাজন্যবর্গ চান উভয় কক্ষের সমান ক্ষমতা। অপরদিকে ব্রিটিশ ভারতের প্রতিনিধিরা চান নিম্নকক্ষ অধিকতর শক্তিশালী হবে। প্রতিপক্ষের সদস্যসংখ্যা নিয়েও মতদ্বৈধ দেখা দিল। রাজারা যে সব আর্থিক দাবি জানালেন তাও যুক্তিগ্রাহ্য নয়। হায়দ্রাবাদ বেরার চাইল, মহীশূর চাইল নজরানা ছাড়, বরোদা চাইল নওনগর-এর বন্দর বিষয়ে নানা সুবিধা। হায়দারি চাইলেন এককক্ষেব সংসদ, বিকানীর সংসদের অর্ধেক সদস্যপদ। আসলে হিন্দু-মুসলিম বিরোধ প্রথম বৈঠকের অবস্থান থেকে রাজাদের সরে যাবার সুযোগ দিল।[২০]

হোর দেখলেন আপাতত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও পরে যুক্তরাষ্ট্র—এ-ভাবে সংস্কারকে দু-পর্বে ভাগ করলে ইংরেজদের সুবিধে। আসলে এটা সাইমনেবই নীতি। সাফি ও জিন্না গোপনে রাজি হলেন কিন্তু প্রকাশ্যে বিরোধিতা করলেন। আম্বেদকর নীরব রইলেন। শুধু সাপ্রুর দল করলেন ঘোর আপত্তি।[২১] গান্ধী বললেন, (১) যে আইনে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হবে, তাতেই কেন্দ্রে দায়িত্ববান সরকার প্রতিষ্ঠাব কথা থাকবে। (২) কবে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা চালু হবে তার সময়সীমা (ছ' মাস) নির্দেশ করতে হবে। (৩) প্রদেশদের প্রভূত, প্রায় সার্বভৌম, ক্ষমতা দিতে হবে।[২১ক] হোর সাহস পেলেন এবং গান্ধীকে ডেকে বললেন, "There was not a dog's earthly chance of satisfying his (Gandhi's) demand."[২২] ১ ডিসেম্বর দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের আনুষ্ঠানিক অন্তিম ভাষণে ম্যাকডোনাল্ড ঘোষণা করলেন—ভোটপ্রথা, অর্থ, ব্যবসায় প্রভৃতি বিষয়ে বিচার বিবেচনা করাব জন্য তিনটি কমিটি ভারতে যাবে। প্রয়োজন হলে তিনিই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। নেভিল চেম্বারলেন এ সময় তাঁর ভগ্নীকে যে চিঠি লেখেন তা পড়লে বোঝা যায় ইংরেজদের আশা ছিল একটি, দুটি করে প্রদেশগুলি স্বায়ত্তশাসন চাইবে, অর্থাৎ আগে উঠবে সে বিষয়ে সংস্কারের কথা। যদি তারা সফল হয় তবেই পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে ফেডারেশনের কথা উঠবে। ঘুরে ফিরে সেই কোন সম্প্রদায়ের কত লোক চাকুরি পাবে তাই নিয়ে বাগবিতণ্ডায় দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক সমাপ্ত হল। নেহরু লিখছেন, "The very conception of freedom had taken the form of large-scale jobbery."

দেশে ফেরার আগে গান্ধী হোরের কাছে লিখিত প্রতিশ্রুতি চাইলেন যে, রক্ষাকবচ ও বৈঠকের স্থায়ী কমিটির কাজ নিয়ে কংগ্রেস যে কোন প্রশ্ন তুলতে পারবে। হোরের মতে গান্ধী কংগ্রেসকে শান্তির পথেই রাখতে চেয়েছিলেন।[২৩] কিন্তু কমন্স সভা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, টেগার্টের প্রাণনাশের চেষ্টা, লোম্যান হত্যা ইত্যাদি সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে দৃঢ় মনোভাব নিয়েছিল। গান্ধীব প্রধান দাবি—কংগ্রেসকেই ভারতের একক মুখপাত্র হিসেবে মেনে নিয়ে আলোচনায় বসতে হবে—একথা কি পার্লামেন্ট, কি সরকার মানতে রাজি হয়নি। শুধু হাতেই গান্ধীকে ফিরতে হয়েছিল।

সুভাষ গান্ধীর গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের তীব্র সমালোচনা করেছেন। জুডিথ ব্রাউনের মতে সংখ্যালঘু সমস্যা সমাধানে তিনি ব্যর্থ হন শুধু তাঁর 'Political style'-এর দোষে। কিন্তু আমি দেখিয়েছি মুসলিমরা বা আম্বেদকরের অনুচররা ধোয়া তুলসীপাতা ছিল না। ভারতসচিব হোরও কম কলকাঠি নাড়েননি। হ্যারল্ড ল্যাস্কি ও জাস্টিস হোমসের চিঠিপত্রে আমার মতেরই সমর্থন মিলবে। গান্ধীজী সাম্প্রদায়িক সমস্যা না মিটলে বৈঠকে যাবেন না বলেও ছিলেন কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটি তাঁর আপত্তি অগ্রাহ্য করেছিল। তবে গান্ধীর

একা লণ্ডন যাওয়া উচিত হয়নি, তাঁর সর্বতোভাবেই কংগ্রেসের আরও দু-একজন নেতা (যেমন প্যাটেল) ও জাতীয়তাবাদী মুসলিমদের নেতা (যেমন আনসারি)-কে সঙ্গে নেওয়া উচিত ছিল। উইলিংডন আপত্তি জানালে গান্ধী সেই অজুহাতে বিলেত যেতে অস্বীকার করতে পারতেন। দোষটা তখন সম্পূর্ণরূপে ইংরেজদের ওপর পড়ত। গান্ধী দেশে থাকলে আইনঅমান্য আন্দোলনে ছেদ পড়ত না, উত্তরপ্রদেশে কৃষক অভিযান আরো জোরদার হত, জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্রের মত বামঘেঁষা নেতাদের শক্তি বাড়ত। আর একটা কথা মনে হয়। আন্দোলন অব্যাহত থাকলে সন্ত্রাসবাদীরাও এমন সক্রিয় হয়ে উঠত না। হতাশা যে তাদের অনেকাংশে প্রণোদিত করেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। গান্ধী যদি তাঁর অহিংসা পন্থা দ্বারা কোন সুবিধে আদায় করতে না পারেন তা হলে চট্টগ্রামের বীর সৈনিকরা বা বি ভি গ্রুপের অসমসাহসিক সদস্যরা মেরে এবং মরে দেখিয়ে দেবেন স্বাধীনতার জন্য তাঁরা কতটুকু করতে পারেন।

গান্ধী খালি হাতে ফিরলে আইন অমান্য ফের শুরু হবে এ আশঙ্কা ছিল ভারত সবকারের। প্রথমত বড়লাট উইলিংডন সেই অসহযোগ আন্দোলনের সময় (যখন তিনি বোম্বাই-এর লাট) থেকে গান্ধীকে বিশ্বাস করতেন না। "হতে পারেন তিনি (গান্ধী) সন্ত, সাধু লোক, অকৃত্রিম নীতিবাদী, কিন্তু আমি নিশ্চিত যে এবকম ঝানু রাজনীতিজ্ঞ ও দরকষাকষিতে পটু ভদ্রলোক আমি কোনদিন দেখিনি।"[২৪] আরুইন আবার তাঁকে এমন আকাশে তুলেছেন যে মনে হচ্ছে ভারত দু'জন রাজার শাসনাধীন। দ্বিতীয়ত ১৯৩১-এব অক্টোবরে জওহবলাল বডলাটকে জানান উত্তরপ্রদেশে কৃষকদেব অবস্থা শোচনীয় হয়েছে এবং তাঁকে আবাব আন্দোলন শুরু করতে হতে পাবে। তৃতীযত সন্ত্রাসবাদীবা আবার তৎপর হয়ে ওঠে। কড়া অর্ডিন্যান্স প্রয়োগে ১৫৫ জনকে গ্রেফতার কবে চট্টগ্রামের বাইরে অভ্যুত্থান ঠেকানো যায বটে কিন্তু টেগার্টের প্রাণনাশের চেষ্টা হয় ১৯৩০-এব ২৫ আগস্ট। তাঁর স্মৃতিকথায় অনুজার মৃত্যু ও দীনেশ মজুমদারের গ্রেফতারের চাঞ্চল্যকব বিবরণ পাই। দীনেশের কাছে উন্নতধরনের বোমা ও তা ফাটাবার জন্য সিগার পাওয়া যায়। বোমা তৈরি করেন ডঃ নবায়ণ বায।[২৫] ২৯ আগস্ট (১৯৩০) ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালে আই জি· লোম্যান ও এস· পি হডসনের ওপর আক্রমণ চালান বিনয় বসু। পরে লোম্যানের মৃত্যু হয। টেগার্ট বিলেত থেকে ফিরে এসে পলাতক চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের চন্দননগর আস্তানা আক্রমণ করেন। লোকনাথ বল ও গণেশ ঘোষ ধরা পড়েন। ৮ ডিসেম্বর (১৯৩০) ঘটে রাইটার্স বিল্ডিং-এর বিখ্যাত অলিন্দ যুদ্ধ। কারা বিভাগের আই· জি· সিম্পসনকে হত্যা ও অন্য কয়েকজন আমলাকে আহত করার পর বাদল বিষপানে আত্মহত্যা কবেন। পরে আত্মহত্যার চেষ্টায় আহত বিনয় মারা যান এবং দীনেশ গুপ্তের প্রাণদণ্ড হয় (১৯৩১-র জুলাইতে)। বিপ্লবীরা পাল্টা জবাব দেন বিচারক গার্লিকের প্রাণনাশ করে। ১৯৩১-এর সেপ্টেম্বরে ঘটে দ্বিতীয় চট্টগ্রাম অভ্যুত্থান, যার নেত্রী প্রীতিলতা ওহ্‌দেদার ঘটনাস্থলেই আত্মহত্যা করেন। ডিসেম্বরে শান্তি ও সুনীতির হাতে কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্স নিহত হন। ভগৎ সিং-এর ফাঁসির ঠিক পঞ্চদশ দিনে মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট পেডি নিহত হন। ১৯৩২-এর ফেব্রুয়ারিতে বীণা দাশ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ছোটলাট জ্যাকসনকে গুলি করেন। অল্পের জন্য তিনি রক্ষা পান। কিন্তু এপ্রিলে নিহত হন পেডির উত্তরাধিকারী ডগলাস। ১৯৩৩-এর সেপ্টেম্বরে—তাঁব স্থলাভিষিক্ত বার্জও মারা পড়েন। আততায়ীরা সবাই হেম ঘোষের বি ভি গ্রুপের। এর ফলে বাংলার আমলাদের মনোবল প্রায় ভেঙে পড়ে একথা স্বীকার করেছেন স্বরাষ্ট্র বিভাগের সদস্য এমার্সন ও পুলিশেব কর্তা

উইলিয়ামসন।[২৬] ভয় থেকে আসে ক্রোধ, ক্রোধ থেকে প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি। চন্দ্রশেখর আজাদকে হত্যা ও হিজলি বন্দী নিবাসে গুলি চালনা সেই প্রবৃত্তিরই পাশব প্রকাশ। সরকারী বিচার বিভাগীয় অনুসন্ধানে জেল কর্মীরাই দোষী সাব্যস্ত হয়। চিরবিশ্বাসী কবিগুরুর কণ্ঠে বেজে ওঠে বজ্রগর্ভ প্রতিবাদ। তিনি দেখেছেন শত শত তরুণ বালক দেশপ্রেমে উন্মাদ হয়ে কারাপ্রাচীরে নিষ্ফল মাথা কুটছে ; তিনি শুনেছেন বিচাবের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদছে। বিধাতা কি তাও সহ্য করবেন ?

যাহাবা তোমার বিষাইছে বায়ু
নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ,
তুমি কি বেসেছ ভাল ?

এ প্রশ্ন শুধু বিধাতার উদ্দেশে নয, তাঁর দূতদেব (অর্থাৎ গান্ধীর) উদ্দেশে—যিনি শুধু ক্ষমা করতে বলেন, ভালোবাসতে বলেন, বলেন অন্তর থেকে বিদ্বেষ-বিষ নাশ করতে। জালিযানওয়ালাবাগেব পব ও 'প্রান্তিকে'র পূর্বে রবীন্দ্রনাথকে এমন স্থৈর্য হাবাতে দেখি না। অথচ এমনই অদৃষ্টের বিডম্বনা যে দু বছরের মধ্যে তিনিই লিখেছিলেন 'চার অধ্যায'। দমননীতি ও সন্ত্রাসবাদ—কোনটাব অমানবিকতাই তিনি সহ্য করতে পাবেননি। নেহরু স্পষ্টই লিখেছেন, "terrorism produced an atmosphere which was not favourable to direct action." চট্টগ্রামে মুসলিম পুলিশ ইন্সপেক্টরকে সন্ত্রাসবাদীরা হত্যা কবলে যে ব্যাপক দাঙ্গা হয় ও পুলিশী নির্যাতন চলে তাতে সন্ত্রাদবাসের অন্য কুফলও স্পষ্ট হয়।

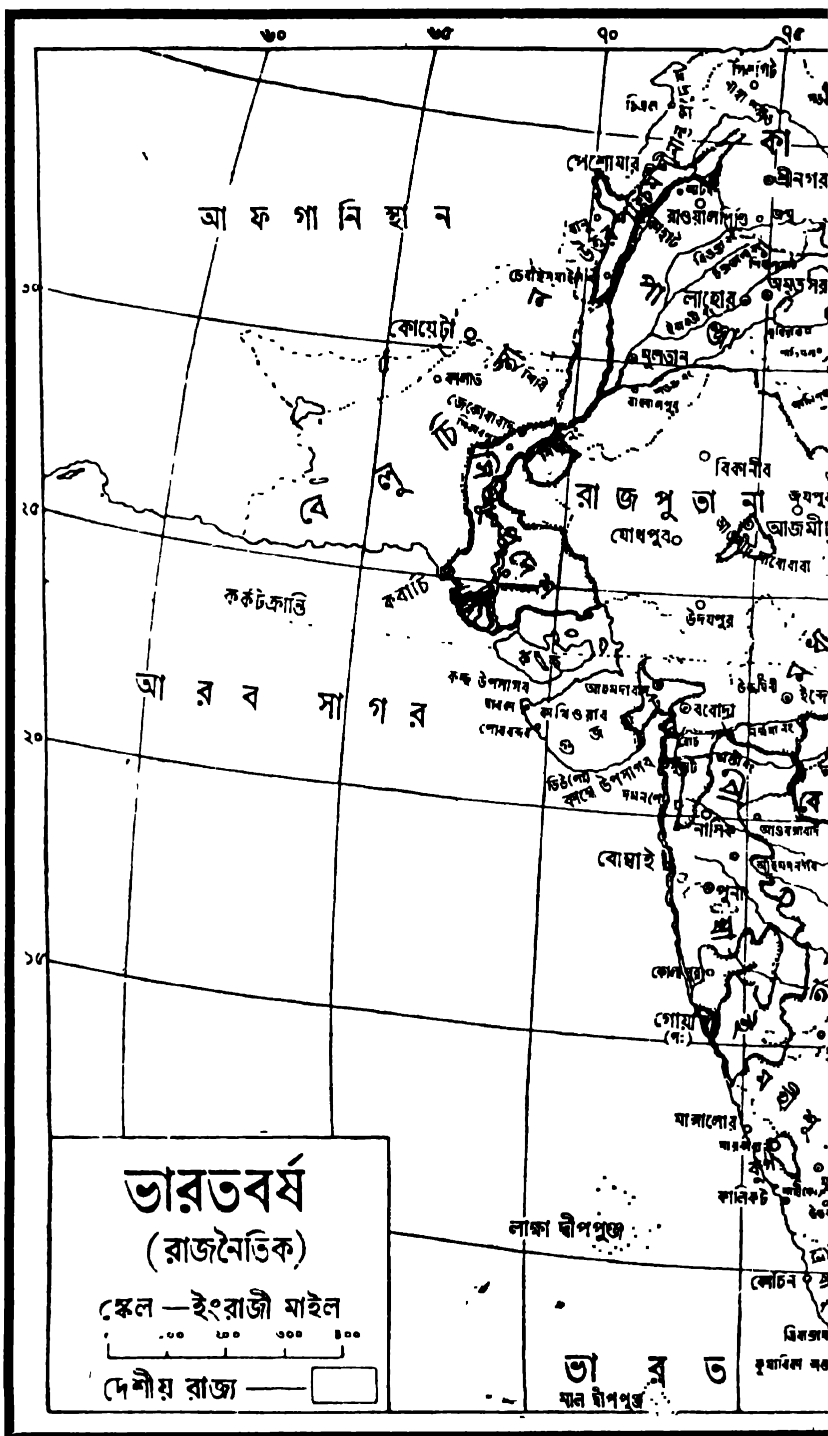
হোর চেয়েছিলেন গান্ধীকে পক্ষে বাখতে কিন্তু কোন চুক্তি চাননি, দমননীতি ত্যাগ কবতেও চাননি।[২৭]গান্ধীর পক্ষে পশ্চাদপসবণ, এমনকি কালহরণও সম্ভব ছিল না। বড়লাট বাংলা, ইউ· পি· সীমান্ত প্রদেশে অর্ডিন্যান্সেব অপব্যবহার নিয়ে আলোচনা করতে অরাজি হলে ১৯৩২-এর ৩ জানুয়াবি সত্যাগ্রহ পুনরায শুরু কবলেন তিনি। সরকার প্রস্তুত হয়েই ছিল। পবের দিন ওযার্কিং কমিটি, এ আই· সি· সি· এবং বহু স্থানীয় কংগ্রেস কমিটি নিষিদ্ধ করা হল। কিষাণ সভা, যুব লীগ, ছাত্র সংগঠন কেউ বেহাই পেল না। গান্ধীকে গ্রেফতার করে পাঠানো হল যারবেদা জেলে। আরও কতকগুলি দমনমূলক অধ্যাদেশ জারি করে আত্মসন্তুষ্ট উইলিংডন বলেছিলেন, "We got in the first blow."[২৭ক] গান্ধী নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি বন্দী হলে হরতাল, অনশনের মাধ্যমে সত্যাগ্রহ শুরু হবে এবং স্থানীয় নেতৃবৃন্দ যে ভাবে পারবেন আইন অমান্য করবেন। সভাপতিগণ বন্দী হলে তাঁদের মনোনীত নেতারা সভাপতি হবেন। বল্লভভাই (করাচী কংগ্রেসের সভাপতি) মনোনীত করেন রাজেন্দ্র প্রসাদকে। রাজেন্দ্র প্রসাদের পর যথাক্রমে মনোনীত হন আনসারি, শার্দুল সিং, মৌলানা আজাদ, সরোজিনী নাইডু, জি. দেশপাণ্ডে, কিচলু ও রাজগোপালাচারি।

আইন অমান্য আন্দোলনের দ্বিতীয়পর্বে বিভিন্ন শ্রেণী কি রূপ সাড়া দিল ? বোম্বাই-এর মুলজি জেঠা তুলা বাজারের দালালগণ, শ্রফ অ্যাসোসিয়েশন প্রভৃতি বয়কট পুরো সমর্থন করল। কস্তুরভাই লালভাই ও আম্বালাল সারাভাই-এর গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা ছিল অকপট। গুজরাটী বণিকদের মদতে বোম্বাই হয়েছিল, ছোটলাট সাইক্‌সের ভাষায়, "গান্ধীবাদের দুর্গ" (The keep of Gandhism), লালা শ্রীরাম, বিড়লা ও ঠাকুরদাসের মনস্তত্ত্ব অনেক জটিলতার। উভয় শিবিরে পা রেখে ভারতীয় ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের স্বার্থরক্ষা করতে চেয়েছিলেন তাঁরা। উইলিংডন তাঁদের পক্ষে রাখতে চান, আর তাঁদের পুরো বিশ্বাস না

করলেও, হোর সে নীতি সমর্থন করেন। এমনকি এঁদের কাউকে কাউকে তিনি আসন্ন অটোয়া সম্মেলনে প্রতিনিধি করে পাঠাতে চান। এ সময় বিড়লা হোরকে লিখেছিলেন, "I always make a distinction between Gandhiji and the Congress, and I again submit that it is possible for you to give us a constitution, which, though not acceptable to Congress, may not be rejected by Gandhi, and which can ensure a smooth working in future."[২৮] এ মন্তব্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর আর একটি মন্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়—"He (Gandhi) alone is responsible for keeping the left wing in India in check." বিড়লার কাছে গান্ধীর মূল্য ছিল বিবিধ। প্রথমত কংগ্রেসের ওপর তাঁর প্রভাব এত বেশি যে গান্ধী যদি কোন সংস্কার মেনে নেন, কংগ্রেস তা শেষপর্যন্ত কার্যকর করবে। দ্বিতীয়ত একমাত্র গান্ধীই কংগ্রেসের বামপন্থীদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন। বিড়লা গান্ধী ও সরকারের মধ্যে আপোসই চেয়েছিলেন কিন্তু নিজেদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না করে। ভারতীয়দের আর্থিক স্বাধীনতা, ব্রিটিশ বণিকদের রক্ষাকবচ ইত্যাদি ব্যাপারে তিনি আলোচনার দাবি তুলেছিলেন।[২৯] অন্যদিকে ল্যাঙ্কাশিয়রের প্রতিনিধিরাও অটোয়া চুক্তির আওতায় পূর্ব আফ্রিকায় ব্যবসা বাড়াতে ভারতীয় ধনপতিদের সঙ্গে বোঝাপড়া চেয়েছিলেন।[৩০] আসলে বিড়লা বা ঠাকুরদাসের মত বড় বণিকরা স্বাধীনতা নিয়ে বিরোধের চেয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে আপোসের ওপর বেশি জোর দেন। মান্দ্যের ফলে ব্রিটিশ ধনতন্ত্র দুর্বল হয়েছিল। পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করার আগে তার থেকে যতটা সুবিধে পাওয়া যায় তা আদায় করার কৌশল নিয়েছিলেন ভারতীয় শিল্পপতিরা।

অটোয়া সম্মেলনে (১৯৩২) মোটরগাড়ি, রাসায়নিক দ্রব্য, ঔষধ, ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য প্রভৃতি ভারতে রপ্তানির ক্ষেত্রে ব্রিটিশ বণিকদের বেশি সুবিধা দেওয়া হয়। প্রতিদানে ভারতীয় চা, তুলো, পাট ও তামাক বিনা শুল্কে বিলেতে আমদানি করা হত। এর মধ্যে ব্রিটিশ বস্ত্র, লোহা ও ইস্পাতের স্থান ছিল না। ১৯২৭ থেকে টাটা আয়রন অ্যাণ্ড স্টিলের সঙ্গে ব্রিটিশ লোহা ও ইস্পাত ব্যবসায়ীদের সমঝোতা হয়েছিল। কলকাতার ব্রিটিশ বণিক চূড়ামণি এডওয়ার্ড বেন্থল (Benthall) চান যৌথ মূলধনী কোম্পানির মাধ্যমে ভারতীয় ও ব্রিটিশ শিল্পপতিদের সহযোগিতার ক্ষেত্র আরও প্রসারিত হোক। হোর চাইছিলেন ল্যাঙ্কাশিয়রের বস্ত্রশিল্পের সঙ্গে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের এ ধরনের বোঝাপড়া। ইয়েনের অবমূল্যায়নের ফলে জাপানী কাপড়ের বন্যা বয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু সমঝোতায় না এসে বিলেতের কটন ট্রেড লীগ দাবি করল ব্রিটিশ বস্ত্রশিল্পকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।[৩২] এর পেছনে ছিলেন চার্চিল। অন্যান্যরা অবশ্য সমঝোতার পথ নেয়। ফলে ১৯৩৩ সালে লীস-মোদি চুক্তি (Lees-Modi Pact) স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু তাতে বোম্বাই ও আমেদাবাদের দ্বন্দ্ব প্রকট হল। আমেদাবাদের কল মিহি সুতোর কাপড় তৈরি করত। বিলাতি কাপড়ের ওপর শুল্ক কমালে তারাই মার খাবে বেশি। তাতে বোম্বাই-এর মোদির কিছু যায় আসে না কিন্তু আমেদাবাদের কস্তুরভাই-এর ক্ষতি হয়। সুতরাং তিনি আলোচনা বর্জন করেন ও লীসের সঙ্গে মোদি চুক্তি সম্পাদন করেন।[৩৩]

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাবে দুই স্তরে দ্বন্দ্ব চলছিল—(১) ব্রিটিশ ও ভারতীয় মূলধনের মধ্যে ; (২) বোম্বে ও আমেদাবাদের বণিকদের মধ্যে। ইংরেজদের সঙ্গে বোম্বাইওয়ালাদের ভাব বেশি, অতএব আমেদাবাদ অর্থাৎ গুজরাটী ব্যবসায়ীরা কংগ্রেসকে সাহায্য করবে এতে আশ্চর্য কি ! মার্কোভিৎস বলেছেন সব বড় শিল্পপতিরাই আন্দোলনের



ভারতবর্ষ
(রাজনৈতিক)
স্কেল —ইংরাজী মাইল
দেশীয় রাজ্য
আফগানিস্থান
আরব সাগর
রাজপুতানা
কোয়েটা
করাচি
কর্কটক্রান্তি
পেশোয়ার
শ্রীনগর
রাওয়ালপিণ্ডি
লাহোর
অমৃতসর
মুলতান
বিকানীর
যোধপুর
আজমীর
উদয়পুর
কচ্ছ উপসাগর
কাম্বে উপসাগর
বরোদা
বোম্বাই
পুনা
নাসিক
গোয়া
ম্যাঙ্গালোর
কালিকট
কোচিন
লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ
মালদ্বীপপুঞ্জ
ভারত



৮০
৮৫
৯০
৯৫
তি ব্ব ত
মানস সরোবর
কাঠমণ্ডু
লক্ষ্ণৌ
কানপুর
এলাহাবাদ
পাটনা
গয়া
রাঁচি
কলিকাতা
ঢাকা
শিলং
চট্টগ্রাম
ব্র হ্ম দে শ
নাগপুর
কটক
পুরী
ব ঙ্গো প সা গ র
হায়দারাবাদ
ভিজাগাপত্তম
গোদাবরী
নেলোর
মাদ্রাজ
পণ্ডিচেরী (ফঃ)
কারিকল (ফঃ)
আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ
ত্রিকোমালী
সিংহল
ক্যাণ্ডি
ম হা সা গ র
নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ

ব্যর্থতা চেয়েছিলেন, কংগ্রেসের আসল সমর্থক ছিলেন ছোট ব্যবসায়ীরা।[৩৪] একথা পুরো সত্য নয়। বড়দের মধ্যেও ভাগ ছিল। তা ছাড়া রাজনীতি ও অর্থনীতিকে এত আলাদা করে দেখা যায় না। বিড়লা বেন্থলের মত সহযোগিতা চাইতে পারেন কিন্তু তিনিও জানতেন আসন্ন সংস্কারে বড়লাটের হাতে প্রভূত বিশেষ দায়িত্ব (special responsibility) ও ভিটো ক্ষমতা থাকলে ভারতীয় বণিককুলের সুবিধে হবে না।[৩৫] অটোয়া চুক্তি ও লীস-মোদি প্যাক্টে সকল ধনিকের সুবিধে হয়ওনি। নেহরু আত্মজীবনীতে লিখেছেন, **"Every Dominion wrung out the hardest terms from England (at Ottawa) but India had the privilege of making almost a gift to her।"**

একটা কথা বারবার ওঠে। ব্যবসায়ীদের দান নেবার ফলে কংগ্রেস তাদের অর্থদাস হয়ে গেছে, গান্ধী যেন পিতামহ ভীষ্ম ; কৌরবের অন্ন খেয়েছেন বলে অধার্মিক দুর্যোধনের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করেছেন। জ্ঞান পাণ্ডে বলতে চান ১৯২০ ও ১৯৩০-এর দশকে কংগ্রেস ভাণ্ডারের প্রধান উৎস ছিল বণিক ও শিল্পপতিরা। গোয়েন্দা দফ্তবের প্রতিবেদন (২০ জুলাই ১৯২৯), এলাহাবাদ কংগ্রেসেব অর্থনৈতিক অবস্থাবিষয়ক কাগজপত্র (জওহরলাল নেহরু মিসেলেনিয়াস কলেকশন), নরদেও শাস্ত্রীর "দেবাদুন আউব গাড়ওয়াল রাজনৈতিক আন্দোলন কা ইতিহাস ১৯১৮-৩১" এবং ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার থেকে তিনি প্রমাণ কবতে চেয়েছেন ইউ পি-ব বণিক ও শিল্পপতিরা প্রভূত অর্থ-সাহায্য করেছিল।ধনী উকিল, বড় জমিদাববা বাদ যাননি। প্রতিদানে কানপুরের বস্ত্র-ব্যবসায়ীদের বিলাতি কাপড় বিক্রয় করতে দেওয়া হয়। আগ্রা ও আলমোড়াতেও তাই।[৩৬] বিপান চন্দ্র আরও একটু এগিয়ে বলেছেন, গান্ধীর এগাব দফা দাবি (১৯২৯) যেন 'ফিকি' (FICCI)-র দাবির প্রতিধ্বনি।[৩৭] সুমিত সরকার তো স্বদেশী আন্দোলন থেকেই এই অশুভযোগ লক্ষ্য কবেছেন। এসব অভিযোগেব উত্তরে কিছু আগেই দেখিয়েছি শিল্পপতিদের মধ্যে যথেষ্ট দ্বিধা ছিল ; তাঁরা সবাই এক মন প্রাণ ছিলেন না, বরং বেশ কিছু সবকাবের দিকে ঝুঁকেই ছিলেন। তা ছাড়া ১৯২৯-৩২-এ প্রতিদান দেবার মত শক্তি কংগ্রেসের ছিল না। দ্বিতীয়ত পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সাম্যবাদী লেনিনও আপন উদ্দেশ্য সাধনেব জন্য অর্থ সাহায্যের উৎসের নীতিমূলক বিচার করেননি। রুশ বিপ্লব সফল করার জন্য—অর্থাৎ সুদূর সুইটজাবল্যান্ড থেকে রুশ বিপ্লবীদেব সংগঠন চালাতে, তাদের মধ্যে যোগাযোগ রাখতে, তাদেব জন্যে প্রচারপত্র ছাপতে, শেষে অর্থ ও অস্ত্র সংগ্রহ করতে লেনিনকে ব্যাঙ্ক, টিকিটঘর ও ট্রেন লুট সমর্থন কবতে হয। ক্রাসিন শিল্পপতি মরোজভ (Morozov)-এর কাছ থেকে নিযমিত অর্থ সাহায্য পেতেন। পারভুস (Purvus) জার্মান বিদেশ দফতব থেকে ও নিজের বেআইনী ব্যবসা থেকে যে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেন, তাঁর অনেকখানি বিপ্লবীদের সাহায্যে ব্যয়িত হয়। তার মানে এই নয় যে লেনিন তাঁব অনন্য উদ্দেশ্য—রুশ বিপ্লব—থেকে কোনওদিন বিচ্যুত হয়েছিলেন। পারভুসের মত ব্যক্তিগত বিলাসব্যসনেও তিনি অর্থ নষ্ট করেননি বা যুদ্ধকালীন জার্মান বৈদেশিকনীতির বেদীতে বিপ্লবের স্বার্থ বলি দেননি। জার্মেনীর সঙ্গে আলাদা সন্ধি করলে জাবতন্ত্র পুনর্জীবন লাভ করবে, সর্বহারার বিপ্লব হবে না। অতএব কিছুতেই তা হতে দেওয়া হবে না। জার্মেনীর সাহায্য যদি জারতন্ত্রকে ধ্বংস করতে সাহায্য কবে তবেই যিনি তা নেবেন। নচেৎ নয়।[৩৮] অনুরূপ অবস্থায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সংগ্রামে কংগ্রেস যদি ব্যবসায়ীদের সাহায্য নিয়ে থাকে, তাও পরিমাণে সামান্য—তা হল বাস্তবতার দিক থেকে লেনিন তাকে সমর্থন তো করতেনই, নীতির দিক

থেকেও তার মধ্যে কোন অন্যায় দেখতে পেতেন না। বিড়লা বা সারাভাই-এর কাছে টাকা খেয়ে গান্ধী ভারতবর্ষে সমাজতন্ত্র স্থাপন করতে দেননি বা জার্মেনী ও জাপানের অর্থসাহায্য নিয়ে সুভাষ বসু ভারতে ফাসিবাদী সরকার গঠন করতেন এর চেয়ে বড়ো 'মিথ' কমই আছে। জওহরলাল নেহরু ভারীশিল্পের ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, তিনিও ধনপতিদের হাতে আত্মা বিক্রয় করেননি। সে সব ক্ষেত্র বিস্তৃত হলেই, অর্থাৎ নির্বিচারে জাতীয়করণের নীতি গৃহীত হলেই, যে ভারতবর্ষের প্রগতি নিশ্চিত হত এমন কথা গর্বাচভের 'পেরেস্ত্রইকা' ও 'গ্লাসনস্তে'র নীতি এবং দেং সিয়াও পিং-এর উদার অর্থনৈতিক নীতির পরিপ্রেক্ষিতে আদৌ বলা যায় না। সত্যিকারের ঐতিহাসিক স্বীকার করবেন কিছু কংগ্রেসী নেতাদেব ও ধনপতিদেব ব্যক্তিগত অশুভ সম্পর্কের ফলে জাতীয় জীবনে আজ যে গভীর ও সুদূরচারী দুর্নীতি করাল কর্কট রোগের মত প্রকট হয়েছে তার জন্য ১৯২১-২২ বা ১৯৩০-৩২-এ কংগ্রেস ও ভারতীয় বণিক/শিল্পপতিদের অতি-শিথিল এবং দ্বিধাগ্রস্ত সম্পর্ক দায়ী নয়। আইন অমান্যের সময় থেকে গঙ্গা যমুনা কৃষ্ণা গোদাবরীতে অনেক জল গড়িয়ে গেছে।

॥ ২ ॥

Men will renew the battle in the plain
To-morrow; red with blood will Xanthus be,
Hector and Ajax will be there again;
Helen will come upon the wall to see.
Than we shall rust in the shade or shine in strife,
And fluctuate'tween blind hope and blind despairs.
And fancy that we put forth all our life,
And never know how with the soul it fares.

—Mathew Arnold

'অন্ধ আশা ও অন্ধ হতাশা'র মধ্য দিয়ে আবার আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হল। বন্দীর সংখ্যা যদি তার ব্যাপকতার একটা নির্দেশক হয় তবে ১৯৩২-৩৩-এ সাবা দেশে ৭৪,৬৭১ জন বন্দী খুব বেশি বলা চলে না। এর মধ্যে মহিলাব সংখ্যা ছিল ৩৬৩০। জনসংখ্যার হার অনুপাতে সবচেয়ে বন্দী এসেছিল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে। তারপর যথাক্রমে বোম্বাই, বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও বাংলার স্থান। শোভাযাত্রা, সভা, ইস্তাহার প্রচার তো ছিলই, এবারও বিদেশী দ্রব্য ও মাদক বর্জনের ওপর জোর দেওয়া হয়। নতুন একটা স্তর লক্ষিত হয়—রেল, ডাক, তার প্রভৃতি যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর আক্রমণ। প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ ঘটে অধিগৃহীত কংগ্রেস অফিস দখল করাব সময়। কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের দুই সচিব—জয়প্রকাশ নাবায়ণ ও লালজী মেহরা—সাইক্লোস্টাইল করা নির্দেশ ছড়িয়ে দিতেন।[৩৯] বোম্বাইতে গোপন বেতার মাবফত প্রচাব ব্যবস্থা হয়েছিল। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি আবার লোকমুখে বা সার্কুলার ছড়িয়ে নির্দেশ পাঠাত। তা কাজে পরিণত করত স্থানীয় সংগ্রাম পরিষদ ও 'ডিক্টেটর'। তখন ইটালি ও জার্মেনীতে ডিক্টেটরশিপ জনপ্রিয়তার তুঙ্গে। ফাসিজিমের স্বরূপ না জেনে অনেকেই তার ভক্ত। তা ছাড়া সরকারের ব্যাপক

দমননীতির পরিপ্রেক্ষিতে সুশৃঙ্খল পরিচালনার জন্য সর্বাধিনায়কের প্রয়োজন ছিল। তাঁকে গ্রেফতার করা হলে আর একজন তাঁর স্থান নিতেন। হার্দিকার ও জওহরলাল স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন জোরদার করেন। কিন্তু নেহরুর চিঠিতে বোঝা যায় হিন্দুস্থানী সেবাদল দানা বাঁধেনি। তবে ক্রমবর্ধমান কৃষি সংকট, করবৃদ্ধি, সরকারী কর্মী ছাঁটাই, টাকার মূল্য ১ শিলিং ৬ পেন্সে বেঁধে দেওয়া, ৯ অক্টোবরের প্রেস আইন, সন্ত্রাসবাদ দমনে অক্টোবর-নভেম্বরের অধ্যাদেশ অসন্তোষের ক্ষেত্র ভাল ভাবেই তৈরি করেছিল।

এতবড় কর্মকাণ্ড অথচ কেন্দ্রীয় কমিটি অর্থ সাহায্য করেছিল সোয়া লাখ টাকার ,মত। এর অধিকাংশই সাধারণের দান। বিড়লা বলছেন তিনি খাদি প্রচার ও হরিজন আন্দোলনের জন্য টাকা দিলেও আইন অমান্য বাবদ দেননি।[৪০] দু-একজন বড় ব্যবসায়ী দিয়েছেন, কিন্তু সে সব উৎস বন্ধ করার জন্য সরকার সদা সতর্ক ছিল। বস্তুত দ্বিতীয় আইন অমান্য আন্দোলনের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা ছিল অর্থাভাব। ১৯৩৩ সালে শুধু সেই কারণে বাংলা ও পঞ্জাবের স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী ভেঙে যেতে থাকে।

এ দফায় গুজরাটের আন্দোলন পূর্বেকার তীব্রতা হারায়। খেড়ার মাত্র পনেরোটি গ্রাম খাজনা দেয়নি। রাস গ্রামের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হার্ডিম্যানের মতে ষোল লাখ টাকার সম্পত্তি মাত্র বিশ হাজারে বরাইয়া ও মুসলিমরা কিনে নেয়। ফলে কন্যাপণের অভাবে রাসপটিদাবেরা সমাজে খেলো হয়।[৪০ক] পিটুনি পুলিশ বসানো হয়। বরোদা সরকার গুজরাটী পটিদারদের আশ্রয় দিতে অস্বীকার করে। সাম্প্রদায়িকতার বিস্ফোরণে আন্দোলন দুর্বল হয়ে যায়। সীমান্তে আব্দুল গফ্ফর খানেব অনুপম সংগঠন ক্ষমতা তো ছিলই, উপরন্তু ১৯৩১-এ রেড শার্ট দল কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়। বিশ্ব মান্দ্যের ফলে আন্দোলন জোরদার হয়। অধিকাংশ স্বেচ্ছাসেবী ছিল বেকার। সেনাবাহিনী ও পিটুনি কর যথেচ্ছ ব্যবহার করে গোলমাল থামানো হয়েছিল।

বিহারে জমিদারদের চাপ কম ছিল। তাই আক্রমণ চলে থানার ওপর।মজঃফরপুর, চম্পারন ও মুঙ্গের ছিল ঝটিকা কেন্দ্র। নেতাদেব গ্রেফতারের ফলে আন্দোলন প্রশমিত হয়। সরকাবের মাদক শুল্কজনিত আয় এবাবও মাব খায়। ১৯৩০-৩১ থেকে ১৯৩২-৩৩-এ এই আয় ১ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা থেকে কমে হয় ১ কোটি ২০ লক্ষ।[৪১]

বাংলার আন্দোলন সুভাষচন্দ্র ও যতীন্দ্রমোহনেব দলাদলিব ফলে বেশ ব্যাহত হয়। নেহরু বলছেন. দুই পক্ষ ওয়ার্কিং কমিটির কাছে পবস্পববিবোধী অভিযোগ আনতে থাকে এবং তার ফলে কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া যাযনি। ১৯৩১-এব মাঝামাঝি সুভাষ, সেনগুপ্ত দলের কর্তৃত্বে ঘা দিতে, মফস্বলের জেলাসমূহকে আইন অমান্যের ডাক দেন। প্রাদেশিক কমিটি তা অনেকদিন ঠেকিয়ে বাখে। নেতারা গ্রেফতার হওয়ার ফলে বেআইনী শোভাযাত্রা সফল না হলেও পিকেটিং ভালভাবেই চলে কলকাতায়। মুসলিম ও নমঃশূদ্রদেব অনীহার ফলে পূর্ববাংলাব গ্রামাঞ্চলে শান্তি বিঘ্নিত হযনি বললেও চলে। ত্রিপুরা ও মনয়মনসিংহে পাটের দাম পড়ে যাওয়ার ফলে যে খাজনা বন্ধ হয় তা ঠিক সবকাববিবোধী ছিল না। সেখানকাব ধনী পাট-চাষীরা জমিদারদের প্রতিভূ কংগ্রেসকেই দোষ দেয়। মৌলানা ভাসানি স্পষ্টতই সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে ছিলেন। আরামবাগে আন্দোলন হয় জমি পুনঃবন্দোবস্তের বিরুদ্ধে, মেদিনীপুরে লবণ আইন ও চৌকিদারী ট্যাক্সের বিরুদ্ধে। শুধু কাঁথির ৭৬টি য়ুনিয়ানের মধ্যে ৬৪টি আন্দোলনে নামে। গান্ধীবাদীদের অগ্রণী ছিলেন সুতাহাটা থানার কুমার জানা। কিন্তু তমলুকে অজয় মুখার্জি ও সতীশ সামন্ত চরমপন্থীদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কাঁথির নেতা ছিলেন প্রমথ ব্যানার্জি, ঈশ্বরচন্দ্র মাল,

নিকুঞ্জ মাইতি ও বসন্তকুমার দাস। মেদিনীপুরে প্রাদেশিক কংগ্রেসের নির্দেশের চেয়ে স্থানীয় নেতাদের নির্দেশের গুরুত্ব ছিল ঢের বেশি।[৪২] প্রাদেশিক রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত থেকে এই জেলা দূরে থাকতে চেষ্টা করেছে। মাহিষ্য নেতাদের প্রতি কলকাতার অভিজাত উচ্চবর্ণের বাবুদের অবজ্ঞার কথা অত শীঘ্র ভুলে যাওয়ার নয়। চৌকিদারী ট্যাক্স না দিলে গুর্খা পুলিশ পাঠানো হত ও তাদের অত্যাচার সহজেই অনুমেয়। তাদের ব্যয় বহন করতে হত দরিদ্র গ্রামবাসীদেরই। তবে সে ট্যাক্স তোলা সহজ হয়নি। "মেদিনীপুরের ইতিহাস" রচয়িতা নরেন্দ্রনাথ দাশের মতে জনগণ উত্তর দিয়েছিল সামাজিক বয়কটের মাধ্যমে। চৌকিদারদের সাহায্য করলে পতিত হতে হত। তমলুকের সংগ্রাম পরিষদের বিশদ বিবরণ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কাগজপত্রে পাওয়া যাবে।[৪৩] ১৯৩০-৩২-এর মধ্যে কাঁথিতে ভাগচাষী আন্দোলন প্রবল হয় জোতদারদের উপরি আদায়ের বিরুদ্ধে। প্রমথনাথ, ঈশ্বর মালরা একটা মীমাংসা করে দেন। জোতদার ও ভাগচাষীদের মধ্যে বিরোধ আন্দোলনকে দুর্বল করত। হিতেশ সান্যাল দেখিয়েছেন জোতদার ও ভাগচাষী কাউকে বাদ দিতে পারেনি কংগ্রেস। নিম্নবর্ণের অশিক্ষিত গ্রাম্য যুবকদের কংগ্রেসী আদর্শে অনুপ্রাণিত করা গিয়েছিল। হিজলি বন্দী নিবাসে তাদের সংখ্যাই ছিল সর্বাধিক।[৪৩ক]

বাংলার মুসলিম ও নমঃশূদ্রদের মতো পঞ্জাবের শিখরাও বিশেষ উৎসাহ দেখায়নি। ঢাকা, খুলনা, ফরিদপুর এবং যশোরে মুসলিম-নমঃশূদ্রদেব সঙ্গে জমি নিয়ে কলহ সাম্প্রদায়িক রূপ নেয় এবং কৃষকবা কংগ্রেস নেতৃত্ব ত্যাগ করে কৃষক-প্রজা দলের আওতায় চলে যায়। শিরোমণি আকালি দলের নিষ্ক্রিয়তা লক্ষণীয়। কংগ্রেসী ক্রিয়াকলাপের ফলে বেকারি বাড়ছে, এমন একটা ধারণা পাঞ্জাবীদের মনে বদ্ধমূল হয়েছিল।[৪৪] অন্ধ্রের উপকূলে খাজনা নিয়ে কিছু অশান্তি দেখা দিলেও মাদ্রাজের আন্দোলন শহরাঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। মাদ্রাজের বাইবে প্রাধান্য নেয় মাদুরা ও বিরুধনগর। উইলিংডন জানাচ্ছেন, এপ্রিলের মধ্যেই অবস্থা আয়ত্তে আসে। তানজোর ব্রাহ্মণ, ভেল্লালা ও কাল্লার মধ্যবিত্ত এবং সরকারী সেচ ব্যবস্থাব ওপব নির্ভর গ্রামীণ মালিকরা আনুগত্যের গণ্ডির মধ্যে ফিরে এসেছিল। তা ছাড়া খ্রীস্টান-অখ্রীস্টান-কাল্লার ও কাল্লার-ভেল্লারদের মধ্যে জেলা বোর্ড নিয়ে বিবোধ আন্দোলনকে দুর্বল করেছিল।[৪৪ক]

গান্ধী-আরুইন চুক্তি না হলে উত্তরপ্রদেশের কৃষক আন্দোলন যে আরও প্রবল আকার ধাবণ করত তাতে সন্দেহ নেই। নেহরু দুটো নীতিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন—(১) কোনমতেই পূর্ণ স্বরাজের লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হওয়া চলবে না ; (২) খাজনা বন্ধের আন্দোলন একাধারে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক। সরকারের সঙ্গে যদি সাময়িক রাজনৈতিক যুদ্ধবিরতি হয়ও তবু মান্দ্যের ফলে ঘনীভূত অর্থনৈতিক দুর্দশার প্রতিকারকল্পে অর্থনৈতিক আন্দোলন চলতে পারে।[৪৫] গান্ধী বিলেত রওনা হবার পূর্বেই মান্দ্য গভীরতর হয়। রবি শস্য বিনষ্ট হয়। তাই কংগ্রেস দখলদারী কিষাণদের ৫০% হারে ও স্ট্যাটুটারী প্রজাদের ৪০% হারে খাজনা দিতে বলে। নেহরু ইউ. পি. সরকারের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন।[৪৬] কিন্তু সরকার এ কাজ সুনজরে দেখেনি। নেহরু নাকি জমিদারি উচ্ছেদ ও সরকারের সোভিয়েতীকরণ চাইছেন। সরকার গান্ধীর কাছে নালিশ করল, নেহরু শ্রেণীসংগ্রাম চাইছেন ও চুক্তি ভাঙছেন। এমার্সন ও গান্ধীর মধ্যে যে কথাবার্তা হয় তাতে বোঝা যায় গান্ধী বিচলিত হয়েছেন।[৪৭] এর মধ্যে প্রথম গোলটেবিল বৈঠক থেকে ফিরে হেইলি ৬৭ লাখ টাকার রাজস্ব মকুব ঘোষণা করেন ও একই সঙ্গে রবি মরসুমের খাতে ২ কোটি ২০ লাখ টাকার খাজনা হ্রাস। বলা বাহুল্য, সরকারের নেকনজর জমিদারদের ওপরই ছিল বেশি।

কিন্তু মুশকিল হল এই ঘোষণায় খরিফ শস্যের জন্য বকেয়া খাজনা হ্রাসের কোন উল্লেখ ছিল না। বারাবাঁকি, রায়বেরিলি, লখনউ ও প্রতাপগড়ে খুব কম আদায় হল। আগ্রা, মীরাট ও এলাহাবাদে কিঞ্চিৎ বেশি। স্থানীয় পুলিশের সাহায্যে জমিদাররা শস্য দখল ও জমি বেদখল চালাল। মে মাসের মাঝামাঝি এমার্সনের সঙ্গে গান্ধীর দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার ঘটল।[৪৭ক] গান্ধী বললেন, গরীবের বন্ধু হিসাবে সরকারের সঙ্গে কিষাণদের হয়ে কথা বলার অধিকার কংগ্রেসের অবশ্যই রয়েছে, তবে খাজনা বন্ধ বা সামর্থ্যের কম খাজনা দেওয়ার নিন্দা করলেন তিনি। হেইলির সঙ্গে কথা বলার পর ২৩ মে গান্ধী যে মেনিফেস্টো প্রকাশ করলেন তাতে স্ট্যাটুটারী প্রজাদেব টাকায় অন্তত আট আনা ও দখলদারী চাষীদের অন্তত বার আনা দিয়ে দিতে বলা হল। এখানে তিনি প্রাদেশিক কমিটির নির্দেশের বিরুদ্ধে গেলেন। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন হেইলি।

জুনে সিংহল থেকে ফিরে নেহরু দেখলেন অবস্থার অবনতি হয়েছে। গান্ধীর হিংসার সম্ভাবনা সম্বন্ধে সতর্কবাণী তিনি আমল দিলেন না। গান্ধীকে সোজাসুজি প্রত্যাখ্যান না করে তিনি বললেন ২৩ মে-র মেনিফেস্টোতে সর্বোচ্চ হাবে খাজনা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কিন্তু যদি ঋণ করে বা লাঙল, গোমেষাদি বেচে বা অত্যাচারের চাপে খাজনা দিতে হয় তবে তা করা হবে না। তিনি গান্ধীর সঙ্গে সিমলা যান। উইলিংডনের সঙ্গে কথাবার্তাব সময় ঠিক হয় বিস্তৃত অনুসন্ধানের পর খাজনার হাব স্থির হবে। ১৯ ও ২০ জুলাই এমার্সনের সঙ্গে নেহরুর যে কথা হয় তাতে বোঝা যায় তিনি আদৌ অবুঝ বিপ্লবীর ভূমিকা নেননি।[৪৮] স্থানীয় সরকাব তাঁর অনুরোধ না শুনে খাজনা আদায় ও অনাদায়ে বেদখলী চালিয়ে যায়। নেহরু গান্ধীকে সব জানান, কিন্তু ইউ. পি.-র কিষাণ প্রসঙ্গে ওয়ার্কিং কমিটি সরকারের সঙ্গে সংগ্রাম চান না বুঝে ও গান্ধীর লণ্ডন যাত্রার প্রতিবন্ধকতা না করার জন্য পিছিয়ে যান। সর্বপল্লী গোপালের জওহর-জীবনীতে দেখা যাচ্ছে—বাকি খাজনার জন্য ১ অক্টোবর ১৯৩০ থেকে ৩১ জুলাই ১৯৩১-এর মধ্যে জমি বেদখলের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬৪,০৭৬—আগের দু বছরের তুলনায় সংখ্যাটা অনেক বেশি, জমির পরিমাণও।[৪৯] জওহরলাল কংগ্রেস সভাপতি প্যাটেলের মাধ্যমে তদ্বিব কবলেন কিন্তু দু টাকা পাঁচ টাকা বকেয়ার জন্য মারধর বন্ধ হল না। অথচ বায়বেরিলি জেলা কংগ্রেসকে আইন অমান্যের অনুমতি দেওয়া হল না। উপরন্তু ইউ. পি. কংগ্রেস কমিটি স্থাপিত অনুসন্ধানী কমিটি ঘোষণা করল তারা শ্রেণীসংগ্রাম চায় না, জমিদারী উচ্ছেদও নয়। এলাহাবাদের কলেক্টর মুডি যখন ১৯৩১-এর জন্য সামান্য ৯·৫ লাখ টাকার (১৭%) মকুব ঘোষণা করলেন, তখন নেহরুর ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল। গান্ধীকেও তিনি সব জানালেন। বুদ্ধিমান হেইলি মুডিকে সরিয়ে ও আরও কিছু মকুব অনুমোদন করায় ওয়ার্কিং কমিটি হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। হেইলি নেহরু ও কংগ্রেসের মধ্যে ক্রমবর্ধমান পার্থক্য দেখে খুশি হলেন।[৫০] একটু বেশি তাড়াতাড়ি। প্যাটেলও বাধ্য হয়েছিলেন আলোচনাকালে এলাহাবাদের কিষাণদের খাজনা দিতে বারণ করতে। ক্রুদ্ধ ক্রেরার ইউ. পি. সরকারকে কংগ্রেসীদের বিরুদ্ধে দমননীতি প্রয়োগ করতে নির্দেশ দিলেন। নেহরু বলছেন—এই ত্রিশঙ্কু অবস্থা ('hybrid state') তাঁর সহ্য হয়নি। অন্যদিকে উইলিংডন তাঁকে ধরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজে নির্বাসন দিতে চেয়েছিলেন!

যাই হোক, ৬ ডিসেম্বর রায়বেরিলি, এটাওয়া, কানপুর, উনাও ও এলাহাবাদের কিষাণদের খাজনা বন্ধ আন্দোলন শুরু করার অনুমতি দেওয়া হল। গান্ধী ফিরলে অবস্থার অবনতি হবে বুঝে হেইলি এক অধ্যাদেশ জারি করলেন যার দ্বারা নেহরু ও অন্য নেতাদের

আন্দোলন বিষয়ে লেখা বা বক্তৃতা দেওয়া নিষিদ্ধ হল,নেহরুর এলাহাবাদ ত্যাগও। শেষোক্ত অপরাধে তাঁকে ২৬ ডিসেম্বর গ্রেফতার করা হল। এটা উইলিংডনেব নিরঙ্কুশ দমননীতির নান্দীমুখ মাত্র। হোরের চিঠিতে জানা যায় তিনি খুশি না হলেও সমর্থন করেছিলেন ; আর উইলিংডন গর্বের সঙ্গে বলেছিলেন, তিনি 'ভারতেব মুসোলিনি' হতে চলেছেন।[৫১] হেইলির মতো ঝানু লোকের ধাবণা হয়েছিল নেহরু ভারতে লেনিন মার্কা প্রলেতারীয় স্বৈবতন্ত্র স্থাপন করতে চান।

আগ্রা ও রায়বেবিলির আন্দোলনের বিস্তৃত বিশ্লেষণ করেছেন জ্ঞান পাণ্ডে।[৫২] কংগ্রসী নেতৃত্বের সীমাবদ্ধতার সমালোচনা কবেছেন তিনি। নেহরু সর্বশ্রেণীর স্বার্থের কথা ভেবেছিলেন, অর্থাৎ জমিদারদেবও। গান্ধীর "মেনিফেস্টো টু দ্য কিযাণস্" ও "অ্যাপিল টু দ্য জমিনদাবস" উভয় যুযুধান পক্ষের প্রতি সংযমেব নির্দেশ। পাণ্ডে এই দৃষ্টিভঙ্গিকে **"umbrella approach"** আখ্যা দিয়েছেন। সরকারী দমননীতি ও কংগ্রেসী দ্বিধার মধ্যে নিষ্পিষ্ট কিষাণদেব প্রতিবোধ ভেঙে গিয়েছিল। হেইলি ১৯৩২-এব মাঝামাঝি ফিগুলেটারকে লিখছেন, কানপুব ও এলাহাবাদ জেলা ছাড়া **"the no-tax campaign does not exist any more."**

জ্ঞান পাণ্ডের মন্তব্য **"The U. P. Congress volt-face on the question of peasant protests following the Gandhi-Irwin agreement was surely one of the most bizzarre episodes in the history of Civil Disobedience Movement and one of the most significant."**[৫৩] মাও-জে-ডং-এব উক্তি উদ্ধৃত করে তিনি বলতে চেয়েছেন, কোনো অনগ্রসর আধা-উপনিবেশে যখন বুর্জোযা নেতৃত্বে জাতীয আন্দোলন ঘটে তখন গ্রামীণ সামন্তশ্রেণীই সবচেযে বেশি বাধা দেয। এদের মাধ্যমেই সাম্রাজ্যবাদীবা আধিপত্য বজায় রাখে। সাম্রাজ্যবাদের এই ভিত্তি ভেঙে না ফেললে তাকে হটানো যায় না। সাব-অলটার্ন ঐতিহাসিক পাণ্ডে মাঝারি ও দবিদ্র চাষীদেব 'স্বতঃস্ফূর্ত' এবং কখনো কখনো সহিংস প্রতিরোধের মধ্যে সমস্যাব সমাধান পেয়েছেন। এলাহাবাদেব ভাটওযাবিযা ও বাযবেরিলিব আরখায় কিষাণরাই কংগ্রসকে বাধ্য করেছে জমিদারদের ওপব চাপ দিয়ে খাজনা কমাতে। তাদেরই চাপে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির দাবিব তালিকায় জমিদারী উচ্ছেদ স্থান পেয়েছে। ইউ পি কংগ্রেসের অ্যাগ্রেরিয়ান এনকোয়াবি কমিটির ১৯৩১ ও ১৯৩৬-এব দুটি রিপোর্ট তুলনা করলে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন লক্ষিত হবে। তবে ভূমিহীন চাষীরা তখনও কংগ্রেসের মানচিত্রে স্থান পায়নি। জওহরলালের আত্মজীবনী যে সব দরিদ্র ও মাঝারি মালিক চাষীকে **"a fine body of men and women"** বলে স্বীকার করেছে তাদেরই জন্য রচিত হয়েছিল ১৯৩৯-এর টেনান্সি অ্যাক্ট।

পাণ্ডের মতে কংগ্রেসের গণআন্দোলন পরিচালনাব সীমাবদ্ধতা ফুটে উঠেছে প্রেমচন্দের 'গোদান' উপন্যাসে (১৯৩৬)। পার্শ্ববর্তী গ্রামের আহির মুখিয়ার কাছ থেকে হরি গরু পেয়েছে দান হিসাবে। তখুনি তার প্রতি ঈর্ষা জেগেছে প্রতিবেশীদের। তার নিজের ভাই বিষ খাইয়ে মেরেছে গরুটাকে। ইতিমধ্যে হরি জানতে পেরেছে তার একমাত্র ছেলে মুখিয়ার বিধবা কন্যাকে অন্তঃসত্ত্বা করে পালিয়েছে। সমস্ত পরিবারের ওপর নেমে এসেছে দুরপনেয় কলঙ্ক। হরি বছরের আখ বিক্রি করে একটি টাকাও বাড়ি তুলতে পারেনি—মহাজন তার কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছে এক শো কুড়ি টাকা। আরও দেনা বাকি। হরি স্ত্রীকে বলেছে শ্রমিক হয়ে সে রুজি রোজগার কববে। স্ত্রী উত্তর দিয়েছে—গ্রামে কাজ কোথায় ?

কোথাও হরি তার পাশে কংগ্রেসকে দেখতে পায়নি। 'গোদান' কাহিনীকে প্রতীক রূপে ব্যবহার করে পাণ্ডে বলতে চেয়েছেন আন্দোলনের সামাজিক গভীবতা (social depth) কমেছে, বাড়েনি।

আমবা শবৎচন্দ্রের "মহেশ" বা "অভাগীব স্বর্গ"-এর কথা তুলব না, প্রতিতুলনা হিসেবে উল্লেখ করব তাবাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যাযেব "গণদেবতা" ও "পঞ্চগ্রাম"। সেখানে কংগ্রেসেব পক্ষে জনমত সংগঠন করছে দেবু মাস্টাব। তাব সঙ্গে অনিবার্য সংঘর্ষ ঘটছে উচ্চবর্ণের, উচ্চবিত্তেব, শয়তান মহাজনের—অবশ্যই পুলিশের। কিন্তু যে নৈপুণ্যেব সঙ্গে তারাশঙ্কব গ্রামীণ জীবনের অন্তর্নিহিত ও বহুস্তব দ্বন্দ্ব (শুধু শ্রেণীতে শ্রেণীতে নয়, জাতপাতে, শিক্ষিত-অশিক্ষিতে, ইংরাজি শিক্ষিত-সংস্কৃত পণ্ডিতে, কৃষি ও কারুশিল্পনির্ভব মানুষ ও শহুবে শিল্পনির্ভব মানুষে) উদ্‌ঘাটন কবেছেন প্রেমচন্দের উপন্যাসে তা অনুপস্থিত। তাকে উডিয়ে দেওযা যায় না। তাই আন্দোলনকে সমাজের গভীরে ছডিযে পড়তে দেয়নি। ভারতের সমস্যার তুলনায় চীনেব সমস্যা অনেক কম ছিল। চীনেব জাতীয়তাবাদ প্রভাবিত সাম্যবাদী আন্দোলনের এক প্রতিপক্ষ ছিল সাম্রাজ্যবাদ, অন্য প্রতিপক্ষ—সামন্ততন্ত্র। সেখানে হিন্দু-মুসলিম, ব্রাহ্মণ-কাযস্থ, কামার-কাহাব, দখলদার, কোর্ফা, ভাগ ও ভূমিহীন চাষীব, ভাষা-সংস্কৃতির এত হাজাবরকম বিভেদ ছিল না। শুধু মাও-জে-ডং-এর বাণী উদ্ধৃত কবলেই কোনো সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হয না। অহিংস ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন চালিযে "ধাত্রীদেবতা"ব শিবু যে "গণদেবতা"র দেবুতে উত্তীর্ণ হযেছিল সেইটুকুই লাভ।

তাবাশঙ্কবেব বীবভূমের পাশেব জেলা বাঁকুডায় কি ঘটছিল তার ছবি তুলেছেন হিতেশরঞ্জন · সান্যাল। মদনমোহনপুব গ্রামের ব্যবসায়ী জমিদার দালালের বিরোধিতা কবেছিল পাশের গ্রামের (জমুনা রৈরীর) সম্পন্ন চাষী ও আনাজ ব্যবসায়ী সদ্‌গোপ এবং স্বগ্রামে বাসন ব্যবসায়ী চক্রবর্তী। দালালরা বিদেশী কাপড়ের ব্যবসা করত ও বিদেশী সুতো তাঁতিকে দিযে কাপড বোনাত বলে সদগোপ ও চক্রবর্তী বয়কট চালায়। কোতুলপুর ও শিবোমণিপুরে জমিদারদেব প্রতিপক্ষ ছিল গন্ধবণিকরা। তারা কংগ্রেসে যোগ দেয়। সিহড় ইউনিয়নে সদগোপ জমিদার স্থানীয় ব্রাহ্মণ জমিদাবদের চেয়ে কম মর্যাদা পেত বলে কংগ্রেস সমর্থন করে। সিমলাপাল রাজবংশের বিবোধিতা করেছিল তারই জ্ঞাতিবংশ। জেলা পর্যায়ে কংগ্রেসীদের মদত দেয় বড় ব্যবসায়ী ও চালকলের মালিক গোয়েঙ্কা, দত্ত, নন্দী, সামন্ত, সাহানারা। সান্যালের আর্থ-সামাজিক ভাগ ছিল নিম্নরূপ :[৫৪]

ক্ষেতমজুর, ভাগচাষী ও ছোট চাষী	৫১·৬%
মাঝারি চাষী	·৮.৯০%
ছোট ব্যবসায়ী ও শিল্পশ্রমিক	.৪.৭৯%
জোতদার, মহাজন, বড় ব্যবসায়ী	২.৪০%
জমিদার	২.৮০%

কংগ্রেসের মধ্যে এত বিপরীতমুখী শক্তির সহাবস্থান বেশিদিন শান্তিপূর্ণ থাকতে পারে না। অপেক্ষাকৃত বড়লোকদের নিয়ন্ত্রণও অবিসংবাদিত। আন্দোলনের দুর্বলতার এ সব মৌল দিক বিস্মৃত হলে চলবে না। তা ছাড়া ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস সামনে রেখে, দরিদ্র, ভূমিহীন, কৃষক ও দিনমজুর সম্পর্কে মাতিয়ে (Mathiez)-র রোমান্টিক ভাবালুতা ত্যাগ করে লেফেভ্‌র (Lefebvre)-এর মত মোহমুক্ত হতে হবে।

'অর্ডিন্যান্স রাজে'র প্রকোপে[৫৪ক] গান্ধীর দ্বিতীয় পর্বের আইন অমান্য আন্দোলন যখন

স্তিমিত হয়ে আসছে তখন শাসন সংস্কার বিষয়ে আলোচনা পড়েছিল সংকটের মুখে। ডেভিডসন কমিটির রিপোর্টে পড়ি, রাজন্যবর্গ যে সব শর্তে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো মেনে নিতে চাইছিলেন তার প্রথমটাই হল ব্রিটেনের সঙ্গে সব সন্ধি অটুট থাকবে। দ্বিতীয়ত, নওনগরের জামসাহেবের মত অনেকে বলছিলেন, অভ্যন্তরীণ প্রশাসনে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ চলবে না, অথচ প্রয়োজন হলে রাজারা ব্রিটেনের সাহায্য পাবেন। অর্থাৎ প্যারামাউন্ট্সির ছত্রচ্ছায়া তাঁরা ছাড়বেন না।[৫৫] চেম্বার অফ প্রিন্সেসের প্রস্তাবে পড়ি, ফেডারেশন মেনে নিলেও তাঁরা সরকারের কাছে যোগদান চুক্তি (instrument of accession) নিয়ে আলাদা আলাদা আলোচনা চাইবেন।

সাম্প্রদায়িক সমস্যার ব্যাপারে জিন্না আগেই (১৯৩০-এর জানুয়ারি) বলেছিলেন তাঁর চৌদ্দদফা দাবি মানতে হবে এবং মহম্মদ আলি তাঁর সঙ্গে একমত হন। লাহোর কংগ্রেস নেহরু রিপোর্ট মেনে নেওয়ায় আনসারি এত ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন যে ওয়ার্কিং কমিটি থেকে তিনি পদত্যাগ করেন।[৫৫ক] গান্ধী চাইছিলেন একপক্ষ (তাঁর মতে, হিন্দু) ক্ষতি স্বীকার করুক কিন্তু মুঞ্জে তাতে রাজি ছিলেন না। অন্যদিকে ফজল-ই-র ভয় ছিল জিন্না কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকবেন। জিন্নাকে নিরস্ত করতে তিনি সাফাত আহ্‌মদ খাঁ ও জাফরুল্লা খাঁকে গোলটেবিল বৈঠকে পাঠান। সাফি পৃথক নির্বাচন আঁকড়ে ধরে থাকেন। ফিরোজ খাঁ নুন আগা খাঁকে জানান পাঞ্জাবী মুসলিমরা পৃথক নির্বাচন ত্যাগ করবে না।[৫৫খ]

আসল কথা সাফি চাইছিলেন অন্তত চারটি প্রদেশে পূর্ণ মুসলিম শাসন। মহম্মদ আলির ম্যাকডোনাল্‌ড্‌কে লেখা শেষ চিঠিতে আছে পঞ্জাব ও বাংলায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা খুব বেশি নয়, তাই ওই দুই প্রদেশে মুসলিম আসন সংরক্ষণ কবতেই হবে। ১৯৩০-এব ২৯ ডিসেম্বর ইকবাল লীগের সভাপতিরূপে বলেন— পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান এক লপ্তে আমাদেব চাই।[৫৫গ] এখানেই 'পাকিস্তান' ভাবনার বীজ রোপিত হল।

শিখদের পক্ষ থেকে সর্দার উজ্জ্বল সিং ও সম্পূরণ সিং বললেন, শিখদের ভাগে মাত্র ১৯% আসন পড়েছে। তা অত্যন্ত কম, অন্তত ৩০% দিতে হবে। মুসলিমদের ৫১% আসন দিতেও তাঁরা রাজি হলেন না।

প্রথম বৈঠকের শেষে ম্যাকডোনাল্‌ড্‌ বলেন, কোনো বাঁটোয়ারা চাপাবার ইচ্ছে তার নেই। কিন্তু হেইলির সংগ্রহে তাঁর Note on Hindu-Muslim Representation-এর খসড়ার নকল পাওয়া গেছে। এদিকে গান্ধী দ্বিতীয় বৈঠকে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছেন। গান্ধী জমিয়ত-উল-উলেমা কনফারেন্সে বলেন, "মুসলমানরা যা চায় আমি দেব। আমি বাণিয়ার মত আচরণ করতে চাই না।" সিমলায় এক মুসলিমদের বৈঠকে (১৮ এপ্রিল ১৯৩১) গান্ধীর গ্রহণের জন্য মুসলিম দাবির খসড়া তৈরি হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন আনসারি, আলি ইমাম, জিন্না, আগা খাঁ, শৌকৎ আলি ও কিফায়েতুল্লা। আবদুর রহিম, ইকবাল, কোয়ায়ুম, গজনভি ও হারুন প্রধান মুসলিম প্রদেশগুলির প্রতিনিধিত্ব করছিলেন। কিন্তু লীগের পক্ষ থেকে বলা হয় যৌথ ভোটাধিকারের বিষয়টা রেফারেন্ডামে দিতে হবে পৃথক নির্বাচিত সংসদের পঞ্চম বছরে। আর বয়স্ক ভোটাধিকার প্রবর্তিত হলে দশ বছর পরে যৌথ নির্বাচন শুরু হবে, যদি যুক্তরাষ্ট্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমরা তা পূর্বাহ্নে মেনে নেয়। জাতীয়তাবাদী মুসলিমরা বলেন—যৌথ নির্বাচন দিয়ে শুরু হোক, রেফারেণ্ডাম না হয় দশ বছর পরে হবে। দরকার হলে প্রথম নির্বাচনের সময় ৫০% যৌথ ভোট ও ৫০% পৃথক

ভোটের ব্যবস্থা হতে পারে। ক্রমশ যৌথ ভোটের অংশ বাড়বে। ২৯ মে ১৯৩১ নিখিল ভারত মুসলিম কনফারেন্স প্রথম নির্বাচনে পৃথক ভোটের ওপর জোর দেয়। মুসলিমরা নিজেরা ঝগড়া করলে গান্ধী কি করবেন ? শিখরা যদি লিয়ালপুর ও মন্টগোমারী জেলা ছাড়া গোটা রাওলপিণ্ডি ও মুলতান বিভাগ পঞ্জাব থেকে বের করতে চায় তাহলে অন্যরা কি তাই মেনে নেবে ? ঝগড়াঝাটির বহর দেখে নভেম্বর মাসেই উইলিংডন বলছেন, ভারতসচিবকেই সাম্প্রদায়িক সমস্যার ব্যাপারে 'হুকুম' দিতে হবে। পরিশ্রান্ত গান্ধী ব্রিটিশ সরকারেব ওপর দোষারোপ করে বলেন, শাসন সংস্কারে এ ব্যাপারটাকে এত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে কেন ? "হিন্দু মুসলমান সমস্যার সমাধান হবে স্বরাজসৌধের চূড়া, ভিত্তি প্রস্তর নয়।" তখন মুসলমানরা অন্য সংখ্যালঘুদের সঙ্গে এক প্যাক্ট করে বসলেন—যার প্রধান দাবি ছিল পৃথক নির্বাচন ও ওয়েটেজ এবং পঞ্জাব ও বাংলায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার গ্যারাণ্টি। পিছনে রক্ষণশীল দল ও অ্যাসোসিয়েটেড চেম্বার অব কমার্সের নেতা এডোয়ার্ড বেন্থল ইন্ধন যোগাতে লাগলেন। ম্যাকডোনাল্ড্‌কে দিয়ে বলান হল এই জটিল বিষয়ে তিনি নিজেই রোয়েদাদ দেবেন। আর মুসলিমরা বলল রোয়েদাদ না বেরোলে শাসন সংস্কার বিষয়ে আলোচনায় তারা বসবে না। এ সময়কার উইলিংডনের চিঠি পড়লে বোঝা যায় গান্ধীর প্রত্যাবর্তনের পর আইন অমান্য ফের শুরু হবে আশঙ্কায় বড়লাট মুসলিমদের যে কোন উপায়ে তুষ্ট রাখতে চাইছিলেন। আগা খাঁ তাই চান। হোরকে তিনি লিখলেন, "It is our inherent interest to work hand in hand with Great Britain but also to see that the result of their cooperation is not our being handed over by Great Britain to Hindu domination". হেইলি বড়লাটকে জানালেন মুসলমানরা "an assurance of the best possible bargain" প্রত্যাশা করে। গজনভি ও নাজিমুদ্দিন ছোটলাট অ্যাণ্ডারসনকে জানালেন—বাংলায় অন্তত ৫১% আসন মুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত করতে হবে। ইতিমধ্যে অনুন্নত হিন্দুদের মধ্যে দু'দল হয়ে গেছে। এক দলের নেতা আম্বেদকর। তিনি সম্পূর্ণ পৃথক ভোটের পক্ষে। অন্য এক দলের নেতা আম্বেদকরের প্রতিদ্বন্দ্বী এম. সি. রাজা। রাজা ও মুঞ্জে পৃথক পৃথক ভোট চাননি, আসন সংরক্ষণ ভিত্তিক এক চুক্তিও করেন।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার যে খসড়া তৈরি হয়েছিল তার রচয়িতা ছিলেন সাইমন, আরুইন ও লোথিয়ান। তা সংশোধন করেন হোর। হোরের ৫ আগস্টের চিঠিতে পড়ি এই বাঁটোয়ারায় হরিজনদের জন্য দু দফায় ভোটের ব্যবস্থা হয়েছিল। প্রত্যেক সংরক্ষিত আসনের জন্য প্রথম দফায় তারা পৃথক নির্বাচন করবে। এ ব্যবস্থা আপাতত বিশ বছরের জন্য চালু থাকবে। কেলকার ও জয়াকর সোজাসুজি বাতিল করলেন না কিন্তু মহাসভা করল। বাংলা ও পঞ্জাবে মুসলিমদের পৃথক নির্বাচন ও ওয়েটেজ বজায় থাকল। বাংলার লাট স্যার জন অ্যাণ্ডারসনের মতে ২৫০ জনের আইন পরিষদে হিন্দুদের ভাগে ১০৭ ও মুসলিমদের ভাগে ১১১ হওয়া উচিত।[৫৬] ভারত সরকার কিন্তু বাংলার হিন্দুদের ৯৬টির বেশি আসন দিতে চাননি। এর মধ্যে তাঁরা মাত্র ১০টি আসন হরিজনদের জন্য সংরক্ষিত রাখতে চেয়েছিলেন। উইলিংডন জানান বাংলার হিন্দুদের প্রতি বেশি সদয় হলে ইউ.পি.ও পঞ্জাবের মুসলিমরা বিরক্ত হবে।[৫৭] "We shall have the whole forces of the country against us, Hindus and Muslims...We can not afford wholly to be without friends".[৫৮] এর পর ব্রিটিশ ক্যাবিনেট নিম্নলিখিত হারে আসন বন্টন করেন। (দ্রষ্টব্য সারণী)

বাংলা		
সাল	মুসলিম	হিন্দু
১৯১১	৩৯	৪৬
১৯৩২	১১৯	৮০

পাঞ্জাব		
মুসলিম	হিন্দু	শিখ
৩০	২৯	১২
৮৬	৪৩	৩২

বাংলার হিন্দু আসনেব দশটি হবে হবিজনদেব জন্য সংরক্ষিত। তাদেব দু'পর্বে ভোট দিতে দেওযা হবে। বলা বাহুল্য. মুসলমানবা খুব খুশি হবে, হরিজনরাও।

॥ ৩ ॥

ষোল আগস্ট ম্যাকডোনাল্ড সাম্প্রদায়িক বাঁটোযারা ঘোষণা কবলেন। তাব আগেই জ্ঞানপাপী হোব লিখেছিলেন, "The communal fat will...be in the fire." গান্ধী দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে বলেছিলেন প্রাণের শুল্কে তিনি হবিজনদের পৃথক নির্বাচন ঠেকাবেন। ঘোষণাব অল্প আগে (১ মার্চ) তিনি হোরকে আবাব সে কথা মনে করিয়ে দেন। ১৮ আগস্ট তিনি প্রধানমন্ত্রীকে জানালেন—ধর্ম ও নীতিব দিক থেকে হিন্দু ঐক্যের ওপব এত বড আঘাত তিনি সহ্য কববেন না। ২০ সেপ্টেম্বর থেকে আমৃত্যু অনশন শুরু করবেন। "...the contemplated step is not a method, it is part of my being. It is a call of conscience which I dare not disobey..." মহাদেব ও বল্লভভাই অনশনের ব্যাপারটা পছন্দ করেননি, নেহরু তো করবেনই না। উইলিংডন মনে করলেন এভাবে গান্ধী তাঁর লুপ্ত মর্যাদা ও প্রভাব পুনরুদ্ধার কবাব চেষ্টা করছেন। ম্যাকডোনাল্ড ভাবলেন অনশন কবে গান্ধী হরিজনদের জন্য সংরক্ষিত আসন কমাতে চাইছেন। কিন্তু গান্ধীর উদ্দেশ্য ছিল অস্পৃশ্যতা সমস্যাব প্রতি হিন্দুসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ, তাদের বিবেকের উদ্বোধন।[৫৯]

গান্ধীর আবেগকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়েও পুণা চুক্তির সমালোচনা না করে পারা যায না। এ কথা ঠিক যে মর্লে-মিন্টো সংস্কার মুসলিমদের পৃথক ভোটাধিকার ব্যবস্থা সাম্প্রদায়িক বিভেদ অনেক বাড়িয়ে দেয়। অধিকাংশ মুসলিম জাতীয়তার মূল স্রোত থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। হিন্দুদের ক্ষেত্রে জাতপাত নিয়ে যত অভ্যন্তরীণ বিরোধই থাক না কেন, তারা অন্তত একসঙ্গে ভোট দিত, অর্থাৎ রাজনীতির ক্ষেত্রে একই যুক্তফ্রন্ট বজায় রাখত। অস্পৃশ্যদের ও অনুন্নতদের পৃথক ভোটাধিকার দিলে তা অবশ্যই ভেঙে যাবে। তদুপরি জাতপাতের বিরোধ, অস্পৃশ্যতার গ্লানি কোন দিনই ঘুচবে না, বরং প্রথাবদ্ধ হয়ে যাবে। ১৯২৪ সাল থেকে হিন্দুসমাজের এই ক্ষতের দিকে তাঁর দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয় এবং হরিজন আন্দোলন তার ফলশ্রুতি। তাঁর বিশ্বাস ছিল ভালবাসা ও সততার সঙ্গে চেষ্টা করলে

এ ক্ষত একদিন নিরাময় হবে। তিনি বর্ণাশ্রমধর্মকে উৎখাত কবতে চাননি, নিম্নবর্ণের প্রতি উচ্চবর্ণের সামাজিক দায়িত্বের ওপর জোর দিতে চেয়েছিলেন : কোনো বর্ণযুদ্ধের জিগির তোলেননি, সবাইকে নিজ নিজ স্বভাব (ধর্ম) অনুযায়ী কর্তব্য পালনের মাধ্যমে সমাজকে অধিকতর সংহত করতে বলেছিলেন। জলাচরণ, স্পর্শদোষ, মন্দির প্রবেশের অধিকার, এক পথে গমনাগমন ও এক প্রতিষ্ঠানে (বিদ্যালয়ে)-র সুযোগ গ্রহণ নিয়ে বাদানুবাদকে তিনি মনুষ্যত্ববিরোধী বলে মনে করতেন। গান্ধীজী সর্বদা মনে করতেন হিন্দুধর্মের মূল তত্ত্বের সঙ্গে এর কোন যোগ নেই। অনশনের দ্বারা একথাই তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন বৃহত্তর হিন্দুসমাজকে।

বিবেকেব বোধন কতদূর হয়েছিল তা বলা সম্ভব নয় কিন্তু তাঁর অনশনের সুযোগ নিয়ে অনুন্নত শ্রেণীর মুখপাত্র আম্বেদকর অনেক সুবিধা আদায় করেছিলেন।[৬০]

পুণা চুক্তির বিশ্লেষণে কি পাচ্ছি আমরা ? (১) গান্ধী প্রাথমিক ও দ্বিতীয় স্তরের নির্বাচন মেনে নিলেন। প্রাথমিক স্তরে প্রতি সংরক্ষিত কেন্দ্রে অনুন্নত শ্রেণী ৪ জন করে প্রতিনিধি পৃথক ভোটে নির্বাচন করবে। এ ব্যবস্থা চলবে দশ বছর। যদিও ব্রিটিশ ক্যাবিনেট বিশ বছরের কথা বলেছিল তবু প্রাথমিক স্তরে পৃথক ভোটাধিকার মেনে নেওয়া কি গান্ধীব ঘোষিত নীতিব পরাজয় নয় ? (২) তাদের জন্য আসন সংবক্ষণ বজায় থাকল। (৩) ম্যাকডোনাল্ডের বাঁটোয়ারা অনুযায়ী তারা সারা ভারতে প্রাদেশিক আইন পরিষদে পেত ৮১টি আসন (বাংলায় মাত্র ১০টি)। পুণা চুক্তি অনুযায়ী তারা সারা ভারতে পেল ১৪৮টি আসন (যার মধ্যে বাংলায় তাদের জন্য নির্দিষ্ট হল ৩০টি)।[৬১] বাজা-মুঞ্জে চুক্তিতে তারা সারা ভারতে পেত ২৬৫টি আসন। গান্ধী তা কমিয়ে ১৪৮ করলেন ঠিকই, কিন্তু বাংলায় কুড়িটি আসন বাড়িয়ে বর্ণহিন্দুদের সর্বনাশ করলেন। এ ছাড়াও ফেডারেল সংসদে সাধারণ আসনের ১৮% পেল তারা। অর্থাৎ ১৯০৯ সালে গোখ্‌লের উদারনীতির সুযোগ নিয়ে মর্লে-মিন্টো মুসলমানদের যে ঢালাও সুবিধা দিয়েছিলেন, ১৯৩২ সালে গান্ধীব উদারনীতি অনুন্নত হিন্দুদের সে সুযোগ দিল। মাথা-গণনাভিত্তিক গণতন্ত্রে এটা হয়তো অন্যায্য নয়। এত শত বছরের হরিজন-নির্যাতনের পরিপ্রেক্ষিতে হয়তো এটাই সুবিচার। কিন্তু ব্রিটিশ বিভাজননীতি আবার ফায়দা ওঠাল। গান্ধীর হরিজনদের তাব্য বোঝাল যে মুসলমানও সংখ্যালঘু, তারাও সংখ্যালঘু; অতএব মুসলমানদের সঙ্গে চললে তাদের স্বার্থ বেশি সংরক্ষিত হবে। এখন থেকে বাংলার রাজনীতিতে মুসলিম ও হরিজন এক গাঁটছড়ায় বাঁধা পড়ল। তার পুরোহিত ও সাক্ষী হল ইউরোপীয় এম এল এ-রা।

১৯৩১-এর জানুয়ারিতে বি. পি. সিংহরায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, তুলসী গোস্বামী, প্রমথনাথ টেগোর, বি. সি. চ্যাটার্জী ও জে. এন. বসু প্রমুখ বাঙালী নেতারা উইলিংডনের সঙ্গে দেখা করে পুণা চুক্তির বিরোধিতা করলেন। উইলিংডন লিখছেন, "The Hindu position here is certainly very hard. Under the pact they have had a further 20 seats taken away from them and handed over to the depressed classes, with the result that they will be in a small minority in the new Council and this notwithstanding the fact that they are in Bengal the chief men of influence both educationally and meterially..."[৬২] এ বিষয়ে সুভাষচন্দ্রের 'লিবার্টি' (১৭ আগস্ট ১৯৩২) ও সেনগুপ্তের 'অ্যাডভান্স' (১৮ আগস্ট ১৯৩২)-এর প্রতিবাদের সুর এক।[৬৩] উভয়ের মতে সব নিম্নবর্ণের লোকরাই অনুন্নত নয়। তারা কেন অন্যায় সুযোগ পাবে বর্ণহিন্দুদের স্বার্থ ব্যাহত

করে ? আটটি আসন হারিয়ে পাঞ্জাবী হিন্দুরা অবশ্যই ক্রুদ্ধ হল।

মজার কথা, মুসলমানরাও নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা না পেয়ে প্রতিবাদ জানাল। যৌথ ভোটাধিকার না পৃথক ভোটাধিকার চালু হবে তা নিয়ে পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গের হিন্দু-মুসলিমে মতভেদ হ'ল। পশ্চিমের হিন্দুরা ছিল যৌথ নির্বাচনের পক্ষে, পূর্বে ঠিক বিপরীত। কংগ্রেসী মুসলিম ও লীগপন্থী মুসলিম যৌথ নির্বাচনের পক্ষে, আবার অন্যান্য মুসলিমরা বিপক্ষে। সবাইকে খুশি রাখতে কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে "না গ্রহণ না বর্জন" নীতি নেয়।[৬৪] নির্বাচন কাছে এলে কংগ্রেসকে স্পষ্ট নির্দেশ দিতে হয়। হিন্দু মহাসভা ঘেঁষা মালব্য ও অ্যানি তা বর্জন করতে কিন্তু কংগ্রেসী মুসলিম—আনসারি, আসফ আলি ও খলিকুজ্জমান—গ্রহণ করতে জেদ ধরেন। গান্ধী আর এক অস্পষ্ট প্রস্তাব আনেন। তাতে বলা হয় মতভেদ হওয়ায় কংগ্রেস গ্রহণ বা বর্জন করতে অপারগ। জাতীয়তাবাদের দিক থেকেও এটা গ্রহণীয় নয়। আসলে তিনি সাম্প্রদায়িক বিভেদের ভূতকে বোতল থেকে বের করতে চাননি। মূল শাসন সংস্কার বাতিল হলে বাঁটোয়ারাও বাতিল হবে এই ছিল তাঁর আশা এবং তা করার জন্য তিনি সংগ্রাম চালাতে চেয়েও ছিলেন।[৬৫] কিন্তু সারা ভারত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্মেলনে প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যায়। পূর্ব বাংলার হিন্দুরা মুসলিমদের এত আসন দেওয়ায় প্রবল আপত্তি জানায়। সুভাষচন্দ্রের বিদেশ গমনের ফলে তাঁর দল বিধান রায়ের হেফাজতে এসেছিল। ডাঃ রায় গান্ধীর কাছে বাঁটোয়ারা বিরোধিতার অনুমতি চান কিন্তু গান্ধী তা দেননি।[৬৬] সরকার সানন্দে পুণা চুক্তি মেনে নেন এবং তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকে হিন্দু-মুসলিম সমঝোতা না হওয়ায় মুসলিম সম্পর্কিত রোয়েদাদও কার্যকর হয়। এক্ষেত্রে মালব্য ও অ্যানিকে প্রতিক্রিয়াশীল ও গান্ধীকে উদার মনে করা ভুল হবে। গান্ধী ব্রিটিশ বিভাজননীতির ঘায়ে সম্পূর্ণ বানচাল হয়েছিলেন।

পুণা প্যাক্টের পরবর্তী হরিজনসম্পর্কিত গান্ধীর কার্যকলাপ নেহরুও সুচক্ষে দেখেননি। তাঁর মনে হয়েছিল, এর ফলে আইন অমান্য আন্দোলন থেকে জনগণের দৃষ্টি সরে যাবে। যদিও কলকাতা কংগ্রেস (মার্চ-এপ্রিল, ১৯৩৩) নিয়ে খুব হৈ চৈ হয় তবু, সন্দেহ নেই, মূল আন্দোলনে ভাঁটার টান লেগেছিল। সরকার চাইছিল গান্ধীজীর শক্তি এদিকে ব্যয়িত হোক। ব্রিয়াঁ স্টডার্টের অন্ধ্র রাজনীতির আলোচনা পড়লে মনে হয় সরকার ঠিকই ভেবেছিলেন।[৬৭]

তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকের গুরুত্ব ছিল না বললেই চলে। ১৭ নভেম্বর (১৯৩২) শুরু হয়ে ২৪ ডিসেম্বর (১৯৩২) পর্যন্ত বৈঠক চলে। ব্রিটেনের শ্রমিক দল কোন প্রতিনিধি পাঠায়নি। কংগ্রেস তো কারারুদ্ধ, তার প্রতিনিধি যাবার কথাই ওঠে না। ভারত থেকে মাত্র ৪৬ জন আমন্ত্রিত হন। প্রধানত, লোথিয়ান, পার্সি ও ডেভিডসন কমিটির প্রস্তাবানুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের কাঠামো নিয়ে এই বৈঠকে আলোচনা হয়। লোথিয়ান সর্বজনীন ভোটাধিকার চাননি, উচ্চতর কক্ষের পরোক্ষ নির্বাচন (প্রাদেশিক আইন পরিষদ দ্বারা) চেয়েছিলেন। নানা বিষয়ে মতদ্বৈধ দেখা দেয়। হিন্দুরা চায় বড় যুক্তরাষ্ট্রীয় সংসদ, মুসলমান ও বড় রাজারা চায় ছোট। কেন্দ্র ও প্রদেশের ক্ষমতা ভাগ নিয়ে বিরোধ বাড়ে। হিন্দুরা চায় বাড়তি (residuary) ক্ষমতা কেন্দ্রে থাকুক, মুসলমানরা চায়—প্রদেশ পাক। আর্থিক ব্যবস্থা ও দায়দায়িত্ব, প্রতিরক্ষার কর্তৃত্ব, লাটদের সংরক্ষিত ক্ষমতা এ সব তো চিরবিতর্কিত। বৈঠকের শেষে যে শ্বেতপত্র প্রকাশিত হয় তাতে দেখা যায়— (১) লক্ষ্য হিসাবে 'ডোমিনিয়ান' শব্দটার উল্লেখও নেই ; (২) কবে ফেডারেশন চালু হবে তার হদিশ নেই ; (৩) পূর্ব শর্ত মানা যায় না কারণ তা বহু বিলম্বের কারণ হবে ; (৪) ইণ্ডিয়া কাউনসিল বাতিল হয়নি ; (৫) সংরক্ষিত ক্ষমতা সর্বব্যাপী এবং গণতন্ত্রবিরোধী ; (৬)

অন্তর্বর্তী কালের পর ভারতীয়দের হাতে সৈন্য বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দেবার প্রতিশ্রুতি নেই ; (৭) অর্থ দফতর ভারতীয়দের হাতে দেওয়া হলেও বাজেটের ২০ থেকে ২৫% এর বেশি নিয়ন্ত্রণ ছাড়া হয়নি ; (৮) আর্থিক রক্ষাকবচ আপত্তিজনক এবং অনাবশ্যক ; (৯) বাণিজ্যের দিক থেকে ইংল্যান্ডকে অন্যায় সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, তার ওপর কেন্দ্রীয় সংসদের নিয়ন্ত্রণও নেই, এই দিক থেকে বড়লাটের ভিটো-ক্ষমতা মানা যায় না ; (১০) আই. সি. এস. আই. পি. এস. প্রভৃতি উচ্চতম চাকুরির নিয়োগ, নিয়ন্ত্রণ, মাইনে নিয়ে ভারত সরকারকে ক্ষমতা দেওয়া হয়নি ।[৬৮]

নেভিল চেম্বারলেন এ বিষয়ে একটা নিষ্ঠুর পরিহাস করেছিলেন—"ভারত আদুরে ছেলে, তাকে একটা পেন্সিল কাটা ছুরি দেওয়া হবে বলা হয়েছে। যদি তাকে নিরাপদে রাখতে হয় তবে বেঁধে রাখতে হবে, ছেড়ে দিলে চলবে না।" আরুইন কিন্তু মন্তব্য করেন—কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বহীনতা সংস্কারকে ছিবড়েতে পরিণত করেছে।

সাপ্রু ও জয়াকর বৃথাই ফেডারেশনকে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পূর্বশর্ত করতে চেয়েছিলেন। তবু তাঁরা জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটির কাজে যোগ দিতে বিলেত গেলেন নির্বেদ মন নিয়ে। এতে ব্রিটিশ ভারতের ২১ জন এবং রাজ্য থেকে ৭ জন যোগ দেন। ইতিমধ্যে ম্যাকডোনালডেব ক্ষমতা আরও কমে গিয়েছিল কারণ হার্বার্ট স্যামুয়েলের অনুগত লিবারেলরা মন্ত্রিসভা ত্যাগ করেছিল। র‍্যামজের নিজেব ভাষায়—তিনি "limpet in office." তা হলে আর কার কাছে ভারতীয়দেব আবেদন চলবে ? ভাবত সরকাব ও ব্রিটিশ সরকার দৃঢ়তার সঙ্গে শ্বেতপত্রকে সমর্থন কবল। 'ডোমিনিযান স্ট্যাটাস' সম্বন্ধে এবারও কোন উল্লেখ থাকল না। শুধু বিতর্ক হল নির্বাচনের পদ্ধতি ও ফেডারেল সংসদেব আয়তন নিয়ে। জয়াকর চাইলেন প্রত্যক্ষ নির্বাচন এবং বড়ো সংসদ। রাজা ও মুসলিমরা হোরকে উল্টো বোঝাল। উদারপন্থীদেব হাতে রাখতে উইলিংডন সাপ্রুদের সমর্থন করলেন। হোর কাজীর বিচার করলেন—বড়ো সংসদ ও পরোক্ষ নির্বাচন। নিম্নতর কক্ষ নির্বাচন করবে প্রদেশের নিম্নতর কক্ষ, কাউন্সিল অব স্টেট নির্বাচন কববে প্রদেশের উচ্চতর কক্ষ। অর্থনৈতিক ব্যাপারে ল্যাঙ্কাশিয়রের সন্দেহ কিছুতেই ঘুচছিল না। ভারতীয় ট্যারিফ কমিশন যে উচ্চহারে শুল্ক নির্ধারণ করেছিল তাতে ল্যাঙ্কাশিয়রের সদস্যরা অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়। উইলিংডন ছ' মাসের জন্য শুল্ক বৃদ্ধি মুলতুবি রাখেন। তবু ল্যাঙ্কাশিয়রের মনে হয় ভবিষ্যতে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এ ধরনের discriminating protection-এর নীতি নিতে পারেন। পার্লামেন্টে আবার চার্চিলের আক্রমণ তীব্র হতে তীব্রতর হচ্ছিল। হোর লিখছেন, **"Winston is determind to smash the National Government and believes that India is a good battering ram as he has a large section of the Conservative Party behind him."**[৬৯] রক্ষণশীলদের বাৎসরিক সভায় ও জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটিতে চার্চিলের অনুগামীরা জোর লড়াই দেয়।

১৮ মার্চ শ্বেতপত্র প্রকাশিত হয়। ১০ মার্চের (ক্যাবিনেট মিনিটসে রক্ষিত) হোরের বক্তৃতা তাঁর গূঢ় অভিসন্ধি বুঝতে সাহায্য করে। তাঁরই ভাষায়, "এ ব্যবস্থায় কংগ্রেস কোনদিন কেন্দ্রে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবে না।" অর্থাৎ ভারতের সর্বাধিক জনপ্রিয় দল কোনদিন ক্ষমতা পাবে না। দ্বিতীয়ত, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন (১৯৩৫-এর সংস্কারের একমাত্র কার্যে পরিণত অংশ)-এর অন্যতম লক্ষ্য—মুসলিম তোষণ। তৃতীয়ত, রাজন্যবর্গের ভিটোক্ষমতা দ্বারা যতদিন সম্ভব ফেডারেশন ঠেকান যাবে।

লর্ড লিনলিথগো-কে সভাপতি করে জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটি গঠিত হল এপ্রিলে। তার

আগে থেকেই, পুণা প্যাক্টের পর পর, ব্রিটিশ সরকারের ওপর চাপ এল গান্ধীসহ কংগ্রেসকর্মীদের মুক্তি দেওয়া হোক। উইলিংডন ও হোর চাইছিলেন গান্ধী নিজের থেকে আইন অমান্য প্রত্যাহার করুন—তাতে সরকারের মর্যাদা বাঁচে। উইলিংডনের ভাষায়, "...the initiative for this must come from him and cannot come from us."[৭০] তিনি গান্ধীর সঙ্গে আলোচনায় বসতে রাজি ছিলেন না। আরুইনের মত—তাঁর পরামর্শদাতারা দেখেছিলেন গান্ধীর জনপ্রিয়তা কমে যাচ্ছে, কংগ্রেসের কর্মীরা অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে, মধ্যস্থ হিসাবে গান্ধীব গুরুত্ব নিম্নমুখী। তাছাড়া "গান্ধী যদি বাণিয়ার মত ব্যবহার করেন ও শর্ত আরোপ করেন, তবে যেখানে আছেন (অর্থাৎ জেলে) সেখানেই থাকতে হবে।"[৭১] ১৯৩৩-এর ১লা এপ্রিল কলকাতা কংগ্রেসে যোগদান করতে গেলে স্বরূপরাণী নেহরু, অ্যানি ও মালাব্যকে পথেই গ্রেফতার করা হল। কলকাতায় আরো অনেককে। তবু চৌরঙ্গীতে ৮০০ জনের জমায়েত হয় ও শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা প্রস্তাব পাঠ শুরু করলে তাঁকেও গ্রেফতার করা হয়।

এ কথা ঠিক ওয়ার্কিং কমিটির মত না নিয়ে গান্ধীর পক্ষে আইন অমান্য প্রত্যাহাব কবা সম্ভব ছিল না।[৭২] তিনি ঐ সময় মাদ্রাজ মন্দিব প্রবেশ আইন ও হরিজন পত্রিকা প্রকাশ প্রভৃতি নিয়ে বেশি মাথা ঘামাচ্ছিলেন এবং সরকার, এমনকি আপন পবিচিতদের মধ্যেও, সাড়া না পেযে অনশনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। ৩০ এপ্রিল তিনি ঘোষণা করলেন আত্মশুদ্ধিব জন্য ৮ থেকে ২৯ মে (একুশ দিন) তিনি অনশন কববেন। এ নাকি ঈশ্বরের নির্দেশ এবং হরিজন সমস্যার ওপর দৃষ্টি আকর্ষণ করাই তাঁর উদ্দেশ্য।[৭৩] নেহরু, মালব্য, আনসারি, আজাদ প্রমুখ নেতাগণ প্রতিবাদ জানালেন। 'আত্মজীবনী'র পাতায় নেহরুর বিভ্রান্তি ও বিরক্তি সুপরিস্ফুট।[৭৪] জেলে গান্ধীর মৃত্যু হোক সবকারসে ঝুঁকি নিতে পারে না। তাঁকে ৮ মে ছেড়ে দেওয়া হল।

মুক্তিলাভের 'পর তিনি ফিবে এলেন রাজনৈতিক ভূমিকায়। ৮ মে কংগ্রেস সভাপতি অ্যানিকে ছ' সপ্তাহের জন্য আইন অমান্য মুলতুবি রাখতে নির্দেশ দিলেন. সবকাবকে অনুরোধ করলেন বন্দীদের মুক্তি দিতে, আলোচনায় বসতে রাজি এমন ইঙ্গিতও জানালেন। ৯ মে সরকার জানাল, আইন অমান্য স্পষ্টভাবে প্রত্যাহার করতে হবে এবং সে বিষয়ে আলোচনাব বা বন্দীদের মুক্তি দেবার ইচ্ছা তাদের নেই।[৭৫] সরকার জানতো কংগ্রেসীরা আইন অমান্য প্রত্যাহার করতে রাজি নয়, শ্বেতপত্রও মেনে নেবে না, অথচ নতুন সংস্কারের সুযোগে যতগুলি সম্ভব পরিষদীয় আসন দখল করতে আগ্রহী।[৭৬] উইলিংডনেব ধারণা ছিল জওহরলাল, প্যাটেল ও আব্দুল গফ্ফর খাঁ কোনও চুক্তি মানবেন না—অতএব গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা কবে (তাঁর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে) লাভ কি ?[৭৭] উইলিংডন নেহরুর আপত্তি সম্বন্ধে ভুল বলেননি। তাঁর ডায়েরিতে পড়ি, "All India, or most of it, stares reverently at the Mahatma and expects him to perform miracle after miracle and put an end to untouchability and get Swaraj and so on—and does nothing itself !"[৭৮] এ বাক্যগুলির শ্লেষ সুস্পষ্ট।

নেহরুর মত উগ্রপন্থীরা বললেন ছোট ছোট দলের সত্যাগ্রহ চলুক, কৃষক-শ্রমিকদের স্বার্থে আন্দোলন বন্ধ করা চলবে না ; অন্যদিকে শাসনসংস্কার গ্রহণ করা হোক এরকম চাপও আসতে থাকে, বিশেষত, জাতীয়তাবাদী মুসলিমদের কাছ থেকে।

গান্ধী অসুস্থ হওয়ায় আইন অমান্য আরও ছ' সপ্তাহ পিছিয়ে দেওয়া হল। জাতীয়তাবাদী

মুসলিমরা, বিশেষত, আসফ আলি, সংসদীয় রাজনীতিব পক্ষে চাপ বাড়ালেন। গান্ধী তখনও চাইছেন আলোচনায় বসার আগে অন্তত সীমান্ত গান্ধীকে মুক্তি দেওয়া হোক।[৭৯] জুলাই মাসের মাঝামাঝি স্থির হল বড়লাটের সঙ্গে তিনি দেখা করতে চাইবেন। নেহরু শুনে চটে লাল। বড়লাট রাজি হলেন না। ব্যক্তিগত আইন অমান্যের কথা মুখে বললেও গান্ধী দ্বিতীয়বার অনুরোধ জানালেন। ২৬ জুলাই-এর প্রতিবেদনে গান্ধী 'ডিক্টেটর' প্রথা ত্যাগ করলেন। এসব উল্টোপাল্টা এবং নতিস্বীকারমূলক কাজ দেখে উদারপন্থী সাপ্রুও বিমূঢ়।[৮০] গান্ধী সববমতী ত্যাগ করে ওয়ার্ধায় আশ্রম স্থাপন করবেন শুনে শাস্ত্রী ঠাট্টা করে গান্ধীর নাম দিলেন 'দ্বিতীয় ডন কুহোটি' (Second Don Quixote)।[৮১] গুজরাটে স্বাধীনভাবে ভ্রমণ করতে চাইলে গান্ধীকে আবার গ্রেফতার করা হল (১লা আগস্ট), তিনদিন পরে ছেড়ে দিয়ে পুণার মধ্যে অন্তরীণ করা হল, অমান্য করলে এক বছরের জেল দেওয়া হল। হোরের মতে এসব করে তিনি আবার পাদপ্রদীপের সামনে ফিরতে চাইছিলেন। উইলিংডন মনে করতেন তিনি কংগ্রেসী রাজনীতিতে 'back number' হয়ে গেছেন।

বলা বাহুল্য, নরম বা চরমপন্থীরা কেউ খুশি হয়নি। নরমপন্থীরা তখন সংস্কার, নির্বাচন, ক্ষমতার লড়াই-এর কথা ভাবছেন আর নেহরু সব ব্যাপারটায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ।[৮২] সাপ্রুর ভাষায়, কংগ্রেস কর্মীসাধারণের মনে "the present feeling is of despair and disappointment."[৮৩] সমস্ত অনশনের ব্যাপারটাই তাঁব চোখে মধ্যযুগীয় বলে প্রতীয়মান হয়েছিল। শাস্ত্রী লিখছেন, "তাঁব অনশন আমার বিবক্তি উৎপাদন করে। তাঁর অন্তবেব বাণীর ঘন ঘন উল্লেখ আমাকে অধীর করে।" যেখানে ব্রিটেনে রক্ষণশীল দল শিকড় গেড়ে বসেছে আর সংখ্যালঘুরা সংস্কারের সুফল ভোগের জন্য উৎসুক সেখানে জাতীয়তাবাদীদের নিষ্ক্রিয়তা বা অনৈক্য সাজে না।

সেপ্টেম্বরে গান্ধী ও নেহরুর দেখা হল—প্রায় দু' বছর পর। স্থির হল গান্ধী তাঁর জেলের বাকি সময়টা হরিজন আন্দোলন নিয়ে কাটাবেন, কংগ্রেসী নেতাদের প্রয়োজনে পরামর্শ দেওয়া ছাড়া অন্য কিছু করবেন না। সত্যাগ্রহ চলবে। নেহরু গান্ধীব প্রতি পূর্ণ আনুগত্য জানালেন। তাঁর মতে গান্ধীর সহযোগিতা ছাড়া বাঞ্ছনীয় লক্ষ্যের দিকে এগোনো সম্ভব ছিল না। হরিজন আন্দোলনের মাধ্যমে গান্ধী দেশের ঐক্য ও সংগ্রামী মনোভাব জাগিয়ে রাখতে পারবেন এ আশা তাঁর ছিল।[৮৪] গান্ধী কাজটা একটু বেশি করছিলেন—তা না হলে বিহারের ভূমিকম্পে সহস্র সহস্র লোকের প্রাণহানির পিছনে তিনি অস্পৃশ্যতার পাপ দেখতেন না। রবীন্দ্রনাথ এই অবৈজ্ঞানিক (এবং অমানবিক) মন্তব্যের প্রতিবাদ না করে পারেননি। ফলে গান্ধী মনপ্রাণ দিয়ে ত্রাণকার্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। অন্য দিকে নেহরু ক্রমশই সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকছিলেন। তখনও তাঁর চোখে স্বরাজ প্রাথমিক লক্ষ্য, আইন অমান্য শ্রেষ্ঠ উপায়।[৮৫] আবার যমনদাস মেহতা, এন সি কেলকার প্রভৃতি দক্ষিণপন্থী আমলাতন্ত্র ও মুসলিমদের আধিপত্য ঠেকাতে আইনপরিষদ দখল করতে বদ্ধপরিকর হচ্ছিলেন। মাদ্রাজের সত্যমূর্তি তো কংগ্রেস স্বরাজ পার্টি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু কোন পক্ষই গান্ধীকে হারাতে প্রস্তুত ছিলেন না।[৮৬] দক্ষিণপন্থীদের পক্ষ থেকে নরীম্যান, আনসারি ও বিধান রায় গান্ধীর সম্মতি আদায় করার জন্য চেষ্টা শুরু করলেন। বোম্বাই-এর কে. এম. মুন্সীও যোগ দিলেন। গান্ধী শেষে রায়ের কথায় নিমরাজি হলেন ; আনসারিকে জানালেন, যদিও তিনি ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে বিশ্বাসী তবু সমস্ত ব্যাপারটা আলোচনার্থে এ. আই. সি. সি. ডাকতে তিনি আপত্তি জানাবেন না।[৮৭] এঁদের ও রাজেন্দ্র প্রসাদের সঙ্গে আলাপের পর ৭ এপ্রিল (১৯৩৪) তিনি ঘোষণা করলেন, কংগ্রেস আপাতত সত্যাগ্রহের ব্যাপারটা তাঁর

হাতে ছেড়ে দেবে। এটা নাকি বাস্তববাদীর পরাজয় স্বীকার নয়, একটা 'আধ্যাত্মিক সমাধান', ভবিষ্যতে সত্যাগ্রহ অস্ত্র যাতে আরো ভালোভাবে কাজে লাগানো যায় তার জন্য প্রস্তুতি। আনসারিকে লিখলেন : **"I feel that it is not only right, but that it is the duty of every Congressman who for some reason or another, does not want to, or cannot take part in civil resistance, and who has faith in entry into the legislatures, to seek entry and form combinations in order to promote the programme..."**[৮৮] বল্লভভাইকে লিখলেন, যারা দিনরাত কাউন্সিলে ঢোকার জন্য ব্যাকুল তাদের ঢুকতেই দেওয়া উচিত। **"Don't you think it is better for someone who is always dreaming of jalebi (জিলিপী) to eat it and find out its actual taste for himself ?"**[৮৯] বলা বাহুল্য, নেহরু মর্মাহত হলেন।

গান্ধী বুঝতে পেরেছিলেন সত্যাগ্রহরূপ হরধনুতে সকলে জ্যা রোপণ করতে পারে না। সত্য অসত্য হিংসা অহিংসা নিয়ে কোনো কংগ্রেস কর্মীর মাথাব্যথা নেই। সরকার এ আই সি সি-র ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ায় যেভাবে কংগ্রেসীদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা গেছে তাতে তাঁর সরে থাকাই শ্রেয়। কম্যুন্যাল অ্যাওয়ার্ডের প্রতিবাদে মালব্য ও অ্যানি তো আলাদা ন্যাশনালিস্ট পার্টি গড়ে ফেলেছেন। তা ছাড়া দেখা দিয়েছে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি। নেহরুর তাতে হাত না থাকলেও সহানুভূতি ছিল। 'না গ্রহণ না বর্জন নীতি'তে অনেকেই অসন্তুষ্ট। উপদলীয় দ্বন্দ্ব তো ছিলই। সাপ্রুর ভাষায়, "প্রায় সর্বত্রই কংগ্রেসে নিজেদের দলের লোকের মধ্যে গৃহযুদ্ধ চলছে।" বুদ্ধিমান জয়াকর শাস্ত্রীকে লিখলেন, এই ঘৃণ্য দলাদলির কেন্দ্রে ঝাঁপিয়ে না পড়ে তার প্রান্তে থেকে গান্ধী বুদ্ধিমত্তার পরিচয়ই দিচ্ছেন।[৯০]

জুন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে নেহরুর প্রতিবাদের পর গান্ধীর স্থৈর্যের বাঁধ ভাঙল। ১৭ সেপ্টেম্বর এক দীর্ঘ প্রতিবেদনে গান্ধী জানালেন, যেসব মূল্যবোধ তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ তা নিয়ে অধিকাংশ কংগ্রেসীদের সঙ্গেই তাঁর মতবিরোধ উপস্থিত। তিনি খাদি, চরখা, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও অহিংসার উল্লেখ করলেন। বিশেষ করে সমাজতন্ত্রীদের সম্বন্ধে বললেন, **"If they gain ascendancy in the Congress I cannot remain in the Congress."** সত্যাগ্রহের সাধনায় যদি কংগ্রেসীদের পূর্ণ সহানুভূতি না পান, তবে একাই তিনি পথ চলবেন। তাঁর কাছে স্বরাজের অর্থ নৈতিক আত্মশুদ্ধি, রাজনৈতিক সংস্কার নয়।[৯১] তবে বাইরে থাকলেও পরামর্শ দিতে কার্পণ্য করবেন না তিনি। যখন বোম্বাইতে কংগ্রেসের অধিবেশন বসল তখন গভীর দুঃখের সঙ্গে সংগঠন তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। অবশ্য ভয়ের কিছুই ছিল না। সভাপতি তাঁরই সুযোগ্য শিষ্য রাজেন্দ্র প্রসাদ। তাঁকেই যখন এ আই সি সি থেকে ওয়ার্কিং কমিটি মনোনয়ন করার ক্ষমতা দেওয়া হল তখন বাইরে থেকে চাবিকাঠি নাড়ার কোন অসুবিধা রইল না মহাত্মার। কংগ্রেস স্থাপন করল সারাভারত গ্রামীণ শিল্প সমিতি, যা গান্ধীব অধীনে হবে এক স্বনিয়ন্ত্রিত সংস্থা। ১৯২৫-এ তৈরি হয়েছিল সারা ভারত সূতা কাটুনি সঙ্ঘ। এখন থেকে এই দুই প্রতিষ্ঠান গান্ধীর কর্মসূচির দুই মূল স্তম্ভ হয়ে দাঁড়াল। কংগ্রেস নামল সক্রিয় রাজনীতিতে অর্থাৎ ভোটাভুটিতে, আর গান্ধী চললেন আপন সত্য পালনের জন্য বনবাসে। সেই ভোট যুদ্ধের নায়ক অবশ্যই বল্লভভাই প্যাটেল, যার মত সমাজতন্ত্রবিরোধী বিরল। আরও রইলেন এস কে পাতিল ওমোরারজি দেশাই-এর মত স্থানীয় নেতা যারা মন্ত্রীত্ব[৯২] গ্রহণে আগ্রহী।

॥ ৪ ॥

উনিশ শো চৌত্রিশের ৬ জুন এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি দ্বারা কংগ্রেসের ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হল। হোমমেম্বার হেইগের উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণপন্থী ও সমাজতন্ত্রী লড়াইয়ে প্রথম পক্ষ সমর্থন। অক্টোবরে বোম্বাই কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ শাসন সংস্কারবিষয়ক শ্বেতপত্রের নিন্দা করেছিলেন। তাঁর মতে নয়া ব্যবস্থায় ব্রিটিশ কর্মচারী ও মনোনীত সদস্যবৃন্দের স্থান নেবে ফেডারেশনে যোগদানকারী রাজন্যবর্গের প্রতিনিধিরা। পৃথক ভোটাধিকার ব্যাপকতর হওয়ায় নতুন সংসদ হবে কম প্রগতিশীল। বড়লাট ও ছোটলাটদের হাতে এত 'বিশেষ দায়িত্ব' ও 'বিবেচনা (discretion) অনুযায়ী নীতিগ্রহণের ক্ষমতা' দেওয়া হয়েছে যে তার ফলে ভারতীয়রা আসল ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হবে। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন যে গুরুতর রূপে ব্যাহত হবে, তাতে সন্দেহ নেই। অর্থনৈতিক ব্যাপারে অর্থমন্ত্রী ও সংসদের ক্ষমতা অতি সীমিত করা হয়েছে। তা ছাড়া ভবিষ্যৎ অগ্রগতি নির্ভর করছে পার্লামেন্টের দাক্ষিণ্যের ওপর। "It would be a kind of federation in which unabashed autocracy will sit entrenched in one-third of India and peep in every now and then to strangle popular will in the remaining two-thirds." কংগ্রেস সভাপতি সাপ্রু ও জয়াকর থেকে আলাদা কথা বলেননি। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ব্যাপারে কংগ্রেস নিরপেক্ষ রইল—আনসারিকে খুশি রাখার জন্য। নতুন সংবিধানে সুতা কাটা ও শ্রমদান কংগ্রেসের কোনো কমিটির সদস্য পদে প্রার্থী হবার সর্তরূপে স্বীকৃত হয়েছিল। সর্ব ভারতীয় গ্রামীণ শিল্পোদ্যোগ সংস্থার কথা আগেই বলেছি।

তবু ১৯৩৪ সালের নভেম্বরের কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের নির্বাচনে কংগ্রেস নামল এবং পূর্ণ স্বরাজের দাবিতে অটল থেকে ৪৪টি আসন জিতল। আরও কিছু সদস্যের সমর্থন পেয়ে তাঁর সমর্থন দাঁড়াল ৬০-এ। ১৯৩৫-এর ৭ ফেব্রুয়ারি সারা ভারত প্রতিবাদ দিবস পালন করলেও দক্ষিণপন্থীরা জানতেন শাসন সংস্কার বিল তাঁরা ঠেকাতে পারবেন না। বরং প্রস্তাবিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ সমীচীন। এ ব্যাপারে জিন্নার সহযোগিতা আবশ্যক হয়েছিল।

গান্ধীর প্রস্থান ও জিন্নার প্রবেশ প্রায় সমকালীন। মহম্মদ আলি ও সাফির মৃত্যুর পর লীগের কর্ণধার কেউ ছিল না। সদস্য সংখ্যা ও শৃঙ্খলাবোধ কমছিল, তহবিল নিয়ে নয়-ছয় চলছিল, সুদূর সুইটজারল্যাণ্ডবাসী আগা খাঁর নেতৃত্ব দেবার শক্তি বা ইচ্ছা কোনটাই ছিল না। এই অবস্থায় সদ্যবিবাহিত লিয়াকত আলি খাঁ জিন্নার সঙ্গে দেখা করলেন এবং সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন ভারতে ফিরে লীগের পরিচালনাভার গ্রহণ করতে। প্রথমে জিন্না রাজি হননি; পরে বলেন, "সরেজমিনে পরিস্থিতি বুঝে যদি যেতে বলেন, যাবো।"[৯১ক] ১৯৩৪-এর এপ্রিলে লিয়াকতের সাহায্যে জিন্না লীগের চিরস্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত হলেন। কেন্দ্রীয় আইনপরিষদে নিজের বোম্বাই আসন তো জিতলেনই, উপরন্তু ২২ জনের (১৮ জন মুসলিম) এক পরিষদীয় দল তৈরি করে ফেললেন। যখন রাজেন্দ্র প্রসাদরা বুঝেছেন মুসলিমদের সঙ্গে আপোস না করলে কেন্দ্রে ক্ষমতা পাওয়া যাবে না, তখন জিন্নাও বুঝেছেন কংগ্রেসের সঙ্গে বোঝাপড়া না করলে তিনি জাতীয় স্তরের নেতা বা সংখ্যালঘু প্রদেশের মুসলিমদের 'sole spokesman' হতে পারবেন না। পঞ্জাবে ফজল-ই-হোসেন তাঁর

সমঝোতার নীতি না মানলেও বাংলার মুসলমানরা মানতে পারে।[৯২] এই পরিপ্রেক্ষিতে জিন্না ও কংগ্রেস সভাপতিব কথাবার্তা হয় ১৯৩৫-এর গোড়ায়।[৯৩] আজাদ রাজেন্দ্র প্রসাদকে জানান, জিন্না আপোসের মেজাজে আছেন এবং মুসলিমদের হয়ে প্রতিশ্রুতি দিতে সমর্থ।[৯৪] বল্লভভাই, মালব্য ও ভুলাভাই-এর সঙ্গে কথা বলে রাজেন্দ্র প্রসাদ যৌথ নির্বাচনের বদলে বাংলা ও পঞ্জাবের মুসলিমদের আসন সংখ্যার ৫১% দিতে রাজি হন।[৯৫] জিন্না আরও সুবিধা চাইলেন। স্থির হল বাংলায় মুসলিম আসন সংরক্ষিত হবে ও ইউরোপীয় আসনেব কিছু ভাগ পাওয়া গেলে তা জনসংখ্যার অনুপাতে হিন্দু ও মুসলমানরা ভাগ করে নেবে।[৯৬] রাজেন্দ্র প্রসাদ প্যাটেলকে জানান, যৌথ নির্বাচনের জন্য এই মূল্য দেওয়া যায়।[৯৭] ঐতিহাসিকের কর্তব্য দেখিয়ে দেওয়া বাংলা ও পঞ্জাবের হিন্দু/শিখের স্বার্থহানি করে কিভাবে রাজেন্দ্র প্রসাদ ও আজাদ-বা জিন্নার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চেয়েছিলেন। স্বীকার করতে হবে জাতীয় সংহতির দিক থেকে যৌথ নির্বাচন অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং নেহরু রিপোর্ট থেকে কংগ্রেস তা দাবি করে আসছে। তা ছাড়া জিন্নাকে ফজল-ই-র দল থেকে সরিয়ে নিলে তিনি হয়তো এতখানি বিচ্ছিন্নতাবাদীতে পরিণত হতেন না। কিন্তু পঞ্জাবের শহরবাসী মুসলিমরা তা মানত কী? বাঙালী হিন্দুরা ও মুসলিমরা সবাই মানতো এ কথাও কি ঠিক? ১৯২৭-৩৩-এর মধ্যে ফজলল হক (আবদার রহিমের সমর্থনে) মুসলিমদের স্বার্থে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন বিল (১৯২৮), বঙ্গীয় গ্রামীণ প্রাথমিক শিক্ষা বিল (১৯৩০), বঙ্গীয় ম্যুনিসিপাল অ্যাক্ট সংশোধন বিল (১৯৩২), বঙ্গীয় মহাজন বিল (১৯৩২) ও বঙ্গীয় কৃষি ঋণগ্রস্তদেব জন্য বিল (১৯৩৩) উত্থাপন করে ও অনেকগুলি পাস করে হিন্দু ভদ্রলোকদের খেপিয়ে দিয়েছিলেন। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ও পুণা চুক্তি তাতে ঘৃতাহুতি দেয়। পূর্ব বাংলাব হিন্দুরা অনিশ্চিত ইউবোপীয আসনের ভাগাভাগির লোভে যৌথ নির্বাচন চাইবে কেন? আব লোক্যাল ও যুনিযান বোর্ডে কর্তৃত্বেব মধুর স্বাদ পাবার পর মুসলিমবাই-বা কেন আইন পরিষদে চিরন্তন কর্তৃত্ব চাইবে না? গ্যালাহার ও আয়েষা জালালেব মতে হিন্দু মহাসভা রাজেন্দ্র প্রসাদ-জিন্না আলোচনা সফল হতে দেয়নি।[৯৮] মালব্যকে দোষী কবেছেন মার্গেরিট ডাভ। এ মত এক পেশে। আযেষা জালাল জিন্নার পক্ষে রীতিমত ওকালতি কবেছেন। জিন্না নাকি সাম্প্রদাযিক বাঁটোযাবার রাজনৈতিক ব্যাখ্যা করেছেন, ধর্মীয় ব্যাখ্যা নয। ওটা না গ্রহণ কবলে পুরো শাসন সংস্কারটাই বর্জন করতে হত। কিন্তু জিন্না কি জানতেন না (এবং বলেননি) যে এই সংস্কাব "অপমানজনক" ও "অসহ্য"? আসলে তিনি বুঝেছিলেন মুসলিম প্রদেশগুলি স্বাযত্ত শাসনের জন্য লোলুপ এবং তা গ্রহণ না করলে তিনিই বর্জিত হবেন। সেই অংশটুকু গ্রহণ করে ফেডারেশনের অংশটুকুর সমালোচনা করেছিলেন তিনি—আপন স্বার্থে। ফেডারেশনে আপত্তি জানিয়ে তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে তাল বজায় রাখছিলেন। অপর দিকে পঞ্জাব ও বাংলার জন্য যতটা বেশি সুবিধা আদায় করে সেখানকার মুসলিমদেব আনুগত্য সংগ্রহ করতে চাইছিলেন। বঙ্গীয় হিন্দুদের মেজাজ বোঝা গিয়েছিল ১৯৩৩-এর মার্চে আইন পরিষদে আনীত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুণা প্যাক্ট-বিরোধী প্রস্তাব থেকে। এই প্রস্তাব ৩৬-২৭ ভোটে গৃহীত হয়। অক্ষয়কুমার সেন ছাড়া সব বর্ণহিন্দু প্রস্তাবের পক্ষে এবং সব অনুন্নত হিন্দু (এবং মৌলভী আবদুস সামাদ ছাড়া সব মুসলমান) বিপক্ষে ভোট দেয়। অমূল্যধন রায়, মুকুন্দবিহারী মল্লিক প্রভৃতি অনুন্নত শ্রেণীর সদস্যের বক্তৃতার সুর এবং বেঙ্গল ফেডারেশনের কার্যাবলী বাঙালী বর্ণহিন্দুর মনঃপূত হতে পারে না। বিশেষ করে অপছন্দ হয়েছিল তপসিলী জাতি নির্ধারণের প্রণালী। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে

অস্পৃশ্যতাই ছিল মাপকাঠি। কিন্তু বাংলার জন্য মাপকাঠি করা হল "সামাজিক ও রাজনৈতিক পশ্চাৎপরতা" (social and political backwardness)। সাইমন কমিশন ও লোথিয়ান কমিটি কিন্তু অস্পৃশ্যতাকেই মাপকাঠি করতে বলেছিলেন। বাংলা সরকার যখন এ সব জাতের তালিকা ঘোষণা করল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনও প্রতিবাদ না করে পারেনি।[৯৯] যাদের জন্য সরকারের এত মাথা ব্যথা তাদের মধ্যে পোদরা বিভক্ত হলেও মাহিষ্য, সূত্রধর ও নাথ বা যোগীরা ঐক্যবদ্ধভাবে আপত্তি জানায়।[১০০] কিন্তু গ্রামবাংলার, বিশেষত পূর্ব বাংলার, তপসিলী জাতিদের মধ্যে ফজলল হকের কৃষক প্রজা পার্টির শক্তিশালী ভিত্তি ছিল। ১৯৩৭-এর নির্বাচনে যে ৩২ জন তপসিলী প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়, তার মধ্যে কংগ্রেসী ছিল—৭, হিন্দুসভা—২ ও স্বতন্ত্র—২৩। কংগ্রেস টিকেটে নির্বাচিত হয় ৫৪, স্বতন্ত্র বর্ণহিন্দু—৩৭, হিন্দু জাতীয়তাবাদী—৩, হিন্দু সভা—২, মুসলিম লীগ—৩৯, কৃষক প্রজা পার্টি—৪০, স্বতন্ত্র মুসলিম—৪২, ইউরোপীয়, 'অ্যাঙ্গলো-ইণ্ডিয়ান' ও ইণ্ডিয়ান ক্রিশ্চিযান—৩১। বলা বাহুল্য, কংগ্রেস, লীগ, কৃষক প্রজা পার্টির কাবোর কোন সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না, প্রত্যেকের নজব ছিল তপসিলী প্রতিনিধিদের ওপর। বর্ণহিন্দুদের পক্ষে এ যেন সার্কাসের শক্ত কবে টানা দড়ির ওপর দিযে হাঁটা। হাঁটতে পারেনি তাবা।

আমবা শাসন সংস্কারেব প্রসঙ্গে ফিরে যাই। ভারত সরকার ও ব্রিটিশ সবকাব স্থির করেছিল তাবা শ্বেতপত্রের বাইবে যাবে না। জযেণ্ট সিলেক্ট কমিটিতে বিতর্ক হচ্ছিল নির্বাচনেব পদ্ধতি ও ফেডারেল সংসদের আয়তন নিয়ে। জযাকর চাইলেন প্রত্যক্ষ নির্বাচন হোক এবং সংসদ বড মাপের হোক। কিন্তু মুসলিম ও অন্য সংখ্যালঘুদেব এবং একদল বাজাব মন্ত্রণায় হোব প্রথমে ঠিক কবলেন পরোক্ষ নির্বাচন ও ছোট সংসদ হবে। উইলিংডন কিন্তু জানালেন এতে উদাবপন্থীবা ক্ষুব্ধ হবে।[১০১] হোব কাজীর বিচার করলেন—সংসদ বড হল কিন্তু নির্বাচন পবোক্ষ রইল। প্রাদেশিক আইন সভা (Assembly) নির্বাচন কববে নিম্নতর কক্ষ আব প্রাদেশিক আইন পরিষদ (Council) বা ইলেকটবাল কলেজ নির্বাচন কববে কাউন্সিল অব স্টেট। বিল রূপে এ সব প্রস্তাব পার্লামেণ্টে আনা হল ও ১৯৩৫-এব ৪ আগস্ট বাজাব সম্মতি লাভ করে আইন (Government of India Act, 1935)-এ পবিণত হল। স্থিব হল ১৯৩৭-এর ১ এপ্রিল থেকে কিছু বক্ষা কবচসহ পূর্ণদায়িত্ববান সবকার (এখন সিন্ধু ও উডিষ্যাকে নিয়ে) এগারটি প্রদেশে চালু হবে। ফেডারেশনের অর্থাৎ ফেডাবেল কেন্দ্রীয সবকাব ও সংসদের ব্যবস্থা থাকল। ডাযার্কিব ভূত প্রদেশ থেকে কেন্দ্রেব ঘাডে চাপল। বৈদেশিক সম্পক ও প্রতিবক্ষা হল বড়লাটেব জন্য সংরক্ষিত। কিছু বক্ষাকবচসহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় বিষয় গেল মন্ত্রীদেব হাতে।

প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইন সভায় সাম্প্রদাযিক বাঁটোয়ারা অনুযাযী পৃথক ভোটাধিকাব বহাল রইল। ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের কথা ছিল না, তবে বলা হল "mainly by usage and convention India under the new constitution might quickly acquire the same freedom, internal and external, as that of the other members of the British Commonwealth."

এর মধ্যে সবচেয়ে অনিশ্চিত ছিল ফেডারেশন। দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক থেকে রাজাদের মতিগতি বদলে গেছিল। পাতিয়ালার নেতৃত্বে একদল ক্ষুদ্র বাজা সাপ্রুর পরিকল্পনার বিবোধিতা করছিলেন। তাঁরা চাইছিলেন রাজাদের এক আলাদা যুনিয়ন। বিকানীর আবাব এদের বিবোধিতা করেন। বিকানীরের সমর্থনে ভূপালের নবাব

পাতিয়ালাকে হারিয়ে চেম্বার অব প্রিন্সেসের সভাপতি হলেন। অনেক রাজ্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট হন এবং দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের বহু সময় এই আলোচনায় ব্যয়িত হয়। মাঝারি রাজ্যরা শেষে বিকানীর-ভূপালের পক্ষে যান। বড রাজ্য হায়দ্রাবাদের আকবর হায়দারি আবার পাতিয়ালা বা বিকানীরের কোনো কথা শুনলেন না।[১০২] ফেডারেল সংস্থা কর্তৃক কেন্দ্রীয় বিষয়ে শাসন তিনি মানতে রাজি নন। অন্তত পাঁচ পাঁচটা রক্ষাকবচ তাঁর চাই। ১৯৩২-এর প্রথমে হায়দ্রাবাদ সাপ্রুকে স্পষ্ট জানিয়ে দেয় তা স্বৈরতন্ত্র ছাড়তে রাজি নয়। জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটিব অনুরোধে সাপ্রু আবার এক প্রস্তাব রচনা করেন কিন্তু অনেকে গোপনে সমর্থন করলেও প্রকাশ্যে হায়দাবি ও রামস্বামী আয়ারের বিরোধিতার জন্য পিছু হঠেন। মুসলিমরা হঠাৎ সমর্থন প্রত্যাহার করে এবং ব্রিটিশ প্রতিনিধি দল তাদের অনুসরণ করে।[১০৩] ব্যাপারটা ঠিক কাকতালীয় নয়। মুসলিম-প্রধান প্রদেশে আধিপত্য কায়েম কবার পর কেন্দ্রেব ব্যাপাবে মুসলিমদের বিশেষ মাথা ব্যথা ছিল না। ফেডারেশন হলে তারা তো সংখ্যালঘুই হযে যাবে। জাফরুল্লা খাঁর বহু প্রস্তাব বাজন্যবর্গকে ভডকে দেবাব জন্য উত্থাপিত হযেছিল। মুসলিমবা ফেডারেশন চায়নি।

আমাব বিশ্বাস বড রাজা, মুসলমান ও ব্রিটিশ পক্ষেব মধ্যে গভীব ষডযন্ত্র চলছিল। হায়দাবি ও মীর্জা ইসমাইলের কোন্দল চিত্তবিক্ষেপকাবী অভিনয মাত্র। পাতিয়ালা ও জামসাহেবকে বুদ্ধি যোগাচ্ছিলেন রাসব্রুক উইলিযামস্, অর্থাৎ বক্ষণশীল দল, একথা স্বযং হোর স্বীকাব করেছেন।[১০৪] শেষ পর্যন্ত সাইমন কমিশন যা ভেবেছিলেন তাই হল—অর্থাৎ ফেডাবেশন "a dim and distant product of the future" থেকে গেল। এর জন্য ভাবতীযদেব অন্তর্দ্বন্দ্ব অবশ্যই দাযী ছিল কিন্তু ব্রিটিশ সরকাবেব ওপব বক্ষণশীল দলের ক্রমবর্ধমান ও পবস্পর বিবোধী প্রভাব কম দায়ী নয। শুধু সলসবেবিব উপদলই বাধা দিচ্ছিল না। চার্চিল অস্টেন চেম্বাবলেনকে পটাচ্ছিলেন বলডুইনকে হটাবার উদ্দেশ্য নিয়ে, অতএব দলেব নেতৃত্ব রাখতে বলডুইনও সংস্কার বিষযে কঠোব মনোভাব নিচ্ছিলেন। চার্চিল শুধু পাতিযালাব মহাবাজাকেই নয, চেম্বাব অব প্রিন্সেসেব চ্যান্সলাব—ভূপালের নবাবকেও জপাচ্ছিলেন। ফলে ১৯৩৫-এর ফেব্রুয়ারিতে বোম্বাই সম্মেলনে রাজন্যবর্গ ফেডারেশন প্রস্তাব প্রায নাকচ করে দিলেন। ঠিক এই সময চার্চিল ফেডারেশনের বিরুদ্ধে পার্লামেণ্টে তিক্ততম বিষ উদ্গীবণ কবেছিলেন।[১০৫]

১৯৩৫-এ আইনেব মুখবন্ধ (preamble) সম্বন্ধে হোব বললেন, "Rightly understood, the Preamble of 1919, which I repeat will stand unrepealed, is a clear statement of the purpose of the British people, and this Bill is a definite step, indeed a great stride, forward towards the achievement of that purpose." যদিও এই মুখবন্ধের যে ব্যাখ্যা ১৯২৯-এ আরুইন করেছিলেন হোর তা মানতে রাজি হন—"the natural issue of India's progress as there contemplated is the attainment of Dominion Status", তবু এও যোগ করেন যে কাজ দেখে বিচার হবে।

শাসনতন্ত্রের ফেডাবেশন অংশ আপাতত মুলতুবি বইল, অন্যান্য অংশ চালু হল। ১৯৩৫-৩৬-এ যে প্রশ্ন কংগ্রেসের সামনে বড়ো হয়ে উঠেছিল তা হল—(১) কংগ্রেস শাসন সংস্কার আদৌ গ্রহণ করবে কিনা, এবং (২) গ্রহণ কবে নির্বাচনে জিতলে মন্ত্রিত্বভার নেবে কিনা। দক্ষিণপন্থীরা মোটামুটি রাজি হলেও সমাজতন্ত্রী দল ও নেহরুব তীব্র আপত্তি ছিল। গান্ধী আইন অমান্য প্রত্যাহার করায় তিনি কিরূপ মর্মাহত হন তা আত্মজীবনীব ছত্রে ছত্রে

বিধৃত যেমন, "Life seemed to be a dreary affair, a very wilderness of desolation." এ প্রসঙ্গে গান্ধীর জীবন ও কর্মদর্শন সম্বন্ধে তাঁর মনে বহু প্রশ্ন জাগে। কেন এই অতীতমুখী সন্ন্যাসের আদর্শ তিনি গ্রহণ করলেন ? কৃচ্ছ্রসাধন, যৌন-সংযম, দারিদ্র্যবন্দনা, যন্ত্র সভ্যতার সমালোচনা ও "লাঙলধাবী কৃষক" নিয়ে বোমাণ্টিসিজম কোনটাই যুক্তিসিদ্ধ, এমন কি মানবিক, বলে তিনি ভাবতে পারছিলেন না। ধনতান্ত্রিক পরিবেশে গান্ধীর 'Moral Man' কি করে জন্মাবে ? যে হিংসা তিনি পরিহার করতে চান তার বীজ ধনতান্ত্রিক সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রোথিত। নিভুরের Moral Man and Immoral Society পড়ে তাঁর মনে হয় হিংসা ত্যাগ নেতিবাচক ও অবাস্তব। তাঁব চবম লক্ষ্য হয়েছিল, "a classless society with equal economic justice and opportunity for all, a society organised on a planned basis for the raising of mankind to higher material and cultural levels....[১০৫ক] কী করে ১৯৩৫-এর সংস্কার তা আনবে ? ফেডারেশনকে তিনি বলেছিলেন, 'unholy structure'[১০৬] গান্ধী কী করে অত্যাচারী মধ্যযুগীয় রাজাদের ন্যাসী ভাবেন ? কী করে দেশীয় রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবেন না প্রতিশ্রুতি দেন ?[১০৬ক] সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাই বা কী কবে মানা যায় ?

হয়তো সেইজন্যই নেহরুকে গান্ধী পরবর্তী সভাপতি রূপে চাইলেন। দাযিত্বের ভার ঘাড়ে চাপিয়ে তিনি নেহরুর সদ্যওঠা সমাজতান্ত্রিক দাঁত ভাঙতে চেয়েছিলেন। খুশি করতে লিখলেন, "Your presidency is the rightest thing that could have happened for the country."[১০৭] তিক্ত বিতর্ক এড়াতে ওয়ার্কিং কমিটি গান্ধীর পরামর্শ মেনে নেয। স্ত্রী বিয়োগের আসন্ন সম্ভাবনায় বিষণ্ণ নেহরুব এসব দিকে মন ছিল না। কিন্তু গান্ধী বোঝান, কংগ্রেসের নতুন শাসনতন্ত্রে সভাপতিই ওযার্কিং কমিটি তৈরি করেন বলে আপন নীতি (যাই হোক) কার্যে পরিণত করতে নেহরু বাধা পাবেন না।

নেহরু-জীবনীকার গোপাল জানাচ্ছেন, লণ্ডনে বেনব্র্যাড্‌লে ও রজনী পাম দত্তর সঙ্গে নেহরুর দেখা হয় এবং তিনি নাকি দত্তকে কথা দেন—কংগ্রেস সভাপতিরূপে কম্যুনিস্ট পার্টির স্বার্থ দেখবেন ও কিছু বিশেষ কর্মসূচি নেবেন।[১০৮] ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষে এই সময় কংগ্রেসের ছত্রচ্ছায়ায আশ্রয় গ্রহণ প্রয়োজন ছিল। ১৯৩৪ সালেব ২৮ জুলাই বডলাটের নির্দেশে বাংলার বাবোটি, বোমবাই-এর দশটি এবং মাদ্রাজ ও পঞ্জাবে আরও কতকগুলি কম্যুনিস্ট সংগঠন বেআইনী ঘোষিত হয়। কানপুর, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে ধর্মঘটে নেতৃত্ব দেবার জন্য পি সি যোশী, অজয় ঘোষ, রণদিভে, সরদেশাইরা গ্রেফতার হন। পরে পার্টি সম্পাদক ডঃ অধিকারী। পরবর্তী সম্পাদক মিরাজকর ১৯৩৫-এ কমিনটার্নের সপ্তম কংগ্রেসে যাবার পথে সিঙ্গাপুরে গ্রেফতার হন। এরও পূর্বে মুজফ্ফর আহ্‌মদ, আবদুল হালিম, সরোজ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি নানা অপরাধে কারারুদ্ধ হয়েছিলেন।[১০৯] কম্যুনিস্টরা যেমন হারিয়েছিলেন, তেমনি কিছু লাভও করেছিলেন—বহু প্রাক্তন সন্ত্রাসবাদীকে দলে পেয়ে। তাঁদের সঙ্গে আন্দামান, দেউলি, বক্‌সা প্রভৃতি বন্দিনিবাসে আটক বহু বিপ্লবীর যোগাযোগ স্থাপিত হয়। প্রমোদ দাশগুপ্ত, মনোরঞ্জন রায়, ভবানী সেন প্রভৃতি এই সময় কম্যুনিজমে দীক্ষিত হন। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, গান্ধীবাদে ও কর্মপন্থায় বিশ্বাসহীন এবং দমননীতির শিকার সাম্যবাদীরা কি করবেন ?

ইউরোপে ফাসিস্ত ও নাৎসীবাদের দ্রুত অগ্রগতি ও সম্ভাব্য রুশ অভিযান ঠেকাতে ১৯৩৫-এর আগস্টে কমিনটার্নের সপ্তম কংগ্রেসে ডিমিট্রিভ যুক্তফ্রন্টের নীতি প্রবর্তন

করেছিলেন। ফ্রান্সে লিঁও ব্লাম ও স্পেনের গণতন্ত্রী সরকারে কম্যুনিস্ট পার্টিরও স্থান হয়। ভারতে তার ঢেউ এল কিছু দেরিতে। ব্র্যাডলে ও পাম দত্ত "লেবার মান্থলি" পত্রিকার ১৯৩৬-এর মার্চ সংখ্যায় The Anti-Imperialist Peoples' Front in India নামক প্রবন্ধ লেখেন। সরোজবাবুব মতে এর আগেই এসেছিল চীনের নেতা ওয়াং মিন ও ইতালির নেতা তোগলিয়াত্তিব লেখা উপনিবেশ-সংক্রান্ত দলিল, যাব ভিত্তিতে ১৯৩৫-এর শেষে নাগপুবে অনুষ্ঠিত পার্টিব গোপন বৈঠকে সোমনাথ লাহিড়ী এক খসড়া কর্মসূচি তৈরি করেন। ব্র্যাডলে ও দত্তের থিসিস পড়ে তা সংশোধন করা হয।

কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলেব উদ্ভব ঘটেছিল ১৯৩৪-এর মে মাসে, কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতাদের সমাজতন্ত্র বিবোধিতাব প্রতিক্রিয়া রূপে। ওযার্কিং কমিটি বলেছিলেন, শ্রেণীসংগ্রাম ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি অধিগ্রহণ অহিংসা নীতির পরিপন্থী। কংগ্রেস "wiser and juster use of private property" ও "healthier relationship between capital and labour"-এর বেশি কিছু চায় না। জওহরলাল এব তীব্র প্রতিবাদ করেন।[১১০] কিন্তু গান্ধী বিশেষ কর্ণপাত কবেননি।

নেহরু এই দলের উদ্যোক্তা না হলেও এঁবা নেহরু দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং সমাজতন্ত্রের সঙ্গে জাতীযতাবাদের সমন্বয় চেয়েছিলেন। তাঁরা কংগ্রেসেব মধ্যে একটা 'প্রেসার গ্রুপে'র কাজ করতে চেযেছিলেন।[১১১] উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন আচার্য নবেন্দ্র দেব, জয়প্রকাশ নারায়ণ, ইউসুফ মেহের আলি, মিনু মাসানি, অশোক মেহ্‌তা ও রামমনোহর লোহিয়া। মালাবারেব কংগ্রেসী নেতা ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ এই সময় কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টিতে যোগ দেন।[১১১ক] কিষাণ সভাব মাধ্যমে এঁবা বিহারে বেশ শক্তিশালী হয়েছিলেন। এঁবা শাসন সংস্কার গ্রহণ, বিশেষত মন্ত্রীত্ব গ্রহণে,আপত্তি জানান।

১৯৩৫-এর এপ্রিলে জব্বলপুর এ· আই· সি· সি·-তে সমাজতন্ত্রী দল পবিষদীয় কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করে গণ পরিষদের দাবি ওঠাল। জয়প্রকাশ বললেন, শুধু সবকাবকে বিতর্কে হারানই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য নয়, পবিষদের ভেতরকাব কাজকে বাইবেব দৈনন্দিন গণ সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে, সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ উদ্‌ঘান কবতে হবে, কাজে বাধা দিতে হবে। তা ছাড়া নির্বাচনে জিতলেও মন্ত্রীত্ব নেওযা চলবে না। ভোটে হেবে গিয়ে তাঁবা জোর লড়াই দেন বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেসে। সন্ত্রস্ত মুন্সী গান্ধী ও প্যাটেল-কে জানান—বোম্বাই হাতছাড়া হতে চলেছে। সম্পূর্ণানন্দ দক্ষিণপন্থীদেব আক্রমণ করলে পাতিল ও মোরারজি সমাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গেব অভিযোগ আনেন। সভাপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ তাতে রাজি হননি। অন্যদিকে সত্যমূর্তি জোব গলায মন্ত্রীত্ব গ্রহণের পক্ষে প্রচার করেন। তার সঙ্গে যোগ দেন আনসারি, আসফ আলি, বিধান বায় ও খলিকুজ্জমান। বিভ্রান্ত ওয়ার্কিং কমিটি এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত পরবর্তী কংগ্রেস পর্যন্ত পিছিয়ে দেন। মাদ্রাজ এ· আই· সি· সি· ও লখনউ কংগ্রেসের অন্তর্বর্তীকালে দেশব্যাপী বিতর্ক শুরু হয়। AITUC, AISF এবং AIKS সবাই সমাজতন্ত্রীদের মদতে শাসন সংস্কাব গ্রহণে আপত্তি জানায়। ১৯৩৫-এর ডিসেম্বরে প্রকাশিত "The Congress Socialist" সাপ্তাহিকে জয়প্রকাশ ও মাসানি প্রভৃতির রচনা পঠিতব্য। কংগ্রেস প্রার্থীদের জন্য নয় দফা দাবিপত্র এর অন্যতম। ১৯৩৬-এর জানুয়ারি মাসে সমাজতন্ত্রীদের মীরাট অধিবেশনে তা স্পষ্টতর হয়। ১৯৩৫-এব জুলাই থেকে অক্টোবর বিভিন্ন পত্রে উইলিংডন নতুন ভারত সচিব (জেটল্যাণ্ড)-কে জানাচ্ছিলেন—কংগ্রেস সম্ভবত বিভক্ত হবে। কংগ্রেস সোস্যালিস্টরা নেহরুকে সমর্থন করতেই পারেন, কারণ অন্য নেতারা কেউই তাঁদেব পাত্তা দেবেন না। কিন্তু কম্যুনিস্টরা

বিনা শর্তে সমর্থন করেননি। ব্র্যাড্‌লে ও দত্ত চেয়েছিলেন হয় শ্রমিক ও কৃষক য়ুনিয়ানগুলির সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হোক না হয তাদের দলগতভাবে সদস্য করা হোক। কংগ্রেসের শাসনতন্ত্র বদলে গ্রাম থেকে জাতীয়স্তরে এই ব্যবস্থা করতে হবে। ওয়ার্কিং কমিটির শক্তির বিকেন্দ্রীকরণ চাই, যেন তার নির্দেশেব দিকে সাধারণ সদস্যদের তাকিযে থাকতে না হয়। তাঁরা আরও চেযেছিলেন কংগ্রেসকে অহিংসানীতি ত্যাগ কবতে হবে, কারণ এ ধরনের অন্ধ মতবাদ সমর কৌশলের সুবিধাবাদী পবিবর্তন ব্যাহত করে। কংগ্রেসের মুখ্য দাবি হোক সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে কনস্টিট্যুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি। নির্বাচনকালে বামপন্থীদের যথেষ্ট মনোনয়নও দিতে হবে। জওহরলাল এই থিসিসেব অনেকখানি মেনে নেন কিন্তু গান্ধীব নেতৃত্ব ও অহিংসাব নীতি পবিত্যাগ কবতে তখনও তিনি পুরোপুরি প্রস্তুত হননি।

লখনউ কংগ্রেসেব পূর্বে ও পবে কংগ্রেসী, সোস্যালিস্ট ও কম্যুনিস্টদেব ঘনিষ্ঠতা বেড়েছিল। সাবা ভারত কৃষক সম্মেলন (লখনউ, ১১ এপ্রিল ১৯৩৬), প্রগতিশীল লেখক সম্মেলন, সারা ভাবত ট্রেড য়ুনিযন সম্মেলনে সবাইকার প্রতিনিধিদেব দেখা যায়। আবদুল হালিমেব সঙ্গে কথায জয়প্রকাশ নাকি বলেন, "আপনারা গোপনে পার্টি করুন, আমবা বাধা দেব না। প্রকাশ্যে আমাদের সঙ্গে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টিতে যোগ দিন।" বোম্বাই, ইউ পি, মাদ্রাজ, কেরালায তাই হয়েছিল।[১১৩] মাসানি, মেহ্‌তা ও লোহিয়া এটা চাননি।

লখনউতে বাম ও দক্ষিণপন্থীর বিরোধ প্রথম থেকেই স্পষ্ট হয়। বিষয় নির্বাচনী কমিটি সমাজতন্ত্রীদেব ওয়ার্কিং কমিটিতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করতে চায়। সমাজতন্ত্রীরা পাল্টা জবাব দেয় সরকার গঠনের বিরোধিতা করে। নেহরু কিন্তু সমাজতন্ত্রীদের সমর্থন করেননি। তাঁর মনে হযেছিল সভাপতিরূপে দক্ষিণপন্থীদেব আপত্তি তিনি বানচাল করতে পারবেন। সরকাব গঠনেব ব্যাপারে কংগ্রেসী ঐক্যে ফাটল ধবাতে তিনি চাননি। গণসংযোগ বহু বিস্তৃত করতে হলে নির্বাচন যে একটা ভাল মাধ্যম এ বোধ তাঁব ছিল। কংগ্রেস এত দিন জনগণের জন্য ছিল, তাকে জনগণেব মধ্য থেকে গড়তে হবে। এর জন্য বদলাতে হবে তার গঠনতন্ত্র, দেখতে হবে প্রাথমিক কমিটিগুলি যেন প্রাণবন্ত হয. ট্রেড য়ুনিয়ন ও কৃষক সমিতিব সদস্যরা স্থান পায়। সদস্যপদ শুধু ব্যক্তি-ভিত্তিক হবে না, গোষ্ঠী-ভিত্তিক হবে। লক্ষ্য হবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ। শাসন সংস্কারের রূপরেখা তৈবি করবে গণপবিষদ। ১৯৩৫-এর যে আইন কংগ্রেস প্রত্যাখ্যান কবেছে তদনুযায়ী সরকাব গঠন হবে স্ববিবোধী। এব পরিণতি বন্ধ্যা সংস্কারবাদ বা তার চেয়েও খারাপ, সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভারতীয় জনগণের শোষণ। প্রাদেশিক আইন সভায় ঢুকে কংগ্রেসের কাজ হবে ফেডারেশনের বিরোধিতা এবং সংস্কার বানচাল করা। জওহরলালের সভাপতির ভাষণে আমরা মতিলাল ও চিত্তরঞ্জনের ডায়ার্কি বানচাল করার প্রতিধ্বনি শুনি। পরিবর্তনের মুখোসে প্রবহমানতার আবির্ভাব ইতিহাসে নতুন নয়।

কিন্তু অন্যদের কানে তাঁর সমাজতন্ত্রের ডাক বিপজ্জনক মনে হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, "আমি যখন এই শব্দ (সোস্যালিজম্‌) উচ্চারণ করি তখন কোন ধোঁয়াটে মানবিকতাবাদের কথা বলি না, বলি বৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক অর্থে।" সমাজতন্ত্র একটা বিশিষ্ট জীবনদর্শন ; সিডনি ও বেয়াত্রিচে ওয়েবের রাশিয়া সম্বন্ধে বিখ্যাত উক্তিকে স্মরণ করে বলা যেতে পারে—"একটা নতুন সভ্যতা"। তবে সমাজতন্ত্র যে রুশী আদলে স্থাপন করতেই হবে এমন গোঁড়ামি তাঁর নেই। ভারতের সমাজতন্ত্র রচিত হবে ভারতের পারিপার্শ্বিকে, কথা বলবে ভারতীয় ভাষায়। নেহরু স্তালিনবাদীদের মত কোনও ডগমায়

বিশ্বাস করতেন না (স্তালিনও করতেন না, তা না হলে Socialism in One Country কি হয় ?)। তাঁর মার্ক্সবাদে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা স্বীকৃত। তাঁর সমাজতন্ত্রের সঙ্গে গণতন্ত্রের বিরোধ নেই। জোর করে তিনি তা কংগ্রেসের ওপর চাপাতে চাননি, মুখ্যত যা জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠান তাকে নিজের পথে চালাতে গিয়ে অহিংসা ত্যাগ করতেও রাজি ছিলেন না। সবচেয়ে লক্ষণীয়, গান্ধী-প্রশস্তি দিয়ে তাঁর লখনউ-ভাষণের পূর্ণচ্ছেদ। যাই হোক না কেন, গান্ধীর সঙ্গে নাড়ীর যোগ ছিন্ন করতে তিনি তখনও প্রস্তুত হননি।

আর একটা কথা। তিনি শুধু বামপন্থীদের নিয়ে চলতে চেয়েছিলেন, এটাও সত্য নয়। আমরা তাঁকে মালব্যের ন্যাশানালিস্ট পার্টির সঙ্গে নির্বাচনী আঁতাত গড়তে দেখি।[১১৪] তবু কৃষক ও শ্রমিক সংগঠনগুলির সঙ্গে কাজ কবলে কংগ্রেসেব গণভিত্তি আবও ব্যাপক ও দৃঢ় হত। কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটি তা হতে দেয়নি। ছোট একটা কমিটি হয়েছিল কতটা গণসংযোগ করা যায় তা খুঁটিয়ে দেখতে ও কাজে পরিণত করতে। বিফলকাম নেহরু সভাপতি পদ ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন।[১১৪ক] পরে পিছিয়ে যান।

নিশ্চিন্ত বিড়লা পুরুষোত্তমদাসকে লেখেন, "মহাত্মাজী কথা বেখেছেন এবং একটি শব্দও উচ্চারণ না করে দেখেছেন যাতে কোন নতুন (বামপন্থী) কর্মসূচি না গৃহীত হয। জওহ্বলালজীর বক্তৃতা এক দিক দিয়ে বাজে কাগজের ঝুড়িতে নিক্ষিপ্ত হযেছে, কারণ যতগুলো প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে সবই তাঁব বক্তৃতার পরিপন্থী। তিনি অবশ্য পদত্যাগ করে দলে ভাঙন ধরাতে পারতেন কিন্তু কবেননি···মনে হচ্ছে জওহরলালজী একজন আদর্শ ইংরেজ গণতন্ত্রীর মত খেলোয়াড়সুলভ মনোভাবে পরাজয় মেনে নেন। He seems to be out for giving expression to his ideology, but he realises that action is impossible and so does not press for it."[১১৫] গান্ধী এই জন্য নেহরুকে একটা ভাল সার্টিফিকেট দেন : "But though he is extreme in his presentation of his methods, he is sober in action.... "[১১৬] চৌদ্দ জনের ওয়ার্কিং কমিটিতে দশজন পুরাতনপন্থী অর্থাৎ সরকার গঠনেচ্ছু নেতা দিয়ে নেহরু গান্ধীব সার্টিফিকেটের যোগ্যতা প্রমাণ করেছিলেন। গান্ধীর ইচ্ছাক্রমেই তিনজন সমাজতন্ত্রীকে নেওয়া হয়। তাঁরা হলেন নরেন্দ্র দেব, জয়প্রকাশ নারায়ণ ও অচ্যুত পটবর্ধন। বাকি সদস্য সুভাষচন্দ্র বসু তখনও জেলে। বাঙালীদের সঙ্গেই ছিল দক্ষিণপন্থীরা। বসুর লখনউ কংগ্রেসে উপস্থিতি চাননি বলে তাঁরা নাকি বসুর গ্রেফতারে সাহায্য করেন।[১১৭] সমাজতন্ত্রীবা শুধু নেহরুর প্রতি আনুগত্যবশত ওয়ার্কিং কমিটিতে ঢুকতে রাজি হয়েছিলেন। তবুও শিল্পপতি এবং বণিক চূড়ামণিদের ভয় যায়নি। তাঁরা নেহরুর সঙ্গে বাদানুবাদে নামায় বিব্রত বিড়লা ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদকে লিখেছেন, "It looks very crude for a man with property to say that he is opposed to expropriation in the wider interest of the country."[১১৮]

তিনি নিজে এত স্থূল না হলেও তাঁরই পরামর্শে শিল্পপতিরা বল্লভভাইকে দিয়ে আপত্তি তোলালেন। বল্লভভাই-এর সঙ্গে যোগ দিলেন রাজেন্দ্র প্রসাদ ও রাজাজী। গান্ধীর কানে যথারীতি কথাটা তোলা হল এবং গান্ধী নেহরুর কাছে ব্যাখ্যা চাইলেন। নেহরু ভারতীয় ধনতন্ত্র ও তার মুখপাত্রদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে গেলেন। এ· আই· সি· সি-র নতুন একটা বিভাগ খোলেন নেহরু—রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংবাদ বিভাগ। তাতে দুজন কম্যুনিস্টকে সদস্য করা হয়—জেড· এ· আহমদ ও কে· এম· আশ্রফ। আহমদ তীব্র ভাষায় ১৯৩৫-এর সংস্কার আক্রমণ করেন A Brief Analysis of the New Constitution

নামক পুস্তিকায়। একদিকে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা ভাঙবার আহ্বান জানান আহমদ। অন্যদিকে সত্যমূর্তি মন্ত্রীত্ব গ্রহণের। জুলাই (১৯৩৬) মাসের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে গান্ধীর তিরস্কারে ক্রুদ্ধ নেহরু পদত্যাগ করতে চাইলেন। গান্ধী কঠিন ভর্ৎসনার সুরে লিখলেন : "তুমি তাদের (দক্ষিণপন্থীদের) দ্বাবা সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হয়েছ, কিন্তু এখনও ক্ষমতায় আসনি। যাতে তুমি আরো শীঘ্র ক্ষমতায় আস তারই চেষ্টায় তোমাকে সভাপতি করা হয়েছে।" অতএব এই ধরনের বাদানুবাদ ও নাটুকেপনা না করাই শ্রেয়।[১১৯]

জওহরলাল যথারীতি আত্মসমর্পণ কবলেন, যেমন করেছিলেন ১৯২২ ও ১৯২৭-এ। তাঁকে বলতে শুনি—রাজনৈতিক স্বাধীনতা না এলে ভারতে সমাজতন্ত্রের কথা ওঠে না এবং তাও উঠবে যদি অধিকাংশ ভারতীয় চায়। নেহরু-জীবনীকার গোপাল লিখছেন, গান্ধী তাঁকে যে ব্যক্তিগত কারণে সাবধান হতে বলেছিলেন তা নেহরুকে স্পর্শ করেনি। ক্ষমতার লোভ তাঁর ছিল না। এ মন্তব্য মানা কঠিন। বাস্তববাদী নেহরু ভালভাবেই বুঝতেন কংগ্রেসের চাবিকাঠি কার হাতে। বামপন্থীদের সম্ভাব্য সমর্থনের আশায় আশুলভ্য ফল ত্যাগ করার মত নির্বোধ তিনি ছিলেন না। তিনি জানতেন দক্ষিণপন্থী নেতাদের মত স্থানীয় প্রভাবশালী বাম বিকল্প তখনো তৈরি হয়নি, আব গান্ধীব ইঙ্গিতের অপেক্ষায় রয়েছেন ওয়ার্কিং কমিটির দশজন সদস্য। ত্রিপুরী কংগ্রেসেব আগে সুভাষচন্দ্র এ কথা বোঝেননি বলে ত্রিপুরীতে ও পরে ঘোর বিপদে পড়েছিলেন।

তবে নেহরুর সমাজতান্ত্রিক প্রতিশ্রুতি না পেলে কংগ্রেস জনগণের কতটা সমর্থন আদায় করতে পারত তা বলা যায় না। ১৯৩৭-এব নির্বাচন কংগ্রেসের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। নেহরুর charisma ও বামপন্থীদের জনসংযোগ কংগ্রেসের বিপুল জয়ের পিছনে ছিল। নেহরু বিগড়ে বসলে ও বামপন্থীবা সরে গেলে দক্ষিণপন্থীরা কটা রাজ্যেব মন্ত্রিত্ব দখল করতেন ? আমার মনে হয়, ১৯৩৬/৩৭-এ, ১৯৪৫/৪৭-এ, নেহরু ও কংগ্রেস ছিল পরস্পরনির্ভর। আর ১৯৪৫ পর্যন্ত উভয়ে ছিল গান্ধীজী-নির্ভর।

শেষ পর্যন্ত ২২/২৩ আগস্ট (১৯৩৬) যে নির্বাচনী ইস্তাহার রচিত হল[১২০] তাতে করাচী কংগ্রেস (১৯৩১)-এ গৃহীত মৌল অধিকারের ওপর জোর দেওয়া হয় ও প্রাদেশিক কমিটিগুলিকে কৃষিসম্পর্ক ও কৃষিঋণবিষয়ক এক কর্মসূচি তৈরি করার নির্দেশ দেওয়া হয়। মনে রাখতে হবে—সমাজতন্ত্রী নেতারাও জমিদারি উচ্ছেদ বা প্রধান প্রধান শিল্পেব জাতীয়করণের প্রস্তাব ইস্তাহারে তোলবার জন্য জেদ ধরেননি। এ বিষয় বল্লভভাই তাঁর সন্তোষের কথা গান্ধীকে জানিয়েছিলেন।[১২১] প্রতিদানে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের কথা তুললেন না তাঁরা। ওটা 'না বলা বাণীর ঘন যামিনী'র মাঝে রইল। ২০ নভেম্বর নেহরু এক প্রতিবেদনে বললেন, সমাজতন্ত্রে তাঁর বিশ্বাস দৃঢ়তব হযেছে। নির্বাচনী ইস্তাহারের ব্যাখ্যায় তিনি বললেন, শুধু সংস্কার আইন বিরোধিতাই নয়, মন্ত্রীত্ব গ্রহণের বিরোধিতাও করা হবে। ফলে প্যাটেল ও প্রসাদরা বিরক্ত হন। প্যাটেল রাজেন্দ্রবাবুকে লেখেন (২২ নভেম্বর ১৯৩৬), এ অবস্থায় তাঁর সভাপতি হয়ে লাভ কি ? নেহরু (গান্ধীর নির্দেশে) বিবৃতি দেন যে এই ব্যাখ্যা সত্য নয়। প্যাটেলও (গান্ধীর নির্দেশে) সভাপতি পদের নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ান। কিন্তু অন্তরে প্রতিজ্ঞা নিয়ে যে প্রয়োজনে মন্ত্রীত্ব নেওয়া হবে। রাজাজী যে নেবেনই তা তো সবাইকার জানা। ফৈজপুর কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণে (ডিসেম্বর, ১৯৩৬) সংস্কার বাতিল ও গণপরিষদের দাবি সমাজতন্ত্রের দাবি ছাপিয়ে গেল।

১৯৩০-৩৪-এর আন্দোলন পূর্ণ স্বরাজের লক্ষ্যে না পৌঁছলেও ১৯৩৭-এর নির্বাচনে প্রভূত সাহায্য করেছিল। এই আন্দোলনের ফলে অঞ্চলে অঞ্চলে ঐক্য গড়ে ওঠে। বহু

তরুণ স্বেচ্ছাসেবী কংগ্রেসী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে, শৃঙ্খলায় অভ্যস্ত হয়ে, ও কারাবরণ বা ততোধিক নির্যাতন সহ্য করে ভবিষ্যতের নেতৃত্ব পদের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষালাভ করেছিল। আন্দোলন বহু স্থানে তৃণমূল স্পর্শ করেছিল বলে কংগ্রেস বৃহত্তম সর্বভারতীয় দলে পরিণত হয়েছিল এবং অধিকাংশ ভোটদাতার আস্থা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিল। কংগ্রেস সরকার গঠন করতে যাচ্ছে ভেবে বহু উচ্চাকাঙ্ক্ষী, মুখ্যত রাজনৈতিক, ব্যক্তি কংগ্রেসে যোগ দেয়। পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষমতা, পুরস্কার দেবার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাজনীতিতে মূল্যবান। মন্ত্রী বা তাঁর পার্ষদরাই তা দিতে পারে। মন্ত্রীর সামাজিক মর্যাদা বা আর্থিক প্রাপ্য (perquisites) উপেক্ষণীয় নয়। হরিজন আন্দোলন, নিখিল ভারত কাটুনী সঙ্ঘ বা গ্রামীণ শিল্প সংস্থার কাজের মধ্যে কোন নাটকীয় আত্মপ্রচারের সংস্থান ছিল না বটে কিন্তু তাব রাজনৈতিক মূল্যও কম নয়। দেশকে সেগুলি একটা শ্রেণীগত সংহতি দিয়েছিল: উঁচু-নীচু জাত, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যেব ভেদ অনেকখানি ভুলিয়েছিল। কবাচী কংগ্রেসের সীমিত অর্থনৈতিক কর্মসূচিরও আবেদন কম ছিল না আগেই বলেছি। শুধু ১৯৩৭ নয় পরবর্তী আরও ত্রিশ বছর এই আদর্শ ও সংহতি-চেতনা ভাঙিয়ে কংগ্রেস বারংবার নির্বাচনে জয়ী হয়। জুডিথ ব্রাউন ও জ্ঞান পাণ্ডেব মত কঠোর সমালোচকও এ-কথা স্বীকার করতে বাধ্য হযেছেন। নেহরুর নিজস্ব অবদান অসামান্য ছিল। এখন থেকে গান্ধীর charisma ম্লান হতে শুরু কবে, আব জনগণমনে নেহরুর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হতে থাকে।

১৯৩৭-এর নির্বাচনে মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা ও মাদ্রাজে কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ কবল; বোম্বাইতে হল বৃহত্তম দল (১৭৫-এর মধ্যে ৮৬)। আসামে ১০৮ জনেব মধ্যে ৩৩টি ও উত্তর পশ্চিম সীমান্তে ৫০টিব মধ্যে ১৯টি আসন—খুব খারাপ ফল বলা যায় না। মোট প্রাদেশিক ১৫৮৫ আসনেব ১১৬১টি লডাই কবে কংগ্রেস জিতে নেয় ৭১৬টি আসন। মাদ্রাজের লাট এরস্কাইন (Erskine) ঠিকই বলেছিলেন, "'গান্ধীর জন্য হলুদ বাক্সে ভোট দাও' এই জিগিব সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে গেল।" কেবল মুসলিম দুর্গ পঞ্জাব (১৮-১৭৫) বাংলা (৫৪-২৫০) ও সিন্ধুতে (৭-৬০) তারা সাফল্য দেখাতে পারেনি। ১৯৩৭ জানুয়ারি মাসে গজনভি ও বর্ধমানের মহাবাজার এক চুক্তিতে ৫০ : ৫০ ভিত্তিতে হিন্দু ও মুসলমানের এক সমঝোতাব সম্ভাবনা দেখা দেয। কিন্তু অধিকাংশ হিন্দু ও মুসলিম তা মানতে রাজি হয়নি। সাবা ভারতে ৫৮টি মুসলিম আসনে প্রার্থী হয়ে কংগ্রেস জেতে মাত্র ২৬টি। উত্তব-পশ্চিম সীমান্ত ছাড়া মুসলিম ভোটদাতারা কংগ্রেসকে বর্জন করে। লীগকেও। ৪৮২টি মুসলিম আসনের মাত্র ১০৯টি পেয়েছিল লীগ। হেইলি ও হেইগ ইউ পি-তে কংগ্রেস জলতবঙ্গ রোধ করতে ন্যাশানাল অ্যাগ্রিকালচারিস্ট পার্টি নামে জমিদারদের এক দল তৈরি করেন কিন্তু ছত্তারির নবাব ও শ্রীবাস্তবের রেষারেষিতে তা বিফল হয়। মাদ্রাজে জাস্টিস পার্টির ভরাডুবি ঘটালেন রাজাজী।

নেহরু নির্বাচন মেনে নিলেও সরকার গঠন চাননি। কিন্তু ১৯৩৬-এর ফেব্রুয়ারিতে কংগ্রেস পার্লামেণ্টাবি বোর্ড যখন এ ব্যাপারে প্রাথমিক আলোচনা করে তখনই কৃপালনী রাজেন্দ্র প্রসাদকে লেখেন, "কেউ কল্পনাও করতে পারেনি সরকার গড়ার পক্ষে মত এত জোরাল।"[১২১ক] সমাজতন্ত্রীরা বিরোধিতা করলে প্যাটেল গান্ধীর সমর্থন আছে জানান। নতুন সংস্কারের মৃত্যু ঘটাতে পারলে খুশি হতেন গান্ধী, কিন্তু আইন সভায় আসন গ্রহণ করা স্থির হলে গ্রামোন্নয়ন, মাদক বর্জন, কৃষিঋণভার হ্রাস প্রভৃতি ব্যাপারে সরকারের সহযোগিতা

করতে রাজি ছিলেন। ওয়ার্ধায় ফেব্রুয়ারি মাসে যে ওযার্কিং কমিটির অধিবেশন বসে তাতে গান্ধীর মন্ত্রীত্ব গ্রহণের পূর্বশর্ত ছিল—কংগ্রেসী উন্নয়নকর্মে ছোটলাটবা বিশেষ দায়িত্ব সম্ভূত ক্ষমতা দ্বারা বাধা সৃষ্টি করতে পারবেন না।[১২১খ] নেহরু অবশ্য বিরোধিতা করেন। তাঁকে পূর্ণ সমর্থন জানায় ইউ· পি· কংগ্রেস তথা সমাজবাদীরা। নেহরুর বিবোধিতা খণ্ডনে এক চাল চাললেন দক্ষিণপন্থীরা। তাঁরা এ আই সি সি ও নির্বাচিত কংগ্রেসীদের সম্মেলন ডাকলেন দিল্লীতে, একই সময়ে (১৯৩৭ মার্চ), নেহরু তাঁদের বললেন, সংস্কার বর্জন করা হোক, গণপরিষদের দাবি তোলা হোক। শরৎ বসু ও বামপন্থীরা তাঁকে সমর্থন জানালেন। গান্ধীর ইচ্ছাও তাই ছিল। লিনলিথগোর চিঠিপত্রে পাই কী নির্বাচন কী নিঃশর্ত সবকার গ্রহণ কোনটাই তিনি চাননি। কিন্তু কোন দিকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা বুঝতে পেরে তিনি পিছিয়ে যান। ওয়ার্কিং কমিটি অদ্ভুত এক আপোস করল। একমুখে বলল, শাসনতন্ত্রেব সঙ্গে লড়াই চলবে ; অন্যমুখে বলল. যদি প্রাদেশিক আইন সভাব নেতারা বোঝেন ছোটলাট বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন না বা শাসন ব্যাপারে যদৃচ্ছ বাধা দেবেন না তবে মন্ত্রিসভা গডতে পারেন। গোপাল মানবেন্দ্রনাথ রায়ের জবানিতে নেহরুর মনোবেদনার কাহিনী বলেছেন।[১২২] লিনলিথগো জানতেন এত প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচন জিতে মন্ত্রিত্ব না নেওয়া কঠিন হবে।[১২৩] এমার্সন বড়লাটকে এমনও বলেন—গান্ধী নেহরুকে যতই স্নেহ করুন সি, পি, ইউ, পি, বিহার ও মাদ্রাজেব কংগ্রেসীরা মন্ত্রিত্ব নিতে বদ্ধপরিকব জেনে তাঁকে সমর্থন কবতে সাহস পাবেন না।[১২৪] নেহরু চাইলেও গান্ধী কংগ্রেসকে ভাঙতে চাইবেন না। বিড়লা বড়লাটকে ১২ মার্চ জানান, গান্ধী চান রক্ষাকবচ নিয়ে লাটদের সঙ্গে কংগ্রেসেব একটা ভদ্রলোকের চুক্তি হওয়া উচিত।[১২৪ক] মাদ্রাজের লাট এবস্‌কাইন (Erskine) দুবার রাজাজীর সঙ্গে কথা বলেন, যদিও তিনি মৌখিক বা লিখিতভাবে সংস্কাব বিরোধী কোনো দিলাশা দেননি। ১৮ মার্চের এ· আই· সি· সি-তে স্থির হয সবকাব গঠন করা যেতে পাবে যদি কংগ্রেস দল নেতা প্রকাশ্যে বলেন, "the Governor will not use his special powers of interference or set aside the advice of the ministers in regard to constitutional activities." গান্ধীজি বিড়লাব কাছে আশা পেয়েছিলেন যে গভর্নররা বেশি বাগডা দেবেন না। হোম ডিপার্টমেণ্টের কাগজপত্র পড়লে মনে হবে এমন আশা করা ঠিক হয়নি। পন্থ হেইগের কাছে কোনো ইতিবাচক ইঙ্গিত পাননি।[১২৪খ] রাজাজীকে এরস্‌কাইন যে কথা দেন, গান্ধী তাতে খুশি হননি। বস্তুত বড়লাট সব কংগ্রেসী লাটদের বারণ করে দেন।[১২৪গ] হয়তো ফেডাবেশনেব স্বার্থে তিনি তা করেন কিন্তু আমলারাও মদৎ দেয়। কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ পিছিয়ে দেয় ও বহু প্রদেশে সংখ্যালঘু মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। কিন্তু উভয় পক্ষই চাপে পড়েছিল। লোথিয়ান, আরুইন, আগাথা হ্যারিসনরা মনে করেন গান্ধীর বাড়ানো হাত গ্রহণ না কবা ঠিক হয়নি। জেটল্যাণ্ড নিজেই বলেন, কংগ্রেসের নরমপন্থীদের পক্ষে আনতে গান্ধীর সঙ্গে মিটমাট কবাই শ্রেয়ঃ।[১২৪ঘ] এপ্রিলের শেষে ওয়ার্কিং কমিটির যে অধিবেশন বসে তাতে নেহরু এ ধবনেব আলোচনায় আপত্তি জানান। অন্য দিকে গান্ধী বলেন—আইন অমান্য শুরু করাও সম্ভব নয়। তিনি পুনরায় গঠনমূলক কাজের ওপর জোর দেন। প্রস্তাবে বলা হয় কংগ্রেস সংস্কার আইনের কোন সংশোধন চাইছে না, ছোটলাটদের মন্ত্রীসভা বরখাস্ত বা পবিষদ বাতিল করাব অধিকারও চ্যালেঞ্জ করছে না। তবে সরকার ও মন্ত্রীসভার মতবিরোধের জন্য মন্ত্রীসভাকে বরখাস্ত করতে হবে, তার পদত্যাগ চাওয়া চলবে না। অর্থাৎ বরখাস্ত করা পর্যন্ত ছোটলাটরা বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন না। লিনলিথগো এতেও নরম হতেন না কিন্তু ৫ই

মের ব্রিটিশ ক্যাবিনেটে অনেকে বলেন এভাবে কংগ্রেসের সঙ্গে ঝগড়া করা ঠিক হচ্ছে না। জেটল্যাণ্ডের বক্তৃতায় তার ছাপ পড়ে—"The reserved powers, of which the Congress make so much, will not normally be in operation at all....." যদি মতভেদ হয় তবে উভয় পক্ষ সৌহার্দপূর্ণ আলোচনায় তা মেটাবে। লিনলিথগোর এতটা ভাল লাগেনি। কিন্তু তিনি ৬ মের চিঠিতে ভারত সচিবের দৃষ্টিভঙ্গি মেনে নেন। ১১ই জুন রাজাজী এরস্‌কাইনকে বলেন, মন্ত্রীসভা বরখাস্ত করার ব্যাপারে গান্ধীর দাবি মানলে মিটমাট হবে। এর ফলে আইন অমান্যের ক্রমবর্ধমান চাপও কমবে।[১২৪] ৬ জুনেব এক ঘোষণায় বডলাট বলেন, মন্ত্রী ও লাটদের সহযোগিতা আবশ্যিক। গভর্নরদেরও তিনি বলেন, "কংগ্রেসীদের সঙ্গে ভাল্ সম্পর্ক বেখে চলুন।" শেষে এইসব মিষ্ট কথার ওপর নির্ভর করে ছটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করে। কোন গভর্নর আনুষ্ঠানিক প্রতিশ্রুতি দেননি।

তবে স্থির হয় নেহরু, প্যাটেল, আজাদের মত প্রথম সারিব নেতারা মন্ত্রিত্ব নেবেন না। দ্বিতীয় সারিব নেতারা প্রাদেশিক সরকার গডবেন। প্যাটেল, রাজেন্দ্র প্রসাদ ও আজাদকে নিয়ে পার্লামেন্টারি বোর্ড গঠিত হয। তাঁরা দৃঢ় হস্তে প্রাদেশিক মন্ত্রী সভার কাজ নিয়ন্ত্রণ করবেন। ক্যুপল্যাণ্ড এই নীতির নাম দেন—unitarianism। ভারতসচিব জেটল্যাণ্ড ঠিকই আশা করেছিলেন যে, একবাব রক্তের স্বাদ পেলে কংগ্রেসীরা মন্ত্রিসভা ভাঙবে না।[১২৫] নেহরু এত বিবক্ত হয়েছিলেন যে পার্লামেন্টারি বোর্ডেব সভ্য হননি।

লিনলিথগো ফেডারেশনের সবচেয়ে বড সমর্থক ছিলেন। ভাবত সরকারের আশা ছিল প্রাদেশিক নির্বাচনের ফল দেখে রাজন্যবর্গ ফেডারেশনেব মধ্যেই অধিকতব নিরাপত্তা বোধ করবেন। শুধু লোথিয়ান বুঝেছিলেন বেশি দেরি করলে রাজারা পিছিয়ে যাবেন। বৃহত্তব রাজ্যদের রাজি করাবার জন্য ভারতসচিবকে লেখা বডলাটেব চিঠিপত্রে হায়দ্রাবাদ ও মহীশূরেব নানা ওজর, আপত্তি, বাযনার বিবরণ আছে। রাজপুতানাব বিকানীরের মহারাজা ছিলেন, "the most determined opponent."[১২৬] ফেডারেশন ঘোষণার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান জেটল্যাণ্ড ও লিনলিথগো। কিন্তু হোব ও নয়া প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেন তা প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁরা তো আসলে ফেডারেশন চাননি, তার অজুহাতে কেন্দ্রে কংগ্রেস শাসন ঠেকাতে চেয়েছিলেন, কংগ্রেসকে প্রদেশেব মধ্যে সীমাবদ্ধ কবে রাখতে চেয়েছিলেন।

দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে কংগ্রেসের নীতি পরিবর্তনও রাজন্যবর্গকে ফেডারেশন থেকে দূবে ঠেলে দিল। ১৯৩৮-এব ফেব্রুয়ারি মাসে কংগ্রেস দাবি তুলল যে দেশীয রাজ্যেব প্রতিনিধিদের নির্বাচিত হতে হবে, রাজাদের দ্বারা মনোনীত হলে চলবে না। এব ফলে শুধু রাজারা নয়, মুসলমানবাও সন্ত্রস্ত হল। এব মধ্যে উভয়ে দেখল কংগ্রেসী সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভূত। দেশের সর্বত্র প্রজামণ্ডল সক্রিয় হয়ে উঠছিল। ১৯৩৯-এর প্রথমে গান্ধীব রাজকোট সত্যাগ্রহ তাদের আশঙ্কা দৃঢ়তর করল।[১২৭] কংগ্রেসের বহু নেতা প্রজামণ্ডলের ব্যাপারে কংগ্রেসকে জড়িয়ে ফেলতে চাননি। কিন্তু সাবধানে চললেও রাজাদের আশঙ্কা তাঁরা দূর করতে পারেননি। জিন্নার দল মুসলিম সংখ্যালঘিষ্ঠ প্রদেশগুলি, বিশেষত ইউ.পি-তে, মন্দ ফল দেখায়নি। কিন্তু ইউ.পি.মন্ত্রিসভায় তাদের দু'জন প্রতিনিধিকে না নেওয়ার অজুহাতে লীগ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রায় জেহাদ ঘোষণা করে। মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে শুধু পক্ষপাতিত্ব নয়, মুসলিম নিগ্রহের অপপ্রচারও চালান হয়। আগা খাঁ স্বীকার করেছেন, দেশীয় রাজ্যের সদস্যরা নির্বাচিত হলে কংগ্রেসের হাত শক্ত হবে এই ভয় মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াকে

অতিরিক্ত কঠোর করেছিল।[128]

লিনলিথগোর মনে হয়েছিল প্রজা আন্দোলনের ফলে রাজন্যবর্গ দ্রুত ফেডারেশনে যোগ দেবে। ১৯৩৮ ডিসেম্বরে তাঁর শেষ অনুরোধ গেল রাজ্যে রাজ্যে। কিন্তু রাজাদের এক কমিটি ১৯৩৯-এর এপ্রিলে তা প্রত্যাখ্যান করার সিদ্ধান্ত নিল। লিনলিথগো যোগদানের সময়সীমা বাড়িয়ে ১ সেপ্টেম্বর করলেন। কিন্তু তার মধ্যে মাত্র এক-চতুর্থাংশ রাজ্য যোগ দিতে রাজি হল। হায়দ্রাবাদসহ একটি বড রাজ্যও তার মধ্যে ছিল না। হায়দ্রাবাদ এমন দাবিও করে যে কংগ্রেসী প্রজা আন্দোলন জোরদার হলে ব্রিটিশ সরকারকে সন্ধিশর্ত রক্ষার্থে এগিয়ে আসতে হবে। এর ঠিক দু'দিন পরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধল আর ফেডারেশনের ওপর নেমে এল যবনিকা। কংগ্রেসের বিপুল জয় ও পরবর্তী নীতি, রাজাদের বিরোধিতা, হোর প্রভৃতি রক্ষণশীল নেতার অনীহা ১৯৩৫-এর শাসনসংস্কারের একটা প্রধান অংশকে কবরস্থ করল।

॥ ৫ ॥

সরকাব গঠনের ব্যাপাবে গান্ধীব শেষ ফর্মুলা ছিল যদি মন্ত্রীদের সঙ্গে লাটদের কোন অনতিক্রমণীয় মতদ্বৈধ ঘটে তখন লাটরা মন্ত্রীদেব বরখাস্ত করতে পারেন। এ নিয়ে বাদানুবাদ বেশিদূব গডাতে দিতে জেটল্যাণ্ড বা গান্ধী কেউই চাননি। জেটল্যাণ্ডের ধারণা ছিল কংগ্রেস শাসনভাব না নিলে বামপন্থীরা লাভবান হবে। গান্ধী ("this saintly old sinner and humbug") নতুন করে আক্রমণ শুরু করবেন। এ আশঙ্কা অমূলক ছিল। মুখবক্ষাব জন্য জুলাই মাসে ওয়ার্কিং কমিটি বলল, দেশের মনোভাব বুঝে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে।[129] তার আগে থেকেই বাজাজী লর্ড এরস্‌কাইনের সঙ্গে দহরম মহবম কবছিলেন। ব্রেবোর্নও খেবকে বিনা শর্তে মন্ত্রিত্ব গ্রহণে রাজি করান। হেইগ মন্ত্রী নিয়োগ, অ্যাডভোকেট জেনাবেল নিয়োগ ইত্যাদি ব্যাপারে পন্থের আপত্তি মেনে নেন। নেহরু, আপত্তি সত্ত্বেও, জানান—সংখ্যাগবিষ্ঠের মত তিনি মেনে নেবেন। দুজন কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীব আপত্তি ছিল। কিন্তু অধিকাংশ সদস্য "দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও সাধাবণ কংগ্রেসীদেব মনোভাবেব পরিপ্রেক্ষিতে" মন্ত্রীত্ব গ্রহণের পক্ষে ভোট দেন। প্রস্তাবটা নেহরুও গান্ধীব বিবোধী মতেব সমন্বয়। সবচেয়ে বডো পবিবর্তন—গান্ধীর নির্দেশে কোযালিশনে প্রবেশ করাব অনুমতি পেল প্রাদেশিক কংগ্রেস দল। শরৎচন্দ্র বসু এর পেছনে ছিলেন। হকেব সঙ্গে যুক্ত মন্ত্রীসভা তিনি গঠন করতে পারেননি পূর্ববর্তী নিষেধের জন্য। কিন্তু বড দেবি হয়ে গেল। এব খেসাবৎ বাঙালী হিন্দুদেব দিতে হবে।

১৯৩৭-এব জুলাই মাসে বোম্বাই, মাদ্রাজ, সি পি, ইউ পি, বিহার ও উড়িষ্যায় কংগ্রেস সবকাব গঠিত হল। কিছু পরে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে। ১৯৩৮-এর অক্টোবরে আসামে কংগ্রেসেব নেতৃত্বে এক কোয়ালিশন গঠিত হয়। মুখ্যমন্ত্রীরা হলেন যথাক্রমে বি জি খেব, বাজাগোপালাচারি, এন বি খারে, গোবিন্দবল্লভ পন্থ শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, বিশ্বনাথ দাস, ডঃ খান সাহেব ও গোপীনাথ বড়দলই। আজাদের মতে সর্দার প্যাটেল কে এফ নরীম্যানকে পছন্দ কবতেন না বলে অন্যায় কবে খেরকে বোম্বাই-এর মুখ্যমন্ত্রী করা হয়। দ্বিতীয় সারির নেতাবা, যেমন কে এম মুন্সী, টি প্রকাশম, ভি ভি গিবি, রফি কিদোয়াই, কৈলাসনাথ কাটজু, অনুগ্রহনারায়ণ সিংহ, সৈয়াদ মাহমুদ, হরিশঙ্কর শুক্লা, ডি পি মিশ্র, নিত্যানন্দ কানুনগো, ফকরুদ্দিন আলি আহমদ, বিভিন্ন প্রাদেশিক মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়েছিলেন। একমাত্র মহিলা

মন্ত্রী হলেন ইউ· পি··তে—বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত। এমন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কশোভিত ক্যাবিনেট আর কোনদিন প্রাদেশিক স্তরে দেখা দেয়নি।

নির্বাচনী ইস্তাহার, ওয়ার্কিং কমিটি ও পার্লামেণ্টারী বোর্ডের নির্দেশ ছাড়া কর্তব্য সম্বন্ধে হরিজন-এ প্রকাশিত গান্ধীব নানা রচনা প্রেরণা দিত। বিশেষ উল্লেখযোগ্য তাঁর ১৩ নভেম্বর ১৯৩৭-এর রচনা। তাঁব প্রথম আদর্শ ছিল ভারতের দারিদ্র্য ও প্রাচ্যের ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে সরল জীবনচর্যা, দ্বিতীয়—মাদক বর্জন, তৃতীয়—কৃষকদের অবস্থার উন্নতি সাধন। অধিক কর ও খাজনার চাপ, বেআইনী শোষণ ও ঋণের ভার থেকে চাষীকে মুক্ত করতে কংগ্রেস অঙ্গীকারবদ্ধ। এরপব আসে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তার ও কলেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন। এসব দায়-দায়িত্ব স্মরণ করে ওয়ার্কিং কমিটি এক চোদ্দ দফার কর্মনীতি ঘোষণা করে (তাকে আজকের বিশ দফার উৎস বলা যেতে পারে)। রাজস্ব ও খাজনা হ্রাসের সঙ্গে যোগ করা হয়েছিল কৃষি আয়কর প্রবর্তন, জমির স্বত্ব স্থায়ীকরণ এবং বকেয়া খাজনা ও ঋণের দায় মোচন ; দমনমূলক আইন প্রত্যাহার এবং রাজনৈতিক বন্দী ও অন্তরীণ মুক্তি , আইন অমান্যেব অপবাধে বাজেয়াপ্ত জমি প্রত্যর্পণ ; শ্রমিকদের জন্য দৈনিক আট ঘণ্টাব অনধিক শ্রমবিধান, জীবিকা নির্বাহের ব্যায়ানুযায়ী মজুবি প্রবর্তন ও বেকার ভাতা ; রাজকর্মচারীদের অতিরিক্ত মাহিনা, ভাতা প্রভৃতি হ্রাস করে মাথাভারী প্রশাসনের ব্যয়সঙ্কোচ। মন্ত্রীদের অধিকারেব চেয়ে কর্তব্যের ওপর জোর দিয়ে গান্ধীজী বলেছিলেন, "মন্ত্রিত্ব হবে কাঁটার মুকুট।" পরিশ্রম, সততা, অপক্ষপাত ইত্যাদি সদ্‌গুণ ছাড়াও কর্মচারীদের থাকা চাই শাসনসংক্রান্ত সব খুঁটিনাটি ব্যাপারে দক্ষতা। বর্তমান শাসককুলের কয়জন গান্ধীব এই উচ্চাদর্শ অনুসরণ করেন ?

কেন্দ্রীয় নির্দেশ অনুযায়ী সব কংগ্রেসী প্রদেশের আইন সভায় ১৯৩৫-এর সংস্কারেব নিন্দা করা হয়, গণপবিষদেব দাবি তোলা হয় ও ফেডারেশনের খসড়ার বিরোধিতা করা হয়। নেহরু লোথিয়ানকে জানিয়েছিলেন, ফেডারেশনের আর্থিক ব্যবস্থায় কোন উন্নয়নমূলক ব্যয় করা সম্ভব হবে না। আর রাজেন্দ্র প্রসাদ ও দক্ষিণপন্থীদের আশঙ্কা ছিল কেন্দ্রে কংগ্রেসেব সংখ্যাগবিষ্ঠতা থাকবে না।

দমনমূলক আইন প্রত্যাহার এবং বন্দীমুক্তি কংগ্রেসী সরকারদের অন্যতম কীর্তি। ভবিষ্যতে শ্রমিক আন্দোলন হিংসার পথ নিলে তার মহড়া নিতে এমন আইন প্রয়োজন মনে করতেন বোম্বাই-এর মুখ্যমন্ত্রী খের।[১২৯ক] তাঁর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, মুন্সী, কম্যুনিস্ট বন্দীদের মুক্তি দিতে আদৌ ব্যগ্র ছিলেন না। নেহরু তাঁকে তিরস্কার করে বলেন, "আপনি তো এরই মধ্যে বড়া পুলিশ অফসর বনে গেছেন।" ২৯-৩১ অক্টোবর কলকাতা এ আই সি সি-তে এই ও অন্যান্য ব্যাপাবে মন্ত্রিসভাব ওপর অত্যাধিক নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেহরু ও খেরেব মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ হয় এবং, লুমলির মতে, খেব "pitched into him (Nehru) hot." প্যাটেলেব কাছে আবেদন জানান মুন্সী, গান্ধীর কাছে খেব। উভয়েই সমর্থন পান।[১২৯খ] গোয়েন্দা দফতরেব কর্তা ইউআর্ট লিখছেন, "Patel hates Nehru. Communists and Kisan Sabhas with almost equal bitterness. Gandhi... is generally ready to help them (ministers) fight violence." তাঁর মতে গান্ধী অপাতত ডান ও বামের মধ্যে পাল্লা ধবে রেখেছেন, তাঁর মৃত্যু হলে কংগ্রেসে ভাগ অপরিহার্য।[১২৯গ] বিড়লাও বলেছিলেন একথা। মুন্সী নেহরুর শ্রাদ্ধ করেন।[১২৯ঘ]

তবু বোম্বাই সরকার Special Emergency Powers Act (1932) বাতিল করেন, বিহার Public Safety Act (1930) ও সীমান্ত প্রদেশ—Public Tranquility Act

(1932)। ইউ. পি ও বিহারে বামপন্থীদের চাপ ছিল ঢের বেশি, কিছু মন্ত্রী ছিলেন সমাজতন্ত্রী, নেহরুর অধিকতর প্রতিপত্তি। উক্ত দুই রাজ্যের লাট 'বিশেষ দায়িত্ব' বলে যশপাল ও কয়েকজন কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলার বন্দীর ব্যাপারে বিবেচনা করতে চান ও বড়লাট তাঁদের সমর্থন করেন।এ নিয়ে দুই রাজ্যের মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে (১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮) এবং সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টি হয়। গান্ধী বলেন, "How I wish that it was possible for the Governor-General to retrace his step..." তবে মুখ্যমন্ত্রিদ্বয় (তখন প্রধানমন্ত্রী বলা হত) লাটদের সঙ্গে আলোচনা চালান এবং তাঁরা স্বাস্থ্যকর কনভেনশন চালু কবতে রাজি হওয়ায় সংকট কেটে যায়।

এই সময় দেশে ফিরবার দাবিতে আন্দামানের রাজবন্দীরা অনশন শুরু করে। তা শেষ হলে বন্দিমুক্তির প্রশ্ন ওঠে এবং গান্ধী বাংলার ফজলল হক মন্ত্রিসভার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে কথা বলার পর বন্দীদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। সন্ত্রাসবাদ সম্বন্ধে বহু বন্দীর মত পরিবর্তিত হয়েছিল ; তারা অনেকেই সাম্যবাদী বিপ্লবের আদর্শ গ্রহণ করেছিল। প্রেসিডেন্সী জেল থেকে সি পি আই-এর বাংলা কমিটির কাছে এক চিঠিতে পরিষ্কার লেখা হয় : "Revolutionary youths who have scientifically understood the futility of their previous method of terrorism, who have thoroughly studied the principle of Communism, who are mostly professional revolutionaries, are no doubt great assets to the C. P. and Indian revolution," বড়লাট বলছেন, এ ধরনের চিঠি আন্দামান, দেওলি ও বাংলাব জেলে বন্দীদের পাঠান হচ্ছিল।[১৩০] হেইগ জানান বামপন্থীরা এসব বন্দী মুক্তি নিয়ে কংগ্রেসেব ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। গান্ধীর আশা ছিল সহিংস বিপ্লবের পথ ছেড়ে এরা কংগ্রেসী হবে।

আর এক গোলমাল বাধল উড়িষ্যায়। ছোটলাট ছুটিতে দেশে যাবার সময় রেভিন্যু কমিশনার ডেইনকে অস্থায়ী লাট নিযুক্ত কবেন। কিছুদিন আগে যিনি মন্ত্রিসভার অধীনস্থ কর্মচারী ছিলেন তিনি এখন তার খবরদারি করবেন ? প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথ দাস প্রতিবাদ করলেন। সুভাষচন্দ্র তখন কংগ্রেসের সভাপতি। তিনি ও গান্ধীজী দাসের সঙ্গে যোগ দিলেন। লাট ছুটি প্রত্যাহার করায় সংকটের অবসান হল। কিন্তু বড়লাট স্বীকার করেছেন উড়িষ্যাব ছোটলাট হাব্যাক দাশকে ক্ষমা করেননি, যে কোন অজুহাতে জব্দ কবার চেষ্টা করেছেন।[১৩১]

মাদ্রাজে রাজাজী কারুর কথা না শুনে আর এক বিপত্তি বাধান। নেহরু মনে করতেন এটা কংগ্রেসী নীতি ও কর্মপদ্ধতির "reversal and negation." রাজাজী কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদের গ্রেফতার করাচ্ছিলেন, স্বাধীনতা শপথের ওপরও নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেননি, ছোটলাট এরস্‌কাইনকে তিনি বলতেন, "ভারতে কড়া (শাসক) হওয়া দরকার।" অন্ধ্র প্রদেশ গঠনের ব্যাপারে ছোটলাটের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করতে তাঁর বাধেনি।[১৩২] এরস্‌কাইন মজা পেয়ে লিখছেন, "In fact, he is even too much of a Tory for me...he wishes to go back two thousand years and to run India as it was run in the time of King Asoka." এর থেকে বোঝা যায় সুযোগ পেলে কংগ্রেসী মন্ত্রীরাও ব্রিটিশ আমলাশাহীর সঙ্গে পাল্লা দিতেন। লঙ্কার আবহাওয়া এমন যে সেখানে যে যায় সেই রাবণ হয়।

অবশ্য এসব বড় কথা নয়। কৃষক ও প্রজাদের প্রতি প্রতিশ্রুতি কতটা পালন করতে

সমর্থ হয়েছিল কংগ্রেস সরকার ? কৃষক সম্পর্কিত কর্মসূচি তাদের বর্তমান সাফল্যের কারণ আবার ভবিষ্যৎ সাফল্যের চাবিকাঠি। বিহারের মন্ত্রিসভা ১৯৩৭-৩৮ সালে এ বিষয়ে পাঁচটি আইন পাস করে। প্রথমত, ১৯১১ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত খাজনার বর্ধিত হার মকুব করা হয়। দ্বিতীয়ত, ঐ সময় যে সব খাজনা আদায় বন্ধ ছিল কৃষিমূল্য হ্রাসের সমহারে তা কমিয়ে দেওয়া হয়। তৃতীয়ত, বালি পড়ে বা জল জমে বা মালিকরা উপযুক্ত জলসেচের ব্যবস্থা না করায় যে সব জমির উৎপাদিকা শক্তি কমে গিয়েছিল সে সব ক্ষেত্রে পুরো বা আংশিকভাবে খাজনা মাফ করা হয়। চতুর্থত, স্থানীয় প্রধান শস্যের গড় দাম পড়ে গেছে সেখানকার খাজনা কমানো হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত নিরিখ ধার্য হয়। যে খাজনা এইভাবে কমানো হবে বা ধার্য হবে পরের বছর তা বাড়ানো চলবে না। দখলীস্বত্বের জমি বা তার অংশ হস্তান্তরের পথে যে সব বাধা ছিল তা তুলে দেওয়া হল। মালিকের সম্মতি নেওয়ার বা সেলামি দেওয়ার আর কোন বাধ্যবাধকতা রইল না। মালিকের কাগজপত্রে নাম বদল করার জন্য নামমাত্র একটা ফি দিতে হবে এবং মালিক রাজি না হলে কালেক্টরিতে জমা দিলেই চলবে। দখলীদার প্রজার অধীনস্থ প্রজারা যদি বারো বছর জমি ভোগ কবে থাকে তবে তারাও দখলী স্বত্ব অর্জন করবে। তারা জমির গাছ, ফল ইত্যাদিও ভোগ কবতে পারবে। তাদের উত্তরাধিকারীরা বিনা বাধায় স্বত্ব পাবে। মালিকরা বাকি খাজনার দায়ে কিষাণদের জেলে পাঠাতে পারবে না বা তার অস্থাবর সম্পত্তি আটক কবতে পারবে না, উৎখাত তো করতেই পারবে না। আদালতের রায় অনুসারেও কারও পুরো জোত বেচা চলবে না যদি না সে চাষী স্বভাবতই খাজনা বাকি ফেলে। ১৯২৯-এর পরবর্তী মান্দ্যের ফলে যাদের জোত নীলাম হয়ে যায়, ১৯৩৮-এর এক আইনের বলে, বকেযা খাজনাব অর্ধেক মিটিয়ে দিলেই, সে জমি তারা ফেরত পাবে।

ইউ.পি-তে ১৯৩৯-এর এক আইনেব মাধ্যমে নানা কৃষিসম্পর্কিত সংস্কার সাধিত হয়েছিল। প্রথমত, আগ্রা ও অযোধ্যার পৃথক ভূমি ব্যবস্থার অবসান ঘটল। অযোধ্যাব অল্প প্রজাই দখলী স্বত্ব ভোগ করত (যেখানে আগ্রার প্রজাদের অর্ধেক জমিই ছিল দখলী স্বত্বাধীন)। নতুন আইনে সব কিষাণকেই জমি দখলেরও উত্তরাধিকারসূত্রে ভোগের অধিকার দেওয়া হল। দ্বিতীয়ত, সির (sir) প্রথা তুলে দেওয়া হল। ১৯২১ ও ১৯২৬-এব প্রজাস্বত্ব আইনে নানা কারণে কিষাণদের উৎখাত করা চলত। এর অন্যতম ছিল মালিকেব পক্ষে আবাদ বাডানোর অজুহাত। নতুন আইনে স্থির হল বাড়ি ও বাগানের জন্য পাঁচ একরের অধিক জমি অধিগ্রহণ করা চলবে না। নিলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে অধিক হারে। বাড়ি ও খামার তৈরি করার জন্য মালিকের অনুমতির দরকার হবে না আর। উত্তরাধিকারসূত্রে দখলী জমির খাজনা স্থির করবে সরকারী কর্মচারীরা এবং দশ বছরের মধ্যে তা বদলানো যাবে না। উৎপন্ন শস্যের বর্তমান মূল্যের বিশ শতকের বেশি খাজনা নেওয়া বারণ হল। উৎপাদন ব্যয় হিসাবে ধরা হল। মালিক বা কিষাণ শস্যে দেয় খাজনার বদলে টাকায় খাজনা দেবার দাবি তুলতে পারবে। অবশ্যই বাকি খাজনার দায়ে গ্রেফতার বা জেল বাতিল হল ও খাজনার রসিদ দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হল।

উড়িষ্যায় ১৯৩৮-এর এক আইনে দখলী স্বত্বাধীন জমি বিনা ফি-তে হস্তান্তরের অনুমতি দেওয়া হল ও বকেয়া খাজনার ওপর সুদের হার ৬%-এ নামিয়ে আনা হল। যখন উড়িষ্যার জমিদাররা বললেন, "এই বিলে লেনিনবাদের গন্ধ পাচ্ছি," বিশ্বনাথ দাস উত্তর দেন, "যে সব সুবিধা চাষীদের দেওয়া হচ্ছে তাতে মালিকদের আয় পাঁচ শতকের বেশি কমবে না। এতেই বিপ্লবের কথা!" বস্তুত কংগ্রেস কোথাও জমিদারী উচ্ছেদের চেষ্টা করেনি এবং

একটি মাত্র বিল (The Madras Estates Land (Orissa Amd.) Bill of 1937) বড়লাটের সম্মতি পায়নি। মাদ্রাজের যে অঞ্চল উড়িষ্যায় এসেছিল সেখানকার জমিদাররা মোট উৎপাদনের অর্ধেক খাজনা হিসাবে নিত। রায়তওয়ারী অঞ্চলের তুলনায় এই হার অত্যধিক। উক্ত আইনের উদ্দেশ্য ছিল পার্শ্ববর্তী রায়তী জমির খাজনার হারের সঙ্গে সমতা আনয়ন, তবু টাকায় দু আনা করে বেশি খাজনা জমিদাররা পাবে। বিলটি বড়লাটের সম্মতির জন্য পাঠানো হলে সর্বভারতীয় কিষাণ সংস্থা এবং অধ্যাপক এন জি রঙ্গ আপত্তি তোলেন। জমিদাররা কোন সমঝোতায় রাজি না হওয়ায় ১৯৪১ পর্যন্ত অপেক্ষা করে বড়লাট ভিটো প্রয়োগ করেন। উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্যে অনুরূপ হার প্রবর্তনের সুপারিশ করেন বিশ্বনাথ দাস। খালিকোটের রাজা ও ছোটলাট হাব্যাকের আপত্তিতে তা ভেস্তে যায়। জমিদার বা রাজা কাউকে চটানো যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভব ছিল না।

মাদ্রাজে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এলাকার খাজনা নিয়ে বিতর্ক হয়। এক বিশেষ কমিটি অনুসন্ধান করার পর টি প্রকাশম আইন পরিষদে বলেন, কমিটির প্রতিবেদন আদৌ বৈপ্লবিক নয়। রাজাজী তো জমিদারকে পূর্ণ, এমনকি আংশিক, মালিক বলে স্বীকার করেননি এবং ক্ষতিপূরণের দাবি উড়িয়ে দেন। কিন্তু, দুর্ভাগ্যের বিষয়, ১৯৩৯-এ পদত্যাগ পর্যন্ত মাদ্রাজ মন্ত্রিসভা কৃষক সবিধার্থ কোন আইন আনেননি।

বোম্বাই সরকারের সঙ্গে গুজরাটের আইন অমান্যকারীদের বাজেয়াপ্ত জমি প্রত্যর্পণের ব্যাপারে বিরোধ ঘটে লাটের। গান্ধীর মতে প্রস্তাবিত খাজনার ২৫ গুণ ক্ষতিপূরণের হার অত্যন্ত চড়া। প্যাটেল বলেন, ক্ষতিপূরণের সঙ্গে ১৫% লাভ যোগ করলে যথেষ্ট হবে। পতিত জমি ধরালাদের দিতে হবে। ব্রোবোর্ন বলেন, রাজস্বের বারোগুণ হারে ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত। রাজস্বমন্ত্রী মোরারজি দেশাই আটগুণের বেশি দেবেন না। মুন্সী তা কমিয়ে চারগুণের মত করলেন। শেষে প্যাটেলের মতই বজায় থাকে। বি জি খের ব্রেবোর্নকে বলেন, তা না মেনে নিলে গান্ধী মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে বলবেন।[১৩৩]

দখলী স্বত্বের মতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল কৃষিঋণের সমস্যা। মহাজনী আইন সংশোধন করা হয় বিহার, বোম্বাই, সি পি, মাদ্রাজ, উড়িষ্যা ও সীমান্ত প্রদেশে। মহাজনদের নথিভুক্ত করার বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা হল এই প্রথম। ঠিকমত হিসেব রাখা ও রসিদ দেওয়ারও ব্যবস্থা হল। দামদুপতের নীতি পুনরায় চালু হল। মাদ্রাজ ও সীমান্তে উর্ধ্বতম সুদের হার স্থির হল ৬$\frac{১}{৪}$%, বিহারে বন্ধকী ঋণের ক্ষেত্রে ৯% ও বন্ধকহীন ঋণের ক্ষেত্রে ১২%। দেনার দায়ে এক তৃতীয়াংশের বেশি জমি নীলাম করা যাবে না। মাদ্রাজে চাষীদের দেনার অনেকখানি মকুব করা হয়, সব জেলায় ঋণ সালিসী বোর্ড স্থাপিত হয় এবং ঋণ শোধের সুবিধার্থ সরকার থেকে ৫০ লাখ টাকা সাহায্য দেওয়া হয়। উড়িষ্যায় স্থাপিত হয় কো-অপারেটিভ ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক ও প্রাদেশিক কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক।

মাদ্রাজে ঋণের দায়ে দাসত্ব (গোঠি) প্রথা চালু ছিল, বিহার ও উড়িষ্যায় 'কামিয়াউতি' প্রথা। সে প্রথা রদ করার জন্য কিছু আইন করা উচিত ছিল।

গ্রামীণ পুনর্গঠনের জন্য ইউ.পি-র প্রত্যেক জেলায় কুড়িটি করে কেন্দ্র স্থাপিত হল। প্রত্যেক কেন্দ্রের অধীনে থাকবে কুড়ি থেকে ত্রিশটি গ্রাম। কেন্দ্র পরিচালক অধিবাসীদের স্বাবলম্বী হবার শিক্ষা দেবেন। তার কাজ পরিদর্শন করবে জেলা সমিতি (যাদের হাতে উন্নয়নের টাকা দেওয়া হবে)। মাদ্রাজে পানীয় জল সরবরাহের জন্য ও রাস্তাঘাট তৈরি বা সংস্কারের জন্য আলাদা ফাণ্ড গঠিত হল। বোম্বাইতে গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিকল্পনা প্রাধান্য পায় এবং ১৬১টি কেন্দ্র স্থাপিত হয়। সি.পি-তে ৫০টি কেন্দ্রে গ্রামীণ উন্নয়নের

সঙ্গে কর্মমুখী বৃত্তিপ্রশিক্ষণের ব্যবস্থা চালু হয়। অবশ্যই সুতোকাটা ও তাঁত বোনা তার অন্যতম। ওয়ার্ধায় অবস্থিত নিখিল ভাবত গ্রামীণ শিল্প সংস্থা ও নিখিল ভারত সুতাকাটুনী সঙ্ঘ এ সব কেন্দ্রে শিক্ষক পাঠাত। এ ছাড়াও থাকত স্বাস্থ্য, জল সরবরাহ, বয়স্ক শিক্ষা, কৃষি শিক্ষা প্রভৃতির ব্যবস্থা।

গান্ধীজীর পরিকল্পনায় খাদি ও কুটীরশিল্পের স্থান সর্বাগ্রে। ১৯৩৮-এ হরিপুরা কংগ্রেসে খাদি প্রদর্শনী উদ্বোধন করতে গিয়ে গান্ধী বলেছিলেন—

"আমি প্রায়ই বলেছি যে যদি সাত লাখ গ্রামকে বাঁচিয়ে রাখতে হয় এবং সভ্যতার মূলস্বরূপ শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হয় তবে সব হস্তশিল্পের কেন্দ্রে বসাতে হবে চরখাকে।...চরখার সূর্য অন্য কুটীরশিল্পের গ্রহকে আলোকিত করবে।"

সর্বভারতীয় খাদি বোর্ডের সভাপতি ভরতন কুমারাপ্পার অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। মাদ্রাজে খাদি ও কুটীরশিল্প প্রসারের জন্য তিনটি আইন পাস হয়। কাগজ ও তৈলনিষ্কাষণ শিল্পের ওপর জোর দেওয়া হয়। সি.পি-তে কাঠ, চামডা, কাচ, লোহা, খেলনা, মাটির পাত্র, ঘি, তেল ও সাবান তৈবির আয়োজন লক্ষ্য করি। এখানে প্রশিক্ষণের জন্য দুটি পলিটেকনিক স্থাপিত হয়। বিহারে জোব পড়ে কাগজ ও রেশম শিল্পের ওপর। ঝরিয়া ও কুস্তোড়ের কুলি কামিনদের জন্য হাতের কাজ ও চামারদের জন্য চামডার কাজ শেখাবার চেষ্টা হয়েছিল।

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বুঝতে পারছিলেন এ ধরনের বিচ্ছিন্ন ও সীমিত প্রয়াসে দেশের দারিদ্র দূর কবা বা আর্থিক উন্নযন সম্ভব নয়। এই চেতনার ফলশ্রুতি ভারতীয় পরিকল্পনা কমিটি। কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু সব কংগ্রেসী শিল্পমন্ত্রী, বিডলা ও লালা শ্রীবাম প্রমুখ শিল্পপতি ও দেশের সর্বপ্রথম পরিকল্পনাভাবুক বিশ্বেশ্বরয়াকে আমন্ত্রণ জানান দিল্লীতে। জাতীয় পবিকল্পনাব রূপবেখা নিয়ে আলোচনা বসে ১৯৩৮-এব ২ ও ৩ অক্টোবর। সুভাষবাবু বলেন, শুধু কৃষিসম্পদেব পূর্ণ ব্যবহারে উন্নয়ন সম্ভব নয়, দ্রুত শিল্পায়ন ও গ্রামীণ বেকারদেব শিল্পকর্মে নিয়োগ আবশ্যিক। বাশিয়ার 'গসপ্ল্যান'-এর উদাহরণ তখন সকলেব চোখে ভাসছে। গান্ধীর দলকে খুশি করাব জন্য তিনি বলেন, ভাবী শিল্পেব উন্নতির সঙ্গে কুটীরশিল্পের কোন বিবোধ নেই, বরং তাবা পরিপূরক। সম্মেলনেব সিদ্ধান্তানুযায়ী জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে বাবো সদস্যের এক পরিকল্পনা কমিটি গঠিত হল। কমিটি ১৬৭টি প্রশ্ন ও ৭০টি আনুষঙ্গিক প্রশ্ন সংবলিত এক তালিকা প্রত্যেক প্রদেশ, রাজা, বিশ্ববিদ্যালয়, ট্রেড য়ুনিয়নদেব কাছে পাঠায়।

স্থির হয় বন্যা প্রতিরোধ, ব্যাপক সেচ, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ও ভারী শিল্প স্থাপন প্রভৃতি বহুমুখী উদ্দেশ্যে নদীশাসনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মেঘনাদ সাহা বহুদিন ধরে জনমত তৈরি করছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রে টেনেসি ভ্যালি অথবিটি নিয়ে রুজভেল্টেব আমলে খুব আন্দোলন চলছিল। ১৯৩৯ সালে কৃষি, পরিবহণ, শিল্প, জনসংখ্যা, বাণিজ্য ও লগ্নি, জনকল্যাণ ও শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে অনুসন্ধান এবং কর্তব্য নির্ধারণের জন্য ২৭টি সাব কমিটি গঠিত হয়। দুঃখের বিষয়, অল্প পবেই মহাযুদ্ধ বাধে এবং এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার থেকে কংগ্রেসের মন সরে যায়। তবে যে বীজ প্রোথিত হয়েছিল তাই একদিন পরিকল্পনা কমিশনেব মহীরুহে পরিণত হয়েছিল।

দক্ষিণপন্থীরা জানত মীবাট বন্দীদের মুক্তির পর কম্যুনিস্ট আন্দোলন জোরদার হবে কমিনটার্নের সপ্তম অধিবেশনে যুক্তফ্রন্টেব নীতি গৃহীত হলে কম্যুনিস্টরা কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টিতে যোগ দেয় এবং তার মাধ্যমে কংগ্রেসের মতভেদেব সুযোগ নিয়ে

প্রভাব বাড়াতে চায়। একে তারা Trojan horse policy আখ্যা দিয়েছিল।[১৩৪] ইয়ুথ লীগ, ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন প্রভৃতি এই উদ্দেশ্য নিয়ে স্থাপিত হয়েছিল।[১৩৫] ১৯৩৬-৩৮-এর মধ্যে দলে দলে সন্ত্রাসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দিলে তারা জোরদার লড়াই করতে সমর্থ হয়েছিল। জওহরলালের সমাজতন্ত্রী নীতি দক্ষিণপন্থীদের আপত্তিতে ও গান্ধীর সমর্থনে প্রায় পরিত্যক্ত হওয়ায় তাদের গান্ধীবাদবিরোধিতা তীব্রতর হবে এতে আশ্চর্য কি!

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাদের হাতে সবচেয়ে বড়ো হাতিয়ার ছিল ধর্মঘট। ১৯৩৭ সালে বাংলার পাটকলে ছয় সপ্তাহব্যাপী ধর্মঘট দিয়ে এর সূচনা। বোম্বাই, সোলাপুর, আহ্‌মদাবাদ ও কানপুরের শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক অসন্তোষ তো লেগেই ছিল। ১৯৩৮-এর নভেম্বরে বোম্বাই সরকার Trade Disputes Bill পাস করে আকস্মিক ধর্মঘট ও কারখানা বন্ধ (lock out) উভয়ই নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। অধিকাংশ ধর্মঘট সুতোকলে হত বলে এক Textile Enquiry Committee গঠিত হয় ও তার অনুমোদনক্রমে শ্রমিকদের বর্ধিত বেতনহার ও বসবাসের উন্নততর ব্যবস্থার দাবি খানিকটা মেনে নেওয়া হয়। বলা বাহুল্য কম্যুনিস্ট নেতারা সন্তুষ্ট হননি এবং ৭ নভেম্বর সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেন। কিন্তু ৭৭টি কলের মধ্যে মাত্র ১৭টিতে কাজ বন্ধ রাখতে সমর্থ হন তাঁরা। মাদ্রাজের সরকার মালিক-শ্রমিক সংঘর্ষে হস্তক্ষেপ করে এবং তার ফলে কিছু মজুরি বেড়েছিল। ১৯৩৭-এ কানপুরের কাপড়ের মিলে যে ধর্মঘট শুরু হয় তা পন্থের হস্তক্ষেপে মিটলেও পরের বছর গুরুতর আকার ধারণ করে। ইউ.পি সরকারের Labour Enquiry Committee-র অনুমোদন মানতে অস্বীকার করেন মালিকরা। পরে একটা আপোস হয়। এখানেই শ্রমিক আবাসনের জন্য প্রথম গৃহনির্মাণ প্রকল্প গৃহীত হয়েছিল।

শ্রমিক কল্যাণের সঙ্গে মাদক বর্জনের প্রশ্ন যুক্ত। গান্ধীর মতে সম্পূর্ণ মাদক বর্জন ছাড়া কৃষক বা শ্রমিক কোনদিন সুখী হতে পারবে না, স্বাধীনও নয়। এর মত খাঁটি সত্য কথা হয় না। ওয়র্কিং কমিটি ১৯৩৭-এর আগস্টে এ বিষয়ে প্রস্তাব নেয় এবং প্রাদেশিক সরকারদের তিন বছরের মধ্যে এ পাপ দূর করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। মুশকিল হল, এর ফলে সরকারকে অনেকখানি রাজস্ব হারাতে হবে। বোম্বাই ও মাদ্রাজে মাদক শুল্ক সমগ্র আয়ের চতুর্থাংশের মত বা কিছু বেশি। তবু গান্ধী বলেন, "This drink and drugs revenue is a form of extremely degrading taxation." তা ছাড়া আপাতদৃষ্টিতে যাকে ক্ষতি মনে হচ্ছে উন্নত চরিত্র ও স্বাস্থ্যবান শ্রমিক অধিক উৎপাদন করে তা পুষিয়ে দেবে। প্রাদেশিক সরকারবা ধীরে ধীরে সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হয়। বোম্বাইতে খের বাড়ি ও জমির ওপর কর বাড়িয়ে মাদক-শুল্ক বাবদ ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করেন। মাদ্রাজে প্রথমে সালেমে ও পরে চিত্তুর ও কুডাপ্পাতে মাদক বর্জন শুরু হয়। রাজাজী ছিলেন এর সবচেয়ে জঙ্গী সমর্থক। ইউ.পি.শুরু করে এটা ও মইনপুরি থেকে। কোনও কোনও স্থানে দিশি মদের বিক্রয় প্রায় অর্ধেক কমে যায়, বড় শহরে শুল্ক বিভাগ মদ গাঁজার দোকান নিয়ন্ত্রণ করত। সি পি-তে চরস নিষিদ্ধ হয়। উড়িষ্যায় আফিম ও দিশি মদের বিরুদ্ধে আলাদা আইন করা হয়।

গান্ধীর প্রেরণায় অস্পৃশ্যতামোচন ও হরিজন উন্নয়ন কংগ্রেস সরকারদের অন্যতম ব্রত হয়েছিল। ১৯৩৪ সাল থেকেই উড়িষ্যার মন্দিরে হরিজনদের প্রাবেশাধিকার নিয়ে তিনি সংগ্রাম করছিলেন। ১৯৩৮-এ তিনি আবেদন জানালেন জগন্নাথের মন্দির সকলের জন্য খুলে দেওয়া হোক। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন হরিজনদের প্রবেশাধিকার না দেওয়া পর্যন্ত

মন্দিরে প্রবেশ করবেন না। তাঁকে না জানিয়ে কস্তুরবা, দুর্গাবেন ও মহাদেব দেশাই জগন্নাথ দর্শন করায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন তিনি, এমনকি অসুস্থ হয়ে পড়েন। বোম্বাই সরকার এ ধরনের আইন পাস করল প্রথম। মাদ্রাজের Removal of Civil Disabilities Bill (১৯৩৮) চাকুরির ক্ষেত্রে ও সরকারী কূপ, পুষ্করিণী, রাস্তা প্রভৃতি ব্যবহারে হরিজনদের ওপর বাধানিষেধ লোপ করে। মালাবারে অস্পৃশ্যদের মন্দির প্রবেশ এই আইনের বলেই সম্ভব হয়। মাদ্রাজের কংগ্রেস সবকার পদত্যাগ করার পূর্বেই মীনাক্ষী মন্দিরের দ্বার সকলের জন্য খুলে দেওয়া হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, নঈ তালিমের কিছু ব্যবস্থা হল।প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাকে আগাগোড়া ভ্রান্ত ও ক্ষতিকর মনে করতেন গান্ধী। তাঁর এ বিষয়ে যথেষ্ট পড়াশোনা ছিল, চিন্তাভাবনা চলছিল। ১৯৩৭-এব ২২ অক্টোবর বিস্তৃত আলোচনার জন্য ওয়ার্ধায় এক শিক্ষাসম্মেলন ডাকা হল। উদ্বোধনী ভাষণে গান্ধী বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও হাতের কাজের ওপব জোর দেন (আজ আমরা যাকে Vocational ও Work education নাম দিয়েছি)। প্রথাগত শিক্ষাব সঙ্গে লেজুড়েব মত তাকে জুড়ে দেওয়া হবে না, তার মাধ্যমেই দিতে হবে শিক্ষা। জাকিব হোসেন কমিটি সপ্তবর্ষব্যাপী বাধ্যতামূলক কিন্তু অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা, হাতের কাজ কেন্দ্র করে ও মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা, পরিবেশ অনুযায়ী বৃত্তিশিক্ষার অনুমোদন সংবলিত যে প্রতিবেদন বচনা করে আজকেব গণশিক্ষা তারই ওপর দাঁড়িয়ে আছে। হবিপুরা কংগ্রেস ওযার্ধা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল এবং সর্বভারতীয় শিক্ষা বোর্ড গঠন করাব প্রস্তাবও দিয়েছিল। তদনুসারে পাটনা ট্রেনিং স্কুল স্থাপিত হয় এবং বেতিয়া থানায় ৫০টি নঈ তালিম বিদ্যালয়ে সাত বছবের শিক্ষাক্রম পবীক্ষামূলক ভাবে চালু হয়। এলাহাবাদে অনুরূপ বেসিক ট্রেনিং কলেজ স্থাপিত হয়েছিল। কিছু জেলা ও মিউনিসিপ্যাল স্কুলের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে সেগুলিকে নঈ তালিম বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হয়। ওই ধবনেব বিদ্যালয় ছাড়াও বোম্বাই সবকার Primary Education Amd. Bill (1938)-এব মাধ্যমে পুবোনো শিক্ষাব্যবস্থার বহু ত্রুটি সংশোধন করে। লক্ষ্য ছিল প্রতি গ্রামে স্কুল হবে। ব্যায়ামশিক্ষার জন্য একটি বোর্ডও গঠিত হয়। সি.পি-তে গান্ধীজীর 'বিদ্যামন্দিব' পবিকল্পনা উল্লেখযোগ্য। একটি বাড়ি ও তৎসঙ্গে কিছু জমি নিয়ে কাজ আবম্ভ করা হল। জমিতে যে ফসল ছেলেবা ফলাত তাই বেচে খবচ তোলা হত। জমি ও বাড়ি স্থানীয গ্রামবাসীবা দান করবে আশা ছিল। পণ্ডিত রবিশঙ্কব শুক্লাব উৎসাহে ১৯৩৯-এ সি পি.বিদ্যামন্দিব বিল পাস হয়। গোপবন্ধু চৌধুরী কটক জেলায নঈ তালিম প্রবর্তন কবেন।

বয়স্ক শিক্ষা প্রসাবেব জন্য বোম্বাই এক বয়স্ক শিক্ষা বোর্ড গঠন করে। উদ্দেশ্য ছিল স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ও উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের সাহায্যে তিন বছরের মধ্যে কিছু বয়স্ককে সাক্ষর কবে তোলা। বিহাবেব সৈয়দ মাহমুদ যখন ছাত্রসমাজকে গ্রীষ্মবকাশে এই কাজে আহ্বান জানান, বিপুল সাড়া মেলে। বিহার মহিলা সমিতিও প্রচুর সাহায্য করে। ১৯৩৯ সালে সি.পি-তে ৪৮টি জেলায় বয়স্ক শিক্ষার ২৮৩৪টি বিদ্যালয় চালু ছিল। তা ছাড়া ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেবির ব্যবস্থাও হয। বিহারেব সব ম্যুনিসিপ্যালিটি, স্থানীয় ও জেলা বোর্ড স্ত্রী শিক্ষা ও হবিজন শিক্ষাব জন্য অর্থ বরাদ্দ করেছিল।

উচ্চশিক্ষাব ক্ষেত্রে কাশী বিদ্যাপীঠ ও জামিয়া মিলিয়ার স্নাতক উপাধিকে চাকুরির ব্যাপারে বি এ ডিগ্রিব মর্যাদা দেওয়া হয়।

গঠনমূলক কাজেব পরিমাণ এত ব্যাপক ও সমস্যা এত জটিল ছিল যে তদনুপাতে কংগ্রেসী সবকারেব চেষ্টা বা অর্থব্যয় আশানুরূপ হয়নি। মনে রাখতে হবে তারা মাত্র দুবছর

একটানা কাজ করতে পেরেছিল। কংগ্রেসের বার্ষিক রিপোর্টে বিভিন্ন সরকার বিভিন্ন খাতে কি পরিমাণ জনকল্যাণমূলক কাজ করছিল তার নিরিখ মেলে।[১৩৬]

যুদ্ধারম্ভে পদত্যাগ না করতে হলে কালক্রমে উদ্যোগ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেত। অর্থের অভাব থাকলেও সততার অভাব ছিল না। সর্বোপরি ছিল গান্ধীজীর সদাসতর্ক দৃষ্টি। বর্তমান অকংগ্রেসী সরকারগুলি যখন সীমিত শক্তি ও অর্থের ওজর তোলেন এবং প্রায় প্রতি ব্যাপারে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও কেন্দ্রের বিমাতৃসুলভ আচরণকে দায়ী করেন তখন তাঁরা ভেবেও দেখেন না কি প্রতিকূল পরিবেশে ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ এইসব কংগ্রেসী সরকারকে দেশের কাজ করতে হয়েছিল। তাদের গঠনমূলক কাজ ইংরেজ লাট ও বড়লাটের প্রশংসা অর্জন করেছিল। লিনলিথগো তাদের "a distinguished record of public achievement"-এর উল্লেখ করেছেন। ইউ.পি.ও মাদ্রাজের লাটরা কাজের মেয়াদ শেষ হলে যে সব প্রবন্ধ লেখেন তাতে কংগ্রেসী সরকারদের নিষ্ঠা, সদিচ্ছা ও দক্ষতার প্রশংসা করা হয়েছিল।[১৩৭]

কেন্দ্রীয় কংগ্রেস মোটামুটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চলত। তবু সি.পি. মন্ত্রিসভার সংকট উল্লেখযোগ্য। এখানে মারাঠীভাষী ও হিন্দীভাষী মন্ত্রীরা বনিয়ে চলতে পারছিলেন না। প্রত্যেক অঞ্চল থেকে তিনজন করে মন্ত্রী ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মারাঠীভাষী এন বি খারে। গোলমাল শুরু হয় আইনমন্ত্রী শরীফ ধর্ষণ মামলায় ধৃত এক ব্যক্তিকে মুক্তি দিলে। খারে ব্যাপারটা ধামাচাপা দিতে চাইলেও আইনসভার ভেতরে বাইরে প্রচণ্ড গোলমাল বাধে। ওয়ার্কিং কমিটির নির্দেশে মন্ত্রী পদত্যাগ করেন। খারেকে বলা হয় ওয়ার্কিং কমিটির অনুমতি না নিয়ে তিনি যেন মন্ত্রিসভার রদবদল না করেন। পাঁচমারিতে মারাঠী ও হিন্দীভাষী নেতাদের আপোস হয় কিন্তু খারে তাতে সন্তুষ্ট হননি। প্যাটেল তাঁকে ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেন কিন্তু অধীর খারে ও তাঁর দুই মারাঠী সহকর্মী, গোল ও দেশমুখ, পদত্যাগ করেন। হিন্দীভাষী মন্ত্রীরা রাজেন্দ্র প্রসাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং তিনি তাঁদের পদত্যাগ না করতে বলেন। কিন্তু ছোটলাট খারের পদত্যাগ গ্রহণ করে মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করলেন (২০ জুলাই ১৯৩৮) ও খারেকে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করতে বললেন। দলীয় হাই কমাণ্ডের সঙ্গে কোন আলোচনা না করে পরের দিনই খারের অধীনে নয়া মন্ত্রিসভা শপথ নিল। ২২ জুলাই ওয়ার্ধায় পার্লামেণ্টারী সাবকমিটি এই নিয়ে বিচার করতে বসে এবং খারেকে ২৩ জুলাই পদত্যাগপত্র পেশ করতে বাধ্য করে। খারে আবার সি.পি.প্রার্লামেণ্টারী দলের নেতা হতে চান এবং ২৫ জুলাই গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁকে সংবাদপত্রে সব ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে আপন "error of judgement" স্বীকার করতে বলা হয়, কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা না করায়, শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে, তাঁকে কংগ্রেসের দায়িত্বশীল পদের অযোগ্য ঘোষণা করা হয়। ২৭ জুলাই-এর নির্বাচনে পণ্ডিত রবিশঙ্কর শুক্লা দলের নেতা নির্বাচিত হন এবং ৩০ জুলাই নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। খারের নানা অভিযোগের উত্তরে গান্ধী যে বিধ্বংসী বিবৃতি দেন (৬ আগস্ট) তা পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের নীতি হিসাবে আদর্শ বলে পরিগণিত হওয়া উচিত। In no case can any minister take internal quarrels to the Governor and seek relief through him without the consent of the W. C.... Of course the Governor's action conformed to the letter of the law, but it killed the spirit of the tacit compact between the British Government and the Congress..." সুভাষবাবু তখন সভাপতি। তিনি

বলেন, "In no country would a deposed Premier have behaved with such supreme lack of dignity and responsibility as the ex-Premier of C. P."[১৩৮] আজকাল যদি এভাবে শৃঙ্খলা রক্ষিত হত, কংগ্রেস বাঁচত।

॥ ৬ ॥

কংগ্রেসী প্রদেশের সরকার যখন দরিদ্র দেশের উন্নয়নের জন্য সীমিত চেষ্টা চালাচ্ছিলেন তখন ওপরতলার নেতারা মুসলমানদের সঙ্গে সঙ্গে বোঝাপড়ার পথে বাধার পর বাধার সম্মুখীন হচ্ছিলেন। ১৯৩৫ সালে রাজেন্দ্র প্রসাদ ও জিন্নার আলোচনা কিভাবে ব্যর্থ হয় আগেই বর্ণিত হয়েছে। হিন্দু মহাসভা ও মালব্য-পরিচালিত ন্যাশানালিস্ট দল তা প্রত্যাখ্যান করে। সি পি ও বোম্বাই-এর অ্যানি-পরিচালিত ডেমোক্র্যাটিক স্বরাজ পার্টিও। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ফলে বাংলার হিন্দুরা কংগ্রেস সভাপতির প্রস্তাব মেনে নিতে রাজি হয়নি। আনসারি ও আসফ আলি প্রভৃতি কংগ্রেসী মুসলমানদের চাপে কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ব্যাপারে "না গ্রহণ না বর্জন" নীতি অনুসরণ করে। আসফ আলির বন্ধু, সত্যমূর্তি, জব্বলপুর এ আই সি সি-তে জিন্না-প্রসাদ ফর্ম্যুলার পক্ষে প্রস্তাব আনবেন শুনে বাঙালী কংগ্রেসীরা রুখে দাঁড়ায়। মালব্য পঞ্জাবে বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে জোর প্রচার চালান। কংগ্রেস সোস্যালিস্টরা আবার বাঙালীদের বাঁটোয়ারা-বিরোধী মনোভাবে মদৎ দিচ্ছিল। মন্ত্রীত্ব গ্রহণে প্রস্তুত প্যাটেল এই নিয়ে গোলমাল বাধাতে চাননি। রাজেন্দ্র প্রসাদ পুনরায় জিন্নার সঙ্গে আলোচনার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। কিন্তু লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের সময় বোঝা গেছল মালব্যের দল বাঁটোয়ারা বর্জন করার নীতির পক্ষ নিয়ে ভোটে নামবে। নেহরু নিজে মনে করতেন জনগণের অর্থনৈতিক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানেই সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান নিহিত। তেল-নুন-লকড়ির প্রশ্ন সব জাতপাত সম্প্রদায়ের বিভেদ ভেঙে দেবে এবং দেখিয়ে দেবে যে সমাজের আসল বিভেদ শ্রেণীগত। সাম্প্রদায়িকতার একটা দিকে প্রতিক্রিয়াশীল ও ব্রিটিশ সমর্থননির্ভর স্বার্থ; অন্যদিকে ভয়। "Honest communalism is fear: false communalism is political reaction." হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়েই এই দুই ধরনের সাম্প্রদায়িকতা আছে। সৎ সাম্প্রদায়িকতার লক্ষণ—স্বাধীনতার লক্ষ্য নিঃশর্তে সমর্থন। সভাপতির ভাষণে তিনি বলেছিলেন, "it is after all a side issue..... my vision of a future India contains neither imperialism nor communalism." সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা, তাঁর মতে, দেশকে ধর্মের ভিত্তিতে নানা গোষ্ঠীতে ভাগ করেছে। এটা হল "an utter negation of nationalism (designed) to give strength to disruptive tendencies and thus to strengthen the hold of British imperialism." এমন "patent absurdity" সম্পর্কে দৃঢ় (এবং বিরোধী) অবস্থান না নিয়ে 'না গ্রহণ না বর্জন' নীতি নেওয়ার অর্থ কি?

নির্বাচন যত এগিয়ে এল, কংগ্রেস ততই মালব্যের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চাইল। তিনিও বাঁটোয়ারা বিরোধী, যদিও অন্য কারণে। তদুপরি যে তিনজন মুসলিম নেতা বোম্বাই কংগ্রেসের 'না গ্রহণ না বর্জন' নীতির পেছনে ছিলেন, তাদের মধ্যে টি কে শেরওয়ানি ও আনসারি মারা গেলেন, খলিকুজ্জমান কংগ্রেস ত্যাগ করলেন। আজাদ নিয়েছিলেন আনসারির স্থান কিন্তু তাঁর বেশি প্রভাব ছিল না। ওয়ার্কিং কমিটি ১৯৩৬-এর ১ জুলাই

মালব্যের সঙ্গে আলোচনাকে স্বাগত জানাল। নেহরু-রচিত নির্বাচনী ইস্তাহারে বলা হল—বাঁটোয়ারা হল “wholly unacceptable as being inconsistent with independence and the principle of democracy.” ফলে একদিকে বাংলা, বিহার ও নাগপুরে বাঁটোযাবাব বিরুদ্ধে জোব আন্দোলন শুরু হল, অন্যদিকে ইউ· পি-তে (এবং কিছুটা পঞ্জাবে) মালব্যাধীন ন্যাশানালিস্ট দল ও কংগ্রেসেব প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে সমঝোতা। ফৈজপুর কংগ্রেসে খুব অল্প মুসলিম প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এখানে গণ পরিষদেব ওপর জোব দেওয়া হল কিন্তু সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানে ঐক্যমত্যেব ওপর নয়। স্বীকাব করতেই হবে সমাজতন্ত্রী দল ও নেহরু সাম্প্রদায়িক সমঝোতা ও সংখ্যালঘুকে দেয রক্ষাকবচের ধারণা প্রত্যাখ্যান করে জিন্নাকে চটিযে দিয়েছিলেন।

১৯৩৬-এব প্রথম দিকে জিন্না সম্বন্ধে বিদাযী বডলাট মন্তব্য করেছিলেন, জিন্না “would go over to Congress entirely if he did not think that the Gandhi cap was not suitable for his style of dress and that he prefers to look like a Paris boulevardier with a monocle in his eye.”[১৩৮ক] রাজেন্দ্র প্রসাদেব সঙ্গে আলোচনা ব্যর্থ হবার পরও তিনি হাল ছাড়েননি। মুসলিমদেব যে তিনি সংগঠিত করতে চাইছেন এতে সত্যমূর্তি কোনও অন্যায় দেখেননি। মুসলিম লীগ পার্লামেণ্টারী বোর্ডও প্রতিক্রিয়াশীল ছিল না। জামিয়ৎ ও লীগের সহযোগিতা পরোক্ষ কংগ্রেস সমর্থন সূচনা করে। দুর্ভাগ্যের বিষয়—১৯৩৭ সালে নেহরু ও জিন্নার বিতর্কে ভাবী অমঙ্গলেব সুব শোনা গেল। জওহবলাল বললেন, ভারতীয় রাজনীতিতে দুটো মূল শক্তি কাজ কবছে—সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয়তাবাদ। জিন্না আপত্তি করলেন ; বললেন, একটা তৃতীয় শক্তিও আছে, তার নাম মুসলমান। মুসলিমরা আলাদা জাত এ ধারণা নেহরু উড়িয়ে দিলেন—তাঁর মতে লীগ সামন্ততান্ত্রিক ও অভিজাত ধনী মুসলমানের দল। জিন্না পরিহাস কবে বললেন, “Pandit Nehru is torn between Benares and Moscow.” বেনারস মানে মালব্য। জিন্নাব মতে লীগও দেশের স্বাধীনতা চায় কিন্তু হিন্দু-মুসলিম সংহতিব পূর্বশর্ত—সংখ্যালঘু প্রশ্নের সমাধান। মুসলমানদের আশঙ্কা দূর করতে হবে, নিরাপত্তা বোধ বাড়াতে হবে, সমান সুযোগ দিতে হবে। নেহরু জিন্নাকে ভাই পরমানন্দেব সঙ্গে তুলনা করলে জিন্না জানান, “ভাই পরমানন্দ তো হিন্দুরাজ চান, আর আমি চাই সকল ভারতীযের জন্য গণতান্ত্রিক এবং দায়িত্ববান সরকার।” ভাবী শাসনতন্ত্রে সংখ্যালঘুর রক্ষাকবচ থাকা চাই। তা ছাড়া কংগ্রেস মুসলিমদের প্রতিনিধিত্ব করছে এ দাবি তিনি নস্যাৎ করে দিলেন। সমাজতন্ত্রী নেহরু বললেন, ওপরতলার কিছু নেতার সুবিধাবাদী বোঝাপড়ায় সমাধান হবে না। জিন্না লক্ষ্মৌ চুক্তির দোহাই পাড়লেন। এ ধরনের উতোর চাপান কোন সমঝোতার পক্ষে শুভ নয়।

নির্বাচনের পর দেখা গেল ৪৮২টি মুসলিম আসনে মাত্র ৫৮টি লড়ে কংগ্রেস পেয়েছে ২৬টি আর (সবগুলিতে না লড়ে) লীগ পেয়েছে ১০৯টি। পঞ্জাব এবং বাংলার মত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশেও লীগ ভাল ফল করতে পারেনি—পঞ্জাবে পেয়েছিল মাত্র একটি আসন।[১৩৯] ইউ· পি-তে কংগ্রেসের চাপ না থাকায় অনেক কংগ্রেসী মুসলিম লীগ টিকেটে দাঁড়ায়।

সারণী ১
পঞ্জাব

সরকার পক্ষে		বিরোধী পক্ষে	
দল	সদস্য	দল	সদস্য
য়ুনিয়নিস্ট হিন্দু	৯৫	কংগ্রেস	১৮
ইলেকটোরাল বোর্ড	১১	শিরোমণি আকালি	১০
খালসা ন্যাশনাল	১৪	মজলস-ই-অর্হর	২
		ইত্তিহাদ-ই-মিল্লাত	২
		মুসলিম লীগ	১
		কংগ্রেস ন্যাশনালিস্ট	১
		সোশ্যালিস্ট	১
		লেবার	১
		স্বতন্ত্র	১৯
	১২০		৫৫

বাংলার ক্ষেত্রে নির্বাচন পরবর্তী চিত্র ছিল এরকম (দুটি আসন বাদ)[১৪০]

সারণী ২

পার্টি	সংখ্যা
কংগ্রেস	৫৪
হিন্দু ন্যাশানালিস্ট (বর্ণহিন্দু)	৩
হিন্দু সভা (তপসিলী)	২
স্বতন্ত্র হিন্দু	৩৭
মুসলিম লীগ	৩৯
প্রজা পার্টি	৪০
স্বতন্ত্র মুসলিম	৪২
ইউরোপীয়ান	২৫
অ্যাংগ্লো ইণ্ডিয়ান	৪
ইণ্ডিয়ান ক্রিশ্চিয়ান	২
	২৪৮

নির্বাচনের পূর্বে হক ও নাজিমুদ্দিনের মধ্যে নেতৃত্ব নিয়ে বিবাদের ফলে নাজিমুদ্দিন লীগে যোগ দেন। আক্রাম খাঁ-র 'আজাদ' লীগের বড় মুখপাত্র হয়ে দাঁড়ায়। লীগের অর্থভাণ্ডার বড় জমিদার ও কলকাতার অবাঙালী মুসলিম বণিকদের দানে পুষ্ট। নাজিমুদ্দিন ছিলেন একসিকিউটিভ কাউন্সিলর, ফারুকি মন্ত্রী। তাঁদের হাতে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। শহীদ সুরাবর্দি খিলাফত কমিটির অর্থ ব্যবহার করেছিলেন। অন্যদিকে হকের কৃষক

প্রজা পার্টির পক্ষে ছোট জমিদার, তালুকদার, জোতদাররা আর কতটুকু অর্থ ব্যয় করতে পারে ? বলা বাহুল্য, হক খানিকটা কংগ্রেসী ও হিন্দুদের সমর্থন পাবাব আশা করেছিলেন। 'আজাদে'র সুর ক্রমশই সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠছিল। লীগকে ইসলাম ও প্রজা পার্টিকে হিন্দুর সমার্থক বলে প্রচাব করা হচ্ছিল। ফজলুল হক ও প্রজা পার্টির আবেদন ছিল মুখ্যত অর্থনৈতিক · গ্রামে গ্রামে দ্বারে দ্বারে তাদের বাণী পৌঁছে দেবার জন্য ছিল উৎসর্গিত প্রাণ কর্মী। মুসলিম ছাত্র ও যুবক প্রজা পার্টিকে নিজেদের মনে করত। স্বয়ং ছোটলাট নাজিমুদ্দিনকে পটুয়াখালি আসনেব নির্বাচনে সমর্থন করে লীগকে হেয় করেছিলেন। মৈমনসিং, ববিশাল, নোয়াখালি ও চাটগাঁ ছিল প্রজা পার্টির সব থেকে শক্তিশালী ঘাঁটি। ফজলল হকেব উক্তি সব প্রজার কানে মধুবর্ষণ করেছিল, "আল্লার দোয়ায় আমি শীঘ্রই জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ কবব।" পটুযাখালির বণক্ষেত্রে জমিদার-প্রজার বিরোধে শুধু ছোটলাট নয়, নেমেছিলেন ঢাকাব নবাব, ফুবফুবার পীর, শত শত মৌলানা, মৌলভী।[১৪১]

তবু কৃষক প্রজা পার্টিব স্থান হল স্বতন্ত্র মুসলিম ও লীগেব পর। দেখা গেল তাবা গ্রামাঞ্চলে প্রবল কিন্তু শহর ও বিশেষ কেন্দ্রে অস্তিত্বহীন। তাবা কি লীগ কি স্বতন্ত্র মুসলিম (৪২)দেব সাহায্য ছাড়া মুসলিম সবকাব স্থাপন কবতে অপারগ। কৃষক প্রজা পার্টিব একমাত্র আশা যদি কংগ্রেসেব সমর্থন পাওয়া যায। উভয়ে মিলে তাদেব হতে হবে ৯৬টি সদস্য। স্বতন্ত্রদেব ৩০ জনকে দলে আনতে পাবলে তারাই মন্ত্রিসভা গডতে পারবে।

কংগ্রেস ছিল সংখ্যাগবিষ্ঠ দল এবং আইনত তাবাই সরকার গঠনের দাবিদাব। নিজেবা না দাযিত্ব নিলেও তাবা বাইবে থেকে হককে সমর্থন জানাতে পারত। কিন্তু বাংলাব দুর্ভাগ্য, তা হল না। বিবোধ বাধল বাজনৈতিক বন্দীমুক্তি নিযে। হুমায়ুন কবিব এ ব্যাপারে কংগ্রেসেব দ্বিধাকে দায়ী কবেছেন।[১৪২] গভর্নবেব 'বিশেষ দাযিত্ব' নিযে তখন কংগ্রেসেব সঙ্গে বডলাটেব বিতর্ক চলেছে। কোথাও তাবা সবকাব গঠনেব সিদ্ধান্ত নেয়নি। বাংলায আলাদা নীতি অবলম্বন কবতে দ্বিধা হওয়া অস্বাভাবিক নয। কিন্তু তারা তো বাইবে থেকে হক মন্ত্রিসভাকে সমর্থন জানাতে পারত ? বাংলায় লীগের পথে কাঁটা দিতে হলে, মুসলিম ঐক্য ভাঙতে হলে—অর্থাৎ হিন্দুদেব স্বার্থ বাখতে হলে, এছাড়া কোন পথ ছিল কি ?

আবুল মনসুব আহমদ আলোচনায উপস্থিত ছিলেন এবং কৃষক প্রজা স্বার্থকে অগ্রাধিকাব দেবাব প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তাঁব মতে বন্দীমুক্তিব ওপব জোব দিলে গভর্নব মন্ত্রিসভা ববখাস্ত কবতে পাবেন, তখন প্রজা পার্টির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি কোথায় যাবে ? এক দিক থেকে দেখলে কৃষক প্রজাব উন্নতিসাধনকে অগ্রাধিকার দান কংগ্রেস ও বাঙালী হিন্দুর পক্ষে কৌশল তো ছিলই, কর্তব্যও ছিল। এটা করলে তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের থেকে চিববিচ্ছিন্ন হয়ে যেতেন না। আর রাজনৈতিক বন্দীমুক্তিব কিঞ্চিৎ বিলম্ব হলেও দেশপ্রেমিক বন্দীবা যুক্তিটা মেনে নিতেন।

কিন্তু কবির, আহ্‌মদ, শীলা সেন—কারুর মন্তব্য সহজে মানা যায় না। প্রথমত বিরোধটা কি মুখ্যত বন্দীমুক্তি নিয়ে হয়েছিল, না নলিনী সরকারকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত কবতে গিযে ? সবকার তখন কংগ্রেস ছেড়ে হকের তহবিলদার হয়েছেন। কবিব বলেছেন, হকের পক্ষে সবকার ও মশাবফ হোসেনকে ত্যাগ করা অসম্ভব ছিল। যখন কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনা বিফল হল তখন সরকাবই লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টিকে নিজেব বাড়িতে ডেকে আলোচনা ও আপোসেব সুযোগ করে দিয়েছেন। তার চেয়েও বড়ো কথা, যে আবুল মনসুব আহ্‌মদ কৃষক প্রজাব সুবিধাকে এত অগ্রাধিকার দিতে চেয়েছিলেন, তিনি কোন নীতিতে লীগের মত প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ত-বণিক-সাম্প্রদায়িক দলের সঙ্গে আঁতাতে রাজি হন ?

ভারতীয় রাজনীতির আসল চবিত্র সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে ফুটে উঠেছে—মুখে বড়ো বড়ো নীতি, কর্মসূচি, কৃষক শ্রমিকেব দুঃখে অশ্রুজল বিসর্জন. আর ভেতরে মন্ত্রিপদ প্রাপ্তির নির্জলা অশোভন আকাঙ্ক্ষা। মুসলিম লীগেব তিনজন মন্ত্রী—নবাব হবিবুল্লা, নাজিমুদ্দিন (তিনিও ঢাকার নবাববংশীয়) ও সুবাবর্দি (কলকাতার বণিককুলের সঙ্গে যুক্ত)-কে নিয়ে, হিন্দুদের নলিনী সবকার, বিজযপ্রসাদ সিংহরায, শ্রীশচন্দ্র নন্দীকে নিয়ে, প্রজাদের কি স্বার্থ রাখবেন হক? সামসুদ্দিনের বদলে মশারফ হোসেনকে নিয়ে? মহম্মদ ওয়ালিয়ুল্লা 'যুগবিচিত্রা' গ্রন্থে লিখেছেন, শেষ মুহূর্তে কি হীন উপায়ে মশাবফকে ঢোকান হল। তিনি কৃষক প্রজা দলেব নীতিপত্রে স্বাক্ষব করেও মুসলিম লীগ কাউন্সিলে থেকে গেলেন। হক মন্ত্রিসভার এগাব জন সভ্যেব নয় জন ছিলেন জমিদার শ্রেণীর এবং ছয়জন বিশেষ আসনে নির্বাচিত, একথা ভুলে শুধু কংগ্রেসকে দোষ দিলে চলবে না। কেবল সাম্প্রদায়িক আপত্তিতে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে নেওযা হযনি এ কথাও ভোলার নয়। বাঙালী হিন্দু যদি আপন সর্বনাশ ডেকে এনে থাকে. হকও খাল কেটে লীগের কুমীবকে ডেকে এনেছিলেন। সেই স্বখাত সলিলে তিনি, কৃষক প্রজা পার্টি, সাম্প্রদাযিক সম্প্রীতি, দেশেব সংহতি সবই একদিন ডুবল।

বাংলায কংগ্রেসী নীতিব সমালোচক যদি হন কবির, তবে ইউ.পি-তে কংগ্রেসী নীতির সমালোচক হলেন আবুল কালাম আজাদ[১৪৩] ও চৌধুরী খলিকুজ্জমান।[১৪৩ক] আজাদের মতে লীগেব সঙ্গে ইউ.পি. মন্ত্রিসভায দুজন মন্ত্রী নেবাব সূত্রে বোঝাপডা হযে গিযেছিল, নেহরুর আকস্মিক আপত্তিতে তা কমিযে একজন কবা হয ও ফলে আলোচনা ভেঙে যায়। খলিকুজ্জমান অভিযোগ কবছেন, কংগ্রেস চেযেছিল লীগের অবলুপ্তি। গান্ধীব ব্যক্তিগত সচিব পেযাবেলাল একে "a tactical error of the first magnitude" আখ্যা দিযেছেন, এমনকি গান্ধীব মতেব বিরুদ্ধে নেওয়া হয তাও বলেছেন।[১৪৩খ] পেণ্ডেবেল মুন সুবগ্রাম আরও চড়িয়ে বলেছেন, লীগেব দুজন মন্ত্রী নিতে নেহরুব আপত্তি হল fons et origo malorum—অশুভেব উৎসমুখ. আর তার থেকেই ভারত ভাগেব জন্ম। আমরা দেখাব আসল ঘটনাটা কি এবং এত তুচ্ছ কাবণ থেকে দেশ ভাগ হযনি। ক্ষমতা হস্তান্তব সম্পর্কিত ব্রিটিশ সবকারেব দলিল সংগ্রহেব অন্যতম সম্পাদক (মুনেব সহকর্মী) নিকোলাস ম্যানসার্গও মুনেব সিদ্ধান্তে আপত্তি জানিয়েছেন।[১৪৪]

ঘটনাটা এইরূপ। কিছুটা ভূমিসংস্কারের ভয়ে, কিছুটা ইউ.পি.আমলাদেব মদতে অনুগত জমিদাব ও তালুকদারবা ন্যাশানাল অ্যাগ্রিকালচাবিস্ট পার্টি গডেছিলেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে, ছোটলাট হেইগের মতে, ব্যক্তিগত বেষারেষিব অন্ত ছিল না। একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল নির্বাচনে জযলাভ।[১৪৫] নেহরু রাজেন্দ্র প্রসাদকে (২১ জুলাই ১৯৩৭) লিখছেন, কংগ্রেসের দিক থেকে জাতীযতাবাদী মুসলিমদের ওপর কোন চাপ দেওযা হয়নি। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস মাত্র নয়টি মুসলিম আসনে প্রার্থী দেয। "We allowed matters to drift, although, we began to regret not having run more Congress Muslim candidates." মাত্র দুটি কেন্দ্রে কংগ্রেস লীগ প্রার্থীদের বিরোধিতা করে। অন্য আসনে কংগ্রেস "usually supported the League candidate if he was not an obvious reactionary, as sometimes he was." উভয়ের লক্ষ্য ছিল এক—সরকার সমর্থিত এগ্রিকালচাবিস্ট পার্টিকে হারানো। জেড এ আহমদের মতে এটা কংগ্রেসের ভুল হযেছিল। উচিত ছিল এই সুযোগে মুসলিম জনগণকে কংগ্রেসে সামিল করা। ছত্তাবির নবাব ও নবাব স্যার মহম্মদ ইউসুফ লীগেব নৌকায় পা রেখে চলতেন।

মাহমুদাবাদের রাজা জিন্নার বহুদিনের বন্ধু। সালেমপুরের বাজা লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ডের সদস্য। এমনকি কিছু কিছু জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতা মুসলিম কেন্দ্রে কংগ্রেসের টিকেট কোনো কাজ দেবে না বুঝে লীগ-ভজনা শুরু করেছিলেন। তাঁদেব মধ্যে সবচেযে বিখ্যাত হলেন চৌধুরী খলিকুজ্জমান। তবু লীগের পক্ষে নির্বাচনের ফল ভাল হল না। হেইগ লিখছেন—লীগের মত একটা "ramshackle coalition"-এর ভাগ্যে আর কি জুটবে ? লীগ গ্রামাঞ্চলে ২৭টি ও শহরাঞ্চলে ১২টি আসনে প্রার্থী দেয়। কংগ্রেস শহবাঞ্চলের কোন মুসলিম আসনে প্রার্থী দেযনি। পিটার রীভ্‌সের মতে এটা কংগ্রেস-লীগ বোঝাপড়ার প্রমাণ।[১৪৬] গোপালও একটা "informal, unspoken understanding" কথা তুলেছেন। তাঁব মতে ইউ.পি-তে কংগ্রেস ও লীগ হাত ধরাধরি করে ব্রিটিশ সরকার ও তার খয়েব খাঁর দলকে হারাতে চেষ্টা করে ; লীগেব কোন সাম্প্রদায়িক ভূমিকা ছিল না। এই প্রদেশে হিন্দু-মুসলিম যতই ভাল হোক (?) এতটা মানতে আমি বাজি নই। তার প্রমাণ একটু পরেই পাওয়া যাবে।

যাই হোক, উভয়েব চেষ্টায় এবং অন্তর্দ্বন্দ্বেব ফলে অ্যাগ্রিকালচারিস্ট পার্টি প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

সারণী ৩

দল	সাধারণ আসন	মুসলিম সংরক্ষিত আসন	বিশেষ আসন	মোট
কংগ্রেস	১২৬	১	৮	১৩৫
লীগ	—	২৯	১	৩০
মুসলিম স্বতন্ত্র	—	—	—	২৪
হিন্দু স্বতন্ত্র	—	—	—	১৪
ন্যাশনাল অ্যাগ্রিকালচাবিস্ট				
পার্টি অব আগ্রা	—	—	—	১৩
পার্টি অব অযোধ্যা	—	—	—	১২

ইউ.পি-তে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ। তার কারুর সঙ্গে জোট বাঁধার প্রযোজন ছিল না। নেহরু, প্রসাদ ও প্যাটেল বোম্বাই ও ইউ পি-তে লীগেব সাথে কোয়ালিশনের বিরোধী ছিলেন। পন্থকে নেহরু (৩০ মার্চ ১৯৩৭) লেখেন, আজাদও বিবোধী। অন্যদিকে লীগ যদি কংগ্রেসেব সঙ্গে গাঁটছড়া না বাঁধে ইউ.পি-তে তার তাৎক্ষণিক শক্তিবৃদ্ধিব কোন সম্ভাবনা তো হবেই না, সর্বভারতীয় রাজনীতিতে স্থান হওয়া মুশকিল। মনে রাখতে হবে—বাংলায় তারা কৃষক প্রজা পার্টির সঙ্গে এই উদ্দেশ্যে গাঁটছড়া বাঁধছিল। ইউ পি-র দৃষ্টান্ত যদি অন্যান্য মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশে অনুসৃত হয তবে জিন্নাব মত কে লাভবান হবেন ? মোট কথা, জিন্না চাইলেন. কোয়ালিশন, নেহরু—নয়। বোম্বাইতে একই চেষ্টা হয়। সেখানে প্যাটেল আপত্তি করেন ; গান্ধীও গা করেননি।[১৪৬ক]

নির্বাচনের ফলাফল দেখে নেহরুর মনে হয়েছিল কংগ্রেসের আশু কর্তব্য মুসলিমদের সঙ্গে নিবিড়তর গণসংযোগ। তা না করলে নতুন প্রজন্ম ও মুসলিম কৃষক শ্রমিকরা সাম্প্রদায়িকতার শিকার হবে। তাঁর ধারণা হয়েছিল মুসলিম জনসাধারণ কংগ্রেসের কাছে

এমন আহ্বান প্রত্যাশা কবছে।[১৪৭] এ বিষয়ে প্রাদেশিক কমিটিগুলির কাছে নানা সুপারিশ পাঠাচ্ছিলেন তিনি। গান্ধীর নাকি আপত্তি ছিল,[১৪৭ক] কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটি সায় দেয়। জিন্নাব প্রতিক্রিয়া বিরূপ হতে বাধ্য। তিনি নেহরুকে 'পিটার প্যান' বলে ব্যঙ্গ করলেন। নেহরুর উত্তর—"কংগ্রেসে এমন অনেক মুসলমান আছেন যাঁরা হাজার জিন্নাকে প্রেরণা দিতে পারেন।"

এই পশ্চাৎপটে ইউ.পি-তে মোর্চা গড়ার কথা উঠল। কংগ্রেস প্রথমে কোন প্রদেশেই সরকাব গড়েনি সেকথা আগেই বলেছি। অর্ন্তবর্তী সরকার গড়ে খয়ের খাঁর দল। কিন্তু ভবিষ্যতের প্রস্তুতি হিসাবে গোবিন্দবল্লভ পন্থ খলিকুজ্জমানের মত পুরোনো কংগ্রেসীদের ফিরিযে আনতে চাইলেন। হযতো তাঁদের মধ্যে কোন চুক্তির কথাও উঠেছিল।[১৪৮] নেহরু আঁচ পেযেই পন্থকে সাবধান কবেছেন[১৪৯] এবং ইউ.পি-র ভারপ্রাপ্ত আজাদও নেহরুকে সমর্থন কবেন। কিন্তু জিন্না চেয়েছিলেন যুক্ত ফ্রন্ট, কংগ্রেসের মধ্যে লীগের আত্মবিসর্জন (merger) নয। লখনউ এসেই তিনি লীগকে পৃথক অস্তিত্ব বজায় বাখতে পবামর্শ দেন। জুনে খলিকুজ্জমান ও নবাব ইসমাইল খাঁ যুক্ত মন্ত্রিসভার কথা আবার তোলেন। প্রথম জন তো আজাদকে বলেই ফেললেন, তাঁদেব দুজনকে মন্ত্রী কবলেই চলবে।[১৫০] খলিকুজ্জমান অবশ্য লিখেছেন, তিনি শুধু বলেছিলেন নবাবকে বাদ দিযে আর কাউকে নেওযা চলবে না।[১৫১] আজাদ অতঃপব এক শর্তে দুজনকে নিতে চাইলেন—সংযুক্ত প্রদেশে লীগের আলাদা অস্তিত্ব রাখা চলবে না ও কংগ্রেসেব কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। খলিকুজ্জমান লীগ পার্লামেণ্টারী বোর্ড তুলে দিতে ও উপনির্বাচনে লীগ প্রার্থী প্রত্যাহাব করতে রাজি হননি, যদিও দ্বিতীয ব্যাপাবে তিনি লীগ এক্‌সিকিউটিভ কাউন্সিল ডাকতে রাজি হন। কংগ্রেস তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কবলে আলোচনা ভেঙে যায়। আজাদ অভিযোগ কবেছেন পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডনেব প্রবোচনায নেহরু হঠাৎ ঝাঁপিযে পড়ে প্রতিবন্ধকতা কবেন। একটিব বেশি মন্ত্রী নিতে তিনি বাজি হননি। আজাদ তখন ওযার্ধায় গান্ধীব কাছে আবেদন জানান, কিন্তু জওহবলালেব বক্তব্য শুনে গান্ধী তাঁব দিকে ঝোঁকেন।

কিন্তু তখন বা পবে নেহরুব সঙ্গে মতপার্থক্যেব কথা আজাদ কাউকে জানাননি। শুধু India Wins Freedom-এ আফসোস কবেছেন, নেহরুব অনমনীয (এবং অপ্রত্যাশিত) আপত্তির জন্য কংগ্রেস-লীগ মিলনের সম্ভাবনা ব্যর্থ হয। ঐতিহাসিকের উচিত আজাদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াকে গুরুত্ব দেওয়া, অনেক পরে লেখা স্মৃতিকথাকে নয। দ্বিতীযত, আজাদ উভয দলের merger বা মিশ্রণেব আশা করেছিলেন কেন? কোন ভিত্তিব উপর দাঁড়িয়ে তিনি বলেন—অনেকেই লীগ ছেড়ে চলে আসতে চাইছিল, শুধু নেহরুর ভুল নীতির জন্য ফিবে গেল জিন্নাব পক্ষপুটে? লীগ পার্লামেণ্টারী বোর্ডের দুই সদস্য—মাহমুদাবাদেব রাজা ও শৌকত আলিব আপত্তি ছিল। ইউ. পি-র ছোটলাট (হেইগ) ২৩ এপ্রিল, ১৯৩৭-এর রিপোর্টে লিখছেন, "খলিকুজ্জমান ১০ জন মুসলিম এম· এল· এ-কেও কংগ্রেসে আনতে পারবেন না।" বল্লভভাই প্যাটেল, আলোচনা ভেঙে যাবার পর, নেহরুকে ৩০ জুলাই লিখছেন, "It is perhaps too premature to expect any such settlement at present." তৃতীযত, এমন সুবিধাবাদী (এবং অসম) বিবাহ দুজন লীগ মন্ত্রী নিলেই কি টিকত? মনে বাখতে হবে, জিন্না বোম্বাই সরকারেও লীগ প্রতিনিধি ঢোকাতে চাইছিলেন। সেটা মেনে নিলে একই দাবি উঠত অন্যান্য কংগ্রেসী সরকারের ক্ষেত্রে। এরা সব হতেন জিন্নাব 'ট্রোজান ঘোড়া'। কংগ্রেসী আদর্শ, নীতি, কৌশল কোনটার প্রতি তাঁদেব আনুগত্য থাকত না। মুন্সীব ভাষায, তাঁবা থাকতেন, "at the disposal of

Jinnah to obstruct, defy, sabotage and blackmail the Congress." এসব ভয় বাস্তব ছিল বলেই বি জি খেবের মাধ্যমে গান্ধীকে পাঠানো জিন্নাব ইঙ্গিত গান্ধী বিশেষ আমল দেননি। হিন্দু ও মুসলমানের ভেদ দুস্তর নয়, কিন্তু গণভিত্তিক ও ধর্মনিরপেক্ষ কংগ্রেসের সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক এবং ক্রমশ মৌলবাদী লীগের বিভেদ দুস্তব। আলোচনা চলার সময় যে উপনির্বাচন হযেছিল, জিন্না সেখানে লীগ প্রার্থী দাঁড করিযেছিলেন। তা হয়তো অন্যায় নয়। কিন্তু আল্লা, কোরান ও বিপন্ন ইসলামেব জিগির, মোল্লা ও টাকার ছড়াছড়ির কথাও কি ভুলতে হবে ?

লীগের দুর্দিন চলছে তখন। পঞ্জাবের আইন সভায় একটি মাত্র লীগ সদস্য ; বাংলায় হক মন্ত্রিসভায তাবা স্থান কবেছে কিন্তু আধিপত্য স্থাপন কবতে পারেনি ; সিন্ধু ও সীমান্তে একটিও লীগপন্থী জেতেনি। জিন্না তবু নিবস্ত হলেন না। আযেষা জালাল তাঁর সম্বন্ধে ঠিকই বলেছেন, "But Jinnah was a fighter and he was the master of a long slow game, an expert at seeing chances in the worst reverses."[১৫২] তিনি দুটো জিনিস বুঝলেন · (১) মুসলিম মৌলবাদ সম্বন্ধে অনীহা ত্যাগ কবে তাকে কাজে লাগাতে হবে, (২) কেন্দ্রে আপন প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা কবতে গেলে প্রতিস্পর্ধী মুসলিম প্রদেশগুলিব ক্ষমতা খর্ব কবতে হবে। এক দিকে তাঁর চেষ্টা হয় ফজলল হককে সবিয়ে লীগেব নাজিমুদ্দিনকে বাংলায প্রধানমন্ত্রী করা ও পঞ্জাবেব সিকান্দাব হাযাত খাঁকে অপসাবিত কবা বা স্বপক্ষে আনা। হক তখন কৃষক প্রজা দলের বিবোধী গোষ্ঠী (সামসুদ্দিন আহ্মদ ও কুডি জন এম এল এ) ও কংগ্রেসীদেব যুগপৎ আক্রমণে বিপর্যস্ত। প্রধানমন্ত্রিত্ব বাখতে তিনি লীগেব লখনউ অধিবেশনে সদলবলে যোগ দিলেন। সিকান্দার ও জিন্নাব একটা কাজ-চলা গোছেব বোঝাপডা হল, তবে সিকান্দাব যুনিয়ানিস্ট দল ও নিজেব কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ বাখলেন। অন্যদিকে কংগ্রেসী প্রদেশে কংগ্রেস পতাকা উত্তোলন, বন্দেমাতরম্ গান, মসজিদেব সামনে বাদ্য প্রভৃতি সামান্য (এবং পুবনো) অভিযোগকে ফুলিয়ে ফাঁপিযে তুলে তিনি প্রচাব কবতে লাগলেন গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেস কমিটি হিন্দু নেতাদেব সহযোগিতায হিন্দুবাজ কাযেম কবছে। কংগ্রেসী মুসলিম ও স্বতন্ত্র মুসলিমদেব মন্ত্রিসভায নেওযা হল। কিন্তু জিন্না বললেন, এবা উচ্চাকাঙ্ক্ষী, নীতিহীন, কংগ্রেসেব হাতেব পুতুল।

১৯৩৭ সালেব প্রথমে সংখ্যালঘু মুসলিম প্রদেশেব সমর্থন বর্জন কবাব সময হয়নি। পঞ্জাবে লীগেব কোন আলাদা সংগঠন গডতে দেননি সিকান্দার। ইকবালেব ভাষায়, সিকান্দাব-জিন্না লখনউ চুক্তিব অপব নাম "handing over the League to Sir Sikander and his friends." বাংলায হকেব আনুগত্য তিনি কিনেছিলেন নাজিমুদ্দিনেব উচ্চাশাকে খর্ব কবে। হকেব দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছিল। নাজিমুদ্দিন সহজেই ইউবোপীযানদেব সহায়তায প্রধানমন্ত্রী হতেন। কিন্তু জিন্না বোঝেন—"অল হজলু মিনা শযতান"। সবুবে মেওযা ফলবে। তাঁর প্রয়োজন ছিল কেন্দ্রেব রাজনীতিতে সিকান্দার ও হকেব সমর্থন। তিনি ঝানু আইনজ্ঞ। বুঝতে পেবেছিলেন, নতুন শাসনতন্ত্রে কেন্দ্রই হবে গুরুত্বপূর্ণ, সেখানেই তাঁকে সর্বভাবতীয মুসলিমদের অবিসংবাদী নেতা হতে হবে।

এমন সময নেহরুব নির্বন্ধাতিশয্যে কংগ্রেস মুসলিমদের মধ্যে গণসংযোগের ডাক দিল।[১৫৩] জিন্না ঠিক করলেন এর উত্তবে সাম্প্রদায়িকতার কুকুর লেলিয়ে দেবেন। আগেই ইউ·পি-ব উপনির্বাচনে 'বিপন্ন ইসলাম'-এর জিগির তোলা হয়েছিল ; কংগ্রেস পতাকা ও বন্দেমাতবমেব বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কিছু পরে। এখন বিদ্যামন্দির, নঈতালিম—সবই মুসলিম সংস্কৃতি দলনেব প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপিত হতে লাগল। কংগ্রেসী মন্ত্রীরা হিন্দুদের বেশি

চাকুরি দিচ্ছেন, নানা রকমের নেকনজর দেখাচ্ছেন, মুসলমানদের লোক্যাল বোর্ড, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে বাধা দিচ্ছেন—এ অভিযোগ তো ছিলই। সংযুক্ত প্রদেশের লাট হেইগ ৭ জুনের রিপোর্টে বলছেন, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ অনেক বেড়ে গেছে। ১৯৩৭-এর এপ্রিল ও জুনের মধ্যে বোম্বাই, মাদ্রাজ ও পঞ্জাবে দাঙ্গা তার প্রমাণ। ১৯৩৮-এর ফেব্রুয়ারিতে লীগের যে নতুন শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হল তাতে লীগ কাউন্সিলে পঞ্জাবকে ৫০টি আসনের জায়গায় দিতে হল ৯০টি, বাংলায় ৬০টির জায়গায় ১০০টি। অবশ্য একই সঙ্গে সংখ্যালঘু ইউ. পি-তে ৫০টি সত্ত্বেও জায়গায় ৭০টির ও আসামে ১২টির জায়গায় ২৫টির ব্যবস্থা করে পাল্লা খানিকটা সমান রাখলেন তিনি। তা ছাড়া নতুন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন এল সম্পূর্ণ তাঁর কব্জায়। সভাপতিরূপে কাউন্সিল থেকে যে কোন ২১ জনকে তিনি বেছে নিতে পারবেন। ওয়ার্কিং কমিটিকে প্রভূত ক্ষমতা দেওয়া হল। বেশ বোঝা যায় ১৯৩৪-এর কংগ্রেসের নয়া শাসনতন্ত্র তাঁর আদর্শ, যদিও সভাপতির ক্ষমতা তিনি চালাবেন হিটলারী প্রথায়।

একটা নতুন কথা শোনা গেল ইকবালের মুখে। তিনি জিন্নাকে উপদেশ দিলেন, মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশের কথা ভুলে যান। "Why should not the Muslims of North-West India and Bengal be considered as nations entitled to self determination just as other nations in India are?" এতে ভারতের সব জায়গার মুসলমানদেরই সুবিধা হবে।[১৫৪] পাকিস্তান বিষবৃক্ষের বীজ রোপিত হল। ফল ফলতে দের বাকী।

কলকাতায় আহূত লীগ অধিবেশনে (১৭-১৮ এপ্রিল ১৯৩৮) সভাপতি জিন্না বললেন, "We cannot surrender, submerge or submit to the dictates or the ukase of the High Command of the Congress, which is developing into a totalitarian and authoritative causes (sic) functioning under the name of the Working Committee, and aspiring to the position of a shadow cabinet in a future republic."[১৫৫] তারা কিনা সিন্ধুর রাজনীতিতেও নাক গলাচ্ছে! ১৯৩৮-এর মার্চে সিন্ধুর প্রধানমন্ত্রী গুলাম হুসেন পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং কংগ্রেসের সমর্থন পেয়ে আল্লা বক্স মন্ত্রিসভা গঠন করেছিলেন। তলে তলে জিন্নার লোক—আবদুল্লা হারুন—লীগ মন্ত্রিসভা আনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জিন্না-বকস বোঝাপড়া হবার আগেই কিনা কংগ্রেস বক্সকে ভাঙিয়ে নিল! ক্রুদ্ধ জিন্না পিরপুরের নবাবের নেতৃত্বে কংগ্রেসী দুঃশাসনের ওপর এক অনুসন্ধানী কমিটি বসিয়ে দিলেন।

জিন্নার দাপাদাপিতে কংগ্রেস একটু থমকে গেল।[১৫৬] এ যেন এক নতুন জিন্না—আর সেই পুরনো জাতীয়তাবাদী, মৌলবাদবিরোধী, আধুনিক মনোভাবাপন্ন মিঃ জিন্না নন; তিনি হয়েছেন জনাব জিন্না এবং কোয়েদ-ই-আজম হতে চলেছেন। ভারতের চেয়ে মুসলিম কৌম তাঁর চোখে বড়। গান্ধী তাঁর লখনউ ভাষণ পড়ে লিখলেন, "এ তো যুদ্ধ ঘোষণা।" জিন্না উত্তর দিলেন, "না, আত্মরক্ষা।" গান্ধী লিখলেন, "I miss the old nationalist." জিন্নার উত্তর, "I would not like to say what people spoke of you in 1915 and what they speak of and think of you to-day."

এই পরিপ্রেক্ষিতে বোম্বাইতে গান্ধী-জিন্না সাক্ষাৎকার হল। গান্ধীর সঙ্গে নতুন সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসুও যোগ দেন। কংগ্রেস-লীগ যুক্ত মন্ত্রিসভা নিয়ে আলোচনা ভেঙে গেল জিন্নার জেদে। জিন্না বললেন, মুসলিম লীগকে ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্ব

মূলক এবং অধিকারবান (authoritative) প্রতিষ্ঠান বলে মেনে নিতে হবে, যেমন কিনা "You (অর্থাৎ গান্ধী) represent the Congress and other Hindus throughout the country. Only on that basis we can proceed further."[১৫৭] কংগ্রেস এই অদ্ভুত দাবি মানতে পারে না। লীগ ভারতের সব প্রদেশেব সব মুসলমানেব একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান নয় তা তো নির্বাচন প্রমাণ করে দিয়েছে। আর কংগ্রেসেব প্রতি যে বহু মুসলমানেব আনুগত্য বিদ্যমান তাও প্রতিষ্ঠিত। অ্যালেন হেস মেবিযাম জানাচ্ছেন, এপ্রিলে জিন্না দাবি কবলেন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে কোন মুসলমান নেওযা চলবে না। বসু অবশ্যই এই দাবি নাকচ করে দেন।[১৫৮] জিন্না-নেহৰুব এ সমযকাব পত্রালাপে জিন্নাব রূঢ়তা আবও স্পষ্ট। নেহরু (৬ এপ্রিল ১৯৩৮) লিখছেন, "অবশ্যই লীগ গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রদাযিক সংগঠন এবং আমরা সে ভাবেই তাকে দেখি। তবে আমাদের তো সব সংগঠন ও ব্যক্তির কথা ভাবতে হয়···আর গুরুত্ব তো বাইবে থেকে আসে না, আসে অন্তর্নিহিত শক্তি থেকে।" জিন্না (১০ এপ্রিল ১৯৩৮) উত্তব দিচ্ছেন, "আপনাব সুব ও ভাষা এতই উদ্ধত ও সংগ্রামী মনোভাব প্রকাশ কবছে, যেন কংগ্রেসই সার্বভৌম শক্তি··· Unless the Congress recognizes the Muslim League on a footing of complete equality....we shall have to depend upon our *'inherent strength'* which will determine the measure of importance or distinction it possesses." (ইটালিক্স আমাব)[১৫৯]

জিন্না জানতেন এ দাবি কংগ্রেস মানতে পাবে না। তাই তিনি অস্থায়ী বড়লাট ব্রেবোর্নেব দিকে হাত বাড়ালেন। ব্রেবোর্ন ভাবতসচিবকে লিখছেন, জিন্না চান, "কেন্দ্রে ক্ষমতা এখন যেমন বয়েছে (অর্থাৎ ব্রিটিশেব হাতে) তাই থাক, ব্রিটিশবা যদি কংগ্রেসী প্রদেশে মুসলিম স্বার্থবক্ষা কবে তবে মুসলিমবাও কেন্দ্রে ব্রিটিশ স্বার্থরক্ষা করবে"।[১৬০]

মনে বাখতে হবে সময়টা ১৯৩৮। ইউবোপ একটাব পর একটা সংকটে টালমাটাল। আসন্ন যুদ্ধেব দামামা বেজে উঠেছে চেক, পোল ফ্রন্টে। ইংল্যাণ্ড আপন অস্তিত্ব সুরক্ষিত করতে নিযেছে নির্লজ্জ তোষণনীতি। ভাবতবর্ষে তার মিত্রেব দবকার ছিল। জিন্নার বাড়ানো হাত ব্রেবোর্ন, লিনলিথগোবা প্রত্যাখ্যান কবতে পাবেন না। আর এক দিক থেকে আশাব আলো দেখা দিল। কংগ্রেস সভাপতি বসু স্বযং বিদ্রোহ ঘোষণা কবলেন দক্ষিণপন্থী, পবে গান্ধীব, নেতৃত্বেব বিরুদ্ধে।

প্রথমেই বলা দরকাব সুভাষ-গান্ধী বিবোধ ব্যক্তিগত কাবণে ঘটেছিল বললে শুধু ইতিহাসের অতিসবলীকবণ করা হবে না, উভযের প্রতি অন্যায়ও করা হবে। অহঙ্কাব, মাৎসর্য্য, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ক্ষমতালিপ্সা আদর্শের মুখোস পরে দেখা দেয় না তা নয়, কিন্তু সব সময়ই দেখা দেয় এ বকম সিদ্ধান্ত অনৈতিহাসিক। জীবন এর চেয়ে ঢের বেশি জটিল। আধুনিক মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণ ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষের একটা ব্যাখ্যা দিতে পারে কিন্তু তা সত্যের একটা অসম্পূর্ণ দিক। কোন এরিকসন গান্ধীর বা জর্জ কেনান স্তালিনের আদর্শ বা কার্যকলাপের পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ কবতে পারবেন না।

সন্দেহ নেই, স্তালিন বাল্যে নিঃসঙ্গ ছিলেন, শুধু পিতৃস্নেহে বঞ্চিত নয়, নির্যাতিত। সুপণ্ডিত, বহু ভাষাবিদ, পাশ্চাত্য সংস্কৃতিরসে জারিতমন ট্রটস্কি বা রাডেক বা বুখারিন-কামেনেভের সামনে তিনি হীনমন্যতায় ভুগবেন এতে আশ্চর্য কি! জার্মান, অস্ট্রিয়ান, পোলিশ, হাঙ্গেরীয়ান সমাজতন্ত্রী চিন্তার শরিক ছিলেন না বলে রাশিয়ার বাইরের

সাম্যবাদী আন্দোলন সম্বন্ধে সন্দেহ তাঁব কোনদিন যাযনি। নিরাপত্তা বোধ ছিল না, তিনি তাই একদা নিষ্ঠুর অত্যাচাবী শাসকে পরিণত হবেন তাও মেনে নেওয়া যায। কিন্তু রুশ বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিত বাদ দিলে তাঁকে কি সত্যি বোঝা যাবে? ট্রটস্কির সঙ্গে একদিন ক্ষমতার লড়াই বাধবে বলেই কি তিনি ১৯২৪ সালে October and Trotsky's theory of permanent revolution লিখেছিলেন? তা নয়, আসলে গৃহযুদ্ধেব পব থেকেই নয়া অর্থনীতি, কুলাকশ্রেণীব আবির্ভাব, সর্বহাবা ও দরিদ্র চাষীদেব ডিক্টেটরশিপেব বদলে আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রেব উদ্ভব, ট্রেড য়ুনিয়ানেব কর্ম পরিধি, পার্টির অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র, বিচিত্র জাতি ও সংস্কৃতিব স্বাধীনতার অধিকার, বিশ্ববিপ্লব সংঘটনেব দায়িত্ব নিয়ে লেনিনেব মনে চিন্তা জেগেছিল। পরবর্তীকালে সমাধান নিয়ে বিতর্ক, বিতর্কের অনুষঙ্গরূপে ও পৃথক মেজাজেব জন্য ব্যক্তিগত সংঘর্ষ এবং শেষে স্তালিনের জযের সঙ্গে ব্যক্তিপূজা দেখা দেয়। অর্থাৎ বাস্তব সমস্যা, মত ও পথেব পার্থক্য বাদ দিযে শুধু ব্যক্তির মনস্তত্ত্ব নিয়ে ব্যাখ্যা চলে না। ব্যক্তিত্ব ও ঐতিহাসিক পবিবেশের সম্বন্ধ জটিল। আজও তার জটিলতা মাপা গেল না।

এ ছাড়াও রয়েছে ঐতিহ্যেব প্রভাব। মেনশেভিক-বলশেভিকদেব কথা ধবা যাক। উভয়ে মার্ক্সীয় চিন্তাধারায় মানুষ। কিন্তু বলশেভিকরা বেছে নিয়েছিল মার্ক্সেব বৈপ্লবিক স্বতঃস্ফূর্ত কর্মপ্রেরণাব (voluntarist) দিকটা। আব মেনশেভিকবা তাঁর বিবর্তনবাদী, নিয়ন্ত্রিত (determinst) কর্মপ্রেরণাব দিকটা। বলশেভিকরা জোব দেয় সচেতন সংখ্যালঘু নেতৃত্বেব ওপর। তাবাই জনগণকে বৈপ্লবিক কর্মে উদ্দীপিত ও প্রণোদিত কববে। মেনশেভিকরা অপেক্ষা করছিল কখন পরিবর্তনেব গোপন শক্তি পেকে উঠবে, জনসাধারণের মধ্যে বৈপ্লবিক চেতনা সঞ্চার করবে। মেনশেভিকদের ধারণা পশ্চিমী ঐতিহ্যঘেঁষা, বলশেভিকদের রুশ ঐতিহ্যঘেঁষা। ১৯২১-এ নেতারা যে সব সমস্যায বিব্রত হয়েছিলেন তা উনিশ শতকে পশ্চিমপন্থী ও স্লাভোফিলদেরও বিব্রত কবেছিল। রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের জয় কি পশ্চিমী পথে সাধিত হবে, না রুশ ইতিহাস দেবে কোন আলাদা পথেব ইঙ্গিত? যদি প্রথমটা ঠিক হয় তবে শিল্পায়ন ও শ্রমিকদের ভূমিকা পাবে অগ্রাধিকাব। যদি দ্বিতীয়টা ঠিক হয় তবে কৃষকদেব তুষ্ট করে কৃষি উৎপাদন বাড়াতে হবে এবং তাদের চাহিদা বাড়লে শিল্পয়ানও সম্ভব হবে। দুই বিকল্পের কোন একটিকে বেছে নেওয়া লেনিনের পক্ষেও সম্ভব হয়নি। নয়া অর্থনীতি এ দুয়ের একটা সাময়িক সমন্বয়মাত্র। ই· এইচ· কাব দেখিয়েছেন—ট্রটস্কি ছিলেন পুরো পশ্চিমপন্থী, লেনিনের মধ্যে স্লাভোফিল চিন্তা অন্তঃশীলা আব স্তালিনের মধ্যে তা সব ছাপিয়ে উঠেছে। পশ্চিম সম্বন্ধে অজ্ঞ স্তালিন পশ্চিমে কি হচ্ছে তা নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। ১৯২৩-২৮ যে নীতি তিনি কুটিল পথে অনুসরণ করছিলেন তা হল রাশিয়াকে শক্তিশালী ও স্বয়ম্ভর করে তুলতেই হবে। আর তাতে পশ্চিমী যুক্তির চেয়ে বেশি কাজ দেবে পিটার দ্য গ্রেটের শক্তি এবং ওল্ড চার্চের বিশ্বাস যে মস্কো হল তৃতীয় রোম, সেই অবক্ষয়ী পশ্চিমকে পথ দেখাবে। কোন সূক্ষ্ম তাত্ত্বিক তর্কে স্তালিন মন দিতেন না, স্ট্র্যাটেজি ও ট্যাকটিকস তাঁর কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ট্রটস্কি তাঁর "ccntemptuous attitude towards ideas" লক্ষ্য করেছেন, কিন্তু জয়ী হয়েছে স্তালিনের দলীয় ক্ষমতার নিরঙ্কুশ প্রয়োগ।

অতএব সুভাষ-গান্ধী বিরোধ প্রসঙ্গে আমাদের শুধু পারিরারিক মর্যাদা, ব্যক্তিত্ব বা মেজাজের পার্থক্য, শিক্ষার হেরফের ইত্যাদি ভাবলেই চলবে না, ভাবতে হবে পরিবর্তনশীল বৈদেশিক পরিস্থিতির কথা, কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ সংগঠনের, মত ও পথ নিয়ে পার্থক্যের

কথা, ভারতীয় ও আঞ্চলিক ঐতিহ্যের তারতম্যের কথা।

গীতশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় Constraints in Bengal Politics 1921-41 গ্রন্থে দেখাতে চেষ্টা করেছেন গান্ধীবাদী রাজনীতির সঙ্গে বাংলার রাজনীতির মেলবন্ধন সম্ভব হয়নি। কেন, তার কিছু উত্তর ব্রুমফিলড্ আগেই দিয়ে গেছেন তাঁর Elite Conflict in a Plural Society-তে। সুভাষচন্দ্র গান্ধী ও দাশের মধ্যে নেতারূপে দাশকেই মেনে নিয়েছিলেন। প্রথম সাক্ষাৎ থেকেই তাঁর মনে হয় গান্ধীর পরিকল্পনায় একটা "deplorable lack of clarity" রয়েছে। তাঁর নিজের পরিকল্পনার কিছু পরিচয় পাই An Indian Pilgrim গ্রন্থে। দাশের প্রতি বুদ্ধিগত ও আবেগপূর্ণ আনুগত্য ছাড়াও বসুকে যে পরিবেশে কাজ করতে হয়েছিল তার অন্যতম নিয়ন্ত্রক ছিল সন্ত্রাসবাদী ধ্যানধারণা—যা হিংসার প্রশ্ন নিয়ে গান্ধীবিরোধী। গান্ধী যখন ত্রিমুকুটের জন্য যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে বেছে নিলেন তখন শরৎ বসুর দল খুশি হননি। সেনগুপ্তর দলকে ক্ষমতা রাখতে কম বেগ পেতে হয়নি। গঠনমূলক কাজে নিযুক্ত প্রফুল্ল ঘোষ, সতীশ দাশগুপ্ত, প্রফুল্ল সেন প্রভৃতি প্রাদেশিক রাজনীতিতে স্থানই পাননি। বীরেন শাসমলকে কৃষ্ণনগর সম্মেলন (১৯২৬)-এ সন্ত্রাসবাদী দল তাড়ায়। তাঁর অপরাধ—হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট সমর্থন। ব্রুমফিল্ডের মতে, তারুণ্যের দীপ্তি, দেশের কাজে স্বার্থত্যাগ ও বারংবার কারাবরণ, প্রশাসনিক দক্ষতা, উদ্দীপক ভাষণশক্তি সুভাষচন্দ্রের একটা charisma গড়ে তোলে যা বাঙালী ভদ্রলোকের মানসিকতা ও আবেগকে প্রবল ভাবে আন্দোলিত করেছিল। "He encouraged their elite activist, philosophy of politics, and offered it a purpose in a cathchword 'Socialism', which he was careful never to define. He applauded heroic acts of violence—the glory of self-immolation for the nation—and he provided paramilitary organisation and parades to appeal to the Hindu bhadralok's romantic militarism."[১৬১] বলা বাহুল্য, চিত্তরঞ্জনেব রাজনৈতিক ঐতিহ্য, বাঙালী ভদ্রলোকের হিংসাবাদী, রোমান্টিক, বিপ্লবী মানসিকতা, নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও আদর্শবাদ (যতই ধোঁয়াটে হোক না কেন) সব মিলে সুভাষের যে ভাবমূর্তি তৈরি হয়েছিল, বারংবার গান্ধীনীতির বিরোধিতা করে (মাদ্রাজ, ১৯২৭,কলকাতা, ১৯২৮, করাচী, ১৯৩১) তিনি নিজেই তাকে তরুণদের মধ্যে উজ্জ্বলতর করেছিলেন। ১৯৩০-৩৪-এর আইন অমান্য আন্দোলন অন্তত বাংলায় অহিংস ছিল না। সূর্য সেনদের সঙ্গে সুভাষের যথেষ্ট পরিচয় ছিল। অবাঙালী কংগ্রেসীদের প্রতিবাদে তিনি কর্ণপাত করেননি। আর আইন অমান্য প্রত্যাহারকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছিলেন।[১৬২] কিন্তু বাংলা কংগ্রেসের অন্তর্নিহিত রেষারেষি ও বিশৃঙ্খলা ভারতীয় নেতাদের চোখ এড়ায়নি, চোখ এড়ায়নি মুসলিমদের সম্বন্ধে অনীহা। বিরক্ত নেহরু গান্ধীকে লিখছেন, "Might not the dominant part of the Bengal Congress be called today 'the Society for the advancement of Mr. Nalini Ranjan Sarkar'.....and the other part probably a similar society for a similar laudable object?"[১৬৩] অহিংসা ও সন্ত্রাসবাদের,হিন্দু স্বার্থের সঙ্গে মুসলিম স্বার্থের, সর্বভারতীয় রাজনীতির বাধ্যবাধকতার সঙ্গে বাঙালী স্বার্থের সমন্বয়, গণসংযোগের উপায় ও গণআন্দোলনের কৌশল-কোন বিষয়ই ১৯৩৪-৩৫ পর্যন্ত মনঃস্থির করতে পারেননি বাংলা কংগ্রেস। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ফলে উচ্চবর্ণ বাঙালী ভদ্রলোক কোণঠাসা হয়েছে, মান্দ্য ও বেকারির ফলে বাঙালী মধ্যবিত্তের অস্তিত্ব বিপন্ন, ব্রিটিশ ও

মাড়োয়ারী ধনতন্ত্রের চাপে বাঙালী শিল্পোদ্যোগ নিষ্পিষ্ট, সাম্যবাদের অভ্যুদয়ে বাঙালী শ্রমিক ও কৃষক কংগ্রেস-বিরোধী পথ নিচ্ছে, অ্যাণ্ডারসনী দমননীতির আঘাতে বাংলার কণ্ঠ রুদ্ধ—এমনি এক অস্বাভাবিক সংকটে সুভাষ ফিরে এসেছিলেন পাদপ্রদীপের সামনে। রোগজীর্ণ দেহ পুরো সারেনি, মনে মৃত্যুঞ্জয়ী বল, আদর্শের দিগন্ত ইউরোপে অবস্থান ও ভ্রমণের ফলে প্রসারিত, কিছুটা বা বিভ্রান্ত। উনিশ শতকীয় বাংলার গর্ব ও বিশ শতকীয় বাংলার অভিমান সুভাষচন্দ্রের মধ্যে উদ্যত খড়্গের মত ঝলসে উঠল।

॥ ৭ ॥

সুভাষচন্দ্র মান্দালয় থেকে দেশে ফেরার পর যুগান্তর দল মোটামুটি তাঁকে সমর্থন করছিল। কলকাতা কংগ্রেস (১৯২৮)-এর সময় ও পরে বি ভি গ্রুপকে তাঁর পেছনে দেখি। চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানেব নায়ক সূর্য সেন ও তাঁব দলের দু এক জনের সঙ্গে বসুদের যোগাযোগ ছিল। এ বিষয়ে চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে সুভাষের পার্থক্য ছিল। চিত্তরঞ্জন সন্ত্রাস বা সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী ছিলেন না কিন্তু করপোরেশন ও প্রাদেশিক কংগ্রেসের কার্য পরিচালনায় সন্ত্রাসবাদীদের সমর্থননির্ভর ছিলেন। জীবনের শেষে মূলত বৈষ্ণব চিত্তবঞ্জন শক্তি-সাধনায় আকৃষ্ট হননি। সুভাষ শাক্ত, বৈষ্ণব কোনটাই না হয়েও এবং জীবনের প্রথম ভাগে মোটামুটি বৈদান্তিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন হলেও স্বাধনীতার লক্ষ্য অর্জনে যে-কোন পথ নিতে প্রস্তুত ছিলেন। গান্ধীর মত লক্ষ্য ও উপায়ের সমতায় কোন বিশ্বাস ছিল না তাঁর। কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর সর্বাধিনায়ক (G.O.C) রূপে তিনি যে ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা কবেছিলেন তার সঙ্গে নেপোলিয়ন (ডেভিডেব বিখ্যাত প্রতিচ্ছবি স্মরণ করুন)-এব মিল।

অস্ত্রাগার,লুণ্ঠনের পর চট্টগ্রামে পাঞ্জাবী দমননীতি চালু হল, হিজলি বন্দীনিবাসে গুলি চলল। এ আই সি সি-র কাছে প্রতিবাদ দিবস ও সত্যাগ্রহের দাবি তুললেন বাঙালী নেতারা।[১৬৭] নীরব রইলেন কেন্দ্রীয় নেতারা। মেদিনীপুবেব ত্রাসেব রাজত্বও তাঁদের বিচলিত করল না। তারপব গান্ধী-আরুইন চুক্তি। নিখিল বঙ্গ ছাত্র সম্মেলন (৬-৯ মার্চ ১৯৩১) তার নিন্দা কবল। সেনগুপ্তর দল মানল কিন্তু সুভাষ কবাচীতে বললেন, "of what use the truce terms were if—the lives of such heroes (eg. Bhagat Singh) could not be saved?" বিদ্রোহী সুভাষকে বশে আনবাব জন্য করাচী কংগ্রেসে গান্ধী বলেন, "যদি দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক থেকে শুধু হাতে ফিবে আসি, একসঙ্গে আবার লড়া যাবে।"[১৬৫] কিন্তু বসু জানতেন গোলটেবিলে কিছু পাওয়া যাবে না। উইলিংডনের আধা সামরিক অর্ডিন্যান্স-রাজের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বহরমপুর বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে পুনরায় সত্যাগ্রহ শুরু করার দাবি তোলেন। (মনে রাখতে হবে সেপ্টেম্বরের ওয়ার্কিং কমিটিতে নেহরুওইউপি-তে 'defensive direct action'-এব দাবি তুলেছিলেন।) গান্ধী ফিরে আসার পর আইন অমান্য ফেব শুরু হয়। কিন্তু ১৯৩৩-এ অসুস্থ সুভাষকে চিকিৎসাব জন্য ভিযেনা যাবার অনুমতি দেবার আগেই তিনি বুঝেছিলেন, আন্দোলন ব্যর্থ হতে চলেছে।[১৬৬]

ভারতেব স্বাধীনতার দাবি ইউরোপে প্রচার করতে গিয়ে গান্ধীর কঠোব সমালোচনা করেছিলেন তিনি। কুর্তিকে বলেছিলেন, ব্রিটিশদের সঙ্গে গান্ধী যে ভাবে চলেন, যে আপোসকামী মনোভাব দেখান, নমনীয় চুক্তি করেন, তাতে ভারতের রাজনৈতিক অগ্রগতি

হবে না।[১৬৭] বুডাপেস্টে তিনি সশস্ত্র বিপ্লবের কথাও বলেন। এ সবের ফলে বাংলায় কংগ্রেসের প্রতি বিরাগ বেড়েছিল। গোয়েন্দা দফতরের মতে কলকাতায় তাড়াহুড়ো করে যে কংগ্রেস অধিবেশন বসে (৩১ মার্চ—১ এপ্রিল ১৯৩৪) তাতে এক চতুর্থাংশের বেশি বাঙালী প্রতিনিধি উপস্থিত ছিল না। গান্ধীর বাংলার সফরের কথা উঠলে কোন উৎসাহ দেখা দেয়নি।[১৬৮] সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ও পুণা প্যাক্টের ফলে বাঙালী হিন্দুর মন বিষিয়ে ছিল। তা ছাড়া গান্ধী কংগ্রেসের যে নয়া গঠনতন্ত্র প্রবর্তন করলেন (১৯৩৪), সুভাষ তার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। মূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিসংখ্যা ও নিখিল ভারত ও প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভ্যসংখ্যা হ্রাস তাঁর কাছে অগণতান্ত্রিক প্রতীয়মান হয়েছিল।[১৬৯] ওয়ার্কিং কমিটি নিজের লোক দিয়ে ভর্তি করে গান্ধীর অবসরগ্রহণ পরিহাসের চোখে দেখেছিলেন তিনি।

পিতার অসুস্থতার জন্য দেশে ফেরার (ডিসেম্বর ১৯৩৪) অল্পদিন পর তিনি আবার ইউরোপ ফিরে যান (জানুয়ারি ১৯৩৫), জোর করে ভারত ফেরেন (এপ্রিল ১৯৩৬), আবার গ্রেপ্তার হন এবং শেষে ১৯৩৭-এর মার্চে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। অক্টোবরে তাঁদেরই কলকাতার বাসভবনে এ আই সি সি ও ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন বসে। গান্ধী শরৎ বসুব বাড়িতে উঠেছিলেন এবং সেখানকার অনেক মজাব ঘটনা নীরদ চৌধুরী **Thy Hand, Great Anarch**-এ বর্ণনা করেছেন। বামপন্থীদের সাফল্যে বিব্রত গান্ধী তাদের পাল থেকে হাওয়া কেড়ে নেবার জন্য নেহরুকে ১৯৩৬ সালে সভাপতি করেন। এবাবও অনেকটা সেই কারণে তিনি সুভাষচন্দ্রকে হবিপুরা কংগ্রেসের (১৯৩৮) সভাপতি করার প্রস্তাব দেন। এ সময় কংগ্রেসের যে সাংগঠনিক নির্বাচন হয় তাতে কম্যুনিস্ট ও সোস্যালিস্টরা মিলিতভাবে এ আই সি সি-র ৪০টি আসন পান। 'ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি ও আমরা' গ্রন্থে সরোজবাবু লিখছেন, "তিনি তখন (মুক্তির পর) থেকেই কমিউনিস্ট, কংগ্রেস সোস্যালিস্ট ও অন্যান্য বামপন্থীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে কাজ করতে থাকেন।" হরিপুবা কংগ্রেসে মুজফ্‌ফর আহমদ, সোমনাথ লাহিড়ী ও বঙ্কিম মুখার্জীর মত প্রথম সারির কম্যুনিস্ট পার্টির সভ্যরা প্রতিনিধি রূপে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মতাদর্শের সঙ্গে বসুর মতাদর্শেব খুব অমিল ছিল না। ফজলল হকের সঙ্গে শবৎচন্দ্র বসুব শর্তাধীন (খাজনা হ্রাস, আট ঘণ্টা কাজ, বন্দীমুক্তি ইত্যাদি) কোয়ালিশনে তাঁদের আপত্তি ছিল না। বলা বাহুল্য, কেন্দ্রীয় কংগ্রেস তখন কোন প্রদেশেই সরকাব গড়তে চাননি—লাটদেব বিশেষ দায়িত্বেব ব্যাপাবে আপত্তির জন্য। কিন্তু বাংলায এ সুযোগ আর আসবে না তা কম্যুনিস্ট ও বসুরা জানতেন। তাঁদের খুশি হবার কথা নয়। উভয়ে একযোগে বন্দীমুক্তির জন্য হক মন্ত্রিসভার ওপব চাপ সৃষ্টি কবেছিলেন। ১৯৩৮-এর মাঝামাঝি বিনাবিচাবে আটক বন্দীদের মুক্তি সম্পূর্ণ হয় এবং আন্দামানে বন্দীদের দেশে ফেরানো হবে স্থির হয। তবে এ ব্যাপারে গান্ধীও কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন। রাজনৈতিক বন্দীমুক্তির প্রশ্নে বিহার ও উত্তর প্রদেশেব মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে—ভুললে চলবে না।

যাই হোক, সুভাষচন্দ্র বসুর নির্বাচনের পেছনে শুধু একজন সর্বত্যাগী সংগ্রামী নেতার প্রতি দেশবাসীর সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি ছিল তাই নয়, ছিল বামপন্থী জনমতের চাপ। কিন্তু তিনি নিজে কতটা বামপন্থী ছিলেন?

গান্ধী ও নেহরুর রচনায় আমরা তাঁদের ইডিওলজির মোটামুটি একটা প্রতিফলন পাই। গান্ধী মিস্টিক ছিলেন। 'অন্তরের আলো' তাঁকে পথ দেখাত, 'অন্তরের প্রত্যাদেশ' তিনি শুনতে পেতেন। তাই তাঁর চিন্তার ন্যায় সব সময় স্পষ্ট বোঝা যায় না। কবির ভাষায় তা

'পালিয়ে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায় ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে।' তবু 'হিন্দ স্বরাজ' আলোচনা প্রসঙ্গে আগেই আমরা দেখাবার চেষ্টা করেছি, ভারতীয় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সাধনার বিভিন্ন পর্ব থেকে আদর্শের সূত্রগুলি নিয়ে, তার সঙ্গে টলস্টয়ের মত নৈরাজ্যবাদী (বাকুনিনের মত নয়) ভাব মিশিয়ে তিনি একটা রামরাজ্যের প্রতীক তৈরি করেছিলেন যার সঙ্গে খ্রীস্টান Kingdom of God বা Righteousness-এর বিশেষ তফাৎ নেই। আধুনিকতা ও যন্ত্রসভ্যতা সমার্থক মনে করলে তিনি অবশ্যই আধুনিকতা বর্জন করেছিলেন বলতে হবে, কিন্তু কোন অর্থেই তিনি অতীতাশ্রয়ী বা পলায়নকামী ছিলেন না। ভারতেব সব চেয়ে বড়ো বাস্তব—দারিদ্র—'স্বে মহিম্নি' শ্রেয় কখনো মনে করেননি তিনি, কিন্তু তা কেবল পশ্চিমী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দ্বারা নিরাকৃত হতে পারে নেহরুর মত এমন বিশ্বাস তাঁব ছিল না। নগরায়ন, বৃহৎ শিল্পায়ন, কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি তাঁর কাছে উন্নতির 'চিচিং ফাঁক' ছিল না। পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রেখে গ্রামীণ অর্থনীতিকে স্বয়ম্ভর করাই ছিল শ্রেষ্ঠ সমাধান, কারণ তাতে জীবনচর্যার ঐতিহ্যানুমোদিত মূল্যগুলি ব্যাহত হয় না। মানুষের সঙ্গে মানুষের, মানুষের সঙ্গে প্রকৃতিব, এমনকি মানুষের সঙ্গে সমগ্র জীবজগতের যে একটা অদৃশ্য যোগসূত্র রয়েছে তা অক্ষুণ্ণ রেখে সরল, অহিংস, সামূহিক কল্যাণে উৎসর্গিত জীবনযাপনই স্বরাজ।

জওহবলাল নেহরু এই ধরনের ইডিওলজিকে অতীতাশ্রযী, অযৌক্তিক এবং বিপজ্জনক মনে কবতেন। খাদ্যাখাদ্য নিযে গান্ধীব বাছবিচাব, ব্রহ্মচর্য নিয়ে বাড়াবাড়ি (ফ্রয়েডেব পরেও !), জমিদার ও শিল্পপতিব অছিতত্ত্ব (trusteeship), বৃহৎ যন্ত্রেব ওপব বিরাগ, দাবিদ্র্য-জীর্ণ, রুচিহীন, সংস্কাবান্ধ কৃষক নিয়ে বোমান্টিক আবেগ, খাদিব ওপব অস্বাভাবিক জোর—সবই তো প্রাক্ শিল্পবিপ্লব যুগের মানসিকতার দ্যোতক। গান্ধী সন্তদের সমগোত্রী ; বর্তমান পৃথিবীব দ্বন্দ্ব, সমস্যা, কুশ্রীতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে চান। তিনি মনে কবেন পাপ ও পবিত্রাণ হল প্রাথমিক সমস্যা, সামাজিক কল্যাণ পবেব কথা। সমাজতন্ত্রকে তিনি মনে করেন অমঙ্গল, কারণ তার মধ্যে হিংসার সম্ভাবনা। শ্রমিকের পানাসক্তি, চবিত্রদোষ, জুয়া খেলার প্রবণতাকে তিনি তার দারিদ্র্যের জন্য যতটা দায়ী করেন ধনিকের শোষণকে ততটা নয়। এটা শ্রমিকদের প্রতি অন্যায় নয় কি ? তা ছাড়া একমাত্র বিজ্ঞান ও আধুনিক প্রযুক্তিই প্রাচুর্য সৃষ্টি করে দারিদ্র্য দূর করতে সমর্থ—যদি অবশ্য সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্র তাতে হস্তক্ষেপ না করে। সব মিস্টিকদের মত গান্ধী মনে করেন—ব্যক্তিগত ও অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক পরিবর্তনের ফলে বাইরের পরিবেশ বদলে দেওয়া যায়। বিপ্লব ছাড়া তা যায় না। আব হিংসার কথা যদি ওঠে, ধনিক ও শ্রমিক, মালিক ও চাষীব শ্রেণীসম্পর্কেব মধ্যে কি হিংসা নেই ?

১৯২১-এ উত্তর প্রদেশেব কিষাণ আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে এ সব প্রশ্নের সম্মুখীন হন তিনি। ব্রাসেলস কনফারেন্সে বিদেশের সমাজতন্ত্রীও সাম্যবাদীদের সঙ্গে কথাবার্তায়,[১৬৯ক] পরে রাশিয়া সফরে তিনি সাম্যবাদী চিন্তাধারার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসেন। ১৯২৭-এ গান্ধীর সঙ্গে আদর্শবাদ নিয়ে প্রথম সংঘর্ষ ঘটে। তিনি 'হিন্দ স্বরাজে'ব ধাবণা নস্যাৎ করে দেন। তখন থেকে তাঁর ধারণা হয় সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্র হাত ধবে চলে। একমাত্র সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই উভয়কে ধ্বংস করতে সক্ষম। তবে ভারতবর্ষের বিশেষ পরিস্থিতিতে জাতীয়তাবাদকে অগ্রাধিকার দিতে ও গান্ধীর নেতৃত্ব মেনে নিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন।

প্রথম দিকে গান্ধীব সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্লেটোর Diologues থেকে সক্রেটিস সন্দর্শনে বিমুগ্ধ অ্যালকিবায়াডিসেব কথা উদ্ধৃত করেছেন তিনি :

"Only I have been bitten by something much more poisonous than a snake; in fact, mine is the most powerful kind of bite there is. I have been bitten in the heart, or the mind, or whatever you like to call it." আত্মজীবনীর শেষ অধ্যায়গুলিতে দেখি ১৯৩৬-এর কাছাকাছি এতমোহ তাঁর ছিল না। তবু যাঁকে তিনি পিতৃবন্ধু ও পিতার বিকল্প হিসাবে ভালবেসেছেন তাঁর বহু ত্রুটি, ভ্রান্তি, চারিত্রিক কৌণিকতা, মেনে নেওয়া স্বভাবগত হয়ে গিয়েছিল। তাঁর রচনায় এই প্রেম-ঘৃণামূলক সম্পর্কের টানাপোড়েন ধরা পড়েছে। বারে বারে যুক্তি বিদ্রোহ করেছে কিন্তু আবেগ টেনে রেখেছে তাঁকে গান্ধীর প্রভাবমণ্ডলে।

সুভাষচন্দ্রের এ সব বালাই ছিল না। তাঁর ওপর উদ্ভিন্ন কৈশোরে যাঁর প্রভাব ছিল সর্বাধিক তিনি বিবেকানন্দ। সন্ন্যাস জীবনের প্রতি তাঁর একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল। সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁব চিঠিপত্রের তৃতীয় খণ্ডে বাসন্তী দেবীকে লেখা এক চিঠিতে পড়ি তিনি প্রশ্ন করছেন, বাসন্তী দেবী যদি বাজনীতি থেকে সরে থকেন তবে সুভাষচন্দ্রেরই বা কি দায় পডেছে সন্ন্যাসব্রত না নিয়ে দেশেব কাজ করার? তাঁর মধ্যে বৈদান্তিক নিরাসক্তি ও ক্ষত্রিয়সুলভ তেজেব যে দ্বন্দ্ব বারবার ফুটে উঠেছে তা বিবেকানন্দের জীবনেও লক্ষণীয়। বিবেকানন্দই তাঁব মধ্যে সঞ্চাব করেছিলেন মৃত্যুঞ্জয় অভীঃ মন্ত্র, শিখিয়েছিলেন বলতে—'আমি মায়েব জন্য বলি প্রদত্ত।' আশা করি পাঠকদের বুঝতে অসুবিধা হবে না সে যুগের শ্রেষ্ঠ সন্ত্রাসবাদীদেবও বিবেকানন্দ অনুপ্রাণিত করেছিলেন বলে তাঁরা ও সুভাষচন্দ্র এত সমমর্মী ছিলেন। তাঁরা সবাই ছিলেন বিশ্ববিজয়ী বীর সন্ন্যাসীর শিষ্য, সতীর্থ।

কিন্তু বিবেকানন্দ ইংরেজদের শাসন ও শোষণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল হলেও এবং তজ্জনিত ক্রোধ মাঝে মাঝে নিবেদিতার ওপর বর্ষণ করলেও[১৭১] আপন দেশের ত্রুটি, বিচ্যুতি, স্খলন, পতন সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন না। জাতিভেদ, ছুৎমার্গ, নারীজাতির প্রতি অবজ্ঞা, চিরায়ত ধর্মের স্থানে লোকায়ত আচার স্থাপন, অদৃষ্টবাদ, দৈহিক ও স্নায়বিক দুর্বলতা এবং তজ্জনিত ভয় ও ক্লৈব্য, শেষে ম্লেচ্ছাপবাদে সমস্ত নতুন ভাবনাচিন্তাব সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে কূর্মবৃত্তি অবলম্বন—এগুলিই তো বিদেশী শাসনেব কারণ। শুধু তাদেব দোষ না দিয়ে বা তাদের অন্ধ অনুকরণ না করে নিজেদেব ও তাদের যা ভালো তাব সমন্বয় তিনি করতে বলেছিলেন—প্রাচ্যের সত্ত্বের (সাম্প্রতিক তমঃ নয়) সঙ্গে প্রতীচ্যেব রজঃ মেলালে উভয়েরই লাভ। তা ছাড়া রাজনীতিকে অগ্রাধিকার তিনি দেননি। পশ্চিমেব সাম্যমৈত্রীস্বাধীনতামূলক রাজনীতি সম্বন্ধে শিবানন্দকে লেখা চিঠিতে তা পরিষ্কার ভাবে ফুটেছে। রাজনীতি মানুষের একটা দিক মাত্র স্পর্শ করে, আর বস্তুবাদের সঙ্গে মিলে সংহতির স্থলে আনে বিভেদ। গণতন্ত্রকে তো তিনি devil's dance in man বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। ভবিষ্যতে সমাজতন্ত্র আসছে বুঝতে পারলেও সে সম্বন্ধে তাঁর নানা দ্বিধা ছিল। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁকে সমাজতন্ত্রের ও শূদ্রাধিপত্যের প্রবক্তা বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তা ঠিক নয়। তিনি চেয়েছিলেন প্রত্যেক বর্ণের আদর্শ গুণগুলি বজায় রাখতে, দোষগুলি বাদ দিতে। শূদ্র যদি বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ের গুণ অর্জন না করে আধিপত্য করতে চায় তবে উচ্চতর কোনো সাংস্কৃতিক বা আধ্যাত্মিক স্তবে উত্তরণ হবে না।[১৭২] স্বামীজী বলেছেন, "আমি কি কেবল ভারতের, আমি সারা পৃথিবীর"। জ্ঞানীর লক্ষ্য সর্বাত্মতাবন্ধ সমষ্টিভূত একেকে জানা; ভক্তের লক্ষ্য তাকে ভালবেসে সবাইকে ভালবাসা। "আমি এমন একটি ধর্ম প্রচার করতে চাই যাহা সকল ভূতের মনের উপযোগী হইবে। ইহা সমভাবে দর্শনমূলক. তুল্য রূপে ভক্তিপ্রবণ, সমভাবে মরমী এবং

কর্মপ্রেরণাময় হইবে।"

কিন্তু সুভাষচন্দ্রের মনে হয় বিবেকানন্দ যে দরিদ্র ও আর্তকে ঈশ্বরজ্ঞানে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন শুধু সেবা দ্বারা, অন্নদান, আরোগ্যদান, শিক্ষাদান, ধর্মদান দ্বারা তাদের প্রকৃত সমস্যার সমাধান হবে না। এব মূলে রযেছে ইংরেজ শাসন, তার পেছনে সাম্রাজ্যবাদ। এর সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে বাজনীতি দিয়েই। তবে তা গান্ধীবাদী অহিংস সত্যাগ্রহ বা আইন অমান্যের পথে হবে না, বিচ্ছিন্ন সন্ত্রাসবাদের দ্বারাও নয়—সশস্ত্র বিপ্লব চাই। মার্ক্সবাদীরা একই কথা বলছিলেন। কিন্তু তাঁরা চাইছিলেন সে বিপ্লব ভারতের মাটিতে জন্মলাভ করুক। কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণী নানা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আপন ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন হলেনিজেরাইবিপ্লব কববে। তখন তাকে নেতৃত্ব দেবে পার্টি। ১৯২৮ পর্যন্ত কংগ্রেসেব সঙ্গে চলে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের ষষ্ঠ কংগ্রেস ভাবতীয় পার্টিকে সশস্ত্র বিপ্লবের পথে আলাদা চলতে বলে, কাবণ জাতীযতাবাদীরা "এক সংস্কারবাদী শ্রেণী সহযোগিতার চবিত্র" নিযেছে।

এব পবেও সুভাষচন্দ্র ছাত্র, যুব ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে তাদেব সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন। মজদুব সঙ্ঘেব সভাপতি রূপে জামসেদপুরের টাটা কোম্পানীতে ধর্মঘটের একটা মীমাংসা কবে দিয়েছিলেন। গোলমুরি টিন প্লেট কোম্পানীর ধর্মঘটে তাঁব সহাযক ছিলেন আবদুল বাবি। লাহোরেব ছাত্র সম্মেলনে (১৯ অক্টোবব ১৯২৯) তিনি যে বক্তৃতা দেন, তাতে স্বাধীনতা বলতে তিনি কী বোঝেন তার ব্যাখ্যা আছে: "This freedom implies not only emancipation from political bondage but also equal distribution of wealth, abolition of caste barriers and social inequities, and destruction of communalism and religious intolerance."[১৭৩] গান্ধী-আরুইন চুক্তির পব তাঁর নির্দিষ্ট পথ হল:

(১) সমাজতন্ত্রেব ভিত্তিতে কৃষক ও শ্রমিক সংগঠন;
(২) যুবশক্তিকে কঠোব শৃঙ্খলাধীন স্বেচ্ছাসেবী দলে সংঘবদ্ধকবণ,
(৩) জাতিভেদপ্রথা দূবীকবণ এবং সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কারের সমূল উৎপাটন;
(৪) নারী সংগঠন;
(৫) ব্রিটিশ পণ্য বর্জন কঠোরতরকরণ; এবং
(৬) নতুন মতবাদ ও কর্মপন্থার ব্যাপক প্রচারার্থ সাহিত্য রচনা।

কিন্তু একটা তফাৎ লক্ষ্য করতে হবে। বাবংবার তিনি বলেছেন, তিনি বাস্তববাদী—সবরমতী বা পণ্ডিচেবী, কারুর নির্দেশ তিনি বেদবাক্য বলে মানেন না।[১৭৫] ট্রেড ইউনিয়নের ব্যাপারে আর্মস্টার্ডাম বা মস্কোর নির্দেশও নয়।[১৭৬] কলকাতার ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে ক্রেডেন্সিয়াল কমিটি কম্যুনিস্টদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা চ্যালেঞ্জ করলে গোলমাল হয় ও কংগ্রেস ভেঙে যায়। ১৯৩৩ সালে অধিকারী Red Trades Union Congress-এর পুনর্গঠনের প্রস্তাব দেন। সুভাষ দেশে থাকলে অবশ্যই তাব বিরোধিতা করতেন। ১৯৩৪ সালে কানপুর, বোম্বাই প্রভৃতি অঞ্চলে যে ধর্মঘট হয় তার নেতৃত্ব দেয় কম্যুনিস্ট পার্টি এবং ফলে তাদের অধিকাংশ নেতা গ্রেফতার হন, পরে পার্টি বেআইনী ঘোষিত হয়। সে সময় নীহারেন্দু দত্তমজুমদার পরিচালিত বেঙ্গল লেবার পার্টি ও রজনী মুখার্জীব রায়বাদী পার্টিও আলাদা হয়ে গিয়েছিল।

কেউ কেউ বলেছেন (বা বলতেন) সুভাষ নাৎসী-ফাসিস্ত মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। যদি হয়ে থাকেন তবে ১৯৩৩ ও ১৯৩৮-এর মধ্যে হবেন। তার আগে নয়।

প্রথমত সমরোত্তর ইতালীর গণতান্ত্রিক সরকারেব তুলনায় মুসোলিনি দক্ষতব প্রশাসক ছিলেন বলে বহু দেশে তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। আমাদের দেশের পত্র-পত্রিকায় মুসোলিনি একটা প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়েছিল। কিন্তু ১৯৩৫-এব আগে সুভাষেব সঙ্গে তাঁব সাক্ষাৎকার ঘটেনি। মুসোলিনি ও ইতালীযানদের সম্বন্ধে তাঁর একটা দবদ গড়ে ওঠে, যদিও মানবতার দিক থেকে তাঁর অভিযোগ ছিল না, তা নয়। ১৯৩৩-এর পরে বহুবাব তিনি ভিয়েনা, বার্লিন, প্রাগ অঞ্চল ঘুবেছেন। কিন্তু পার্টির মধ্যে আপন স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ও ইঙ্গ-ফবাসী মিত্রশক্তিকে বোকা বানিযে মধ্য ইউবোপে জার্মান প্রভাব নিরঙ্কুশ করায় হিটলাব অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর পবামর্শদাতা হসহফাবের (Haushauffer) ভৌগোলিক-রাজনৈতিক (geo-political) বীক্ষণে ভাবতবর্ষেব গুরুত্বই ছিল না। হিটলাব ইংরেজদের একই নর্ডিক (তথা আর্য) জাতির অন্তর্ভুক্ত মনে করতেন, তাদের ভাবতীয় সাম্রাজ্যকে এশীয বাজনীতিতে ভারসাম্যরক্ষক মনে করতেন। তিনি হঠাৎ এই যুবক নেতাব সঙ্গে কিছু চক্রান্ত করবেন এ কথা ভাবাই যায় না। তা হয়ওনি।

যেটা বাস্তব সত্য তা হল ১৯৩৩-এ হিটলাব তাঁব সঙ্গে দেখা কবেননি, ১৯৪২-এব ২৮ মে-তে হিটলাবেব সঙ্গে তাঁব একবাব মাত্র দেখা হয। আলেকজান্ডাব ওয়ার্থের মতে তাতে সুবিধা হযনি। যুদ্ধের এক অতি আশাব্যঞ্জক লগ্নেও আজাদ হিন্দ আন্দোলনেব স্বীকৃতি পেতে সুভাষকে অনেক কাঠখড পোড়াতে হয়েছিল। বার্লিনের ফ্রি-ইন্ডিয়া সেন্টারেব জন্য জার্মান সবকাব যে অর্থ সাহায্য করতেন তিনি তা ধাব হিসাবে নিতেন। নাম্বিযার বলেন, পূর্ব প্রাচ্য থেকে কিছু ঋণশোধও তিনি করেন।[১৭৭] লোথাব ফ্রাংক (হিটলার বিরোধী)-এর মতে হিটলার ও তাঁর সবকার সম্বন্ধে সুভাষেব কোন মোহ ছিল না, তবে জার্মান জাতির প্রতি শ্রদ্ধা ছিল। মিউনিখেব জার্মান অ্যাকাডেমির কর্তা ডঃ থিয়েরফেলডাবকে ১৯৩৬-এ তিনি লিখেছিলেন, "...I regret I have to return to India with the conviction that the new nationalism of Germany is not only narrow and selfish but arrogant." তবে যুদ্ধটা যেহেতু বিশ্বের বৃহত্তম সাম্রাজ্যের সঙ্গে তখন অনেক অপমান সহ্য কবতে হবেই! যেহেতু জার্মানরাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে আঘাত হানতে পারবে সেহেতু কৌটিল্য নীতিতে তারাই "natural allies of India."

'মাৎসোটা' ছদ্মনামে জার্মান বৈদেশিক দফতরের কর্মচারী ডঃ ওয়ারম্যানকে তিনি রাশিয়ার বিরুদ্ধে নাৎসী অভিযান সম্বন্ধে ভাবতেব বিরূপ প্রতিক্রিযা জানাতে দ্বিধা কবেননি।

বর্তমানে লেখকের নিবেদন—দর্শনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছাত্র সুভাষের ওপর বেশ কয়েক বছর হেগেলের প্রভাব পড়েছিল। হেগেলের মতে ইতিহাসের মধ্যে spirit ক্রমপ্রকাশিত আর তার চরম পরিণতি সর্বশক্তিমান রাষ্ট্র। রাষ্ট্র হল "the ethical spirit as revealed, self conscious, substantial will." অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সংঘর্ষের মধ্যেই রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব প্রকট। যুদ্ধ সব সময় মন্দ নয়, কারণ তা spirit-এর ইচ্ছার প্রকাশ মাত্র। ইতিহাসের যাঁরা নেতা (কার্লাইলের 'বীর') তাঁরা idea-কে ধারণ করেন, বহন করেন বিপজ্জনক জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। কিন্তু তাঁরা যন্ত্র মাত্র। Spirit-ই যন্ত্রী। ব্যক্তিগত আচরণের একমাত্র নীতি হল সামগ্রিক কল্যাণ। এইটে বদলেছিল নাৎসী ইডিওলজি ; রাষ্ট্রের স্থানে বসিয়েছিল Blood, People, Race-কে। মূলত উভয়ই শক্তির উপাসক। হেগেলের শিষ্য ট্রিটস্কে বলেছিলেন—"the essence of state is Power."[১৭৮]

যদি আমরা তাঁর পরিকল্পিত সাম্যবাদী সঙ্ঘের দশদফা কর্মসূচি (১৯৩৩) বিশ্লেষণ করি,

তাহলে প্রথমেই দেখব—"সাম্যবাদী সঙ্ঘ হবে কেন্দ্রীভূত এক সর্বভাবতীয় দল", এর কাজ হবে ন্যায়, সাম্য ও স্বাধীনতার ভিত্তিতে এক নতুন রাষ্ট্র স্থাপন ও তার মাধ্যমে ভারতের ঐতিহ্যগত বাণী বিশ্বে প্রচার। Indian Struggle-এর দশম অধ্যায়—'A glimpse of the future'-এ আর একটা নতুন কথা শোনা গেল। বিবর্তনের পরবর্তী স্তর নাকি কম্যুনিজম ও ফাসিজমের সমন্বয়। এদের মধ্যে অনেক স্ববিরোধিতা কিন্তু সামান্য ধর্মও কম নয়। ব্যক্তির ওপর রাষ্ট্রের আধিপত্য, পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রে অনাস্থা, একদলীয় শাসনে বিশ্বাস, বিরোধী সংখ্যালঘুদের দলন, পরিকল্পনার ভিত্তিতে শিল্পায়ন উভয়েরই নীতি। ভারতের কর্তব্য হবে তাদের সমন্বয় করা। ভারতবর্ষে কিছুদিনের জন্য স্বৈরতন্ত্র চাই। "It will not stand for a democracy in the mid-Victorian sense of the term, but will believe in government by a strong party bound together by military discipline." বারংবার শক্তিমান কেন্দ্র, সুসংহত একমেব রাজনৈতিক দল, ডিক্টেটরশিপের প্রয়োজনীয়তা হেগেলের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে।

তবে বসু কোনওদিন ভোলেননি সেই শক্তিমান রাষ্ট্রের বা দলের কাম্য—জনসাধারণেব সর্বাঙ্গীণ মুক্তি, সকলের জন্য ন্যায়।[১৭৯] ১৯৩৮ সালে লন্ডন ছাড়ার আগে রজনী পাম দত্ত জিজ্ঞাসা করেন, ফাসিজম-কম্যুনিজমের সমন্বয় বলতে বসু কি বোঝেন? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল' গ্রন্থে সে কথা বলার পর তাঁর মত বদলেছে। "আমরা ভারতের স্বাধীনতা চাই এবং তারপর সমাজতন্ত্র। যখন আমি 'কম্যুনিজম ও ফাসিজমের সমন্বয়'-এর কথা বলেছিলাম আমি তাই বলতে চেয়েছিলাম। হয়তো যে ভাষা ব্যবহাব করেছিলাম তা যুৎসই হয়নি। কিন্তু আমি বোঝাতে চাই যখন আমি বইটা লিখছি, ফাসিজম তখনো সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন শুরু করেনি এবং আমার কাছে মনে হয়েছিল তা জাতীয়তাবাদেরই একটা উগ্র রূপ। আরও বলতে চাই ভারতে যারা কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠার পক্ষে তাদেব জাতীয়তা বিরোধী মনে হয়েছিল এবং আমার মনোভাব আরও দৃঢ় হয় তাদের কযেকজনের ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি শত্রুসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি দেখে। অবশ্য এখন অবস্থাটার মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে।

"My personal view today is that the Indian National Congress should be organised on the broadest anti-imperialist front and should have the tow-fold objective of winning political freedom and the establishment of a socialist regime."[১৭৯ক]

১৯৩৫-এর ৩ এপ্রিল রোমাঁ রোলাঁর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। তিনি বলেছিলেন, "অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় এই বস্তুবাদী জগতের পক্ষে গান্ধীর পথ অতি বেশি মহৎ এবং রাজনৈতিক নেতা রূপে বিপক্ষের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় তিনি বড় বেশি ঋজু।" তিনি রোলাঁকে জিজ্ঞাসাও করেছিলেন, যদি যুক্তফ্রন্টের নীতি বর্জিত হয় ও কংগ্রেসের চরমপন্থীরা কৃষক ও প্রজাদের স্বার্থের সঙ্গে নিজেদের বিজড়িত করে, তা হলে কি হবে? রোমাঁ রোলাঁর উত্তর ছিল দ্বিধাহীন। "গান্ধী বা কোন দলের যদি সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের আবশ্যিক উদ্‌বর্তনের সঙ্গে বিরোধ বাধে তাহলে আমি চিরদিনই নির্যাতিত শ্রমিকের পক্ষে রইব।" তিনি আরও বলেন, প্রচণ্ড মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে তিনি বুঝেছেন, "non-violence connot be the central pivot of our entire social activity."[১৮০]

১৯৩৬ সালে ৮ এপ্রিল তিনি সরকারের নিষেধ অমান্য করে দেশে ফিরলেন ও গ্রেফতার হলেন—বন্দী রইলেন ১৯৩৭-এর ১৭ মার্চ পর্যন্ত। কলকাতায় ফিরে এ আই সি

সি-র অধিবেশনে যোগ দিলেন এবং তখনই মোটামুটি স্থির হল পরেব বছর তিনিই হবেন কংগ্রেসের সভাপতি। আবার গেলেন ইউরোপ এবং ১৯৩৮-এর জানুয়ারিতে লন্ডনে থাকা কালে সভাপতিপদে নির্বাচনের পাকা খবর পেলেন। গান্ধীকে তিনি যেভাবে আক্রমণ করেছিলেন (বিঠলভাই-এর সঙ্গে) তাতে অনেক গান্ধীবাদীই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু সে তো নেহরুও করেছেন বারবার। হয়তো গান্ধী এ ভাবে বামপন্থীদের পাল থেকে হাওয়া কেড়ে নিতে চেয়েছিলেন। একে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির অভ্যুদয়, অন্যদিকে কম্যুনিস্টদের চাপ—মাঝখানে তরুণদেব প্রিয় নেতা নেহরু ও সুভাষের সমাজতন্ত্রী মনোভাব দক্ষিণপন্থীদের বিব্রত করতেই পারে। তা ছাড়া সুভাষকে সভাপতি করার অর্থই হল সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি।

কিন্তু হরিপুরা কংগ্রেসের সামনে সমাজতন্ত্র বড়ো কথা ছিল না। সবে ছটি প্রদেশে কংগ্রেস সরকার স্থাপিত হয়েছে। তাদের কর্মসূচি ছোটলাটদের সঙ্গে সম্পর্ক, হাইকমান্ডেব সঙ্গে মন্ত্রিসভার সম্পর্ক—সেসব তো গুরুত্বপূর্ণ ছিলই, উপবন্তু যে সমস্যা ক্রমশ বড়ো হয়ে উঠছিল তা ফেডারেশন গ্রহণের সমস্যা।

বিলেত ছাড়বার আগে ১ জানুয়ারি (১৯৩৮) ভারতসচিব জেটল্যান্ডের সঙ্গে সদ্য নির্বাচিত কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের দেখা হয়। তাতে প্রথম যে কথা উঠেছিল তা হল সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা হিন্দুদের পক্ষ থেকে কোনভাবে সংশোধন করা যায় কিনা। বাঙালী হিন্দু ভদ্রলোকদের প্রতিনিধির পক্ষ থেকে প্রশ্নটাব গুরুত্ব ছিল। দ্বিতীয় প্রশ্ন ওঠে ফেডারেশন নিয়ে। "His (Bose's) most fundamental objection (to federation) was the fact that expenditure upon defence and control of the army would be altogether withheld from the popular part of the Federal Government." তাঁব দ্বিতীয় আপত্তি—রাজন্যবর্গের প্রতিনিধিত্বের প্রকৃতি ও পরিমাণ। তৃতীয় প্রশ্ন ওঠে কম্যুনিস্টদেব নিয়ে। বসুর মতে তাদের সংখ্যা অল্প এবং "তিনি নিজে সমাজতন্ত্রী—যা কম্যুনিস্টদের থেকে অনেক আলাদা।"[১৮১]

ফেডারেশনের ব্যাপারে শুধু সুভাষের নয় নেহরু ও কংগ্রেস সোশ্যালিস্টদেবও ঘোর আপত্তি ছিল।[১৮২] গান্ধী পড়েছিলেন দোটানায়। এ বিষয়ে দক্ষিণপন্থীদের জেতাতে গেলে রাজ্য প্রতিনিধিদের নির্বাচন আদায করতে হবে। একমাত্র তা হলেই যুক্তবাষ্ট্রীয় সংসদে কংগ্রেস সদস্যরা সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করতে পারে।[১৮৩] অন্যদিকে বডলাটও পডেছিলেন দোটানায়। রাজাদের ওপর বেশি চাপ দিলে ফেডারেশনটাই ভেস্তে যাবে। জিন্না "could not support anything that would give a Hindu majority at the centre."[১৮৪]

কংগ্রেসের যাঁরা সর্বোচ্চ সংস্থায় মোটামুটি ফেডারেশনের পক্ষে ছিলেন তাঁদের মধ্যে গান্ধী, রাজাজি, প্যাটেল, আজাদ, বাজাজ, সরোজিনী নাইডু ও ভুলাভাই দেশাই-এর নাম করা যেতে পারে। নেহরু, অচ্যুত পটবর্ধন ও নরেন্দ্র দেব ছিলেন ঘোর বিরোধী। অক্টোবব (১৯৩৭)-এ কলকাতার এ আই সি সি-তে দেখি বসুও বিরোধী, তবে আগেকার চেয়ে সংযত। তারপর থেকে দক্ষিণপন্থীরা বলতে থাকেন, ফেডারেল সংসদে নির্বাচন বর্জন করলে কংগ্রেসের ক্ষতি হবে। তবে দরকষাকষিতে তাঁদের আপত্তি ছিল না। গান্ধী বিপক্ষে না হলেও রাজ্য প্রতিনিধিদের নির্বাচনের ওপর জোর দিচ্ছিলেন। বোম্বাই ওয়ার্কিং কমিটি (জানুয়ারি ১৯৩৮)-তে দেখি নেহরু তখনও বিরোধী এবং গান্ধী শর্তাধীনে রাজি। ওয়ার্ধায় (ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮) বর্তমান আকারে ফেডারেশন পরিকল্পনা বাতিল করা হয়। "Subhas

Bose advocated the strongest possible opposition to federation and even favoured civil disobedience if necessary." নেহরু তাঁকে সমর্থন করেন, কিন্তু দেশাই ও রাজাজি আলোচনার দরজা খুলে রাখতে বলেন। শেষে হরিপুরায় এক গোপন সভায় গান্ধী বলেন, কংগ্রেস গণআন্দোলনের জন্য প্রস্তুত নয় বলে তাঁর ওপর চার বছরের জন্য আস্থা রাখতে হবে—এমন কি তিনি যদি ফেডারেশন গ্রহণ করতেও বলেন। তবে প্রস্তাবে কিছু শর্তের কথা ছিল—যেমন (১) রাজ্যে দায়িত্ববান সরকার স্থাপন; (২) পূর্ণ নাগরিক অধিকার ; (৩) নির্বাচন প্রথা উদারতরকরণ ; (৪) রক্ষাকবচ নিয়ে পুনর্বিবেচনা ও (৫) ফেডারেল সরকারের হাতে আরও ক্ষমতা সমর্পণ।

দক্ষিণপন্থীরা আশা করছিল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি গুরুতর হওয়ায় ব্রিটেন শর্ত মেনে নেবে, ফেডারেশনে বাধা থাকবে না ; আর বামপন্থীরা ভাবছিল ব্রিটেন কোনওদিনও শর্ত মানবে না, তাই ফেডারেশনও হবে না। নেহরু, বসু ও নরেন্দ্র দেব তখনও প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে অটল।

॥ ৮ ॥

But if it be a sin to covet honour,
I am the most offending soul alive.
(Shakespeare, Henry V, IV, III, 28)

১৯৩৮-এর ১৯ ফেব্রুয়ারি হরিপুরায় সভাপতির ভাষণে সুভাষচন্দ্র স্বাধীনতার দাবিতে সক্রিয় প্রতিরোধের কথা তুললেন, যদিও তা হবে অহিংস। মন্ত্রিত্ব গ্রহণ একটা সাময়িক পদক্ষেপ। বৃহত্তর সমস্যা হল ফেডারেশন এবং তা ঠেকাতে আরো বড় আইন অমান্য আন্দোলন করতে হবে। স্বাধীনতার পর কি হবে তারও রূপরেখা দিলেন তিনি। আশ্চর্যের ব্যাপার, ভাবী স্বৈরতন্ত্রের প্রতিষেধকরূপে তিনি বহু দলের কথা বললেন, গণতান্ত্রিকভিত্তিও মেনে নিলেন। জাতীয় পরিকল্পনার ওপর জোর দিলেন তিনি। দেশের দারিদ্র্য দূর করতে ভূমিব্যবস্থার ব্যাপক সংস্কার, জমিদারী প্রথা বিলোপ, কৃষিঋণ মকুব, গ্রামীণ অর্থনীতি মজবুত করতে শস্তা মূলধনের ব্যবস্থা, সমবায় প্রথার বিস্তার, বৈজ্ঞানিক কৃষি দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি, শিল্পায়নের ওপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ, শিল্পায়নের মূলধন সংগ্রহার্থ দেশী-বিদেশী ঋণপ্রকল্প, এমনকি প্রয়োজনে মূল্যস্ফীতির কথাও উঠল। হরিপুরা ভাষণে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ একটা বড়ো সমস্যা বলে পরিগণিত হয়েছিল।

বৈদেশিক সম্পর্কের ব্যাপারে তিনি বললেন রাশিয়াকে অনুসরণ করতে, সাম্যবাদী হয়েও যা সুবিধার জন্য বিরোধী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে।

রাজন্যবর্গ প্রসঙ্গে তিনি বললেন, ইংরেজরা স্বৈরাচারী রাজা ও গণতান্ত্রিক ব্রিটিশ ভারতের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চাইছে বর্তমান ফেডারেল পরিকল্পনা দিয়ে। দেশীয় রাজ্যের জনগণের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি জানিয়ে তিনি বললেন, তাঁর মত অনেক কংগ্রেস সদস্য প্রজাদের সংগ্রামে অংশীদার হতে চান। সংখ্যালঘু সম্পর্কে তিনি কলকাতা এ আই সি সি (অক্টোবর ১৯৩৭)-এর প্রস্তাব পুনরায় বিশ্লেষণ করেন। তা ছাড়া করাচী কংগ্রেসের মৌল অধিকার ঘোষণার উল্লেখও করেন। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাকে ঐক্যবিরোধী, অগণতান্ত্রিক মনে করলেও পরিবর্তন আনতে হবে সবাইকার সম্মতি নিয়ে। "If it

(Congress) succeeds in executing its programme, the minority communities would be benefited as much as any other section of the Indian population." সোশ্যালিজম হলে তো বঞ্চিতদেরই বেশি লাভ।

ব্রিটেনের সঙ্গে সম্পর্ক সম্বন্ধে এখুনি সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়, তবে আয়র্ল্যান্ডের ডি ভ্যালেরার মত স্বাধীনতা পাবার পর সুসম্পর্ক বজায় রাখতে তাঁর আপত্তি ছিল না। স্বাধীনতার পর কংগ্রেসের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হোক এও তিনি চাইতেন না। "Only those who have won power can handle it properly." যারা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছে তারা ছাড়া কার আছে শক্তি, আত্মবিশ্বাস, আদর্শবাদ ? তারা কি পুনর্গঠনের দায়িত্ব এড়াতে পারে ? বহু দল থাকুক, আর কংগ্রেস দলের ভিত্তি হোক গণতান্ত্রিক : "unlike, for instance, the Nazi Party, which is based on the 'leader principle'." সংহতি রক্ষার জন্য এক ভাষার প্রয়োজন এবং তা হবে হিন্দি ও উর্দু মেশা, আর লিপি নাগরী বা উর্দু হতে পারে। তুরস্ক গিয়ে তাঁর যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তার ভিত্তিতে তিনি রোমক লিপি সমর্থন করেন।

কংগ্রেস আপাতত সাতটি প্রদেশে সরকার গঠন করেছে। তাঁর আপত্তি ছিল কিন্তু এখন কিছু করবার নেই। তবে আমলাদের চরিত্র ও গঠন বদলাতে না পারলে কংগ্রেসের সর্বনাশ হবে। তিনি সমরোত্তর জার্মেনীর সোশ্যাল-ডোমোক্র্যাটিক পার্টি ও ব্রিটেনের লেবার পার্টির পরিণাম দেখে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। দ্বিতীয়ত কংগ্রেসী মন্ত্রীরা একত্র হয়ে পুনর্গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করুক। কেন্দ্রীয় কংগ্রেস অভিজ্ঞ লোকদের পরামর্শ নিয়ে তাঁদের দিক। এ ব্যাপারে ওয়ার্কিং কমিটিকে নেতৃত্ব দিতেই হবে। না দিলে তা শৃঙ্খলারক্ষা করতেও পারবে না। ওয়ার্কিং কমিটি হল ভাবী স্বাধীন ভারতের shadow cabinet, যেমন ছিল ডি ভ্যালেরার রিপাবলিকান সরকার।

ফেডারেশন ব্যাপারে তিনি কংগ্রেসকে ওয়ার্ধা ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব (৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮) সম্বন্ধে অবহিত করলেন। যতদিন না ফেডারেশনে যোগদানকারী দেশীয় রাজ্যসমূহে ব্রিটিশ ভারতের মত প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান, দায়িত্ববান সরকার, নাগরিক অধিকার ইত্যাদি স্থাপিত হচ্ছে ততদিন ফেডারেশন সার্থক হতে পারে না। এ অবস্থায় ফেডারেশন চালু হলে বিভেদকামী শক্তির জয় হবে, ভেতরে বাইরে সংঘর্ষ বাঁধবে। যদি সে চেষ্টা হয় প্রাদেশিক সরকার সর্বপ্রকারে বাধা দেবে, আর এ আই সি সি প্রয়োজনমাফিক নীতি গ্রহণ করবে। দ্বিতীয়ত ফেডারেশনের আর একটা মন্দ দিক—প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক ব্যাপারে জনগণের কোন কর্তৃত্ব নেই। এই দুই খাতে ব্যয় তাদের এক্তিয়ারভুক্ত নয়। বড়লাট ফেডারেল সরকারের সংরক্ষিত অংশে যে ব্যয়নিয়ন্ত্রণ করবেন তা বাজেটের ৮০ শতাংশ। তা ছাড়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও ফেডারেল রেলওয়ে অথরিটি হবে স্বয়ংশাসিত। দেশের প্রতিনিধিরা ঠিক করতে পারবে না কি হবে মুদ্রা ও বিনিময় নীতি, যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে অতি গুরুত্বপূর্ণ। বিদেশের সঙ্গে যে সব বাণিজ্যচুক্তি হবে তাও সংসদের এলাকায় পড়বে না। অথচ জার্মেনী, চেকোস্লোভাকিয়া আমেরিকার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি অত্যাবশ্যক। বাণিজ্যিক রক্ষাকবচের অন্যতম উদ্দেশ্য হল ব্রিটিশ পণ্যের ওপর অত্যধিক শুল্ক বসানো বন্ধ করা। এক্ষেত্রে বড়লাটের ভিটো মেনে নেওয়া আত্মহত্যার শামিল।

দলীয় সংগঠনের ব্যাপারে কিছু কথা তিনি বলেছিলেন যার মূল্য আজও সকলে বুঝেছে মনে হয় না। তিনি চেয়েছিলেন শিক্ষিত অফিসারের অধীনে এক সুশৃঙ্খল স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী আর রাজনৈতিক কর্মীদের জন্য বিশেষ শিক্ষাক্রম, যা ব্রিটেন ও ফাসিস্ত দেশে

সুপরিচিত। দলে প্রতিভাবান কর্মীর প্রয়োজন। নাৎসীদের লেবার সার্ভিস কোরের (corps) মত কিছু করাও দরকার। উপরন্তু যাঁরা ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ও কিষাণসভার মত ফ্রন্টের বিরোধী সুভাষ তাঁদেব আপত্তি অগ্রাহ্য করেছিলেন। তবে অবশ্যই তাদের কংগ্রেস আদর্শে উদ্বুদ্ধ ও কাজে অনুপ্রাণিত করতে হবে। তার জন্য কংগ্রেস কর্মীদের ট্রেড ইউনিয়নে যোগ দিতে হবে। ট্রেড ইউনিয়ন ও কিষাণসভা বিশেষ করে অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে কাজ করবে কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলনে কংগ্রেস হবে তাঁদের মূল কেন্দ্রীয় সংস্থা। তবে শ্রমিক ও কৃষক সংগঠনগুলিকে কংগ্রেসে সামূহিক যোগদান (collective affiliation) দিতে হবে বলে বামপন্থীরা যে দাবি তুলেছে সে বিষয়ে মতভেদ থাকতে পারে। ব্রিটেনেও ট্রেডস ইউনিযন কংগ্রেস লেবার পার্টির ওপর প্রভাব ফেলেছে। ভারতবর্ষে যদি তাদেব সামূহিক যোগদানের অধিকার দেওয়া হয় তবে কি ধরনের প্রভাব তারা ফেলছে সে বিষয়ে সতর্ক হতে হবে। তিনি স্বীকার করেন ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার জন্য এসব সংস্থাব কর্তব্য কংগ্রেসেব নীতি ও পদ্ধতি মেনে নেওযা। কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি সমর্থন করেন তিনি। তবে এ ধরনের দলের ভূমিকা হবে কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী উপদলেব। সোশ্যালিজমেব সমস্যা এখন অগ্রাধিকাব না পেতে পারে কিন্তু সমাজতান্ত্রিক প্রচারেব জন্য এমন উপদল প্রয়োজন।

বৈদেশিক নীতিব ব্যাপারে তিনি স্পষ্টই বলেন— "We should not be influenced by the internal politics of any country or the form of its state...In this matter we should take a leaf out of Soviet diplomacy." বাশিযা সাম্যবাদী কিন্তু কোনও দেশের সমর্থন বা সাহায্য উপেক্ষা কবেনি। অতএব কংগ্রেসের উচিত প্রতি দেশে ভাবতানুবাগী এক একটি ক্ষুদ্র কেন্দ্র গঠন, যার মাধ্যমে ভারতের দাবি প্রচাব চলবে। ব্যক্তিগত যোগাযোগ এ ব্যাপারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ ব্যাপারে তিনি চেম্বাব অব কমার্স, আন্তর্জাতিক সম্মেলন, বিদেশে পাঠবত ছাত্রছাত্রীব সাহায্য ও ফিল্মেব মাধ্যম ব্যবহার করতে বলেছিলেন। ব্রিটেনকেও বাদ দেওয়া উচিত নয। আব ব্রহ্ম, সিংহলের মত প্রতিবেশী দেশগুলিকে তো অগ্রাধিকার দিতেই হবে।

তিনি ভাষণ শেষ করেন এক অপ্রীতিকর কিন্তু বাস্তব সত্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। কংগ্রেসের মধ্যে ডান ও বাম পক্ষ দেখা দিয়েছে। তাঁদের মধ্যে নানা বিবোধ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বাইরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চ্যালেঞ্জ। কিন্তু ভুললে চলবে না ডান, বাম সকলের পক্ষেই— সব সাম্রাজ্যবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামীর একমাত্র সঙ্গমস্থল—কংগ্রেস। "I would appeal specially to the Leftist group in the country to pool all their strength and their resources for democratizing the Congress and reorganizing it on the broadest anti-imperialist basis. I am greatly encouraged by the attitude of the British Communist Party..."

বলা বাহুল্য, হরিপুরা ভাষণের এই দীর্ঘ বিবরণ দিলাম কয়েকটি কথা তুলে ধরার জন্য। প্রথমত, কোনও কোনও ক্ষেত্রে নাৎসী জার্মেনীর কথা তুললেও মূলত তিনি সাম্যবাদী আদর্শের দিকে ঝুঁকেছেন। 'ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল'-এর অপরিণত চিন্তাভাবনা ইউরোপে কয়েক বছর (১৯৩৪-৩৮) কাটাবার ফলে অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। বারবার রাশিয়ার উল্লেখ, এমনকি শেষ উদ্ধৃতিতে সি পি জি বি-র উল্লেখ, ট্রেড ইউনিয়ন, কিষাণসভা, সাম্যবাদী

দলগুলির কংগ্রেসে সামূহিক যোগদানে সম্মতি, কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির প্রকাশ্য সমর্থন, সকল বামপন্থী শক্তিকে কংগ্রেসে যোগ দিয়ে তাকে আরও গণতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী করার আহ্বান, সবই যেন এক রাগিণীর বিচিত্র বিস্তার। বস্তুত জওহরলাল নেহরুর লখনউ কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণ (১৯৩৬) ও সুভাষ বসুর হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণ (১৯৩৮) তুলনা করলে দ্বিতীয়টাকেই বেশি স্পষ্টভাবে বামপন্থী বলতে হবে। দ্বিতীয়ত, পুনর্গঠনের জন্য প্ল্যানিং কমিশনের গুরুত্ব নিয়ে এমন গভীর ভাবনা আগে শোনা যায়নি। এখানেও রাশিয়ার গস্ প্ল্যানের প্রভাব। এসব গান্ধী বা বিড়লা কাউকে খুশি করতে পারে না। তৃতীয়ত, কংগ্রেস দলকে ভবিষ্যৎ গণআন্দোলনের জন্য সুগঠিত করতে তাঁর নানা প্রস্তাব শুধু বাস্তব নয়, তখুনি কার্যকর করা দরকার ছিল। ১৯৩৪-এ গান্ধী পুনর্গঠনের কাজ শুরু করেছিলেন, ১৯৩৮-এ সুভাষ তাতে দাঁড়ি টানলেন। চতুর্থত, এ ভাষণে শাসনসংস্কার বিরোধিতা নেহরুর প্রতিধ্বনি হতে পারে, ফেডারেশন বিরোধিতা অনেক বেশি স্পষ্ট ও তার কারণগুলি নিপুণ ভাবে বিশ্লেষিত।[১৮৬]

কিন্তু এ সবের জন্যই ভাষণটি দক্ষিণপন্থীদের কর্ণে মধু বর্ষণ করল না। হরিপুরার শোধ তারা ত্রিপুরীতে নিল।

সংঘবদ্ধ কৃষক-মজদুর শ্রেণীর সঙ্গে কংগ্রেসের জোট বাঁধার কথা হরিপুরাতে প্রথম ওঠেনি, ফৈজপুর কংগ্রেসে (১৯৩৭) নেহরু সে আহ্বান জানিয়েছিলেন। তার অন্যতম কারণ, কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির শক্তিবৃদ্ধি ও বেআইনী ঘোষিত হবার পর কম্যুনিস্ট পার্টির বহু সভ্যের কংগ্রেস প্রতিনিধিরূপে যোগদান। দিল্লী এ আই সি সি (১৭-১৮ মার্চ ১৯৩৭)-তে জয়প্রকাশ নারায়ণ সরকাব গঠন-সম্পর্কিত প্রস্তাবেব এক সংশোধনী এনে বলেন, কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা সাম্রাজ্যবাদের আওতায় শোষিত জনগণের জন্য কোনও সুবিধা আনতে পারবে না। এই প্রসেঙ্গ দক্ষিণপন্থী (সত্যমূর্তি, রাজাজি, দৌলতরাম, ভুলাভাই প্যাটেল) ও বামপন্থী (সহজানন্দ সরস্বতী, কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, অচ্যুত পটবর্ধন, মিনু মাসানি ও নরেন্দ্র দেব)-দের মধ্যে তুমুল বিতর্ক হয। নেহরু মূল প্রস্তাবেব বিরোধী ছিলেন কিন্তু আপন মত প্রকাশ করেননি। বামপন্থীরা ১২৭-৭০ ভোটে পরাজিত হলেও তাদের ক্রমবর্ধমান শক্তি দক্ষিণপন্থীদের সতর্ক করে।

সমাজতন্ত্রীরা তখন কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাব মাধ্যমে কৃষক-শ্রমিক শ্রেণীর উন্নতিব জন্য সচেষ্ট হয়। বহু কৃষক সমিতিও শ্রমিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা তার প্রমাণ। ১৯৩৮-এ সহজানন্দ মানবেন্দ্রনাথ রায়কে লিখেছিলেন, জাতীয় কংগ্রেসকে "স্বাধীনতা সংগ্রামের কার্যকর হাতিয়ার" করতে কিষাণ ও মজদুরদের শ্রেণীসংগঠন আবশ্যক এবং তাদের দৈনন্দিন সমস্যা নিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে তাদের শ্রেণীসচেতন করা উচিত। লক্ষ লক্ষ শ্রেণীসচেতন কিষাণ ও মজদুর যদি কংগ্রেসের সদস্য হয় তবে কংগ্রেসেব চরিত্র বদল যাবে।[১৮৭]

বলা বাহুল্য, এ ধরনের মনোভাব বিড়লা[১৮৮] ও গান্ধীর[১৮৯] ভালো লাগেনি। বোম্বাই সরকারের ট্রেডস্ ডিসপ্যুটস অ্যাক্ট-এর কথা আগেই বলেছি। আবশ্যিক সালিসী ও বেআইনী ধর্মঘটের জন্য ছ'মাসের জেল বা ট্রেড য়ুনিয়ন সম্পর্কিত বিধান শ্রমিকরা পছন্দ করেনি। ১৯৩৮-এর ৬ নভেম্বর ডাঙ্গে, ইন্দুলাল যাজ্ঞিক ও আম্বেদকর বোম্বাই-এর বিশাল শ্রমিক সমাবেশে এ আইনের তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং পরের দিন ধর্মঘট হয়। পুলিশ গুলি চালায় ও একজন নিহত হয়। বিহারে জমিদাররা আইন অমান্যের ভয় দেখালে আজাদ এবং রাজেন্দ্র প্রসাদ পাটনায় তাদের সঙ্গে এক গোপন সমঝোতায় আসেন। উত্তরে সহজানন্দের কিষাণসভা আন্দোলন শুরু করে। তারা ১৯৩৮/৩৯-এর খাজনা দেওয়া বন্ধ

করে ও আওয়াজ তোলে "লগা লেগে কৈসে ডান্ডা হামারা জিন্দাবাদ।" চম্পারন, সারণ ও মুঙ্গেরের কংগ্রেস কমিটি কংগ্রেস সদস্যদের সহজানন্দের সভায় যোগ দিতে বাবণ করেন। এর ফলে জয়প্রকাশ ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। কংগ্রেসে থেকে হিংসার প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য সহজানন্দকে বহিষ্কৃত করা হয়েছিল।[১৯০]

ফেডারেশন নিয়েও দক্ষিণপন্থী-বামপন্থীদের বিরোধ বেধেছিল। যদিও কলকাতা এ আই সি সি (অক্টোবর ১৯৩৭) প্রাদেশিক সরকাবদেব ফেডারেশন চালু কবার অপচেষ্টা প্রতিহত করতে বলে, তবু মাসানি, জয়প্রকাশ, রঙ্গা-দের সন্দেহ যায়নি। তাঁরা ফেডাবেশনেব বিরুদ্ধে প্রকাশ্য আন্দোলন চেয়েছিলেন কিন্তু দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পাবেননি।

সুভাষ হরিপুরা ভাষণে এই বামপন্থী মনোভাবের প্রবক্তা হলেন। তাঁব সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কর্মসূচি, ফেডারেশনেব ওপব কঠোর শর্তাবোপ, প্রজা আন্দোলন সমর্থন, বৃহত্তর আইন অমান্য আন্দোলনের হুমকি এ দলেব রাজনৈতিক সমর্থন আদায় কবতে সমর্থ হয়েছিল। হরিপুরাব পর এক গোপন সভায় গান্ধীকে ফেডাবেশন গ্রহণেব কয়েকটি কঠোব পূর্ব শর্ত দিতে হয়। বসুও তখুনি বাজাদেব সঙ্গে কলহে প্রস্তুত ছিলেন না। ভুলাভাই দেশাই-এব মত উদ্ধৃত করে বড়লাট জানাচ্ছেন যে, দক্ষিণপন্থীবা আশা কবছিলেন সময়ে বাজারা উদারপন্থা নেবেন। সত্যমূর্তি তাঁকে জানান, মহীশূবেব মত বড দেশীয বাজ্য যদি গণতান্ত্রিক সংস্কারেব দিকে পদক্ষেপ নেন, তাতে গান্ধীর হাত শক্ত হবে। গান্ধীব সঙ্গে বডলাটের দেখা হয় ১৫ এপ্রিল ১৯৩৮। গান্ধীর স্বভাব অনুযায়ী প্রথমেই তিনি বন্দীমুক্তির কথা তোলেন। আমবা জানতে পারি যে বাংলাব বিপ্লববাদী বন্দী বিশেষত মহিলা বন্দী মুক্তিব জন্য তিনি অনুবোধ করেছিলেন এবং সুভাষ ও শরৎ বসুব কথায় বিশ্বাস কবে বলেছিলেন, অনুশীলন ও যুগান্তব দলের মুক্ত বন্দীবা কেউই সন্ত্রাসবাদেব পথ নেযনি। বডলাট বলেন, এটা ছোটলাট ব্রেবোর্নেব এক্তিয়াব, তবে যতটা কবা যায় কবা হবে। শাসনসংস্কার প্রসঙ্গে গান্ধী বলেন, এটা ভাঙাই তাঁর অভিলাষ ("his ambition was to break the Act.")। তবে এব ব্যাপক সংশোধন বা বর্জন ব্রিটিশ সরকারকে দিয়ে পাস কবানোব মত চাপ দেবার শক্তি আপাতত জাতীযতাবাদীদের হাতে নেই। সরকার যদি কংগ্রেসকে একমাত্র বিরোধী শক্তি বলে স্বীকাব না কবে বা দেশীয রাজন্যবর্গকে গণতান্ত্রিক উপায়ে প্রতিনিধি নির্বাচন করতে বাধ্য না করে তাহলে বুঝতে হবে তাবা ভারতীযদেব পূর্ণ সার্বভৌমত্বেব দাবি মানতে নারাজ। কংগ্রেসের দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে নীতি হবে—"to influence some of the Rulers of leading states as to persuade them of their own volition to move as soon as possible in the desired direction." বডলাট যখন বললেন, "এতে অনেক অসুবিধা, অনেক সময লাগবে, তখন "He (গান্ধী) murmured something about putting up with second best in a Federation of British India till the bigger thing was ripe..." কিন্তু এতেও তাঁর ঠিক সায ছিল না। বডলাট বোঝালেন, দেশীয় রাজ্যে নির্বাচনপ্রথা প্রবর্তিত হলে মুসলমানরা প্রতিনিধিত্ব দাবি করবে, অর্থাৎ সাম্প্রদায়িকতা সেখানেও ছড়াবে। গান্ধী নীরব রইলেন। প্রতিবক্ষা ও বৈদেশিক দফতরের ব্যাপারে বডলাট বললেন, তিনি নিশ্চয়ই মন্ত্রীদের সঙ্গে নিয়ে চলবেন।[১৯১]

গান্ধীর সঙ্গে কথা বলার পর লিনলিথগো ছোটলাটদের এক সার্কুলার পাঠান, তাতে বলা হয়েছে, আগে কংগ্রেসের মত ছিল ফেডারেশন সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত ও অগ্রহণীয় কিন্তু "the movement is now, at any rate in the Right wing, more in the

direction of accepting Federation subject to bargaining over terms and possibly some modification of the scheme."[১৯২]

দক্ষিণপন্থীরা যে নীতি নিয়েছিলেন, তা হল প্রজা আন্দোলনের মাধ্যমে রাজন্যবর্গকে ভয় দেখিয়ে আপন শর্তে ফেডারেশনের শামিল তথা সংসদে কংগ্রেসেব সমর্থন করান। মহীশূরে গুলি চললে গান্ধী জানান, শুধু ক্ষতিপূরণ দিলে হবে না, "একমাত্র প্রতিকার জনসাধারণকে দাযিত্বভার অর্পণ।" প্যাটেল একমত ছিলেন। ১৯৩৮-এর সেপ্টেম্বরে কাশ্মীর, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি রাজ্যে প্রজা আন্দোলন জোবদাব হয়। কাশ্মীরে শেখ আবদুল্লার নেতত্বে হিন্দু ও মুসলিমদেব এক জাতীয় দল গঠিত হয এবং দরবারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। ত্রিবাঙ্কুরে গুলি ও লাঠি চলে। উড়িষ্যাব নীলগিরিতে একই ধরনের গোলমালের পেছনে ছিল কংগ্রেস। রাজাদের প্রতিবাদে উডিষ্যা মন্ত্রিসভা গুরুত্ব দেয়নি।[১৯৩] নভেম্বরে ঢেঙ্কানলে, নন্দগাঁও ও রাজকোট রাজ্যে প্রজা আন্দোলন পেকে ওঠে। বড়লাটও তাদের দোষ দিতে পারেননি।

বসুর প্রতিক্রিয়া (অন্তত জানুযাবিতে ভাবতসচিবের সঙ্গে কথায) প্রথমে খুব তফাৎ ছিল না, কিন্তু পববর্তীকালে তা কঠোরতর হয়। তিনি ফেডারেশনেব দুটো মহৎ দোষ দেখেছিলেন— '১) প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক দফতব এবং সে বাবদ অর্থবরাদ্দ ভাবতীয় নিয়ন্ত্রণেব বাইবে থাকবে ; (২) রাজন্যবর্গকে বড বেশি প্রতিনিধি পাঠাতে বলা হয়েছে। তাতে প্রতিক্রিয়াই জোবদাব হবে। জুলাই-এর শেষে ওযার্ধায যে ওযার্কিং কমিটিব বৈঠক বসে তাতে বসু ফেডারেশন প্রসঙ্গ তুললে অনেকে বিরক্ত হন। তাঁদেব আশা ছিল গান্ধী বড়লাটের সঙ্গে ১৫ এপ্রিলেব সাক্ষাৎকারে যে-সব শর্তের কথা তুলেছেন তা নিয়ে ব্রিটিশ সবকাব আলোচনা কবছেন। তাঁরা ধরেই নিয়েছিলেন যে বক্ষাকবচ ও বিশেষ দায়িত্বের ব্যাপারগুলো কংগ্রেস নীতি কার্যকর কবার পথে বাধা হবে না। অস্থায়ী বড়লাট ব্রেবোর্ন অবশ্য বুঝতে পারেননি এ নিযে দক্ষিণপন্থীরা কতদূব যাবেন।[১৯৪] সীতারামায়া তখন ওযার্কিং কমিটির সদস্য। তিনি লিখছেন, বসুও ফেডারেশন নিয়ে কোনও জেদাজেদি করেননি। অনেক ব্যাপারে ডান ও বামেব মতদ্বৈধ থাকলেও বসু "did not project them (his own opinions) into discussions, and appeared to be singularly free from a desire to take side....It was all smooth sailing."[১৯৫]

ইউরোপীয় সংকট ভাবতে তার কালো ছাযা ফেলল। ম্যুনিখের পর নেহরু ও বসু—এই দুজন অন্তত বুঝেছিলেন মহাসমর আসন্ন। ফাসিজমের ঘোর বিরোধী ও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী নেহরুর দোটানা লক্ষ্য করা যায়। চেম্বারলেন ও দালাদিয়েরের তোষণনীতি তিনি পছন্দ করেননি কিন্তু জার্মেনী ও ইতালীর সঙ্গে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে ভারতবর্ষ কোন নীতি নেবে তা নিয়ে মানসিক সংকটে পড়েছিলেন। তবু তিনি যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে স্বাধীনতার জন্য চাপ দিতে চান। সুভাষ বসু তো এ-জন্য ব্যাপক গণআন্দোলন দাবি করলেন। অন্য দিকে বিড়লা চান কংগ্রেস যুদ্ধের উদ্যোগে আপত্তি করবে না বা বাধা দেবে না। সি পি-র ডি পি মিশ্র নাকি ছোটলাটকে জানান যে, গান্ধীকে ডিক্টেটরের ক্ষমতা দেওয়া হবে এই সুযোগে নানা সুবিধা (বিশেষ করে ফেডারেশনের ব্যাপারে) আদায় করবার জন্য। "Gandhi may not permit active cooperation but active non-cooperation was unlikely."[১৯৬]

ব্রেবোর্ন কেন এরকম আশা করছিলেন বোঝা যায় না। গোয়েন্দা দফতরের রিপোর্ট

অনুসারে গান্ধী কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা ও প্রাদেশিক কংগ্রেস দলগুলির কার্যকলাপে বিরক্ত ছিলেন। তারা ছোটলাট ও ব্রিটিশ আমলাদের পাল্লায় পড়ে কংগ্রেস হাইকমান্ডের নির্দেশ শুনছে না। প্রাদেশিক দলগুলির মধ্যেও নানা বাদবিসম্বাদ শুরু হয়েছে। তারা নির্বাচনী শর্তকে কতটুকুই বা পালন করতে পারছে? অহিংসা নীতি ভুলে "Ordinary cut-and-thrust of political war-fare"-এ মেতে গেছে। এরকম ভাবে মন্ত্রিত্ব আঁকড়ে থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল।[১৯৭] লিনলিথগো ফিরে এসে দেখেন লুমলি যদি গুজরাট ভূমি প্রত্যর্পণ বিলে সম্মতি না দেন খের পদত্যাগ করবেন এবং গান্ধী সেই সুযোগে সমস্ত কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে নির্দেশ দেবেন।[১৯৮] ১৯৩৮-এর শেষে বসু, নেহরু ও গান্ধী বিভিন্ন কারণে কংগ্রেসী সহাযতার প্রহসন বন্ধ করতে চাইছিলেন বলেই মনে হয়। তবে কোন ইস্যুতে এবং কি পদ্ধতিতে কংগ্রেস বেরিয়ে আসবে তা নিয়ে মতভেদ ছিল। গান্ধী চিরদিন যে ভূমিকা পালন করেছেন—দক্ষিণ ও বামপন্থীদের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষকের ভূমিকা, সরকারের কাছে কংগ্রেসের অনন্য মুখপাত্রের ভূমিকা—তাই পালন করছিলেন।

ইতিমধ্যে ভিন্ন কারণে লীগও ফেডারেশনে আপত্তি জানিয়েছিল। আবার উঠেছিল পাকিস্তানের কথা। প্রথমে কেমব্রিজের ছাত্র রহমৎ আলির কাছ থেকে এসেছিল আটটি মুসলিম প্রদেশ (?) নিয়ে পাকিস্তান কমনওয়েলথ অব নেশনস গঠনের প্রস্তাব। দ্বিতীয়বার কথাটা তোলেন ইক্‌বাল ১৯৩৭ সালে। জিন্না কান দেননি। তৃতীয়বার তোলেন সিকান্দার হায়াত খাঁ বড়লাট লিনলিথগোর সঙ্গে ১৯৩৮, ১ জুনের সাক্ষাৎকারে। "...Sikander's scheme includes a proposal for the partitioning of India with six or seven regional groups one of which would be in effect the famous Pakistan, with a highly complicated system of central representation, frankly designed to prevent a Hindu majority in the all-India legislature. Sikander's principal motive was clearly to put off Federation..."[১৯৯] নভেম্বরের শেষেও লীগ এক কথা বলছিল। বড়লাটের মনে হয় কংগ্রেস এখুনি ফেডারেশন গ্রহণ না করে, পূর্বশর্তরূপে দেশীয় রাজ্যে গণতান্ত্রিক নির্বাচন চেয়ে ভুল করছে। লীগ তো পিছিয়ে যেতে চাইছেই, রাজারাও উত্যক্ত হচ্ছেন। প্যাটেল নিজের মেয়েকে রাজকোট সত্যাগ্রহে নেতৃত্ব দিয়ে পাঠাচ্ছেন এবং বলছেন রেসিডেন্টের বা পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্টের রাজাকে সাহায্যদানের এক্তিয়ার নেই।[২০০]

হরিপুরা কংগ্রেসের সুস্পষ্ট প্রস্তাব সত্ত্বেও কেন এই দেশীয় রাজ্যের ওপর হামলা? কেন গান্ধীর মত লোকও মহীশূরে বার্তা পাঠাচ্ছেন যে দেশীয় রাজ্যে এখুনি দায়িত্ববান সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে? আসলে ফেডারেল সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে গেলে (৯০ থেকে ১০০-র বেশি আসন কংগ্রেস পাবে না) কংগ্রেসকে নির্ভর করতে হবে দেশীয় প্রতিনিধিদের ওপর। প্রজা আন্দোলনের উদ্দেশ্যে—রাজাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে তাদের নির্বাচননীতি নিতে বাধ্য করা। নেহরুকে এজন্যই করা হয়েছিল দেশীয় রাজ্য প্রজা সংগঠনের সভাপতি। গান্ধী অ্যাগাথা হ্যারিসনের মাধ্যমে বড়লাটকে অনুরোধ করেছিলেন, "He did not desire the Viceroy's intervention, but only his restraint."[২০১] অর্থাৎ তিনি যেন রাজ্যে পুলিশ বা সৈন্য না পাঠান। ১৪ ডিসেম্বর বিড়লার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বড়লাট প্রশ্ন করেন, "মিঃ গান্ধী কি ফেডারেশন চান?" বিড়লার উত্তর—"হ্যাঁ, তিনি চান।" পরে অবশ্য বিড়লা বড়লাটের ব্যক্তিগত সচিবকে বলেছিলেন, "চান, তবে

সর্বজনবিদিত শর্তে।"[২০২] ২৩ ডিসেম্বর এক চিঠিতে গান্ধী চেয়েছিলেন রাজাদের সঙ্গে কংগ্রেসের সরাসরি আলোচনা।

অতএব তলায় তলায় দক্ষিণপন্থীদের ও গান্ধীব সঙ্গে ফেডাবেশন নিয়ে সবকারের সমঝোতা হচ্ছিল এ আশঙ্কা অমূলক। অন্যদিকে গান্ধী নাকি বাংলায় হক ও কংগ্রেসের কোয়ালিশন চাইছিলেন এবং বসু ভ্রাতৃদ্বয় বাজি হলে সুভাষকে দ্বিতীযবারেব জন্য সভাপতি করবেন আভাস দিয়েছিলেন—নাজিমুদ্দিনের এই কথা পুবো বিশ্বাসযোগ্য না হলেও (বড়লাট মন্তব্য কবছেন, "I take this with a grain of salt!")[২০৩]-এব পেছনে কিছু সত্য ছিল। ১৯৩৮-এব আগস্টে হক খুব বিপদে পড়েছিলেন। বাজস্বনীতি নিয়ে মতবিরোধেব ফলে তমিজুদ্দিন খান মন্ত্রিসভা ছেড়ে যান (১১ মার্চ ১৯৩৮) এবং ১৭ জন অনুগামী নিয়ে ইনডেপেন্ডেন্ট প্রজা পার্টি গঠন কবেন। এব আগেই কৃষক প্রজা পার্টির ১৭ জন সদস্য বেবিয়ে গিয়েছিল। এবপর বাধল নৌসের আলির সঙ্গে কলহ। নৌসেব আলিকে বাদ দিয়ে জুনে যে মন্ত্রিসভা গঠিত হল তা পুবোপুবি লীগেব কবজায। কিন্তু অন্যদিকে সম্পূর্ণ ইউরোপীয় সদস্যেব কৃপানির্ভব। ১৯৩৮-এর আগস্টে কংগ্রেস ও বিদ্রোহী কৃষক প্রজা দল মিলে মন্ত্রী শ্রীশচন্দ্র নন্দীব বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছিল। সবকারেব পক্ষে পডল ৯২ কোয়ালিশন সদস্য (মুখ্যত লীগ), ৯ তফসিলী, ৪ ন্যাশনালিস্ট, ২ অ্যাংলো ইন্ডিযান ও ২৩ ইউবোপীয সদস্যের মোট ১৩০ ভোট। বিপক্ষে ১১১ ভোট। বোঝা গেল ২৩ জন ইউবোপীয মন্ত্রিসভাকে বাঁচিয়েছে। সেদিন সুবার্বর্দি লক্ষাধিক মুসলিম অনুগামী দিযে বিধানসভা ঘেবাও কবে ভবিষ্যতেব বাজনীতি কোন দিকে চলবে তাব অশুভ সংকেত জানালেন। যাই হোক, নভেম্ববে তমিজুদ্দিন খান সামসুদ্দিন আহমদকে মন্ত্রিসভায় নিয়ে হক অবস্থাব সামাল দেন। আবাব সংকট দেখা দিল নলিনীবঞ্জন সবকাবকে মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দেবার জন্য কংগ্রেসেব চাপ সৃষ্টিতে। সুভাষ লিখছেন ৯ ডিসেম্বব সবকাব তাঁকে কথা দিয়েছেন বাজেট অধিবেশনের আগে পদত্যাগ কববেন।

গান্ধীকে লেখা সুভাষচন্দ্রেব ২১ ডিসেম্বরেব চিঠি পডলে মনে হয় কংগ্রেস ও হক দলেব কোযালিশনে গান্ধীব আপত্তি ছিল না। অসমে তো গোপীনাথ বড়দলই-এব নেতৃত্বে কোযালিশন গঠিত হযেছে—বাংলায নয কেন? কিন্তু নীবদ সি চৌধুবী গান্ধী-বসু পত্রালাপেব ভিত্তিতে দেখাচ্ছেন, নলিনী সবকাব, আজাদ ও বিডলা বাগডা দিলে গান্ধী মত প্রত্যাহার করেন। সুভাষবাবু ঐ চিঠিতে লিখছেন, আজাদেব মতে মুসলিম সংখ্যাগবিষ্ঠ প্রদেশ—বাংলায, পঞ্জাবে ও সিন্ধুতে—মুসলিম মন্ত্রিসভা ফেলা ঠিক হবে না। অথচ বসু তাই কবতে চেয়েছিলেন। এতে সফল হলে কংগ্রেস ১১টি মন্ত্রিসভা নিযন্ত্রণ কববে এবং হিন্দু-মুসলিমদেব বৃহত্তর সমঝোতা না হলেও কংগ্রেসই ব্রিটিশ ভাবতেব মুখপাত্র হবে। আবার সেই জোরে ত্রিপুরীতে পূর্ণ স্বরাজেব দাবি কবতে পাববে। আন্তর্জাতিক পবিস্থিতিতে এ দাবি অগ্রাহ্য কবা সহজ হবে না। আব করলেও বৃহত্তব জনমতের শক্তিতে বলীয়ান হযে কংগ্রেস ব্যাপকতর সত্যাগ্রহ শুরু কবতে পাববে।[২০৪] ব্যাপাবটা কিন্তু অত সহজ ছিল না। বাংলায় হয়তো একটা বিকল্প সবকাব গডা যেত আব গান্ধী তাতে আপত্তি কবেননি। ২২ ডিসেম্বর লিখছেন, "I still hold the opinion that if we can form a coalition ministry with honour and dignity we shall unhesitatingly do so." কিন্তু পঞ্জাবে গডা যেত না। আব সিন্ধুতে সেই কোয়ালিশন ক'দিন টিকত বলা যায না। বসুব চিঠিব ভিত্তিতে চৌধুবী ও তাঁর ভিত্তিতে লেনার্ড গর্ডন ইতিহাসেব সরলীকবণ করেছেন বড় বেশি। তবে আজাদ যদি বাংলায কোয়ালিশন গড়ায় বিবোধিতা করে থাকেন, অন্যায

করেছেন। বিড়লা যে কারণে আপত্তি জানিয়েছিলেন বলে চৌধুরীর অনুমান তা কিন্তু ভ্রান্ত। লীগের পক্ষপুটে তিনি বেশি নিরাপদ এমন ধারণা বিড়লার মত ঝানু ব্যবসায়ীর হতে পারে না।

অবশ্যই ১৯৩৯-এর জানুয়ারিতে সুভাষ গান্ধীর ওপর রেগে ছিলেন। বহুদিনের নীতিগত বিরোধ, স্বভাবের অমিল, সাম্প্রতিক তিক্ততায় (কোয়ালিশন নিয়ে) ইন্ধন যুগিয়েছিল বামপন্থী চাপ। ছোটলাট ব্রেবোর্ন জানাচ্ছেন, গত নয় মাসে অন্তত ছ হাজার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জলুস বেরিয়েছে যার পেছনে রয়েছে কম্যুনিস্টরা।[২০৫] ছাত্র ফেডারেশনের বন্দীমুক্তি আন্দোলন, বর্ধমানে ক্যানেল-কর নিয়ে হরেকৃষ্ণ কোনার, আসানসোলে শ্রমিক আন্দোলন নিয়ে বিনয় চৌধুরী, কলকাতায় প্রমোদ দাশগুপ্ত, ভবানী সেন, সোমনাথ লাহিড়ী প্রভৃতির কাজ উল্লেখযোগ্য। সুভাষ পুনরায় সভাপতি পদে প্রার্থী হলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমরা যেন সুরাটের পুনরভিনয় দেখতে ফিরে গেলাম। বসুর পক্ষে এ বাসনা গঠনতন্ত্র বা গণতন্ত্রবিরোধী ছিল না। নেহরু যদি ১৯৩৬ ও ১৯৩৭-এ পর পর সভাপতি হতে পারেন, তবে তিনিই বা পারবেন না কেন? গান্ধী নেহরুর নাম করলেন। তিনি আজাদের নাম করে সরে গেলেন। গোলমাল এড়াতে আজাদ পট্টভি সীতারামায়াকে এগিয়ে দিলেন। গান্ধী ও ওয়ার্কিং কমিটি এ ব্যবস্থা সবচেয়ে নিরাপদ মনে করে সমর্থন করলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে বহু প্রাদেশিক কমিটি সুভাষবাবুকে মনোনয়ন দিয়েছেন। তিনি ২১ জানুয়ারির বিবৃতিতে জানালেন, প্রার্থীপদ তিনি প্রত্যাহার করবেন না,—"ব্যাপারটা ব্যক্তিগত নয়।" দেশের সামনে যে সব ইস্যু পরিষ্কার হওয়া দরকার তার মধ্যে সবচেয়ে বড়—আন্তর্জাতিক সংকটে কর্তব্য ও ফেডারেশন।

গান্ধীর খুশি হবার কথা নয়। তাঁর ২২ ডিসেম্বরের চিঠিতে পড়ি, "I do not like your constant threats about Federation and ultimatum. You have said, quite forcefully, that so far as the Congress is concerned, Federation is dead. The idea of ultimatum is in my opinion premature." সুভাষ পুনরায় প্রার্থী হলে, ২৪ জানুয়ারি সাতজন ওয়ার্কিং কমিটি সদস্য (প্যাটেল, রাজেন্দ্র প্রসাদ, জয়রামদাস দৌলতরাম, কৃপালনি, যমনালাল বাজাজ, শঙ্কররাও দেও ও ভুলাভাই দেশাই) বারদোলি থেকে বললেন, এতদিন সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্বাচন হয়েছে এবং বিশেষ অবস্থা ছাড়া পুনর্নির্বাচন হওয়া বিধেয় নয়। যে সব ইস্যু বসু তুলেছেন তা নির্বাচনের ব্যাপারে অবাস্তব, কারণ তা বিবেচনা করবে কংগ্রেস বা ওয়ার্কিং কমিটি, সভাপতি নয়। সভাপতি ওয়ার্কিং কমিটির চেয়ারম্যান মাত্র। তাঁরা সীতারামায়াকে সমর্থন করলেন ও বসুকে সরে দাঁড়াতে অনুরোধ জানালেন।

এই বারদোলি বিবৃতিতে গান্ধীজীর হাত আছে এমন আভাস পাই নেহরুকে লেখা প্যাটেলের এক চিঠি থেকে।[২০৬] আশ্চর্য ব্যাপার, বসু বুঝতে পারেননি যে তাঁর সংগ্রাম পট্টভির সঙ্গে নয়, এমনকি ওয়ার্কিং কমিটির সঙ্গেও নয়, স্বয়ং গান্ধীর সঙ্গে। তার কারণ—ফেডারেশন নয়, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও নয়, মূলত সুভাষ বসুর সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য, ভাবী শিল্পনির্ভর পরিকল্পনা নীতি, অবিলম্বে গণআন্দোলনের দাবি এবং অহিংসার ব্যাপারে দো-ফাঁদা মনোভাব। গান্ধী এতদিন সমস্ত গণআন্দোলনের কাল নির্ধারণের কর্তা, গতি-প্রকৃতির নিয়ামক হয়ে এসেছেন এবং দুবারের ব্যর্থতা সত্ত্বেও আবার হতে চান। সুভাষের মধ্যে তিনি নিজ অবিসংবাদিত নেতৃত্বের বিপজ্জনক চ্যালেঞ্জ দেখেছিলেন। সমাজতন্ত্রের ব্যাপারে নেহরুর সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ হয়ে গেছে ১৯৩৬ সালে। বসু কি ভুলে

গিয়েছিলেন গান্ধী কিভাবে, প্রায় চোখ রাঙিয়ে, নেহরুকে বাগে এনেছিলেন ?[২০৭] নেহরু নানা কাবণে বশ মেনেছিলেন, উত্তরাধিকারের লোভ তার মধ্যে গৌণতম। কিন্তু মনস্তত্ত্ববিদ গান্ধী জানতেন, সুভাষকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। তাঁর বিদ্রোহ চিরদিনেব মত দমন করতে হবে।

শরৎচন্দ্র বসুকেও না জানিয়ে সুভাষ ২৫ জানুয়ারি যে বিবৃতি দেন তা তাঁর অসংযম ও আবেগপ্রবণতাব প্রমাণ। তিনি আবার ফেডারেশনকে দেশেব সামনে প্রকৃত ইস্যু বলে তুলে ধরলেন এবং প্যাটেলদের এই ব্যাপারে ষড়যন্ত্রকাবীদের দলে ফেললেন। কাজটা ঠিক হল না। প্যাটেল, ভুলাভাই বা রাজাজি ছিলেন না। তৃতীয়ত, সীতারামায়া সম্বন্ধে এমন ব্যক্তিগত কটাক্ষপাত কবলেন যাতে তিনি আপত্তি না জানিয়ে পারেন না। বিবৃতি, পাল্টা বিবৃতিতে জল ঘোলা হল। সহকর্মীদের আচরণে সন্দেহ প্রকাশ নেহরুব ভাল লাগেনি। ৪ ফেব্রুয়ারি তিনি সুভাষকে অনুরোধ করলেন মিটমাট করে নিতে। "...behind political problems, there are psychological problems, and these are always more difficult to handle. The only way to do is perfect frankness with each other and I hope therefore that all of us will be perfectly frank." সুভাষবাবু কান দিলেন না। এব অনেক পর লেখা নেহরুব দুটি চিঠি থেকে সুভাষবাবুব পদ-প্রার্থনায় তাঁর আপত্তির কারণ জানতে পাবি। ৩ এপ্রিল তিনি সুভাষকে লেখেন, "দুটো মুখ্য কারণে আমি আপনাব নির্বাচনেব বিবোধিতা কবি। অবস্থাগতিকে এটা গান্ধীজীব সঙ্গে বিচ্ছেদ সূচনা কবত। আব এতে সত্যকাব বামপন্থীদেবও সুবিধা হত না।" ৭ এপ্রিল শবৎ বসুকে তিনি লেখেন, "Subhas Bose's election would unleash certain tendencies and conflicts which would injure the country." গান্ধী কোন প্রার্থীব জন্য সুপারিশ করলেন না, শুধু মন্তব্য করলেন— দেশেব সামনে "anarchy and red ruin" অপেক্ষা কবছে।[২০৮]

নির্বাচন হল। বসু সীতারামায়াকে পবাজিত কবলেন ১৫৮০-১৩৭৫ ভোটে। ৩১ জানুযাবি গান্ধী আপন হাত দেখালেন। "পবাজয় আমাবই বেশি, তাঁব (সীতারামাযাব) নয়। কতকগুলি নীতি ও কার্যক্রমেব প্রতিনিধি ছাড়া আমি কিছুই নই। তাই মনে হচ্ছে আমাব নীতি ও কার্যক্রম কংগ্রেসেব প্রতিনিধিবা পছন্দ কবছে না। পবাজয়ে আমি আনন্দিত। দক্ষিণপন্থীদের দযায় সভাপতি না হয়ে সুভায বসু এখন নির্বাচনে জয়ী হযেছেন। কোনো বাধাব সম্মুখীন না হয়েই তিনি এখন সংহত ক্যাবিনেট (ওযার্কিং কমিটি) গঠন কবতে পারবেন ও নিজেব কর্মসূচি চালু কবতে পাববেন।" এব সঙ্গে কিছু মন্তব্য তিনি জুড়ে দিলেন যাকে বড়লাট "sibylline" আখ্যা দিযে ভুল করেননি। "After all, Subhas Babu is not an enemy of the country. He has suffered for it...The minority can only wish it all success. If they cannot keep pace with it, they must come out of the Congress...Those, therefore, who feel uncomfortable in being in the Congress may come out, not in a spirit of ill-will but with the deliberate purpose of rendering more effective service."।[২০৯] এত ভদ্র ভাষায় এমন ভযাবহ চ্যালেঞ্জ কি হতে পারে ?

বড়লাট ঘটনার যে মূল্যায়ন কবেছিলেন তা নিখুঁত। তাঁর মতে "অপেক্ষাকৃত অল্পপবিচিত ও কোনমতেই সর্বভারতীয় নেতা নন এমন একজনকে (সুভাষবাবুব বিরুদ্ধে)

দাঁড় করানোর মূল্য দিচ্ছে দক্ষিণপন্থীরা।" এটা তাদের "a piece of gross mismangement" ছাড়া কিছু নয়। মহাত্মার প্রতিক্রিয়ার গুরুত্ব তখুনি প্রণিধান করেছিলেন তিনি এবং বলেছিলেন, "Nor shall I be surprised if a good many of those who have on this occasion voted for Bose were directly or indirectly to lend support to right wing policies in future Congress discussions."[২১০] কি শ্যেন দৃষ্টি আর কি সত্য ভবিষ্যদ্বাণী !

সুভাষ বসুব দুটো ভুল অমার্জনীয়। প্রথমত, তিনি গান্ধীকে বৃদ্ধ, আন্তর্জাতিক পবিস্থিতি সম্বন্ধে অজ্ঞ, ব্যাপক গণআন্দোলনের নেতৃত্ব দেবার অনুপযুক্ত, অনিচ্ছুক তো বটেই, মনে করেছিলেন।[২১১] দ্বিতীয়ত, দক্ষিণপন্থীরা ফেডারেশনের ব্যাপারে দেশকে বিকিয়ে দিতে যাচ্ছেন এই অভিযোগও ছিল অমূলক। ফেডারেশনের সংগঠন ও প্রবর্তনের রীতিপদ্ধতি নিয়ে পার্থক্য থাকতেই পারে ; তাকে ষড়যন্ত্র আখ্যা দেওয়া অন্য পক্ষকে গুরুতর প্ররোচনা দেওয়ার শামিল। নেহরুর পুনঃ পুনঃ অনুবোধ সত্ত্বেও এ ভুল বোঝাবুঝি সুভাষ মিটিয়ে না নিয়ে আপন বিপদ ডেকে এনেছেন। দিলীপকুমার রায়ের মত এমন অকৃত্রিম (এবং মুগ্ধ) বন্ধু তাঁর ছিল না। তিনিও বলতে বাধ্য হয়েছেন, "...this unseemly apparent eagerness to be re-elected would look too personal to be convincing. Nehru was surely right when he wrote to you that you hardly needed to cling to the President's chair in order to make your great influence felt in the country."[২১২]

ওয়ার্ধায় গান্ধীব সঙ্গে ১৫ ফেব্রুয়ারির সাক্ষাৎকারে ব্যাপারটা ভদ্রভাবে মিটিযে না নিয়ে সুভাষ তৃতীয় ভুল কবলেন। নেহরুব ৩ এপ্রিলের লেখা চিঠিতে জানতে পারি, তিনি গান্ধীব সহাযতা চেয়েছিলেন কিন্তু নামমাত্র সৌজন্য হিসেবে। ওয়ার্কিং কমিটি কাদেব নিযে গঠিত হবে তিনি স্থিব কবে ফেলেছিলেন, হযতো কথাও দিয়ে ফেলেছিলেন। "You were of course perfectly entitled to do so, but all this indicated that you were thinking in terms other than those of cooperation with Gandhiji and his group."[২১৩] গান্ধী এতে খুশি হতে পাবেন না। বডলাটের চিঠিতে দেখি, "Mahatma took the opportunity to pull him to pieces and leave him in no doubt whatever as to what he thought of him on all points."[২১৪]

তাঁব চতুর্থ ভুল—বামপন্থীদের সক্রিয় সাহায্যের ওপব অতিরিক্ত নির্ভরতা। নিজেব কোন সংগঠন তাঁব ছিল না, গড়ার বিশেষ চেষ্টাও তিনি করেননি। আপন charisma সম্বন্ধে এমন উচ্চ ধাবণা পোষণ কবা উচিত হয়নি। কলকাতা শহরের হিন্দু নাগরিক ও ছাত্র যুবকদের আবেগমুখর সমর্থন, কলকাতা করপোরেশনেব সীমাবদ্ধ রাজনীতিতে সাফল্য, ভাবতর্ষের কিছু বিচ্ছিন্ন এলাকায় জনপ্রিযতা (যা নঞর্থক, মুখ্যত গান্ধীবিরোধী বলেই সুভাষ-সমর্থক) সংহত, শৃঙ্খলাবদ্ধ, গণভিত্তিক ও সম্পূর্ণ অনুগত দলের বিকল্প হতে পারে না। প্রথমাবধি তিনি যুগান্তব দলের ওপব নির্ভর, পরবর্তীকালে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট ও কম্যুনিস্ট দলের ওপব নির্ভব। অন্যদিকে দক্ষিণপন্থীদের হাতে বহু আন্দোলনে পোড-খাওয়া, প্রবীণ নেতৃত্ব পবিচালিত, অর্থ ও পৃষ্ঠপোষকতার বলে বলীয়ান, প্রাদেশিক রাজনৈতিক ক্ষমতায প্রোথিত এক সংহত দল। আর সর্বোপরি গান্ধীব প্রায়-ঐশ্বরিক মহিমা। গোযেন্দা দফতরেব কর্তা ইউয়ার্ট বলছেন, প্যাটেলেব হাতে অধিকাংশ মন্ত্রীর

পদত্যাগপত্র ছিল।

দক্ষিণপন্থীরা প্রথম চাল চাললেন গণ-পদত্যাগে। ত্রিপুরীর বিষয়সূচি আলোচনার জন্য ২২ ফেব্রুয়ারি ওয়ার্ধায় ওয়ার্কিং কমিটি বসার কথা। সহসা অসুস্থ হওয়ায় ২১ ফেব্রুয়ারি এক তারবার্তায় সুভাষ তা পেছাতে বললেন। তাঁদের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করা হচ্ছে অজুহাতে ১৯৩৯-এর ২২ ফেব্রুয়ারি পনেরো জন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যের মধ্যে বারো জন পদত্যাগ করলেন। কিছু পরে এঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন নেহরু। তাঁরা দ্বিতীয় চাল দিলেন গোবিন্দ বল্লভ পন্থের মাধ্যমে বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে (৭ মার্চ) এক প্রস্তাব তুলে। প্রস্তাবটি নিম্নরূপ · The (Tripuri) Congress declares its adherence to the fundamental policies of the Congress which have governed its programme in the past twenty years under the guidance of Mahatma Gandhi and is definitely of opinion that there should be no break in these policies, and that these should continue to govern the Congress programme in the future. The Congress endorses its confidence in the work of the Working Committee during last year and regrets that any aspersions should have been cast against any of its members. In view of the critical situation that may develop during the coming year and in view of the fact that Mahatma Gandhi can lead the Congress and the country to victory during such a crisis, the Congress regards it as imperative that the executive authority of the Congress should command his implicit confidence and requests the Congress President to nominate the Working Committee for the ensuing year in accordance with the wishes of Gandhiji." বলা বাহুল্য, এ প্রস্তাব সুভাষ বসুর প্রতি অনাস্থারই নামান্তর।

গান্ধীজী ত্রিপুরী কংগ্রেস (৭ মার্চ থেকে শুরু)-এর পূর্বেই রাজকোট চলে গেছেন এবং অধিবেশনের প্রাক্কালে অনশন শুরু করেছেন। তাঁর প্রত্যক্ষ নির্দেশে পন্থ প্রস্তাব এনেছিলেন বা তিনি এ প্রস্তাবের খসড়া নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন এ অপবাদ টেকে না। গান্ধী পরে বলেছিলেন, এলাহাবাদ পৌঁছবার পূর্বে পন্থ প্রস্তাবের বয়ান তাঁর হাতে আসেনি এবং তিনি তা পছন্দও করেননি। গান্ধীকে অবিশ্বাস করবার কিছু নেই। দক্ষিণপন্থীরা জানতেন, গান্ধীর অনুপস্থিতিতে তাঁর নাম ব্যবহার করেই কার্যোদ্ধার করতে পারবেন তাঁরা।

তাই সত্য হল। বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে পন্থের প্রস্তাব ২১৮-১৩৫ ভোটে জিতল।

ত্রিপুরীর প্রকাশ্য অধিবেশন শুরু হল ১০ মার্চ। সুভাষ অত্যন্ত অসুস্থ—সভাপতির আসন নিলেন আজাদ আর ভাষণ পড়লেন শরৎ বসু। এই ভাষণের মুখ্য প্রতিপাদ্য হল—আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় দাবি নিয়ে সরকারকে অবিলম্বে চরমপত্র দিতে হবে। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে উত্তর না পেলে বা সন্তোষজনক উত্তর না পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। সে ব্যবস্থা অবশ্যই গণ-আইন অমান্য। তাঁর মতে এমন সুযোগ আর আসবে না। সবাই মিলে সমস্ত শক্তি দিয়ে সংগ্রাম নামলে বিপন্ন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে তা অপ্রতিরোধ্য হবে। ১১ তারিখে মাধব শ্রীহরি অ্যানি প্রস্তাব তুললেন, সভাপতির অসুস্থতা নিবন্ধন নির্বাচন নিয়ে ভুল বোঝাবুঝিভিত্তিক প্রস্তাব ভবিষ্যতে

এ আই সি সি-তে তোলা হোক"। এই প্রস্তাব গৃহীত হলে এমন গোলমাল শুরু হল যে নেহরু পর্যন্ত বহুক্ষণ মুখ খুলতে পারলেন না। সি. পি-র ছোটলাট ওয়াইকে শুক্লা বলেছিলেন, বাঙালী প্রতিনিধিরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এমন মারমুখী হন যে গান্ধী থাকলে বিপদে পড়তেন এবং নেহরু অতিরিক্ত পুলিশ চেয়ে পাঠান।[২১৫] অ্যানি প্রস্তাব তুলে নিলেন। জয়প্রকাশ জাতীয় দাবি নিয়ে প্রস্তাব তুললেন, কিন্তু তাতে চরমপত্রের কথা ছিল না। বামপন্থীদের বাধা সত্ত্বেও তা গৃহীত হল। ১২ তারিখে পন্থ প্রস্তাব উঠল এবং বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হল। জয়প্রকাশের দল নীরব রইলেন। দক্ষিণপন্থীরা শেষ আঘাত হানল তাঁর অসুখ ভান মাত্র অপবাদ ছড়িয়ে। অসুস্থ, অপমানিত, বন্ধু পরিত্যক্ত সভাপতি ত্রিপুরী ত্যাগ করলেন।

তাঁর তখনকার মনোবেদনা বিধৃত হয়ে আছে মডার্ন রিভ্যুর এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত My Strange Illness প্রবন্ধে। এবং গান্ধী ও নেহরুর সঙ্গে পত্রালাপে।

ইতিমধ্যে গান্ধী রাজকোটে ও তাঁর শিষ্য যমনলাল বাজাজ জয়পুরে রাজাদের সঙ্গে গোলমালে জড়িয়ে পড়েছেন। রাজকোটে কস্তুরবা ও মণিবেন প্যাটেল বন্দী হয়েছেন। বাজাজ জয়পুর থেকে দ্বিতীয়বার বিতাড়িত, শেষে বন্দী। প্রজামণ্ডলের বিরুদ্ধে গিবসনের দমননীতিকে কংগ্রেস 'গুণ্ডামি' আখ্যা দিয়েছে। গান্ধী নিজে 'হরিজন' পত্রিকায় তা সমর্থন করেছেন। বড়লাট মনে করছিলেন রাজ্যের ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে বিচ্ছেদ চায় প্রাদেশিক মন্ত্রিসভারা। তালচের প্রভৃতি রাজ্যের দুর্নীতিমূলক কুশাসন তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। এর জন্য কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের অভাবই দায়ী। কিন্তু ঝানু রাজনীতিজ্ঞ বলে তিনি বুঝতে পারছিলেন গান্ধীকে রাজ্যের ব্যাপারে মধ্যস্থ বলে মেনে নিলে তাঁর ক্ষমতা অনেক বেড়ে যাবে এবং সেই বলে বলীয়ান হয়ে তিনি ত্রিপুরীতে বসুর মুখোমুখি হবেন। অবস্থা বুঝে রাজাদের নরম হতে উপদেশ দেন তিনি—জয়পুরের মহারাজাকে প্রজামণ্ডল স্বীকার করে নিতে বলেন। কিন্তু গান্ধী অপেক্ষা করতে প্রস্তুত ছিলেন না—রাজকোটকে তিনি moral issue করে তুলেন। শুরু করলেন অনশন—ঠিক ত্রিপুরী অধিবেশনের প্রাক্কালে। বড়লাটের ৭ মার্চের মন্তব্য খুব গুরুত্বপূর্ণ. "Whether he (Gandhi) goes to Tripuri or not, he has beyond any question completely elbowed the unhappy Bose out into the cold (if, indeed, a man with 102° of fever can be cold), and has concentrated the spotlight on himself."[২১৬] ওদিকে বসু বিদায় হবেন, এদিকে রাজকোটে জয় হলে দেশীয় রাজারা ভয় পাবে এবং মাঝখান থেকে গান্ধী (এবং তাঁর দল) কংগ্রেসের অসপত্ন কর্তৃত্ব ফিরে পাবেন। বড়লাটের চোখে এই ছিল সিনারিও। কিন্তু তিনি জানতেন, রাজন্যবর্গই একমাত্র ফেডারেশনের বিরোধিতা করছেন না। মুসলিম লীগ বুঝতে পেরেছিল গান্ধীর দেশীয় রাজনীতি সফল হলে কেন্দ্রে কংগ্রেসকে ঠেকানো যাবে না। তাদের হাতে এক ভালো তাস ছিল—পাকিস্তানের দাবি। সেই ১৯৩০-এর গোড়ায় রহমত আলি, তারপর ইকবাল, তারও পর সিকান্দার পাকিস্তান নামধেয় এক ধোঁয়াটে দাবি তুলছিলেন—জিন্না তাঁদের কথায় কান দেননি। এখন, ১৯৩৯ থেকে আবার নানা কথা উঠতে লাগল। সিন্ধু, আলিগড়, হায়দ্রাবাদ, নানা জায়গা থেকে নতুন নতুন পরিকল্পনা আসতে লাগল। ২৮ ফেব্রুয়ারি জিন্না বড়লাটকে বললেন, মুসলিম ও হিন্দু ভোটের সাম্য ('equipoise') না পেলে ফেডারেশন নিয়ে তাঁর কি লাভ?[২১৭] বড়লাট পঞ্জাবের লাট ক্রেইকের মাধ্যমে সিকান্দারকে উসকে দিলেন।[২১৮] মীরাটে মুসলিম লীগ কনফারেনসে তা আলোচিত হল কিন্তু ঝড় তুলল না। আপাতত জিন্না নীরব রইলেন কিন্তু

তুরুপের তাস তাঁর হাতে। তা দেখান হবে ১৯৪০ সালে, লাহোবে।[২১৯]

॥ ৯ ॥

"What must the king do now ? Must he submit ?
The King shall do it : must he be deposed ?"
(Shakespeare, Richard II. III. 143)

বাইশে ফেব্রুয়াবি প্যাটেল প্রমুখ বারো জন সদস্য পদত্যাগ কবে সুভাষকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত করতে চাননি. চেয়েছিলেন তাঁকে গান্ধীব কাছে সম্পূর্ণ নতি স্বীকাব কবাতে—যাকে বলা হয় 'journey to Canossa.'[২২০] সুভাষের অপমান বোধ যতই তীব্র হোক, তিনিও কংগ্রেসে থাকতে চেয়েছিলেন—অবশ্য সম্মানজনক শর্তে। দিল্লীতে গান্ধী বয়েছেন, তাঁব সঙ্গে দেখা কবতে অসুস্থ সুভাষ যেতে পাববেন না। তাই তিনি শরৎবাবুকে তাঁব প্রতিনিধি করে পাঠাতে চাইলেন।[২২১] জ্যোতিষীর পবামর্শে (?) শবৎবাবু বওনা হলেন না . ভাইকে জানালেন, ৫ এপ্রিলেব আগে গান্ধীব সঙ্গে দেখা কবলে শুভ হবে না।[২২২] অথচ গান্ধীব অনুচবদেব বিরুদ্ধে তিক্ত অভিযোগ করে এমন সব চিঠি লিখতে লাগলেন, যাতে উল্টো ফল হল। এসব অভিযোগেব অধিকাংশই গুজব—শবৎবাবু কান পাতলা ছিলেন। অন্য দিকে সুভাষবাবু নেহরুকে তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্তেব প্রেবণাদাতা বলে দাযী কবলেন। উভয় ভ্রাতা কেউই গান্ধীব বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তিগত অভিযোগ তুললেন না—তিনি যেন নিবপেক্ষ আপীল আদালত, একমাত্র তাঁব কাছেই সুবিচাব প্রত্যাশা কবা যায়।

গান্ধীর সুবিধাই হল। তিনি শবৎ বসুব· অভিযোগ প্যাটেল ও কৃপালনিকে দেখালেন—আজাদ ও নেহরুকে দেখাবেন বললেন। তিনি জানালেন পন্থ-প্রস্তাবেব কোন সবকাবী বিজ্ঞপ্তি তিনি পাননি, পুরো বয়ানও দেখেননি। কিন্তু দেখলেই বা এমন 'ভয়াবহ পাবস্পবিক সন্দেহে'ব পবিপ্রেক্ষিতে কি কবতে পারতেন তিনি ? এ অবস্থায় হয় সবাই একত্র হযে আলাপ-আলোচনাব মাধ্যমে বিবাদ মিটিয়ে নিক, না হয সুভাষ বলুন পুরনো কমিটি নিয়ে তিনি কাজ করতে পাববেন না। তাঁব সামনে দুটো পথ খোলা—তিনি সভাপতির পদ থেকে অব্যাহতি চাইবেন অথবা আপন ওযার্কিং কমিটি স্বাধীন ভাবে গঠন করবেন।[২২৩]

গান্ধী শরৎ বসুকে প্যাটেল, কৃপালনি ও ভুলাভাই-এর বক্তব্য পাঠিয়ে দিলেন। নেহরু ও আজাদ শরৎ বসুর সঙ্গে সরাসরি পত্রালাপে নামলেন। প্রথম তিন জন শরৎবাবুর অভিযোগ ("mean, malicious and vindictive propaganda against President") অস্বীকার করলেন। দেশাই জানালেন, তিনি রাষ্ট্রপতিকে 'rascal' বলতেই পারেন না। কৃপালনি লিখলেন, ত্রিপুবীব উত্তপ্ত আবহাওযায উভয়পক্ষ কত বকম গুজব ছড়িযেছে—তা কি বিশ্বাস করা উচিত ? ২৪ মার্চ নেহরু লিখলেন, "আপনার (২১ মার্চের) পত্রে নীতি বা কর্মসূচি নিয়ে প্রায় কোন কথা নেই। বযেছে শুধু কিছু ব্যক্তি সম্বন্ধে গুরুতর অভিযোগ। এতে বিতর্ককে নিম্নতর স্তরে নামিয়ে আনা হয় এবং যদি কোন ব্যক্তি বা দল অন্যদের সম্বন্ধে এমন মত পোষণ করে তবে যৌথ কর্তব্য সম্পাদনে পারস্পরিক সহযোগিতা অসম্ভব হয়ে ওঠে।"

গান্ধী উপর্যুক্ত তিন জনের ব্যাখ্যার সঙ্গে মন্তব্য করলেন—"This distrust must

go, if it is at all possible. Political differences may remain perhaps. But why bitterness."

২৯ মার্চ সুভাষ গান্ধীকে অনুরোধ করলেন, হয় তিনি সুভাষকে সব মতেব লোক নিয়ে (composite) ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে দিন, না হয় সম্পূর্ণ আপন মনোমত লোকদেব নাম ঘোষণা করুন। কিন্তু এব সঙ্গে জুড়ে দিলেন এক অদ্ভুত এবং তিক্ত মন্তব্য—"যদি আপনি দ্বিতীয় পথ বেছে নেন, তবে বিচ্ছেদের সময় এসেছে।"

৩১ মার্চ আবার তিনি লেখেন, গান্ধীই একমাত্র কংগ্রেসকে বাঁচাতে পাবেন। "There is no doubt that there is today a wide gulf between the two parties (or blocks) in the Congress. But the gulf can yet be bridged—and that by you." তিনি আরও জানতে চান পন্থ-প্রস্তাব কি অনাস্থা প্রস্তাব ? বসুর কি পদত্যাগ কর্তব্য ? ত্রিপুরীতে প্রচার চলেছিল যে এব পেছনে গান্ধীর সমর্থন রয়েছে। বসু তা বিশ্বাস কবেননি। এটা সংশোধিত রূপে মেনে নিতে রাজিও ছিলেন তিনি। প্যাটেল রাজি হননি। ত্রিপুরীতে কি গান্ধীর নামের অপব্যবহার হয়নি ? সংশোধিত বয়ান কি মেনে নেওয়া উচিত ছিল না ? সুভাষের চিঠিতে তাঁর বেদনা, দ্বন্দ্ব, গান্ধীব সুবিচাবে আস্থা, এমনকি গান্ধীব কাছে আত্মসমর্পণের আভাসও পাওয়া যায়।

২ এপ্রিল গান্ধী উত্তর দিলেন, "সব বিবেচনা কবে আমার সিদ্ধান্ত তুমি এখনি মনোমত লোক নিয়ে ক্যাবিনেট তৈরি কর, নিজের কর্মসূচি বচনা কব এবং আসন্ন এ আই সি সি-তে পেশ কর। যদি তারা তোমার কর্মসূচি মেনে নেয় ব্যাপারটা সহজ হয়ে যাবে যদি না নেয় তোমার পদত্যাগ করা উচিত।" ৬ এপ্রিল সুভাষ জানালেন, পন্থ-প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীব পরামর্শ ছাড়া তিনি ক্যাবিনেট গড়বেন কি করে ? তাকে আবাব গান্ধীর পূর্ণ আস্থাভাজন হতে হবে। গান্ধী নিজে নেতৃত্ব নিলে তিনি সব ছেড়ে দেবেন কিন্তু শর্ত—অবিলম্বে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। যদি গান্ধী চান সুভাষ মনোমত ক্যাবিনেট গড়ুন তবে সেই ক্যাবিনেট সম্বন্ধে গান্ধীকে আস্থা প্রকাশ করতে হবে—যা হবে এ আই সি সি-র সম্মতির তুল্য। ১০ এপ্রিল গান্ধী উত্তর দিলেন, মতবিরোধেব পরিপ্রেক্ষিতে আপন পছন্দসই লোকদের বসুর ওপর তিনি চাপাতে চান না! যেহেতু "The gulf is too wide, suspicion too deep", সেহেতু উভয পক্ষের মধ্যে মিটমাটও তিনি করতে পারবেন না। আবার এ আই সি সি-র ওপর প্রভাব খাটিয়ে বসু মনোনীত কমিটি ও কর্মসূচি পাকা কবিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতিও তিনি দিতে পারেন না। "It would amount to suppression." তিনি বললেন দেশ আগে কোনদিন এত অহিংস মনোভাবাপন্ন হয়নি—বসুব এ মত তিনি মানেন না। "I smell violence in the air I breathe." কংগ্রেসের মধ্যে দুর্নীতিরও অন্ত নেই। বর্তমান অবস্থায় কংগ্রেস আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করতে অপারগ এ বিশ্বাসে তিনি অটল ছিলেন।[২২৫] সুভাষ দেখা করতে চাইলেন, গান্ধী বললেন—তিনি রাজকোট নিয়ে ব্যস্ত। বিরক্ত সুভাষ জানালেন, "আমার মত লোকের কাছে এই সংকটে কংগ্রেস সমস্যা রাজকোটের চেয়ে হাজার গুণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ।" গান্ধী কলকাতা এ আই সি সি-র আগে দেখা করলেন না।

উক্ত পত্রালাপে বাঙালী সুলভ একটা দৌর্বল্য চোখে পড়ে। একটু অমার্জিত ভাষায় তাকে বলে—'ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরা'। যে গান্ধীর সঙ্গে ১৯২২ সাল থেকে একটানা লড়াই তিনি করেছেন, ১৯৩৩ সালে বিঠলভাই প্যাটেলের সঙ্গে সুর মিলিয়ে যাঁর নেতৃত্বকে ব্যর্থ বলেছেন, যাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি দ্বিতীয়বার পদপ্রার্থী হয়েছেন এবং জয়লাভ করে

ভেবেছেন গান্ধীর প্রভাব প্রতিপত্তি অস্তমিত, দেশ তাঁকেই গান্ধীর স্থানে বসিয়েছে, তাঁরই দরবারে নিজ সহকর্মীদের বিরুদ্ধ নালিশ করতে, সুবিচারের আবেদন করতে, এমনকি বিপক্ষ ও এ আই সি-র ওপর প্রভাব খাটিয়ে পন্থ-প্রস্তাব বানচাল করার অনুরোধ জানাতে তাঁর আত্মসম্মানে বাধা উচিত ছিল। কেন তিনি গান্ধীর ২ এপ্রিলের উপদেশ অনুযায়ী নিজের মনোমত ক্যাবিনেট গড়লেন না এবং তা ও কর্মসূচি এ আই সি সি-র সমর্থনের জন্য পেশ করলেন না ? সেটা শুধু বীরের কাজ হত না, কৌশলের কাজ হত। গান্ধীর সুস্পষ্ট নির্দেশের সামনে পন্থ-প্রস্তাবের উল্লেখ কেউ করতে পারত না। আসলে, সুভাষ জানতেন গান্ধীব সক্রিয় সাহায্য ছাড়া কি আপন মনোমত কমিটি, কি পছন্দসই কর্মসূচি, তিনি পাস করাতে পারবেন না। বাংলা দেশের অবিসংবাদিত নেতাও কি ছিলেন তিনি ? কিরণশঙ্কর, বিধানচন্দ্ররা কি তাঁর কথা শুনে, কেন্দ্রীয় কংগ্রেসেব বিরুদ্ধে সর্বসম্মত বিদ্রোহ ঘটিয়ে, সংকট সৃষ্টি করতে রাজি হতেন ? আর তাঁর বামপন্থী সমর্থকরা, যাঁরা ত্রিপুরীতে দোদুল্যমান, তাঁরাই বা এ আই সি সি-র আসন্ন অধিবেশনে কতটা মদত দিতে পারতেন, এমনকি চাইতেন ? ত্রিপুরীতে বিপক্ষ একটা সুযোগ তাঁকে দিয়েছিল—সুভাষের অসুস্থতা নিবন্ধন পন্থ-প্রস্তাব পরবর্তী এ আই সি সি পর্যন্ত পিছিয়ে দিতে। সে সুযোগও তিনি গ্রহণ করেননি। অথচ কে না জানে অশুভস্য কালহরণম্ শ্রেয়ঃ ? তিনি কি ভেবেছিলেন বামপন্থীদের ভোটে পন্থ-প্রস্তাব হেরে যাবে ? এমন বুদ্ধি কোন্ বন্ধু তাঁকে দিয়েছিল ? আমার ধারণা—নিজে অত্যন্ত অসুস্থ ছিলেন বলে মতিস্থির করে কাজ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। শরৎ বসু ছিলেন তাঁর বিভ্রান্ত প্রতিভূ, আর সমর্থকদের অনেকেই কপট মিত্র। এত কম শক্তি নিয়ে প্যাটেল, দেশাই, আজাদ প্রভৃতির সঙ্গে লড়া যায় ?

এমনকি তাঁর প্রতি সর্বাপেক্ষা মিত্রতাভাবাপন্ন নেহরুর সঙ্গেও তিনি ও শরৎবাবু সুবিচার করেননি। দু একটা চিঠিতে তার প্রমাণ মিলবে। ২৮ মার্চ তিনি নেহরুকে লিখছেন "I find that for some time past you have developed a tremendous dislike for me. I say this because I find that you take up enthusiastically every possible point against me; what could be said in my favour, you ignore."[২২৬] আপাতভাবে তাই মনে হবে। পট্টভি সীতারামায়াকে সমর্থন না করলেও নেহরু বলেছিলেন, এই পরিস্থিতিতে দায়িত্বপূর্ণ পদ নিতে গেলে তাঁর বা সুভাষের কার্যকারিতা কমে যাবে। ওয়ার্কিং কমিটির বারো জন সদস্যের সঙ্গে একযোগে পদত্যাগ না করলেও একটি চিঠি দিলেন যা রহস্যময়। তাঁরই কথায়, পদত্যাগ করলেন না, অথচ মনে হল করলেন। ত্রিপুরীতে প্রায় নীরব দর্শক ছিলেন তিনি। ভাইপোকে সুভাষবাবু ১৭ এপ্রিল লেখেন, "No body has done more harm to me personally, and to our cause in the crisis, than Pandit Nehru. If he had been with us, he would have probably given us a majority. But he was with the Old Guard at Tripuri,"[২২৬ক] রাজাগোপালাচারি এর জন্য নেহরুর স্বার্থবুদ্ধিকে দায়ী করেছেন। উত্তরাধিকার লাভে কৃতসঙ্কল্প নেহরু গান্ধীর পক্ষে থাকাই শ্রেয় মনে করেছিলেন। গোপালের ভাষায়, রাজাজির মতে, "Happy on the inside track, he (Nehru) allowed his only rival, on the outer rails, to be pushed off the course."[২২৭]

কিন্তু নেহরুর সত্যি কতটুকু দোষ ছিল ? গান্ধী ও বসুর মধ্যে মিটমাট করে দেননি বলে হীরেন মুখার্জি নেহরু সম্বন্ধে অভিযোগ এনেছেন।[২২৮] কিন্তু তিনি কি কোন চেষ্টাই

করেননি ? সত্য বটে তিনি সুভাষ বসুর দ্বিতীয়বার দাঁড়ানোর আপত্তি জানিয়েছিলেন (যদিও সীতারামায়াকে সমর্থন করেননি), বারো জন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যের সঙ্গে ২২ ফেব্রুয়ারি একযোগে পদত্যাগ না করলেও তাঁদের কাজ সমর্থন করেছিলেন, ত্রিপুরীতে প্রায় নীরব দর্শক ছিলেন ও জাতীয় দাবিব ওপর যে প্রস্তাব তোলেন তা নিতান্ত নিরামিষ—তবু মনে রাখতে হবে সুভাষকে লেখা ৩ এপ্রিল ও শরৎবাবুকে লেখা ৭ এপ্রিলের চিঠির কথা। প্রথম চিঠিতে সুভাষের ২৮ মার্চেব চিঠির অজস্র কটুকাটব্য হজম করেও তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন, গান্ধীব সঙ্গে প্রকাশ্য বিরোধিতা করা ঠিক হবে না ; এতে বামপন্থীদেরও অসুবিধা ঘটবে, কংগ্রেসে অন্তর্বিরোধ শুরু হলে তারা সামাল দিতে পারবে না, উল্টে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জোরদার হবে। নির্বাচনে জিতলেও গান্ধীকে বাদ দিয়ে গণআন্দোলন চালানো সম্ভব নয়। শরৎ বসুকে তিনি লিখেছিলেন, সুভাষের নির্বাচনেব ফলে এমন কতগুলি প্রবণতা দেখা দেবে যাতে দেশের ক্ষতি হবে, এই মুহূর্তে যে কোনো অনৈক্য কংগ্রেসেব পক্ষে বিপজ্জনক। তাঁর সঙ্গে গান্ধীর এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সত্ত্বেও তিনি দেখেছেন মহাত্মার সঙ্গে কাজ করা সুকঠিন। সুভাষের সঙ্গে গান্ধীব সে বকম ঘনিষ্ঠতা নেই, উপরন্তু রয়েছে পারস্পরিক সন্দেহ ও অনাস্থা। নেহরু সতর্ক করে দিতে দেয়েছিলেন যে বসু তো তাঁব ন্যায় আপনার মতামতের ওপর জোব না দিয়ে, বনিবনা কবে চলতে পাববেন না। আরও আগে সুভাষকে ৪ ফেব্রুয়ারি লিখেছিলেন, বামপন্থী-দক্ষিণপন্থীর বিভেদের ওপব অত জেদ না ধরে, ওয়ার্কিং কমিটিব সদস্যদের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি মিটিয়ে নেওয়াই শ্রেয। "Public affairs involve principles and policies. They also involve an understanding of each other and faith in the bonafides of colleagues...What am I to do with the finest principles if I do not have faith in the person concerned ?...behind the political problem, there are psychological problems, and these are always more difficult to handle."[২২৮ক] সুভাষ গান্ধীর সঙ্গে (১৫ ফেব্রুয়ারি) ওয়ার্ধায় দেখা করতে যাওয়ার আগে তিনি আবার ফয়শালার পবামর্শ দেন। বসু শোনেননি। ত্রিপুরীর ব্যাপারে শরৎকে লেখা নেহরুর চিঠিতে পড়ি—বাঙালী প্রতিনিধিরা কি অভদ্রভাবে তাঁর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করতে চায়। তিনি মেজাজ খারাপ কবে বলেছিলেন—এটা 'গুণ্ডামি ও ফাসিস্ত আচরণ'। এর জন্য তিনি দুঃখিত কিন্তু শরৎ নিশ্চয় বুঝবেন—"The strain on me was considerable." বামপন্থী দল, বিশেষত কিষাণ সভাব, দায়িত্বহীন আস্ফালন অনেক দিনই তাঁর ভাল লাগছিল না। এখন তার মনে হল বামপন্থী স্লোগান ব্যবহার করছে 'কিছু' adventurist. কম্যুনিস্টদের সম্বন্ধে তাঁর মত · "they changed their attitude three times in a course of the two days, largely owing to pressure from Bengal."[২২৮খ]

সবচেয়ে বড়ো কথা, ১৭ এপ্রিল তিনি গান্ধীকে অনুরোধ করছেন, "সুভাষের অনেক দোষ আছে কিন্তু বন্ধুভাবাপন্ন হলে তাঁর হৃদয়তন্ত্রীতে ঘা লাগবে।" "I am sure that if you make up your mind to do so, you could find a way out." তিনিও বলেন, রাজকোটের ব্যাপার কংগ্রেসের সংকটের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। "I wish you could have met Subhas." এতে অনেক সুবিধা হবে। "আমি এখনও মনে করি, যেমন দিল্লীতে করেছিলাম, আপনার সুভাষকে সভাপতিরূপে স্বীকাব করা উচিত।" "To try to push him out seems to me to be an exceedingly wrong

step. As for the Working Committee, it is for you to decide." অত বেশি ঐকমত্যের ওপর জোর দেওয়া উচিত নয়। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য পর্যন্ত ঐকমত্যের নীতি বিস্তৃত করা ঠিক হবে না। "After all, we must remember that by having a homogeneous executive, we do not create a homogeneous Congress. The latter is easier of achievement if we have a larger homogeneity in view."[২২৯] ২০ এপ্রিলের তারবার্তায়ও একই কথা। সুভাষের সঙ্গে কথাবার্তার পর তাঁর ধারণা হয়েছিল গান্ধী ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করলেও গান্ধীর পরামর্শে কর্মসূচি রচিত হলে সুভাষ আপত্তি করবেন না। আমরা দেখব কলকাতা এ আই সি সি-তে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নেহরু চেষ্টা করেন বসু তাঁর পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করুন।

গান্ধীজী কতটা দোষী ছিলেন সে বিষয়ে তখনকার (এবং কিছুটা এখনকার) বাঙালীর প্রতিক্রিয়া নৈর্ব্যক্তিক ও নিরপেক্ষ হতে পাবে না। নেহরু এক চিঠিতে সুন্দর করে বলেছিলেন, "এই মুহূর্তে সুভাষ বাংলার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং কোন প্রতীকেব সঙ্গে বা ব্যাপারে যুক্তি প্রয়োগ অসম্ভব।"[২৩০] বড়লাট লিনলিথগো সুভাষ ও গান্ধী কারুর মিত্র ছিলেন না, তিনি বেশ খুশি হয়েছিলেন এই অভ্যন্তরীণ বাদবিসম্বাদে। কিন্তু বিভিন্ন চিঠি থেকে দেখিয়েছি তাঁবও গান্ধীর কাজটা ভাল লাগেনি। ৩১ জানুযারিতে তিনি লিখছেন, মহাত্মাব প্রতিবেদন বড বেশি সুভাষ বিরোধী, এর ফলে জনসাধারণ তাঁকেই সমর্থন করবে। ২১ ফেব্রুয়ারি লিখছেন, দেশীয় বাজ্যের ব্যাপারে গান্ধী মুখ্য মধ্যস্থেব ভূমিকা চান এবং তা পেলে সুভাষ ও বামপন্থীদেব ওপব আঘাত হানবেন। বড়লাটের তাতে আপত্তি নেই কিন্তু রাজা ও মুসলমানদেব কথাও ভাবতে হবে। আসলে বসু-গান্ধীব দাবাখেলায তিনি বড়ে হতে বাজি ছিলেন না।[২৩১] বাজাদেব নিযে গান্ধীর এত দাপাদাপিকে ভাবতসচিব মনে করেছিলেন, "a smoke-screen behind which the centri-fugal tendencies present in the Congress may be covered up and a united front presented once to the Paramount Power."[২৩২] বড়লাটেব ২৮ ফেব্রুযাবির চিঠিব আগেই উল্লেখ কবেছি। "গান্ধী ত্রিপুরী যান বা নাই যান তিনি প্রশ্নাতীত ভাবে দুর্ভাগা বসুকে বেব করে দিতে সক্ষম হয়েছেন…।"

গান্ধী ও বসু ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে পত্রালাপে গান্ধীর অনমনীয় মনোভাব স্পষ্ট। গান্ধীর ২৪ মার্চেব চিঠিতে পড়ি সুভাষবাবু যদি বেশি অসুস্থ থাকেন, তবে পদত্যাগ করুন। ২ এপ্রিল জানান, সুভাষ নিজের মনোমত ক্যাবিনেট গড়ুন কর্মসূচি তৈবি করুন ও এ আই সি সি-র সামনে উপস্থিত করুন। যদি এ আই সি সি প্রত্যাখ্যান করে তবে পদত্যাগই কর্তব্য। সুভাষের বহু অনুরোধ সত্ত্বেও ক্যাবিনেট নির্বাচনে (যাকে homogeneous হতেই হবে) অংশ নেননি তিনি, সুভাষের মনোনীত ক্যাবিনেটকে মেনে নিতেও নয়, এ আই সি সি-কে প্রভাবিত করতে তো নয়ই। আমরা একটি প্রশ্ন তুলতে পারি—কেন তিনি, ১৫ ফেব্রুয়ারিতে, বসুব সঙ্গে সাক্ষাৎকাবে, composite cabinet মেনে নিলেও পরে homogeneous cabinet-এব ওপর জোর দিচ্ছিলেন ? সুভাষেব মনোনীত কিছু লোক ও তাঁর মনোনীত কিছু লোক (যারা দক্ষিণপন্থীদের আস্থাভাজন হত) নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি গড়লে কি ক্ষতি হত ? পন্থ-প্রস্তাব অনুযায়ী নিজেও ক্যাবিনেট গডবেন না ("I cannot and will not impose a cabinet on you."), সুভাষের গড়া ক্যাবিনেট এ আই সি সি-কে দিয়ে মানিয়েও নেবেন না ("It would amount to suppression.")—এর

একমাত্র পরিণতি নিজেই তিনি জানতেন—"If you do not get the vote, lead the opposition till you have converted the majority." অর্থাৎ পদত্যাগ। কেন তিনি রাজকোট নিয়ে এত অযথা জড়িয়ে পড়লেন ? বড়লাটের চিঠিপত্রে পরিষ্কার, তিনি অনাবশ্যক টালবাহানা করছিলেন। কলকাতা এ আই সি সি-র আগে উভয়ের দেখা হলে সুভাষকে হয়তো কংগ্রেস ত্যাগ করতে হত না। অনেক শিক্ষা তিনি দিয়েছিলেন কিন্তু পুরো ভেঙে ফেলা কি রাজনীতি কি অধ্যাত্ম নীতি কোনটাই সমর্থন করে না। রবীন্দ্রনাথের ২৯ মার্চের অনুরোধ অতি গুরুত্বপূর্ণ—"At the last Congress session some rude hands have deeply hurt Bengal with an ungracious persistence. Please apply without delay, balm to the wound, with your own kind hands and prevent if from festering." গুরুদেব (গান্ধীর নিজের দেওয়া নাম)-এব এই সনির্বন্ধ, প্রায় সকাতর, আবেদনেব উত্তর এল—"I have your letter full of tenderness. The problem you set before me is difficult. I have made certain suggestions to Subhas. I see no other way out of the impasse." এই কি মহাত্মার যোগ্য উত্তর ? অন্তত এই একটি ঘটনায় গান্ধী তাঁর আপন উচ্চাদর্শ—গীতাব স্থিতপ্রজ্ঞের—ক্ষমাগুণের পরিচয় দেননি। অন্যান্য নেতারা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতিহিংসায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে পারেন কিন্তু মহাত্মা কি তার সূত্রপাত করবেন, তাতে ইন্ধন যোগাবেন ? শুধু বিদেশী মাইকেল ব্রেচারের (Brecher) মনে তাঁব সম্বন্ধে সন্দেহ জাগেনি,[২৩৩] যাঁর জন্য গান্ধী বিতর্কে জড়িয়ে পড়লেন, সেই সীতারামায়ার মনেও প্রশ্ন জেগেছে।[২৩৪]

তাঁব ক্ষমাহীন ক্রোধেব একটা কাবণ দেখিয়েছেন কে এম মুন্সী, তবে তা কতদূব বিশ্বাস্য বলতে পারব না। মুন্সী অশোক মজুমদার (বিখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের পুত্র)-কে জানিযেছিলেন—বসু ১৯৩৮-এ বোম্বাই থাকার সময জার্মান কনসালের সঙ্গে গোপনে দেখা কবতেন। কোন বন্ধুর বাড়ি নেমন্তন্ন খাওয়ার পর বিশ্রাম নেবার অছিলায় তিনি চলে যেতেন এবং অতিথি বিদায় নিলে পোশাক বদলে, ছদ্মবেশ পরে এবং মাঝপথে ট্যাক্সি বদলে, অন্য এক বন্ধুর বাড়িতে জার্মান কনসালের সঙ্গে মিলিত হতেন। এই কনসালের সাংকেতিক লিপিব পাঠোদ্ধাব করে ব্রিটিশ গুপ্তচর সংস্থা ভারত সরকারের অবগতির জন্য পাঠায। ভারত সরকাব আবার তা মুন্সীর গোচরে আনে। মুন্সী তখন বোম্বাইয়ের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সুভাষের এই গোপন কার্যকলাপই গান্ধীকে সুভাষের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত করেছিল। তিনি শুধু তাঁব দ্বিতীয় দফায় নির্বাচনে আপত্তি জানাননি, সহযোগিতা না কবে তাঁকে পদত্যাগে বাধ্য করেছিলেন।[২৩৫]

কাহিনীটা যে কোনো থ্রিলারের মত শোনালেও সুভাষ বসুর পরবর্তী নানা কার্যকলাপেব সঙ্গে খাপ খায়। মুন্সী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তাঁর ব্রিটিশদের সঙ্গে বেশ ভাবও ছিল। তাঁর মাধ্যমে গান্ধীকে খবর পাঠানো অসম্ভব ছিল না। সরকার জানতেন গান্ধী ভারতের স্বাধীনতা চাইলেও তা ব্রিটিশদের সঙ্গে অহিংস সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জন করতে চাইতেন, জার্মেনীর সঙ্গে গোপন ষডযন্ত্রেব মাধ্যমে নয়। শুধু যে তিনি সহিংস সংগ্রামের বিরোধী ছিলেন তা নয়, জার্মেনীর নাৎসী সরকারের বীভৎস ক্রিয়াকলাপের কথাও তাঁর অজানা ছিল না। নেহরু যথারীতি তাঁকে অবহিত রেখেছিলেন সে বিষয়ে। মানবিকতার দিক থেকে গান্ধী ছিলেন উনিশ শতকীয শ্রেষ্ঠ লিবারেল—তাঁর কাছে অত্যুগ্র জাতিবিদ্বেষভিত্তিক. ইহুদী নিধনে কলঙ্কিত, পররাজ্য গ্রাসে লোলুপ অমানবিক জার্মেনীর কাছে সাহায্য চাওয়া

নীতিবিগর্হিত মনে হয়েছিল। কংগ্রেসেব অন্যান্য নেতাদের না জানিয়ে গোপনে এ কাজ করাতো অমার্জনীয়। এ রকম ব্যক্তি সভাপতি হলে এবং আপন মনোনীত লোক দিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করলে তাঁর এত সাধের এত দিনের পরিশ্রমে গড়া কংগ্রেস আদর্শ থেকে সমূলে বিচ্যুত হবে। এ তিনি হতে দিতে পারেন না, তাই কুসুমের মত মৃদু গান্ধী বজ্রাদপি কঠোর হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ, নেহরু, সুভাষ কারুর কোন কথায় কর্ণপাত করেননি।

প্রথম প্রশ্ন, মুন্সী বলেছেন মজুমদারকে, এর কোন সমর্থক প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। দ্বিতীয়ত, গান্ধী জানতে পারার পর সরাসরি সুভাষকে জিজ্ঞাসা করলেন না কেন? কেনই বা তিনি সুভাষের শত্রু প্যাটেলদেরই বা বললেন না? এঁদের মধ্যে কেউ তো সুভাষের বিরুদ্ধে এই যুক্তি দেখাননি। কিন্তু উত্তরে বলা যায়, এত গোপনীয় কথা ফাঁস করা মুন্সীর পক্ষে সম্ভব ছিল না—তিনি কংগ্রেসের একজন মন্ত্রী, সভাপতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনবেন কি করে— বিশেষত শত্রু পক্ষের গুপ্তচব কর্তৃক পঠিত সাংকেতিক লিপির ভিত্তিতে? গান্ধী বলতে পারেন না—তাতে সমগ্র কংগ্রেসেব ওপর পশ্চিমী গণতান্ত্রিক দেশগুলির সন্দেহের উদ্রেক হবে। তা ছাড়া এটা যে ইংরেজদের ফাঁদ নয়, তাই বা তিনি জানবেন কি ভাবে? কিন্তু কাউকে বলা ঠিক না হতে পারে, তাঁর নিজের মনে সংশয় জাগা স্বাভাবিক। সুভাষ বহুদিন ধরেই বলছেন, কৌটিল্য নীতি অনুসারে শত্রুর শত্রু (জার্মেনী) আমাদের মিত্র। রাশিয়া যদি ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে মিতালি করতে পারে ভারতই বা করবে না কেন? আসন্ন মহাযুদ্ধে ব্রিটিশ শক্তি দুর্বল হবেই, তখন তার সুযোগ না নেওয়া মূর্খতা। সুভাষের নেহরুকে লেখা ২৮ মার্চের চিঠি ও নেহরুর ৩ এপ্রিলের উত্তরে বাদানুবাদ স্পষ্ট। এরকম লোককে কি সভাপতি করা বা রাখা চলে? যুদ্ধ বাধলে গান্ধী বড়লাটকে বলেছিলেন, তিনি "ইংরেজদের হৃদয় নিয়ে" যুদ্ধকে দেখছেন, ব্যক্তিগতভাবে তিনি সহযোগিতা কবতে প্রস্তুত এবং পার্লামেন্ট ও ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবের সম্ভাব্য ধ্বংসের কথা ভেবে ভেঙে পড়েছিলেন।[২৩৬]

আসলে সত্যি কি ঘটেছিল তা আমরা জানতে পারব না। কলকাতার এ আই সি সি-তে ট্রাজেডির পঞ্চমাঙ্ক অভিনীত হল। ২৯ এপ্রিল সুভাষ পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কারণস্বরূপ তিনি জানালেন, পন্থ প্রস্তাবানুযায়ী ক্যাবিনেট গড়তে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন, মহাত্মার নির্দেশানুযায়ী ক্যাবিনেট গড়াও সম্ভব নয়। এ আই সি সি যদি নিজে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করে তিনি হয়তো খাপ খাবেন না। নতুন কাউকে সভাপতি করলে সমস্যার সমাধান হতে পাবে। নেহরু তাঁকে পদত্যাগ প্রত্যাহার করতে অনুরোধ জানান। নেহরুর প্রস্তাব—পুরোনো কমিটি থেকে বাজাজ ও দৌলতরাম বিদায় নিন ও সকলের পরামর্শ নিয়ে সুভাষ তাঁদের শূন্য স্থান পূর্ণ করুন। এদিন নেহরু, পন্থ ও কৃপালনিকে গোলমালের সম্মুখীন হতে হয়। পরের দিন সুভাষ আবার composite cabinet অর্থাৎ সব গোষ্ঠীর প্রতিনিধি সংবলিত কমিটির কথা তোলেন। প্রতি বছরই কংগ্রেসের ধমনীতে নতুন রক্ত প্রবাহিত হওয়া উচিত। সেদিনের কর্মপরিচালিকা সরোজিনী নাইডু তাঁর পদত্যাগ ব্যাপারে স্পষ্ট জবাব চাইলে সুভাষ বলেন, homogeneity ব্যাপারে এ আই সি সি প্রস্তাবের ওপর তাঁর পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নির্ভর করছে। নেহরু তখন তাঁর নিজের প্রস্তাব তুলে নেন। নাইডু তখন বিনা ভোটে সুভাষের পদত্যাগ গ্রহণ করেন ও বিনা ভোটে রাজেন্দ্র প্রসাদকে সভাপতি ঘোষণা করেন।[২৩৭] কেউ এ সব কাজকে গণতন্ত্রসম্মত বলবে না। স্বভাবতই বাঙালী প্রতিনিধিরা উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করে, ওয়েলিংটন স্কোয়ারে খণ্ডযুদ্ধ বাধে ও নেতাদের

বিধান রায়ের বাড়িতে আশ্রয় নিতে হয়। এ যেন সুরাটের পুনরভিনয়।

শেষের অধিবেশনে রাজেন্দ্র প্রসাদ যে ওয়ার্কিং কমিটি ঘোষণা করেন বসু ও নেহরু তার সদস্য হতে আপত্তি জানান। নতুন দুজন সদস্য হন—বিধান রায় ও প্রফুল্ল ঘোষ। বসু আর কত লাঞ্ছনা সহ্য করবেন? স্বভাবগর্বিত তিনি—গয়া কংগ্রেসে পরাজিত চিত্তরঞ্জনের সগৌরব প্রত্যাবর্তন ও তাঁব কাছে গান্ধীর নতি স্বীকার তিনি ভুলে যাননি। ইতিহাসের কি পুনরাবৃত্তি হবে না?

সুভাষের মনে হল কংগ্রেসের মধ্যে এক সঙ্ঘবদ্ধ বামপন্থী উপদল গঠন প্রয়োজন। ফরোয়ার্ড ব্লকের জন্ম হল ৩ মে, ১৯৩৯—তাঁরই ভাষায় ফরোয়ার্ড ব্লক হল 'যুগধর্মের প্রকাশ' (expression of the time-spirit)। এই time-spirit কথাটা একেবারে জার্মান Zeitgeist-এর ইংরেজী প্রতিশব্দ এবং সুভাষের চিন্তার পেছনে জার্মান প্রভাবের পরিচয়। ফরোয়ার্ড ব্লকের সামনে তিনটে কাজ—বামশক্তির সংহতিকরণ, কংগ্রেসে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন এবং কংগ্রেসের নামে ও ঐক্যবদ্ধ শক্তির জোবে জাতীয় সংগ্রাম পরিচালন। ২২ জুন বোম্বাইতে বসল ফরোয়ার্ড ব্লকের সর্বভারতীয় সম্মেলন। এব গঠনতন্ত্র পবিষ্কারভাবে ঘোষণা করল—ব্লক কংগ্রেসেরই অন্তর্ভুক্ত এবং কংগ্রেসের সকল বামপন্থীব যৌথ মিলনভূমি। এব লক্ষ্য পূর্ণ স্বরাজ এবং সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। একমাত্র কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্যরাই এর সদস্য হতে পাববে। ব্লকের কর্মসূচির কয়েকটি দিক উল্লেখযোগ্য। (১) ধর্ম ও মরমীয়াবাদকে রাজনীতির ব্যাপারে আধিপত্য করতে দেওযা হবে না। বলা বাহুল্য, এটা গান্ধীব নেতৃত্বেব প্রতি সরাসবি চ্যালেঞ্জ। (২) প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতাব বিরুদ্ধে লড়তে হবে। ১৯৩৫-এর শাসনতন্ত্র চালু হওয়ার ফলে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনেব আওতায় প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যবোধ বাড়ছিল। তদুপরি প্রত্যেক প্রদেশে দেখা দিয়েছিল উপদল। হবিপুবা সভাপতিরূপে সি পি· সঙ্কট মোচন করার সময় সুভাষকে এ ধরনেব দলাদলিব মুখোমুখি হতে হয়েছিল। ওড়িশায নীলকণ্ঠ দাস ও গোদাবরীশ মিশ্র মুখ্যমন্ত্রী বিশ্বনাথ দাসেব বিবোধিতায় নেমেছিলেন। অন্য দিকে ১৯৩৭-এ ইউ পি-র মন্ত্রিসভায় দুজন মুসলিম মন্ত্রীর যোগদান নিয়ে যে কলহের বীজ রোপিত হয, তা ক্রমশ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে বিরাট হয়ে উঠছিল। জিন্নার সঙ্গে আলোচনায় সুভাষ সুবিধা করতে পারেননি। নেহরুকে জিন্নার ১২ এপ্রিল ১৯৩৮-এর চিঠি, পীরপুর ও শরীফ রিপোর্ট (প্রথমটিতে সারা ভারতে, দ্বিতীয়টিতে বিহারে, মুসলিমদের ওপর কংগ্রেসের অত্যাচারের বহু অলঙ্কৃত ও অলীক বিবরণ আছে), মুসলিম লীগের সভাপতির ভাষণ (১৯৩৮)—সবই ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িকতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছিল। সুভাষের মনে হয়েছিল, তখনও আন্তঃসাম্প্রদায়িক সমঝোতা সম্ভব। দাশেব শিষ্য তিনি, হিন্দু-মুসলমান প্যাক্টের কথা ভোলেননি। এ বিষয়ে ওয়ার্কিং কমিটি অনেক উদার হলেও স্থানীয় হিন্দু চাপে প্রাদেশিক কমিটি নির্বাচনে মনোনয়নের ব্যাপারে অনেক বেশি হিন্দুঘেঁষা হয়েছিল। অন্য দিকে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দুই প্রদেশ—বাংলা ও পঞ্জাবে—লীগের প্রভাব তখনও প্রবল নয়। তখনও অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যায়নি। (৩) কায়েমী স্বার্থ—বণিক, শিল্পপতি, জমিদার—তারা নানাভাবে কংগ্রেসের রাজনৈতিক ক্ষমতা কাজে লাগাচ্ছিল ও তার ফলে দুর্নীতি বাড়ছিল। কংগ্রেসের শুচিতা ও অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র বাঁচাতে সে সব অশুভ শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম আবশ্যক। (৪) যুদ্ধ আসন্ন, তার পূর্ণ সুযোগ নেবার জন্য সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনকে জোরদার করতে হবে। শুধু ব্রিটিশ ভারতে নয়, দেশীয় রাজ্যে।

যাঁরা বি· আর· টমলিনসনেব The Indian National Congress and the Raj, 1929-1942, The Penultimate Phase (London, 1979) পড়বেন তাঁরা এ সময়কার কংগ্রেসী রাজনীতিতে যে টানাপোড়েন চলছিল তার একটা ছবি পাবেন। কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির জন্ম (১৯৩৪), "Gandhism has played its part," বলার পরও জয়প্রকাশ নারায়ণেব গান্ধী নেতৃত্ব ছাড়তে অনীহা, সমাজতন্ত্রের প্রতি প্রবল আকর্ষণ সত্ত্বেও নেহরুর বাস্তাববাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং গান্ধী নেতৃত্বে আস্থা, সুভাষচন্দ্রের বিদ্রোহ, কম্যুনিস্ট (তখন তাঁরা ন্যাশনাল ফ্রন্ট নামে কাজ করছেন)-দের বামপন্থী মঞ্চ গড়ার আগ্রহ—প্রত্যেকটারই ঐতিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে।

যাই হোক, জুনের বোম্বাই সম্মেলনের আগে, সরোজ মুখার্জির মতে, পি· সি· যোশী ও জয়প্রকাশ সুভাষচন্দ্রের কাছে প্রস্তাব দেন—সকলে মিলে সারা ভারত বামপন্থী সম্মেলন ডেকে নিখিল ভারত বামপন্থী সমন্বয় কমিটি গঠন করা হোক। এই কমিটির পক্ষ থেকে কংগ্রেসের সংগ্রামবিরোধী কর্মনীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনের ডাক দেওয়া হবে। বোম্বাইতেও আলোচনা হল। কিন্তু সংগঠনেব রূপ কি হবে তাই নিয়ে মতভেদ দেখা দেয়। নরীম্যান বলেন কম্যুনিস্ট, সোস্যালিস্ট সবাই ব্যক্তিগতভাবে ব্লকে যোগ দিন। সহজানন্দ প্রশ্ন করলেন, পদ্ধতি স্থির হবে সংখ্যাধিক্যের ভোটে, না একমত হয়ে? কম্যুনিস্ট ও সোস্যালিস্টরা একযোগে বললেন, সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত উভয় পদ্ধতিতে ব্লকের অন্তর্ভুক্ত হওয়া যাবে। সুভাষ বলেন, আলাদা সংগঠন হিসাবে সবাই কাজ করুন, তবে একটা যুক্ত বামপন্থী সমন্বয় কমিটি গঠন কবা হোক। রায়বাদীবা যোগ দিলেন না। পরে অশোক মেহতা, মিনু মাসানি ও অচ্যুত পটবর্ধনরাও সাম্যবাদীদের পেছনে লাগলেন।[২৩৭ক]

পরবর্তী এ আই সি সি-তে দক্ষিণপন্থীরা দুটি প্রস্তাব আনল। (১) প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অনুমোদন ছাড়া কোন কংগ্রেস সদস্য সত্যাগ্রহ করতে পারবে না, (২) প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ও মন্ত্রিসভার মধ্যে কোন মতদ্বৈধ দেখা দিলে তা পার্লামেণ্টারী সাব-কমিটির কাছে জানাতে হবে। বসু তো এতে আপত্তি করেইছিলেন,[২৩৮] সহজানন্দ সরস্বতীও। বসু এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ৯ই জুলাই প্রতিবাদ দিবস ঘোষণা করলেন। রাজেন্দ্র প্রসাদ বসুকে বললেন, এ ধরনের কাজ শৃঙ্খলা ভঙ্গ করবে। বসু উত্তর দিলেন, এ তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার।[২৩৯] প্রতিবাদ দিবস পালিত হল। বসু দমদম ও আলিপুর জেলে বন্দীদের পক্ষ নিয়েও লড়াই চালালেন। গান্ধী এঁদেব অনশনের বিরোধিতা করেন। কিন্তু ৬ই জুলাই বন্দীবা অনশন শুরু কবে ও ১৬ই বসুর নেতৃত্বে প্রাদেশিক কংগ্রেস সহানুভূতিসূচক বিক্ষোভ (demonstration) চালান। ওয়ার্কিং কমিটি ১১ আগস্টের এক প্রস্তাবে সুভাষকে প্রাদেশিক কমিটিব সভাপতি পদ থেকে অপসারিত করে এবং তিন বছরের জন্য তিনি কোন নির্বাচিত সংস্থার সদস্য হতে পারবেন না বলে ঘোষণা করে।[২৪০] ১৭ আগস্ট রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রাদেশিক কমিটি বাতিল করে দেন এবং সুভাষবাবুর দল বিদ্রোহ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। ওয়ার্কিং কমিটি তখন মৌলানা আজাদের সভাপতিত্বে এক অস্থায়ী (ad hoc) কমিটি গঠন করে। বাংলা সরকার[২৪১] একে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বলেই মনে করেছিল। গান্ধী শ্লেষাত্মক মন্তব্য করেছিলেন, "I could understand rebellion after secession...[২৪২] বলা বাহুল্য এর পর থেকে বাংলার কংগ্রেস বিভক্ত হয়ে গেল—এক কংগ্রেস বসুর নেতৃত্ব মেনে নিল, অন্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বশ্যতা স্বীকার করায় সরকারী কংগ্রেস বলে স্বীকৃত হল। বসুর নির্বাচন প্রার্থী হওয়ার সময় থেকে ছ মাসের মধ্যে তাঁর বহিষ্কারে ট্রাজেডির ওপর যবনিকা পড়ল। গান্ধী বললেন, কাজটা আদৌ

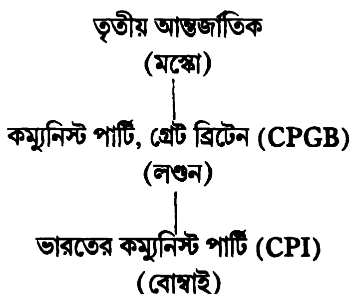
প্রতিশোধমূলক নয়। আর সুভাষ বললেন, দক্ষিণ-পন্থীদের সংহতকরণের এটাই ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতি।

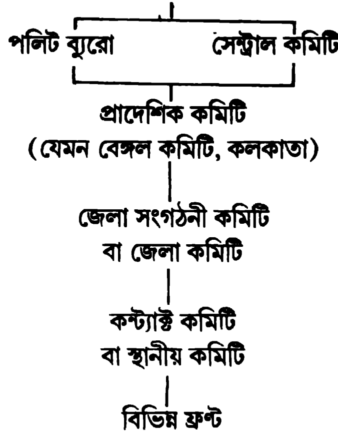
"By trying to warn the country about the continued drift towards constitutionalism and reformism, by protesting against resolutions which seek to kill the revolutionary spirit of the Congress, by working for the cause of Left-consolidation and, last but not least, by consistently appealing to the country to prepare for the coming struggle, I have committed a crime for which I have to pay the penalty." 'ফরোওয়ার্ড ব্লক' পত্রিকার প্রথম সম্পাদকীয়, 'Why Forward Block' ,পড়লে বোঝা যায় তাঁর চিন্তাধারা হেগেলীয় পথে চলেছে। দক্ষিণপন্থীরা যদি 'সিন্থেসিস' হয়, বামপন্থী 'অ্যান্টিথিসিস' আবির্ভূত হবেই। ১৯২০ সালে গান্ধী ছিলেন বামপন্থার প্রতিভূ, আজ (অদৃষ্টচক্রে নয়, বাস্তব পরিস্থিতির পরিবর্তনে) তিনিই নেতৃত্ব দিচ্ছেন দক্ষিণপন্থীদের। অতএব জন্ম হয়েছে বামপন্থী সংগঠন, ইতিহাসেরই নিয়মে। তাকে দুই ফ্রণ্টে যুঝতে হবে—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও কংগ্রেসী আমলাতন্ত্র। আর অনিবার্য কারণে উভয়ের হাতেই খেতে হবে আঘাত। তথাকথিত বামপন্থী নেতা নেহরু গান্ধীর কাছে পুরো আত্মসমর্পণ করেছেন। ওয়ার্কিং কমিটির নেই কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব—তা মহাত্মার ছায়ামাত্র। কিন্তু সত্যিকার বামপন্থীরা তাঁর নির্দেশ মেনে চলবে না।[২৪৩] বস্তুত যুদ্ধ বাধার পর চরখা ও মাদক বর্জনের ওপর জোর দেওয়ায় তাঁর ব্যঙ্গ ও শ্লেষ ক্রমশ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছিল। তিনি যেখানে সকল শক্তি নিয়ে সাম্রাজ্যবাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছিলেন, সেখানে হিংসা, দুর্নীতি, সম্ভাব্য সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের অজুহাতে কংগ্রেস কেবলই চাইছিল সরকারের সঙ্গে আপোস।

॥ ১০ ॥

উনিশ শো সাঁইত্রিশ থেকে উনিশ শো উনচল্লিশ পর্যন্ত কম্যুনিস্ট পার্টি ও সন্ত্রাসবাদী দলগুলির কার্যকলাপ বিষয়ে সবচেয়ে প্রামাণ্য দলিল—বাংলা গোয়েন্দা দফতরের সংকলন—Policy and Activities of the Terrorist Parties in Bengal from 1937 to August 1939 ও গোয়েন্দা বিভাগের ডিরেক্টর জে· এম· ইউয়ার্টের এক সমীক্ষা—Communism in India.[২৪৪]

উচ্চ নীচ ক্রমে কম্যুনিস্ট পার্টি (১৯৩৪ থেকে বেআইনী)-র সংগঠন ছিল নিম্নরূপ—





পার্টির প্রথম দিকের ইতিহাস আগেই কিছু বলা হয়েছে। ১৯২৮-এর কমিন্টার্নের ষষ্ঠ বিশ্ব কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী দল, বিশেষত কংগ্রেস, সম্পর্কে যে নীতি ঘোষণা করেছিল, ১৯৩৫-এ সপ্তম কংগ্রেস তা আমূল পরিবর্তন করে। ১৯২৮-এ বলা হয়েছিল, চীন , ভারত ও মিশরের বুর্জোযারা জাতীয়তাবাদী বুলি আউড়ে জনগণকে প্রভাবিত করছে ও আন্দোলনের ভয় দেখিয়ে সাম্রাজ্যবাদকে কিছু সুবিধা দিতে বাধ্য করছে। সঠিক সাম্যবাদী কৌশলে জনগণকে বুর্জোয়া দলগুলির প্রভাব থেকে মুক্ত করতে হবে। "The Communists must unmask the national reformism of the Indian National Congress..." প্রাভ্দায (১৯৩০) যে Platform of Action of the CP of India প্রকাশিত হয়, তাতে বলা হয়েছিল, "ভারতে বিপ্লবের সবচেয়ে বড বিপদ যে জনগণ এখনো কংগ্রেস সম্পর্কে 'খোয়াব' দেখছে—বুঝতে পারছে না এটা একটা ধনিকদের শ্রেণীসংগঠন..." পরে 'ইনপ্রেকর'-এ ও 'ডেইলি ওয়ার্কার'-এ মহাত্মা গান্ধীর প্রেম, দীনতা, ইত্যাদি ব্যাপারে ধোঁয়াটে কথাবার্তাকে একটা আবরণ আখ্যা দেওয়া হয়েছিল, যার আড়ালে ভারতীয় ধনিকদের স্বার্থ রক্ষিত হয, সমাজিক অনৈক্য ও শোষণের চিরন্তনতা প্রতিপাদিত হয়। কংগ্রেসের মধ্যেও আবার সবচেয়ে নিন্দা কবা হয়েছিল বামমার্গী নেহরু, সুভাষ বসু প্রভৃতিকে। এঁদের জনগণ থেকে দূরে সরিয়ে শ্রমিক কৃষকদের কম্যুনিস্ট পার্টির পতাকাতলে আনতে হবে।

কৌশল কাজে পরিণত হবার আগেই মীরাট মামলার মাধ্যমে কম্যুনিস্ট নেতারা বন্দী হলেন। পার্টি থেকে বিতাড়িত হয়ে এম এন বায়ের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে বিপদ বাড়ল। দলের মধ্যে নানা গোষ্ঠী ছিল। ১৯৩৪-এর মার্চে ডঃ অধিকারী মস্কোতে প্রস্তুত Draft Platform of the Communist Party of India-র ভিত্তিতে রচিত এক থিসিসে আন্দোলনকে দুই পর্বে ভাগ করতে চান। প্রথম পর্বে থাকবে সাধারণ ধর্মঘট, খাজনা বন্ধের জন্য কিষাণ আন্দোলন, পূর্ণ স্বরাজের জন্য দেশব্যাপী অভিযান ও পুলিশ এবং সৈন্য বাহিনীর মধ্যে প্রচার। দ্বিতীয় পর্বে হবে সশস্ত্র অভ্যুত্থান। ১৯৩৪-এর ১১ মে পার্টির একটা নিয়মাবলী প্রকাশিত হল 'ইনপ্রেকর'-এ। বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সম্মেলনে অধিকারী যে মেনিফেস্টো প্রকাশ করলেন তা অনেকটা তাঁর থিসিস অনুযায়ী। তাতে বলা হয়েছিল "The Indian National Congress is a class organisation of the bourgeoisie connected with the liberal

landlords..." কিন্তু কাজ শুরু করার আগেই পার্টি বেআইনী ঘোষিত হল (জুলাই, ১৯৩৪।

১৯৩৫-এর কমিন্টার্নের সপ্তম অধিবেশনে নতুন এক কর্মপন্থা গৃহীত হল এবং ব্রাডলে-দত্ত থিসিস রূপে ভারতে এল। ১৯২৮-এর কংগ্রেস বিরোধিতা ত্যাগ করে পার্টির সদস্যরা কংগ্রেসে, বিশেষত কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টিতে, ঢুকে পড়ে। যুক্ত ফ্রন্টের নীতি (শত্রুরা বলেন Trojan horse policy) শ্রমিক সংগঠনেও প্রতিফলিত হয়। মীরাটে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস সোস্যালিস্ট কনফারেন্স কম্যুনিস্টদের জন্য দরজা খুলে দেয়। তারা শনৈঃ শনৈঃ সোস্যালিস্ট পার্টির কার্যনির্বাহী কমিটিতে, এমনকি সহসচিবের পদেও, গৃহীত হয়। নেহরুর আনুকূল্যে যুক্ত ফ্রন্টের ভাবনা ব্যাপকতর হয়। সাজ্জাদ জহীর, জেড এ আহম্মদ ও এম আশ্রাফ এ আই সি সি-র সদস্য হন। সি এস পি-র সদস্য সুন্দরায়া, গোপালন ও নাম্বুদ্রিপাদ অবশ্য পরে সি পি আই-তে ঢোকেন। সুভাষচন্দ্র যখন প্রথম সভাপতি হলেন, তখন সোস্যালিস্ট ও কম্যুনিস্টরা তাঁকে সমর্থন জানায়। ত্রিপুরীতে তারা পূর্ণ না হলেও, উল্লেখযোগ্য,সমর্থন জানিয়েছিল। ফরওয়ার্ড ব্লক গঠিত হলে তারা এক যুক্ত মঞ্চ গঠন করতে চায়। সুভাষবাবু সবাইকে স্বতন্ত্র থেকে এক বাম সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে আন্দোলন করতে বলেন।

১৯৩৭ থেকে গোপন কেন্দ্র গড়ে তুলছিল কম্যুনিস্টরা। নেহরুর মত বামঘেঁষা নেতাও কম্যুনিস্টদের কৌশল জানতেন।

"They want to utilise the Congress and at the same time to break through it in directions which are opposed to Congress policy." কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি সম্বন্ধেও তাঁর উচ্চ ধারণা ছিল না। দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে কলহ করতে গিয়ে, তারা "antagonised the large middle group and did not succeed as it might have done, in carrying this large anti-imperialist group with it." লখনউ কংগ্রেসের পর তিনি তাদের দলের তিনজনকে ওয়ার্কিং কমিটিতে নিলেও তাদের মতভেদের কথা জানতেন, তাদের কংগ্রেস-নিন্দাও পছন্দ করেননি। ত্রিপুরীতে তাদের আচরণে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হলেও 'বাম সমন্বয় কমিটি' কংগ্রেস প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ৯ জুলাই প্রতিবাদ দিবসরূপে পালন করলে তিনি বেশ ক্ষুব্ধ হন।[২৪৬] মার্ক্সবাদী ও রুশ ভক্ত হলেও তিনি মনে করতেন ভারতের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সমাজতন্ত্রকে খাপ খাওয়াতে হবে, ভারতের ভাষায় তাকে কথা বলতে হবে। তাঁর সমাজতন্ত্রী দর্শনে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের একটা উচ্চ স্থান ছিল। স্তালিনের আমলে স্বৈরতন্ত্রের প্রসার তাঁর ভাল লাগেনি। দ্বিতীয়ত, কংগ্রেসের ওপর সমাজতন্ত্র জোর করে চাপাতে চাননি তিনি। একটা মূলত জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠানের সংগ্রাম এতে ব্যাহত হবে। তৃতীয়ত, গান্ধী থেকে কোনও দিন দূরে চলে যেতে চাননি তিনি। কম্যুনিস্টদের হিংসাশ্রয়ী কর্মপদ্ধতি এজন্যই তাঁর ভাল লাগেনি।

ভাল লাগেনি কংগ্রেস সোস্যালিস্ট দলের চার নেতারও—মাসানি, মেহতা, লোহিয়া ও পটবর্ধনের। ১৯৩৮-এর সেপ্টেম্বরে মাসানি Communist plot against the CSP নামক পুস্তিকা প্রকাশ করেন। লাহোরে সি এস পি-র বার্ষিক অধিবেশনে কম্যুনিস্টরা কার্যনির্বাহী সমিতি প্রায় দখল করেছিল। ৯ জুলাই (১৯৩৯) কিছু সোস্যালিস্ট, কম্যুনিস্ট ও ফরওয়ার্ড ব্লক সদস্য প্রতিবাদ দিবসরূপে পালন করলে মাসানিরা পদত্যাগ করলেন। তাঁদের সঙ্গে কম্যুনিস্টদের মূল পার্থক্য, তাঁদের মতে, "The attitude towards the

Congress, the adherence to peaceful and legitimate means, and the attitude towards the Soviet Government." সরোজ মুখার্জির মতে তাঁদেব বিরুদ্ধে 'Trojan horse' অপবাদ অসত্য। নাম্বুদ্রিপাদ বা গোপালন কেউই কম্যুনিস্ট ছিলেন না, বরং সি এস পি-র কাজে বিরক্ত হয়ে কম্যুনিস্ট হন।[২৪৭] জয়প্রকাশ নারায়ণ কিন্তু পরে মাসানির সন্দেহের সত্যতা স্বীকাব করেছিলেন।[২৪৮]

যুদ্ধ বাধল ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ এবং সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস, সোস্যালিস্ট, কম্যুনিস্ট (তখন 'ন্যাশনাল ফ্রন্ট' নামে কাজ করত), লীগ সবাইকে আপন কৌশল স্থির করতে হল। কংগ্রেস সোস্যালিস্টরা দমননীতি ও কর্মী ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদ, ব্রিটিশ পণ্য বর্জন, কৃষক আন্দোলন, সাধারণ ধর্মঘটের কর্মসূচি নিল ও বোম্বাইতে 'যুদ্ধ সাব-কমিটি' স্থাপন করল। 'ন্যাশনাল হেরাল্ড'-এর প্রবন্ধে জয়প্রকাশ জানালেন যুদ্ধ বিরোধিতা অবশ্যই করতে হবে, কিন্তু গান্ধী-বিরোধিতা নয়। অন্যদিকে কম্যুনিস্টরা বলতে লাগল, কংগ্রেসের নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে কোন ফল হবে না যদি না তারা অংশগ্রহণ করে তাকে বৈপ্লবিক সংগ্রামে পরিণত কবে। তাবা প্রস্তাব নেয় : (১) সম্ভব হলে কংগ্রেস কমিটির মাধ্যমে, না হলে, সহযোগিতায়, গণবিক্ষোভ, সভা, শোভাযাত্রা করতে হবে, (২) সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও অর্ডিন্যান্স-রাজ্যেব বিরুদ্ধ ওয়ার্কিং কমিটির নির্দেশ সমর্থন করতে হবে, (৩) ব্রিটিশ বিভাজন নীতিব বিরুদ্ধে মুসলিম ও অন্য সংখ্যালঘুদের কাছে আবেদন বাখতে হবে, (৪) এমন কিছুই কবা হবে না যা আইন অমান্য ও রাজনৈতিক ধর্মঘট বিষয়ে ওয়ার্কিং কমিটির নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন মনে হয়, (৫) শ্রমিক, কিষাণ প্রভৃতি বিভিন্ন ফ্রন্টেব প্রতিনিধিদেব নিয়ে কংগ্রেস কমিটি গডতে হবে, (৬) প্রচারপত্র প্রকাশ ও বিতবণ আশু কর্তব্য, (৭) কংগ্রেস কমিটির মাধ্যমে, না হলে সমমর্মী কংগ্রেসীদের সাহায্যে,কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবীদের তালিকাভুক্ত করতে হবে। সব কমরেড যেন স্বেচ্ছাসেবী দলে যোগ দেয়। কংগ্রেসের উঁচু সারির নেতারা কম্যুনিস্ট-বিরোধী হলেও নীচের নেতারা সহানুভূতিশীল। সংগ্রাম আরম্ভ হলে এবাই স্থানীয সংগ্রাম সমিতিগুলিব কর্তৃত্ব পাবে। "আজ যদি আমরা তাদের বিশ্বাস উৎপাদন করতে পারি এবং তাদেব সঙ্গে যুদ্ধ-বিরোধী প্রচাব শুরু করি, শীঘ্রই তাহলে আমরা আবো বেশি প্রভাব বিস্তার কবতে পারব।" শ্রমিকদের ২৫% মজুবি বৃদ্ধি, খাদ্য মূল্য বৃদ্ধি বাবদ ভাতা, কিষাণদেব খাজনা মকুব ও কর হ্রাস যুদ্ধ বিবোধেব সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল। "Mixing anti-war propaganda with these demands will enable us to mobilise the workers and peasants *en masse*." জনগণকে হাত করে সংগ্রামেব নেতৃত্ব অধিকাবের কৌশলটা স্পষ্ট। এ ছাড়াও ছিল গোপন কাজেব ব্যবস্থা—কিছু নেতা গা ঢাকা দেবেন, কারাববণ কববেন না। এমনকি দৃষ্টিও আকর্ষণ করবেন না। কেন্দ্রীয কমিটিব গোপন ঘাঁটি হল বোম্বাই, নেতা—অধিকারী ও পি সি যোশী। গোয়েন্দা দফতবেব বিপোর্টে দেখি ইউ· পি·, সি· পি·, বোম্বাই ও বিহারে সংগঠিত অন্তর্ঘাতেব কথা বলা হচ্ছে। নাৎসী-সোভিয়েত চুক্তিকে সমর্থন জানানো হল, কারণ এর ফলে সাম্রাজ্যবাদীবা পারস্পবিক সংঘর্ষে দুর্বল হয়ে পড়বে ও বিশ্ব বিপ্লবেব পথ সুগম হবে।[২৪৯] এই উদ্দেশ্যে রাজদ্রোহী পুস্তিকা ছড়ানো হচ্ছিল। তার মধ্যে দুটি উল্লেখযোগ্য—(১) ডঃ অধিকারীব The Second Imperialist War,[২৫০] (২) The Communist পত্রিকার দ্বিতীয় খণ্ডেব প্রথম সংখ্যা (নভেম্বর, ১৯৩৯)। প্রথমটির বক্তব্য—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা কিছুতেই যুদ্ধের উদ্দেশ্য বর্ণনা করছে না কারণ তারা হিটলারেব বদলে অন্য কোন প্রতিক্রিযাশীল, কিন্তু বন্ধুভাবাপন্ন, শক্তি প্রতিষ্ঠা করতে

চায়—যা রাশিয়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। অন্যদিকে রাশিয়া চায় বিশ্বশান্তি। তাই সব স্বাধীন দেশের প্রলেতারিয়েতের কর্তব্য ফাসিস্তপন্থী সরকারের পতন ঘটানো, পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবলোপ, সর্বত্র ফাসিস্ত-বিরোধী যুক্তফ্রন্ট প্রবর্তন। স্লোগান হবে—"Convert imperialist war into a democratic war." দ্বিতীয় প্রবন্ধটির একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম লক্ষণীয়—"Revolutionary, fight for peace, transform imperialist war into civil war, defend the Soviet Union." গান্ধীবাদী অহিংসার সংস্কারকামী চালচিত্র ভেঙে দিতে হবে, কংগ্রেসকে আপোস করতে দেওয়া হবে না। কংগ্রেস যেন মেনশেভিক, তাই বলশেভিক পদ্ধতিতে তাকে রুখতে হবে। ১৯৪০ সালে সি পি আই-এর বঙ্গীয় প্রাদেশিক শাখা প্রকাশিত Red Flag-এর প্রচারের কথা পরে বলা হবে।

প্রাক্তন সন্ত্রাসবাদীদের প্রতিক্রিয়া দিয়ে শেষ করি। হোম ডিপার্টমেণ্টের এফ· এইচ· পাক্‌ল (Puckle)-এর মতে ১৯৩৯-এর মধ্যে কম্যুনিস্টরা প্রায় সব সন্ত্রাসবাদীদের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেছিল।[২৫১] আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে আবদুল হালিম (১৯৩৪) ও সরোজ মুখার্জি (১৯৩৫) দেওলি ও আন্দামানের সঙ্গে যোগ স্থাপন করেন। ১৯৩৬-এ প্রেসিডেন্সি জেলে তাঁরাই কম্যুনিস্ট সেল স্থাপন করেন। সি পি আই-এর অধীনে জেল কমিটি কাজ কবত। অনুশীলন দল কিন্তু দু ভাগ হয। এক শাখা (A. R. G.—অনুশীলন রিভোল্টেড গ্রুপ) সি পি আই-এব সদস্য হলেও স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছিল। অন্য শাখা প্রতুল গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে বাংলা ও ইউ· পি·-র সৈন্য বাহিনীতে বিদ্রোহ লাগাবার চেষ্টা করে। বাংলার গোয়েন্দা বিভাগেব কর্তা ডি· এ· ব্র্যানডেনের মতে শ্রীসঙ্ঘ ও বি ভি গ্রুপ সন্ত্রাসবাদের নীতিতে অবিচল ছিল ও সুভাষকে সমর্থন করত। যুগান্তর দলের এক শাখা (যাদুগোপাল মুখোপাধ্যাযের অধীনে) প্রকাশ্যে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে সহযোগিতা কবত। অন্য শাখা ছিল সুবেন ঘোষের অধীনে। এঁরা বিধান রায়ের সরকারী কংগ্রেসকে সমর্থন করেন বলে এক উপদল সুভাষেব দিকে চলে যায়। যাদুগোপালের দল, অনুশীলন, বি ভি, শ্রীসঙ্ঘ ও আনন্দবাজার গ্রুপ (?)-এর সাহায্যে ১৯৩৮-এর এপ্রিলে সুভাষবাবু জেতেন ও বি পি সি সি কবজা করেন।[২৫২] মানবেন্দ্রনাথ রায় হতাশ হয়ে ১৯৩৯-এর জুনে বাংলা ছেড়ে যান। যুগান্তরের একদল "স্বাধীন কম্যুনিস্ট পার্টি" গড়েন।

স্বাধীনতা সংগ্রামেব যে মূল স্রোত—কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কম্যুনিস্ট, সন্ত্রাসবাদী, সকলের এত অভিযোগ তার যুদ্ধারম্ভে কি প্রতিক্রিয়া হল?[২৫৩] কংগ্রেস দীর্ঘকাল ধবে জার্মেনী, ইতালী ও স্পেনেব ফাসিস্ত জমানাব নিন্দা করে আসছিল। বলা বাহুল্য, এই নিন্দার প্রবক্তা ছিলেন নেহরু। সুভাষেব নানা পত্রে ও ভাষণে আমরা কৌটিল্যনীতির উল্লেখ শুনি কিন্তু কংগ্রেস শুধু বলছিল, কোন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে তারা ইংরেজদের পক্ষ নেবে না। ৩ সেপ্টেম্বর যুদ্ধ যখন সত্যই শুরু হল তখন বড়লাট ভারতের পক্ষ থেকে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন, ডিফেন্স অভ ইণ্ডিয়া অর্ডিন্যান্স চালু করলেন ও পার্লামেণ্ট ১৯৩৫-এর সংস্কার একদিনে সংশোধন করে ভারত সরকারকে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন প্রয়োজনে মুলতুবি রাখার ক্ষমতা দিলেন। অগত্যা কংগ্রেসকে এমন অবস্থান নিতে হল যা একই সঙ্গে বহির্বিশ্বের আদর্শবাদীদের কাছে আবেদন রাখতে পারে আবার দেশের অভ্যন্তরে বামপন্থীদের পালের হাওয়া কেড়ে নিতে পারে। ফাসিস্ত-বিরোধী আদর্শবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয়তাবাদের দোটানায় প্রথমদিকে কংগ্রেসের কথাবার্তায় একটা অস্পষ্টতা লক্ষ্য করি। গান্ধী নাকি ৪ সেপ্টেম্বর লিনলিথগোকে বলেন, পার্লামেণ্ট ও

ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবের ধ্বংসের কথা স্মরণ করে তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে।[২৫৩ক] ইউ· পি·-র মন্ত্রীরা যুদ্ধে সহযোগিতা করতে চাইছিলেন। নেহরু এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নেন। ১৪ সেপ্টেম্বর ওয়ার্কিং কমিটি যে প্রস্তাব গ্রহণ করে তা নেহরুর দুটি খসড়া মিলিয়ে সুর কিছু মোলায়েম করে রচিত।[২৫৪] তাতে বলা হয়, যখন ভারতীয়দের মতামত না নিয়ে যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, ভারতের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার দাবি মানা হচ্ছে না এবং যেটুকু ছিল হরণ করা হচ্ছে তখন তার পক্ষে পোল্যাণ্ডের ওপর নাৎসী আক্রমণের অজুহাতে যুদ্ধ সমর্থন করা সম্ভব নয়। সহযোগিতা হয় সমানে সমানে। যদি ব্রিটেন সত্যই গণতন্ত্র রক্ষার্থে যুদ্ধে নেমে থাকে তবে তার এখুনি ভারতে পূর্ণ গণতন্ত্র স্থাপন করা উচিত। এই কারণে ব্রিটেনকে তার সামরিক লক্ষ্য অবিলম্বে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করতে হবে এবং ভারতে প্রয়োগ করতে হবে। নেহরু এই যুদ্ধ ন্যায়সঙ্গত মনে করলেও সাম্রাজ্যবাদেব কথা ভোলেননি। প্রস্তাব পড়ে বেয়াত্রিচে ওয়েব তাঁর ডায়েরিতে লেখেন, "Nehru has called the British bluff." নেহরু, প্যাটেল ও আজাদকে নিয়ে এক যুদ্ধকালীন সাব কমিটি গঠিত হয়। ১৫ সেপ্টেম্বর গান্ধী বলেন, তিনি বিনা শর্তে সাহায্য করতে চান কিন্তু নেহরুর ভয় ছিল, যে-বৃটিশ সরকাব গত এক বছর ধরে ইউরোপে বাবংবার নীতি ও আদর্শভ্রষ্ট হয়েছে তারা কি ভাবতবর্ষে ঠিক কাজ করবে?[২৫৫] তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন, শর্তাধীনে সাহায্য করতে তিনি রাজি। "We want to see the end of the law of jungle, but we also want to see the end of imperialism." তিনি মনে করিয়ে দেন স্বাধীন ভারত তার বিপুল সাহায্যসম্ভার নিয়ে যুদ্ধে নামলে বিশ্ব-মানবের কল্যাণই হবে। 'ন্যাশন্যাল হেরাল্ড'-এ লিখলেন, "A statement of war aims should...include : the liberation of countries taken by Hitler, the ending of the Nazi regime, no truce or pacts with fascist powers, and the extension of democracy and freedom by the winding up of the imperialistic structure and the application of the principle of self-determination."[২৫৬] আপাতত এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল সম্প্রসারণ ও কনস্টিট্যুয়েন্ট অ্যাসেম্বলির দাবি উঠল। ১৬ সেপ্টেম্বর সাক্ষাৎকারে গান্ধী জনৈক ভারতীয়কে প্রতিরক্ষামন্ত্রী করার কথা তোলেন।

এ সব পড়ে বড়লাট স্থির করলেন কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা চেয়ে লাভ নেই, তার চেযে মুসলিমদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা শ্রেয়। প্রথম দিকে জিন্নার চেয়ে তাঁর বেশি বিশ্বাস ছিল সিকান্দাবের ওপব। বস্তুত যুদ্ধ বাধলে পঞ্জাব ও বাংলার গুরুত্ব হবে অপরিসীম। "I am perfectly clear in my own mind that we have the whole-hearted support of the Punjab while Fazlul Huq has also publicly lent his support to our attitude...[২৫৭] দেশীয় রাজন্যবর্গ তো সাহায্য করতে উন্মুখ। জুনেই তিনি ফেডারেশনের আশা ত্যাগ করেছিলেন। জামসাহেব যে-সব পূর্ব শর্ত আরোপ করেছিলেন তা কংগ্রেস কোনও দিন মানতে পারে না।[২৫৮] বিকানীর বিরোধিতা করছিলেন। সর্বাধিক রক্ষাকবচ চাইছিলেন নিজাম। ৩১ আগস্টের চিঠিতে জানতে পারি দেশীয় রাজ্যের যে জনসংখ্যা ও রাজ্যদের জন্য নির্ধারিত আসনের যে সংখ্যা যোগ দিলে ফেডারেশন চালু হবে তার থেকে এক চতুর্থাংশ কম যোগ দিয়েছে। দুদিন পরে যুদ্ধ শুরু হলে, ফেডারেশনের প্রহসনের পর যবনিকা নেমে এল। এতে প্রতিরক্ষার ব্যাপারে কোন ক্ষতি হয়নি। জিন্নাকে হাত করার চেষ্টা চলল। জিন্নার প্রথম দাবি হল কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলি বরখাস্ত করা হোক। বড়লাট প্রশ্ন করলেন, গণতন্ত্র ছাড়া সমস্যার সমাধান

কি ? জিন্না অকম্পিত কণ্ঠে বললেন, "ভারত ভাগ।"[২৫৯] ১৯৪০-এর পাকিস্তান প্রস্তাব সরকারীভাবে তোলবার আগেই কি তিনি ভারত ভাগের কথা ভাবছিলেন ?

গান্ধীর সঙ্গে ২৬ সেপ্টেম্বরেব সাক্ষাৎকারে বড়লাট জানালেন এখনই যুদ্ধের লক্ষ্য ঘোষণা করা সম্ভব নয়। ৩ অক্টোবর নেহরুকে জানালেন, ফেডারেশনের আগে ডোমিনিয়ানের প্রতিশ্রুতি তিনি দেবেন না। তারপরও নেহরু ৬ তারিখ যে পত্র লিখেছিলেন, তাব সুব কড়া ছিল না। নেহরু নাকি সুদূরপ্রসারী কোন সংস্কার চাননি, শুধু পরামর্শদাতাব ভূমিকা পেলেই খুশি হবেন।[২৬০] ১০ অক্টোবর এ আই সি সি-তে ওয়ার্কিং কমিটিব ১৪ সেপ্টেম্ববেব প্রস্তাব ১৮৮-৫৮ ভোটে গৃহীত হল। সবচেয়ে বাধা দেয় সোস্যালিস্টবা। সুভাষ বললেন, "The resolution...represents a policy of inaction..." বাজা ও মুসলিমদের মদত পেয়ে ১৭ অক্টোবর বড়লাট ঘোষণা করলেন, মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কাবেব মুখবন্ধে যা আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল (অর্থাৎ ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসেব ?) তাব ব্যতিক্রম হবে না, তবে তা হবে যুদ্ধ শেষে। ভবিষ্যতেব শাসনতন্ত্র বিভিন্ন দল, সম্প্রদায, স্বার্থ, বাজন্যবর্গ—সকলের সঙ্গে আলোচনা করে স্থির হবে। অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা হিসাবে একসিকিউটিভ কাউন্সিল সম্প্রসারণ ও পরামর্শদাতা কমিটি গঠন করা যেতে পাবে।[২৬১] ব্যঙ্গ করে নেহরু লিখলেন, "In 1939 they remind us of an preamble of the Act of 1919."[২৬২]

১৮ অক্টোবর ভাবতসচিব জেটল্যাণ্ড দায়ী কবলেন সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে। এব প্রতিধ্বনি শুনি বডলাটের প্রতিশ্রুতিতে। মুসলিমদের তিনি জানালেন—তাদের সম্মতি ছাড়া কোন সংস্কার আনা যাবে না। গান্ধীব ধৈর্যচ্যুতি ঘটল।[২৬৩] তিনি বললেন, "কংগ্রেস রুটি চেয়েছিল, তাব বদলে পেল পাথব।" ২২ ও ২৩ অক্টোবর অধিবেশনে ওয়ার্কিং কমিটি বড়লাটেব, ১৭ তারিখেব প্রস্তাব নাকচ করে দিল এবং যুদ্ধে অসহযোগিতার নিদর্শনস্বরূপ ১৫ নভেম্ববেব মধ্যে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের পদত্যাগের নির্দেশ দিল। অন্যদিকে একই দিন (২২শে) লীগের দিল্লী অধিবেশন বডলাটের ঘোষণাকে গ্রহণ না কবেও সরকার কংগ্রেসের জাতীয় প্রতিনিধিত্বেব দাবি অগ্রাহ্য করে পরোক্ষভাবে লীগেব মুসলিম প্রতিনিধিত্ব স্বীকার করতে চলেছে এবং তাদেব হাতে শাসন সংস্কাবের ভিটো দিয়েছে এতে আনন্দ প্রকাশ করল। মিণ্টোব মতই লিনলিথগো মুসিলিম তুরুপ (crescent card) ফেললেন।[২৬৪] দুঃখ করে নেহরু ন্যাশনাল হেবাল্ড-এ লিখলেন, "It is a tragedy that at the supreme crisis in our national history, the League should have sided with full-blooded reaction."কিন্তু ট্রাজেডির তখনো ঢের বাকি, সবে বীজসন্ধি হল !

মাদ্রাজ সরকার পদত্যাগ করল ২৭ অক্টোবর, ইউ· পি· ৩০শে, বোম্বাই ও বিহার ৩১শে। তবু গান্ধী, রাজেন্দ্র প্রসাদ (ও জিন্না) ১ নভেম্বর বড়লাটের সঙ্গে দেখা করলে বড়লাট আবার জানালেন প্রদেশের ক্ষেত্রে একটা সমঝোতার চেষ্টা হোক ও কেন্দ্রীয় একসিকিউটিভ কাউন্সিলে আসন বণ্টনের প্রস্তাব দেওয়া হোক। সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের জন্য তাঁর কাউন্সিলে কয়েকটি আসন ও পরামর্শদাতা কমিটির বেশি কিছু দেওয়া সম্ভব হবে না। যা কিছু দেওয়া হবে তাও অস্থায়ী (ad hoc) ভিত্তিতে।

গান্ধীর মধ্যে যে যুদ্ধাশ্ব সুপ্ত ছিল তা আবার গা ঝাড়া দিল। ৪ নভেম্বর তিনি বললেন, "ওয়ার্কিং কমিটির ক্ষমতা রয়েছে আইন অমান্য ঘোষণা ও নিয়ন্ত্রণের। তবে আমি ওয়ার্কিং কমিটিকে পথ দেখাবার ভার নিয়েছি।" এই সুর বিপজ্জনক। ক্রুদ্ধ নেহরু এডওয়ার্ড

টমসনকে লিখলেন, "We shall have nothing to do with it even if the whole Viceroy's council is offered to us, with the Viceroyalty thrown in. It is a complete change in the outlook, the system, the structure, the objective that is an essential preliminary."[২৬৫] কৃষ্ণ মেনন যখন জানালেন, ব্রিটিশ জনগণ সাম্প্রদায়িক সমস্যার ওপব জোর দিচ্ছে, নেহরু উত্তব দিলেন, লীগই একমাত্র মুসলিম ভাবতের প্রতিনিধি নয়। কংগ্রেসী মুসলিম ছাডাও রয়েছে অর্হর, জামিয়াত-উল-উলেমা, মোমিন। আর বাংলা, পঞ্জাব ও সিন্ধু কি জিন্নার অনুগত ?[২৬৬]

বডলাট অহেতুক সাম্প্রদাযিক সমস্যাকে অগ্রাধিকার দেওয়ায় গান্ধী বললেন, ওটা কনস্টিট্যুযেণ্ট অ্যাসেম্বলির জন্য তুলে বাখা হোক। ভারতের স্বাধীনতা লক্ষ্য রূপে ঘোষিত হলেই কংগ্রেস অন্তর্বর্তী সরকাবে যোগ দেবে।[২৬৭] নেহরু তার পূর্বেই সংখ্যালঘু স্বার্থ সংরক্ষণেব নীতি মানতে বাজি ছিলেন, ব্রিটেনের সঙ্গে সন্ধিতে তা অন্তর্ভুক্ত করতে, এমন কি, প্রযোজনে, আন্তর্জাতিক আদালতে সালিশীতে দিতে। শুধু প্রতি প্রদেশের কোযালিশনেব নীতি মানতে তিনি রাজি ছিলেন না।[২৬৮] জিন্না আদৌ গণপরিষদ চাননি, প্রাদেশিক মন্ত্রিসভায় ঢোকাটাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কংগ্রেস মন্ত্রীদের পদত্যাগ করতে নির্দেশ দিলে সেটা ব্যর্থ হয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত কংগ্রেসের অপসারণে তাঁর সুবিধাই বাডল। মন্ত্রিসভা বর্জনেব সিদ্ধান্ত ঠিক হযনি। এতে সিন্ধু, বাংলা ও পঞ্জাবে জিন্নার হাতই শক্ত হল। ২২ ডিসেম্বর তিনি 'মুক্তি দিবস' ঘোষণা করে ফেললেন।

ইতিমধ্যে ২৫ অক্টোবব, প্রধানত চার্চিলের প্ররোচনায়, ব্রিটিশ ক্যাবিনেট স্থির কবে—(১) বডলাটের চবম ক্ষমতা অবিকৃত থাকবে, (২) ব্রিটেনের সৈন্য সংগ্রহ, সংস্থান ও পরিচালনার ক্ষমতা অটুট থাকবে, (৩) যুদ্ধের মধ্যে কোন শাসন সংস্কার পাস হবে না এবং (৪) যুদ্ধের পর কি হবে সে প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হবে না। ৬ নভেম্বর, আবার চার্চিলের চাপে, যুদ্ধোত্তব স্বাধীনতা ও গণপরিষদের দাবি নাকচ হল। এর পর বড়লাটের করার কিছু ছিল না। কংগ্রেস শাসিত প্রদেশে ৯৩ ধারানুযায়ী ছোটলাটের শাসন প্রবর্তিত হয়। জেটল্যাণ্ড নেভিল চেম্বাবলেনকে গণপরিষদের প্রতিশ্রুতি দিতে বলেছিলেন[২৬৯] কিন্তু লিনলিথগো বললেন, এতে ব্রিটেনের আসল উদ্দেশ্য—"to hold India to the Empire."—ব্যাহত হবে।[২৭০] বাধ্য হয়ে ২২ ডিসেম্বর আইন অমান্যের প্রস্তুতিপর্ব রূপে অহিংসা ও গঠনমূলক কর্মসূচি নিল ওয়ার্কিং কমিটি। ক্রিপ্‌সকে লেখা এক চিঠিতে জিন্না ও লীগের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার কবলেন নেহরু।[২৭১] বড়লাটের সঙ্গে ৫ ফেব্রুয়ারি এক সাক্ষাৎকারের পর গান্ধী আবার ব্রিটেনের বিবেকের কাছে আবেদন রাখলেন—কিঞ্চিৎ উচ্চতর গ্রামে। ৫ মার্চ তিনি হুমকি দিলেন—আইন অমান্যের জন্য অন্তরের আদেশ যে কোনো দিন আসতে পারে।

গোয়েন্দা দফতরের মতে রামগড় কংগ্রেসের আগে নিয়ন্ত্রণ গান্ধীর হাতেই ছিল। বামপন্থীরা মনে করছিল আন্দোলন আসন্ন, আর দক্ষিণপন্থীরা চাইছিল কথাবার্তা চলুক।[২৭২] অনেকেই গান্ধীর দীর্ঘসূত্রিতা, বড়লাটের সঙ্গে বারংবার সাক্ষাৎকার, নরম ও গরম সুরে বিবৃতি প্রদান পছন্দ করেনি। সুভাষ বসুর ধারণা ছিল, "ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সমঝোতার চেষ্টা চলছে রঙ্গমঞ্চের অন্তরালে।" নেহরুও গান্ধীকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন—তাঁর কাজের অপব্যাখ্যা হচ্ছে।[২৭৩]

তবু কেন মহাত্মা এভাবে চলছিলেন ? প্রথমত, প্রতিপক্ষের হৃদয়ের পরিবর্তন সহজসাধ্য

নয় বলে সত্যাগ্রহীর কর্তব্য তাকে যথেষ্ট সময় দেওয়া। ব্রিটেনের বিপদের পরিপ্রেক্ষিতে তা আরও কঠিন হয়েছিল বলে তিনি সময়সীমা বাড়াচ্ছিলেন। দ্বিতীয়ত, ব্রিটেন যতই শত্রু হোক, নাৎসী কার্যকলাপে গান্ধীর বিতৃষ্ণা জাগা অস্বাভাবিক নয়। একটা ব্যাপক আন্দোলন শুরু করে অপ্রস্তুত ব্রিটেনকে বিব্রত করতে চাননি তিনি।

নেহরুর মত না হোক, তিনিও বুঝতে পারছিলেন এই যুদ্ধের প্রকৃতি ঠিক প্রথম মহাযুদ্ধের মত নয়। ফাসিজমের অভ্যুত্থান ও প্রসারে গণতান্ত্রিক দেশগুলির যথেষ্ট হাত থাকলেও শেষপর্যন্ত যখন তারা ফিরে দাঁড়িয়েছে তখন তাদের দুর্বল হাত আরো দুর্বল করাব ইচ্ছা তাঁর ছিল না। এখানেই সুভাষের সঙ্গে তাঁর বিরোধ—তিনি কৌটিল্যনীতির নিরঙ্কুশ প্রবক্তা ছিলেন না। তৃতীয়ত, আন্দোলনের জন্য দেশ বা কংগ্রেস তৈরি হয়নি একথা অনেকদিন আগে থেকেই তিনি বলে আসছিলেন এবং এজন্য সুভাষের সঙ্গে মতভেদও হয়েছিল। মূলত, বামপন্থীদের তিনি দূরদৃষ্টিহীন adventurist মনে করতেন, লক্ষ্য ও উপায় নিয়ে কোন মাথাব্যথা তাদের ছিল না। চতুর্থত, সেই ১৯৩০ থেকে তিনি দুটো দুর্বলতার কথা বলে আসছেন—সাম্প্রদায়িক অনৈক্য ও দুর্নীতিপরায়ণতা। জিন্নার সঙ্গে শেষ কথাবার্তায়ও প্রথমটার কোন সুরাহা হয়নি আর দ্বিতীয়টা কংগ্রেসী মন্ত্রীদের আমলে বেড়েছে বই কমেনি। তাঁব আশঙ্কা ছিল সত্যাগ্রহ জোরদার হলে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বাধবে ও ইংরাজরা তার সুযোগ নেবে। জেটল্যাণ্ডের ১৮ অক্টোবরের ভাষণ, লিনলিথগোর নানা বক্তৃতা থেকে এ সত্য সূর্যের মত ভাস্বর। পঞ্চমত, ইংরেজরা কংগ্রেসের দাবি মেনে নিলে কংগ্রেস কিভাবে তাদের সাহায্য দেবে তা নিয়ে তাঁর ও তাঁর সহকর্মীদেব মতদ্বৈধ দেখা দিয়েছিল। গান্ধীর মতে সামরিক (অর্থাৎ সহিংস) সাহায্য দেবার কথা ওঠেই না কিন্তু অন্যরা তাতে রাজি ছিলেন।

গান্ধীর মনোভাব বুঝে মুন্সী ও ভুলাভাই বড়লাটকে বলেছিলেন, জিন্নাকে প্রশ্রয় দিয়ে গান্ধী ও দক্ষিণপন্থীদের দূরে সরিয়ে দেওয়া ঠিক হচ্ছে না।[২৭৪] কিন্তু বড়লাট এখনও অন্তর্বর্তীকালে কাউন্সিল সম্প্রসারণ ও যুদ্ধান্তে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের আশ্বাসকে যথেষ্ট মনে করছিলেন। তাঁর ভারতসচিবকে লেখা ফেব্রুয়ারি ও মার্চের চিঠি বিশ্লেষণ করে দেখেছি তাতে নিম্নলিখিত ক্রিয়াপদগুলি পুনঃপুনঃ ব্যবহৃত : hold out, refrain from, lie back, avoid running after (the Congress).[২৭৫]

মুন্সীর ভয় অমূলক ছিল না। বামপন্থীদের চাপে নেহরু বিব্রত বোধ করছিলেন। কংগ্রেসীদের মনোবল ভেঙে পড়ছিল এবং সংগ্রামে দেরি হলে অনুকূল বাতাবরণ থাকবে না একথা গান্ধীকে জানান তিনি।[২৭৬] আজাদকেও।[২৭৭] গান্ধী যে ক্রমশ ইংরেজদের সহানুভূতিহীন ব্যবহারে বিরক্ত হচ্ছিলেন তার প্রমাণও পাওয়া যাবে কৃষ্ণ মেননকে লেখা নেহরুর চিঠিতে।[২৭৮] তিনি বুঝেছেন ডোমিনিয়ান ও স্বরাজ সমার্থক নয়। তাঁর কনস্টিট্যুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি বিষয়ে ধারণা আরও প্রগতিশীল হয়েছে। রাজন্যবর্গ ও সংখ্যালঘু সমস্যাকে তিনি সাম্রাজ্যবাদের অঙ্গ বলে বুঝতে পারছেন।

॥ ১১ ॥

এসবের ফলশ্রুতি রামগড কংগ্রেসের প্রস্তাব (২০ মার্চ ১৯৪০)। স্থির হল (১) সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে অংশ নেওয়া হবে না। (২) ডোমিনিয়ানের মর্যাদা যথেষ্ট নয়। (৩) গণপরিষদ চাই এবং বোঝাপড়া দ্বারা বা সালিশী দ্বারা সংখ্যালঘু অধিকার রক্ষিত হবে। (৪) কংগ্রেস সাংগঠনিকভাবে প্রস্তুত হবে। কোন সংকট দেখা দিলে আইন অমান্য শুরু হবে। (৫) গান্ধী তার নেতৃত্ব দেবেন কিন্তু শৃঙ্খলা-সাপেক্ষে ও গঠনমূলক কর্মসূচি পালিত হলে। এই পিছুটানের বিরোধিতা করে কম্যুনিস্টরা ও বামপন্থীরা কিন্তু পায় মাত্র ষোল ভোট। ইতিমধ্যে ওয়ার্কিং কমিটি বি পি সি সি-কে মুলতুবি ঘোষণা করায় সুভাষ বসু নিকটবর্তী কিষাণনগরে Anti-Compromise Conference নামে সমান্তরাল অধিবেশন চালান।[২৭৮ক] ওয়ার্কিং কমিটির আলোচনা (১৬-১৯ মার্চ)-য পড়ি গান্ধী বলেন, সত্যাগ্রহ শুরু হলে সরকার কিছু করবে না কিন্তু লীগ ও অন্যান্য কংগ্রেস-বিরোধীদের লেলিয়ে দেবে। প্যাটেল এটা মেনে নিয়েও বলেছিলেন—অন্তত ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আরম্ভ না করলে কংগ্রেস হতোদ্যম হয়ে পড়বে। ৪ জানুয়ারি থেকে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত সুতিকল শ্রমিকদেব ধর্মঘট, খাদ্য ভাতা নিয়ে কানপুরে শ্রমিক অসন্তোষ, ইম্পিরিয়াল টোব্যাকোর ধর্মঘট, চিনিকলে অসন্তোষ বুঝিয়ে দিল বাতাস কোন দিকে বইছে। গান্ধী এ প্রস্তাব নিয়ে চিন্তা করতে রাজি হন।[২৭৯] বোঝা যায় শুধু বামপন্থীদেব নয় তথাকথিত দক্ষিণপন্থীদের চাপও পড়ছে গান্ধীর ওপর।

লীগের লাহোর প্রস্তাব ('পাকিস্তান' প্রস্তাব বলে খ্যাত) পড়ে বড়লাট কিছুটা আশ্বস্ত হলেন। পাকিস্তানের পূর্ব ইতিহাস আগেই কিছু বলা হয়েছে। জিন্না তখন কান দেননি। কিন্তু কৌমকে খুশি রাখতে কংগ্রেসী শাসনেব বিরুদ্ধে নানা মিছে অপবাদ দিতে দিতে তিনি নিজের কথার জালে জড়িয়ে পড়লেন। ১৯৩৯-এব মার্চে লীগ একটা বিশেষ কমিটি গঠন করল পৃথকজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলিমদেব জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্রবিষয়ক নানা প্রস্তাব বিচাব করতে। একটা হল সিকান্দারের প্রস্তাব। তাতে কেন্দ্র হবে দুর্বল, পঞ্জাব কর্তৃত্ব করবে সিন্ধু, সীমান্ত ও বালুচিস্তানের ওপর। দ্বিতীয়টা—বহমত খানেব। আটটি মুসলিম বাষ্ট্র আলাদা করে নিয়ে গঠিত হবে Pakistan Commonwealth of Nations. তার সঙ্গে মধ্য এশিয়া ও তুরস্কের সংহতি স্থাপিত হবে।[২৮০] তৃতীয়টি হল আলিগড় প্রস্তাব। ভারতকে তিনটি আলাদা রাষ্ট্রে ভাগ করা হবে—একটি হিন্দুস্তান, অন্য দুটি মুসলিম শাসিত রাষ্ট্র। হিন্দুস্তান থেকে আবার দিল্লী ও মালাবার নিয়ে নেওয়া হবে। তিনটি প্রস্তাবের মধ্যে ঐক্যসূত্র ছিল—মুসলিমদের পৃথক জাতিত্ব। তদনুসারে কংগ্রেস প্রস্তাবিত বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত গণপরিষদের ধারণা পবিত্যজ্য।[২৮১] আয়েষা জালালের মতে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল জাফরুল্লা খাঁর চতুর্থ প্রস্তাব।[২৮২] এরও বৈশিষ্ট্য ছিল দুর্বল ফেডারেল কেন্দ্র। তবে এতে মুসলিম ফেডারেশনগুলি সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে গঠিত হবে না। জিন্না কোনটাই চাননি। কেন্দ্রে লীগ দল শক্তিশালী না হলে মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশগুলি বিপন্ন হবে। তা ছাড়া যিনি কেন্দ্রে মুসলিম কৌমের অনন্য মুখপাত্র হবেন, তিনি তাকে দুর্বল করতে চাইবেন কেন? ইউ.পি. ছিল তাঁর পীঠস্থান। পূর্বে ও পশ্চিমে দুটো আলাদা রাষ্ট্র তৈরি হলে ইউ.পি-র মুসলিমদের ফায়দা কি? এসব গোলমাল এড়াতে মুসলিম রাষ্ট্রগুলির সীমানা নির্দেশ কবা হল না। জনৈক সদস্য যখন বললেন, এতে

অবিভক্ত পঞ্জাবের কথা স্পষ্টভাবে বলা হোক, লিয়াকত আলি খাঁ উত্তর দিলেন, "If we say Punjab that would mean that the boundary of our state would be Gurgaon, whereas we want to include in our proposed dominion Delhi and Aligarh which are centres of our culture...Rest assured that we will not have to give away any part of the Punjab."[২৮৩] অর্থাৎ ব্যাপারটা পুরো অস্পষ্ট বাখলে ব্রিটেন ও কংগ্রেসের সঙ্গে দর কষাকষির সুবিধা হবে একথা ধুরন্ধর রাজনীতিজ্ঞ জিন্না বুঝতেন। তবে এটা তাঁর দুর্বলতারও পরিচায়ক। বাংলা ও পঞ্জাবের মত সংখ্যগুরু মুসলিম প্রদেশকে তিনি চটাতে চাননি। জালাল তাই তাঁকে আখ্যা দিয়েছেন—"a good player with poor hands."

এই প্রসঙ্গে তিনটে কথা মনে রাখতে হবে। (১) লাহোব প্রস্তাবে 'পাকিস্তান' শব্দটা নেই, (২) দেশভাগেব আভাসও নেই, আর (৩) এ প্রস্তাব শুধু অস্পষ্ট নয়, স্ববিরোধী। এর তৃতীয় অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পূর্বে ও উত্তর পশ্চিমে দুটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র হবে যাব অংশ (unit) গুলি হবে "autonomous and sovereign". স্বাধীন রাষ্ট্রের সার্বভৌম অংশ বলতে কি বোঝায় ? দ্বিতীযত, মুসলিম স্বাধীন বাষ্ট্রগুলি নিজেবা সার্বভৌম হবে শাসনতন্ত্র প্রণয়নেব পব। তবে কি মাঝখানে আর একটা স্তর আছে, অর্থাৎ জিন্নাব পক্ষে দব কষাকষিব অবসব ? তৃতীযত, হিন্দুশাসিত অঞ্চলে সংখ্যালঘুব ওপব সুবিচার ও মুসলিম শাসিত অঞ্চলে হিন্দুদেব প্রতি সুবিচাবেব উল্লেখ কি এক ধরনের কেন্দ্রের ইঙ্গিত বহন করছে না ? কেন্দ্র থাকবে, দুটো স্বাধীন মুসলিম বাষ্ট্র হবে, তার আবার সার্বভৌম য়ুনিট থাকবে, এ কি অদ্ভুত ব্যবস্থা ? সব ভাল কবে বিশ্লেষণ করে আমাব সিদ্ধান্ত—এটা জিন্নার একটা চাল (ploy বা gambit)। ১৯৪৬ পর্যন্ত জিন্না তথা লীগ এই অস্পষ্ট ও স্ববিবোধী প্রস্তাবেব কোন সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেযনি। জিন্না শুধু বলেছেন, হিন্দু ও মুসলিম দুটো আলাদা জাতি, এদেব নিযে এক রাষ্ট্র গডা যায না। বডলাটেরও মনে হয়েছিল এটা দর কষাকষির হাতিযার, কংগ্রেসেব পূর্ণ স্বরাজ ও গণপবিষদেব 'অসম্ভব দাবি'র 'অসম্ভব' পাল্টা জবাব।[২৮৪] বেশ পছন্দই কর্বেছিলেন তিনি। মনে হয় আপন কাউন্সিলেব জাফরুল্লা খাঁকে একটা প্রস্তাব আনতে উসকেও দেন। তাঁব হোম মেম্বার, ম্যাক্সওযেল, কংগ্রেসকে চূর্ণ কবতে প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

১০ মে উইনস্টন চার্চিলেব নেতৃত্বে ব্রিটেনেব মন্ত্রিসভা পুনর্গঠিত হল। নতুন ভারতসচিব এমেবি যখন বডলাটকে ১৯৩৫-এব সংস্কারের বিকল্প অনুসন্ধান করতে বলেন, তখন তিনি জানান, প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাব মাধ্যমে লীগ যুদ্ধে প্রভূত সাহায্য দিচ্ছে। তাদের মৌচাকে ঢিল মেরে লাভ নেই। সৈন্যবাহিনীব শতকরা যাট ভাগ মুসলমান—এ বাস্তব সত্য ভুললে চলবে না।[২৮৫] উৎসাহ পেয়ে জিন্না দর বাডিয়ে চললেন। ২৮ জুনের সাক্ষাৎকারে তিনি বললেন, (১) গণপবিষদ ডাকা চলবে না, (২) কেন্দ্রীয ও প্রাদেশিক সরকারে মুসলিমদেব জন্য অর্ধেক আসন সংরক্ষণ করতে হবে ও (৩) তাদের মনোনয়ন করবে লীগ (অর্থাৎ তিনি নিজে)। কাছাকাছি সময়ে নেহরু, রাজেন্দ্র প্রসাদ ও আসফ আলিকে লিখেছিলেন, জিন্নাব সঙ্গে বিরোধ সাম্প্রদায়িক নয়, রাজনৈতিক। চিরদিনেব মডারেট জিন্না কংগ্রেসেব পেছনে বামপন্থীদেব দীর্ঘ ছায়া দেখে ভয় পাচ্ছিলেন।

ওয়ার্কিং কমিটির শুধু সে ভযই ছিল না, জিন্নার ক্রমবর্ধমান দাবি ও বড়লাটের তাতে প্রশ্রয় দেওযায় তাঁবাও আপোসের জন্য উদগ্রীব হয়েছিলেন। ১৭-২১ জুনের ওযার্কিং কমিটি জানাল তাঁদের শর্ত মেনে নিলে গান্ধী সকল দায়িত্ব ছেড়ে দেবেন, অর্থাৎ সামরিক

সাহায্যদানের কোন বাধা থাকবে না। ৩-৭ জুলাই-এর বিতর্কে রাজাজি বললেন, "আমাদের প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক, অহিংসা প্রচারের যন্ত্র নয়।" পূর্ণ স্বরাজের দাবি কমিয়ে অস্থায়ী, কিন্তু সব দলের প্রতিনিধি নিয়ে, জাতীয় সরকারের দাবি ওঠান হল। রাজাজিকে প্যাটেল ও আজাদ সমর্থন করলেন। প্রস্তাবটা অপছন্দ হলেও ফ্রান্সের পতনে বিষণ্ণ নেহরু প্রতিরক্ষার জন্য সামরিক সাহায্য দিতে প্রস্তুত হলেন।[২৮৬] মোটের ওপর গান্ধী ছাড়া সকলেই তাতে রাজি হওয়ায়, এ আই সি সি-র সম্মতি পাওয়া শক্ত হল না। পরে আমরা জানতে পারি, বড়লাট ও এমেরি মিলে একটা নরম ঘোষণার খসড়া করেছিলেন কিন্তু চার্চিলের ২৫ জুলাই-এর কড়া টেলিগ্রামে তা অর্থহীন হয়ে যায়। এমেরি দুঃখ করে বড়লাটকে লেখেন, "The trouble is that he (Churchill) reacts instinctively and passionately against the whole idea of any government of India other than that which he knew forty years ago "[২৮৭]

পর্বত মূষিক প্রসব করল—বড়লাটের ৮ আগস্টের ঘোষণায়। প্রথমত, যুদ্ধের পর ভারতীয়রাই আপন শাসনতন্ত্র রচনা করবে। দ্বিতীয়ত, তারাই নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা দ্বারা কি ধরনের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান তৈরি হবে, কি ভাবেই বা তা কাজ করবে, এসব স্থির করবে। তৃতীয়ত, এখন বড়লাটের শাসন পরিষদ সম্প্রসারণ করা হবে। চতুর্থত, আরো একটা পরামর্শদাতা পরিষদ গঠিত হবে যা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে জনমতকে জড়িত করবে। তৃতীয় ও চতুর্থ সংস্কারের মাধ্যমে পরবর্তীকালে ভারত ব্রিটিশ কমনওয়েলথের স্বাধীন ও সমান শরিক হবে। এর মধ্যে সবচেয়ে আপত্তিজনক কথা ছিল মুসলিম, রাজন্যবর্গ ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের প্রতি প্রতিশ্রুতি (pledge)—তাদের সম্মতি ছাড়া সরকার কোন সংস্কার গ্রহণ করবে না। এমেরি ঠাট্টা করে বলেছিলেন, এ হল "Linlithgow Charter for Muslims and minorities"।[২৮৮] এই প্রতিশ্রুতি ও চার্চিলের কাণ্ডকারখানা লীগের দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও মদত দিল। ১৯৪১-এর আগস্টে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তিনি যে আটলান্টিক চার্টার সম্পাদন করেন তার তৃতীয় ধারা ভারতের প্রতি প্রয়োগ করা হবে না বলে তিনি পার্লামেন্টে ঘোষণা করেন ৯ সেপ্টেম্বর। গান্ধী নিন্দা করলেন। নেহরু খুশি হলেন—সংঘর্ষের সময় সমাগত। এ আই সি সি-র বম্বে (১৫-১৬ সেপ্টেম্বরের) অধিবেশনে বড়লাটের ঘোষণা অগ্রাহ্য হল।[২৮৯] ততদিনে জানা গেছে বড়লাট প্রাদেশিক সরকারদের কঠোর দমননীতি প্রয়োগ করার অনুমতি দিয়েছেন। আশ্চর্যের ব্যাপার শ্রমিক দলও তাতে সায় দিয়েছিল।[২৯০]

জিন্না সুবিধে বুঝে দর বাড়ালেন। বড়লাটের সঙ্গে পত্রালাপে তাঁর দম্ভ প্রকট। তিনি দাবি করলেন কংগ্রেস যদি পরে কাউন্সিলে যোগ দিতে চায়, তবে লীগের শর্তে যোগ দিতে হবে। বড়লাট মনে করলেন এটা আসলে প্রধানমন্ত্রিত্বের দাবি। ২৪ সেপ্টেম্বরের সাক্ষাৎকারের পর জিন্না আর এক কড়া চিঠি লিখলেন। পড়ে এমেরির মনে হল, জিন্না সিংহাসনের পেছনের ছায়া হতে চাইছেন, "and a very definite and visible shadow at that."[২৯১] ২৯ সেপ্টেম্বর লীগ ৮ আগস্টের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। লিনলিথগো আপাতত তা ঠাণ্ডাঘরে রেখে দিলেন। সাম্প্রদায়িক কারণ দেখিয়ে জিন্না প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তাই হক ও সিকান্দারের ইচ্ছা থাকলেও অ্যাডভাইসারী কাউন্সিলে যোগ দেবার উপায় ছিল না। জিন্না তাঁদের মাথার ওপর দিয়ে মুসলিম ভোটদাতাদের কাছে আবেদন করলে কি হবে ? লীগকে ভাগ করতেও তাঁরা চান না। এখন থেকে জিন্না তাঁদের

কোণঠাসা করে রাখবেন।

শুধু গান্ধীর পক্ষে আর দেরি করা সম্ভব ছিল না। ১৫ অক্টোবর যুদ্ধ-বিরোধী প্রচারের স্বাধীনতার জন্য তিনি ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ শুরু করলেন বিনোবা ভাবেকে দিয়ে। বিনোবা গ্রেফতার হলেন ২১শে। দ্বিতীয় সত্যাগ্রহী রূপে এগিয়ে এলেন নেহরু। বাক্-স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে তিনি ইউ. পি. কিষাণদের আবার খেপাতে পারেন সে ভয় ছিল কর্তৃপক্ষের। তাই তাঁকে ৩০ অক্টোবর গ্রেফতার করা হল এবং চার বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হল। চার্চিলের মত লোকও এই কঠিন দণ্ডে বিব্রত বোধ করলেন এবং জেলে সদ্‌ব্যবহারের সুপারিশ করলেন।[২৯২] কংগ্রেস সভাপতি কারারুদ্ধ হলেন ১৯৪১-এর জানুয়ারিতে। মে মাসের মধ্যে ১৪,০০০ সত্যাগ্রহী কারাবরণ করেছিল।

ততদিনে বড়লাট মনস্থির করে ফেলেছেন। কোন দলকে আলোচনার জন্য না ডেকে তিনি একসিকিউটিভ কাউন্সিল সম্প্রসারণ করলেন। সবসুদ্ধ তের জনের কাউন্সিলে ৮ জন বেসরকারী ভারতীয় ও ৫ জন সরকারী সদস্য থাকবেন। এর সঙ্গে তিনি গঠন করলেন ৩১সদস্যের এক জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদ (National Defence Council)। এর ২২ জন সদস্য আসবে ব্রিটিশ ভাবত থেকে, ৯ জন দেশীয় বাজ্য থেকে।[২৯৩] যে ৮ জন ভারতীয় একসিকিউটিভ কাউন্সিলে এলেন তাঁরা হলেন—নলিনী সরকার, রামস্বামী মুদালিয়াব, ফিরোজ খান নুন, সুলতান আহমেদ, এম এস অ্যানি, আকবর হায়দারি, রাঘবেন্দ্র রাও ও মোদী। হায়দারির মৃত্যু হলে তাঁর স্থান নেন স্যার মহম্মদ উসমান। পরে অনুন্নতশ্রেণী থেকে আম্বেদকবকে ও একজন শিখ নেতাকে নেওয়া হয়। তাঁর অনুমতি ছাড়া বাংলা, আসাম ও পঞ্জাবেব প্রধানমন্ত্রীবা প্রতিরক্ষা পরিষদের সদস্য হওয়ায় জিন্না "রেগে প'গল"। এব অন্যতম কাবণ বড়লাট ও এমেবি তাঁর পাকিস্তানের প্রস্তাব সুনজবে দেখেননি।

জিন্না সেপ্টেম্বরের মধ্যে এঁদের প্রতিরক্ষা পরিষদ ত্যাগ করতে হুমকি দিলেন। হক তখন লীগ ছাডলেন, শ্যামাপ্রসাদের সহায়তায নতুন মন্ত্রিসভা গঠন কবলেন ও পুনরায় পরিষদে এলেন। সিন্ধুর প্রধানমন্ত্রী আগেই জিন্নাব সঙ্গে কলহ কবেছেন। শুধু এতটুকু পবিবর্তন কবেই বড়লাট দেখিয়ে দিলেন—জিন্নার দম্ভ কত অসার। তবু তিনি তাঁকে ছাডতে পাবলেন না। যুদ্ধের অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়েছিল।

দশ মে, ১৯৪০ হিটলাবেব ৮৯ ডিভিজন সৈন্য হল্যান্ড, বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এক হাজার ভারী ট্যাঙ্কসহ তিন হাজার সাঁজোয়া গাডি ও দশ ডিভিজন সৈন্য ছিল ঝটিকা আক্রমণের প্রধান অস্ত্র।

সবচেয়ে বিস্ময়কব ছিল আর্ডেনের মধ্য দিযে রুন্‌ডস্টেটের দ্রুত অগ্রগতি। ক্লিস্ট্ মিউজ নদী অতিক্রম করলেন মাত্র তিনদিনে। হালডার বলছেন, হিটলার আপনার অবিশ্বাস্য সাফল্যে থমকে না গেলে ২৭ মে ও ৪ জুনের মধ্যে ব্রিটিশ বাহিনীকে ডানকার্ক থেকে অপসারণ করা যেত না। হিটলারের বিখ্যাত জীবনীকাব অ্যালান বুলক লেখেন, নাৎসী-সোভিয়েত চুক্তি দ্বারা হিটলার নিজেকে বিসমার্কের সমকক্ষ করেছিলেন, এখন এই সামরিক জয়ের দ্বারা মোলট্‌কি ও লুডেনডর্ফের জয়কে ছাপিয়ে গেলেন, এমনকি ফ্রেডেরিক দ্য গ্রেট ও নেপোলিয়ানকে চ্যালেঞ্জ জানালেন।[২৯৪]

কিন্তু জয় কি কাজে লাগল ? হিটলার কোনওদিন পশ্চিম ইউরোপে সম্প্রসারণ চাননি। জার্মেনীর 'লেবেনস্রম' পূর্ব ইউরোপে বিধিনির্দিষ্ট। ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স তাঁকে মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে আধিপত্য বিস্তারে বাধা দিয়েছিল বলে তাদেব সঙ্গে যুদ্ধ। তিনি ব্রিটেনেব সঙ্গে

মৈত্রী করতে প্রস্তুত ছিলেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধেও কোন আপত্তি ছিল না। রুন্‌ডস্টেটকে তিনি নাকি বলেছিলেন—ক্যাথলিক চার্চ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পাশ্চাত্য সভ্যতাব দুই স্তম্ভ। ইংল্যান্ড যদি জার্মানি উপনিবেশ ফিরিয়ে দেয় ও জার্মেনীকে ইউরোপে কর্তৃত্ব করতে দেয় তিনি কেন পশ্চিম ফ্রন্টে যুদ্ধ চালাবেন ? বিশেব দশকে তিনি কি লেখেননি, **"When we speak of new territory in Europe today we must think principally of Russia and her border vassal states. Destiny itself seems to wish to point out the way to us here...The colossal empire in the east is ripe for dissolution, and the end of the Jewish domination in Russia will also be the end of Russia as a state."**[২৯৫]

তবু কেন তিনি সোভিয়েতের সঙ্গে চুক্তি কবেছিলেন (২৪ আগস্ট ১৯৩৯) তাব বিস্তৃত বর্ণনা প্রাসঙ্গিক নয়। শুধু মনে রাখতে হবে এর সঙ্গে এক গোপন ধারা (protocol) ছিল। আর ২৪ অক্টোবর ১৯৩৯ ও ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০ রাশিয়ার সঙ্গে আরও দুটি অর্থনৈতিক চুক্তি সম্পাদিত হয়। হিটলার চেয়েছিলেন, ১৯৩৫-এর ফ্রাঙ্কো-সোভিযেত চুক্তি, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে রাশিযার দীর্ঘায়িত আলোচনা এবং পোল্যান্ডকে দেওয়া ব্রিটিশ ও ফরাসী গ্যারান্টি এক আঘাতে চূর্ণ করে দিতে। ব্রিটিশ দলিলপত্র থেকে দেখা যায় ইংরেজবা জার্মেনী ও পোল্যান্ডের মধ্যে আলোচনা চেয়েছিল কিন্তু পোল্যান্ডকে চাপ দিতে নয। ইতিমধ্যে পশ্চিমী গণতন্ত্রের গড়িমশিতে বিবক্ত হযে স্তালিন মলোটভেব মাধ্যমে স্যুলেনবার্গের সঙ্গে যোগযোগ করেন (১৯৩৯, ২০ মে)। আইজ্যাক ডয়সার সুন্দর বলেছেন, "স্তালিন ব্রিটিশ ও ফবাসী প্রতিনিধিদেব জন্য খোলা বেখেছেন তাঁব সদর দরজা, আব জার্মানদেব সঙ্গে আলোচনা চলছে পেছনের সিঁড়ি দিয়ে।" আজ সন্দেহ নেই যে গণতান্ত্রিক দেশগুলিব ভুল চাল স্তালিনকে নাৎসীদেব সঙ্গে চুক্তি কবতে বাধ্য করে।[২৯৬] একমাত্র নাৎসীদের সঙ্গে বোঝাপডা হলেই তিনি মহাযুদ্ধে নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকা নিতে পারেন ; গণতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে চুক্তি করলে প্রথমদিন থেকে, সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায, তাঁকে যুদ্ধে জডিয়ে পডতে হত। স্তালিনের সন্দেহ হয়েছিল ব্রিটেন ও ফ্রান্স পোল্যান্ডকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রাখবে না।[২৯৭] আব পুবো পোল্যান্ড যদি জার্মেনীব হাতে চলে যায় রুশ প্রতিরক্ষাশক্তি সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হবে। জার্মেনী পোল্যান্ড ও বল্টিকে রুশ স্বার্থ রক্ষা কববে ইঙ্গিত পেযে স্তালিন অধীর আগ্রহে হিটলারের দিকে ঝুঁকলেন। ২৩ আগস্ট রিবেনট্রপ মস্কো এলেন। গোপন প্রোটোকলে পোল্যান্ড ভাগ স্থির হল ; ফিনল্যান্ড, এস্টোনিয়া ও ল্যাটভিয়া রুশ 'প্রভাব মণ্ডলে' এল (যাতে লেনিনগ্রাদ রক্ষা সম্ভব হয)। যুদ্ধ তাঁকে একদিন লডতেই হবে, জানতেন তিনি। তবু জার অ্যালেকজান্ডাব যেমন সময় পাবার জন্য নেপোলিয়ানের সঙ্গে টিলসিটের সন্ধি করেছিলেন, তেমনি সময় হাতে পেতে হিটলারের সঙ্গে চুক্তি করলেন স্তালিন।

হিটলারের দ্রুত অগ্রগতি ও অভাবনীয় সাফল্যে ভীত হলেন তিনি। তাঁর সন্দেহ হল পশ্চিমী শক্তিগুলির ক্লৈব্য রুশ-জার্মান যুদ্ধ বাধানোর জন্য চাল নয়ত ? **Nazi-Soviet Relations** শীর্ষক দলিলসংগ্রহ অনুসরণ করলে দেখা যাবে পোল্যান্ডে কিভাবে নাৎসীদের মতই আগ্রাসী ভূমিকা নিচ্ছেন তিনি, হিটলারের সঙ্গে মিলে পশ্চিমী শক্তিগুলিকে দায়ী করছেন যুদ্ধ চালানোর জন্য ! ডয়সার লিখছেন, **"In lending his support to this 'peace-offensive' of Hitler's, Stalin surpassed himself in hypocrisy."** যত হিটলারকে তিনি অবিশ্বাস করছেন, তত সজোরে বন্ধুত্ব ঘোষণা

করছেন ; এমনকি ১৯৩৯-এর অক্টোবরে ও ১৯৪০-এর ফেব্রুযারিতে খাদ্যশস্য, কাঁচামাল সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতিও দিচ্ছেন। বল্টিকে সৈন্য সমাবেশ ও ফিনল্যান্ড আক্রমণ (৩০ নভেম্বর ১৯৩৯) তাঁর জার্মানি ভীতিরই প্রমাণ। ফ্রান্সের পতনের পব ভয আবো বাড়ল। ফলে বল্টিক দেশগুলিতে বিপ্লবেব নামে রুশ শাসন স্থাপিত হল। রুমানিযা থেকে বেসারাবিয়া ও বুকোভিনা তিনি নিয়েনিলেন। বাল্কান নিযে শুরু হল রুশ-জার্মানি রেষারেষি। তবু ব্রিটিশ দূত স্যাব স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌সের সঙ্গে কথাবার্তায (জুলাই, ১৯৪০) এমন কোন ইঙ্গিত তিনি দিলেন না যা জার্মেনীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যায়।

ইংরেজদের কাবু করতে না পেরে হিটলাব হাঙ্গেরী, রুমানিযা, বিশেষত বাল্কানের দিকে নজর দিলেন। জাপান ও ইতালীর সঙ্গে মিলে চতুঃশক্তি চুক্তির প্রস্তাব দিলেন তিনি। রাশিয়াকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশ দেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল। বলা বাহুল্য, ভারত ছেড়ে দেবার লোভ দেখান হচ্ছিল। স্তালিন পাল্টা প্রস্তাব দিলেন—জার্মানি সৈন্য ফিনল্যান্ড ত্যাগ করুক, বালগেরিযাকে রুশ প্রভাবাধীন বলে স্বীকার করা হোক, প্রণালী অঞ্চলে বাশিযাকে ঘাঁটি করতে দেওয়া হোক। এই জবাব পাবাব তিন সপ্তাহেব মধ্যে হিটলাব তাঁব সেনাপতিদের রুশ আক্রমণের পরিকল্পনা (Plan Barbarossa) তৈরি করতে বললেন। পাল্টা জবাব দিলেন স্তালিন জাপানী বিদেশমন্ত্রী মাৎসুওকাব সঙ্গে নিবপেক্ষতাব চুক্তি সম্পাদন করে (১৩ এপ্রিল ১৯৪১)—বললেন, "আমবা উভয়েই তো এশিযাবাসী।" এভাবে তিনি পৃষ্ঠ রক্ষা করলেন।

যদিও এ সময় তিনি ব্রিটেনের কাছ থেকে (এবং এরও আগে আমেরিকাব কাছ থেকে) সতর্কবাণী শুনতে পান যে হিটলাব বাশিযা অভিযানেব ব্যবস্থা প্রায সম্পূর্ণ করে ফেলেছেন তবু স্তালিন তাতে কান দেননি। স্যালেনবার্গ মিটমাট করে দেবেন এ ভবসা বোধ হয় যায়নি ১৪ জুনও তিনি ব্রিটিশ দূতেব বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন—তিনি রুশ-জার্মানি যুদ্ধ আসন্ন এবম্বিধ গুজব ছড়াচ্ছেন বলে।[২৯৮] এসব গুজব—"false, nonsensical, and provocative"—এর ঠিক সাত দিন পর, ২২ জুন প্রত্যুষে মেরুপ্রান্ত থেকে কৃষ্ণসাগব পর্যন্ত হিটলাবেব ১৫০ ডিভিজন সৈন্য রাশিয়াব বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফন্ ক্লিস্ট্ (Kleist) পরে বলেছিলেন, দুই কি তিন মাসে যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে ভবসা ছিল হিটলাবের। জোড্‌লেব (Jodl) ডায়েরিতে পড়ি—তিনি বলছেন, "We have only to kick in the door and the whole rotten structure will come crushing down." বাশিযার বিপুল সৈন্যবাহিনী দেখে তিনি ঘাবড়াননি, রাশিযার বাজনৈতিক দুর্বলতা তাঁকে এ ঝুঁকি নিতে প্রণোদিত করে। কিন্তু ব্রিটেন নীবব বইল না। ঐ দিনই প্রধানমন্ত্রী চার্চিল বেতারে ঘোষণা করলেন, "Any man or state who fights on against Nazidom will have our aid. Any man or state who marches with Hitler is our foe... রুশ বিপদ আমাদেব বিপদ, যেমন আমেরিকার বিপদ। আপন পরিবাব ও গৃহের জন্য যে রুশ যুদ্ধ করছে তাব লক্ষ্য বিশ্বের সব দেশের স্বাধীন ব্যক্তি ও জাতের লক্ষ্য।'[২৯৯]

বিশের দশক থেকে স্তালিনের ভুলভ্রান্তি কমিন্টার্নেব নীতিতে প্রতিফলিত হচ্ছিল। ডয়সারের ভাষায়, "That automatic transmission of every movement and reflex from the Russian to all other parties constituted the main and the most bizarre anomaly in the life of the Comintern. an anomaly which became the norm. It was because of this that an unreality hung over so much of the Comintern's activity."[৩০০] যেমন,

স্তালিন স্থির করলেন চীনা কম্যুনিস্টদের চিয়াং কাইশেকের সঙ্গে ভাব রেখে চলা উচিত, অমনি তাঁর (তখনকার) সহযোগী বুখারিন-পরিচালিত কমিন্টার্ন বুর্জোয়া দলগুলির সঙ্গে সহযোগিতার নীতি নিল। পোল্যান্ডের কম্যুনিস্টরা সাহায্য করল মার্শাল পিলসুদস্কিকে। একই সময় স্তালিন রুশ ট্রেড ইউনিয়নদের ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ানদের সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করতে বললেন। উভয় নীতিব প্রতিবাদ কবলেন ট্রটস্কি, জিনোভিভ, ও কামেনেভ। ১৯২৭-এ পার্টি থেকে তাঁদের বহিষ্কার করা হল। স্তালিন ১৯২৭-এব শেষেই বুঝতে পারলেন তাঁব নীতি ব্যর্থ হয়েছে। অমনি তাঁবই ইঙ্গিতে ১৯২৮ সাল থেকে কমিন্টার্ন বামপন্থী নীতি নিল—অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্যের পথ। আবার এব বাড়াবাড়ি কবতে গিয়ে জার্মান কম্যুনিস্টরা হিটলারের অভ্যুদয়ে সাহায্য কবল ও শেষে নিজেরাই নির্মূল হল। ক্যান্টনের অভ্যুত্থানের রক্তাক্ত অবসান ঘটল। মীরাট মামলার প্রায় সব ভাবতীয় কম্যুনিস্ট নেতা গ্রেফতার হলেন এবং ১৯৩৪-এ পার্টি বেআইনী ঘোষিত হল। সন্দেহ নেই, এব সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল বহু অভ্যন্তরীণ বিতর্ক—নেপ, শিল্পায়ন, কৃষি সমগ্রীকরণ—আব ব্যক্তিগত ক্ষমতার লড়াই, প্রথমে ট্রটস্কিদেব সঙ্গে, পরে বুখাবিনদের সঙ্গে। ১৯৩৫-এ সপ্তম কমিন্টার্ন কংগ্রেস আব একবার নীতি বদলাল। এবার যুক্ত ফ্রন্টেব নীতি।

কিন্তু অনেক কারণে ফ্রান্সে পপ্যুলাব ফ্রন্ট সফল হল না। স্পেনের গৃহযুদ্ধে স্তালিনেব কর্মকাণ্ড গণতন্ত্রীদের মনে সন্দেহ জাগাল, গণতন্ত্রীদেব ক্লৈব্য-স্তালিনেব ভয়। ১৯৩৮-এর 'পার্জ' প্রথম পক্ষকে আবও সতর্ক কবল। ম্যুনিখ থেকে বাশিয়াকে সম্পূর্ণ দূবে রাখা হল। রুমানিয়া রুশ বাহিনীকে চেক সাহায্যার্থ যাবাব অনুমতি দিল না। অষ্টাদশ পার্টি কংগ্রেসে স্তালিনের বক্তৃতা ইঙ্গিত দিল ব্রিটেন ও ফ্রান্সেব সঙ্গে চুক্তির জন্য দরজা খোলা, কিন্তু জার্মেনীব দিকেব দবজা খোলা হতে পাবে। এরই পবিণতি আগস্টেব নাৎসী-সোভিয়েত চুক্তি। যুদ্ধ আবম্ভ হলে ফাসিস্ত-বিবোধী সব যুক্তি, কৌশল, 'নাবা' পবিত্যক্ত হল। য়ুরোপের পার্টিগুলি নিরপেক্ষতাব এক দ্ব্যর্থক অবস্থান নিল। শ্রমিকদের বলা হল যুদ্ধ বিরোধিতা করতে, শান্তির জন্য লড়াই করতে। এব ফল মাবাত্মক হল ফরাসী কম্যুনিস্ট ও জার্মান নাৎসী-বিরোধী দলের ওপর। ভাবতেব কম্যুনিস্ট-দলও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ থেকে দূরে সরে দাঁড়াল।

কিন্তু দলের একটা অপরাধ বোধ থেকে গেল, একটা গভীব অপমানের লজ্জা। ২২ জুন বাশিয়া আক্রমণ কবে হিটলার স্তালিনকে তার থেকে মুক্তি দিলেন। স্তালিনের ইঙ্গিতে, সম্পূর্ণ অর্ধবৃত্ত ঘুরে গিয়ে কমিন্টার্ন ঘোষণা করল—যুদ্ধ আব সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ নেই, তা "জনযুদ্ধ"-এ পবিণত হয়েছে।

এর কি প্রতিক্রিয়া হল সি পি আই-এর ওপব? আমরা দেখেছি প্রকাশ্যে একদল কম্যুনিস্ট কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি, এমনকি জাতীয় কংগ্রেসের, মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধ চালাচ্ছে, আর ভেতরের নেতৃত্ব গোপনে চলে যাচ্ছে। ১৯৪০-৪১ সালে বাংলার পার্টি কমিটি তাই করেছিল। এ বিষয়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির ৭ এপ্রিল ১৯৪১-এর রিপোর্ট প্রামাণ্য। ২২ জুন রাশিযা আক্রান্ত হলে পার্টিতে যুদ্ধের চরিত্র, পার্টির কর্তব্য এসব বিষয়ে জোর আলোচনা শুরু হল। প্রত্যেক সদস্য আপন মতামত লিখে কেন্দ্রীয় কমিটিকে পাঠালেন। দেউলির বন্দীদের হয়ে রণদিভে এক থিসিস প্রস্তুত করলেন। কিন্তু কি ভিত্তিতে শেষ সিদ্ধান্ত নেওয়া হল? সরোজবাবু লিখছেন, "ইতিমধ্যে অবশ্য লন্ডন থেকে ব্রিটিশ কম্যুনিস্ট পার্টির মতামতও পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির হাতে এসে যায়।" সরকারী (গোয়েন্দা দফ্‌তরই প্রধান) দলিলপত্রে দেখছি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সি পি জি বি-র সচিব হ্যারি পলিটের

লেখা (৮ জুলাই ১৯৪১) এক আবেদন (পার্টি লেটার ৫৪), হিটলারী আক্রমণের এক মাসের মধ্যে লেখা ব্রিটিশ পার্টি প্রকাশিত দুটি দলিলের ওপর সি পি আই-এর প্রতিক্রিয়া (পার্টি লেটার ৫৫) ও জেলে বন্দী সদস্যদের এক প্রতিবেদন ('জেল ডক্যুমেন্ট' বলে পরিচিত)-এর ভিত্তিতে। সেই সিদ্ধান্ত পার্টি লেটার ৫৬ (১৫ ডিসেম্বর ১৯৮১) রূপে সদস্যদের মধ্যে বিতরিত হয়েছিল।[৩০১]

হ্যারি পলিটের আবেদনে বলা হয় সোভিয়েত য়ুনিয়ানে যা ঘটছে তাব দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এখনই তার সাহায্যার্থে এগিয়ে না এলে "We shall be committing an unforgivable crime." ব্রিটিশ পার্টি প্রকাশিত দলিলদ্বয়ের ওপব প্রতিক্রিয়ায় এই স্বীকৃতি ছিল যে ভারতীয় পার্টির ভুল ভেঙেছে, চোখ খুলেছে। তারা এতদিন বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী মত আঁকড়ে ছিল, মার্ক্স ও লেনিনের প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতা নয়। এখন তারা বুঝেছে—"War for the defeat of Hitler is now the supreme issue before the whole democratic and progressive mankind." আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটলে চলবে না। ব্রিটিশ ও মার্কিন সরকাবের সাহায্য প্রতিশ্রুতি যুদ্ধের চরিত্র বদলে দিযেছে। এ আর দুই সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর যুদ্ধ নয়। চার্চিল ও রুজভেল্টের আসল উদ্দেশ্য কি এ নিয়ে ঘোঁট পাকানো মূঢ়তা—ফাসিজমের বিনাশই এই মুহূর্তের চরম লক্ষ্য, চার্চিল সরকাবেব পতন ঘটানো নয়। তাকে চাপ দিযে হিটলাবেব বিরুদ্ধে আরো জোবদার লডাই চালাতে, রাশিয়াকে আরো বেশি সাহায্য দিতে, উৎসাহিত করাই সত্যিকার কম্যুনিস্টের কর্তব্য। কিন্তু রাশিয়ার সঙ্গে যোগ দিয়ে যথেষ্ট প্রগতিশীল অবস্থান নিলেও ব্রিটেন পুরো প্রগতিশীল হয়নি। ব্রিটেন বোঝেনি যে ভারত স্বাধীন হলে এই জনযুদ্ধে সব শক্তি নিযে শামিল হবে। তাই বলে কি ভারতকে স্বাধীনতা না দেওয়া পর্যন্ত আমরা নীরব দর্শক রইব ? না। রাশিযা ও আমেবিকা-ব্রিটেনের মিলিত শক্তি হিটলারের ফাসিজমকে ধ্বংস করলে ভাবতেব স্বাধীনতা প্রাপ্তি অনিবার্য। সেই উদ্দেশ্যে ভারতীয় জনগণকে লড়াইয়ে যোগ দিতে হবে। বর্তমান সবকাবের যুদ্ধ প্রস্তুতির সঙ্গে অসহযোগ করলে চলবে না। কম্যুনিস্ট পার্টি সব প্রগতিশীল শক্তি সমবেত কবে সেই সব ন্যূনতম দাবি তুলবে "as are necessary to make the voluntary organisation of the resources and man-power of India for throwing India's full weight for victory of the all-people's war." সেই ন্যূনতম দাবি হল— (১) ভারতের স্বাধীনতার অধিকার স্বীকার, (২) গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি, (৩) গণ প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর যার দ্বারা শ্রমিক কৃষকদের জরুরী দাবি মেটে, যুদ্ধের ব্যয় বড়লোকদের ওপর চাপানো হয়, দেশে শিল্পায়ন ঘটে। জেল ডক্যুমেন্টে বারবার বোঝানো হয়—স্তালিন এ যুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' আখ্যা দিয়েছেন—রুশ সরকারের স্বার্থে নয়, বিশ্বের সব জনগণের স্বার্থে। বুর্জোয়া সরকারের যুদ্ধোদ্যোগে সাহায্য করে সর্বহারারা বুর্জোয়াদের সহযোগিতা করছে না, করছে রাশিয়ার সঙ্গে, শ্রমিক শ্রেণীর সব শত্রুর বিরুদ্ধে। ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীকে জাতীয়তাবাদী ধোঁকায় ভুললে চলবে না।— "As a part of the international, it looks upon the USSR as the only fatherland..." নাৎসীবাদের ধ্বংসে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ দুর্বল হবে, ব্রিটেনও তার সঙ্গে। এই জেল ডক্যুমেন্টের লেখক (রণদিভে ?) জুড়ে দিলেন—ব্যক্তিস্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক অধিকার, ভারতীয় দ্বারা প্রতিরক্ষা নিয়ন্ত্রণ, সৈন্যবাহিনীর ভারতীয়করণ, কেন্দ্রে জাতীয় সরকার—এসব দাবিও। সঙ্গে সঙ্গে বললেন, এ



AFGHANISTAN
Peshawar
Rawalpindi
PUNJAB
Gurdaspur
Lahore
Ferozepur
R. SUTLEJ
PAKISTAN
PERSIA
Delhi
RAJPUTANA
SIND
R. INDUS
Karachi
AJMER
STATES OF
WESTERN
INDIA
Rajkot
CENTRAL INDIA
(Port)
BERAR
Bombay
GOA
(Port)
MYSORE
ARABIAN
SEA
0 50 100 200 300 400 500 Miles

INDIA - 1947



BRITISH INDIA, LEASED TERRITORIES AND TRIBAL AREAS



PRINCELY STATES

—·—·— Boundaries between India and Pakistan

TIBET
NEPAL
UNITED PROVINCES
Allahabad
R. GANGES
BIHAR
ENTRAL INDIA
PROVINCES
EASTERN STATES
ORISSA
BENGAL
Calcutta
PAKISTAN
Dacca
SYLHET
R. BRAHMAPUTRA
ASSAM
BURMA
BAY OF BENGAL
Madras
ANDAMAN ISLANDS

সব পূর্ব শর্ত নয়। "A general slogan of conditional cooperation in the war is a bourgeois slogan." (এটি অবশ্যই কংগ্রেসী নীতির প্রতি ঠোকা)। শর্তসাপেক্ষ সহযোগিতা নাকি সুবিধাবাদী ও সমাজতন্ত্র-বিরোধী, আন্তর্জাতিকতার ওপর সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা! পূর্ণ স্বাধীনতার আওয়াজ তুললে ব্রিটেনের সোভিয়েত-বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীলদের হাত শক্ত হবে। হয়তো তারা হিটলারের সঙ্গে মিলে যাবে। লেখক যে সব দাবির কথা বলছেন সে শুধু সরকারী যুদ্ধকে জনযুদ্ধে রূপান্তরিত করার জন্য। তাঁর দীর্ঘ প্রতিবেদনের সমাপ্তিপর্বে কংগ্রেসকেই তার যুদ্ধের লক্ষ্য ঘোষণা করতে বলা হয়েছিল,প্রাদেশিক মন্ত্রিত্বভার/পুনর্গ্রহণ করতে বলা হয়েছিল,কংগ্রেস ও লীগের পূর্ণ মৈতক্য চাওয়া হয়েছিল।

॥ ১২ ॥

পার্টির সিদ্ধান্ত রয়েছে ৫৬নং পার্টি লেটারে (তারিখ ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৪১)। গত পাঁচ ছয় মাসের ভুল স্বীকার করা হয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা আগে চাই—এ দাবি তোলা নেহরুর অনুসরণ মাত্র। বস্তুত তা গান্ধীর নৈষ্কর্ম্যের সমর্থন, রাজাজির মত সাম্রাজ্যবাদের কাছে নতি স্বীকার। যুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী পর্বে কংগ্রেস প্রকাশ্যে তা সাম্রাজ্যবাদী বলেনি, সর্বতোভাবে বিরোধিতাও করেনি।

আবার তার জনযুদ্ধ পর্বে—"They (Congress) again refuse to rouse the people to the consciousness that they have to win it in common with the other peoples of the world in order to ensure their freedom."

দুজন শীর্ষস্থানীয় নেতা কি বলেছিলেন তা উদ্ধৃত করে প্রসঙ্গ শেষ করছি। সরোজ মুখার্জির ভাষায়, "সারা দুনিয়ার প্রতিটি মানুষের কাজ হল সমাজতন্ত্রের দুর্গ সোভিয়েত ইউনিয়নকে বাঁচাও, হিটলার দস্যু বাহিনীকে পরাজিত কর, ফ্যাসিজমকে রোখো, মানব সভ্যতাকে রক্ষা কর। এ যুদ্ধ জনগণের বাঁচার লড়াই। এ যুদ্ধ মানবতার শত্রু ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে জনগণের নিজেদের যুদ্ধ। এ যুদ্ধ জনযুদ্ধ।"[৩০২] এই উক্তির মধ্যে পার্টির অভ্যন্তরীণ বিতর্কের প্রমাণ পাই না। নাম্বুদ্রিপাদ ভারতীয় কম্যুনিস্টদের দ্বিধা আরও চমৎকার করে ফুটিয়েছেন :

"Before them (Indian Communists) was a difficult choice: either carry on the struggle against our national enemy which hinders the defence efforts of the anti-fascist coalition or extend support to the anti-fascist powers and get isolated among the anti-imperialist masses in the country. The Party leadership, after experimenting with the first alternative for six months, chose the second in December 1941. By that time, the continent of the war, its theatre of operation, had undergone a vital change."[৩০৩] নাম্বুদ্রিপাদ যুদ্ধের এলাকা বিস্তৃতি দ্বারা নিশ্চয়ই পার্ল হারবারের ওপর জাপানের ৭ ডিসেম্বরের আক্রমণের কথা বলছেন।

ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের Indian Communists and the War শীর্ষক এক প্রতিবেদন ও বিভিন্ন প্রদেশেব মুখ্যসচিবদের কাছে লেখা অতিরিক্ত সেক্রেটারী রিচার্ড টটেনহ্যামেব এক সার্ক্যুলার চিঠি (১০ জানুয়ারি ১৯৪২) কিছুটা আলোকপাত করে এ বিষয়ে।[৩০৪] যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর কংগ্রেসের বিরোধিতা সত্ত্বেও, এমনকি ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আরম্ভ হলেও, ব্রিটেন উদ্বিগ্ন হয়নি। কিন্তু সুভাষচন্দ্র, ফরওয়ার্ড ব্লক ও কম্যুনিস্ট দলের ওপর কড়া নজর ছিল তাদের। গোয়েন্দা পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে সরকারকে সম্পূর্ণ ভাঁওতা দিয়ে, ১৬ জানুয়ারি, ১৯৪১ সুভাষ যে ভাবে ভারত ত্যাগ করেছিলেন তার বিস্তৃত ও রোমাঞ্চকর বিবরণ পাওয়া যাবে ডাঃ শিশিরকুমাব বসুর 'মহানিক্রমণ' গ্রন্থে।[৩০৫] ব্যাপারটা কর্তৃপক্ষকে চিন্তিত করে তুলেছিল। কোথায গেলেন তিনি অনেক দিন তাঁরা জানতে পারেননি। তাঁর পরিবারের লোকজনও জানতে পারেন ৩১ মার্চ—ভগৎবামের কাছে। সেই দিনই সুভাষ অরল্যান্ডো মাৎসোটা ছদ্মনামে মস্কো পৌঁছেছিলেন ও ১ এপ্রিল রাত্রে বার্লিন রওনা হয়ে গিয়েছিলেন।

১৯৬৮ সালে ভিয়েনায় প্রকাশিত রিমুন্ড স্ন্যাবেল (Reimund Schnabel)-এব Tiger and Jackal German-India Politics 1941-1943 A document report (ইংরেজী অনুবাদ আমার কাছে আছে) গ্রন্থে পাই সুভাষচন্দ্র ৯ এপ্রিল জার্মান সরকারকে বার্লিন, আফগানিস্তান ও উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায ব্রিটিশ-বিরোধী কাজের এক বিস্তৃত স্মারকলিপি দেন ও ৩ মে আব এক পরিপূবক স্মারকলিপি। তাঁব নির্দেশ ট্রট (Trott) সংকেতলিপিতে ভগৎরাম তলোযাব (ওরফে রহমত খান)-এর কাছে পাঠাতেন। টাকাকড়িও তাঁর কাছে পাঠানো হত। ৩০ আগস্ট সুপ্রিম কমান্ড অফিস থেকে ফবেন অফিসকে জানানো হয় যে মাৎসোটাব সঙ্গে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের 'অপারেশান টাইগার' নিয়ে কথা হয়েছে। ৫ সেপ্টেম্ববের এক তারবার্তা থেকে জানা যায ভগৎরামকে শক্তিশালী বেতার যন্ত্র দেওয়া হবে। ১০ই ব্যাংকক থেকে উপদেশ আসে ভাবতে বসু-গোষ্ঠীকে সমর্থন করা হোক, সর্বত্র সাধাবণ ধর্মঘট লাগানো হোক, সৈন্যদেব কাছেও আবেদন রাখা হোক। কাবুলের মাধ্যমে সংবাদ লেনদেনের অসুবিধা হচ্ছিল মনে হয়। ব্যাংককের জনৈক ইউ এন নন্দীর সঙ্গে কলকাতা থেকে পাঠানো বসুর লোকদেব দেখাসাক্ষাৎ করতে বলা হয়। তিনি আবার জনৈক সত্যানন্দ পুরীর কাছে তাদের পাঠাবেন। কাবুলের ২২ সেপ্টেম্বরের তারে জানা যায় সত্য বক্সীব দল (ফরওযার্ড ব্লক)-কে নাশকতার শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। বেলুচিস্তানের কাছে জার্মান সৈন্য এলে নাশকতা বাড়ানো হবে। ২৫শে স্বয়ং সুভাষ আর কে (রহমত খান ?)-কে বক্সী বা শরৎ বসুর সঙ্গে দেখা করে ব্যাংককের জার্মান দূতাবাসের ফন্ প্লেসেনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে বলছেন। এই দুজনকে ব্রহ্ম, ব্যাংকক, মাদ্রাজ, কলম্বো, পূর্ব আফ্রিকা ও পারস্য উপসাগরে এখনি চর পাঠাতে বলা হয়। এ সব ব্যবস্থার জন্য আর কে-কে দশ হাজার মার্ক দেওয়া হবে। পরের তারে ফন প্লেসেনের বদলে ইউ এন নন্দীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়। ২০ অক্টোবর ব্যাংকক থেকে মেয়ার (Meyer) জানাচ্ছেন ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে ভাঁটা পড়েছে, তবু গান্ধী আইন অমান্যের নির্দেশ দিচ্ছেন না। ২৪ অক্টোবরের তারে জানি ইংরেজদের সৈন্য সংগ্রহে কোন অসুবিধা হচ্ছে না—মাসে প্রায় ৪০,০০০ সৈন্য যোগ দিচ্ছে। নভেম্বরের শেষে ইতালীর বিদেশমন্ত্রক বার্লিনকে জানায়, রহমৎ খাঁ ফিরে আসেননি, সম্ভবত তিনি বন্দী হয়েছেন। ইতালীর দূতাবাসের সঙ্গে ভারতের ভেতরের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। মাৎসোটার এখুনি বেতার ভাষণ শুরু করা উচিত। ২৯ নভেম্বর বার্লিনে বিদেশমন্ত্রী রিবেনট্রপের সঙ্গে

বসুর সাক্ষাৎ হয় (ডক্যুমেন্ট ৩৯)। তিনি বলেন চার্চিলের বিকল্প নেই। তিনি শ্রমিক ও রক্ষণশীল দলের মধ্যপন্থী বলে সরকার চালাচ্ছেন। কিন্তু কায়রোর দিকে জার্মান অগ্রগতি সফল হবে ও খুব বেশি হলে পরের বছরের মধ্যে রাশিয়াও হারবে। ভারতের ব্যাপারে তিনি কোনও ঘোষণা করতে রাজি হননি, কারণ সেখানে জার্মেনীর কোন শক্তি নেই। ইরাকের বেলায় তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ফল হয়নি। "In Germany one wished to avoid taking a step, which again could excite certain circles to unconsidered action." প্রকাশ্যে কিছুই করতে দেওয়া হবে না। জার্মান সৈন্য ককেশাস পেরোলে কিছু করা যেতে পারে। বসুর প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী জানান—এটা হিটলারেরও মত। তিনি বলেন ফ্যুয়েরারের সঙ্গে দেখা করবার সময় হয়নি। বসু তখন ভারতে বেতার মারফত প্রচার করার সুযোগ চান।

১৫ জানুয়ারি রোম থেকে খবর আসে যে জাপানী দূতাবাসের কাউন্সেল জানাচ্ছেন অবস্থা আরও অনুকূল না হলে জার্মান-ইতালীয়ান-জাপানী যুক্ত ঘোষণা করা ঠিক হবে না। জাপানী প্রসারকে ভারতীয়রা সন্দেহের চোখে দেখছে। অন্যদিকে দেখি—শেদাই (Schedai?) এরকম ঘোষণার জন্য চাপ দিচ্ছেন। ইংরেজরা প্রচার করছে—জাপানীরা ভারত দখল করতে চায়। এর উলটো প্রচার জরুরী হয়ে উঠেছে। এ ধরনের ঘোষণার ফলে ভারতীয় সকল জাতীয়তাবাদী অক্ষশক্তির সঙ্গে পুরোপুরি সহযোগিতা করবে (ডক্যুমেন্ট ৫০)। ব্যাংককের খবর—ভারতীয়রা নিজেরাই স্বদেশকে মুক্ত করতে চায় কিন্তু জাপানীরা চায় জাপানী সৈন্যবাহিনী সে কাজ করুক। মালয়ে ভারতীয় বন্দী সৈন্য বা পলাতক সৈন্যদের জাপানীরা একত্র করছে। গুরুত্বপূর্ণ আর এক দলিল (ডক্যুমেন্ট ৫৪) বার্লিন থেকে (২৮ জানুয়ারি ১৯৪২) জানাচ্ছে—সুভাষ বসু, ফন জিজউইজ, ও ট্রটের সঙ্গে কর্নেল ইয়ামামোটো ও মেজর মারওয়েড্-এর সাক্ষাৎ হয়েছে। বসু বলছেন (১) কলকাতায় বোমাবর্ষণের আগে প্রচারপত্র বিলি করে ভারতবাসীদের মন তৈরি করতে হবে। (২) অক্ষশক্তির ঘোষণা করতে হবে যে তাদের লক্ষ্য ভারতের মুক্তি। (৩) ব্রহ্মের পতনের পর যে সংকট শুরু হবে তার সুযোগ নিতে হবে। (৪) দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার ভারতীয় সৈন্যদের বিদ্রোহে অনুপ্রাণিত করতে হবে।[৩০৫ক]

ইংরেজরা এসব খবর না জানলেও অনেক কিছু আশঙ্কা করছিল। অতএব, প্রথম দিকে কম্যুনিস্টদের সত্যই মত পরিবর্তন হয়েছে, তারা যুদ্ধকে জনযুদ্ধ বলছে, ইংরেজদের সামরিক সাহায্য দিতে চাইছে—এ সব কথা গোয়েন্দা দফতরের বিশ্বাস হয়নি। টটেনহ্যাম যে প্রতিবেদন প্রাদেশিক মুখ্যসচিবদের কাছে পাঠাচ্ছেন তাতে আছে. "The fact that Russia is our ally has produced no 'official' change in the attitude of the C.P.I. towards the war, corresponding to that of the Communist Party of England...The entry of Japan and the alliance with China, also seem to have made no 'official' difference to the parties." কংগ্রেস ও লীগ এ সুযোগে দর বাড়াচ্ছে। মানবেন্দ্রনাথ রায় বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে হিটলারের পরাজয়ের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বোম্বাই প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস কমিটির 'কম্যুনিস্ট গোষ্ঠী' বলছে তারা AITUC'র জেনারেল কাউন্সিলকে 'বিনা শর্ত সমর্থনে'র নীতি নেওয়াবার চেষ্টা করবে। অনেক রাজবন্দীদের কাছ থেকেও সহায়তার প্রতিশ্রুতি আসছে। এর সবগুলি বিশ্বাসযোগ্য নয়। কিন্তু ভিক্টর গোলান্‌জের 'Russia and Ourselves'-এর একটা কথা অনেক কম্যুনিস্টের মনে লেগেছে—"to put the

needs of the present before the memory of the past..." এ ভাবে দেখলে কারো প্রাক্তন কাজকর্ম বা ভবিষ্যতের লক্ষ্য বিচার না করে দেখতে হবে ঠিক এখুনি তারা কি   রবে। এ অবস্থায় কিছু ঝুঁকি নিতে হবে। "The crux of the matter is to divide the sheep (if any) from the goats, and then to make use of the former in such a way as not only to exploit the fissiparous tendencies that have already appeared, but also to make positive use of their services." প্রত্যেকের ব্যাপার আলাদা করে খুঁটিয়ে দেখতে হবে। তখন দেখতে হবে তার সত্যিকার সাহায্য দানের গুরুত্ব কতটা বা তার হৃদয়ের পরিবর্তন হয়েছে কিনা।

প্রশ্ন উঠেছিল ১৫ জন রাজবন্দী কম্যুনিস্টদের মুক্তিদান নিয়ে—ঘাটে, অভয়ংকর, পাঠক, ডাঙ্গে, মিরাজকর, বাটলিওয়ালা, রণদিভে, মালব্য, অজয় ঘোষ, এইচ. কে. মজুমদার, আর. সি. সিংহ, আর. ভি. ভরদ্বাজ, এস. কে. মুখার্জী, সাজ্জাদ জাহীর ও রাহুল সাংকৃত্যায়ন। পার্টির ৫৪, ৫৫, ৫৬নং চিঠির ভিত্তিতে (ডিসেম্বর ১৯৪১) ডেইন কমিটি এদের মুক্তি দান করতে বলেন। টটেনহ্যামের সংশয় জাগে। এদের মুক্তি দিলে সি পি আই-কে বেআইনী সংস্থা হিসাবে চিহ্নিত করে রাখার অর্থ কী ? আর এরা মুক্তি পেলে গোপন কর্মপন্থা নেবে না তার স্থিরতাই বা কোথায় ? একমাত্র যদি এরা যুদ্ধের ব্যাপারে প্রকাশ্যে সহায়তা করে তবেই এদের মুক্তি দেওয়া সার্থক হবে।[৩০৬]

টটেনহ্যামের প্রশ্নের উত্তরে গোয়েন্দা দফতরের পিলডিচ্ জানান—তাঁদের ২১ মার্চের রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে জনযুদ্ধের নারা (slogan) সরকার-বিরোধী কাজকর্ম প্রচারের একটা আবরণ ছাড়া কিছু নয়। তাদের বৈপ্লবিক লক্ষ্য—গণ সরকার প্রতিষ্ঠা—পরিবর্তিত হয়নি। ইংরেজদের যুদ্ধে সাহায্য দানের ব্যাপারটা— "a very secondary and by no means universally accepted consideration." এদের মুক্তি দিলে এরা দুমুখো কর্মসূচি নেবে—বাইরে অক্ষশক্তির মৌখিক প্রতিরোধ, ভেতরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বাস্তব বিরোধিতা। এতে সুবিধা না হয়ে সরকারের অসুবিধাই হবে। তাছাড়া যে সব জাত থেকে সৈন্য সংগৃহীত হয় তাদের ওপর কম্যুনিস্টদের প্রভাব কতটুকু ? এমনকি শ্রমিকদের মধ্যেও তা সীমিত। কংগ্রেস ও অন্যান্য যুদ্ধবিরোধী সংস্থার কাজকর্মের প্রগতিশীল প্রতিবাদের কেন্দ্র কি তারা হতে সক্ষম ? কংগ্রেসেব সঙ্গে বিবাদ করলে তারা বহুদিনের নীতি থেকে বিচ্যুত হবে, জনমতের থেকে আলাদা হয়ে পড়বে। মুক্তি পেলেই তারা পার্টি সংগঠন শক্ত করবে ; কংগ্রেস, কিষাণ, শ্রমিক, সৈন্য—সকল স্তরে পার্টির কাজ বিস্তার করবে ; যুদ্ধের মধ্যে বা পরে বর্তমান সরকারের পতন ঘটাবে। রিভ্যু কমিটির কথায় যদি এদের ছেড়ে দিতে হয়, তবে সি পি আই-এর ওপর নিষেধাজ্ঞা রাখাই বা হবে কেন ? "I do not believe that the threat from communism is any whit diminished as the result of Russia's' entry into the war." তা ছাড়া প্রাদেশিক সরকারগুলির মতামত না জেনে তা করাও ঠিক হবে না। কীর্তি কিষাণ দলের কথা স্মরণ করে পঞ্জাব সরকার তো রাজি হবেই না, বাংলা—নৈব নৈব চ। অতএব পিলডিচ্ চাইলেন, পনেরো জনের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হোক কি পদ্ধতিতে তারা যুদ্ধের সম্বন্ধে তাদের পরিবর্তিত মত কার্যকর করবে।[৩০৭] হোম মেম্বার ম্যাক্সওয়েল পিলডিচের সঙ্গে একমত হন ও বিশেষ করে পি সি যোশীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে নির্দেশ দেন। নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের ব্যাপারে একই পদ্ধতি নেওয়া হয়েছিল জানতে

পারি। পি সি যোশীর সঙ্গে জি. আহ্‌মেদ-এর সাক্ষাৎকার হয় ১২ মে ১৯৪২; ম্যাক্সওয়েলের সঙ্গে ১৫ মে ১৯৪২। এর ভিত্তি ছিল (১) Memorandum on Communist Policy and Plan of Work (২৩ এপ্রিল ১৯৪২)—যা পার্টির বক্তব্য উপস্থাপিত করেছে ও (২) Summary of Communist Activity in India March-April 1942 যা গোয়েন্দা দফতর তৈরি করেছে (৪ মে ১৯৪২)। এগুলি বিচাব করার আগে আমাদের পূর্ববর্তী কয়েক মাসের ঘটনাবলী বিশ্লেষণে ফিরে যেতে হবে।

এই ঘটনাবলীর সূত্রপাত হল জাপানের পার্ল হারবার আক্রমণে (৭ ডিসেম্বর ১৯৪১) ও সমাপ্তি হল স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের ভারত মিশনে। প্রথমটার সঙ্গে দ্বিতীয়টার যোগসূত্র পরিষ্কার। পার্ল হারবারের পরপরই মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট, শ্রমিক দলের মন্ত্রীবা (যেমন আর্নেস্ট বেভিন), ইন্ডিয়া কনসিলিয়েশন গ্রুপের নেত্রী অ্যাগাথা হ্যারিসন, সাপ্রু—সবাই চার্চিল সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি কবতে থাকেন। বেভিন তো পার্ল হারবারের অনেক আগে এমেরিকে লেখেন, "এখনি ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস প্রতিষ্ঠার কাল আগত আমার দৃঢ় বিশ্বাস এখনই কোন বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিলে ভারতীয় জনমত আমাদের পক্ষে আসবে।"[৩০৮] প্রায় একই সময ওয়াশিংটনে রুজভেল্ট ভাবতীযদেব দাবি প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে চার্চিল অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলেন।

দীর্ঘ দিন পরে ৩০ ডিসেম্বর যে ওয়ার্কিং কমিটি বসে তাতে কংগ্রেস নেতাবা স্পষ্টই বলেন, যুদ্ধ বিস্তৃত হওয়ায় তাঁরা জানিয়ে দিতে চান জাতীয় প্রতিবক্ষার ক্ষেত্রে অহিংসা আদর্শ বলে পরিগণিত হবে না। গান্ধী পদত্যাগ করেন। এর পরও লর্ড প্রিভিসিলকে চার্চিল লেখেন, "Bringing hostile political elements into the defence machine will paralyse action."[৩০৯] বড়লাটও কংগ্রেসেব সহযোগিতা নিযে মাথা ঘামাচ্ছিলেন না। বরং তিনি জাপানেব মহড়া একা নেবেন তবু কংগ্রেসের দাবি মানবেন না এই ছিল তাঁর কৌরবসুলভ মনোভাব।[৩১০] তিনি অবশ্য ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহীদেব মুক্তি দেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অ্যাটলি তবু ওয়ার ক্যাবিনেটে এই মনোভাবের প্রতিবাদ করলেন। এ ধরনের 'কিছুই করব না' নীতি অনুসরণ কবলে হযতো বর্তমান ঝড় কাটিয়ে ওঠা যায় কিন্তু পরবর্তী ঝড? "Such a hand-to-mouth policy is not satesmanship...To mark time is to lose India..." ডাবহ্যামকে যেমন ক্যানাডা পাঠানো হয়েছিল উনিশ শতকে, তেমনি বিচক্ষণ কাউকে পাঠানো হোক। "We need a man to do in India what Durham did in Canada..."[৩১১] রক্ষণশীল দল ১৯৪০-এর প্রতিশ্রুতির বাইবে যেতে চাইছিলেন না। চার্চিল Defence of India Council-এর এক অদ্ভুত প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রুজভেল্ট ও চিয়াং কাইশেককে ভাঁওতা দেওয়া। কিন্তু লিনলিথগোব আপত্তিতে তা ভেস্তে যায়।

সিঙ্গাপুরের পতন (১৫ ফেব্রুয়ারি, '৪২)-এর পর ক্যাবিনেট পুনর্গঠিত হল। অ্যাটলি হলেন সহকারী প্রধানমন্ত্রী ও ডোমিনিয়ান ব্যাপারের রাষ্ট্রসচিব। ক্রিপস এলেন লর্ড প্রিভিসিল ও কমন্স সভার নেতা রূপে। আবার চাপ এল চিয়াং ও আমেরিকা থেকে। ২৬ ফেব্রুয়ারি অ্যাটলির সভাপতিত্বে ওয়ার ক্যাবিনেটের ইন্ডিয়া কমিটির প্রথম অধিবেশন বসল। ইতিমধ্যে এমেরি কিছু সংস্কারের কথা তুললেন। তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও বিপজ্জনক ছিল কিছু কিছু প্রদেশের নতুন কেন্দ্রীয় সরকারের বাইবে যাবার অধিকার।

ফেব্রুয়ারির শেষে এমেরি বড়লাটকে আসন্ন প্রস্তাবের কিছু পূর্বাভাস দেন। তাঁর মতে আসল সমস্যা হল একদিকে কংগ্রেস বলছে সংখ্যালঘুদেব ভিটো দিয়ে ব্রিটেন সংস্কার

পিছিয়ে দিচ্ছে, অন্যদিকে সংখ্যালঘুরা বলছে তাদের রক্ষার প্রতিশ্রুতি পালন করতেই হবে। এমেরি মনে করছেন এর সমাধান নিম্নরূপে হতে পারে—"If there are sufficient provinces who want to get together and form a Dominion the dissident provinces should be free to stand out and either come in after a period of option or be set up at the end of it as Dominions of their own."[৩১১ক] এই 'provincial option'-এর ধারা শেষ পর্যন্ত ঘোষণা প্রস্তাবের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। ফিরোজ খান নুন যখন একসিকিউটিভ কাউন্সিলের ভারতীয়করণে আপত্তি জানান,[৩১১খ] তখন এমেরি বলেন এটাকে 'Pakistan option' মনে করলে নুনের আপত্তি করার কারণ থাকে না।[৩১১গ] এ বিষয়ে লিনলিথগো নানা প্রশ্ন তুলেছিলেন। চার্চিল ৪ মার্চ রুজভেল্টকে যে ব্যাখ্যা দেন তাতে বলা হয় জিন্না, নুন ইত্যাদিব আপত্তি স্মবণ করে এই ব্যবস্থা করা হল। এর অর্থ— "The creation of separate Moslem states in the Moslem majority areas independent of the rest of India, except so far as they accept joint control negotiating as separate political entities."[৩১১ঘ] ২৯ মার্চ যে ঘোষণা ক্রিপস প্রকাশ কবেন তাব বয়ানে ছিল যদি কিছু প্রদেশ নতুন শাসনতন্ত্র না মেনে নেয় তবে তারা বর্তমান অবস্থায় থাকবে। পরে ইচ্ছা করলে ভারতীয় যুনিয়ানে যোগ দিতে পারে, না হলে তাদেব ভাবতীয় যুনিযানের সমমর্যাদাসম্পন্ন শাসনতন্ত্র দেওয়া হবে।

ঘোষণার অন্যান্য অংশ হল— (১) যুদ্ধের পরই ভাবতকে স্বশাসনাধিকার দেওয়া হবে। (২) নব নির্বাচিত প্রাদেশিক আইনপবিষদ গণপরিষদ নির্বাচন কববে শাসনতন্ত্র বচনার জন্য। (৩) রাজারা এখানে প্রতিনিধি পাঠাতে পারেন। (৪) ভারত কমনওয়েলথে থাকতেও পারে, নাও পারে কিন্তু (৫) ব্রিটেনের স্বার্থ দায়িত্ব, ইত্যাদির জন্য তাকে এক সন্ধি করতে হবে। (৬) অন্তর্বর্তীকালে ব্রিটিশ সবকাবের যুদ্ধচালনার দায়িত্বসাপেক্ষে ভারতীয় দলগুলি যাতে একসিকিউটিভ কাউন্সিলে আসতে পারে তাব জন্য আলোচনা হবে।

বড়লাট সমানে Provincial option-এর বিরোধিতা কবছিলেন, এমনকি ৯ মার্চ পদত্যাগের হুমকিও দেন। পঞ্জাবের লাট গ্ল্যান্সি জানান—শিখবা তা কখনই মানবে না। প্রধান সেনাপতি যুদ্ধেব সময় সাম্প্রদায়িক গোলমাল বাধিয়ে সৈন্য সংগ্রহে অসুবিধা ঘটাতে চাননি। তখন ঘোষণা বন্ধ রেখে ক্রিপসকে আলোচনা কবার জন্য ভারতে পাঠানো স্থির হয়।[৩১১ঙ] ৯ মার্চ ক্যাবিনেট কমিটি একটা খসড়া অনুমোদন করে। তার (e) অনুচ্ছেদের ভিত্তিতে আলোচনা কবা হবে। চার্চিল ব্যাপারটা পছন্দ করেননি। তিনি ক্রিপসের হাত বেঁধে দিলেন। তাঁকে বলা হয় ভারতীয়দের একসিকিউটিভ কাউন্সিলে স্থান দেওয়া হবে—"Provided this does not embarrass the defence and good government of the country during the present critical time." (মনে রাখতে হবে ৮ মার্চ রেঙ্গুনের পতন হয়েছিল)। আরও বলা হল সর্বদা বড়লাট ও প্রধান সেনাপতির সঙ্গে পরামর্শ করে চলতে হবে।[৩১২] চার্চিল বড়লাটকে জানিয়ে দিলেন খসড়া হবে "our utmost limit."[৩১৩] বড়লাট ও ক্যাবিনেট, ক্যাবেনিট ও ক্রিপস, বড়লাট ও ক্রিপসের মধ্যে বোঝাপড়া সম্পূর্ণ হবার আগেই ক্রিপস রওনা হলেন।

আর জে মুর-এর Churchill, Cripps and India, 1939-45 (1979), এইচ. ভি. হডসনের The Great Divide: Britain-India-Pakistan (1969), ক্যুপল্যান্ডের ডায়েরি ও ম্যানসারগ ও অন্যান্য (সং) The Transfer of Power

1942-47 ক্রিপস মিশন নিয়ে সব চেয়ে প্রামাণ্য আকর। মুরের মতে ঘোষণার চৌহদ্দির মধ্যে ক্রিপসের কতটা স্বাধীনতা ছিল তা নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে এবং তাব বেশ কিছুটা ইচ্ছাকৃত। (১) ক্রিপসকে বিভিন্ন ভারতীয় দলের প্রতিনিধিদের একসিকিউটিভ কাউন্সিলে আসন দেবার প্রস্তাব করতে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। (২) তিনি বড়লাট ও প্রধান সেনাপতির সঙ্গে পরামর্শ করবেন কিন্তু তাঁদের মতামত মেনে নিতে সর্বদাই বাধ্য ছিলেন না। (৩) তাঁর আলোচনার আসল সীমা ছিল—তিনি কোনওভাবে ভাবতের সামরিক শক্তি ক্ষুণ্ণ করতে পারবেন না বা বিশেষ দাযিত্ব পালনের জন্য বড়লাটকে যে সব বিধিবদ্ধ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তাও বিলিয়ে দিতে পারবেন না। সম্ভবত বড়লাটকে তুষ্ট রাখার জন্য এমেরি তাঁর সঙ্গে পবামর্শ করে চলার ওপর জোব দিয়েছিলেন।[৩১৪] একসিকিউটিভ কাউন্সিল গঠনেব ব্যাপারে ক্রিপস্ ও বড়লাট একমত হবেন এমন আশা পোষণ করতেন চার্চিল, এমেরি, সাইমন প্রভৃতিরা। অন্যদিকে ক্রিপস ভেবেছিলেন—এ ব্যাপারে লিনলিথগোব মনোমত না হলেও সীমার মধ্যে আলোচনা ও আপোস করার ক্ষমতা তাঁকে দেওযা হয়েছিল।[৩১৫] বড়লাট বলেছেন, ক্যাবিনেট ক্রিপ্‌সকে কি নির্দেশ দিয়েছেন সে বিষয়ে তিনি অজ্ঞ ছিলেন। অথচ সে নির্দেশ তাঁর মাধ্যমেই পাঠানো হয়েছিল ২৮ মার্চ। মুরের সিদ্ধান্ত—উভয়েই মনে করতেন তাঁরা জরুরী মিশন নিয়ে এসেছেন। এ দ্বন্দ্ব— অহং-এর দ্বন্দ্ব—একটা 'point-counterpoint relationship.'[৩১৬]

ক্রিপ্‌সের মিশন কি আমরা জানি। যদি তাঁর প্রস্তাব ভারতীয়েরা গ্রহণ করেন, "পবেব বিশ বছর তিনি ভাবতের নীতি নির্ধারণ করবেন।"[৩১৭] সেই সাফল্য তাঁকে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রিত্বও দিতে পারে। অন্যদিকে লিনলিথগো ভারতকে স্বশাসনের যোগ্য মনে করতেন না, তিনি নিজেই ঠিক করে দেবেন কি ভাবে সে স্বশাসন লাভ করবে। ক্যুপল্যান্ড তাঁর ডায়েরিতে লিখছেন, "Also a touch of Curzonian self-sufficiency though not arrogance. He seems to feel the whole burden rests on him alone."[৩১৮]

ক্রিপ্‌স ভারতে পদার্পণ করলেন ২৩ মার্চ ১৯৪২। আর সেই দিনই বড়লাটের সঙ্গে বিতর্কের সূত্রপাত হল। ক্রিপস একসিকিউটিভ কাউন্সিল পুনর্গঠনের প্রসঙ্গে বড়লাটের হাতে এক তালিকা তুলে দিলেন, আর তিনি ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, "এটা তো আমার ব্যাপার।"[৩১৯]

২৫ মার্চ তিনি আজাদের সঙ্গে দেখা করলেন (আজাদ কংগ্রেস সভাপতি তখন)। নতুন কাউন্সিলের ব্যাপারে তিনি বললেন,—প্রধান সেনাপতি ব্যতীত সব সদস্যই হবেন ভারতীয় কিন্তু যে পদ্ধতিতে সরকার চলছে তা অব্যাহত থাকবে। বড়লাট "ইংল্যান্ডের রাজার মত শাসনতান্ত্রিক প্রধান" থাকবেন এবং সদস্যদের পরামর্শ সাধারণত মেনে নেবেন। অর্থাৎ কাউন্সিল হবে অনেকটা ক্যাবিনেটের তুল্য। আজাদ ভুল করে ভাবলেন বড়লাটের বিশেষ দায়িত্ব ও ভিটোক্ষমতা লুপ্ত হবে। আজাদ জানালেন—কংগ্রেসের দাবি প্রতিরক্ষামন্ত্রী করতে হবে জনৈক ভারতীয়কে—অন্তত বাহ্যত (in appearance)। সৈন্য চলাচল, রণকৌশল অবশ্যই থাকবে প্রধান সেনাপতির হাতে।[৩২০] হড্‌সন[৩২১] ও শিবরাও[৩২২] উভয়েই বলেছেন, কংগ্রেসকে আধা ক্যাবিনেট সরকারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।

পঞ্জাব ও বাংলার মুখ্যমন্ত্রীদের জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করে জিন্না তখন লীগের প্রায় অবিসংবাদিত কর্তা। তাঁকেও একই দিনে ডাকলেন ক্রিপস। প্রস্তাবে যে 'local option'-এর কথা ছিল তাতে জিন্না পাকিস্তানের প্রতিশ্রুতি দেখে

অবাক (এবং খুশি) হয়েছিলেন। তিনিও চাইলেন কাউন্সিলকে ক্যাবিনেটের মর্যাদা দেওয়া হোক।

২৫শে লিনলিথগো ক্রিপসকে বললেন, ভারতীয় দলগুলি ঘোষণার সবটা মেনে নিলে তিনি তাদের নিয়ে কাউন্সিল গঠন করতে রাজি। কিন্তু তার বেশি নয়। খানিকটা সতর্ক করে দিয়ে বললেন, "His Excellency...would forgive him almost anything except stealing His Excellency's cheese to bait his own trap."[৩২৩] তবু ২৯ মার্চ এক প্রেস কনফারেন্সে ঘোষণা সর্বসমক্ষে প্রচার করা হল। ক্রিপস তার প্রথম ধারার (e) অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কাউন্সিল ভারতীয়করণ ও ক্যাবিনেট ধাঁচের সরকারের উল্লেখ করলেন।[৩২৪] বড়লাটের পক্ষ থেকে কোন প্রশ্ন ওঠানো হল না। পরে কিন্তু এ নিয়ে গোলমাল দেখা দেবে।

২৭ মার্চ প্রথম চ্যালেঞ্জ জানালেন গান্ধী। তিনি তিনটে আপত্তি তুললেন : (১) ঘোষণায় পাকিস্তান গঠনে মুসলিমদের প্রায় নিমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। (২) দেশীয় রাজাদের 'প্যারামাউন্ট পাওয়ার' হিসেবে ব্রিটিশরা রক্ষা করবে, বা তারা গণপরিষদে তাদের প্রতিনিধিদের মনোনয়ন করবে— এ কিরকম কথা! (৩) প্রতিরক্ষার নিয়ন্ত্রণ ব্রিটিশরা রাখবে এও গ্রহণীয় নয়।[৩২৪ক] ক্রিপস বললেন, ঘোষণা সংহতি ও ঐক্যের ওপরই জোর দিয়েছে ; গণপরিষদে অনৈক্য দেখা দিলেই কোন কোন অংশের যোগ না দেবার প্রশ্ন দেখা দেবে। তিনি আশা করেন ব্রিটিশরা চলে গেলে গণপরিষদ ঐক্যমূলক শাসনতন্ত্র রচনা করতে সক্ষম হবে। আর জোর করে দেশীয় রাজাদের শামিল করা ঠিক হবে না। ২৮ মার্চ রাজাজি ইঙ্গিত দিলেন, ক্রিপস যদি কংগ্রেসের সম্মতি চান তবে ভারতীয়কে প্রতিরক্ষামন্ত্রী করতেই হবে। সাপ্রু ও জয়াকর একই কথা বললেন।[৩২৫] জিন্না জানালেন, লীগ নীতিগত ভাবে ঘোষণা মেনে নিচ্ছে।

২৮শে লিনলিথগো ও ক্রিপস (e) অনুচ্ছেদ নতুন করে লিখলেন ও চার্চিলের অনুমতি নিলেন। তাতে বলা হল ব্রিটিশ সরকার ভারতের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব ও নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে রাখলেও ভারত সরকারের হাতে ভারতের সামরিক, নৈতিক ও সরবরাহ সংক্রান্ত সম্পদের সংগঠনের ভার ছেড়ে দেবে। ২৯ মার্চ নেহরুর সঙ্গে কথা বলে ক্রিপসের মনে হল প্রতিরক্ষামন্ত্রক নিয়ে গোলমাল হবে। নেহরু তাঁকে কংগ্রেস অফিসে নিয়ে গেলেন আর আজাদ তাঁদের গান্ধীর কাছে। ক্রিপসকে বলা হল—"India's association with defence portfolio was the key to Congress acceptance." সে দিন বিকেলে নেহরুকে (e) অনুচ্ছেদের পরিবর্তিত বয়ান দেখান হল। আজাদের মতে নেহরু তা ভেবে দেখতে রাজি হলেন। সন্ধ্যায় ঘোষণা সংবাদমাধ্যমের হাতে দেওয়া হল। ক্রিপস বললেন, "কোনো ভারতীয় প্রতিরক্ষার জন্য দায়ী থাকবেন বললে মিথ্যাচার হবে—ভারত সরকার শুধু ভারতীয় সম্পদ সংগঠন করবেন।"[৩২৬]

ক্যাপল্যান্ডের ডায়েরিতে পড়ি সে-রাত্রে এ ধরনের কাউন্সিল গঠন নিয়ে বড়লাট রাজি হন কিন্তু ৩০ মার্চ ক্রিপস যখন বললেন, আজাদকে জানিয়ে দেওয়া হোক, তখন বড়লাট বললেন, ভারতীয়কে প্রতিরক্ষামন্ত্রী করা হবে কিন্তু "without in any way impinging upon the functions and duties of the C. in C. as supreme commander...or as (Defence) member of the Executive Council."[৩২৭]

এই মুহূর্তকে আমরা ক্রিপস মিশনের turning point বলতে পারি। শোনা গেল গান্ধী

নাকি বলেছেন—ঘোষণাটা "blank cheque on a crashing bank."[৩২৮] ক্যুপল্যান্ড ৩১ মার্চ তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন, গান্ধী বলেছেন—"a post-dated cheque on a bank which is obviously going broke"[৩২৯]। নেহরু ক্রিপসেব সঙ্গে ৩০-এ ডিনার খেতে এলেন—মুখ অতি গম্ভীর। ক্রিপসের মনে হল তিনি এবং রাজাজি আপোস চাইলেও গান্ধী ও তাঁর শান্তিবাদী অনুচববা বাগড়া দিচ্ছেন। আর তাঁরাই ওয়ার্কিং কমিটিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ।[৩৩০] ক্যুপল্যান্ড ৩১-এ ডায়েবিতে লিখছেন, ক্রিপস কল্পনা কবছেন গান্ধী নৈরাজ্য চান। ক্যুপল্যান্ডের মতে গান্ধীর আপত্তি শান্তিবাদী বলে নয়, "but because it would be cooperation with the British, with all its responsibility, at a time when victory is uncertain." নেহরুব মনে হয়েছিল প্যাটেল, বাজেন্দ্র প্রসাদ ও কৃপালনির ধারণা জাপানীদের রোখা যাবে না এবং এ অবস্থায় কাউন্সিলে ঢোকা নিরর্থক। কোনো ভারতীয় সৈন্য আই এন এ-র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাইবে না। প্রতিরক্ষার পূর্ণ দায়িত্ব না পেলে ভারতীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রীই বা আলাদা শান্তিস্থাপন কববেন কিরূপে ?[৩৩১]

আমার ধারণা 'আলাদা শান্তি' কথাটা গোয়েন্দা দফতরের সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ। গান্ধীবাদীরা মার্চেব শেষে এতটা পরাজিত মনোভাব নিয়েছিলেন বিশ্বাস হয় না। সম্ভবত তিনি বিরোধিতা দ্বারা চাপ সৃষ্টি কবতে চাইছিলেন। মুরের মতে—নেহরুর হতাশাব্যাঞ্জক ব্যবহারের উদ্দেশ্য ভারতীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রীর জন্য আরও বেশি ক্ষমতা আদায়।

মোটের ওপর ক্রিপস আবার নেহরু ও আজাদের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন ২ এপ্রিল। তাঁবা এসেই জানালেন ওয়ার্কিং কমিটি প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছে, তবে আপাতত ঘোষণা মুলতুবি রেখেছে। আরও আপত্তি উঠেছে local option, দেশীয় রাজ্য, সরকারের পূর্ণদায়িত্ব ইত্যাদি বিষয়ে।[৩৩২ক] ক্রিপস ঐ দিনই এ খবব জানালেন চার্চিলকে। চার্চিল জানালেন মূল প্রস্তাবের খসড়া থেকে সরে যাওয়া সম্ভব নয়, তবে পূর্ণ ক্যাবিনেটের সম্মতিসাপেক্ষে প্রতিরক্ষা ব্যাপারে ক্রিপস, প্রধান সেনাপতি ও কংগ্রেসের মধ্যে আলোচনা চলতে পারে। আরও অন্যায় করলেন তিনি, বডলাটকে পরিস্থিতি বিষয়ে এক বিপোর্ট দিতে বলে। এই সুযোগ নিলেন বডলাট। তিনি ওয়াভেলের আপত্তি নিয়ে সাতকাহন গাইলেন। একে মা মনসা, তারপর ধুনোর গন্ধ। ওয়াভেল জানালেন, প্রতিরক্ষা ও অন্যান্য মন্ত্রকের মধ্যে মধ্যস্থতা করার জন্য Ministry of Defence Coordinationএর বেশি কিছুতেই তিনি রাজি হবেন না।[৩৩৩] ক্রিপস সব শুনে মন্তব্য করলেন—কংগ্রেসের সঙ্গে মিটমাটের সম্ভাবনা দশ শতকের বেশি নয়।

৪ এপ্রিল গান্ধী ওয়ার্ধা রওনা হলেন ার্কিং কমিটিকে বলে গেলেন, আজাদের পরামর্শানুসারে চলতে। নেহরু এতদিনে প্রস্তাবের বিরোধী ছ'জন গান্ধীবাদী সদস্যদের দলে যোগ দিয়েছেন। অন্যদিকে আজাদ, রাজাজি, দেশাই, পন্থ ও আসফ আলি প্রতিরক্ষা ব্যাপারে কিছু সুবিধা পেলেই ঘোষণা মেনে নিতে রাজি। ৪ এপ্রিল সন্ধ্যায় ক্রিপস নেহরু ও আজাদকে নিয়ে গেলেন ওয়াভেলের বাড়ি। কোন লাভ হল না। নেহরু চাইলেন প্রধান সেনাপতি পরামর্শদাতারূপে থাকুন, পুরো প্রতিরক্ষার ভার ভারতীয় সদস্যের হাতে থাক। উপস্থিত জেনারেল মোলস্‌ওয়ার্থ ভাবলেন, এবার আসল দর কষাকষি হবে। তা হল না। ওয়াভেল বললেন, "এই যদি আপনার বক্তব্য হয় তাহলে কিছু বলার নেই।" বলেই তিনি উঠে পড়লেন। ক্রিপস চার্চিলকে জানালেন মিটমাট না হলে এক প্রচণ্ড বিরুদ্ধ পরিবেশে যুদ্ধ চালাতে হবে। তাঁর সূত্র হল—প্রতিরক্ষামন্ত্রকের বিভাজন, প্রধান সেনাপতি হবেন ওয়ার মেম্বার আর জনৈক ভারতীয় হবেন প্রতিরক্ষা সমন্বয় বিভাগের কর্তা—তাঁকে কিছু

নগণ্য দায়িত্ব দেওয়া হবে।

এই মুহূর্তে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হলেন ব্রিটেনের সবচেয়ে শক্তিশালী মিত্র রুজভেল্টের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি কর্নেল এল এ জনসন। ক্রিপস তাঁর সাহায্য চান ৪ এপ্রিল। তিনি নেহরুর সঙ্গে দেখা করেন ৫ এপ্রিল।[৩৩৬] তাঁর সঙ্গে কথাবার্তার পর প্রতিরক্ষামন্ত্রক ভাগ নিয়ে জনসন, ক্রিপস, নেহরু প্রভৃতিব কয়েকবার আলোচনা হয। ৭ এপ্রিল ক্রিপস আজাদকে ভারতীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রীব হাতে কি কি দায়িত্ব দেওয়া হবে তার একটা আভাস দেন—যেমন জনসংযোগ, পেট্রোলিয়াম সববরাহ, সৈন্য ও তাদেব পরিবারের কল্যাণ, ক্যানটিন, স্টেশনারি ও মুদ্রণ। তিনি প্রতিরক্ষা সমন্বয় বিভাগেব ভাবও পাবেন—যথা ডিনায়াল পলিসি, অর্থনৈতিক যুদ্ধ ইত্যাদি। নেহরু জানিয়ে দেন, তাঁরা সন্তুষ্ট হননি। তখন ফর্মুলা পরিবর্তন করে নেহরুকে দেওয়া হয় ৮ এপ্রিল। স্থিব হয় প্রধান সেনাপতি এবং ওয়ার মেম্বারেব হাতে যুদ্ধমন্ত্রক থাকবে ও তার দাযিত্ব কি তালিকা-নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে। বাকী সব বর্তাবে ভারতীয় প্রতিবক্ষামন্ত্রীব হাতে। যদি নতুন কোন দাযিত্ব সংযোজিত হয় বা দুই মন্ত্রকে মতপার্থক্য দেখা দেয় তবে সিদ্ধান্ত নেবে ব্রিটিশ সবকাব—বড়লাট নন।[৩৩৭]

বলা বাহুল্য, লিনলিথগো ও ওয়াভেল আপত্তি জানান। তাঁদের অজ্ঞাতে তাঁদের দাযিত্ব নিয়ে কথাবার্তা চলছে এটা তাঁবা পছন্দ করতে পারেন না। চার্চিল জানতে চান নতুন ফর্মূলাটা কি? তিনি আবও জানান রুজভেল্টের ব্রিটেনস্থিত প্রতিনিধি হ্যাবি হপকিনস বলছেন—জনসনকে এ ব্যাপাবে নাক গলাবাব ক্ষমতা দেওযা হযনি (পরে বোঝা যায এটা হ্যারির ভুল—দুদিন পব রুজভেল্টের সর্নির্বন্ধ অনুবোধ আসে ক্রিপস মিশন যেন সফল করার সব চেষ্টা করা হয়)। ক্যাবিনেট ক্রিপসকে জানায় নতুন ফর্মুলা বডলাটদের অজ্ঞাতে করা ঠিক হয়নি, ঘোষণার বয়ানমত চলতেই হবে। আর ক্রিপস যে বাববার 'জাতীয় সরকার' কথা ব্যবহার কবছেন (যেমন আজাদকে লেখা ৭ এপ্রিলের চিঠিতে), এব অর্থ কি? কোন ভারতীয়কে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভার দেওযার কথা তো ছিল না। ক্যাবিনেট বড়লাটকে এবং চার্চিল ক্রিপসকে জানিয়ে দেন কোন কনভেনশান দ্বারা বড়লাটের বিশেষ দায়িত্ব বা ভিটোক্ষমতা ক্ষুণ্ণ করা চলবে না।[৩৩৮] এখন থেকে ক্রিপসের কথাবার্তার সুর বদলে গেল।

এদিকে নেহরু জনসনকে জানালেন (৯ এপ্রিল) নতুন ফর্মুলা তাঁদেব পছন্দ হয়নি। তিনি দাবি করলেন উভয় মন্ত্রকেব অধীনস্থ দায়িত্বের তালিকা। তিনি প্রশ্ন তুললেন জেনারেল, নেভাল ও এয়ার হেড্‌কোয়াটার্সের সঙ্গে প্রতিরক্ষামন্ত্রক যোগ রাখবে না কেন? আজাদ 'জাতীয় সরকার' কথাটা নিয়ে ক্রিপসকে চেপে ধরলেন। তিনি বললেন, 'ক্যাবিনেট ধাঁচের সরকার', 'জাতীয় সরকার'—এসব কথা প্রথম থেকেই ক্রিপস ব্যবহার করছেন কংগ্রেস তাই প্রশ্ন করেছে—জাতীয় সরকারই যদি হয়, তবে প্রতিরক্ষার দায়িত্ব থেকে তা কেন বঞ্চিত হবে? "The chief functions cf a National Government must necessarily be to organize defence, both intensively and on the widest popular basis, and to create mass psychology to an invader. Only a National Government could do that, and only a Government on whom this responsibility is laid," কেবল আপোসরফার জন্য কংগ্রেস প্রতিরক্ষা দায়িত্বের ওপর সীমা মেনে নিয়েছে, প্রধান সেনাপতি ও যুদ্ধ সদস্যের হাতে যুদ্ধ পরিচালনার ভার ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু ৯ এপ্রিল যে আলোচনা হয়

তাতে দেখা যাচ্ছে পুরনো ও নতুন তালিকায় বিশেষ ফারাক নেই। তাছাড়া এতদিন 'জাতীয় সরকার' 'ক্যাবিনেট ধাঁচের সরকার'—এ সব কথা ব্যবহার করে ৯ এপ্রিল ক্রিপস যা বলছেন, তাতে "It would be just the Viceroy and his Executive Council with the Viceroy having all his old powers."

তবু সত্যকার জাতীয় সরকার গঠিত হলে দায়িত্ব নিতে কংগ্রেস রাজি। ভবিষ্যতের ব্যাপার না হয় আপাতত মুলতুবি রইল।

"But in the present the National Government must be a Cabinet Government with full Power, and must not merely be a continuation of the Viceroy's Executive Council." আজাদ জানালেন, "আমরা দায়িত্ব নিতে পারি না যদি না আমাদের তা পালন করার দায়িত্ব ও ক্ষমতা না দেওয়া হয়।"[৩৩৯]

১০ এপ্রিলের ওয়ার ক্যাবিনেট ও চার্চিলের তার পড়ে ক্যুপল্যান্ড ডায়েরিতে মন্তব্য করেন—"Not generous." বস্তুত চার্চিল যখন লেখেন—ক্রিপসকে ভারতীয় দলগুলির সঙ্গে আলোচনার জন্য পাঠানো হয়নি, কেবল প্রস্তাবের সামান্য পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল—তখন তিনি হয় মিথ্যা বলছেন না হয় ব্যাপারটার ভুল ব্যাখ্যা করছেন। ক্রিপস সত্যি কোনদিন বড়লাটের বিশেষ দায়িত্ব বা ভিটোক্ষমতার হানি চাননি। তিনি চেয়েইছিলেন অবস্থার গুরুত্ব বুঝে বড়লাট কাউন্সিলের পরামর্শ সাধ্যমত শুনবেন। ক্যুপল্যান্ড প্রশ্ন রাখছেন, ১৯৩৭ সালে বড়লাট যদি গভর্নরদের প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার সঙ্গে বনিয়ে চলার পরামর্শ দিতে পারেন, তবে ১৯৪২ সালে নিজে কেন সে কাজ করলেন না? তিনি তো কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে ব্যাপারটা খোলসা করে নিতে পারতেন। তা না করে সাপ্রুর ভাষায়, নিজেকে 'পর্দার আড়ালে' রাখলেন। নেহরুর সঙ্গে কথা বলে সংবাদমন্ত্রকের এডওয়ার্ড ভিলিয়ার্সের একই কথা মনে হয়েছিল। অন্যদিকে প্রশ্ন করা যায়, ওয়ার ক্যাবিনেট ও চার্চিলই বা তাঁকে এই পরামর্শ না দিয়ে তাঁর একগুঁয়েমি ও ঔদ্ধত্যে প্রশ্রয় দিলেন কেন? সব চেয়ে বিস্ময়কর অ্যাটলির প্রতিক্রিয়া।

॥ ১৩ ॥

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ১১ এপ্রিল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। এটা পাস হয়েছিল ২ এপ্রিল, মুলতুবি ছিল এতদিন। ক্রিপস আপন মুখরক্ষার জন্য ১১ এপ্রিলের বেতার ভাষণে কংগ্রেসকে দোষ দিয়ে গেলেন। ভারতের স্বাধীনতা ও গণপরিষদ তো তিনি দিতেই চেয়েছিলেন। আর প্রতিরক্ষার ব্যাপারটায় কংগ্রেসকে তুষ্ট করতে গেলে "বহু বছর আগে যে ডিম ভাঙা হয়েছে তা আবার জোড়া দিতে হয়।" শত্রু যখন দোরগোড়ায় তখন তা কি সম্ভব। তদুপরি শেষ মুহূর্তে কংগ্রেস কিনা দাবি করল শাসনতন্ত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন—জাতীয় সরকার! "সহজেই বোঝা যায় ভারতের মহান সংখ্যালঘু দলগুলি এ ব্যবস্থা কোনদিন মেনে নেবে না...এতদিন ধরে আমরা যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তা খেলাপ হবে এতে।" বস্তুত নির্লজ্জ মিথ্যাভাষণ না নির্জলা আত্মপ্রতারণা—কি বলা যায় একে?

ক্যুপল্যাণ্ডের ডায়েরিতে ক্রিপসের মনোভাব ধরা পড়েছে, "They (Congress) have come to the very edge of the water, and stripped, but hesitate to make the plunge because the water looks so cold."[৩৪০] সত্যই কি

তাই ?

গান্ধীকে তিনি সব চেয়ে বেশি দায়ী করেছেন। তিনি নাকি ৯ এপ্রিল ওয়ার্ধা থেকে টেলিফোন করে প্রায় সম্পাদিত চুক্তি বানচাল করে দেন। অথচ গান্ধী এবং মহাদেব বলছেন, ৪ এপ্রিলের পর গান্ধীর সঙ্গে কংগ্রেসী নেতাদের কোন কথা হয়নি। তাঁদের অবিশ্বাস করার কারণ নেই।

ক্রিপসের একটা অভিযোগ বিশেষ ভাবে পীড়িত করেছিল আজাদ ও নেহরুকে। নিজে জাতীয় সরকাব শব্দ ব্যবহার করে শেষে তিনিই বলছেন—কনভেনশনেব পরিণতি "absolute dictatorship of the majority"? কংগ্রেসের লক্ষ্য যখন ভারতেব নিরাপত্তা, তখন কিনা বলা হচ্ছে কংগ্রেস হিন্দুবাজত্ব কায়েম কবতে চায়?[৩৪২] নেহরু বিস্মিত হয়েছিলেন ক্রিপসেব পরিবর্তন দেখে। ইভলিন উডকে তিনি লেখেন, "ক্রিপসকে পছন্দ করতাম, যদিও তিনি কিছুটা বিশৃঙ্খলমস্তিষ্ক" কিন্তু "On this occasion I was surprised at his woodenness and in spite of his public smiles."[৩৪৩]

মুসলমানরা বাগ করবে এমন কথা আগে থেকেই বলা হচ্ছিল। এমেরি লিনলিথগোকে লেখেন, "ক্রিপস এমন দিকে এগুচ্ছিলেন আমরা সবাই যার বিবোধী· ·ক্রিপস এতদূব এগুলেন অথচ জিন্না বারবাব বলেছেন মুসলমানরা বিদ্রোহ করবে··"[৩৪৪] ক্রিপসের ব্যর্থতাব জন্য অ্যাটলিও কংগ্রেসেব জেদ ও সাম্প্রদায়িক মতভেদকে দায়ী করেন। ক্যাপল্যাণ্ড প্রায় এক কথাই বলেছেন The Crips Mission পুস্তিকায়। অথচ ক্যাপল্যাণ্ডের ১০ এপ্রিলেব রোজনামচায় দেখছি— "উইনস্টন ও এমেরি ক্যাবিনেটের ব্যাপারটায় অনর্থক উদ্বিগ্ন হচ্ছেন, মুসলিম সংখ্যালঘুরা কোন দুর্ঘটনা ঘটতে দেবে না।" মুসলিম-বিবোধিতা একটা পশ্চাৎচিন্তা মাত্র। আসল কারণ, মুরের মতে, ভারতীয়দেব হাতে যুদ্ধের পবও ক্ষমতা হস্তান্তব কবাব ইচ্ছা ছিল না রক্ষণশীল দলের। গান্ধী ও নেহরু সম্বন্ধে তাঁদের বিবাগ অবশ্যই একটা বড় ভূমিকা নিয়েছে। এমেরি তাঁদের আখ্যা দেন, "niggling unpractical creatures."[৩৪৫] লিনলিথগো এমেরির এক চিঠির প্রান্তে স্বহস্তে মন্তব্য লেখেন, "They could never run straight."। জনসন ও রুজভেল্টেব বুঝতে অসুবিধা হয়নি। জনসন স্পষ্টতই চার্চিলকে দায়ী করেছেন।[৩৪৬] রুজভেল্ট হপকিনস্‌কে লিখছেন, "American public opinion cannot understand why, if the British Government is willing to permit the component parts of India to secede from the British empire after the war, it is not willing to permit them to enjoy self-government during the war."[৩৪৭] তিনি চেয়েছিলেন ক্রিপসকে করাচিতে থামিয়ে ফের আলোচনায় বসাতে। চার্চিল তাঁর অনুরোধ ক্যাবিনেটকে জানাননি। লুই ফিশার ঠিকই বলেছেন, ক্রিপসকে পেছন থেকে ছুরি মাবা হয়েছিল।

গান্ধী ১৯ এপ্রিলের 'হরিজন'-এ লিখলেন, 'That Ill-fated Proposal' প্রবন্ধ। বললেন—এমন হাস্যকর এই প্রস্তাব যে কোথাও তা গৃহীত হল না। আর প্রস্তাবক কিনা ক্রিপস—"acclaimed as a radieal among the radicals and a friend of India?" তিনি কি জানতেন না যে সাম্রাজ্যের বাইরে যাবার ক্ষমতা দেওয়া হলে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের দিকে কেউ নজর দেবে না? তা ছাড়া ভারতকে তিন ভাগে ভাগ করার পরিকল্পনা? সব শেষে, দায়িত্ববান মন্ত্রীদের হাতে প্রতিরক্ষার সত্যকার নিয়ন্ত্রণও দেওয়া হল না। যথাবীতি গান্ধী ভারতীয়দের নিজেদের দুর্বলতার কথা মনে করিয়ে

দিলেন। সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান না হলে স্বাধীনতা কোনও দিন আসবে না। যদি মুসলমানদের অধিকাংশ নিজেদের স্বতন্ত্র জাতি বলে মনে করে, পৃথিবীর কোন শক্তি তাদের অন্য রকম ভাবতে বাধ্য করতে পারবে না। যদি তারা সেই ভিত্তিতে দেশ ভাগ চায়, তারা পাবে—যদি না হিন্দুরা তার বিরুদ্ধে লড়াই করে। তাঁর মনে হচ্ছিল উভয় পক্ষে সেরকম গৃহযুদ্ধের আয়োজন চলছে। কিন্তু তা হবে আত্মহত্যা। প্রত্যেক দল হয় ইংরেজ না হয় কোন বিদেশী শক্তির সাহায্য চাইবে। "আর তাহলে, হে স্বাধীনতা, বিদায়।"

নেহরু আরও কড়া সুরে উদ্ধৃত করলেন লঙ (Long) পার্লামেন্টের সামনে অলিভাব ক্রমওয়েলের বিখ্যাত সেই বক্তৃতা, "You have sat too long here for any good you have been doing. Depart, I say, and let us have done with you. In the name of God, go." গান্ধীর 'ভারত ছাড়ো'র সঙ্গে এব সুবের, এমন কি ভাষার, পার্থক্য কোথায়? অথচ এর সম্পূর্ণ উল্টো কথা বলতেও তাঁব বাধল না। ১১এপ্রিল জনসনকে বললেন, ব্রিটেনের বিপর্যয়ের তিনি তাকে বিব্রত করবেন না—বরং সমবসম্ভাব উৎপাদন যাতে আবও ত্বরান্বিত হয, ধর্মঘট ইত্যাদি দ্বাবা ব্যাহত না হয, দেখবেন। আর জাপানীরা যদি ভারত আক্রমণ করে তিনি শুধু অহিংস অসহযোগে দিযে তাব প্রতিবোধ করবেন না, প্রয়োজন গেরিলা যুদ্ধেব আযোজনে কববেন, পোড়ামাটিব নীতি সমর্থন কববেন।১২ এপ্রিলের দিল্লী সাংবাদিক সম্মেলনের এতদূব বললেন যে, সুভাষ বসু এলেও তিনি তাঁব বিবোধিতা করবেন—কারণ তাঁর বাহিনী "a dummy force under Japanese control" ছাড়া আর কিছু নয। গান্ধী এতটা সহ্য করতে বাজি ছিলেন না। তিনি সাবধান কবে দিলেন, "তোমাব নীতি যদি গৃহীত হয় তবে ওযার্কিং কমিটি এখন যা তা থাকা উচিত নয।"[৩৪৮] গেবিলা যুদ্ধেব আহ্বান প্রত্যাহার কবতে নেহরুকে তিনি বাধ্য কবলেন।

বস্তুত, জাপানী আক্রমণেব সম্ভাবনা অনেক বেড়েছিল। ৬ ফেব্রুযাবি বার্লিনে এক আলোচনা হয়, তাতে উপস্থিত ছিলেন মাৎসোটা (সুভাষ), ডঃ ট্রট, ডঃ জিজউইজ্ (Zitzwitz), কর্নেল ইয়ামামোটো, মেজর মাবওয়েড ও দোভাষী ডঃ ভাগ্নাব। সুভাষ বলেন, সিঙ্গাপুব ও রেঙ্গুনেব পতনেব পব মিত্রপক্ষেব মনে যে মানসিক আঘাত লাগবে তার সুযোগ নিযে জাপানীদেব ভাবত আক্রমণ কবা উচিত। ইযামামোটো বলেন—বাশিযান ফ্রন্টে আক্রমণেব কথা চলছে। আপাতত বাংলাসহ ভাবতেব পূর্ব ফ্রন্টে সুভাষেব বিশ্বস্ত অনুচবদের সঙ্গে জাপানীদেব যোগাযোগ হওযা বাঞ্ছনীয। আক্রমণেব সঙ্গে অভ্যন্তবীণ উত্থান বা নাশকতামূলক কাজকে সমন্বয় কবতে হবে।[১] ৩ মার্চ ব্যাঙ্কক থেকে খবব আসে কিছু জাপানী সেনাপতিব সঙ্গে ভাবতীয সেনাপতি ব্যাংকক এসেছিল, সিঙ্গাপুব গিয়েছিল, আবার ফিরে টোকিও বওনা হযেছে। ভাবতীয় সেনাপতিদের মধ্যে রযেছেন মুক্ত ভারতীয বাহিনীর অধিনায়ক মোহন সিং, জাপানীদেব মধ্যে ফুজিয়াবা ও ইযামাগুচি থাকতে পাবেন। আলোচনার বিষয়—সুদূব প্রাচ্যে ভাবতীয় সেনাদেব কাজকর্মে সংহতি আনযন, ভাবতের মুক্তি সংগ্রামে তাদেব যোগদান। এতদিন পর্যন্ত অধিকাংশ ভাবতীয সেনাপতি ব্রিটেনেব বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাজি হয়নি, এখন ব্রিটিশ সৈন্যেব ক্রমাগত পশ্চাদপসবণে হতাশ হযে তারা স্বেচ্ছায় জাপানীদের সঙ্গে যোগ দিতে প্রস্তুত হচ্ছে। তাদেব সঙ্গে কথা বলে জানা গেল তারা বসুব রাজনীতি পূর্ণ সমর্থন করে ও "would endeavour, to obtain Japanese consent, to place entire Indian movement including Indian troops of Malay under political leadership of B. (Bose)." ১১

মার্চ আই এন সি-র সচিব দাস বসুর কাছে পাঠানোর জন্য এক বার্তা দেন, তাতে দেখি আই এন সি-র ৫৩০০ সদস্য ও ১০০০ স্বেচ্ছাসেবী বসুর নেতৃত্ব মেনে নিতে প্রস্তুত। "We request thee to take up supreme command over all Indian soldiers in the regions occupied by Japan in order to avoid that Indian leaders of subordinate importance are utilized by the Japanese for their own ends." ভাবতীয়রা বসুকেই একমাত্র বিশ্বাস করে কাবণ "Thou art not purchasable and place Indian interest ahead of everything else." এই চিঠিতে স্পষ্ট ভারতীয়রা জাপানীদের অধীনে কাজ করতে চায় না, জাপানেব উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও তাবা সন্দিহান।

এ দিকে, নাম্বিয়ারের মতে, ৪২-এর জানুয়াবি থেকে বসুও পূর্ব এশিযায যাবাব জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বার্লিনে, ওশিমা, ইয়ামামোটো ও সুভাষচন্দ্রের ঘনঘন কথা চলছে কিন্তু জাপানে অনেকেই মনে করছে বার্লিন থেকে তিনি নেতৃত্ব দেবেন কি ভাবে ? তাবা চাইছে রাসবিহাবী বসুকে। এর কারণ জার্মানদেব প্রতি ঈর্ষা হতে পাবে, জাপানীবা বাজনৈতিক প্রশ্নের চেয়ে সামবিক প্রশ্নকে বেশি গুরুত্ব দিতে পাবে, আবাব তাবা সম্পূর্ণ নিজেব তাঁবেব ভারতীয়কে চাইতেও পারে। ব্যাংককের ইণ্ডিযান ইণ্ডেপেণ্ডেন্স লীগ বাসবিহাবীকে প্রস্তাব দেয যে, সুভাষকেই ভাবতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা করা উচিত, বাসবিহাবী তাঁর প্রতিনিধিরূপে কাজ করুন।

১৯৪২-এর এপ্রিল নাগাদ টোকিও সিদ্ধান্ত নিল সুভাষকে পূর্ব এশিযায় নিয়ে আসা হোক। তখন (২২ এপ্রিল) তিনি কাবুলকে নানা নির্দেশ পাঠাচ্ছিলেন—যেমন সুভাষেব সকাল সন্ধ্যায় নিযমিত বেতার ভাষণেব খবব প্রচাব, ব্রিটিশেব ক্রমাগত পবাজয় হচ্ছে বটনা, যুদ্ধসংক্রান্ত শিল্পে 'ধীবে চলো' নীতি অনুসবণ, চট্টগ্রাম থেকে কন্যাকুমাবী জাপানী ও জার্মান অভিযানকারীদেব জন্য স্বাগত জ্ঞাপনেব ব্যবস্থা, তাবা কোন অঞ্চল দখল কবলে পার্শ্ববর্তী ব্রিটিশ অঞ্চলের লোকদেব অস্ত্রশস্ত্র নিতে আসাব ব্যবস্থা, বার্লিনে স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গঠনেব সংবাদ প্রচার, ব্রহ্মেব জাপানী সৈন্যবাহিনীব সঙ্গে যোগাযোগ, বিরোধী লোকদের তালিকা প্রস্তুত করা, সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ব্যাপক ইংবেজবিরোধী প্রচার, আদিবাসী অধ্যুষিত (পশ্চিম সীমান্তে) প্যারাশুট সৈন্য অবতবণেব ব্যবস্থা, 'পোড়ামাটি' নীতিতে বাধা দান।

টোকিওতে ২৮ থেকে ৩০মে যে ভারতীয় প্রতিনিধি সম্মেলন বসল তাব প্রোটোকল পাচ্ছি ব্যাংককে ৮ মে-র তাববার্তায়। এখানেই স্থিব হল 'মটো'—ঐক্য, বিশ্বাস, আত্মনিবেদন (unity-faith-sacrifice), আর লক্ষ্য—ভারতেব পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন। একসিকিউটিভ কমিটির অস্থায়ী সভাপতি হলেন রাসবিহাবী বসু। স্থিব হল ভাবতেব বিরুদ্ধে অভিযান ভারতীয় সেনাপতিব অধীনে চালাবে ভাবতীয জাতীয বাহিনী (I.N.A.) একসিকিউটিভ কমিটি চাইলে জাপানীরা সামবিক সাহায্য দেবে। জাপানীদেব কথা দিতে হবে তারা ভারতেব স্বাধীনতা স্বীকাব কববে ও ভাবতীযদেব ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র বচনা কবতে দেবে। অবশ্যই স্বাধীন ভাবত জাপান-ঘোষিত co-prosperity sphere-এর সমান অধিকারসম্পন্ন সদস্য হবে।

৫ জুন ন্যানকিং থেকে খবব এল ব্যাংককে জাতীয কংগ্রেসে যোগ দিতে সাংহাই থেকে তিন জন ভারতীয় প্রতিনিধি গেছে। মার্কিন সৈন্য বাংলায মোতায়েন হচ্ছে। উপকূলবর্তী অঞ্চল থেকে লোকজনদের সরিযে দেওযা হচ্ছে। সবাই ওয়ার্ধায মহাত্মা কি কবেন সেদিকে তাকিয়ে আছে।

১৫ জুন ব্যাংককের খবর—রাসবিহারী বসুর সভাপতিত্বে ভারতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছে। জাপানের প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণায় বলা হয়েছে ব্রিটেনের সঙ্গে ভারতের মাটিতে যুদ্ধ আসন্ন—ভারতীয়রা যেন এখনই ব্রিটেনের সম্পর্ক ত্যাগ করে। ১৫ জুলাই-এর তারে জানি জাপানীরা রাসবিহারীকে পূর্ব এশিয়ার সর্বোচ্চ নেতা বলে স্বীকার করে এবং টোকিওর ভারতীয়দের নেতা—সহায় এবং ব্যাংককের ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কাউন্সিলের নেতা—দাস তা মেনে নেন। মালয় ও ব্রহ্মেব ভাবতীযেরা রাসবিহারীকে পছন্দ কবেনি। "Provisional supreme leadership of Gandhi in India is supported by majority of Indian leaders in East Asia..." যদিও তারা জানে গান্ধী তাদের কাজকর্ম পছন্দ করবেন না। একমাত্র দাসই সুভাষ বসুকে সর্বোচ্চ নেতার পদ দেবার কথা তোলেন। রাহবিহারী চান সুভাষ তা পশ্চিম থেকেই দিন। অধিকাংশ ভারতীয় মনে করে সুভাষ বসু জাপানীদের পছন্দের লোক নন, আর তিনি প্রাচ্যে উপস্থিতও নন। তখন স্থির হয় সুভাষকে প্রাচ্যে আনার ব্যবস্থা করা হোক। ২৩ জুলাই সুভাষ রিবেনট্রপকে অনুরোধ জানান—যেহেতু দু দুবার ইতালীর প্লেন সুদূর প্রাচ্য নিবাপদে ঘুরে এসেছে, তাঁকেও এইভাবে সেখানে যেতে দেওয়া হোক। জার্মান সবকাব অনুরোধ জানালে ইতালী নিশ্চয়ই এ ব্যবস্থা করবে। এ অনুরোধ যেন হিটলাবকে জানানো হয। সুভাষ চান আগস্টেব প্রথম সপ্তাহে পৌঁছতে।

আমরা জানি তা হয়নি। সুভাষ রওনা হলেন ৮ ফেব্রুযাবি, ১৯৪৩। পূর্ব এশিযায় পৌঁছলেন—১৯৪৩ সালেব মে মাসে। তখন যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি অনেকখানি বদলে গেছে। তোজোর সঙ্গে দেখা হতে আবও সময গেল—অতি মূল্যবান সময়।

কিন্তু ১৯৪২-এর সেই আগস্টেই নেওয়া হযেছিল 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব আব ভারতবর্ষে শেষ ব্যাপক গণ বিদ্রোহ আওযাজ তুলেছিল—'করেঙ্গে ইযা মবেঙ্গে।' সুভাষ কি বহুদূর থেকে গান্ধীব মনে যাদু বিস্তাব কবেছিলেন ?

সুভাষ যখন কাছে ছিলেন গান্ধী তাঁকে দূরে ঠেলে দিয়েছিলেন। তিনি যখন নিরুদ্দেশে পাড়ি জমালেন, তাঁব মনে একটা ধাক্কা লাগল। একে ঠিক অপরাধ বোধ বলা চলে না, যদিও তার সামান্য ছোঁওয়া থাকতে পাবে। ১৯৩৯-৪০ সালে তিনি ও সুভাষ দুই মেরুতে অবস্থান করতেন। প্রথমত, গান্ধী ছিলেন প্রকৃত সত্যাগ্রহী, সারা জীবন ইংরেজদেব সঙ্গে লড়েও তিনি তাদের বিপদের সুযোগ নিতে চাননি। তাঁব রাজনীতি কৌটিল্য বা মাকিয়াভেল্লিকে সযত্নে পরিহার কবেছিল। দ্বিতীয়ত, সুভাষেব মত জার্মেনী ও ইতালীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না বটে এবং নেহরুর মত তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার না হলেও তিনি তাদের কাণ্ডকারখানা পছন্দ কবেননি। হেগেলেব Idea যা ক্ষমা করবে গান্ধীর ঈশ্বব তা কববেন না। ১৯৪১-এব শেষ পর্যন্ত তাঁকে বলতে শুনি হিটলারতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদে বেশি তফাত নেই। "Hitlerism is a superfine copy of Imperialism." পবে, "And is there any difference between Imperialism and Nazism ? I see none. The latter is the logical outcome of the first." তৃতীয়ত, তাঁর মনে হযেছিল ১৯৩৯-৪০ সালে দেশ প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত ছিল না। কংগ্রেসের দুর্নীতি তো ছিলই, মুসলিমদেব মতিগতিও তাঁব ভাল লাগেনি। জিন্নার দ্বিজাতি তত্ত্ব প্রচার ও লাহোর প্রস্তাব, তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত কথাবার্তা ও চিঠিপত্র সবই এর প্রমাণ। খুব খেদেব সঙ্গে তিনি স্মরণ করছিলেন খিলাফতি যুগেব সৌহার্দ্যের কাহিনী। কেন কংগ্রেসী ও হিন্দুদেব ওপর এই অন্যায় আক্রমণ—প্রশ্ন করেছিলেন জিন্নাকে। জিন্না উত্তর দিযেছিলেন

অতি অশোভন ও অসংযত ভাষায়। চতুর্থত, আন্দোলন হিংসার পথ নেবে এমন সন্দেহ তাঁর ছিল, আর সুভাষ যে অহিংসায় বিশ্বাসী নন তিনি জানতেন। পঞ্চমত, কংগ্রেসের ওপর তাঁর দৃঢ়মুষ্টি শিথিল হয়ে যাচ্ছিল। কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতা বলছিলেন—দাবি পূরণ হলে তাঁরা ইংরেজদের সক্রিয়ভাবে (অর্থাৎ সহিংস ভাবে) সাহায্য করবেন। তিনি তাতে অংশ নেবেন কোন নীতিতে ?

ব্যক্তিগত অসহযোগ ব্যাপারটা ধামাচাপা দিয়েছিল। তিনি ভেবেছিলেন বোম্বাই এ আই সি সি ১৯৪০-এর ১৬ সেপ্টেম্বর যে প্রস্তাব নিয়েছিল তদনুসারে কাজ করছিলেন তিনি। কিন্তু ১৯৪১-এর শেষে জেল থেকে বেরিয়ে অনেকে তাঁর ব্যাখ্যা সম্বন্ধে মতদ্বৈধ প্রকাশ করতে লাগলেন। অনেকে পুণায় গৃহীত ১৯৪০-এর ২৮ জুলাই-এর প্রস্তাব (মন্ত্রিত্ব গ্রহণ)-এ ফিরে যেতে চাইলেন। ১৯৪১-এর ২৮ অক্টোবর গান্ধী বিবৃতি দিলেন—তেব দফা গঠনমূলক কর্মসূচি ও কিছু মনোনীত লোকের সত্যাগ্রহ এখনও অনুসরণ কবা উচিত।[৩৫০] ডিসেম্বরের শেষে বারদোলিতে ওযার্কিং কমিটি বসলে গান্ধী অনুবোধ কবলেন তাঁকে নেতৃত্বের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হোক। তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হল। দায়সারা ভাবে বলা হল স্বরাজ লাভেব জন্য অহিংসার পথ পরিহার কবা হবে না। বোম্বাইতে গৃহীত প্রস্তাব পুনরনুমোদন করা হল। ওযার্ধায় এ আই সি সি-র অধিবেশন বসল ১৯৪২-এর জানুয়াবিতে। গান্ধী বললেন, বাবদোলি প্রস্তাব বিনা ভোটে মেনে নেওযা হোক। তিনি একে ভ্রান্ত মনে করেছিলেন এবং এব পেছনে বাজাজিব হাত লক্ষ করেছিলেন। কিন্তু নিজের নেতৃত্ব বাঁচাতে কারুর (যেমন রাজাজি বা নেহরুব) বিশ্বাসে আঘাত করতে চাননি। "I do not want it to be said that in order to retain my leadership you bade good-bye to your senses because you had no courage to give me up. I do not covet leadership by undermining any one's manhood."

প্যাটেল ও রাজেন্দ্র প্রসাদকে পদত্যাগ করতে বারণ করেছিলেন তিনি। আর নেহরুর সঙ্গে তার ক্রমবর্ধমান পার্থক্য সম্বন্ধে করেছিলেন বিখ্যাত উক্তি—"Jawarharlal has been resisting me ever since he fell into my net. You cannot divide water by repeatedly striking it with a stick. It is just as difficult to divide us. I have always said that *not Rajaji, nor Sardar Vallabhbhai, but Jawaharlal will be my successor.* He says whatever is uppermost in his mind, but he always does what I want."[৩৫১]। রাজাজি সরকারেব সহযোগিতা করতে চান, আশা করছেন নেহরু তাঁর সঙ্গে যাবেন, কিন্তু তা হবে না।

এমন সময় সুদূর প্রাচ্যে জাপানের অগ্রগতি সকলকে স্তম্ভিত করে দিল, সুভাষের বেতার ভাষণ অনেকের মনে অসম্ভবের আশা জাগাল, ক্রিপস মিশন রাজাজি, আজাদ ও নেহরুব মনে সহযোগিতার আহ্বানের মত শোনাল। গান্ধী প্রমাদ গুনলেন। যদি প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হয়, নেতৃত্বে তিনি ফিরতে পারবেন না। তাঁরই চোখের সামনে তাঁরই হাতে গড়া কংগ্রেস তাঁরই অহিংসা নীতি উপেক্ষা করে ইংরেজের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে। কিন্তু যদি না হয় ?

ক্রিপসের ঘোষণা সম্বন্ধে তাঁর প্রতিক্রিয়া প্রথম থেকেই বিরূপ হল। আজাদ ও নেহরুকে আলোচনা চালাতে বলে ৪ এপ্রিল তিনি ওয়ার্ধা চলে গেলেন। কিন্তু তার আগে ২ এপ্রিল ঘোষণা অগ্রাহ্য করে ওয়ার্কিং কমিটি যে প্রস্তাব নিল তাতে গান্ধীর হাত স্পষ্ট।

চার্চিল, লিনলিথগোরা বাগড়া না দিলে ব্যাপারটা কোনদিকে গড়াত বলা যায় না, কিন্তু মীমাংসা হল না। এখন গান্ধী কোন পথ নেবেন ? ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ ব্যর্থ হয়েছে, ক্রিপস্ দৌত্যও ব্যর্থ হয়েছে। গান্ধী সংকটে পড়লেন। এলাহাবাদে এ আই সি সি অধিবেশন বসবে, মৌলানা তাঁকে যাবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করছেন। কিন্তু গিয়ে কি বলবেন তিনি ? জাপানীদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ ? ভারতের সকল লোককে সামরিক শিক্ষাদান ? হোরেস অ্যালেকজাণ্ডারকে মনের দুঃখ জানালেন তিনি AICC-র সাত দিন আগে। **"How could the British Government, at this critical hour, have bahaved as they did ? The whole thing has left a bad taste in the mouth."** ইংরেজদের কি করণীয় ? **"My firm opinion is that the British should leave India now in an orderly manner and not run the risk they did in Singapore and Malaya and Burma."** ব্রিটেন ভারতকে বাঁচাতে পারবে না, নিজেকেও নয়। **"The best thing she can do is to leave India to her fate."**[৩৫২]

কংগ্রেসের কি করণীয় তা জানা যায় প্যাটেলকে লেখা চিঠিতে। এলাহাবাদ এ আই সি সি-তে তিনি তাঁকে যেতে বারণ করছেন, যদি তিনি যান তবে অহিংস অসহযোগ সম্বন্ধে পরিষ্কার কোন প্রস্তাব গ্রহণ না করলে পদত্যাগ করতেও বলছেন। প্যাটেলের উচিত পোড়ামাটি নীতি বা বিদেশী শত্রুকে আহ্বান করার প্রস্তাবে আপত্তি জানানো।[৩৫৩] বোঝা যায় ইংরেজ, জাপানী কারুর সঙ্গেই তিনি সহযোগিতা করতে চাইছেন না।

এলাহাবাদে তিনি গেলেন না কিন্তু মীরাবেনের হাতে এক প্রস্তাব পাঠিয়ে দিলেন। ২৭ এপ্রিল থেকে ১ মে এ আই সি সি ঐ প্রস্তাব, রাজেন্দ্রবাবুর সংশোধনী ইত্যাদি আলোচনা করে, প্রথমে রাজেন্দ্রবাবুর প্রস্তাব ও আজাদের কথায়, শেষে, নেহরু উত্থাপিত এক বিকল্প প্রস্তাব গ্রহণ করল। তাতে ক্রিপস্-প্রস্তাবকে নিন্দা করে বলা হল—**"It is significant and extraordinary that India's inexhaustible manpower should remain untapped while India develops into a battleground between foreign armies fighting on her soil or on her frontiers, and her defence is not supposed to be a subject fit for popular control. India resents this treatment..."** সংকট থেকে প্রমাণ হচ্ছে ভারতে ব্রিটিশ অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ থাকুক এমন কোনো পরিকল্পনা কংগ্রেস মেনে নিতে পারে না। **"Not only the interests of India but also Britain's safety, and world peace and freedom demand that Britain must abandon her hold on India."** কংগ্রেস মনে করে যে কোনো বিদেশী শক্তির আক্রমণ দ্বারা ভারতের স্বাধীনতা আসবে না। যদি আক্রমণ আসে তবে তা প্রতিহত করতে হবে। তা নেবে অহিংস অসহযোগের রূপ। যদি আক্রমণকারী আমাদের ঘরবাড়ি ক্ষেতখামার নিতে চায় আমরা মৃত্যুপণ বাধা দেব। যে সব অঞ্চলে ইংরেজদের সঙ্গে তাদের লড়াই হচ্ছে সেখানে আমাদের অসহযোগ অর্থহীন। সেখানে ইংরেজ বাহিনীকে বাধা না দেওয়াই আক্রমণকারীর সঙ্গে অসহযোগ। দেশের সর্বত্র আত্মনির্ভরতা ও আত্মরক্ষার সংকল্প গ্রহণ করতে হবে।

যদি আমরা গান্ধীর খসড়ার সঙ্গে এর তুলনা করি তবে পার্থক্যটা হৃদয়ঙ্গম হবে। গান্ধী লিখছেন, "জাপানের কলহ ভারতের সঙ্গে নয়। সে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। ভারত যে যুদ্ধে যোগ দিয়েছে তাতে ভারতীয় জনগণের প্রতিনিধিদের সম্মতি

নেওয়া হয়নি। সেটা একমাত্র ব্রিটিশ নীতি। ভারত যদি স্বাধীন হয় তার প্রথম পদক্ষেপ হবে সম্ভবত জাপানের সঙ্গে বোঝাপড়া। কংগ্রেসের ধারণা ইংবেজরা ভাবত ত্যাগ করলে, জাপানী বা অন্য কোন আগ্রাসী শক্তিকে ভারত আরও ভালো ঠেকাতে পাববে। "The AICC is, therefore, of opinion that the British should withdraw from India." কমিটি জাপানী সরকাবকে জানাতে চায় যে ভাবতীয় জনগণের জাপান বা অন্য কোন দেশের প্রতি বিরূপ মনোভাব নেই। ভাবত চায পবাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি। সে বিদেশীদের সহানুভূতি চায়, সামরিক সাহায্য নয। অহিংস শক্তি দ্বাবাই ভাবত তা অর্জন করবে। কমিটি আশা করে জাপান যেন ভাবত সম্বন্ধে কোন অভিসন্ধি না পোষণ করে। যদি জাপান ভারত আক্রমণ কবে তবে ভাবত সম্পূর্ণ অসহযোগিতা কববে।

ইংরেজদের সঙ্গে সক্রিয সহযোগিতা আমবা কবতে পাবি না কিন্তু যেখানে লডাই চলছে তাদের বাধা দেওয়াও ঠিক হবে না। সেখানে অসহযোগিতা করলে তা জাপানীদের হাতে দেশকে তুলে দেওয়ার শামিল হবে। তবে কমিটি পোড়ামাটি নীতিব বিবোধী আব ইংবেজদের প্রতি অনুবোধ তারা যেন বিদেশ অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র থেকে সৈন্য আমদানি না করে। যাবা আছে তারাও যেন বিদায নেয। এটাও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদেব নীতিহীনতাব প্রমাণ।[৩৫৪]

ফরাসী স্ট্রাকচারালিস্টরা এই 'ডিসকোর্স' বিশ্লেষণ করলে অনেকগুলি স্তব পাবেন। এই খসড়া ও অন্যান্য চিঠিপত্র, ভাষণ ইত্যাদি পডলে মনে হয গান্ধীব দৃঢ় ধাবণা ছিল ইংবেজবা ভারত ছেড়ে গেলে জাপানীরা আক্রমণ কববে না। "The presence of the British in India is an invitation to Japan..." অথচ এও নয তিনি জাপানের স্বরূপ জানেন না। "Indeed, Japan is too much of an aggressor for me..." কিন্তু ইংরেজ ও জাপানীদের মধ্যে তফাত আছে। একজন প্রত্যক্ষ আগ্রাসী—কয়েক শ' বছব বুকে চেপে বসে আছে ; অন্যজন আক্রমণ করতে পারে, নাও পাবে। তাবা ইংবেজদেব সঙ্গে লড়তে চায়। ভারতের সঙ্গে তাদের কোন বিরোধ নেই। ইংরেজবা চলে গেলে "We shall be able to come to terms with Japan." বাজাজির কথা তুলে তিনি বলছেন, তিনি মনে করেন ইংরেজ রাজত্ব শ্রেয়ঃ, কিন্তু গান্ধী তা মনে করেন না। তাদেব মনের পরিবর্তন হবে না। অর্থাৎ গান্ধীর মত হৃদয়ের পরিবর্তনে বিশ্বাসী সত্যাগ্রহীও আশা হারিয়েছেন। কেন ? ব্রিটেন কি রাজাজির বাড়ানো হাত ধরেছে ? ক্রিপসেব পব আব কোনো দূত পাঠিয়েছে ? তারা যদি ভারত ছেড়ে যায় হয়তো অরাজকতা দেখা দেবে, কিন্তু ভারতে যা চলেছে তা কি ordered anarchy নয ? "হয়তো কিছুদিন গৃহযুদ্ধ হবে। কিন্তু তার থেকে উঠবে সত্যকার ভারত।" বোঝা গেল ১৯৩৯ সালে যে ইংরেজ তাঁর নৈতিক সমর্থন পেয়েছিল তা হারিয়েছে। তা না হলে তিনি বলতে পারতেন না, "তারা ভগবানের হাতে ভারতকে ছেড়ে যাক..." ; লিখতে পারতেন না 'হরিজন' (১৫ মে ১৯৪২)-এ—"Leave India to God. If that is too much then leave her to anarchy."

আরও চোখ খুলে দেয় ওয়ার্কিং কমিটির জোর বিতর্ক। নেহরু বললেন গান্ধীর খসড়া গ্রহণ করলে ইংরাজরা ভারতকে শত্রু দেশ ভাববে, রেঙ্গুনের মত গুঁড়িয়ে দিয়ে যাবে। তাছাড়া সারা বিশ্ব মনে করবে আমরা অক্ষশক্তির পক্ষ নিয়েছি। আর অহিংসা দিয়ে জাপানীদের, কোনওদিন ঠেকানো যাবে না। "But the whole thought and background of the (Gandhi) draft is one of favouring Japan... It is

Gandhiji's feeling that Japan and Germany will win." অর্থাৎ জাপান ও জার্মেনী জিতছে ভেবে গান্ধী তাঁদের দিকে দান ফেলছেন। পটবর্ধনেব জবাব—"নেহরুব কথা শুনলে তো ইংবেজদেব সঙ্গে বিনা শর্তে সহযোগিতা কবতে হয়।" পন্থ, আসফ আলি, ভুলাভাই, সবোজিনী নাইডু নেহরুকে সমর্থন করলেন। রাজাজির মতে গান্ধীর বয়ানে জাপানীরা খুব খুশি হবে। "Japan will fill the vacuum..." গান্ধীব পক্ষে গেলেন বল্লভভাই, রাজেন্দ্র প্রসাদ, সীতাবামায়া, বিশ্বনাথ দাশ, পটবর্ধন, জযরামদাস। বল্লভভাই বললেন, "I feel that he (Gandhi) is instinctively right." বারদোলিতে যে-দবজা খোলা হয়েছিল তা চিরতরে বন্ধ করে দেওযা উচিত। নবেন্দ্র দেব বললেন, "ক্রিপস্ অভ্যন্তরীণ বিরোধকে দাযী করেছেন, বাজাজি ক্রিপসেব হাতই শক্ত করছেন (পাকিস্তান সমর্থন করে)। কিন্তু কেন আমবা জাপানী আক্রমণেব আশঙ্কায এত ঘাবড়ে যাচ্ছি? যা হয হোক, ইংরেজ ভারত ছাড়ুক।" সব শেষে আজাদ মন্তব্য করলেন—"গান্ধীজি হয়তো ঠিক কথা বলছেন কিন্তু তাঁর নীতি জাপানীদেব বিরুদ্ধে কার্যকব হবে কি ?[৩৫৫]

১ মে সকালবেলার অধিবেশনে ওযার্কিং কমিটি রাজেন্দ্র প্রসাদেব খসড়া পাস করলেন। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার। বিকেলে মৌলানা আজাদেব অনুবোধে বাজেন্দ্র প্রসাদেব সমর্থকবা নেহরুব খসড়া গ্রহণ কবলেন। বেশ বোঝা গেল—ওযার্কিং কমিটিব দোলাচলচিত্তবৃত্তি। ইংবেজদেব ভারতত্যাগও তারা চায, আবার জাপানীদের আক্রমণেও ভয় পায। গান্ধী ও নেহরু কোন পক্ষেই ঐকমত্য হল না।

অন্য এক বিষয় নিয়ে মতদ্বৈধ ছিল কিন্তু এতটা প্রকট নয়। রাজাজি জিন্নার পাকিস্তান প্রস্তাব মেনে নিতে বাজি. মাদ্রাজ সংসদীয় দলকে দিয়ে তা পাস কবানোর চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু গান্ধী প্রশ্ন কবলেন, জিন্না কি তাঁর সঙ্গে এ ব্যাপাবে কথা বলতে এগিয়েছেন ? রাজাজি বলছেন—"যৌথ পবিবারের সম্পত্তি ভাগেব মত ভাবত ভাগও মেনে নেওয়া যায়।" কিন্তু গান্ধী বললেন, "But I cannot agree. I cannot swallow the splitting of India." নেহরু তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। তিনি চেয়েছিলেন শক্তিশালী কেন্দ্র ও স্বয়ংশাসিত সাংস্কৃতিক ভিত্তিতে বচিত প্রদেশ। সর্বভারতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা ছাড়া সম্ভব নয়। বাজেন্দ্র প্রসাদ বললেন, "premature, if not perverse." লিনলিথগো এমেরিকে জানান বাজাজি নিজের প্রদেশে প্রতি দুজনেব মধ্যে একজন সমর্থক হাবিযেছেন। রাজাজি ৩০ এপ্রিল ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন।

মে-র মাঝামাঝি সবকার বুঝতে পারছিলেন কংগ্রেসেব বিবোধিতা দ্রুতগতিতে বাড়ছে। রাজাজিকে দিয়ে কিছু হবে না। মুসলিমদেব পক্ষে বাখতেই হবে—সেদিক দিয়ে ক্রিপসেব প্রস্তাব কাজ দিয়েছে, রাজাজির মতামতও। রাজাদের সম্পর্কে চিন্তা নেই। একসিকিউটিভ কাউন্সিল সম্প্রসারিত করা হল। ১৪ জন সদস্যের মধ্যে (প্রধান সেনাপতি বাদে) ১১ জনই ভারতীয়। তাদেব মধ্যে একজন শিখ, একজন অনুন্নত শ্রেণীর। রামস্বামী মুদালিয়ার ও জামসাহেবকে ওয়ার ক্যাবিনেট ও প্যাসিফিক ওয়াব কাউন্সিলে নেওযা হল। বাকি থাকে কম্যুনিস্টরা। বেশ কিছুদিন আগে থেকে তারা নেতাদের মুক্তি চাইছিল। টোয়াইন্যাম ও ম্যাক্সওয়েল তা নিয়ে টালবাহানা করছিলেন—কম্যুনিস্টদের মতিগতি বোঝা ভার। ক্রিপ্‌স যাবার আগে বলে গেলেন ফাসিবিরোধী সংগ্রাম জোরদার করতে কম্যুনিস্ট নেতাদের মুক্তি দেওয়া উচিত।[৩৫৬] স্বরাষ্ট্রবিভাগ চিরদিনই সাবধানী। তারা ছোটলাটদের ওপর ব্যাপারটা

ছেড়ে দিল। বড়লাট অবশ্য তাঁদের বললেন, উদারনীতি নেওয়া হোক।[৩৫৭] বাংলার ছোটলাট হারবার্ট তখুনি পদক্ষেপ নিলেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের বলা হল, হয় অন্তরীণ বা অন্য দমনমূলক আদেশ প্রত্যাহার করা হবে, না হয় আপত্তির কারণ জানানো হোক।[৩৫৮] Communist policy and plan of work (২৩ এপ্রিল ১৯৪২) দাবি করল সবাইকে ছেড়ে দিলে ও বাধা-নিষেধ তুলে নিলে, 'ন্যাশনাল ফ্রন্ট' ও 'দ্য নিউ এজ' পত্রিকার ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করলে, দেশের সর্বত্র ফাসিবিরোধী মোর্চা, জমায়েত, মেলা, প্রচারব্যবস্থা করা হবে ; ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রাচারের নিন্দা করা হবে ; ফাসিবিরোধী গান, নাচ, নাটক, কার্টুন, পোস্টার প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে। জাপানীদের রুখবার জন্য কম্যুনিস্টদের যুদ্ধের শিক্ষা দেবে সেনাবাহিনী। "In Bengal we are the most influential political force after the Forward Block and, more, we have a dominating influence over the student and Kisan movements while the Forward Block's influence is confined to the middle classes only."অন্ধ্রে অধিকাংশ সক্রিয় কংগ্রেসী কম্যুনিস্ট সমর্থক। মালাবারে দল থেকে বের করে দেওয়ার আগে তারাই ছিল কংগ্রেসে সংখ্যাগরিষ্ঠ। মালাবারেই একশ' সারাক্ষণের কম্যুনিস্ট কর্মী গোপনে আছে। কিছু সামরিক শিক্ষা পেলে জাপানী বাহিনীর পেছনে তারা প্রচণ্ড নাশকতামূলক কাজ করতে পারবে। কম্যুনিস্টরা A.R.P-কে জনপ্রিয় করবে। জনযুদ্ধের নীতি নেওয়ার পর তারা একটিও ধর্মঘট বাধায়নি—যা লেগেছে তাও আপোসে মিটিয়ে দিয়েছে। কম্যুনিস্ট নেতাদের ছেড়ে দিলে তারা শ্রমিকদের শহর ছেড়ে পালাতে দেবে না, উৎপাদনে উৎসাহ তো দেবেই। জাপানীরা এসে পড়লে যে ভীতি দেখা দেবে—একমাত্র কম্যুনিস্টরা তা রুখতে পারে। দরকার হলে সামরিক স্বার্থে শিল্প সরিয়ে নিয়ে যাবে দেশের অভ্যন্তরে। পাটনায় A.I.S.F জনযুদ্ধের নীতি গ্রহণ করেছে। মুক্তি পেলে নেতারা সব ছাত্র ও যুবককে যুদ্ধের পক্ষে আনবে।

সর্বশেষে অনুরোধ জানানো হল—অন্তত পি সি যোশী, জি অধিকারী, পি সুন্দরায়া, সোমনাথ লাহিড়ী, ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ ও ভি এস বৈদ্য-র ওপর থেকে সব নিষেধ প্রত্যাহার করা হোক। আর পি সি যোশীব সঙ্গে সরকারই কথা বলুন।[৩৫৯] যোশীর সঙ্গে জি আহমেদ কথা বললেন—১২মে, ম্যাক্সওয়েল স্বয়ং কথা বললেন—১৫ মে। যোশী কিন্তু কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কথা বলেননি। ম্যাক্সওয়েল মন্তব্য করছেন . "The Congress are anti-British first and anti-Japanese only a long way afterwards while the Communists are anti-Japanese first and anti-British afterwards." জি আহমেদের বুঝতে অসুবিধা হয়নি যোশীর প্রধান উদ্দেশ্য দুটি—(১) যুদ্ধোদ্যমে সাহায্য দানের সূত্রে শ্রমিকদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, (২) অন্তত পঞ্চাশজন নেতার মুক্তি। ম্যাক্সওয়েল বলছেন কম্যুনিস্ট মতবাদ নিয়ে সরকার কোনদিন মাথা ঘামায়নি, তাদের পন্থা নিয়েই আপত্তি। যোশীর কথা শুনে মনে হচ্ছে তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচিতে বিপ্লব অগ্রাধিকার পাবে না। কিন্তু জনগণের ওপর অন্যান্য উপায়ে তারা প্রভাব বিস্তার করতে চেষ্টা পাবে।[৩৬০] যাই হোক, রাজাজিও ম্যাক্সওয়েলকে বোঝাতে চাইলেন. কম্যুনিস্টদের মুক্তি দিলে তারা ৮ আগস্টের এ আই সি সি-তে 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাবের বিরোধিতা করবে। ম্যাক্সওয়েল ছিলেন বাস্তববাদী। ২৩ জুলাই কম্যুনিস্ট পার্টি, তার অধীনস্থ সংস্থা ও সংবাদপত্রের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হল।

॥ ১৪ ॥

ক্যা ভগৎ সিং, ভাইয়োঁ, যুঁহি ভুলায়া জায়েগা ? বেশ কিমৎ লাল ক্যা যুঁ হি লুটায়া জায়েগা ? কাট কর শব জর্জে কা, আউর ফুঁ ক কর ইংল্যান্ড কো নোক পব ভালে কে চার্চিল ঘুমায়া জাযেগা। ব্যাঙ্ক ইম্পিরিযাল, খাজানে, ডাকখানে লুটলা ; কোতোযালি ঔব কাছেরি ভি জালাযা জাযেগা। (ভগত সিংকে এত সহজে ভুলে যাবে সাথীবা ? আমাদেব আদরের লালকে বৃথাই বলি দেওয়া হযেছে ? আমরা রাজা জর্জেব মাথা কাটবো, ইংলন্ডকে আগুনে জ্বালাবো, চার্চিলকে চড়াবো বর্শার ফলকে! সবকাবি ব্যাঙ্ক তহশীল ডাকঘব পোড়াও, থানা কাছারি গুঁড়িয়ে দাও মাটিতে)।

১৪ জুলাই ওয়ার্ধায ওয়ার্কিং কমিটি বসল ভাবত ছাড়ো প্রস্তাবেব অন্তিম রূপ দিতে। তার প্রায় এক মাস আগে আমেবিকান সাংবাদিক লুই ফিশাব গান্ধীব সঙ্গে এক সপ্তাহ ছিলেন এবং ৪ থেকে ৯ জুন কয়েকবাব এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনা কবেছিলেন। ফিশারেব বিবরণ থেকে আমবা গান্ধীর এই সমযকার মতিগতি জানতে পাবি।

তিনি বলেন, 'ভাবত ছাড়ো' ব্যাপারটা তাঁব মনে হঠাৎ উদিত হয ক্রিপস চলে যাবাব অল্প পবে—হোবেস অ্যালেকজান্ডারকে চিঠি লেখাব সময় (অর্থাৎ ২২ এপ্রিল ১৯৪২), "The idea arose from the crushed hope that had been pretty high in our minds." কিন্তু ইংরেজবা ভাবতবর্ষকে এভাবে জাপানেব হাতে তুলে দিতে পারে না, আমেবিকানবা তা সমর্থন করবে না—ফিশাবের এ উত্তব শুনে গান্ধী বললেন, "আমি তো জাপান বা অক্ষশক্তি যুদ্ধে জিতুক তা চাই না। কিন্তু আমি নিশ্চিত যে ভাবতের জনগণ স্বাধীন না হলে ব্রিটেন যুদ্ধে জিততে পারবে না।" তাছাড়া "ব্রিটিশ শাসনে ফাসিজমেব অনেক উপাদান রয়েছে, আমরা তা প্রতিদিন দেখছি ও অনুভব কবছি···তোমাব বাষ্ট্রপতি (রুজভেল্ট) চার স্বাধীনতাব কথা বলছেন, তাব মধ্যে কি স্বাধীন হবাব স্বাধীনতা বয়েছে ? আমাদের বলা হচ্ছে জার্মেনী, ইতালি ও জাপানেব সঙ্গে গণতন্ত্রের জন্য লড়াই কবতে। কি করে করব যখন নিজেরাই গণতন্ত্র পাইনি ?" লুই ফিশাব সুভাষ বসুব কথা তুলে প্রশ্ন করলেন, সুভাষের মৃত্যুসংবাদ (ভুল) বটলে গান্ধী তাঁর মাতাব কাছে শোকবার্তা পাঠান—কি করে সম্ভব হল অক্ষশক্তির সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্ম বসুব প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন ? গান্ধী জোরেব সঙ্গে বললেন, "I did it because I regard Bose as a patriot of patriorts. He may be misguided. I have often opposed Bose. Twice I kept him from becoming president of Congress...But suppose he had gone to Russia or to America to ask for aid for India. Would that have made it much better?" কোনো বাইরেব শক্তিব, মিত্র বা অক্ষ যাই হোক, সাহায্য নিয়ে ভারত স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাতে চায় না। তার আত্মশক্তিই যথেষ্ট।

এর পর প্রশ্ন উঠল কি রূপ নেবে আন্দোলন ? গান্ধীর উত্তর, "গ্রামে গ্রামে কৃষকবা করদান বন্ধ করবে, লবণ আইন অমান্য করবে, পরে জমি কেড়ে নেবে।" এর ফলে হিংসা দেখা দিতে পারে, আবার মালিকরা "পালিয়ে গিয়ে সহযোগিতা কবতেও পাবে।" বড়জোর দিন পনের অরাজকতা চলবে, তার বেশি নয়। শহরের শ্রমিকরা কাবখানা ছাড়বে, রেলপথ

বন্ধ হয়ে যাবে, সরকারী কর্মচাবী এমনকি দেশীয রাজন্যবর্গও যোগ দিতে পারে। আন্দোলন খানিকটা সাফল্য লাভ কবলে মুসলমানরা অংশ নেবে এমন আশা গান্ধীব ছিল। ৯ জুন ফিশাব প্রশ্ন রাখলেন, "আসন্ন আইন অমান্য হিংসার পথ নিলে...আপনি কি তা প্রত্যাহাব কববেন—আগে যেমন করেছেন ?" গান্ধীর উত্তর প্রণিধানযোগ্য— "..আগে আমি বেশি সাবধানী ছিলাম সেটা আমাদেব অভিজ্ঞতা লাভের জন্য প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আগের মত আমি আর চলব না।"

মনে রাখা প্রয়োজন— গান্ধী এবার যে সর্বাত্মক আন্দোলনেব ডাক দিতে চলেছেন তাতে হিংসাব স্থান রয়েছে, তাতে কৃষকদের বিনা ক্ষতিপূরণে জমি পাবাব আশাও দেখানো হয়েছে, শ্রমিক, মুসলমান, বাজা—যাবা ১৯৩০-৩৪-এব আইন অমান্যে যোগ দেয়নি তাদেবও শামিল কবাব কথা আছে। স্বল্পকালীন অবাজকতাব সম্ভাবনা তিনি উড়িযে দেননি।

কিন্তু এব সঙ্গে মনে রাখতে হবে ফিশারের সঙ্গে তাঁব শেষ কথাগুলি। তিনি ইংবেজদেব "complete and irrevocable withdrawal" চান বটে কিন্তু "complete physical withdrawal"-এব ওপর জোব দিচ্ছেন না। তাবা সবে যেতে বাজি হযে, স্বাধীনতা দিযে, চুক্তি সম্পাদন কবলে ভাবতে সসৈন্যে থাকতে পাবে। দ্বিতীযত, ফিশাবকে বড়লাটেব সঙ্গে এ বিষযে কথা বলতে অনুমতি দেন তিনি "Let him talk to me; I may be converted. I am a reasonable man.....Tell your President I wish to be dissuaded." কী তাৎপর্য এ কথাব? সম্মানজনক শর্তে অর্থাৎ বাজনৈতিক ক্ষমতা (সামবিক নয) হস্তান্তরেব শর্তে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীব ভারতত্যাগ তিনি দাবি কবছেন না।

৯ জুলাই ওযার্ধায গান্ধীব প্রস্তাব নিযে আলোচনা শুরু হল। জওহবলাল নেহরু মেমোরিযাল্ মুজিযাম ও লাইব্রেরিতে প্রস্তাবেব চাবটি বয়ান পাওযা যায।[৩৬২] প্রথমটি গান্ধীব। শেষ তিনটি আলোচনাব ফলে পবিবর্তনেব সাক্ষ্য বহন করছে। ১৪ জুলাই যে প্রস্তাব গৃহীত হল তাতে বলা হল, "The proposal of withdrawl of the British power from India was never intended to mean the physical withdrawal of all Britishers from India,..." দ্বিতীযত, জাতীয লক্ষ্য লাভে অধীর হলেও কংগ্রেস "wishes to take no hasty step and would like to avoid, in so far as possible, any course of action that might embarass the United Nations."

শুধু ভাবতের স্বার্থে নয, জাতিসঙ্ঘেব বিঘোষিত মানব স্বাধীনতা স্বার্থে, আবাব আবেদন কবা হচ্ছে ব্রিটেনেব কাছে। কিন্তু আবেদন ব্যর্থ হলে (সমযসীমা দেওযা হয়নি) গান্ধীজির নেতৃত্বে কংগ্রেস তাব সকল অহিংস শক্তি দিযে সংগ্রাম শুরু করবে। শেষ সিদ্ধান্ত নেবে এ আই সি সি বোম্বাইতে ৭ আগস্ট। স্মবণ বাখা উচিত গান্ধীর প্রস্তাব ছিল ঢেব বেশি কড়া। তাতে নৈবাজ্যের ঝুঁকি নেওযাব কথা ছিল, ব্যাপক গণসংগ্রাম, স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট, খাজনা ও করবন্ধ, সবকারী কর্মচাবীদেব অসহযোগ ইত্যাদি কর্মসূচির কথা ছিল; সব চেয়ে বড়ো কথা ছিল বাজা, জাগীবদাব, জমিদাব, মালিক ও ধনিক শ্রেণীব প্রতি হুঁশিয়ারি যে তারা "desire their wealth and property from the workers in the fields or factories to whom alone all power & authority must belong." আশ্চর্যেব ব্যাপাব গান্ধীর এ ধবনেব বৈপ্লবিক (এবং মার্ক্সবাদী) বাক্য নেহরুর মত সমাজতন্ত্রীব আপত্তিতে পবিত্যক্ত হয়। চীন ও আমেবিকা গ্যাবান্টি দিলে নেহরু

ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস নিতে রাজি হন। আজাদ রুজভেল্টকে সালিসী করতে অনুরোধ জানাতে চান। এতে গান্ধী খুব রেগে যান। প্রয়োজনে গান্ধী মৌলানা আজাদকে ও নেহরুকে ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন।[৩৬৩] এমন কি অহিংসাকেও। মীরাবেন বড়লাটের সচিব লেথওয়েটের সঙ্গে ১৭ জুলাই দেখা করেন। তিনি জানান—গান্ধী অহিংস উপায়ে আন্দোলন পরিচালনা করার যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন কিন্তু যতক্ষণ তিনি স্বাধীন থাকবেন। "If he was not left to guide it by word or writing there was nothing left for him but death." হিংসাত্মক ঘটনা ঘটলেই তিনি আন্দোলন প্রত্যাহার করবেন না।[৩৬৪] তাঁর আশা ছিল ইংরেজরা ভারত ছাড়লে হিন্দু-মুসলিম সমস্যা মিটে যাবে। "The dictating factor will not be an outside one, but wisdom."[৩৬৫] কিন্তু জাপানী বা কোন বিদেশী শক্তির সাহায্য তিনি চাননি বা তাদের অভিযানে সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিলেন না। একথা সুভাষ বসুব বেডিও ভাষণের উত্তবে স্পষ্টভাবে জানিযে দিয়েছিলেন। দেশে ব্রিটিশদেব বিরুদ্ধে প্রভূত বাষ্প জমা হয়েছে—কিন্তু এটা তাব বেরুবার পথ নয়। "I do not feel flattered when Subhas Babu says I am right. I am not right in the sense he means. For there he is attribuiting pro-Japanese feeling to me."[৩৬৬]

গান্ধীব মনোভাব, বিশেষ কবে তাব সূক্ষ্ম দ্যোতনা বোঝবাব ক্ষমতা ছিল না শ্রমিক দলেবও। তাই তারা আইন অমান্যেব চিন্তাকেই "রাজনৈতিক দায়িত্বজ্ঞানহীনতার প্রমাণ" বলে ঘোষণা করল। এমেরি স্বীকার কবেছেন—'লবিং'ই কবাব মধ্যে তাঁর বেশ হাত ছিল।[৩৬৭] এমেরি তখুনি আক্রমণের কথা বলেছিলেন কিন্তু ধূর্ত লিনলিথগো বোম্বাই এ আই সি সি-ব জন্য অপেক্ষা করলেন—আগে থেকে বারুদ শুকনো বেখে। ৮ আগস্টের গভীর বাত্রে তাঁব কার্যাবলী তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

গান্ধীজি বুঝতে পেবেছিলেন এবাব তাঁব ব্রিটিশ বন্ধুদেব বিশ্বাস তিনি হারিয়েছেন। হোবেস অ্যালেকজান্ডারেব মত লোক জানাচ্ছেন ইংবাজ বন্ধুদেব কাছে "এটা পেছনে ছুবি মারা।" কিন্তু "But there are moments when it becomes necessary to risk (not to incur) the loss of credit for the sake of the creditor himself." গান্ধী আবও বুঝেছিলেন সবকাবেব প্রচণ্ড দমননীতি বজ্রেব মত নেমে আসবে জনসাধাবণেব ওপর। কিন্তু তার ফলে ইংবেজদেব নৈতিক হানি কম হবে না। আন্দোলন করে তিনি ইংরাজদেব নৈতিক উৎকর্ষ পুনরুদ্ধারের আহ্বানই জানাচ্ছেন। এব উদ্দেশ্য—"to help Britain in spite of herself."[৩৬৮]

৪ আগস্ট হিন্দীতে তিনি ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের জন্য নির্দেশেব এক খসড়া তৈবি করলেন। হরতাল দিয়ে আন্দোলন শুরু হবে কিন্তু জোর কবে দোকানপাট বন্ধ কবা হবে না। গ্রামে অবশ্য সভা, মিছিল হতে পারে, কংগ্রেস কর্মীবা সত্যাগ্রহের উদ্দেশ্য বুঝিযে বলতে পারে। তাবা যেন বলে স্বাধীনতাব পব ভাবতের ত্রিশ কোটি জনগণই সবকার চালাবে— হিন্দুরা নয়। আন্দোলন ইংবেজদেব বিরুদ্ধে নয়, ব্রিটিশ শাসনেব বিরুদ্ধে। স্থানীয় কংগ্রেস প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কাছে সব প্রতিবেদন পাঠাবে। তাবা কেন্দ্রীয় কমিটিতে। কোন নেতা গ্রেফতার হলে আরেকজনকে নির্বাচন করতে হবে। প্রত্যেক প্রদেশ অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা নেবে। "In the last resort, every Congressman is his own leader and a servant of the whole nation." কংগ্রেসের খাতায় নাম না থাকলেও প্রত্যেক ভারতীয়, যদি সত্য ও অহিংসায় বিশ্বাস করে, তাহলে নিজেকে

কংগ্রেস কর্মী মনে করতে পারে। কোন সাম্প্রদায়িক বা ইংরেজ বিদ্বেষ থাকা চলবে না। তাকে শপথ নিতে হবে যে সে স্বাধীন হবে, না হয় মরবে। সরকারী আপিস, কারখানা, রেল, পোস্ট অফিসের লোকেরা হরতালে যোগ দেবে না, তবে পরে প্রয়োজনে তাদেরও ডাকা হবে যোগ দিতে। সর্বোচ্চ আইনসভা থেকে মুনিসিপ্যালিটি পর্যন্ত কংগ্রেস সদস্যরা পদত্যাগ করবে। সরকারী কর্মচারীকে কোনো অন্যায় করতে বললে তার কর্তব্য পদত্যাগ করা। সরকারী স্কুল ও কলেজের ছাত্ররা বেরিয়ে আসবে। তাদের মধ্যে ষোল বছরের উর্ধ্ব বয়স্করা যোগ দেবে সত্যাগ্রহে। তবে এ বিষয়ে কারুর ওপর জোর করা চলবে না। যদি সরকার কোথাও দমননীতির বাড়াবাড়ি করে জনসাধারণ প্রতিরোধ করবে ও শাস্তি স্বীকার করবে। কোনো সামরিক কাজকর্মে বাধাদান আমাদের লক্ষ্য নয়। রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করতে হবে—কংগ্রেসের মতে জমিতে যে কাজ করে সেই জমির মালিক। জমিদার যদি রায়তদের সঙ্গে চলে তবেই খাজনা পাবে কিন্তু সরকার পক্ষে যোগ দিলে পাবে না। যারা সর্বনাশ পণ করতে রাজি তারাই খাজনা বন্ধ করবে।[৩৬৯]

তবু তাঁর প্রশ্নোত্তর থেকে জানা যায় প্রস্তাব পাস হওয়া মাত্রই এসব নির্দেশ কার্যকরী হত না। তিনি সরকারকে এক সপ্তাহ বা পক্ষকাল সময় দিতে রাজি ছিলেন। তিনি বড়লাটকে আর একবাব সংঘর্ষ এডানোব অনুরোধ জানাতেন এবং প্রতিক্রিয়া ভাল হলে আলোচনা চালাতেন।[৩৭০]

৭ আগস্ট এ আই সি সি-ব সামনে প্রস্তাব পেশ করাব পূর্বে তিনি যে বক্তৃতা দেন তাতে এও পরিষ্কার যে তিনি অহিংসা নীতি আঁকড়ে রয়েছেন এবং ব্রিটেনেব জনগণের প্রতি তাঁর কোন বিদ্বেষ নেই। তিনি লড়াইটা নিজেদের লড়াই করার জন্যই আন্দোলনে নামছেন, আর ইংরেজদের বন্ধু মনে কবেন বলেই তাদের ভুল দেখিয়ে দিচ্ছেন। হয়তো ইংরেজরা ক্রোধবশে, প্রতিশোধ স্পৃহায়, অনেক অন্যায় করবে। **"Nevertheless you should not resort to violence and put non-violence to shame."** এরকম করলে—**"My blood will be on your head."** যদি তারা অহিংসা নীতি গ্রহণে অস্বীকার করে তবে প্রস্তাব নেওয়ার দরকার নেই। ধর্ম রূপে না নিলেও অন্তত কৌশল রূপে অহিংসা নিতে হবে।

তার পরদিন ঐতিহাসিক ভাবত ছাড়ো প্রস্তাব গৃহীত হল।[৩৭১] সেখানে বলা হয়নি আন্দোলনের উদ্দেশ্য শুধু ভাবতের মুক্তি—বলা হয়েছিল—স্বাধীন দেশসমূহের যুক্তরাষ্ট্রই উদ্দেশ্য আর তার ফলে হবে বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণ ও বিশ্বশান্তি। ব্রিটেনের কাছে বারংবার আবেদনে ফল হয়নি বলেই এই সংগ্রাম, আর এ চলবে **"on non-violent lines on the widest possible scale."** আবার—**"They must remember that non-violence is the basis of this movement."** যদি কোন কারণে কংগ্রেস কমিটিগুলি নির্দেশ পাঠাতে না পারে তবে প্রত্যেক আন্দোলনকারীকে আপন পথ স্থির করতে হবে— **"within the four corners of the general instructions issued."** অর্থাৎ অহিংসা নীতি পরিত্যাগ করা চলবে না।

৮ আগস্টের প্রস্তাব নেহরুর বচনা। তাঁর কাগজপত্রে এর চারটি খসড়া পাওয়া যায়। আলোচনাব ফলে প্রথম তিনটি (সবগুলির তারিখ ৫ আগস্ট) পরিবর্তিত হয়ে চতুর্থটি সাব্যস্ত হয়। নেহরুর রচনা বলেই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ওপর এত জোর পড়েছে। ৭ আগস্টের বক্তৃতায় তিনি জাপানী আক্রমণ ঠেকাবার জন্য মিত্রশক্তির সৈন্যদের ভারতে থাকার অনুমতি দেওয়া হবে উল্লেখ করেছেন। ল্যাস্‌কির মত শ্রমিক দলের সেরা বুদ্ধিজীবী,

দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস্ ও দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট-এর মত অগ্রণী পত্রিকা গান্ধীর সমালোচনায় মুখর হওয়ায় নেহরু আহত হয়েছিলেন। ৮ আগস্টের বক্তৃতায় (প্রস্তাব পাস হবার পর) ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "এর দ্বারা আমরা ভয় দেখাচ্ছি না। It is an invitation. It is an explanation. It is an offer of cooperation." তবে "It is an offer of cooperation but of a free India with other free peoples." ইংরেজরা প্রস্তাব মত কাজ করলে ভারতীয়দের সহযোগিতা কি ইন্দ্রজাল ঘটাতে পারে সে বিষয়ে আশ্বাস তিনি দিয়েছিলেন।[৩৭২]

সরকার আগে থেকেই তৈরি হচ্ছিলেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ১৪ জুলাই-এর প্রস্তাব নেবার পর ভারত সরকারের সংবাদ অধিকর্তা ফ্রেডেরিক পাকল সব প্রাদেশিক মুখ্যসচিবদের কাছে সার্কুলার পাঠান এর বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করতে। এমেরির কথা বলেছি। তিনি কংগ্রেসী নেতাদের গ্রেফতার করার নির্দেশ দেন ১৩ জুলাই। তবু লিনলিথগো ধৈর্য ধরেছিলেন। ৮ই আগস্ট এ আই সি সি প্রস্তাব গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে ভাবত সরকার পাল্টা প্রস্তাব নিল। আর ৯ আগস্টের ভোবে গান্ধীসহ সব ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের গ্রেফ্তার করা হল। গান্ধী জাতিব উদ্দেশে শেষ বাণী দিয়ে গেলেন—"করেঙ্গে ইয়ে মবেঙ্গে।'[৩৭৩]

সঙ্গে সঙ্গে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন শুরু হযে গেল। গান্ধী চেয়েছিলেন আন্দোলন হবে মূলত অহিংস এবং প্রকাশ্য। এ. আই. সি. সি.-ব সামনে তাঁর শেষ বক্তৃতায় বলেছিলেন, "This is an open rebellion. In this struggle secrecy is a sin."[৩৭৪] আন্দোলন সর্বত্র প্রকাশ্য হল না, অহিংস তো নয়ই এবং ব্যাপকতায সরকাবকে বিস্মিত করেছিল। ১৯৪৩-এব ১৩ জানুয়াবি লিনলিথগো গান্ধীকে হিংসাত্মক ঘটনাবলীর জন্য দাযী কবলেন।[৩৭৫] গান্ধী উত্তর দিলেন—লিনলিথগো সাক্ষাৎকারের আবেদন অগ্রাহ্য করে নেতাদেব পাইকারী হাবে গ্রেফতাব করাব জন্যই হিংসার আবির্ভাব। "Was not the drastic and unwarranted action of the government responsible for the reported violence?...Government goaded the people to the point of madness. They started leonine violence..."[৩৭৬]

কারণ যাই হোক, লিনলিথগো স্বীকার করেছেন এমন ব্যাপক সরকার-বিরোধী আন্দোলন সিপাহী বিদ্রোহের পর আর দেখা যায় নি। এ বিষযে যে কটি বিবরণ গুরুত্বপূর্ণ তা হল F. G. Hutchins-এর Spontaneous Revolution (Delhi, 1971), David A. Low'র Lion Rampant (London, 1973), পি. এন. চোপরা সম্পাদিত Quit India Movement: British Secret Report, ম্যানসারগ ইত্যাদি সম্পাদিত The Transfer of Power 1942-47-এর তৃতীয় খণ্ড, আর. এইচ. নিবলেটের The Congress Rebellion in Azamgarh ইত্যাদি (Allahabad, 1957), স্টিফেন হেনিংহ্যাম, ম্যাক্স হারকোর্ট প্রভৃতির কিছু প্রবন্ধ এবং অতি সম্প্রতি প্রকাশিত জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে সম্পাদিত The Indian Nation in 1942 (Calcutta, 1988) প্রবন্ধাবলী। সরকারী রিপোর্টের মধ্যে আর টটেনহ্যামের 'Congress Responsibility for the Disturbances 1942-43' (Calcutta, 1944) ও উইকেনডেনের 'Report on the Disturbances of 1942-43' যেমন একপেশে তেমনি একপেশে তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের মুখপত্র 'বিপ্লবী' বা গুজরাট আন্দোলনের মুখপত্র 'আজাদ পত্রিকা'। তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের অধীন বিদ্যুৎবাহিনীর সর্বাধিনায়ক সুশীল ধাড়ার আত্মজীবনীমূলক 'প্রবাহ'

বহুস্থলে ঘটনা বিকৃত করেছে। সে তুলনায় রাহুল সাংকৃত্যায়নের 'মেরী জীবনযাত্রা' (এলাহাবাদ, ১৯৫০) অনেক বেশি সত্যদর্শী। জয়প্রকাশের 'Towards Struggle: Selected manifestoes, speeches and writings (Bombay,1946) অবশ্যই আকর গ্রন্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কারণ তিনি বহুদিন ধরে আগস্ট বিপ্লব পরিচালনা করেছিলেন। পল গ্রিনাও (Greenough) গোপনে প্রকাশিত বিপ্লবী সাহিত্যের বিবরণ দেন,[৩৭৭] যেমন গেইল ওমভেদ (Gail Omvedt) মারাঠী সাহিত্যের।[৩৭৮] কিন্তু সব ছাপিয়ে গেছে সতীনাথ ভাদুড়ীর উপন্যাস 'জাগরী'—বিপ্লবের কোন প্রত্যক্ষদর্শী বা অংশগ্রহণকারীর সাক্ষ্য এই অন্তর্দর্শী ও সূক্ষ্ম সংবেদনশীল ঔপন্যাসিকের সংযত, গভীর, মর্মস্পর্শী কাহিনীকে অতিক্রম করতে পারবে না। তাঁরই "ঢোঁড়াই চরিতমানস" (দ্বিতীয় চরণ) ব্যর্থতার কারণ ফুটিয়ে তুলেছে।

এই আন্দোলনের প্রকৃতি, ব্যাপকতা, দুর্বলতা প্রভৃতি নিয়ে দু চার কথা আগেই বলা ভাল। প্রথমত একে গান্ধীবাদী অহিংস আন্দোলন বলা ঠিক হবে না। সরকারের 'leonine violence'-কে প্রবোচনামূলক বলে দায়ী কবলেও গান্ধী আগস্ট ও সেপ্টেম্বরের (১৯৪২) ঘটনাবলীকে 'Calamity' বলে বর্ণনা করেছেন। জনগণ—"ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিল।"[৩৭৯] ১৯৪৫-এর শেষে সুতাহাটা কংগ্রেস কর্মীসম্মেলনে একথা স্বীকাব করতে হয়েছে তাঁকে[৩৭৯ক] এবং বর্তমান লেখকের কাছে সোদপুরে থাকাব সময়ও তিনি এর পুনরুক্তি করেছেন। উইকেনডেন যাই বলুন ও হিতেশবঞ্জন সান্যাল 'হরিজন'-এর বিক্ষিপ্ত কয়েক সংখ্যা থেকে যাই সিদ্ধান্ত নিন—গান্ধী এটা চাননি। নেহরু 'ডিস্কভারি অব ইন্ডিয়া'য় এর বর্ণনা দিয়েছেন, "impromptu frenzy of the mob"—আন্দোলনকালে "the people forgot the lessons of non-violence which had been dinned into their ears for more than twenty years."[৩৮০] ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ পুণায় যে ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন বসে তাতে গত কয়েক বছরের গণবিদ্রোহেব প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা হয়। তাতে বিদেশী সবকারের প্ররোচনামূলক কাজকে দায়ী করা হলেও স্বীকার করা হয—"in some places the people forgot and fell way from the Congress method of peaceful and non-violent action...'[৩৮১] আত্মপক্ষ সমর্থনে জয়প্রকাশ নারায়ণ বলেন, "আমরা স্বাধীনতা ঘোষণা করেছি, ব্রিটিশদের আগ্রাসী শক্তি বলে চিহ্নিত করেছি, আমরা তাই বোম্বাই প্রস্তাব অনুসারে ব্রিটিশদের সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে ন্যায্য কাজই করেছি। যদি তা গান্ধীর নীতিব সঙ্গে না মেলে আমার অপরাধ নয়।"[৩৮২] তাঁর মতে, গান্ধী ও কংগ্রেস কার্যসূচি স্থির না করলেও এটা নিশ্চয়ই কংগ্রেসী বিদ্রোহ। বস্তুত সবাই গান্ধীর নাম নিলেও কেউ জয়প্রকাশ-অরুণা আসফ আলি প্রভৃতির, অর্থাৎ কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির, নির্দেশে চলে কেউ বা ফরোয়ার্ড ব্লকের নির্দেশে। অনেক ক্ষেত্রে, বিশেষত মেদিনীপুর, পূর্ব ইউ.পি.ও বিহার এবং গুজরাটে, স্থানীয় নেতারা স্বেচ্ছামত আন্দোলন চালিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যেও কম বিরোধ ছিল না। কাঁথি মহকুমা কংগ্রেস কমিটির নেতা প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বর মাল, নিকুঞ্জ মাইতিরা কৃষক আন্দোলনকে কংগ্রেস কর্মসূচিব অন্তর্ভুক্ত করেন; তমলুকের সতীশ সামন্ত, অজয় মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি এসব ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকেন কিন্তু কৃষকদের হিংসার প্রশ্রয় দিতে বারণ করেন। ভূপাল পাণ্ডার মত কেউ কেউ কৃষকসভার সঙ্গে যোগ দেন—অর্থাৎ কম্যুনিস্ট দলে। ফরোয়ার্ড ব্লক গঠিত হলে প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বসন্ত দাস, বলাইদাস

মহাপাত্র, বরদাকান্ত কুইতিরা তাতে যোগ দিয়েছিলেন। ৪২-এর আন্দোলন আরম্ভ হলে কট্টর গান্ধীবাদী দল নিজেদের সরিয়ে নেন। বাদবাকিরা অল্পবিস্তর জড়িত হন—তাঁদের অনেকখানি জড়িয়ে ফেল্লেন পুলিন সেনের বা সুশীল ধাড়ার মত নেতারা। তমলুকের পুরোনো মহকুমা কমিটি ভেঙে যে কমিটি হয় সুশীল ধাড়া হন তার সচিব। কৃষকসভা প্রথমে আপত্তি করলেও পরে শামিল হয়। জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডের মতে গাজীপুরেব বিদ্রোহীরা গান্ধীর নাম নেয় মুখে কিন্তু পরিচালিত হয় ভগৎ সিং-এর প্রেরণায়। গান্ধী যখন (১ আগস্ট ১৯৪৪) গোপন বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণ করতে ডাক দেন সাতারায় তার সাড়া জাগেনি। 'প্রতি সরকার'-এর কুণ্ডলগোষ্ঠী আত্মসমর্পণ করেনি। বালিয়ায় আক্ষরিক অর্থে আগুন জ্বালায় পবেশনাথ মিশ্র নামধেয় বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, আজাদের মতে, আন্দোলনের রূপরেখা সম্বন্ধে গান্ধীর কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। আমরা দেখেছি লুই ফিশারের সঙ্গে কথায় তিনি কিছুটা ধাবণা দিয়েছিলেন। কিন্তু ইংরেজরা আলোচনায় বসবে, তখুনি সবাইকে গ্রেফতার করবে না—এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশে তিনি কোনো নির্দেশাবলী রচনা করেননি। প্যাটেলরা গান্ধীর ওপর নির্ভব করেই তুষ্ট ছিলেন। আজাদ বুঝেছিলেন যুদ্ধাবস্থায় গান্ধী বর্ণিত কোনো অহিংস বিদ্রোহ চলতে পারে না। তিনি নাকি নির্দেশ দেন, নেতৃবৃন্দ গ্রেফতাব হলে জনগণ 'অহিংস অথবা সহিংস' যে কোনো উপায়ে প্রতিরোধ গড়বে। [৩৮৪] উইকেনডেন বলছেন, প্যাটেল আমেদাবাদে খবর পাঠিয়েছিলেন যদি রেলপথ তুলে ফেলা হয় বা ইংরেজ হত্যা কবা হয় কোনো আপত্তি নেই। নাশকতামূলক কর্মসূচি বোম্বাই ও আমেদাবাদে 'আজাদ' পত্রিকা মাবফত ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।[৩৮৫] প্যাটেল তার রচয়িতা কিনা সন্দেহ হয়। নেহরু কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের দায়িত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। তারা যদি সামান্যতম হিংসাব ইঙ্গিত দিত তবে আগস্ট বিপ্লব হত শতগুণ ভয়াবহ। টটেনহ্যাম অন্ধ্রপ্রদেশ কংগ্রেস কমিটির যে সার্কুলার (২৯ জুলাই ১৯৪২) এক প্রমাণ হিসাবে দাখিল করেছেন তাতে যে ছয় ধবনের কাজের নির্দেশ রয়েছে তা মূলত গান্ধীপন্থী। ট্রেন পোড়ানো, রেলপথ ধ্বংস করার কথা তাতে নেই। টেলিগ্রাফের তার কাটা নিষিদ্ধ না হলেও সমর্থিতও ছিল না। একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় গান্ধী এবং নেহরু হিংসার ইঙ্গিতও দেননি ; আজাদ ও প্যাটেল কি ও কতটা দিয়েছিলেন বলা মুশকিল।

তবে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির নেতারা ইন্ডিয়া সিক্রেট কমিটির নামে নানা গোপন ইস্তাহার মাবফত এক কর্মসূচি প্রচার করেছিলেন তার বহু প্রমাণ রযেছে। এ ধরনের কর্মসূচি তমলুক ও কাঁথির নেতাদের দেন অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী। তার মধ্যে প্রশাসনিক কেন্দ্র দখল বা বিনষ্ট করা, রাস্তা কাটা, সরকারী কর্মচারীদের খাদ্য সরবরাহ বন্ধ কবা, টেলিগ্রাফ ও ডাক যোগাযোগ ছিন্ন করা থেকে সমান্তরাল সরকার গঠনের ডাকও ছিল।

কিন্তু অনেক জায়গায় আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্ত ছিল—জনতাই নেতা। ১১ও ১২ আগস্ট পাটনার যে ঘটনার বিবরণ রাহুল সাংকৃত্যায়ন দিয়েছেন তা অনুধাবনযোগ্য। মজঃফরপুরের রামকল ধনুক বা তমলুকের গুণধর মণ্ডল নিজেরাই নেতা বনে যায়। 'জাগরী'তে পড়ি কবৈয়ার "যে গরিব কিষাণের দল জীবনে কখনও প্রাণ খুলিয়া হাসিবার অবকাশ পায় নাই" তারাই বীরগাঁও থানা দখল করে ধামদাহা-পূর্ণিয়া রোডে, রহুয়ায়, 'টর্মি' আগমনের পথ রুদ্ধ করবার জন্য ব্যারিকেড দিচ্ছে আর বলছে "বোম্বাইসে আই আওয়াজ, ইনকিলাব জিন্দাবাদ।"

'জাগরী'র কম্যুনিস্ট নীলুর ভাষায়—

"এক বৈদ্যুতিক শক্তি সহসা দেশশুদ্ধ লোককে উদ্‌ভ্রান্ত ও দিশেহারা করিয়া দিয়াছে। যেখানে যাও, মনে হইতেছে যেন পাগলা গারদের ফটক খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। বিক্ষুব্ধ অথচ নেশাগ্রস্ত জনতা, কী করিবে ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছে না। ...রেলস্টেশন, খাসমহল, কাছাবি, সবরেজেস্ট্রি অফিস ও থানার পর্ব শেষ হইয়া গিয়াছে। যেখানেই তাহারা দল বাধিয়া যাইতেছে সেখানেই তাহাদের সম্মুখে শক্তির স্তম্ভগুলি ভূমিসাৎ হইয়া যাইতেছে ও অত্যাচারেব প্রতীক গুলি মাথা নত কবিয়া লইতেছে।...খাসমহল কাছারির ম্যানেজার তাহাদের ভোজেব আয়োজন কবিয়া দেন, দারোগা সাহেব গান্ধী টুপি মাথায় দিয়া, ত্রিবর্ণ পতাকা হাতে লইয়া তাহাদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করেন, চৌকিদার তাহার উর্দি জ্বালাইয়া কাজে ইস্তফা দেয। গবীব কিষাণের আনন্দ, আর তাহাকে জমিদারের খাজনা দিতে হইবে না, চৌকিদারেব ট্যাক্স দিতে হইবে না।" তারপর একদিকে স্টেশন জ্বালানো, 'মহাত্মাজী কা ইজলাস', অন্যদিকে বীরগাঁও স্টেশনেব হাটে টমিগানের শব্দ। "আর সেখানকার 'ক্রান্তি'র নায়ক কে ? না, বিনাযক মিসির।"

ঢোঁড়াই চবিতমানসে অনুৰূপ বিবরণ অনেক। বিসকান্ধার অঙ্গীকার—"মহাৎমাজি গ্রেপ্তার ! হো যাও তৈয়াব।" থানা জ্বালানো তিতলি কুঠি দহনের পর সাঁওতাল নেতা বডকা মাঝি সুবাসিক্ত কণ্ঠে গাইছে ·

" · বেললাইন উঠিয়ে ফেললে
তো পা ভেঙে গেল সরকারের।
তার কেটে দিলে
তো কান কেটে দিলে সরকারের।
থানা জ্বালিয়ে দিলে
তো চোখ গেলে দিলে সরকাবেব।"

আগস্ট বিপ্লবের প্রথম ধাক্কা লাগে বোম্বাই, আমেদাবাদ, পুণা, কলকাতা, পাটনা ও ঢাকার মত শহবে—পবে তা ছড়িয়ে পডল গ্রামাঞ্চলে। বোম্বাই থেকে ইউ. পি, বিহার দিয়ে বাংলা ও উড়িষ্যায তা প্রবাহিত হল। সাতারা, বারাণসী, গোবক্ষপুব, বিহারেব কিছু অংশ, মেদিনীপুব ছিল ঝটিকা কেন্দ্র। মাদ্রাজের রাজাগোপালাচারি ছিলেন আন্দোলনবিরোধী। কম্যুনিস্ট পার্টির আপত্তিতে কেরলে আন্দোলন হয়নি। মুসলিমরা প্রায় কোথাও অংশ নেযনি (১৯৩০-৩৪-এব মত) এবং এটা আন্দোলনের একটা বড় দুর্বলতা। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ কংগ্রেসী হলেও প্রায় এর বাইরে ছিল। শ্রমিকরা জামসেদপুর, কানপুব, নাগপুব, বোম্বাই, আমেদাবাদ ও দিল্লীতে ধর্মঘট চালালেও কম্যুনিস্ট শৃঙ্খলা তাদের যুদ্ধবিরোধিতা করতে দেয়নি।[৩৮৫ক] এবার কৃষকরা দলে দলে যোগ দেয় কিন্তু গোবিন্দ সহায় 42 Rebellion (Delhi, 1947) এ যেসব প্রমাণ দিয়েছেন তাতে দেখি খুব অল্প স্থানেই (যেমন সাতারা, মেদিনীপুব, উত্তরপ্রদেশ, বিহারের কোন কোন জায়গা) তা জমিদার জোতদারের বিরুদ্ধে শ্রেণীসংগ্রামের রূপ নেয়। যেখানে নেয়, তাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত আক্রোশের ফলে বা তারা সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করছিল বলে বা অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে। হার্ডিম্যানের মতে খেড়ার বরাইয়া ও পটনবাদিয়ারা (অধীনস্থ কৃষক) আন্দোলন পরিহার করেছিল।

শহবাঞ্চলে হরতাল, স্কুল-কলেজ বর্জন থেকে ধর্মঘট, ট্রামবাস পোড়ানো ও পুলিশ বা সৈন্যদের সঙ্গে সংঘর্ষ ছিল বিদ্রোহ প্রকাশের অঙ্গ। ৯ আগস্ট থেকে ১৪ আগস্ট বোম্বাইতে,

১০ থেকে ১৭ আগস্ট কলকাতায়। ১১-১২ আগস্ট পাটনায় অবস্থা ভয়াবহ আকার ধারণ করায় পুলিশ ও সৈন্য গুলি চালায়। গ্রামাঞ্চলে সরকারী সম্পত্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর আক্রমণ হয় বেশি। প্রথমটির মধ্যে মুখ্য ছিল থানা, ডাকঘর, রেজেস্ট্রি অফিস, রেল স্টেশন দখল বা অগ্নিসংযোগ।

মেদিনীপুরের কথা ধরা যাক।[৩৮৫খ] ২৪ সেপ্টেম্বর স্থির হয় থানা ও সরকারী ভবনগুলির ওপর যুগপৎ আক্রমণ করা হবে। এ কাজের জন্য মহিষাদল, তমলুক, সুতাহাটা ও নন্দীগ্রামে 'বিদ্যুৎবাহিনী' নামে স্বেচ্ছাসেবী দল গঠিত হয়। ২৮-এ সেপ্টেম্বর যোগাযোগ বিপর্যস্ত করা হয় ও খেজুরি থানা দখল হয়। ২৯-এ পাঁচটি থানা দখল করা ও পোড়ানোব চেষ্টা চলে। সুতাহাটা, পটাশপুর দখল হল কিন্তু মহিষাদল, ভগবানপুর ও তমলুক থানায় বিদ্রোহীরা হার মানে। তমলুক থানা আক্রমণে অসীম বীরত্ব দেখান মাতঙ্গিনী হাজবা, ওখানে সৈন্য না থাকলে কি হত বলা যায় না। মহিষাদল থানা বাঁচল বাজাব দেহরক্ষীবৃন্দের সাহায্যে। ভগবানপুব থানায় নেতৃত্ব দেন হৃষীকেশ গায়েন। এখানে শহীদেব সংখ্যা ১৭ জন।-ডাকবাংলো, স্কুল, ডাকঘর, রেজেস্ট্রি অফিস, খাসমহল অফিস পোড়ানো হয় বেশ কিছু। ৩০ সেপ্টেম্বব নন্দীগ্রাম থানা দখল করতে গিযে পাঁচজন নিহত হয়েছিল। মোটের ওপর ১৯৪২-এর অক্টোবরের মধ্যে পটাশপুব, খেজুরি ও সুতাহাটা বিদ্রোহীদের হাতে চলে যায়। ১ অক্টোবব ছোটলাট হারবার্ট মন্তব্য করছেন, "This is a large scale rebellion and suitable measures are necessary."[৩৮৬] বিভিন্ন স্থানে সামরিক বাহিনী পাঠানো শুরু হয। ১৬ অক্টোবব প্রচণ্ড ঝড় ও বন্যা এই পর্বে ছেদ টানে। তবু ২৫শে অজয মুখার্জি বলেন—সংগ্রাম স্তিমিত হতে দেওযা হবে না। ১৭ ডিসেম্বর তাম্রলিপ্ত জাতীয় সবকার ঘোষিত হয। তার সর্বাধিনায়ক হন সতীশ সামন্ত, অর্থসচিব—অজযবাবু, সমব ও স্বরাষ্ট্রসচিব—সুশীল ধাড়া। এর অধীনে ছিল থানা জাতীয সরকাব। পটাশপুবের মঙ্গলা মাড়ো, হলুদ বাড়ি প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহীরা নিজস্ব জেলা থানা স্থাপন করে। জমিদাবদেব ধান লুট (কাঁথির অচিন্ত্য শাসমল, মহিষাদলবাজ) কবে অর্থসংগ্রহ চলে। ঝড বন্যাব ফলে দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণ ত্রাণব্যবস্থা চাইছিল। তাই কংগ্রেসের থেকে তারা সবে যায়। সামবিক বাহিনীব আগমনে সম্পত্তিবান লোকেবাও সাহস পায়। আই জি-র মতে ফেব্রুযারিতে (১৯৪৩) অবস্থা স্বাভাবিক হচ্ছে। তবু বিত্তবান জোতদাবদেব কাছ থেকে জরিমানা আদায়, ডাকাতি, জরিমানা আদায না হলে অপহরণ চলছিল। ১৯৪৩ সালে তা অনেক বাড়ে। কোন কোন স্থানে দফাদার চৌকিদার নির্যাতন এবং গোয়েন্দাদের হত্যা কবা হয়।[৩৮৭] গোয়েন্দা বিপোর্টে বলা হচ্ছে ১৯৪৩-এর মার্চে আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে। "The military forces had been withdrawn from the Contai area by the middle of February and it was considered possible to withdraw millitary forces also from the Tamluk area."[৩৮৮] সামরিক বাহিনীর মর্মন্তুদ অত্যাচারের বিবরণ অবশ্যই এতে পাওয়া যাবে না। তবে সরকাবকে কম্যুনিস্টবা যে ভালোভাবে সাহায্য করেছিল তার বিবরণ পাওয়া গেছে। অনেক ক্ষেত্রে মুসলমানরাও।[৩৮৯] মে মাসে সতীশ সামন্ত বন্দী হলে অজয়বাবু হন দ্বিতীয় সর্বাধিনায়ক। তিনি বন্দী হন সেপ্টেম্বরে। এরপর আরেক পর্ব শুরু হয় সুশীল ধাড়ার অধীনে। এই বছর (১৯৪৩)-এর প্রথম তিনি বিদ্যুৎবাহিনীর সর্বাধিনায়ক মনোনীত হয়েছিলেন। জুলাই মাসে জামিন পেয়ে তিনি পলাতক হলেন ও নভেম্বরের মধ্যে অবস্থা বদলে ফেললেন। বর্তমান লেখককে তিন সপ্তাহ বন্দী করে রেখে তার পিতার প্রায় সমস্ত

নগর অর্থ জরিমানা বলে আদায় করে অনেকখানি অর্থাভাব তিনি দূর করেন। 'প্রবাহ'-এ এই ঘটনার যা বিবরণ তিনি দিয়েছেন তা, অত্যন্ত নৈর্ব্যক্তিকভাবে বলতে পারি, বহুলাংশে স্বকপোলকল্পিত।[৩৯০] ১৯৪৪-এর আগস্টে ছোটলাট কেসি (Casey) ওয়াভেলকে জানাচ্ছেন, তমলুকের অবস্থা "তখনও বিপজ্জনক", এমনকি "clearly intolerable."[৩৯১] ঐ বছর ১লা সেপ্টেম্বর গান্ধীর আহ্বানে তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার অবসান ঘোষণা করে। কাঁথির 'স্বরাজ পঞ্চায়েত' তার অনুসরণ করে। গোয়েন্দা দপ্তরের মতে গান্ধীর সমর্থন ছিল না বলে সুশীল ধাড়ারা সরকার গুটিয়ে ফেলেন।[৩৯২] তাই একমাত্র কারণ নয়। তাঁদের অনেক কাজই জনসাধারণের অধিকাংশ পছন্দ করেনি, শুধু ভয়ে মেনে নিয়েছে। ধাড়া স্বীকার করেছেন মুক্তিপণের টাকার অনেকটা জমা হয়েছিল অজয়বাবুর বউদি মারফত তমলুক লোন অফিসে—যার সেক্রেটারি ছিলেন অজয়বাবুর পিতা।[৩৯৩] দরিদ্র চাষীদে। দুর্দশাকে জমিদার জোতদারদের বিরুদ্ধে লাগিয়ে তাদের নিজের শ্রেণীর দিকে যেতে দেননি তাঁরা বহু ক্ষেত্রে। সতীশ সামন্তরা জাতীয় সরকারের যে বদান্যতার কাহিনী বলেছেন তা সুমিত সরকার পুরো বিশ্বাস করে ঠিক করেননি।

ম্যাক্স হারকোর্ট ডেভিড লো সম্পাদিত Congress and the Raj পুস্তকের 'Kisan Populism and Revolution in Rural India: The 1942 distrubances in Bihar and East United Provinces' প্রবন্ধে দেখাচ্ছেন এটা জাতীয় বিদ্রোহ নয়, মূলত কৃষকবিদ্রোহ। তাঁর মতে, ১৯৪১-এর জুলাই পর্যন্ত কিষাণ সংগঠনগুলি নিয়ে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি ও কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে একটা শিথিল সমঝোতা ছিল। পরে সহজানন্দ সবস্বতী পুরো মার্ক্সবাদী হযে যান। মার্ক্সবাদীরা ছিল কৃষকদের বিপ্লবী চেতনা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ। কিষাণ বলতে তারা সংকীর্ণ অর্থে বুঝত দরিদ্র ও ভূমিহীন চাষী। উঁচু ও নীচু উভয় জাতের মাঝারি চাষীদের বাদ দেওয়ায় তারা কংগ্রেসের পতাকাতলে আশ্রয় নেয়। ক্ষেতমজুরদেরকে তাবা সমকক্ষ মনে করত না। কংগ্রেসী ভূমিসংস্কারে অসন্তুষ্ট হয়েছিল তারা। সোশ্যালিস্ট পার্টির 'লাল কিষাণ' সভায় পুরোনো কিষাণ সভার বহু কর্মী যোগ দেয়। হারকোর্ট এর পেছনে আসন্ন ব্রিটিশ শাসন অবসানের আশা লক্ষ্য করেছিলেন (অনেকটা ১৮৫৭ সালের মনস্তত্ত্ব কাজ কবছিল)। জাপানীদের দ্রুত অগ্রগতি, ব্রহ্মজয়ের পর দুর্গম পথে প্রত্যাবর্তনকালে ভারতীযদের দুর্দশা, তাদের মুখে ব্রিটিশ অসহায়তার নানা কাহিনী প্রচাব, রেলপথে আহত ব্রিটিশ সৈন্যর যাতায়াত, নানা উড়ো খবরের জন্ম দিচ্ছিল। "This was bound to be unsettling, for the Kisan mind associated such changes of regime with a transitional 'Time of Trouble', which was traditionally the opportune occasion for the peasantry to rise in armed revolt, both in order to redress grievances against outside authority, and to enrich themselves through pillaging townsfolk and others outside the moral community, like money-lenders, traders, etc." আমলারা আহীর, ভূমিহার ও রাজপুতদের (অর্থাৎ কৃষক শ্রেণীকে) অপরাধপ্রবণ জাতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, তাদের মধ্যে social banditry-র নিদর্শন দেখতে পাননি। ত্রিশের দশকের মন্দা থেকেই এদের টমসনকথিত moral economy বিপর্যস্ত হয়েছিল। চল্লিশের প্রথমে যুদ্ধের জন্য শস্যের মূল্য বাড়ে এবং খাজনার চাপ কমে সন্দেহ নেই কিন্তু ১৯৪২ সালে দেখা দিল খাদ্যাভাবের আশঙ্কা এবং তার ফলে নিরাপত্তার অভাব; ১৯৪০-১৯৪৩-এর মধ্যে ঠিক দুর্ভিক্ষ দেখা না

দিলেও বেশ ফলন কমে গিয়েছিল। ১৯৪২-এ রেঙ্গুন পতনের পব ব্রহ্মদেশ থেকে চাল আমদানি বন্ধ হযেছিল। এসবের ফলে মজুতদারী বাড়ে। এপ্রিল-আগস্টের মধ্যে খাদ্যেব দাম ৬০ পয়েন্ট বেড়েছিল। ব্যবসায়ীরা আগে দাম বাড়িয়ে চাষীদের শস্য বেচতে প্রলুব্ধ করল, পরে আবার তাদেরই বাধ্য করল সেই শস্য চড়া দামে কিনতে। সুতরাং মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে কৃষক শ্রেণী লুটপাট বাহাজানিব মাধ্যমে শাসকদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানাতে প্রস্তুত হল। গান্ধীজি অহিংসা চাইলেও বিহাব ও উত্তব ইউ.পি-ব বহু অঞ্চলে ভারত ছাড়ো আন্দোলন হিংসার রূপ নিল।[৩৯৪] মাহমুদাবাদে গান্ধীবাদী শিবপূজন রায় মরলেন আব অন্যরা 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' বাণীকে রূপান্তরিত করল "করো ইয়া মারো"-তে।

রণজিৎ গুহ সম্পাদিত Subaltern Studies, দ্বিতীয় খণ্ডে স্টিফেন হেনিংহ্যাম এই অঞ্চলের ওপর এক প্রবন্ধ লিখেছেন— 'Quit India in Bihar and the Eastern United Provinces: The Dual Revolt' নামে। তিনি মনে করেন হারকোর্টের এই ব্যাখায় (এরিক উলফের প্রভাবে) মাঝাবি কৃষকদের অত্যধিক গুরুত্ব দেওযা হয়েছে। তাঁব মতে চল্লিশেব দশকে অর্থনৈতিক কারণ কাজ কবেনি। কৃষকরা যোগ দেয় পুলিশী অত্যাচাবের প্রতিক্রিযায, উচ্চবর্ণেব লোকদের প্ররোচনায় ও জাতীয়তাব আবেগে। হেনিংহ্যামের মতে এই বিদ্রোহের দ্বিস্তব প্রকৃতি বুঝতে হবে : "One insurgency was an elite nationalist uprising of the high caste rich peasants and small landlords who dominated the Congress. The other insurgency was a subaltern rebellion in which the initiative belonged to the poor, low caste people of the region." ১৯৪১-এ শস্যের দাম ১৯৪০-এব তুলনায ১৩·৫% বেড়েছিল। কেরোসিন প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসেব দামও বাড়ে। ফাটকা, মজুতদারী, কালোবাজারীর কথাও অস্বীকার করা যায় না।[৩৯৫] কিন্তু হেনিংহ্যামের মতে এর জন্য মাঝাবি চাষীদেব খুব অসুবিধে হয়নি। অথচ ক্ষেতমজুবদেব প্রকৃত মজুরি (real wages)কমেছিল। শুধু তাই নয়, তাদের সংখ্যাধিক্যেব ফলে বেকাবি বেড়ে যায়। তাই চুরি, ডাকাতি, হাট লুটপাটেব কারণ। অভাব অভিযোগের সঙ্গে যোগ দেয বর্মা প্রত্যাগত লোকদেব ব্রিটিশ ব্যবহাবেব তিক্ত সমালোচনা, জাপানী অভিযানের আশঙ্কা ও ব্রিটিশ পবাজযেব সম্ভাবনা। পুলিশেব সংখ্যা ছিল অপ্রতুল, সাহস ক্ষীযমাণ। বিহাবের মুখ্যসচিব নানা বটনার উল্লেখ কবেছেন। আব কে না জানে সিপাহী বিদ্রোহেব সময যা হয়েছিল, বটনাব ফল হবে শাসকশ্রেণীব ওপব আক্রমণ ?[৩৯৬]

হেনিংহ্যামও বলেছেন, কম্যুনিস্টরা যোগ দেযনি। সহজানন্দ সরস্বতী 'জনযুদ্ধে'র মতবাদ মেনে নেন।[৩৯৭] রাহুল সাংকৃত্যাযনেব আত্মজীবনীতে পড়ি—কম্যুনিস্টরা আন্দোলনেও যোগ দেযনি, সরকারকেও মদত দেযনি।

জয়প্রকাশ, বামনন্দন মিশ্র প্রভৃতি সোশ্যালিস্ট নেতারা যোগাযোগ নষ্ট করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁরা জেলে গেলে মধ্যস্তবেব নেতারা সামনে আসেন। উইকেনডেনের রিপোর্টেও তাই বলা হয়েছে। প্রথমে উঁচুজাতের ছাত্ররা হাঙ্গামা শুরু করে। তারপর সর্বশ্রেণীর কংগ্রেস কর্মী। তারপর, মধুবনি ও মুঙ্গেরের এস ডি ও-র মতে যোগ দিল ছোটজাতের লোকেরা—যারা হাটপাট লুটে প্রতিদিন ব্যস্ত ছিল। রেলওয়ে স্টেশনে জমা খাদ্যশস্য লুটে এই শেষ জাতের হাত ছিল বেশি। সারণ থানা আক্রমণের নেতা ছিল জেলে জুব্বা মাল্লা। কংগ্রেসীরা পছন্দ না করলেও মেনে নেয়। এখানেও social banditry-র কথা উঠেছে। জিনিসপত্রের যা ন্যায্য দাম হওয়া উচিত তাব থেকে যদি ব্যবসায়ীরা অনেক

বেশি চায় তবে তাদেরও অধিকার আছে লুটপাট করার।

জাপানের মহড়া নিতে পূবঞ্চলে যে ব্রিটিশ ও মার্কিন সৈন্যের সমাবেশ হয়েছিল তারাই অবস্থা আয়ত্তে আনে। আজমগড়ের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, নিবলেট, হার্ডি ও জনস্টন প্রভৃতির অত্যাচারের কথা স্বীকার করেছেন। তবে ছোট জমিদার, জোতদার, ধনী কৃষকেরা প্রথম থেকে নিয়ন্ত্রণ হাতে রাখায় দ্বারভাঙার মহারাজার মত বড়ো জমিদার ছাড়া মালিকশ্রেণীর ওপর আক্রমণ হয়নি বললেও চলে। ১৯৪২-এর নভেম্বরে জয়প্রকাশ ও পাঁচজন সোশ্যালিস্ট নেতা হাজারীবাগ জেল থেকে পালিয়ে গেরিলা যুদ্ধের সূত্রপাত করেন। পরে নেপাল থেকে জয়প্রকাশ অভিযানগুলির মধ্যে সংহতি আনার চেষ্টা করেছিলেন।[৩৯৮] ১৯৪৩-এর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিনি আত্মগোপন করেছিলেন। ঐ বছরের শেষে আন্দোলনের ওপর যবনিকা নেমে আসে।[৩৯৯]

আজমগড়ের ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বিবরণ (ডায়েরি) রেখে গেছেন আর. এইচ. *নিবলেট। তিনি মধুবন থানা আক্রমণের সময় উপস্থিত ছিলেন।* বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা আজমগড়ে প্রথম গণ্ডগোল শুরু করে রেলওয়ে স্টেশনের ওপর হামলা করে। আজমগড়ের সংবাদ আবার প্রভাবিত করে পার্শ্ববর্তী বালিয়াকে।[৪০০] বন্দগাঁও-এর চাষী রামফল ধনুক বলতে থাকে সাহেবদের যদি বোমা ও বন্দুক থাকে তাদেরও রয়েছে ইট, লাঠি, তলোয়ার, ভল্ল। এস ডি ও ও তাঁর সঙ্গীদের হত্যা করা হয় সীতামারিতে।[৪০১] সাসারামে অনুরূপ আক্রমণের বিবরণ দিয়েছেন এস ডি ও এইচ বি মার্টিন। বিপুল সংখ্যক গোরা সৈন্য এনে সামাল দিতে হয়। সৈন্যদের ওপরও আক্রমণ চলে নারাযণপুর (মুঙ্গের) ও ফতোয়ায়। চন্দন মিত্রের মতে, বালিয়ায় সত্যকার অভাবের চেয়েও অভাবের আশঙ্কা ও ব্রিটিশ রাজত্ব অবসানের সম্ভাবনা নৈরাজ্যের পটভূমিকা সৃষ্টি করে ছিল। তিনি সোশ্যালিস্ট পার্টির কৌমী সেনাদলের নেতৃত্বের ওপর জোর দিয়েছেন। বিলয়ারা বোড রেল স্টেশনের ওপর আক্রমণ, সৈন্য রসদবাহী ট্রেনের ওপর হামলা ইত্যাদির পরিচালনা করে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পরশনাথ মিশ্র। কিন্তু জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর মতে জনতাই আগে কাজ শুরু করে।

বালিয়ার ম্যাজিস্ট্রেট নানা রটনায় বিমূঢ় হয়ে জেলা কংগ্রেস সভাপতি চিত্তু রামের শরণ নেন। শেষে জেল থেকে সব বন্দীদের মুক্তিও দেন তিনি। পাণ্ডেকে 'স্বরাজ জিলাধীশ' খেতাব দেওয়া হয়। কয়েকদিন পর সৈন্য আসছে শুনে নেতারা পালায়। চন্দন মিত্র দেখাচ্ছেন পাণ্ডের মত পুরোনো নেতা ও সোশ্যালিস্ট তরুণদের মধ্যে বাদবিতণ্ডা হয়। তরুণরা দু-একটা লুটপাটের বেশি কাজ দেখাতে পারেনি। অর্থাৎ সোশ্যালিস্টদেরও কোন ব্যাপক কর্মসূচি ছিল না।[৪০২] গুজরাট ও সাতারায় কি ঘটেছিল তা পরের অধ্যায়ে বলব।

॥ ১৫ ॥

বোম্বাই-এর ছোটলাট স্যার রোজার লামলি একবার লিখেছিলেন, "গুজরাট হল কংগ্রেসের আধ্যাত্মিক নিবাস", এখানে জনসাধারণ সরকারের চেয়ে কংগ্রেসকে ঢের বেশি সমর্থন করে।[৪০৩] ডেভিড হার্ডিম্যান দেখাচ্ছেন এ অঞ্চলে আগস্ট বিদ্রোহ কম নাটকীয় হলেও বেশি স্থায়ী হয়েছিল, বেশি সুসংগঠিত ছিল।[৪০৪] আহ্মেদাবাদের সুতাকল ধর্মঘট যুদ্ধোদ্যোগ ব্যাহত করে।[৪০৫] আর বোমাবাজি ও নাশকতামূলক কাজে পশ্চিম ভারত ছিল অগ্রণী।[৪০৬]

প্যাটেলের নেতৃত্বে গুজরাট প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি বার বার কৃতিত্ব দেখিয়েছে—বিশেষত বারদোলি সত্যাগ্রহ (১৯২৮) তো তুলনাহীন। ১৯২১ থেকে ১৯৪৬ প্যাটেল ছিলেন সভাপতি। তিনি শহরাঞ্চলের পেটিবুর্জোয়া ও গ্রামাঞ্চলে পটিদার কৃষকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রেখে চলতেন। আহমেদাবাদ, বরোদা, সুরাট শহর এবং খেড়া ও সুরাট জেলার গ্রামাঞ্চল ছিল তাঁর শক্তিকেন্দ্র। মোরারজি দেশাই তখনো সুবিধা করতে পারেননি, তবে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির প্রভাব ছিল বর্ধমান আর ব্রোচের ছোটুভাই পুরানি গুজরাট ব্যায়াম প্রচারক মণ্ডলের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদী ঐতিহ্য জিইয়ে রেখেছিলেন। পশ্চিমের রণাঙ্গনে ইংরেজদের ক্রমাগত পরাজয় গুজরাটের বানিয়া মহলে এক ধরনের উল্লাস জাগাত। জাপান যুদ্ধে যোগ দিলে আনল "a fresh wave of pessimism and defeatism."[৪০৭] ব্যাঙ্কের সঞ্চিত অর্থ তোলার ও সোনারুপো জমানোর হিড়িক পড়ে যায়। জাপানী বোমার আতঙ্ক গুজরাটীদের বাঙালীদের মতই কাঁপিয়েছিল। রেঙ্গুন প্রত্যাগত গুজরাটী ব্যবসায়ীদের দুর্দশা তারা নিত্য দেখছিল। ফলে, শুধু সোনারুপো নয়, খাদ্যশস্য মজুত করাও আরম্ভ হল। এর অবশ্যম্ভাবী ফল খাদ্য মূল্যবৃদ্ধি। আতঙ্ক ও অভাবের তৈরি মাটিতে পড়ল 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের বীজ।

নরহরি পারিখ তাঁর 'প্যাটেল জীবনী'তে লিখেছেন, জাপানীরা আসবার আগে স্বাধীনতা পাবার জন্য প্যাটেল অধীর হয়েছিলেন।[৪০৮] গণ সত্যাগ্রহ, সরকারী কাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি শিল্প ও যোগাযোগে ধর্মঘট সফল হলে ব্রিটিশ শাসন বেশিদিন টিকতে পারে না। তিনি নাকি বলেছিলেন, "অহিংসার গণ্ডীর মধ্যে থেকে সরকারের ক্ষমতা ভাঙো," "কর্মসূচির জন্য বসে থেকো না, নিজেরা তৈরি করে নাও।" মোরারজি কিন্তু ভয় করেছিলেন, এ ধরনের কাজ শুরু হলে সোস্যালিস্টদের প্রভাবই বাড়বে।[৪০৯] প্যাটেল জুলাই মাসে ওয়ার্ধা থেকে ফিরে সব গুজরাটী নেতাদের সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন—তিনি নাকি বলেন, "on this occasion they would all go out, and were not to be too squeamish about non-violence."[৪১০] উইকেনডেন তাঁর ২৫ জুলাই-এর আহ্‌মেদাবাদ বক্তৃতার যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা আরও ভয়াবহ। তিনি নাকি বলেন, ক্রোধে উন্মত্ত জনতা যদি কোন বিপজ্জনক সংগ্রামও চালায় কংগ্রেস বাধা দেবে না, গান্ধীও আপত্তি জানাবেন না।[৪১১] রেল লাইন তুলে ফেলা, ইংরেজ হত্যা, এমন কি চৌরিচৌরার অনুরূপ হিংসাতেও নাকি আন্দোলন বন্ধ করা হবে না।[৪১২] গ্রেফতার হবার অব্যবহিত পূর্বে তিনি নাকি নাশকতামূলক কাজের খসড়া দিয়ে যান। এ ধরনের পাঁচটি গুজরাটী পত্রিকা (বুলেটিন) হার্ডিম্যানের প্রবন্ধের শেষে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এর কতটা উগ্র তরুণদের স্বকপোলকল্পিত ও প্যাটেলের মুখে আরোপিত তা বলা কঠিন। হার্ডিম্যান উইকেনডেনের রিপোর্টকে বেদবাক্য বলে মেনেছেন কিন্তু প্যাটেলের চরিত্র অনুধাবন করেননি।

আহমেদাবাদে ছাত্রদের প্রাথমিক নেতৃত্ব, হরতাল, থানা পোড়ানো, পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ অন্যান্য অঞ্চলের অনুরূপ। খেড়ায় ১১ থেকে ১৯ আগস্টের মধ্যে পুলিশের গুলিতে অন্তত দশ জন প্রাণ হারায়। লামলি এই অঞ্চলে সেনা নামান।[৪১৩] সুরাট শহর শান্ত থাকলেও জালালপুর ও বারদোলি তালুকার রেলস্টেশন ও লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কোন কোন স্থানে পুলিশের ওপর আক্রমণ চলে। বরোদা শহরে নরমপন্থী প্রজামণ্ডল 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে যোগ দিতে বাধ্য হয় এবং সংঘর্ষের ফলে দু'জনের মৃত্যু ঘটে। নতুন নেতাদের অভ্যুদয় লক্ষণীয়—হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ও লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিকসের ছাত্র বি· কে· মজুমদার ও ছোটুভাই পুরানি। মজুমদার ছিলেন অচ্যুত পটবর্ধনের বন্ধু—সোস্যালিস্ট।

তিনি বোম্বাই ও পুণায় অল ইণ্ডিয়া সিক্রেট কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। পুরানি ছিলেন পুরনো সন্ত্রাসবাদী—নাশকতামূলক কাজে তাঁর জুড়ি ছিল না। তৃতীয় নেতা জয়েন্তি ঠাকুরও সোস্যালিস্ট ছিলেন। ইনি প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতেন কর বসিয়ে, ডাকাতি করে, স্বেচ্ছাদান পেতেন না তাও নয়। সে টাকা দিয়ে প্রচার-পত্রিকা (বুলেটিন) প্রকাশ করা হত, বোমা বানানো হত, বা অস্ত্র কেনা হত। হার্ডিম্যান বলছেন সত্য ঘটনার সঙ্গে বহু অসত্য রটনাও প্রচাবিত হত। তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য, কংগ্রেস ও জাপানীদের মধ্যে গোপন আলোচনার খবর দিতে অস্বীকার করায় মহাদেব দেশাইকে জেলের মধ্যে মেরে ফেলা হয়েছে!

জয়েন্তী ঠাকুরকে আহ্‌মেদাবাদের 'সহেব সুবা' বলা হত (মেদিনীপুরের সর্বাধিনায়কের মত), তাঁর অধীনে ছিল উনিশ জন 'ওয়ার্ড নায়ক' আবার তাদের অধীনে 'পোল নায়ক'। শিশুদেরও একটা দল ছিল—নাম 'বানর সেনা'। সংবাদ আদানপ্রদানে তাদের জুড়ি ছিল না।

আহমেদাবাদ ও বরোদায় সমর্থন আসত উঁচু জাতের মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে। ফলে, পাইকারি ও খুচবো বাজার বা শেয়ার বাজার বন্ধ করা কঠিন হয়নি। এক এক জাত ছোট ছোট ঘেবা অঞ্চলে থাকত—তার নাম 'পোল'। সেখানে আশ্রয় নিলে পুলিশের সাধ্যও ছিল না ধরে। আহমেদাবাদের নায়করা এসেছিল খড়িয়া অঞ্চলের নাগর ও ব্রাহ্ম ক্ষত্রিয় জাত থেকে। খড়িয়ার কে জি প্রভু ছিলেন সব নাশকতামূলক কাজের হোতা। বরোদায় 'পঞ্চপোল' থেকেই বড বড় মিছিল বেরত।

হিন্দু-মুসলিম বিবাদ আহমেদাবাদ আন্দোলনের সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা। ১৯৪১-এর এপ্রিলে এখানে যে ভয়াবহ দাঙ্গা হয়, তাব স্মৃতি দুই সম্প্রদায়কে বিভক্ত করে রেখেছিল। ছোটলাট লামলি লিখছেন, "....I do not doubt that the basic origin of these riots is political and is due to the preaching of Pakistan and the counter preaching of the Hindu Maha Sabha and to some extent to the civil disobedience movement which the Muslims regard as an attempt to coerce us into granting a Hindu Raj.[৪১৪] বরোদা শহরের মুসলমানরা ২৬ আগস্ট শপথ নেয় তারা 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে যোগ দেবে না।

তবে আহমেদাবাদের শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ করত গান্ধীপন্থী 'মজুর মহাজন'। তারা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কাবণে ধর্মঘট শুরু করে। শ্রমিকদের দুই-তৃতীয়াংশ শহব ছেড়ে চলে যায়, থেকে যায় শুধু মুসলিম তাঁতিরা। গোয়েন্দা দফতরের মতে প্যাটেল শিল্পপতিদের বলেন, দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে। তাঁরা ধর্মঘটে আপত্তি তো করেনই নি, চাঁদাও দেন প্রচুর।[৪১৫] কস্তুরভাই লালভাই-এর সঙ্গে বি· কে· মজুমদাবের যোগাযোগ ছিল। মিল মালিকদের ভয় ছিল জাপানীরা প্রবেশ করলে ইংরেজরা মিলগুলো গুঁড়িয়ে দিয়ে যাবে। ভবিষ্যতে কংগ্রেস একদিন সরকার গড়বে এ আশাও ছিল না তা নয়। কম্যুনিস্ট ও মুসলিম তাঁতিরা কিন্তু মিল খুলবার দাবিতে সোচ্চার হয়েছিল। বেশিদিন মিল বন্ধ রাখা সম্ভব হয়নি। মালিকদের প্রভূত ক্ষতি হচ্ছিল। আগস্ট থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে কাপড়ের দাম তিন গুণ বাড়ে। ইংরেজরাও ভয় দেখাচ্ছিল কয়লা সরবরাহ বন্ধ কবে দেবে। নভেম্বরে বোঝা গিয়েছিল যুদ্ধ ইংরেজদের পক্ষে যাচ্ছে। 'মজুর মহাজন' শ্রমিকদের চাপে পড়ে মিল খোলায় সম্মতি দেয়। ধীরে ধীরে শান্তি ফিরে আসে। আন্দোলনকারীরা ভয় দেখিয়ে কিছু করতে পারেনি। ১৯৪৩ মার্চের মধ্যেই আন্দোলন শেষ হয়ে আসে।

২২ সেপ্টেম্বর ব্রোচ জেলার জাম্বুসর তালুকার ভেদাচ থানা আক্রমণ দিয়ে ছোটুভাই পুরানির কাজ শুরু। এর পর ব্রোচ জেলা, সুরাট জেলা ও বরোদায় নানা নাশকতামূলক ঘটনা ঘটে। লুট, ডাকাতি চলে অবাধে। সুরাটে যেসব প্যাটেল পদত্যাগ করেনি তাদের ওপর জুলুম চলে, এমন কি বোমাবাজিও। এখানে মোরারজি দেশাই-এর অনুচররা রেকর্ড অফিস, ডাকঘর, সরকারী সম্পত্তির ওপর আক্রমণ চালায়। দক্ষিণ গুজরাটে আদিবাসীরা সরকারের অনুগত প্যাটেল, বানিয়া মহাজন ও পার্সী মদ/তাড়ি বিক্রেতাদের ওপর নির্বিচারে আঘাত হানে।

সবচেয়ে লক্ষণীয় ব্যাপার ১৯৪২-এ গুজরাট রাজস্ব বা খাজনা দিতে অস্বীকার করেনি। খেড়া, সুরাট ও ব্রোচের প্রজাদের মনে ছিল যে ১৯৩২-৩৪ সালে খাজনা না দেওয়ার জন্য তাদেব জমি বাজেয়াপ্ত হয়েছিল এবং ১৯৩৮-এ কংগ্রেস সরকার তা ফিরিয়ে দিলেও তাদের অবর্ণনীয় দুঃখ ভোগ করতে হয়। আরেকটা কারণ—ধনী কৃষকরা উঠতি দামের সুযোগ নিতে চেয়েছিল। পূর্ব আফ্রিকার সচ্ছল গুজবাটীবা টাকা পাঠাত। তামাক চাষের প্রভূত উন্নতি হয়। আবেকটা তথ্য ভুললে চলবে না। আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল পটিদার সম্প্রদায় ও অনাবিল ব্রাহ্মণের মধ্যে। আদিবাসীরাও যোগ দেয়। কিন্তু বরাইয়া ও পতনবাদিয়ারা পটিদাবদের নেতৃত্ব মানেনি। তাবা প্রধানত কিষাণ সভায় যোগ দিয়েছিল। শেষে, ১৯৪২-৪৩-এ কংগ্রেস নেতৃত্বকে কেউ বিশ্বাসঘাতকতার দোষ দিতে পারেনি। প্রচণ্ড ব্রিটিশ দমননীতি এব ব্যর্থতার জন্য দায়ী ছিল।

পশ্চিম মহাবাষ্ট্রে ১৯৪২-৪৩-এ ব্যাপক গেবিলা কাজকর্ম চলেছিল কিন্তু সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল সাতারা। সেখানে গেরিলারা যে 'প্রতি সরকার' স্থাপন করে তা গান্ধীর নির্দেশে আত্মসমর্পণ কবেনি এবং ১৯৪৬ পর্যন্ত ব্রিটিশ দমননীতি সহ্য করে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উঁচু রেখেছিল। এখানে সশস্ত্র আন্দোলনের সঙ্গে ন্যায়দানমণ্ডল প্রতিষ্ঠা ও গঠনমূলক কাজও চলছিল। ওম ভেদ্ বলছেন, "এখানে কংগ্রেসকল্পিত স্বাধীনতাই লক্ষ্য ছিল না—লক্ষ্য ছিল শ্রমিক-কৃষকেব বাষ্ট্র।"[৪১৬] বর্তমান সাতারা চিনির কল্যাণে অতি বর্ধিষ্ণু, কিন্তু ১৯৪২-এ ছিল কৃষকদেব জেলা, মুখ্যত কুন্‌বি জাতের জেলা, ইংবেজদেব দলিলে 'wild and predatory Marathas'-দের জেলা। নীচু জাতের মধ্যে ছিল মহর, মং ও রামোশি। মহারাষ্ট্রেব অনেক জাযগাব মত তা ব্রাহ্মণ-বানিযাব প্রভাবাধীন ছিল। তাই এখানে ব্রাহ্মণ-বিবোধী জটিবাম ফুলে তাঁব সত্যশোধক সমাজেব কাজে সুফল পান। ১৯১৯-২১-এ এখানে ফসলেব $\frac{১}{৩}$ বা $\frac{৩}{৪}$ অংশ খাজনাব বদলে $\frac{১}{২}$ অংশ দেবার জোব আন্দোলন হয়। ওম ভেদের মতে, সাতাবাব 'প্রতি সবকারেব' ভিত্তি ছিল এই ব্রাহ্মণ-বিরোধী আন্দোলন। একই সঙ্গে তা সামন্তপ্রথা-বিবোধী ও উচ্চজাতের শাসন-বিবোধী। শেষে সত্যশোধক আন্দোলন এদের ব্রিটিশ-বিবোধীও কবে তোলে। গান্ধীব সমাজসংস্কারমূলক কর্মধারা তাদের সহানুভূতি পেয়েছিল। ১৯৩২ সালের জঙ্গল সত্যাগ্রহে এরা জড়িয়ে পড়ে। ভাল্বা তালুকার নানা পাটিল ছিলেন ১৯৪২-এর নেতৃত্বে। কিন্তু কংগ্রেসের পতাকাতলে নয়। ওম ভেদের ভাষায়, "They were taking the name of Gandhi as a symbol but without becoming Gandhians in any ideological sense." এখানে কম্যুনিস্ট কিষাণ সভাব কোন চিহ্ন দেখা যায়নি। আগস্টে তারা গান্ধীর দুটো কথা মনে রেখেছিল—"করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে", আর "প্রত্যেকে নিজের নেতা হোক।" সুতবাং তাব কেটে, ট্রেন লুট করে, লড়াই চালিয়ে, জনগণের আদালতে দোষীদেব শাস্তি দিয়ে তাবা মনে করছিল গান্ধীর পথই অনুসরণ করছে।

প্রথম শ্রেণীর নেতারা গ্রেফতার হলে ওয়াই· বি· চবন, রামানন্দ স্বামী, বিঠলরাও পাজে ও বসন্তদাদা পাতিল গোপনে মিলিত হন ও সাতারায় ফিরে দুদিন নানা পরামর্শ চালান। ঠিক হয় একটা প্রকাশ্য দল করবে সত্যাগ্রহ, আরেকটা দল থাকবে গোপনে। বড় বড় মিছিল বেরোয় সরকারী সম্পত্তি দখল করতে এবং পুলিশ গুলি চালায়। অতএব শুরু হয় গোপন নাশকতা—তার কাটা, সরকারী বাড়ি পোড়ানো, রেল লুঠ ইত্যাদি। সরকার উত্তর দেয় গ্রামের ওপর বিরাট অঙ্কের জরিমানা বসিয়ে ও ব্যাপক গ্রেফতারে। ১৯৪৩-এর প্রথমে মনে হয় সরকার জিতছে। এর বদলা নিল গোপন দল পুলিশ চরদের ওপর হামলা চালিয়ে। শিবালা দল আর একটু এগিয়ে গ্রামবাসীদেরই পুলিশ, রাজস্ব ইত্যাদি নানা ব্যাপারে দায়িত্ব দিল। স্থাপিত হল গণ-আদালত। চবদের পায়ে আঘাত করে খোঁড়া করে দেওয়া হত। এজন্য 'প্রতি সরকার'-কে অনেকে নাম দিয়েছিল 'পত্রি সরকার'। শেষে গড়ে উঠল 'ন্যায়দানমণ্ডল'। ১৯৪৩ ফেব্রুয়ারি ও জুনে দুটি গোপন সভায় 'প্রতি সরকার' স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। জুনের সভায় চবন এই সিদ্ধান্তে আপত্তি জানান। এমন কি অচ্যুত পটবর্ধনও প্রথমে বলেন, আত্মসমর্পণ করতে। কিন্তু 'ন্যায়দানমণ্ডল' এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে, তাঁদের উপদেশ অগ্রাহ্য হয়। 'বহুজন সমাজ' কেন শুনবে কংগ্রেসের কথা? পটবর্ধন শেষে সম্মতি দেন। ১৯৪৩ জুন থেকে ১৯৪৪ মার্চ পর্যন্ত 'প্রতি সরকাবের' চরমপন্থীদের এইভাবে ভাগ করা যায়।[৪১৭]

সাবণি ১ ও ২ দ্রষ্টব্য।

সারণী-১

জাতি	বৃত্তি			
	মালিক বানিয়া	চাষী	কেরানি উকিল শিক্ষক	শ্রমিক
ব্রাহ্মণ	৪	১	৩	০
বানিয়া, জৈন	২	২	১	০
মারাঠা কুন্‌বি	২	১৪	২	৫
বালুতেদার (লোহার, ছুতার)	১	২	০	৪
দলিত (মহর, মং, চামার)	০	০	০	২

সারণী-২

জাতি	কংগ্রেসী	বামপন্থী	আর এস এস
ব্রাহ্মণ	২	১	২
বানিয়া, জৈন	১	০	০
মারাঠা কুনবি	২	০	০
বালুতেদার	১	০	০
দলিত	০	০	০

তিনটি বড় দলে বিভক্ত ছিল 'প্রতি সরকার'—(১) শিরলাপেঠ দল। প্রথম দিকে এর নেতা গান্ধীবাদী হলেও পরে বাবুজি পতঙ্কর নামে দরিদ্র মারাঠী চাষী এটি পরিচালনা করেন। (২) কুন্তল দল। শিরলাপেঠ দল কৃষ্ণা উপত্যকায় সামান্য কাজ করলেও প্রধানত পাহাড়ী অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল আর কুন্তল দলের কাজকর্ম চলত কৃষ্ণাতীর ধরে, অল্প করদ তালুকে। নেতা ছিলেন—তিনজন লাড় ভ্রাতা। তাঁরা সামনে রেখেছিলেন নানা পাটিলকে। (৩) করদ দল। প্রথম দিকে এর নেতা ছিলেন চবন। পরে নেতৃত্ব দেন মাধব রাও যাদব ও ধন্বন্তরি—এও কৃষ্ণা উপত্যকায়। ছ' মাস পর পর দলগুলি মিলিত হত এবং 'প্রতি সরকারে'র কর্মসূচি নির্ধারণ করত। নানা পাটিল কুন্তল দলের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত থাকলেও 'প্রতি সরকারে' অধিকাংশ কাজ চলত তাঁর নামে। কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির সঙ্গে এর সম্পর্ক ছিল একটু অদ্ভুত। ১৯৪৩-এর অক্টোবরে এদের সন্ত্রাসবাদী হিংসাত্মক কাণ্ডকারখানার খবর পেয়ে সোস্যালিস্টরা এক প্রতিনিধি পাঠায়। তার প্রশংসা উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক নিবিড়তর করে এবং ধন্বন্তরী, নাথজী লাড় রা বোম্বাইতে কার্যালয় স্থাপন করেন। ম্যাক্স হাবকোর্টের মত ঐতিহাসিকরা, যাঁরা এদের social bandit-এর পর্যায়ে ফেলতে চান, তাঁরা অবাক হবেন শুনে যে এরা বহুক্ষেত্রে ডাকাতদের সঙ্গে লড়েছে। তবে এরা মালিক ও মহাজনদের স্বতন্ত্র অন্যায়ের মোকাবিলা করলেও সম্পত্তিগত সম্পর্কের পরিবর্তনে নামেনি। অনুপস্থিত মালিকদের জমি কয়েক ক্ষেত্রে গরীব চাষীদের মধ্যে বিতরিত হয়েছিল। অসহায়া রমণী (বিশেষত বিধবা)-র প্রতি অত্যাচার বেশ কমে ছিল। গুণ্ডাদেরও দমন করা হয়।

১৯৪৪-এর মার্চে অচ্যুতরাও পটবর্ধন কোলহাপুর অঞ্চল থেকে এদের এক 'ডিক্টেটর' স্থির করলে সাতারার দল প্রতিবাদ করে। বিভিন্ন দল আপন এলাকায় স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলে। সাতারা দল শেষপর্যন্ত নিজেদের লোক কিষণ বীরকে ডিক্টেটর স্থির করে। তাকে সাহায্য করার জন্য এক কর্মসূচি কার্যকরী মণ্ডল গঠিত হয়। এরা লাইব্রেরি, ন্যায়দানমণ্ডল, সেবাদল গঠন করে প্রত্যেক গ্রামে। গান্ধীর কিছু গঠনমূলক কাজও (যেমন বর্ণহিন্দু ও অচ্ছুতদের একত্র ভোজন) প্রকাশ্যে চলে। খান্দেশ খাজাঞ্চিখানা থেকে পাঁচ লাখ টাকা লুঠ একটা বড় ঘটনা। টাকাটা কিন্তু ঠিকমত বিতরিত হয়নি। কুন্তল দল অন্য দু দল থেকে এবং সোস্যালিস্ট পার্টি থেকে আলাদা হয়ে 'তুফান সেনা' সংগঠিত করে। নাগনাথ নাইকৌডি অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে একটা সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে চান। গান্ধীবাদী ও সোস্যালিস্টদের বিরোধের ফলে ১৯৪৩-এর সেপ্টেম্বরেই বোম্বাই-এর কেন্দ্রীয় আধিকারিকরা বিরক্ত হয়ে গিয়েছিল।

১৯৪৪-এর ১ আগস্ট গান্ধীর কাছ থেকে এল আত্মসমর্পণের আহ্বান। এ সি ভূইঞ্যা The Quit India Movement: The Second World War and Indian Nationalism (Delhi, 1987) এই পর্বটা ভালভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন সব জায়গা থেকে আত্মগোপনকারী নেতারা সাড়া দিলেও সাতারা সাড়া দেয়নি। কুন্তল দল ছিল সবচেয়ে বিরোধী। ধন্বন্তরী নাকি বলেন, "গান্ধী যা বলছেন ঠিক। কিন্তু যতক্ষণ আমাদের প্রতিপক্ষের হাতে অস্ত্র আছে আমরা আত্মসমর্পণ করতে পারব না।" যারা চায় তাদের অবশ্য স্বাধীনতা দেওয়া হল। কিন্তু তারা শিরালা দলের মুষ্টিমেয়। রব্‌দে গুরুজি, মাধবরাও যাদব ও ধন্বন্তরি শেষপর্যন্ত গ্রেফতার হন। কিন্তু 'প্রতি সরকারে'র নতুন নেতার অভাব হয়নি। ওম ভেদের মতে ১৯৪৬-এর সাধারণ নির্বাচনই প্রতি সরকারের কাজের ওপর যবনিকা টেনে দিল—ব্রিটিশ সেনাবাহিনী নয়। এ সিদ্ধান্ত আমি

মানতে রাজি নই।[৪১৭] সুমিত সবকারের মতে এই নির্বাচন কংগ্রেস কর্মসূচিকে গণ-সংঘর্ষের পথ থেকে সরিয়ে আনার জন্য ব্রিটিশ চাল—এই সিদ্ধান্তও স্বীকার করা কঠিন।[৪১৮] দক্ষিণ মহারাষ্ট্রের কৃষককুলেব দীর্ঘ দিনের সামন্ত বিরোধী, জাতপাত বিরোধী এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামেব ঐতিহ্য এব পেছনে ছিল। কিন্তু সামনের লক্ষ্য কি ছিল?

১৯৪২-এব শেষ দিন এমেরি বডলাটকে অভিনন্দন পাঠালেন—"Every possible good wish for 1943 and for a triumphant romp home over the last lap."[৪২০] লিনলিথগোব দমননীতি অভিনন্দনের যোগ্য ছিল। ১৯৪৩-এর ১ ফেব্রুয়ারি সবকাবী হিসাব মতে জেলে ছিল [৪২১]

আইন	সংখ্যা
প্রচলিত আইন বা প্রতিবক্ষা বিধি অনুযায়ী	২২,৭২৫
প্রতিবক্ষা বিধি ২৬ অনুযায়ী	৮,১৩০
প্রতিবক্ষা বিধি ১২৯ অনুযায়ী	৪,১৮৪
	৩৫,০৩৯

এই সময়ের মধ্যে পুলিশ ৬০১ বাব গুলি চালায় (বেশির ভাগ বোম্বাইতে), ৭৬৩ জন নিহত হয় (ইউ.পি-তে ২০৭ ও বিহাবে ১১৬), আহত হয ১৯৪১ (ইউ.পি-তে ৪৫৮, বিহাবে ৫০৮, বোম্বাইতে ৪০৬)। ২০১২ জন পুলিশ আহত হযেছিল। থানা পোড়ে ২০৮টি। ১৮ মার্চ (১৯৪৩)বডলাট লিখছেন, নানা আইনেব প্রয়োগে টেলিগ্রাফেব তাব কাটা, হবতাল, কর্মচাবী বযকট, বোমাবাজি বন্ধ কবাব চেষ্টা সফল। শুধু বেলগাঁও, মেদিনীপুব প্রভৃতি কযেক জাযগায বিচ্ছিন্নভাবে গোলমাল চলছে।[৪২২] ১৯৪৩-এব ৩১ ডিসেম্বব পর্যন্ত সবকাবী হিসাব শেষ সাবণীতে সংযোজিত হল।[৪২৩]

প্রকৃতিও যেন সবকারেব মত কষ্ট হযেছিল। ১৯৪২-এর অক্টোবরে মেদিনীপুবেব উপকূল অঞ্চলে যে প্রচণ্ড ঝড ও বন্যা বয়ে যায় এবং ১৯৪৩-এ সমগ্র বঙ্গে যে দুর্ভিক্ষ তাব করাল পক্ষ বিস্তাব কবে তাও আন্দোলনকে অনেকাংশে দুর্বল কবেছিল। শুধু তমলুক মহকুমায শস্যহানি ঘটেছিল ৫০%, প্রাণহানি ৪০০০ এবং পশুহানি—৭০,০০০-এব মত।

১৯৪৩-এব মন্বন্তরেব ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। দুর্ভিক্ষ কমিশনেব প্রতিবেদন বলছে—১৯৪০-৪১ সালে ফসল ভাল হযনি বলে সঞ্চিত শস্যের পবিমাণ হ্রাস পায। তাব ওপব ১৯৪২-৪৩-এব আমন ফসলও মার খায। ১৯৪৩-এ ৪৯ সপ্তাহেব বেশি খাদ্যেব যোগান ছিল না।[৪২৪] মফকরুল ইসলাম তাব Bengal Agriculture গ্রন্থে দেখাচ্ছেন ১৯৪০-৪৪-এব পাঁচ বছবে ১৯৩৫-৩৯-এব পাঁচ বছরেব চেয়ে সব বকমেব শস্য উৎপাদন কমে যায।[৪২৫] ব্লিনেব হিসাব অনুসাবে খাদ্যশস্যেব উৎপাদনে নিযুক্ত জমিব পবিমাণ যে-হাবে বাডছিল, তাব চেয়ে বেশি বাডছিল গড জনসংখ্যা।[৪২৬]

সাবণী ৩ দ্রষ্টব্য।

পেণ্ডেবেল মুনেব মতে ব্রহ্মদেশ ও জাপানী অধিকৃত দক্ষিণপূর্ব এশিযা থেকে চাল আমদানি বন্ধ হযে যাওযাই "basic cause of the Bengal famine"[৪২৬] সুমিত সবকাব তাই মনে করেন।[৪২৭] কিন্তু মফকরুল ইসলাম দেখাচ্ছেন ১৯৩১-৩২ থেকে ১৯৪১-৪২ বছর পিছু ১১ লক্ষ টনেব বেশি চাল আমদানি হত না। তা অভ্যন্তরীণ যোগানেব ১·৪ থেকে ১.১%-এব বেশি নয়—অর্থাৎ নগণ্য। দেশময় শস্য চলাচলেব

সারণী-৩

	বার্ষিক কৃষিজমি বৃদ্ধির পরিমাণ (সংশোধিত)	জনসংখ্যা বৃদ্ধি
বঙ্গদেশ	০·২	০ ৪
প্রেসিডেন্সি বিভাগ	০ ৯	১ ২
বর্ধমান বিভাগ	০·৭	০·৮
বাজশাহী বিভাগ	০·১	০ ৩
ঢাকা বিভাগ	০ ৯	০·৯
চট্টগ্রাম বিভাগ	০ ৫	১ ৩

অসুবিধা দেখা না দিলে হয়তো এমন অভাব দেখা দিত না। কিন্তু যুদ্ধকালীন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাব জন্য মেদিনীপুব, ববিশাল, খুলনাব উদ্বৃত্ত শস্য সবকাব কিনে নেন, উপকূলবর্তী জেলা থেকে সব নৌকা সবিয়ে বা নষ্ট করে দেন।[৪২৮] এব ফলে স্থানীয জনসাধাবণেব মনে আতঙ্ক সৃষ্টি হয এবং চালেব চাহিদা-যোগানেব ওপব দেখা দেয তার প্রতিক্রিয়া। উদ্বৃত্ত উৎপাদকবা খাদ্য মজুত কবতে থাকে ভযে আর বড়ো উৎপাদকবা, ফড়ে ও ব্যবসাযীবা কবতে থাকে চড়া দামেব লোভে। শুধু যুদ্ধসংক্রান্ত কনট্রাক্টেব দৌলতে বড়লোকদেব দাবিই বাড়ে না, যুদ্ধজনিত নানা কাজে নিযুক্ত মজুবেব সংখ্যা বেড়ে যায ও তাদেব চাহিদাও বাড়ে। বিবাট সৈন্যবাহিনীব দাবি তো ছিলই। স্যাব টি বাদাবফোর্ড লিনলিথগোকে জানান—ভয ও অনিশ্চযতাব কাবণে ও মুনাফাব লোভে সামান্য উৎপাদন হ্রাসেব অনুপাত বহির্ভূত প্রতিক্রিয়া হয।[৪২৯] ওযাভেল চার্চিলকে যে চিঠি লেখেন তাতে ঘাটতি ছাড়াও দাযী কবা হযেছে "human qualities of fear, selfishness, greed, and provincialism"-কে।[৪৩০] এ দুর্ভিক্ষ শুধু প্রকৃতিব নয, মানুষেবও সৃষ্টি।

কেমব্রিজ ইকনমিক হিস্টবি অব ইণ্ডিযার ২য খণ্ডে ম্যাক অ্যালপিন তাঁব অধ্যাযেব শেষে যে ভাবতীয মূল্যেব ইনডেক্স নাম্বাব দিযেছেন তাতে দেখা যায ১৯৪১ থেকে ১৯৪২ উল্লেখযোগ্যভাবে কৃষিজাত পণ্যেব মূল্যবৃদ্ধি শুরু হযে তা ১৯৪৩ সালে শিখবে পৌঁছে। অকৃষিজাত পণ্যেব মূল্য ১৯৪২ থেকে ১৯৪৩ এতটা বাড়েনি।

সাবণী ৪ দ্রষ্টব্য।

সারণী-৪

বছর	কৃষিজাত পণ্য মূল্যের ওয়েটেড ইনডেক্স (১৮৭৩ = ১০০)	অকৃষিজাত পণ্য মূল্যের ওয়েটেড ইনডেক্স (১৮৭৩ = ১০০)
১৯৩৯	১৫৩	১১২
১৯৪০	১৪৭	১১১
১৯৪১	১৬৬	১৩২
১৯৪২	১৯৪	১৮১
১৯৪৩	৪২১	২৮১
১৯৪৪	৩৪০	২৩৩

খুচরো চালের দাম আরো বেশি চোখ খুলে দেয়। কলকাতায় চালের দাম ১৯৪৩-এর ৩ মার্চ ছিল মণ প্রতি ১৫ টাকা। ঐ বছর ১৭ মে তা বেড়ে হয় মণ প্রতি ৩০ টাকা। কলকাতা ও হাওড়া বাদ দিয়ে (!) মফস্বলে মজুতদারীদের বিরুদ্ধে অভিযান ঐ দুই অঞ্চলের মজুতদারদের কাছে মুনাফার সুবর্ণ সুযোগ এনেছিল। মফস্বলের অনেকেই প্রান্তিক চাষী, অধিকাংশ ভূমিহীন ক্ষেতমজুর—আজকালকার ভাষায় দারিদ্র্যসীমার ঢের নিচে। প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ বর্গাদার ও ভূমিহীন ক্ষেতমজুর পর্যায়ে পড়ে। তারা দলে দলে কলকাতায় চলে আসে দুটি অন্নের আশায়। ১৯৪৩-এর অক্টোবরে এমন নিরন্ন এবং নিরাশ্রয়ের সংখ্যা এক লক্ষে দাঁড়ায। তারপর সরকার যখন বাঁধা দামে চাল বেচার আয়োজন করে তখন বাজাব থেকে চাল উধাও হযে যায। শ্যামাপ্রসাদ, বিধানচন্দ্র, বদরিদাস গোয়েঙ্কার মত সহৃদয় ভদ্রলোক বেঙ্গল বিলিফ কমিটি গঠন কবেন (২৭ নভেম্বর ১৯৪২) ও পরে রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটির মাধ্যমে ত্রাণব্যবস্থা কবে অবস্থা সামান্য সামাল দেন। এব পর এগিয়ে আসে হিন্দু মহাসভা ও সি পি আই। কম্যুনিস্টরা তাদের সব ত্রাণব্যবস্থা সংহত করে পিপলস রিলিফ কমিটিতে।[৪৩১] তবু কলকাতাব মৃত্যুহাব সাত মাসে স্বাভাবিকের চেয়ে ত্রিশ শতাংশ বেড়েছিল। সমগ্র বাংলায় মৃত্যুসংখ্যা দাঁড়ায় সপ্তাহে দশ হাজার। সরকার কিছু ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয। এইচ এস সুরাবর্দি শ্যামাপ্রসাদকে সরকারী চালের আশ্বাস দেন।[৪৩২] বারিবিন্দুব মত সাহায্যের আশ্বাসে উত্তেজিত শ্যামাপ্রসাদ লীগ সরকারকে তীব্র ভাষায তিরস্কার করেন। ফাসি-বিবোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ একেব পর এক মর্মস্পর্শী নাটকেব মাধ্যমে ('মৈঁ ভুখা হুঁ', 'জবানবন্দী', পবে 'নবান্ন') এই শতাব্দীর নিষ্ঠুবতম ট্রাজেডিকে জনসমক্ষে তুলে ধরে। ছোটলাট হাববার্ট অবশ্য এই সংকটের পেছনে বাজনীতি ছাড়া কিছু দেখতে পাননি।[৪৩৩] তাঁরই প্রিয় সরকাবের খাদ্যনীতি (না, নীতির অভাব ?), বিশেষত লীগের অন্যতম অবাঙালী চাঁই ইসপাহানিব পরিবার পবিচালিত এম এম ইসপাহানি. অ্যাণ্ড কোং-কে বাংলার সব চাল কেনবাব একচেটিয়া অধিকার দান, যে এই ভয়াবহ মন্বন্তরেব জন্য দায়ী এই সত্য তিনি গোপন রেখেছিলেন কিন্তু বাংলা বিধানসভায় শ্যামাপ্রসাদ তা ফাঁস করে দেন। লিনলিথগো বাংলার মন্ত্রিসভা ও কলকাতা করপোরেশনকে অযোগ্যতাব অপরাধে বাতিল করতে চেয়েছিলেন।[৪৩৪]

ভারত সরকারের খাদ্য বিভাগের এক মেমোরেণ্ডাম (৭ সেপ্টেম্বর ১৯৪৩) সরকারী অব্যবস্থাব কয়েকটি দিকে নির্দেশ করেছেন—(১) কলকাতায় মজুতদাববিরোধী অভিযানে ব্যর্থতা ; (২) রেশন ব্যবস্থা চালু করতে অযথা বিলম্ব ; (৩) ইসপাহানিকে একচেটিয়া খাদ্য ব্যবসায়েব অধিকাব দান।[৪৩৫] পেণ্ডেরেল মুন স্পষ্টতই "an inefficient and probably corrupt Muslim League ministry"-কে দায়ী করেছেন। ওয়াভেল বডলাটের কার্যভাব গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে তৎপরতা দেখা দিল। তাঁর ২৯ অক্টোবর ১৯৪৩-এর রোজনামচায় পড়ি তিনি চাইছেন—কলকাতা থেকে দুর্গতদের অপসাবণ, সৈন্যবাহিনী দ্বারা খাদ্যশস্য চলাচল নিয়ন্ত্রণ, কলকাতাব জন্য বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানির ব্যবস্থা।[৪৩৬] তাঁর আশঙ্কা ছিল এমন "grave national crisis" যুদ্ধ ব্যবস্থা দুর্বল করবে।[৪৩৭] তবু আঞ্চলিক খাদ্য কমিশনার বাংলা সরকাবের অনাগ্রহ, অপদার্থতা ও জনস্বার্থ বিষয়ে অনীহাব উল্লেখ করছেন এবং ওয়াভেল ডিসেম্বরের শেষেও না দেখছেন কাজ করার ইচ্ছা না ক্ষমতা।[৪৩৮] ছোটলাট রাদারফোর্ডকে তাঁর সরাবার ইচ্ছা ছিল, এমনকি বাংলায় ৯৩ ধারার শাসন প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন তিনি। ক্যাবিনেটেব আপত্তিতে তা পারেননি।[৪৩৯]

পরবর্তী ছোটলাট কেসি (Casey)-র ডায়েরি (আমার বহু সন্ধানের ফলে ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে পাওয়া গেছে)-তে বাংলার খাদ্য সমস্যার বিস্তৃত বিবরণ পড়ি। সুরাবর্দি তাঁকে বলেন ঢাকার অবস্থা খুব খারাপ আর বাইরে থেকে যথেষ্ট চাল আসছে না। ১৫ জানুয়ারি ১৯৪৪ থেকে চালেব সর্বোচ্চ দাম ২০ টাকা মণ থেকে কমিয়ে ঘাটতি এলাকায় ১৭ টাকা ও উদ্বৃত্ত এলাকায় ১৬ টাকা করা হয়েছিল। তা কার্যকর করা যায়নি। খাদ্য কমিশনার স্টিভেন্স বলেন সংগ্রহেব চেয়ে বিতরণের সমস্যাই বেশি। ত্রাণ কমিশনার মার্টিন বলেন লীগ সরকারের কর্মচারী নিয়োগনীতি বড বেশি সাম্প্রদায়িক বলে কিছু করা মুশকিল। ভারত সরকারের রেশনিং বিষয়ে পরামর্শদাতা কিববি কলকাতায় রেশনপ্রথা চালুর ব্যাপারে সুরাবর্দির গডিমসি ও কর্মচারী নিয়োগনীতির নিন্দা করেছেন। ১৯৪৪-এর মার্চেও বাংলায চালের দর মণপিছু ১৪॥ টাকা, খাদ্যশস্য নিয়ন্ত্রণাদেশ সাধারণ চাষীব ওপর বলবৎ নয়। ১৯৪৪ সালে ধান ভাল হলেও দাম পড়বে এই আশায় তারা মজুত করছে। শ্যামাপ্রসাদ সর্বদলীয় সবকার গঠন করে সমস্যার মোকাবিলা করতে চেয়েছিলেন কিন্তু জিন্না তা দেননি।[৪৪০] ভাবতের বাইরে থেকে খাদ্য আমদানির প্রস্তাব বার বার দেন ওয়াভেল। ক্যাবিনেট তা নাকচ করলে এক তাবে তিনি কডা ভাষায় প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। সেটা তুলে দিচ্ছি

"Bengal famine was one of the greatest disasters that has befallen any people under British rule and damage to our reputation here both among Indians and foreigners in India is incalculable."[৪৪১]

ভাবত সরকাব কলকাতায় খাদ্য সববরাহেব ভাব নিলেও মফস্বলের অবস্থা ভয়াবহ থেকে গেল। ১৯৪৩ সালে বাংলায় সমূহ মৃত্যুসংখ্যা ছিল ১৯,০৮,৬৬২। এর মধ্যে গ্রামাঞ্চলের মৃত্যু সংখ্যাই—১৭,৮০,৩১৫।[৪৪২] সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয় মেদিনীপুব, ২৪ পরগণা, ঢাকা, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর ও মৈমনসিংহে।[৪৪৩] অমর্ত্যকুমার সেন দেখিয়েছেন, এদের অধিকাংশই ভূমিহীন মজুর।[৪৪৪] খাদ্য সংগ্রহের জন্য অর্থ যোগাড করতে ৬৫ লক্ষ পরিবাবের ২·৬ লক্ষ জমি হারায়। যুদ্ধের কল্যাণে কলকাতা ও অনেক শহরে টাকার বন্যা বয়ে যাচ্ছিল। গ্রাম তার আওতার বাইবে বলে তার গায়েই বেশি ঝাপটা লাগে। এখানে জাতপাতেব ভেদ ও সামাজিক মর্যাদার তাগিদে বহু লোক না খেয়ে মরেছে তবু ভিক্ষা করেনি বা লঙ্গব খানায় লাইন দেযনি। অমর্ত্যকুমার সেনের মতে সারা দেশে যা খাদ্যশস্য ছিল তাতে সুদক্ষ পরিবহণ ও সুষম বণ্টনের ব্যবস্থা হলে দুর্ভিক্ষ রোধ করা যেত। কিন্তু মুক্ত বাজাবে খাদ্যশস্য ছাডলে যে দাম উঠত সেটা গ্রামবাসীদের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে। (এই ক্রয়ক্ষমতাব নাম তিনি দিয়েছেন entitlement), ক্রয়ক্ষমতার উৎস জমা টাকা বা নতুন আয়, বিক্রয়যোগ্য সম্পদ ও সরকারী সাহায্য। প্রায় সবকটার যুগপৎ অভাব দেখা দেয। নারী ও শিশু পরিবারের দুর্বলতম সদস্য বলে তাদের ভাগ্যে অনেক কম খাদ্য জুটত। এরাই মরেছে সর্বাধিক।[৪৪৫]

আজও কানে বাজে অমিয় চক্রবর্তীর 'অন্নদাও'—

"রাতের কান্না দিনের কান্না ঘুরে ঘরে ওঠে
অন্ন দাও।
মূর্ছা চোখের অন্ন দাও
বোবা বুক বলে, অন্ন দাও।

কোথাও পাথব ভাঙে না. ঝবে না অন্ন জল,
কঠিন শহবে অন্ন নেই ।"

অথচ অন্ন আছে ।

"লোভেব মবাইযে ধ্বংস গোলায অন্ন আছে,
পণ্য বাষ্ট্র জানে ভুবনেব অন্নেব পথ ।"

পল গ্রীনাও (Greenough)-এব মতে শহবেব মধ্যবিত্ত বেসরকাবী ত্রাণসাহায্য পেযেছিল বলে এমন দুর্দশায পড়েনি ।[৪৪৬] গ্রীনাও জানেন না মধ্যবিত্তেব অনেকে আত্মবক্ষা কবেছিল শত শতাব্দীব নীতিবোধ বিসর্জন দিয়ে । আব ডাকাতি নামে নথিবদ্ধ হযেছে অনেক ধান লুঠেব ঘটনা—বিশেষত মেদিনীপুবে । এ সময়ের সামগ্রিক অবক্ষযেব অপূর্ব কিছু ছবি বেখে গেছেন বাংলাব শিল্পী (জযনাল আবেদিন) আর লেখক, যাঁদের মধ্যে প্রথমেই মনে পডবে বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায (অশনি সংকেত), তারাশঙ্কব বন্দ্যোপাধ্যায (মন্বন্তর), সবোজ বাযচৌধুবী (কালো ঘোডা), প্রবোধ সান্যাল (অঙ্গাব), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (বহু গল্প) । বিষ্ণু দে-ব 'জন্মাষ্টমী' ও 'পদধ্বনি', জীবনানন্দেব 'বিভিন্ন কোবাস' ও 'তিমিব হননেব গান', অমিয় চক্রবর্তীব 'অন্নদাও' ও 'সন্দীপ', সমব সেনেব 'পোড়োমাটি' ও 'ক্রান্তি', সুভাষ মুখোপাধ্যাযেব 'স্বাগত', আই পি টি এ-ব 'নবান্ন' নাটক অনেক ঐতিহাসিক দলিলকে হার মানাবে ।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ভোগ ছাড়াও ভাবতীয কম্যুনিস্ট পার্টিব বিবোধিতা 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনকে কিছুটা দুর্বল করেছিল । রজনী পাম দত্ত সি পি আই-কে এক চিঠি লিখেছিলেন (২ আগস্ট ১৯৪২) যা 'দ্য পিপল্‌স ওযার'-এ ছাপা হয় । তাতে আছে—

"The general line is clear; maximum mass mobilisation against fascism; full cooperation in practical action with all who oppose fascism, irrespective of political differences; no action of the present rulers so long as they stand by the alliance to resist fascism, should deflect us from this line, which is in the interests, not merely of the world front of the peoples, but of the Indian people whose future cannot be separated from the world front of the peoples."

বোম্বাইতে ১৯৪৩-এর ২৩ মে সি পি আই-এব প্রথম কংগ্রেসে প্রস্তাব নেওয়া হয—"পঞ্চমবাহিনীতে যাবা বয়েছে তারা হল—ফরওযার্ড ব্লক, বিশ্বাসঘাতক বোসের দল ; সি এস পি যা যুদ্ধের প্রথমেই সমাজতন্ত্রেব প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, সুবিধাবাদ ও বিভেদমূলক নীতি অনুসবণ করে ও শেষে ট্রটস্কিপন্থী (!) বিশ্বাসহন্তাদের শিবিরে যোগ দেয ; এবং পরিশেষে ট্রটস্কিপন্থী গোষ্ঠী যারা ফাসিবাদীরা টাকা খাওয়া অপরাধীর দল । কম্যুনিস্ট পার্টি ঘোষণা কবছে যে এই তিন গোষ্ঠীকে প্রত্যেক সত্যকার ভারতীয় যেন জাতিব হীনতম শত্রুরূপে গণ্য কবে এবং রাজনৈতিক জীবন থেকে বিতাড়িত করে এবং নিশ্চিহ্ন কবে .."

(The Communist Party declares that all these three groups must be treated by every honest Indian as the worst enemy of the nation and driven out of political life and exterminated.)

ম্যাক্সওয়েল আশা করেছিলেন যোশী স্বরাষ্ট্র বিভাগের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলবেন এবং

তাঁরা কি করছেন খবর দেবেন। যোশী ১৫ মার্চ ১৯৪৩ তাঁর কাছে এক ব্যক্তিগত চিঠি ও এক ১২০ পাতার রিপোর্ট পাঠান। চিঠিতে তিনি জানাচ্ছেন কম্যুনিস্ট পত্র-পত্রিকা যেভাবে নাশকতামূলক কাজেব বিরোধিতা কবছে তা স্টেটসম্যান ও টাইমস অব ইণ্ডিয়াও করছে না। সবচেয়ে বড়ো কাজ তাঁরা যুদ্ধের জন্য উৎপাদন অব্যাহত রেখেছেন, কোথাও ধর্মঘট হতে দেননি। "আমবা ভাবতীয় দেশপ্রেমকে বাঁচিযে বেখেছি....আমরা না থাকলে সত্যকাব দেশপ্রেমী গোঁড়া পঞ্চমবাহিনীতে পবিণত হত· আমরা দেশকে খাদ্যদাবিতে দাঙ্গার হাত থেকে বক্ষা কবেছি.....বোম্বাই-এব পুলিশ কমিশনাব সাক্ষ্য দেবেন আমাদের খাদ্যবাবদ কাজ কত কার্যকব হযেছে।.... From the ranks of the people we are the only political party that FIGHTS (caps in original) the fifth column. Government repression feeds the fifth column, our propaganda and work isolate the fifth column from the honest patriots..."

রিপোর্টটিতে বলা হযেছে প্রায সব প্রদেশে সবকাবী (ব্রিটিশ) কর্মচাবীদেব সঙ্গে তাঁবা যোগাযোগ স্থাপন কবেছেন। মধ্যপ্রদেশে ফরওযার্ড ব্লক শ্রমিক নেতা রুইকব ১১ আগস্ট (১৯৪২) ধর্মঘটেব ডাক দেন—তাঁবা তা ব্যাহত কবেছেন। কিছু পবে অর্থনৈতিক দাবিতে আবাব ধর্মঘট ডাকবাব চেষ্টা কবেন রুইকব। কিন্তু "Through our work, we blew up this plan too." তাঁবা না থাকলে "Bombay would have gone up in smoke". খাদ্য বিতবণেব ব্যাপাবে রেড গার্ডবা প্রশংসনীয় কাজ কবছে—তা না হলে ভযাবহ দাঙ্গা হযে যেত। মাতুঙ্গা ও প্যাবেলের রেলওযে কর্মশালায কমবেডবা না থামালে সর্বনাশ ঘটতো। "Contrast Bombay and Jamshedpur to see what might have happened to Bombay but for the Communist Party....." ছাত্ররা তো সবাই প্রায কংগ্রেসেব খপ্পবে পড়ে গিযেছিল কিন্তু সববকম অপমান অপবাদ তুচ্ছ কবে কম্যুনিস্ট ছাত্র নেতাবা তাদেব নাশকতামূলক কাজ ও ধর্মঘট থেকে রক্ষা কবে। অন্ধ্রের কৃষ্ণা, পশ্চিম গোদাববী ও গুণ্টুব জেলা তো বিহার ও পূর্ব ইউ.পি-র মত বিদ্রোহ ঘোষণা করত। আমরা ছিলাম বলে তা সম্ভব হযনি। জামসেদপুবে প্রথম দিকে সুবিধে হযনি কাবণ ৩৫ জন কম্যুনিস্ট নেতা বহিষ্কৃত হয়েছিল, পার্টিব ওপব নিষেধ তুলে নেওযাব পবও তাদেব ওপর বহিষ্কারের আদেশ বলবৎ ছিল। "What happened at Jamshedpur after August 9?" সেখানে, একটা মূল যুদ্ধ উৎপাদন কেন্দ্রে, দু মাসেব ওপর ধর্মঘট চলেছিল! অথচ কম্যুনিস্টদেব সক্রিয়তাব ফলে এমন ঘটনা জামালপুব, গিবিডি বা ঝরিযায হযনি। আমবা কানপুবে লাগাতাব ধর্মঘট হতে দিইনি। দু তিন দিনেব মধ্যে কর্মীদের কাবখানায ফিরিয়ে এনেছি। "The example of Cawnpore is unique in India. Here was the industrial centre where the working class was most nationalist and Congress-minded. But the party was able to bring hold-up of production to an end within three days...."

কালিকট, পালঘাট, তেলিচেরিতে কৌশলে জাতীয নেতাদের মুক্তি দাবি করে আমরা কেরলে আন্দোলন হতে দিইনি। পঞ্জাবে বিবাট কিষাণ মোর্চা করে আমরা জনগণকে ফাসি-বিরোধী আন্দোলনের শামিল রেখেছি, এমনকি অনেক বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন সৈন্যদেরও ঠিক পথে রেখেছি। অমৃতসরে সুতাকলে ধর্মঘট হতে দিইনি, লাহোরের মুকুন্দ আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল ওয়ার্কসে ও সর্বত্র ছাত্রদের মধ্যে বিভেদ বাধিয়ে আমরা নাশকতার পরিমাণ কমিয়েছি। যোশীর চিঠিতে একটা অভিযোগ বারংবার ধ্বনিত হয়েছে। এত করার

পরও সরকার কিনা কম্যুনিস্টদেরই জেলে পুরছে !

এব ওপর রিচার্ড টটেনহ্যামের মন্তব্য খুবই মজার । 'The fact , however, is that the Communists are the sort of people who must always be 'anti' something rather than 'pro' anything (except, perhaps, themselves and a shadow entity called 'the people'). It would be something gained if we could at least drive them into the position of proclaimıng themselves openly as "anti-CSP and Forward Block"—or, in other words, "anti-left wing Congress." অর্থাৎ সরকার ও পার্টি পরস্পরকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করছিল : পার্টি—আপন প্রভাব প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারে, সরকার— তাদের দিয়ে প্রতিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে প্রচার চালাতে । সরকারই বেশি সফল হয়েছিল বোঝা যায় মে মাসের প্রথম পার্টি কংগ্রেসে যে পার্টি শাসনতন্ত্র বচিত হয় তার থেকে ১৯৩৪ সালের The Draft Platform of Action বিসর্জনে । তা ছাড়া অধিকাবী স্বীকাব করেন ১৯৪২-এর আগস্টের পর তাঁদের বচনায় একটা "বাম জাতীয়তাবাদী বিকৃতি" ধরা পডেছে । প্রথমত, দেশপ্রেমিক দলগুলি, বিশেষত, জাতীয় কংগ্রেসের নঙর্থক ও পবাজযকামী নীতিব সমালোচনা জোবদাব করা হযনি । দ্বিতীয়ত, উৎপাদন চালু রাখা হলেও "....We have failed so far ın rousing the working class to patriotıc mass enthusiasm for raising productıon and improving transpɔrt. We kept the peasant from harm's way but have not roused the kisan to the patriotic mass enthusiasm to grow more food." এইসব পড়ে টটেনহ্যামের মন্তব্য—"a marked improvement."[৪৪৭] পঞ্চমবাহিনীর বিরুদ্ধে ক্রোধ প্রধানত পডেছিল সুভাষ ও জয়প্রকাশের ওপর । এই প্রসঙ্গে দ্য পিপলস ওয়ার-এব ১০ জানুযারি, ২১ মার্চ ও ২৫ জুলাই সংখ্যা দ্রষ্টব্য । গান্ধীজীও বাদ যাননি । ১৯৪২-এর আগস্টেব আগে তাঁকে "The astute leader of the bourgeoisie" বলা হয়েছে, তাঁর "non-embarrassing non-cooperation" নীতিকে দেউলিয়া ও 'non-violent suicide' বলা হয়েছে । দ্য পিপলস ওয়াব-এব ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৪২-এব সুব কিন্তু সম্পূর্ণ বদলে গেল । 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন "makes the national movement the prey of bureaucratic provocation in the name of struggle." এর ফলে আসবে বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ । ১১ অক্টোবর ১৯৪২-এর সংখ্যায় বলা হল নাশক ও সত্যাগ্রহীর মধ্যে কোন বস্তুগত পার্থক্য নেই ; করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে—দেউলিয়া নীতি, ফাসিবাদীর কাছে বস্তুগত আত্মসমর্পণ ।

আরেকটা আক্রমণ এল অধিকারী থিসিসের মাধ্যমে অর্থাৎ পাকিস্তান দাবি সমর্থনের মাধ্যমে । এটি বোম্বাই কংগ্রেসে গৃহীত হয় ।[৪৪৮] যেহেতু জাতীয় প্রতিরক্ষা বর্তমান সংকটে সর্বাগ্রাধিকার পাবে এবং জাতীয় সরকার ছাড়া তা সম্ভব নয়, সেহেতু কংগ্রেস ও লীগের সমঝোতা প্রয়োজন । এজন্য লীগকে পাকিস্তান দাবির সার (essence) দিতে হবে । ঠিক এই সময় পাকিস্তান দাবি সমর্থন করে কম্যুনিস্ট পার্টি সরকারের হাতই শক্ত করে । ভারতের এক জাতিত্বের কথা বলে এসে হঠাৎ তা রাশিয়ার মডেলে বহুজাতিত্বের কথা পাড়ল । আরও বলা হল লীগ নেতৃত্ব আর 'সামন্ত-তান্ত্রিক প্রতিক্রিয়াশীল' নেই, এটা পরিণত হয়েছে শিল্পভিত্তিক বুর্জোয়া নেতৃত্বে এবং আপাতত তা সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা

কবছে।   অতএব তাদের দিতে হবে—"The right to self determination, the right of autonomous state of existence... accompanied by the unconditional right to political secession." কোথায় ১৯২৫ সালে লেখা স্টালিনের জাতি-সমস্যা-বিষয়ক নিবন্ধ এবং আবও পূর্বে ১৯১২ সালে লেখা জাতিব সংজ্ঞা আর কোথায় মুসলিম দ্বিজাতিত্বের দাবি। অধিকারী ভুলে গিয়েছিলেন স্টালিন তাঁব nationality-র সংজ্ঞায যে community of language and economic life-এর ওপর জোর দিয়েছিলেন জিন্নাব পাকিস্তানে তার অস্তিত্বও ছিল না। তাছাডা স্টালিন কি কোথাও ধর্মভিত্তিক জাতীয়তার কথা বলেছিলেন? ১৯১৭-১৮ সালে স্টালিন বলেছিলেন—বিচ্ছিন্নতার দাবি সমাজতান্ত্রিক সবকারের বিরুদ্ধে অচল। জর্জিয়ার জাতীযতাবাদী বিচ্ছিন্নতাব দাবি তিনি টিপে মেরেছিলেন। ১৯৩৬-এব সোভিয়েত শাসন সংস্কারে স্বনিয়ন্ত্রণের অধিকাব স্বীকার করার পর কত সংখ্যালঘু জাতিকে কাজাকিস্তান, সাইবেবিযা পাঠানো হয তার ইয়ত্তা নেই। আজ আর্মেনিযা ও আজার বাইজানের জাতিগত সংঘর্ষ তাবই ফলশ্রুতি।

আবও সাংঘাতিক কথা—অধিকারী অন্ধ্র, কর্ণাটক, তামিল, বাংলা, মাবাঠা প্রভৃতি জাতিকেও এই নীতিব অন্তর্ভুক্ত কবতে চেযেছিলেন। এতখানি 'বল্কানাইজেশনে'র কথা ক্রিপসও ভাবতে পারেননি। অথচ এতে নাকি "মাতৃভূমির বিভাগ" কখনই আসবে না—"উচ্চতব এক স্তরে উচ্চতব এক ঐক্য" আসবে। আশ্চর্য নয়, ১৯৪৩-এর ডিসেম্বরে করাচী লীগ সম্মেলনে জিন্না পার্টিব এবংবিধ কার্যকলাপকে উপহাস করেছিলেন। টটেনহ্যামেব মন্তব্য—"It will be interesting to see how People's War reacts to Jinnah's 'hand-off' warning to the Communists...."

তবু সন্দেহ নেই, জনযুদ্ধেব জিগির তুলে, 'ভাবত ছাড়ো' সমর্থকদের পঞ্চমবাহিনী ঘোষণা কবে, শ্রমিকদেব ধর্মঘট থেকে দূরে বেখে, দেশ ভাগের প্রস্তাব এনে—তাঁরা যে ভূমিকা পালন কবেছিলেন, তাতে ম্যাক্সওয়েল-টটেনহ্যামবা মজা পেলেও বুদ্ধিজীবীরা বিভ্রান্ত হযেছিলেন। হযতো সমব সেন এ দলে পড়েন না। তাঁর '২২শে জুন' কবিতা পঠিতব্য। সতীনাথ ভাদুড়ী ও সুবোধ ঘোয তো প্রতিবাদই করেছিলেন। সতীনাথের বিলু ও নীলু এখনও উভয পক্ষেব প্রতীক হয়ে আছে।

॥ ১৬ ॥

প্রশ্ন উঠবে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনেব বিবোধিতা কবে কম্যুনিস্টরা কি দেশদ্রোহেব অপরাধ করেছিল? ১৯৪২-এব ৮ আগস্ট বোম্বাই এ আই সি সি-তে যখন তেব জন কম্যুনিস্ট সদস্য বিরুদ্ধ-ভোট দিলেন, তখন গান্ধী বলেছিলেন, "যে তের জন বন্ধু প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করেছেন আমি তাঁদের অভিনন্দন জানাই। এতে লজ্জা পাবাব কিছু নেই। গত বিশ বছর আমরা শিখতে চেষ্টা করছি অত্যন্ত আশাহীন সংখ্যালঘুতে পবিণত ও উপহসিত হলেও সাহস না হারাতে। আমবা নিজেদের বিশ্বাস আঁকডে ধবতে শিখেছি, আমরা ঠিক পথে চলেছি এই অবস্থায়। It behoves us to cultivate this courage of conviction, for it ennobles man and raises his moral stature. I was, therefore, glad to see these friends had imbided the principle

which I have tried to follow for the last fifty years and more."[৪৪৯] কিন্তু জেল থেকে বেরিয়ে বহু সূত্রে কম্যুনিস্টদের বিরোধিতা, এমনকি আত্মগোপনকারী কংগ্রেস কর্মীদের খবর গোয়েন্দা দফতরের হাতে তুলে দেবার অভিযোগ পেয়ে তিনি মর্মাহত হন। পি সি যোশীর সঙ্গে তাঁর যে পত্রালাপ হয় তাতে ক্রোধের চেয়েও কম্যুনিস্টদের বক্তব্য বুঝবার চেষ্টা প্রকট।[৪৫০] ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৪৪ ও ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫-এর চিঠিতে যোশী অভিযোগ এনেছিলেন যে, কংগ্রেসীরা তাঁদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ প্রচার করছে, তাঁদের দেশপ্রেম নির্ভেজাল প্রমাণ করাব দায়িত্ব যেন কংগ্রেসের।[৪৫১] গান্ধী সব কাগজপত্র ভুলভাই দেশাইকে পরীক্ষা করে দেখতে বলেন। ১৯৪৫-এর ২০ আগস্ট তিনি মত দেন যে, যোশী নিজেই স্বীকার করেছেন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রচারের কথা। গান্ধী তারপরও ওয়ার্কিং কমিটির এক সাব কমিটি (নেহরু, প্যাটেল ও পন্থ)-কে দিয়ে কম্যুনিস্ট পার্টির অভিযোগ খতিয়ে দেখার ব্যবস্থা করেছিলেন।

কিন্তু কম্যুনিস্টদেব মধ্যেই অনেকের বিবেক পীড়া দিচ্ছিল। প্রথম কংগ্রেসে (১৯৪৩) যোশী যতই প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাব বন্দনা গান, জাপানী চরদের বিরুদ্ধে লড়াই ও উৎপাদন বৃদ্ধির সাফাই গান, নাম্বুদ্রিপাদের ভাষায়, "It amounted to a softening of the Party's anti-imperialism in politics and militancy in economic struggles."[৪৫২] ঘটনাব চার দশক পরে নির্মোহ বিশ্লেষণ কবতে গিয়ে তিনি ভুল স্বীকার করেছেন। তখন মনে হয়েছিল সমাজতন্ত্রের পিতৃভূমি বাশিয়াব পক্ষ নিতে গিয়ে আন্তর্জাতিকের শবিক সি পি আই-কে যদি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভারতীয় জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হয় তবু সে মূল্য দিতে হবে। এখন মনে হচ্ছে প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাব বিচারেই এবংবিধ সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত। দ্বিতীয় ভুল হযেছিল সমালোচনা ও আত্মসমালোচনাব পদ্ধতি ত্যাগ করে যোশী-নেতৃত্বেব নির্বিচাব অনুসবণ। অনেকের মনে দ্বিধা ছিল, শুধু বাশিয়াব কথা ভেবে তারা দেশবাসীব সন্দেহ ও ঘৃণা সহ্য কবেছে। এর অনিবার্য প্রতিক্রিয়া—১৯৪৬-এর রণদিভে প্রবর্তিত অতিবামনীতি।[৪৫৩]

পাকিস্তান ব্যাপাবে অধিকাবী থিসিসও ভ্রান্ত ছিল। এতে লীগের দেশভাগেব প্রস্তাব ও কংগ্রেসের দেশভাগ বিবোধিতাকে সমমূল্য দেওযা হয়েছিল। অথচ সামান্য কথাটা পার্টি ভুলেছিল—লীগ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মদত পাচ্ছে আব কংগ্রেস তাকে প্রতিবোধ কবছে (যদিও শেষ পর্যন্ত পাবেনি)।

"The essence of the mistake committed by the Party was that, as opposed to the Marxist-Leninist stand that the question of nationalities should be dealt with not abstractly but as part of the class political question (India's freedom struggle in this case), the CPI failed to take due account of the real class and national situation in the country. Equating the League demand for the division of India with the Congress opposition to it, meant putting on par an avowedly pro-imperialist section of the bourgeoisie with its oppositional, though compromising, rival in the same class—a stand which is clearly impermissible for Marxists-Leninists."[৪৫৪]

সরোজ মুখোপাধ্যায়ের রচনায় ই এম এস-এর আত্মসমীক্ষা নেই। মনে হয় অধিকারীব 'পাকিস্তান ও স্বাধীন ভারত' থিসিস এবং রণদিভের 'ঐক্যের পথে মুসলিম লীগ' থিসিস

তিনি সমর্থন করেন আজও,[৪৫৫] বিশ্বাস করেন "সম্মিলিত জাতির জনগণের সাথে কাঁধে কাঁধ দিয়ে দেশরক্ষা"ই স্বাধীনতার একমাত্র পথ ছিল।[৪৫৬] পিপলস্ রিলিফ কমিটির মাধ্যমে দুর্ভিক্ষ ত্রাণে ঝাঁপিয়ে পড়ে, চোরাবাজারী মজুতদারীর বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়ে, কংগ্রেস নেতাদের নিঃশর্ত মুক্তি চেয়ে, জাতীয় প্রতিরক্ষার জন্য জাতীয় সরকার দাবি করে, সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি, ফাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ গঠন করে পি সি যোশী সমালোচনার মোড় বেশ কিছুটা ঘুরিয়ে দিতে পেরেছিলেন। তাঁদের দাবি ছিল পার্টিই দেশকে বাঁচাবে, এমনকি ধ্বংসমূলক কাজ থেকে কংগ্রেস 'দেশভক্ত'দের সরিয়ে নেবে। অবশ্যই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু এর মানবিক দিকটাও প্রশংসার্হ। জনরক্ষা সমিতি ও মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র মাধ্যমে গণসংযোগ আরো ভাল হয়েছিল ঠিকই কিন্তু রিলিফ কমিটিগুলির একযোগে ত্রাণকার্যে তারা বড় অংশ নেয়। ফাসিবিরোধী লেখক সঙ্ঘের প্রাণপুরুষ বিষ্ণু দে, তারাশঙ্করের মত লেখক ও যামিনী রায়ের মত শিল্পীকে টানতে পেরেছিলেন। এঁদের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪২-এর ১৯ ও ২০ ডিসেম্বর—তারাশঙ্করের সভাপতিত্বে। সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি চালাতেন প্রবীণ ভূপেন দত্ত, জ্যোতি বসু, ভূপেশ গুপ্ত, গোপাল হালদার প্রমুখ। এ ছাড়া ছিল কিশোর বাহিনী, যার অন্যতম ছিলেন কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য।[৪৫৭]

আমরা আগে দেখিয়েছি ম্যাক্সওয়েল কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির দাবি ও জাতীয় সরকারের দাবি পছন্দ করেননি, এবং যোশী এ-বিষয়ে সুর নামিয়ে আনেন। জ্যোতি বসু তাঁর আত্মকথা—'জনগণের সঙ্গে'তে—পার্টি অফিসের ওপর হামলা, কমরেডদের ওপর দৈহিক আক্রমণ, বিশেষ করে ঢাকার সোমেন চন্দের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ওপর জোর দিয়েছেন।[৪৫৮] কিন্তু কংগ্রেসের অনুপস্থিতিতে বঙ্গমঞ্চ পেয়ে তাঁরা কম লাভবান হননি। নিচে সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধির হিসাব দেওয়া হল।[৪৫৯]

বছর	কম্যুনিস্ট পার্টির সভ্যসংখ্যা
১৯৩৩	১৩৩
১৯৪২ (জুলাই)	৪,৪০০
১৯৪৩ (১ মে)	১৫,৫৬৩
১৯৪৪ (১ মে)	৫১,১২৫

ব্রিটিশ দমননীতি ও কম্যুনিস্ট পার্টির বিরোধিতাই ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ব্যর্থতার প্রধান কারণ নয়। প্রধান কারণ—আন্দোলনের কালানৌচিত্য (wrong timing)। মনে থাকতে পারে সুভাষ বসু ১৯৩৯ এই ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন শুরু করতে বলেছিলেন এবং গান্ধী সাম্প্রদায়িকতা ও প্রস্তুতির অভাবের অজুহাতে তাতে বাধা দিয়েছিলেন। ১৯৩৯-এর ভারতে ব্রিটিশ সামরিক শক্তির দুর্বলতার পরিপ্রেক্ষিতে সুভাষবাবুর কথা ফেলবার মত নয়। ১৯৪০ সালে ইউরোপীয় রণাঙ্গনে শোচনীয় পরাজয়ের পর তাদের মনোবলও শূন্যে ঠেকেছিল। অথচ কালহরণের ফলে ১৯৪২-এর আগস্টের পূর্বেই ব্রিটিশ সমরসজ্জা অনেক বেশি প্রসারিত ও সুসংহত হয়েছিল, মার্কিন সৈন্য দলে দলে তার বলবৃদ্ধি করছিল।

দ্বিতীয়ত, কংগ্রেসের অজ্ঞাতে বিশ্বের বিভিন্ন রণাঙ্গনে মিত্রশক্তি যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। ১৯৪২-এর ২৭ মে অ্যাফ্রিকায় এল এলামিনের যুদ্ধে অক্ষশক্তির অগ্রগতি রুদ্ধ হয়েছিল। নভেম্বরে মন্টাগোমারি রোমেলের বাহিনীকে মিশর থেকে বিতাড়িত করেছিলেন ও আইজেনহাওয়ার ফরাসী উত্তর অ্যাফ্রিকায় অভিযান শুরু করেছিলেন। ১৯৪২-এর আগস্টে জার্মেনী স্তালিনগ্রাদে যে আক্রমণ চালায় রাশিয়া তার উত্তর দেয় সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বরের মধ্যে। ১৯৪৩-এর প্রথমেই লেনিনগ্রাদের সতের মাসের অবরোধের অবসান ঘটে। জার্মানিরা বসন্তকালে পুনরাক্রমণ করলেও গ্রীষ্মকালে রুশ প্রতিরোধ তুঙ্গে ওঠে এবং অক্টোবরে রুশ বাহিনী নিপার নদী পর্যন্ত দখল করে নেয়। ১৯৪১-এর ৭ ডিসেম্বর পার্লহারবারে আকস্মিক আক্রমণের পর এশিয়ায় জাপানের অগ্রগতি ছিল বিস্ময়কর। ১৯৪২-এর ফেব্রুয়ারিতে সিঙ্গাপুর, মার্চে ব্যাটাভিয়া, মে-তে মান্দালয় এর পতন ঘটে। কিন্তু ৭ মে কোরাল সি-র এবং ৪-৭ জুনের মিডওয়ে আইল্যাণ্ডের নৌ ও আকাশযুদ্ধ জাপানী নৌবহরের ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানে। ১২ নভেম্বর সলোমন আইল্যাণ্ডসের নৌযুদ্ধ জাপানকে আরও দুর্বল করে তোলে। ভারতবর্ষ আক্রমণের শক্তি আর তাদেব ছিল না।ইতস্তত বোমাবর্ষণ করে তারা অহেতুক একটা ভয় জাগিয়ে রেখেছিল। অতএব যদি জাপানী অভিযানের আশায় কংগ্রেস নেতারা 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন শুরু করে থাকেন তবে তাঁরা নিদারুণ কৌশলগত ভুল করেছেন। বলা বাহুল্য, সুভাষচন্দ্রেবও একই ভুল হয়েছিল। জার্মেনীর সাহায্য পাবেন বলে ১৯৪১ থেকে ১৯৪৩ নিরর্থক তিনি বার্লিনে বসে থাকেন। রাশিয়া আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বুঝেছিলেন জার্মেনীর কাছে সাহায্যেব আশা তিরোহিত। কিন্তু জাপান যাত্রা কবতে অসম্ভব দেরি হল (অবশ্য তাঁব দোষ নেই) এবং যখন তিনি জাপান পৌঁছলেন তপন জাপানের নৌ ও বিমানবহর বিপর্যস্ত। যুদ্ধে মিত্রশক্তি হারতেই থাকবে এই আশায় যদি কংগ্রেস ও সুভাষচন্দ্র জুয়ো খেলে থাকেন তবে ভাগ্য তাঁদের বিরুদ্ধে যেতেই পারে। আজও বোঝা যায় না কেন গান্ধী একটা short and sharp struggle-এর আশা করেছিলেন

কালানৌচিত্য ছাড়া আবও ত্রুটি ছিল—পরিকল্পনার অভাব। এটা অবশ্য ১৯২০, ১৯৩০-এও লক্ষ্য করি। গান্ধী 'অন্তরেব আলো' বা বোধিব ওপব অত্যধিক নির্ভব কবতেন। কিন্তু সত্যাগ্রহও একরকমের যুদ্ধ—তারও স্ট্র্যাটেজি ও ট্যাকটিকস আছে। সে সম্বন্ধে চিরদিনই তিনি ছিলেন নেহরুর ভাষায়, "delightfully vague"। অন্যদিকে প্রতিপক্ষ যুদ্ধারম্ভ থেকেই প্রস্তুত হতে শুরু করে—বড়লাট ও ভারত সচিবেব চিঠিপত্রে কংগ্রেস আন্দোলনেব বিরুদ্ধে সব সম্ভাব্য কৌশল আলোচিত হয়েছিল। রাজন্যবর্গ, লীগ, কম্যুনিস্ট পার্টি—অন্তত এই তিনটি প্রাকার তাঁরা খাড়া কবেছিলেন—পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী ছাড়া। দ্বিতীয়ত, গান্ধী কেন তৃতীয় সারির নেতা স্থির করে গেলেন না? কেন ভাবলেন, লিনলিথগো আরুইনের মতই তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালাবেন, তিনিও ধীরে সুস্থে আন্দোলনের গতি, প্রকৃতি নেতৃত্ব নির্ধারণ করবেন? উইলিংডনকে দেখেও কি তাঁর শিক্ষা হয়নি? যদি সব নেতা গ্রেফতার হন তবে প্রত্যেক ভারতীয় হবে নিজে নেতা—এ তো দায়িত্বহীন উক্তি। নৈরাজ্যবাদী তিনি, হয়তো বিশ্বাস করতেন—নৈরাজ্যের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠবে একটা শৃঙ্খলা, দেখা দেবে কোনো অজ্ঞাত অখ্যাত নেতার দল। জাপানী অভিযানের আসন্ন সম্ভাবনার মুখে ব্রিটেন ঝুঁকি নেবে না, নেতাদের মুক্তি দেবে, আলোচনায় বসবে। ঠিক তার উল্টোটা হল—কংগ্রেসী হিংসার জবাবে সরকার জানাল 'সিংহসুলভ হিংসা'।

হয়তো এই আন্দোলন সুভাষের কাছে গান্ধীর অতিবিলম্বিত ত্রুটি স্বীকার। আজাদ

লিখেছেন, সুভাষ জার্মেনী পালাবার পর গান্ধীজির তাঁর প্রতি মনোভাবের পরিবর্তন হয়। "Many of his remarks convinced me that he admired the courage and resourcefulness Subhas Bose had displayed in making his escape from India. His admiration for Subhas Bose unconsciously coloured his view about the whole war situation."[৪৬০]

ফলাফলের দিকে দিয়ে বিচার করলে ১৯৪২-এর বিদ্রোহ তুল্যমূল্য। কংগ্রেস মন্ত্রিসভা (কম নয়, সাত সাতটি প্রদেশে) পদত্যাগ করায় উন্নয়নমূলক কর্মধারা তো ব্যাহত হলই, আবার ফিরে এল আমলাতন্ত্র তার পুরোনো মহিমায়। দ্বিতীয়ত, লীগের হাত আরও শক্ত হল। এখন থেকে লিনলিথগো কংগ্রেস ও লীগকে সমান মর্যাদা দিতে আরম্ভ করেন। ওয়াভেল এই নীতিকে আরও সম্প্রসারিত করে গান্ধী ও জিন্নাকে সমান মর্যাদা দেন। বস্তুত উভয় বড়লাট গান্ধীর কাজকে বিশ্বাসঘাতকতা মনে করতেন এবং কোনদিনই তাঁকে বা কংগ্রেসকে ক্ষমা করতে পারেননি। চার্চিল ও এমেরির বীতরাগ তো আগে থেকেই ছিল, তার সঙ্গে যুক্ত হল অ্যাটলির বীতরাগ।

১৯৪২-এর শেষে গান্ধী বড়লাটকে জানান, যদি না বড়লাট তাঁর ভুল দেখিয়ে দেন তিনি "অনশন দ্বারা দেহকে ক্রুশবিদ্ধ" করবেন। ১৯৪৩-এর ১৩ জানুয়ারি বড়লাট উত্তব দেন, "যা ঘটেছে তাব পরিপ্রেক্ষিতে যদি আপনি প্রত্যাবর্তন করতে চান ও গত গ্রীষ্মেব নীতি থেকে নিজেকে সবিয়ে নেন, আমাকে জানাবেন। তাহলে আমি তা বিবেচনা কবব।' তদুত্তরে গান্ধী ৯ আগস্টের পরবর্তী সমস্ত ঘটনার দায়িত্ব ভারত সবকারেব ওপব চাপালেন। "(1) If you want me to act singly, convince me that I was wrong and I will make amends ; (2) If you want me to make a proposal on behalf of the Congress you should put me among the Working Committee members." বড়লাট অবশ্যই এ প্রস্তাব নিলেন না বরং দোষ স্বীকার ও ভবিষ্যতের জন্য আশ্বাস দাবি করলেন। গান্ধী বললেন, সরকারই "goaded the people to the point of madness." তিনি ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে একুশ দিন অনশনের হুমকিও দিলেন এবং ৯ ফেব্রুয়াবি অনশন আরম্ভও করলেন। চার্চিলের কাছে ভারতীয় নেতাদের আবেদন ব্যর্থ হলে তিনজন কাউন্সিল সদস্য পদত্যাগ করলেন এবং (কংগ্রেস ও লীগ ব্যতীত) এক সর্বদলীয় সভা সাপ্রুব সভাপতিত্বে বসল। সভা গান্ধীর তাৎক্ষণিক বিনাশর্ত মুক্তি দাবি করল। লিনলিথগো অনড় রইলেন। তিনি এটাকে অভিনয় মনে করছিলেন। গান্ধীজির অবস্থা মাঝখানে খুব খারাপ হয় কিন্তু শেষপর্যন্ত দেহের ওপর জয়ী হন তিনি। সর্বদলীয় সভা প্রতিনিধি পাঠাতে চাইলে বড়লাট প্রত্যাখ্যান কবেন ও জানান—যতদিন গান্ধী বা কংগ্রেস মনোভাব না বদলান, তাঁদের সঙ্গে কাউকে দেখা করতে দেওয়া হবে না। বড়লাটের অনমনীয় অবস্থান লীগের অভিনন্দন পায়।

১৯৪৩-এর প্রথমে ভারত সচিব লিখছেন, তিনি কোন রাজনৈতিক নেতার পেছনে ছুটতে রাজি নন। তাতে একসিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যদের মনোবল ক্ষুণ্ণ হবে। তা ছাড়া দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা গঠন করলে রাজন্যবর্গ ও মুসলমানরা ভয় পেতে পারে।[৪৬১] রুজভেল্টের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি, উইলিয়াম ফিলিপস, এই সময় অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের জন্য চাপ দিচ্ছিলেন।[৪৬২] এমেবি মার্কিন চাপের কাছে নতি স্বীকার করেননি।[৪৬৩] গান্ধী যখন জেলে অনশন শুরু করলেন তখন চার্চিল মন্তব্য করেন অত্যন্ত অশোভন ভাষায়—"It now seems almost certain that the old rascal will emerge

all the better from his so-called fast."[৪৬৪] বড়লাট সব ব্যাপারটাকে মুক্তিলাভের জন্য অভিনয় মনে করতেন এবং তা বানচাল করে আত্মতৃপ্তি অনুভব করেছিলেন : "We have exposed the Light of Asia—Wardha version—for the fraud it undoubtedly is : blue glass with a tallow candle behind it" !![৪৬৫] ১৯৪৩-এর সেপ্টেম্বরে বড়লাট মনোনীত হয়ে ওয়াভেল ক্রিপসেব অন্তবর্তী প্রস্তাব পুনর্বিবেচনা করতে বলেন। চার্চিল তখন অ্যাফ্রিকায়। ক্রিপ্‌স, হ্যালিফ্যাক্স ও এমেরি তাঁর পক্ষ নিলেও সহকারী প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি (শ্রমিক দলের নেতা হলেও) রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে (বিশেষত কংগ্রেসের সঙ্গে) আলোচনায় বসতে রাজি হননি।[৪৬৬] অর্থাৎ দলনির্বিশেষে ব্রিটেনের কেউই 'ভাবত ছাড়ো' আন্দোলনকে সুচক্ষে দেখেনি। এমেরি মে মাসেও মনে করছেন, ভাবত হারালে মধ্যপ্রাচ্যে ও ভারত মহাসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলে ব্রিটিশদের পরিস্থিতি দুর্বলতর হবে। "Asia will anyhow be the danger zone of the future, and I can think of nothing more likely to bring about a third world war than an Indian Empire in dissolution."[৪৬৭]

৪২'-এর আন্দোলন সরকাবের বিশেষ ক্ষতি করতে পারেনি ববং লীগের প্রভাব বাড়িয়েছিল। প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার পদত্যাগের সিদ্ধান্ত কংগ্রেসেব পক্ষে একটা ভুল পদক্ষেপ। মন্ত্রিসভায় থেকেও যুদ্ধে সাহায্য না কবা চলত এবং তখন যদি গভর্নবরা মন্ত্রিসভা বরখাস্ত করতেন (নিশ্চয়ই করতেন), তখন কংগ্রেসেব রাজনৈতিক লাভ হত। আসামে মহম্মদ শাদুল্লার নেতৃত্বে এক যৌথ মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। ১৯৪১-এর ডিসেম্বব রোহিণীকুমার চৌধুবী শিক্ষামন্ত্রিত্বে ইস্তফা দিযে নতুন এক দল গড়েন। ফলে শাদুল্লাব পতন ঘটে ও ৯৩ ধারার শাসন চালু হয। কংগ্রেসেব সাহায্য পেলেই রোহিণী চৌধুবী মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারতেন। কিন্তু গভর্নর স্যার ববার্ট বীড ও স্যাব অ্যানড্রু ক্লো কিছুতেই যুদ্ধবিরোধী কংগ্রেসকে কোয়ালিশানে ঢুকতে দিতে বাজি হননি। শেষ পর্যন্ত ইউবোপীয় সদস্য (সবাই চা বাগানেব মালিক)-দেব সহাযতায ১৯৪২-এব আগস্টে শাদুল্লা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেন। From Planter Raj to Swaraj গ্রন্থে এব বিশদ বিববণ মিলবে। সিন্ধুতে আল্লা বক্স 'খান বাহাদুব' ও 'ও· বি ই' উপাধি ত্যাগ করলে ক্রুদ্ধ বড়লাট তাঁর সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও স্যাব হিউ ডাওকে দিযে তাঁকে ববখাস্ত কবান। তখুনি লীগের সহায়তায় গুলাম হুসেন হিদায়েতুল্লাকে মন্ত্রিসভা গঠন কবতে দেওযা হয়। এতে জিন্না বলতে পারেন সিন্ধুতে পাকিস্তান-নীতি জয়ী হযেছে। সিন্ধু বাজনীতি অসংখ্য উপদল ও প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তিব নিরন্তর কলহে এমন ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি করেছিল যে বিধান সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে নির্লজ্জ উৎকোচই যথেষ্ট ছিল। একথা বডলাটকে লেখা ডাও-এব বিভিন্ন পত্রে স্পষ্ট। ১৯৪৩-এর মে-তে আল্লা বক্স বহস্যজনকভাবে নিহত হন। গুলামকে টিঁকিয়ে রাখতে জিন্না খুড়ো ও সায়েদকে লীগ ওয়ার্কিং কমিটিতে নেন।

বাংলাব রাজনীতি জটিল মোড নিল ১৯৪১-এর শেষে। ডিফেন্স কাউন্সিলের সদস্যপদ গ্রহণ নিযে হকেব সঙ্গে জিন্নার মতান্তর ঘটলে হক লীগেব সদস্যপদ ত্যাগ করেন। এই প্রসঙ্গে লীগের সচিবকে লেখা চিঠিতে তিনি জিন্নার অনুসৃত নীতি বাঙালী মুসলিমদের স্বার্থবিরোধী বলেছিলেন।[৪৬৭ক] সুরাবর্দী প্রকাশ্য সভায এই প্রসঙ্গে তুললে হকের দল তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব তোলে। মনান্তর তীব্রতর হলে হকের দল কোয়ালিশন ত্যাগ কবে প্রগ্রেসিভ অ্যাসেম্বলি পার্টি তৈরি করেন। লীগ মন্ত্রীরা অনাস্থা প্রস্তাব এড়াবার জন্য ১

ডিসেম্বর পদত্যাগ করলে শরৎ বসু ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যাযেব সহাযতায হক নূতন দল গড়েন। তিনি যেদিন মন্ত্রিসভা গঠনেব নির্দেশ পান (১১ ডিসেম্বব ১৯৪১), সেদিন প্রত্যুষেই শবৎ বসুকে ভারত প্রতিরক্ষাবিধিতে গ্রেফতার করা হয। এই সময়কাব ঘটনা জিন্নাকে লেখা নাজিমুদ্দিনেব ১৪ ডিসেম্বব ১৯৪১-এব পত্রে বিধৃত আছে।[৪৬৭খ] তিনি খুবই আশা করেছিলেন তাঁকেই মন্ত্রিসভা গঠন করতে ডাকা হবে। তিনি ছোটলাট ও ইউবোপীয সদস্যদের দোষ দিচ্ছেন—তাঁরা প্রথমে তাঁকে সমর্থন কববেন বলেও পিছিয়ে যান। **"The main consideration which led H. E. (Herbert) to this decision was the fact that if he asked me (Nazimuddin) to form the ministry his position with the Hindus would be bad."**

মুসলিম লীগ মন্ত্রীবা হকের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আনলেন এবং জিন্না বাধ্য হলেন তাঁকে লীগ থেকে বহিষ্কৃত করতে। নাগপুরে ওযার্কিং কমিটি এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করল। জিন্নার পক্ষে সমস্যা হল কি করে বাংলায তিনি লীগেব হৃত গৌবব পুনঃস্থাপন কববেন। হকের প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশনের সংগঠন ছিল একপ

সারণী-১

প্রোগ্রেসিভ অ্যাসেম্বলি পার্টি	৪২
কংগ্রেস (বসু দল)	২৮
কৃষক প্রজা	১৯
হিন্দু মহাসভা	১৪
নির্দল তপসিলী	১২
অ্যাংগ্লো ইণ্ডিয়ান	৩
শ্রম	১
	১১৯

সবকারী কংগ্রেস (কিরণশঙ্কব বায় চালিত)-এব ২৫ জন সদস্য বাইরে থেকে সাহায্য করবেন বলেছিলেন।

এখানে জিন্নাব সম্ভাব্য সমর্থনেব উৎস ছিল দুটি—(১) নাজিমুদ্দিন ঢাকা নবাব অক্ষ, (২) সুরাবর্দিব কলকাতা-ভিত্তিক উপদল। দুঃখের বিষয নানা কাবণে হক ও হার্বার্টেব মনোমালিন্য বেড়ে যায়। সিভিলিয়ানদের সঙ্গেও তাঁব সম্পর্ক ভাল ছিল না। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন কালে কাঁথি ও তমলুকে দমননীতিব অপপ্রযোগ নিয়ে হক বিচাব বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিলে হাবর্টি ক্ষুব্ধ হন। ১৫ ফেব্রুয়াবি (১৯৪৩)-এর এক চিঠিতে তিনি জানান এসব বিষয় তাঁব বিশেষ দায়িত্বেব আওতায়। ১৬ই এর এক কড়া জবাব দিয়ে হক ছোটলাটকে রাগিয়ে দেন। পদত্যাগেব পর শ্যামাপ্রসাদ যে বিবৃতি দেন তাতে মন্ত্রীদেব পরামর্শ অগ্রাহ্য করে সিভিলিয়ানদের কথা শোনা হচ্ছে এমন অভিযোগ ছিল। হকও তাব ব্যতিক্রম নয।[৪৬৭গ] যেমন উপকূলবর্তী অঞ্চল থেকে উদ্বৃত্ত ধান চাল সবাবার আদেশ তাঁর মাথার ওপর দিয়ে জানানো হয়েছিল এবং চট্টগ্রামে লীগের অপকর্ম জানা সত্ত্বেও মুখ্যসচিব ব্ল্যাণ্ডি তার সম্বন্ধে কমিশনারকে নীরব থাকতে বলেন। দ্বিতীয়ত, তমলুক ও কাঁথিতে দমননীতির অপপ্রয়োগে ক্ষুব্ধ শ্যামাপ্রসাদ পদত্যাগ করলে হক দুর্বল হয়ে পড়েন। তদুপরি

ফরোয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে তাঁর সমঝোতা গভীর ছিল না।[৪৬৮] তৃতীয়ত, লীগ তাঁর ওপর খাদ্যাভাবের দায়িত্ব, কিশোরগঞ্জ মসজিদে মুসলিমদের ওপর গুলিচালনার দায়িত্ব চাপাতে থাকে। চতুর্থত, টাকার খেলাও হকের বিরুদ্ধে যায়। ইসপাহানি লিখছেন, "ভোটের দাম এখন হাজার টাকা চলছে। আমরা (লীগ) আইন সভায় দিন দিন প্রবলতর হচ্ছি।"[৪৬৯] ২৩শে তমিজুদ্দিন খাঁ অনাস্থা প্রস্তাব আনেন। ২৪ মার্চ হকের দলে ছিল ১১৬ জন সদস্য। দুদিনের মধ্যে হকের সমর্থন কমে দাঁড়ায় ১০৯। বড়লাট এবং জিন্না[৪৭০] লীগকে তখুনি ক্ষমতায় আনতে চাননি। কিন্তু মুখ্যত ইউরোপীয় সদস্যদের কথায় ও নিজের ঝাল ঝাড়তে এ ভার নিলেন হার্বার্ট। ২৮ মার্চ জাতীয় মন্ত্রিসভা গঠন করা হবে ভাঁওতা দিয়ে তিনি হককে পদত্যাগ করতে বাধ্য করলেন। একথা ২৯ মার্চ আইন সভায় হক নিজেই বলেছেন। লীগের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দেন স্পীকার আইনসভা অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি করে দিয়ে। ২৪ এপ্রিল পর্যন্ত লাট শাসন চলে। ২ এপ্রিল ইসপাহানি জানাচ্ছেন, নানা রকম লোভ দেখিয়ে পনের জন "Cursed Muslim rascals" (ঠিক কথাই বলেন তিনি)-কে পক্ষে আনা গেছে। শেষে এরকম সব লোক, ইউরোপীয় সদস্য ও (যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের) তফসিলী সদস্যদের নিয়ে একটা সংখ্যাগরিষ্ঠতা খাড়াও করেন নাজিমুদ্দিন। মন্ত্রিসভায় এগার জনের স্থানে তের জন নিয়ে ও ষোলটি (!) নতুন পার্লামেণ্টারী সচিবেব পদ সৃষ্টি কবে এ মহৎকার্য তিনি সম্পন্ন করেন। নিম্নে সরকার ও বিপক্ষের সদস্য তালিকা দেওযা হল।

সারণী-২

সরকার পক্ষ		বিপক্ষ	
মুসলিম লীগ	—৭৯	সরকারী কংগ্রেস	—২৫
তপসিলী	—২০	বসু কংগ্রেস	—১৯
বাংলা স্বরাজী	— ৫	প্রোগ্রেসিভ	—২৪
নির্দল	— ৪	কৃষক প্রজা	—১৭
ইউরোপীয	—২৫	তপসিলী	— ৮
শ্রম	— ২	ন্যাশানালিস্ট	—১৩
অ্যাংগ্লো ইণ্ডিয়ান	— ৪	নির্দল	— ১
ইণ্ডিয়ান খ্রীশ্চান	— ১	ইণ্ডিযান খ্রীশ্চান	— ১
	১৪০		১০৮

যদিও সুরাবর্দিকে ক্যাবিনেটে রাখা হয়েছিল তখনও নবাবরা দলে ভারী। ফলে সুরাবর্দি-সাহাবুদ্দিনের দল ফুঁসছিল। ইস্‌পাহানি জিন্নাকে কলকাতা এসে মদত দিতে বলেন—না হলে নতুন মন্ত্রিসভা "তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়বে।"[৪৭১] অতখানি ইউরোপীয় সমর্থনের ওপর নির্ভর করা জিন্নার মনোমত হয়নি। তা ছাড়া এমন এক সময় নাজিমুদ্দিন মুখ্যমন্ত্রী হন যখন দুর্ভিক্ষের সব দায় তাঁর ঘাড়েই পড়ে। আর মুখ্যমন্ত্রী হতে না পেরে সুরাবর্দির উপদল বিধানসভার বাইবে শক্তি সংগ্রহে মন দেয়। ১৯৪৩-এর নভেম্বরে প্রাদেশিক লীগের বার্ষিক সভায় নাজিমুদ্দিন-সুরাবর্দির প্রতিদ্বন্দ্বিতা জোরদার হয়। নাজিমুদ্দিনের অবাঙালী রসদদার আদমজি হাজি দাউদ ও ইসপাহানি সহ-সভাপতির পদ হারান। প্রত্যেকটি সহকারী সচিব হয় সুরাবর্দির লোক। আর নিখিল ভারত লীগ

কাউন্সিলের একশত বাংলার প্রতিনিধির প্রত্যেকেই কোন না কোনরূপে সুরাবর্দির অনুগৃহীত।[৪৭২] লাভ হয় আবুল হাশিমেরও। দুই যুযুধান পক্ষের বাইরে থেকে তিনি সচিবের পদ পান।

পঞ্জাবের রাজনীতি লাহোর প্রস্তাবের পর এক অভাবনীয় মোড় নিল। সেখানে সিকান্দারের য়ুনিয়নিস্ট দলকে সাহায্য কবত খালসা ন্যাশানালিস্টরা (আসলে ব্রিটিশ সমর্থক)। তারা আকালি দলের কিছু সদস্য এর সঙ্গে মিলে তৈরি করে খালসা ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া লীগ এবং সিকান্দারকে বলে 'পাকিস্তান' প্রস্তাব বর্জন না কবলে তারা বিপক্ষে চলে যাবে।[৪৭৩] সিকান্দার তো পঞ্জাব বিধানসভায় প্রকাশ্যে পাকিস্তান প্রস্তাবকে আক্রমণ করেন, এমনকি (জিন্নার উদ্দেশে), বলেন, পঞ্জাবের ঘবোয়া ব্যাপাবে কাউকে নাক গলাতে দেওযা হবে না।[৪৭৪] ১৯৪১-এর জুলাই মাসে লিনলিথগো ন্যাশানাল ডিফেন্স কাউন্সিল গঠন করেন ও হক, সিকান্দার এবং শাদুল্লাকে তার সদস্য মনোনীত কবেন। জিন্নাব মত না নিযে যোগ দেওয়ার অর্থ তাঁর অসপত্ন আধিপত্য প্রশ্ন কবা। হক "কোন ব্যক্তিবিশেষের খেয়াল খুশিমত' চলতে রাজি হননি।[৪৭৫] লীগ মন্ত্রীরা জিন্নার আদেশে পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেও হক এক প্রগ্রেসিভ অ্যাসেম্বলি পার্টি তৈবি করেন ও শ্যামাপ্রসাদ, প্রমথ ব্যানার্জীদের দিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন কবেন। সিকান্দার বুঝতে পারেন জিন্নাব সঙ্গে মিটমাট করে নেওয়াই শ্রেয়। তিনি ডিফেন্স কাউন্সিলের সভ্যপদ ত্যাগ করেন।

ক্রিপসের ভারত আগমনকালে কি বাংলায় কি পঞ্জাবে লীগ সুবিধে করতে পাবেনি। বাংলায় নাজিমুদ্দিন, পঞ্জাবে মামদোত-দৌলতানা, সিন্ধুতে খুড়ো ও সীমান্তে আওরঙজেব খান গদি পাবাব চেষ্টা কবছেন। বড়লাট জানতেন, পাকিস্তানেব দাবির ব্যাখ্যা চাইলে—"all we should get is something woolly and general". জিন্নার আসল উদ্দেশ্য ভারতের ঐক্য নষ্ট করা নয়, হিন্দু সংখ্যাগবিষ্ঠতাব ফল এড়ানো। শুধু হডসনই এমন কথা বলেননি, জিন্নার চিঠি থেকেও তা প্রমাণ কবা যায়।[৪৭৬] ক্রিপস্ 'local option'-এর প্রস্তাব তুলে পাকিস্তানেব স্ববিরোধিতা প্রকট করে তুলতে চেয়েছিলেন। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলি স্বতন্ত্র হলে জিন্না কোথায় যাবেন ? দ্বিতীয়ত, মুসলিম সংখ্যালঘিষ্ঠ প্রদেশ সমূহের কি লাভ হবে ? তৃতীয়ত, পঞ্জাবে এতদিনের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ভেঙে গিয়ে গৃহযুদ্ধ শুরু হবে।

জিন্নাকে প্রথমে সাহায্য করল 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন। জিন্না বললেন, এটা "mere camouflage...which is really aimed at its supreme control of the government of the country by the Congress." দ্বিতীয়ত, সিকান্দারেব আকস্মিক মৃত্যু তাঁর এক যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে সরিয়ে দিল। সিকান্দারের পর মুখ্যমন্ত্রী হলেন খিজর হায়াৎ তিওয়ানা। কিন্তু য়ুনিয়নিস্টদের পুরাতন ঐক্য আর রইল না। তিন পরিবার ঐ পদের প্রার্থী ছিল—(১) সারগোধার নুন—তিওয়ানারা, (২) ওয়া-র হায়াৎরা, ও (৩) দৌলতানারা। হায়াৎদের হাতে রাখার জন্য খিজব সিকান্দারের বড় ছেলে শৌকত হায়াৎকে মন্ত্রিসভায় নিলেন। হরিয়ানার হিন্দু জাঠদের নেতা, ছটুরাম, কোয়ালিশানের প্রবীণতম মন্ত্রী। তিনি মুসলমানদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেননি। কিন্তু জিন্নার অনুগতরা তাঁকে উত্তেজিত করতে লাগলেন। অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে য়ুনিয়নিস্ট দুর্গের পতন হল। ১৯৪৩-এর মে মাসে শৌকত হায়াৎ জিন্নার দলে যোগ দিলেন। মামদোত-দৌলতানারা মদত দিলেন। পঞ্জাবের ছোটলাট গ্ল্যান্সি খিজরকে না বাঁচালে তখনই তাঁর ক্ষমতা যেত। গ্ল্যান্সি আদৌ সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অনুপ্রবেশ চাননি। য়ুনিয়নিস্টরা এতদিন গ্রামাঞ্চল থেকে সৈন্য

সরবরাহ করেছে, জাঠ ও শিখদের সঙ্গে সম্প্রীতি রেখেছে। লীগ কর্তৃত্ব পেলে কি হবে বলা যায় না। কিন্তু লীগ ছাড়ল না। খিজরের ওপর তারা রেশানিং, মূল্য নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির দায় চাপাল। তাঁকে বোঝাপড়া করতেই হল, কাগজে কলমে নিজের পার্টিকে লীগ অ্যাসেম্বলি পার্টি বলতেই হল। তবে সিকান্দার-জিন্না চুক্তিও বজায় থাকল।

উত্তর পশ্চিম সীমান্তে ১৯৪৩-এর মে পর্যন্ত লীগ মন্ত্রিসভা স্থাপন করা যায় নি। তাও সম্ভব হয় ৫০ জনের বিধানসভায় ৭টি আসন খালি থাকায় ও ২২ জন কংগ্রেসী বিধায়কের ১০ জনকে জেলে পুরে ও মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ করে। যাই হোক, কংগ্রেসের অনুপস্থিতিতে লীগের সুর ক্রমাগতই চড়া হচ্ছিল। দিল্লী অধিবেশনে (২৪-২৬ এপ্রিল ১৯৪৩) জিন্নার ভাষণ বিশ্লেষণ করে সরকার মন্তব্য করছে—"He has become more aggressive, more challenging and more authoritative..." তিনি বলেছিলেন "আমরা চাই পাকিস্তান কিন্তু ওই বস্তু কংগ্রেসের বাজারে মিলবে না, মিলবে ব্রিটিশ বাজারে। আপাতত কংগ্রেস থেকে বিপদ আসবে না, আসছে আমাদের দ্বিতীয় শত্রু—ইংরেজদের কাছ থেকে। আমরা কংগ্রেসকে মেরে ফেলেছি। এবার ব্রিটিশের পালা। যুদ্ধ আরো বছর তিনেক চলবে। তার মধ্যে আমদের নিজেদের দলে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হবে···সেই মনস্তাত্ত্বিক মুহূর্ত পর্যন্ত ব্রিটিশদেব সঙ্গে সংঘর্ষ করা চলবে না।"[৪৭৭] এই হুঙ্কারে বড়লাট বিচলিত হননি। তিনি লিখছেন ভারতসচিবকে, "আপনাকে ও জেটল্যাণ্ডকে বাববার বলেছি—শহিদ হিসাবে জিন্না গান্ধীব মতই মন্দ কিন্তু তিনি তো গান্ধী ও কংগ্রেসেব মত শক্তিমান নন...he represents a minority and a minority that only effectively hold its own with our assistance".[৪৭৮] তিনি জানতেন কংগ্রেসের মত লীগেব সংগঠনেব মূল গভীব ছিল না। জিন্নার চাল চিরদিনেব মত destructive—আপন সম্প্রদায়েব জন্য সব চেয়ে বেশি সুবিধে আদায় তাঁর লক্ষ্য। তবে তাঁকে হাতে রাখা দবকার।

১৯৪৩-এব জুলাই মাসে বড়লাট ভারতসচিবকে জানাচ্ছেন---বাজনৈতিক দিক থেকে অবস্থা অনেক ভাল হয়েছে। কোন দলই কি কববে ভেবে পাচ্ছে না। "The Muslim League have no wish to do anything, the Congress are completely at a loss ; the Princes, depressed classes and the minorities have nothing to gain by activity ; and while the Mahasabhas are very anxious to take over the Congress chair they are not really well-organised or authoritative enough to be able to do so."[৪৭৯]

অক্টোবরের প্রথমেও পড়ি সংবাদ মাধ্যমে ওয়ার্কিং কমিটির কথা কেউ উল্লেখ করে না। বাজাগোপালাচাবি বর্তমানে তাঁদের মুখপাত্র হলেও তাঁর কোন প্রস্তাব নেই। "The Muslims who have immensely strengthened their position during the last 3 or 4 years, are solid ; more bitterly communal than ever;" কিন্তু মুখে লীগ যতই জাতীয়তাবাদী হুঙ্কাব দিক, ব্রিটিশ সম্পর্ক বিনষ্ট বা দুর্বল হলে তাদেব কোন লাভ হবে না তাবা জানে। তপসিলী জাতদেরও প্রতিক্রিয়া একই।[৪৮০] চার্চিলকে লেখা কেসির চিঠিতে ক্রমবর্ধমান হিন্দু-মুসলিম বিভেদেব উল্লেখ পাচ্ছি যা প্রায় blood-feud-এব পর্যায়ে চলে গেছে।

কম্যুনিস্টদের সম্বন্ধে সরকাবেব অবিশ্বাস আদৌ যাযনি। হোম ডিপার্টমেণ্টের ২ সেপ্টেম্বরেব এক রিপোর্টে পডছি, ওপবের নেতারা যতই আন্তর্জাতিকতার বুলি আওড়াক,

নিচের লোকেরা অধিকাংশই প্রাক্তন সন্ত্রাসবাদী ও বিপ্লবী। তারা পার্টিব যুদ্ধ-সমর্থক নীতি কার্যকর করছে না। বিহারের ছোটলাট মুডি তাদের শত্রু মনে কবতেন। পার্টির সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধিব চেষ্টার ফলে এমন লোক ঢুকে পড়েছে যারা শুধু মুখেই কম্যুনিস্ট। তবু সবকাব আপাতত নিরপেক্ষতার নীতি নিয়েছেন।[৪৮১] ১৯৪৪-এর মাঝামাঝি পর্যন্ত তাঁবা এ নীতি বজায় রেখেছিলেন, যদিও পার্টিব ওপর "Continued and increasing vigilance" রাখা হয়েছিল।[৪৮২] আমরা আগেই পার্টির সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধির হিসেব দিয়েছি। এব সুদূবপ্রসারী ফল আমবা দেখতে পাব বিধানচন্দ্রেব মৃত্যুর পর।

তা হলে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের কি সুফল পেল কংগ্রেস? সরকার তাদেব আলোচনার জন্য ডাকলেন না, গান্ধীর মৃত্যুব সম্ভাবনা সত্ত্বেও মুক্তি দিলেন না। লীগের শক্তি বাড়ল —জিন্না বাংলা ও পঞ্জাবে আপন প্রতিপত্তি বাড়িযে সবকাবেব কাছে গান্ধীব সমান মর্যাদা দাবি করলেন। কম্যুনিস্টরা আন্দোলনে বাধা দিয়েও সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি কবল, তাব চেযেও বড়ো—গণ-সংযোগ। এমনকি হিন্দু মহাসভাও প্রভাব বাড়াল। সব সত্য—তবু দুটো কথা মানতেই হবে। ১৯৪২-এ ক্রিপসদৌত্যেব ব্যর্থতাব পব সারা দেশে যে সাম্রাজ্যবাদ-বিবোধী মনোভাব প্রায় বিস্ফোরণের পর্যায়ে এসেছিল, ভাবত ছাডো আন্দোলন তাকে একটা নিষ্কাশনের পথ কবে দেয। এখানে গান্ধী যতটা নেতা, ততটাই জনগণের ইচ্ছাব দাস। পবে বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মুসলিম ও কম্যুনিস্ট স্বাতন্ত্র্য—নানা কাবণে তাতে ভাঁটা পডেছিল বলে ১৯৪২-এব মাঝামাঝি তাব প্রচণ্ড সত্যতা অস্বীকাব করা যায় না। এমেবির ইডেনকে লেখা চিঠি আগেই উল্লেখ কবেছি। এখন চার্চিলকে লেখা আবেক চিঠি থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি—ব্রিটেনের মনোভাবের প্রমাণস্বরূপ :

"To keep India within the Commonwealth during the next ten years is much the biggest thing before us. *If we can keep her for ten years I am convinced we can keep her for good,* even within the Dominion relationship...Next to winning the war, keeping India in the empire should be the supreme goal of British policy."[৪৮৮] এই উদ্ধত, সাম্রাজ্যগর্বী মনোভাবেব একটা জবাব দেওয়া অনুচিত হয়নি।

দ্বিতাযত, ইংরেজদেব দমননীতি আপাতদৃষ্টিতে সফল হলেও, দূরদৃষ্টিতে তা **counter-productive** হয়েছিল। পববর্তী প্রত্যেক নির্বাচনে কংগ্রেস সাধারণ আসনে যে বিপুল সংখ্যাধিক্য লাভ করে তাব ভিত্তি বচনা করেছিল শত শত অখ্যাত অজ্ঞাত দধীচির অস্থি, শত শত লাঞ্ছিত রমণীর অশ্রুজল, সর্বস্ব নাশের শুল্কে ক্রীত শত শত দরিদ্র কৃষকের অনমনীয় সঙ্কল্প। তাদের সবাই মারেনি, অনেকেই করেছে ও মরেছে। 'ভাবত ছাড়ো' আন্দোলনেব নেতা তাবাই। হয়তো তারা গান্ধীজীর কথা ঠিক বোঝেনি, হয়তো তাবা সোশ্যালিস্ট পার্টি ও ফবোয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি দ্বারা বিপথে পরিচালিত হয়েছে, তবু ইয়েটস যেমন ইস্টারবিপ্লবীদের সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছিলেন, আমবাও তুলতে পারি—

'And what if excess of love
Bewildered them till they died ?'

টীকা

১। এস· অ্যাসটন, ব্রিটিশ পলিসি টুওয়ার্ডস দ্য ইণ্ডিয়ান স্টেট্স, ১৯০৫-১৯৩৯ (লণ্ডন, ১৯৮২)

২। বিডিংকে হারকোর্ট বাটলাব, ৬ ডিসেম্বর ১৯৩০, রিডিং কল, পৃঃ উঃ

৩। জয়াকরের ডায়েবি, ৪-১৯ অক্টোবর, ১৯৩০, ডেভিড লো, 'তেজবাহাদুর সাপ্রু অ্যাণ্ড দ্য ফার্স্ট রাউণ্ডটেবল কনফারেন্স', লো (সং), সাউণ্ডিংস ইন মডার্ন সাউথ এশিয়ান হিস্টরি, পৃঃ উঃ পৃঃ ২৯৯. ৩১৪

৪। আরুইনকে ওয়েজউড বেন, ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৩০, হ্যালিফ্যাক্স পেপার্স, Eur. Mss. C125/6, পৃঃ ২৮৯

৫। ঐ, ১২ জানুয়ারি, ১৯৩১, তদেব, পৃঃ ৩১৫-১৬

৬। আরুইনকে হেইলি, ১৪ নভেম্বব ১৯৩০, তদেব, C125/19

৭। মিচেল অ্যাণ্ড ডিন, অ্যাবস্ট্রাক্ট অব ব্রিটিশ হিস্টরিক্যাল স্ট্যাটিসটিক্স, পৃঃ ২৮৪, ৩০৪, ৩২৬

৮। বাসুদেব চ্যাটার্জী, ল্যাঙ্কাশিয়র, কটন ট্রেড অ্যাণ্ড ব্রিটিশ পলিসি ইন ইণ্ডিয়া ১৯১৯-৩৯ (কেমব্রিজ গবেষণাপত্র)

৯। বি আর টমলিনসন তাঁর 'ফবেন প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট ইন ইণ্ডিয়া ১৯২০-১৯৫০', প্রবন্ধে (মডার্ন এশিয়ান স্টাডিজ, ১৪, ৪ (১৯৭৮), পৃঃ ৬৫৫-৬০) এ সব তথ্য পুবো ঠিক স্বীকার না কবলেও মোটামুটি তা ভুল নয়।

১০। সিক্রেট সাইফাব টেলিগ্রাম, টেম্পউলড পেপার্স, Mss Eur E 240/13

১১। $ ৪৮৬ থেকে $ ৩৮০ ও পরে $ ৩২৩-এ।

১২। টমলিনসন, দ্য পলিটিক্যাল ইকনমি অব দ্য বাজ (লণ্ডন, ১৯৭৮), পৃঃ ৮৭

১৩। ম্যাণ্ট ও স্ট্রাকোস্কের মন্তব্য, উইলি'ডনকে হোব, ২৬ ফেব্রুযাবি ১৯৩২-এব অন্তর্ভুক্ত।

১৪। এ বিষযে টমলিনসন ও কার্ল ব্রিজেব বিতর্ক পাওযা যাবে ইকনমিক হিস্টবি বিভ্যু, ২য সিরিজ, XXXII, 1 (1979) ও XXXIII, 2 (1981) সংখ্যায।

১৫। লোথিয়ানকে ঘনশ্যামদাস বিড়লা, ৪ আগস্ট, ১৯৩২

১৬। উইলিংডনকে হোব, ৬ নভেম্বব ১৯৩১, Eur Mss E240/1, পৃঃ ৬৫

১৭। জযাকরকে বিড়লা, ২ ডিসেম্বব, ১৯৩১, ঘনশ্যামদাস বিড়লা, ইন দ্য স্যাডো অব দ্য মহাত্মা, পৃঃ ৪৬-৭

১৭ক। সেকেণ্ড রিপোর্ট অব দ্য মাইনবিটিজ কমিটি, অ্যাপেনডিক্স III, IRTC (সেকেণ্ড সেসন), পার্লামেন্টাবি পেপাবস, কমন্স, অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ৬৮-৭২

১৮। গান্ধী, সম্পূর্ণ বচনাবলী, ৪৮ খণ্ড, পৃঃ ১১৫-১৯

১৯। ম্যাকডোনাল্ডকে গান্ধী, ১৪ নভেম্বব ১৯৩১, তদেব পৃঃ ৩০১-২, মুঞ্জে ডাযেবি ৪-১৪ নভেম্বব ১৯৩১ দ্রষ্টব্য

২০। গ্ল্যান্সিব মন্তব্য, ২৯ অক্টোবব ১৯৩১, টেম্পলউড কল, Eur Mss. E 240/53a, পৃঃ ১-৪

২১। উইলিংডনকে হোর, ৩ ডিসেম্বর ১৯৩১, তদেব, পৃঃ ৬৪

২১ক। গান্ধী সম্পূর্ণ বচনাবলী, ৪৮খণ্ড, পৃঃ ৩০০-১, ফেডারেল স্ট্রাকচাব কমিটিতে বক্তৃতা, ২৫ নভেম্বব, ১৯৩১ তদেব, পৃঃ ৩৩৬-৪২

২২। উইলিংডনকে হোব, ৩ ডিসেম্বব ১৯৩১, তদেব, পৃঃ ৮৬

২৩। ঐ, ১০ ডিসেম্বর ১৯৩১, তদেব, পৃঃ ৯৩

২৪। হোবকে উইলিংডন, ২৮ আগস্ট ১৯৩১, তদেব ৫ খণ্ড, পৃঃ ১

২৫। টেগার্টের মেমযাব, Eur. Mss. C235/1, পৃঃ উঃ

২৬। উইলিংডনকে হোব, ৯ নভেম্বর, ১৯৩১, টেম্পলউড কল, ৫ খণ্ড, পৃঃ ২৫; G B conf file no 345 (1-17) of 1931-এ—ঢাকাব কমিশনাবকে বাখবগঞ্জেব ম্যাজিস্ট্রেট ২৩ জুন ১৯৩১, চীফ সেক্রেটারিকে লেখা চট্টগ্রামের কমিশনার ১৬ জুন ১৯৩১, মেদিনীপুবেব ম্যাজিস্ট্রেটেব ১৬ জুন, বাখরগঞ্জেব ম্যাজিস্ট্রেটেব ১৮ জুন, মৈমনসিংহেব ম্যাজিস্ট্রেটেব ১৯ জুন-এব চিঠি দ্রষ্টব্য।

২৭। ঐ, ৩১ ডিসেম্বব, ১৯৩১, তদেব, পৃঃ ১১৫-১৯

২৭ক। ১৯৩২-এব ২৪ মার্চ কমন্স সভায হোব স্বীকাব কবেন অধ্যাদেশগুলি "Very drastic and severe. They cover almost every activity of Indian life."

২৮। হোরকে বিড়লা, ১৪ মার্চ ১৯৩২, Eur. Mss. E240/1, পৃঃ ২৫৪

২৯। ঐ, ২৮ মার্চ ১৯৩২, তদেব, পৃঃ ২৫৫

৩০। উইলিংডনকে হোব, ২৬ ফেব্রুয়াবি ১৯৩২, তদেব, পৃঃ ১৯৫-৯৬

৩১। বি আব টমলিনসন, 'কলোনিয়াল ফার্মস অ্যাণ্ড ডিক্লাইন অব কলোনিয়ালিজম্ ইন ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া', মডার্ন এশিযান স্টাডিজ, ১৫, ৩ (১৯৮১), পৃঃ ৪৫৫-৮৬

৩২। ১৯৩১-৩২-এ ল্যাঙ্কাশিয়বেব আবদারে ভাবত সরকাব বিলাতী কাপডকে বেশি সুবিধা দেয। যেখানে তাব ওপব ২৫% হাবে শুল্ক ধার্য হয়েছিল, সেখানে অন্যান্য দেশেব কাপড়ের ওপব ৩০%, পরে ৭৫% পর্যন্ত শুল্ক বসে। তবু বিলাতী কাপড়ের আমদানি ১৯৩৩-৩৪ সালে কমে দাঁড়ায় ৪১ কোটি ৫০ লক্ষ গজে।

৩৩। দ্বিজেন্দ্র ত্রিপাঠী, ডায়নামিক্স অব আ ট্রাডিশন · কস্তুরভাই লালভাই অ্যাণ্ড হিজ আঁত্রেপ্রেনরসিপ (নিউ দিল্লী, ১৯৮১) পৃঃ ১৭৯-৮০.

৩৪। ক্লদ মার্কোভিৎস, পৃঃ উঃ

৩৫। সাপ্রুকে বিড়লা, ৩১ অক্টোবর ১৯৩১, জি· ডি বিড়লা, ইন দ্য স্যাডোজ অব দ্য মহাত্মা, পৃঃ উঃ,পৃঃ ৪২-৪৫

৩৬। জ্ঞান পাণ্ডে, দ্য অ্যাসেণ্ডেনসি অব দ্য কংগ্রেস ইন উত্তরপ্রদেশ ১৯২৬-৩৪ (নিউ দিল্লী, ১৯৭৮), পৃঃ ৫৭-৫৮

৩৭। বিপনচন্দ্র, 'এলিমেন্টস অব কন্টিনিয়ুটি অ্যাণ্ড চেঞ্জ ইন আর্লি ন্যাশানালিস্ট অ্যাকটিভিটি।'

৩৮। এই প্রসঙ্গে উপন্যাসের শৈলীতে লেনিনের সঙ্গে পারভুসেব ও জার্মান বিদেশ দফতবের সম্পর্কেব অপূর্ব আলোচনা করেছেন সলঝেনিত্সিন, লেনিন ইন জুরিখ (পেঙ্গুইন, ১৯৭৫)-এ।

৩৯। এ আই সি সি পেপার্স, ১৯৩২, ফাইল নং ১৫ (মিসেলেনিযাস) p-22 এবং নং ১২ (মিসেলেনিয়াস)

৪০। হোবকে ঘনশ্যামদাস বিড়লা, ১৪ মার্চ ১৯৩২

৪০ক। ডেভিড হার্ডিম্যান, লো (সং) কংগ্রেস অ্যাণ্ড দি রাজ, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৬৯

৪১। বিহার অ্যান্ড ওড়িশা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট ১৯৩১-৩২, পৃঃ ৯-১৬, ২০-২২, ৮৯-৯৭

৪২। বেঙ্গল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট, পৃঃ XI-XV, XXV-XXVI; হোম পল ১৯৩২, ফাইল নং ৫/৪৬

৪৩। এ আই সি সি,ফাইল নং ৪/৪০৬ অব ১৯৩২

৪৩ক। Report on the Political Situation in the district of Midnapur 1932-34, G B Pol. Conf file no 277 of 1934

৪৪। সিক্রেট বিপোর্ট অন কংগ্রেস অ্যাটিভিটিজ ১৭ জুলাই ১৯৩২, হোম পল ১৯৩২, ফাইল নং ৫/৬৭

৪৪ক। ম্যাড্রাস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিপোর্ট ১৯৩১-৩২ পৃঃ XI-XIV, ভারতেব হোম সেক্রেটারিকে মাদ্রাজের অ্যাক্টিং চীফ সেক্রেটাবি, ১২ মে ১৯৩২, হোম পল ফাইল নং ১৪/২৮ অব ১৯৩২

৪৫। জওহরলাল নেহরু, অটোবায়োগ্রাফি, পৃঃ ২৯৯

৪৬। অ্যাগ্রেবিয়ান ডিসপ্যুটস ইন দ্যা য়ুনাইটেড প্রভিন্স (লখনউ, ১৯৩১), পৃঃ ৪৬

৪৭।এমার্সন-গান্ধী সাক্ষাৎকাব, ৬ এপ্রিল ১৯৩১, হোম পল, ফাইল নং ৩৩/XI অব ১৯৩১

৪৭ক। ঐ সাক্ষাৎকাব ১২-১৫ মে, হোম ফাইল নং ১১/১/৩১—M.S পৃঃ ৬৫-৬৭

৪৮। এমার্সন-নেহরু সাক্ষাৎকাব ১৯/২০ জুলাই ১৯৩১, হোম পল,ফাইল নং ৩৩/২৩ অব ১৯৩১

৪৯। এস গোপাল, জওহবলাল নেহরু আ বায়োগ্রাফি, ১ম খণ্ড, সারণী পৃঃ ১৬৩

৫০। ক্রেবারকে হেইলি, ৯ নভেম্বব ১৯৩১, হোম পল ফাইল নং ৩৩/৩৬

৫১। হোবকে উইলিংডন, ২৬ ডিসেম্বর ১৯৩১, টেলমপলউড পেপার্স, ৫ম খণ্ড

৫২। জ্ঞান পাণ্ডে, দ্যা অ্যাসেনডেন্সি অব দ্য কংগ্রেস ইন উত্তবপ্রদেশ ১৯২৬-৩৪ ইত্যাদি (অক্সফোর্ড, ১৯৭৮), ষষ্ঠ ও

৫৩। তদেব, পৃঃ ১৮৮। অন্যত্র পাণ্ডে বলছেন, "The poor man's party of 1920 had become a rich peasants' party by 1940." লো (সং), কংগ্রেস অ্যাণ্ড দ্য বাজ, পৃঃ উঃ, পৃঃ ২১৮

৫৪। হিতেশরঞ্জন সান্যাল, অন্য অর্থ, সেপ্টেম্বব-অক্টোবব ১৯৭৪, নভেম্বব-ফেব্রুয়াবি ১৯৭৫, জানুযারি-ফেব্রুয়াবি ১৯৭৭

৫৪ক। দমননীতির জন্য, ডেভিড লো (সং), কংগ্রেস অ্যান্ড দ্য বাজ, পৃঃ উঃ পৃঃ ১৬৫-৯৮

৫৫। হোরকে উইলিংডন, ৪ এপ্রিল ১৯৩২, Eur Mss E 240, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১০৬

৫৫ক। গান্ধীকে আনসাবি, ১৩ ফেব্রুয়াবি ১৯৩০। মতিলাল প্রতিবাদ করেন। আনসারিকে মতিলাল, ১৭ ফেব্রুযাবি ১৯৩০, আনসারি পেপার্স

৫৫খ। মহম্মদ আলিকে সাফত আহমদ খাঁ, ২৩ সেপ্টেম্বব ১৯৩০, মহম্মদ আলি পেপার্স (জামিয়া মিলিয়া)

৫৫গ। এস এস পিবজাদা (সং), ফাউণ্ডেশন অব পাকিস্তান অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ ডক্যুমেন্টস, ২য় খণ্ড, ১৯২৪-৪৭, (কবাচি, ১৯৭০), পৃঃ ১৫৯

৫৫ঘ। হোবকে আগা খাঁ, ৯ মার্চ ১৯৩২, L/PO/49

৫৫ঙ। বাংলার অনুন্নত হিন্দু (পবে তপসিলী) বাজনীতিব বিস্তৃত আলোচনাব জন্য শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়,সোশ্যাল মবিলিটি ইন বেঙ্গল ইন দ্য লেট নাইন্টিন্থ অ্যান্ড দ্য আর্লি টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরিজ (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, অপ্রকাশিত গবেষণা)। রাজা-মুঞ্জে প্যাক্টের জন্য রিফর্মস অফিস, ভাবত সরকার, ফাইল নং ১১১/৩২-R

৫৬। হোরকে অ্যান্ডারসন, সিক্রেট, ৭ জুন ১৯৩২

৫৭। উইলিংডনের তার ৪৯৩ এস, ৯ জুলাই ১৯৩২

৫৮। অ্যান্ডারসনকে উইলিংডন, ১০ জুলাই ১৯৩২

৫৯। মহাদেব দেশাই-এর ডায়েরি, ১ খণ্ড পৃঃ ২৯৬-৩০৪, গান্ধীর প্রতিবেদন, সম্পূর্ণ রচনাবলী ৫১ খণ্ড

৬০। পুনা আলোচনার বিশদ বিবরণ, সাপ্রু পেপার্স সিরিজ II ও মুঞ্জের ডায়েরি। গান্ধী ও আম্বেদকরের আলোচনা ও ঘোষণা। সম্পূর্ণ রচনাবলী, ৫১ খণ্ড, পৃঃ ৪৫৮-৬১

৬১। তপসিলী হিন্দুব জন্য সংরক্ষিত আসন

প্রদেশ	ম্যাকডোনালডেব বাঁটোয়াবা অনুযাযী	পুনা প্যাক্ট অনুযাযী
মাদ্রাজ	১৮	৩০
বোম্বাই	১০	১৫
পঞ্জাব	০	৮
বিহার ওড়িশা	৭	১৮
বাংলা	১০	৩০
সি পি	১০	২০
আসাম	৪	৭
ইউ. পি.	১২	২০

ভারত সবকাবকে বোম্বাই সবকাবেব তাব, হোম পল ফাইল নং ৩১/১১৩ অব ১৯৩২-এব অন্তর্ভুক্ত মালব্যেব তালিকানুযাযী।

৬২। হোবকে উইলিংডন, ১৫ জানুযাবি ১৯৩৩, Eur.Mss E 240, ষষ্ঠ খণ্ড সাব নৃপেন সবকাবেব প্রতিবাদেব জন্য—সাপ্রুকে সবকাব, ১৭ ফেব্রুযাবি ১৯৩৩, সাপ্রু পেপার্স সিবিজ II, অন্যান্য বাঙালীব প্রতিবাদ জযাকবেব কাগজপত্র (ফাইল নং ৪২১)-এ পাওযা যাবে।

৬৩। শার্দুল সিংকে লেখা সুভাষচন্দ্রেব প্রতিবাদ গোযেন্দা দফতব গাযেব কবে। তা পাওযা যাবে হোম পল ফাইল নং ৩/৩৩ অব ১৯৪০-এ। গান্ধীব চেলা জে এল ব্যানার্জি স্বযং এক প্রতিবাদী প্রস্তাব কাউন্সিলে পাস কবান।

৬৪। বাজেন্দ্র প্রসাদ, অটোবাযোগ্রাফি, পৃঃ ৩৭৮-৭৯, ওযার্কিং কমিটিব প্রস্তাব ১২-১৩ জুন ১৯৩৪

৬৫। মাধব শ্রীহবি অ্যানিকে গান্ধী, ১২ জুলাই ১৯৩৪

৬৬। বি সি বাযকে গান্ধী, ২৫/৩০ আগস্ট ১৯৩৪, বল্লভভাই প্যাটেল পেপার্স।

৬৭। ব্রির্যা স্টডার্ট, 'স্ট্রাকচাব অব কংগ্রেস পলিটিকস ইন কোস্টাল অন্ধ্র', ১৯২৫-৩৭' ডেভিড লো (সং), কংগ্রেস অ্যান্ড দ্য বাজ, পৃঃ উঃ, পৃঃ ১২৪

৬৮। ন্যাশনাল লিবাবেশন ফেডারেশনেব চর্তুদশ সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব (এপ্রিল ১৯৩৩), সাপ্রু-জযাকব মেমোবেন্ডাম, ১৬ মে ১৯৩৩ জয়াকব পেপার্স, গ্র্যাহম পোলকে সাপ্রু, ২ এপ্রিল ১৯৩৩, সাপ্রু পেপার্স, সিবিজ-II

৬৯। উইলিংডনকে হোব, ৩ মার্চ ১৯৩৩,

৭০। হোরকে উইলিংডন, ৩ অক্টোবব ১৯৩২, Eur. Mss. E 240 ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৯৩

৭১। ঐ, ৯ অক্টোবব ১৯৩২, তদেব, পৃঃ ১৯৬-৯৭

৭২। স্ববাষ্ট্র সদস্য হেইগ মনে কবতেন বল্লভভাই, নেহক ও সীমান্ত গান্ধী বাজি হতেন না। এইচ হেইগেব নোট, ৩ অক্টোবব ১৯৩২, হোম পল, ১৯৩২, ফাইল নং ৩১/৯৫ .

৭৩। হবিজন, ৬ মে ১৯৩৩

৭৪। জওহবলালেব ডাযেবি, সিলেক্টড ওযার্কস, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৪৭৪-৫

৭৫। ভাবতসচিবকে বডলাট তাব ৯ মে ১৯৩৩-এ সবকাবী বিবৃতি পাওযা যাবে

৭৬। ফর্টনাইটলি বিপোর্ট ফ্রম বেঙ্গল, মার্চ ১৯৩৩, হোম পল ফাইল নং ১৮/৪ অব ১৯৩৩

৭৭। ভাবতসচিবকে বডলাট তাব ১, ৮, ১৩ জুলাই, ১৯৩৩, Eur. Mss. E 240, দ্বাদশ খণ্ড। ভাবতসচিব তখন উদাবপন্থী ও শ্রমিক নেতাদেব চাপে আলোচনা শুরু কবতে চাইছিলেন। ভাবতসচিবেব উত্তব ৬, ১১, ১২ জুলাই ১৯৩৩, তদেব

৭৮। নেহক, সিলেক্টড ওযার্কস, পঞ্চম খণ্ড পৃঃ ৪৭৮, ৪৮৫

৭৯। সি এফ অ্যানড্রুজকে গান্ধী, ১৫ জুন ১৯৩৩, আসফ আলিকে গান্ধী, ২৬ জুন ১৯৩৩, গান্ধী স্মাবকনিধি, নং ১৯০৯৮, ১৯১০৮।

৮০। জযাকবকে সাপ্রু, ১৩ আগস্ট ১৯৩৩, সাপ্রু পেপার্স, সিবিজ II

৮১। মিসেস দাসকে শাস্ত্রী, ২৬ জুলাই ১৯৩৩, শাস্ত্রী পেপার্স, (জে এন এম এম এল)

৮২। গান্ধীকে নেহক, ১৩ সেপ্টেম্বব ১৯৩৩, সিলেক্টড ওয়ার্কস, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৫২৮-২৯

৮৩। জয়াকবকে সাপ্রু, ১৩ আগস্ট ১৯৩৩, সাপ্রু পেপার্স, সিবিজ II

৮৪। আসফ আলিকে নেহক, ১২ অক্টোবব ১৯৩৩, নেহক, সিলেক্টেড ওযার্কস, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪২-৪৪

৮৫। নেহরু, হুইদাব ইন্ডিয়া ? তদেব, পৃঃ ১-১৬

৮৬। মুন্সী ও মুঞ্জের কথোপকথন, মুঞ্জেব ডাযেবি, ১২ মার্চ ১৯৩৪

৮৭। আনসারিকে গান্ধী, ১৮ মার্চ ১৯৩৪, হোম পল ফাইল নং ৩/৬ অব ১৯৩৪

৮৮। ঐ, ৫ এপ্রিল ১৯৩৪৫, দ্য স্টেটসম্যান, ৬ এপ্রিল ১৯৩৪

৮৯। বল্লভভাই প্যাটেলকে গান্ধী, ১৮ এপ্রিল ১৯৩৪, লেটার্স টু সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, পৃঃ ৫৬

৯০। শাস্ত্রীকে জয়াকর, ১৬ আগস্ট ১৯৩৪, জয়াকর পেপার্স, করেসপণ্ডেন্স ফাইল নং ৪০৮। সম্প্রতি প্রকাশিত Marguerite Dove-এর Forfeited Future ইত্যাদি (দিল্লী, ১৯৮৭) পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য। মালব্য, বিড়লা, রাজাজী, মুন্সী সকলেই চেয়েছিলেন পরিষদীয় কর্মকাণ্ডের ওপর কংগ্রেসের কর্তৃত্ব। গান্ধীকে লেখা রাজাজীর চিঠি তুলে দিয়েছে গোয়েন্দা দফতর G. I. Home Pol file no 4/4/34 এ। রাঁচী সম্মেলনে মাসানী বোম্বাই সমাজতন্ত্রীদের পক্ষ থেকে আপত্তি জানান। বোম্বাই সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে যোগ দেন ইউ পি সমাজতন্ত্রীরা। গান্ধী বলেন কাউন্সিলে ঢুকলেও গঠনমূলক কর্মই হবে প্রধান। তারপর পাটনায় এ আই সি সি-তে রাজাজীর দল জয়ী হন। ১৯৩৪-এর ১৫ মে স্বয়ং গান্ধী পার্লামেন্টারী বোর্ড গঠনের প্রস্তাব তোলেন। তবে গঠনমূলক কর্মের উপর জোরও দেন। না-গ্রহণ না-বর্জন নীতি নিলেও মালব্যকে তিনি দলে রাখতে পারেননি।

৯১। টেন্ডুলকর, মহাত্মা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩১৭-১৯

৯২। A I C C P. file G-63, 1934, file G-43 (KW) (ii), 1935, file P-13, 1934-36

৯১ক। হেক্টর বলিথো, জিন্না, পৃঃ উঃ, পৃঃ ১০৪-০৫

৯২। গান্ধীকে কে এম মুন্সী, ২৭ জানুয়ারি ১৯৩৪, মুন্সী, ইণ্ডিয়ান কনস্টিটুশনাল ডক্যুমেন্টস, ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৬০-৬১

৯৩। রাজেন্দ্র প্রসাদ পেপার্স, XI/135/1/2 and 6

৯৪। রাজেন্দ্র প্রসাদকে মৌলানা আজাদ, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৫। তদেব।

৯৫। তদেব, 7

৯৬। তদেব, 17

৯৭। বল্লভভাই প্যাটেলকে রাজেন্দ্র প্রসাদ, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৫

৯৮। গ্যালাহার, 'কংগ্রেস ইন ডিক্লাইন বেঙ্গল, ১৯৩০-১৯৩৯', গ্যালাহার, জনসন ও শীল (সং), লোকালিটি প্রভিন্স অ্যাণ্ড নেশন, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৩০৯-১৩, আয়েষা জালাল, দ্য সোল স্পোকসম্যান জিন্না, দ্য মুসলিম লীগ অ্যাণ্ড দ্য ডিমাণ্ড ফর পাকিস্তান (লংম্যান, ১৯৮৫) পৃঃ ১৪

৯৯। বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল প্রোসিডিংস, ৪১ খণ্ড, নং ১, ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩, ঐ নং ২, ১৪, ২৫ ও ২৭ মার্চ ১৯৩৩। ১৪ মার্চের কার্যবিবরণীতে জে এল ব্যানার্জীর প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা রয়েছে।

১০০। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, অপ্রকাশিত গবেষণা, পৃঃ উঃ

১০০ক। রিপোর্ট অন দ্য পলিটিক্যাল সিচ্যুয়েশন ইন বেঙ্গল ফর দ্য সেকেণ্ড হাফ অব জানুয়ারি ১৯৩৭, হোম (কনফিডেনশিয়াল), জি বি ফাইল নং ১০/৩৭ শীলা সেন ও জালালে ভিন্ন সংখ্যা পাই।

১০১। উইলিংডনকে হোর, ২০ অক্টোবর ১৯৩৩, Eur Mss E 240, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৮৪৭-৪৮, ৮৫৭, ঐ, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৩৩, তদেব, পৃঃ ৯২৬-২৭, হোরকে উইলিংডন, ২৩ এপ্রিল ও ৭ মে, তদেব, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৫০৫-০৯

১০২। কিস (Keys)-কে আকবর হায়দারি, ১১ মে ১৯৩১

১০৩। ব্রজনারায়ণকে সাপ্রু, ২ জুন ১৯৩৩, সাপ্রু পেপার্স

১০৪। উইলিংডনকে হোর, ২৬ মার্চ ১৯৩৩, পৃঃ উঃ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৫৫

১০৫। পার্লামেন্টারী ডিবেটস, কমন্স, ১৯৩৪-৩৫, ২৯৮ তম খণ্ড, পৃঃ ৯৭১-৯

১০৫ক। জওহরলাল নেহরু, অটোবিয়োগ্রাফি (১ম সং ১৯৩৬), ৬১ ও ৬২ অধ্যায়

১০৬। লর্ড লোথিয়ানকে নেহরু, ১৭ জানুয়ারি ১৯৩৬, নেহরু, আ বাঞ্চ অব ওল্ড লেটার্স (২য় সং), পৃঃ ২৯৮ অটোবিয়োগ্রাফি, পৃঃ ৫৩০-৩৪

১০৬ক। বল্লভভাই প্যাটেল বরোদার এক সভায় (৬ জানুয়ারি ১৯৩৫) এই নীতির উল্লেখ করেন। বার্ক সম্বন্ধে পেইনের মন্তব্য উদ্ধৃত করে নেহরু লিখেছিলেন, "Gandhiji certainly never forgets the dying bird But why so much insistence on the plumage?" তদেব, পৃঃ ৫৩৪

১০৭। জওহরলালকে গান্ধী, ৩ অক্টোবর ১৯৩৫

১০৮। এস গোপাল, পৃঃ উঃ, পৃঃ ২০২

১০৯। সরোজ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৭৮ ও পরবর্তী

১১০। গান্ধীকে নেহরু, ১৩ আগস্ট ১৯৩৪

১১১। আচার্য নরেন্দ্র দেবের প্রথম কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ

১১১ক। ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ, রেমিনিসেন্সেস অব অ্যান ইণ্ডিয়ান কম্যুনিস্ট (নিউ দিল্লী, ১৯৮৭), দশম অধ্যায়

১১২। বোম্বে ক্রনিকল, ২৬ মার্চ ও ৮ এপ্রিল, ১৯৩৬। নাম্বুদ্রিপাদ উল্লেখ করছেন, "The Nehru-CSP concept of the Congress being the anti-imperialist united front' in which the militant organisations of the working people were to play a crucial role." পৃঃ উঃ, পৃঃ ৬৬

১১৩। সরোজ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৭৫

১১৪। মদনমোহন মালব্যকে নেহরু, ২০ এপ্রিল ১৯৩৬। বোম্বাইতে তিনি বলেন, কংগ্রেস হল "an All-Parties Conference in permanent session."

১১৪ক। AICC file G-31, 1936.
১১৫। পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাসকে বিড়লা, ২০ এপ্রিল, ১৯৩৬, ঠাকুরদাস পেপার্স, ফাইল নং ১৭৭
১১৬। অ্যাগাথা হ্যারিসনকে গান্ধী, ৩০ এপ্রিল ১৯৩৬
১১৭। হোম পল ফাইল নং ১৮/৪ অব ১৯৩৬। গোয়েন্দা দফতরের একথা মানা কঠিন।
১১৮। ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদকে বিড়লা, ২৬ মে ১৯৩৬, ঠাকুরদাস পেপার্স
১১৯। জওহরলাল নেহরুকে গান্ধী, ৮, ১৫ ও ৩০ জুলাই ১৯৩৬
১২০। এ আই সি সি ফাইল G ৭১ অব ১৯৩৬
১২১। তদেব, ফাইল G ৮৫ (১) অব ১৯৩৬
১২১ক। হোম পল ফাইল নং ৪/১৩/৭৫
১২১খ। AICC file 42, 1936
১২২। এস গোপাল, পূঃ উঃ, পৃঃ ২১৮-১৯
১২৩। জেটল্যাণ্ডকে লিনলিথগো, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭, Eur. Mss. F 125/4
১২৪। লিনলিথগোকে এমার্সন, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭, জেটল্যাণ্ডকে লিনলিথগো, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭-এর চিঠির অন্তর্ভুক্ত, তদেব। জেটল্যাণ্ড ভাবলেন গান্ধী ছোটলাটদের প্রতিশ্রুতি আদায় করে কংগ্রেসের সম্ভাব্য বিভাজন এড়াতে চাইছেন। লিনলিথগোকে জেটল্যাণ্ড, ১৩ জুন ১৯৩৭, Eur Mss F 125/3, ২য় খণ্ড
১২৪ক। জেটল্যাণ্ডকে লিনলিথগো ১৯ মার্চ ১৯৩৭-এর অন্তর্ভুক্ত
১২৪খ। রাজেন্দ্র প্রসাদকে পন্থ, ২ এপ্রিল ১৯৩৭, রাজেন্দ্র প্রসাদ পেপার্স file II/37, AICC
১২৪গ। জেটল্যাণ্ডকে লিনলিথগো, তার, ২২ মার্চ ১৯৩৭
১২৪ঘ। লিনলিথগোকে জেটল্যাণ্ড, ২২ এপ্রিল ১৯৩৭
১২৪ঙ। জেটল্যাণ্ডকে লিনলিথগো, তার, ১১ জুন ১৯৩৭
১২৫। ভারতসচিবের মেমো, ১২ জুলাই ১৯৩৭ CAB 24/270
১২৬। জেটল্যাণ্ডকে লিনলিথগো, ৩ সেপ্টেম্বর ও ১১ অক্টোবর ১৯৩৬, Eur. Mss. F 125/3, ১ম খণ্ড, ২৮ জানুয়ারি, ১৯৩৭, Eur Mss F 125/4.
১২৭। জন আর উড, 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশানালিজম ইন দ্য প্রিন্সলি কনটেক্সট দ্য রাজকোট সত্যাগ্রহ অব ১৯৩৮-৩৯', আর জেফ্রি (সং), পিপল, প্রিন্সেস অ্যাণ্ড প্যারামাউন্ট পাওয়ার (নিউ দিল্লি, ১৯৭৮)
১২৮। জেটল্যাণ্ডকে লিনলিথগো, ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০, Eur Mss. F 125/3
১২৯। ওয়ার্কিং কমিটির মিনিটস্ AICC file 42, 1936, জেটল্যাণ্ডকে লিনলিথগো, ৮ জুলাই ১৯৩৭ Eur. Mss. F 125/4-এর কৃতিত্ব দাবি করেছেন আজাদ। ইণ্ডিয়া উইনস ফ্রিডম, পূঃ উঃ, পৃঃ ১৪-১৫
১২৯ক। জেটল্যাণ্ডকে লিনলিথগো, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৭, তদেব
১২৯খ। লিনলিথগোকে লুমলি, ৯ নভেম্বর ১৯৩৭, ঐ ১১ নভেম্বর ১৯৩৭-র অন্তর্ভুক্ত, তদেব
১২৯গ। ইউয়ার্টের নোট, ২০ নভেম্বর ১৯৩৭
১২৯ঘ। মুন্সীর সঙ্গে বড়লাটের আলাপ, ১০ ডিসেম্বর ১৯৩৭, জেটল্যাণ্ডকে লিনলিথগো, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৩৭-র জেটল্যাণ্ডকে লিনলিথগো ১৬ ডিসেম্বর ১৯৩৭-র অন্তর্ভুক্ত। Eur. Mss. F 125/4
১৩০। বেঙ্গল আই বি, সিক্রেট রিভ্যু অব রেভল্যুশনারী ম্যাটারস্ ফর উইক এণ্ডিং ১৯ আগস্ট ১৯৩৭, ঐ, ৩০ আগস্ট ১৯৩৭-র অন্তর্ভুক্ত। তদেব
১৩১। জেটল্যাণ্ডকে লিনলিথগো, ২ জুন ১৯৩৮, Eur. Mss. F 125/5
১৩২। এস গোপাল, পূঃ উঃ, পৃঃ ২৩০
১৩৩। জেটল্যাণ্ডকে লর্ড ব্রেবোর্ন, ২১ জুলাই ১৯৩৮, Eur-Mss.F. 125/5
১৩৪। Extract from 'Communist Review'. Organ of Bengal Committee of C.P.I., Vol II. October, 1935, হোম পল, ১৯৩৬, ফাইল নং ৭/১০
১৩৫। Review of the Recent Communist Activities in India by D I B, হোম পল, ১৯৩৭, ফাইল নং ৭, (২৭ অক্টোবর, ১৯৩৭)
১৩৬। এ এম জৈদি ও এস জি জৈদি (সং), দ্য এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইণ্ডিয়া ন্যাশানাল কংগ্রেস, ১২ খণ্ড, পৃঃ ২৮১-৮৪
১৩৭। রেজিনাল্ড কুপল্যাণ্ড, ইণ্ডিয়ান পলিটিকস ১৯৩৬-১৯৪২ (লণ্ডন, ১৯৪৩), তৃতীয় থেকে পঞ্চদশ অধ্যায়, স্যার হ্যারি হেইগ, 'দ্য যুনাইটেড প্রভিন্সেস অ্যাণ্ড দ্য নিউ কনস্টিট্যুশন,' এশিয়াটিক রিভ্যু, ৩৬শ খণ্ড (জুলাই ১৯৪০), পৃঃ ৪২৩-৩৪, লর্ড এরসকাইন, 'ম্যাড্রাস অ্যাণ্ড দ্য নিউ কনস্টিট্যুশন, তদেব, ৩৭শ খণ্ড (জানুয়ারি ১৯৪১), পৃঃ ১২-২২

প্রদেশ		জনগণের লাভের বাৎসরিক অর্থমূল্য (লক্ষ টাকা)
মাদ্রাজ	মাদক শুল্ক লোপ	২৬০
	রাজস্ব হ্রাস	৭ ১৪
	ঋণ মুকুবের জন্য কিষাণদের আনুমানিক লাভ	৫০০০
	বকেয়া ঋণ মাফ	৩০০
	হরিজন উন্নয়ন	২৭ ৮০
বোম্বাই	মাদক শুল্ক লোপ	৫০০
	সূতীবস্ত্র অনুদান	৯৫
	রাজস্ব বাবদ	৩০
	ঋণ মকুব খাতে	৩০০০ থেকে ৪০০০
ইউ পি	রাজস্ব বাবদ জমিদারদের লাভ	৩৫৭
	প্রজাদের লাভ	১০৭১
	বকেয়া খাজনা মকুব	৯০০
	মাদক শুল্ক লোপ	১০০
	আখ চাষ নিয়ন্ত্রণ	৮০০
উড়িষ্যা	উড়িষ্যা প্রজা আইন বাবদ	৪
	মাদ্রাজ এস্টেটস ল্যাণ্ড অ্যাক্ট সংশোধন বাবদ (উত্তর উড়িষ্যায় জলকর বাবদ, পশুচারণ কর বাবদ, মহাজনী আইন সংশোধন বাবদ, কোর্ট ফি হ্রাস বাবদ ও আফিম নিষিদ্ধকরণ বাবদ উপকারের অর্থমূল্য ধরা হয়নি।)	১০
বিহার	প্রজা আইন বাবদ	২৫০
	আখমাড়াই কল নিয়ন্ত্রণ আইন বাবদ	—
	মাদক শুল্ক বাবদ	৬০
	ঋণ মকুব বাবদ	—
সি পি	রাজস্ব/খাজনা বাবদ	১১ ৮৭
	সূতীকল শ্রমিক	৫
	মাদক শুল্ক বাবদ	২৭
	পশুচারণ কর হ্রাস	১ ১৮
	সেচকর হ্রাস	২
	ঋণ মকুব বাবদ	৫৮৩

১৩৮। সমস্ত ঘটনা ও বিবৃতির জন্য টেণ্ডুলকার, মহাত্মা, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৬৪-৬৬

১৩৮ক। জেটল্যাণ্ডকে উইলিংডন, ৩০ মার্চ ১৯৩৬, জেটল্যাণ্ড পেপার্স

১৩৯। পার্লামেন্টারী পেপার্স ১৯৩৭-৩৮, ২১তম খণ্ড, Cmd. 5589, স্টিফেন ওরেন, 'দ্য শিখস্, কংগ্রেস অ্যাণ্ড দ্য য়ুনিয়নিস্টস্ ইন ব্রিটিশ পাঞ্জাব, ১৯৩৭-১৯৪৫', মডার্ন এশিয়ান স্টাডিজ ৮, ৩ (১৯৭৪), পৃঃ ৩৯৮

১৪০। লিনলিথগোকে স্যার জন অ্যাণ্ডারসন, ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭, R/3/2/2, ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী

১৪১। শীলা সেন, মুসলিম পলিটিক্স ইন বেঙ্গল, ১৯৩৭-১৯৪৭ (১৯৭৬), তৃতীয় অধ্যায়,

১৪২। হুমায়ুন কবির, মুসলিম পলিটিকস্ ইন বেঙ্গল ১৯০৬-৪২ (কলকাতা, ১৯৪৩), পৃঃ ১৩-১৭

১৪৩। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, ইণ্ডিয়া উইনস্ ফ্রিডম, পৃঃ উঃ, পৃঃ ১৬১

১৪৩ক। চৌধুরী খলিকুজ্জমান, দ্য পাথওয়ে টু পাকিস্তান (লাহোর, ১৯৬১)

১৪৩খ। পেয়ারেলাল, মহাত্মা গান্ধী, দ্য লাস্ট ফেজ, প্রথম খণ্ড (আহ্‌মদাবাদ, ১৯৫৮), পৃঃ ৭৬

১৪৪। এন ম্যানসার্গ, 'ট্রানসফার অব পাওয়ার ইন প্লুরাল সোসাইটিজ', ফিলিপস্ অ্যাণ্ড ওয়েনবাইট (সং), দ্য পার্টিশান অব ইণ্ডিয়া, পৃঃ ৪৭-৪৮

১৪৫। লিনলিথগোকে হেইগ, ২৯ অক্টোবর ১৯৩৬

১৪৬। পি ডি রীভস্, মডার্ন এশিয়ান স্টাডিজ, ৫, ২ (১৯৭১), পৃঃ ১২৭, ঐ, ল্যাণ্ডলর্ডস অ্যাণ্ড পার্টি পলিটিক্স ইন দ্য য়ুনাইটেড প্রভিন্সেস, ১৯৩৪-৩৭, ডেভিড লো (সং), সাউণ্ডিংস ইন মডার্ন সাউথ এশিয়ান হিস্টরি, পৃঃ উঃ, পৃঃ ২৬১-৮২

১৪৬ক। চৌধুরী খলিকুজ্জমান, পৃ" উঃ, পৃঃ ১৬৭, গান্ধীকে জিন্না, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮, পীরজাদা, Leaders correspondence, পৃঃ ৩৭-৪২

১৪৭। ক্রিপসকে নেহরু, ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭

১৪৭ক। ওয়ার্কিং কমিটি মিনিটস, AICC file no 42, 1936

১৪৮। নেহরুকে গোবিন্দবল্লভ পন্থ, ২ এপ্রিল ১৯৩৭

১৪৯। গোবিন্দবল্লভ পন্থকে নেহরু, ৩০ মার্চ ১৯৩৭, AICC file E-1, 1936

১৫০। রাজেন্দ্র প্রসাদকে নেহরু, ২১ জুলাই ১৯৩৭

১৫১। চৌধুরী খলিকুজ্জমান, পৃঃ উঃ, পৃঃ ১৬০

১৫২। আয়েষা জালাল, দ্য সোল স্পোকসম্যান, জিন্না, দ্য মুসলিম লীগ অ্যাণ্ড দ্য ডিমাণ্ড ফর পাকিস্তান (কেমব্রিজ/লংম্যান ১৯৮৫), পৃঃ ৩৩

১৫৩। এ আই সি সি ফাইল নং 24/1936 ad 41/1937

১৫৪। জিন্নাকে ইকবাল, ২১ জুন ১৯৩৭, লেটার্স অব ইকবাল টু জিন্না (৪র্থ সং লাহোর ১৯৬৩)

১৫৫। পিরজাদা (সং), ফাউণ্ডেশনস্ অব পাকিস্তান, ১১ খণ্ড, পৃঃ ২৯৩-৯৫

১৫৬। জেটল্যাণ্ডকে ব্রেবোর্ন, ৫ আগস্ট ১৯৩৮, Eur Mss F 125/5

১৫৭। পিরজাদা (সং), লিডার্স করেসপণ্ডেন্স, পৃঃ ৩৮-৫০, জিন্নার কাছে সুভাসচন্দ্র বসুর মন্তব্য ১৪ মে ১৯৩৮, AIML, ফাইল নং ১২২

১৫৮। অ্যালেন হেস মেরিয়াম, গান্ধী ভার্সাস জিন্না (কলকাতা, ১৯৮০), পৃঃ ৬১

১৫৯। হেক্টর বলিথো, জিন্না পৃঃ ১১৬-১৭

১৬০। জেটল্যাণ্ডকে ব্রেবোর্ন, ১৯ আগস্ট ১৯৩৮, Eur Mss F 125/5

১৬০ক। সুভাষ বসুকে শরৎ বসু, ১৫ জুলাই ১৯২৫, বসু, করেসপণ্ডেন্স

১৬১। ব্রুমফিল্ড, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৩০১-০২

১৬২। ৯ মে ১৯৩৩, আই এ আর, ১৯৩৩, ১ খণ্ড, পৃঃ ২২

১৬৩। গান্ধীকে নেহরু, ৩০ মার্চ ১৯৩৭, নেহরু, আ বাঞ্চ অব ওল্ড লেটার্স (২ সং) পৃঃ ১১৭

১৬৪। প্যাটেলকে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত তার, ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩১, এ আই সি সি ফাইল নং p-6/1927 part I (১৯২৭ ফাইলের তারিখ হতে পারে না) ঐ, হেমন্তকুমার বসুর তার, ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩১, তদেব

১৬৫। হোম পল, ফাইল নং ১৩৬ অব ১৯৩১

১৬৬। সুভাষচন্দ্র বসু, ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল, পৃঃ ২৪৪

১৬৭। কে কুর্তি, সুভাষ বোস অ্যাজ আই নিউ হিম (কলকাতা, ১৯৬৫), পৃঃ ৩০

১৬৮। হোম পল ফাইল নং 183/II, 18/IV, 18/VI অব ১৯৩৪। সরোজ মুখার্জি এই সময় গান্ধী বয়কট কমিটির সম্পাদক।

১৬৯। সুভাষচন্দ্র বসু, ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল, পৃঃ ৩০৫

১৬৯ক। জওহরলাল নেহরু, সিলেক্টেড ওয়ার্কস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭৮-৯৬

১৭০। মেরী হেলকে বিবেকানন্দ, ৩০ অক্টোবর ১৮৯৯, বিবেকানন্দ, কমপ্লিট ওয়ার্কস, অষ্টম খণ্ড পৃঃ ৪৭৫-৭৮

১৭১। নিবেদিতা, নোটস অন সাম ওয়ানডারিংস উইথ স্বামী বিবেকানন্দ

১৭২। বিবেকানন্দ, কমপ্লিট ওয়াকস, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৪৯-৬৯ ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৮২

১৭৩। সিলেক্টেড স্পিচেস অব সুভাষচন্দ্র বোস (ভারত সরকার, ১৯৬২), পৃঃ ৫৩

১৭৪। তদেব, পৃঃ ৫৮

১৭৫। তদেব, পৃঃ ৪৩

১৭৬। সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণ (৪ জুলাই ১৯৩১), তদেব, পৃঃ ৬০

১৭৭। এই প্রসঙ্গে সেনাটার, এ্গার ওয়াইডেম্যান প্রভৃতি পূর্ব জার্মানি গবেষকদের মতামত, কৃষ্ণা বসু, ইতিহাসের সন্ধানে (কলকাতা, ১৯৭২)

১৭৮। কে আর পপার, দ্য ওপন সোসাইটি অ্যাণ্ড ইটস এনিমিজ, ২য় খণ্ড, হেগেল অ্যাণ্ড মার্ক্স

১৭৯। সুভাষচন্দ্র বসু, ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল, পৃঃ ৩১৩-১৪, ৩৮১-৮৬

১৭৯ক। ডেইলি ওয়ার্কার (লন্ডন), ২৪ জানুয়ারি ১৯৩৮

১৮০। বসু-রোলাঁ সাক্ষাৎকার, মডার্ন রিভ্যু, সেপ্টেম্বর ১৯৩৫

১৮১। ১৭ জানুয়ারি ১৯৩৮-এ জেটল্যান্ড ও বসুর সাক্ষাৎকারের ওপর নোট, লিনলিথগোকে জেটল্যান্ড, ২৪

জানুযারি ১৯৩৮-এব অন্তর্ভুক্ত। Eur Mss F125/5

১৮২। কৃষ্ণ মেননকে বামমনোহব লোহিয়া, ২২ জুলাই ১৯৩৭, কৃষ্ণ মেননকে নেহরু, ৭ অগাস্ট ১৯৩৭, জেটল্যান্ডকে লিনলিথগো, ৬ এপ্রিল ১৯৩৮-এব অন্তর্ভুক্ত। তদেব

১৮৩। জেটল্যান্ডকে লিনলিথগো, ১৫ মার্চ ১৯৩৮, তদেব

১৮৪। জেটল্যান্ডকে লিনলিথগো, ৬ এপ্রিল ১৯৩৮, তদেব

১৮৫। গোয়েন্দা দফতবের সংবাদ, ঐ

১৮৬। হবিপুবা ভাষণ, সিলেক্টেড স্পিচেস অব সুভাষচন্দ্র বোস, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৬৭-৮৭

১৮৭। এ-আই-সি-সি ফাইল নং G 39/1938

১৮৮। মহাদেব দেশাইকে ঘনশ্যামদাস বিড়লা, ৪ সেপ্টেম্বব ১৯৩৭, বিড়লা, ইন দ্য স্যাডো অব দ্য মহাত্মা, পৃঃ ২২৭

১৮৯। হরিজন, ২৩ অক্টোবব, ১৯৩৭। গান্ধী আহমদাবাদ বস্ত্র শ্রমিক সংগঠনেব নেতা ব্যাঙ্কাব ও নন্দাকে বলেন, তাঁদেব অন্যান্য য়ুনিযনেব সঙ্গে ঐক্যেব প্রযোজন নেই।

১৯০। সুবেন্দ্রনাথ দ্বিবেদী, মো জীবন সংগ্রাম (ওড়িযা ভাষায, কটক, ১৯৮৪) পৃঃ ১০৮-৯

১৯১। জেটল্যাণ্ডকে লিনলিথগো, ২০ এপ্রিল ১৯৩৮, Eur Mss F 125/III

১৯২। ঐ, ১২ মে, ১৯৩৮-এর অন্তর্ভুক্ত, তদেব

১৯৩। জেটল্যান্ডকে ব্রেবোর্ন, ৯ সেপ্টেম্বব, ১৯৩৮, তদেব (লিনলিথগো ছুটি নিলে ২৫ জুন ব্রেবোর্ন অস্থাযী বড়লাট হন।)

১৯৪। জেটল্যাণ্ডকে ব্রেবোর্ন, ৫ অগাস্ট ১৯৩৮, তদেব

১৯৫। পট্টভি সীতাবামাযা, হিস্টবি অব দ্য কংগ্রেস, ২য খণ্ড, পৃঃ ১০৪

১৯৬। জেটল্যাণ্ডকে ব্রেবোর্ন, ৭ অক্টোবব ১৯৩৮-এব অন্তর্ভুক্ত জে এ থর্নেব নোট, ৬ অক্টোবব ১৯৩৮ Eur Mss F 125/III

১৯৭। ডি আই বি বিপোর্ট নং ৪১, ২২ অক্টোবব ১৯৩৮। ব্রেবোর্ন তবু আশা কবেছিলেন যে গান্ধী 'নিষ্ক্রিয সহাযতা' কববেন। জেটল্যাণ্ডকে ব্রেবোর্ন, ২২ অক্টোবব ১৯৩৮, তদেব

১৯৮। জেটল্যাণ্ডকে লিনলিথগো, ২ নভেম্বব ১৯৩৮, তদেব, গান্ধী, হবিজন, ২৯ অক্টোবব ১৯৩৮

১৯৯। জেটল্যাণ্ডকে লিনলিথগো, ২ জুন ১৯৩৮, Eur Mss F 125/III

২০০। গ্লান্সিকে ক্রাইন, ১৮ নভেম্বব ১৯৩৮, জেটল্যাণ্ডকে লিনলিথগো, ৩০ নভেম্বব ১৯৩৮-এব অন্তর্ভুক্ত। তদেব

২০১। ঐ, তদেব

২০২। বিড়লাব সঙ্গে সাক্ষাৎকাবেব বিববণ, জেটল্যাণ্ডকে লিনলিথগো, ২০ ডিসেম্বব ১৯৩৮-এব চিঠিব অন্তর্ভুক্ত। তদেব

২০৩। ঐ, তদেব

২০৪। নীবদ সি চৌধুবী, দাই হ্যাণ্ড, গ্রেট অ্যানার্ক ইণ্ডিযা ১৯২১-১৯৫২ (লণ্ডন, ১৯৮৭), পৃঃ ৪৭৯ ও পববর্তী, লেনার্ড এ গর্ডন, বেঙ্গল দ্যা ন্যাশানালিস্ট মুভমেণ্ট ১৮৭৬-১৯৪০ (কলম্বিযা, ১৯৭৪), পৃঃ ২৮৩-৮৫। নীবদবাবু লিখছেন, গর্ডন তাঁব কাছে বক্ষিত কাগজপত্র দেখেছিলেন। চৌধুবী, পৃঃ উঃ, পাদটীকা, পৃঃ ৪৭৯

২০৫। জেটল্যাণ্ডকে লিনলিথগো, ৩ জানুযাবি ১৯৩৯, Eur Mss F 125/IV

২০৬। নেহরুকে প্যাটেল, ৮ ফেব্রুযাবি ১৯৩৯ নেহরু, আ ব্রাঞ্চ অব ওলড লেটার্স, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৩২২

২০৭। নেহরুকে গান্ধী, ৮, ১৫, ৩০ জুলাই ১৯৩৬, এস গোপাল, পৃঃ উঃ, পৃঃ ২১১-১৩।

২০৮। মহাত্মা গান্ধী, Internal Decay, হবিজন, ২৮ জানুযাবি ১৯৩৯

২০৯। মহাত্মা গান্ধীব বিবৃতি, ৩১ জানুযাবি, ১৯৩৯

২১০। জেটল্যাণ্ডকে লিনলিথগো, ৩১ জানুযাবি ১৯৩৯, Eur.Mss 125/IV

২১১। সুভাষচন্দ্র বসু, দ্য ইণ্ডিযান স্ট্রাগল, পৃঃ ৩৩৬

২১২। দিলীপকুমাব বায, নেতাজি—দ্য ম্যান, পৃঃ ৮২

২১৩। সুভাষ বসুকে নেহরু, ২০ এপ্রিল ১৯৩৯, নেহরু, আ ব্রাঞ্চ অব ওল্ড লেটাস, পৃঃ ৩৫৪

২১৪। জেটল্যাণ্ডকে লিনলিথগো, ২৮ ফেব্রুযাবি ১৯৩৯, Eur. Mss F 125/IV

২১৫। ঐ, ১৪ মার্চ ১৯৩৯, তদেব

২১৬। ঐ, ৭ মার্চ ১৯৩৯, তদেব

২১৭। ঐ, ২৮ ফেব্রুযাবি ১৯৩৯, তদেব

২১৮। ঐ, ২১ মার্চ ১৯৩৯, তদেব

২১৯। বড়লাট ও জিন্না কি কবতে চান বুঝতে পাবছিলেন না কারণ তিনি "Keeps things too much in his own hands and is too much concerned to run a purely personal policy on a basis of mystery." এই বহস্যেব সন্ধান কেউ কবতে পাবেনি। জেটল্যাণ্ডকে লিনলিথগো, ১৭ এপ্রিল, ১৯৩৯, তদেব

২২০। বিশপদেব পোপ, না সম্রাট কে নিযুক্ত করবেন এ নিয়ে মধ্যযুগে যে তুমুল বিতর্ক ওঠে (investiture contest) তাতে পোপ সপ্তম গ্রেগবী জেতেন এবং সম্রাট চতুর্থ হেনরীকে অনুতপ্ত হযে তাঁব দববাব ক্যানোসায়

(Canossa) আসতে বাধ্য করেন। সেই থেকে Journey to Canossa'র অর্থ অপমানজনক শর্তে বশ্যতা স্বীকার।

২২১। গান্ধীকে সুভাষ বসুর তার, ১৫ মার্চ, ১৯৩৯, নীরদ সি চৌধুরী, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৫১৬

২২২। তদেব, পৃঃ ৫১৭

২২৩। শরৎ বসুকে গান্ধী, ২৩ মার্চ ১৯৩৯, তদেব, পৃঃ ৫১৮-১৯

২২৪। শরৎ বসুকে নেহরু, ২৪ মার্চ, ১৯৩৯, তদেব, পৃঃ ৫২২, নেহরু, আ বাঞ্চ অব ওল্ড লেটার্স, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৩২৪-২৮

২২৫। সুভাষ বসুকে গান্ধী, ১০ এপ্রিল ১৯৩৯, মহাত্মা গান্ধী, সম্পূর্ণ রচনাবলী, ৬৯ খণ্ড, পৃঃ ৯৬-৯৮

২২৬। নেহরুকে সুভাষ বসু, ২৮ মার্চ ১৯৩৯, নেহরু, আ বাঞ্চ অব ওল্ড লেটার্স, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৩২৯-৪৯, নেহরুর উত্তর, ৩ এপ্রিল ১৯৩৯, তদেব, পৃঃ ৩৫০-৬৩

২২৬ক। অমিয়নাথ বসুকে সুভাষ বসু, ১৭ এপ্রিল ১৯৩৯, এন জি যোগ, ইন ফ্রীডমস্ কোয়েস্ট (কলকাতা, ১৯৬৯), পৃঃ ১৫৮

২২৭। এস গোপাল, পৃঃ উঃ, পৃঃ ২৪৩

২২৮। হীরেন মুখার্জি, দ্য জেন্টল কলোসাস (কলকাতা, ১৯৬৪), পৃঃ ৮০

২২৮ক। সুভাষ বসুকে নেহরু, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯, একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি। নেহরু, সিলেক্টেড ওয়ার্কস, নবম খণ্ড, পৃঃ ৪৮০-৮৫

২২৮খ। কৃষ্ণ মেননকে নেহরু, ১৬ মার্চ ১৯৩৯, তদেব, পৃঃ ৫২৪

২২৯। গান্ধীকে নেহরু, ১৭ এপ্রিল ১৯৩৯, নেহরু, আ বাঞ্চ অব ওল্ড লেটার্স, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৩৭৯-৮০, ন্যাশানাল হেরল্ড পত্রিকায় প্রকাশিত (২৮ ফেব্রুয়ারি, ১-৬ মার্চ) Where are we ? প্রবন্ধাবলীতে homogeneity-কে তিনি সংকীর্ণ আখ্যা দেন।

২৩০। কৃষ্ণ মেননকে নেহরু, ৪ এপ্রিল ১৯৩৯, নেহরু, সিলেক্টেড ওয়ার্কস, নবম খণ্ড, পৃঃ ৫৫০

২৩১। জেটল্যাণ্ডকে লিনলিথগো, ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯, Eur Mss F 125/IV

২৩২। লিনলিথগোকে জেটল্যাণ্ড, ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯

২৩৩। মাইকেল ব্রেচার, নেহরু আ পলিটিক্যাল বায়োগ্রাফি, পৃঃ ২৪৫

২৩৪। পট্টভি সীতারামায়া, দ্য হিস্টরি অব দ্য ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল কংগ্রেস, ২ খণ্ড, পৃঃ ৬৭৯

২৩৫। এ কে মজুমদার, অ্যাডভেন্ট অব ফ্রীডম, পৃঃ ১৫৫। এ বিষয়ে কৃষ্ণা বসু জানাচ্ছেন, এন জি গনপুলে সুভাষের সঙ্গে জার্মান অফিসারদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেন। "কোনো গোপনতার প্রশ্ন ছিল না এই সাক্ষাৎকারের একটি রিপোর্ট এই দুই অফিসার বার্লিনে পাঠান। আলেকজাণ্ডার ওয়ার্থের বই Der Tiger Indians-এ মূল রিপোর্টটি মুদ্রিত আছে। এর ইংরেজী অনুবাদ নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোতে রক্ষিত আছে।" কৃষ্ণার মতে এতে সুভাষ জার্মানদেরই কঠোর সমালোচনা করেছেন। অর্থাৎ, ষড়যন্ত্রের প্রশ্নই ওঠে না। দেশ, ৫ নভেম্বর ১৯৮৮, পৃঃ ৭-৮

২৩৬। জেটল্যাণ্ডকে লিনলিথগো, ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯, Eur Mss F 125/IV

২৩৭। A. I C C. Mss, file no G/20/1939/part III গোয়েন্দাকর্তা ইউয়ার্টের উইকলি রিপোর্ট নং ১৭, ৬ মে, ১৯৩৯ বলছে, "There is no question that the Mahatma and his friends have delivered a decisive blow to Subhas Bose"

রাজেন্দ্র প্রসাদ লিখছেন, প্রথম দিনের অধিবেশনে পন্থ, দেশাই ও কৃপালনি নিগৃহীত হন। পরের দিন গোলমালের আশঙ্কা দেখা দেয় ও আলোচনা শুরু হয় কে সভাপতি হবেন। জওহরলাল অস্বীকার করেন। মৌলানার পায়ে চোট লাগায় তিনিও বিবেচিত হননি রাজেন্দ্র প্রসাদ আপত্তি জানান কিন্তু "Gandhiji directed me to take up the responsibility" পরের দিন সুভাষ পদত্যাগ পেশ করলে এ আই সি সি তা গ্রহণ করে, ও রাজেন্দ্র প্রসাদ সভাপতি হন। কিছু গোলমাল হয়। পথে রাজেন্দ্র প্রসাদের কুর্তা টানাটানির বেশি কিছু নয়। "I only lost a few buttons and reached home safely" পরে তিনি বিধান রায়ের বাড়ির সামনে ও ভেতরে ভাঙচুরের কথা শুনেছেন। অটোবায়োগ্রাফি (বোম্বে, ১৯৫৭) পৃঃ ৪৮৫-৮৬

২৩৭ক। সরোজ মুখার্জি, পৃঃ উঃ, পৃঃ ১৫২-৫৩

২৩৮। রাজেন্দ্র প্রসাদ অন্য কারণ দিয়েছেন। তাঁর মতে কংগ্রেসীরা অনেকে বিনা কারণে মন্ত্রীদের পেছনে লাগত। তিনি সি পি-র বহিষ্কৃত মুখ্যমন্ত্রী খারে, পন্থ-বিরোধী সুভাষের দল ও উড়িষ্যার নীলকণ্ঠ দাসের উল্লেখ করেছেন। তাদের জন্যই এই প্রস্তাব। তদেব, পৃঃ ৪৮৮-৮৯

২৩৯। তদেব, ৪৮৯-৯০, এ আই আর ১৯৩৯, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩

২৪০। ঐ, পৃঃ ১৫

২৪১। বেঙ্গল গভর্নর, সিচ্যুয়েশন রিপোর্ট, ডিসেম্বর ১৯৩৯, ফাইল নং P/J/310/1940 (I O)

২৪২। মহাত্মা গান্ধী, হরিজন, ২৬ আগস্ট ১৯৩৯

২৪৩। ফরোয়ার্ড ব্লক, ৩০ ডিসেম্বর ১৯৩৯

২৪৪। Policy and Activities of the Terrorist parties in Bengal from 1937 to August 1939, compiled from I. B. and C. I. D, Bengal; জে এম ইউয়ার্ট, Communism in India, Home Pol no

F 7/6 of 1939

২৪৫। মাসানি স্বীকার করেছেন—জয়প্রকাশ ছিলেন তৃতীয় ইন্টারন্যাশনালভুক্ত মার্কসিস্ট ও তিনি নিজে ব্রিটিশ লেবার পার্টির অর্থাৎ দ্বিতীয় ইন্টারন্যাশনালের সভ্য। এম আর মাসানি, দ্য কমুনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (লন্ডন, ১৯৫৪), পৃঃ ৫৩

২৪৬। রাজেন্দ্র প্রসাদকে নেহরু, ১১ জুলাই ১৯৩৯, নেহরু সিলেক্টেড ওয়ার্কস, নবম খণ্ড, পৃঃ ৩৫২

২৪৭। সরোজ মুখার্জী, কম্যুনিস্ট পার্টি ও আমরা, ১ম খণ্ড, পৃঃ উঃ, পৃঃ ১৫৮-৫৯

২৪৮। জয়প্রকাশ নারায়ণ, সোস্যালিস্ট য়ুনিটি অ্যান্ড দ্য কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি (১৯৪১), পৃঃ ২৪, মাসানি সম্বন্ধে তিনি লিখছেন, "He was the first to see through their game of disruption and capture, played under the cover of unity"

২৪৯। Communism in India, পৃঃ উঃ

২৫০। হোম পল্ এফ ৩৭/৪৩ অব ১৯৩৯

২৫১। স্বরাষ্ট্র দফতরের এফ এচ পাক্‌ল-এর প্রতিবেদন, হোম পল প্রতিবেদন, হোম পল, এফ ৪৫/৪

২৫২। পাক্‌লের প্রতিবাদে ব্র্যানডেন, Appendix to Puckle and Euart, 9 May 1939; Policy and Activities, etc পৃঃ উঃ, পাদটীকা ২৪৪, 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি'তে যাদু গোপাল লিখেছেন, সুভাষবাবুকে তিনি শর্তাধীন সমর্থন জানান। কিন্তু ১৯৩৯ সালে সভাপতি পদে দাঁড়াতে সাহায্য করলেও পদত্যাগের পরবর্তী কাজ সমর্থন করেননি। ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৪৫৬-৫৮। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর কমিন্টার্নের বাইরে গড়েন কম্যুনিষ্ট লীগ। সৌমেন্দ্রনাথের 'যাত্রী'তে এর উল্লেখ আছে।

২৫৩। গোয়েন্দা দফতর no 29/Cong /40 I B (Home), 20 March 1940

২৫৩ক। জন গ্লেন্ডোভেন, দ্য ভাইসরয় অ্যাট বে (১৯৭১), পৃঃ ১৩৬ ও পরবর্তী

২৫৪। নেহরু সিলেক্টড ওয়ার্কস, দশম খণ্ড, পৃঃ ১২২-৩৮

২৫৫। অ্যাগাথা হ্যারিসনকে নেহরু, ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯, তদেব, পৃঃ ১৪৩

২৫৬। তদেব, পৃঃ ১৫৫

২৫৭। জেটল্যান্ডকে লিনলিথগো, ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯, Eur Mss F 125/IV

২৫৮। ঐ, ১৯ জুলাই ১৯৩৯-এর অন্তর্ভুক্ত

২৫৯। জিন্নার সঙ্গে ৪ সেপ্টেম্বরের সাক্ষাৎকার, জেটল্যান্ড পেপার্স, ১৮ খণ্ড, গ্লেন্ডোভেন, দ্য ভাইসরয় অ্যাট বে, পৃঃ ১৩৮

২৬০। লিনলিথগোকে নেহরু, ৬ অক্টোবর ১৯৩৯, হেইগ পেপার্স ৭ম খণ্ড

২৬১। মরিস গাইয়ার ও আপ্পাডোরাই, স্পিচেস অ্যান্ড ডকুমেন্টস্ অন দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিট্যুশন, ১৯২১-১৯৪৭, ২য় খণ্ড (অক্সফোর্ড, ১৯৫৭), পৃঃ ৪৯০

২৬২। ন্যাশনাল হেরাল্ড সম্পাদকীয়, ১৮ অক্টোবর ১৯৩৯

২৬৩। নেহরু, সিলেক্টেড ওয়ার্কস, ১০ম খণ্ড, পাদটীকা ৩, পৃঃ ২০৩, কৃষ্ণ মেননকে তার, ২৫ অক্টোবর, তদেব, পৃঃ ২০৭

২৬৪। জেটল্যান্ডকে লিনলিথগো ২৫ অক্টোবর ১৯৩৯, F125/18/409, ঐ, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৩৯ তারবার্তা।

২৬৫। এডওয়ার্ড টমসনকে নেহরু, ১১ নভেম্বর ১৯৩৯, নেহরু, সিলেক্টেড ওয়ার্কস, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৬

২৬৬। কৃষ্ণ মেননকে নেহরু, ৮ নভেম্বর ১৯৩৯, তদেব পৃঃ ২৩১

২৬৭ গান্ধী, হরিজন, ১১ নভেম্বর ১৯৩৯

২৬৮। নেহরু, A Confidential Note on Congress Policy, Wardha, 20 January 1940. Nehru Papers, J N M M L

২৬৯। চেম্বারলেনকে জেটল্যান্ড, ১ ডিসেম্বর ১৯৩৯

২৭০। জেটল্যান্ডকে লিনলিথগো, ২১ ডিসেম্বর ১৯৩৯

২৭১। স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্‌কে নেহরু, ১৭ জানুয়ারি ১৯৪০, সিলেক্টেড ওয়ার্কস, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৩০১

২৭২। হোম পল, ফাইল ৪/১৭ অব ১৯৪০, সিক্রেট, no 29/Cong/40, I.B (Home) ২০ মার্চ, ১৯৪০, সার্কুলার মেমোরেন্ডাম

২৭৩। গান্ধীকে নেহরু, ২৪ জানুয়ারি ১৯৪০ আ বাঞ্চ অব ওল্ড লেটার্স, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৪২৪-২৫

২৭৪। কে এম মুন্সি, ইন্ডিয়ান কনস্টিট্যুশনাল ডকুমেন্টস্, ১ম খণ্ড (বোম্বাই ১৯৬৭), অ্যাপেনডিক্স, ১৪৪

২৭৫। জেটল্যান্ডকে লিনলিথগো, ১৩, ২১, ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০ ও তারবার্তা ৮ মার্চ ১৯৪০

২৭৬। গান্ধীকে নেহরু, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০

২৭৭। আজাদকে নেহরু, ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০, সিলেক্টেড ওয়ার্কস, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩০-৩৪

২৭৮। কৃষ্ণ মেননকে নেহরু, ২ মার্চ ১৯৪০, তদেব, পৃঃ ৩৪৩

২৭৮ক। ক্রুদ্ধ নেহরু কৃষ্ণ মেননকে লিখেছেন, "Subhas Bose is going to pieces and has definitely ranged himself against the Congress" মেননকে নেহরু, ২ মার্চ ১৯৪৬, সিলেক্টেড ওয়ার্কস, ১০ম খণ্ড, পৃঃ

২৭৯। এ আই সি সি ফাইল G 32 of 1940

২৮০। Pakistan, the Fatherland of the Pak Nation (rev edn, Lahore, 1978) পৃঃ ২২৮-২৯। জাফরুল্লার মন্তব্য—'utterly impracticable'

২৮১। Minutes of A. I M L Working Committee, 3-6 February 1940, Quaidi Azam Papers, File no 137

২৮২। জাফরুল্লার মন্তব্য, Eur Mss, F 125/135, Sl no. 20, Vol V, M 119-50 (I O) লিনলিথগো জাফরুল্লা প্রস্তাবের কথা জানতেন।

২৮৩। নইম (সং) ইকবাল, জিন্না অ্যান্ড পাকিস্তান (সাইরাকিউজ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৯), পৃঃ ১৮৬

২৮৪। জেটল্যান্ডকে লিনলিনগো, ২৫ মার্চ ১৯৪০, এমেরিকে লিনলিথগো, ৩০ জুন ১৯৪০ তারবার্তা

২৮৫। গ্রেনডোভেন, পৃঃ উঃ, পৃঃ ১৭৪

২৮৬। গ্রেনডোভেন, পৃঃ উঃ, পৃঃ ১৮২

২৮৮। লিনলিথগোকে এমেরি, ৫ জানুয়ারি ১৯৪২, Eur Mss. F125/11

২৮৯। মরিস গইয়ার ও আপ্পাডোরাই, পৃঃ উঃ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫০৫-৬

২৯০। বড়লাটের তার ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৪০, ভাবতসচিবের তার, ১৩ ও ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৪০, হোম ডিপার্টমেন্ট, ফাইল নং ৩/১৩/৪০ পল (I)

২৯১। গ্রেনডোভেন, পৃঃ উঃ, পৃঃ ১৮৫

২৯২। লিনলিথগোকে এমেরি, ১৪ নভেম্বর ১৯৪০, লিনলিথগো পেপার্স, নবম খণ্ড।

২৯৩। ম্যানসারগ্ ও লাম্বির সম্পাদনায় যে The Transfer of Power 1942-47 শীর্ষক দলিল সংগ্রহ বেবিয়েছিল তাতে একসিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যসংখ্যা দেওয়া আছে—১২ (৮+৪), ও জাতীয় প্রতিবক্ষা কাউন্সিলেব সদস্যসংখ্যা—২৯. প্রথম খণ্ড Document 43. p 84

২৯৪। অ্যালান বুলক, হিটলার, এ স্টাডি ইন টিবানি (পেলিক্যান, ১৯৬২). পৃঃ ৫৮৭-৮৮

২৯৫। মাইন কাম্ফ, ২য় খণ্ড C. 14

২৯৬। অমলেশ ত্রিপাঠী, গণতান্ত্রিক পররাষ্ট্রনীতি, ইতিহাস ও ঐতিহাসিক (কলকাতা, ১৯৮৭)

২৯৭। উইনস্টন চার্চিল, দ্য সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩০৫

২৯৮। নাৎসী-সোভিয়েত রিলেশনস, পৃঃ ৩২৪ ও পববর্তী

২৯৯। উইনস্টন চার্চিল, পৃঃ উঃ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৩২

৩০০। আইজ্যাক ডয়সার, স্তালিন আ পলিটিক্যাল বায়োগ্রাফি (লন্ডন, পেপাব ব্যাক ১৯৬১), পৃঃ ৪০৩

৩০১। হোম পল, ফাইল নং ৪৪/৩২ অব ১৯৪২

৩০২। সরোজ মুখার্জী, কম্যুনিস্ট পার্টি ও আমরা, ১ম খণ্ড, পৃঃ উঃ, পৃঃ ২০৯

৩০৩। ই. এম. এস. নাম্বুদ্রিপাদ, Reminiscences of an Indian Communist (N D 1987) পৃ উঃ, পৃঃ ৮৭

৩০৪। সিক্রেট, no 7/2/42, Political (I) G I, Home, dt 10 1 1942

৩০৫। শিশির কুমার বসু, মহানিষ্ক্রমণ (কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ১৯৮৭)

৩০৫ক। রিমুন্ড ম্যাবেল, Tiger and Jackal German-India Politics 1941-1943 A Document Report (Vienna) 1968-তে মূল জার্মান বচনা—আসলে দলিল সংকলন—প্রকাশিত হয়েছিল। ইংবেজী অনুবাদ করেছেন ডঃ সত্যানন্দ গুহ। এটি একেবারে আক্ষরিক অনুবাদ এবং অত্যন্ত মূল্যবান। আমাব ইচ্ছা এটিকে শীঘ্র প্রকাশ করা।

৩০৬। টটেনহ্যাম-এর পত্র, ১৫ এপ্রিল ১৯৪২, হোম পল ফাইল নং ৪৪/৩২ অব ১৯৪২

৩০৭। পিলডিচের মন্তব্য, ২৭ এপ্রিল ১৯৪২, তদেব

৩০৮। এমেরিকে বেভিন, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৪১, বেভিন কলেকশন ৩/১

৩০৯। লর্ড প্রিভিসীলকে চার্চিল, ৭ জানুয়ারি ১৯৪২, চার্চিল, দ্য সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়াব, ৩ খণ্ড, পৃঃ ৬১৪

৩১০। এমেবিকে লিনলিথগো, ২১ জানুয়ারি ১৯৪২। ম্যানসাবগ্, লাম্বি, মুন (সং), দ্য ট্রান্সফার অব পাওয়াব, ১ খণ্ড, সি এম ২৩, এমেরির মেমো, ২৮ জানুয়াবি ১৯৪২ তাঁকে সমর্থন করে। তদেব, ডক্যুমেন্ট ৪৩, পৃঃ ৮১

৩১১। অ্যাটলির মেমো, ২ ফেব্রুয়ারি তদেব,সি এম ৬০, পৃঃ ১১০-১২

৩১১ক। লিনলিথগোকে এমেবি, ২১ ফেব্রুযারি ১৯৪২, তদেব, ডক্যুমেন্ট ১৬৩, পৃ ২১৭-১৮

৩১১খ। এমেরিকে নুন, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪২, ডক্যুমেন্ট ১৯৮, তদেব, পৃঃ ২৭০-৭১

৩১১গ। লিনলিথগোকে এমেরি ১ মার্চ ১৯৪২, ডক্যুমেন্ট ২০৩, তদেব. চার্চিলকে এমেরি, ২ মার্চ, ডক্যুমেন্ট ২০৬, তদেব।

৩১১ঘ। রুজভেল্টকে চার্চিলের তাব, ডক্যুমেন্ট ২২৮, তদেব, পৃঃ ৩১১

৩১১ঙ। এমেরি ১০ মার্চ বড়লাটকে লেখেন, একটা মুখ্যত রক্ষণশীল দল ভারতীয়দের দিয়ে মানিয়ে নেবার জন্য এ

চাল চালেন। "There is much to be said for sending out some one who has always been an exterme left winger and in close touch with Nehru and the Congress" ডক্যুমেন্ট ৩০৪, ম্যানসারগ ইত্যাদি (সং), দ্য ট্রান্সফার অব পাওয়ার, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৪০২। ১৯ মার্চের চিঠিতে এমেরি বলেন, এর উদ্দেশ্য নয় চার্চিলের কোন প্রতিদ্বন্দ্বীকে বিপদে ফেলা। ডক্যুমেন্ট ৩৪৯, তদেব

৩১২। অ্যানেক্স টু ডক্যুমেন্ট ২৬৫, তদেব পৃঃ ৩৫৭-৫৮, অ্যানেক্স টু ডক্যুমেন্ট ২৮৩, তদেব পৃঃ ৩৮০

৩১৩। লিনলিথগোকে চার্চিল, ১০ মার্চ ১৯৪২

৩১৪। লিনলিথগোকে এমেরির তার, ১০ মার্চ ১৯৪২, সি এম ৩০৪

৩১৫। ক্রিপস তাঁর এ ব্যাখ্যা চার্চিলকে তার মারফত জানান ৪ এপ্রিল ১৯৪২, সি এম ৫১৯, ক্রিপসের প্রেস কনফারেন্স বক্তৃতা ২২ এপ্রিল ১৯৪২, সি এম ৬৬৫

৩১৬। আর জে মুর, চার্চিল, ক্রিপস্ অ্যান্ড ইন্ডিয়া ১৯৩৯-৪৫ (১৯৭৯), পৃঃ ৮১

৩১৭। ক্যাপল্যান্ডের ডায়েরি, ২৬ মার্চ ১৯৪২

৩১৮। তদেব, ৯ মার্চ ১৯৪২

৩১৯। ক্রিপসের নোট, ২৩ মার্চ ১৯৪২, সি এম ৩৬৮, হডসন, দ্য গ্রেট ডিভাইড, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৯৮

৩২০। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৫৭, ক্রিপসের নোট, ২৫ মার্চ, ১৯৪২, সি এম ৩৭৯

৩২১। হডসন, পৃঃ উঃ, পৃঃ ১০৩

৩২২। বি শিবরাও, 'ইন্ডিয়া--১৯৩৫-৪৭', ফিলিপস ও ওয়েনরাইট (সং), দ্য পার্টিসন অব ইন্ডিয়া পলিসিজ অ্যান্ড পারসপেক্টিভস্, ১৯৩৫-৪৭ (১৯৭০), পৃঃ ৪২৮

৩২৩। সি এম ৩৮৭

৩২৪। সি এম ৪৪০

৩২৪ক। গান্ধী এইসব কথা লুই ফিসারকে আরও পরিষ্কার ভাবে বলেন ১৯৪২-এর ৪ জুন। লুই ফিসার, এ উইক উইথ গান্ধী, পৃঃ ১৪-২০

৩২৫। সি এম ৪১২ ও ৪১১

৩২৬। সি এম ৪৪০

৩২৭। পিনেলের ডায়েরি, ৩০ মার্চ ১৯৪২, সি এম ৪৫৪

৩২৮। তদেব

৩২৯। আর জি ক্যাপল্যান্ড, ইন্ডিয়ান ডায়েরি, ১৯৪১-৪২ (অক্সফোর্ড), ৩১ মার্চ ১৯৪২

৩৩০। সি এম ৪৪৯, ক্যাপল্যান্ডের ডায়েরি, ৩১ মার্চ ১৯৪২, ম্যানসারগ ইত্যাদি (সং), দ্য ট্রান্সফার অব পাওয়ার, ১ম খণ্ড, পৃ ৫৫৭-৫৮

৩৩১। হোম পল ২২১/৪২

৩৩২। সি এম ৫০৭

৩৩২ক। জওহরলাল নেহরু, সিলেক্টেড ওয়ার্কস, ১১ খণ্ড, পৃঃ ১৮৮-৮৯, ম্যানসারগ ইত্যাদি (সং), দ্য ট্রান্সফার অব পাওয়ার, ১ খণ্ড, পৃ ৬০৯

৩৩৩। ক্যাপল্যান্ডের ডায়েরি, ৩ এপ্রিল ১৯৪২

৩৩৪। এমেরি ও চার্চিলকে লিনলিথগো, ৬ এপ্রিল ১৯৪২, সি এম ৫৩০

৩৩৫। ভি পি মেনন, দ্য ট্রান্সফার অব পাওয়ার ইন ইন্ডিয়া (ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৯৫৭), পৃঃ ১২৭-২৮

৩৩৬। জনসন-নেহরু সাক্ষাৎকার, ম্যানসারগ ইত্যাদি (সং), দ্য ট্রান্সফার অব পাওয়ার, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৬৫-৬৬

৩৩৭। বিভিন্ন ফর্মুলার জন্য তদেব, পৃ ৬৯৯-৭০০। নেহরু জনসনকে কংগ্রেসের দাবি স্পষ্ট করে জানান ৮ এপ্রিলের চিঠিতে। নেহরু, সিলেক্টেড ওয়ার্কস, ১২ খণ্ড, পৃঃ ১৯৭-৯৯

৩৩৮। ভাইসরয়কে ওয়ার ক্যাবিনেট ১০ এপ্রিল ১৯৪২, ক্রিপসকে চার্চিল, ১০ এপ্রিল ১৯৪২। ম্যানসারগ ইত্যাদি (সং), দ্য ট্রান্সফার অব পাওয়ার, পৃঃ ৭২০-২৬

৩৩৯। ক্রিপসকে আজাদ, ১০ এপ্রিল ১৯৪২ (নেহরুর খসড়া), তদেব, পৃঃ ৭২৬-৩০

৩৪০। ক্যাপল্যাণ্ডের ডায়েরি, ১০ এপ্রিল ১৯৪২

৩৪১। ক্রিপসকে অ্যাগাথা হ্যারিসন, ১৫ জানুয়ারি ১৯৪৩

৩৪২। ক্রিপসকে আজাদ, ১১ এপ্রিল ১৯৪২ (নেহরুর খসড়া), ম্যানসারগ ইত্যাদি (সং), দ্য ট্রান্সফার অব পাওয়ার, পৃঃ ৭৪৩-৪৫, কৃষ্ণ মেননকে নেহরু, ১৩ এপ্রিল, ১৯৪২, হোম পল ২২৫/৪২

৩৪৩। ইভলিন উডকে নেহরু, ৫ জুন ১৯৪২, নেহরু, সিলেক্টেড ওয়ার্কস, ১২ খণ্ড পৃঃ ২৪১-৪২

৩৪৪। লিনলিথগোকে এমেরি, ১১ এপ্রিল, ১৯৪২

৩৪৫। লিনলিথগোকে এমেরি, ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪২, সি এম ৫৮

৩৪৬। রুজভেল্টকে জনসন, ১১ এপ্রিল ১৯৪২, ফরেন রিলেশনস্ অব দ্য য়ু এস ১৯৪২, ১ খণ্ড, পৃঃ ৬৩১-৩২

৩৪৭। হপকিনসকে রুজভেল্ট (চার্চিলের জন্য) ১১ এপ্রিল ১৯৪২, তদেব, পৃঃ ৬৩৩-৩৪

৩৪৮। নেহরুকে গান্ধী, ১৫ এপ্রিল ১৯৪২, নেহরু, আ বাঞ্চ অব ওল্ড লেটার্স, পৃঃ ৪৭০-৭১

৩৪৯। গান্ধী, সম্পূর্ণ রচনাবলী, ৭৫ খণ্ড, পৃঃ ৩৭, ৭২

৩৫০। প্রেস বিবৃতি, ২৮ অক্টোবব ১৯৪১, তদেব, পৃঃ ৬১

৩৫১। এ আই সি সি-তে বক্তৃতা, তদেব, পৃঃ ২২৪

৩৫২। হোবেস অ্যালেকজাণ্ডাবকে গান্ধী, ২২ এপ্রিল, ১৯৪২, গান্ধী স্মাবকনিধি, ১৪৩৪

৩৫৩। বল্লভভাইকে গান্ধী, ২২ এপ্রিল ১৯৪২, সম্পূর্ণ বচনাবলী, ৭৬ খণ্ড, পৃঃ ৬১-৬২

৩৫৪। ওয়ার্কিং কমিটিতে যে খসড়াগুলি নিয়ে আলোচনা হয় তা পাশাপাশি তুলে ধবা হয়েছে নেহরু, সিলেক্টেড ওয়ার্কস, ১২ খণ্ড, পৃঃ ২৭৬-৮৫

৩৫৫। ওয়ার্কিং কমিটিব আলোচনাব জন্য, তদেব, পৃঃ ২৮৬-৯৩

৩৫৬। লিনলিথগোকে ক্রিপস, ১১ এপ্রিল ১৯৪২, ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), দ্য ট্রানসফাব অব পাওযাব, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৫২।

৩৫৭। গভর্নবদেব লিনলিথগো, ১৬ এপ্রিল ১৯৪২, তদেব, পৃঃ ৭৯১-৯২

৩৫৮। লিনলিথগোকে স্যাব জন হাববার্ট, ১৯ এপ্রিল ১৯৪২, তদেব, পৃঃ ৮০৩

৩৫৯। সুবোধ বায (সং), কম্যুনিজম ইন ইণ্ডিযা আনপাবলিশড ডক্যুমেন্টস ১৯৩৫-৪৫ (কলকাতা ১৯৭৬) পৃঃ ৩৬৩-৭৫। এটি এন এম যোশীব মাধ্যমে বোম্বাই-এব লাট লামলি ও হোম মেম্বাব ম্যাক্সওয়েলেব দৃষ্টিগোচব কবা হয

৩৬০। তদেব, পৃঃ ৩৭৯-৮২, বিশেষত, পৃঃ ৩৮২

৩৬১। লুই ফিশাবেব সঙ্গে গান্ধীব কথোপকথনেব জন্য, গান্ধী, সম্পূর্ণ রচনাবলী, ৭৬ খণ্ড, অ্যাপেনডিক্স V পৃঃ ৪২৭-৫১ টোযাইন্যামেব মতে এই শর্তে নেহরু গান্ধীকে সমর্থন করেন। লিনলিথগোকে টোয়াইনাম, ২৪ জুন ১৯৪২, ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), দ্য ট্রান্সফাব অব পাওযাব, ২ খণ্ড পৃঃ ২৬৪

৩৬২। নেহরু, সিলেক্টেড ওযার্কস, ১২ খণ্ড, পৃঃ ৩৮৬-৪০০

৩৬৩। নেহরুকে গান্ধী, ১৩ জুলাই ১৯৪২, গান্ধী, সম্পূর্ণ বচনাবলী, ৭৬ খণ্ড, পৃঃ ২৯৩-২৯৪

৩৬৪। এমেবিকে লিনলিথগো, ১৭ জুলাই, ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), দ্য ট্রান্সফাব অব পাওযাব, ২য খণ্ড, পৃঃ ৪০৭-৮

৩৬৫। হবিজন, ২৫ জুলাই ১৯৪২

৩৬৬। তদেব, ২ আগস্ট ১৯৪২

৩৬৭। লিনলিথগোকে এমেবি, ২৪ জুলাই ১৯৪২, ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), পৃঃ উঃ, পৃঃ ৪৫৪-৫৫

৩৬৮। নোট অন লেটাব ফ্রম হোবেস অ্যালেকজান্ডাব, ৩ আগস্ট, গান্ধী স্মাবকনিধি, ১৪৩৮

৩৬৯। নেহরু পেপার্স, ফাইল নং ৩১B, ১৩০ খণ্ড, পৃঃ ৪১৯-২৩

৩৭০। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসেব সঙ্গে সাক্ষাৎকাব, ৬ আগস্ট, ১৯৪২, গান্ধীজিজ কবেসপণ্ডেন্স উইথ দ্য গভর্মেন্ট, ১৯৪২-৪৪, পৃঃ ৫৩-৫৫

৩৭১। ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), দা ট্রান্সফাব অব পাওযাব, ২ খণ্ড, পৃঃ ৬২১-২৪, এব ৪টি খসড়া নেহরুব কাগজপত্রে পাওযা যাবে

৩৭২। ফাইল নং ৩৫৯০/ H/V1-6 পুলিশ কমিশনাবেব অফিস, মহাবাষ্ট্র সবকাবী অভিলেখাগাব

৩৭৩। জাতিব প্রতি বাণী, ৯ আগস্ট, ভোব পাঁচটা—ডি আই জি, আই বি, পশ্চিমবঙ্গ সবকাবেব অভিলেখাগাব

৩৭৪। গান্ধী, সম্পূর্ণ বচনাবলী, ৭৬ খণ্ড, পৃঃ ৩৯৬-৪০১

৩৭৫। গান্ধীকে লিনলিথগো, ১৩ জানুযাবি ১৯৪৩

৩৭৬। লিনলিথগোকে গান্ধী, ২৯ জানুয়াবি ১৯৪৩

৩৭৭। Paul Greenough, 'Political mobilization and the underground literature of the Quit India movement, 1942-44', Modern Asian Studies, 17, 3 (July 1983)

৩৭৮। Gail Omvedt, 'The Satara Prati Sarkar' in G Pandey (ed.) The Indian Nation in 1942, fn. 3, pp 259-60

৩৭৯। ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), দ্য ট্রান্সফাব অব পাওযাব, ২য খণ্ড, পৃঃ ১০০২

৩৭৯ক। আনন্দবাজাব পত্রিকা, ৩১ ডিসেম্বব ১৯৪৫, সাক্ষাৎ বিববণ বর্তমান লেখককে দেন অহিংস গান্ধীবাদী কুমাবচন্দ্র জানা

৩৮০। নেহরু, ডিসকভাবি অব ইন্ডিযা, পৃঃ ৪৮৭

৩৮১। ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), দ্য ট্রান্সফাব অব পাওযাব ইত্যাদি, ৬ খণ্ড, পৃঃ ২৭৪-৭৫

৩৮২। জযপ্রকাশ নাবাযণ, টুওযার্ডস স্ট্রাগল, ইত্যাদি

৩৮৩। গেইল ওমভেদ্, 'দ্য সাতাবা প্রতি সবকাব', জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে (সং), দ্য ইণ্ডিয়ান নেশন ইন ১৯৪২, পৃঃ উঃ, পৃঃ ২৫১ ও পববর্তী

৩৮৪। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, ইন্ডিযা উইনস ফ্রিডম, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৭৪-৮৪

৩৮৫। জ্ঞান পাণ্ডে (সং), দ্য ইণ্ডিয়ান নেশন ইন ১৯৪২, পৃঃ ১০৯-২০

৩৮৫ক। ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), দ্যা ট্রান্সফার অব পাওযাব, ২ খণ্ড, পৃঃ ৬৬৯, ৬৮২-৮৩ , এমেবিকে লিনলিথগো,

১২, ২১ আগস্ট ১৯৪২

৩৮৫ক। সতীশ সামন্ত ইত্যাদি, আগস্ট বেভল্যুশান অ্যান্ড টু ইয়ার্স ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট ইন মিডনাপুব (কলকাতা, ১৯৪৬)

৩৮৬। Governor's Secretariat Papers, R/3/2/36/ I O L

৩৮৭। সুশীলকুমাব ধাড়া, প্রবাহ, পৃঃ উঃ, পৃঃ ১৬৬-৬৮

৩৮৮। G B Home Pol secret 10

৩৮৯। ফর্টনাইটলি বিপোর্ট, ২ সেপ্টেম্বব ১৯৪২, ১ নভেম্বব ১৯৪৩

৩৯০। সুশীলকুমাব ধাড়া, প্রবাহ (১৩৯০), পৃঃ ১৪৫-৪৬

৩৯১। ওয়াভেলকে কেসি, ১৪ আগস্ট ১৯৪৪ L/P and J/5/151, I O L

৩৯২। ফর্টনাইটলি বিপোর্ট, ১ অক্টোবব, ১৯৪৪

৩৯৩। সুশীলকুমাব ধাড়া, প্রবাহ, পৃঃ উঃ, পৃঃ ১৬০

৩৯৪। ম্যাক্স, হাবকোর্ট, 'কিষাণ পপ্যুলিজম ইত্যাদি', ডেভিড লো (সং), কংগ্রেস অ্যান্ড দ্য বাজ, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৩১৫-৩৪৮

৩৯৫। অর্থনৈতিক অবস্থাব জন্য ফর্টনাইটলি বিপোর্টস, ল্যান্ড বেভিনিউ অ্যাডমিনস্ট্রেশন বিপোর্টস, কালোবাজাবী ইত্যাদিব জন্য, District Officers Collection, Eur Mss F/80/17, p 24 ও Eur Mss F 180/21, pp 43-48

৩৯৬। ফ্রান্সিস হাচিনস, স্পন্টেনিয়াস বেভল্যুশন দ্য কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট (দিল্লী, ১৯৫১), পৃঃ ২৩৩-৩৪, ২৫৪, এ সব বটনাব বিবরণ দিয়েছেন

৩৯৭। লিনলিথগোকে (বিহাবেব ছোটলাট) স্টুয়ার্ট, ২৪ মার্চ ১৯৪২, Eur.Mss F 125/49

৩৯৮। কে কে দত্ত, হিস্টবি অব ফ্রিডম মুভমেন্ট ইন বিহাব, ৩য় খণ্ড (পাটনা, ১৯৫৭), পৃঃ ২৬৮-৭৪

৩৯৯। বিহাব ফর্টনাইটলি বিপোর্ট, সেকেন্ড হাফ অব ডিসেম্বব, ১৯৪৩

৪০০। আব নিবলেট, দ্য কংগ্রেস বেবেলিয়ান ইন আজমগড আগস্ট-সেপ্টেম্বব ১৯৪২ ইত্যাদি, চন্দন মিত্র, 'পপ্যুলাব আপবাইজিং ইন ১৯৪২ দ্য কেস অব বালিয়া', জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে, দ্য ইন্ডিয়ান নেশন ইন ১৯৪২, পৃঃ উঃ, পৃঃ ১৭৫

৪০১। জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে, 'দ্য বিভোল্ট অব আগস্ট ১৯৪২ ইন ইস্টার্ন য়ু পি অ্যান্ড বিহাব', তদেব, পৃঃ ১৪৪-৪৫

৪০২। চন্দন মিত্র, পৃঃ উঃ, পৃঃ ১৮১

৪০৩। লিনলিথগোকে লামলি, ১ জানুয়াবি ও ৯ জুলাই, ১৯৪০, L/P & J/5/160 (I O L)

৪০৪। ডেভিড হার্ডিম্যান, 'দ্য কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্ট ইন গুজবাট', জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে (সং), দ্য ইণ্ডিয়ান নেশন ইন ১৯৪২, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৭৭

৪০৫। ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), দ্য ট্রানসফাব অব পাওযাব, ২ খণ্ড, পৃঃ ৯০৫, গোবিন্দ সহায আহমেদাবাদকে 'ভাবতেব স্টালিনগ্রাড' আখ্যা দেন। ফবটি টু বেবেলিয়ান (দিল্লী, ১৯৪৭), পৃঃ ১২৪

৪০৬। ফ্রান্সিস হাচিন্স, স্পন্টেনিয়াস বেভল্যুশন দ্য কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট (নিউ দিল্লী, ১৯৭১), পৃঃ ৩৩৮

৪০৭। লিনলিথগোকে লামলি, ৩ অক্টোবব ১৯৪১, L/P & J/5/162/I O.L

৪০৮। নবহরি পাবিখ, সবদাব বল্লভভাই প্যাটেল, ২ খণ্ড (আহ্‌মেদাবাদ, ১৯৫৬), পৃঃ ৪৭৪-৭৫

৪০৯। মোবাবজি দেশাই, দ্য স্টোবি অব মাই লাইফ, ১ খণ্ড (মাদ্রাজ, ১৯৭৪), পৃঃ ১৭৭-৮০

৪১০। লিনলিথগোকে লামলি ২৭ আগস্ট ১৯৪২, L/P & J/5/163, I O L

৪১১। পি এন চোপবা, কুইট ইণ্ডিযা মুভমেণ্ট (উইকেনডেন বিপোর্ট), পৃঃ ৫৬

৪১২। তদেব, পৃঃ ১৯৭-৯৮

৪১৩। ৪১০ পাদটীকাব মত

৪১৪। লিনলিথগোকে লামলি, ১ মে ১৯৪১ L/P & J/5/162

৪১৫। ফর্টনাইটলি বিপোর্ট, আগস্ট ১৯৪২, L/P & J/5/163

৪১৬। ওম ভেদ (Om Vedt) 'দ্য সাতাবা প্রতি সবকাব', জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে (সং), দ্য ইণ্ডিয়ান নেশন ইন ১৯৪২, পৃঃ উঃ, পৃঃ ২২৫

৪১৭। তদেব, পৃঃ ২৪২

৪১৮। তদেব, পৃঃ ২৫৪

৪১৯। সুমিত সবকাব, 'পপ্যুলাব মুভমেন্টস অ্যাণ্ড ন্যাশানাল লিডাবশিপ, ১৯৪৫-৪৭', ইকনমিক অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল উইকলি, ১৭, (অ্যানুযাল নাম্বাব, ১৯৮২)

৪২০। ম্যানসারগ ইত্যাদি (সং), দ্য ট্রানসফার অব পাওয়ার, ৩ খণ্ড, পৃঃ ৩০৪

৪২১। তদেব, ডক্যুমেণ্ট নং ৩৫৭, এন ৩ টু নং ৫৯৭

৪২২। এমেবিকে লিনলিথগো, ১৮ মার্চ ১৯৪৩, ম্যানসারগ ইত্যাদি (সং), দ্য ট্রান্সফার অব পাওয়ার, ৩ খণ্ড, ডক্যুমেন্ট নং ৫৯৭

৪২৩ । সারণী পাওয়া যাবে হোম্ পল ফাইল নং ৩/৫২/৪৩ (I)-এ ও হাচিনসের ইণ্ডিয়াজ রেভল্যুশন, পৃঃ ২৩০-৩১-এ ।

৪২৪ । ফেমিন কমিশন রিপোর্ট, পৃঃ ১৫

৪২৫ । এম ইসলাম, বেঙ্গল অ্যাগ্রিকালচার, ১৯২০-৪৬, (কেম্‌ব্রিজ, ১৯৭৮), সারণী ২ ১৯, পৃঃ ৭৫, অ্যাপেনডিক্স, পৃঃ ২০৫-১৬

৪২৬ । পেণ্ডেরেল মুন (সং), দ্য ভাইসরয়জ জার্নাল, পৃঃ ৩১

৪২৭ । সুমিত সরকার, মডার্ন ইণ্ডিয়া ১৮৮৫-১৯৪৭ (দিল্লী, ১৯৮৩), পৃঃ ৪০৬

৪২৮ । Order no 42611/X/G S (O) dated Ranchi 12/13 March 1942 on denial policy. Govt of Bengal Defence Conf file no 268 of 1942. ফজলুল হক মন্ত্রিসভাকে না জানিয়ে এসব কাজের নিন্দা করেছিলেন । সার জন হারবার্টকে হক, ২ আগস্ট ১৯৪২, বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি প্রোঃ ৫ জুলাই ১৯৪৩, LXV, পৃঃ ৪৬-৫৪

৪২৯ । ম্যানসারগ ইত্যাদি (সং), দ্য ট্রানসফার অব পাওয়ার, ৪ খণ্ড, পৃঃ ৩৬১-৬৫

৪৩০ । চার্চিলকে ওয়াভেল, ২৪ অক্টোবর ১৯৪৪, মুন (সং), দ্য ভাইসরয়জ জার্নাল, পৃঃ ৯৬

৪৩১ । জি বি রেকর্ডস, ফাইল নং ৭২২/৪৪

৪৩২ । বি সি রায় পেপার্স, এন এম এম এল, ফাইল নং ১৪৬

৪৩৩ । লিনলিথগোকে হারবার্ট, ২৮ আগস্ট ১৯৪৩, ম্যানসারগ ইত্যাদি (সং), দ্য ট্রানসফার অব পাওয়ার, ৪ খণ্ড, পৃঃ ১৮৮

৪৩৪ । এমেরিকে লিনলিথগো, ১০ আগস্ট ১৯৪৩, তদেব, পৃঃ ২০৮-০৯

৪৩৫ । তদেব, পৃঃ ১৯৬-২০০

৪৩৬ । পেণ্ডেরেল মুন (সং), ভাইসরয়জ জর্নাল, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৩৫

৪৩৭ । ওয়েভেলের মেমো, ১ নভেম্বর ১৯৪৩, ম্যানসারগ ইত্যাদি (সং), দ্য ট্রানসফার অব পাওয়ার, ৪ খণ্ড, পৃঃ ৪১৭-২৩

৪৩৮ । পেণ্ডেরেল মুন (সং), ভাইসরয়জ জর্নাল, পৃঃ উঃ, ২২ ডিসেম্বর ১৯৪৩, পৃঃ ৪২

৪৩৯ । তদেব, ৯ জানুয়ারি ১৯৪৪, পৃঃ ৪৭

৪৪০ । কেসি ডায়েরি, Eur Mss 48/1, from January to July, 1944

৪৪১ । ভারতবার্তা, ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪, পেণ্ডেরেল মুন (সং), ভাইসরয়জ জার্নাল, পৃঃ ৫৪

৪৪২ । G B Bengal Public Health Report for 1943 (Cal 1947), pp 48-49

৪৪৩ । এমেরিকে ওয়াভেল, ১ নভেম্বর ১৯৪৩, ম্যানসারগ ইত্যাদি (সং), দ্য ট্রানসফার অব পাওয়ার, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৩৯

৪৪৪ । এ কে সেন, 'ফেমিন মরটালিটি এ স্টাডি অব দ্য বেঙ্গল ফেমিন অব ১৯৪৩', ই হবসবম (সং), পেজেন্টস ইন হিস্টরি ।

৪৪৫ । ঐ, পভার্টি অ্যাণ্ড ফেমিনস অ্যান এসে অন এনটাইটলমেন্ট অ্যাণ্ড ডিপ্রাইভেশন (অক্সফোর্ড, ১৯৮১), পৃঃ ৭৭

৪৪৬ । পি আর গ্রীনাও প্রসপারিটি অ্যাণ্ড মিজারি ইন মডার্ন বেঙ্গল দ্য ফেমিন অব ১৯৪৩-৪৪ (অক্সফোর্ড ১৯৮২), পৃঃ ১৩৩-৩৬

৪৪৭ । সব প্রাদেশিক সরকারের কাছে টটেনহ্যাম, ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৪৩, হোম পল, ফাইল নং ৭/৫/৪৪—পল (I) অব ১৯৪৪

৪৪৮ । জি অধিকারী (সং), পাকিস্তান অ্যাণ্ড ন্যাশানাল য়ুনিটি । (৩য় সংস্করণ, বোম্বাই ১৯৪৪) ।

৪৪৯ । গান্ধী, সম্পূর্ণ রচনাবলী, ৭৬ খণ্ড, পৃঃ ৩৮৪

৪৫০ । করেসপণ্ডেন্স বিটুইন মহাত্মা গান্ধী অ্যাণ্ড পি সি যোশী, মোহন কুমারমঙ্গলমকে গান্ধী, ২৪ মে, ১৯৪৫ । সম্পূর্ণ রচনাবলী, ৮০ খণ্ড, পৃঃ ১৪৪ ৪৫

৪৫১ । গান্ধীকে যোশী, ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫, গান্ধী সম্পূর্ণ রচনাবলী, ৭৯ খণ্ড, অ্যাপেনডিক্স II পৃঃ ৪৩৯-৪০

৪৫২ । ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ, রেমিনিসেন্সেস অব অ্যান ইণ্ডিয়ান কম্যুনিস্ট, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৯৮

৪৫৩ । তদেব, পৃঃ ৯৯-১০০

৪৫৪ । তদেব, পৃঃ ১০৪

৪৫৫ । সরোজ মুখোপাধ্যায়, ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি ও আমরা, ২ খণ্ড (১৯৪২-১৯৪৭), (কলকাতা ১৯৮৬) পৃঃ ২৭

৪৫৬ । তদেব, পৃঃ ১১৬

৪৫৭ । এ যুগের নানা সাংস্কৃতিক কাজের বর্ণনা দিয়েছেন হীরেন মুখোপাধ্যায় 'তরী হতে তীর'-এ । সুধী প্রধানের মার্ক্সিস্ট কালচারাল মুভমেন্ট ইন ইণ্ডিয়া গ্রন্থ এবং বিষ্ণু দে'র কিছু প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । সরোজ মুখার্জি ফেলো ট্রাভলারদের তালিকা দিয়েছেন, পৃঃ উঃ, পৃঃ ১৫০, তাদের মধ্যে পার্টির লোকের, পৃঃ ১৫১-৫৩ ।

৪৫৮ । জ্যোতি বসু, জনগণের সঙ্গে (কলকাতা, ১৯৮৬), পৃঃ ২৩-২৪

৪৫৯ । সরোজ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ উঃ, পৃঃ ১৪৯

৪৬০ । মৌলানা আজাদ, ইণ্ডিয়া উইনস ফ্রিডম, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৪১

৪৬১। লিনলিথগোকে এমেরি, ২৯ জানুয়ারি ১৯৪৩, ম্যানসারগ ইত্যাদি (সং) দ্য ট্রান্সফার অব পাওয়ার, ৩ খণ্ড, পৃঃ ৫৬০-৬২

৪৬২। এমেরিকে লিনলিথগো, ২৮ জানুয়ারি ১৯৪৩, তদেব, ডক্যুমেন্ট নং ৩৬৬

৪৬৩। লিনলিথগোকে এমেরি, ১৩ নভেম্বর ১৯৪২, তদেব, ডক্যুমেন্ট নং ১৭৮ , ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩, তদেব, ডক্যুমেন্ট নং ৩৭৪

৪৬৪। লিনলিথগোকে চার্চিল, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩, তদেব, পৃঃ ৭৪৪

৪৬৫। এমেরিকে লিনলিথগো, ২ মার্চ ১৯৪৩, তদেব, পৃঃ ৭৪৫-৪৬

৪৬৬। ইণ্ডিয়া কমিটি মিনিটস, ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৪৩, তদেব, ৪ খণ্ড, পৃঃ ১২০

৪৬৭। ইডেনকে এমেরি, ৯ মে ১৯৪৩, তদেব ৩ খণ্ড, ডক্যুমেন্ট নং ৬৯৫

৪৬৭ক। হোম পল ফাইল নং ১৭/৪/৪১ পল (I), শীলা সেন, পূঃ উঃ, App IV

৪৬৭খ। জিন্নাকে নাজিমুদ্দিন, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৪১, শীলা সেন, App V

৪৬৭গ। স্যার জন হার্বার্টকে হক, ২ আগস্ট ১৯৪২, ঐ, App VI

৪৬৮। ২০ নভেম্বর ১৯৪২ শ্যামাপ্রসাদ পদত্যাগ করেন। তাঁর আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল প্রত্যেক প্রশাসনিক ব্যাপারে সরকারী কর্মচারীদের হস্তক্ষেপ। ব্রুমফিল্ড, পূঃ উঃ, পৃঃ ২৮২, শীলা সেন, পৃঃ ১৪১-৪২

৪৬৯। জিন্নাকে ইসপাহানি, ১৩ মার্চ ১৯৪৩, জাযদি (সং), এম এ জিন্না—ইসপাহানি করেসপণ্ডেন্স (করাচী, ১৯৭৭), পৃঃ ৩২৫-২৬

৪৭০। ইসপাহানিকে জিন্না, ৩ এপ্রিল ১৯৪৩, তদেব, পৃঃ ৩৪০

৪৭১। জিন্নাকে ইসপাহানি, ১৫ এপ্রিল ১৯৪৩, তদেব, পৃঃ ৩৫৪-৫৫

৪৭২। শীলা সেন, পূঃ উঃ, পৃঃ ১৮২

৪৭৩। স্টিফেন ওরেন, 'দ্য শিখস, কংগ্রেস অ্যাণ্ড দ্য য়ুনিয়ানিস্টস ইন ব্রিটিশ পাঞ্জাব, ১৯৩৭—১৯৪৫', মডার্ন এশিয়ান স্টাডিজ, ৮, ৩ (১৯৭৪), পৃঃ ৪০৯

৪৭৪। চৌধুরী খলিকুজ্জমান, পূঃ উঃ, পৃঃ ২৫৪

৪৭৫। লিয়াকত আলি খাঁকে হক, ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৪১, জামিল-উদ-দিন আহমদ (সং), হিস্টরিক ডক্যুমেন্টস অব দ্য মুসলিম ফ্রিডম মুভমেন্ট (লাহোর, ১৯৭০), পৃঃ ৪১৮-১৯

৪৭৬। এস এম ইসমাইলকে জিন্না, ২৫ নভেম্বর ১৯৪১

৪৭৭। ম্যানসারগ ইত্যাদি (সং), দ্য ট্রান্সফার অব পাওয়ার, ৩ খণ্ড, পৃঃ ৯১৮-২১

৪৭৮। এমেরিকে লিনলিথগো, ১০ জুন ১৯৪৩, তদেব, পৃঃ ১০৫২-৫৩

৪৭৯। ঐ, ১৯ জুলাই ১৯৪৩, তদেব, ৪ খণ্ড, ডক্যুমেন্ট নং ৫৩

৪৮০। ঐ, ১ অক্টোবর ১৯৪৩, তদেব, পৃঃ ৩৪৯-৫০

৪৮১। তদেব, ডক্যুমেন্ট নং ১২৭ . ওয়াভেলকে মুডি (বিহারের লাট), ২৭ অক্টোবর ১৯৪৩, তদেব, ডক্যুমেন্ট নং ১৯০

৪৮২। ভারত সরকার (হোম)—সব প্রাদেশিক সরকারকে, ২১ আগস্ট ১৯৪৪, তদেব, ডক্যুমেন্ট নং ৬৬৯, পৃঃ ১২১২-১৩

৪৮৩। চার্চিলকে এমেরি, ১৬ এপ্রিল ১৯৪৩, তদেব, ৩ খণ্ড, ডক্যুমেন্ট নং ৬৫৪, পৃঃ ৮৯৫-৯৭

Evidence of the Regional incidence of the 'Quit India movement' and its suppression, for the period ending 31 December 1943.

Category	Madras	Bombay	Bengal	United Provinces	Punjab	Bihar	Central Provinces	Assam	North-West Frontier Province	Orissa	Sindh	Delhi	Coorg	Total
Government servants (excluding those of the Central Government)														
Police														
Number of occasions on which police fired	21	226	63	116	—	96	42	4	1	9	—	22	—	601
Number of casualties inflicted, fatal	39	112	87	207	—	166	45	15	3	69	—	20	—	763
Number of casualties inflicted, non-fatal	86	400	149	458	—	508	181	19	13	111	—	10	—	1941
Number of casualties suffered, fatal	—	6	5	16	—	26	8	—	—	1	1	—	—	63
Number of casualties suffered, non-fatal	91	563	180	333	—	342	256	17	52	26	90	62	—	2012
Number of defections from police	1	6	6	2	—	205	2	—	—	—	—	—	—	216
Other Government Servants														
Number of attacks on other Government servants, fatal	—	1	—	3	—	4	2	—	—	—	—	—	—	10
Number of attacks on other Government servants, non-fatal	19	50	14	141	—	87	39	—	—	13	—	1	—	364
Number of defections from other Government services	—	3	—	9	—	4	—	—	5	—	—	—	1	22
Damage to property (excluding Central Government property)														
Number of police stations or	5	46	4	42	—	72	29	4	—	5	—	1	—	208

outposts etc destroyed or severely damaged																
Number of the other Government buildings destroyed or severely damaged		50	318	95	45	2	103	41	64	1	25	—	4	1	749
Number of public buildings other than Government buildings, e. g., municipal property, schools, hospital, etc , destroyed or severely damaged		57	152	58	37	4	92	45	66	—	8	2	4	—	525
Number of important private buildings destroyed or severly damaged		11	38	29	3	5	119	2	61	—	2	1	2	—	273
Estimated loss to Government	Rs	225192	945410	171876	363366	1000	354720	424840	284582	200	46549	1904	15456	120	2735125
Estimated loss to other parties	Rs.	916025	563581	55391	102778	105000	495231	167270	194847	—	33598	2932	370376	245	3007274
Cases of sabotage															
Number of bomb explosions		17	447	51	60	—	8	10	10	1	—	50	—	10	664
Number of bombs or explosives discovered without damage		35	738	106	157	1	218	18	9	1	—	13	11	12	1319
Number of cases of sabotage to roads		32	78	57	84	—	169	7	43	—	4	—	—	—	474
Number of cases in which collective fines imposed		41	73	20	7	—	16	3	1	—	—	5	—	7	173
Amount of collective fines imposed	Rs	1034359	817950	605503	3176973	—	2660765	344595	339487	—	27750	—	—	—	9007382
Number of sentences of whipping inficted		295	17	2	1252	—	340	282	—	—	9	—	—	—	2562
Number of arrests made		5859	24416	4818	16796	2501	16202	8753	2707	2339	2806	3689	90	860	91836
Number of local authorities superseded under Defence Rule 38 B or otherwise		27	19	11	7	—	3	35	—	—	5	—	1	—	108

Source· Home Political File 3/52/43(1), quoted in Hutchins, India's Revolution, pp 230-1

চতুর্থ পর্ব

॥ ১ ॥

চলো দিল্লি পুকারকে
কৌমী নিশান সাম্‌হাল কে
লাল কিল্লে গাড় কে
লড়য়ায়ে যা লঢ়য়াযে যা

প্রসঙ্গান্তরে যাবার পূর্বে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন সম্পর্কে নেহরুর মন্তব্য স্মরণীয়। 'ডিসকভারি অব ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে তিনি বলছেন, "It was essentially a spontaneous mass upheaval...." কিন্তু জনগণের কাজে একটা দ্বিধা ও আত্মদ্বন্দ্ব প্রকট। "অহিংসার যে বাণী কুড়ি বছরের অধিক কাল তাদের কর্ণকুহরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে জনগণ তা ভুলে গিয়েছিল, তবু তারা, মনের দিক থেকে ও অন্যদিক থেকে, সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ছিল হিংসাকে সফল করতে। অহিংসার শিক্ষাই তাদের মধ্যে দ্বিধা সঞ্চার করেছিল। ফলে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ হয়েছিল 'মূঢ় ও অকালোচিত।"[১] মহাত্মা গান্ধীর মধ্যেও নেহরু দেখেছিলেন অন্তর্দ্বন্দ্ব—একদিকে পৃথিবীর জন্য শান্তি, সত্য ও অহিংসার বাণীবাহী 'প্রোফেট', অন্যদিকে জাতীয় নেতা—যিনি সমগ্র মনপ্রাণ দিয়ে স্বাধীনতা চাইছেন। রাজনৈতিক নেতারা, বিশেষভাবে সুবিধাবাদী বলে নয়, সর্বদা ব্যক্তিগত স্তরে কাজ করতে পারে না। তাদের অন্যদের কাজ করাতে হয়, তাই অন্যদের ভুল, ভ্রান্তি, ত্রুটি, বিচ্যুতি, সত্য উপলব্ধি করার সীমিত ক্ষমতা সবই মনে রাখতে হয়। এভাবে নীতির সঙ্গে আপোস করতে করতে অনেক সময় নীতি বিসর্জন দিতে হয়। গান্ধী যুদ্ধের প্রথমদিকে যে নীতি সঙ্গত মনে করেছিলেন তা ইংরেজদের বাধা না দেওয়ার নীতি (policy of non-embarrassment)। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে তিনি অজ্ঞ ছিলেন না। কিন্তু তার সঙ্গে ক্রমশ বাড়ছিল ব্রিটিশ একগুঁয়েমি ও দমননীতির বিরুদ্ধে একটা তীব্র প্রতিবাদের স্পৃহা। আন্তর্জাতিকতার দোহাই দিয়ে ব্রিটিশ স্বৈরতন্ত্র মেনে নিতে নিতে ভারতে আত্মিক অবনয়ন অনিবার্য। তখন ভারতের কি আর জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধ করার মত প্রতিজ্ঞা বা শক্তি অবশিষ্ট থাকবে? তা ছাড়া ভারত কি সব নির্যাতিত শোষিত ঔপনিবেশিক জনগোষ্ঠীর প্রতীক নয়? ভারতই হচ্ছে সেই নিকষ যাতে ব্রিটেন ও আমেরিকার গালভরা নীতির কতটুকু খাঁটি তা যাচাই হবে। তাঁর মনে হচ্ছিল—এই পরস্পরবিরোধী নীতি মিলিয়ে, এখুনি একটা কিছু না করলে তাঁর জীবনের সব কাজ ব্যর্থ হবে। খুব মরিয়া না হলে তিনি অহিংসানীতি ত্যাগ করে মিত্রশক্তির সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করতে রাজি হতেন না। "....he swallowed the bitter pill, so over-powering was his desire that some settlement should be arrived at to enable India to resist the aggressor as a free nation". তা যখন হল না তখন জনগণের উত্তেজিত ক্রুদ্ধ

মেজাজের প্রতিনিধিত্ব করলেন তিনি। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে যুক্তির স্থান নিল আবেগ। বর্তমান ক্লৈব্যের অসহনীয় যন্ত্রণার পরিবর্তে অজানিতের পথে ঝাঁপিয়ে পড়া শ্রেয় মনে হল। "It was better to jump into the uncharted seas of action and do something, rather than be the tame objects of a malign fate."[২]

আগেই আমরা দেখিয়েছি এ রকম একটা মনোভাব নেহরুর হলেও গান্ধীর ওপর তা আরোপ করা ঠিক হবে না। জেল থেকে গান্ধী বড়লাটের সঙ্গে যে চিঠিপত্র চালিয়েছিলেন তাতে একথা স্পষ্ট। অসহিষ্ণু যে তিনি আদৌ হননি তা নয়। লুই ফিশারের সঙ্গে কথোপকথনে একটা তিক্ততার ও উগ্রতার সুর ধরা পড়ে। তবু তিনি সত্যি কি চাইছিলেন তা এ. আই. সি. সি. প্রস্তাব পাস হবার পর (৮ আগস্ট) শনিবার রাত্রে যে বক্তৃতা দেন তা থেকে বোঝা যায়। অথচ সরকারের হঠকারিতা সংঘর্ষকে ত্বরান্বিত করল। "The precipitate action of the Government leads one to think that they were afraid that the extreme caution and gradualness with which the Congress was moving towards direct action, might make world opinion veer round to the Congress as it had already begun doing, and expose the hollowness of grounds for the Government rejection of the Congress demand."[৩] এই প্রসঙ্গে নেহরুর সঙ্গে তাঁর বিতর্কের উল্লেখ করেছেন তিনি। চীন ও রাশিয়ার বিপদে মুহ্যমান নেহরু সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে পুরনো কলহ ভুলতে চেয়েছিলেন। গান্ধীর চেয়েও তিনি নাৎসীবাদ ও ফাসীবাদকে বেশি ঘৃণা করেন। "I argued with him for days together. He (Nehru) fought against my position with a passion that I have no words to describe. But the logic of facts overwhelmed him. He yielded when he saw clearly that without the freedom of India that of the other two (Russia and China) was in great jeopardy." গান্ধীর সিদ্ধান্ত—ভারত সাম্রাজ্য আঁকড়ে ধরে থাকার অব্যক্ত সংকল্পই সরকারকে এমন অনমনীয় করেছে। কোনও একটা সময় এমেরি ও লিনলিথগো সব দোষ গান্ধীর ওপর ফেলার নীতি নিয়েছেন। যেন কংগ্রেস নয়, শুধু গান্ধীই, সব অঘটনের মূল (fons et origo)। তাঁকে হিংসামূলক ঘটনার নিন্দা করতে বলা হচ্ছে, অথচ তার উৎস কিছু সেন্সর করা খবরের কাগজ। "I must own that I thoroughly distrust those reports." তাঁর অনশন করা ছাড়া পথ নেই—তবে যদি বড়লাট দেখিয়ে দিতে পারেন তিনি কি কি ভুল করেছেন, তিনি তা সংশোধন করতে প্রস্তুত। "You can send for me or send some one who knows your mind and can carry conviction." এই চিঠিতে আলাপ আলোচনা শুরু করতে আবেদন জানানই হয়েছে।[৪] বড়লাট উত্তরে লিখলেন, খবরের কাগজে প্রকাশিত বিবরণ সবই সত্য—"I only wish they were not, for the story is a bad one." গান্ধী যদি পুনরায় আপন পথে প্রত্যাবর্তন করতে চান ও যা ঘটেছে তার সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করেন তবে বড়লাট সব ব্যাপারটা পুনর্বিবেচনা করতে রাজি।[৫] গান্ধী বললেন, এ তাঁর হুমকির উত্তরে পালটা হুমকি। "My letter of 31st December was a growl against you. Yours is a counter growl." কিন্তু দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের পরিপ্রেক্ষিতে এ ধরনের ওতোর-চাপান অশোভন।[৬] উত্তরে বড়লাট স্বীকার করলেন—অহিংসায় গান্ধীর বিশ্বাস অটল হতে পারে, কিন্তু এ কথা তাঁর অনুচরদের সম্বন্ধে

সত্য নয়। তা ছাড়া তাদের আদর্শ থেকে পতন শত শত লোকের জীবনহানির জন্য দায়ী, আরো বেশি লোকের সম্পত্তিহানির জন্য। ভারত সরকারের ওপর দোষারোপ তো তথ্যবিরোধী। গান্ধীর বিশেষ কোন প্রস্তাব থাকলে তিনি বিবেচনা করতে রাজি, কিন্তু কংগ্রেসকে নিজের কাজ যথার্থ প্রতিপন্ন করতে হবে।[৭] উত্তবে গান্ধী আবার সরকারকে হিংসার বিস্ফোরণের জন্য দায়ী করলেন, জানতে চাইলেন আগস্ট প্রস্তাবের কোন অংশটা আপত্তিকর। সেখানে অহিংসার বিরুদ্ধে কিছুই বলা হয়নি, ববং ফাসীবাদের বিরুদ্ধেই বলা হয়েছিল, যুদ্ধে সাহায্য দেবাব কথাই বলা হয়েছিল। এ অবস্থায় অনশন ব্যতীত উপায নেই এবং ৯ই ফেব্রুয়াবি থেকে একুশ দিন তিনি অনশন করবেন। "The fast can be ended sooner by the Government giving the needed relief."[৮] এখানেও আলোচনা শুরু করাব আবেদনের সুর শুনতে পাওযা যায। উত্তবে বডলাটের সুব অত্যন্ত কড়া। প্রথমে তিনি বললেন, অনশন দাযিত্ব এডাবাব সহজ পথ ("an easy way out")। দ্বিতীযত, এ তো এক ধরনের ব্ল্যাকমেইল। "I regard the use of a fast for political purposes as a form of political blackmail (himsa) for which there can be no moral justification."[৯] গান্ধীব আব কোন উপায় বইল না। তবু তিনি একে ব্ল্যাকমেইল বলতে রাজি হলেন না—তাঁর মতে এটা "appeal to the Highest Tribunal for justice which I have failed to secure from you. If I do not survive the ordeal I shall go to the judgement seat with the fullest faith in my innocence. Posterity will judge..."[১০] আমরা জানি যুদ্ধেব সেই সংকটময় মুহূর্তে, ভাগ্য যখন যে কোনো দিকে ঝুঁকতে পারে, এ সব আধ্যাত্মিক কথার কোনো মূল্য ছিল না লিনলিথগো, এমেবি, চার্চিলেব কাছে। গান্ধীব নিঃশর্ত মুক্তিব জন্য বাজাগোপালাচাবিব আবেদন অগ্রাহ্য করলেন বড়লাট। চার্চিল বললেন, "বুড়ো বদমাস (rascal) এই তথাকথিত অনশন থেকে আবো ভালোভাবেই বেরিয়ে আসবে।" কয়েকজন কাউন্সিলবের পদত্যাগ আমল দিলেন না তাঁরা। লিনলিথগো একে গান্ধীর একটা বড রকমের পরাজয় বলে মনে কবেছিলেন। ১৯৪৩-এব ১ অক্টোবব দর্পিত লিনলিথগো জানাচ্ছেন, "হতে পাবে আপাতত একটা বাজনৈতিক অচলাবস্থা চলছে কিন্তু কোনও মানবিক চাতুর্য দ্বারা আমি তা দূব কবতে পারব না।" "The Working Committee are in jail and forgotten. One hardly ever sees a reference to them in the press. Gandhi is equally out of the way of doing mischief,.... Rajagopalachari is the principal mouthpiece at the moment,....But he has no settled policy and nothing to offer. The Muslims who have immensely strengthened their position during the last 3 or 4 years, are solid, more bitterly communal than ever....."[১১]

১৯৪৩-এর সেপ্টেম্বরে ওয়াভেল পরবর্তী বডলাটের পদে মনোনীত হলেন। নতুন বড়লাটের জন্য নির্দেশনামা তৈরি করলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। তাতে ছিল : "The declarations of H. M. G. in favour of the establishment of a self-governing India as an integral member of the British Empire and Commonwealth of Nations remain our inflexible policy. You will make, as occasion warrants, any proposals which you consider

may achieve that end. You will not be deterred from making such proposals by the fact that the war is still proceeding; but you will beware above all things lest the achievement of victory and the ending of miseries of war should be retarded by undue concentration on political issues while the enemy is at the gate."[১২]
ওয়ার ক্যাবিনেটের ৭ অক্টোবরের সিদ্ধান্তে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল জাপানীদেব বিরুদ্ধে অভিযান, দুর্ভিক্ষ প্রতিকারের জন্য খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা এবং সমাজসংস্কারবিষয়ক আইন প্রণয়নের (!) ওপর। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনকে সম্পূর্ণ পরাভূত করে বিজয়ী চার্চিল ১৯১৯-এর শাসন সংস্কারে ফিরে যেতে চাইছিলেন। যেন আর তা যাওযা যায়! ভাবতবর্ষ সম্বন্ধে চার্চিলের রাজনৈতিক দৃষ্টি এতই অন্ধ ছিল।

সরজমিনে উপস্থিত ভাবী বড়লাট এতটা অন্ধ ছিলেন না। ওযাভেল সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ আকরগ্রন্থ হল পেণ্ডেরেল মুন সম্পাদিত The Viceroy's Journal (লণ্ডন, ১৯৭৩)। সমসাময়িক ঘটনার এমন সংক্ষিপ্ত কিন্তু সারবান বর্ণনা, ভারতীয় ও ব্রিটিশ নেতাদের ক্রিযা প্রতিক্রিয়া ও উভযের মনস্তত্ত্বের এমন সুনিপুণ বিশ্লেষণ একজন কাঠখোট্টা প্রধান সেনাপতির কাছে আশা কবা যায় না। ১৯৪৩-এব ২৪ জুনের ডাযেরিতে চার্চিলেব ওপর তাঁর মন্তব্য থেকে বোঝা যাবে উভযের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য। ভাবতীয় বঙকটদের হাতে অত্যাধুনিক অস্ত্র দেওয়া হযেছে শুনে চার্চিল চটে লাল হযেছিলেন "he (Churchill) has a curious complex about India and is always loath to hear good of it and apt to believe the worst. He has still at heart his cavalry subaltern's idea of India; just as his military tactics are inclined to date from the Boer War." এমেবির মতও বিশেষ আলাদা ছিল না। ওযাভেলের ২৭ জুলাই-এর ডায়েরিতে পড়ি, চার্চিলেব কথাবার্তা শুনে এমেরি ওয়াভেলকে এক চিলতে কাগজে লিখে দেন—"(Churchill) knows as much of the Indian problem as George III did of the American colonies." ওযাভেল একটা রাজনৈতিক সমাধান চাইছিলেন। অবশ্যই ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা হবে তাব প্রাথমিক পর্ব। ৭ অক্টোবরের ক্যাবিনেটে চার্চিল এই মনোভাবের বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদ্গার কবেন। ওয়াভেলের ভাষায়, তিনি "waved the bogey of Gandhi at every one." ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের মেরুদণ্ডহীনতা দেখে ওয়াভেলেব ঘেন্না ধরে যায়। ৮ অক্টোবর চার্চিল বলেন—"only over his dead body would any approach to Gandhi take place." ওয়াভেল বুঝতে পারেন, তিনি ভারত রওনা হলে চার্চিল তাঁকে অপদস্থ করার সব চেষ্টাই করবেন। তাঁর সন্দেহ অমূলক ছিল না। চার্চিলের গান্ধীবিদ্বেষ যেমন ১৯৩০-৩১ সালে সক্রিয় ছিল, তেমনি সক্রিয ছিল ১৯৪২-৪৩ সালে। ববং আরও বেড়েছিল।

ওয়াভেলের সম্বন্ধে চার্চিলের কোনদিনই উচ্চ ধারণা ছিল না। যেটুকু বা ছিল তা ১৯৪২-এর শেষে আরাকান অভিযানের ব্যর্থতা ধূলিসাৎ করে দিয়েছিল। বস্তুত ১৯৪২-এর শেষে ব্রিটিশ বাহিনীর মনোবল শূন্যে ঠেকেছিল। আবাকান অভিযানের সেনাপতি জেনারেল আরুইন মাউন্টব্যাটেনকে বলছেন, "He did not see how any unit at present in the front line could be counted on to hold in the event of the Japanese much-heralded 'march on Delhi', much less

stage an advance."[১৪] ভারতের প্রধান সেনাপতি অকিনলেকের নতুন অভিযান চালানোর সাহস ছিল না। ওয়াভেল ব্রহ্মের চীনা বাহিনীর মার্কিন সেনাপতি স্টিলওয়েলের সঙ্গে বনিয়ে চলতে পারছিলেন না। আরাকানে আরুইন স্লিমের সৎ পরামর্শ শোনেননি। ব্রিটিশ-ভারতীয় চতুর্দশ ডিভিজন অনভিজ্ঞ রংরুট নিয়ে গঠিত। অন্যদিকে মিয়াওয়াকির অধীনস্থ জাপ সৈন্য জঙ্গল ও নদীযুদ্ধে অভ্যস্ত, তদুপরি ব্রহ্ম বিজয়ের গর্বে বলীয়ান। বুথিয়াডং থেকে মংড সমগ্র 'টানেল অঞ্চলের' পতন হলে মে (১৯৪৩) মাসে ব্রিটিশ সৈন্য পিছু হটল, পেছনে ফেলে এল ৫০০০ হতাহত। ক্রুদ্ধ চার্চিল খুঁজছিলেন নবীন, দক্ষ, যুদ্ধাভিজ্ঞ কাউকে নবগঠিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া কমাণ্ড (SEAC)-এর কর্তৃত্ব দিতে। এমেরি প্রথমে মাউন্টব্যাটেনের নাম তুললেন।[১৫] অনেক বাদানুবাদের পর, প্রধানত মার্কিন চাপে, মাউন্টব্যাটেন মনোনীত হন।[১৬] মেয়ে প্যামেলাকে তিনি লিখছেন, "My task is probably the biggest and most difficult which any Englishman has been given in war. To reconquer Burma, Malaya, the Dutch East Indies and all the places in which the British Empire's present forces received an unparalleled series of defeats on land, at sea, and in the air."

১৯৪৪-এর প্রথমে একদিকে গান্ধীমুক্তিব দাবি অন্যদিকে পাকিস্তানেব দাবি ছাড়া কিছুই শোনা যাচ্ছিল না।[১৭] ওয়াভেল প্রথম মুখ খোলেন কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের বাজেট অধিবেশন (১৭ ফেব্রুয়াবি ১৯৪৪)-এ। কংগ্রেসের অসহযোগ নিয়ে দুঃখ প্রকাশ কবে তিনি জানান 'ভ্রান্ত ও লাভহীন' এই আন্দোলন প্রত্যাহার না করলে বন্দীমুক্তি সম্ভব নয়। ঠিক এই কথাই টটেনহ্যামেব Congress Responsibility for Disturbances মারফত স্ববাষ্ট্র বিভাগ জানিয়েছিল ভারত সচিবকে।[১৮]

১৭ ফেব্রুয়াব্বির বক্তৃতায় ওযাভেল ক্রিপস প্রস্তাবই পুনকথাপন করেছিলেন কিন্তু তাতে ভারতভাগের বিরোধিতা করা হযেছিল। ওযাভেল মনে কবতেন হিন্দু ও মুসলমানদের এক রাষ্ট্রে থাকাই সমীচীন। অবশ্য বড়লাটেব কোন বিশেষ ক্ষমতায হস্তক্ষেপ চলবে না। তার ডায়েরি পড়লে মনে হয বছরের মাঝামাঝি পর্যন্ত সমাধানের কোনো পথ তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। কংগ্রেসকে তুষ্ট কবার বাসনা তাঁর ছিল না, আবাব পাকিস্তানের দাবি মানতেও তিনি অরাজি। সি পি-র ছোটলাট টোয়াইন্যাম তাঁকে লীগ ও রাজাজিকে সমর্থন করতে উপদেশ দিলে ওয়াভেল ৩বা মার্চেব ডায়েরিতে মন্তব্য করেছিলেন—"Hardly practical politics, I think."

১৯৪৪-এ তিনটে ঘটনা ঘটল। মার্চে গান্ধী তাঁর সঙ্গে পুনরায় পত্রালাপ শুরু করলেন। বাংলা ও পঞ্জাবের রাজনীতিতে পালাবদল ঘটল। সর্বোপরি, কোহিমা-ইম্ফল রণাঙ্গনে প্রচণ্ড যুদ্ধের পর, সম্মিলিত জাপ ও আই. এন. এ. অভিযান পর্যুদস্ত হল। শেষের ঘটনাটাই আগে আলোচনা করা দরকার, কারণ ১৯৪২ থেকে ১৯৪৪ ভারতের জনমানসে জাপ অভিযানের পুরোভাগে নেতাজীব আবির্ভাব, আসন্ন ব্রিটিশ পরাজয় ও সম্ভাব্য স্বাধীনতার যে আশাদীপ শত ঝঞ্ঝায়ও অনির্বাণ ছিল, তা চিরতরে নিবে গেল। SEAC গঠন, সেনাপতি রদবদল, গুর্খা সৈন্যের অধিকতর ব্যবহার, রাজকীয় বিমানবাহিনীর সাহায্য, বিশেষত বায়ুপথে রসদ সরবরাহ, অবস্থাটার আমূল পরিবর্তন সাধন করল।

১৯৪৪-এর জানুয়ারি মাসে স্লিমের অধীনস্থ ক্রিস্টিসন জাপানীদের মংড-বুথিয়াডং রেখার উপর আক্রমণার্থ প্রস্তুত হলেন। জাপানীরা ঠিক করল আত্মরক্ষার চেয়ে পাল্টা

আক্রমণই হবে সফলতর কৌশল। তাদের পরিকল্পনা হল চিন্দুইন পর্বতমালা থেকে পশ্চিমের দিকে অভিযান, ইম্ফলে কেন্দ্রীভূত ব্রিটিশ-ভারতীয় চতুর্থ কোরের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিনাশ ও আরাকানস্থিত সৈন্যবাহিনী ধ্বংস। এই পরিকল্পনার সাংকেতিক নাম HA-GO. প্রধানত জেনারেল স্লিমের বুদ্ধিমত্তার ফলে তা ১৯৪৪-এর ২৪ ফেব্রুয়ারি প্রতিহত হয়। ব্রিটিশ ভারতীয় পঞ্চদশ কোরের হতাহতের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৫০০-র ওপর। জাপানীদের মনোবল থাকে অক্ষুণ্ণ। শুধু 'হা-গো'র সেনাপতি হানায়াকে সরিয়ে আনা হল কর্নেল কোবাকে। তিনি ব্রিটিশদের কালাদান উপত্যকা থেকে বিতাড়িত করেন। অন্যদিকে আরম্ভ হয় জাপানীদের ইম্ফল অভিযান।

টিড্ডিম-ইম্ফল-কোহিমা রণাঙ্গনে তখন প্রতিবক্ষার দায়িত্ব ছিল ব্রিটিশ চতুর্থ কোরের ওপর। সিঙ্গাপুর বিজয়ী লেঃ জেঃ মুতাগুচি স্থির করলেন লেঃ জেঃ ইয়ানাগিদার তেত্রিশতম ডিভিজন এই কোরকে আক্রমণ করবে। এর সাংকেতিক নাম ছিল U-GO। এর প্রধান লক্ষ্য ছিল ইম্ফলের ব্রিটিশ ঘাঁটি ধ্বংস করে ব্রহ্মরক্ষা, আর আনুষঙ্গিক লক্ষ্য ছিল সুভাষচন্দ্রের অধীনস্থ ভারতের জাতীয় বাহিনীর সাহায্যে ভারতেব মাটিতে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা। মুতাগুচি আরও তিন ডিভিজন কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন—(১) ইয়ামাউচির পঞ্চদশ ডিভিজন, যা শ্যাম থেকে ব্রহ্মে পৌঁছতে অনেক সময় নিল, (২) তেত্রিশতম ডিভিজন, যার সঙ্গে ছিল সব সাঁজোয়া গাড়ি ও ভারী কামান এবং (৩) একত্রিশতম ডিভিজন (লেঃ জেনারেল সাতোব অধীনে) যাকে বড পর্বতমালাব উপর দিয়ে কোহিমা পর্যন্ত যেতে হবে। চিন্দুইনের সমান্তরাল ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ববাবর দুশো মাইল ধরে এই তিন ডিভিজন আক্রমণ চালাবে। প্রশান্ত মহাসাগরে একের পব এক পবাজযের লজ্জা দূর করতে প্রধানমন্ত্রী তোজো ও কাউন্ট তেবাউটি মুতাগুচিব এই ঝুঁকি নেওয়া সমর্থন করলেন। তাঁদের আশা ছিল, সুভাষ বসুর অধীনস্থ আই. এন. এ. (যারা আবাকানে এরই মধ্যে সপ্তম ব্রিটিশ আর্মির সঙ্গে ভাল লড়েছে)-কে দেখে পূর্ব ভাবতে স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থান ঘটবে। জাপানী সেনাপতি কাওয়াবে জেদ ধবলেন জাপ ডিভিজনেব অন্তর্ভুক্ত করতে হবে আই. এন. এ.-কে। শেষে বসুর সঙ্গে সমঝোতা হল ভারতীয়রা জাপানীদের নেতৃত্বে যুদ্ধ করলেও তাদের আলাদা সেকটর বরাদ্দ করা হবে ও মুক্তাঞ্চল তাদেব হাতে অর্পণ করা হবে। সুভাষ ব্রিগেডের প্রথম ব্যাটেলিয়ান লডবে কালাদান উপত্যকায়, অন্য দুই ব্যাটেলিয়ান চীন পর্বতমালায় জাপানী সৈন্যদের সাহায্য করবে। তাদের অবশ্য নিজস্ব কোনো বিমান বা কামান থাকবে না।

জাপানী তেত্রিশতম ডিভিজনকে নির্দেশ দেওযা হল টিড্ডিম ও টংভ্যাং-এ সপ্তদশ ভারতীয় ডিভিজন ঘিরে ফেলতে ও তাবপর উত্তবে ইম্ফল সমতলেব দিকে দ্রুত এগিয়ে যেতে। এব ফলে শিলচরগামী বাস্তা দু টুকরো হযে যাবে। পঞ্চদশ ডিভিজন চিন্দুইন অতিক্রম কবে উখরুল ধবে ইম্ফলেব উত্তবে ডিমাপুর বাস্তা কেটে দেবে ও ব্রিটিশ বিংশতিতম ডিভিজনকে ঠেকিযে বাখবে। ইয়ামামোতো কালেমিও থেকে কাব উপত্যকা ধরে এগোবেন এবং পঞ্চদশ ডিভিজনকে সাহায্য কববেন। একত্রিশতম ডিভিজন নাগা পর্বতমালার ভেতব দিয়ে এগিয়ে কোহিমা দখল কববে এবং ডিমাপুর-ইম্ফল বাস্তার ওপর গিরিবর্ত্ম দখল কবে বসবে। সুবিধে পেলে ডিমাপুরও দখল কববে তাবা। মুতাগুচি এর জন্যে তিন সপ্তাহের বেশি সময় লাগা উচিত মনে করেননি।

এই জাপানী অভিযান মূলত প্রতিহত করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল স্লিমের চতুর্দশ আর্মি। সর্বপ্রধান সেনাপতি মাউন্টব্যাটেন আদেশ দিতেন একাদশ আর্মি গ্রুপের নায়ক গিফার্ডকে।

এই আর্মির অধীনে ছিল আরাকানে পঞ্চদশ কোর (ক্রিস্টিসন), ইম্‌ফলে চতুর্থ কোর (স্কুনস্), নর্দার্ন কম্‌ব্যাট এরিয়া কমাণ্ড (স্টিলওয়েল) ও স্পেশ্যাল ফোর্স (উইঙ্গেট)। পরে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার জন্য তেত্রিশতম কোর (স্টপফোর্ড) গঠিত হয় ও পঞ্চদশ কোরকে গিফার্ডের অধীনে আনা হয়। তেত্রিশতম কোরে সৈন্যসংখ্যা ছিল ৭৫,০০০।

স্লিম ও স্কুনের কৌশল হল, ইমফল আক্রান্ত হলে, দুই অগ্রগামী ডিভিজনকে (সপ্তদশ ও বিংশ) বিস্তৃত ইমফল সমতলে ফিরিয়ে আনা। সেখানে ট্যাঙ্ক, ভারী কামান, বৈমানিক সাহায্য দ্বারা জাপানী আক্রমণ প্রতিহত করা সহজ হবে। দরকার হলে আর এক ডিভিজন (পঞ্চম ভারতীয়) সৈন্য বায়ুপথে আনা হবে, এক প্যারাশুট ব্রিগেড ইম্‌ফল ও উখরুলে নামবে। পরে এর সঙ্গে এক ট্যাঙ্ক ব্রিগেডও যুক্ত হয়। সবসুদ্ধ প্রায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার সৈন্য ইম্‌ফলে সমবেত হয়েছিল। রাজকীয় বিমানবাহিনী অধিকন্তু।

যে জাপানী পঞ্চদশ আর্মি চিন্দুইন অতিক্রম করল তাতে ছিল ৮৪,২৮০ জাপানী ও ৭০০০ ভারতীয় সৈন্য। পরে আবও ৪০০ সৈন্য যোগ দেয়। ভারী কামানওয়ালা রেজিমেণ্ট ছিল দুটি ও ট্যাঙ্ক রেজিমেণ্ট একটি। ইয়ানাগিদা আক্রমণ শুরু করেন ৭-৮ মার্চ ১৯৪৪—মুখোমুখি হন সপ্তদশ ডিভিজনের। পূর্বেকার পরিকল্পনা মত তাদের প্রত্যাহারের আদেশ দেওয়া হল। ফেরবার পথে গুর্খারা এত জাপ সৈন্য ধ্বংস কবল যে ইয়ানাগিদা মুতাগুচিকে জানালেন অবস্থা সঙ্গীন। শারম্যান ও গ্র্যাণ্ট ট্যাঙ্কেব ধ্বংস শক্তি দেখে বিহ্বল হয়েছিলেন তিনি। ইয়ানাগিদাকে সরিয়ে নিলেন মুতাগুচি এবং অপূরণীয় ক্ষতি কবলেন জাপবাহিনীর মনোবলের। ইতিমধ্যে ইয়ামামোতোর সৈন্য ম' (Maw)-তে গ্রেসির অধীনস্থ বিংশতিতম ডিভিজনের সম্মুখীন হল। আবাব পূর্ব পরিকল্পনামত বিংশতিতম ডিভিজনকে ইম্‌ফলে পিছু হঠবার নির্দেশ দেওয়া হল। ইয়ামাউচির পঞ্চদশ ডিভিজন চিন্দুইন অতিক্রম করে উখরুলের দিকে এগোচ্ছিল। তাদেব বলা হল ইম্‌ফলের উত্তরে পাহাড়ের দিকে এগুতে। ইতিমধ্যে সাতোর একত্রিশতম ডিভিজন চিন্দুইন অতিক্রম করে উখরুল পৌঁছেছে (১৫-১৬ মার্চ ১৯৪৪)। তাদেবই একদল ভারতীয় প্যারাসুট ব্রিগেডকে হটিয়ে দিয়ে কোহিমার দক্ষিণে মারামে পৌঁছল ২৭ মার্চ। অন্য দু'দল আসাম বেজিমেণ্টেব হাত থেকে জেসামি নিয়ে নিল ১ এপ্রিল। জেসামি কোহিমার কিছু পূর্বে। ঠিক এই সময় কোহিমা থেকে ব্রিটিশ এক বাহিনী ডিমাপুর রক্ষা কবতে যাওয়ায কোহিমার অবস্থা খুবই করুণ হয়েছিল। ১৫ এপ্রিল কোহিমা অবরুদ্ধ হল। জাপানী পঞ্চদশ ও একত্রিশতম ডিভিজনেব সঙ্গে যুক্ত আই. এন. এ. ভারতের মাটিতে প্রথম পদার্পণ করে ১৮ মার্চ।

ইম্ফলের অবস্থা কিন্তু আরও জোরদার করা হয়েছিল আরাকান থেকে সৈন্য এনে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় সুসজ্জিত হয়েছিল তেত্রিশতম কোর। স্টপফোর্ড কোহিমা রক্ষার জন্য পাঠিয়ে দিলেন এক ব্রিগেড। ইতিমধ্যে সাতোর সরবরাহ কমে আসছে। চিন্দিতরা রেলপথের রাস্তা কেটে দিয়েছে, বহু সেতু উড়িয়ে দিয়েছে। তিনি মুতাগুচিকে জানালেন খচ্চরের মাংস খেতে হচ্ছে সৈন্যদের। প্রতিদানে পেলেন অপমানকর সিগন্যাল। চিন্দিতরা পূর্বে এগিয়ে গেল জাপানী বাহিনীর পেছনে। বিপর্যস্ত সাতো জানালেন পশ্চাদপসরণ ছাড়া গতি নেই। আরও বিপর্যয় হল—পঞ্চদশ ডিভিজনের অধিনায়ক ইয়ামাউচি ম্যালেরিয়ায় মারা গেলেন। ১ জুন সাতোর সিগন্যাল এল—"Propose retreating from Kohima with rearguard"—মুতাগুচির উত্তর এল—"Retreat and I will court-marshal you." সাতোর পাল্টা সিগন্যাল—"Do as you please. I will bring you down with me." এই উত্তর প্রত্যুত্তরে স্পষ্ট কী মনোবল নিয়ে একত্রিশতম

ডিভিজনের জাপানীরা লড়ছিল। কোহিমা বিপন্মুক্ত হল। তবে ইম্ফলে দারুণ যুদ্ধ দিল জাপানী পঞ্চদশ ও তেত্রিশতম ডিভিজন (যার সঙ্গে আই. এন. এ. যুক্ত)। কিন্তু ব্রিটিশদের উচ্চ মনোবল, উন্নত যুদ্ধ কৌশল, ট্যাঙ্ক, বিমান ও মাঝারি কামানের প্রাচুর্য জাপানীদের উন্মত্ত আক্রমণ পর্যুদস্ত করল। সুভাষ ব্রিগেড যোগাযোগ রক্ষায় সাহায্য করেছিল, গান্ধী ব্রিগেড পালেল এরোড্রমে অসম সাহসে নৈশ আক্রমণ চালায়। আজাদ ব্রিগেড বিশেষ কিছু করতে পারেনি। জাপানীদের নিজেদেরই গোলাবারুদ, খাবাব, যানবাহন, ওষুধের তীব্র অভাব—তারা আই. এন. এ.-কে কি সাহায্য করবে? জুনের প্রবল বৃষ্টি, সরবরাহের অভাব, রোগের প্রাদুর্ভাব, সাতোর অকর্মণ্যতা (তাঁর ডিমাপুর দখল করা উচিত ছিল) জাপানের বৃহত্তম পরাজয় ডেকে আনল। যে ৮৮,০০০ জাপ সৈন্য ইরাবতী অতিক্রম করেছিল তার হতাহতের সংখ্যা ৫৩, ৫০৫। আর এর মধ্যে ৩০,৫০২ শুধু রোগেই মারা যায়! তুলনায় ব্রিটিশ ভারতীয় হতাহতের সংখ্যা মাত্র ১৬,৭০০। ২২ জুন ইম্ফল সম্পূর্ণ শত্রুমুক্ত হল।[২০] জনৈক জাপানী লেখক—তোজিকাজু কাসে—এই যুদ্ধের নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন : "The disaster of Imphal was perhaps the worst of its kind yet chronicled in the annals of war."[২১]

অদৃষ্টের পরিহাস—৪ থেকে ১১ জুলাই সুভাষ যেসব বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তাতে পরাজয়ের হতাশার সুরের চেয়েও ফুটে উঠেছিল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সুর। এব একটি মহাত্মা গান্ধীর উদ্দেশে বেতারভাষণ। ২৬-এ জুলাই-এর সরকারী ঘোষণায় ইম্ফল অভিযান মুলতুবি রাখা ও তোজোর পদত্যাগের কথা শুনে তিনি যেন সর্বনাশের প্রথম সংকেত পেলেন। অনমনীয় মনোবলে তিনি আহত ভারতীয় সৈন্যদের চিকিৎসা, খাদ্যসরববাহ ইত্যাদিতে মেতে উঠলেন। ১৯৪৪-এর ১৪ আগস্ট তাঁব বিশেষ দিনের আদেশে (Special order of the day) সব দুর্ঘটনার দায় চাপান হল প্রবল বর্ষণের ওপর। আই. এন. এ.-র পশ্চাদপসরণ যেন পুনরভিযানের প্রস্তুতিপর্ব। ভেতরে ভেতরে তিনি জানতেন তাঁর এক চতুর্থাংশ সৈন্য ইম্ফল থেকে হয় পলায়ন করেছে না হয় ধরা পড়েছে। রেঙ্গুনে আই. এন. এ. সেনাপতিদের যে তীব্র ভর্ৎসনা তিনি করেছিলেন, তার থেকে নিজেকেও বাদ দেননি তিনি। কেন তিনি সৈন্যদের পুরোভাগে ফ্রন্টে যাননি, তাই নিয়ে আফসোস করেন তিনি। তাঁর দুটি কাজ লক্ষণীয়। প্রথমত, আমেরিকাব উদ্দেশে বেতারভাষণে তিনি জানালেন, "It is not Japan we are helping by waging war on you and on our mortal enemy—England. We are helping ourselves—We are helping Asia." দ্বিতীয়ত, তোজোর স্থলাভিষিক্ত নতুন প্রধানমন্ত্রী কইসোকে তিনি অনুরোধ জানালেন রাশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে তাঁকে সাহায্য করতে। বার্লিন যাবার পথে রুশ সাহায্য চেয়ে তিনি পাননি। জাপানের পরাজয় সম্ভাবনা লক্ষ্য করে আবার তিনি সে চেষ্টা করলেন। দিল্লী হনুজ দূর অস্ত। তবু দিল্লী যেতেই হবে।

ইতিমধ্যে ব্রিটিশ ব্রহ্ম অভিযান শুরু হয়ে গেছে। ১ জানুয়ারি ১৯৪৫ আকিয়াবের পতন হয়েছে। আই. এন. এ.-র দ্বিতীয় ডিভিজন ইরাবতীর উভয় তীরে ঘাঁটি গড়ল ব্রিটিশদের যুদ্ধ দিতে। পি. কে. সাগলের অধীনস্থ দ্বিতীয় পদাতিকবাহিনী জাপানীদের পাশে দাঁড়াল মিটকিলা রক্ষার জন্য।

শেক্সপীয়রের ভাষায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যখন এসব "alarums and excursions" চলছিল, গান্ধী বড়লাটকে চিঠি লিখতে শুরু করলেন। তিনি জানালেন, 'ভারতছাড়ো' প্রস্তাব

তখনও তিনি সমর্থন করেন। ওয়াভেল উত্তর দিলেন, কংগ্রেসকে তিনি জাপান সমর্থনের অভিযোগ থেকে মুক্তি দিতে প্রস্তুত কিন্তু কংগ্রেস কি জানত না এ ধরনের আন্দোলন যুদ্ধোদ্যোগের ক্ষতি করবে ? অতএব অসহযোগিতার পথ ত্যাগ করেই কংগ্রেস জনগণের সবচেয়ে বেশি মঙ্গল সাধন করতে পারে। পরে তিনি জানান, গান্ধীর যদি কোন গঠনমূলক প্রস্তাব থাকে, তিনি তা বিবেচনা করবেন। এপ্রিলে গান্ধী অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ডাঃ বিধান রায়ও মনে করেছিলেন তাঁর মৃত্যু আসন্ন। সব প্রাদেশিক লাট ও স্বরাষ্ট্র দফতর মুক্তির সওয়াল করায়, অনিচ্ছা সত্ত্বেও, বড়লাট গান্ধীর মুক্তির আদেশ দিলেন এবং ৬ মে তিনি জনজীবনে ফিরে এলেন। তিনি ১৭ জুন লিখলেন,কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মনোভাব না জেনে কোনো পদক্ষেপ তিনি নিতে পাবেন না। "I pleaded as a prisoner for permission to see them. I plead now as a freeman for such permission."[২২] ওয়াভেল রাজি হলেন না। ২৭ জুলাই গান্ধী লিখলেন, অবস্থা পরিবর্তিত হওয়ায় ১৯৪২-এর আগস্ট প্রস্তাব কার্যকর করা সম্ভব নয়। এখুনি ভাবতের স্বাধীনতা ঘোষণা ও জাতীয় সরকার গঠনের শর্তে সমরায়োজনে পূর্ণ সহযোগিতার সুপাবিশ তিনি ওয়ার্কিং কমিটিকে করতে রাজি আছেন।[২৩] স্টুয়ার্ট গেলডাব নামধেয় নিউজ ক্রনিকলেব সাংবাদিককে ৪ জুলাই তিনি বলেছিলেন, অসহযোগিতাব পথে ফিরে যাবার কোন ইচ্ছা তাঁব নেই। "I cannot take the country back to 1942. History can never be repeated." কিন্তু খাদ্যপরিস্থিতির মোকাবিলা করতে ভারতীয়দের শক্তি ও দায়িত্ব চাই। তবে ১৯৪২-এর সঙ্গে তফাত আছে। এখন তিনি অসামবিক সবকাবেব বেশি কিছু চান না। শুধু বড়লাটকে ইংল্যাণ্ডের রাজার মত মন্ত্রীদের উপদেশ শুনতে হবে, সব প্রদেশে দায়িত্ববান সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সামরিক ব্যাপারে বডলাট ও প্রধান সেনাপতিব পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকবে, তবে জাতীয় সবকাবেব সমালোচনা করার ও উপদেশ দেবার অধিকাবও থাকবে। তিনি নিজে কি করবেন ? গান্ধীর উত্তব—"স্বাধীনতাব প্রতিশ্রুতি পেলে যুদ্ধবিরোধীরূপে আমি সরে দাঁড়াব, কিন্তু জাতীয় সরকার বা কংগ্রেসেরএই কাজে (যুদ্ধে সহযোগিতা করলে) বাধা দেব না।" আর সাম্প্রদায়িক সমস্যা ? তাঁর সমাধান তো চার্চিলের মনঃপূত নয়। ওয়াভেল আর কি করবেন ? হাউস অব লর্ডসে গেল্ডাব-গান্ধী সংবাদের ওপর মন্তব্য করেন লর্ড মানস্টার : "গান্ধী ক্রিপ্স প্রস্তাব যেভাবে বানচাল করেছিলেন এখনও তাই চান, অর্থাৎ বড়লাটের বিশেষ ক্ষমতা মানতে তিনি রাজি নন। তা ছাড়া সংখ্যালঘুদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি কি ব্রিটেন ভুলে যাবে ?"

এই প্রসঙ্গে রাজাজি এক ফর্মুলা চালু করলেন এবং বললেন তাতে গান্ধীব সায় আছে। এই প্রস্তাবে বলা হয়েছিল উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব ভারতে যেসব সংলগ্ন এলাকায় মুসলিমবা নিরঙ্কুশভাবে সংখ্যাগুরু সেগুলি আলাদা করে চিহ্নিত হবে ও তাদের নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হবে।

পাকিস্তান ও অবশিষ্ট ভারতের মধ্যে প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য, যোগাযোগ ও অন্যান্য জরুরী বিষয় নিয়ে চুক্তি হবে। জিন্না উত্তর দিলেন, নিজের দায়িত্বে তিনি এ ফর্মুলা নিতে পারেন না এবং লীগকেও জানাবেন যদি গান্ধী তাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগ করেন।

বড়লাটের উত্তর গান্ধী-প্রস্তাবে ঠাণ্ডা জল ঢালল। ভারত সচিব এমেরি ২৮ জুলাই পার্লামেণ্টে বলেন—এ তো ক্রিপস মিশন কালীন আজাদের প্রস্তাব। বড়লাটের উত্তর এমেরির প্রতিধ্বনি করল। তিনি মনে করিয়ে দিলেন যুদ্ধকালীন সরকার গঠনের বিভিন্ন পূর্ব শর্তের কথা যার মধ্যে অন্যতম হল সর্বদলীয় সম্মতিক্রমে শাসনসংস্কার প্রণয়ন। তা

ছাড়া—"I must make it clear that until the war is over, responsiblity for defence and military operations cannot be divided from the other responsibilities or Government, and that until hostilities cease and the new constitution is in operation, H. M. G. and the G. G. must retain their responsibility over the entire field."[২৪] চার্চিল জানতে চাইলেন, "ডাক্তারী মতে গান্ধীব মবার কথা না ?" কোহিমা-ইম্ফল বিজয়ীব যোগ্য প্রশ্ন। বিষণ্ণ গান্ধী সংবাদপত্রে জানালেন : "It is as clear as crystal that the British Government do not propose to give up the power they possess over the 400 millions, unless the latter develop strength enough to wrest it from them. I shall never lose hope that India will do so by purely moral means."[২৫] বলটা আবার গান্ধীর কোর্টেই ফিবে এল।

৯ অক্টোবর রাজাজি-প্রস্তাব নিয়ে জিন্নার সঙ্গে গান্ধীর কথাবার্তা শুরু হল। জিন্না বললেন, গান্ধীকে কংগ্রেসের সভাপতিরূপে কথা বলতে হবে ও স্বাধীনতার চেয়েও হিন্দু-মুসলিম সমঝোতাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। গান্ধী দ্বিজাতিতত্ত্ব পুনবায় প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি বললেন, লাহোবের লীগ প্রস্তাবেও দুই জাতির কথা নেই। আগে দেশ স্বাধীন হোক পবে দেশভাগের কথা ভাবা যাবে। ২১ জুন জিন্না বললেন, হিন্দু ও মুসলিম আলাদা জাতি। ২২শে গান্ধীব উত্তর—"Let it be a partition between two brothers, if a division there must be." ২৫শে জিন্না রাজাজি-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন, গান্ধী প্রত্যাখ্যান করলেন লাহোব-প্রস্তাব। এই আলোচনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় জিন্না চাইছেন—(১) পুরো ৬টা প্রদেশেব ওপব কর্তৃত্ব, (২) বাংলা ও পঞ্জাব ভাগে তাঁর আপত্তি, (৩) জনমত গ্রহণ (plebiscite) অর্থে বুঝছেন শুধু মুসলিম মত গ্রহণ, (৪) বৈদেশিক ও প্রতিরক্ষা ব্যাপারে কোনও যৌথ ব্যবস্থা চাইছেন না এবং (৫) কোন সংবিধান রচনা করার পূর্বেই পাকিস্তানকে সার্বভৌম ঘোষণা করতে হবে। পববর্তী কালে সাপ্রুব এক প্রশ্নের জবাবে গান্ধী বলেন, জিন্না যৌথ বিষয় নিয়ে বোঝাপড়া হবার আগেই দেশভাগ চান, আর ভাগের পর দুই সার্বভৌম বাষ্ট্রের মধ্যে এক সন্ধি। গান্ধী বোঝেন, সন্ধি ভঙ্গেব ফল সর্বত্র যা হয় তাই হবে—অর্থাৎ দুই সার্বভৌম বাষ্ট্রেব মধ্যে যুদ্ধ। জিন্না পঞ্জাব ও বাংলায় গণভোট চাননি, কারণ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে গণভোটেব ব্যাপাবে অন্যান্য সম্প্রদায়ের কোন বক্তব্য থাকতে পারে না। তেজবাহাদুর প্রশ্ন কবেন, দ্বিজাতিত্বে বিশ্বাস না করেও গান্ধী দেশভাগ মেনে নেন কী করে ? গান্ধী উত্তর দেন—"I agreed on the basis of members of a family desiring severance of the family tie in matters of conflict but not in all matters so as to become enemies one of the other as if there was nothing common between the two except enmity."[২৬] আমরা পরে দেখব—গান্ধীব এই অতি সূক্ষ্ম ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করে অনেক জল ঘোলা হবে। কংগ্রেসেবই একদল পাবিবাবিক দায়ভাগের ভিত্তিতে দেশভাগ সমর্থন করবেন। অধিকারী থিসিসেব উল্লেখ পূর্বেই করেছি। গান্ধীব এসব শিথিল কথায় তা জোর পায়। বড়লাট গান্ধী-জিন্না আলোচনার ব্যর্থতায় খুশি হয়ে মন্তব্য করেছেন—"দুটো বড় পর্বতের দেখা হল, আর একটা ছোট্ট মূষিকও জন্মাল না ?" তাঁর পরের মন্তব্য লক্ষণীয়, "This surely must blast Gandhi's reputation as a leader. Jinnah had an easy task, he merely had to keep on telling

Gandhi he was talking nonsense, which was true, and he (Jinnah) did so rather rudely, without having to disclose any of the weaknesses of his own position, or define his Pakistan in any way."[২৭]

॥ ২ ॥

যাঁরা মনে করেন ১৯৪৪-এ জিন্না লীগেব অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে গান্ধীর সঙ্গে কথা বলেছিলেন তাঁরা ভুল কববেন। সদ্য প্রকাশিত আজাদের পূর্ণ আত্মজীবনী India Wins Freedom-এ পড়ি গান্ধীজি তাঁকে অনাবশ্যক গুরুত্ব দিয়ে মুসলিম জনমানসে প্রতিষ্ঠিত করেন। "In fact, it is doubtful if Jinnah could ever have achieved supremacy but for Gandhiji's attitude. Large sections of the Indian Muslims were doubtful about Mr. Jinnah and his policy but when they found that Gandhiji was continually running after him and entreating him, many of them developed a new respect for Jinnah." ১৯৪৪-এর জুলাইতে জেলে বসে আজাদ শুনলেন গান্ধী-জিন্নার পত্রালাপ হচ্ছে এবং পরে সাক্ষাৎকারও। তখন সহযোগীদের তিনি বলেন, "গান্ধীব ভীষণ ভুল হচ্ছে, এতে তো সমস্যার সমাধান হবেই না, উল্টে রাজনৈতিক অবস্থা আরও সঙ্গীন হবে। পরবর্তী ঘটনায় আমার আশঙ্কাই সত্য প্রমাণিত হল। জিন্না পরিস্থিতিব পূর্ণ ফায়দা তুললেন, নিজেব শক্তি সুগঠিত কবলেন, কিন্তু এমন কিছু বললেন বা করলেন না যাতে ভারতের স্বাধীনতার কোন উপায়ে সাহায্য হয়।"[২৮] আমরা আগেই দেখিয়েছি লিনলিথগো ও ওয়াভেল প্রয়োজনবোধে জিন্নাকে তুলছেন। তবু বাংলা ও পঞ্জাবের বাজনীতিতে তখনও তিনি পুবো কর্তৃত্ব লাভ করেননি।

নাজিমুদ্দিন সরকারের খাদ্যনীতিতে (বা তার অভাবে) বিবক্ত হয়ে ৬ জানুয়ারি (১৯৪৪) ওয়াভেল বাংলায় ৯৩ ধারায় শাসন প্রবর্তনেব সুপারিশ করেছিলেন। তাঁব ১০ জানুয়াবিব রোজনামচায় পড়ি, স্বয়ং নাজিমুদ্দিনকে তিনি আপন বিরক্তির কথা জানাচ্ছেন, আর নাজিমুদ্দিন রাজনৈতিক শত্রুতার দোহাই পাড়ছেন। বড়লাট সব থেকে অসন্তুষ্ট ছিলেন সুরাবর্দির ওপর। ক্যাবিনেট তাঁর প্রস্তাবে সায় দেযনি।[২৮ক] ৯ ফেব্রুয়াবি তিনি এক কড়া তার পাঠালেন—"যদি ব্রিটেন দাবি মত খাদ্য সরববাহ না করে তবে ১৯৪৩-এর মন্বন্তরের চেয়েও ঢের বড় সর্বনাশ আসন্ন।" এমন কি পদত্যাগের হুমকিও তিনি দেন। ২৯ জুনের রোজনামচায় পড়ি—বাংলার নব-নিযুক্ত লাট কেসি (Casey) ছ' মাস পরই ৯৩ ধাবা প্রবর্তন করতে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন, কারণ, "he is aghast at the virulence and corruption of Bengal politics and the inefficiency of the administration..."

এ সময় বাংলার রাজনীতি নাজিমুদ্দিন ও সুরাবর্দির কলহে বিদীর্ণ হচ্ছিল। তাঁদের নতুন এক প্রতিদ্বন্দ্বী আসরে নেমেছিলেন—আবুল হাশেম। লীগের সেক্রেটারি হাশেমের আবেদন ছিল মফস্বলের লীগপন্থীদের কাছে।[২৯] অনেক কৃষক-প্রজা নেতা লীগে যোগ দেয় এ সময়।[৩০] মধ্যবিত্ত ও ছাত্রদের হৃদয় জয় করলেও হাশেম বাধা পান গ্রামাঞ্চলের ভূম্যধিকারীদের কাছ থেকে। তাঁর জমিদারি উচ্ছেদ ও সমাজতন্ত্রের ডাক জিন্না ও

নাজিমুদ্দিনের কানেও ভাল শোনায়নি।

১৯৪৪ থেকে পাকিস্তান ভাবনা মুসলিমদের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছিল। শীলা সেন লিখছেন, অধিকাংশ মুসলিম বুদ্ধিজীবী 'পূর্ব পাকিস্তান'কে স্বতন্ত্র ভাবেই দেখতেন। ১৯৪৩ সালে 'আজাদ' পত্রিকা-সম্পাদক আবুল কালাম সামসুদ্দিনের প্রেরণায় কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেশাঁস সোসাইটি' আর ঢাকায় 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ'।[৩১] আবুল মনসুর আহমেদ 'মোহম্মদী'তে লেখেন, 'তমুদ্দুন' বা সংস্কৃতির দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তান ধর্মভাই (পশ্চিম) পাকিস্তান থেকে আলাদা জাত।[৩২] নাজিমুদ্দিন কেসিকে বলেন, তিনি 'উত্তর-পূর্ব পাকিস্তান' চান। তাতে থাকবে বর্ধমান বিভাগ বাদ দিয়ে সমগ্র বাংলা, সমগ্র আসাম ও বিহারের পূর্ণিয়া জেলার একাংশ। বাংলা ও আসাম একত্র হলে মুসলিমরা সমগ্র জনসংখ্যার ৫১% হবে। কিন্তু নাজিমুদ্দিন প্রস্তাবিত 'উত্তর-পূর্ব পাকিস্তান'-এ তারা হবে ৫৮%। কিছুদিন পরে বর্ধমান বিভাগ স্বেচ্ছায় চলে আসবে।[৩৩]

বুদ্ধিজীবীরা যাই ভাবুন, লীগের পক্ষে গণসমর্থন সংগ্রহ করতে গিয়ে পাকিস্তানের দাবি সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হল। বাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগের যে খসড়া মেনিফেস্টো হাশেম রচনা করেন তাতে ইসলামের মূল্যবোধ ও শরিয়তের প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। এর সঙ্গে কিছু বামপন্থী দাবি মিলিয়ে দেওয়ায় তরুণ মুসলমানরা আকৃষ্ট হয়। নবাবী ও আক্রমখানী রাজনীতি এবং কলকাতা-ভিত্তিক ইস্পাহানি মার্কা অবাঙালী ব্যবসাদারের কর্তৃত্ব চ্যালেঞ্জ করা অন্যায় হয়নি। কিন্তু তাঁকে সুরাবর্দির ওপর খানিকটা নির্ভর করতে হয়েছিল। সুরাবর্দির শক্তির ভিত্তি ছিল কলকাতা ও শহরতলির দরিদ্র মুসলমান। পাকিস্তান তাদের কাছে এক আশ্চর্য চিচিংফাক বলে পরিগণিত হয়েছিল। ছাত্রের দল দু ভাগে বিভক্ত হয়েছিল। জিন্না অবশ্য নাজিমুদ্দিনের দিকেই ঢলে ছিলেন কারণ বাংলায় তাঁর সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত অনুচর—ইস্পাহানি—নাজিমুদ্দিনের সমর্থক। কিন্তু হাশেম তাঁর কান ভাঙাতে কসুর করেননি। তিনি জানাচ্ছিলেন, "The fact is that there is a fall in the ministerialist credit due to disintegration within our own ranks. The unbridled favouritism and nepotism in which the (Nazimuddin) Ministry has been indulging for some time past particularly in the matter of patronage, appointments and contracts here had serious repercussions inside our own ranks."[৩৪] বাঙালী রাজনীতির (নাকি সব রাজনীতির?) সেই পুরোনো গলদ—চাকরি, কনট্র্যাক্ট নিয়ে খেয়োখেয়ি—লীগের সংহতি বিপন্ন করেছিল। আগস্টের শেষে কেসি ওয়াভেলকে জানাচ্ছেন, "Nazimuddin had got back several followers by typical Bengal methods." উভয় পক্ষের গোলমাল চরমে উঠল বাংলার লীগ কাউন্সিলের নভেম্বর (১৯৪৪) অধিবেশনে। সুরাবর্দি দেখলেন, হাশেম এত জনপ্রিয় হয়েছেন যে তাঁব দল সম্পূর্ণ জিতলে তাঁর নিজেরই বিপদ ঘনাবে। নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে একটা সমঝোতায় এলেন তিনি। হাশেমকে পুনরায় সেক্রেটারি হিসেবে মেনে নেওয়া হল আব নাজিমুদ্দিনকে বলতে হল—ধান্দাবাজদের তিনি আর প্রশ্রয় দেবেন না। অনেক লীগ এম এল এ ধীরে ধীরে নাজিমুদ্দিন থেকে সুরাবর্দির দিকে সরে যেতে লাগলেন। অয়েষা জালালের ভাষায়—"Nazimuddin's stock had fallen, Suhrawardy's was rising, and Jinnah's, as usual, was unquoted."[৩৫] ১৯৪৫-এর ২৮ মার্চ নাজিমুদ্দিনের দলের ২১ জন এম এল এ তাঁকে ত্যাগ করলেন। বাজেট ১০৬-৯৭ ভোটে প্রত্যাখ্যাত

হল। কেসি বুঝলেন এ ধরনের দলাদলি এড়িয়ে ৯৩ ধারা প্রবর্তন কবাই শ্রেয়।[৩৬] বাংলায় জিন্নার প্রধান স্তম্ভ—নাজিমুদ্দিন—ভেঙে পড়লেন।

পঞ্জাবের কথা আগেই কিছু বলেছি। সিকান্দারের মৃত্যুর পর খিজির হায়াৎ তিওয়ানা প্রধানমন্ত্রী হলেন। এতে হাযাৎ ও দৌলতানা পরিবার ক্ষুব্ধ হয়েছিল। খিজির সিকান্দারের পুত্র সৌকত হায়াৎকে মন্ত্রিসভায় নিয়ে গোলমাল এড়ান। জিন্নার অনুচর ববকত আলি (যেমন বাংলায় ছিলেন ইস্পাহানি) তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে ফেলতে চাইলে জিন্না পাশ কাটান। বরকতবা চান সব এম এল এ য়ুনিয়ানিস্ট দল ত্যাগ করে লীগ দলের সদস্য হন। খিজির বলেন, সে তো ১৯৩৭ সাল থেকে (সিকান্দার-জিন্না চুক্তিব সময় থেকে) হয়েই আছে। বুদ্ধিমান জিন্না খিজিরের কথাই মেনে নেন। পঞ্জাবের ছোটলাট গ্ল্যান্সি চেয়েছিলেন, ব্রিটিশ স্বার্থে, যুদ্ধেব স্বার্থে, মুসলিম-শিখ-জাঠ য়ুনিয়ানিস্টবা গদীতে থাকুক। তাঁব ভয় হল যদি লীগেব প্ররোচনায তা ভেঙে যায়! 'পাকিস্তান' নাবা তুলে লীগপন্থী ও সুবিধাবাদীবা তা করতে পারে। হলও তাই। সৌকত হায়াৎ/মামদোত ও দৌলতানাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে খিজিবকে তাড়াতে চাইলেন। মামদোত জিন্নাব সাহায্যও চাইলেন। জিন্না বুঝলেন, আবও একটু ধৈর্য ধরলে লীগেব (তাঁব) প্রতিপত্তি বাড়বে। হলও তাই। ১৯৪৩-এর নভেম্ববে খিজির ঘোষণা কবলেন, তাঁর মুসলিম অনুচরবা লীগ দলের বলে পবিগণিত হবে। কিন্তু সিকান্দার-জিন্না চুক্তি পবিষদীয দল দ্বারা অনুমোদন কবিযে নিযে আপন স্বাধীনতা অনেকখানি বজায বাখলেন তিনি। অন্যদিকে কমিটি অব অ্যাকশন ও সেন্ট্রাল পার্লামেন্টাবি বোর্ড গঠন কবে জিন্না সর্বভাবতীয লীগেব তাঁবে আনতে চাইলেন সব প্রাদেশিক লীগকে।[৩৭] তাতে সুবিধা হল না। জিন্না নিজে পঞ্জাবে এলেন ১৯৪৪-এব মার্চে এবং সিকান্দাব-জিন্না চুক্তি প্রকাশ্যে প্রত্যাখ্যান কবলেন। ছোটুবাম হিন্দু ও জাঠদের পক্ষ থেকে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন।

জিন্না পাকিস্তানেব ব্যাপাবটা ব্যাখ্যা না কবেই তাকে সব মুশকিলেব আসান বলে চালাতে চাইলেন; অহ্রব, খাকসার সবাইকে লীগে যোগ দিতে বললেন। ভীত খিজির গ্ল্যান্সিকে বলেন, তিনি রাজনীতি ছেড়ে দেবেন। যে ভাবে মুল্লা ও মৌলভীদেব দিয়ে উত্তেজনা ছড়ানো হচ্ছে তাতে প্রত্যক্ষ আক্রমণ অসম্ভব নয়। য়ুনিয়ানিস্ট মুসলিমরা কোনদিনই খুব সংহত ছিল না। চাপে পড়ে বা লোভে পড়ে তাঁরই অনুগত ৩২ জন লীগে ভিড়লে তিনি আশ্চর্য হবেন না। "Pakistan slogan is bound to gain momentum and...it is likely to become a decisive factor in the next election."[৩৮] আপাতত সবকাবী সমর্থনে খিজিব টিকে গেলেন। যুদ্ধকালে ওয়াভেলের কাছে পঞ্জাবী সৈন্যেব মূল্য সর্বাধিক। তিনি বললেন, পঞ্জাবী জমিদাবদেব শহুবে বাজনীতিক (অর্থাৎ লীগ)-দেব বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে—"তাঁদের জানানো হোক রুটির কোন দিকে ঘি মাখানো।"[৩৯] গ্ল্যান্সির চাপে সৌকতকে মন্ত্রিসভা থেকে সরিয়ে দেওযা হল। অবস্থা বুঝে জিন্না নীরব বইলেন।

সিন্ধুতে বাজনীতিব কলকাঠি নাড়তেন ছোটলাট ডাও। সেখানে আল্লাবক্স নিহত হবার পব যে নির্বাচন হয় তাতে লীগ দুই অক্ষেব মধ্যে বিভক্ত হল। এক পক্ষে সঈদ ও গজদার, অন্যপক্ষে খুড়ো ও হারুন। সঈদকে সমর্থন কবেছিলেন জিন্না। সীমান্তে আওবঙ্গজেব খান, আবদুব বব নিস্তাবের মত কিছু উগ্রপন্থী লীগ যোগাড কবলেও হিন্দু এবং শিখ সমর্থক পাবার আশায পাকিস্তানকে অগ্রাধিকার দিতে পারেননি। ছোটলাট কানিংহাম বলতেন, সীমান্তে ইসলামকে ধবে বেখেছেন তিনি, লীগ নয়।

মোটের ওপর ১৯৪৪-এর মাঝামাঝি ওয়াভেল যুদ্ধে জিতেছেন, গান্ধী একা, জিন্নাও মুসলিমদের একমাত্র মুখপাত্র হতে পারেন নি। ওয়াভেলের মনে হল—শাসন সংস্কারের কথা তোলার এমন সুযোগ আর আসবে না। ২১ সেপ্টেম্বব ভাবত সচিবকে তিনি প্রস্তাব পাঠালেন প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে কেন্দ্রে এক অস্থায়ী সরকাব গঠনেব জন্য সম্মেলন ডাকা হোক। ২৪ অক্টোবর চার্চিলকে তিনি যে পত্র লেখেন তাতে বলা হযেছে—১৯৪৩-এর ৮ অক্টোবব ভারতের বডলাট হিসাবে নিযুক্ত করাব সময় প্রধানমন্ত্রী যে সব নির্দেশ দেন তার মধ্যে দুটি ছিল— (১) সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধান ও (২) প্রতিরক্ষার প্রয়োজন মনে রেখে, প্রযোজনবোধে, শাসন সংস্কাব-বিষযক প্রস্তাব দান। কার্যকালের বৎসরাধিক পবে তাঁব মনে হচ্ছে এ বিষয়ে প্রস্তাব দেবাব সময এসেছে। ভারতবর্ষকে বাহুবলে ধরে রাখা সম্ভব নয়। প্রথমত তাতে ভযাবহ দমননীতি প্রয়োগ করতে হবে। কিন্তু যুদ্ধ শেষে ব্রিটিশ সৈন্য বেশিদিন থাকতে রাজি হবে না, বিশ্বেব জনমতও তা সমর্থন করবে না। "The present Government of India connot continue ındefinitelv, or even for long. Though ultimate responsibility still rests with His Majesty's Government, His Majesty's Covernment has no longer the power to take effectıve action." এমন অর্থনৈতিক ও বাজনৈতিক অবস্থার সৃষ্টি হবে যাব জন্য ভাবত দাযী অথচ বদনাম হবে ব্রিটেনেব। যাবা সত্যি দেশ শাসন করত সেই ব্রিটিশ আমলাবা শ্রান্ত, হতাশ, আব যুদ্ধশেযে শাসন কবাব জন্য কেউ এদেশে আসবেও না। যদি ভাবতকে কমনওযেলথেব সদস্য হিসেবে বাখতে হয় কিছু সংস্কাব আশু প্রবর্তন কবতে হবে। "We have every reason to mistrust and dislike Gandhi and Jinnah, and their followers. But the Congress and the League are the dominant parties in Hindu and Muslım India, and will remain so." তাবাই সংবাদ মাধ্যম নিযন্ত্রণ করে, নির্বাচনযন্ত্র চালায, ধনীদেব প্রভাবিত কবে। তা ছাডা গান্ধী (যাঁব আয়ুব ঝুঁকি কোন বীমা কোম্পানি নিতে চাইবে না) এবং জিন্না কাল অন্তর্হিত হলেও তাঁদেব চেয়ে বেশি বিচক্ষণ লোক পাবাব আশা নেই। এবকম বিদ্রোহী জে. পাশা ও ডি.ভ্যালেবাব সঙ্গে আগেও আমাদেব বোঝাপডা কবতে হযেছে। জাপানী যুদ্ধ শেষ হবাব আগেই আলোচনা শুরু কবা বিধেয।

তবে প্রস্তাবটা সৎ ও বন্ধুত্বপূর্ণ হওযা চাই। "What I have ın ınind is a provısional Political Government, of the type suggested in the Cripps declaration, within the present Constitution..." আব তাব সঙ্গে চূড়ান্ত শাসনতান্ত্রিক সমঝোতা নিয়ে আলোচনা। এ জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন—আত্মিক পরিবর্তন। সময়টা গান্ধী-জিন্না আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার ফলে অনুকূল হয়েছে। এ সুযোগ ছাড়া উচিত হবে না।[৪০]

ভারত সচিব এক পালটা প্রস্তাব পাঠালেন। ন্যাশানাল ডিফেন্স কাউন্সিলেই সংস্কাব নিয়ে আলোচনা চলুক। ওয়াভেলের জবাবে তিনি ছোটলাটদের সঙ্গে পবামর্শ কবতে বলেন। বিরক্ত হয়েই স্বয়ং চার্চিলকে উপরের চিঠি লেখেন ওয়াভেল। ১৬ নভেম্বর ভুলাভাই দেশাই তাঁর সঙ্গে দেখা করে বলেন, বর্তমান শাসনতন্ত্রেব অধীনে জাতীয় সরকার গঠন করলেই হবে—অবশ্য তার পূর্বে ওয়ার্কিং কমিটিব সদস্যদের মুক্তি দিতে হবে ও কংগ্রেসী প্রদেশ থেকে ৯৩ ধারার শাসনের অবসান চাই। ২০ নভেম্বব তেজ বাহাদুর সাপ্রু

নির্দলীয় কমিটি গঠন করেন। ঘনশ্যাম দাস বিড়লা জেনকিনসের মন জানবার চেষ্টা করেন। অর্থাৎ সকলে ব্রিটেন কি চাল চালে তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। ১৯৪৫-এর ১৩ জানুয়ারি ভুলাভাই বড়লাটের ব্যক্তিগত সচিবকে বলেন যে যুদ্ধকালে কেন্দ্রে ও প্রদেশে (?) কোয়ালিশন সরকার গঠনে তিনি গান্ধী ও জিন্না উভয়ের সম্মতি পেয়েছেন। কিন্তু ২০ জানুয়ারি তাঁর সঙ্গে কথা বলে বড়লাটের সন্দেহ হয় কতখানি সমর্থন সত্যি তিনি পেয়েছেন। তবু ৩০ জানুয়ারি দেশাই-প্রস্তাবের ভিত্তিতে আলোচনার জন্য তিনি ভারত সচিবকে অনুরোধ জানান। ফেব্রুয়ারি মাস ধরে ক্যাবিনেটের নানা সংশয় ও আপত্তির খবর আসতে থাকে। শেষে ক্যাবিনেট বড়লাটকে দেশাই ও জিন্নার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বলে। জিন্না বোম্বাই-এর লাট কলভিলকে জানান—তাঁর সঙ্গে দেশাইয়ের কোনও কথা হয়নি। আর লিয়াকতের সঙ্গে দেশাই-এর কি কথা হয়েছে তিনি জানেনও না। (বড়লাটের মন্তব্য—"an obvious falsehood")। জিন্না এই সময় কিংকর্তব্যবিমূঢ়। সিন্ধু লীগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, সীমান্ত সরকারের পতন আসন্ন এবং পঞ্জাবে খিজিরের য়ুনিয়ানিস্ট মন্ত্রিসভা বহাল তবিয়তে সমাসীন। সবচেয়ে মজার কথা, আইন পরিষদে লিয়াকতও অস্বীকার করেন এ ধরনের কথা হয়েছে এবং পরে দেশাইকে গোপনে বলেন, জিন্না এসব কথা চালাচালিতে অত্যন্ত বিরক্ত হওয়ায় তিনি অস্বীকার কবতে বাধ্য হয়েছেন।

কথা হয়েছিল সত্য কিন্তু বেশি এগোয়নি। প্যারেলালের লেখায় পড়ি—গান্ধী ভুলাভাই প্রস্তাবের কিছু সংশোধন চেয়েছিলেন।

১। সমহারে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ থেকে কংগ্রেস ও লীগ প্রতিনিধি, সংখ্যালঘু প্রতিনিধি এবং প্রধান সেনাপতিকে নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হবে।

২। বড়লাটকে কার্যত ভেটো প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে।

৩। ইউরোপীয় সদস্য না রাখাই বাঞ্ছনীয়। যদি বাখতে হয়, কংগ্রেস ও লীগ তাদের মনোনীত করবে।

৪। যদি এরকম সরকার স্থাপিত হয়, তার প্রথম কাজ হবে ওয়ার্কিং কমিটিব সদস্যদের মুক্তিদান। এ বিষয়ে লীগকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।

৫। কোন কিছু সমাধানে রাজি হবার আগে ভুলাভাইকে জানতে হবে জিন্নাব সম্মতি আছে কিনা এবং পরিষ্কারভাবে সব শর্ত লিখিত হবে।

৬। কেন্দ্রে সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে প্রদেশ থেকে গভর্নবের শাসন তুলে নিতে হবে ও কোয়ালিশন সরকার স্থাপন করতে হবে।[৪১] বলা বাহুল্য, পঞ্চম শর্ত, অর্থাৎ জিন্নার সম্মতি পাওয়া যায়নি।

ব্রিটেনের টালবাহানায় বিরক্ত ওয়াভেল বিলেত গেলেন কর্তৃপক্ষেব সঙ্গে নিজস্ব প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করতে। ২৬ মার্চ ক্যাবিনেট সাব কমিটিতে দীর্ঘ আলোচনা শুরু হয়। এর সদস্য ছিলেন অ্যাটলি, এমেরি, ক্রিপস, অ্যাণ্ডারসন, সাইমন, গ্রিগ, র‍্যাব বাটলার। অনেকে ঝুঁকির কথা তোলেন, সাইমন নানা আইনের কূটকচালি। ২৯ মার্চ চার্চিলের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার কালে সম্ভাব্য সাধারণ নির্বাচনের সুবাদে তিনি নতুন প্রস্তাব স্থগিত রাখতে বলেছিলেন। তিনি নিজে ভারতকে টুকরো করে হিন্দুস্তান, পাকিস্তান, প্রিন্সেসস্থান ইত্যাদি করার কথাও বলেছিলেন। অন্যদিকে ক্যাবিনেট কমিটিতে অ্যাটলি শাসন পরিষদের ভিত্তিরূপে কোনো-না-কোনো গণতান্ত্রিক নির্বাচন চাইছিলেন। ১৪ ও ১৬ এপ্রিলের কমিটিতে জোর দেওয়া হয় প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সভ্যদের নির্বাচিত এক প্যানেল থেকে একসিকিউটিভ কাউন্সিল মনোনীত হোক, আর কোনো কোন ক্ষেত্রে বড়লাট

তার মতের ওপর ভেটো প্রয়োগ করতে পারবেন তাও স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হোক। ওয়াভেল বললেন, প্রথমটা করতে গেলেই রাজনৈতিক প্রশ্ন উঠবে (আইন পরিষদের বহু সদস্যই ভারতরক্ষা ও অন্যান্য আইনে বন্দী)। তা ছাড়া রাজাজির মত যে সব লোককে কংগ্রেস বর্তমান অপছন্দ করে তাঁরা মনোনীত হবেন না। দ্বিতীয়টা অতি জটিল ও বিতর্কিত প্রশ্ন। কংগ্রেস চাইবে ভেটোর সর্বৈব প্রত্যাহার, আর লীগ বলবে সংখ্যালঘুর স্বার্থরক্ষায় অত্যাবশ্যক ও অবর্জনীয়। শেষে এমন হল যে ক্যাবিনেট কমিটিতে ওয়াভেলকে ডাকা হত না। ২৬ এপ্রিলের রোজনামচায় ওয়াভেল লিখছেন—"I am getting tired of being treated as an untouchable in the presence of Brahmins..." ওদিকে খবর আসছে, জার্মান ফ্রন্ট ভেঙে পড়ছে, ব্রহ্মেব পুনরুদ্ধার হল বলে। আরও দেরি করলে কংগ্রেসের দাবি তো বাড়বেই।

দেরি হবার একটা কারণ ভারতীয় শিল্পপতি ও বণিকদের নানা দাবি। যুদ্ধেব চাহিদা মেটাবার জন্য ওয়ার রিসোর্সেস কমিটিব অধীনে সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট শিল্পোদ্যোগ নিযন্ত্রণ করছিল। তখন থেকেই কনট্রাক্টারদের স্বর্ণযুগ শুরু। সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট ক্রীত পণ্যেব সারণী দেওয়া হল।[৪২]

সারণী-১

ক্রীত পণ্য	১৯৩৯ (সেপ্টেম্বর)—১৯৪১ (৩১ ডিসেম্বর) মূল্য (দশ লক্ষ পাউণ্ড হিঃ)
এঞ্জিনিয়ারিং, হার্ডওয়্যার, ইত্যাদি	৭৩
সূতীবস্ত্র, পশম বস্ত্র ইত্যাদি	৭২.৮
খাদ্য	১২.১
চামড়া ও তজ্জাত দ্রব্য	৭.৬
কাঠ ও কাঠজাত দ্রব্য	৬.৮
	১৭২·৩

১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ পূর্ণ নিরিখ পাওয়া যায়নি।

যুদ্ধের প্রথমে দেশে ৬০০'র মত এঞ্জিনিয়ারিং পণ্য প্রস্তুতের কারখানা ছিল, যুদ্ধের শেষে কারখানার সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫০০। আগে যা তৈরি হত না তা হতে থাকে। অনুরূপভাবে বেড়ে যায় রাসায়নিক শিল্প। কাপড়, সিমেন্ট, স্টিল, কাগজ, চিনি উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছিল। কয়লা ও পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন ১৯৪১-এর পর কমে যায়। তবে ওঠা পড়াও লক্ষণীয়।[৪৩] ১৯৪৩-এর মার্চ নাগাদ কাপড়ের দাম মহাযুদ্ধেব আগের দামের পাঁচ গুণ হয়েছিল। উৎপাদন সাড়া দেবে—আশ্চর্য কি ?

সারণী-২

পণ্য	১৯৩৮	১৯৩৯	১৯৪০	১৯৪১	১৯৪২	১৯৪৩	১৯৪৪
কাগজ (হাজার হন্দর হিঃ)	১১৮৪	১৪১৬	১৭৫৩	১৮৭১	১৮২১	১৭৫২	২০০১
কাপড (দশ লক্ষ গজ হিঃ)	৪২৬৯	৪০১২	৪২৬৯	৪৪৯৩	৪১০৯	৪৮৭০	৪৬৯৫
সুতো (দশ লক্ষ পাউণ্ড হিঃ)	১৩০৩	১২৪৩	১৩৪৯	১৫৭৭	১৫৩৩	১৬৮০	১৬২৩
সিমেন্ট (হাজাব টন হিঃ)	১৫১২	—	১৭২৭	—	২১৮৩	২১১২	২০৪৪
চিনি (হাজাব টন হিঃ)	৬৫০	১২৪১	১০৯৫	৭৭৮	১০৭০	১২১৬	৯৮৫
স্টিল ইনগট (হাজার টন হিঃ)	৯৭৭	—	১২৮৫	১৩৬৩	১২৯৯	১৩৬৬	১২৬৪

এর মধ্যে সবকাবী কাবখানায তৈবি অস্ত্রশস্ত্র ধবা হযনি, অনেক ক্ষুদ্রশিল্পেব হিসেবও নয়। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ভি কে আব ভি বাও ১৯৪৪-এব প্রথম সংগঠিত সব শিল্পেব উৎপাদন মিলিয়ে বাস্তববিক হাব ৬০% নির্দেশ কবেছিলেন।[৪৪]

কিন্তু শিল্পতিবা এতে সন্তুষ্ট হননি। ঘনশ্যাম দাস বিড়লা চাইছিলেন ভাবতেব ক্রমবর্ধমান স্টাবলিং পাওনা থেকে নতুন যন্ত্রপাতি কিনে কাবখানাগুলিকে আধুনিক কবা হোক। যুদ্ধকালেও কোন পবিকল্পনা ছিল না বলে তিনি দুঃখ কবেছেন

"There is no facility for the disposal of the exportable surplus. The prices, therefore, have in many cases failed to respond to the newly created demand...Our gold reserves are frittered away when they could have been used for buying plant from America which would have been to England's advantage."[৪৫]

বস্তুত নাৎসী জার্মেনী ও পবে গণতান্ত্রিক পশ্চিমী দেশগুলিব প্রাপ্তিসাধ্য সঙ্গতির পরিকল্পিত ব্যবহার দেখে তাঁবা চাইছিলেন বৈজ্ঞানিক প্ল্যানিং। অস্ট্রেলিযাব উন্নতি তাঁদেব ঈর্ষাব কাবণ হযেছিল। কযলাব উৎপাদন কি বাডানো যেত না? পণ্য চলাচল ব্যবস্থাব উন্নতি কবা যেত না? গ্র্যাডি কমিশনের সুপারিশ মেনে অ্যামেবিকা থেকে নতুন যন্ত্র কেনা যেত না? বিড়লা ও ওযালচাঁদ হীবাচাঁদের মত উদ্যমী শিল্পপতি জাহাজ, প্লেন, নানা ধবনেব মোটব গাড়ি তৈবি কবতে চাইছিলেন। আবও দুঃখের কাবণ যুদ্ধের আগে তাঁবা যে সব বযনযন্ত্র বা সেলাই-এব যন্ত্র তৈরিব কারখানা বসিযে ছিলেন, সবকার তা অধিগ্রহণ কবেছিল। ওয়ালচাঁদ অনেক কষ্টে হিন্দুস্থান এয়ার ক্রাফট কোম্পানীর কাবখানা কবলেন ব্যাঙ্গালোরে— ১৯৪২ সালে সরকার তা নিয়ে নিল। আসলে ব্রিটেন চেয়েছিল ভাবতেব অবদান গোলাবারুদ, পাট, সুতো বা তজ্জাত বস্ত্র, চা, মাইকা, ম্যাঙ্গানিজ, বাবাব ইত্যাদি খনিজ বা বনজে সীমাবদ্ধ থাকুক আব ভাবতীয শিল্পপতিরা চেয়েছিলেন যুদ্ধের সুযোগ নিযে ভারী শিল্প উৎপাদনের অংশ নিতে। এই বিবোধ নতুন নয়, কিন্তু তা স্বাধীনতার দাবিকে অনেক বেশি জোরদার কবে।

বস্তুত প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেব মধ্যে ভাবতে ভাবী শিল্পেব অগ্রগতি প্রায় আড়াই গুণ

বেড়েছিল এবং ডেভিড মীকের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ফোক হিলগার্ড দেখিয়েছেন, রাশিয়া ও জাপান ছাড়া তা অন্যান্য পশ্চিমী দেশেব তুলনায় বেশি বই কম ছিল না। নীচেব সাবণী দেখলে তুলনা কবা সহজ হবে।[৪৬]

সারণী-৩

বছর	যুক্তরাষ্ট্র	জার্মেনী	ব্রিটেন	রাশিয়া	জাপান	ভারত
১৯১৩	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০
১৯২১-২৫	১২৯.৩	৭৭.৭	৭৬.৪	৪১.১	২০৩.৩	১২২.১
১৯২৬-২৯	১৬৩.৬	১১২.২	৯২.৬	১৩৪.৯	২৮৯.৮	১৪৬.৬
১৯৩০	১৪৮	১০১.৬	৯১.৩	২৩৫.৫	২৯৪.৮	১৪৪.৭
১৯৩১-৩৫	১১৭.৮	৯০.৬	৯২.৩	৩৯৩.২	৩৬৫.৮	১৭৪.৮
১৯৩৬-৩৮	১৬৬.৬	১৩৮.৩	১২১.৫	৭৭৪.৩	৫২৮.৯	২৩০.৪

পশ্চিমী দেশে মান্দ্য যে প্রভাব ফেলেছিল ভাবতেব শিল্প উৎপাদনেব ক্ষেত্রে ততটা ফেলেনি। ১৯৩৩-৩৪-এব উৎপাদন আদৌ কমেনি। শিবসুব্রহ্মনিযমেব হিসেবে জাতীয আযেব হাবেব অংশ হিসাবে শিল্পোৎপাদনেব বৃদ্ধি ঘটেছিল ৩.৭৫% থেকে ৭ ৫%। সুতীবস্ত্র ও পাট শিল্পে উন্নিতিব হাব কম হলেও (উৎপাদন অবশ্যই বেড়েছিল) কিছু কিছু নূতন শিল্প দেখা দেয। পাট শিল্প ভাবতীযদেব হাতে চলে যাচ্ছিল। বস্ত্রশিল্পেব সমস্যা বোম্বাই ও আমেদাবাদে আলাদা ছিল। আমেদাবাদ আগে থেকেই মিহি সুতো ও কাপড়ে চলে গিযেছিল। বোম্বাই তা পারেনি। তাই ব্রিটিশ ও জাপানী আমদানি ঠেকাবার জন্য বোম্বাই মালিকদেব এত মাথাব্যথা। ১৯২১ সালে সরকাব আমদানি কাপড়েব ওপব ১১% শুল্ক ধার্য কবে, সুতোর ওপর নতুন কবে ৫%। পরে সংবক্ষণ নীতি আবও জোবদাব কবা হয়। কিন্তু আসল সমস্যাটা অভ্যন্তরীণ বাজাব অর্থাৎ ভাবতীযদের ক্রয়ক্ষমতাব অভাবে নিহিত ছিল। ১৯২৯ থেকে ১৯৩৪-এর মধ্যে বোম্বাই-এব মিল সংখ্যা ৭৭ থেকে ৫৫-তে নেমে যায়। যাবা বেঁচে যায় তাবা অনেক বেশি দক্ষ কিন্তু অনেক বেশি শ্রমিক শোষণে তৎপবও বটে। ১৯২৮, ১৯২৯, ১৯৩৪-এব সাধাবণ শ্রমিক ধর্মঘট তাব প্রমাণ। কংগ্রেসী আমলে ও তাবপব সবকার শ্রমিকদেব স্বার্থবক্ষায কিছু তৎপব হয।

ইস্পাত উৎপাদনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো সমস্যা ছিল বৈদেশিক ইস্পাত নির্মাতাদের কম দামে বিক্রয় নীতি (dumping)। মরিস ডি মবিসেব মতে ১৯২৩ ও ১৯৩২-এর মধ্যে ভারতে আমদানি ইস্পাতের দাম প্রায় ৬০% কমে গিয়েছিল। সংরক্ষণনীতি ছিল স্বল্প ফলদায়ী। ১৯২৪-এব জুনে প্রথম আমদানি শুল্ক বসিয়েই প্রায় পব মুহূর্তে অস্থায়ী বাড়তি শুল্ক বসাতে হয়। ১৯২৬-এ সাত বছবেব জন্য সংরক্ষণ পেল টিসকো। তা আবার বাড়ানো হয়। দিলীপ ওযাগ্‌লের কেম্‌ব্রিজ গবেষণাপত্র ইস্পাত শিল্পেব বিভিন্ন সমস্যা বিশ্লেষণ করেছে।

সারণী-৪

সময়	টিসকোর বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা (টন)
প্রথম মহাযুদ্ধ	১২৫,০০০
১৯২৩-২৪ (বৃহত্তর সম্প্রসারণ নীতিব ফলে)	৪২০,০০০
১৯৩৯	৮০০,০০০

মোটামুটি প্রতি বছর উৎপাদন ক্ষমতা বেড়েছে ৮%। ১৯৩৬ সালে মাইসোর আয়রন অ্যাণ্ড স্টিল ওয়ার্কসে উৎপাদন শুরু হয় আর ১৯৩৯-এব ডিসেম্বরে স্টীল করপোরেশন অব বেঙ্গল-এ। চাহিদা আশানুরূপ বাড়েনি। তাই ইণ্ডিয়ান আয়বন অ্যাণ্ড স্টিল কোম্পানী (ইসকো) ১৯১৮ থেকে পিগ আয়বন উৎপাদন শুরু করলেও ক্ষমতা বাড়াতে সাহস করেনি। তবে অটোয়া চুক্তি অনুসাবে ব্রিটেন ভাবতের লোহা কিনতে থাকে। যুদ্ধের জন্য চাহিদা ফেব বাড়ে। ১৯৩৯-এ হীবাপুরেব ইসকো কুলটির বেঙ্গল আযরন কোম্পানীব সঙ্গে যুক্ত হয় স্কবের অধীনে। মহাযুদ্ধের সময় তার উৎপাদন ক্ষমতা ২০০,০০০ টনে পৌঁছায়।

সিমেন্টের ক্ষেত্রে এসোসিয়েটেড সিমেন্ট কোম্পানীজ একচেটিযা ব্যবসার দৃষ্টান্ত ছিল। কিন্তু ১৯৩৭-এ ডালমিযা-জৈন গোষ্ঠী পাঁচটি নতুন কাবখানা শুরু করে তাতে আঘাত হানে। কাগজের চাহিদা ১৯২৩-২৫-এ ছিল ১০৮,০০০ টন, ১৯৩৬-৩৮-এ তা বেড়ে হয ২১৮,০০০—অর্থাৎ ঠিক দুগুণ: কিন্তু ১৯২৫ থেকে সংবক্ষণ নীতির আওতায় থাকা সত্ত্বেও মণ্ডেব অভাবে কাগজশিল্প বাড়তে পাবেনি। দুটি যুরোপীয় মিল—টিটাগড ও বেঙ্গল পেপার—কাগজ উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ কবত কিন্তু এখানেও ভারতীযরা প্রতিযোগিতা শুরু কবে। বিশেব দশকে পবিশুদ্ধ চিনির মাত্র ৩.৭% দেশে তৈবি হত। মাব খেত আখ চাষীবা। ত্রিশের দশকে সরকাব আমদানি চিনিব ওপর ১৫০% শুল্ক বসায। ফলে তার পরিমাণ ১৯২৯-৩০-এব ৯৩৩,০০০ টন থেকে ১৯৩৬-৩৭-এ শূন্যে ঠেকে। এই সময় আধুনিক চিনির কলের সংখ্যা ২৭ থেকে বেড়ে হয় ১৫০। চিনি শিল্পের স্থান হয বস্ত্র, পাট ও লৌহ শিল্পের পর।

যুদ্ধেব কল্যাণে ১৯৩৮-৩৯ থেকে ভারী শিল্প উৎপাদনেব মূল্যবৃদ্ধিব নিবিখ দেওয়া হল।[৪৭]

সারণী-৫

বছর	উৎপাদনের মূল্য (দশ লক্ষ টাকার হিঃ)	১৯৩৮কে ১০০ ধরে অগ্রগতির হার
১৯৩৮	১,৭০১	১০০
১৯৩৯	১,৭৫১	১০২.৯
১৯৪০	১,৭৭৯	১০৪.৬
১৯৪১	২,১৩৯	১২৫.৭
১৯৪২	২,৩৩০	১৩৭
১৯৪৩	২,৫৯৯	১৫২.৮
১৯৪৪	২,৫৪৮	১৪৯.৮
১৯৪৫	২,৭৪৯	১৬১.৬

কিন্তু যেটা সব ভারতীয় শিল্পপতিদের উষ্মার কারণ সেটা হল মূলধনী পণ্য (Capital goods) উৎপাদন সংগঠনে অপারগতা। এদের মধ্যে প্রধান ছিলেন কলকাতায়—থাপার, বাঙ্গুর, সূরযমল-নাগরমল, আগরওয়ালা ও সর্বোপরি বিড়লা ভ্রাতাগণ ; বোম্বাইতে টাটা ও ওয়ালচাঁদ ; উত্তর ভাবতে গোবন, ডালমিয়া, নারাং প্রভৃতি। বিড়লা ও টাটা কোম্পানী সমূহের টাকায় আদায়ীকৃত লগ্নীর পরিমাণ ছিল—

সারণী-৬

লগ্নী (Paid up Capital in rupees)

বছর	বিড়লা ব্রাদার্স	টাটা সনস্
১৯২২	৬,৫২৩,০০০	২৬৬,০১৩,০০০
১৯৩৭	১৭,৮৯৭,০০০	১০৪,৫৯৪,০০০
১৯৪৭	২,১৮,৫০৪,০০০	১৪০,৭৪৮,০০০

কিন্তু টাটা সনসেব মূলধনের সঙ্গে টাটা হাইড্রোইলেকট্রিক কোম্পানীর মূলধন যোগ করলে অবস্থা স্পষ্ট হবে।

আমবা দেখেছি—টাটারা ও তাঁদেব সঙ্গে যুক্ত বোম্বাই-এর বড় শিল্পপতিগণ জওহরলাল নেহেরুর সমাজতন্ত্রী ভাষণের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন[৪৭ক]। কিন্তু বিড়লা মনে করতেন এ ধরনের প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত সীমাবদ্ধ দৃষ্টির লক্ষণ।[৪৮] কিন্তু অন্যান্য ব্যবসায়ীরা মান্দ্যেব জন্য ঘা খায়। জনগণের ক্রয় ক্ষমতাব সঙ্গে তাদের উন্নতি জড়িত আবার সেই ক্রয় ক্ষমতার সঙ্গে স্বাধীনতার প্রশ্ন। আশ্চর্য নয়, যেদিন নেহেরু বিরোধী বোম্বে মেনিফেস্টো প্রকাশিত হয়, সেদিনই বোম্বে বুলিয়ান এক্সচেঞ্জেব ব্যবসায়ীরা নেহেরুকে দেড় হাজার টাকার থলি উপহার দিয়েছিল, আব পরের দিন কাপড়, শস্য, তৈলবীজ বণিকরা ও তার পরের দিন চিনি, বীজ, শস্যের পাইকাবী বিক্রেতারা সংবর্ধনা জানিয়েছিল। কংগ্রেস যখন সাতটি প্রদেশে শাসন ভার পেল, তখন শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের ক্ষতি হয়নি—একথা স্বীকার করেছেন ইণ্ডিয়ান চেম্বাব অব কমার্সের ১৯৪৮-এর অধিবেশনের সভাপতি—এম এল শা। ওয়ালচাঁদেব প্রেমিয়াব অটোমোবিল কোং প্রতিষ্ঠিত হয় এই সময়। কিলিক নিক্সন পরিচালিত বোম্বে স্টিম নেভিগেশন লিমিটেডের বিরুদ্ধে ওয়ালচাঁদের সিন্ধিয়া স্টিম নেভিগেশন প্যাটেলের সমর্থন পায়। কিন্তু যুদ্ধ (ও কংগ্রেসী মন্ত্রীসভার পদত্যাগ) বড শিল্পপতিদের ফের ভাবিয়ে তুলল। আগস্ট বিপ্লবের কালে বোম্বাই-এর বাজার বেশ কয় মাস বন্ধ থাকে।

এতে কোন সুবিধে না হওয়ায় এবং হাতে প্রভূত সঞ্চিত অর্থ থাকায় ভারতীয় শিল্পপতিরা পরিকল্পিত অর্থনীতির ওপর জোর দিতে থাকেন। এর পরিণতি ১৯৪৪-এ প্রকাশিত বোম্বে প্ল্যান। এর স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন পি ঠাকুরদাস (বোম্বাই-এর 'কার্পাসরাজ'), জে আর ডি টাটা, ঘনশ্যাম দাস বিড়লা, স্যার আর্ডেশির দালাল (শেয়ার বাজারের কর্তা), স্যার শ্রীরাম (ডি সি এম), কস্তুরভাই লালভাই (আমেদাবাদের বস্ত্রাধিপতি), এ ডি স্রফ (শেয়ার বাজারের কর্তা) ও জন মাথাই (টাটার ডিরেক্টর)। এই প্ল্যানের রাজনৈতিক ভিত্তি নিম্নরূপ—

"Underlying our whole scheme is the assumption that on

termination of the war or shortly thereafter, a national government will come into existence at the centre which will be vested with full freedom in economic matters." এর লক্ষ্য ছিল পনের বছরের মধ্যে ভারতীয় নাগরিকের গড আয় দ্বিগুণ করার উদ্দেশ্যে ১০,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ।[৪৯] নিম্নলিখিত খাতে বিনিয়োগ হবে—

সারণী-৭

সেক্টর বিনিয়োগ

	(কোটি টাকায়)
শিল্প	৪,৪৮০
কৃষি	১,২৪০
যাতাযাত ব্যবস্থা	৯৪০
শিক্ষা	৪৯০
স্বাস্থ্য	৪৫০
গৃহনির্মাণ	২,২০০
অন্যান্য	২০০
	১০,০০০

১৯৪৪-এর ২০ এপ্রিল ওযাভেল স্যাব আর্দেশির দালালকে একসিকিউটিভ কাউন্সিলের উন্নযন-সদস্য হবাব জন্য অনুরোধ জানালেন। ১৯৪৫-এর ১ মার্চ, কাউন্সিলে ব্রিটিশ শিল্প-বাণিজ্যেব স্বার্থবক্ষাব প্রশ্ন উঠল। পবেব দিন আইন সভায় দাবি উঠল এখুনি সব রক্ষাকবচ পরিত্যাগ করতে হবে। ব্রিটিশ শিল্প-বাণিজ্য প্রতিনিধিরা প্রমাদ গুনলেন। ইন্ডিয়া কমিটি দালালকে ১৯৩৫-এর আইনেব অন্তর্ভুক্ত বাণিজ্য সংক্রান্ত ধাবা আলোচনা করার জন্য ডেকে পাঠালেন। বলা বাহুল্য, ভাবত সচিব এমেবি দালালেব উৎসাহে জল ঢাললেন। রক্ষাকবচেব লডাই, প্রতিবক্ষা ব্যবস্থার লডাই ও কমনওযেলথে ভারতের যোগদান নিয়ে লড়াই শেষ দিন পর্যন্ত চলবে।[৫০]

॥ ৩ ॥

উনিশ শো চুয়াল্লিশ সালে স্বরাষ্ট্র বিভাগেব গোয়েন্দা দফতবের এক প্রতিবেদন অনুসারে বৃহৎ বণিক-শিল্পপতি গোষ্ঠী কংগ্রেসকে আপন স্বার্থসিদ্ধিব যন্ত্র রূপে প্রযোগ করছেন বা কংগ্রেসও তাদের কাছ থেকে প্রচুব অর্থ পেয়ে সবকার বিবোধী কার্যকলাপ চালাচ্ছে—একথা ঠিক নয়। ববং রাজাগোপালাচাবি তাঁব পুস্তিকা— The Way Out-এ লিখেছেন, "Indian industrialists, while shedding copious tears for nationalism, are making their pile by quiet and uninterrupted services at the call of a bureaucratic government." আত্মগোপনকারী

নেতারা তো রীতিমত অসন্তুষ্ট। গোয়েন্দা দফতরের সিদ্ধান্ত—"The support given by 'Big Business' to the movement, although substantial, has obviously not drawn upon more than a fraction of the total 'Big Business's resources and of this the detained Congress Working Committee members, no less than the underground Congress leaders, must be well aware."[৫১]

আগেই আমরা দেখিয়েছি টাটা ও বিড়লার মত শিল্পপতিরা কংগ্রেস থেকে নিজেদের একটু পৃথক করে নিচ্ছিলেন এবং বোম্বে প্ল্যানের মাধ্যমে, সরকারের সহযোগিতায়, ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় একটা বড় পরিবর্তন আনতে চাইছিলেন। তাতে অবশ্যই তাঁরা মুখ্য ভূমিকা নেবেন, কংগ্রেস বা কোনো রাজনৈতিক দল নয়। ওয়াভেল এটা অনভিপ্রেত মনে করেননি বলে দালালকে উন্নয়ন সদস্য মনোনীত করেছিলেন। এমন কি ওয়ার ক্যাবিনেটও এই নিয়ে প্রাসঙ্গিক বাণিজ্য বিষযক রক্ষাকবচ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন দালালের সঙ্গে। ওয়াভেলের ১৪ মে (১৯৪৫)-র রোজনামচায় পড়ি ইণ্ডিয়া কমিটির সভায় তিনি সহানুভূতিসূচক মনোভাব আশা করছেন। কিন্তু অর্থমন্ত্রী গ্রিগ বিড়লা ও অন্যান্য শিল্পপতিদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছিলেন। জন অ্যাণ্ডারসন গ্রিগের সমর্থনে বলেন, এতে জনসাধারণের কোনো উপকার হবে না—এর আসল উদ্দেশ্য ব্রিটিশ বণিক শিল্পপতি এবং ব্রিটিশ পরিচালক উৎসাদন। লেদারস (Leathers) বাণিজ্য বিষযক রক্ষাকবচ রাখতে চেয়েছিলেন। ওয়াভেল বলেন, "to be tough with India and continue to treat her as a colony was a possible policy if H. M. G. was prepared to provide the force to support it...but in the long run it would be disastrous." তিনি জানতে চান, ব্যাপক শিল্পায়ন ছাড়া কি ভাবে জনগণের অবস্থার উন্নতি সম্ভব।[৫২] কিন্তু ইণ্ডিয়া কমিটি সব বিবেচনা করে বলেন, "There can be no question, in present circumstances, of any repeal to the commercial discrimination provisions of the Government of India Act."[৫৩] অর্থাৎ বোম্বে প্ল্যান কার্যকর করার জন্য ব্রিটিশ বাণিজ্যিক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করতে মন্ত্রিসভা রাজি হল না।

কিন্তু এতে ঘাবড়াবার লোক নন বিড়লা-টাটার দল। তাঁরা ব্রিটিশ শিল্পপতি ও বণিকদের সঙ্গে সমঝোতার উদ্দেশ্যে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা চালাচ্ছিলেন। এমেরির এক পত্রে পড়ি—সহযোগিতার মাধ্যমে ব্রিটিশ শিল্পপতিরা যে অনেক লাভবান হবেন সে কথা তাঁরা বুঝতে পারছিলেন। "I believe that there are a number of negotiations going on between United Kingdom and Indian Commercial interests for the establishment of joint enterprises." তাঁদের মনে হয়েছিল—ভারতে কাঁচা মালের অভাব নেই, মজুরীর হার ঢের নীচু। অতএব ইংল্যাণ্ডে বেশি মূল্যে সেগুলি উৎপাদন না করে ভারতেই করা উচিত এবং প্রয়োজনে ভারতীয় শিল্পপতিদের সাহায্য নেওয়া উচিত। তাদের হাতে অনেক টাকা, ব্যাপক যোগাযোগ ও বিপণন ব্যবস্থা তাদের নিয়ন্ত্রণে. তাদের সহযোগিতা রাজনৈতিক অশান্তির হাত থেকে বাঁচতে সাহায্য করবে, হয়তো শ্রমিক অশান্তির হাত থেকেও। তাছাড়া ব্রিটেন হাত গুটিয়ে বসে থাকলেও মার্কিন মুলুক বা ইউরোপ থেকে সাহায্য পেতে কোনো অসুবিধা হবে না টাটা-বিড়লার। "The advantages of an alliance with Indian capital,

influence and enterprises are self-evident."[৫৪]

বিড়লারা নিজেরাই এসে পড়লেন মে মাসে। ২৪ মে বিড়লার সঙ্গে ওয়াভেলের কথা হল। "He recommended a business Government and more than hinted that he was ready to assist me in forming one or indeed to take part in the Government." তবে বিড়লা ১৯৪২ সালে গান্ধীর প্রতি অন্যায় ব্যবহারের প্রতিবাদও করলেন। উত্তরে ওয়াভেল বলেন, গান্ধীকে 'Saint or Statesman' কোনটা মানতেই তিনি রাজি নন। ওয়াভেলের মনে হল নেহরু ও বামপন্থীদের বিড়লা বিশ্বাস করেন না এবং তাই নিজেই সক্রিয় রাজনৈতিক ভূমিকা নিতে চান। "...he obviously would like to have a finger in the political pie, and it would be of the Jack Horner type."[৫৫]

ইংল্যাণ্ডে অনেক বাধা অতিক্রম করে ৩১ মে চার্চিলের সমর্থন পেলেন ওয়াভেল। চার্চিল তখন সাধারণ নির্বাচন ডাকতে যাচ্ছেন, তাই ভারতবর্ষকে দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে রাখতে চেয়েছিলেন বলে মনে হয়। কিন্তু নিজের একসিকিউটিভ কাউন্সিলের সাত সদস্য ওয়াভেলের প্রস্তাবে বাধা দিলেন। সম্ভবত ভুলাভাই দেশাই-এর চাপে। কিন্তু আম্বেদকর, খাবে ও শ্রীবাস্তব একটা গুরুত্বপূর্ণ কাবণে আপত্তি জানান—তা হল কাউন্সিলে হিন্দু ও মুসলিম সদস্য সংখ্যার সমতা। আম্বেদকর তপসিলীদের অবজ্ঞা করার কারণে পদত্যাগ করতে চান। ১৪ জুন এক বেতার ভাষণে ওয়াভেল তাঁর শাসনতান্ত্রিক সংস্কার বিষয়ক প্রস্তাব ঘোষণা করলেন। বড়লাট ও প্রধান সেনাপতি ছাড়া কাউন্সিলের সব সদস্য ভারতীয় হবে। বর্ণহিন্দু ও মুসলিম সদস্যসংখ্যা সমান হবে। কাউন্সিল ১৯৩৫-এর আইন অনুসারে চলবে। যদিও এর প্রধান কাজ হবে জাপান যুদ্ধ জয় তবু নতুন সংস্কার নিয়ে কোনো সমঝোতায় আসা যায় কিনা তাও বিবেচনা করবে। বন্দী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের ছেড়ে দেওয়া হবে। এই সব প্রস্তাব বি ঢকর করার জন্য ২৫ জুন থেকে ভারতীয় রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে এক সম্মেলন বসবে সিমলায়।[৫৫ক]

গান্ধী 'বর্ণহিন্দু' শব্দ ব্যবহারে আপত্তি জানান। "May I then say that there are no casteless Hindus who are at all politically minded. Therefore the word rings untrue and offensive. Who will represent them at your table? Not Congress which seeks to represent without distinction all Indians who desire and work for independence." এমন কি হিন্দু মহাসভাও বর্ণহিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব করতে চাইবে না। তা ছাড়া স্বাধীনতা সম্বন্ধে ঘোষণার কোন কথা নেই কেন?[৫৬] ১৫ জুনের প্রেস প্রতিবেদনে তিনি বলেন, ভুলাভাই-এর প্রস্তাবকে তিনি সমর্থন করেছিলেন কোন সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, ভুলাভাই-লিয়াকৎ ভারতের সমস্যার একটা সম্প্রদায়-নির্বিশেষ সমাধান চেয়েছিলেন বলে।[৫৭] তবে. ব্যাপারটা বিচার করবে ওয়ার্কিং কমিটি। ১৯৩৪ থেকে তিনি কোনো প্রতিষ্ঠানেরই প্রতিনিধিত্ব করেন না। নিমন্ত্রণ জানালে কংগ্রেস সভাপতিকেই জানানো হোক।[৫৮] ১৭ জুন আর এক তারবার্তায় তিনি বর্ণহিন্দু ও মুসলিম সমতার প্রতিবাদ জানান: "You will quite unconsciosly but equally surely defeat purpose of conference if parity between Caste Hindus and Muslims is unalterable. Parity beteewn Congress and League understandable."[৫৯] পরের দিন জানান, যদি ওয়াভেল এ বিষয়ে মত না বদলান,

"My advice to Congress will be not to participate in formation of Executive Council."

১৮ জুন ওয়াভেল জানান, তিনি বেতার ঘোষণা বদলাতে পারবেন না আর আলোচ্য বিষয়ে খুঁটিনাটি এখনই বলা সম্ভব নয়। "None of the persons or parties concerned is expected or required to accept or reject the proposal now."

আর একজন আপত্তি জানান—তিনি পঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী খিজির। তিনি একজন য়ুনিয়নিস্ট মুসলিমকে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে নেবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন।

২৪ জুন ওয়াভেলের সঙ্গে আজাদ, গান্ধী ও জিন্নার সাক্ষাৎকার হয়। ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গান্ধী বলেন—(১) সমস্ত রাজনৈতিক নেতাদের ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল, (২) কংগ্রেসে কোন জাতপাতের স্থান নেই—তাই 'অ-তপসিলী হিন্দু' কথা ব্যবহার করলে ভাল হত (!), (৩) প্রদেশে যদি কোয়ালিশন গঠিত হয় তবে কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সদস্যরা সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব করবে, (৪) কংগ্রেসের অনেকে আপত্তি তুললেও তিনি সমতা মানতে রাজি আছেন, তবে কংগ্রেস মুসলমান বা তপসিলীদের মনোনয়ন দিতে পারে। ওয়াভেল জানান—অ-তপসিলী হিন্দু ও মুসলমানদের সমতা বজায় রাখতেই হবে।

জিন্না বলেন, যাই ঘটুক মুসলমানরা সংখ্যালঘু থাকবেই! ওয়াভেল তখন বলেন,সব সংখ্যালঘু সব সময়ই মুসলমানদের বিরুদ্ধে ভোট দেবে কেন ? তা ছাড়া বড়লাটের ভিটো তো আছেই। জিন্নার আবদার—সব মুসলিম কাউন্সিলর মনোনয়ন করবে লীগ। ওয়াভেল তা গ্রহণ করতে রাজি হলেন না। জিন্না গত দু'বছরের উপনির্বাচনের নজির দেখিয়ে বললেন লীগ সব কটাই জিতেছে—অর্থাৎ তারাই সব মুসলিমদের মুখপাত্র। ওয়াভেল বললেন, তিনি পঞ্জাব য়ুনিয়ানিস্ট দল মনোনীত একজন মুসলিমকে নিতে চান। উত্তরে জিন্না য়ুনিয়ানিস্টদের নানা গালমন্দ করেন—তারা নাকি তাঁরই কৃপায় এত দিন কোয়ালিশন চালাচ্ছে। বড়লাটের মনে হয় জিন্না ঠিক নিজের অবস্থায় খুশি নন।[৬০] আপন দলের ওপর সত্যি তাঁর অসপত্ন কর্তৃত্ব ছিল না।

২৫ জুন থেকে যে সিমলা সম্মেলন বসল[৬১] তার প্রধান আলোচ্য প্রশ্ন দুটি—(১) যে সব সাধারণ নীতির ভিত্তিতে কাউন্সিল কাজ করবে (বেতার ভাষণে বড়লাট একটা ছক দিয়েছিলেন) তা কি গ্রহণীয় ? (২) যদি গ্রহণীয় হয় তবে কাউন্সিল কি ভাবে গঠিত হবে এবং কারা সদস্য হবেন ? দ্বিতীয়টাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও বিতর্কিত।

২৭ জুন বলদেব সিং বলেন পঞ্জাব থেকে একজন শিখ ও একজন পঞ্জাবী মুসলমান নিতেই হবে। বড়লাট জিন্নাকে জানান যুদ্ধকালে পঞ্জাব সৈন্য ও রসদ যুগিয়ে যে সাহায্য করেছে তাতে একজন পঞ্জাবী মুসলমান না নিলে চলবে না। তবে তিনি একজন নিরপেক্ষ মুসলিম নেবেন। জিন্না জানান পন্থের সঙ্গে তাঁর যা কথা হয়েছে তাতে কংগ্রেস চাইছে মুসলিম কোটার দু'জনকে মনোনয়ন করতে। জিন্না নিজে চান ১৪ জনের কাউন্সিল—৫ হিন্দু, ৫ মুসলমান, ১ শিখ ও ১ তপসিলী, বড়লাট ও প্রধান সেনাপতি তো থাকবেনই। "He said this was the only Council in which the Muslims would stand a chance of not being out-voted on every issue." ওয়াভেল মনে করেন জিন্না বড় বেশি সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে কাউন্সিলের কার্যকলাপ দেখছেন। জিন্না আবার জেদ ধরেন—সব মুসলমানদের লীগ (অর্থাৎ তিনি) মনোনয়ন দেবেন কিন্তু আবার বড়লাট প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি সৈনিকসুলভ স্পষ্টবাদিতার সঙ্গে প্রশ্ন করেন, জিন্না কি এই

প্রশ্নে সম্মেলন বানচাল করতে চান ? শেষে জিন্না বলেন, স্বয়ং বড়লাট যদি দু-একজনকে কবতে চান তবে তিনি ওয়ার্কিং কমিটিব সঙ্গে কথা বলবেন।[৬২]

উভয় পক্ষে মিটমাট না হওয়ায় ২৯ জুন ওয়াভেল বলেন, দলপতিরা যদি পছন্দসই নামের তালিকা তাঁর কাছে পাঠান, তিনি একটা গ্রহণীয় পরিষদ গঠন করাব চেষ্টা কববেন। ১৪ জুলাই পর্যন্ত সম্মেলন মুলতুবি থাকে।

৮ জুলাই জিন্না আবাব দেখা কবলেন এবং বললেন, "I am at the end of my tether." "I ask you not to wreck the League." অর্থাৎ তিনি সংকটে পড়েছেন। তাঁব দল কিছুতেই লীগেব বাইবেব লোক ববদাস্ত কবছে না। যদি তা না কবা হয, তবে তাঁব নেতৃত্বেব দুর্বল ভিত আবো দুর্বল হবে। শেষে তিনি নামের তালিকা পাঠাতে অস্বীকাব কবলেন।[৬৩] অন্য দিকে কংগ্রেস সর্বভাবতীয প্রতিষ্ঠান বলেই পাঁচটি নামেব মধ্যে মাত্র দুটি হিন্দু ও মুসলিম, পার্শী এবং খ্রীস্টানদেব একটি করে নাম দিযেছিল। ওযাভেল অন্যায করে তাদেব stooge আখ্যা দেন। কি ভাবে তালিকা তৈবি হয তা পাওযা যাবে আজাদেব India Wins Freedom গ্রন্থে। আজাদ এব সব কৃতিত্ব নিতে চান কিন্তু গান্ধী এ ধবনেব কথা অনেক আগে থেকেই বলছিলেন। তাব প্রমাণ ওযাভেলকে পাঠানো ১৮ জুনেব তাব বার্তা ও ২৯ জুন গোবিন্দবল্লভ পন্থকে লেখা চিঠি। খিজির দিলেন চাব নামেব তালিকা, যার শীর্ষে ছিলেন কোটেব নবাব মহম্মদ উসমান খান।[৬৩ক] তাবা সিং-এব তালিকায তিন নামেব মধ্যে তিনি ছাড়া বাকি দুজন 'ডামি'। সব দেখে ওযাভেল সমর্থনেব জন্য যে তালিকা বিলেত পাঠালেন তার মধ্যে চাবজন ছিল মুসলিম লীগেব।

বিলেতের সম্মতি এল কিন্তু জিন্না আপন দাবিতে অবিচল। উপবন্তু তিনি দাবি করলেন যে কাউন্সিলে কোন বিষয়ে মুসলিম আপত্তি উঠলে দুই-তৃতীযাংশ ভোটেব কমে তা গ্রহণ করা চলবে না। অর্থাৎ তিনি সাম্প্রদাযিক ভিটো চাইলেন। ওযাভেল উভয দাবি অগ্রাহ্য করলে সম্মেলন কার্যত ভেঙ্গে গেল। সব শুনে গান্ধী মন্তব্য কবলেন, ব্রিটিশ সরকাবকে হিন্দু অথবা মুসলিম এক পক্ষেব মত মেনে নিতে হবে, কাবণ তাবা পরস্পব বিবোধী এবং সমঝোতা অসম্ভব।[৬৪] ১৪ জুলাই, সম্মেলনেব শেষ দিন, জিন্না বললেন, মুসলিমদেব অন্যান্য সব দলেব সঙ্গে সমতা দিতে হবে। বোজনামচায ওযাভেল লিখছেন, "If he really means this, it shows that he had never at any time an intention of accepting the offer, and it is difficult to see why he came to Simla at all." তবু তিনি বলছেন কংগ্রেসের তালিকা নেওযা যায় না, তাতে কাউন্সিলে কংগ্রেসের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হত।

কিন্তু গান্ধীব কথাই ঠিক। পাকিস্তান সম্বন্ধে গান্ধী ও জিন্না সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস বুঝতেন। ওয়াভেল তা জানতেন। আগেব বছর এমেরিকে তিনি লিখেছেন, "Jinnah wants Pakistan first and independence afterwards, while Gandhi wants independence first with some kind of self-determination for Muslims to be granted by a provisional government which would be predominantly Hindu."[৬৫] গান্ধীব মনোভাব পরিবর্তিত হযনি। কংগ্রেস ও লীগের এই পার্থক্য ছাড়াও সাংগঠনিক পার্থক্যের দিকে দৃষ্টি আব .ণ করেন নেহরু। কংগ্রেসেব দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক এবং জাতীযতাবাদী আর লীগ একটা মধ্যযুগীয় ধারণা, যা শ্রেণীব চেয়েও সম্প্রদায়কে বড়ো কবে দেখে।

কিন্তু একটা জিনিস জিন্না পারলেন—তিনি যে 'শক্ত মানুষ' 'লোহার মানুষ', কিছুতেই

কংগ্রেসবাজ তথা হিন্দুরাজ মেনে নেবেন না, এমন কি ব্রিটিশবাজকেও তোয়াক্কা করেন না—এমন একটা ভাবমূর্তি তিনি তৈবি করতে পারলেন। অবশ্য সংহতিব বিনিময়ে। অখণ্ড ভারতেব একটা উজ্জ্বল সম্ভাবনা সিমলায সমাধিস্থ হল।

ওয়াভেলের অনেক দোষ ছিল কিন্তু একটা নতুন পদক্ষেপ নিতে চেয়েছিলেন তিনি, চেয়েছিলেন অচলাবস্থার অবসান ঘটাতে। আব ভাবতভাগ তিনি চাননি। শেষে লীগের গুরুত্ব মেনে নিলেও জিন্নাকে সব মুসলমানেব 'একমাত্র মুখপাত্র' বলে কোনও দিন স্বীকাব করেননি তিনি। জিন্নাব সংকীর্ণ, প্রতিক্রিয়াশীল, সাম্প্রদায়িক রূপ ভাল ভাবেই চিনতেন তিনি। পাকিস্তান বলতে জিন্না বুঝতেন ভারতেব কয়েকটি মুসলিম অঞ্চলে শুধু মুসলিম ভোটেব মাধ্যমে স্বতন্ত্র শাসন। এ ব্যাখ্যা ওযাভেল মেনে নেননি। কিন্তু হডসনেব প্রশ্ন (যা আমাদেরও), জিন্নাব গোঁযার্তুমিতে তবে কেন পিছিয়ে গেলেন তিনি? কেন সিমলা বৈঠকে ইতি টানলেন?[৬৬] তিনি যদি অন্যান্য দলের নেতাদের সঙ্গে কথা চালিয়ে যেতেন, জিন্নাকে সুব নামাতেই হত। লীগকে বাদ দিযে কাউন্সিল গঠিত হচ্ছে—তা তিনি সহ্য কবতে পাবতেন না! আব যদি তৎসত্ত্বেও অসহযোগিতা কবতেন, তবে বহুসংখ্যক মুসলিমদেব ওপব কর্তৃত্ব হাবাতেন। পঞ্জাবেব মুসলমানবাই তো তাঁকে পবিত্যাগ করত। আমবা দেখব ১৯৪৬ সালে অন্তর্বর্তী সরকাব গঠনের সময জিন্না একগুঁযেমি কবছেন কিন্তু সেবাব লীগকে বাদ দিযেই সবকাব গঠিত হয। জিন্না অনেক সাধাসাধি কবে, ওযাভেলকে নবম করে, প্রায় পেছনেব দবজা দিযে সবকারে ঢোকেন। আমাব মনে হয, জাপানেব সঙ্গে যুদ্ধ তখনও শেষ হযনি বলে ওযাভেল শুধু কংগ্রেস প্রভাবিত কাউন্সিল চাননি। সেখানে কাজ করছিল কংগ্রেস সম্পর্কে তাঁব বহু তিক্ত স্মৃতি—ক্রিপস মিশনের সময ভাবা প্রতিরক্ষা দফতর চেযেছিল অর্থাৎ ব্যক্তিগতভাবে তাঁব কর্তৃত্ব চ্যালেঞ্জ কবেছিল, আবাব 'ভারত ছাডো' আন্দোলনের সময সমবোদ্যোগে ব্যাঘাত ঘটিযেছিল। দাঁড়িপাল্লার একদিকে লীগ না থাকলে কংগ্রেসকে সামাল দেবে কে? উভযে দিনবাত ঝগডা না কবলে তাঁব হাতে শেষ সিদ্ধান্ত থাকবে কি করে? তা ছাড়া লীগকে বাদ দিযে সবকার গঠনেব ব্যাপারে বাংলা ও পঞ্জাবেব লাটদের আপত্তি ছিল, যদিও সিন্ধু ও সীমান্তেব লাটদের ছিল না। গান্ধী আমলাদেবও দোষ দিযেছেন।[৬৭] সাম্প্রদাযিক পবিস্থিতি এর ফলে আরো খাবাপ হবে এমন ভয কাজ কবেছিল। সর্বোপরি ওযাভেলেব ভয ছিল, কংগ্রেসীদের প্রাধান্য দিলে চার্চিল তা ববদাস্ত কববেন না। এমনি চার্চিল তাঁকে অপছন্দ কবতেন, তখন হযতো ববখাস্ত করে দেবেন। এ বিষযে তাঁব ৩১ জুলাই-এর রোজনামচা দ্রষ্টব্য। সব স্বীকাব করি তবু মনে হয়, আবো কয়েকদিন বৈঠক টিকিয়ে বাখতে পাবলে ভালো হত। সাধাবণ নির্বাচনে শ্রমিক দলেব জযলাভেব সঙ্গে বাজনৈতিক পট আমূল পরিবর্তিত হত। অবশ্য ওয়াভেল শ্রমিক দলেব বিপুল জযের কথা ভাবতেই পারেননি, তাই চার্চিল সবকাব 'কেয়ারটেকাব' হলেও তাব বিরুদ্ধে যেতে সাহস করেননি। তাঁব বাজনৈতিক সাহসের অভাব ছিল, কিন্তু সৈনিকসুলভ খোলাখুলি আলোচনায আপত্তি ছিল না, মিটমাট হোক সে বিষযে সত্যকার আগ্রহ ছিল। অন্তত মৌলানা আজাদকে সে ব্যাপাবে নিঃসন্দেহ করেছিলেন তিনি। এর পর অনেক ব্যাপারে, বিশেষত ক্যাবিনেট মিশনের সঙ্গে আলোচনা চলা কালে ওয়াভেল কংগ্রেস সভাপতিব অনেক সাহায্য পেয়েছিলেন। আজাদ প্রশ্ন করেছেন—জিন্নার একগুঁযেমিতে মুসলিম সম্প্রদাযেবই বা কি লাভ হল? লীগের তালিকার সঙ্গে কংগ্রেসের আজাদ ও পঞ্জাবের খিজিব (বা আর কেউ) যুক্ত হলে কাউন্সিলের চোদ্দজন সদস্যের মধ্যে সাতজন অর্থাৎ অর্ধেকেব বেশি (আসলে ছয়জন, কারণ ওয়াভেল লীগের চারটি নাম পাঠাতেন)

হত মুসলমান—এবং তা কিনা ভারতবর্ষের মত বিপুল হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রে ! জিন্না যে আসলে মুসলিম স্বার্থের চেয়ে আপন অহমিকাকে উচ্চতর স্থান দিতেন এর চেয়ে বড় প্রমাণ কিছু নেই। আর তাও কি না যখন পঞ্জাবের য়ুনিয়ানিস্ট মন্ত্রিসভা, সীমান্তে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা, আর সিন্ধু ও আসামের মুখ্যমন্ত্রীরা কংগ্রেসী সমর্থনের ওপর নির্ভরশীল ? বস্তুত সিমলা সম্মেলন বানচাল কবার দায়িত্ব জিন্নার এবং তাতে মুসলিম স্বার্থের ক্ষতিই করেছিলেন তিনি।

ইতিমধ্যে জাপান অবশ্যম্ভাবী পতনের দিকে এগিয়ে চলেছিল। স্লিম যে ব্রহ্ম অভিযান চালান তার সাংকেতিক নাম Extended Capital. ব্রিটিশ চতুর্দশ আর্মি পশ্চিম থেকে পুবে জাপানী পঞ্চদশ আর্মিকে আক্রমণ করবে আর উত্তরে স্টিলওয়েলের নর্দার্ন কমব্যাট এরিয়া কমাণ্ড সেই আর্মির পার্শ্ব ভেদ করবে—এই ছিল যুদ্ধ কৌশল। স্টপফোর্ডের অধীন তেত্রিশতম কোর নেবে মান্দালয় আব মোরভি-র চতুর্থ কোর মিটকিলা। প্রথমটা হবে হাতুড়ি, দ্বিতীয়টা নেহাই। মাঝে পিষ্ট হবে জাপ বাহিনী। যুদ্ধ আরম্ভ হল ফেব্রুয়ারি মাসে। আই.এন.এ. ইরাবতীর উভয় তীরে ঘাঁটি গড়েছিল। কিন্তু প্রস্তুত হবার আগেই ব্রিটিশ বাহিনী নদী অতিক্রম কবতে লাগল। মিটকিলা রক্ষায় এগিয়ে এল পি কে শাগলের রেজিমেন্ট। স্বয়ং নেতাজী ২৫ ফেব্রুয়াবি (১৯৪৫) এলেন ইনড-তে। শা নওয়াজ লিখছেন, চাঁদনী রাতে আত্মরক্ষাব দিকে দৃকপাত না করে নেতাজী এগিয়ে চললেন যুদ্ধক্ষেত্রেরপানে। শা নওয়াজ আপত্তি করায় তিনি বললেন, "সুভাষ বোসকে মাবতে পারে ইংরেজরা এমন বোমা বানায়নি।"[৬৮]

মিটকিলার পতন হল ১ মার্চ, মান্দালয়েব—২০ মার্চ। বিখ্যাত বার্মা রোডের অনেকখানি এসে গেল মিত্র শক্তির হাতে। তাব আগেই ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরে ব্রিটিশ নৌশক্তি প্রাধান্য লাভ করেছিল বলে জলপথে সরবরাহ সহজ হল। আকিয়াব হল বিমানঘাঁটি।

পিনমানায় সুভাষ শেষযুদ্ধেব জন্য প্রস্তুত হতে চাইলেন কিন্তু খবব এল সর্বত্র আই. এন এ. সৈন্য আত্মসমর্পণ করছে। শাগল ডায়েরিতে লিখছেন, "There is no discipline left" এবং পলাতকরাই শত্রুপক্ষকে অবস্থান জানিয়ে দিচ্ছে। বসুকে তাদের বিরুদ্ধে কঠোব আদেশ জারি করতে হল। কিন্তু বিচ্ছিন্ন, সরবরাহহীন, মনোবলহীন আই এন. এ. সৈন্য কি করবে ? জাপানীরা বসুকে জানাল (২৩ এপ্রিল) তারা রেঙ্গুন ত্যাগ করছে। ২৭ এপ্রিল রেঙ্গুন দখলের জন্য যুগপৎ জলে আকাশে আক্রমণ শুরু হল। ২৯এ জাপানীরা রেঙ্গুন ছেড়ে গেল। অদম্য বসু জানিয়ে গেলেন, "আমরা অন্ধকারতম মুহূর্ত অতিক্রম করছি কিন্তু সূর্যোদয়ের দেরি নেই। ভারত স্বাধীন হবেই।"

জুনের শেষে ব্রহ্মযুদ্ধ শেষ হল। বসু চললেন মালয়ে অবশিষ্ট আই. এন. এ. বাহিনী পরিদর্শনে। দেশে তখন সিমলা বৈঠক চলছে। বেতার ভাষণে ওয়াভেলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার অনুরোধ জানালেন তিনি। কংগ্রেস কি হাজারটা দলের অন্যতম মাত্র ? মুসলীম লীগই কি ভারতীয় মুসলিমদের একক মুখপাত্র ? "এতো বড়লাটের জন্য স্বরাজ, একসিকিউটিভ কাউন্সিলের জন্য নয়।" এই ছিল তাঁর ভারতের উদ্দেশে অন্তিম ভাষণ।

জাপানের ওপর ভারী মার্কিন বোমারু বি-২৯ যে প্রচণ্ড আঘাত হানছিল তাতেই তাকে আত্মসমর্পণ করতে হত। ২৩ ও ২৫ মে আক্রমণে টোকিয়োর অর্ধেক গুঁড়ো হয়ে যায়। মড়ার ওপর খাঁড়ার প্রথম ঘা দিল মার্কিন অ্যাটম বোমা (লিটলবয়) হিরোশিমায়, ৬ আগস্ট, দ্বিতীয় ঘা রুশবাহিনী মাঞ্চুরিয়ায় ৮ আগস্ট ও চরম ঘা দ্বিতীয় অ্যাটমবোমা (ফ্যাটবয়)

নাগাসাকিতে,৯ আগস্ট। ১০ আগস্ট জাপান আত্মসমর্পণ করল।

সেই দিনই আই· এন· এ-র প্রচারমন্ত্রী এস· এ· আয়ারের মুখে খবরটা শুনলেন নেতাজী। ক্ষণেকের গভীর চিন্তার পর হাসিমুখে বললেন, **"So that is that. Now what next ? Well, don't you see we are the only people who have not surrendered ?"**[৬৯] এ যেন ভাগ্যহত কর্ণ—রথচক্র মেদিনী গ্রাস করছে ; শুধু পরাজয় নয়, বিনাশও আসন্ন, তবু নির্বিকার। ১৫ই জাপান বেতারে আত্মসমর্পণ সংবাদেব সমর্থন শুনে বসু বুঝতে পারলেন সিঙ্গাপুর ছাড়তে হবে। স্থির হল, সম্ভব হলে, রাশিযা যাবেন। সিঙ্গাপুর থেকে সায়গন। সায়গন থেকে ১৭ আগস্ট উড়ল তাঁর বিমান। **'The rest is silence.'** কি হল সঠিক আমরা আজও জানি না। যদি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়ে থাকে তবে লাতিন কবি হোরেসের ভাষায়—**Dulce et decorum est pro patria mori (It is a sweet and seemly thing to die for one's country).** কিন্তু আবার তাঁরই ভাষায়—**Non omnis moriar (I shall not altogether die).**

এই সময় ওয়াভেল বসেছিলেন তাঁর ছোটলাটদের সঙ্গে কর্তব্য নির্ধারণ করতে। আবুল কালাম আজাদ তাঁর ১৫ জুলাই-এব চিঠিতে কিছু দাবি তুলেছিলেন।[৬৯ক] গ্ল্যান্সি ছাড়া সবাই বললেন, যত শীঘ্র সম্ভব কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের নির্বাচন, সমূহ রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি, কংগ্রেস সংস্থার ওপর সব নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা উচিত। কিন্তু বসু তাঁদের জন্য এক সমস্যা রেখে গেলেন যা ক্রমশ কালবৈশাখীর মেঘের মত বড়ো হয়ে উঠল। কি করা হবে আই· এন এ·'র বন্দী সৈন্যদের নিয়ে ? ওয়াভেলের নীতি হল—**"to detain the 'Blacks' and try the worst of them by court-martial, to discharge the 'Greys', and to return the 'Whites' to their units."**[৭০] এর মধ্যে 'ব্ল্যাক'দের সংখ্যা ৭০০০-এর মত। তারা মনে প্রাণে ব্রিটিশ-বিদ্বেষী ; জাপানীদের হয়ে শুধু যুদ্ধই করেনি অনেকক্ষেত্রে বিশ্বস্ত ভারতীয় সৈন্যদের ওপর জঘন্য অত্যাচারও করেছে। পরে তাদেরই কয়েকজনের বিচার হয়।

লাটদের অনুমোদিত নীতি গ্রহণ করল নতুন শ্রমিক সরকার। নির্বাচনের কথা ঘোষিত হল। পরামর্শ করার জন্য ওয়াভেলকে ডেকে পাঠান হল। তিনি ২৪ আগস্ট দিল্লী ত্যাগ করলেন। আলোচনা ত্বরান্বিত করতে চাইছিলেন ক্রিপস্। কিন্তু সবাই বুঝতে পারছিল ক্রিপস্ ঘোষণার পুনরাবৃত্তিতে কাজ হবে না। নতুন ভারত সচিব, পেথিক-লরেন্স, প্রদেশ থেকে মনোনয়নের ভিত্তিতে অস্থায়ী কাউন্সিলের কথা পেড়েছিলেন। ক্রিপস্ প্রস্তাবে কাজ হবে না জানিয়ে ওয়াভেল বললেন, পাকিস্তান ব্যাপারটা নিয়ে আগে খোলাখুলি ও বিস্তৃত আলোচনা করা হোক এবং ফল কি দাঁড়াবে সবাই জানুক। তাছাড়া এবার শুধু রাজনৈতিক নয়, নানা সামাজিক, অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান করতে হবে। ক্যাবিনেট কমিটিতে তিনি বললেন, ক্রিপস্ প্রস্তাব নিলে স্থানীয় অপশান্ নীতিও নিতে হয়। কিন্তু বাংলা ও পঞ্জাবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা এত সামান্য যে তারা ভারত ত্যাগ মেনে নেবে কিনা সন্দেহ। এদের বাদ দিয়ে জিন্নার পাকিস্তান কোথায় যাবে ? শুনে অবশ্যই খুশি হননি ক্রিপস্।[৭১] ওয়াভেল ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আরও আলোচনা না করে গণপরিষদের কথা তুলতে চাইছিলেন না। অন্যদিকে বিড়লা ক্রিপস্ ও অ্যাটলিকে জপাচ্ছিলেন যে একটা গণপরিষদ ডাকা দরকার। ওয়াভেলের মতে কংগ্রেসী চাপ ঠেকাতে পারছিলেন না ক্রিপস্‌রা।

যাই হোক, দেশে ফিরে ওয়াভেল ব্রিটিশ সরকারের নীতি ঘোষণা করলেন (১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫) :

১। সামনের শীতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচন হবে। তারপর আশা করা যায় সব প্রদেশেই দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে।

২। ব্রিটেনের ইচ্ছা যত শীঘ্র সম্ভব সংবিধান রচনার জন্য এক গণপরিষদ গঠন। তার জন্য বড়লাট আসন্ন নির্বাচনের পর প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলির সদস্যদের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন। আলোচ্য বিষয়—১৯৪২-এর ক্রিপস্ প্রস্তাব গ্রহণীয় না কোন বিকল্প প্রার্থনীয়। রাজন্যবর্গের সঙ্গেও গণপরিষদে যোগদানের কথা হবে।

৩। ব্রিটেন ও ভারতের মধ্যে সন্ধির শর্ত নিয়ে আলোচনা হবে।

৪। অর্ন্তবর্তী ব্যবস্থা স্বরূপ, নির্বাচনের ভিত্তিতে, সব ভারতীয় দলের গ্রহণযোগ্য শাসন পবিষদ গঠন করবেন বড়লাট।[৭২]

বন্দীমুক্তিব পর কংগ্রেসে জোর বিতর্ক শুরু হয়েছিল। অনেকেই ভারত ছাড়ো আন্দোলন পুনঃ প্রবর্তনের কথা বলছিলেন। ২১-২৩ সেপ্টেম্বব বোম্বাই এ· আই· সি· সি· আই এন· এ· বন্দীদের সমর্থন করে প্রস্তাব নেয়। দেশাই, সাপ্রু, কাটজু, আসফ আলি এমনকি স্বয়ং নেহরু লালকেল্লায় তাদের হয়ে সওয়াল করেন। নেহরু ও প্যাটেল যে সব বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তা গণঅভ্যুত্থানের প্ররোচনা ছাড়া কিছু নয়—মনে হয়েছিল সরকারের। গান্ধী কিন্তু কংগ্রেসের ওপব বীতরাগ হয়েছিলেন। তিনি জোর দিচ্ছিলেন কংগ্রেস-লীগ সমতাব ওপব, আব ওয়ার্কিং কমিটি হিন্দু-মুসলিম সমতার কথা বলছিল। কম্যুনিস্ট পার্টি মোটামুটি গান্ধীকে সমর্থন কবছিল। ১৯৪৪-এর গান্ধী-জিন্না সাক্ষাৎকারে গান্ধী যে সীমাবদ্ধ পাকিস্তানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ওয়ার্কিং কমিটি তাও মেনে নিতে রাজি ছিল না। ১৯৪৫-এব ১২ আগস্ট গান্ধী প্যাটেলকে লিখেছিলেন, "What I had written to Jinnah Saheb was final, and, therefore, I cannot do anything different. But you and others have a right to disagree with what I wrote...I did not speak on anybody's behalf, but merely expressed my own opinion."[৭৩] সবচেয়ে বেশি দুঃখজনক হল স্বাধীন ভারতের রূপরেখা নিয়ে তাঁর সঙ্গে জওহরলাল নেহরুব মতান্তর। তিনি জানালেন ১৯৪৫ সালেও তিনি ১৯০৮-এ লিখিত 'হিন্দ স্বরাজ'-গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বদলাননি। তিনি বললেন, সত্যিকার স্বাধীনতা পেতে গেলে সকলকে গ্রামে ফিরে যেতে হবে, থাকতে হবে প্রাসাদে নয়—কুটীরে। পরিত্যাগ কবতে হবে হিংসা ও অসত্য, যা গ্রামের সরল পরিবেশেই সম্ভব। পৃথিবী অন্যদিকে যাচ্ছে বলে তাঁব মাথাব্যথা নেই। "For the matter of that, when the moth approaches its doom it whirls round faster and faster till is burnt up." হয়তো ভারত 'পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখং বিবিক্ষু' হবে কিন্তু শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত তিনি ভারতকে সেই মহতী বিনষ্টিব হাত থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করবেন। ব্যক্তি যদি তার জীবনযাত্রাব জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের ওপব নিয়ন্ত্রণ হারায় তবে বাঁচবে না। "Ultimately, the world is made up of individuals. If there were no drops there would be no ocean." তাঁর স্বপ্নের গ্রামের অধিবাসী আজকের গ্রামবাসীর মত জড় নয়, সে চৈতন্যময়। সে পশুর মত আবর্জনার স্তূপে বাস করবে না। কেউ রইবে না অলস বা ভোগেব স্রোতে ভাসমান। কাযিক শ্রম হবে আবশ্যিক। তারপব রেল ও তার থাকুক না থাকুক যায় আসে না। নেহরুকে বললেন, "I want that we two should understand each other fully...our bond is not merely political. It is much deeper...neither of us considers himself as

worthless. We both live only for India's freedom, and will be happy to die for that freedom. Though I aspire to live up to 125 years rendering service, I am nevertheless an old man, while you are comparatively young. That is why I have said that you are my heir. It is only proper that I should at least understand my heir and my heir in turn should understand me. I shall then be at peace."[৭৪]

সোক্রাতেস জানতে চাইছেন তাঁর সুযোগ্য শিষ্য অ্যালকিবায়াডেস কোন virtue বা মূল্যবোধের ওপর স্বাধীন ভারতীয় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবেন ? উত্তরে শিষ্য জানালেন, বেশ রূঢ় ভাষায়, "even when I read it ('Hind Swaraj') twenty or more years ago it seemed to me completely unreal...The world has completely changed since then..." বিশ বছরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার যে বৈপ্লবিক উন্নতি হয়েছে তাতে মধ্যযুগীয় রামরাজ্যে বিশ্বাস আঁকড়ে থাকার অর্থ জনগণকে বঞ্চিত করা। খাদি ও কুটীর শিল্পের সম্প্রসারণে সমাধান হবে না। যে পরিকল্পনার ভিত্তি রচিত হয়েছে তাকেই সুদৃঢ় করতে হবে। তার ওপর গড়ে উঠবে বিপুলাকার ইস্পাত কারখানা, সার কারখানা, জলাধার, বিদ্যুৎ প্রকল্প। নতুন যুগের নতুন মন্দির এরা। যন্ত্রদেবতার উপাসনায় সিদ্ধি নিশ্চিত আর সিদ্ধির ফলে সমৃদ্ধি—যার সুষম বণ্টনে ঘুচবে হাজার হাজার বছরের দারিদ্র। এই পরিকল্পিত অর্থনীতির ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন লাহোরে, করাচীতে, লখনৌতে। সুভাষ তাকে কংগ্রেসের নীতিতে পরিণত করেছেন হরিপুরায়। তা মেনে নিয়েছেন দেশের বিরাট শিল্পপতিরাও।[৭৫] এমনকি সরকার। পরে দেখব বৃহৎ শিল্পাশ্রিত সমাজবাদ ও কুটীর শিল্পাশ্রিত গান্ধীপন্থা কোনটাকেই তিনি ছাড়েননি। কিন্তু ১৯৪৫-এ গান্ধীর বিরুদ্ধে বহুদিনের জমা বাষ্পের একটা পথ চেয়েছিলেন তিনি। তাছাড়া তখনও তাঁর দৃষ্টি সোভিয়েত দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে আচ্ছন্ন। তাঁর মনে হয়েছিল স্তালিনের শিল্পনীতির ফলে রাশিয়া এত বড় টাল সামলাতে পেরেছিল।

ক্রমবর্ধমান একাকিত্বের যন্ত্রণায় গান্ধী বুঝতে পারছিলেন

The old order changeth
yielding place to new.

দুঃখ করে ভুলাভাইকে তিনি জানাচ্ছেন, তাঁর সঙ্গে বল্লভভাই এক বাড়িতে বাস করছেন অথচ আসন্ন নির্বাচন নিয়ে কোনো কথা বলেন না।[৭৬] নির্বাচন নিয়ে কোনো দিন তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল না। তবু এই চিঠিতে তাঁর মর্মবেদনা টের পাওয়া যায়।

কংগ্রেসের কর্মকর্তাদের তাঁকে তেমন দরকার নেই কিন্তু হয়তো বাংলার দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের আছে। তিনি বাংলায় এলেন—"তাদের যেটুকু সান্ত্বনা দেওয়া যায় দিতে, কষ্ট যেটুকু পারা যায় লাঘব করতে"।[৭৭] তাঁর আসার আগেই নানা কারণে প্রতিবাদের ঢেউ উঠেছিল সেই প্রদেশে। কম্যুনিস্ট পার্টি বুঝতে পেরেছিল 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সময় তারা মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তারা জনপ্রিয়তা পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হল। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ যেমন সহসা এক দিন 'জনযুদ্ধে' রূপান্তরিত হয়েছিল তেমনি একদিন ফাসিবাদের পতনের পর আবার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায় রূপান্তরিত হল। জনগণের মধ্যে তো অসন্তোষ ছিলই। চাষীর দাবি পাটচাষ কমাতে হবে, পাটের ক্রয়মূল্য বেঁধে দিতে হবে, ভাগচাষী চাইছিল উৎপন্ন ফসলের দুই তৃতীয়াংশ; মজুরেরা শস্তায় চাল, অধিক মহার্ঘভাতা। আই· এন· এ· বন্দীদের মুক্তি নিয়ে কংগ্রেসী, লীগ, কম্যুনিস্ট সব ছাত্র ও

বুদ্ধিজীবীরা ছিল সোচ্চার। গোয়েন্দা দফতর জানাচ্ছে, আই· এন· এ-র প্রতি সহানুভূতিতে সব সম্প্রদায় ও শ্রেণী ঐক্যবদ্ধ।[৭৮] ৫ নভেম্বর একজন হিন্দু, একজন মুসলিম ও একজন শিখ আই· এন· এ· বন্দীদের বিচার শুরু হল লালকেল্লায়। প্রতিবাদে আই· এন· এ· সপ্তাহ উদযাপিত হল ৫-১১ নভেম্বর। ১২ই আই· এন· এ· দিবস পালিত হল। দেশপ্রিয় পার্কে শরৎ বসু, নেহরু ও প্যাটেল জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিলেন। নানা প্রাত্যহিক দুঃখ ও দৈন্যের শুকনো বারুদে পড়ল তার স্ফুলিঙ্গ। ২১ নভেম্বর প্রতিবাদ মিছিল চলল ড্যালহৌসি স্কোয়ার অভিমুখে। ধর্মতলায় মিছিলের ওপর গুলি চলল। রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও জনৈক মুসলিম ছাত্র প্রাণ দিলেন। আহতের সংখ্যা—৫২ জন। রামেশ্বরকে স্মরণ করে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী লিখলেন :

মৃত্যুকে তুমি উপহাস করে
করেছো জয়
রক্তস্নানেব মধ্যে হয়েছে অরুণোদয়,
প্রাণ সমুদ্রে এনেছো বন্যা কি দুর্জয়।
উর্বর তুমি , ছড়ায়েছো বীজ · চেয়ে আছি
মোরা অনিমিখে
হে অশ্বারোহি ! রক্তাক্ষরে তোমার শপথ
নিই লিখে।

মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়নি তবু। পরদিন সাধাবণ ধর্মঘটে কলকাতা অচল হল। বাস্তায় রাস্তায ব্যারিকেড—গাড়ি ও লরি পোড়ানো স্মরণ কবালো '৪২-এর দিনগুলিকে। সৈন্যবাহিনীর প্রতিক্রিয়াব কথা ভেবে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের লাট কানিংহ্যাম থেকে বাংলার লাট কেসি প্রমাদ গুনলেন। দিল্লী প্রাসাদকূটে প্রধান সেনাপতি ও বড়লাটের তন্দ্রাও টুটে গেল।

॥ ৪ ॥

আই. এন. এ. বন্দীমুক্তি নিয়ে আন্দোলন চালিযে কংগ্রেস একটা রাজনৈতিক খেলা খেলেছিল এমন ধারণা বেশ চালু আছে। সেটা সত্য নয়। জুলাই মাসের শেষে গান্ধী বল্লভভাই প্যাটেলের কাছে শোনেন আই. এন. এ. বন্দীদের লালকেল্লায় রাখা হয়েছে এবং দলপতিদের কোর্ট মার্শাল করে গুলি করা হয়েছে। তিনি তা বিশ্বাস করেননি কিন্তু ওযাভেলকে সঙ্গে সঙ্গে সব তথ্য প্রকাশ করতে বলেন এবং বিচারকালে বন্দীরা যাতে আইনগত সাহায্য পায় তার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ জানান।[৭৯] অক্টোবরের শেষে তিনি জানান সশস্ত্র প্রতিরোধে বিশ্বাসী তিনি নন, কিন্তু আই.এন. এ. বন্দীদের সাহস ও দেশপ্রেম উপেক্ষা করতে পারেন না। "And can the Government afford to ignore the almost if not wholly unanimous opinion of Indians of all shades of opinion? India adores these men who are on trial."[৮০] আই. এন. এ. বন্দী ছাড়াও অস্তি ও চিমুরের বন্দী, হরিদাস মিত্র, জ্যোতিষ বসু সকলের শাস্তি হ্রাস বা মকুবের আবেদন তিনি করেন বার বার। শীলভদ্র যাজী ও রামমনোহর লোহিয়ার ওপর

জেলে অত্যাচার করা হচ্ছে বলে তিনি প্রতিবাদ জানান। ১৬ ডিসেম্বর থেকে কেসির সঙ্গে সিকিউরিটি বন্দীদের সম্বন্ধে দীর্ঘ পত্রালাপ চলে। বন্দী মুক্তির জন্য ১৯৪৪ থেকে কম্যুনিস্ট পার্টি জোরদার আন্দোলন চালিয়েছিল সন্দেহ নেই কিন্তু গান্ধীর চেষ্টারও অন্ত ছিল না।

যাই হোক, ২১ নভেম্বরের কলকাতার আন্দোলনে সব দলই জড়িত ছিল, যদিও সাহাবুদ্দিন ও ইস্পাহানি বলেন লীগ জড়িত নয়[৮০ক] আর কিরণশঙ্কর বলেন—কংগ্রেস নয়[৮০খ]। কেসি নিজে পুলিশকে দোষ দেন —"the police staff work was thoroughly bad, a good deal of the firing unnecessary, and most of the Bengal officials useless".[৮১]

সীমান্তের লাট কানিংহ্যাম পরামর্শ দিলেন—প্রধান সেনাপতি এখুনি ঘোষণা করুন ভারতের জনমত প্রচণ্ড বিরোধিতা করায় তিনি সব বিচাব বাতিল করছেন। এতে সৈন্যবাহিনীর শৃঙ্খলা ভঙ্গের ভয় নেই। অন্যদিকে— "I think that every day that passes now brings over more and more well-disposed Indians into the anti-British camp and, whatever the outcome of the trial may be, this anti-British bias will persist in each man's mind."[৮২]

২৪ নভেম্বরের ওয়াভেলের ডায়েরিতে পড়ি ভারতীয় বাহিনীব আনুগত্যের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কায় অকিনলেক নীতি বদলাতে রাজি এবং সেই মর্মে বিলেতেব নির্দেশ চেয়েছেন। এব সমর্থন পাই জেনারেল টুকারেব "While Memory Serves" গ্রন্থে। শেষ পর্যন্ত ঠিক হয় যে শা নওয়াজ, শেগাল ও ধীলোঁর বিচার চলবে কিন্তু বর্বরোচিত ব্যবহারের অভিযোগ ব্যতীত আর কারুর বিচার হবে না।[৮৩] সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ছাড়া অন্য সব অভিযোগ থেকে এদের মুক্তি দেওয়া হয। কয়েক মাস পব স্বয়ং ওয়াভেল স্বীকার করেছিলেন · "It was undoubtedly a serious blunder to place on trial first men against whom no brutality could be proved." আই এন. এ-র ব্যাপারে সি পি আই, লীগ, হিন্দু মহাসভা, আর এস এস, শিখ লীগপ্রত্যেকেই জড়িত ছিল, যদিও কংগ্রেস ছিল সর্বাধিক সোচ্চার।[৮৪] বহু অনুগত পরিবারও (বিশেষত পঞ্জাবে) সরকারের বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিল।[৮৫] মৃত (?) সুভাষ জীবিত সুভাষের চেয়ে ঢেব বেশি শক্তিশালী প্রতিপন্ন হয়েছিলেন।

গান্ধীর সঙ্গে কলকাতায় দেখা হল ওয়াভেলের ১৫ই ডিসেম্বর। অকিনলেকেব ১লা ডিসেম্বরের বিপোর্টে বডলাট পড়েছিলেন—নেহরু ও প্যাটেল সমস্ত জনসভায় ৪২-এব শহীদদের উচ্চ প্রশংসা করছেন, এমনকি গণ-আন্দোলনের হুমকিও দিচ্ছেন। বলা বাহুল্য, এর অনেকটাই নির্বাচনী বাহ্বাস্ফোট। তবু উদ্বিগ্ন বডলাট গান্ধীর কাছে নালিশ জানালেন এবং হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ওপর জোর দিলেন। গান্ধী বললেন, কংগ্রেসের চডা সুর তিনি নামাবেন কিন্তু ব্রিটিশ বিভাজন-নীতি বজায় বইলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আসবে কি করে? অত্যন্ত অন্যায করে ওয়াভেল দাযী করলেন ১৯৩৭-৩৯-এ কংগ্রেসী মন্ত্রীসভার মুসলিম-বিরোধী কার্যাবলীকে। এককথায় তিনি পীরপুর রিপোর্ট, জিন্নাব অভিযোগ (যা লিনলিথগো মিথ্যা বলে জানতেন) সব মেনে নিলেন কি করে? গান্ধী চেপে ধরলে তিনি বললেন, সত্য মিথ্যা যাই হোক, মুসলিমদের ওপর মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া অনস্বীকার্য। তাঁর মন্তব্য— "He (Gandhi) has not changed and never will."[৮৬] ক্ষুণ্ণ গান্ধী কেসিকে বলেছিলেন, যদি ব্রিটেন খণ্ডিত ভারত মেনে নেয়, কংগ্রেস তা কখনও মানবে না। অন্যদিকে ইসপাহানি জানান, হিন্দুদেব আধিপত্য (বিশেষ কবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে) অসহ্য।

এখন যদি গৃহযুদ্ধ হয়, মুসলিমদের হারানো যাবে না কিন্তু দশ-পনের বছর পরে হিন্দুরা অজেয় হবে। তাই লীগ ব্রিটেনের সহযোগিতায় এত আগ্রহী।"[৮৭] কেসি দ্বিজাতিতত্ত্ব মেনে নেননি। "The real difference was economic, caused by the backwardness and the lack of education of the Muslims...Pakistan to the great majority of the Muslims meant that they would own the stores and business and not Hindus."[৮৮] অতএব তাঁর উপদেশ ছিল মুসলমানদের জন্য প্রচুর চাকুরির ব্যবস্থা করে তাদের মন অন্য দিকে ফিরিয়ে দিতে। "Let us boil the frog slowly."

সরকারী মহলে যখন আবার পাকিস্তান নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হচ্ছে গান্ধী তখন মহিষাদলে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন কালে যত হিংসাত্মক কাণ্ড হয়েছিল তার তীব্র নিন্দা করেন। এ ব্যাপারে আমার বিস্তৃত চিঠি পড়ে তিনি মর্মাহত হয়েছিলেন।[৮৯] আমি তাঁর পুরো মন্তব্য উদ্ধৃত করছি, কারণ আজও অনেকে সুতাহাটা ও মহিষাদল থানার তৎকালীন কাজকর্ম নিয়ে উচ্ছ্বসিত হন। ২৬ ডিসেম্বর কি কিছু পরে মহিষাদলে তিনি বলেন,

"I cannot say that all that has been done has been well done or ought to have been done. On the contrary, much of it ought not to have been done. That the people did not remain inert is a matter of satisfaction, but the fact that after all these years they should not have known what the Congress stood for is a matter for sorrow What they did was thoughtless. By its very nature it could not be sustained.

"You have graphically put in your reports how you blew up a railway track, put roads out of use, burnt a kutchery, seized a thana. set up a parallel government and so on. This is not the techique of non-violent action. .It is not in this way that India will attain her independence. We cannot afford to repeat it." রাশিয়ার সঙ্গে তুলনা দেওয়া যে বাতুলতা তিনি স্পষ্ট করে দেন। তাছাড়া অ্যাটম বোমার যুগে এ ভাবে কি সাম্রাজ্যবাদী (মিত্র) শক্তিদের সঙ্গে লড়াই করা যাবে? জাপানের আত্মসমর্পণ আমাদের কি শিক্ষা দিল?

একজন তাঁকে প্রশ্ন করেন, অহিংস বিপ্লব কি শক্তি ছিনিয়ে নেবার উপায় নয়? তিনি বলেন—ওখানেই ভুল হচ্ছে। "A non-violent revolution is not a programme of 'seizure of power' It is a programme of transformation of relationships ending in a peaceful transfer of power" যদি তাঁর ৮ই আগস্ট (১৯৪২)-এর বক্তৃতায় উল্লিখিত পঞ্চবিধ উপায় লোকে নিত তবে সরকারী দমননীতি আপনা থেকে স্তব্ধ হয়ে যেত। বারদৌলির সঙ্গে মেদিনীপুরের তুলনা করে তিনি বলেন, কয়েকদিন ব্রিটিশ শক্তির কয়েকটা প্রতীক (যেমন থানা) দখল করে কি স্থায়ীলাভ হল? তারা তা ধরে রাখতে পারল কি? তাছাড়া যারা এমন বীর তারা নারীদের সম্মান রক্ষার্থে প্রাণ দিল না কেন?[৯০] গান্ধীর তিক্ত কটাক্ষ কলকাতার ওয়ার্কিং কমিটি (৭-১১ ডিসেম্বর ১৯৪৫)-এর প্রতিধ্বনি। তা অহিংসার ওপর জোর দিয়েছিল।

১৯৪৫-এর শেষে রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে সরকার কি ধারণা পোষণ করছিলেন

তার বিশ্লেষণ পাই ভাবত সচিবকে লেখা বড়লাটের ২৭ ডিসেম্বরের দীর্ঘ পত্রে। সঙ্গে সঙ্গে পাই তাঁর ব্যক্তিগত বিরাগের নিদর্শন। যেমন—কংগ্রেস একটা বর্ণহিন্দু প্রতিষ্ঠান এবং এখুনি ক্ষমতা পাবার জন্য হিংসাব পথও নিতে পারে। তাদেব পেছনে অসীম অর্থশক্তি বযেছে, বয়েছে হিন্দু যুবক-ছাত্র সমর্থন। তবে ভাবতীয় শিল্পপতিরা সংঘর্ষ ও বিশৃঙ্খলা পবিহাব করতে চায়।২৪ মে বিড়লাব সঙ্গে তাব আলাপ হয়েছিল। "Birla was obviously alarmed at the possibility of Nehru's dominance in the Congress party, and spoke slightingly of him." পববর্তী পাঁচ বছবেব বাজনীতি বড় কথা নয়, উন্নয়নই বড় কথা। বড়লাটের মনে হয়েছিল "He (Birla) wished to have a finger in the politicalpie."এবং তিনি ভাবতীয় শিল্প নিয়ন্ত্রণ কবতে চান।[৯০৪] বড় জমিদাববা সবকাবেব পক্ষে, কিন্তু তাদেব কাছে সাহায্য আশা কবা বৃথা—"On the whole rather a poor lot."

কংগ্রেসেব বিকল্প নেই। কম্যুনিস্ট পার্টি বা এম এন বায়েব সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট দলেব প্রভাব স্বল্প। তপসিলী শ্রেণী বিভক্ত এবং তাদেব বেশ কিছু কংগ্রেসেব সমর্থক। মুসলিম লীগ থেকেই প্রধান বিবোধিতা কিন্তু তা সবকাব বা ব্রিটিশ সমর্থক নয। সবকাব ও কংগ্রেসেব মধ্যে বিবোধ বাধলে তাবা বড় জোব নিবপেক্ষ বইবে। জিন্না যতদিন লীগ নীতি নিযন্ত্রণ কববেন, পাকিস্তান তাদেব লক্ষ্য থাকবে কিন্তু তাব সমর্থকদেব মধ্যে যাবা নিজেবা চিন্তা কবতে পাবে তাবা পাকিস্তানেব নানা অসুবিধা ও সমস্যা সম্বন্ধে ওযাকিবহাল।

আপাতত সবকাব আমলা, পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীব ওপব নির্ভব কবতে পাবে কিন্তু নীচেব দিকে আমলাদেব সম্বন্ধে জোব কবে কিছু বলা যায না। কিছুদিন পব ভাবতীয আমলা বা সৈন্যাধ্যক্ষ বা পুলিশেব কর্তা কতটা অনুগত থাকবে বলা যায না।

অধিকাংশ রাজার কংগ্রেসভীতি না থাকলে তাবা তখুনি ব্রিটেনেব সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাইত। তাদেব নিজেদের মধ্যে সংহতি নেই। চেম্বাব অব প্রিন্সেসকে প্রতিনিধিত্বমূলক বলা যায় না। এই পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস বিদ্রোহ কবলে হযতো তা দমন কবা যাবে কিন্তু বহু রক্তব্যয়ে--আর তার বদলে কি প্রতিষ্ঠা কবা হবে? বিশুদ্ধ আমলাতন্ত্র চালাবার মত আমলাও তো নেই। কংগ্রেস এখন নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত কিন্তু পরে তাদেব দাবি না মেটালে গণ-আন্দোলনে লিপ্ত হবে। ইতিমধ্যে সৈন্যবাহিনীকে পক্ষে আনাব চেষ্টা চলেছে। কংগ্রেস নির্বাচন জিতলে এবম্বিধ দাবি তুলবে—

(১) কেন্দ্রে নতুন একসিকিউটিভ কাউন্সিল গঠন এবং সাফল্য অনুযায়ী কংগ্রেস মনোনীত সদস্য গ্রহণ।

(২) বড়লাটেব ভিটো লোপ বা অনুরূপ চুক্তি।

(৩) গণপরিষদ গঠন—যাতে সাফল্যানুযায়ী কংগ্রেস সদস্য নিতে হবে। আব আলোচনা বা সংশোধনব্যতীত গণপরিষদেব সিদ্ধান্তই হবে চূড়ান্ত।

(৪) সম্ভবত ইন্দোনেশিযা থেকে ভারতীয় সৈন্য ফিবিয়ে না আনলে বা সব আই.এন.এ. বন্দীদেব মুক্তি না দিলে তারা সহযোগিতা করবে না।

সরকারকে ঠিক করতে হবে কেন্দ্রীয় শাসক পবিষদে কংগ্রেসেব সহযোগিতা পেতে তাবা কতদূর যেতে পারে—অর্থাৎ (১) কতটা জিন্না ও লীগকে পাশ কাটাবে বা তাদেব মাথাব ওপর দিয়ে যাবে, (২) গভর্নর জেনারেলের ভেটো ক্ষমতা সংকুচিত বা বিলুপ্ত কবতে বাজি হবে কিনা। (১) ও (২) পবস্পব নির্ভর। (৩) গণপবিষদ গঠনার্থ সম্মেলন কি ভাবে তৈরি হবে।

তিনি নিজে চেয়েছিলেন ফেব্রুয়ারির শেষে কেন্দ্রীয় শাসন পরিষদ গঠন করতে। ততদিনে পঞ্জাবে লীগ কতটা সাফল্য অর্জন করল বোঝা যাবে। সিমলা বৈঠকের মত কিছু তিনি চাননি। কংগ্রেস ও লীগের সভাপতিদের ডেকে তাদের কাছ থেকে নামের তালিকা চাইছেন—আর নিজে ঠিক করবেন কাকে কাকে নেওয়া হবে। যদি কোন দল রাজি না হয়, তাকে বাদ দিয়েই পরষিদ গঠিত হবে। যদি পঞ্জাবে লীগ ভাল ফল দেখায় তবে তিনি জিন্নাকে বলবেন (১) মুসলিম ও বর্ণহিন্দুর সমতা দেওয়া হবে, (২) মুসলিম লীগ থেকেই মুসলিম সদস্য নেওয়া হবে, (৩) যুদ্ধ, বিদেশ, স্বরাষ্ট্র ও অর্থ এই গুরুত্বপূর্ণ চার দফতরের দুটো পাবে লীগ। অর্থাৎ ওয়াভেল চেয়েছিলেন ৫ বর্ণহিন্দু, ৫ মুসলিম, ২ তপসিলী, ১ শিখ ও ১ খ্রীশ্চান—১৪ জনের শাসন পরিষদ।

এটা গঠিত হলে তিনি গণপরিষদ গঠনার্থ সম্মেলন ডাকাব প্রস্তাব দেবেন। এ সম্বন্ধে কাগজপত্র তৈরি কবছিলেন ভি পি মেনন ও বি এন রাউ।

২৭ ডিসেম্বব আর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্মাবকলিপি ওয়াভেল পাঠান। তাতে আছে—যদি মুসলমানবা পাকিস্তান দাবিতে অটল থাকে, "he would tell Jinnah that ıf they persisted in this attitude, H. M. G. would have to take a decision and their decision would be based on the principle that large non-Muslım populations could not be included in Pakıstan against their will. Thıs would mean that western Bengal including Calcutta and at least two-fifths of the Punȷab would have to be excluded from Pakistan and Jinnah would be left, in hıs own words, with only 'the Husk". ওযাভেলের ধারণা ছিল এতে ভয পেযে জিন্না অবিভক্ত ভাবতই চাইবেন। এই স্মারকলিপি অতি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এভাবেই ভাবতভাগ হযেছিল। জিন্নাকে ওযাভেল ও মাউন্টব্যাটেন কেউই ভয দেখাতে পাবেননি।[৯১]

শ্রমিক সরকার এবিষয়ে কোন উত্তব দেননি কারণ ১৯৪৬-এব জানুয়ারি মাসেই তাঁরা ভাবতে এক শক্তিশালী ক্যাবিনেট মিশন পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিযেছিলেন।[৯১ক]

ইতিমধ্যে আই.এন.এ-ব তিন বিচাবার্থীব (শা নওয়াজ,শেগাল ও ধীলোঁ) যাবজ্জীবন কাবাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু প্রধান সেনাপতি তা কম্যুট কবাব সিদ্ধান্ত নেন। সৈন্যবাহিনীর অধিকাংশই ক্ষমাব পক্ষপাতী ছিল, তাদেব চোখে এদেব বিপথে নিয়ে যাওযা হলেও আসলে এবা দেশপ্রেমিক। অকিনলেক খুঁচিয়ে ঘা কবতে চাননি।[৯২] ওযাভেল বলেছিলেন, "abstract justice must to some extent give way to expediency." অর্থাৎ মানে মানে তাঁবা পশ্চাদপসবণ করেছিলেন।

ভালই করেছিলেন, কারণ ফেব্রুয়ারিতে ঘটেছিল রয়্যাল ইন্ডিয়ান নেভি (RIN)-র বিদ্রোহ। নৌবিদ্রোহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তার আগে রসিদ আলির কারাদণ্ডের প্রতিবাদে কলকাতা উত্তাল হযে উঠেছিল। ১০ই ফেব্রুয়ারি কলকাতায় গোলমালের সূত্রপাত হয়। ১১ই ফেব্রুয়ারি লাট কেসি মিছিলকে (পুলিশ সহ) ড্যালহৌসি যেতে অনুমতি দেন। কিন্তু ওয়েলিংটন স্কোয়ার ফেরার পথে পুলিশের সঙ্গে মিছিলের সংঘর্ষ ঘটে। ব্যাপক লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, মিলিটারী গাড়ি পোড়ানর ঘটনা সরকারকে বিচলিত করে। ১২ই কম্যুনিস্ট পার্টি সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয়। বিক্ষোভ মিছিলে যোগ দেন শরৎ বসু, সুরাবর্দি, সতীশ দাশগুপ্ত ও সোমনাথ লাহিড়ী। পুলিশ কমিশনার এক গোপন রিপোর্ট লেখেন, "এ বিক্ষোভে সবচেয়ে বিপজ্জনক ভূমিকা নিয়েছে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি।" কেসির ধারণা

এতে সুরাবর্দির হাতও ছিল, যদিও গোলমাল থামাচ্ছেন এমন অভিনয় তিনি করেন। সৈন্যবাহিনীর সাহায্য চাওয়া হয়। রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি হচ্ছে বলে ১৩ই আরও সৈন্য নামানো হয়। অনেক প্রাণের বিনিময়ে ১৫ই ফেব্রুয়ারি অবস্থা আয়ত্তে আসে।[৯৩]

R. I. N. বিদ্রোহ শুরু হয় ১৮ই ফেব্রুয়ারি। 'এইচ এম আই এন তলোয়ার'—এর সিগন্যাল কর্মশিক্ষাধীন ক্যাডেটরা জাতিবৈষম্য, দুর্ব্যবহার, জঘন্য খাদ্য ইত্যাদির প্রতিবাদে অনশন আরম্ভ করে এবং পরের দিন তা ব্যাপ্ত হয় ২২টি জাহাজে ও তীরবর্তী নৌ-সংস্থায়। 'তলোয়ার'-এ গুলি চলেছে মিথ্যা গুজবে উত্তেজিত হয়ে নাবিকরা জাহাজ ছেড়ে তীরে অবতরণ করে ও কংগ্রেসী পতাকা উড়িয়ে লরি চেপে বোম্বাইয়ের পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। ২১-এ কাসল ব্যারাকে অবরুদ্ধ নৌ-সৈন্য মুক্তি পাবার চেষ্টা করলে সংঘর্ষ বাধে। করাচীতে হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়ে ও 'হিন্দুস্তান' থেকে ব্রিটিশ সৈন্যের ওপর কামান দাগা হয়। ইউনিয়ন জ্যাকের জায়গায় কংগ্রেস ও লীগ পতাকা উত্তোলিত হয়।

বোম্বাই ও কলকাতা, পরে অন্যান্য শহর, প্রতিবাদমুখর হয়। আবার আক্রান্ত হয় সাহেবরা। থানা, ডাকঘর, ট্রাম ডিপো, খাদ্যশস্যের দোকান পোড়ান হয়। Y. M. C. A.-র কেন্দ্রও বাদ যায়নি। বোম্বাইতে সি পি আই ও কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট দলের অরুণা আসফ আলি ('৪২-এর আন্দোলন বিখ্যাত) ও পটবর্ধন সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেন। ২২শে ফেব্রুয়ারির সেই ধর্মঘটে প্রায় তিন লক্ষ শ্রমিক অংশ নেয়। রেল ও রাস্তা রোকো ছিল এর অঙ্গ। অন্যান্য জায়গায় হরতাল, মিছিল ইত্যাদির মাধ্যমে সহানুভূতি দেখান হয়। সবসুদ্ধ ৭৮টি জাহাজ, ২০টি তীরস্থ ঘাঁটি ও ২০,০০০-এর মত নাবিক সামিল হয়েছিল বিদ্রোহে। উপরন্তু বোম্বাই, মাদ্রাজ, পুণা, কলকাতা, যশোর ও আম্বালার ভারতীয় বিমান বাহিনীর ভারতীয় সৈন্যরাও ধর্মঘট করেছিল।[৯৪] ২৩শে ফেব্রুয়ারি প্যাটেল ও জিন্নার অনুরোধে নাবিকরা আত্মসমর্পণ করে। লক্ষণীয় যে ১১ থেকে ১৩ই ফেব্রুয়ারি কলকাতায় যে গোলমাল হয়েছিল তার সঙ্গে R. I. N. বিদ্রোহের প্রকৃতি পৃথক। সাধারণ ধর্মঘট চলেছিল মাত্র একদিন এবং তাতে শ্রমিক ছাড়া অন্য শ্রেণী যোগ দেয়নি। গ্রামাঞ্চলে গণ্ডগোল ছড়িয়ে পড়েনি। সি পি আই পরে বলার চেষ্টা করেছে, বিদ্রোহীরা জনগণের কাছে আত্মসমর্পণ করে। তা ঠিক নয়। কংগ্রেস ও লীগ নেতারা নাবিকদের আত্মসমর্পণে প্রণোদিত করেন। বিশেষ করে বল্লভভাই প্যাটেল। তাঁর মতে সৈন্যবাহিনীর শৃঙ্খলাভঙ্গ করা উচিত নয়। গান্ধীর মতেও এটা ভারতের পক্ষে "bad and unbecoming example." কিন্তু এই একমাত্র কারণ নয়। বোম্বাইতে প্যাটেল লক্ষ্য করেছিলেন বিদ্রোহ দমনের কি বিপুল আয়োজন করেছে সরকার। ২২শে ফেব্রুয়ারি তিনি নেহরুকে লিখছেন· "The overpowering force of both naval and military personnel gathered here is so strong that they can be exterminated altogether and they have been also threatened with such a contingency."[৯৫] অরুণা আসফ আলি মনে করতেন জনসাধারণ "are not interested in the ethics of violence and non-violence." এইভাবে ব্যারিকেডেই আসবে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি। এর যোগ্য উত্তর দেন গান্ধী।[৯৫ক]। এমন দায়িত্বহীন অতিরোমান্টিক উক্তি কি করে সুমিত সরকার "a tragically accurate prophecy" মনে করেন বুঝি না।[৯৬] প্যাটেল জানতেন অ্যাডমিরাল গড্‌ফ্রের হুমকি ফাঁকা আওয়াজ নয়। কাউকে শাস্তি দেওয়া হবে না এবং অভিযোগ শোনা হবে এই শর্তে প্রধান সেনাপতির সঙ্গে তিনি সমঝোতা করেন।

যাঁরা মনে করেন ব্রিটিশ মনোবল ভেঙে পড়েছিল তাঁরা স্বপ্নের স্বর্গে বাস করছেন। সব দুঃসংবাদ শোনার পর বড়লাট ১৯-এর ডায়েরিতে লিখছেন : "What a cheerful day—prospect or reality of three mutinies and two strikes! However, I got in 18 holes of golf..." ২০শেই স্থির হয় কঠোর হস্তে R. I. N. বিদ্রোহ দমন করা হবে। ২১-এর ডায়েরিতে পড়ি—"there could be no question of parley and that nothing else than unconditional surrender would be accepted ."[৯৭] এক মারাঠী ব্যাটেলিয়ান নাবিকদের ব্যারাকে ঢুকতে বাধ্য করে, গডফ্রের জাহাজ বিদ্রোহী জাহাজ বেষ্টন করে দাঁড়ায় আর বোমাবর্ষণের ভয় দেখান হয়। ২৭-এ বড়লাট ভারত সচিবকে জানান—"on the whole, the Indian army has been most commendably steady."[৯৮] শুধু বোম্বাইতে অসামরিক নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় ২২৮, আহতের সংখ্যা—১০৪৬।

অতএব রজনী পাম দত্তের সরলীকরণ—ভয় পেয়ে সরকার ক্যাবিনেট মিশন পাঠায়—মানতে পারলাম না। তথ্যের দিক থেকেও আমাদের জানা উচিত মিশন পাঠানর কথা ১৭ ফেব্রুয়ারি ঘোষিত হলেও ব্রিটিশ ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত নেয় ২২ জানুয়ারি ও বড়লাট জানতে পারেন দুদিন পর। দ্বিতীয়ত সরকার যদি সত্যি ভয় পেত, তবে আলাপ আলোচনায় তার কোন ছাপ পড়ল না কেন? কংগ্রেসও এই আকস্মিক উগ্রপন্থায় ভয় পায়নি। সম্ভব হলে কংগ্রেস আলোচনার পথে চলেছে, অসম্ভব হলে আন্দোলনে নেমেছে। আসন্ন আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এবম্বিধ অতিবাম প্রতিক্রিয়া ক্ষতিকারক হবে বলে ভাবা ভীতির লক্ষণ নয়, বিবেচনার লক্ষণ। গান্ধী অরুণার যে জবাব ২৬ ফেব্রুয়ারি দেন তা সকলের অবশ্য পাঠ্য। এখন আমরা বুঝি বামপন্থী উগ্রতার পেছনে দুটো মনস্তত্ত্ব কাজ করছিল—(১) ১৯৪২-এ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার অস্বস্তিকর স্মৃতি অপনোদন, (২) ইউরোপে ঠাণ্ডা লড়াই শুরু হওয়ার ফলে স্তালিনের নীতি পরিবর্তন। অরুণার কথা আলাদা। ৪২-এর স্মৃতি তিনি ভুলতে পারছিলেন না।

ক্যাবিনেট মিশনের পটভূমিকায় ১৯৪৫-৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল অনেক বেশি কাজ করেছিল। কেন্দ্রে ও কোন কোন প্রদেশে লীগ অসাধারণ সাফল্য দেখাল। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে লীগ সবগুলি (৩০) মুসলিম আসন দখল করে এবং মুসলিম ভোটদাতার ৮৯% এর মত ভোট পায়। কংগ্রেস জেতে ৫৭টি আসন—অমুসলিম ভোটের ৯১%-এর বেশি পেয়ে। আসাম, ইউ. পি., বোম্বাই, সি. পি., মাদ্রাজ, ওড়িশা, বিহার ও সীমান্তে কংগ্রেস জিতল। নির্বাচনের সময় বাংলায় ৯৩ ধারায় শাসন চলছিল। নাজিমুদ্দিনের মন্ত্রীসভা না থাকা লীগের পক্ষে শাপে বর হয়েছিল। লীগের পরিষদীয় দলের সঙ্গে পার্টি সংগঠনের বনিবনা ছিল না। ১৯৪৫-এ বাংলার ২৭টি জেলার মাত্র ১৮টিতে লীগ সংগঠন ছিল—তাও নমো নমো করে। আবুল হাশেমের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না কিন্তু তাঁর ক্ষমতার কেন্দ্র বর্ধমান থেকে ঢাকার স্থানীয় রাজনীতি কি করে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব? নিখিল ভারত কেন্দ্রীয় কমিটি অব অ্যাকশনের পর্যবেক্ষণ থেকে বোঝা যায় সংগঠন বলতে অধিকাংশ জায়গায় কিছু ছিল না। হাশেমের নিজ জেলার সহকারী সচিব হাশেমকে যাতে নির্বাচনী টিকেট না দেওয়া হয় তার জন্য পার্লামেন্টারী বোর্ডকে অনুরোধ জানান। জনৈক আসাদুল্লা লিয়াকৎকে লেখেন, সুরাবর্দি ও নাজিমুদ্দিন, "forget the supreme importance of unity and solidarity at this moment, they are out for their own supremacy." আক্রাম খাঁ তাঁর সারাজীবনের চেষ্টায় গড়া লীগের অবস্থা

দেখে সভাপতির পদ ত্যাগ করেন। লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ড গঠনে দু দলের মারামারিও হয়েছিল তাব খবর পাই জিন্নাকে লেখা ইস্পাহানির ১ অক্টোবর (১৯৪৫)-এর চিঠিতে।[১১] বোর্ডের ৯ জনের ৪ জন নাজিমুদ্দিনের, বাকী ৫ সুরাবর্দি-হাশেম অক্ষের। ইস্পাহানি ঠিকই লিখেছিলেন—এ লডাই পরবর্তী প্রধানমন্ত্রীত্বের জন্য লড়াই। জিন্না সব শোনেন এবং যুদ্ধের ঊর্ধ্বে থেকে ঘোষণা করেন—একমাত্র জিগির হোক "Pakistan against Akhand Hindustan."[১২] বাংলার অস্থায়ী লাট টোয়াইনামেব কাছে নাজিমুদ্দিন সখেদে বলেছিলেন তিনি রাজনীতি ছেড়ে দেবেন। শেষে তিনি কলকাতা ছেড়ে লীগের ওয়ার্কিং কমিটিতে আশ্রয় নেন। অন্যদিকে বিবক্ত জিন্না সুবাবর্দিকে নির্বাচনেব ব্যয়বাবদ একটি পয়সাও দেননি। ফজলল হক জাতীয় মুসলিম ও কৃষক প্রজা পার্টিব অবশিষ্ট নিয়ে আলাদা দল গডেন। কংগ্রেস তাঁকে সমর্থন জানায়। দলাদলির পবিণাম—হিংসা। তখন থেকেই কলকাতায় crowd বা mob বাজনীতিতে একটা বড অংশ নিতে থাকে। হকেব দলকে বিশ্বাসঘাতক অপবাদ দিযে ক্ষান্ত হযনি লীগ। প্রায কোন সভা কবতেও দেযনি। আবুল মনসুব আহমদেব মত লোকও লীগকে বিপ্লবী দল, পুবোনো কৃষক প্রজা পার্টিব অগ্রগামী ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত কবতে থাকেন। যাই হোক, এত বিবাদেব পবও কেন্দ্রীয় আইন পবিষদে লীগ বাংলা থেকে ছ'টি মুসলিম আসনই জিতে নেয। কংগ্রেস জেতে—৭, ইউবোপীয়ানবা—৩, নির্দল (কংগ্রেস পক্ষে)—১। বর্ধমান ও প্রেসিডেন্সী বিভাগেব আসন জেতেন সুবাবর্দি প্রায ৯২% ভোট পেযে। কেসি ভয পেযে যান বাংলা বাজনীতিব

সারণী-১

বাংলা আইন পরিষদ
(সদস্য সংখ্যা-২৫০)

লীগ	—	১১৫
নির্দল		
মুসলিম	—	২
মুসলিম শ্রম	—	১
কৃষক-প্রজা	—	৫
তপসিলী (সংবক্ষিত)	—	২৪
নির্দল তপসিলী	—	৫
ইউরোপীয়ান	—	২৫
		১৭৭
কংগ্রেস	—	৬২
নির্দল হিন্দু	—	১
হিন্দু মহাসভা	—	১
খ্রীশ্চান	—	২
অ্যাংগ্লো ইন্ডিযান	—	৪
কম্যুনিস্ট	—	৩
		৭৩

এই সাম্প্রদায়িক পোলারাইজেশন দেখে। বাংলার আইন পরিষদে ভোটের ফল দাঁড়াল এইরূপ—[১০১]
যে সুরাবর্দির অধীনে মন্ত্রীসভা গঠিত হয় তাঁর সম্বন্ধে ওয়াভেলের মন্তব্য—"One of the most inefficient, conceited and crooked politicians of India."[১০২]
বারোজ চেষ্টা করেন লীগ ও কংগ্রেস যুক্ত মন্ত্রীসভা গঠন করুক—অর্থাৎ পোলারাইজেশন যাতে না হয়। কিরণশঙ্কর রায় কোন মুসলিম নাম দেবেন না জানান কিন্তু মন্ত্রীসভায় কংগ্রেস কটা আসন পাবে তা নিয়ে গোলমাল বাধে আর হাই কমাণ্ড আবার বাগড়া দেয়।[১০৩]

সারণী-২

পঞ্জাব আইন পরিষদে
দলীয় অবস্থা[১০৪]

দল		আসন
লীগ	—	৭৫
কংগ্রেস	—	৫১
য়ুনিয়ানিস্ট	—	২১
শিখ	—	২১
নির্দল	—	৭
		১৭৫

পঞ্জাবের য়ুনিয়ানিস্ট দলও বেশ মার খেল। ৮৬টি মুসলিম আসনের মধ্যে লীগ পেল ৭৫ (মুরের মতে ৭৯, কেন বুঝলাম না), তবুও ১৭৫ জনেব পবিষদে তা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারল না।

লীগ আকালিদের দিকে হাত বাড়ায়। আকালিরা বলে—লীগ মন্ত্রীসভা গঠন করুক।আগে-ভাগে যোগ দিলে তাদের বদনাম হবে। দৌলতানা, ইফ্‌থিকারউদ্দিন, বশির ও মামদোত্ খিজিরকে বিনাশর্তে মন্ত্রীসভা গঠন করতে বলেন। খিজির তা গ্রহণ করেন। এতসব আলোচনা জিন্নাকে বাদ দিয়েই হয়। জিন্না শোনামাত্রই দৌলতানার প্রস্তাব নাকচ করে দেন। তখন তাঁরা খিজিরকে লীগের সদস্য হবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। খিজিব অবাজি হলে পঞ্জাবে স্থায়ী সরকার গঠনের সম্ভাবনা তিরোহিত হয়। দৌলতানা কিন্তু বলেছেন—জিন্নাই তাঁকে আকালিদের বোঝাতে বলেছিলেন যে মুসলিম ভোটদাতাদেব পাকিস্তানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও তা কাজে পরিণত করা হবে না। বলা মুশকিল—কে সত্য কথা বলছেন, কে মিথ্যা। শেষে গভর্নর খিজিরকেই ডাকেন এবং শিখ ও কংগ্রেসের সহায়তায় খিজির এক যুক্ত সরকার গড়েন (৫১+২১+২১+=৯৩)। আজাদ বলেছিলেন, গভর্নরের ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু তাঁর চাপেই খিজিরকে ডাকতে হয়।[১০৪ক] সিন্ধুর রাজনীতি বাংলার মতই দুই নেতার লড়াইতে ঘুলিয়ে উঠেছিল। একদিকে প্রধানমন্ত্রী গুলাম হুসেন অন্যদিকে প্রাদেশিক লীগ সভাপতি জি এম সায়েদ। সায়েদ শেষ পর্যন্ত আলাদা লীগ সংগঠন তৈরি করেন ও কংগ্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ভয় পেয়ে জিন্না স্বয়ং আসেন গোলমাল মেটাতে। কিছুই ফল হয় না। খুড়ো প্রশ্ন করেন, গুলাম হোসেনের মত লোককে কি ভাবে লীগ প্রধানমন্ত্রী বলা যায়? কি উত্তর দেবেন জিন্না? তিনি গ্রামাঞ্চলের বড়

জমিদাব, পীর ও মুল্লাদের ওপর সিন্ধুকে ছেড়ে দেন। তারপর চলল অবাধ টাকার খেলা। জিন্না একবার বলেছিলেন, সিন্ধুর সব নেতাকে পাঁচ লাখ টাকায় কিনতে পাবেন। গভর্নর ডাও (Dow) উত্তব দেন, তিনি পারেন আরো কম টাকায়। মুখ্যসচিব জানাচ্ছেন—'এক ভোট এক নোট' এই চলছে ভোটের বাজার দর। সায়েদ ছিলেন সিন্ধু জাতীয়তাবাদের প্রতীক। লীগের সর্বভারতীয় কৌশলের শিকাব হতে চাননি তিনি। কংগ্রেসের নেতা নিচলদাস তাঁকে সমর্থন জানাচ্ছিলেন। আবেক নেতা, সিন্ধ, প্যাটেলকে জানাচ্ছেন, মুসলিমদের মধ্যে এত দলাদলি যে হয়তো কংগ্রেসই জিতে যাবে এবং তা হলে মুসলিমদের সহায়তায় "পাকিস্তানকে সিন্ধুর মাটিতে কবব দেওয় হবে।"[১০৫]

তা অবশ্য হযনি। তবে লীগও নিবংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাযনি। কংগ্রেস পেল দ্বিতীয় স্থান। প্যাটেল, আজাদ, জিন্না কারুবই হাত ছিল না মন্ত্রীসভা গঠনে। তা করলেন ছোটলাট মুডি—গুলাম হুসেনকে ডেকে। মন্ত্রীবা সবাই লীগেব, পেছনে জমিদাব ও মীব—তবু প্যাটেল ভেবেছিলেন মন্ত্রীসভা ফেলে দেওয়া কঠিন হবে না। তা হযতো যেত, কিন্তু সর্দার দেখেননি যে শহরাঞ্চলে মুসলিম ভোটেব ৭৯.৩% পেয়েছে লীগ। এটা শুভ লক্ষণ নয়।

উত্তর পশ্চিম সীমান্তে গঠিত হল জিন্নাব প্রতিদ্বন্দ্বী—কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা। এখানে আওবঙ্গজেব খাঁ ও শাদুল্লা খাঁব দ্বন্দ্ব লীগকে দুর্বল করে বেখেছিল। আবদুল কৈয়ুম খাঁ ও আবদুর বব নিস্তাব লীগেব শক্তি কিছু বাড়ালেও পাকিস্তান-এর নামে বিচ্ছিন্নতাবাদ আদৌ জোরদার হযনি।[১০৬] জিন্না আওবঙ্গজেব খাঁর বিবোধিতা কবে কিছু আসন হাবান।[১০৭] কংগ্রেস কেন্দ্রীয় পরিষদের জন্য নির্দিষ্ট ১টি মুসলিম আসন, প্রাদেশিক আইন পবিষদের ১৯টি মুসলিম ও ১৪টি অমুসলিম আসন জেতে। মুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত ৩৬টি আসনের মাত্র ১৭টি জেতে লীগ। তবে একটা অমঙ্গলের লক্ষণ দেখা দেয়। শহরাঞ্চলে মুসলিম আসনে লীগ ভোটের ৪৫.৬% পায়, কংগ্রেস—২২.২২%, গ্রামাঞ্চলে লীগ পায়—৪০.৭%, কংগ্রেস—৪১.৪%। অর্থাৎ এখানে লীগের প্রভাব বাড়ছিল সন্দেহ নেই।

মোটের ওপব জিন্না ভারতীয় রাজনীতিকে দুই মেরুতে বিভক্ত করতে না পারলেও শহবাঞ্চলের মুসলিম ও কোনো কোনো স্থানে গ্রামাঞ্চলের মুসলিমকে 'পাকিস্তান' নামক অব্যাখ্যাত বস্তুটির প্রতি কিছুটা আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন। জানুয়ারি (১৯৪৬)-তে যে পার্লামেন্টারী প্রতিনিধি দল ভারত ঘুরে যায তাদের কাছে জিন্না বলেন, মুসলমানদেব পাকিস্তান দাবি, লীগের parity-র দাবি ও দুটো সংবিধানিক সভার দাবি মেনে না নিলে কোন সরকারে তিনি যোগ দেবেন না। নির্বাচনেব ফল দেখে কিঞ্চিৎ উৎসাহিত হলেন তিনি।

ক্যাবিনেট মিশন সম্বন্ধে সর্বাধিক প্রামাণিক গ্রন্থ—আর জে মুরের Escape from Empire: The Attlee Government and the Indian Problem (Clarendon, 1983). তাতে পটভূমিকা স্বরূপ তিনি যুদ্ধ শেষে ব্রিটেনের নানা অসুবিধার কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমত যুদ্ধের সময় সিভিল সার্ভিসে নিয়োগ বন্ধ থাকায় ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল। ১৯৪০-এ তা ছিল ১২০১, ১৯৪৬-এ দাঁড়ায়—৯৩৯।

সারণী-৩

আই সি এস-এর সংখ্যা

বছর	ব্রিটিশ	ভারতীয়
১৯৪০	৫৮৭	৬১৪
১৯৪৬	৪২৯	৫১০

এদের মধ্যে ভারতীয়ের প্রায় দ্বিগুণ সংখ্যক ব্রিটিশ সিভিলিয়ান অবসর গ্রহণের মুখে।[১০৮] কেসি বারবার বলছেন যে খাদ্য সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার শাসন অসম্ভব হয়ে উঠছে। ৬৫টি ঊর্ধ্বতন পদের মধ্যে মাত্র ১৯টি পদে থাকবে ব্রিটিশ কর্মচারী।[১০৯]

যে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে প্রধানমন্ত্রী সলস্‌বেরি একদা "English barrack on the Oriental seas" আখ্যা দিয়েছিলেন, এবং সম্প্রতি যা মধ্য প্রাচ্য থেকে ব্রহ্মরণাঙ্গণে অসীম বীরত্ব দেখিয়েছে তার ব্রিটিশ অংশ প্রথম মহাযুদ্ধের পর বেশ কমে গিয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বহু ভারতীয়কে কমিশন দেওয়ার ফলে ভারতীয় অফিসারের সংখ্যা ১৯৩৯-এ মাত্র ১০০০ থেকে ১৯৪৫-এ বেড়ে হয়েছিল ১৫,৭৪০। আই.এন.এ-র ব্যাপারে পর তাদের আনুগত্যে চিড় ধরেছিল, সন্দেহ নেই।[১১০]

এ সময় ব্যবসাবাণিজ্যের দিক থেকে ব্রিটেনের কাছে ভারতের পূর্বতন গুরুত্ব প্রায় তিরোহিত। ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতের বস্ত্র চাহিদার মাত্র ৪% জোগাচ্ছিল ল্যাঙ্কাশিয়র। অর্থাৎ ভারত এই শিল্পে স্বয়ম্ভরতা অর্জন করেছিল। ট্যারিফ বোর্ডের বদান্যতায় শুধু বস্ত্রশিল্পে নয়, লৌহ ও ইস্পাত, কাগজ ও চিনি শিল্পে অনেক উন্নতি হয়েছিল। অবশ্য বাজেট ঘাটতি মেটানও আমদানী শুল্ক বৃদ্ধির একটা উদ্দেশ্য ছিল। ভারতীয় শিল্পপতি ও বণিকরা ১৯৩৫-এর সংস্কার আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার সময় বড়ো ভূমিকা নিয়েছিলেন এবং তাঁদেরই সুবিধার্থে ১৯৩৪-এ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন পাশ হয়। শুধু ভারতীয় নয়, ইংল্যাণ্ডের অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তিও টাকার অবমূল্যায়ন (১ শিলিং ৪ পেন্স) চেয়েছিলেন। কিন্তু ম্যাকডোনাল্ড, স্নোডেন ও চেম্বারলেন ব্রিটিশ করদাতার স্বার্থরক্ষার্থ ভারতকে অর্থ বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দেননি। বড়লাটের হাতে বক্ষাকবচের প্রচুর ক্ষমতা ছিল। ১৯৩৯-এর Anglo-Indian Trade Agreement ব্রিটিশ রপ্তানীর ওপর কিছু সুবিধাও আদায় করেছিল।

তবু ব্রিটিশ উদ্যোগের পক্ষে ভারতের গুরুত্ব কমে যায়নি। কয়লা, পাট ও চা শিল্প মার খেলেও রাবার, পেট্রোলিয়াম, রাসায়নিক দ্রব্য, প্রসাধন দ্রব্য ইত্যাদি ডানলপ, ইউনিলেভার, ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল প্রভৃতি বহুজাতিক সংস্থাকে ভারতের প্রতি আকৃষ্ট করে। প্রথমগুলো চলে যায় ভারতীয় শিল্পপতির হাতে। অনেক ক্ষেত্রে তারাই হয় বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের সম্পূরক। অতএব পরিচালনার ক্ষেত্রে ভারতীয় ও ব্রিটিশ ডিরেক্টারদের সহযোগিতা লক্ষণীয় হয়ে ওঠে।[১১১] যুদ্ধের অধিকাংশ লাভ ভারতীয়দের হাতেই যায়। যুদ্ধশেষে টাটা, বিড়লা, ডালমিয়ার শ্রীবৃদ্ধি আমরা আগেই আলোচনা করেছি। অতএব স্বার্থরক্ষার জন্য ব্রিটেনের দিকে না তাকিয়ে ব্রিটিশ শিল্পপতিরা ভারত সরকারের দিকে তাকাতে বাধ্য হন। অর্থ দফতরের সদস্য জেমস গ্রিগ এটা পছন্দ করেননি। তিনি কেইনসের মতামতকে "either silly or vicious" মনে করতেন। কিন্তু ওয়াভেল শিল্পায়নের বিস্তৃত পরিকল্পনা দিয়েছিলেন। চার্চিলের কেয়ারটেকার সরকার পুরোনো বিরাগের বশে তা বাতিল করে

দেয়। তবু ক্যাবিনেট মিশনের আলোচনাকালে ব্রিটিশ বণিক ও শিল্পপতিদের চাপ অনেক কমে গিয়েছিল। তারা জানত মালয়, ব্রহ্ম, সিংহল ও পূর্বআফ্রিকায় ব্যবসা চালাতে ভারতেব ঘাঁটি দরকার। তাছাড়া প্রথম দিকে স্বাধীন ভারতের ভোগ্যপণ্য জোগাবে ব্রিটেন ছাড়া আব কে ?[১১২]

তবে দুটো প্রশ্ন খুব জরুরী হয়ে উঠেছিল। (১) বৃহত্তর সাম্রাজিক স্বার্থে, অর্থাৎ মহাসাগরীয় অঞ্চলে প্রভুত্ব রক্ষায়, ভারতের ক্রমবর্ধমান সামরিক ও উৎপাদন শক্তির সাহায্য প্রয়োজন। তা পাওয়া যাবে কি ভাবে ? (২) যুদ্ধকালে নানা উপকরণ জুগিয়ে ভারত যে ১৩০০ মিলিয়ান পাইণ্ড স্টারলিং ব্যালান্স জমিয়েছে তা শোধ হবে কি করে ?

সারণী-৪

কোটি টাকার হিসাবে ব্রিটেনের দেয় প্রতিরক্ষা ব্যয়	
১৯৪০	৫৩
১৯৪১	১৯৪
১৯৪২	৩২৫.৪৮
১৯৪৩	৩৭৭.৮৭
১৯৪৪	৪১০.৮৪
১৯৪৫	৩৭৪.৫৪
	১৭৩৫,৭৩

(সিংহ ও খেবা) ইন্ডিয়ান ইকনমি (১৯৬২), অ্যাপেনডিক্স XXXII

কেইনসের হিসাব মতে ব্রিটেনের বাৎসরিক বাজেটে ঘাটতি দাঁড়াবে ১৪০০ মিলিয়ান পাউণ্ড। কোথা থেকে আসবে ভারতকে দেয় এত অর্থ ? প্রত্যক্ষ বাণিজ্যের দিক থেকে না হোক, সাম্রাজ্যিক ও আর্থিক দিক থেকে ভারতকে হাতে রাখতে হবে অথচ তার প্রত্যাশা পূরণ করতে হবে এই দোটানায় পড়েছিল ক্যাবিনেট মিশন।[১১৩]

মিশনের সদস্য ছিলেন তিনজন (যাঁদের ওয়াভেল ঠাট্টা করে 'three Magi' আখ্যা দিয়েছেন)—ভারতসচিব পেথিক-লরেন্স স্বয়ং, বোর্ড অব ট্রেডের প্রেসিডেন্ট—স্যাব স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ ও অ্যাডমিরালটির প্রথম লর্ড—এ· ভি· অ্যালেকজাণ্ডার। বোঝা যাচ্ছিল ওয়াভেলের ২৭ ডিসেম্বরের 'Breakdown Plan' গ্রহণযোগ্য হয়নি। এতে ওয়াভেল জানান, যদি পাকিস্তানের জন্য লীগ বেশি জেদ করে তবে পঞ্জাব ও বাংলাকে ভাগ করতে হবে। এর বিরোধী ছিলেন পঞ্জাবের লাট গ্ল্যান্সি,ইউ· পি·-র লাট ওয়াইলি ও বাংলার লাট কেসি। গ্ল্যান্সির মতে পঞ্জাব ভাগ হবে সর্বনাশ[১১৪] ও জিন্নাকে তার 'প্রকৃত ওজন' সমঝে দেওয়া উচিত। কেসি 'পাকিস্তান'—ধারণাকে টিপে মারবার পরামর্শ দিয়েছিলেন।[১১৫] কিন্তু ২৫ মার্চ (ক্যাবিনেট মিশন পৌঁছবার পরের দিন) যে কাউন্সিল বসে তাতে বেন্থল ও রোলাণ্ডস্ উভয়েই পাকিস্তানের পক্ষে মত দেন। সমর্থন করেন আম্বেদকর, শ্রীবাস্তব, আজিজুল হক। একমাত্র আকবর হায়দারি প্রশ্ন তোলেন—পাকিস্তান বলতে জিন্না বোঝেন কি ? অসাধারণ বুদ্ধিমান হায়দারি জিন্নার জারিজুরি ভাঙতে চেয়েছিলেন।

কংগ্রেসের ক্যাবিনেট মিশন সম্বন্ধে বেশি উৎসাহ ছিল না। ক্রিপস্ দৌত্যের তিক্ত স্মৃতি নেহরু ভুলতে পারেননি। যে অ্যাটলি চার্চিলের হাত ধরে এমন চণ্ড দমননীতি প্রয়োগ করেন, কি আশা তাঁর কাছে ? আজাদ অবশ্য পূর্বের মত উৎসাহ দেখিয়েছিলেন।

গণপরিষদ ও য়ুনিয়ন পেলে প্রাদেশিক অপশন মেনে নিতেও তিনি রাজি ছিলেন।[১১৬] বিড়লা প্যাটেলকে একই পরামর্শ দেন।[১১৭] প্যাটেল তা নেননি—নির্বাচন নিয়েই তিনি বেশি ব্যস্ত ছিলেন।

সি পি আই/সি এস পি-র উগ্রতা, হিন্দু মহাসভার সাম্প্রদায়িকতা, লীগের চ্যালেঞ্জ এসব সমস্যা বড় হয়ে উঠেছিল। এক হাতে কোরান অন্য হাতে হিন্দুশাস্ত্র নিয়ে লীগ পঞ্জাবের গ্রামে গ্রামে গিয়ে নির্বাচনী প্রচার চালাচ্ছিল—মনে রাখতে হবে।[১১৮]

মিশন ভারতে পদার্পণ করল ২৪ মার্চ। পেথিক-লরেন্স প্রেস প্রতিবেদনে জানালেন—স্বাধীনতা ও স্বশাসন নীতিগতভাবে স্বীকৃত হয়েছে। এখন সমস্যা—ভারতীয়রা কিভাবে সেই পূর্ণ স্বাধীন অবস্থা পাবে তার পদ্ধতি নির্ধারণ। যদিও ৪৭২ জন ব্যক্তির সঙ্গে মিশন সাক্ষাৎ করেন, তবু আসল কথাবার্তায় অনেক সময় বেসরকারী মাধ্যম ব্যবহৃত হয়। হোরেস অ্যালেকজাণ্ডার ও অ্যাগাথা হ্যারিসন ছিলেন গান্ধী ও ক্রিপস/পেথিক-লরেন্সের মধ্যস্থ। রাজকুমারী অমৃত কাউর মিস হ্যারিসনকে গান্ধীর মনোভাব জানাতেন। ১৯৪২-এ গান্ধীকে তাচ্ছিল্য করে ক্রিপস্ যে ভুল করেছিলেন তার পুনরাবৃত্তি করতে চাননি। ফলে ওয়াভেল ও অ্যালেকজাণ্ডারের (এবং অবশ্যই জিন্নার) মনে সন্দেহ জাগে যে তাঁদের না জানিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে ভারতসচিব ও ক্রিপস্ একটা ষড়যন্ত্র চালাচ্ছেন। আমরা দেখব মিশনের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের অন্যতম কারণ এই সন্দেহ। একদিকে চলেন ভারতসচিব ও ক্রিপস্; অন্যদিকে, ওয়াভেল ও অ্যালেকজাণ্ডার। বলা বাহুল্য, প্রথম দল সাধারণত নেন কংগ্রেস পক্ষ, দ্বিতীয় দল—লীগের। ওয়াভেল এমন কংগ্রেসবিরোধী ছিলেন যে ২৯ মার্চ মিশনকে লেখেন, কংগ্রেস আন্দোলনের ভয় দেখিয়ে তাদের অযৌক্তিক দাবি আদায়ের চেষ্টা করবে। তখন, "We have one high trump in our hand—the Big Stick. We can in the last resort make things practically impossible for India by various kinds of sanctions, of which the principal would be a blockade." তিনি পেট্রোল, কেরোসিনের সরবরাহ বন্ধ করে দেবেন। কোনো ব্রিটিশ সম্পদ বা প্রাণ বিনষ্ট হলে স্টারলিং ব্যালান্স কেটে নেবেন। ১৯৪৬-এর মার্চের শেষে এই ছিল ওয়াভেলের প্রস্তাব।[১১৯]

॥ ৫ ॥

ক্যাবিনেট মিশন ভারত রওনা হবার আগে ব্রিটেনের প্রতিরক্ষা দফতর থেকে যত পরামর্শ এসেছিল, সবই ভারত ভাগের (অর্থাৎ স্বতন্ত্র পাকিস্তান-এর) বিরুদ্ধে। অন্য দিকে মিসেস উইণ্ট (ফ্রেডা মার্টিন) ও পেণ্ডেরেল মুন ভারতীয় পরিস্থিতি সরজমিনে বিচার করে পরামর্শ দিয়েছিলেন, ভারতকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে হলে মুসলিমদের একটা স্বতন্ত্র সর্বভৌম রাষ্ট্র দিতে হবে, যা অবশিষ্ট ভাবতের সঙ্গে স্বেচ্ছায় সহযোগিতা করবে, কিন্তু পঞ্জাব ও বাংলা থেকে হিন্দু জেলাগুলিকেও আলাদা করে দিতে হবে। মুন স্পষ্টই বলেন—ঐক্যের স্বপক্ষে বিপক্ষে তর্ক চালিয়ে লাভ হবে না—"it is no use crying for the moon." পাকিস্তান দাবি না মানলে জিন্না কোন সংস্কার বিষয়ক সমঝোতায় আসবেন না, মানলে হয়তো বা হিন্দুস্তানের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। "The concession of Pakistan in name would be the means of approximating most nearly to a united

India in fact." ওয়াভেলের ২৭ ডিসেম্বরের 'Breakdown Plan'-এর কথা আগেই বলা হয়েছে। সেখানেও মুসলিমদের স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হয়েছিল, যদি অমুসলিম জেলাগুলির স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হয়। এই খণ্ডিত পাকিস্তানকে পরে 'পোকায় কাটা পাকিস্তান' বলা হয়েছে। ১৯৪৪-এর গ্রীষ্মকালে এ ধবনের পাকিস্তানে রাজাজি ও গান্ধী সম্মত হয়েছিলেন।

কিন্তু ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা দফতর প্রশ্ন তুললেন—ভাবতের পশ্চিম ও পূর্ব সীমান্তে এই বিভক্ত, দরিদ্র ও দুর্বল পাকিস্তান হলে ব্রিটেনের কি সুবিধা হবে? শ্রেষ্ঠ সমাধান হল ঐক্যবদ্ধ ভারতের স্বাধীনতা। তা সম্ভব না হলে খণ্ডিত পাকিস্তানই ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু পাকিস্তান খণ্ডিত হলে ঐ অঞ্চলের স্থায়িত্ব বক্ষার্থ ব্রিটেনের সামরিক দাযিত্ব থেকেই গেল। সাম্রাজ্য ছেড়ে দেব বললেই বর্তমান বিশ্ব-পরিস্থিতিতে তা পাবা যায় না এ কথা হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলেন প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী ক্লেমেন্ট অ্যাটলি। ক্যাবিনেট মিশনকে ব্রিটেনের সেনাপতিবর্গ জানালেন, ভারত ভাগ হোক না হোক, হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান কমনওয়েলথে আসুক না আসুক, আসল সমস্যা—

"there should co-ordinated machinery for defence of geographical India', and that there should be a single common defence authority with whom H.M.G. could deal."[১২০]

ক্যাবিনেট মিশনকে তাই দুই পরস্পববিরোধী সমাধানেব সমন্বয় খুঁজতে হল—(১) সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান, (২) সাম্রাজ্যের (তথা প্রতিরক্ষার) সমস্যার সমাধান। তা আবার উভয় পক্ষই যেন অবাধ আলোচনার ফলে মেনে নেয়। প্রথমটা না হলে সুয়েজ থেকে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ব্রিটিশ স্বার্থ বজায় রেখে অপসবণ সম্ভব নয়।[১২১] তা ছাড়া অ্যাটলি সরকার এই নিয়ে পার্লামেণ্টে বিরোধী পক্ষের সমালোচনা চাইছিলেন না। তাঁরা চার্চিল, লিনলিথগোদের মনোভাব ভালই জানতেন। নির্বাচনে হারলেও চার্চিল কি অসীম জনপ্রিয় কারুর অজানা ছিল না।

উল্লিখিত কারণে ক্যাবিনেট মিশন প্রথমেই পাকিস্তান প্রস্তাবের ওপর জোর না দিয়ে ঐক্যের ওপর জোর দিয়েছিল। একে বলা হয় Plan Union. অনেক লাটই পাকিস্তান-বিরোধী ছিলেন। গ্ল্যান্সি, ওয়াইলি ও কেসির কথা আগেই বলেছি। কেসির স্থলাভিষিক্ত বারোজ প্রস্তাব দেন—হিন্দু, মুসলিম ও রাজন্যবর্গের জন্য তিনটি পৃথক যুক্তরাষ্ট্র, প্রত্যেকটির জন্য আলাদা সংবিধান এবং শেষে সকলের ওপর এক Super Constituent Assembly যা প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ ও অন্য ব্যাপারে দেখাশোনা করবে। আসামের লাট আর্চবোল্ড ক্লো (Clow) বলেন, ব্রিটেনের শ্রেষ্ঠ অবদান—ভারতের সংহতি এবং "We must throw all our weight on the side of unity." ইউ. পি-র ওয়াইলি বলেন—দেশভাগের প্রস্তাব মেনে নিলে রাজনৈতিক সততার অপলাপ হবে। "There was no such thing as an unqualified right of self-determination.[১২২]

মিশনের সঙ্গে কি ভাবে আলোচনা চালাতে হবে সে বিষয়ে নেহরু একটা খসড়া আগেই তৈরি করেছিলেন। প্যাটেল সে খসড়া আজাদকে পাঠিয়ে দেন।[১২৩] তদনুসারে (১) অন্তর্বর্তী কেন্দ্রীয় সরকারকে ক্যাবিনেটের মর্যাদা দিতে হবে। (২) সঙ্গে সঙ্গে বসবে গণপরিষদ যা হবে সার্বভৌম। (৩) সেই পরিষদ তৈরি হবে প্রাদেশিক বিধান সভার সদস্য থেকে। তা আপন কার্যপদ্ধতি স্থির করবে ও ভারতের জন্য সংবিধান রচনা করবে। (৪) সংবিধানে থাকবে কেন্দ্রীয় বিষয়ের দুটি তালিকা—যার একটি আবশ্যিক, অন্যটি ঐচ্ছিক।

(৫) তারপর পাকিস্তান প্রশ্ন নিয়ে বিচার হবে। হয় সর্বদলের সম্মতিতে না হয় বিভিন্ন এলাকার সব সম্প্রদায়ের মত নিয়ে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হবে। (৬) রাজন্যবর্গ ঐ গণপরিষদে যোগ দিতে পারেন কিন্তু তাঁদের সম্বন্ধে ব্রিটিশ প্রাধান্যসূচক অধিকার (paramountcy) কেন্দ্রীয় সরকারে বর্তাবে। নেহেরুর ধারণা ছিল—সীমান্ত, সিন্ধু, পশ্চিম পঞ্জাব ও পূর্ব বাংলায় কর্তৃত্ব পেলে মুসলমানরা সন্তুষ্ট হবে, দেশভাগ চাইবে না।

আজাদ দাবি করেছেন—এই দ্বিতীয় বা ঐচ্ছিক তালিকা তাঁরই মস্তিষ্ক-প্রসূত। তিনি চেয়েছিলেন কোনো কোনো প্রদেশ এই optional list-এর সব বা আংশিক নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রকে ছেড়ে দিতে পারে, কোনো কোনো প্রদেশ রেখে দিতেও পারে। আবশ্যিক তালিকায় তিনি রেখেছিলেন—প্রতিরক্ষা, বিদেশ ও যোগাযোগ দফতর। প্যাটেল নাকি এর সঙ্গে যোগ করতে চেয়েছিলেন—মুদ্রা ও অর্থনীতি, শিল্প ও বাণিজ্য। আজাদের আশা ছিল—মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় সব ঐচ্ছিক বিষয়গুলি রাখতে পারলেই সন্তুষ্ট হবে। কেন্দ্রীয় ঐক্য ও প্রাদেশিক স্বনিয়ন্ত্রণের এমন সমন্বয় আর হয় না। ৩ এপ্রিল ক্যাবিনেট মিশনের সামনে এই প্রস্তাব তিনি দাখিল করেন। সঙ্গে সঙ্গে দাবি করেন প্রাদেশিক মনোয়নের ভিত্তিতে স্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার যা হবে সার্বভৌম গণপরিষদেরই প্রতিফলন। সব প্রদেশ ও রাজ্য শাসনতন্ত্র রচনার জন্য একত্র হবে। যদি কোনো সুনির্দিষ্ট অঞ্চল শাসনতন্ত্র তৈরি হবার পর তার আওতায় আসতে না চায় তার ওপর জোর করা হবে না। অর্থাৎ পঞ্জাব ও বাংলার অমুসলিম অঞ্চলগুলিকে স্বনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিতে হবে। বলা বাহুল্য, এটা প্রাদেশিক ভিত্তিতে দেশভাগের প্রস্তাব নয়।[১২৪]

সরকারী সাক্ষাৎকারের আগে ১ এপ্রিল গান্ধী জানিয়েছিলেন—সদিচ্ছার প্রমাণস্বরূপ (১) সব বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে, (২) লবণ কর প্রত্যাহার করে নিতে হবে, (৩) আম্বেদকরকে পদত্যাগ করতে হবে। তাঁর নিজস্ব মত রাজাজী-ফর্ম্যুলায় সীমাবদ্ধ ছিল। তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার চেয়েছিলেন—তা জিন্না গঠন করলেও আপত্তি নেই।[১২৫] ভারত সচিবের আলাদা করে গান্ধীর সঙ্গে দেখা করায় বেশ চটেছিলেন ওয়াভেল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন বন্দীমুক্তির ব্যাপারে গান্ধী জয়প্রকাশের মুক্তির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। অন্যান্য দাবি তাঁর মনে হয়েছে "impertinent". ৩ এপ্রিল যখন এই "malevolent old politician" (গান্ধী) সরকারী ভাবে আলোচনা করতে এলেন তখন আবার উঠল লবণ করের কথা, জিন্নার সঙ্গে রাজাজী-ফর্ম্যুলা নিয়ে আলোচনা ভেঙে যাওয়ার কথা। জিন্নার সঙ্গে চিঠিপত্রে এই ফর্ম্যুলা তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি আবার বললেন, জিন্নাই অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করুন।[১২৫] ওয়াভেলের মতে গান্ধী অতি ঝানু রাজনীতিক, আদৌ সাধুসন্ত নন। তিনি এ প্রস্তাব দেন, কারণ জানতেন কেন্দ্রীয় আইন সভায় হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত।

গান্ধীর মতই জিন্নার মনোভাব আগেভাগে জানার চেষ্টা হয়েছিল। ক্রিপস্ নিজে জিন্নার সঙ্গে দেখা করেন ৩০ মার্চ। জিন্না পাকিস্তান দাবিতে অনড় ছিলেন, তবে তার সীমা কি হবে তা নিয়ে গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা করতে বা সালিশী মানতে রাজি। ২ এপ্রিল জিন্নার 'আপনজন' ইস্পাহানি ও মাহ্‌মুদাবাদের রাজাকে নানা প্রশ্ন করেন ক্রিপস্—বিশেষ করে কেন্দ্রীয় বিষয় তালিকাভুক্ত প্রতিরক্ষা নিয়ে। ৪ এপ্রিল সরকারী সাক্ষাৎকারে জিন্না বলেন : (১) পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হবে এমন কোন ব্যবস্থা তিনি মেনে নেবেন না, আর (২) পাকিস্তান বলতে তিনি বোঝেন—"a nucleus of Muslim territory surrounded by sufficient additional territory to make it

economically viable."[১২৬] প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ নিয়ে সার্বভৌম হিন্দুস্তান ও সার্বভৌম পাকিস্তানের মধ্যে চুক্তি হতে পারে। তবে পাকিস্তানেব সীমানা নির্ধারণে কোন অঞ্চলের লোক গণনা চলবে না। একটা উদাহরণ দিয়েছিলেন তিনি, যা আমাদের মনে রাখা উচিত। বলেছিলেন, পূর্বে পাকিস্তানেব মধ্যে কলকাতা থাকতেই হবে কারণ কলকাতা বাদ দিতে বলা হল "like asking man to live without his heart." পরবর্তীকালে এই কলকাতা নিয়ে তিনি এবং (তাঁবই বকলমায ?) সুবাবর্দি মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে কি ঝোলাঝুলি কববেন!

শিখদের পক্ষ থেকে তাবা সিং বলেন, তাঁবা অখণ্ড ভাবত চান, আব যদি ভাবতভাগই হয় তবে তাঁরা নিজেদের জন্য চাইবেন স্বতন্ত্র বাষ্ট্র। শিখ বাষ্ট্রেব অধিকাব থাকবে হিন্দুস্তান বা পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্তবাষ্ট্র গঠন কববার। জ্ঞানী কর্তার সিং বলেন, শিখপ্রধান অঞ্চল বলতে তিনি বোঝেন—জলন্ধর ও লাহোর বিভাগ, আম্বালা বিভাগেব হিসাব, কর্ণাল, আম্বালা ও সিমলা জেলা এবং মণ্টগোমারি ও লিযালপুর জেলা। ক্রিপস্ বলদেব সিংকে প্রশ্ন কবেন, 'খালিস্তান' বলতে তিনি কি বোঝেন ? উত্তব এল—"মুলতান ও বাওলপিণ্ডি বিভাগ ছাড়া বাকি পঞ্জাব, যার সীমা হবে চন্দ্রভাগা।" কিন্তু বলদেব অখণ্ড ভাবতই চান, কারণ ভাবত ভাগ হলে সীমান্ত বিপন্ন হবে।

আশ্চর্য ব্যাপার—আম্বেদকর গণপরিষদ চাননি কারণ তাতে বর্ণহিন্দুর আধিপত্য সুনিশ্চিত হবে। জগজীবন রাম, রাধানাথ দাশ ও পৃথ্বীসিং আজাদ (পুরোনো বিপ্লবী ও All India Depressed Classes League-এর প্রতিনিধি) অখণ্ড ভারত এবং একটি গণপরিষদ চান।

হিন্দু মহাসভা তো অখণ্ড ভারত চাইবেই—তারা তদুপরি করে হিন্দু-মুসলিম সমতা (parity)-র বিরোধিতা। উদারপন্থী সাপ্রু ও জয়াকর বলেন, মুসলিম প্রদেশগুলিকে পূর্ণ স্বাযত্তশাসন দিলেও শক্তিশালী কেন্দ্রের প্রয়োজন ভুললে চলবে না। বর্তমান নির্বাচনে পাকিস্তানের দাবিও প্রমাণিত হয়নি। শুধু প্রমাণিত হয়েছে যে হিন্দু ও মুসলমান ভারতের দুই প্রধান সম্প্রদায়। প্রাদেশিক সীমানার পুনর্বিন্যাসে সাপ্রুর আপত্তি ছিল না। কম্যুনিস্টবা অধিকারী থিসিস অনুযায়ী পাকিস্তান মেনে নিতে রাজি ছিলেন।[১২৭]

আপন হাত শক্ত করতে বিভিন্ন প্রাদেশিক আইন সভার লীগ সদস্যদের সভা ডাকলেন জিন্না—১০ এপ্রিল। সুরাবর্দি প্রস্তাব আনলেন, সার্বভৌম পাকিস্তান চাই। তাতে থাকবে বাংলা, আসাম, পঞ্জাব, সীমান্ত, সিন্ধু ও বালুচিস্থান। দুটি গণপরিষদ গঠন করতে হবে ; দুটি আলাদা সংবিধান রচিত হবে ; সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষা করতে হবে। তবেই মুসলিমরা অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দেবার কথা ভাববে।[১২৮] বেশ বোঝা যায়—লীগ চাইছে যে কেন্দ্রীয় সরকার হবে দুটি সার্বভৌম সরকারের agent বা নায়েব মাত্র। সুরাবর্দি জিন্নার প্রিয়পাত্র হবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন। ৮ এপ্রিল তাঁর সঙ্গে মিশনের যে আলাপ হয় ওয়াভেল তাকে "a hymn of hate against the Hindus"আখ্যা দিয়েছেন। এ হেন ব্যক্তির সঙ্গে স্বাধীন বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন শরৎ বসু!

১০ এপ্রিলের মধ্যে যত আলোচনা হল তাতে দেখা গেল—কংগ্রেস চাইছে কেন্দ্র নিয়ে সংবিধান রচনা শুরু হোক এবং তার আয়ত্তাধীন বিষয় থেকে কিছু ঐচ্ছিক বিষয় বাদ দেওয়া যেতে পারে। প্রধান সেনাবাহিনী থাকবে কেন্দ্রের হাতে। অর্থাৎ শক্তিশালী য়ুনিয়ন। শরৎ বসুও তা সমর্থন করেন। অন্য দিকে লীগ চাইছে—প্রথমে কেন্দ্রকে ভেঙে দুই স্বতন্ত্র ভাগ করে পরে আবার জোড়া দিতে। আর সৈন্যবাহিনীও হবে দু'ভাগ। অবস্থা

বুঝে ক্রিপস্ মিশন ও ওয়াভেলের সঙ্গে আলোচনার জন্য দুটো বিকল্প প্রস্তাব তৈরি করলেন। (ক) প্রথম প্রস্তাব তৈরি হয়েছিল আজাদের পরিকল্পনার সঙ্গে বারোজের পরামর্শ মিলিয়ে। সর্বভারতীয় যুনিয়নের তিনটি অংশ থাকবে : (১) হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহ, (২) মুসলিম সংখ্যাগবিষ্ঠ প্রদেশসমূহ ও (৩) দেশীয় রাষ্ট্রসমূহ। এরা প্রতিরক্ষা, বিদেশনীতি ও যোগাযোগের ব্যাপারে একত্র হবে। এই তিনটি অংশের প্রত্যংশ (প্রদেশ)-গুলি কিছু ঐচ্ছিক বিষয়েব এক্তিয়ার যুনিয়ানকে দিতে পারে, কিছু ঐচ্ছিক বিষয় অংশগুলি (যাকে group-ও বলা যায)-কে দিতে পাবে আবার সব ঐচ্ছিক বিষয় নিজেরা রাখতে পারে। সংবিধান বচিত হবে দফায দফায। প্রথমে তারা তিনটি জোটে আলাদা আলাদা হয়ে প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র বচনা কববে এবং তাতেই ঐচ্ছিক বিষয়েব ভাগাভাগি ঠিক হবে। তারপব তিন জোট সমমর্যাদায একত্র হয়ে, একটা grand Constitutional Assembly তৈরি কবে, যুনিযান সবকাবেব শাসনতন্ত্র বচনা কববে। ক্রিপসের মতে এতে যুনিয়ানে হিন্দু গরিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত হবে না কারণ তিন অংশের প্রতিনিধি সংখ্যা হবে সমান। (খ) এর বিকল্প হবে পাকিস্তান ও দেশভাগ। পাকিস্তান গঠিত হবে সিন্ধু, বালুচিস্তান, সীমান্ত প্রদেশ এবং পঞ্জাব, বাংলা ও আসামের মুসলিম সংখ্যাগবিষ্ঠ এলাকা নিয়ে। এই প্রস্তাবের ভিত্তি দ্বিজাতিতত্ত্ব (two nation theory) বলে পুরো পঞ্জাব, বাংলা ও আসাম পাকিস্তানকে দেওয়া সম্ভব নয়, কলকাতা তো নয়ই। জিন্না দাবি করছেন পাকিস্তানকে 'economically viable' হতেই হবে। কিন্তু কি দ্বিজাতিতত্ত্ব, কি আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির সঙ্গে এ দাবি মেলে না।পাকিস্তান ও হিন্দুস্তান আলাদা হলে দেশীয় রাজ্যগুলি যে কোন একটিতে যোগ দিতে পারবে বা স্বাধীন থাকবে। দুই বিভক্ত দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও যোগাযোগ নিয়ে সন্ধি হবে বিভাগের পূর্ব শর্ত। কুড়ি বছরের জন্য তাদেব এক প্রতিরক্ষা মৈত্রী স্থাপন করতে হবে।[১২৯]

ইতিমধ্যে কিছু প্রশ্ন উঠেছিল, যেমন যুনিয়ান গঠিত হলেও পনেব বছর পর তিন অংশ আলাদা হতে পাবে এমন ব্যবস্থা থাকা উচিত, আসামেব সিলেট ছাড়া অন্য কোন জেলা পাকিস্তানে পড়বে না, জিন্না যদি পুরো পাকিস্তানও পান তবু তা বহিরাগত আক্রমণ প্রতিবোধে সক্ষম হবে না, হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান আলাদা বৈদেশিক নীতি নিলেও গোলমাল দেখা দেবে। বিলেত থেকে যে নির্দেশ নিয়ে মিশন এসেছে তাব মুখ্য উদ্দেশ্য ভারত ও মহাসাগবীয় অঞ্চলের নিবাপত্তা। কোন প্রস্তাবেই তাকে বিঘ্নিত হতে দেওযা যায় না। তাই ১১ এপ্রিল ক্রিপসের দুই বিকল্প প্রস্তাব ক্যাবিনেটের বিবেচনার জন্য বিলেত পাঠিয়ে দেওয়া হল। ঠিক হল জিন্নাকে কংগ্রেসের সঙ্গে মিটমাট করে নেবাব জন্য আবাব চাপ দেওয়া হবে, কংগ্রেসকে বলা হবে দেশীয় রাজ্যেব দাযিত্ব তারা পাবে না এবং অন্তর্বর্তী সরকার তৈরি হবে বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী। তবে গান্ধীকে খুশি করাব জন্য জয়প্রকাশ, লোহিয়া ও আই এন এ কর্মীদেব মুক্তি দেওয়া হল।

ক্যাবিনেট জানাল—প্রথম প্রস্তাব (যুনিয়ান ও ঐক্য) অবশ্যই বেশি ভাল কিন্তু যদি কংগ্রেস-লীগ সমঝোতা কিছুতেই না হয় তবে অগত্যা দ্বিতীয় প্রস্তাব মেনে নিতে হবে। ১৩ এপ্রিল অ্যাটলি ব্রিটেনের সমর প্রধানদের মত পাঠালেন—"দেশভাগের চেয়ে দুর্বল সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ভাল কিন্তু ব্যাপক গৃহযুদ্ধের চেয়ে ভাল দেশভাগ।"[১৩০]

১৫ এপ্রিল ওয়াভেল ডায়েরিতে লিখছেন, "Congress has not abated one tittle of its 'democratic' clims as a majority, Jinnah has not conceded an acre of Pakistan."১৬ই জিন্না প্রথম প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন।

য়ুনিয়ানের আইন পরিষদ ও শাসন পরিষদ কিছুতেই তিনি মানবেন না। বিকল্প প্রস্তাব (পাকিস্তান ও দেশভাগ) শুনে বললেন, তিনি কোন কোন এলাকা ছেড়ে দিতে রাজি তা বলবেন না, তবে কলকাতা কখনই নয়। পেথিক-লরেন্স প্রশ্ন করেন, হিন্দু-অধ্যুষিত এলাকা নিযে জিন্নার লাভ কি? বাইরে হিন্দুস্তানের প্রতিকূলতার সঙ্গে ভেতরে হিন্দু শত্রুতা যুক্ত করা কি সমীচীন হবে?[১৩১] সে দিনকার ডায়েরিতে অ্যালেকজাণ্ডার লিখেছেন, "জিন্না এক ধরনের খেলা খেলছেন—প্রথমে বিরাট এক দাবি করা, তারপর দেখা বিপক্ষ সে দাবি পূরণে কতটা এগিয়ে আসে।"[১৩২] ওয়াভেল ডায়েরিতে লিখছেন, "obviously J's (Jinnah's) intention is to drive us into an award and to hope we shall remain in India to enforce it."[১৩৩] এতৎসত্ত্বেও ১৭ এপ্রিল ক্রিপস্ জিন্নার সঙ্গে আলাদা দেখা করেন। কোন লাভ হয়নি।

১৫ এপ্রিল আজাদ কাউকে না বলে মিশনের সঙ্গে লীগের ১৪ এপ্রিল কি কথা হল ক্রিপসের কাছে জানতে চান। তারপর এক বিবৃতিতে কংগ্রেসের প্রস্তাব তুলে ধরেন। তাঁর মতে পাকিস্তান-ভাবনা এক ধরনের ভয় থেকে জন্মেছে। কেন্দ্রে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে বলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের শাসনে হিন্দুরা খবরদারি করবে—এই হল ভয়। কংগ্রেস এই ভয় দূর করতে সব প্রদেশকে পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিতে চায়। কেন্দ্রীয় বিষয়তালিকা (যা হবে ন্যূনতম)-র বাইরে সব ক্ষমতাই দেওয়া হবে প্রদেশদের। যদি কোন প্রদেশ ইচ্ছে করে তবেই সে সব ক্ষমতার কিছু কেন্দ্রকে দিতে পারে। এর ফলে কি কেন্দ্র কি প্রদেশ স্বাধীনভাবে উন্নয়নের পথে এগোতে পারবে। "The Congress formula meets the fear of the Muslim majority areas to allay which the scheme of Pakistan was formed. On the other hand, it avoids the defects of the Pakistan scheme which would bring the Muslims where they are in a minority under a purely Hindu government." এর পরও মতপার্থক্য থাকতে পারে কিন্তু তা হবে অর্থনৈতিক, সাম্প্রদায়িক নয়। তা ছাড়া নয় কোটি মুসলিমকে হিন্দুরা অবজ্ঞা করবে তা হতে পারে না। করলেও, "they are strong enough to safeguard their own destiny."

১৭ এপ্রিল আজাদের সঙ্গে মিশনের আবার দেখা হল। ওয়াভেল একটা প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার কথা পাড়েন দেখা হওয়ার আগে। একে ত্রি-স্তর সূত্র বলা হয়েছে। (১) লীগ যদি য়ুনিয়ান কেন্দ্র (ন্যূনতম বিষয়ের ভিত্তিতে) মেনে নেয় তবে তার অধীনে থাকবে দুটো ফেডারেশন . (ক) একটায় থাকবে—সিন্ধু, বালুচিস্তান, সীমান্ত, পঞ্জাব, সিলেট-সহ বাংলা, (খ) অন্যটায়—হিন্দু প্রদেশসমূহ। (২) য়ুনিয়ানে দুটি ফেডারেশনেরই সমান প্রতিনিধিত্ব থাকবে। ওয়াভেল বলছেন—ভারত সচিব এ প্রস্তাব নিয়ে আজাদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেননি। আজাদ অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর জোর দেন। তাঁকে বলা হয় এই সরকার ১৯৩৫-এর আইনে চলবে, অর্থাৎ ক্যাবিনেট-ধর্মী হবে না। তা ছাড়া দেশীয় রাজ্যের ওপর ব্রিটিশ প্রভুত্ব (paramountcy)-ও বজায় থাকবে। ওয়াভেলের মতে পেথিক-লরেন্স উল্টো-পাল্টা কথা বলেন, এমন কি ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের কর্তৃত্ব ছাড়তেও রাজি হননি। আজাদের মনে হওয়া স্বাভাবিক এ বিষয়ে আলোচনার দরজা খোলা। ওয়াভেলেরও মনে হয়েছিল অন্তর্বর্তী সরকারের ব্যাপারে ক্রিপস্ কংগ্রেসকে আরো বেশি ক্ষমতা দিতে চান। ১৮ এপ্রিল নেহেরু ও আজাদ ত্রি-স্তর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ওয়ার্কিং কমিটিকে রাজি করাতে পারলেন না।

মোটের ওপর ১৯ এপ্রিলের অবস্থা ভালো ছিল না। আজাদ ছিলেন বিভ্রান্ত কিন্তু আশাবাদী ; জিন্না য়ুনিয়ানে সম্পূর্ণ নারাজ ; অন্তর্বর্তী সরকারের ব্যাপারে মিশনেব অর্ন্তদ্বন্দ্ব প্রকট। গান্ধী জিন্নার সঙ্গে কথা বলতে চান না, জিন্না আজাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ক্রিপসের দুই প্রস্তাবেব সঙ্গে যোগ হয়েছে ওয়াভেলের ত্রি-স্তর সূত্র। কংগ্রেস তাতে আপত্তি জানায় কারণ মধ্যবর্তী স্তর য়ুনিযানকে দুর্বল করবে। তা ছাড়া দেশীয় রাজ্য য়ুনিযানেব অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়া উচিত। তা না হলে ভারতেব সংহতি বজায থাকবে কি রূপে ? জিন্না বলেন, এ ব্যাপারে ব্রিটেনকেই রোয়েদাদ দিতে হবে। সে আবদার রাখা হযেছিল।

সব আলোচনা, প্রস্তাব, মতবিরোধ খুঁটিযে দেখতে মিশন কাশ্মীব গেল। স্থির হল ২৪ এপ্রিল থেকে আবাব কথাবার্তা শুরু হবে। জিন্না ও নেহরুর মধ্যে সাক্ষাৎ ঘটিয়ে সমঝোতাব একটা শেষ চেষ্টা করা হবে ২৫ এপ্রিল। যদি সমঝোতা না হয় তবে ব্রিটেন একটা অ্যাওয়ার্ড দেবে। ১৮ই ক্রিপস্ তাব একটা খসড়াও ছকে ফেললেন।[১৩৫] এই খসড়ায় পাকিস্তান প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়েছিল। লীগ নিজেই বলেছে—মুসলিম সংখ্যাগবিষ্ঠ অধ্যুষিত এলাকা 'viable' হবে না। ক্ষুদ্রতব কোন পাকিস্তানও লীগ নেবে না। কিন্তু "Every argument that can be used in favour of Pakistan can...equally be used in favour of the exclusion of these non-Muslim areas from Pakistan." উপবন্তু পাকিস্তান হলেও সাম্প্রদাযিক সমস্যার অবসান হবে না। ঐ পাকিস্তানে এত বিপুল সংখ্যক হিন্দু থাকবে ও তাব বাইরে এত মুসলমান, যে সমস্যার নিবসন হবে না। তাব চেয়ে ত্রি-স্তর ভাল। যেমন

সর্বভাবতীয় য়ুনিযান

হিন্দুস্তান　　পাকিস্তান　　বাজ্য(?)

প্রদেশ (ও বাজ্য ?)

সর্বোচ্চ স্তব (য়ুনিয়ান)-এর হাতে থাকবে (১) প্রতিবক্ষা, (২) বৈদেশিক নীতি, (৩) যোগাযোগ, (৪) সংখ্যালঘু সমস্যা, (৫) অন্যান্য বিষয যা প্রাথমিক (প্রদেশ) স্তব ও মধ্যবর্তী (হিন্দুস্তান, পাকিস্তান) স্তব ছাডতে চাইবে। মধ্যবর্তী স্তবেব হাতে বইবে সে সব বিষয়ে যা প্রাথমিক স্তর ছাড়তে রাজি হবে। আর বাদবাকী সব বিষয় থাকবে প্রাথমিক স্তরের হাতে। বলা বাহুল্য, আজাদের ১৫ই এপ্রিলেব প্রস্তাব অনেকটা এইরকম ছিল। তফাত ছিল এইখানে—(১) হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের অভ্যন্তবীণ শান্তিরক্ষার্থ আলাদা বাহিনী থাকবে ; (২) সর্বভারতীয় সরকারে হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের সদস্য সংখ্যা হবে সমান ; (৩) লীগ ও কংগ্রেস পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানেব সংবিধান রচনা কববে ; (৪) পরে উভয়ে সমভাবে য়ুনিয়ান সংবিধান রচনা করবে ; (৫) সর্ব শেষে পূর্ণ সার্বভৌম এক গণপরিষদ সে সব সংবিধান অনুমোদন করবে। তার চেয়েও বিপজ্জনক ইঙ্গিত রইল জিন্না দশ পনের বছর পরে এমন য়ুনিয়ান ত্যাগ করতে পারবেন। বলা বাহুল্য, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ১৯ এপ্রিলই এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। আর জিন্না প্রথম থেকেই এর প্রতি আকৃষ্ট হলেন। পরবর্তী সব আলাপ আলোচনায় ক্রিপসের এই ত্রিস্তরীয় খসড়া হ্যামলেটের পিতার প্রেতাত্মার মত আবির্ভূত হবে বাবংবার।

কাশ্মীব যাবার আগে জনৈক তরুণ লীগ নেতা (নবাব এম· এ· গুরমানি) এক প্রস্তাব আনলেন ক্রিপসের কাছে। শ্রীনগরে সহকর্মীদের তা দেখালেন ক্রিপস্ এবং ওয়াভেলকে তার মর্মও জানানো হল। মোটামুটি তা ক্ষুদ্র পাকিস্তান মেনে নেয। এ নিযে কথা এগোযনি, কারণ জিন্না ২৪ এপ্রিল বললেন, তা লীগ ওয়ার্কিং কমিটিকে দেখাতে হবে। তাও কংগ্রেস

গ্রহণ কবলে। পরের দিন ক্রিপস জানালেন নেহরু তা পত্রপাঠ প্রত্যাখ্যান কবেছেন। নেহরু বলেছেন, সংবিধান রচনার পূর্বে পাকিস্তান মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। তাহলে মুসলিম প্রদেশগুলিকে বুঝিয়ে রাজি কববার সুযোগ পাবে না কংগ্রেস। পাঠকগণের নিশ্চয়ই মনে আছে ১৯৪৪-এ জিন্নার সঙ্গে আলোচনাব সময গান্ধী ঠিক এই কথা বলেছিলেন—আগে সংবিধান রচনা, পরে পাকিস্তান ব্যাপারে কর্তব্য নির্ধারণ। মিশন ভারতে পদার্পণ করার আগে নেহরুও তার প্রতিধ্বনি করেছিলেন। ২৫ এপ্রিল দেখা গেল কোন পক্ষই আপন কোট ছাড়তে রাজি নয়। ওয়াভেল বললেন, এবার সরকারের 'হুকম্' (award) দেবার সময় এসেছে। ঐ দিন সন্ধ্যায় জিন্না ক্রিপস্‌কে জানালেন, ক্ষুদ্র পাকিস্তান তিনি মেনে নেবেন না, তবে ত্রি-স্তর ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিবেচনা করতে বাজি।

গান্ধীর সঙ্গে পরামর্শ করার আগেই ২৬ এপ্রিল আজাদ নিজের দায়িত্বে এই ব্যবস্থার প্রতি আগ্রহ দেখালেন। তিনি বললেন, "he could get the Working Committee to agree to a single Federation which would be broken down in to two parts legislating separately for optional subjects."[১৩৭] তিনি আরও বললেন, জিন্নাকে কংগ্রেসের সম্মতি জানানো যেতে পারে এবং কংগ্রেস ও লীগের চাবজন করে প্রতিনিধি সিমলায় এ প্রস্তাব নিয়ে আলোচনায় বসতে পারেন। জিন্না শুনে বললেন, লিখিতভাবে প্রস্তাব দিলে তিনি তাঁব ওয়ার্কিং কমিটিকে জানাবেন। আশ্চর্য ব্যাপার—আজাদ তাঁর আত্মজীবনীতে ঘটনাটা বেমালুম চেপে গিয়েছেন।

গান্ধী ইতিমধ্যে আজাদেব গোপন কথাবার্তাব ব্যাপাবটা জানতে পেরে খুব বিবক্ত হযেছিলেন। তাঁব প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে সুধীব ঘোষেব Gandhi's Emissary, প্যারেলালের Mahatma Gandhi: The Last Phase (১ খণ্ড ১ অংশ), ওযাভেল ও অ্যালেকজাণ্ডাবেব ডায়েরি উল্লেখযোগ্য।[১৩৯] তাঁকে না জানিয়ে, তাঁর ও ওযার্কিং কমিটির মাথার ওপব দিযে আজাদ কিনা পবিত্যক্ত ত্রি-স্তর ব্যবস্থাব সম্মতি জানাচ্ছেন! ভীত আজাদ সিমলায় নিমন্ত্রণের চিঠির উত্তবে তাঁব প্রস্তাব কিছু পবিবর্তন করতে চাইলেন। (১) কংগ্রেস হিন্দু ও মুসলিম জোটে ভাবতের প্রদেশ ভাগ মেনে নেবে না, যুনিয়ানকে দুই অধস্তন ফেডাবেশন দ্বাবা দুর্বল হতেও দেবে না, যদিও কোনও কোনও প্রদেশ যদি ঐচ্ছিক বিষয কেন্দ্রকে দিতে চায সে ব্যবস্থা মেনে নেবে, (২) প্রদেশসমূহকে কোনমতেই 'সার্বভৌম' আখ্যা দেওযা চলবে না।[১৪০] আজাদকে বলা হল—জিন্নাব কাছে নিমন্ত্রণ চলে গিযেছে, তাই প্রস্তাব বদলানো সম্ভব নয়। কিন্তু সিমলা আলোচনাব পূর্বে কংগ্রেসকে সম্মতি দিতেও তো বলা হচ্ছে না। আজাদ তাঁর সরকাবী চিঠিতে প্রদেশসমূহের আবশ্যিক জোট বাঁধাই শুধু অগ্রাহ্য করেননি, দুটো অধস্তন ফেডাবেশনেব ধাবণাও বাতিল কবে দিলেন।[১৪১] অ্যালেকজাণ্ডাব লক্ষ্য করেছেন জিন্নাও তাঁর প্রাথমিক অবস্থায অনড।[১৪২] বড়লাট মন্তব্য করেছেন, সিমলা বৈঠকের পূর্বে লীগ ও কংগ্রেসের অবস্থান "are still poles apart, and have both interpreted the basis quite differently."

সিমলা বৈঠকেব পূর্বে কংগ্রেসের দাবি ছিল—(১) এখুনি স্বাধীনতা দিতে হবে ও (২) গণপরিষদ হবে সার্বভৌম। আর লীগের দাবি ছিল—মুসলিম প্রদেশ নিয়ে গঠিত সার্বভৌম পাকিস্তান। তবু ক্রিপস্ আশা করছিলেন সিমলার শীতে সকলে ঠাণ্ডা মাথায বিকল্প প্রস্তাবগুলি বিবেচনা করবে। গান্ধীর যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না। আজাদেব ব্যবহারে ব্যথিত হয়ে তিনি ক্রিপসকে লিখেছিলেন, "You do not understand how uneasy I

feel. Something is wrong..." তবু এসেছিলেন তিনি মিশনের সনির্বন্ধ অনুরোধে। তাঁর ভূমিকা ছিল রঙ্গমঞ্চের বাইরে—পরামর্শদাতাব। কংগ্রেস পক্ষে আলোচনা করছিলেন নেহরু, প্যাটেল, আবদুল গফ্ফব খান ও আজাদ ; লীগ পক্ষে—জিন্না, লিয়াকৎ, ইসমাইল খান, আবদুররব নিস্তার। বৈঠক আরম্ভ হয় ৫ মে—চলে প্রায় সপ্তাহ খানেক।

প্রথমেই য়ুনিয়নের হাতে কি দফতর থাকবে তাই নিয়ে বিরোধ বাধে। আজাদ বলেন, কেন্দ্রের হাতে তহবিল আসবে কোথা থেকে ? কর বসাবার ক্ষমতা চাই। জিন্না উত্তর দেন—কেন্দ্র তো দুটি ফেডারেশনের নায়েব মাত্র, তাকে টাকা যোগাবে কর্তারা। অনেক কষ্টে য়ুনিয়ান আইন পরিষদেও তিনি রাজি হন কিন্তু দাবি করেন এতে হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানেব সমসংখ্যক প্রতিনিধি থাকবে। ৬ মে আজাদ ভারত সচিবকে লেখেন, এখুনি স্বাধীনতা দিতে হবে—অর্থাৎ গণপরিষদ গঠনের পূর্বে তৈরি করতে হবে স্বাধীন ভারতের সরকার। তা ছাড়া কোনো জোটের আইন ও শাসন পরিষদ থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। য়ুনিয়ান আইন পরিষদে দুই জোটের সমতাই বা কি করে মানা যায় ?[১৪৩] নেহরু আজাদের প্রতিধ্বনি করে জিন্নাকে অনুরোধ করেন গণপরিষদে যোগ দিতে। কংগ্রেস সংখ্যালঘুদের স্বার্থ নিশ্চয়ই রক্ষা করবে। তা ছাড়া যদি কিছু প্রদেশ সর্বভারতীয় ফেডাবেশনে না থাকতে চায়, জোর করে তাদের ধরে রাখা হবে না। জিন্নার উত্তর—যদি দুই জোটকে আইন ও শাসন পরিষদ দেওয়া হয় তবেই তিনি য়ুনিয়ান গ্রহণ করবেন। নেহরু বলেন জোট বাঁধা না বাঁধা তো প্রদেশের ইচ্ছা। জোর করে তো জোট চাপানো যায় না।

গণপরিষদ নিয়ে আলোচনায় নেহরুর মতে একটা সর্বভারতীয় গণপবিষদ প্রথমে য়ুনিয়ানের শাসনতন্ত্র রচনা করবে। জিন্না বললেন, না—প্রথমে বসবে দুই জোটের দুই গণপবিষদ। তারা রচনা করবে জোট ও জোটের অন্তর্ভুক্ত প্রদেশসমূহের সংবিধান। পরে তারা একত্র হয়ে য়ুনিয়ানের সংবিধান রচনা করবে। তবে প্রথমে তারা মিলিত হয়ে কার্যপদ্ধতি ও বিচার্য তালিকা তৈরি করতে পারে। তিনি আরও বলে বসেন, য়ুনিয়ান প্রথম খেপে পাঁচ বছরের বেশি স্থায়ী হবে না। তৎক্ষণাৎ প্যাটেলের মন্তব্য—"There we have it now, what he has been after all the time."[১৪৪] অর্থাৎ জিন্না প্রসন্নমনে য়ুনিয়ান মেনে নিচ্ছেন না, অল্প কিছু দিন পরে ভেঙে বেরিয়ে যাবেন বলে কৌশল হিসেবে আপাতত মেনে নিচ্ছেন। প্যাটেলের মনে আগে থেকে যে সন্দেহ ছিল তা দৃঢ় হল। সমঝোতার পক্ষে এটা শুভ নয়।

৬ই মে সন্ধ্যায় গান্ধীর সঙ্গে মিশনের দেখা হল। গান্ধী বললেন, জোট বাঁধার পরিকল্পনা—"Worse than Pakistan."[১৪৫] হয় কংগ্রেস না হয় লীগ কারুব মত বেছে নিতে হবে—"There was no half way house." গৃহযুদ্ধের ভয়ে তিনি আদৌ বিচলিত নন। ওয়াভেলের মনে হয় প্যাটেলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তিনি—যদি সরকার দৃঢ় থাকেন, মুসলিমরা লড়াই করবে না। ৭ই মে হোরেস অ্যালেকজাণ্ডার ও অ্যাগাথা হ্যারিসনের সঙ্গে তাঁর ৬ই মে-র আলোচনা বিষয়ে কথা হয়। গান্ধী হোরেসকে বলন—ব্রিটেনের রোয়েদাদের প্রশ্নই ওঠে না। অ্যাটলি তো সে সম্ভাবনা বাতিল করে দিয়েছেন। যে পক্ষের মত ন্যায়সঙ্গত মনে হবে তাকেই ক্ষমতা হস্তান্তর করা উচিত। প্যাটেল বলেন, মিশন বোধহয় জিন্নার সঙ্গে কোন সমঝোতায় এসেছে। মিশন বলতে চাইছে—"যদি গৃহযুদ্ধ এড়াতে চাও, আমাদের প্রস্তাব নাও।" এ তো লীগকে গোলমাল বাধাতে উৎসাহ জোগাবে।[১৪৫ক]

৭ মে ক্রিপস্ প্রস্তাবের কিছু রদবদল করে আবার গান্ধীর সঙ্গে দেখা করলেন, জিন্নার

সঙ্গে ওয়াভেল। ওয়াভেল ডায়েরিতে লিখছেন—জিন্না সন্দিগ্ধ হয়েছেন আর গান্ধী মোটেও রাজি হননি। "I am not at all persuaded that C. (Cripps) had led G. (Gandhi) up to the altar, I believe it is more likely that G. has led C. down the garden path."

পরিবর্তিত প্রস্তাবে য়ুনিয়ানকে কর বসানোব ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল এবং জোট, জোটের প্রাদেশিক সংবিধান রচনা, আইন ও শাসন পরিষদ গঠন সবই may' ক্রিয়া দ্বারা জোলো করে দেওয়া হয়েছিল। তবে য়ুনিয়ান আইন ও শাসন পরিষদে হিন্দু ও মুসলিম প্রদেশের সমান প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হয়েছিল (২৫০ কোটিব সঙ্গে ৩০ কোটির !) এবং সংবিধান দশ বছর পর পর পরিবর্তনের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল জিন্নাকে। এখন পর্যন্ত জোট বাঁধা আবশ্যিক নয়, ঐচ্ছিক। গণপরিষদের ব্যাপারে বলা হয়েছিল কার্যবিধি স্থির হবার পর তা তিনটি 'সেকশানে' বিভক্ত হবে—(১) হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ, (২) মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ও (৩) দেশীয় রাজ্যের জন্য। দুটি সাম্প্রদায়িক সেকশান আলাদা আলাদা অন্তর্ভুক্ত প্রাদেশিক সংবিধান রচনা করবে এবং 'ইচ্ছা করলে' জোটের সংবিধানও রচনা করবে। তারপর তিন সেকশান একত্র হয়ে য়ুনিয়ানের জন্য সংবিধান রচনা করবে। তখন প্রত্যেক সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন (issue) দুই সম্প্রদায়ের প্রত্যেকের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্ধারিত হবে। এখানে লক্ষণীয়—'সেকশান' ও 'গ্রুপ' দুই শব্দের সহাবস্থান এক অনাবশ্যক জট সৃষ্টি করল। ক্রিপস্ বড বেশি ওকালতি চাল চেলেছিলেন।

আশ্চর্য নয় যে ৮ মে প্যাটেল ওয়াভেলকে জানালেন—জোট ব্যাপাবটাই সংহতি নাশ করবে। তিনি নাকি এও বলেছিলেন যে হিন্দু ও মুসলমানে গৃহযুদ্ধ অনিবার্য এবং এখনই তা হয়ে যাক।[১৪৬] পরে গান্ধী ক্রিপস্‌কে লিখলেন, তাঁর সূত্রগুলি কংগ্রেস প্রতিনিধিদের পক্ষে বাধ্যতামূলক নয়। আর হিন্দু মুসলিম সমতা তো "worse than Pakistan."[১৪৭] ৯ মে আজাদ ক্রিপস্‌কে লিখলেন—জোটবাঁধা ও সমতার নীতি কংগ্রেস মানবে না। ক্রিপসের ধারণা আজাদ ও নেহরু মোটামুটি রাজি হলেও ওয়ার্কিং কমিটির অধিকাংশ বাজি হয়নি। অন্যদিকে জিন্না বললেন—য়ুনিয়ানে তিনি সম্মত কিন্তু মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহের জন্য আলাদা গণপরিষদ চাই। নেহরু ও জিন্নার মধ্যে বিতর্কিত বিষয় নিয়ে সালিশের কথা হল কিন্তু মতৈক্য হল না।[১৪৮] জিন্না কোন কংগ্রেসী মুসলিম (যেমন আজাদ ও আবদুল গফ্‌ফর খান)-এর সঙ্গে আলোচনায় বসতে রাজি হলেন না। ১১ মে নেহরু বললেন—হিন্দু, মুসলিম ও শিখ ছাড়া অন্য কোনো ভারতীয়কে, এমনকি আন্তর্জাতিক, সালিশী মানা যেতে পারে। অনড় জিন্না জানালেন—"...if the Congress would agree to Groups of Provinces as desired by the Muslim League, he would seriously consider a Union."[১৪৯] অতএব কংগ্রেস জোট বাঁধার ব্যাপারটা আগে না মেনে নিলে সালিশীর অর্থ হয় না। ক্রিপস্ যতই মিটমাটের চেষ্টা করলেন, ততই উভয় পক্ষ পুরাতন অবস্থানে ফিরে যেতে চাইল। জিন্না লিখলেন—ছটি মুসলিম প্রদেশকে এক জোট ধরতেই হবে এবং কেন্দ্রকে প্রদেয় তিনটি বিষয় ছাড়া সেই জোট আর সব বিষয় নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। তবে সংবিধান রচিত হবার পর এই জোট থেকে কোন প্রদেশ বেরিয়ে যেতে পারে, এতদূর তিনি যেতে রাজি আছেন।[১৫০] আজাদ লিখলেন—আগে তো গণপরিষদ সর্ব ভারতীয় সংবিধান রচনার জন্য বসুক, পরে প্রদেশরা ইচ্ছে করলে জোট বাঁধতে পারবে। এ বিষয়ে প্রদেশদের পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে। তাছাড়া আসামের তো জিন্না কথিত জোটে স্থান নেই এবং শেষ নির্বাচনের ভিত্তিতে সীমান্তও সে জোটে ভিড়বে

না।[১৫১] ১২ মে উভয়ে বললেন—যতদূর যাবার তাঁরা গেছেন। এ কথার পর কথা নেই। অতএব সিমলা বৈঠকের ওপর যবনিকা পড়ল। ওয়াভেল বললেন, এবার সরকারী 'হুকম্' দেবার সময় এসেছে।

এই 'হুকম্' বা 'অ্যাওয়ার্ডে'র জন্য আগে থেকেই মিশন খসড়া তৈরি করছিল। বিলেত থেকে অনুমোদন আসার পর, ১৬ মে সে 'অ্যাওয়ার্ড' ঘোষিত হল। এর মধ্যে বি এন রাউ ও ভি পি মেনন ক্রিপস্‌কে পরামর্শ দিয়েছিলেন, বাংলা ও আসামকে নিয়ে একটা তৃতীয় জোট তৈরি হলে কেউ বলতে পারবে না ভারতকে শুধু সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভাগ করা হচ্ছে। বাংলা শুধু পশ্চিমের মুসলিম প্রদেশগুলি থেকে বহুদূর নয়, ভাষার দিক থেকেও আলাদা। (বাংলাদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করে এই সত্যটা পাকিস্তানকে ১৯৭১ সালে বুঝিয়ে দেয়)। দ্বিতীয়ত, 'পাকিস্তান' কথাটা কোথাও উচ্চারিত হয়নি। তৃতীয়ত, সার্বভৌম' বিশেষণটাও চেপে যাওয়া হয়েছিল। চতুর্থত, জোট (group) বাঁধার ব্যাপারটাও ঐচ্ছিক রাখা হল। প্রদেশগুলি শুধু জোট সংবিধান রচনার জন্য সেকশানে ভাগ হবে স্থির হল। পঞ্চমত, সংবিধান রচনার প্রথম পর্যায়ে য়ুনিয়ান দিয়ে শুরু হবে স্থির হল এবং য়ুনিয়ানকে কর বসানর ক্ষমতাও দেওয়া হল। ষষ্ঠত, য়ুনিয়ান থেকে বেরিয়ে যাবাব ব্যবস্থাও থাকল না। তবে দশ বছর পর পর পুরো সংবিধান খতিয়ে দেখার কথা রইল। ক্যাবিনেট সম্মতি পাঠাল—শুধু দুটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত মুলতুবি রেখে—(১) কমনওয়েলথেব সঙ্গে সম্পর্ক, (২) ব্রিটেনের সঙ্গে সন্ধি।[১৫২] ওয়াভেল এর পেছনে চার্চিলের ভয় দেখতে পেলেন।

অন্তর্বর্তী সরকার নিয়ে জিন্নার সঙ্গে কথা হয়েছিল ১৩ মে। ওয়াভেল বললেন—বড়লাটকে বাদ দিয়ে ১২ জনের সরকার হবে—৫ জন কংগ্রেসী (১ জন তপসিলী সহ), ৫ জন লীগপন্থী, ১ জন শিখ ও ১ জন অন্য কোনও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নিয়ে। ওয়াভেল জানালেন সীমান্তের মত মুসলিম প্রদেশে কংগ্রেসী সরকার থাকায় কংগ্রেসকে মুসলিম সদস্য মনোনয়নে বাধা দেওয়া সমীচীন হবে না। জিন্না কোনো মন্তব্য করলেন না। প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিন্দু বা মুসলিম কবলে চলবে না—বডলাটের এই মন্তব্যের সঙ্গে একমত হলেন তিনি। তবে নিজের ভযও গোপন রাখলেন না। তাঁর ভয়—কংগ্রেস চাইছে সরকার দখল করে দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবস্থা বানচাল কবতে। য়ুনিয়ান সরকার দখল করলেই কংগ্রেস প্রাদেশিক সরকার নিয়ন্ত্রণ করতে চাইবে। অতএব দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় সন্তুষ্ট না হলে তিনি সরকারে যোগ দিতে রাজি নন।[১৫৩] জিন্নার এই ভয়ের কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। সরকার গঠনের ব্যাপারে ইতিমধ্যে পেথিক-লরেন্স নেহরুর সঙ্গে কথা বলেছেন এবং কংগ্রেস-লীগ সমতা ও বড়লাটের বিশেষ ক্ষমতার ব্যাপারে কংগ্রেসের মত প্রায় স্বীকার করে বসেছেন। ওয়াভেল ১৪ই মে নেহরুকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, তা হবে না। বলা বাহুল্য, এতে কংগ্রেসের খুশি হবার কথা নয়। আমার ব্যক্তিগত ধারণা—মিশন ও বড়লাট দুই বিপরীত দিকে টানাটানি করায় সমস্ত প্রস্তাব এক অস্বাভাবিক জটিল (clumsy) ও পরস্পরবিরোধী রূপ নেয়। পারস্পরিক সন্দেহ তাতে বাড়ে বই কমেনি।

॥ ৬ ॥

১৬ই মে-র ঘোষণা (যাকে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বলা হয়)-র পূর্ণ বয়ান পাওয়া যাবে মুন-সম্পাদিত ভাইসরয়জ জার্নালের দ্বিতীয় পরিশিষ্ট (পৃঃ ৪৭১-৮০)-এ এবং ম্যানসাবগেব Transfer of Power এর সপ্তম খণ্ডে (পৃঃ ৫৮২-৯১)।

প্রথমেই দেখান হল লীগ-কল্পিত পাকিস্তান পুরোটা দিলেও জনসংখ্যা বিচারে তা সাম্প্রদায়িক সমস্যা দূর করতে পারবে না।

সারণী-১

উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল	মুসলিম	অমুসলিম
পঞ্জাব	১৬,২১৭,২৪২	১২,২০১,৫৭৭
সীমান্ত	২,৭৮৮,৭৯৭	২৪৯,২৭০
সিন্ধু	৩,২০৮,৩২৫	১,৩২৬,৬৮৩
বালুচিস্তান	৪৩৮,৯৩০	৬২,৭০১
	২২,৬৫৩,২৯৪	১৩,৮৪০,২৩১
	৬২·০৭%	৩৭·৯৩%
উত্তর পূর্বাঞ্চল	মুসলিম	অমুসলিম
বাংলা	৩৩,০০৫,৪৩৪	২৭,৩০১,০৯১
আসাম	৩,৪৪২,৪৭৯	৬,৭৬২,২৫৪
	৩৬,৪৪৭,৯১৩	৩৪,০৬৩,৩৪৫
	৫১·৬৯%	৪৮·৩১%

এই দুই অঞ্চলের বাইরে ব্রিটিশ ভারতে থাকবে প্রায় ২ কোটি মুসলমান (১৮ কোটি ৮০ লক্ষের মধ্যে)। তাছাড়া বাংলা, আসাম ও পঞ্জাবের বহু স্থানে অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রকট। "Every argument that can be used in favour of Pakistan, can equally in our view be used in favour of the exclusion of the non-Muslim areas from Pakistan. This point would particularly affect the position of the Sikhs."

ক্ষুদ্রতর কিন্তু সার্বভৌম পাকিস্তান লীগ নিতে চাইছে না কারণ এতে (১) পঞ্জাব থেকে বাদ পড়বে সমগ্র আম্বালা ও জলন্ধর বিভাগ, (২) সিলেট ব্যতীত সমগ্র আসাম, (৩) কলকাতা সহ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ (কলকাতার জনসংখ্যার মাত্র ২৩·৬% মুসলিম)। ক্যাবিনেট মিশনও মনে করে বাংলা ও পঞ্জাব (যার জনগণ এক ভাষাভাষী)-এর খুব বড়ো একটা অংশের ইচ্ছা ও স্বার্থ এতে ব্যাহত হবে। পঞ্জাব ভাগে শিখ সম্প্রদায়ের ভাগ অনিবার্য এবং উভয় অংশেই বহুসংখ্যক শিখকে থাকতে হবে। সেটা ন্যায়সঙ্গত নয়।

এ ছাড়াও দেশভাগের বিরুদ্ধে অনেক শাসনতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক যুক্তি দেখান যায়। রেলওয়ে, ডাক ও তার বিভাগের কথা বাদ দিলেও প্রতিরক্ষার সংহতি

অত্যাবশ্যক। যে বৃহৎ পাকিস্তানের কথা বলা হচ্ছে তার দুই সীমান্তই ভারতের সবচেয়ে বেশি দুর্বল অঞ্চল—"for a successful defence in depth the area of Pakistan would be insufficient." আরও সমস্যা হবে দেশীয় বাজ্য নিযে। তারা কোন দিকে যাবে ? তদুপবি বোঝা উচিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের দুই অংশেব মধ্যে থাকবে সাত শ' মাইলের বিরাট ব্যবধান। হিন্দুস্তানের সহযোগিতা ছাড়া শান্তিকালে তা লঙ্ঘন করা যাবে না আব যুদ্ধেব সময় কি হবে তা ভাবাই যায় না। সব দিক দিয়ে বৃহৎ পাকিস্তান রাষ্ট্র হবে অস্বাভাবিক ও অবক্ষণীয়। অথচ মুসলিমদেব রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবন ঐক্যবদ্ধ ভাবতে বিপন্ন হবে সে আশঙ্কা তাদেব বযেছে।

এ সব কথা ভেবে মিশন প্রস্তাব কবছে .

(১) ব্রিটিশ ভাবত ও দেশীয় বাজ্য মিলে একটা 'ভারতীয় যুনিযান' গঠিত হবে যাব হাতে থাকবে বৈদেশিক নীতি, প্রতিরক্ষা ও যোগাযোগ এবং এ সব দফতরেব জন্য প্রযোজনীয় অর্থসংগ্রহেব অধিকাব তাব থাকবে।

(২) সেই য়ুনিযানের শাসন ও আইন পবিষদ ব্রিটিশ ভাবত ও দেশীয় বাজ্যেব প্রতিনিধি নিযে গঠিত হবে। যদি আইন পবিষদে কোনো মুখ্য সাম্প্রদাযিক ইস্যু ওঠে তবে দুই প্রধান সম্প্রদায়েব উপস্থিত প্রতিনিধিদের অধিক সংখ্যক ভোট এবং উপস্থিত সমস্ত প্রতিনিধিদেব অধিক সংখ্যক ভোট দ্বাবা তা নির্ধারিত হবে।

(৩) যুনিযনেব অধীন বিষয ছাড়া বাকী সব বিষয প্রদেশসমূহে বর্তাবে। বাজ্যেব ক্ষেত্রেও তাই।

(৪) প্রদেশগুলি ইচ্ছা কবলে জোট বাঁধতে পাবে। প্রতি জোটেব শাসন ও আইন পরিষদ থাকবে। প্রত্যেক জোট স্থিব কববে কোন কোন প্রাদেশিক বিষয তা যৌথভাবে গ্রহণ ব বতে ইচ্ছুক।

(৫) য়ুনিযান ও জোটেব সংবিধানে এমন ব্যবস্থা থাকবে যাতে প্রথম দশ বছর পব এবং পবে প্রতি দশ বছরে প্রদেশসমূহ তাদেব আইন পবিষদেব সংখ্যাগবিষ্ঠ ভোটে সংবিধানেব পুনর্বিবেচনা চাইতে পারবে।

এব পর দেওয়া হল সংবিধানরচনা পদ্ধতি। প্রথম প্রদেশগুলিকে তিনটি সেকশানে (Section) ভাগ কবা হবে। প্রত্যেক প্রদেশকে জনসংখ্যার ভিত্তিতে (১০ লাখে একজন) আসন দেওয়া হবে। প্রত্যেক সম্প্রদাযের জন্য নির্দিষ্ট আসন সেই সম্প্রদাযেব আইন পরিষদের সদস্যবা নির্বাচন করবে।

তাতে ছবিটা দাঁড়াবে এইরূপ—

সারণী-২

সেকশান 'এ'

প্রদেশ	সাধারণ	মুসলিম	
মাদ্রাজ	৪৫	৪	
বোম্বে	১৯	২	
ইউ· পি·	৪৭	৮	
বিহার	৩১	৫	
সি· পি·	১৬	১	
ওড়িশা	৯	০	
	১৬৭	২০ =	১৮৭

সেকশান 'বি'

প্রদেশ	সাধারণ	মুসলিম	শিখ
পঞ্জাব	৮	১৬	৪
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত	০	৩	০
সিন্ধু	১	৩	০
	৯	২২	৪=৩৫

সেকশান 'সি'

প্রদেশ	সাধারণ	মুসলিম	
বাংলা	২৭	৩৩	
আসাম	৭	৩	
	৩৪	৩৬ =	৭০
	ব্রিটিশ ভারত =		২৯২
	দেশীয় রাজ্য =		৯৩

সর্বমোট = ৩৮৫

এ ছাড়াও সেকশান 'এ'-তে দিল্লী, আজমের, মারওয়াড়া ও কুর্গ থেকে একজন করে এবং সেকশান 'বি'-তে বালুচিস্তানের একজন নেওয়া হবে।

সংবিধান রচনার পদ্ধতি বর্ণিত হল ১৯ ধারায়। ১৯ (IV) ধারা মতে প্রথমেই তিন সেকশানের এক সাধারণ সভায় কার্যপদ্ধতি স্থির হবে, সভাপতি নির্বাচিত হবেন, নাগরিক অধিকার, সংখ্যালঘু ইত্যাদি নিয়ে এক পরামর্শদাতা কমিটি গঠিত হবে। তারপর প্রাদেশিক প্রতিনিধিরা এ· বি· সি· তিন সেকশানে ভাগ হয়ে যাবেন। ১৯ (V) ধারা মতে এই সেকশানরা অন্তর্ভুক্ত প্রদেশসমূহের সংবিধান রচনা করবে এবং স্থির করবে প্রদেশসমূহের

জন্য কোন জোট সংবিধান (group constitution) রচনা করা হবে কিনা। যদি হয়, তবে কোন কোন প্রাদেশিক বিষয় জোটের আওতায় যাবে তা নির্ধারিত হবে এ সময়। অবশেষে ১৯(VI) ধারা মতে তিন সেকশান একত্র হয়ে য়ুনিযান সংবিধান বচনা কববে। ১৯ (VIII) ধারায় বলা হল কোন প্রদেশ যে জোটে পড়েছে সে জোট থেকে বেরিযে আসতে পারবে—তবে নতুন সংবিধানানুযায়ী প্রথম নির্বাচনের পর। আমরা দেখব—মিশন বলবে সেকশান আবশ্যিক, জোট ঐচ্ছিক ; লীগ বলবে—জোট আবশ্যিক ; আর কংগ্রেস বলবে জোট আদৌ আবশ্যিক নয়। সেকশান, গ্রুপ এই দুই শব্দ এবং ক্রিয়া ব্যবহারের ইচ্ছাকৃত শিথিলতার ফলে ১৫ মে-র ঘোষণা নানা ভুল বোঝাবুঝিব সৃষ্টি করবে। মিশনের bonafides-এ আমার সন্দেহ আছে।

যুনিয়ান গণপবিষদের সঙ্গে ব্রিটেনেরএক সন্ধি নিযে আলোচনা হবে—ক্ষমতা হস্তান্তবের জন্য তা প্রয়োজন। যতদিন সংবিধান রচনা চলবে ততদিন শাসন ভার নেবে এক অন্তর্বর্তী সবকাব। তাব ভিত্তি হবে প্রধান দলগুলিব সমর্থন। বড়লাট ছাড়া সব সদস্যই হবেন ভাবতীয। মধুব সঙ্গে হুল ছিল। ঘোষণাব শেষে বলা হল—গ্রহণ না করলে "The alternative would...be a grave danger of violence, chaos, and even civil war."

১৬ই মে ওযাভেল নেহরু ও আজাদেব সঙ্গে দেখা করেন। আজাদ নীবব, নেহরু চিন্তিত। স্বাধীনতাব ব্যাপাবে ঘোষণায় কিছু বলা হযনি, গণপরিষদেব সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ বযেছে, বাজারা গণপবিষদেব প্রতিনিধি মনোনযন কববেন কি যুক্তিতে—এ সব নানা প্রশ্ন তুললেন নেহরু। ওযাভেলেব মনে হল কংগ্রেসেব ইচ্ছা অন্তর্বর্তী সবকাবকে স্বাধীনভাবে চালনা কবা। "I warned him (Nehru) again that there could be no change in the present constitution till a new one was made."[১৫৪]

১৬ থেকে ১৮ই মে পবপব তিন দিন ক্রিপস ও পেথিক-লবেন্সেব সঙ্গে গান্ধীব দেখা হল। তাঁব ৮মে-র মন্তব্যেব পুনবাবৃত্তি করে গান্ধী বললেন—গণপবিষদ সার্বভৌম, ঘোষণায উল্লিখিত শর্ত পরিবর্তন ও বাতিল কবাব ক্ষমতা তাব আছে। ১৭ মে 'হবিজন' পত্রিকায় তিনি লিখলেন—এটি কোন রোযেদাদ নয়, সুপাবিশ মাত্র। গণপরিষদ একে বদলাতে পারে।[১৫৫] ঐদিন এক প্রেস সাক্ষাৎকাবে পেথিক-লবেন্স কিন্তু বললেন, সূত্রগুলি প্রত্যেক দলেব স্বতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে বদলানো যাবে। এককভাবে কোনো দল (অর্থাৎ কংগ্রেস) বদলাতে পাববে না।[১৫৬]

১৮ই মে গান্ধী ক্রিপস্‌কে প্রশ্ন করেন—গণপবিষদেব প্রথম সভায কংগ্রেসপ্রতিনিধিবা কার্যপদ্ধতি নিয়ে, বিশেষত তিন সেকশানে ভাগ নিযে, আপত্তি তুলতে পাবে কি না।[১৫৭] ক্রিপস্ বলেন, যদি প্রশ্নটা সাম্প্রদাযিক ব্যাপাব নিযে হয়, আব এ ক্ষেত্রে তা হবেই, তবে উভয সম্প্রদায়েব সম্মতিক্রমে সেকশানভাগের ব্যবস্থা পবিবর্তন কবা যেতে পারে। ১৯ মে গান্ধী ভাবত সচিবকে জানান, যদি গণপবিষদ সেকশানেব ব্যাপাবে বদলাতে পারেন, তবে নিশ্চযই সীমান্ত ও আসামেব প্রতিনিধিবা সেকশানে যোগ না দিতেও পারেন।[১৫৮] বেশ বোঝা যায, গান্ধী চাইছেন সীমান্তকে 'বি' সেকশান ও আসামকে 'সি' সেকশানের বাইরে বাখতে। অ্যালেকজান্ডার ও ওযাভেল এই সন্দেহ কবেন।[১৫৯]

গান্ধী আবও কতকগুলি প্রশ্ন তুলেছিলেন, যেমন (১) প্যাবামাউন্টসি এখনই বিলুপ্ত হওয়া উচিত নয় কি ? (২) গণপরিষদে বাংলার ইউরোপীয় সদস্য থাকা উচিত হবে কি ?

(৩) ব্রিটিশ সৈন্য অন্তর্বর্তীকালে ব্যবহার করা ঠিক হবে কি ? (৪) শাসন পরিষদে সমতা থাকা উচিত হবে কি ? (৫) গণপরিষদে বালুচিস্তানের প্রতিনিধি থাকবে কেন ? ওয়াভেলের মনে হয়েছিল বড়লটের ক্ষমতার ব্যাপারে ক্রিপস্ কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকছেন। ১৯ মে গান্ধীর চিঠি পড়ে ওয়াভেলের মনে হল তিনি প্রাদেশিক জোট বাঁধা নস্যাৎ করে দিতে চান। ঘোষণা এমনই শিথিলভাবে রচিত হয়েছে যে গান্ধী এমন ব্যাখ্যার সুযোগ নেবেনই। "... this is the result, the clever attempt of an able and unscrupulous politician to torpedo the whole plan." ওয়াভেল বলেন, এ সব ওকালতি মারপ্যাঁচে না গিয়ে মিশনের উচিত দৃঢ়তা দেখানো। গান্ধীর চিঠিতে ছিল—যদি কোনো দল ঘোষণাটি মোটামুটি গ্রহণ করে কিন্তু জোটবাঁধার বিরোধী হয় তবে তা দেশবাসীদের সামনে তা নিয়ে আন্দোলন করতে পারে কি না, আর যদি তা পারে, তবে সীমান্ত ও আসামের প্রতিনিধিরা সেকশানে যোগ দেওয়া থেকে বিরত থাকতে পারে কি না। ওয়াভেল এই চিঠির পাশে নিজের হাতে মন্তব্য করেন—'The answer must be a very definite and decided "No"'[১৫৯ক]

২০ মে ওয়াভেল আবার পরামর্শ দেন—গান্ধীর সঙ্গে বিতর্কে জড়িয়ে না পড়ে স্পষ্ট নেতিবাচক উত্তর দিতে। এমন সময় আবার গান্ধীর এক চিঠি আসে। এতে নাকি আগের দিন ক্রিপস্ ও পেথিক-লরেন্স যা বলেছিলেন তার অপব্যাখ্যা করা হয়, এখুনি অন্তর্বর্তী জাতীয় সরকার গঠন করতে বলা হয়। গণপরিষদ পরে বসবে। আবার গান্ধী প্যারামাউন্টসি উচ্ছেদ করতে ও ব্রিটিশ সৈন্য অপসারণ করতে অনুরোধ জানান। গান্ধীর এই রুদ্রমূর্তি দেখে মিশনের সভ্যদের মনে কি প্রতিক্রিয়া হল তার সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন ওয়াভেল : "Cripps and S. of S. were shaken to the core, while Alexander's reactions were pure John Bull at his most patriotic and insular ...If it were not so tragic and dangerous, it would also have been amusing to see the sudden change in three men."[১৬০] অ্যালেকজাণ্ডারের মনে হয়েছিল কংগ্রেস সব কিছুর আগে সরকার হাত করতে চায়, তারপর, সংবিধান রচনার আগেই, মুসলিম ও রাজাদের ঠাণ্ডা করতে।[১৬১]

অ্যালেকজাণ্ডার ও ওয়াভেলের তীব্র প্রতিক্রিয়ায় ক্রিপস্ ও পেথিক-লরেন্স উদ্বিগ্ন হলেন। যদি আলোচনা ভেস্তে যায় তবে হয় ভারতবর্ষ ত্যাগ করতে হবে (Operation Scuttle), না হয় ভারত পুনরধিকার করতে হবে। এর কোনটাই বাঞ্ছনীয় নয়। গান্ধীর চিঠির জবাবে লেখা হল—সংবিধান রচিত হবার আগে স্বাধীনতা দেওয়া সম্ভব নয় এবং ততদিন রাজাদের ওপর ব্রিটিশ প্রভুত্ব বজায় থাকবে। গান্ধীর উত্তর—তবে কি সত্যিকার স্বাধীনতা দেওয়া হবে এই প্রতিশ্রুতির কোন ভিত্তি নেই ?[১৬২]

ইতিমধ্যে আজাদ মুশকিলে পড়েছেন। আত্মজীবনীতে তিনি কিছু আত্মতৃপ্তির সুরে বলেছেন তাঁর ১৫ এপ্রিলের বিবৃতির সঙ্গে মিশনের ১৬ মে-র ঘোষণার কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। সেকশানের ব্যবস্থাটাই যা নতুন—এতে মুসলিমদের সব আশঙ্কা দূর হওয়া উচিত। আসলে মিশনের প্যাঁচগুলো তিনি বুঝতে পারেননি। গান্ধী পেরেছিলেন বলেই এত তীব্র তাঁর প্রতিক্রিয়া। আজাদের ২০ মে-র চিঠিতে দেখি তিনি আর কংগ্রেসের মুখপাত্র নেই, বরং 'হরিজন' পত্রিকায় প্রকাশিত গান্ধীর এক রচনার প্রতিধ্বনি করছেন মাত্র।[১৬৩] গান্ধী লিখেছিলেন—ঘোষণাটা প্রস্তাবমাত্র (award নয়), গণপরিষদ—সার্বভৌম এবং গ্রুপিং ঐচ্ছিক। ১৫ ধারায় বলা হয়েছে গ্রুপিং-এর ব্যাপারে প্রদেশের স্বাধীনতা স্বীকৃত,

অথচ ১৯ ধাবায় 'সেকশানে' তাদের প্রবেশ আবশ্যিক করা হয়েছে। এটা কি পরস্পর বিরোধী নয় ?

এই প্রশ্নের উত্তবের খসড়া কবলেন ওয়াভেল, কাবণ ক্রিপস্ অসুস্থ হযে পড়েছিলেন। বোঝা কঠিন নয়, উত্তরটা বেশ কড়া হল—"a small mouse... but one which I hope the Congress cat may find it dificult to get its claws into." এই উত্তরের শুধু একটি বাক্য আমি উদ্ধৃত কবছি। ওযাভেল আজাদকে জানাচ্ছেন—"You are aware of the reasons for the grouping of the provinces and this is an essential feature of the scheme which can only he modified by agreement between the two parties." এই কথাটা ঘুবিয়ে ফিরিযে, নবম কবে, গান্ধীকে বলেছিলেন ভাবতসচিব ও ক্রিপস। ওযাভেল তা স্পষ্ট কবে দিলেন। এবপব গ্রুপিং যে আবশ্যিক একথা নিযে কোনো সন্দেহ কংগ্রেসের থাকা উচিত নয়।[১৬৪]

কংগ্রেসেব সবকাব গঠনে পীড়াপীড়িতে ওযাভেল নেহরু ও আজাদেব সঙ্গে দেখা করেন ২৩ মে। তিনি এক তালিকা তুলে দিলেন তাঁদেব হাতে। তাঁরা জোব দিলেন কেন্দ্রীয আইনসভাব প্রতি দায়িত্ববান সবকাবেব ওপব আর ওযাভেল "kept steadily stone walling."[১৬৫] সেকশান 'সি'তে বাংলাব প্রতিনিধি নিযেও গোলমাল বাড়ল। বাংলা ও আসামেব প্রতিনিধি নিযে গঠিত সেকশান 'সি'তে মুসলিম সংখ্যা হবে ৩৬, হিন্দুদের ৩৪—প্রায সমসংখ্যক। ইউরোপীয সদস্যবা ঢুকলে সাম্যাবস্থা নষ্ট হবে—গান্ধী এ আশঙ্কা আগেই প্রকাশ করেছিলেন। লাট বাবোজ ইউবোপীযদেব আপন স্বার্থে সরে থাকতে পবামর্শ দিলেন।

২৪ মে কংগ্রেস ওযার্কিং কমিটি এক প্রস্তাব নিলেন। তাতে বলা হল পুবো ছবিটা পাওযা যাচ্ছে না বলে তাঁবা ঘোষণাব বিষযে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পাবছেন না। তাঁবা ১৫ ধাবাব ভিত্তিতে আপত্তি পুনরুত্থাপন কবলেন। বড়লাটেব ব্যাখ্যা সত্ত্বেও, তাঁদের মতে, নির্দিষ্ট সেকশানে প্রবেশ কবা কোনো প্রদেশেব পক্ষে আবশ্যিক নয। আবার তাঁবা দাবি কবলেন অন্তর্বর্তী সবকাব (তাঁদেব ভাষায Provisional National Government) ক্যাবিনেট-ধর্মী হবে এবং প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন। এই সবকাবেব মর্যাদা, ক্ষমতা, সংগঠন এসব বিষয়ে ব্যাখ্যা না পেলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সম্ভব নয।[১৬৬]

বোঝা গেল, দীর্ঘস্থাযী ব্যবস্থা বিষযে ব্যাখ্যার অনৈক্য দেখা দেওয়ায কংগ্রেস স্বল্পমেযাদী ব্যবস্থাব ওপব জোর দিতে চাইছে। অন্যদিকে জিন্না প্রথমটাব সম্বন্ধে নিশ্চিত না হলে, দ্বিতীযটা চিন্তা কবতে রাজি নন। ২৫ মে ক্যাবিনেট মিশন এক প্রতিবেদনে গ্রুপিং সম্বন্ধে নিজ ব্যাখ্যা আবার জানালেন।

কিছুদিন আলোচনা মুলতুবি রইল। শুধু আলোচনা ভেস্তে গেলে সবকারেব নীতি কি হবে তা নিয়ে চিন্তা কবতে লাগলেন ওযাভেল। মাঝে মাঝে যোগ দিতেন ভারত সচিব ও অ্যালেকজাণ্ডার। এই পরিকল্পনাকে Breakdown Plan আখ্যা দেওয়া হয়েছে। মোটামুটি এর মর্ম হিন্দু প্রদেশ থেকে ব্রিটিশ শক্তিব অপসারণ। এখানেই বলা ভাল, এতে ক্রিপসেব কোন হাত ছিল না এবং জুনে ক্যাবিনেট তা পত্রপাঠ নাকচ করে দেয। অর্থাৎ মে-র শেষে একমাত্র বিকল্প বইল—আলোচনা ভেস্তে গেলে ব্রিটিশ প্রভুত্ব পুনঃস্থাপন।

ইতিমধ্যে অন্তর্বর্তী সরকার সম্বন্ধে কংগ্রেসের সুর কিছু নরম হয়েছিল। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে পঞ্জাবে লীগেব আপেক্ষিক সাফল্য দেখে ওয়াভেল সরকারে কংগ্রেস ও লীগের সমতার ওপব জোব দিচ্ছিলেন। সব মুসলিম সদস্য লীগ মনোনীত করবে তাতেও তিনি

রাজি ছিলেন, কিন্তু আপন ক্ষমতা হ্রাস করতে নয়। কংগ্রেস বাইবে সম্পূর্ণ স্বাধীন সরকারের দাবি তুললেও ভেতরে নাকি নেহরু ১৭ মে রাউকে বলেন, কংগ্রেস সবকাবে যোগ দেবার পূর্বশর্তরূপে কোন কনভেনশন দাবি কববে না।[১৬৭] সিমলা বৈঠককালে নেহরু ও আজাদ এ নিয়ে কোনো কথা বলেননি। ২৫ মে আজাদ সবকাবীভাবে লিখলেন, নতুন সবকাবকে ডোমিনিয়ান ক্যাবিনেটের মর্যাদা দিতে হবে ; আবাব ব্যক্তিগতভাবে লিখলেন, মৌখিক আশ্বাসেই ওয়ার্কিং কমিটিকে খুশি করতে পারবেন বড়লাট।[১৬৮] এই উলটো পালটা কথার কাবণ ওয়ার্কিং কমিটিতে গান্ধী ও বামপন্থী জয়প্রকাশ নারায়ণের চাপ। ২৬-এ ওয়াভেলের Note for a talk with Pandit Nehru থেকে বোঝা যায় কি কথা তাঁদের মধ্যে হয়েছে। গান্ধীদের চাপে নেহরু কড়া মনোভাব নিয়েছেন আব ওযাভেল বলছেন, "Congress are practically asking us to hand over India to single party, a party which is deeply distrusted by all Muslims, by Rulers of States and quite a proportion of their people..." এরা মুসলিমদের সঙ্গে সহযোগিতা করবে কিনা জানবার আগেই আমাদের ক্ষমতা তুলে দিতে বলছে। আমরা জানি এরা দেশীয় রাজ্যের জনগণকে খেপাচ্ছে। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের কাছে দায়িত্ববান সরকারকে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়ার অর্থ সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের ক্ষমতা দেওয়া। এতে মুসলিমদের ঘোর আপত্তি, এর ফলে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী ভেঙে যাবে, দেশে দেখা দেবে নৈরাজ্য। "আমবা আপনাদের সংহত ভারতের সুযোগ দিচ্ছি এবং আমাব মনে হয়—শেষ সুযোগ...কিন্তু কোন দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তব কবতে রাজি নই।" একমাত্র কোয়ালিশন সরকারের হাতেই ক্ষমতা দেওয়া যায় এবং তার অর্থ সবকার গঠনে মুসলিমদেব নানা সুযোগ দিতে হবে। তাছাড়া ঠিক এই সময দেশীয় প্রজা আন্দোলনে মদত দেওয়া অতি নির্বুদ্ধিতার কাজ। "আমরা তো দেশীয় বাজ্যে বিশৃঙ্খল বিপ্লব চাই না।"[১৬৯]

নেহরুর সঙ্গে ওয়াভেলের কথাবার্তার গতি কোনদিকে বুঝতে হলে মিশনেব জন্য ৩০ মে তিনি যে Appreciation of Possibilities in India, May 1946 রচনা করেছিলেন তা পড়তে হবে। তাতে পড়ি লীগ কংগ্রেসেব বামপন্থী নেতাদেব ও গান্ধীকে অত্যন্ত অবিশ্বাস করছে। তাঁর আশঙ্কা মিটমাট না হলে ভয়ঙ্কব সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ঘটতে পারে, বিশেষ করে পঞ্জাব, ইউ· পি·, বিহার ও বাংলায। মনে রাখতে হবে ইউ· পি· ও বিহার 'mutiny province' এবং ১৯৪২ সালে সবচেয়ে ব্রিটিশ-বিরোধী। বাংলায় দাঙ্গা হবে কলকাতা, ঢাকার মত বড় নগরে। দ্বিতীয় সম্ভাবনা গণবিদ্রোহ। হাতে যা ব্রিটিশ সৈন্য রয়েছে, তাতে সে বিদ্রোহ থামাবার উপায় নেই। বিলেত থেকে সৈন্য আমদানী, সামরিক আইন জারি—এসব বিষয়ে ব্রিটেনকে নীতি নিতে হবে। অন্য দিকে বিনাশর্তে ব্রিটিশ শক্তির অপসারণ "would to my mind be disastrous and even more fatal to the traditions and morale of our people and to our position in the world than a policy of repression..." ওয়াভেল তাতে সম্মত নন। দমন ও অপসরণের মধ্যবর্তী কোন নীতি নিতে হবে। সেটা হবে নিম্নরূপ :

"...if we are forced into an extreme position, we should hand over the Hindu provinces...to Hindu rulers withdrawing our troops, officials and nationals in an orderly manner, and should at the same time support the Muslim provinces of India against Hindu domination and assist them to work out their own

constitution." এ নীতি কংগ্রেসকে আগেই জানিয়ে দেওয়া হবে। ভাবত ভাগ · এবং গৃহযুদ্ধকালে ব্রিটেন মুসলমানদেব পক্ষ নিয়ে লডাই করবে এমন ভয় দেখালে কংগ্রেস হয়তো লীগেব সঙ্গে সমঝোতা কবতে পাবে।

ওয়াভেল জানতেন এর সামবিক ঝুঁকি কম নয়। ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বে ব্রিটিশ শক্তি দুর্বল হবে। সব চেয়ে বড কথা মুসলিম প্রদেশেব হিন্দু নাগরিক নিয়ে কি করা হবে ? কি হবে হিন্দু প্রদেশে ব্রিটিশ স্বার্থের ? তিনি নিজেই বলছেন, ভাবতে চিবকালেব মত 'উত্তব আয়াল্যাণ্ড' সৃষ্টি করা সম্ভব নয়।

আর একটা সমস্যা দেখা দিতে পারে। যদি অন্তর্বর্তী সরকাবে কংগ্রেসে যোগ দিতে চায় কিন্তু লীগ প্রত্যাখ্যান কবে তবে কংগ্রেসকে 'না' বলা সম্ভব হবে না। কিন্তু মুসলিম-বর্জিত সেই সবকাব হবে বিপজ্জনক। এতে শুধু পঞ্জাব ও বাংলায় গোলমাল দেখা দেবে না, সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ব্রিটেনের অবস্থা খাবাপ হবে। অবশ্য কিছু অ-লীগ মুসলমান সদস্য নিযে জিন্নাব ওপব চাপ সৃষ্টি করা যেতে পাবে। আব একটা সমাধান—কংগ্রেসী প্রদেশ হিন্দুদেব ও মুসলিম প্রদেশ লীগকে শাসন করতে দিয়ে কেন্দ্রে ব্রিটিশ শাসন।

মোটেব ওপব ওয়াভেলেব সমাধান ছিল হিন্দু ভারত থেকে মুসলিম ভাবতে ব্রিটিশ শক্তি অপসাবণ। ক্ষমতা হস্তান্তবেব অব্যবহিত পূর্বে এমন দেউলিয়া ব্যবস্থাব কথা মাথা-মোটা ওযাভেলই ভাবতে পাবেন। মাথা-মোটা কিন্তু দুষ্ট বুদ্ধি। তাঁব কংগ্রেস-বিদ্বেষ ও মুসলিম-প্রীতি সূর্যেব আলোব মত প্রকট।

॥ ৭ ॥

হে বডলাটেব এমন মনোভাব তিনি আজাদকে ৩০ মে উত্তর দিলেন—আমি কোন দিন কাউন্সিলকে ডোমিনিযান ক্যাবিনেটেব মর্যাদা দেবাব কথা বলিনি। শুধু বলেছিলাম ডোমিনিয়ান সরকারদের প্রতি যেমন সহানুভূতি দেখান হয়, তাদের সঙ্গে যেমন ঘনিষ্ঠ আলোচনা করা হয়, সেবকম করবেন ব্রিটিশ সরকাব। দৈনন্দিন প্রশাসনে সর্বাধিক স্বাধীনতা দেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েওছে। কোনও লিখিত দলিলেব চেয়ে উভয় পক্ষেব সদিচ্ছা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। "I have no doubt that, if you are prepared to trust me, we shall be able to cooperate ..." শেষে তিনি আজাদকে ৭ই জুন ওয়ার্কিং কমিটি ডেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে অনুবোধ জানালেন।[১৭১]

কিন্তু তাঁর সন্দেহ হল তাঁব পেছনে ক্রিপস্ ও পেথিক-লরেন্স নানা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। এঁরা চাইছিলেন ওযাভেল কিছু নির্দিষ্ট কথা দিন। তাঁর ৩০ মে-ব Appreciations অর্থাৎ breakdown plan নিযে আলোচনা হল ২ জুন। ওই দিন ওযাভেল ব্যক্তিগত সচিবকে জানালেন. (১) বড় জোর তিনি জিন্নাকে বলতে পারেন, কংগ্রেসকে হিন্দুপ্রভুত্ব স্থাপন কবতে দিতে রাজি না হলেও তাঁরা মুসলিম লীগকেও পুবো পাকিস্তান দেবেন না। (২) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও আসামকে নিজ নিজ প্রাদেশিক সংবিধান তৈরি করার অধিকার দেওয়া যেতে পারে, অন্তত তাদের গ্রুপেব বাইরে থাকতে দেওয়া যেতে পারে, তবে কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ে সংবিধান রচনা পরে হবে। (৩) কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে শুধু লীগ সদস্যদের নিয়ে শাসনপরিষদ গড়া যাবে না। কিন্তু তাঁর সন্দেহ—কোন পক্ষই রাজি হবে না এবং আবাব সেই বিকল্প—হয় দমন, না হয় অপসরণ, দেখা দেবে। অপসরণ মানে আংশিক

অপসরণ—যা বিপজ্জনক। আসলে ওয়াভেল কিংকর্তব্যবিমূঢ় এবং সব দায়িত্ব ব্রিটিশ সরকারের ওপর চাপাতে চাইছিলেন।[১৭২] এই মর্মে এক 'তার' বিলেত পাঠান হল ৩ জুন।

ওই দিন জিন্নার সঙ্গে কথা বলে তাঁর মনে হল, লীগ সরকারে যোগ দিতে পারে। আজাদকে লেখা ৩০ মে-র চিঠি জিন্নাকে দেখান হল। য়ুনিয়ান আইন পরিষদে সমতার নীতি অনুসৃত হয়নি বলে উষ্মা জানালেন তিনি। জিন্না প্রশ্ন করলেন. যদি কংগ্রেস সরকারে যোগ না দেয় কি হবে? ওয়াভেলের উত্তর—লীগ তার জন্য বঞ্চিত হবে না। জিন্না জানালেন, লীগ কাউন্সিলের সভার (৫ জুন) পূর্বে তিনি স্পষ্ট জানতে চান একা লীগকে সরকার তৈরি করতে দেওয়া হবে কি না।

ইতিমধ্যে কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া দেখা যাক। অসুস্থ ক্রিপসের আবেদনের এক ঠাণ্ডা জবাব দিয়ে গান্ধী, আজাদ ও প্যাটেল সহ ২৮ মে মুশৌরী চলে গিয়েছিলেন। ৯ জুনের আগে গান্ধী ফেরেননি। কিন্তু আজাদ ও নেহরুর সঙ্গে কথা বলে ওয়াভেলের মনে হয় ওয়ার্কিং কমিটির অধিকাংশ সদস্য শান্তিপূর্ণ মীমাংসা চান। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় বাধা এলেও অন্তর্বর্তী সরকার হয়তো করা যাবে। প্যাটেলেরও অনিচ্ছা ছিল না। তাঁর কাছে ১৬ মে-র প্রস্তাবের সবচেয়ে বড় কথা—(১) সারা ভারতের জন্য এক গণপরিষদ, (২) পাকিস্তান প্রস্তাব প্রত্যাহার, (৩) লীগের ভিটোর অবলোপ। গ্রুপিং ব্যাপারে ব্যাখ্যা নিয়ে বিরোধের মীমাংসা গণপরিষদই করবে। ভাজরানিকে প্যাটেল লিখছেন, এই পর্যায়ে এ সব কথা তোলা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। "If we find the proposal otherwise satisfactory and the interim arrangement is made to our satisfaction, it would be wise to accept the proposals... But it is just likely that the whole thing may break on the question of composition of the Interim Government. This, in our opinion, is a vital matter." অর্থাৎ, আজাদ, নেহরু ও প্যাটেল অন্তর্বর্তী সরকার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, আর গান্ধী দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে। ৩ জুন মনে হচ্ছে কংগ্রেস সরকারে ঢুকতে পারে।

৬ জুন লীগ ১৬ মে-র প্রস্তাব গ্রহণ করল। কিন্তু শর্তসাপেক্ষে। লীগ প্রস্তাব উদ্ধৃত করছি :

"... in as much as the basis and the foundation of Pakistan are inherent in the mission's plan by virtue of the compulsory grouping of the six Muslim provinces in sections B and C. [it] is willing to cooperate with the constitution-making machinery proposed in the scheme outlined by the mission, in the hope that it would ultimately result in the establishment of complete sovereign Pakistan..." বলাবাহুল্য, ১৬ মে-র প্রস্তাবের শুধু সুরের সঙ্গে নয়, কথার সঙ্গেও, এর পার্থক্য স্পষ্ট। (১) ১৬ মে-র প্রস্তাব ঐক্যবদ্ধ ভারতের কথাই তুলে ধরেছিল, ভবিষ্যতের পূর্ণাঙ্গ, সার্বভৌম, পাকিস্তানের কথা নয়। (২) ১৬ মে-র ঘোষণায় গ্রুপিং আবশ্যিক এমন কোন কথা ছিল না। ব্যাখ্যাটা লীগের অনুকূলে নিয়ে গিয়ে তবে ঘোষণা করা হয়েছিল। একে পরিষ্কার মনে গ্রহণ কেউ বলবে না। আইনের দিক থেকে এ গ্রহণ অর্থহীন, এমনকি অভিসন্ধিমূলক। অথচ এই জোরে জিন্না পরে শুধু লীগকে দিয়ে সরকার গঠন করাতে চাইবেন।

লীগ কাউন্সিলে প্রতিবাদ তোলা হয়নি তা নয়। আওরঙ্গজেব খান ও আলিগড়ের অধ্যাপক হালিম প্রস্তাবের নানা ত্রুটি দেখান : যেমন, য়ুনিয়ান আইন পরিষদের ব্যবস্থা, য়ুনিয়ানের রাজস্ব বসানোর ক্ষমতা, গ্রুপ স্তরে সার্বভৌমত্বের অভাব, গ্রুপ ও প্রদেশের বাইরে বেরিয়ে যাবার ক্ষমতাব অভাব। লীগ প্ল্যানিং কমিটির যুক্ত সচিব এম এল কুরেশি প্রস্তাবের অর্থনৈতিক দিকটা নিয়ে ব্যাপক প্রতিবেদন লিখেছিলেন। কুরেশি বলেছিলেন, এর চেয়ে ক্ষুদ্রতর, কিন্তু সার্বভৌম, পাকিস্তান ঢের ভাল। পঞ্জাব থেকে আম্বালা, রোতক, হিসার, গুরগাঁও, কর্নাল, লুধিয়ানা, জলন্ধর, হোসিয়ারপুর ও ফিরোজপুব এবং বাংলা থেকে বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিঙ বাদ গেলে ক্ষতি নেই। লীগের লেখক কমিটির আহ্বায়ক জামিল-উদ্‌দিন আহমদ পরামর্শ দেন, বি ও সি গ্রুপের সংবিধান রচনার পর বেঁকে দাঁড়াতে হবে যাতে লীগ-কল্পিত পাকিস্তান দাবি কংগ্রেস ও সরকাব মেনে নিতে বাধ্য হয়। গণপরিষদে বাধা সৃষ্টি কবা, এমনকি বেরিয়ে যাওয়া তো হাতেই আছে। আওরঙ্গজেব খান বলেন, "দীর্ঘ মেয়াদী প্রস্তাব নিন, আবশ্যিক সেকশান মিটিং শুরু করুন, তারপর অন্তর্বর্তী সরকারে সমতা দাবি করে দ্বিজাতিত্ব প্রতিষ্ঠিত করুন।"[১৭৫]

এইসব পরামর্শ মনে রেখে ৭ জুন জিন্না বললেন, তিনি ওয়াভেলের সঙ্গে ১৩ মে-ব কথা মত ৫ (মুসলিম লীগ) : ৫ (কংগ্রেস, ১ তফসিলীসহ) . ১ (শিখ) ১ (অন্যান্য) ভিত্তিতে সরকাব গঠনে রাজি।[১৭৬] ৮ জুন এক চিঠিতে লিখলেন, ১৩ মে-র আলোচনা লীগেব পক্ষে অতি গুরুত্বপূর্ণ—"the turning point in League's decision." তাতে ওয়াভেল parity-র প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, অর্থাৎ কংগ্রেস কোন মতেই মুসলিম প্রতিনিধি মনোনযন করতে পারবে না। তিনি নিজের জন্য চান প্রতিরক্ষা দফতব, অন্য দুই অনুচবের জন্য পবিকল্পনা ও বিদেশমন্ত্রক।[১৭৭]

যদিও ওয়াভেল জানালেন ১৩ মে parity সংক্রান্ত কোন প্রতিশ্রুতি তিনি দেননি, তবু এ সব কথা ওয়ার্কিং কমিটির উষ্মায় ঘৃতাহুতি দিল। ১০ জুন আজাদ ও নেহরু বড়লাটকে জানালেন—"কংগ্রেস parity-র সম্পূর্ণ বিরোধী।"[১৭৮] এব ফলে বর্ণহিন্দুদের সংখ্যা দাঁড়াবে ৪, যা মুসলিমদের চেয়েও কম। ভাবতের এক তৃতীয়াংশেবও কম মুসলিমরা সর্বাধিক সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের চেয়েও বেশি আসন পাবে—এ কেমন ন্যায ? সিমলায় তাঁরা বর্ণহিন্দু ও মুসলিম সমতা মেনেছিলেন ঠিকই কিন্তু তখন কংগ্রেস পক্ষ থেকে ৫, লীগ থেকে ৪ ও একজন অ-লীগ মুসলিম নেবার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। এখন কিনা অ-লীগ মুসলিমদের একেবারে বাদ দেওয়া হচ্ছে ! জিন্নাব কথা মেনে নিলে, কি অন্তর্বর্তী সরকার, কি গণপরিষদে,প্রতি প্রশ্নে বিরোধ বাধবে এবং তার সুযোগ নিয়ে জিন্না চাইবেন পাকিস্তান। সমতার দাবির তাৎপর্য বুঝতে হবে—তা দ্বিজাতিতত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস তা মানতে পারে না। প্যাটেল অ্যাগাথা হ্যাবিসনকে লিখলেন, "...had we known they were going to insist on parity I should not have come back to Delhi."[১৭৯] তাছাড়া ১৬ মে-র ঘোষণা স্পষ্টই 'পাকিস্তান' প্রত্যাখ্যান করলেও জিন্না দাবি করছেন জোট বাঁধার নীতির মাধ্যমে তা পরোক্ষে স্বীকৃত হয়েছে। প্যাটেল গণপরিষদে হিন্দু-মুসলিম সমতার নীতিও প্রত্যাখ্যান করলেন।

১২ জুন ওয়ার্কিং কমিটিতে যোগ দেবার আগে গান্ধী ওয়াভেলের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি বলেন, সর্বসম্মত তালিকা রচনা সম্ভব না হলে দুই দল একটি কবে পূর্ণাঙ্গ তালিকা দেবে—তাদের মধ্যে যোগ্যতরকে নিতে হবে, কিন্তু মেশালে চলবে না—"not an amalgam"।[১৮০] ওই দিন প্যাটেলের সঙ্গেও তাঁর দেখা হয়। প্যাটেল বলেন, প্রস্তাব

গ্রহণের জন্য গান্ধী চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটির কেউ রাজি হননি। বড়লাট তখন বলেন, শুধু সরকারেই সমতার কথা বলেছেন তিনি, গণপরিষদ বা য়ুনিয়ান আইনপরিষদে নয়। প্যাটেল বলেন, জিন্না সরকারে ঢুকে সব কাজে বাগড়া দেবেন এবং ভারত ভাগের চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। ওয়াভেল কথা দেন—তিনি তা হতে দেবেন না। প্যাটেল তা বিশ্বাস করেননি (ভবিষ্যতে তাঁর আশঙ্কাই ফলেছিল)। তবে জিন্না ও নেহরু একত্র হয়ে যদি কোনো তালিকা তৈরি করেন তিনি তা মেনে নেবেন।

ভি পি মেননের সঙ্গে পরামর্শ করে ওয়াভেলের মনে হয় ৫ · ৫ · ৩ হারে সদস্য তালিকা তৈরি হওয়া উচিত এবং কংগ্রেসের ভাগে তফসিলী ফেলা উচিত হবে না। নেহরু ও জিন্নার বিকেলে আসার কথা ছিল। কিন্তু জিন্না বলে পাঠালেন সমতাব নীতিতে রাজি না হলে নেহরুর সঙ্গে তিনি দেখা করবেন না। নেহরু এলেন এবং ১৫ জনেব এক তালিকা পেশ করলেন—৫ কংগ্রেস (সবাই হিন্দু), ৪ (লীগ), ১ (অ-লীগ মুসলিম), ১ (অকংগ্রেসী হিন্দু), ১ কংগ্রেস (তফসিলী), ১ (ভারতীয় খ্রীশ্চান), ১ শিখ ও ১ কংগ্রেস (মহিলা)। অর্থাৎ কংগ্রেসের পক্ষে ৭ জন। বড়লাট বললেন, জিন্না কখনই তা মানবেন না।

১৩ জুন জিন্নাব সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার হল। জিন্না বললেন, ৫ · ৫ : ৩ সূত্র তিনি দাবি করছেন, তবে ৩ জনের একজন তফসিলী হতে পারে। নেহরু শুনে খুব রাগারাগি করলেন কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটিকে জানাবেন বললেন। বল্লভভাই তো জিন্নার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিষোদগাব কবলেন (hymn of hate)। শোনা গেল ওয়ার্কিং কমিটি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। গান্ধী ওয়াভেলকে লিখলেন, "You are a great soldier—a daring soldier. Dare to do the right. You must make your choice of one horse or the other...Choose the names submitted either by Congress or the League. For God's sake do not make an incompatible mixture...[১৮২]

গান্ধী খুব রেগে গিয়েছিলেন স্টেটসম্যানে ইয়ান স্টিফেনের এক সম্পাদকীয ('Slow Motion') পড়ে। ১২ই তিনি পেথিক-লরেন্সকে জানান—বড়লাট যেন কোযালিশন না করেন। "The safest, bravest and the straightest course is to invite the party to form a Government which, in the Viceroy's estimation, inspires greater confidence."[১৮৩] আব ১৩ইলেখেন ক্রিপস্‌কে, "Every day you pass here coquetting now with the Congress, now with the League and again with the Congress, wearing yourself away. (This) will not do."[১৮৪]

শুধু গান্ধী নয়, ওয়ার্কিং কমিটিব সবাই জিন্নার চাল বুঝতে পেরেছিলেন এবং তা বানচাল করতে বদ্ধপরিকব হয়েছিলেন। অবস্থা বুঝে মিশন ও বড়লাট সদস্য সংখ্যা ১৩ জন থেকে বাড়িয়ে ১৪ জন করলেন। হার হবে ৫ : ৫ : ৪। ৪ জন সংখ্যালঘু সদস্যের একজন হবেন পার্সী। ১৪ জুন আজাদ ও নেহরু বলেন তাঁরা এ প্রস্তাব সুপাবিশ করবেন কিন্তু গভীর রাত্রে আজাদের যে চিঠি এল তাতে শুধু অন্তর্বর্তী সরকার নয় ১৬ মে-র ঘোষণাও নাকচ করা হল।

অতএব মিশনের 'হুকম' দেওয়া ছাড়া উপায় রইল না। ১৬ই জুন অন্তর্বর্তী সরকার সম্বন্ধে এক ঘোষণা প্রকাশিত হল। ১৪ জন সদস্যের ৫ জন মুসলিম—সকলেই হবেন লীগ মনোনীত ; ৬ জন কংগ্রেসীর একজন হবেন তফসিলী (শরৎ বসুর স্থলে হরেকৃষ্ণ মহতাবেব

নাম করা হল) ; ৩ জন সংখ্যালঘুর একজন হবেন পার্সী—এন পি ইঞ্জিনিয়ার, একজন শিখ—বলদেব সিং ও একজন—ভারতীয় খ্রীশ্চান—জন মাথাই। কংগ্রেসী তফসিলী হবেন জগজীবন রাম। কংগ্রেসী হিন্দুরা হবেন—নেহরু, প্যাটেল, রাজেন্দ্র প্রসাদ, রাজাগোপালাচারি ও হরেকৃষ্ণ মহতাব। লীগ সদস্যরা হবেন—জিন্না, লিযাকৎ আলি খান, খাজা নাজিমুদ্দিন, নবাব ইসমাইল খান ও সর্দার আব্দুর রব নিস্তার। উভয় দলের সঙ্গে পরামর্শ করে দফ্তর বণ্টন করা হবে। যদি দুই প্রধান দল বা তাদের মধ্যে এক দল সরকার গঠনে রাজি না হয় "it is the intention of the Viceroy to proceed with the formation of an Interim Government which will be as representative as possible of those willing to accept the Statement of May 16th";সঙ্গে সঙ্গেই প্রাদেশিক লাটদের আইনপরিষদ ডেকে গণপরিষদের জন্য নির্বাচন ব্যবস্থা জারি করতে বলা হচ্ছে।[১৮৫]

সঙ্গে সঙ্গে মৌচাকে ঢিল পড়ল। শরৎচন্দ্র বসুকে বাদ দেওযায কংগ্রেস (বিশেষত গান্ধী) আপত্তি জানাল ; নিস্তার নির্বাচনে পরাজিত বলে তাঁর মনোনযনে, আই এন এ বিচারকালে এঞ্জিনিয়ার সৈন্যবাহিনীর পক্ষে ওকালতি করেছিলেন বলে তাঁর মনোনযনে ও কংগ্রেসের কোটা (৬) থেকে একজন মুসলিম না নেওযায প্রতিবাদ জানাল। ১৭ জুন থেকে গান্ধী বলতে থাকেন অমুসলিম সদস্য মনোনয়নে জিন্নার কিছু বলার নেই, আর কংগ্রেস কাকে মনোনয়ন দেবে সে বিষয়েও বক্তব্য নেই। ১৯ জুনের ওয়ার্কিং কমিটিতে গান্ধী আজাদকে কংগ্রেস কোটা থেকে নেবার জন্য জিদ ধরেন এবং ক্রিপস্ আজাদকে সরে দাঁড়াতে অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও অনমনীয থাকেন, এমনকি প্যাটেলকেও পক্ষে আনেন।[১৮৬]

গান্ধীর প্রথম নীতিগত আপত্তি—কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠান, অতএব মুসলিম নেবে ; দ্বিতীয় আপত্তি—কোযালিশন সরকার গঠনের কথা ছিল না।

অন্য দিকে জিন্না জানান কিছুতেই তিনি কোনো জাতীযতাবাদী (অর্থাৎ অ-লীগ) মুসলমানকে মেনে নেবেন না।[১৮৭]

ওয়াভেল জিন্নার চিঠির যে উত্তর দিলেন (২০ জুন), তাতে দু'টি ব্যাপারে অযৌক্তিক পক্ষপাতিত্ব দেখান হল—(১) ৪ জন সংখ্যালঘু সদস্যের কোন পদ শূন্য হলে তিনি স্থানপূরণের আগে উভয় দলের পরামর্শ নেবেন। অর্থাৎ যদি কংগ্রেসী তফসিলী সদস্যের স্থান শূন্য হয় তা পূরণ করতে হলে জিন্নার সম্মতি চাই। দ্বিতীযত সদস্য সংখ্যার সাম্প্রদায়িক অনুপাত দুই দলের সম্মতি ছাড়া পরিবর্তন করা যাবে না। অর্থাৎ কংগ্রেস তার কোটা থেকে কোনো মুসলমান নিতে পারবে না।[১৮৮] জিন্নার উদ্দেশ্য পরিষ্কার—তিনি কংগ্রেসকে বর্ণহিন্দু প্রতিষ্ঠান বলে প্রমাণ করতে চান। এর ফলে খিড়কীর দরজা দিয়ে সমতা ফিরে আসবে। লীগের অধিকাংশ সদস্য আপত্তি জানালে কোনো সাম্প্রদায়িক ইস্যুও সমাধান করা চলবে না। জিন্না সংখ্যালঘু (যত বড়ই হোক) সম্প্রদাযের নেতা হযেও সরকারের ওপর ভিটো পাবেন। কি করে বড়লাট এমন চিঠি লিখলেন বোঝা শক্ত নয়। প্রথম থেকেই তিনি লীগ ও জিন্নার প্রতি ঝুঁকেছেন।

এই ২০ জুনের চিঠি কিভাবে জানি খবরের কাগজে বেরিয়ে গেল। ২১ জুন তার প্রতিলিপি পাঠানো হল কংগ্রেসে। আঘাতের ওপর লবণের ছিটের মত ওয়াভেল আজাদকে সরে দাঁড়াতে অনুরোধ জানালেন।[১৮৯] (ওয়ার্কিং কমিটির অজ্ঞাতে আজাদ বড়লাটকে জানান কংগ্রেস তালিকায় মুসলিম নাম থাকবে না।[১৯০]) ক্রিপস্ ও পেথিক-লরেন্সের এ

চিঠিতে আপত্তি ছিল কিন্তু ওয়াভেলকে মদৎ দেন অ্যালেকজাণ্ডার।[১৯১]

ওয়াভেলের চিঠি এমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল যা গান্ধী এত দিন পাবেননি। ২২ জুন আজাদ ছাড়া সমস্ত ওয়ার্কিং কমিটি ১৬ জুনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কবল। আবাব গান্ধী ও প্যাটেলের দ্বারস্থ হলেন পেথিক-লরেন্স ২৩ জুন। প্যাটেল জানালেন, সিমলা বৈঠকেব চেয়েও অবস্থা গুরুতর। ঐদিন মিশন আজাদ, নেহরু, প্যাটেল ও প্রসাদের সঙ্গে দেখা করলেন এবং বোঝাপড়ার সুবিধার্থ কংগ্রেসকে কোন মুসলমান মনোনযন না কবতে বললেন। বিকেলে গান্ধীর নির্দেশে ওয়ার্কিং কমিটি আগের দিনের প্রত্যাখ্যান প্রস্তাব অনুমোদন করল।

ওয়াভেলের মতে, এই সময় ক্রিপস্ (সুধীর ঘোষেব মাধ্যমে) কংগ্রেসকে বোঝালেন ১৬ জুনের ঘোষণার শর্ত—অন্তর্বর্তী সরকারে ঢুকতে হলে. ১৬ মে-ব প্রস্তাব মেনে নিতে হবে। কংগ্রেস যদি ১৬ মে-র প্রস্তাব না মেনে নেয তবে পরে সবকাবে ঢুকবাব পথ থাকবে না. কিন্তু লীগ অনায়াসে সবকার গঠন কবতে পাববে। মোটেব ওপব নতুন কবে বিষযটা ভাবা হবে। ২৪ জুন ক্রিপস্ বললেন, অন্তর্বর্তী সবকাব প্রত্যাখ্যান কবলেও কংগ্রেস ১৬ মে-ব ঘোষণা মেনে নেবে। বডলাটের মন্তব্য : I am afraid that I would not put it past Cripps to have suggested to Congress in one of his many talks that they would put themselves in a better tactical position if they did so." পেথিক-লবেন্স নাকি ঐ দিন সকালে গান্ধী ও প্যাটেলকে বলেন—১৬ মে-ব ঘোষণা মেনে নিলে তাঁরা লীগেব চাল বানচাল কবতে পারবেন। অ্যালেকজাণ্ডাব সব শুনে বললেন, কংগ্রেসের ১৬ মে-ব ঘোষণা গ্রহণ আন্তরিক নয। শুধু কাগজে কলমে আবদ্ধ। ওয়াভেল অবশ্যই তাতে সায দিলেন। ২৪ জুন সন্ধ্যায গান্ধী আবাব এলেন। গণপবিষদেব প্রার্থীদের নাকি এক দলিলে স্বাক্ষর কবতে বলা হচ্ছে যে তাঁবা ১৯ ধাবার পঞ্চম উপধাবা (সেকশনে প্রাদেশিক জোট বাঁধার নীতি) মেনে নিচ্ছেন। গান্ধী এ বিষয়ে ঘোব আপত্তি তুললেন। মিশন গান্ধীকে ধোঁকা দেবার চেষ্টা করলে ওযাভেল আপত্তি জানান—কিন্তু তাঁকে নীরব থাকতে বলা হয়।[১৯২] তিনি এর প্রতিবাদে মিশনকে এক চিঠি লেখেন। তাতে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, মিশন তো এই নির্দেশ লাটদের দিয়েছেন, এখন অস্বীকাব কবাব অর্থ কি ? "It seems to me therefore that the reassurance given to Mr. Gandhi last night may subsequently lead to an accusation of bad faith on our part..." হয় তাঁকে না জানিয়ে নীতি পরিবর্তন করা হয়েছে, না হয গান্ধীকে স্তোকবাক্য বলা হচ্ছে। তা ছাড়া আজাদের ২৫ জুনের চিঠিতে পরিষ্কার যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ২৫ জুনের প্রস্তাবে ১৬ মে-র ঘোষণা ১৯ (৫) উপধাবাব নিজস্ব ব্যাখ্যাসহ মেনে নিচ্ছে। সেটাও কি ঠিক হচ্ছে ? সেকশান গঠিত হযে গ্রুপিং নিযে সিদ্ধান্ত নেবার আগেই কি প্রদেশরা বাইবে থাকার সিদ্ধান্ত নিতে পারে ? ব্যাপাবটা তো শুধু আইনগত নয়, দু পক্ষের বোঝাপড়াব ভিত্তিতে বচিত। অতএব দেশ ত্যাগ কবাব পূর্বে এ বিষয়ে মিশনের ব্যাখ্যা কি পরিষ্কাব বলে দেওয়া উচিত।[১৯৩] ওয়াভেল মনে কবেন, "We have in fact been out-manoeuvred by the Congress." এই পরিস্থিতিতে জিন্নাকে অ-লীগ মুসলিমের ব্যাপারে রাজি কবানোর প্রশ্নই ওঠে না। তাঁব মনে হয় এই সুবিধা দিলে কংগ্রেস আরো সুবিধা চাইবে। আর লীগকে একা একা শাসন পরিষদ গঠন করতে দেওয়া যাবে না (কারণ কংগ্রেস ইতিমধ্যে ১৬ মে-ব ঘোষণা মেনেছে)। কংগ্রেসেব সঙ্গে তাদের শর্তে লীগকে সহযোগিতা কবতে বলাও অসাধুতা হবে। তৃতীয় বিকল্প—এক

অস্থায়ী এবং আমলাতান্ত্রিক সরকার গঠন। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে ওয়াভেল বলছেন, ভারতে শেষ কোয়ালিশন সরকার গঠনের সম্ভাবনা তিরোহিত হয়েছে।

২৫ জুন কংগ্রেসের দীর্ঘমেয়াদী ঘোষণা গ্রহণকে তিনি বলছেন—"**a dishonest acceptance ; but so cleverly worded that it had to be regarded as an acceptance.**"[১৯৪] কিন্তু কংগ্রেস স্পষ্ট করে ১৯ ধারার V উপধারার নিজস্ব ব্যাখ্যা সহ ঘোষণা গ্রহণ করেছিল। তাকে **dishonest** আখ্যা বলা যায় কি করে ? আবার ওয়াভেলের পক্ষপাতিত্ব কাজ করছিল। ২৫ জুন জিন্না তাঁব কথারই প্রতিধ্বনি তুললেন। (১) সেকশান মেনে না নেওয়ার অর্থ ১৬ মে-র ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করা। তা হলে ১৬ জুনের ঘোষণা অনুসারে সরকারে ঢুকবার অধিকার কংগ্রেসের নেই। (২) কংগ্রেস ১৬ জুনের ঘোষণাও প্রত্যাখ্যান করেছে। অতএব তার অষ্টম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অন্তর্বর্তী সরকার শুধু লীগই গঠন করতে পারবে।

ওয়াভেল আজাদকে জানালেন, উভয় সম্প্রদায়ে মতৈক্য ব্যতীত সেকশানের ব্যাপারে কোনো পরিবর্তন করা যাবে না।[১৯৫] কংগ্রেস উত্তর দিল—জিন্নাও কি প্রসন্ন মনে ও পূর্ণরূপে ১৬ মে-র ঘোষণা মেনে নিয়েছেন ? তা হলে লীগের প্রস্তাবে কেন বলা হয়েছে, "**The attainment of the goal of a complete sovereign Pakistan still remains the unalterable goal of the Muslims in India.**" কেন লীগ বলছে তারা সহযোগিতা করবে "**in the hope that it would ultimately result in the establishment of complete sovereign Pakistan**" ? তা ছাড়া সংবিধান রচনার সময় যে কোন মুহূর্তে লীগ আপন নীতি সংশোধন করার অধিকাব বেখেছে, এমন কি গণপবিষদ বর্জন করার ভয়ও দেখিয়েছে। এই কি ১৬ই মে-র ঘোষণার আন্তবিক গ্রহণ ?

অ্যালেকজাণ্ডাবের ডায়েরি থেকে জানা যায় জিন্নার মেজাজ ছিল খুব কড়া। তিনি মিশনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তোলেন, দাবি করেন কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে সরকার গঠন করতে হবে। মিশনের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে ধুরন্ধর এই আইনজ্ঞ লীগ কাউন্সিলকে দিয়ে ১৬ই জুনের ঘোষণা গ্রহণ করিয়ে নেন। উদ্দেশ্য অনুচরদের দেখানো—তাঁর প্রতি অন্যায় করা হয়েছে।

জুনের শেষে পরিস্থিতি দাঁড়াল এইরূপ। কংগ্রেস দীর্ঘমেয়াদী (১৬ মে) ব্যবস্থা মেনে নিয়েছে কিন্তু স্বল্পমেয়াদী (১৬ জুন) ব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান করেছে আর লীগ উভয় ব্যবস্থাই গ্রহণ করেছে।

২৬ জুন মিশন ঘোষণা করল—উভয় পক্ষের সম্মতিতে গণপরিষদ নির্বাচন ও সংবিধান রচনা শুরু হবে কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকার বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকায় এক অস্থায়ী কার্যবাহী (**Caretaker**) সরকারের বেশি কিছু করা সম্ভব নয়। আর জে মুর যাই বলুন, মিশন অন্তরে অন্তরে জানতেন দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থার ব্যাপারে সত্যকার ঐকমত্য হয়নি, যা হয়েছে তা **illusion** মাত্র। আর ১৬ জুনের অষ্টম অনুচ্ছেদে যাই থাকুক, জিন্না যতই চটুন,[১৯৬ক] কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে কোন অন্তর্বর্তী সরকার গড়া যাবে না। ওয়াভেলের হাতে এক 'রুগ্ণ শিশু' (গণপরিষদ) ও 'মৃতজাত শিশু' (অন্তর্বর্তী সরকার)-র ভার দিয়ে দেশে রওনা হল মিশন ২৯ জুন।

১৯৪৬-এর মার্চ থেকে জুনের ঘটনাবলীর সারাংশ বিশ্লেষণ করে নিজের পক্ষে ওয়াভেল যে সওয়াল তৈরি করেছেন তা অবশ্য পাঠ্য।[১৯৭] প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি তা পুরো মেনে নিতে

পারেননি। তাঁর এক পত্রে জানা যায়—রাজনৈতিক আলোচনা ও দর কষাকষিতে যে ধরনের অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা প্রয়োজন তা এই জাত সৈন্যাধ্যক্ষেব কাছে আশা করা ভুল হয়েছিল।[১৯৮] এমনই অ্যাটলির ভাষায় ওয়াভেল ছিলেন "a curious silent bird." গান্ধীর মত বা জিন্নার মত ঝানু এবং আইনজ্ঞ রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্য যে মানসিক নমনীয়তা দরকার তাঁর তা ছিল না। অন্য দিকে তাঁর ছিল আপন পদ সম্বন্ধে এক ধরনের অহমিকা। বার বার তিনি বলতেন—"আমি শুধু নামমাত্র বড়লাট হতে চাই না।" অ্যাটলির উল্লিখিত চিঠির জবাবে তিনি লেখেন, "সরকার যদি সেনানীকে না করে কোনো কূটনীতিককে বড়লাট বানাতে চান, আমার আপত্তি নেই।" অ্যাটলি তাঁর কথা শুনেছিলেন—কয়েক মাসের মধ্যেই মাউন্টব্যাটেনকে ওয়াভেলের উত্তরাধিকারী করে।[১৯৮ক]

কিন্তু অহমিকার চেয়েও যেটা বেশি বেদনাদায়ক তা হল গান্ধী সম্বন্ধে তাঁর বিদ্বেষ আর লীগের প্রতি পক্ষপাতিত্ব। ডায়েরিতে, চিঠিপত্রে, কথাবার্তায় গান্ধী সম্বন্ধে যে সব বিশেষণ তিনি প্রয়োগ করেছেন তার মধ্যে রয়েছে'sanctimonious', 'malignant', 'malevolent', 'double-tongued' ইত্যাদি। এর পেছনে কাজ করছিল ১৯৪২-এর ক্রিপস্ দৌত্যকালে ও পরে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে গান্ধীব ভূমিকা। কোনো সৈন্যাধ্যক্ষ (১৯৪২-এ ওয়াভেল C-in-C.) চান না বহিরাগত চরম বিপদেব মুহূর্তে অন্তর্ঘাতি মাথাচাড়া দেয়। যদিও গান্ধী বার বার বলেছেন জাপানীদের আগমনে তিনি উল্লসিত নন বা তাদের আহ্বান জানাচ্ছেন না, এমনকি, প্রয়োজনে, জাপানী অভিযান অহিংস উপায়ে তিনি প্রতিরোধ করবেন, তবু ওয়াভেল কংগ্রেস কর্মীদের হিংসাত্মক কার্যকলাপেব পরিপ্রেক্ষিতে তা স্তোকবাক্য ছাড়া কিছুই মনে করেননি। উল্লিখিত সারাংশে তিনি লিখছেন, "for G. (Gandhi) non-violence is a political weapon far more than a creed."[১৯৯] টেলিগ্রাফের তার কাটা, রেল লাইন উপড়ে ফেলা, থানা দখল, সৈন্য ও পুলিশ হত্যা যিনি প্রকাশ্যে নিন্দা করেননি তাঁর অহিংসার চরিত্র কি? গান্ধীর দূত—সুধীর ঘোষ-কে তিনি বলতেন "snake in the grass." ক্রিপস্ ও পেথিক-লরেন্স গান্ধীর সঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে কথা বলছেন, বারংবার দেখা করছেন—এসব ছিল তাঁর কাছে অসহ্য, অবিবেচনা, এমনকি লীগের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। গান্ধী, তাঁব মতে, এক ধূর্ত ব্যবহারজীবী যিনি দর কষাকষিতে মনোমত মূল্য আদায় করেও আরো দাম কমাতে চান। ১৬ মে-র ঘোষণায় ১৫ ও ১৯ ধারার বৈপরীত্য তুলে ধরে, ১৬ জুনের ঘোষণার parity-রূপ অবিচারের বিরুদ্ধে ওয়ার্কিং কমিটিকে উত্তেজিত করে গান্ধী ক্যাবিনেট মিশনের কাজ ভণ্ডুল করে দেন। তিনিই 'real wrecker'। শুধু হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠাই তাঁর উদ্দেশ্য। রাজনীতির সঙ্গে প্রার্থনা মেশালেও তাঁর মধ্যে সন্তসুলভ কোন গুণ ছিল না। "He is an exceedingly shrewd, obstinate, domineering, double-tongued, single-minded politician; and there is little true saintlines in him." ঠিক এই কথাই ত্রিশের দশকে বলে গেছেন উইলিংডন।

অন্যদিকে আজাদ—সৎ কিন্তু দুর্বল; নেহরু—আন্তরিক, সুশিক্ষিত ও ব্যক্তিগতভাবে সাহসী কিন্তু না আছে তাঁর ভারসাম্য, না রাজনৈতিক সাহস; তুলনায় প্যাটেলকে বলিষ্ঠ চরিত্রের নেতা বলে মনে হয়, তাঁর সঙ্গে কাজ করা যায়। তিনি প্রয়োজনে গান্ধীর বিরুদ্ধে কথা বলতে পারেন, আর কেউ নয়। জিন্না কংগ্রেসীদের তুলনায় ঢের বেশি সোজা, নিজের অবস্থান তিনি বদলান না। "শাসনতান্ত্রিক পথ নিলে খুব মূল্যবান, উগ্রপন্থা নিলে-দুর্ধর্ষ।"

তবে তিনিও দর কষাকষিতে কম যান না।"[২০০] **"I have much sympathy with Jinnah, who is straight, more positive and more sincere than most of the Congress leaders."**

ভালকথা—কিন্তু ক্রিপস্ মিশন ও ক্যাবিনেট মিশনের দৌত্যকালে ওয়াভেলেব নিজেব ভূমিকা কি ছিল ? ১৯৪২ সালে লিনলিথগোর সঙ্গে হাত মিলিয়ে তিনিও কি সমাধানে বাগড়া দেননি ? তিনি যদি সিমলা বৈঠককালে জিন্নাকে বাদ দিয়ে আলোচনা চালাতেন, তাহলে জিন্না কি পরে যোগ দিতে বাধ্য হতেন না ? জিন্নাব অবস্থা তখন সঙ্গীন। তাঁবই ভাষায়—**"I am at the end of my tether," "I ask you not to wreck the League."**[২০১] তাঁকে এ অবস্থা থেকে তুলল কে ? ওয়াভেল ভালোভাবেই জানতেন জিন্না মুসলিমদের **'sole spokesman'** ছিলেন না। বাংলায় হক তাঁকে পাত্তা দিতেন না, নাজিমুদ্দিনের আমলে তাঁর প্রভাব বাড়লেও হাশেম ও সুরাবর্দিকে তাঁব অনুগত বলা চলে না। সীমান্ত তাঁকে প্রত্যাখ্যান কবেছিল। পঞ্জাবে খিজির ভীত হলেও তাঁকে মদত যোগাচ্ছিলেন ছোটলাট, হিন্দু ও শিখরা। এই পরিস্থিতিতে কেন তিনি তুললেন অন্তর্বর্তী সরকারে বর্ণহিন্দু-মুসলিম সমতা ও পরে কংগ্রেস-লীগ সমতাব প্রশ্ন ? কেন জিন্না সব মুসলমান মন্ত্রী মনোনযন করবেন ? জাতীযতাবাদী মুসলিম ও পঞ্জাবের ইউনিযানিস্টবা কি মুসলমান নয় ? কোন অধিকাবে জিন্না কংগ্রেসী কোটায় তফসিলী ঢোকাবেন এবং শেষে সেই তফসিলীর মনোনয়নে নাক গলাবেন ? বস্তুত শাসন পবিষদ গঠনের ব্যাপাবে ওযাভেল জিন্নাকে ভিটো দিতে চাইলেন। আজাদকে বাববাব সরে দাঁড়াতে বলতে তাঁর দ্বিধা হল না। আজাদ অত্যন্ত ভদ্রলোক ছিলেন, অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় ছিলেন, সত্যকার মিটমাট চেয়েছিলেন, তাই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে না জানিয়ে সবে দাঁড়াতে বাজিও হয়েছিলেন। গান্ধী রুখে না দাঁড়ালে তাই হত। কিন্তু তাতে কি দ্বিজাতিতত্ত্ব পেছনেব দরজা দিয়ে প্রবেশ কবত না ? কোথায় থাকত সম্প্রদায় নির্বিশেষে কংগ্রেদের জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের দাবি ? ওয়াভেল জ্ঞানপাপী। নিজেই স্বীকার করেছেন—**"I think I was wrong to begin with the 5 : 5 : 2 formula, also not to press Jinnah more strongly about a Congress Muslim from the very start."**[২০১] জিন্না তাঁব ২০ জুনেব চিঠি ফাঁস করে দেওয়ার অবশ্যম্ভাবী পবিণাম—কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিব ২২ জুনেব প্রস্তাব। সত্যিকার **'wrecker'** কে ?

এ কথা সত্য প্রথমে ১৬ মে-র ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করে পরে, ক্রিপস্ ও পেথিক-লরেন্সের পরামর্শে, তা গ্রহণ করে কংগ্রেস। তা নইলে ১৬ জুনের অষ্টম অনুচ্ছেদানুযায়ী সরকারে প্রবেশ করা যেত না। কিন্তু এই গ্রহণকে ওয়াভেল **'insincere'** বলেন কি করে ? গ্রুপিং সম্বন্ধে আপন মনোভাব কি গান্ধী, কি কংগ্রেস, কোনও দিন গোপন রাখেনি। বারবার বলেছে—১৫ ধারা অনুসারে তা ঐচ্ছিক এবং গণপরিষদ বসলে প্রদেশসমূহ নিজ নিজ ইচ্ছামত চলতে পারে। ১৫ ও ১৯ ধারার অসঙ্গতি কি কংগ্রেসের অপরাধ ? হয় এটা মিশনের অনবধানতার ফল, না হয় চাল। গান্ধী ছাড়া কারুব চোখে তা ধরা পড়েনি। কিন্তু সেই ক্ষুরধার আইনজ্ঞের যুক্তি কি গালাগালি দিলেই খণ্ডন করা যায় ? ওয়াভেলই বারবার জিন্নাকে **(cue)** কিউ দিয়ে, সুরে সুর মিলিয়ে, বলেছেন— গ্রুপিং আবশ্যিক। এটা কি লীগের প্রতি পক্ষপাতিত্ব নয় ? তিনি কি বোঝেননি লীগ গ্রুপিংকে পাকিস্তানের প্রথম সোপানরূপে ব্যবহার করবে ? তিনি জানতেন, জিন্নাও ১৬ মে-র ঘোষণা বিনা শর্তে গ্রহণ করেননি। যে পাকিস্তান (বৃহৎ ও ক্ষুদ্র) এড়াবার জন্য মিশনের এত

আয়োজন, লীগ কি তাকেই পাকিস্তান লক্ষ্যের উপায় বলে গ্রহণ করেনি ? প্রকাশ্যে প্রচাব করেনি ?

আসলে তাঁর মাথায় breakdown plan ঘুরছে—'পাকিস্তান' অবচেতন মনে গ্রহণ করেছেন তিনি। হিন্দুভারত থেকে পশ্চাদপসরণ করে সেখানেই তিনি সাম্রাজ্যের শেষ ঘাঁটি গাড়তে চেয়েছিলেন।

অন্তর্বর্তী সরকারের ব্যাপারে তাঁর ক্ষমতা কি হবে সে সম্বন্ধে নেহরু, প্যাটেল, আজাদ, গান্ধীর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার দাবি কোনদিন তিনি মেটাননি। কেন ? ১৯৪৫ সালে তো বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছিল। ভারতকে ডোমিনিয়ান ও কাউন্সিলকে ক্যাবিনেটের মর্যাদা দিলে কি ক্ষতি হত ? আসলে ওয়াভেল তাঁর তুরুপের তাস (ভিটো) হারাতে রাজি ছিলেন না। সন্দেহ হয়, অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করতে আদৌ তিনি রাজি ছিলেন কিনা। অন্তত কংগ্রেসকে বাদ দিতে পারলে খুশি হতেন। ১৬ জুনের ঘোষণার অষ্টম অনুচ্ছেদ যে জিন্নাকে খুশি কবার জন্য—নিজেই তিনি তা স্বীকার করেছেন। কিন্তু শুধু লীগকে নিয়ে সবকার গড়বাব ইচ্ছা থাকলেও সাহস ছিল না তাঁর। ক্যাবিনেট তাতে বাজিও হত না। কেযার টেকাবতো তাঁব অনুগত দাস হবে। ওয়াভেলের মত দর্পিত সৈন্যাধ্যক্ষেব কাছে সেই সবচেয়ে ভালো সমাধান মনে হযেছিল। কিছুদিন তো এভাবে গেল। সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গিব মধ্যে এই ad-hocism নিন্দনীয় কিন্তু তাব পেছনে রয়েছে তাঁব চবম ক্ষমতাপ্রিযতা। ১৯৪২-এ এই বীরপুরুষ গণবিদ্রোহ ব্যর্থ কবেছেন; R.I.N. ও R.A.F. বিদ্রোহ দমন কবেছেন ১৯৪৬-এ। তিনি কি কংগ্রেসেব মোকাবিলা কবতে পারবেন না ?"[২০২] এ আস্ফালন করুণা জাগায়। একই চিঠিতে তিনি বলছেন, "the services are tired and discouraged...the loyalty of the Police and the Indian army problemetical." তাহলে কি করে তিনি আপন অহমিকাব অচলাযতন বক্ষা কবতেন ?

॥ ৮ ॥

কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি ও ফরোযার্ড ব্লকেব চাপ সত্ত্বেও জুলাই-এর প্রথম সপ্তাহে বোম্বাইতে A.I.C.C. ক্যাবিনেট মিশনের দীঘমেযাদী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। তবু কংগ্রেসেব বিরাগ ফুটে ওঠে নতুন সভাপতি জওহবলাল নেহরুর ভাষণে। ৭ই জুলাই তিনি বলেন, "We are not bound by a single thing except that we have decided to go into the Constituent Assembly,"[২০৩] গণপবিষদের সার্বভৌমতা, কার্যপদ্ধতি ও সিদ্ধান্ত নিয়ে ব্রিটেন কোন আপত্তি তুলতে পাবে না। ১০ই জুলাই এক প্রেস সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "We agreed to go into the Constituent Assembly... We agreed to certain procedures for going into it. But we are absolutely free to act." কংগ্রেস গণপবিষদে যাবে—"Completely unfettered by agreements and face to meet all situations as they arise." সেকশন 'এ' গ্রুপিং মানবে না, সীমান্ত আপত্তি জানালে গ্রুপ 'বি' ভেঙে পড়বে, আসামও সম্ভবত বাংলার সঙ্গে জোট বাঁধবে না।[২০৩ক]

মৌলানা আজাদ তাঁব আত্মজীবনী—'ইন্ডিয়া উইনস ফ্রীডম'-এ উক্ত প্রেস বিবৃতিব

কঠোর সমালোচনা করেছেন, এমনকি তিনি নিজে সভাপতি না থেকে নেহরুকে সভাপতির পদ দেবার জন্য অনুশোচনাও করেছেন। " **I acted according to my best judgement but the way things have shaped since then has made me realise that this was perhaps the greatest blunder of my political life."**... তাঁর প্যাটেলকে সমর্থন না কবা ভুল হয়েছে। প্যাটেল সভাপতি হলে ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা কার্যকব হত, ভারত ভাগ হত না। **"He (Patel) would never have committed the mistake of Jawaharlal which gave Mr. Jinnah the opportunity of sabotaging the plan."**[২০৪]

মৌলানার কথা মেনে নিতে পারছি না। প্রথমত কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনে তাঁর কতটুকু হাত ছিল। প্যাটেল এবং কৃপালনি দাঁড়াতে চেয়েছিলেন। কিন্তু গান্ধীব হস্তক্ষেপে নেহরুর নির্বাচন স্থিব হয় ও ৯ই মে কৃপালনি জানান তিনি ও প্যাটেল সরে দাঁড়িয়েছেন। দ্বিতীযত নেহরুব ভাষণ ও বিবৃতি দুর্ভাগ্যজনক হতে পারে কিন্তু একেবাবে নিজস্ব প্রতিক্রিয়া নয। আজাদের বিশ্লেষণে—অনিচ্ছা সত্ত্বেও জিন্না ১৬ মে-র ঘোষণা মেনে নিয়েছিলেন.। তাঁর সমালোচকরা বলছিলেন, এই যদি ঘটবে তবে স্বাধীন ঐস্লামিক বাষ্ট্র নিয়ে জিন্না এতদিন গলাবাজি করলেন কেন? জিন্না বেশ অস্বস্তিবোধ করছিলেন, এমন সময় নেহরুর ভাষণ ও বিবৃতি বোমা ফাটাল। জিন্না পশ্চাদপসবণেব এমন সুযোগ হাতছাড়া করলেন না। কংগ্রেস সভাপতি কি না বলছেন—গণপবিষদেব সংখ্যাগবিষ্ঠ দল পরিকল্পনা ঢেলে সাজতে পারে? সংখ্যালঘুবা (মুসলমানবা) তবে হিন্দুদেব হাতেব মুঠোয় চলে যাবে? আসলে এ ধবনের কথা ১৬ মে-ব ঘোষণা বর্জনেব সামিল এবং ১৬ জুনেব ঘোষণামত বড়লাটের উচিত কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে লীগ ও অন্যান্যদের নিয়ে সবকাব গঠন।

শুধু আজাদ নয়, প্যাটেলও সমালোচনা করেছিলেন এবং অনেক কড়া ভাষায। তিনি বলেছিলেন এটা নেহরুর **'Emotional insanity'**র লক্ষণ।[২০৫] গান্ধী পর্যন্ত বলেন, "আমাদের ঘোষণার সীমার মধ্যে চলতে হবে।"[২০৬] প্যাটেল, গান্ধী, আজাদ প্রত্যেকেরই মনে হয়েছিল জিন্নারূপ মনসার সামনে নেহরু অযথা ধুনোর গন্ধ দিচ্ছেন। কংগ্রেসেব মনে যতই আপত্তি থাকুক, তা এই সঙ্কটময় মুহূর্তে চিৎকাব করে বলা রাজনীতি নয।

কিন্তু এটা কি সত্যি 'আবেগেব উন্মত্ততা'? আমার মনে হয—দীর্ঘদিনের কংগ্রেসী ভাবনা এবং বামপন্থী সোশ্যালিস্টদের খুশি বাখাব চেষ্টাব ফলশ্রুতি এটা। নেহরুর ওয়ার্কিং কমিটিতে অন্তত পাঁচ জন বামপন্থী ছিলেন—শরৎ বসু, রফি কিদোয়াই, কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়,আর এস পটবর্ধন ও মৃদুলা সারাভাই। তাঁরা তো বোম্বাই এ আই সি সি-তে ১৬ মে-র ঘোষণার প্রতিবাদ করেছিলেন। গান্ধীও কি বারংবাব একই কথা বলেননি? স্মরণ করুন তাঁর ৮ মে-র মন্তব্য, ১৭ মে-র 'হরিজন' পত্রিকাব প্রবন্ধ, ১৮ মে-র ক্রিপস্‌কে প্রশ্ন, ১৯ মে ভারতসচিবকে লেখা চিঠি। আজাদ আগে যাই বলুন, গান্ধীর তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখে তিনিও সুর বদলে ছিলেন। ২০ মে-র আজাদের চিঠি 'হরিজন' প্রবন্ধের প্রতিধ্বনিমাত্র। গান্ধীই প্রথম ঘোষণার ১৫ ও ১৯ ধারার স্ববিরোধিতা দেখান—১৫ ধারায় প্রদেশেব স্বাধীনতা স্বীকৃত, আবার ১৯ ধারায় তাদের সেকশনে প্রবেশ আবশ্যিক। এখন যদি, লীগেব ব্যাখ্যানুসারে, সেকশন সাধারণ মেজরিটির ভিত্তিতে গ্রুপিং ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয় তবে কি তা প্রাদেশিক স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করবে না? এই সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা (simple majority) দ্বারা সিদ্ধান্ত নেবার দাবি গোপনে মেনে নিয়েছেন মিশন—জিন্নাকে খুশি করার জন্য। কিন্তু কংগ্রেস তো মেনে নেয়নি।

এছাড়াও রয়েছে ২৫ জুনের ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব। বস্তুত ক্রিপস্ ও পেথিক-লরেন্স মন্ত্রণা না দিলে কংগ্রেস দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা কোনদিনই নিত না। নেওযাব সময় কংগ্রেসেব যে সব মানসিক বাধা (mental reservations) ছিল তাও পরিষ্কার বলা হয়েছিল। গ্রুপিং-এর আবশ্যিকতার বিষয়ে আপত্তি তার অন্যতম। এই জন্যই ওযাভেল ও অ্যালেকজান্ডাব কংগ্রেসের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণকে 'dishonest','insincere' আখ্যা দিয়েছিলেন। উত্তরে কংগ্রেস জানিযেছিল—লীগেব গ্রহণও আন্তবিক নয়।[২০৭] বোম্বাই এ আই সি সি জুলাইতে ওযার্কিং কমিটির মতই সমর্থন করেছিল। তাহলে, সভাপতির ১০ই জুলাই-এব প্রেস বিবৃতিব এত নিন্দা কবা হচ্ছে কেন ? নেহরু আজাদেব মন্তব্যেব প্রতিবাদে অনেক পবে বলেছিলেন, ঘটনা পবম্পবাকে ঐতিহাসিক শক্তিব ক্রিযা বলে না দেখে ব্যক্তিগত ভুলত্রুটির ফল বলে দেখা ঠিক নয়।[২০৮]

জওহরলালের ৭ ও ১০ জুলাই-এর মাত্র দুটি বিবৃতিই কি মিশনের ব্যর্থতা ও দেশভাগের জন্য দায়ী ? নিরাসক্ত ঐতিহাসিক বলবেন, কখনই তা নয। জিন্না আগেই ঠিক করেছিলেন আবশ্যিক গ্রুপিং ও শাসনপরিষদে সব মুসলিম সদস্যের মনোনয়নের একচেটিয়া ক্ষমতা না পেলে তিনি পিছু হটবেন।[২০৯] বড়লাটেব একতবফা প্রতিশ্রুতি তাঁকে ১৬ জুনের ঘোষণা গ্রহণ ক'রতে প্রণোদিত করে। পেথিক-লবেন্স ও ক্রিপসের সঙ্গে গান্ধীব দেখা শোনা চলতে দেখে তাঁর মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়। ওযাভেল উদ্বিগ্ন হন জিন্না তাঁকে বিশ্বাসঘাতক ভাববেন বলে। জিন্না অ্যাটলিকে ৬ই জুলাই (কংগ্রেস সভাপতিরূপে নেহরুর ভাষণের একদিন আগে) লেখেন, মুসলিমদের মূল্যে কংগ্রেসের কাছে আত্মসমর্পণ কবে সরকাব মুসলিমদের রক্তপাতের দিকে এগিয়ে দিচ্ছেন। মনে রাখতে হবে এই চিঠি জিন্নার প্রত্যক্ষ সংগ্রাম (direct action)-এর হুমকির পূর্বাভাস। ৭ই ও ১০ জুলাই-এব নেহরুব শিথিল কথাবার্তা লীগের মনে আশঙ্কা জাগাল—তবে কি তিনটি বিষযেব বাইবেও ক্ষমতা চাইবে কংগ্রেসশাসিত যুনিয়ান কেন্দ্র ? আন্তঃ প্রাদেশিক কলহে নাক গলাবে ? লীগের (মুসলিম) শিল্পপতি পৃষ্ঠপোষকরা টাটা, ডালমিযা, বিড়লার প্রভুত্ব মেনে নেবে ? ১২ জুলাই ব্রিটিশ সরকারের কাছে জিন্না আবেদন জানালেন কংগ্রেসেব ১৬ মে ঘোষণা মেকি, তাব মুখোশ খুলে দেওয়া হোক। ১৮ই জুলাই পেথিক-লবেন্স ও ক্রিপস্ পার্লামেন্টে বললেন, গণপরিষদের সদস্যরা গৃহীত শর্তের বাইরে যেতে পাবে না। কিন্তু পেথিক-লবেন্সেব উত্তব কিছু ধোঁয়াটে রযে গেল। গণপবিষদের ক্ষমতা সম্বন্ধে কোন "সোজা, নির্দিষ্ট, স্পষ্ট" উত্তর দিতে নারাজ হলেন তিনি।[২১১] সন্দিগ্ধ লীগ কাউন্সিল (২৯ জুলাই) ১৬ মে ঘোষণায় তাদের সম্মতি প্রত্যাহার কবল। প্রস্তাব নিল—এখুনি 'স্বাধীন সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্রে'ব কম কিছু পেলে তারা ছাড়বে না—সময় এসেছে "to resort to Direct Action to achieve Pakistan." লীগ কাউন্সিল ওয়ার্কিং কমিটিকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের একটা ছক তৈরি করতে নির্দেশ দিল।[২১২]

তবু আমাদের মনে বাখতে হবে জিন্না দলেব চাপের কাছে আপন নেতৃত্বেব স্বাধীনতা পুরো বিসর্জন দিলেন না। ওযার্কিং কমিটিকে বলা হল—"to organize the Muslims for the coming struggle as and when necessary." তাছাড়া প্রত্যক্ষ সংগ্রামেব কোনো বিস্তৃত ব্যাখ্যা তিনি দিলেন না (পাকিস্তান-এরও দেননি)। আযেষা জালাল মন্তব্য করেছেন, "Direct action, the 'pistol' pointed at Congress in response to its 'threat to launch mass civil disobedience' was played as a metaphor, not proposed as a fact."[২১৪] এটা তিনি কবতে বাধ্য

হলেন। যদি না করতেন, তবে, সিন্ধুর মুখ্যমন্ত্রীর মতে, তিনি ক্ষমতাচ্যুত হতেন।[২১৫] এইভাবে বামপন্থীদের চাপে নেহরু ও উগ্রদক্ষিণপন্থীদের চাপে জিন্না সর্বনাশের দিকে এগিয়ে চললেন। ৩১ জুলাই জিন্না বডলাটকে বলেছিলেন, অন্তর্বর্তী সরকারে তাঁরা আসছেন না কারণ কংগ্রেসকে অন্যায়ভাবে মদত দেওয়া হচ্ছে। ওয়াভেল অবশ্য 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামে'র হুমকিতে ভয় পাননি, ব্রিটিশ সবকারকে চাপ দিয়ে আবশ্যিক গ্রুপিং ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি পাবার একটা চাল বলে মনে করেছিলেন। অর্থাৎ নেহরুর ১০ জুলাই-এর চালে জিন্নার পালটা চাল।[২১৬] কিন্তু কি ব্রিটেন কি কংগ্রেস জিন্নাকে তুষ্ট করার জন্য এগিয়ে এল না। তখন ওয়াভেলের মাথায় এক বুদ্ধি এল। যদি কংগ্রেসকে সরকাবে আনা যায় তবে দায়িত্ববোধ তাকে সুবুদ্ধি দিতে পারে, তারা কম্যুনিস্ট ও সোশ্যালিস্টদেব বাড়াবাড়ি দমিযে রাখতে পাবে। তাঁর কাছে খবর আসছিল প্যাটেল ও দক্ষিণপন্থীবা অন্তর্বর্তী সবকারে ঢুকতে আগ্রহী, এমনকি তাতে বাগড়া পড়লে ওয়ার্কিং কমিটি ছেড়ে দেবেন প্যাটেল। প্যাটেলের মনে হয়েছিল, সরকার না গডলে নৈরাজ্য ঠেকানো যাবে না।[২১৭] ওয়াভেল লিখছেন, প্যাটেল নেহরুকে প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছেন।[২১৮]

৬ই আগস্ট ওয়াভেল নেহরুকে সবকার গঠনের আহ্বান জানালেন। ৮ই আগস্ট তিনি জিন্নাকে পরামর্শ দিলেন কংগ্রেসের ডাক এলে সাড়া দিতে। জিন্নাকে রাজি কবাতে ওযার্কিং কমিটি (ওয়ার্ধা) ১০ আগস্ট প্রস্তাব নিল যে সব বিতর্কিত বিষয়ে ব্যাখ্যার জন্য ফেডারেল কোর্টে আবেদন করা চলবে। গণপরিষদ সার্বভৌম এ দাবিও কিছুটা জোলো করা হল। ১৫ই আগস্ট নেহরু-জিন্না সাক্ষাৎকারে নেহরু জানালেন, উভয়পক্ষের সম্মতি বিনা গণপরিষদে কোনো সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের সমাধান হবে না, মতানৈক্য ফেডারেল কোর্টে তোলা যাবে, আর 'প্রদেশরা চাইলে' কংগ্রেস গ্রুপিং-এও বাধা দেবে না। সরকাবে লীগেব জন্য পাঁচটি আসন সংরক্ষিত থাকবে, তবে কংগ্রেস তাব কোটা থেকে মুসলিম মনোনযন করতে পারবে। এর চেয়ে বেশি সুবিধা দেওয়া কংগ্রেসের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু জিন্না বিচলিত হলেন না বরং আবদার ধবলেন—ছয় মাস সব ব্যবস্থা পিছিয়ে দেওযা হোক।[২১৯] তদুপরি লীগ ১৬ই আগস্টকে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' ঘোষণা করল।

কুরুক্ষেত্রেব প্রথম পর্ব অনুষ্ঠিত হল কলকাতায়। পরে তা ছড়িয়ে পডল নোয়াখালি ও বিহারে। বাংলায় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষেব প্রমাণ উনিশ শতক থেকে মেলে। বিংশ শতাব্দীব গোড়ায় (১৯০৬-৭) মৈমনসিংহে এর বীভৎস প্রকাশ ঘটে বিলাতীবর্জন কেন্দ্র কবে। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা কবেছেন সুরঞ্জন দাশ তাঁব Communal Riots in Bengal 1905-1947 শীর্ষক অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়েব গবেষণাপত্রে (১৯৮৭)। তাব পূর্বে বর্তমান লেখক ও অধ্যাপক সুমিত সবকার ঢাকা বিভাগেব কমিশনাব ন্যাথান, ল্য মেজুবিয়ের (Le Mesurier)ও অন্যান্য সরকারী রিপোর্ট থেকে দেখিয়েছেন যে সাম্প্রদাযিকতাব দুটি স্তব ছিল—একটি উচ্চবর্গীয় (elitist), অন্যটি নিম্নবর্গীয। পূর্ববঙ্গেব হিন্দু জমিদার, আমলা ও মহাজনদের শোষণ এবং অত্যাচার ওই অঞ্চলের সাম্প্রদাযিক উত্তেজনার জন্য অনেকটা দায়ী ছিল। তাব সঙ্গে যোগ দিয়েছিল খাদ্যমূল্যবৃদ্ধি, মহামাবীর প্রকোপ ইত্যাদি। কার্জনের বঙ্গভঙ্গের ফলে ওপবতলাব হিন্দু ও মুসলিম ভদ্রলোকদেব মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা নিয়ে বিরোধ নতুন এক মাত্রা যোগ কবল এব সঙ্গে। মুসলিমদেব অবিসংবাদী নেতা ছিলেন ঢাকার নবাব।

নামী সংবাদপত্র, পুস্তিকা ও বক্তৃতা মারফত উত্তেজনা ছড়িয়ে পডছিল। 'সন্ধ্যা' ও 'বন্দেমাতরম্'-এর মত কাগজ, 'নবাব সাহেবের সুবিচার' ও 'লাল ইস্তাহার' এর মত পুস্তিকা,

মুল্লাদের বক্তৃতা—সরকারী দলিলে উল্লিখিত। ফুলপুর দাঙ্গার পেছনে মুল্লারা মৌলবাদী প্রেরণা জুগিয়েছিল। পক্ষে স্থানীয় নেতৃত্ব দিচ্ছিল পাটচাষে সদ্য বড়লোক মুসলিম জোতদার এবং তাদের সমর্থন করছিল মুসলিম প্রজা ও খাতক, অনেক ক্ষেত্রে বিহারী ও ইউ· পি থেকে আগত মুসলমান। হিন্দু পক্ষে ছিল জমিদারের নায়েব, বরকন্দাজ, স্বদেশী ছাত্রের দল। নেতৃত্ব অনেক ক্ষেত্রে গৌরীপুর, রামগোপালপুর, নাটোরের মত বড় জমিদারীর নায়েব এবং উকিল শ্রেণীর হাতে। হিন্দুপ্রতিমা, কাছারী, হাট, মহাজনের গদী'র ওপর হামলা দিয়ে সংঘর্ষ শুরু। ধোবা, তাঁতি, গোয়ালার মত নিম্নশ্রেণীর হিন্দুও বাদ যায়নি। হিন্দু মহিলাদের ওপর অত্যাচার-এর কথা স্বীকার করেছেন ক্লার্ক ও ল্য মেজুরিয়ের। হিন্দুদের ধারণা হয়েছিল পুলিশ এবং সরকারের নীচু আমলা থেকে লাট—ফুলার পর্যন্ত সবাই তাদের বিরুদ্ধে। কথাটা উড়িয়ে দেবার নয়। তবে কি হিন্দু কি মুসলিম ভদ্রলোক বেশি বাড়াবাড়ি হতে দিতে রাজি ছিলেন না। তাঁরা নীচুতলার মানুষদের চাকরি ও এম এল এ পদের লড়াইতে কামানের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য রবীন্দ্রনাথ 'ব্যাধি ও তাহার প্রতীকার' প্রভৃতি প্রবন্ধে যে সব সদুপদেশ দিয়েছিলেন কেউ তা গ্রাহ্য করেনি।[২২০]

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মতে পূর্ববঙ্গের (সাধারণত মুসলমান) কৃষক সমাজ পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় অনেক বেশি অবিভক্ত (undiffrentiated) হলেও উত্তর, পূর্ব ও মধ্যবঙ্গে একটা মুসলিম জোতদার শ্রেণী গড়ে উঠছিল। খুলনার উপকূলাঞ্চলের আবাদকারী প্রজা বেশ সম্পন্ন ছিল। নোয়াখালির মুসলিম কৃষকেরা হাওলাদার, তালুকদার এমনকি জমিদার বলে পরিগণিত হত। ত্রিপুরায় ব্যাপারীর কাজে টাকা করে অনেকে মালিক পদবাচ্য হয়েছিল। দিনাজপুরে মুসলিম জোতদাররা ছিল সমাজের মাথা। অনেকেই এদের মধ্যে চাষের কাজও করত। অন্য দিকে ঢাকা ও ফরিদপুরে খুব কম মধ্যস্বত্বাধিকারীর দেখা মিলত। পূর্ববঙ্গের জমিদাররা আসত মুখ্যত উচ্চবর্ণের হিন্দু (প্রায় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ) থেকে। পাট চাষের এলাকায় মাড়োয়ারী মহাজন ও সাহা মহাজন গ্রাম্য দাদনের ব্যবসায় একটা বড়ো ভূমিকা নিত। বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্কিং এনকোয়ারি কমিটির ১৯২৯-৩০ রিপোর্টে দেখি জমিদার, পেশাদার, এমনকি মধ্যবিত্ত বিধবারাও মহাজন বনে গেছেন।

এই শতকের বিশের দশকে পূর্ববাংলার হিন্দু জমিদাররা অনেকেই শহরে বসবাস করতেন। হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যাও গ্রামাঞ্চলের তুলনায় বেশি। এদের অনেকেই যুক্ত ছিল পাইকারী ও খুঁচরো ব্যবসায়ে। স্বভাবতই তাই মুসলিম শহরবাসী ও গ্রামাঞ্চলের মুসলিম চাষীদের সঙ্গে এদের সংঘর্ষ লেগে যেত। দুর্গাপূজা (বিশেষত বিসর্জন) উপলক্ষে মসজিদের সামনে বাদ্যোদ্যম, সংকীর্তন, জন্মাষ্টমীর মিছিল অনেক দাঙ্গার অব্যবহিত কারণ। অন্য দিকে কোরবানি ছাড়াও হিন্দুনারী ধর্ষণের জন্য মুসলমানরা হিন্দুদের বিশেষ বিরাগভাজন হয়। এ সব বিষয়ে উভয়পক্ষের মধ্যে একটা কনভেনশান গড়ে তোলার চেষ্টা করে সরকার। মনোমালিন্য বাধত প্রথা ভাঙা হলে। হিন্দুরা জবাব দিত হরতাল ও মুসলিম গাড়োয়ান, সহিস, মিস্ত্রি, বাজনাদার ইত্যাদি বর্জন করে। এটা আবার দরিদ্র মুসলমানদের রুজি রোজগারের সমস্যা তীব্রতর করত। আর্থিক বৈষম্যের জন্য মাৎসর্য ও হীনমন্যতার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল বেকারীর আশঙ্কা।

মুসলমানরা বুঝতে পারছিল যে আপন সাম্প্রদায়িক সত্তা উপলব্ধি করতে গেলে তার একটা সম্পত্তিগত ভিত্তি চাই। ফজলল হকের কৃষক প্রজা পার্টি এব্যাপারে বড়ো ভূমিকা নিল। ১৯২৮ সালে হক বাংলা আইন পরিষদে প্রজাস্বত্ব আইনের যে সংশোধনী বিল পাশ

করালেন তাতে দখলদার রায়তী স্বত্বের ক্ষেত্র বিস্তৃত করা হল। এই স্বত্ব হস্তান্তর কালে মালিককে দিতে হবে ২০% সেলামি ও প্রথম কিনে নেবার অধিকাব (right of preemption)। আইন পরিষদেব মুসলিম ব্লক (এমনকি স্যার আবদার রহিম ও খাজা নাজিমুদ্দিন) অধীনস্থ রায়তের পক্ষে ও জমিদারের বিপক্ষে ভোট দেয়। স্বরাজ্যব্লকের ভোট পড়েছিল জমিদারের পক্ষে। মৈমনসিংহের মহারাজা ও চাকদিঘীর, নাড়াজোলের বা উত্তরপাড়ার জমিদার এমনটি করতে পারেন, কিন্তু চিত্তরঞ্জন দাশের তথাকথিত শিষ্যের দল (অনেক বড় আইন ব্যবসায়ী ও ব্যবসাদার) কি করে এ কাজ করলেন বলা মুশকিল। কাঁথিতে এই নিয়ে দেশবন্ধু-শিষ্য বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ও প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে বিতর্ক হয়েছিল তাতে বোঝা যায় হিন্দুরা প্রজাস্বত্ব আইনের ব্যাপাবে প্রচণ্ড দ্বিধাগ্রস্ত। এ সব কাণ্ড দেখে আবুল মনসুর আহমদ বলছেন, "কি মুসলিম স্বার্থ, কি প্রজাস্বার্থ কোন বিষয়ে আর কংগ্রেসের ওপর নির্ভব করা যায় না।" বাংলার হিন্দু সেদিন অজ্ঞাতে দেশভাগের পক্ষেই ভোট দিয়েছিলেন।[২২১] ১৯৩০-এ ঢাকার দাঙ্গার বৃত্তান্ত মিলবে রিপোর্ট অব দ্য ঢাকা এনকোয়ারি কমিটি ১৯৩০-এ। ১৯৩০-এর দশকে যে সব দাঙ্গা হয় তাব বিবরণ পাওয়া যাবে রিচার্ড ল্যাম্বার্টের পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত 'Hindu-Muslim Riots' শীর্ষক থিসিসে।

কলকাতার নেতৃত্ব (আবদার রহিম, আবদুল মোমেন, মশাবফ হোসেন)-কে চ্যালেঞ্জ করে ফজলল হক পার্টির সভাপতি হলেন ১৯৩৫-এ। তখন প্রজাদেব দুঃখ আবো বেড়েছে বিশ্বমান্দ্যেব ফলে। আজিজুল হক The Man Behind the Plough গ্রন্থে যে পরিসংখ্যান দিচ্ছেন তাতে দেখা যাচ্ছে দখলদাবী বাযতী স্বত্ব হস্তান্তব বদলে ছিল নিম্নরূপে :[২২২]

সারণী-১

বৎসব	হস্তান্তব সংখ্যা
১৮৮১-৮২	২৫,৪৪৮
১৯১৩	২৫০,০০০
১৯২৩	৩১৪,০০০
১৯২৯	৮৫,৩৬১
১৯৩০	১৫২,৬৩৯
১৯৩১	১৭৬,২৪৯
১৯৩২	১৮৮,৭৩৭
১৯৩৩	১৯২,৮৯২
১৯৩৪	২৩৫,১৪৭
১৯৩৫	২৬১,২৯৭
১৯৩৭	২৯৫,৩৭১

বিনয়ভূষণ চৌধুরীর পরিসংখ্যান (রেজিস্ট্রেশন ডিপার্টমেন্টের দলিল মতে)-এ দেখা যায়[২২৩]

সারণী-২		
বৎসর	দখলদারী স্বত্ব বিক্রয়	দখলদারী স্বত্ব বন্ধকী
১৯৩০	১,২৯,১৮৪	৫,১০,৯৭৪
১৯৩১	১,০৫,৭০১	৩,৭৬,৪২২
১৯৩২	১,১৪,৬১৯	৩,৩৮,৯৪৫
১৯৩৩	১,২০,৪৯২	৩,১৩,৪৩১
১৯৩৪	১,৪৭,৬১৯	৩,৪৯,৪০০
১৯৩৫	১,৬০,৩৪১	৩,৫৭,২৯৭
১৯৩৬	১,৭২,৯৫৬	৩,৫২,৪৬৯
১৯৩৭	১,৬৪,৮১৯	৩,০২,৫২৯

ক্রমবর্ধমান ঋণের চাপ যে জমি বিক্রয়ের অন্যতম কারণ তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। মান্দ্যের ফলে শস্যের দাম পড়ে যায়, তাই জমি আর বন্ধকযোগ্য ছিল না।[২২৪] জমি কিনছিল সাধারণত ব্যাপারী ও মহাজনেরা (অনেক ক্ষেত্রে এক)। তারা অধিকতব খাজনায় বিক্রেতা কৃষককেই চাষ করাব অধিকার দিচ্ছিল।[২২৫] এ সব রুখতে ১৯৩২-এ বেঙ্গল মানিলেন্ডার্স বিল ও ১৯৩৫-এ বেঙ্গল অ্যাগ্রিকালচারাল ডেটারস বিল আনা হয়। বিশেষ কাজ হয়নি। হিন্দু ভদ্রলোকের প্রতিবাদ তাদের বিরুদ্ধে জনমত নিয়ে যায়।

১৯৩৮ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন আবাব সংশোধন করতে হল। ১৯২৮ সালের সংশোধনীতে মালিকদের যে সেলামি ও প্রথম কেনার অধিকার দেওয়া হয়েছিল তা প্রত্যাহৃত হল। সার্টিফিকেট দ্বারা খাজনা আদায় বন্ধ কবা হল। ১৯২৮-এর পূর্বে বা পরে যে সব অধীনস্থ প্রজা দখলি স্বত্ব অর্জন করেছিল তাদের পুরো স্বত্ব দেওয়া হল। অনাদায়ী খাজনার ওপর সুদের হার $১২\frac{১}{২}$% থেকে কমিয়ে $৬\frac{১}{৪}$% করা হল। খাজনা বৃদ্ধির যে সব সুযোগ ১৯২৮-এ দেওয়া হয়েছিল তা দশ বছরের জন্য মুলতুবি রাখা হল। কৃষকদের জমি ভাগ করার অধিকারও দেওয়া হল।[২২৬]

এতেও কৃষক প্রজা পার্টির অনেকের আশা পূর্ণ হয়নি। হক গ্রামে গ্রামে ঋণসালিশী বোর্ড গঠন করলেন; ১৯৪০ সালে The Agricultural Debtors (Second Amd.) Act পাশ করলেন। ওই সালেই Bengal Money-lenders Act পাশ হল এবং বন্ধকী ঋণের সুদ ৬% ও বন্ধকহীন ঋণের সুদ ৮%-এ বেঁধে দেওয়া হল। কিন্তু যুদ্ধের ফলে যে খাদ্যমূল্যবৃদ্ধি, বেকারী প্রভৃতি দেখা দিল তাই রচনা করল ১৯৪১-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিকা।[২২৬ক] ঢাকা, বাখরগঞ্জ, খুলনা ও চট্টগ্রামে মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল বহু শত। নারায়ণগঞ্জের রায়পুরা ও শিবপুর থানার ভীত হিন্দুরা পালিয়ে গেল। সবসুদ্ধ ৮১ গ্রাম ও ১৫৭২৪ জন ব্যক্তি এর শিকার হয়, প্রায় ৭০০ বাড়ি পোড়ে।[২২৭] মৌলভী মুল্লাদের ভূমিকা স্পষ্ট। 'হক সাহেব কি জয়', 'নবাব সাহেব কি জয়'—ধ্বনির সঙ্গে শোনা গেল 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ'। তবে তখনও পাকিস্তান রাজনৈতিক দাবি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মুরাপাড়ার জমিদার ও পাল-সাহা মহাজনদের শোষণ একটা বড় কারণ ছিল রায়পুরা ও শিবপুর এলাকার দাঙ্গার।

ভাগ্যের কথা, ত্রিপুরার অধিকাংশ মানুষ সুবুদ্ধি দেখায়। নোয়াখালির সাংসদরা

অসাম্প্রদায়িক পণ নিয়েছিলেন। ১৯৪১ সালের হক যে প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন দল কবলেন তার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু-মুসলিম প্রীতি। কিন্তু হকের সঙ্গে হিন্দু মহাসভাব শ্যামাপ্রসাদ যোগ দেওযায পূর্ববঙ্গে অনুকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হযনি। আবুল মনসুব আহমদ বলছেন, শবৎ বসুকে তাবা বিশ্বাস কবলেও শ্যামাপ্রসাদকে নয়। কিন্তু শবৎ বসুকে জাপানীদেব সঙ্গে ষডযন্ত্রেব অভিযোগে গ্রেফতাব করা হলে শ্যামাপ্রসাদ হিন্দুদেব মুখপাত্র হলেন। ১৯৪২-এব শেষে তিনি পদত্যাগ করায় কিছু মুসলমান ক্ষুব্ধ হন। হাববার্টেব চাতুরীর ফলে নাজিমুদ্দিন যখন ১৯৪৩-এর এপ্রিলে মুখ্যমন্ত্রী হলেন, তখন আবাব জমিদাব-বিবোধী সাম্প্রদায়িক জিগিব উঠল। মধ্যে ঘটে গেছে বন্যা ও ভযাবহ দুর্ভিক্ষ। পূর্ববঙ্গে (এবং মেদিনীপুরেও) কৃষকবা আবাব জমি হাবাতে থাকে।[২২৭ক] সবচেয়ে দুর্গত এলাকা হল ঢাকাব নারাযণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ . ফবিদপুবের গোযালন্দ, ফবিদপুব, মাদারীপুব ; ত্রিপুবাব ব্রাহ্মণবেড়িযা, কুমিল্লা, চাঁদপুর , নোযাখালিব নোয়াখালি ও ফেনি। যাদেব জমি ২ একবেব কম, তারাই বেশি জমি বেচেছিল।

১৯৪৩ থেকে ১৯৪৬-এব মধ্যে কৃষক প্রজা সমিতিব স্থানীয নেতাবা লীগে ঢুকতে লাগল।[২২৮]

আবুল হাশেমও ব্যতিক্রম নন।[২২৮ক] আবুল মনসুর আহমেদ ১৯৪৫-এব ২৩ নভেম্ববেব মিল্লাত-এ লিখলেন, লীগই এখন কৃষক প্রজা আন্দোলনেব অগ্রগামী দল। পাকিস্তানেব বাজনৈতিক ব্যাখ্যা জোবদাব হল—যেন তা শুধু মুসলিম স্বাতন্ত্র্য অর্জন নয, মুসলিম জনসাধাবণেব আর্থিক আকাঙ্ক্ষাবও অঙ্গীকাব। আবও দেখা গেল—যেখানে প্রত্যেক যুনিয়ানে লীগেব শাখা, সেখানে কংগ্রেস প্রায নিশ্চিহ্ন। লীগ সব প্রতিদ্বন্দ্বীকে 'কৌমি গদ্দব' (national traitors) আখ্যা দিতে লাগল। তারা হিন্দুদেব চব, তাদেব বিশ্বাস কবা যায না। সুভাষেব শিষ্য আশ্রফাউদ্দিন চৌধুবী পাঁচ বছব জেলে কাটিযে ত্রিপুবায পদার্পণ কবে যে দৃশ্য দেখেছিলেন তাব বর্ণনা পাই 'বাজদ্রোহী' গ্রন্থে। জাতীযতাবাদী মুসলিম ও কংগ্রেসপক্ষীয কৃষক প্রজাদেব মিটিং ভেঙে দেওয়া হতে লাগল এবং অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয সরকাবী কর্মচাবী মদত দিল।

১৯৪৫/৪৬-এ যে নির্বাচন হল তাতে একদিকে লীগ, অন্যদিকে কংগ্রেস সমর্থিত হকেব অধীনস্থ 'বেঙ্গল ন্যাশনালিস্ট মুসলিম পার্লামেন্টারী পার্টি'। জামিযাৎ থেকে মৌলানা হুসেন আহ্‌মেদ মদ্‌নিকে ত্রিপুবায় পাকিস্তানেব বিরুদ্ধে, জাতীযতাবাদের পক্ষে, বক্তৃতা দিতে ডাকা হল। মারামাবি হয়ে গেল উভয দলে। নোযাখালি ও ত্রিপুবায় অলীগ কৃষক সমিতিব নেতাবা ভোটে হারলেন।[২২৯] প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে লীগ ১২৩টি মুসলিম আসনের ১১৩টি দখল কবল। হকের দল ৮৭টি আসনে লড়ে পেল মাত্র পাঁচটি (দুটিতে হক স্বয়ং)। মুসলিম লীগ পেল ২,০১৩,০০০ মুসলিম ভোট, প্রতিপক্ষ—২,৩২,১৩৪।[২৩০] কংগ্রেস সুরাবর্দির সঙ্গে কোয়ালিশন করতে রাজি না হওযায় বাংলা হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদাযে বিভক্ত হয়ে গেল।[২৩১] কি মফস্বলের কি কলকাতাব সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ আর রোখা গেল না। জলপাইগুড়ি ও দিনাজপুবের তেভাগা আন্দোলন (১৯৩৯-৪০) ও পববর্তীকালের (১৯৪৬-৪৭) বৃহত্তর তেভাগা আন্দোলন (উত্তরবঙ্গের সাথে ২৪ পবগনা জড়িত হয) মুসলিম জোতদারদেব মনে বেশ ভীতির সঞ্চার করে।[২৩১ক] গাবো অঞ্চলে হাজং উপজাতিরাও নগদ খাজনার আন্দোলন করছিল। আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন কম্যুনিস্ট পার্টি। কৃষকদের নেতা ছোট মুসলিম চাষী ও আধিয়াবরা হলেও মাঝারি, ছোট মুসলিম জোতদার ও বড় মুসলিম চাষীদের দৃষ্টিতে কম্যুনিস্টও হিন্দু সমার্থক হয়ে

দাঁড়ায়। যদিও কম্যুনিস্ট নেতাবা 'জান দেব তবু ধান দেব না' জিগিব তুলেও মুসলিম বর্গাদাবদের খেপাতে দ্বিধাবোধ কবছিলেন, তবু অনেকেব ধারণা হয় পশ্চিমবঙ্গ (অর্থাৎ হিন্দু) থেকে আলাদা হয়ে যেতে পাবলে শ্রেণী স্বার্থ বাঁচবে। সুবাবর্দি মন্ত্রিসভা আনীত বর্গাদাব বিলে (Bargadars Temporary Regulation Bill, কলিকাতা গেজেট, ২২ জানুয়ারি ১৯৪৭) পশ্চিমবঙ্গের জমিদাব, জোতদারদেব ভয় হয়—আন্দোলনটা যেভাবে উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণ ২৪ পবগনা ও মেদিনীপুবেব তমলুক/নন্দীগ্রামে ছড়িয়ে পড়ছে, দেশভাগই যোগ্য সমাধান। হিন্দু উকিল, অধ্যাপক, চাকুবে, বুদ্ধিজীবীদেব অনেকেই সে কথা ভাবছিলেন।

১৯৪৬-এর কলকাতাব দাঙ্গাব পেছনেও একটা ইতিহাস আছে। ব্রুমফিল্ড ১৯১৮ সালেব দাঙ্গাব বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন এব পেছনে ছিল পঞ্জাবী—হাবিব সা, মাদ্রাজী—কালামি ও বিহারী—ফজলুর রহমান। কলকাতাব উর্দুভাষী মুসলিম ব্যবসায়ী, ছোট কাবিগর, মিলশ্রমিকদেব মধ্যে এদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। অতিবৃষ্টিব ফলে শস্যহানি, বস্ত্রের অত্যাধিক মূল্য, ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামাবী একটা আতঙ্ক সৃষ্টি কবেছিল। ইডিওলজিব দিক থেকে কাজ করছিল খিলাফৎ আন্দোলন। দুর্গাপুজো ও বকর-ঈদেব এককালীনতা এদেব সুযোগ দেয়। মুসলিম প্রেস ১৯১৭ সালেব বিহাবেব দাঙ্গাব ভযাবহ সব স্মৃতি বোমন্থন কবে উত্তেজনা ছড়ায়। হাতেব কাছেই লক্ষ্য ছিল—মাড়োযারী ব্যবসায়ী, যাবা কাপড়েব দাম বাড়িয়ে বেখেছে আর গোহত্যাব সব থেকে জোব প্রতিবাদ জানায়। বড়বাজাব এলাকায় হিন্দু-মুসলিমবা পাশাপাশি থাকায় বিদ্বেষটা প্রবলতব হয়। আত্মরক্ষার্থ মাড়োয়াবীবা লাঠিয়াল আনলে তাতে ইন্ধন পড়ে। ইন্ডিয়ান ডেইলি নিউজ-এ মহম্মদ সম্বন্ধে অশোভন লেখা তাকে দাবানলে পবিণত কবে। মাড়োযাবী বাড়ি থেকে গুলি চললে দাঙ্গা শুরু হয়। সৈন্য নামাতে হয়। কিন্তু তাব আগেই মাড়োয়াবী গদিলুঠ, অগ্নিসংযোগ, হত্যা ঘটে গেছে।

ব্রুমফিল্ডেব মতে এটা সাধাবণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নয়—"The organisations through which they worked were political, and they played upon political as well as communal grievances." মুসলিমরা বুঝতে পাবে অন্যান্য বাজনৈতিক প্রতিবাদ ব্যর্থ হলে তারা হিংসাব পথে ক্রোধ ও ক্ষোভ প্রকাশ কবাব শক্তি ধরে। এবং হিংসার পথ নিলেই কি সবকাব কি হিন্দুবা সে দিকে দৃষ্টি দিতে বাধ্য হবে। হিংসা হবে "an effective mode of political action."[২৩২]

সন্দেহ নেই দাঙ্গা মুসলিমদেব হাতে নতুন এক বাজনৈতিক তলোযার হল। কিন্তু এ তলোযাবের দু দিকে ধার। দাঙ্গা বাধান কঠিন নয় কিন্তু মাবমুখী জনতাকে নিযন্ত্রণে রাখা কঠিন। কলকাতার মত বহুজন অধ্যুষিত (ঘিঞ্জি) শহবে ছোট ছোট গলি, মহল্লায়, বস্তিতে উভয় সম্প্রদায়েব সহবাস; বিদেশী, বেকার, সমাজবিরোধী ব্যক্তিব আধিক্য ও হিন্দু-মুসলিমের ধন-সম্পত্তির বৈষম্য যে কোন সময় বিস্ফোরণের কারণ হতে পারে।

এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল ১৯২৬ সালে। স্যাব আবদার রহিম-এর কার্যকাল ১৯২৫-এ শেষ হওয়ামাত্র তিনি আপন বাজনৈতিক প্রভুত্ব কায়েম বাখার জন্য সাম্প্রদাযিক বিদ্বেষের ঘুঁটি চাললেন। লীগের আলিগড় অধিবেশনে তিনি বললেন, মুসলিম অধিকাব রক্ষার জন্য সংগঠিত সংগ্রামের সময় এসেছে। হিন্দুবা ব্রিটিশ ও মুসলিম উভযের শত্রু। ব্রিটিশরা মুসলিম দাবি মেনে নিলে চিরদিনের জন্য মুসলিম বন্ধুত্ব পাবে। তাঁর প্রথম কাজ হল উপনির্বাচনে কাউন্সিলে ঢুকে নির্বাচনী বিধান সংশোধন, যাতে সংখ্যানুপাতে সদস্যসংখ্যা নির্ধারিত হয়। বিধান পরিষদের সভাপতি যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের আপত্তি নাকচ করে

দিলে স্বরাজ্যদল সভাকক্ষ ত্যাগ করে। রহিমের সংশোধনী পাশ হয়। এতেও খুশি না হয়ে তিনি মুসলিম সংবাদ মাধ্যমে বিদ্বেষ ছড়ান এবং মফস্বলে প্রচারক পাঠান। এই বারুদের স্তূপে আগুন পড়ল ১৯২৬-এর ২ এপ্রিল। ওইদিন পুলিশের অনুমতি নিয়ে ও পুলিশরক্ষাকারী সহ ব্যান্ড বাজাতে বাজাতে আর্য সমাজের এক মিছিল কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট ধরে হ্যারিসন রোড যেতে দীনু মিঞাঁর মসজিদের কাছ বারবাব যখন আসে তখন আজান পড়া হচ্ছিল। আর্যসমাজীদেব বাজনা থামাতে বলা হয় কিন্তু একজন ড্রামবাদক জেদামি করে বাজাতে থাকে। তখনই শুরু হয় মিছিলের ওপর আক্রমণ। হ্যারিসন বোডে উভয় সম্প্রদায়েব মধ্যে দাঙ্গা বাধে। বেশ কিছু মন্দির ও মসজিদ ধ্বংস হয়। তারপর দু সপ্তাহ ধরে যে দাঙ্গা চলে তাতে অন্তত ৫০ জনের মৃত্যু হয়, ৭০০ জন আহত, দোকান লুট বা অগ্নিদগ্ধ হয় বহু, মন্দির মসজিদ গুরুদ্বার কিছুই বাদ যায়নি। শেষপর্যন্ত সাঁজোয়া গাড়িসহ সৈন্য নামানো হয। সবকারী দলিলে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে উভয় সম্প্রদায়ের উসকানি, মদৎ ও প্রচাব কাজ কবেছিল। ১৫ই এপ্রিল মোটামুটি শান্তি ফিরে এলেও ২৪-এ কটন স্ট্রিটে এক মাতালেব হাঙ্গামা থেকে আবার তাণ্ডব শুরু হয়। আগের বার বিপক্ষকে বাড়িব মধ্যে থাকতে বা ঢুকতে বাধ্য কবে আগুন লাগানব কৌশল নেওয়া হয়েছিল, এবাব নেওযা হল অলিতে গলিতে চোরাগোপ্তা ছুরিকাঘাতেব কৌশল। এই প্রথম বন্দুকের ব্যবহাব হল। ব্যবসায়ীবা আত্মরক্ষার্থ পশ্চিমা গুণ্ডাদের নিয়ে আসে। অন্তত ৭০ জন নিহত হয, ৪০০ জন আহত।[২৩৩] ৯ মে শান্তি ফিরে এলেও মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্ন আক্রমণ চলে, এমনকি বিহারেও ছড়ায়। জুলাই মাসে মসজিদের সামনে বাদ্যোদ্যম নিয়ে আবাব দশ দিন ধবে দাঙ্গা বাধে। প্রত্যক্ষদর্শী অ্যান্ড্রুজ ববীন্দ্রনাথকে লিখছেন, "Calcutta has been like an armed garrison city...Every day came fresh news of out-rages, murders, riots, and the flood of hatred ever mounting higher."[২৩৪]

ফবওয়ার্ড পত্রিকা বুঝতে পেরেছিল এটা আবদার বহিমেব বাজনৈতিক জুয়ার অঙ্গ। ২৯ এপ্রিল তাই দুঃখ কবে লিখেছিল, "How long, the public ask, will it take to ensure the safe return of Sir Abd-ur-Rahim's thirty followers at the next elections? Is not the submerging of nationalism by communalism yet complete?" হিন্দুদেব দৃঢ়বিশ্বাস হয যে আবদাব বহিমেব যোগ্য জামাতা এইচ এস সুবাবর্দি ছিলেন নাটেব গুরু। তাঁবই কথায় কলকাতাব মুসলিম নিম্নশ্রেণী উঠত, বসত। আজকালকার ভাষায় সুরাবর্দি ছিলেন তাদের 'Godfather'.

দুঃখের কথা, কিন্তু মনস্তত্ত্বেব দিক থেকে আদৌ বিস্ময়ের নয, যে তখন থেকেই হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাও সশস্ত্র সংগঠনেব পথ নেয়। যতীন্দ্রমোহন সুরাবর্দীকে ডেপুটি মেয়ব পদে থাকতে দিলে আনন্দবাজার পত্রিকার মত জাতীযতাবাদী সংবাদপত্রও তীব্র প্রতিবাদ জানায়।[২৩৫] কৃষ্ণনগব প্রাদেশিক কনফারেন্সে চিত্তবঞ্জনেব হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট প্রত্যাহৃত হয়। পরবর্তীকালে যতীন্দ্রমোহন এই প্রস্তাব নাকচ কবলে সমগ্র হিন্দু সংবাদ মাধ্যম তাঁর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। প্রতিবাদে রহিমের 'মুসলমান' আর্যসমাজ ও হিন্দু মহাসভার বিরুদ্ধে মুখর।

বস্তুত বাংলায় হিন্দু মহাসভা এইসময় থেকে গুরুত্ব পেতে থাকে। নির্বাচনী প্রচারপত্রে রহিম লিখেছিলেন, "মুসলিমভাইবা, কার পক্ষে তোমরা ভোট দেবে—বহিমের দাস (রহিম অর্থে আল্লা) না রামের দাস ?"

হিন্দু মহাসভাকে 'রামের দাস' রূপে অবতীর্ণ হতে বাধ্য করলেন রহিম, সুরাবর্দি ও

তাঁদেব পৃষ্ঠপোষক ব্রিটিশ আমলাব দল। উগ্রপন্থী হিন্দু নেতাদের মধ্যে লাজপৎ বায মারা গেলেন ১৯২৮ সালে। ১৯৩৭ সালে মালব্য নিলেন অবসর। এঁদের স্থান নিলেন উগ্রপন্থী ভি ডি সাভাবকার, গোলওয়ালকর প্রমুখ। শ্যামাপ্রসাদকে এঁদেব দলে ফেলা ঘোরতর অন্যায় হবে। তিনিই ছিলেন শেষ উদারপন্থী হিন্দু, ফজলল হকের সঙ্গে হাত মেলাতে যাঁর কোন দ্বিধা হয়নি, কংগ্রেসের সঙ্গে তো নয়ই।

১৯৩৯ সালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘেব গুরু গোলওয়ালকর সঙ্ঘেব মতবাদ নিয়ে এক পুস্তিকা রচনা করেন— We Or Our Nationhood Defined. তাতে বলা হয় সংখ্যালঘুর দাবি মেনে নিলে হিন্দু জাতীয় জীবন চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। কংগ্রেসী নেতাবা নির্বোধেব মত আমাদের চিরন্তন শত্রু মুসলিমদের বুকে জড়িয়ে ধবছে আর আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন করছে। তাঁর উপদেশ—**"The non-Hindu peoples in Hindusthan must either adopt the Hindu culture and language, must learn to respect and hold in reverence Hindu religion, must entertain no ideas but those of glorification of the Hindu race and culture...in one word, they must cease to be foreigners, or may stay in the country, wholly subordinated to the Hindu nation, claiming nothing, deserving no privileges—far less any preferential treatment—not even citizen's rights."**[২৩৬]

বলা বাহুল্য, সমকালীন ফাসিস্ত Race spirit-এব প্রতিফলন এতে পড়েছে। আর্যত্ব দম্ভের অপর পিঠ সেমেটিক বিদ্বেষ। জার্মেনীতে সব কিছু অশুভ ও অন্যায়ের প্রতীক যেমন ইহুদী, ভারতে তেমনি হল মুসলমান। 'ইসলাম বিপন্ন' জিগিরেব উত্তরে তোলা হল'হিন্দুধর্ম বিপন্ন' জিগিব।

দুর্ভাগ্য আমাদের,জাতীয়তাবাদী মুসলিমরা যেমন জিন্নাব ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে লড়াই কবতে পারেননি, তেমনি উদারপন্থী শ্যামাপ্রসাদ ও নির্মল চ্যাটার্জীরাও পাবেননি সাভাবকার-গোলওয়ালকরদের সঙ্গে লড়তে। রাজনৈতিক সুবিধাবাদ অনেকেব কণ্ঠবোধ করে—যেমন ফজলল হকের। তাঁর স্ববিরোধী কথা ও আচরণ এক আত্মিক সংকটেব ইতিহাস বহন করে। তেমনি কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে 'না গ্রহণ না বর্জন' নীতি উদারপন্থী হিন্দু নেতাদের দুর্বল করেছিল। মালব্য, ভাই পরমানন্দ, রামানন্দ চ্যাটার্জী ও অ্যানি তো বিরক্ত হয়েই ছিলেন অবাজনৈতিক হিন্দুবাও প্রতিবাদে মুখর হন।[২৩৬ক] রাজেন্দ্র প্রসাদ ও প্যাটেল জিন্নাব সঙ্গে আসন বন্টন নিয়ে যে চুক্তি করতে চান—মুসলমানদের জন্য ৫১% নির্দিষ্ট আসন ও যুক্ত নির্বাচন—তা পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের স্বার্থবিরোধী ছিল। হিন্দু মহাসভা তা নাকচ কবে দেয়।[২৩৭] পূর্ববঙ্গেব হিন্দুবা উলটে মুসলমানদের সংরক্ষিত আসন ১১৯ থেকে কমিয়ে ১১০ ও হিন্দু আসন বাড়িয়ে ৯০ কবতে চায়। যৌথ নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদেব সুবিধে হলেও পূর্ববঙ্গের হিন্দুদেব হত না। পূর্ব ও পশ্চিমের হিন্দুদেব মধ্যে এই বিভেদের জন্য ভূগোল ও ইতিহাস দাযী। অদৃষ্টেব ভূমিকা নিয়েছিল মুসলিম বসতি বিস্তারের ও হিন্দু-ধর্মান্তরকরণের ধারা। বিড়লার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তা ধরা পড়েছিল।[২৩৮] দুঃখের বিষয়, বাংলার কংগ্রেসের দুই উপদল একত্র হয়ে প্রতিবাদ করেও কেন্দ্রীয় কংগ্রেসকে টলাতে পারেনি। জিন্না যে নরম হবেন না জানা কথা কিন্তু শরৎ বসু যখন বাংলা কংগ্রেসের নবনির্বাচিত একসিকিউটিভ কাউন্সিলেব প্রতিবাদ নেহরুকে জানালেন,[২৩৮ক] নেহরু বাঙ্গালীর উদ্বেগ উপেক্ষা করে উত্তর দিলেন, **"It seemed to me**

that they were gradually converting themselves in to the Nationalist party."[২৩৮খ] বল্লভভাই ছিলেন পার্লামেন্টারী বোর্ডেব কর্তা। তিনি সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা বিষয়ে কেন্দ্রীয নীতি গ্রহণেব শর্তে মনোনয়ন দেওযা হবে জানালেন।[২৩৮গ] অগত্যা মত বদলাতে বাধ্য হল বাংলা কংগ্রেস। তবু নেহরুর কাছে আবেদন করেছিলেন শবৎ বসু। কিন্তু দক্ষিণপন্থীদের দ্বারা কোণঠাসা নেহরু সাহায্য কবতে পারেননি। শরৎ বসুব মনোনীত কিছু ব্যক্তিব নাম কেন্দ্র নাকচ কবলে তিনি পদত্যাগ করেন। একই ভাগ্য হল তাঁব প্রতিদ্বন্দ্বী বিধান বাযেব। ক্রুদ্ধ নেহরু তাঁকে উপদেশ দিলেন, "হয কংগ্রেসকর্মীদের গিলবার্ট ও সালিভানেব অপেরা দেখান, না হয শীর্ষাসন কবতে বলুন।"[২৩৮ঘ] এই নির্মম রসিকতা হজম কবতে পাবলেন না বিধানবাবুব মত কঠিন লোক। তিনিও পদত্যাগ কবলেন। ১৯৩৭-এব নির্বাচনে কংগ্রেস কি কবল বোঝা শক্ত নয। তাবা মোট আসনের মাত্র ২১.৬% জিতল। ২৫০-এব মধ্যে ৫৪।

সারণী-১

কেন্দ্র	কংগ্রেস
সাধাবণ (৪৮)	৪৩
তপসিলী	
সংবক্ষিত	৬
শ্রম	৫
	৫৪

ফজলুল হক কংগ্রেসেব সঙ্গে মিতালি কবতে চাইলেন। হাইকমাণ্ড আপত্তি জানাল।[২৩৮ঙ] বাঙালী হিন্দু এক ভগবদ্দত্ত সুযোগ হাবাল আর বাংলার ঐক্যেব কফিনে আর একটি পেরেক বসল।

১৯৪৬-এব নির্বাচন অন্তে সুরাবর্দি হকেব মতই সংকটে পডলেন আর কংগ্রেসেব দিকে হাত বাড়ালেন। এবার শুধু মন্ত্রী সংখ্যা নিয়ে বিবোধ হল না, জিন্নাও বাদ সাধলেন। এব অবশ্যম্ভাবী ফল—সুরাবর্দির উগ্র সাম্প্রদায়িক শিবিরে যোগদান। যিনি ১৯২৬-এ শ্বশুর মহাশয়ের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি বাডাবার জন্য কলকাতায় দাঙ্গা বাধিযেছিলেন, তিনি নব-লব্ধ পৃষ্ঠপোষক জিন্নাব প্রত্যক্ষ সংগ্রামেব ডাকে সাডা দেবেন এতে বিস্মিত হবাব কিছু নেই। কলকাতাব নিম্নশ্রেণীব দবিদ্র বেকার মুসলমান, পশ্চিমা মুসলমান, সমাজবিরোধী মুসলমান, সরকারী পুলিশ তো তাঁব হাতে ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের দৈত্য। ১৯৪৬-এর ১৬ই আগস্ট সেই দৈত্য কলকাতার ওপর ছেড়ে দিলেন তিনি। তারপব তিনি বা জিন্না কেউ তাকে নিযন্ত্রণ করতে পারলেন না। জিন্না বুঝতেও পাবেননি ১৬ই আগস্ট তিনি রুবিকন অতিক্রম করছেন। পাকিস্তান না নিযে আর ফেববার উপায নেই।

॥ ৯ ॥

কাক ডাকে
রোদে পোড়া উদ্বিগ্ন মুখের কালো শব্দ।
বাঙলায় বিহারে গড মুক্তেশ্বরে
বিকলাঙ্গ লাস কাঁধে
লোক চলে গোরস্থানে
কিম্বা পোড়াবার ঘাটে।
মৃত্যু হয়তো মিতালি আনে,
ভবলীলা সাঙ্গ হলে সবাই সমান—
বিহারের হিন্দু আর নোয়াখালির মুসলমান
নোয়াখালির হিন্দু আর বিহারের মুসলমান।

—সমর সেন, জন্মদিনে।

"The loss of life in Calcutta riots was far greater than at the battle of Plassey." Wavell, Vicery's Journal, 3 Nov 1946

১৬ই আগস্ট প্রত্যূষ। মানিকতলায় মুসলিম মিছিল বেরোল। মুখে তাদের আওয়াজ—"লেকর রহেঙ্গে পাকিস্তান, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান।" তারপর শুরু হল নির্বিচার হিন্দু আক্রমণ। কি ভাবে এই দাঙ্গা লাগল? কে বা কারা এর জন্য দায়ী? ঠিক কত লোক এর শিকার হয়? কি পরিমাণ সম্পত্তি নষ্ট হয়? সবচেয়ে বড়ো কথা—নোয়াখালি, বিহার, পঞ্জাব, দিল্লী—এর যে শৃঙ্খল সূত্রে ধৃত প্রতিক্রিয়া দেখা দিল তা কি অনিবার্য ছিল? এর কিছু প্রশ্ন নিরসনের জন্য স্যার প্যাট্রিক স্পেন্সের সভাপতিত্বে এক কমিশন বসান হয় কিন্তু তাঁরা কোন রিপোর্ট দাখিল করেননি। আয়েষা জালাল ঠিকই বলেছেন "..the killings still await their historian."

স্পেন্স নাকি ওয়াভেলকে বলেছিলেন, "হিন্দুরাই উসকানি দিয়েছে"। উত্তর কলকাতার মুসলমানদের প্ররোচনা ব্যতিরেকে হঠাৎ আক্রমণ করা হয়েছে।[২৩৮] ইসপাহানি জিন্নাকে জানান, শান্তিপূর্ণ মুসলিম মিছিল আক্রমণ করা থেকে দাঙ্গার সূত্রপাত। হিন্দুরা চেয়েছিল 'পাকিস্তান' দাবির কণ্ঠরোধ করতে।[২৩৯] ছোটলাট বারোজ কারণ সম্বন্ধে আলোকপাত না করেই একে "pogrom between two rival armies of the Calcutta underworld." বলে বর্ণনা করেছেন এবং এর ভয়াবহতাকে তুলনা করেছেন সম (Somme)-এর যুদ্ধের সঙ্গে।[২৪০] তবে স্টেটসম্যান পত্রিকা একে "The Great Calcutta Killing" আখ্যা দিয়ে ভুল করেনি। পাঁচদিন যে নারকীয় কাণ্ড কলকাতার বুকে ঘটেছিল তাতে অন্তত ৫০০০ জন নিহত ও ১৫০০০ জন আহত ও লক্ষাধিক গৃহহীন হয়।[২৪১] সুরাবর্দির পুলিশ প্রথমে নিষ্ক্রিয় ছিল। বারোজকে আট ব্যাটেলিয়ান সৈন্য ও এক স্কোয়াড্রন সাঁজোয়া গাড়ি নামিয়ে দাঙ্গা থামাতে হয়।[২৪২]

আজাদের মতে লীগেরই মিছিল মানিকতলা অঞ্চলে নরহত্যা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ শুরু করে এবং পুলিশ দেখা যায়নি। যদিও দমদম এরোড্রামে প্রচুর সৈন্য ছিল, শহরের

শান্তি রক্ষার্থে তাদের ডাকা হয়নি।[২৪৩] যদিও বাংলা সরকারের মুখ্য সচিব, আর. এল. ওয়াকার, ১৬ তারিখে বেঙ্গল এরিয়ার প্রধান সেনাপতিকে শেয়ালদা স্টেশনে সৈন্য মজুত করতে বলেন এবং বিভিন্ন রাস্তা খোলা রাখতে বলেন, তবু ব্রিগেডিয়ার ম্যাকিনলে (Mackinlay) সেনাদের ব্যাবাকে আবদ্ধ রাখেন। বুচার (actg. Area Commander) সুরাবর্দির "completely communal attitude"কে দায়ী করেছেন। বুচার (Bucher) নেহরুকে লেখেন, "Neither then, nor afterwards, did one member of that Bengal government give one any real assistance in bringing order out of disorder."[২৪৪] ছোটলাট বারোজ স্পষ্ট অভিযোগ এনেছেন—সুরাবর্দি শুধু মুসলিম জীবন ও সম্পত্তি নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন ও লালবাজারের কন্ট্রোলরুমে বসে পুলিশ কমিশনারের কাজে বাধা দিয়েছিলেন। কাবফিউ জারি করা হয় রাত্রি নটায়। মুখ্য সচিবের এক কথা—দিবারাত্রি সুবাবর্দি পুলিশ কমিশনারকে গালমন্দ করেছেন। স্যার ফ্রান্সিস টাকার স্মরণ করেছেন, "It was unbridled savagery with homicidal maniacs let loose to kill and kill and maim and burn. The underworld of Calcutta was taking charge of the city...The police were not controlling it..."[২৪৪ক]

শীলা সেন সুবাবর্দির নানা উত্তেজক বক্তৃতা ও ভাবত সরকার প্রকাশিত Let Pakistan Speak for Herself-এ উদ্ধৃত লীগ সম্পাদক উসমান ও অন্যান্যের প্ররোচনামূলক রচনার উল্লেখ করেছেন।[২৪৫] ১৬ই আগস্ট ছুটির দিন বলে ঘোষণা করাটাই তো একটা প্ররোচনা। অন্যদিকে আবুল কালাম শামসুদ্দিন 'অতীত দিনের · স্মৃতি'-তে ও ইস্পাহানি Quaid-E Azam Jinnah as I Knew Him-এ হিন্দুকে দোষ দিয়েছেন। স্টেট্সম্যানের সম্পাদক, ইয়ান স্টিফেনস, ১৯৬৩ সালে Pakistan নামক এক পুস্তক লেখেন, তাতে স্পষ্ট বলা হয় মুসলিম আক্রমণ আশঙ্কা করে হিন্দুরা পালটা প্রস্তুতি নেয়। যেন সেটা হিন্দুদের অপরাধ। শরৎ বসু যে ওয়াভেলকে ফোন করে ১৮ আগস্ট অভিযোগ করেন যে পুলিশ মুসলিমদের সাহায্য করছে সেটা যেন ভিত্তিহীন। মুসলিমরা হিন্দুদের চেয়ে অধিকতর সংখ্যায় মরেছিল এটাই যেন হিন্দুদের বিরুদ্ধে অভিযোগের অকাট্য প্রমাণ!

আসলে কে শিকার হয়েছিল এই অর্থহীন অনর্থের? ওয়াভেল ২৬ আগস্ট কলকাতা পরিদর্শন করে ও পুলিশ কমিশনার হার্ডউইকের সঙ্গে কথা বলে লিখছেন—"The victims were almost entirely goondas and people of the poorest class." বারোজ বলেছিলেন—সুরাবর্দির ওপর আর কারুর আস্থা নেই, বরং আজিজুল হকের অধীনে মন্ত্রী সভা গঠিত হোক। বডলাট সুরাবর্দিকে তুলোধুনো করেন—তখন অবশ্য তিনি বৈষ্ণবীয় দৈন্যের অবতার।[২৪৬] তাঁর চিন্তা কি? ইউরোপীয় ভোট তো তাঁর পকেটে। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস ডাকার সময় জিন্না বলেছিলেন, "I am not prepared to discuss ethics." বিপদ হবে বুঝেও জিন্না সামন্ততান্ত্রিক, এমনকি মধ্যবিত্ত, মুসলিমদের মাথার ওপর দিয়ে 'পথের রাজনীতি'র কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। ওয়াভেল মন্তব্য করছেন—"পথের অনুগামীরা (অধিকাংশই যুক্তিহীন বেকার, গুণ্ডা, ছাত্র)-ই তাঁকে থামতে দেবে না। জিন্না যতদূর যে গতিতে চলতে চেয়েছিলেন তা হয়েছিল অনেক বেশিদূর, অনেক বেশি দ্রুত।"[২৪৭]

সব জেনেও কলকাতার দাঙ্গায় তিনি ঘাবড়ে যান। তা না হলে জিন্নাকে তখুনি অন্তর্বর্তী

সরকারের ঢোকাবার জন্য তিনি চাপ দিতেন না। শুধু নেহরুর প্রবল আপত্তিতে তা সম্ভব হয়নি।[২৪৮] নেহরুর মনে কলকাতার হত্যাকাণ্ড গভীর দাগ কেটেছিল। আজাদ শুধু বাংলা সরকারকে দোষ দেননি (১৬ই আগস্ট ছুটির দিন ঘোষণা কবা, গোলমাল হবে জেনেও প্রতিরোধের ব্যবস্থা না করা, ১৪৪ ধারা জারি ও সৈন্য ডাকতে অযথা বিলম্ব করা), তিনি ঠিকই ভয় করেছিলেন এর প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে বিহারে ও উত্তরপ্রদেশে এবং মার খাবে সংখ্যালঘু মুসলিমরা। এলাহাবাদে ২৩ আগস্ট দাঙ্গা হয়েছিল এবং ৪ জন মারা যায়। ১ সেপ্টেম্বর বোম্বাইতে দাঙ্গা বাধে। ৯ই সেপ্টেম্বর পূর্ববঙ্গে প্রথম সংঘর্ষ ঘটে, ১৪ই আবার বোম্বাইতে এবং ঢাকায়, ১৫ই আমেদাবাদে, ২৩শে আবার কলকাতা ও ঢাকায়। এ সব নোয়াখালি ট্র্যাজেডির প্রস্তাবনামাত্র।

২৭ আগস্ট নেহরু ও গান্ধীর সঙ্গে ওয়াভেলের কথা হয়। ওয়াভেল চান কংগ্রেস স্পষ্ট বলুক যে নতুন সংবিধানেব প্রথম নির্বাচনের পর পর্যন্ত প্রদেশদের সেকশানে থাকতেই হবে। এ কথা না বললে তিনি গণপরিষদ আহ্বান করবেন না। গান্ধী আইনের তর্ক তুললে বড়লাট বলেন—তিনি মিশন কি চেয়েছিলেন, ভাল করেই জানেন— "compulsory grouping was the whole crux of the plan." জিন্নার এই কাণ্ডের পরও বড়লাটকে তাঁ'ই পক্ষে ওকালতি করতে দেখে গান্ধীর মাথায় রক্ত চড়ে যায়। তিনি বলেন, যদি রক্তস্নানের প্রয়োজন হয়, তবে অহিংসা সত্ত্বেও হবে। ওযাভেল অনেককেই বলেছেন গান্ধী এত উত্তেজিত হয়েছিলেন যে টেবিল চাপড়ে বলে ওঠেন, "If India wants her blood bath she shall have it." পরের দিনও গান্ধী নাকি তাঁকে গালমন্দ করে চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিটির কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি:

"Your language last evening was minatory. As representative of the King you cannot afford to be a military man only, nor ignore the law, much less the law of your own making...You threatened not to convene the Constituent Assembly if the formula you placed before Pandit Nehru and me was not acted upon by the Congress. If such be really the case then you should not have made the announcement you did on 12th August...The Congress cannot afford to impose its will on warring elements in India through the use of British arms. Nor can the Congress be expected to bend itself and adopt what it considers a wrong course because of the brutal exhibition recently witnessed in Bengal. Such submission would itself lead to an encouragement and repetition of such tragedies."[২৫০]

নেহরুও তীব্র প্রতিবাদ জানান। "Calcutta has been a terrible shock to you and to all of us. We shall face it of course without shouting, but we are not going to shake hands with murder or allow it to determine the country's policy."[২৫১] তবু ওয়াভেল বলেন সমস্যাটি আইনগত নয়, বাস্তব। ফেডারেল কোর্ট যদি গ্রুপিং ব্যাপারে কংগ্রেসের মত মেনেও নেয় তবু লীগ গণপরিষদে যোগ দেবে না এবং দাঙ্গা বেড়েই চলবে।[২৫২] গান্ধীর উত্তেজনা কমেনি। সুধীর ঘোষের স্ত্রীকে দিয়ে লন্ডনস্থ স্বামীকে তার পাঠানর ব্যবস্থা করেন তিনি—"Gandhi says

Viceroy unnerved owing Bengal tragedy. Please tell friends he should be assisted by abler and legal mind. Otherwise repetition of tragedy a certainty."[২৫৩]

প্যাটেলও নীরব ছিলেন না। তিনি সুধীর ঘোষের মারফৎ ক্রিপস্‌কে জানাচ্ছিলেন, সুরাবর্দি প্রকাশ্যে হিংসাত্মক কর্মে ইন্ধন দিয়ে চলেছিলেন।[২৫৪]

অর্থাৎ গান্ধী, নেহরু, প্যাটেল, প্রত্যেক বুঝতে পারছিলেন কলকাতার অপকর্মের জন্য লীগের শাস্তি বিধান না করে বড়লাট কংগ্রেসকে দাঙ্গার জুজুর ভয় দেখাচ্ছেন, আইনের ভাষায় 'ব্ল্যাকমেইল' করছেন। তাঁদেব ১৬ মে ঘোষণার ব্যাখ্যার মধ্যেও কোনো বিরোধ দেখা দেয়নি। পেথিক-লরেন্স ওয়াভেলকে লেখেন, এ বিষয়ে কংগ্রেস ২৫ জুন থেকে ২৮ আগস্ট এক কথাই বলে আসছে।[২৫৫] বরং বড়লাটই অন্যায় চাপ দিয়ে বলছেন, লীগকে না নিলে গণপরিষদ ডাকবেন না। অস্বীকার করা যায় না, বড়লাট লীগের চাপের কাছে নতি স্বীকার করছিলেন।

যাই হোক, তিনিও বাধ্য হলেন কংগ্রেস এবং কিছু সংখ্যালঘু প্রতিনিধি নিয়ে ২ সেপ্টেম্বর অন্তর্বর্তী সরকার গড়তে। নেহরু হলেন কাউন্সিলের সহ-সভাপতি—কার্যত প্রধানমন্ত্রী। অন্যান্য কংগ্রেসীদের মধ্যে এলেন—প্যাটেল, রাজেন্দ্র প্রসাদ, রাজাজি, শরৎ বসু, আসফ আলি ও জগজীবন রাম। গান্ধী আজাদকে যোগ দিতে বলেন কিন্তু তিনি আসফ আলিকেই ঢুকতে বলেন। পরে তিনি লেখেন—কাজটা ঠিক হয়নি। সংখ্যালঘুদের মধ্যে এলেন সৈযদ আলি জহীর (সিয়া), স্যার সাফৎ আহমদ খান, সি এইচ ভাবা (পার্সী), জন মাথাই (ভারতীয় খ্রিশ্চান), বলদেব সিং (শিখ), ফ্রাঙ্ক অ্যান্টনি (ইঙ্গ-ভারতীয)। একজন মুসলমানের আসন খালি রাখা হল। নেহরু ফজলল হকেব নাম করেছিলেন কিন্তু ওয়াভেলের আপত্তিতে বাদ দেন।

২ সেপ্টেম্বর নতুন সরকারেব সাতজন শপথ নেন। প্রায সঙ্গে সঙ্গেই ওয়াভেল জিদ ধরেন লীগকে আনতে হবে। তার প্রথম পদক্ষেপ—লীগকে গ্রুপিং বিষয়ে আশ্বস্ত কবা। ৫ সেপ্টেম্বব প্যাটেল তাঁকে বললেন, সেকশানে বসতে তাঁদের আপত্তি নেই কিন্তু প্রত্যেক প্রদেশ প্রদেশ হিসাবেই ভোট দেবে অর্থাৎ সদস্যদের simple majority নীতি চলবে না। বড়লাট বলেন—এই ব্যাখ্যা মিশনেব ইচ্ছাব সঙ্গে মেলে না। প্যাটেল 'সি' সেকশানে আসামকে বাংলার কবলে ফেলতে চাননি।[২৫৭] ৭ সেপ্টেম্বর বেতার বক্তৃতায় সেকশানের কার্যপদ্ধতি নিয়ে নেহরু কোনো স্পষ্ট মন্তব্য করলেন না। আসলে তিনি আসামেব মুখ্যমন্ত্রী গোপীনাথ বরদলৈকে কথা দিয়ে ফেলেছেন—সি সেকশানে আসাম বসবে, কিন্তু "The province must decide both about grouping and about its own constitution." ফেডারেল কোর্টে গেলেও "in no event we are going to agree to a province like Assam being forced against its will to do anything."[২৫৮] এ ধরনের প্রতিশ্রুতি শিখদেরও দেওয়া হয়েছিল। মেননের মতে—যদি simple majority-র নীতি মানা হয় তবে 'বি' সেকশানে মুসলিম প্রভাব এমন বাড়বে যে শিখরা তা সহ্য করতে পারবে না। বস্তুত বাংলায় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ যেভাবে বাড়ছিল এবং বারোজ যেভাবে সুরাবর্দির হাতের পুতুল হয়েছিলেন তাতে, অন্তত নোয়াখালির ভয়াবহ দাঙ্গার পর, আসামকে জোর করে 'সি' সেকশানে ঢোকানো চলত না।

এদিকে ওয়াভেল সিমলায় জিন্নাকে কংগ্রেসের অজ্ঞাতসারে simple majoirity-র প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসে আছেন।[২৫৯] তিনি বলছেন—ভারত সচিব ও ক্রিপস্ একই প্রতিশ্রুতি

দিয়েছেন, শুধু কাপুরুষের মত নীরব আছেন। তিনি তা ফাঁস করে দেবেন। এজন্য যদি কংগ্রেস কেন্দ্রে ও প্রদেশে মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করে তবুও।[২৬০] বড়লাট এখন মনে করছেন তাঁব প্রতিশ্রুতি কি ব্রিটেন কি কংগ্রেস মেনে নিতে নৈতিকভাবে বাধ্য। বড়লাট ভেবেও দেখেননি যে লীগ ঢুকলে কংগ্রেস বেরিয়েও তো যেতে পারে—আর তখন তিনি সবকাব চালাবেন কিভাবে ? তাঁর চেয়ে ভারত সচিব বেশি বুদ্ধি ধরতেন বলে এ সম্ভাবনা তাঁকে উদ্বিগ্ন করেছিল।

১৬ সেপ্টেম্বর বড়লাট ও জিন্নার সাক্ষাৎ হল। জিন্না ব্যাপাব স্যাপার দেখে কিঞ্চিৎ নবম হয়েছিলেন। যদি কংগ্রেস সরকার ঠিকমত চালাতে পারে, কি হবে তাঁব পাকিস্তানের ? এত রক্তক্ষয় কি বৃথা যাবে ? তা ছাড়া, রক্তক্ষয় তো শুধু এক তবফে হচ্ছে না। নেহরুকে খুশি রাখার জন্য ওয়াভেল তাঁকে বললেন, লীগকে তিনি 'King's party' হিসেবে ঢোকাতে চাইছেন না (যা করেছিলেন ইংল্যান্ডের হ্যানোভেরিয়ান বাজবংশ)। জিন্না দুটো দাবি উত্থাপন করলেন—নেহরু ও তাঁকে বদলে বদলে সহ-সভাপতি কবতে হবে। আব কোন অসম্মানজনক শর্ত তোলা চলবে না। গান্ধীব সঙ্গে কথা বলে (২৬ সেপ্টেম্বর) বডলাটেব মনে হল তিনি কংগ্রেসের আধিপত্য চাইছেন। আশ্চর্য লাগে ওযাভেলের গান্ধী সম্পর্কে মন্তব্য পড়ে · "He would shrink from no violence and blood-letting to achieve his ends, though he would naturally prefer to do so by chicanery and a false show of mildness and friendship."[২৬১] জিন্না ঝরালেন বক্ত, আর অপবাধ হল গান্ধীব !

বেশ বোঝা যায়, গণপরিষদ ডাকা নিয়ে বডলাট ও ব্রিটেনের মন্ত্রিসভাব এক মতবিরোধ চলছিল। ক্যাবিনেট কংগ্রেসের সঙ্গে বিচ্ছেদ এড়াতে চাইছিলেন এবং লীগ একগুঁযেমি করলে গণপরিষদ ডাকাব পক্ষে ছিলেন। আপাতত তাঁবা ওয়াভেলকে নিষ্পত্তির চেষ্টা চালাতে নির্দেশ দিলেন। না হলে সব পক্ষকে বিলেতে ডাকা হবে।[২৬২] গান্ধী স্বভাবসিদ্ধ নমনীয়তা দেখালেন আবার। লীগ না এলেও সবকাব চলুক, তবে গণপরিষদ স্থগিত বাখা যেতে পারে। কাউন্সিলে মুসলিম সদস্য মনোনযনেব দাবি ছাড়তে তিনি বাজি হননি। বিখ্যাত তাঁর উক্তি—"One may waive a right, one can not waive a duty." ভারতীয় মুসলমানদের এক বিপুল সংখ্যাব মুখপাত্র হতে পাবে লীগ, কিন্তু কংগ্রেস হিন্দু বা মুসলিম কাকে মন্ত্রী করবে সে বিষয়ে তার বক্তব্য থাকতে পাবে না।[২৬৩] ৫ অক্টোবর জিন্নার সঙ্গে কথায় নেহরু জিন্না বা লীগকে সমগ্র মুসলমান সম্প্রদাযের একমাত্র মুখপাত্র মেনে নিতে অস্বীকার করেন। তবে প্রধান প্রধান সাম্প্রদাযিক সমস্যা সালিশীতে দিতে, ভবিষ্যতে সংখ্যালঘু মন্ত্রীদের সমগ্র ক্যাবিনেটের সম্মতিতে নিতে তিনি নাকি বাজি হযেছিলেন।[২৬৪] জিন্নার ৭ অক্টোবরের উত্তর তাঁকে বিস্মিত করে। তাতে জিন্না জানান, মন্ত্রিসভায় ঢোকবাব জন্য বড়লাটকে তিনি ন'টি শর্তের কথা বলেছিলেন এবং তার কিছু শর্ত বড়লাট নাকি মেনেও নেন। অর্থাৎ গান্ধী ও ভূপালের নবাব, জিন্না ও নেহরুব দ্বিপাক্ষিক কথাবার্তার পেছনে বড়লাট জিন্নার সঙ্গে আলাদা কথা চালাচালি কবছিলেন। এর একটা শর্ত ছিল মন্ত্রিসভার সহ-সভাপতিত্ব কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে বোটেশন। নেহরু নাকি সহ-সভাপতিত্ব ছাড়তে রাজি হননি। তবে সংসদের নেতার পদ ছাড়তে রাজি হন। অন্যদিকে কংগ্রেস চায বড়লাটের কাছে জিন্না সালিশীর জন্য যাবেন না।[২৬৫]

১৩ অক্টোবর জিন্না অন্তর্বর্তী সরকারের ঢুকতে সম্মতি প্রকাশ কবলেন। কিন্তু এব সঙ্গে এক চাল চাললেন তিনি। প্রথমত নিজে তিনি এলেন না। পাঠালেন—লিযাকৎ, নিস্তাব,

চুন্দ্রিগর, গজনফর আলি খাঁ ও যোগেন্দ্র মণ্ডলকে। কংগ্রেস যেমন তার কোটা থেকে আসফ আলিকে নিয়েছে তেমনি তিনি তাঁর কোটা থেকে নিলেন এক **তপসিলীকে** (যোগেন্দ্র মণ্ডলকে)। বড়লাট বুঝতে পারলেন লড়াই করবার মনোভাব নিয়েই লীগ সরকারে ঢুকছে।[২৬৬] জিন্না ১৩ অক্টোবরেব চিঠির অংশ তুলে দিচ্ছি—

"My Committee have, for various reasons, come to the conclusion that in the interest of Mussalmans and other Communities it will be fatal to leave the entire field of administration of the central government in the hands of the Congress. Besides, you may be forced to have in your interim government Muslims who do not command the respect and confidence of Muslim India which would lead to very serious consequences."

বড়লাটের ১৫ অক্টোবরের ডায়েরি পড়লে বোঝা যায় কোযালিশন কতদিন চলবে সে বিষয়ে তাঁর সন্দেহ ছিল। ঐ দিনই তিনি শুনলেন পূর্ববঙ্গে ভযাবহ দাঙ্গা বেঁধেছে। এদিকে কাকে কি দফতর দেওয়া হবে তা নিয়ে কংগ্রেসে খানিক মতদ্বৈধও হল। আজাদ স্ববাষ্ট্র দফতর লীগকে দিতে চান— কি যুক্তিতে বোঝা কঠিন। কলকাতাব দাঙ্গাব পব এবং নোয়াখালির অব্যবহিত আগে এ ধরনেব কথা বলা দাযিত্বহীন। বফি কিদোযাই-এব পরামর্শে (অবশ্যই প্যাটেলেব সম্মতিতে, কাবণ তিনি স্ববাষ্ট্র দফতব চান), লীগকে অর্থ দফতরের ভার দেওয়া হয়। বড়লাট লীগকে অর্থ, বিদেশ, স্ববাষ্ট্র ও প্রতিবক্ষা দফতবেব অন্তত একটি দিতে চান। কিন্তু অর্থ ছাড়া অন্য কিছু দিলে কংগ্রেস পদত্যাগ কবাব হুমকি দিলে তিনি পশ্চাদপসবণ কবেন। অর্থ, বাণিজ্য, ডাক ও বিমান, স্বাস্থ্য ও পবিষদীয দফতব নিয়ে লীগ অন্তর্বর্তী সবকারে ঢুকল ২৬ অক্টোবব, কিন্তু গণ-পবিষদে ঢোকার পূর্ব শর্ত গ্রহণ না করে ও প্রত্যক্ষ সংগ্রামেব নীতি না ছেড়ে। ১৯ অক্টোবব পঞ্জাবে গজনফব আলিব বক্তৃতা তার প্রমাণ, ২০ করাচীতে লিয়াকতের। অক্টোবরে অন্তত ৪টি চিঠিতে নেহরু এব প্রতিবাদ করেন। মীরাটে কংগ্রেসে (১৯৪৬) সভাপতি নেহরু বলেন, লীগ-মন্ত্রীবা আসলে King's party। সবকারী আমলাদেব সঙ্গেই তাঁদেব বেশি ভাব। উত্তবে জিন্না বলেন, এই কাউন্সিলকে ক্যাবিনেট আখ্যা দেওয়াই ভুল— "You cannot turn a donkey into an elephant by calling it an elephant." এই তো চাইছিলেন ওয়াভেল। ক্যাবিনেট মর্যাদা দেওয়া মানেই আপন বিশেষ ক্ষমতাব সীমা স্বীকাব। তবে ২০ নভেম্বব গণপরিষদ ডেকে দিলেন তিনি। তাঁর আশা ছিল সেকশান, গ্রুপিং ইত্যাদি নিয়ে বিবোধ এব মধ্যে মিটে যাবে।

মেটা দূরের কথা, নোয়াখালির ভয়াবহ ট্র্যাজেডি কংগ্রেস ও লীগ, হিন্দু ও মুসলমানেব মধ্যে যে রক্তের নদী বইয়ে দিল তার ওপর আর সেতু গড়া গেল না। ১০ অক্টোবব থেকে শুরু নোয়াখালির দাঙ্গার ওপর সর্বাপেক্ষা মূল্যবান উপাদান—প্যারেলালের Mahatma Gandhi: The Last Phase-এর প্রথম খণ্ডের প্রথম ভাগের একদশ অধ্যায় ও দ্বিতীয় ভাগের সবটাই (দ্বিতীয় সংস্করণ, আমেদাবাদ, ১৯৬৫)। তা ছাড়া নোযাখালি ঘুবে আচার্য কৃপালনি যে রিপোর্ট দেন তাও মূল্যবান।

বেঙ্গল প্রেস অ্যাডভাইসরী কমিটি ১৪ অক্টোবরের প্রতিবেদনে জানাল, ১০ থেকে উন্মত্ত জনতা মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গ্রামের পর গ্রাম আক্রমণ করছে, লুটপাট করছে, হত্যা

ও অগ্নিসংযোগ চলেছে ঘটনা ঘটছে নোয়াখালি সদর ও ফেনী মহকুমার ২০০ বর্গমাইল জুড়ে। সামরিক ও সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী পাঠানো হয়েছে। গুণ্ডাবা উপদ্রুত অঞ্চল-এ কাউকে ঢুকতে বা বেরোতে দিচ্ছে না। মনে হয় এই ভয়াবহ হত্যা, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট পূর্বপরিকল্পিত।"[২৬৮] মুখ্যমন্ত্রী সুবার্বদি এ-সব ছাড়াও ব্যাপক ধর্মান্তরকবণের উল্লেখ কবেন কিন্তু নিজে অকুস্থলে না গিয়ে দার্জিলিং বওনা হন। ১৮ অক্টোবর স্টেটসম্যান মন্তব্য করছে—"গভর্নর, মুখ্যমন্ত্রীর এই আচবণ বিস্ময়কর— The one remains in Darjeeling, the other has gone to join him there." ঐ পত্রিকাব ২০ ও ২৪ তারিখের খবর— মিলিটারি, পুলিশ, কিছুই তোয়াক্কা না করে গুণ্ডারা টেলিগ্রাফেব তাব কাটছে, পুল ভাঙছে, খাল বন্ধ করে দিচ্ছে, বাস্তায় বাধা সৃষ্টি কবছে। ১৯শে কংগ্রেস সভাপতি ও শবৎ বসু বিমান থেকে ঘটনাস্থল পবিদর্শন কবেন। তখন সর্বত্র আগুন জ্বলছে। মিলিটাবি গোয়েন্দা বিভাগ দিল্লিকে জানায়—বাংলা বিধানসভার প্রাক্তন সদস্য দরিয়া-শরীফের পীর গোলাম সারোয়াবেব বহুদিনেব প্রচাবের ফলে এই দুর্ঘটনা ঘটছে। এখন তা ৫০০ বর্গমাইলে ব্যাপ্ত। বিপন্ন মানুষ বহু কষ্টে পালাচ্ছে। শুধু কলকাতায আসছে বোজ ১২০০ উদ্বাস্তু। তাবা যে সব সংবাদ আনছে তা মর্মান্তিক। ২৫ তাবিখের স্টেটসম্যান জানাচ্ছে—লুটপাটেব চেযেও ভয়াবহ—ব্যাপক নাবী-ধর্ষণ, বলপূর্বক বিবাহ ও ধর্মান্তবকবণ। ২৭ তাবিখেব স্টেটসম্যান রামগঞ্জ থানাব ভদ্র পবিবাবেব এক কিশোবীব যে প্রত্যক্ষদর্শী বিববণ ছাপে তা আজও পডা যায না। ম্যুবিয়েল লেস্টাব প্রশ্ন তোলেন, "কোথায গুণ্ডাবা পেট্রল পাচ্ছে? আব তা ছডাবাব জন্য স্টিবাপ পাম্প? কে জোগাচ্ছে অস্ত্র?"[২৬৯]

ঠিক নোয়াখালি কেন মাবণ-ঝডেব কেন্দ্র হল তাব কিছু কাবণ আছে। এ অঞ্চলে মৌলানা, মুল্লা, দেওবন্দ ও আজমগডে পডা মুসলিম শাস্ত্রজ্ঞ লোকেব সংখ্যা ছিল সর্বাধিক। তাবা যে মৌলবাদী একটা বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল, সন্দেহ নেই। এবা একদিন খিলাফৎ আন্দোলনেব মেরুদণ্ড ছিল, আবাব তা প্রত্যাহৃত হলে গান্ধী ও কংগ্রেস থেকে দূবে সরে গিয়েছিল। লবণ আইন অমান্যেব সময় অশান্তিব সম্ভাবনা দেখা দিলে স্থানীয আমলাবা বিভাজন নীতিব আশ্রয নেয। নোযাখালিব তদানীন্তন জেলাশাসক কৃষক সমিতিগুলিকে অর্থনৈতিক আন্দোলনেব দিক থেকে সাম্প্রদাযিক বেষাবেষিব দিকে ঘুবিযে দিতে সক্ষম হন। মুসলিম বর্গাদাবেরা হিন্দু মালিকেব প্রাপ্য দিতে নাবাজ হয। তাদেব গোমেষাদি পশু চুবি কবে, খডেব গাদা পোডায, মাঠ থেকে ধান নিজ খামাবে তোলে বা চুবি কবে এবং হিন্দুদেব হাট বর্জন কবে আপনাদেব হাট বসায। এর নেতৃত্ব দেন গোলাম সাবোযাব। ১৯৪০-৪২ সালে খরার জন্য চাষ ভাল হয়নি। তাবপব এল বন্যা। সবকাবী ডিনাযাল নীতি মানুষেব কষ্ট বাডায়। ১৯৪২-এ চালেব দাম ছিল মণ প্রতি ছ' টাকা। ১৯৪৩-এব জুলাই মাসে তা বেড়ে হয় ষাট টাকা। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ঘনবসতি অবস্থা সঙ্গিনতব কবে তোলে। ভূমিহীন চাষীব সংখ্যা দ্রুত বাডতে থাকে। যুদ্ধেব পূর্বে তা ছিল মোট জনসংখ্যাব ৩৬%, এখন হল ৬০%। এ যেন গ্রামাঞ্চলে slum conditions, শহুবে বস্তিব আবির্ভাব। অতএব যুদ্ধের ফলে ধনী হিন্দু ব্যবসাযী ও পূর্বতন শত্রু—হিন্দু জমিদার-জোতদাবদেব বিরুদ্ধে নিম্ন শ্রেণীব দরিদ্র মুসলমানেব "পাকিস্তানেব জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামের" আহ্বানে খেপিযে তোলা সহজ হয। কলকাতার দাঙ্গাব ফলে ক্ষতিগ্রস্ত মুসলিম শ্রমিক (বিশেষত ডক মজুব) দেশে ফিবে তা বাডিযে তোলে। জর্জ লেফেভবেব crowd psychology সম্বন্ধে লেখা যাঁবা পডেছেন তাঁরা rumour বা মিথ্যা প্রচাবেব ভূমিকা

বুঝতে পারবেন।

কারণ ছিল নানাবিধ। ধর্মান্ধতা, খিলাফতী মনোভাব, অর্থনৈতিক শোষণ, কলকাতার দাঙ্গার প্রতিক্রিয়া। কিন্তু তার মূল জিগির হল রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র আর তাকে মদত দিচ্ছিল সরকারী আমলাবৃন্দ ও লীগ নেতৃবৃন্দ। লীগের এক দল 'পাকিস্তান' নিয়ে তখন মশগুল। নোয়াখালি অঞ্চলটা যদি হিন্দু-মুক্ত (liberated) করা যায়, বাকী বাংলায় তা করা যাবে না কেন ? কলকাতার জন্য বদনাম হওয়ায় বিব্রত বোধ করতে থাকলেও বাংলা সরকার কোন দৃঢ় প্রতিষেধক ব্যবস্থা নেয়নি। এমনকি পূর্ব এলাকার প্রধান সেনাপতি, বুচার, মার্শাল ল জারি করেননি। তিনি আরও ভুল কবলেন সামরিক সাহায্য দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে উপদ্রুত লোকদের স্ব-গ্রামে থাকতে বলে। হয় তারা সে সাহায্য পায়নি, না হয় সাহায্য বড় দেরিতে আসে। সবকারী দোষস্খালনের চেষ্টা হয়। কিন্তু তা খণ্ডন কবা যায় সিম্পসন ও রঞ্জিত গুপ্ত (আই. সি. এস)-এর ট্যুর ডায়েরি তুলে তুলে। সিম্পসনের প্রতিবেদনের একটি বাক্যই যথেষ্ট— "There is no confidence, sense of security and hope for the future as far as these people (the Hindus) think and act."

হিন্দুদের মনোবল যখন হিমাঙ্কের ঢের নিচে—গান্ধী অবতীর্ণ হলেন পরিত্রাতাব ভূমিকায়। অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দেবার পর শান্তি ও শৃঙ্খলা বক্ষাব দাযিত্ব কংগ্রেসেব ওপর বর্তেছিল। কংগ্রেস অহিংস নীতিব ধাবক ও বাহক হলেও কলকাতা বা নোয়াখালির মত সমস্যা পুলিশ, প্রয়োজনে সৈন্য, ছাডা সমাধান কবা যায না, এ কথা প্যাটেলেব জানা ছিল। কিন্তু তাতে বাধা ছিল অনেক। প্রথমত, অন্তর্বর্তী সবকাবে কংগ্রেস ও লীগের অন্তর্দ্বন্দ্ব ; দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রে বড়লাটের ও প্রদেশে ছোটলাটের সংবক্ষিত ক্ষমতা , তৃতীযত, সৈন্যবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ ছিল ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের হাতে। কংগ্রেসেব পবিস্থিতি বুঝেই গান্ধী সত্য নিয়ে শেষ পরীক্ষায নামলেন। নোযাখালিতে যদি অহিংসা কার্যকবী না হয তবে ব্রিটিশ চলে যাবার পরও প্রকৃত স্বাধীনতা আসবে না। ভারত যদি বৃহৎ সামবিক শক্তি হতে চায তাতে অনেক সময় লাগবে। মধ্যবর্তীকালে কি হবে ? তাছাডা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দমনে ব্রিটিশ সৈন্য ব্যবহার করলে কি ধবনেব স্বাধীনতা পাব আমবা ? "During the interim period we must learn to hop unaided, if we are to walk when we are free. We must cease from now to be spoon-fed"[২৭০] হিন্দু-মুসলিমে আমরণ সংগ্রাম একটা সমাধান কিন্তু ব্রিটিশ তা হতে দেবে না। আর সত্যিকাব লডাই কবাব মত জোর বা অস্ত্র কজনের আছে ?[২৭১] তা হলে বাকি থাকল বীবেব অহিংসা।[২৭২] সব মুসলমান লীগপন্থী নয়, শত্রুও নয়। তাদের ভালবাসা দিয়ে জয় করতে হবে। আব তার দ্বারাই লীগের দ্বিজাতিতত্ত্বেব মূলে কুঠাবাঘাত কবতে হবে। জাতি যদি ধর্ম দ্বাবা নিরূপিত হয় তবে অ-মুসলিম এলাকায় মুসলিম ও মুসলিম এলাকায় অ-মুসলিমদের কি হবে ? হিন্দু ও মুসলিম এক বাষ্ট্রের নাগরিক হতে পারে না—এটা অসত্য, তাই অগ্রাহ্য। পাকিস্তানেব দাবি ইসলাম বিরোধী—কারণ ইসলাম সব মানুষকে একই পবিবাবভুক্ত মনে করে।[২৭৩]

দাঙ্গার পেছনে গান্ধী দেখেছিলেন ভযেব মনস্তত্ত্ব কাজ কবছে। ভয থেকে আসে ঘৃণা। ভয় ও ঘৃণা একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। কিন্তু যদি অহিংস মানুষ বলে, আমাব কোন বাইরের শত্রু নেই, তা হলে ভয চলে যাবে, সঙ্গে ঘৃণাও। ভয যাবে ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপনে, ঈশ্বরে একান্ত আত্মসমর্পণে। আত্মসমর্পণের বাইরের রূপ প্রার্থনা। প্রার্থনার মাধ্যমেই ক্রোধ, ঘৃণা, ভয় জয় কবা সম্ভব। এ যুদ্ধে অস্ত্র বাতিল।

৬ নভেম্বর, এই ধর্মবিজয়ের মনোভাব নিয়ে, সোদপুর থেকে তিনি যাত্রা কবলেন নোয়াখালির উদ্দেশে। ২০ নভেম্বর থেকে শুরু হল তাঁর একক অভিযান। মুখে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুঞ্জয়ী সঙ্গীত—"যদি তোব ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে।" বজ্রানলে যদি নিজের পাঁজর জ্বালিয়ে দিতেও হয়, তবু যাত্রা শেষ হবে না। তাঁর যাত্রার সঙ্গী, অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুব বচনায (ও পবে তাঁর সঙ্গে আলাপে) যা জেনেছি তা মানবাত্মার এক শ্রেষ্ঠ অ্যাডভেঞ্চাব কাহিনী। প্যারেলালের রচনাযও তা ধরা পডেছে। একটু তুলে দিচ্ছি—

"শতকরা শত ভাগ সততার সঙ্গে কার্ডিন্যাল নিউম্যানের সঙ্গে আমি গাইতে পারি— 'the night is darkened I am far from home, lead thou me on.' এমন অন্ধকার আগে কখনো দেখিনি। রাত্রি সুদীর্ঘ মনে হচ্ছে। 'কর অথবা মব' নীতিব পবীক্ষা হবে এখানেই। 'কর' মানে হিন্দু ও মুসলিমকে শান্তি ও সৌহার্দোব সঙ্গে একত্র বাস কবতে হবে। অন্যথা, আমি সে চেষ্টায মৃত্যুববণ কবব। ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হোক।"

ইতিমধ্যে সুবাবর্দি সবকাব শান্তি কমিটি গঠনের প্রস্তাব আনল। প্রত্যেক উপদ্রুত এলাকায় স্থানীয় হিন্দু ও মুসলিমদেব নিয়ে গঠিত হবে এসব কমিটি। হিন্দুবা দাবি কবল গুণ্ডাদেব আগে বন্দী কবতে হবে, হিন্দু পুলিশ কর্মচাবীদেব আনতে হবে, মুসলিম এস. পি.-কে সবাতে হবে। গান্ধী বললেন, সবকারী প্রস্তাব কিছুদিন মেনে নেওযা হোক। শেষ পর্যন্ত স্থিব হল সমসংখ্যক হিন্দু-মুসলিম সভ্য নিযে গ্রাম, যুনিযান ও থানায শান্তি কমিটি গঠিত হবে। মুসলিম সভ্যদেব মনোনীত কববে হিন্দুবা। সভাপতি হবেন এক কর্মচাবী। শেষ সালিশেব ভাব জেলা শাসকেব ওপব। প্রথম শান্তি কমিটি তৈরি হল' কবিমগঞ্জ থানায়—২৫ নভেম্বব। হিন্দুদেব সংশয বা শঙ্কা যাযনি। হিন্দু মহাসভাব সভাপতি এন. সি. চ্যাটার্জি প্রস্তাব দেন সংখ্যালঘুদেব সংঘবদ্ধভাবে স্থানে স্থানে বাখা হোক এবং পবে শৃঙ্খলাব সঙ্গে সবিযে নেওয়া হোক। গান্ধী বললেন— এতে সুবাবর্দি বাজি হবেন না আব হিন্দুদেব অসহায়বোধও যাবে না। মুসলমানবা যদি প্রস্তাবানুযাযী কাজ না কবে, বীবের মত মবা ভাল। মনে বাখতে হবে—বিহাবেব মুসলমানবা অনুরূপ ব্যবস্থা চাইলে কংগ্রেস সরকাব মানবে কি? এ ধবনেব চিন্তার পবিণাম— পাকিস্তান দাবি স্বীকাব। "If Noakhali is lost India is lost"

গান্ধীব অনুচর— আমতুস সালাম, কানু ও আভা গান্ধী, প্যাবেলাল, সুশীলা নাযাব সবাই ছডিযে পডলেন বিভিন্ন গ্রামে। তখনও সেখানকাব মেযেবা শাঁখা-সিঁদুব পবতে ভয পাচ্ছে, তাদের চোখে ভযার্ত পশুব দৃষ্টি, আব মুসলমানদেব মধ্যে অল্প কিছু অনুতপ্ত এবং বাকিবা সব অস্বীকাব করছে, চাইছে গোলাম সারোযাবেব মুক্তি। এই অবস্থায কি করে হিন্দুদেব ভাঙা ঘরবাডি বাসযোগ্য হল, ত্রাণ ব্যবস্থা হল, এমনকি অপবাধীরা দোষ স্বীকাব কবল তাব বর্ণনা রেখে গেছেন প্যাবেলাল।

কিন্তু শান্তি কমিটি ছিল সবকাবেব ছলনামাত্র, দেখা গেল দুষ্কৃতকারীবা নির্বিকাব।[২৭৬] গান্ধীব অনুযোগেব উত্তবে, ধৃষ্টতাব সীমা লঙ্ঘন কবে, সুবাবর্দি তাঁকে বিহাব যেতে বললেন।[২৭৭] গান্ধীজী বললেন, বিহাব ও নোযাখালি নিযে নিবপেক্ষ কমিশন বসুক।[২৭৮] মুখ্যমন্ত্রীব চেযেও সবেশ পার্লামেন্টাবী সচিব, হামিদুদ্দিন চৌধুবি। তিনি বললেন নোয়াখালিব অতিরঞ্জিত ঘটনার প্রতিবাদ না জানিয়ে বিহাবেব ঘটনাব জন্য গান্ধীই দাযী। মুখ্যমন্ত্রী বডদিনেব দিন (!) জানালেন বাংলাব কোন মন্ত্রীব উপদ্রুত অঞ্চলে যাবাব সময় নেই। আশ্চর্য হতে হয, এই লোকেব ওপব নির্ভর করে শবৎ বসুবা অবিভক্ত স্বাধীন বঙ্গ

নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন।

স্বভাবতই প্যাটেল জানালেন বিহার ও নোয়াখালিতে তা হলে একই ব্যবস্থা হোক। বিহারে সব ত্রাণ ব্যবস্থাই মুসলিম লীগের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, প্রথম সপ্তাহের পরই শান্তি বিরাজ করছে। আর নোয়াখালিতে কোন স্থানীয় মুসলমান শান্তি স্থাপন বা ত্রাণ সাহায্যে এগিয়ে আসছে না।[২৭৭]

আসামকে কেন গান্ধী জোর করে 'সি' সেকশানে ঢোকাতে চাননি তা বোঝা যাবে যদি আমরা লক্ষ্য করি ঠিক এই সময় মুসলিমদের দলে দলে আসামে পাঠান হচ্ছে কৃত্রিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গণ্ডগোল বাধাতে। বখ্‌তিয়ার খিলজির বঙ্গ-বিজয় স্মরণ করে তাদের নাম দেওয়া হয়েছিল—'খিলজি দস্তা'। সরকারী জমি বেদখল করাব জন্য আসাম সরকার তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হচ্ছিল। আর সঙ্গে সঙ্গে 'মুসলিম নিধনের' জিগির তোলা হচ্ছিল। বিহারের দাঙ্গার ঘটনা এমন অতিরঞ্জিত করা হচ্ছিল যে গান্ধী বিহারের মন্ত্রী সৈয়দ মাহমুদের কাছে আসল পরিস্থিতি কি জানতে চান। এতদিনেব কংগ্রেসী মাহমুদ নীরব থাকেন। এইখানে মাহমুদ ও আজাদের মত ব্যক্তিব তফাত। ১৯৪৭ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি এক মজার ঘটনা ঘটল হিমচরে। 'অনুতপ্ত' (আসলে সুরাবর্দির গুণ্ডার ভয়ে ভীত) এবং লীগে পুনঃ-গৃহীত ফজলল হক আবদার ধরলেন, গান্ধীর এখুনি বিহার যাওয়া উচিত। গান্ধী পরিহাস করে উত্তর দিলেন—দরকার হলে যাব—"But it will not be to oblige you."[২৭৮] অর্থাৎ সুরাবর্দির সঙ্গে হকের রাজনৈতিক লড়াই-এ তিনি মদত দেবেন না।

নোয়াখালিতে গান্ধীর অবস্থান অনেক মুসলমানের পক্ষে অস্বস্তিকব হয়েছিল। স্বয়ং মাহমুদ অবশেষে লিখলেন, বিহারের তুলনায় নোয়াখালিব ঘটনা অকিঞ্চিৎকর। নাজিমুদ্দিন ও সুরাবর্দি যে সুর মেলাবেন, তাতে আশ্চর্য কি। বহু বিহারী 'উদ্বাস্তু' মুসলিমকে বাংলার সীমান্তে আশ্রয় দেওয়া হচ্ছিল যাতে ওখানে মুসলমানরা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। বস্তুত ব্রিটিশদের 'numbers game' মুসলমানের মত কেউ বোঝেনি। সুরাবর্দির গভীরতর উদ্দেশ্য ছিল ঝাড়খণ্ডেব আদিবাসীদেব মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রচার (যার কুফল আজ ভালভাবেই ফলেছে)। ছোটনাগপুর-সাঁওতাল পরগনাব আদিবাসীরা মধ্যপ্রদেশেব আদিবাসীর সঙ্গে হাত মেলাবে ও শেষে হায়দরাবাদের সঙ্গে যোগ স্থাপন করে হিন্দু-ভারতে বিভেদ আনবে এমন উদ্ভট কল্পনা ছিল এই সর্বদা সিল্ক-স্যুট পরিহিত অভিজাত অক্সোনিয়ান-এর। কিন্তু বিহারে কংগ্রেসীরা একটা ভুল করেছিল উদ্বাস্তু শিবিরেব ভার লীগপন্থীদের ওপর ন্যস্ত করে। ২৯ ডিসেম্বর নেহরু সুরাবর্দিকে লিখছেন, "The impression I gathered was that the Bihar League was more interested in making political capital than helping the evacuees to find suitable accomodation etc..."লীগ এক পুস্তিকা প্রকাশ করে— তার নাম "Divide Bihar".

মোটের ওপর সুরাবর্দি যতই বলুন স্থানীয় নেতারা নোয়াখালির গোলমাল থামিয়েছে, এম. ও. কার্টারের অভিযোগ— খুন, ধর্ষণ, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা তুলে নেওয়ার নির্দেশ বার বার দেয় তাঁকে মন্ত্রিসভা।[২৭৯] বেল বলছেন, এ এক ধরনের 'population transfer'.[২৮০] বিহারে জোর ধাক্কা না খেলে মুসলিমদের চৈতন্য ফিরত কিনা সন্দেহ। বিহারে প্রথম হাঙ্গামা হয় ২৭ সেপ্টেম্বর। ৮ অক্টোবরের মধ্যে তা নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু ২৫ অক্টোবর তা ব্যাপক রূপ নেয় ও পাটনা, ছাপরা, ভাগলপুর প্রায় বিধ্বস্ত হয়। তবে গভর্নর

ডাও (Dow) ও কংগ্রেস মন্ত্রিসভা দৃঢ় হস্তে তা দমন করেছিলেন। এখানে নোয়াখালির প্রতিক্রিয়া হয়েছিল দ্বিতীয় পর্বে (২৫ অক্টোবরেব পর) এবং ভূমি সম্পর্কিত শ্রেণীদ্বন্দ্ব ছিল না তা নয়। বিহার সম্বন্ধে নেহরুব ৬ নভেম্বরের রিপোর্ট দাঙ্গার নানা দিকে আলোকপাত করেছে।[২৮১] ডাও বলছেন, ফিরোজ খান নুন বিহারে লীগপন্থীদেব নেতৃত্ব দেন।[২৮২]

ইউ. পি.-র গড় মুক্তেশ্বরে দাঙ্গা ভয়াবহ রূপ নেয়। এখানে রাষ্ট্রীয স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের হাত ছিল মনে হয়।

কলকাতা, বিহার, ইউ. পি.-তে মার খেয়ে লীগপন্থীবা প্রমাদ গুণল। বোতল থেকে তা হলে দৈত্যকে বার কবা ঠিক হযনি ? কিন্তু বাস্তায় লডাই চালানো কিঞ্চিৎ বিপজ্জনক হলেও সবকারের ভেতর তো লড়াই চালানো নিবাপদ। লিযাকতেব উক্তি স্মরণীয়—অন্তর্বর্তী সরকারের ঢোকার সিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষ সংগ্রাম বা পাকিস্তান-বিরোধী নয।[২৮৩] অর্থাৎ পাকিস্তান লক্ষ্য দুটি উপায়ে অর্জিত হবে—সবকাবের মধ্যে থেকে, না হয লডাই-এর মাধ্যমে—যখন যেটিতে সুবিধে হয়। প্রথমটিতে তাঁবা বড়লাটেব মদত পাবেন, ভালভাবেই জানতেন। ১ নভেম্বর ওয়াভেল পূর্ববঙ্গ সরেজমিন তদন্ত করলেন বিমানে ও স্টিমারে। বারোজ তাঁর কাছে দুঃখ করে বললেন, "আরও বারো মাসের বেশি বাংলাব ভাব বহন করতে আমি পাবব না, কারণ তারপর বহন কবার মত কিছু থাকবে না।" সব দেখে ও শুনেও বাংলাব উপদ্রুত অঞ্চলের ভার নেবার জন্য প্যাটেলেব অনুরোধ অগ্রাহ্য করলেন তিনি। জিন্না কিছুতেই গণপরিষদে ঢুকতে রাজি হলেন না—যদিও সেটা ছিল সরকারেব ঢুকবাব অন্যতম শর্ত। আসামের মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা নেহরুব চিঠি ও গান্ধীব ৩ অক্টোববের ভাষণ উদ্ধৃত করে জিন্না জানালেন সেকশান, গ্রুপিং প্রভৃতি ব্যাপারে নিঃসংশয় না হলে তিনি গণপরিষদের সিদ্ধান্ত নেবার জন্য লীগ কাউন্সিল ডাকবেন না। তাঁব কথাই মেনে নিযে ওযাভেল পেথিক-লরেন্সের কাছে আর্জি পেশ কবলেন, "সেকশানে উপস্থিত সব প্রতিনিধির প্রয়োজনে সংখ্যাধিক্যের ভোটে স্থির হবে গ্রুপ হবে কিনা, একই উপাযে প্রাদেশিক সংবিধান রচিত হবে এবং দরকার হলে গ্রুপ-সংবিধান। এই পদ্ধতি অবলম্বিত না হলে ব্রিটেন তাব আপন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যাবে।"[২৮৪] এ চিঠি ওয়াভেল লিখলেন লিযাকতেব সঙ্গে কথা বলার পর। লিয়াকত তাঁকে রীতিমত ভয় দেখিয়েছিলেন।

ভারত সচিব বুঝতে পারলেন বড়লাটের স্নায়ু ক্রমশই দুর্বল হচ্ছে। ২৬ নভেম্বর তার এল বড়লাট যেন কংগ্রেস ও লীগের দুজন করে ও একজন শিখদের প্রতিনিধি নিযে লন্ডন আসেন। ফয়সালা সেখানেই হবে। প্যাটেল পত্রপাঠ না বললেন।[২৮৫] কিন্তু অ্যাটলির ব্যক্তিগত অনুরোধে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও, রাজি হলেন নেহরু। সঙ্গে গেলেন বলদেব সিং। নেহরু বলে গেলেন, মিটমাট হোক না হোক, ৯ ডিসেম্বর গণপরিষদের অধিবেশনের জন্য তাঁকে ফিরতেই হবে।

বর্তমান লেখকের মনে হয় ওয়াভেল প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কাছে স্বেচ্ছায় নতিস্বীকার করেছিলেন। তিনি তা বন্ধ করতে পারতেন না তা নয়, জিন্না-লিয়াকৎদের তা নিয়ে ভয় দেখাতে পারতেন না তাও নয়। অন্তত তিনি তাদের অন্তর্বর্তী সরকার থেকে বের করে দেবার হুমকি দিতে পারতেন। একবার ক্ষমতায় আসার পর লীগ তা ছাড়তে চাইত না। কিন্তু ওয়াভেল নিজেই চান লীগের ব্যাখ্যা গৃহীত হোক (সেকশান, গ্রুপিং আবশ্যিক ঘোষিত হোক)। তাই সব সমস্যার আলোচনা পুনরায় শুরু হবার সুযোগ পেয়ে খুশি হলেন তিনি। তা ছাড়া বলটা বিলেতে পাঠাতে পেরে ক্রিপস-পেথিক-লরেন্সেরওপর মনের ঝালটা ঝাড়া

গেল। সঙ্গে নিলেন তাঁর বিখ্যাত 'ব্রেক ডাউন প্ল্যান'। ভারতব্যাপী গাঢ় তমিস্রায় নোয়াখালিব শ্মশানভস্মোপর একা জেগে বইলেন গান্ধী—বরাভয়পাণি শিবের মতো।

॥ ১০ ॥

Let them fight it out, friends: things have gone too far. —Browning

উনিশ শো ছেচল্লিশ-এব ৩ ডিসেম্বর অ্যাটলি, পেথিক-লবেন্স ও অ্যালেকজাণ্ডাবের সঙ্গে ওয়াভেল বর্তমান পবিস্থিতি ও দীর্ঘমেযাদী ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনায বসেন। তাতে তাঁব কংগ্রেস, নেহরু ও গান্ধী-বিবোধী মনোভাব সুস্পষ্ট। তাঁব মতে কংগ্রেসেব বাম নেতাবা (বিশেষত জয়প্রকাশ ও অরুণা আসফ আলি) বিপ্লবেব কথা বলছেন, দক্ষিণপন্থীবা তাঁদের দিয়ে গোলমাল পাকিয়ে সবকাবকে বিপদে ফেলতে চায়, নেহরু এই দুই দলেব মধ্যে "unstable link" আর গান্ধী সকলেব পেছনে থেকে হিংসাব নিন্দা কবছেন কিন্তু তা বন্ধ করাব ক্ষমতা তাঁব নেই।[২৮৬] লীগ 'পাকিস্তান', 'ইসলাম বিপন্ন' ইত্যাদি জিগিব তুলে তাঁব ওপব চাপ সৃষ্টি কবতে চাইছিল কিন্তু সাধাবণ মুসলমান তাতে এত খেপে গেছে যে তাদেব থামাতে পাবা যাচ্ছে না। প্রমাণ—কলকাতা ও নোযাখালি। জিন্না তা জানতেন এবং ক্যাবিনেট মিশনেব ঘোষণা গ্রহণ কবেছিলেন মন্দেব ভাল বলে। কিন্তু এখন তাঁব ধাবণা হযেছে মিশন তাঁকে ঠকিযেছে ('double crossed')। ওযাভেলেব দাবি—ব্রিটিশ সরকাবকেই এখন পবিষ্কাব করে খুলে বলতে হবে সেকশানের মাধ্যমে কি ভাবে গ্রুপ এবং প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র বচিত হবে। মিশন (এবং ওযাভেল) তাঁকে যা ব্যাখ্যা দিযেছিলেন তাব বাইরে জিন্না কিছুই গ্রহণ কবতে রাজি নন। যদি সে ব্যাখ্যা এখন গ্রহণীয না মনে হয তবে (১) হয, পুনরায় ব্রিটিশ অধিকাব স্থাপন কবতে হবে, যা বাজনৈতিক পবিস্থিতিতে অসম্ভব, (২) না হয়, নতুন কোন সমাধান বের করতে হবে, যা দেশভাগ, এবং কংগ্রেস তা কখনই মেনে নেবে না, (৩) না হয়, কংগ্রেস সংখ্যাগবিষ্ঠেব মুখপাত্র বলে তারই হাতে আত্মসমর্পণ করতে হবে, যা অত্যন্ত অপমানজনক। ওযাভেল একটা চতুর্থ বিকল্পেব কথা তুললেন—আমাদেব পূর্বপবিচিত Breakdown Plan. তবে তাঁর পবামর্শ—সব চেয়ে ভালো মিশনের পরিকল্পনাকে তার আদিম ভিত্তিতে স্থাপন করা—"to restore the Mission plan to its original basis as intended by the Mission."[২৮৭]

৪ ডিসেম্বব নেহরু বললেন, হিংসাত্মক উপায়ে লক্ষ্য অর্জন করতে চাইছে লীগ এবং অন্তর্বর্তী সরকারে কোন সহযোগিতা করছে না। কংগ্রেস কোন মতেই সেকশানে প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র বচনায় বাজি হবে না। ভারত সচিব তাঁকে প্রশমিত করাব জন্য বললেন, সেকশানেব কার্যপদ্ধতি নিযে গণপরিষদেব প্রথম সভায় আলোচনা হতে পারে এবং মতদ্বৈধ হলে ফেডারেল কোর্ট তো আছেই। নেহরু রাজি হন। জিন্না কিন্তু এতেও প্রশমিত হলেন না। আবার তিনি কাউন্সিলের দোহাই পাড়লেন। তাঁব মতে ব্যাখ্যা নিয়ে যদি ব্রিটেন কংগ্রেসের কাছে নতি স্বীকার করে তবে লীগের নাপসন্দ সংবিধান ঠেকাবে কি করে?

অনেক গোলমালেব পর ৬ ডিসেম্বর ক্যাবিনেট এক ঘোষণা করলেন তাতে লীগের ব্যাখ্যাই (অর্থাৎ সেকশানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা দ্বারা সিদ্ধান্ত) মেনে নেওয়া হল কিন্তু ফেডারেল কোর্টে আপীলের সংস্থানও থাকল।[২৮৭ক] জিন্না অবশ্যই প্রশ্ন তুললেন, যদি ফেডারেল কোর্টের সিদ্ধান্ত সরকাবের ব্যাখার বিবোধী হয় তবে কি হবে? অর্থাৎ জিন্না এ ব্যাপারে

সালিশী মানতে চাননি। আর নেহরু বললেন, ৬ ডিসেম্বরের ঘোষণা ১৬ মে-র প্রস্তাবের সংযোজন এবং কংগ্রেসকে নতুন করে ভাবতে হবে। বলদেব সিং হুঁশিয়ারি দিলেন যে শিখরা উক্ত সংযোজন মানবে না।

ওয়াভেল তাঁর Breakdown Plan নিয়ে ঝুলোঝুলি করছিলেন কিন্তু তার অনেক অসুবিধে ছিল। প্রধানমন্ত্রী বুঝতে পেরেছিলেন পার্লামেন্টে এ ধরনের নীতি পাশ করানো কঠিন হবে এবং ভারতীয় বাহিনী নিয়ে গোলমাল বাধবে। তিনি ওয়াভেলের নেতৃত্ব সম্বন্ধে আগে থেকে সন্দিহান ছিলেন। লীগের প্রতি তাঁর স্পষ্ট পক্ষপাতিত্ব অজানা ছিল না কারও। ১৮ ডিসেম্বর, ওয়াভেলের অজ্ঞাতে, অ্যাটলি মাউন্টব্যাটেনকে বড়লাট হবার জন্য আহ্বান জানালেন।

জিন্নার সন্দেহ অমূলক ছিল না। গণপরিষদের অসমিয়া সদস্যগণ সিদ্ধান্ত নিলেন ফেডারেল কোর্ট যাই বিধান দিক আসাম এমন কোন সেকশানে ঢুকবে না যা সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে চলবে।[২৮৮] নেহরু ও আজাদ কিঞ্চিৎ নরম হলেও গান্ধী বললেন, ফেডারেল কোর্ট তো 'packed court', ওখানে আপীল করে হবে কি? আসামকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ রাজি করাতে পারে না।[২৮৯] তার আগেই তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন আসাম কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করে গণপরিষদ ত্যাগ করতে পারে।[২৯০] শিখদেরও একই পরামর্শ দিলেন তিনি। প্যাটেল ক্রিপস্‌কে জানালেন আসাম সম্বন্ধে ৬ ডিসেম্বরের ব্যাখ্যা প্রয়োগ হবে বিশ্বাসঘাতকতা।[২৯১] এই পরিপ্রেক্ষিতে ওয়ার্কিং কমিটি ২২ ডিসেম্বর প্রস্তাব নিল যে জিন্না ফেডারেল কোর্টে যাওয়ার ব্যাপারে বা তার সিদ্ধান্ত মেনে নেবার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত না নিলে ব্রিটিশ সরকারের ঘোষণার কোন অর্থ নেই। তা ছাড়া প্রাদেশিক স্বশাসনের নীতি সম্পূর্ণ লঙ্ঘিত হচ্ছে। এই অবস্থায় প্রশ্নটা এ আই সি সি-র সামনে তোলা হবে ৫ জানুয়ারি। বিরক্ত নেহরু গান্ধীকে প্রশমিত করার জন্য পূর্ববঙ্গের শ্রীরামপুর ছুটলেন।[২৯২]

এ আই সি সি-র ৬ জানুয়ারির প্রস্তাবে গান্ধীর প্রভাব সুস্পষ্ট। নেহরুকে লেখা গান্ধীর ৩০ ডিসেম্বরের চিঠি তার অকাট্য প্রমাণ।[২৯৩] জয়প্রকাশের দল ও হিন্দু মহাসভা মধ্যপন্থী নেহরুদের জোর লড়াই দেন, তার সাক্ষ্য ভারতসচিবকে লেখা ওয়াভেলের ৮ জানুয়ারির চিঠি। প্রস্তাবে বলা হল—ফেডারেল কোর্টে যাবার ব্যাপারটা এখন "purposeless and undesirable." ভারতীয়দের সকলের যথা সম্ভব অনুমোদনে সংবিধান রচনা হওয়া উচিত কিন্তু "There must be no interference whatsoever by any external authority and no compulsion of any province or part of a province by another province." ৬ ডিসেম্বরের ঘোষণার ফলে আসাম, বালুচিস্তান, সিন্ধু, সীমান্ত ও শিখদের বিপদ দেখা দিয়েছে। কংগ্রেস এমন জুলুম বরদাস্ত করবে না। যদি করা হয় তবে সংশ্লিষ্ট জনগণের যে কোন পন্থা অবলম্বন করার অধিকার রইল। নেহরু বললেন, গণপরিষদ একটা লড়াই-এর মাধ্যম। তা চালিয়ে যাওয়াই ভাল।

অন্যদিকে লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ৩১ জানুয়ারি সিদ্ধান্ত নিল—ক্যাবিনেট মিশন ঘোষণা ব্যর্থ হয়েছে, অতএব গণপরিষদ ভেঙে দেওয়া হোক। আসলে লীগ আলাদা গণপরিষদ চাইছিল।

এই পরিপ্রেক্ষিতে লীগমন্ত্রী ছাড়া বাকী মন্ত্রীরা ৫ ফেব্রুয়ারি বড়লাটকে অনুরোধ করলেন যে লীগ গণপরিষদের পূর্বশর্ত প্রত্যাখ্যান করায় লীগমন্ত্রীরা সরকারে থাকতে পারেন না। নেহরু অ্যাটলিকে জানিয়েছিলেন, হয় লীগ মন্ত্রীদের বের করে দিতে হবে, না হয় কংগ্রেসী মন্ত্রীরা পদত্যাগ করবেন। অ্যাটলি দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধানমন্ত্রীকে জানান—উভয় পন্থাই

বিপজ্জনক।[২৯৪] ১০ ফেব্রুয়ারি নেহরু আবার লীগমন্ত্রীদের পদত্যাগ দাবি করেন। জানুয়ারির শেষে সরকার, গণপরিষদ ইত্যাদি নিয়ে কলহের চেয়েও বড় হয়ে উঠছিল বিভিন্ন প্রদেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি। ৪ ফেব্রুয়ারি ওয়াভেল অ্যাটলির চিঠি পেলেন যে তাঁকে বরখাস্ত করা হয়েছে।[২৯৫] অ্যাটলি লিখেছিলেন, যেহেতু বডলাট ও ব্রিটিশ সরকাবেব নীতি নিয়ে গভীর মতভেদ হয়েছে, ওয়াভেলের ওপর প্রচণ্ড চাপ পডছে, তাঁর তিন বছরের কার্যকালও শেষ হয়েছে, যেহেতু ভাবতীয় সমস্যায নতুন এক পর্ব শুরু হতে যাচ্ছে এবং পরের মাসগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেজন্য বড়লাট বদলের সময় এসেছে।[২৯৬] এ চিঠি পাবার পর কংগ্রেস, লীগ, গণপবিষদ, আইনশৃঙ্খলা কোন বিষযেই আর ওয়াভেল মন দেননি।

১৯৪৭-এব জানুয়ারি মাসে লীগ পঞ্জাবের খিজির মন্ত্রীসভা ফেলে দেবার জন্য বিবাট তোডজোড় শুরু করল। আধা সামরিক মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড ততদিনে ভালো ভাবেই সংগঠিত হয়েছে। তারা প্রচুব অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহও কবেছে। ন্যাশনাল গার্ডদের কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে ই জি বেভারিজের প্রতিবেদন দ্রষ্টব্য।[২৯৭] এব প্রতিক্রিয়ায় সংগঠিত হল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বাহিনী। ২৪ জানুযারি খিজিব সবকাব উভযকেই বেআইনী ঘোষণা করলে[২৯৮] কিছু মুসলিম নেতা তা অমান্য করে বন্দী হল এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজনফব আলি ও স্বয়ং জিন্নাব প্ররোচনায় ২৫ ও ২৬ জানুযাবি মুসলিম জনতা লাহোবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করল। ভয় পেয়ে খিজির ২৭শে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলেন। তৎসত্ত্বেও মুলতান, লাহোর, গুজরাট ও জলন্ধরে সভা হরতাল, মিছিল চলল। জেনকিনস্ জানালেন তাবা পাকিস্তানেব জিগির দিচ্ছে। আসল উদ্দেশ্য খিজিবেব স্নাযুব ওপর চাপ সৃষ্টি করে তাঁকে সরিযে দেওয়া।[২৯৯] ইতিমধ্যে (২০ ফেব্রুয়াবি) অ্যাটলি পার্লামেণ্টে ঘোষণা কবেছেন যে ১৯৪৮ জুনের মধ্যেই ব্রিটেন ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তব কববে। এর ফলে জিন্না মামদোতর্কে উৎসাহ দিতে থাকেন।[৩০০] খিজিব অপমানজনক শর্তে আপোষেব চেষ্টা করেন। তিনি বেসরকারী মুসলিম গার্ড ও প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নীতিও মেনেছিলেন।[৩০১] কিন্তু শেষ রক্ষা হযনি। ২ মার্চ একটু আকস্মিকভাবেই খিজিব পদত্যাগ করেন। লীগ মন্ত্রীসভা গঠন করতে যাচ্ছে শুনে হিন্দু ও শিখদের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়। লাহোবে বিধানসভার বাইরে মাস্টার তারা সিং উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে "রাজ কবেগা খালসা" ধ্বনি দেন—যা তখনকার শিখ মনস্তত্ত্ব প্রকট করে। মামদোত মন্ত্রীসভা গঠনে ব্যর্থ হলে জেনকিনস্ ৯৩ ধারার শাসন প্রবর্তন করেন।[৩০২] মাউণ্টব্যাটেন কার্যভার নেবাব আগেই মুলতান ও রাওলপিণ্ডিতে আগুন জ্বলছিল।[৩০৩] ১৭ মার্চ জেনকিনস্ ওয়াভেলকে লেখেন, "In the triangle Taxila-Marree-Gujar Khan there was a regular butchery of non-Muslems, particularly Sikhs."[৩০৪] ২০ মার্চ তিনি গজনফর আলিকে বলেন, ঘটনা পূর্বপরিকল্পিত। ২৪ মার্চ নুনকে বলেন, তা লীগেব পক্ষে লজ্জাজনক। আটক, মিয়াওয়ালি, গুজরাট থেকে হিন্দু ও শিখদেব অপসারণ করতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কর্মচারী ও পুলিশ ছিল নীরব সাক্ষী। এ বিষয়ে কংগ্রেস ও গান্ধী-বিরোধী হয়েও পেণ্ডেরেল মুন মুসলমানদের সাফাই গাইতে পারেননি।[৩০৫] বাংলা থেকে গান্ধী চলে এলেও শান্তি ফেরেনি। বারোজ ওয়াভেলকে বলেছিলেন, সুরাবর্দির মনে ভয় জেগেছে, কিন্তু তিনি "Cad and untrustworthy".

দেশের এক সীমান্তে কলকাতা ও নোয়াখালি, অন্য সীমান্তে লাহোর ও অমৃতসর ইত্যাদিতে যে কাণ্ড জিন্নার ফ্রাঙ্কেনস্টাইনরা বাধিয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে দেশভাগই ভাল

এ রকম ধারণা দানা বাধতে শুরু করল এখন থেকে। অর্থাৎ মাউন্টব্যাটেন আসার আগেই। ৮ মার্চ কংগ্রেস পঞ্জাব ভাগে রাজি হল। নব্য ভারতীযরা এই নরকাগ্নির মধ্য দিয়ে আসেননি তাই তাঁদের মুখে কংগ্রেসী (তথা হিন্দু) নেতাদেব বিরুদ্ধে অনেক কিছু কটু (এবং 'প্রগতিশীল') মন্তব্য শোনা যায়। ১৭ মার্চের প্রেস প্রতিবেদনে নেহরু ঠিকই বলেছিলেন, "রাজনীতি জঙ্গলের যুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে।" বলদেব সিং অতটা বিচলিত না হয়ে বলেন, এ যুদ্ধ তো মোগল আমল থেকে চলছে, এর শেষ নেই। প্যাটেল মনে করেন—অ্যাটলির ২০ ফেব্রুয়াবির ঘোষণা এর জন্য দায়ী এবং সামরিক আইন জারি করা উচিত। লীগের ধাবণা হয়েছিল ব্রিটেন প্রাদেশিক সরকারগুলিব হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে প্রস্তুত, তাই আসামসহ বাংলা, পঞ্জাব ও সীমান্ত কুক্ষিগত কবতে যে কোন অমানবিক পন্থা অবলম্বন করছিল। জেনকিনস প্যাটেলেব সঙ্গে একমত ছিলেন। ওয়াভেল সব জেনেও পঞ্চদশ লুই-এর মত মনে মনে বলছিলেন—A près moi le deluge—আমাব পর সর্বনাশ হয় তো হোক। তাঁর উচিত ছিল হয় লীগকে গণপবিষদে ঢুকতে ও গোলমাল থামাতে বাধ্য করা, না হয় অন্তর্বর্তী সরকার থেকে সরিযে দেওয়া। বিতাডিত বড়লাট আপন কর্তব্য করেননি। এমনকি লিয়াকৎ আলি খান যখন বাজেট প্রস্তাব নিয়ে বাজনীতি শুরু কবলেন তখন থামাবাব চেষ্টাও কবেননি। লিয়াকৎ ব্যবসাব লাভের ওপর কর (Business Profits Tax) বসাতে চান (আয় হবে ৩০ কোটি টাকা), করপোরেশন কর বাডাতে চান (আয় বাডবে ৪ কোটি), সুপাবট্যাক্স পুনর্বিন্যাস করতে চান (অধিক আয় হবে ২½ কোটি), এবং ডিভিডেণ্ড ট্যাক্স, ক্যাপিটাল গেইনস ট্যাক্স ইত্যাদি থেকে টাকা (৩½ কোটি) তুলতে চান। অধিকন্তু কর ফাঁকি রোধেব জন্য তিনি এক উচ্চ শক্তিসম্পন্ন ট্রাইব্যুনালও গঠন করতে চান। বডলাটেব উপদেষ্টা জর্জ অ্যাবেল স্বীকাব কবেছেন, এ ভাবে লিযাকৎ কংগ্রেস ও বিডলার মত ধনী ব্যবসায়ী পৃষ্ঠপোষকদেব মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি কবতে চেয়েছিলেন।

৫ মার্চ নেহরু, প্যাটেল ও ভাবা জানান তাঁবা বাজেট প্রস্তাব অনুমোদন করেন না। ১৭ মার্চ প্যাটেল পুনরায় বলেন—এটা করা ঠিক হবে না। বডলাটেব মন্তব্য—"it has obviously got Birla and Big Business, with whom P. (Patel) works closely, very much on the raw."[৩০৭] শেষে বিজনেস প্রফিটস ট্যাক্স হ্রাস করা হয়েছিল ২৫% থেকে ১৬½%-এ।

এই সময় সীমান্ত দখলের জন্য জিন্না লডাই শুরু কবলেন এবং তাঁকে পুরো মদৎ দিলেন ছোটলাট ওল্যাফ ক্যারো। লীগ একটা উপ-নির্বাচন জেতার পর ধাপে ধাপে উত্তেজনা বাড়াল। মিছিল নিষিদ্ধ হলে 'জেল ভরো', পরে খানসাহেবের বিরুদ্ধে অভিযান। আবার পেশোয়ারে শোনা গেল 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান'।[৩০৮] বাংলা ও আসাম থেকে আমদানি হল মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড।[৩০৯] ওয়ালি খান তাঁর Facts Are Facts The Untold Story Of India's Partition (Vikas, 1987) ও ইস্কান্দাব মির্জা তাঁর আত্মজীবনীতে জিন্না কি ভাবে সীমান্তে জিহাদ চালাতে চান তার বর্ণনা দিয়েছেন। মির্জা তখন প্রতিবক্ষা দফতরে যুগ্মসচিব। ১৯৪৭-এর ফেব্রুয়ারি জিন্না তাঁকে ফোন করে ডাকলেন। বললেন, "তুমি কি আমাকে ভারতীয় মুসলমানদের নেতা বলে মানো? আমার আদেশ মানবে?" উত্তরে 'হ্যাঁ' বলা ছাড়া উপায় ছিল না। জিন্না বললেন, "চাকরি ছেড়ে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে জেহাদের ব্যবস্থা কর।" মির্জা লিখছেন, "with the liberal expenditure of money I would be able to cause some trouble in Waziristan, Tirah and Mohmand country. I gave my estimate for the sum of

money as one crore." জিন্নাকে টাকা জোগালেন ভূপালেব নবাব। কালাতের খান দিলেন মির্জাকে চাকুরি। মির্জা যখন প্রায় তৈবি, জিন্না মে মাসে ডেকে বললেন, পাকিস্তান মিলবে, ওসবের দরকার নেই।[৩০৯ক] কিন্তু দাঙ্গা বাধানো তো যায়। সব চেয়ে সহজ উপায বিহারের দাঙ্গায় লোমহর্ষক মুসলিম নির্যাতনের গুজব রটিযে উপজাতীয় রোষ সৃষ্টি করা। এবার শুরু হল বোমার ব্যবহার—অবশ্যই অমুসলিমদের ওপর। এবল্যাণ্ড জ্যানসন তাঁব **India, Pakistan or Pakhtoonistan** গ্রন্থে এ সবেব বর্ণনা দিযেছেন। জ্যানসনকে আলম খান বলেছিলেন যে মানকির পীব প্রচুর টাকা ঢালছেন আব সরকাবী আমলারা লীগপন্থীদের সাহায্য করছে। পুলিশ হাঙ্গামাকাবীদের পিঠে লাঠি না মেবে মাটিতে মারত। জেলের কর্মচারীবা বন্দী লীগপন্থীদের ছেড়ে দিত। বাত্রে দিনে প্রতিদিন মেজর খুর্শিদ আনোয়ার গুণ্ডা নিযে গিয়ে আইনসভার অধিবেশন ভাঙতেন। মিছিলে থাকত ছাত্র ও পীরের মুবিদরা। মুরিদবা গুলিতে মাবা গেলে খুর্শিদ জ্যানসনকে বলেন—"কাম ফতে, এবার মুসলিম রক্তপাত হয়েছে।"[৩০৯খ]

লীগের ওপব ২০ ফেব্রুয়াবির ঘোষণাব প্রতিক্রিযা এতক্ষণ আলোচনা কবলাম। এখন কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াব দিকে নজব দেওযা যাক। ঠিক কি কথা বলেছিলেন অ্যাটলি? কোন পরিস্থিতিতে? মনে রাখা দরকাব অ্যাটলি, ক্রিপস, পেথিক-লবেন্স কেউই ওয়াভেলেব ওপর আস্থা রাখতে পাবেননি। ১৯৪৬-এব জুনেই ক্রিপস্ তাঁকে সবিযে দেবাব কথা ভেবেছিলেন। তাঁব ওপব দিযে ক্রিপস ও ভাবতসচিব সুধীব ঘোষেব মাধ্যমে কংগ্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ বাখতেন। এটা এমন দৃষ্টিকটু হয়েছিল যে ওযাভেল আগস্টেব শেষে অ্যাটলির কাছে নালিশ করেন। ঘোষ দাবি কবেছেন যে ডিসেম্ববেব লণ্ডন বৈঠকেব সময় ক্রিপস্ মাউন্টব্যাটেনকে বডলাট কবে পাঠাবাব কথাটা নেহরুর কাছে পাড়েন। হডসন তা অস্বীকার কবেছেন। ঘোষের অনেক কথা বিশ্বাসযোগ্য নয় কিন্তু এটা ঠিক যে ক্রিপস্ নিজেই বডলাট হতে চেযেছিলেন এক সময়। তা আমবা জানতে পাবি ক্রিপসেরই চিঠিতে।[৩১০] অবশ্য তা হয়নি। কিন্তু ডিসেম্বব মাসেই নেহরু ও জিন্নাকে কাছ থেকে দেখে অ্যাটলিব মনে হয নেহরুকে খোলা হাতে খেলতে দিলে এমন সংবিধান রচিত হবে যাতে গৃহযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠবে। অন্যদিকে ওয়াভেলেব **Breakdown Plan** গ্রহণ কবাও সম্ভব নয। সময এসেছে ভাবতীয নেতাদেব জোর ধাক্কা দিযে বোঝাবাব যে দাযিত্ব নেবাব সময় এসে গেছে। অ্যাটলির ভাষায—

"Two things were necessary: one was to make the Indians feel their responsibility by announcing that we were clearing out within a definite period, the other was to find the man to put this through." ১৮ ডিসেম্বব যখন তিনি মাউন্টব্যাটেনকে বড়লাট হবার জন্য আহ্বান জানালেন তখন তাঁর মনে হয়েছিল "ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত আবেদন"-ই ভারতীয় পরিস্থিতিব পক্ষে প্রয়োজন। আবও বিপদ দেখা দিয়েছিল—চার্চিল-জিন্নার মধ্যে বারংবার দেখা শোনায়। কোয়ায়েদ-ই-আজম পেপার্সে দেখি চার্চিল তাঁকে 'গিলিযাট' (Gilliatt) ছদ্মনামে চিঠি লিখতে চাইছেন।[৩১১] জিন্না পরে বলেছেন—চার্চিল তাঁকে জানান পাকিস্তান গঠিত হলে তাঁকে কমনওয়েলথ থেকে বেব করে দেওযা হবে না। সাইমনও কম যান না। তিনি জিন্না ও লর্ডস্ সভার বহু সভ্যের মধ্যে যোগসূত্র ছিলেন।[৩১২] চার্চিল চাইছিলেন—ব্রিটিশ আওতায় দেশভাগ। ভারতীয় দলগুলি কোন সমঝোতায় আসবে না আর ওয়াভেলের পলায়ননীতি তো ব্রিটেনের পক্ষে চরম অপমান। মজার ব্যাপার, শ্রমিক

দলের বেভিন ও অ্যালেকজাণ্ডারও মনে মনে সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন। অ্যাটলি বেভিনকে জানান, ওয়াভেলের মত পরাজিত মনোভাব সম্পন্ন লোককে দিয়ে চলবে না। ওয়াভেল প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধতা মর্মে মর্মে টের পাচ্ছিলেন।

১৯৪৭-এর জানুয়ারি মাস ধরে ক্যাবিনেট কমিটি ওয়াভেলের ক্রম-অপসরণ ও ক্রিপসের এককালীন অপসরণ—এই দুই বিকল্প নীতি নিয়ে আলোচনা চালায়। ওযাভেলেব নীতি ভারতের ঐক্য বিনষ্ট করবে এবং প্রথম থেকেই ভারতীযদের বিরোধিতা জাগাবে। ব্রিটিশ সরকার চাইছিল ক্ষমতা হস্তান্তরেব দিন ঘোষণা করতে হলেও হস্তান্তবটা যেন আলোচনা ও সমঝোতার মাধ্যমে হয়।[৩১৩] ৩১ জানুয়ারিব চিঠিতে ওয়াভেলকে কার্যত বরখাস্ত করলেন অ্যাটলি। মুর ঠিকই বলেছেন যে অ্যাটলি ও ক্রিপসের বাস্তব রাজনীতিজ্ঞান ও ওয়াভেলের গ্রহণীয় নীতি উদ্ভাবনের অক্ষমতাই তাঁর পতনের কাবণ। উক্ত অক্ষমতাব মূলে একজন সেনাপতিব একগুঁয়েমি ও নমনীয়তাব অভাবই ছিল না, ছিল লীগের কার্যকলাপ সম্বন্ধে ন্যায়বিগর্হিত পক্ষপাতিত্ব।

মাউন্টব্যাটেনেব আসবার খুব ইচ্ছে ছিল না। অ্যাটলি সরকাব তাঁকে দিযে কি নীতি কার্যকর করতে চান ভাল ভাবে বুঝে তিনি দাযিত্ব নিতে চেয়েছিলেন। ৭ জানুযাবি তিনি দাবি করলেন হস্তান্তরেব দিন আগেভাগে স্থিব করতে হবে। তিনি যাচ্ছেন অল্পদিনেব মধ্যে কাজ শেষ করতে। অ্যাটলি ১৯৪৮-এর ১ জুন-এর আগে হস্তান্তর হবে ঘোষণা কবতে রাজি হলেন। ৮ ফেব্রুয়ারি মাউন্টব্যাটেন পেলেন তাঁব নিযোগপত্র ও ঘোষণাব খসড়া। ওয়াভেল ঘোষণা পিছিয়ে দিতে বলেছিলেন। বারোজ ও জেনকিনস সতর্ক কবে দেন যে ঘোষণার ফলে সাম্প্রদায়িক সমস্যা বেড়ে যাবে।

২০ ফেব্রুয়াবি কমনস সভায় অ্যাটলি ক্যাবিনেট মিশনের কাজ নিয়ে কিছু গৌরচন্দ্রিকা করলেন, দুঃখ করলেন যে গণপবিষদ ভাবতীয় দলগুলিব মতভেদেব জন্য উদ্দেশ্যমত কাজ করতে পারছে না, তা ছাড়া তা পুরো প্রতিনিধিত্বমূলকও নয। ব্রিটেন চায় ভারতীয়েরা নিজেরাই সংবিধান রচনা করুক। কিন্তু যদি ১৯৪৮-এর জুনেব মধ্যে পুরো প্রতিনিধিত্বমূলক গণপরিষদ দ্বারা সংবিধান রচিত না হয (সোজা কথা, লীগ যদি যোগ না দেয়), তবে

"....H.M.G. will have to consider to whom the power of the Central Government in British India should be handed over, on the due date, whether as a whole to some form of Central Government for British India or in some areas to the existing Provincial Government, or in such other way as may seem most reasonable and in the best interests of the Indian people." সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করা হল ওয়াভেল বিদায় নিচ্ছেন ও তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন ভাইকাউন্ট মাউন্টব্যাটেন। তিনি ব্রিটিশ ভারতের ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। দেশীয় বাজ্যের সঙ্গে ব্রিটেনেব সম্পর্ক (paramountcy) চলবে আগেকার মত।

সুধীব ঘোষ জানাচ্ছেন, তাঁকে নাকি ক্রিপস্ ৩ মার্চ বলেন, "তোমবা চাও আমরা কংগ্রেসের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাই এবং লীগেব ওপর চাপ দিই তোমাদের তৈবি শাসনতন্ত্র মানতে। আমরা তা পাবি না। আমরা নিরপেক্ষ থাকতে কৃতসঙ্কল্প।" ঘোষ জিজ্ঞাসা করেন ব্রিটেন কি চায় কংগ্রেসের কাছে? অ্যাটলি, ক্রিপস্, ভাবতসচিব সবাই নাকি চান কংগ্রেস লীগের সংশয় ও সন্দেহ দূর করার জন্য চবম চেষ্টা নিক, পরিষ্কার ভাবে জানাক ৬ ডিসেম্বরের ক্যাবিনেট ব্যাখ্যা তারা যে গ্রহণ করেছে বলছে তা কতদূব সত্য। ঘোষ বলেন,

এর অর্থ আসামকে বাংলার হাতে সমর্পণ। ক্রিপস্ উত্তর দেন, সেকশান 'সি'-এর বাংলার প্রতিনিধিরা যে 'trickster' এবং আসামের ক্ষতি করবেই এমন মনে করার কি আছে?[৩১৪]

এই পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ৮ মার্চ প্রস্তাব নিল যে গণপরিষদ লীগ বাদ দিয়েই চলবে, সারা ভারতের জন্য সংবিধান রচনা করবে, তবে যদি কোন কোন অংশ তা গ্রহণে অনিচ্ছুক হয় তারা যুনিয়ান থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ পঞ্জাব ও বাংলা ভাগ প্রয়োজনে করা হবে। আপাতত ১৯৩৫-এর শাসনতন্ত্র অল্প বদলিয়ে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের ভিত্তিতে অন্তর্বর্তী সরকারকে ক্ষমতা হস্তান্তর করা যেতে পারে।[৩১৪ক] অন্যদিকে লীগ ব্যাখ্যা করল—অকংগ্রেসী প্রদেশগুলির হাতেই ব্রিটেনের কেন্দ্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। ওয়াভেল ঠিকই ধরেছিলেন দুই ব্যাখ্যা পরস্পরবিরোধী। মাউন্টব্যাটেন ব্যক্তিগত মোহিনী মায়া খাটিয়ে করবেন কি?[৩১৫]

হডসন বলতে চান ২০ ফেব্রুয়ারির ঘোষণার কোন মূল্য নেই, মাউন্টব্যাটেনকে plenipotentiary power দেওয়া হয়েছিল। নেহরু তাঁকে প্রশ্ন করেন এ বিষয়ে। একটু এড়িয়ে মাউন্টব্যাটেন উত্তর দেন—"Suppose I have....?" আসলে তাঁকে সে চরম ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। ১৩ ফেব্রুয়ারি অ্যাটলি ক্যাবিনেটকে জানান যে ঐ ঘোষণাই হবে বড়লাটের নির্দেশিকা (guide line)।[৩১৬] পরে কিছু যোগও করা হয়। (১) সরকারের ইচ্ছা ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্য নিয়ে এক অখণ্ড সরকার স্থাপিত হোক। (২) ১৯৪৭-এর ১ অক্টোবরের মধ্যে মাউন্টব্যাটেন যদি বোঝেন তা সম্ভব নয় তবেই ১৯৪৮-এর জুনের আগে ক্ষমতা হস্তান্তর কি ভাবে হবে জানাবেন। (৩) ভারতীয় নেতাদের তিনি বোঝাবেন সৈন্যবাহিনীর অখণ্ডতা ও প্রবহমানতা নষ্ট করা ঠিক হবে না। (৪) তিনি ভারতকে কমনওয়েলথে রাখার চেষ্টা করবেন। যদি তা সম্ভব না হয় তবে ব্রিটেন ও ভারতের মধ্যে একটা সামরিক চুক্তি করতে হবে। ২২ মার্চ যখন তাঁর সঙ্গে ওয়াভেলের বিদায়ী সাক্ষাৎ হয়, তখন মাউন্টব্যাটেন বেশ আশা নিয়েই বলেছিলেন, ভারতবর্ষকে তিনি ডোমিনিয়ান ভিত্তি মেনে নেওয়াতে পারবেন।[৩১৭] এই শেষ নির্দেশেব পেছনে ইজ্‌মে, অকিনলেক প্রভৃতিব হাত ছিল। ভারত রুশ প্রভাবাধীন হলে মধ্যপ্রাচ্যেব তৈল সম্পদ বিপন্ন হবে, ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হবে,—এমন ভয় বাবংবার উচ্চারিত হয়েছিল।[৩১৭ক] গণপরিষদ ২২ জানুয়ারি ভারতকে স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র ঘোষণা কবে গোলমাল বাধায়।

কয়েকটা কথা আমাদের পরিষ্কার জানা দরকার। মাউন্টব্যাটেন আসার আগেই, বিশেষত ২০ ফেব্রুয়ারির ঘোষণার কাছাকাছি সময়ে কংগ্রেস দেশভাগ নিয়ে আলোচনা করছিল। তার অব্যবহিত কারণ পঞ্জাবের হানাহানি। ওয়াভেলের সঙ্গে ১৭ ফেব্রুয়ারির সাক্ষাৎকারে প্যাটেল বলেন, মুসলিমরা পশ্চিম পঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত (অবশ্য রাজি হলে), পূর্ববঙ্গ নিতে পারে। ২৪ ফেব্রুয়ারি নেহরু পঞ্জাব ও বাংলা ভাগের কথা বলেন, তবে আশা করেন এই খণ্ডিত পাকিস্তান না মেনে জিন্না বিশেষ শর্তে ভারতীয় য়ুনিয়ানে যোগ দেবেন।[৩১৮] মুখে যাই বলুন, প্যাটেল ভাবতেন, ইংরেজরাই পঞ্জাব ও বাংলা ভাগ হতে দেবে না এবং শেষ পর্যন্ত পশ্চিম পঞ্জাব ও পূর্ব বাংলা য়ুনিয়ানে যোগ দেবে।[৩১৯] ৯ মার্চের চিঠিতে ও ১০ মার্চের সাক্ষাৎকারে নেহরু বলেন, পঞ্জাব ও বাংলা ভাগ ছাড়া গতি নেই। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ৮ মার্চের প্রস্তাব এ সব মতের প্রতিফলনমাত্র। নেহরু ও প্যাটেল গান্ধীকে বারবার এই কঠিন সত্য বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন তার প্রমাণ রয়েছে।[৩২০] কিন্তু

গান্ধী অবশ্যই তা মেনে নেননি। তিনি ভগ্নহৃদয়ে ধীরে ধীরে নেপথ্যে সরে যাচ্ছিলেন এমন একটা ধারণা দিতে চেয়েছেন এস গোপাল।[৩২১] তা সত্য নয়। নোয়াখালি ও বিহার ছিল তাঁর জীবনে, চার্চিলের ভাষায়, 'the finest hour'। হিন্দুর হয়ে, ভারতবর্ষের হয়ে, সমগ্র মানবজাতির হয়ে তিনি অগ্নিপরীক্ষা দিচ্ছিলেন যার কাছে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের কৌশল ও মারপ্যাঁচ অতি তুচ্ছ।

মাউন্টব্যাটেন সম্বন্ধে যে প্রভূত মিথ রচিত হয়েছে তার মূলে স্বয়ং মাউন্টব্যাটেন। বড়লাট রূপে ও তার পরে, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত, ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে যখনই কথা উঠেছে, তখনই সচেতন ভাবে ও সুকৌশলে আপন ভূমিকা অতিরঞ্জিত করেছেন তিনি। সন্দেহ নেই, এক লক্ষ্মীপরী যেন জন্মকালে তাঁর শিয়রে উপস্থিত থেকে সব প্রার্থনীয় বর উজাড় করে দিয়েছিলেন—রূপ, বিত্ত, যশ, জয়, সৌভাগ্য। তাঁর ধারণা ছিল সার্লমানের রক্ত বইছে তাঁর ধমনীতে, অন্তত সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার। বিবাহ করেছিলেন তখনকার অন্যতমা সুন্দরীশ্রেষ্ঠা ও ততোধিক ধনবতী, এডুইনা অ্যাসলিকে। চার্চিলের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি হয়েছিলেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মিলিত সমর বাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ (C. in C. SEAC)। অ্যাটলির সম্মতি না থাকলে তিনি পেতেন না বড়লাটের পদ। এই 'প্রিন্স চারমিং'-এর জনসংযোগবিভাগের অধিকর্তা ছিলেন তিনি নিজেই। তাঁর প্রভামণ্ডলে যাঁরা বিরাজ করতেন—অ্যালান ক্যাম্বেল জনসন ও ভি পি মেনন—অতিরঞ্জনে তাঁরাও কম যান না। ডোমিনিক লাপিয়ের ও ল্যারি কলিনসের Freedom at Midnight এবং পরে প্রকাশিত Mountbatten and Independent India অবশ্য যে কোনো ঐতিহাসিকের সন্দেহ উদ্রেক করবে। তা মাউন্টব্যাটেনের নির্জলা আত্মপ্রচারের নির্বিচার প্রতিধ্বনি। কিন্তু তাঁর সরকারী জীবনীলেখক ফিলিপ জিগলাব (Zeigler) ও ঐতিহাসিক এম· এন· দাশ মাউন্টব্যাটেনেব মোহিনীমায়া থেকে নিজেদেব সম্পূর্ণ মুক্ত রাখতে পারেননি। আসলে ব্রডল্যাণ্ডসে রক্ষিত তাঁর বিপুল ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের অরণ্যে হাবিযে গেছে অহমিকা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা, কর্মশক্তি ও প্রাণপ্রাবল্য, মাঝে মাঝে মানবিক, কিন্তু প্রায়শ নিষ্ঠুর, সর্বদা আপন ভাবমূর্তি সম্বন্ধে সচেতন—মাউন্টব্যাটেনেব আসল রূপ।

॥ ১১ ॥

শোনা যায় বল্লভভাই প্যাটেল খোঁজ কবেছিলেন কেমন হবেন নতুন লাটসাহেব।

বিলেতথেকে খবর আসে— "a liberal aristocrat with revolutionary leanings." শুনে প্যাটেল নাকি মন্তব্য করেন—"He will be a toy for Jawaharlal to play with—while we arrange the revolution." আসলে প্যাটেলও বিপ্লবী ছিলেন না, মাউন্টব্যাটেনও নন এবং নেহরু ও মাউন্টব্যাটেন কে যে কার হাতে কখন এবং কতটা পুতুল হয়েছিলেন বলা কঠিন। প্যাটেল তাঁর বাইরের মনোহর 'প্লেবয়' রূপ দেখে ভেতরের কূটনৈতিক দক্ষতা ও নিষ্ঠুরতা কল্পনা করতে পারেননি। আজাদ লিখছেন, তিনিই কংগ্রেসী মন্ত্রীদের মনে কৌশলে দেশভাগের বিষবৃক্ষের বীজ বপন করেন আর প্যাটেলই হন প্রথম শিকার।[৩২২]

বস্তুত এই পর্বের ইতিহাসদর্শন অনেকটা অন্ধের হস্তীদর্শনের মতো। নেহরু সম্বন্ধে আপন পক্ষপাতিত্ব এস গোপাল স্বীকার করেছেন। নেহরুর ওপর অতি সম্প্রতি এম জে

আকবর লিখেছেন Nehru : The Making of India (Viking, 1988). তিনি নেহরুর রচনা ও চিঠিপত্র সংকলনের বেশি কিছু দেখেননি। মাউন্টব্যাটেনের নাম নেহরু প্রথম করেন এ কথা তিনি বিশ্বাস কবেছেন লাপিয়েরের ওপর নির্ভর করে। ভি পি মেনন ছিলেন মাউন্টব্যাটেন ও প্যাটেল উভয়েরই অন্তরঙ্গ ব্যক্তি, উভয়কেই তিনি নিজস্ব মতামত দ্বারা প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি নৈর্ব্যক্তিক ছিল না। অতএব তাঁর The Transfer of Power in India সাবধানে ব্যবহার কবতে হবে। আয়েষা জালালের মত শক্তিমতী ঐতিহাসিকও The Sole Spokesman গ্রন্থে নানা বিরুদ্ধ সমালোচনার পর জিন্নাকে অন্তিমকালে মহনীয় করে তুলেছেন। তাঁর বক্তব্য—জিন্না দেশভাগ, সৈন্যবাহিনী ভাগ—কিছুই চাননি। আকবরও অতিসহজে এ মত খণ্ডন করেছেন। ফিলিপস ও ওয়েনরাইট দম্পতি The Partition of India. Policies and Perspectives, 1935-1947 (1979) মাঝে মাঝে সত্যসন্ধানী আলোকপাত করলেও বহুক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক, এমনকি ভুলপথেও নিয়ে যাও। পেণ্ডেবেল মুন Transfer of Power Series এর অন্যতম সম্পাদক হলেও ওয়াভেলের সময়কাব ঘটনাবলীর পর্যবেক্ষক ও বিশ্লেষকরূপে আমবা তাঁর পক্ষপাতিত্ব লক্ষ্য করেছি। তাঁব Divide and Quit গ্রন্থে বহু প্রমাণ মিলবে। হোয়াইট হল থেকে শেষ ঘটনাবলী দেখেছেন শেষ ভারতসচিব লর্ড লিস্টোয়েলতাঁব Indo-British Review VII, 3 and 4 (1979) -এর প্রবন্ধদ্বয়ে। প্রধানত ক্রিপস ও অ্যাটলির কাগজপত্রের ভিত্তিতে লেখা আব জে মুবের Escape from Empire বহু তথ্যের আকর, কিছুটা জটিল অরণ্যে দিশেহাবা। যাঁবা দেশভাগ সম্পর্কিত রচনার একটা তালিকা চান তাঁরা বি আব নন্দা সম্পাদিত Essays in Modern Indian History (1980)-তে অশোক মজুমদারেব 'Writings on the Transfer of Power, 1945-47' প্রবন্ধটি পডতে পারেন।

প্রাথমিক উপাদান হিসাবে এখনও আমাদেব ম্যানসারগ, লাম্বি ও মুন সম্পাদিত ট্রানসফার অব পাওযার গ্রন্থমালার ওপর নির্ভব করতে হবে। তা ছাডাও আমি মাউন্টব্যাটেনেব কাগজপত্র ব্যবহার কবব। অন্যান্য দেশীয সূত্রকে তো মূল্য দিতেই হবে।

মাউন্টব্যাটেন কার্যভার গ্রহণ করলেন ২৪ মার্চ। আব তাবপব পাযেব তলায ঘাস গজাতে দিলেন না। প্রাযই তিনি বলতেন, তিনি "a one man Cabinet Mission." লিনলিথগো বা ওয়াভেলের মত প্রত্যেক কথায় তাঁকে ইন্ডিয়া অফিসেব দিকে তাকিয়ে থাকতে হয না। জিগলার জানাচ্ছেন—তাঁর এক অন্তবঙ্গ পবিষদবর্গ ছিল। তাতে ছিলেন ইজ্‌মে, মিভিল, অ্যাবেল, স্কট, ক্রিস্টি, ক্রাম। কোন হিন্দু বা মুসলিম নয়। মাঝেমধ্যে ভি. পি. মেননকে ডাকা হত কংগ্রেসের. বিশেষত প্যাটেলের, মতামত জানবার জন্য। যেন হ্যামলেটকে দিয়ে রোজেনক্রানজ্‌, গিলডেনস্টার্ন ও কববখনকদেব হ্যামলেট অভিনীত হচ্ছে।

প্রথমেই তাঁর ও তাঁর প্রধান সহকারীব তৎকালীন মনস্তত্ত্ব বুঝে নিলে পববর্তী ইতিহাস বোঝা সহজ হবে। আরও জানা দরকার, এই ইজ্‌মে ছিলেন জবরদস্ত দমননীতিব প্রতীক উইলিংডনের সহকারী (১৯৩১-৩৩) ও উইনস্টন চার্চিলের চিফ অব স্টাফ (১৯৪০-৪৫)। স্যার এরিক মিভিল (Mieville) ছিলেন উইলিংডনের ব্যক্তিগত সচিব (১৯৩১-৩৬)। স্যার জর্জ অ্যাবেল ছিলেন ওয়াভেলের ব্যক্তিগত সচিব, ক্রিস্টি লিনলিথগোর সহকারী ব্যক্তিগত সচিব, স্কট অ্যাবেলের সহকারী। অর্থাৎ সব উপদেষ্টাই উইলিংডন, লিনলিথগো ও ওয়াভেলের কংগ্রেস বিরোধী নীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

মাউন্টব্যাটেন ও ইজমে বুঝতে পারেন সাবা ভারতে গৃহযুদ্ধের পূর্বেকার অবস্থা। হয়তো বা তা শুরুই হয়ে গেছে। আইন ও শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে এবং তা রক্ষা করার মত সামবিক বা অসামরিক শক্তি নেই। ক্রিপস্‌কে বড়লাট লিখছেন—

"We are sitting on a volcano which only an announcement of how we decide the transfer of power can prevent from eruption."[৩২৩] ইজমে লিখছেন, ১৯৪৮-এব জুনকে বড় শীঘ্র মনে কবা হচ্ছিল, ভাবতে এসে মনে হচ্ছে বড় দেবি হয়ে যাবে। "The few British officials that was still in service were at the end of their tether...British arms were represented by little more than token forces." অর্ন্তবর্তী সরকাব প্রত্যেক সমস্যাকে সাম্প্রদাযিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছে। এ ধরনের সরকাব নিয়ে পনের মাস শাসন চালানো যাবে না। প্রদেশে প্রদেশে "murders and brutalities of the most bestial character had become commonplace." "আমবা এমন এক জাহাজে আছি যা প্রচুর দাহ্য, অত্যন্ত বিস্ফোরক এবং বিধ্বংসী উপাদানে ভর্তি। জাহাজে আবার আগুন লেগেছে। যদিও তা বারুদের ঘরে পৌঁছাযনি তবু অতি সত্বর আমাদের তা নেবাতে হবে, অন্তত নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। তারপব যত শীঘ্র সম্ভব পৌঁছতে হবে বন্দরে।" সময়ের সমস্যাটা এতো বড়ো যে এক্ষুনি কোনো পরিকল্পনা নেওয়া দবকাব। "অবিভক্ত ভারত অবশ্যই সব থেকে ভালো সমাধান কিন্তু একই বকম পরিষ্কাবভাবে বোঝা যাচ্ছে তা বর্তমান অবস্থায় সম্পূর্ণ অসম্ভব।"[৩২৪] এঁদের ভয়ার্ত মনোভাবেব চমৎকাব বর্ণনা পাই লেনার্ড মসলেব The Last Days of the British Raj গ্রন্থে ও অ্যালান ক্যাম্বেল জনসনের Mission with Mountbatten গ্রন্থে। মসলে লিখছেন, "What they (Mountbatten and his advisers) were doing was not so much handing India her freedom but washing their hands of her..."[৩২৫] একবার এরকম মনোভাব এলে বিচার, বিবেচনা, বিবেকের বালাই থাকে না। ১৯৪৮-এর জুন পর্যন্ত অপেক্ষা করলে কি হত বলা যায় না। কিন্তু মাউন্টব্যাটেন তখনই স্থির করেন, তাব যত আগে (পারলে ১৯৪৭-এব মধ্যেই) তল্পি-তল্পা গোটাতে পারলে ভাল হয়।

প্রদেশে প্রদেশে যে নারকীয় ঘটনাবলী ঘটছিল তার নেতৃত্ব দিচ্ছিল হিন্দু, মুসলিম ও শিখদের বেসবকারী সশস্ত্র বাহিনী। ১৯৪৬-এর শেষে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড ও শিরোমণি আকালি দলেব প্রত্যেকেব প্রায় লক্ষাধিক সদস্য ছাড়াও ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময়কার বিপ্লবীরাও ছিলেন, ছিল ফরওয়ার্ড ব্লক, ছিল খাকসার।[৩২৬] স্কট কম্যুনিস্ট পার্টিকে বাদ দিয়েছেন। ১৯৪৫-এর পর থেকে, বিশেষত ১৯৪৬ ও ১৯৪৭-এর প্রথমে, জানভ লাইন (Zhdanov line) গৃহীত হওয়ার ফলে তাদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কার্যকলাপ বাড়ছিল। ভারতেব পার্টি সভ্যসংখ্যা ১৯৪৬ জুলাইতে দাঁড়ায় ৫০,০০০। তাদের আহ্বানে লক্ষ শ্রমিক ও কৃষক সাড়া দিত। ডাক, তার, ধাঙ্গড় ধর্মঘট বা তেভাগা আন্দোলনের মত আন্দোলন, কেবল জোতদার শ্রেণীব ভয় বা ক্রোধ উৎপাদন করে না, আইন ও শৃঙ্খলার সমস্যাও হয়ে দাঁড়ায়। তারা সাধারণ ধর্মঘট ডাকলে সারা দেশে কাজের চাকা অন্তত কিছু দিনের জন্য বন্ধ হয়ে যেত। অতএব বড়লাটের তারাও ছিল মাথা ব্যথার কারণ। সবচেয়ে মাথা ব্যথা ছিল গান্ধীকে নিয়ে। ক্রিপস্‌ ও ক্যাবিনেট মিশনের দৌত্য ব্যর্থ করেছেন তিনি। তাঁকে সযত্নে পরিহার করতেই হবে।

কার্যভার গ্রহণ করার দিন থেকে ৬ মে পর্যন্ত মাউন্টব্যাটেন ১৩৩টি সাক্ষাৎকার করেন। এর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হল গান্ধী, নেহরু, প্যাটেল, জিন্না, লিয়াকৎ আলি ও প্রধান রাজন্যবর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎকাব। এখন থেকে ভারতীয় রাজনীতিতে কৃষ্ণ মেননের আবির্ভাব ঘটে। তিনি ও ভি পি মেনন বড়লাট এবং কংগ্রেসের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করতেন। শাসন পরিষদের সংখ্যালঘু প্রতিনিধিরা অন্যান্যদের সঙ্গে যোগসূত্র রাখতেন।

মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে কথাবার্তায় নেহরুর ও প্যাটেল তাঁদের পূর্ব অভিমত ও ৮ মার্চের ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব অনুযায়ী' চলতেন। অর্থাৎ ১৯৩৫-এর আইন অনুযায়ী নেহরুর নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের হাতে ডোমিনিয়ান সমতুল ক্ষমতা হস্তান্তরিত করতে হবে, কংগ্রেস একাই গণপরিষদে সংবিধান রচনা চালিয়ে যাবে, প্রয়োজন হলে কোন কোন প্রদেশ ভাগ হতে পারে এবং বিভিন্ন বিচ্ছেদকামী এলাকা আলাদা হয়ে যেতে পারে।[৩২৭] প্যাটেল আসাম, পঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশে লীগকৃত দাঙ্গা হাঙ্গামার তীব্র প্রতিবাদ জানান ও কেন্দ্রীয় লীগমন্ত্রীদেব বরখাস্ত করতে বলেন।[৩২৮]

তাঁর ধারণা ছিল খণ্ডিত পাকিস্তান লীগ সদস্যরা মেনে নেবে না। তিনি জানতেন না যে ১৯৪৬-এর মে মাসেই লীগ প্ল্যানিং কমিটি তা সমর্থন করেছিল। তাবও আগে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল মুসলিম লীগের একটা সংখ্যালঘু দল বর্ধমান বিভাগ ছেড়ে দিতে বাজি হয়েছিল, যদিও সংখ্যাগুরু দল কোন অংশ ছাডতে চায়নি এবং উভয় দলই আসাম ও বিহাবেব পূর্ণিয়া চায়।[৩২৯]

১ এপ্রিল গান্ধী দেশভাগে প্রবল আপত্তি তুললেন। তিনি বললেন, জিন্না ও লীগ সদস্যগণকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা গঠন করতে বলা হোক। মাউন্টব্যাটেন প্রশ্ন কবেন— "কিন্তু এ প্রস্তাব কিভাবে নেবেন জিন্না ?' গান্ধীর উত্তব—"যদি তাঁকে জানান—আমি এ প্রস্তাব কবেছি, জিন্না বলবেন—'কৌশলী গান্ধী'।"

"আমার, ধাবণা," বডলাট বললেন, "জিন্না ঠিক কথাই বলবেন।" গান্ধী উত্তব দেন—"না, আমার প্রস্তাব আগাগোডা আন্তবিক।"[৩৩০] তবে তাঁব শর্ত ছিল পাকিস্তান পেতে হলে জিন্নাকে যুক্তিব কাছে আবেদন কবতে হবে, অস্ত্র দ্বারা নয়।[৩৩১] ৫ এপ্রিল ইজ্‌মেকে গান্ধী যে চিঠি লেখেন তাতে কিছু শর্ত ছিল— (১) মন্ত্রীসভা জিন্না গঠন করুন—মন্ত্রীবা সবাই মুসলিম হতেও পারেন। (২) যদি এই মন্ত্রীসভা ভারতীয জনগণেব স্বার্থে কাজ করে, কংগ্রেস তাকে পূর্ণ সমর্থন জানাবে। (৩) কোনটা ভাবতীয়দেব স্বার্থে বা স্বার্থবিরোধী তার একমাত্র বিচারক হবেন ব্যক্তিগতভাবে মাউন্টব্যাটেন। (৪) লীগকে শান্তিরক্ষাব জন্য কাজ কবাব প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। (৫) ন্যাশনাল গার্ড বা অন্য কোন বেসরকারী বাহিনী রাখা চলবে না। (৬) এই পরিপ্রেক্ষিতে জিন্না পাকিস্তানেব দাবি পেশ করতে পারেন, এবং (৭) জিন্না এ সব শর্ত মানতে অরাজি হলে কংগ্রেসকে মন্ত্রীসভা গঠন করতে দিতে হবে।[৩৩২] কিছু নতুন কথা নয়। ক্যাবিনেট মিশনের সামনেও তিনি এই অসমসাহসিক (কিছুটা অবাস্তব) প্রস্তাব বেখেছিলেন। অ্যালান ক্যাম্বেল জনসন লিখছেন, বড়লাটের উপদেষ্টারা তাঁকে গান্ধীর এই আপাত সরল ফাঁদে পড়তে না বলেন।[৩৩৩] ৫ এপ্রিল ভি পি মেনন এরিক মিভিলকে এক নোট পাঠান তার শেষ বাক্যটি তুলে দিলাম—"We must, while keeping Gandhi in good humour, play for time." ৭ এপ্রিল জিন্নার কাছে কথাটা তোলা হয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেন তিনি। কারণ এতে দায়িত্ব রয়েছে, কর্তৃত্ব নেই। আজাদ ও সীমান্ত গান্ধী ছাড়া নেহরু, প্যাটেল ও ওয়ার্কিং কমিটির অন্য সদস্যরা গান্ধীর এই সুমহৎ (না চতুর ?) আদর্শবাদ গ্রহণ কবতে

রাজি ছিলেন না। মহাত্মাকে প্রায় কেউ সমর্থন না করায় তিনি দুঃখ করে লেখেন, "তবুও সি এফ অ্যানড্রুজের স্থান আমি নিতে চাই। তিনি নিজের ছাড়া আর কারুর প্রতিনিধিত্ব করতেন না।"[৩৩৪] তিনি জানিয়ে দেন কথাবার্তার মধ্যে তিনি আর থাকবেন না। এম এন দাশের মতে, তিনি এরপর বিহারের দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকায় চলে যান। বস্তুত নানা চাপ দিয়ে তাঁকে মাউন্টব্যাটেন দিল্লী থেকে সরিয়ে দেন।[৩৩৫] আবার শুরু হল তাঁর 'Via Dolorosa', খ্রীস্টের মত একক তীর্থযাত্রা—মনুষ্যকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য।

মাউন্টব্যাটেন ও তাঁর পবিজনরা ভেবেছিলেন 'নগ্ন বাস্তবেব' চেহারাটা জিন্নার সামনে তুলে ধরলে তিনি পিছিয়ে যাবেন। ৩১ মার্চ স্থির হয় তাঁকে বাংলা ও পঞ্জাব ভাগ করাব ভয় দেখান হবে, দ্বিতীয়ত হিন্দুস্থান ও রাশিযাব মিলিত আক্রমণেব ভয়। ৮ ও ৯ এপ্রিল পঞ্জাব ও বাংলা ভাগের কথা উঠেছিল। জিন্না যখন বললেন, "You must carry out a surgical operation", তখন ইজ্‌মে বললেন, তবে তো পঞ্জাব ও বাংলা ভাগ কবতে হয়। জিন্না ইজ্‌মেকে বলেছিলেন, "দোহাই, আমাকে পোকায কাটা (moth-eaten) পাকিস্তান দেবেন না।" বাঙালী ও পাঞ্জাবীদেব ভাষা ও আচাবব্যবহারগত ঐক্যেব ওপব তিনি জোব দিলে বডলাট শুষ্ক পবিহাসেব সুবে বলেছিলেন, "তা হলে তো ভারতীয জাতীযতার দাবি সর্বাগ্রে। এক বিবাট উপমহাদেশ শান্তিতে বাস কবতে পাবত, বিশ্বে এক বিরাট ভূমিকা নিতে পাবত, আপনি তা ভাগ করতে চাইছেন আব সে জন্য এই দেশ দ্বিতীয় শ্রেণীব শক্তিতে পবিণত হবে।" ১০ এপ্রিল আবাব তিনি জিন্নাকে বোঝান পাকিস্তান চাইলে তাঁকে খণ্ডিত পাকিস্তানই নিতে হবে। অর্থাৎ, সিন্ধু, পঞ্জাব ও বাংলাব অর্ধাংশ, 'সম্ভবত' সীমান্ত প্রদেশ নিয়ে তাঁকে খুশি থাকতে হবে। জিন্না বাববাব আবেদন কবেন—"বাংলা ও পঞ্জাব ভাগ করবেন না, আমাকে viable পাকিস্তান দিন।" বডলাট মন্তব্য কবছেন, "মনে হয় বুড়োকে (জিন্নাকে) আমি পাগল কবে দিয়েছি।"[৩৩৬] আদৌ নয়। জিন্না পাল্টা চাল চাললেন—তা হলে আসামকেও ভাগ কবা হোক। ১১ তাবিখে নেহরু আসাম ভাগে বাজি হলেন। তিনি জানতেন সিলেট ছাড়া আসামেব কোন জেলাই পাকিস্তানে যেতে বাজি হবে না।[৩৩৭] ঐদিন স্টাফ মিটিং-এ বডলাট বললেন, "জিন্না কোন পাল্টা যুক্তি দেখান না। শোনেন বলেও মনে হয না। বুঝিতে পাবি না কি কবে সম্ভব হল এমন সম্পূর্ণ দায়িত্বজ্ঞানহীন মানুষেব এত বড ক্ষমতাব অধিকাবী হওযা।"[৩৩৮] তাঁব জীবনীকাব জিগলাব বলছেন, ৫ এপ্রিল প্রথম সাক্ষাতেই জিন্নাকে দেখে বডলাট মন্তব্য কবেছিলেন—"My God, he was cold।[৩৩৯] ক্রমশ এই শৈত্য বেড়ে গেছিল। ১৭ এপ্রিল জিন্না বলে বসলেন, "I do not care how little you give me as long as you give it to me completely."[৩৪০] জিন্নাকে বডলাট 'psychopathic case' ভাবলেন, কিন্তু বুঝলেন দেশভাগ ছাড়া উপায নেই।

৮ এপ্রিল নেহরু তাঁকে কিছু ইঙ্গিত দেন যাব ভিত্তিতে হস্তান্তব পবিকল্পনাব খসড়া বচনা শুরু হয়। নেহরু বলেন, কোনো বিশেষ এলাকায যদি এক সম্প্রদাযেব সংখ্যাগবিষ্ঠতা থাকে, তবে তাদের ওপর জোব করে সংবিধান চাপানো ঠিক হবে না। প্রদেশ বা প্রদেশেব অংশরাই ঠিক কববে তারা হিন্দুস্তান বা পাকিস্তান জোটে যোগ দেবে। কিন্তু ১৯৪৮-এব জুন পর্যন্ত একটা শক্তিশালী কেন্দ্র থাকতেই হবে। ১০ এপ্রিল বড়লাট স্টাফ মিটিং-এ প্রস্তাব দিলেন, বাংলা ও পঞ্জাব বিধানসভার মুসলিম ও অমুসলিম জেলাব সদস্যবা আলাদা মিলিত হয়ে যদি প্রত্যেক সভাব উভয সেকশান দেশভাগেব পক্ষে বায দেয় তবে বাংলা ও

পঞ্জাব ভাগ হবে। সিলেট মুসলিমবঙ্গে যোগ দিতে পারে। সীমান্তে মনোভাব জানবার জন্য নতুন করে নির্বাচন হবে। এই পরিকল্পনা অ্যাটলির স্বনিয়ন্ত্রণ নীতির ভিত্তিতে তৈরি হচ্ছে। অর্থাৎ দেশ ভাগের দায়িত্ব বর্তাবে ভারতবাসীদের ওপর। এর নাম দেওয়া হল 'প্ল্যান বাল্কান'।[৩৪১] মুর বলছেন, নেহরু যে শক্তিশালী কেন্দ্র চেয়েছিলেন বডলাট সে কথা চেপে যান। নেহরুর ধারণা ছিল বিচ্ছেদকামী প্রদেশ বা তার অংশ য়ুনিয়ানের সঙ্গে বিশেষ যোগ রাখবে। মাউন্টব্যাটেন আবার তাঁর মনের কথা নেহরুকে পুরো জানাননি। সেটা হল—ভাগাভাগির পর ভারতীয় নেতারা কমনওয়েলথে থাকতে চাইবেন। নেহরু তা ঠিক চাননি।[৩৪২] এই নিয়ে দুজনের মধ্যে পরে ভুল বোঝাবুঝি হবে।

১৫ ও ১৬ এপ্রিল লাটদের সভায় মাউন্টব্যাটেন এই খসড়া পরিকল্পনা পেশ কবেন। পঞ্জাবের লাট জেনকিনস্ পঞ্জাব ভাগেব তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি বলেন, জেলাগুলির মধ্যে মুসলিম, শিখ, হিন্দু সম্প্রদায় তো সমভাবে ছড়ানো নয। তাছাড়া শহরগুলির অধিবাসী ও নিকটবর্তী অঞ্চলের অধিবাসী অনেক ক্ষেত্রে ভিন্ন সম্প্রদায়ের। অতএব দেশভাগ হলেই যে সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান হবে তা নয়। প্রায় প্রত্যেক তহশিল ও জেলায় অসন্তুষ্ট সংখ্যালঘু থেকে যাবে। বাবোজ অসুস্থ বলে আসেননি কিন্তু তাঁর প্রতিনিধি জে এফ টাইসন বলেন, বাবোজ বাংলা ভাগেব বিরোধী।

বাংলা ভাগের বিরোধিতা শুধু বারোজই করেননি। বিলেতেব সামরিক কর্তাবাও করেছিলেন। পরে আমবা তা নিয়ে আলোচনা কবব। বাবোজ বাংলাকে অখণ্ড বাখার জন্য কিরণশঙ্কর রায়কে সুরাবর্দির সঙ্গে যৌথমন্ত্রীসভা গঠনে আহ্বান জানান। কিন্তু কেন্দ্রীয় কংগ্রেসেব আপত্তিতে ও হিন্দু মহাসভাব চাপে বাংলাব কংগ্রেস তা করতে সাহস পেল না। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ৪ এপ্রিল প্রস্তাব নিল অখণ্ড বাংলাব হাতে ক্ষমতা হস্তান্তব করা স্থির হলে যে সব জেলা ভাবতীয় য়ুনিয়ানে থাকতে চায তাবা থাকতে পাববে। ৪ থেকে ৬ এপ্রিল বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভা কনফারেন্স একই সিদ্ধান্ত নেয। শ্যামাপ্রসাদ বলেন, **"I can conceive of no other solution of the communal problem in Bengal than to divide the province..."** বাবোজ লিখছেন, শবৎ বসুব ফবোয়ার্ড ব্লক ও কম্যুনিস্টরা দেশ ভাগের বিরোধী কিন্তু সংখ্যাগুরু হিন্দু জনমত তাদেব কথা শুনতে রাজি নয়।[৩৪৩] হিন্দুরা আশা করেছিল তারা পুবো প্রেসিডেন্সী ও বর্ধমান বিভাগ, কলকাতা, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলা, এবং মালদা, দিনাজপুব, ফবিদপুব ও ববিশালেব কিযদংশ পাবে। পশ্চিমবাংলার মোট জনসংখ্যা হবে ২$\frac{২}{১}$ কোটি, মুসলমানেরা তাব মধ্যে ৮০ লক্ষ। মোটামুটি প্রত্যেক বঙ্গে সংখ্যালঘুর সংখ্যা হবে ৩০%-এব মত। অমৃতবাজার পত্রিকা এক জনমত যাচাই করে।তাতে ৯৮.৩% হিন্দু দেশ ভাগ চেয়েছিল।[৩৪৪]

এই পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তবঙ্গের কথা ওঠে। শীলা সেনের মতে স্বাধীন যুক্ত বঙ্গেব প্রথম প্রস্তাব আসে আবুল হাশেম ও শরৎ বসুর কাছ থেকে। তার আগেই শরৎ বসুকে কেন্দ্রীয় সরকার ছাডতে হয়েছিল। এ আই সি সি লন্ডন ঘোষণা (৬ ডিসেম্বব) গ্রহণ করলে তিনি ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদও ত্যাগ করেন। ১৯৪৭-এর জানুযাবি থেকে বাংলাকে এক সোস্যালিস্ট বিপাবলিক হিসাবে গঠন কবতে চান তিনি। ১৫ ফেব্রুয়াবি এক প্রতিবেদনে তিনি দেশভাগে আপত্তি জানান। আক্রাম খাঁরাও খুশি হননি। ফলে সুবাবর্দির যুক্তবঙ্গের চাল চালানোর ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল। তিনি যুক্তবঙ্গের প্রথম আবেদন জানালেন ৮ এপ্রিল ১৯৪৭-এর ২৬ এপ্রিল মাউন্টব্যাটেনেব সঙ্গে সাক্ষাৎকারে স্বাধীন ও অবিভক্ত বাংলাব এমন এক স্বর্ণচিত্র তিনি দেখালেন যে ঝানু বড়লাটও বিহ্বল হলেন। সুরাবর্দি লোভ

দেখালেন—এই যুক্তবঙ্গ কমনওয়েলথে থাকবে। সমগ্র পূর্বাঞ্চলে কলকাতা হবে ব্রিটিশ ধনতন্ত্রের পাদপীঠ। ব্রিটিশ কর্মচারীরাই বাংলা শাসন করবে।[৩৪৫] তিনি জানালেন, জিন্নাকে রাজি করাতে পারবেন। ঐদিনই জিন্নাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, কলকাতা তাঁদের চাই। "What is the use of Bengal without Calcutta? They had much better remain united and independent; I am sure that they would be on friendly terms with us."[৩৪৭] দ্বিতীয় বাক্যের শেষ অংশটি অতি গুরুত্বপূর্ণ। আমার সন্দেহ নেই যে সুরাবর্দি জিন্নাকে বোঝান ভাগাভাগি হলে হিন্দুরা কখনই কলকাতা ছাড়বে না। তাই আপাতত যুক্তবঙ্গ হোক। পরে পাকিস্তানে যোগ দিতে কতক্ষণ ? এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে ২৭ এপ্রিল দিল্লী প্রেস কনফারেন্সে সুরাবর্দিকে প্রশ্ন করা হয় স্বাধীন বাংলা পাকিস্তানে যোগ দেবে কিনা ? সুরাবর্দি এর উত্তর দেননি। অমলেন্দু দে সুরাবর্দির প্রত্যেকটি বিবৃতিকে বেদবাক্যের মর্যাদা দিয়েছেন দেখে বিস্মিত হয়েছি।[৩৪৭] ভেতরে ভেতরে বড়লাট ও তাঁর পারিষদদের সঙ্গে তিনি কি আলোচনা করেছিলেন আরো দেখাব।

২৮ এপ্রিল কলকাতা ফিরে সুরাবর্দি, আবুল হাশেম, শরৎ বসুর কথা হল। তার ফলে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ৬ জন নেতাকে হিন্দু নেতাদের সঙ্গে বসে বাংলার ভাবী সংবিধান তৈরি করার নির্দেশ দিল।[৩৪৮] গান্ধী সোদপুরে এলে তাঁর সঙ্গে প্রথম কথা বললেন শরৎ বসু (৯ মে)। পরে আবুল হাশেম (১০ মে), সুরাবর্দি ও ফজলুর রহমান (১১ মে)। ১১ মে সুরাবর্দিরা কিরণশঙ্কর রায়ের সঙ্গে মিলিত হলেন, পরের দিন শরৎ বসু। সোদপুরে প্রার্থনা সভায় গান্ধী বলেন, যদি বাংলা ভাগ হয় তবে তার জন্য মুসলমানরা, বিশেষত ক্ষমতাসীন মুসলিম সরকার, দায়ী হবে। "If he were the Prime Minister of Bengal, he would plead with his Hindu brethren to forget the past. He would tell them he was as much a Bengali as they were. Difference in religion could not part the two." যদি সুরাবর্দির হৃদয়ে বাংলা ও বাঙালী, হিন্দু ও মুসলমানের জন্য সত্যিকার প্রেম থাকে তবে পাষাণও গলবে।[৩৪৯] হিন্দুদের মনে ভয় ও সংশয় দেখা দিয়েছে তাই এই ভাগাভাগির জ্বর (fever of partition)[৩৫০]।

সুরাবর্দি হিন্দুদের অনেক আশ্বাস দিলেন, লোভ দেখালেন মানভূম, সিংভূম, পূর্ণিয়া ও সুর্মা উপত্যকা নিয়ে এক বৃহৎ বঙ্গ তিনি গড়বেন যার মত সমৃদ্ধ রাষ্ট্র বেশি থাকবে না। ১২ মে শরৎ বসুর বাড়িতে একটা প্রস্তাবও গৃহীত হয়

(১) সার্বভৌম অখণ্ড বঙ্গ হবে সমাজবাদী সাধারণতন্ত্র।

(২) এর সংবিধান রচিত হলে যুক্ত নির্বাচন ও বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন হবে।

(৩) নব নির্বাচিত আইন সভা অবশিষ্ট ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থির করবে।

(৪) লীগ মন্ত্রীসভা ভেঙে দিয়ে প্রতিনিধিমূলক অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হবে।

(৫) নতুন সংবিধান রচনা পর্যন্ত মুসলিম ও হিন্দু (তপসিলীসহ)-কে ৫০ ৫০ হারে চাকুরি দেওয়া হবে।

(৬) ৩০ বা ৩২ সদস্যের গণপরিষদ গঠিত হবে।[৩৫১]

২০ মে এই মর্মে স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনের দলিল রচিত হয়। স্বাক্ষর করেন শরৎ বসু ও আবুল হাশেম। ১২ মে-র প্রস্তাব কিঞ্চিৎ মার্জিত ও পরিবর্ধিত হয়েছিল। নতুনের মধ্যে দেখি মুখ্যমন্ত্রী হবেন মুসলিম, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিন্দু। আর বাকীরা সমহারে মুসলিম ও হিন্দু

(তপসিলীসহ)। শরৎ বসু গান্ধীকে পত্রে একথা জানিয়ে তার সমর্থন চাইলেন ২৩ মে। পরের দিন গান্ধী জানালেন তিনি ওয়ার্কিং কমিটির সঙ্গে আলোচনা করবেন।

কিন্তু তিনি বেশীদূর এগোতে পারেননি। বাধা ছিল অনেক। প্রথম বাধা উঠল লীগের ভেতর থেকে। আক্রাম খাঁর নেতৃত্বাধীন প্রভাবশালী সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বাংলাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত রাখতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। এভাবে অখণ্ড স্বাধীনবঙ্গ মেনে নিলে স্বাধীন সীমান্ত প্রদেশের দাবিও মানতে হবে। ৩০ এপ্রিল জিন্না লাহোর প্রস্তাব ব্যাখ্যা করে বলেন—পঞ্জাব ও বাংলা অবিভক্ত অবস্থায় পাকিস্তানেই থাকবে। তাঁর বাঙালী অনুগামীরা বলতে থাকেন সুরাবর্দি, হাশেম ও ফজলুর রহমানের চেষ্টা নিতান্ত ব্যক্তিগত। আক্রাম খাঁর ৫মে-র বিবৃতি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য :**"I strongly deprecate the suggestion that in order tocounteract the partition move Bengal should dissociate herself from the other Pakistan areas. Such a policy will be suicidal. One of its immediate consquences will be that Muslim Assam, which depends and relies on us, will be completely let down and ruined politically."** ১৪মে-ব আর এক বিবৃতিতে তিনি জানালেন এর ফলে শুধু সাড়ে তিন কোটি মুসলমানকে বর্ণহিন্দুদের হাতে সমর্পণ কবা হবে, তপসিলী হিন্দুদেরও দাসত্ব . স্থায়ী করবে।[৩৫২] যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল সক্রিয়ভাবে লীগের সমর্থন করেছিলেন।[৩৫৩] ১৮ মে জিন্না আক্রাম খাঁ, নুরুল আমিন, হবিবুল্লা বাহাবদেরা বলেন, তিনি আদৌ সুরাবর্দিদের হিন্দু নেতাদের সঙ্গে স্বতন্ত্র বাংলা নিযে আলোচনা চালাতে অনুমতি দেননি।[৩৫৪] আবুল হাশেমেব প্রতিবাদ (১৭ মে) কোন কাজ দেযনি।

দ্বিতীয় বাধা এসেছিল কিছু হিন্দু নেতাদের কাছ থেকে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ও হিন্দু মহাসভা এ বিষযে একযোগে কাজ করেছিল এবং ২৬ এপ্রিল কিরণশঙ্কব বায়, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও বিধানচন্দ্র রায দিল্লীতে মিলিত হয়ে ওযার্কিং কমিটিব সদস্যদেব বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করতে অনুরোধ জানাতে মনস্থ করেন।[৩৫৫] ৪ মে থেকে হিন্দু মহাসভা বাংলাবিভাগের আন্দোলনকে এক ব্যাপক রূপ দেয। ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সেব এক সভায় (৩০ এপ্রিল) এন. আর.সরকার যে প্রস্তাব আনেন তা সুবাবর্দির দীর্ঘ সমালোচনা। কলকাতাসহ হিন্দুপ্রধান অঞ্চল নিয়ে আলাদা প্রদেশ গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়এবং তা বাস্তবায়িত করতে বি. এম. বিড়লা, বি. এল. জালান, বদ্রিদাস গোয়েঙ্কা ও বাঙালী শিল্পপতিদের এক কমিটি কবা হয়।[৩৫৬] ২৯ এপ্রিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি বাংলা বিভাগেব দাবিতে এক প্রস্তাব নেয় ও বড়লাট নেহরু, প্যাটেল প্রভৃতিব কাছে তা পাঠায। ১ মে সভাপতি সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ বিবৃতি দেন—**"An undivided Bengal in a divided India is an impossibility. Let Mr. Suhrawardy repudiate the two nation theory and abandon communalism, and he will be able to prevent the partition of Bengal."** ঘোষের আশা ছিল এই **"temporary partition"** পরে নাকচ হয়ে যাবে।

শুধু রাজনৈতিক নেতারা নন বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের অগ্রণী—যদুনাথ সরকার, রমেশচন্দ্র মজুমদার, মেঘনাদ সাহা, শিশিরকুমার মিত্র ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ৭ মে ভারত সচিবের কাছে এক তার বার্তায় সাম্প্রদায়িক সুরাবর্দি-মন্ত্রীসভার প্রতি অনাস্থা জানিয়ে পৃথক প্রদেশ চেয়েছিলেন। শ্যামাপ্রসাদ আবার চেয়েছিলেন দুই বাংলার জন্য দুই অন্তর্বর্তী সরকার।[৩৫৭] তপসিলীদের এক সংগঠন (বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল ডিপ্রেসড ক্লাসেস লীগ)

এঁদের সঙ্গে যোগ দেন। ১৩ মে কলকাতা করপোরেশন বিভাগ সমর্থন করবে।

আসল ঝগড়াটা কলকাতা নিয়ে। নির্বোধ বারোজ মাউন্টব্যাটেনকে বলেন কলকাতাকে 'মুক্তনগবী' ঘোষণা কবা হোক। বড়লাট ২৮ এপ্রিল উত্তর দেন, "I do not like the idea of a free city. It goes against all the principles on which the rest of the plan is based...and I do not see how we can enforce it. Besides which it is not for me to make Pakistan into a sensible scheme." তার চেয়ে স্বাধীন ও যুক্তবঙ্গ শ্রেয। কিন্তু সুবাবর্দি কি সে ব্যবস্থা কবতে পারবেন?[৩৫৮] এই শ্লেষ না বুঝে বারোজ আবদাব ধবেন তবে কলকাতাকে দুই বাংলাব হাতে দেওয়া হোক। না দিলে তো পূর্ববঙ্গ এক 'rural slum'-এ পবিণত হবে।

কিন্তু ততদিনে কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের, বিশেষত প্যাটেল (ও নেহরুব), বিরোধিতা সম্বন্ধে বড়লাট সচেতন হয়েছেন। প্যাটেলের ক্রোধের কাবণ ছিল— (১) লীগের নানা বেনামী ইস্তাহার (যাতে স্বাধীন বঙ্গের নামকরণ করা হযেছিল আজাদ পাকিস্তান), (২) সুরাবর্দির হুমকি যে বাংলা ভাগ হলে আগুন জ্বলবে। দ্বিতীয় বিষয়ে কে. সি. নিয়োগী প্যাটেলেব দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন ও তাঁর সক্রিয় প্রতিবন্ধকতা আশা কবেছিলেন।[৩৫৯] সর্দাব উত্তব দেন, বাংলা বিভাগ আন্দোলন জোরদার হচ্ছে দেখে সুরাবর্দি বিমর্ষ হযে পড়েছেন। "I am afraid this cry (of Suhrawardy) of a sovereign independent Bengal is a trap in which even Kiran Shankar may fall with Sarat Babu. The only way to save the Hindus of Bengal is to insist on partition of Bengal and to listen to nothing else. That is the only way to bring the Muslim League in Bengal to its senses." তবে সুবাবর্দি যে সব ভয় দেখাচ্ছেন তার বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করা হবে।[৩৬০] শ্যামাপ্রসাদ নালিশ করেন, সুরাবর্দির সঙ্গে সমঝোতার চেষ্টা করে অনেক ক্ষতি কবছেন শরৎ বসু। যদি ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা অনুসারে একটা দুর্বল কেন্দ্রও হয তবু আমবা কোন নিরাপত্তা বোধ করব না। "We demand the creation of two provinces out of the present boundaries of Bengal—Pakistan or no Pakistan."[৩৬১] ১৭ মে-র উত্তরে প্যাটেল জানান—"ভয় পাবেন না। You can depend on us to deal with the situation effectively and befittingly."[৩৬২] ২২ মে শরৎ বসুকে প্যাটেল অনুরোধ জানান সর্বভারতীয় রাজনীতি, এমন কি প্রাদেশিক রাজনীতির ক্ষেত্রে, তিনি যেন কংগ্রেস থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন না করেন। ২৭ মে-র উত্তবে শবৎবাবু লেখেন, "সব বাঙালী হিন্দুই দেশভাগ চাইছে না। পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ হিন্দু এর বিরোধী। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস হিন্দু মহাসভাকে মদৎ দেবার জন্যই দেশভাগের জন্য এত আগ্রহ। অবশ্য গত আগস্ট থেকে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষও প্রভূত বেড়েছে। দেশ ভাগের দাবি কম বেশি মধ্যবিত্তদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। যখন লোকে বুঝবে দেশ ভাগ হলে বাংলার এক তৃতীয়াংশ অঞ্চল ও অর্ধাংশ হিন্দু তারা পাবে তখন আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়বে। আর যদি আপনারা মিলিত প্রতিরোধ চান তবে মিলিত ভারতের জন্য দাঁড়াতে হয়। Future generations will, I am afraid; condemn us for conceding division of India and supporting partition of Bengal and the Panjab."[৩৬৩] ২০ মে-ব দলিল প্রকাশিত হবার পর দিনই সর্দার কিরণশঙ্করকে সাবধান করে দেন, "Individual expression of men's views must fit into that policy (official

Congress policy), and there should not be any discordant note. As a disciplined Congressman, I am sure you will appreciate this advice."[৩৬৪]

বড়লাট চেষ্টা করেছিলেন কিরণশঙ্করকে বুঝিয়ে সুরাবর্দির পরিকল্পনা নিতে।[৩৬৫] কিন্তু রকমসকম দেখে কিরণশঙ্কররা পিছিয়ে গেলেন। ১৫ মে সুরাবর্দি বড়লাটের ব্যক্তিগত সচিবকে হতাশার সুরে লিখছেন, "The Hindus want to browbeat me to accept a Socialist Republic, I reject this as indeed I must, Mr Sarat Bose walks out, and Mr. Kiran Sankar Ray is too weak to fight the Hindus on the score of partition."[৩৬৬] এই চিঠি খুব গুরুত্বপূর্ণ। বেশ বোঝা যায় শরৎ বসু চাইছেন সমাজবাদী সাধারণতন্ত্র, আর সুরাবর্দি তা চান না। ২০ মে যে দলিল রচিত হল সত্যি কি তার পেছনে কোন মতৈক্য ছিল? এক দিকে আবুল হাশেম চেয়েছিলেন ইঙ্গ-মার্কিন ধনতান্ত্রিক শোষণ ঠেকাতে, আর সুরাবর্দি বড়লাটের পারিষদ শোন (Shone)-কে বলছেন, "বিদেশী মূলধন দিয়ে আমি সোনার বাংলা গড়তে চাই। মার্কিন মূলধন তো দরজার গোড়ায়। অখণ্ড বাংলা পেলে আমি তা রূপোর থালায় করে ইংরেজদের উপহার দেব।" কোনটা সত্য? আসলে ঐতিহাসিক হিসেবে সিদ্ধান্তে আসতেই হবে সুরাবর্দি, শরৎ বসু, হাশেম সবাই স্বাধীন যুক্ত বাংলা চাইছেন ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে। আর সে উদ্দেশ্যের সঙ্গে কি কেন্দ্রীয় কংগ্রেস কি কেন্দ্রীয় লীগ একমত নয়। কম্যুনিস্ট পার্টির বক্তব্য এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। অধিকারী আগে যাই বলুন, ভবানী সেন কতকগুলি শর্তে কংগ্রেস ও লীগের ঐক্য চেয়েছিলেন—তা হল (১) সার্বজনীন ভোট, (২) যুক্ত নির্বাচন প্রথা, (৩) জমিদারি প্রথার অবসান, (৪) বিদেশী মূলধন জাতীয়করণ, (৫) ভারতের সঙ্গে বাংলার ভবিষ্যৎ সম্পর্ক স্থির করার জন্য গণভোট, (৬) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংযুক্ত ফ্রন্ট এবং (৭) সম্মিলিত মন্ত্রীসভা।[৩৬৭] এখানে লক্ষণীয়, কম্যুনিস্ট পার্টি ভারতীয় য়ুনিয়ানের সঙ্গে সংযুক্তির ব্যাপারটা গণভোটে দিতে চাইছেন—তা লীগের ইচ্ছা নয়। আর আবুল হাশেম স্বাধীন বাংলাকে দিয়ে যে মূলধন নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছেন তার ৮৬% ইঙ্গ-আমেরিকান—যাদের হাতে অসামান্য শক্তিশালী সামরিক যন্ত্র রয়েছে। সার্বভৌম বাংলা গড়তে গেলে আগে চাই বাংলা থেকে সেই মূলধন ও ব্রিটিশ ফৌজ অপসারণ। সে দাবি তো ওঠানো হয়নি। তৃতীয়ত, মুসলিম লীগ ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ভাগ চাইছে অথচ ধর্মেরই ভিত্তিতে বঙ্গ ভাগ চায় না। এই বা কি রকম পরস্পর বিরোধী কথা? আমরা একটু আগেই দেখেছি সুরাবর্দি ইঙ্গ-আমেরিকান মূলধন বহিষ্কার দূরের কথা তার জন্য দরজা আরো উন্মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। আসলে প্যাটেল এই আন্দোলনকে একটা ফাঁদ (trap)মনে করে খুব ভুল করেননি। এই ফাঁদের দুটো ফাঁস ছিল— (১) লোভ—হিন্দুদের সমহারে মন্ত্রিত্ব দেওয়া হবে, চাকরি দেওয়া হবে, ইত্যাদি, (২) ভয়—না দিলে কলকাতা ধ্বংস করে ফেলা হবে। সুরাবর্দির অন্য কারণও থাকতে পারে। দেশভাগের একেবারে মুখোমুখি হয়ে তাঁর চৈতন্য হয়েছিল পাকিস্তান জিগির তুলে, হিন্দুদের মেরে কি লাভ হল তাঁর?

এপ্রিলের শেষে নেহরু কে. পি. এস. মেননকে লিখছেন, যে সব প্রদেশ বা প্রদেশের অংশ থাকতে চায় না তাদের জোর করে ধরে রাখা যায় না। ভাগের পরও প্রতিরক্ষার মত কিছু বিষয় কিন্তু যুগ্ম দৃষ্টিতে দেখতে হবে এবং হয়তো এভাবে জোড়া লাগবে দেশ। "I have no doubt whatever that sooner or later India will have to

function as a unified country. Perhaps the best way to reach that stage is to go through some kind of a partition now."[১৬৮] পাহাড়েব চূড়ায় সূর্যোদয় দেখতে গেলে তো অন্ধকারাচ্ছন্ন উপত্যাকা অতিক্রম কবতেই হয়। ২৪ এপ্রিল গণপরিষদের সভায় রাজেন্দ্র প্রসাদ এব প্রতিধ্বনি কবেন। সন্দেহ নেই যে মাউন্টব্যাটেনেব ওপর অগাধ বিশ্বাসে নেহরু ক্ষমতা হস্তান্তবেব খুঁটিনাটি এমন কি, অনেক সময় মূলনীতিব, প্রতি সজাগ দৃষ্টি বাখছিলেন না। তা না হলে মাউন্টব্যাটেন কি 'প্ল্যান বাল্কান' বচনা কবতে পারতেন ? এতটা মদৎ দিতে পাবতেন সুবাবর্দি ও তাঁব পৃষ্ঠপোষক বাবোজকে ? অগ্রাহ্য করতে পারতেন পঞ্জাবেব দ্রুত অবনত পবিস্থিতি ?

হিন্দু ও মুসলিম ছাড়া পঞ্জাবে এক শক্তিশালী তৃতীয় পক্ষ ছিল—শিখ। দ্বিতীযত, সেখানকাব সমস্যা আবও জটিল হযেছিল ৯৩ ধাবাব শাসন চলাব ফলে। সর্বোপবি সেখানে গান্ধীব মত শান্তিব অতন্দ্র প্রহবী কেউ যাননি। পঞ্জাব হল পাকিস্তান পরিকল্পনাব প্রাণভ্রমব। অথচ কি মুসলিম জনসংখ্যাব গুরুত্বে, কি মুসলিম বসতিব ভৌগোলিক সংস্থানে, লীগের দাবি খুব জোরালো ছিল না।

মোট জনসংখ্যা (লক্ষ)	মুসলিম (লক্ষ)	অমুসলিম (লক্ষ)
২৮৪	১৬২	১২২

জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশ শিখ জাতি (প্রায ৫৭ লক্ষ) ব্রিটিশ দাক্ষিণ্যেব ফলে পশ্চিম পঞ্জাবেব সেচ-সেবিত অঞ্চলে প্রভূত ভূ-সম্পত্তিব মালিক হতে পেবেছিল। পূর্ব পঞ্জাবে তো বটেই। কিন্তু তাদেব বসতি ছিল বিক্ষিপ্ত। কোনো জেলাযই তাবা সংখ্যাগুরু ছিল না। অথচ কি প্রাক্-ব্রিটিশ ইতিহাসেব প্রেরণায, কি **ধর্মোন্মাদনায়**, তাবা পঞ্জাবকেই মাতৃভূমি মনে করত। তাদেব কানে সর্বদাই বাজত—'বাজ কবেগা খালসা।' হিন্দুবা থাকত প্রধানত ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা ও রাজনীতি নিযে। পূর্ব পঞ্জাবে তাবাই ছিল সংখ্যাধিক। অতবড প্রদেশ স্বল্প সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাবিতে মুসলমানবা নিযে নেবে এটা কি শিখ কি হিন্দু মানতে রাজি ছিল না। তবে কি ব্যর্থ হল গুরু গোবিন্দব খালসা ও বণজিৎ সিংহেব শৌর্য ? গুরু অর্জুন ও তেগবাহাদুবেব আত্মত্যাগ ? সর্দাব অজিত সিং ও লাজপত বায, গদব থেকে ভগৎ সিং, কেন তবে স্বাধীনতাব জন্য শহীদ হলেন ?

পঞ্জাব ভাগে শিখদের বিপদই হবে বেশি। মূলতান ও বাওলপিণ্ডিতে প্রচুব মুসলমান বাস করলেও (২০ লক্ষ অমুসলিম, ৯০ লক্ষ মুসলিম) শিখদেব সম্পত্তিব পবিমাণ প্রভূত। লাহোরে মুসলিম সংখ্যা ৪০ লক্ষ কিন্তু হিন্দু ও শিখেব সংখ্যা—৩০ লক্ষ। আব এই বিভাগেই রয়েছে শিখ-প্রধান অমৃতসর ও শিখ তীর্থবাজ—স্বর্ণমন্দিব। এখানকাব অর্থনৈতিক সম্পদও আবার অমুসলিমদের হাতে। আমাদেব বুঝতে হবে—হিন্দু ও শিখদেব ধন সম্পত্তি মুসলিমদের লোভ (অতএব ক্রোধ)-এব বস্তু হয়েছিল। এ জন্যই একদিকে লীগ লুটপাটের ভয় দেখিয়ে, অন্যদিকে হিন্দু মহাসভা ও আকালি দল প্রাণ ভয় দেখিযে, অন্য সম্প্রদায়ের লোকদের তাড়াতে চেষ্টা কবেছিল। জলন্ধর ও আম্বালায় অমুসলিমেব সংখ্যা ৭০ লক্ষ, মুসলিমের ৩০ লক্ষ। এদের কোনটাতেই মুসলিমরা সংখ্যাগবিষ্ঠ নয।

এসব কারণেই ছোটলাট জেনকিনস পঞ্জাব ভাগেব (তথা পাকিস্তানের) ঘোব বিরোধী ছিলেন। মাস্টার তারা সিং তো দেশভাগ রোখবার জন্য জান কবুল কবেছিলেন। বলদেব সিং ভাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত হলেও পশ্চিম পঞ্জাবের ক্যানাল কলোনিতে শিখ সমস্যাব সমাধান কি হবে বলতে পারেননি। মাঝখান থেকে প্রতিদিন আইন ও শৃঙ্খলা একটু একটু

করে ভেঙে পড়ছিল। পুলিশ ও উর্ধ্বতন ব্রিটিশ আমলারা ছিল নিষ্ক্রিয়। একজন বলেছিলেন, "আমাদের কি—আমরা তো চলেই যাব।" জেনকিনস বুঝেছিলেন দেশভাগের অনিবার্য পরিণাম—গৃহযুদ্ধ। যুক্ত পঞ্জাবের জন্য (যেমন যুক্ত বঙ্গের জন্য) বিশেষ সংবিধান রচনা করতে গেলে পাকিস্তান গঠন সম্ভব নয়। আবার জোর করে ভাগ করতে চাই প্রচণ্ড সামরিক শক্তি—যা নেই। হিন্দু নেতা—ঠাকুরদাস ভার্গব, হংসরাজ ও চমনলাল এবং শিখ পন্থিক পার্টি উভয়েই পঞ্জাব ভেঙে দুটো প্রদেশ করতে চান এবং শিরোমণি আকালি দল (১৪ এপ্রিল) তা সমর্থন করেন। তাই কংগ্রেস পঞ্জাব ভাগেব দাবির ওপর জোর দেয়। ১৮ এপ্রিল শিখ নেতারা বড়লাটকে জানান কোন মতেই তাঁরা মুসলিম কর্তৃত্ব মানবেন না। ২১ এপ্রিল এর প্রতিধ্বনি শুনি পঞ্জাব অ্যাসেম্বলিব কংগ্রেস পার্টির ভীমসেন সাচাব ও পন্থিক পার্টির স্বর্ণ সিং-এব কণ্ঠে।

কিন্তু তার আগে তো পঞ্জাবে শান্তি ফিরিযে আনতে হবে। প্রতিবক্ষামন্ত্রী জানালেন—তিন সম্প্রদায়ের প্রায় দশ লক্ষ সৈন্য সম্প্রতি অসামবিক জীবনে ফিরে গেছে। প্রধান সেনাপতি অকিনলেক জানালেন, সাম্প্রদাযিক কলহ ভাবতীয় সৈন্যবাহিনীকে স্পর্শ করল বলে। গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা সন্নিকটে।[৩৬৯] ২৮ এপ্রিল জেনকিনস মামদোতেব নবাবকে বলে দিলেন, উক্ত অবস্থায় হিন্দু মুসলিম কোন মন্ত্রীসভাই পঞ্জাব শাসন কবতে পাববে না। তাছাড়া মামদোতের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দু একজনেব অধিক ছিলও না।[৩৭০] লীগ রাগে ফুঁসতে লাগল, আরও গোলমাল লাগাল।

এই সময় হিন্দু ও শিখরা চাইছিলেন তিনটে স্বতন্ত্র প্রদেশ করা হোক (১) মন্টগোমারি জেলা বাদে রাওলপিণ্ডি ও মুলতান বিভাগ। এটা যাবে মুসলিমদের ভাগে। (২) জলন্ধব ও আম্বালা বিভাগ। এটা পড়বে অমুসলিমদেব ভাগে। আব (৩) মন্টগোমারি নিয়ে লাহোব বিভাগ যা আপাতত তিন সম্প্রদায়ের শাসনাধীন থাকবে এবং পবে পশ্চিম ও পূর্ব পঞ্জাবেব মধ্যে বিধিবদ্ধ সীমানা কমিশন দ্বাবা বিভক্ত হবে। সুবাবর্দিব ভূমিকা নিলেন খিজিব হাযাৎ খান। অবিভক্ত পঞ্জাব—পঞ্জাবীদের জন্য। কিন্তু কি খিজিব কি গজনফর আলিব সন্দেহ ছিল জনমত এ ধরনের আদর্শবাদী আবেদনে সাড়া দেবে কি না। আবাব বডলাট এই অসম্ভব আবদারে সাডা দিলেন (যেমন দিয়েছিলেন সুরাবর্দিকে)। কংগ্রেস এতে কখনও রাজি হত না (যেমন বাংলাব ক্ষেত্রে)। সাহবেদেব অনেকে আবাব শিখদের জন্য আলাদা মাতৃভূমি চেয়েছিলেন। কিন্তু ভারতসচিব অঙ্ক কষে দেখিয়ে দিলেন, ২ কোটি ৮০ লক্ষেব মধ্যে শিখরা মাত্র ৪০ লাখ—তাঁর ভাষায় "major minorityও নয়"। তাছাডা কোন জেলায় শিখরা সংখ্যাগরিষ্ঠও নয়। কোন গণতান্ত্রিক নীতিতে তাদেব জন্য আলাদা রাষ্ট্র হবে?[৩৭১]

উত্তব-পশ্চিম সীমান্তের ব্যাপারে ভাগাভাগিব প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু কংগ্রেসেব মতে পাঠানরা অখণ্ড ভারত ও কংগ্রেসেব পক্ষে অর্থাৎ পাকিস্তানেব বিবোধী। লীগেব দ্বিজাতিতত্ত্ব ও পাকিস্তান দাবিব পবিপ্রেক্ষিতে সীমান্ত পাকিস্তানে যেতে বাধ্য। শেষ নির্বাচনে ৩০টি আসন জিতেছিল কংগ্রেস, ১৭টিতে লীগ, ২ জন ছিল অলীগ মুসলিম, ১ জন আকালি শিখ। কিন্তু খান সাহেবের সরকার বাইরে থেকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত মনে হলেও জিন্নার প্রত্যক্ষ সংগ্রাম থেকে আত্মরক্ষা করতে পারল না। তাঁব বিপক্ষে দাঁড়ালেন স্বয়ং ছোটলাট ওলাফ ক্যাবো। তিনি বললেন, নতুন নির্বাচন হোক। লীগপন্থীরা পাঠানদের বোঝাল তাদের ভাগ্য ভৌগোলিক কাবণে পাকিস্তানের সঙ্গে জড়িত, হিন্দুস্তানেব সঙ্গে নয়।

৪ এপ্রিল আবদুল গফ্‌ফর খাঁকে নিয়ে গান্ধী বডলাটের সঙ্গে দেখা করলেন ও বাদশা খাঁ

স্পষ্ট ভাষায় ক্যারো ও উপজাতি বিষয়ক কর্মচারীদের পক্ষপাতিত্বের নিন্দা করলেন।[৩৭২] বড়লাটের জেরার ফলে সীমান্তের মুখ্য সচিব, দ্য লাফার্ক, ক্যারোর কংগ্রেস বিদ্বেষের কথা স্বীকার করলেন।[৩৭৩] তিনি নাকি বলেছিলেন—নতুন নির্বাচন হলে আবার কংগ্রেস ক্ষমতায় ফিরে আসবে। আর ক্যারোকে গভর্নর রাখা ব্রিটিশ মর্যাদাহানিকব।[৩৭৪]

বড়লাট কিন্তু ভাবলেন সীমান্ত বাদ পড়লে জিন্না কোনো পরিকল্পনায় বাজি হবেন না। তিনি খান সাহেব ও নেহরুর সঙ্গে কথা বলে ঠিক করলেন বন্দী লীগ প্রতিবাদীদেব ছেড়ে দেওয়া হবে ও সভা সমিতিব ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হবে। কিন্তু পঞ্জাবেব মত এখানেও নরম নীতির উল্টো ফল হল। গণ্ডগোল বাড়ল, ট্রেনের ওপর হামলা শুরু হল। অহিংস খুদা-ই-খিদমদগাব এমন পরিস্থিতিব জন্য প্রস্তুত ছিল না। এম এন· দাশ বলেছেন, বড়লাট জিন্নার সঙ্গে এক গোপন ষডযন্ত্রে নামলেন। তিনি সীমান্ত পবিদর্শনে যাবেন, লীগ গোলমাল সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখবে। জিন্না ঘোষণা কবলেন, "বডলাট নিশ্চয়ই ন্যায়ানুগ ব্যবস্থা নেবেন।" প্যাটেল বললেন, কংগ্রেস মন্ত্রী সভার পতন ঘটানোব জন্য আবদুব রব নিস্তাব ও ফিরোজ খান নুন যা করছেন তাতে ন্যায়ের প্রশ্ন ওঠে কি কবে? তিনি নিজে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রূপে কংগ্রেসের আচরণেব জন্য দাযী থাকবেন। "কিন্তু লীগ যদি প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জিগির না তুলে নেয় তবে সর্বনাশ ঘটবে।"[৩৭৫]

এপ্রিলেব শেষে মাসুদ মালিক গুলাব খান জিন্নাকে লিখছেন, "দক্ষিণ ওযাজিবিস্তান এজেন্সির সব মাসুদের পক্ষ থেকে, যখনই মুসলিম লীগ হাইকমাণ্ড চাইবে, আমি সশস্ত্র সাহায্য দেবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। পাকিস্তান জিন্দাবাদ।" ওয়ালি খান জিজ্ঞাসা করছেন—ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এজেন্টেব নজর এড়িযে জনৈক মালিক কি ভাবে এক ভারতীয় নেতাকে এমন চিঠি লেখে? আব আইপিব ফকিব খুদা-ই-খিদমদগার আন্দোলনের নেতা ইয়াকুব খানকে পত্র লিখলে তাঁকে প্রাণভয় দেখান হয়? এ সব ঘটনা ক্যারোর নাকের সামনে ঘটছিল। তিনি নেহরুব সীমান্ত পবিদর্শনেব বিবোধিতা করেছিলেন, অথচ মানকিশবীফেব পীর যখন খাইবাব, মোহমন্দ, মালাকান্দ ভ্রমণ করে হিন্দু ও নেহরুর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করছিলেন, তিনি বাধা দেননি। এরল্যান্ড জ্যানসন থেকে এরকম বহু নিদর্শন তুলে দেওযা যায় মালিক গুলাব খান ও ব্রিটিশ পলিটিক্যাল অফিসাবদের মধ্যে ষড়যন্ত্রেব।[৩৭৬]

যাই হোক বডলাট তো (জিন্নাব সঙ্গে ব্যবস্থা মত?) পেশোয়াব গেলেন ২৮ এপ্রিল। লীগ প্রায় হাজার পঞ্চাশ লোক জোগাড করে পাকিস্তানের জিগিব তুলল। বডলাট সেই জনতার সামনে নাটকীয ভাবে দর্শন দিলেন। আকাশ বাতাস কম্পিত করে ধ্বনি উঠল—'মাউন্টব্যাটেন জিন্দাবাদ'। বডলাটেব অহং-এ এব চেয়ে বড়ো সুডসুড়ি আর কি হতে পারে? বড়লাট পাঠানদেব মনোগত (অর্থাৎ পাকিস্তানে যোগ দেবাব) ইচ্ছা বুঝে ফেললেন। কংগ্রেসের উচিত ছিল সমান্তরাল জমায়েতের ব্যবস্থা করা। কিন্তু দাঙ্গার আশঙ্কায় খানসাহেব ঝুঁকি নিলেন না। তবে ক্যাবো-বিরোধী ধ্বনি উঠেছিল। বডলাট তার প্রতিবাদ করেছিলেন নেহরুকে লেখা ৬ মে-ব চিঠিতে!!

খানসাহেব বড়লাটের রকমসকম দেখে প্রস্তাব করলেন—সীমান্তকে স্বাধীন পাখতুনিস্তান ঘোষণা করা হোক। লীগ ধনী সর্দারদের মুখপাত্র, গরীব পাঠানদের কি হবে? বডলাট বললেন, "সময় নেই, তা না হলে জনমত যাচাই করতাম plebiscite নিতাম।" সবাই বুঝে নিল পরিকল্পনায সীমান্তের প্লেবিসিট নেওয়া হবে। নেহরুর মতে এ ধরনের কোনো প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বডলাট। নেহরু ক্যারোব পদত্যাগ দাবি তুলে এটা ঠেকাতে চান।[৩৭৭]

১ মে ইজমের হাতে যে খসড়া পরিকল্পনা বিলেত পাঠান হয় তাতে জনমত যাচাইযের ব্যবস্থা ছিল—শুধু হিন্দুস্তান না পাকিস্তান কোন দিকে সীমান্ত যাবে সেই ইস্যুতে। কংগ্রেস দাবি করে যে তারা স্বাধীন থাকতে পারে কিনা তাও যাচাই করা হোক। বডলাট নাকচ কবে দিলেন। নেহরু নির্বাচন ও জনমত যাচাই দুটোই স্থগিত রাখতে বললেন। উলটে বডলাট ভারতসচিবকে বিশেষ অনুবোধ জানালেন যাতে দুটোই হয।[৩৭৮] যাঁরা সীমান্তের প্রতি অন্যায়ের জন্য শুধু কংগ্রেসের ওপব দোষাবোপ কবেন তাঁবা এ ঘটনাগুলো মনে বাখবেন।

॥ ১২ ॥

পযলা মে-ব মধ্যে মাউন্টব্যাটেনেব ক্ষমতা হস্তান্তর পবিকল্পনা চূডান্ত রূপ পেল। আগেই দেখিযেছি মার্চেব শেষে ও এপ্রিলেব প্রথম দু সপ্তাহ বিভিন্ন বাজনৈতিক নেতাদেব সঙ্গে আলোচনাব ফলে তিনি ও তাঁব পাবিষদবর্গ বুঝতে পেবেছিলেন, ক্যাবিনেট মিশনেব প্ল্যানে ফিবে যাওযা সম্ভব নয। জিন্না 'পাকিস্তান' দাবি তো ত্যাগ কববেনই না, ববং পঞ্জাব ও বাংলা ভাগের ঘোব বিবোধী[৩৭৮ক] এবং কংগ্রেস মোটামুটি ৮ মার্চেব সিদ্ধান্ত (পঞ্জাব ভাগ ও বাংলা ভাগ) অনুসাবে চলছে। ৮ এপ্রিল পণ্ডিতজী বলেছিলেন—(১) গণপবিষদ যুনিয়ানের জন্য সংবিধান বচনা করতে থাকবে এবং ততদিন শক্তিশালী কেন্দ্র বাখতে হবে। (২) সংবিধান বচনাব পবই প্রদেশ বা প্রদেশাংশেব স্বাযত্তশাসন নীতিব ভিত্তিতে স্বতন্ত্র হবাব অধিকাব রয়েছে, আগে নয। (৩) অন্তর্বর্তী সবকাবকে এখুনি ডোমিনিযানেব মর্যাদা দেওযা উচিত। তাঁব ধাবণা ছিল বাংলা ও পঞ্জাব ছাডা কোন প্রদেশ বিভক্ত হবে না এবং পূর্ববঙ্গ, সিন্ধু, পশ্চিম পঞ্জাব—সবাই যুনিযানেব সঙ্গে বিশেষ ব্যবস্থা মাবফৎ যোগ বাখবে। বাজেন্দ্র প্রসাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুরূপ ছিল। যদিও আজাদ বলেছেন, অর্থমন্ত্রী লিযাকৎ আলিব ব্যবহারে উত্ত্যক্ত হয়ে, মাউন্টব্যাটেন আসাব পূর্বেই, প্যাটেল "শতকবা পঞ্চাশ ভাগ দেশভাগেব দিকে চলেছিলেন," এমনকি তাঁকেই 'founder of Indian partition' বলা উচিত, তবু এ মন্তব্য মানা যায না। পঞ্জাবে (বিশেষত বাওলপিণ্ডিতে) প্রচণ্ড মাবামাবি, গণপবিষদে লীগেব যোগদানে অসম্মতি এবং জিন্নাব কথাবার্তা তাঁকে বিচলিত কবেছিল। লিয়াকতের অনুমোদন ছাড়া চাপরাশী নিযোগ কবতে পাবছেন না বলে ক্রুদ্ধ হননি সর্দাব, বাংলা ও পঞ্জাবে ক্রমবর্ধমান অশান্তি দমনে কি লীগ মন্ত্রী কি ওযাভেল কোন চেষ্টা করছিলেন না বলে ক্ষিপ্ত হযেছিলেন আপন অসহাযতায।[৩৭৮খ] মাউন্টব্যাটেনেব হাতে যে প্ল্যান (Plan Balkan) বচিত হয ও ১৫ এপ্রিল লাটদেব সভায় অনুমোদিত হয[৩৭৯] তা ছিল সম্পূর্ণ অন্যরূপ। তাতে সংবিধান রচনাব পূর্বেই প্রদেশসমূহের স্বাতন্ত্র্য ও তাদেব হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরেব কথা ছিল। মেনন বলছেন, দলীয় নেতাদেব সম্মতি ব্যতীত এবং শক্তিশালী কেন্দ্রেব হাতে ছাডা অন্যভাবে ক্ষমতা হস্তান্তবিত হলে নৈবাজ্য অবশ্যম্ভাবী। "In a divided India this could best be to two central Governments on the basis—a point on which I laid particular stress—of dominion status."[৩৭৯ক] ১৯৪৬-এর ডিসেম্বরে এই পবিকল্পনা তিনি প্যাটলেকে শুনিয়েছিলেন এবং তাঁর সম্মতি পেয়েছিলেন।[৩৭৯খ] কিন্তু কি মাউন্টব্যাটেনেব পাবিষদবর্গ কি ইণ্ডিযা অফিস তাতে সাডা দেযনি।[৩৭৯গ] মাউন্টব্যাটেনেব প্ল্যানকে মেনন "particularly abhorrent" আখ্যা দেন।

১, ২ ও ৪ মে ওয়ার্কিং কমিটি বসল। গান্ধীও উপস্থিত ছিলেন। প্রস্তাবে লীগেব 'পাশবিক ও সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপ'-এর এবং সরকারেব (বিশেষত সীমান্ত সবকারের) লীগ-তোষণ নীতির প্রতিবাদ জানানো হয়। গান্ধী ৪ মে বড়লাটের সঙ্গে দেখা করে দেশভাগের বিরোধিতা করেন এবং তাঁর (গান্ধীর) ১, ২ ও ৩ এপ্রিলের প্রস্তাব পুনরায় পাড়েন। আমরা স্মরণ করতে পারি যে ১ এপ্রিল তিনি বলেছিলেন :

Mr. Jinnah should forthwith be invited to form the central Interim Government with members of the Muslim League...Any difficulty experienced through Congress having a majority in the Assembly to be overcome by their able advocacy of the measures they wished to introduce.[৩৭৯ঘ]

২ এপ্রিল তিনি প্রস্তাব আরও বিশদ কবেন। এবাব তিনি বলেন, জিন্না ইচ্ছা কবলে কংগ্রেসের সঙ্গে কেয়ালিশনও কবতে পাবেন। আসল কথা এমন মন্ত্রীসভা গঠন যা অ্যাসেম্বলির সর্বাধিক সমর্থন পাবে।আবদুব বব নিস্তার ও গজনফ্বের চেয়ে লীগেব কি ভালো লোক নেই? এই প্রস্তাবেব শর্ত অবশ্য, মাউন্টব্যাটেনেব ভাষায়, "I might have as many months as possible as Viceroy and President of the Cabinet, and by retaining the right of veto, continue to exercise complete control in the interest of fair play." এতে জিন্নার সবকাব প্রথম কয়েক মাস কোন অন্যায কাজ কবতে পারবে না—"straight and narrow path" অনুসবণ করতে বাধ্য হবে। জিন্না যদি অনিচ্ছা প্রকাশ করেন তবে কংগ্রেসকে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হোক। কংগ্রেস সব দল থেকে (লীগ থেকে তো বটেই) মন্ত্রী নেবে। এর জন্য কংগ্রেসেব সম্মতি আদায কবতে গান্ধী তাঁর যথাসাধ্য কবতে প্রতিশ্রুতি দেন। এমন কি সমস্ত দেশজুড়ে জনমত সংগ্রহ কবতেও। বড়লাট বলেন, এব চেয়ে বোধহয ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান ভালো। গান্ধী বলেন, কিন্তু তা পবিবর্তন কবা চাই।[৩৭৯ঙ] ৩ এপ্রিল গান্ধী বলেন, তিনি যে সব নেতাব সঙ্গে কথা বলেছেন—তাঁবা সমর্থন করেন, তবে নেহরুর সঙ্গে কথা হযনি। তিনি স্বীকাব কবেন লীগ যদি একেবারেই বেঁকে দাঁড়ায তবে দেশভাগ কবতে হবে। তবে দেশব্যাপী হাঙ্গামা রুখতে যথাশীঘ্র একটা ব্যবস্থা চাই। তিনি আবাব বলেন, যাই হোক, বড়লাট যেন জুন ১৯৪৮ পর্যন্ত থেকে যান, in order to act as an umpire and exercise a guiding hand during the early stages of self Government.[৩৭৯চ] ৩ এপ্রিলের সাক্ষাৎকাবে তিনি ওলাফ ক্যারোর পক্ষপাতিত্বেব বিরুদ্ধে আপত্তি জানান। সীমান্ত গান্ধী অভিযোগ আনেন, ক্যারো নানাভাবে খান সাহেবেব মন্ত্রীসভা ফেলতে চাইছেন। ৪ এপ্রিল গান্ধী অভিযোগ আনেন সিন্ধুব লাট মুডিব বিরুদ্ধে। সীমান্ত গান্ধী এ দিন জিন্নার হাতে ক্ষমতা সমর্পণ সমর্থন কবেছিলেন।[৩৭৯ছ]

গান্ধীর প্রস্তাব ইজ্‌মেকে জানানো হয। তিনি জানান ভি পি মেননকে। কিন্তু গান্ধী ১১ এপ্রিল বড়লাটকে জানান যে কংগ্রেসেব অধিকাংশ নেতা সম্মতি দেননি এবং তিনি তাঁব প্রস্তাব প্রত্যাহার করছেন। আজাদেব মতে সব চেয়ে জোর আপত্তি কবেন নেহরু ও প্যাটেল। ১২ এপ্রিলেব সাক্ষাৎকাবে বড়লাট দুঃখ প্রকাশ করে বলেন—এখনও কি ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব নেওয়া যায় না? গান্ধী বলেন—বিতর্কিত বিষয়ে কোর্টে আবেদন সাপেক্ষে মেনে নেওয়া যেতে পারে। কংগ্রেস আদালতের মত মেনে নেবে। বড়লাট অবশ্য ৬ ডিসেম্বর (১৯৪৬)-এব ব্যাখ্যা আঁকড়ে থাকেন।[৩৭৯জ]

এরপর গান্ধীর সঙ্গে দেখা হল ৪মে। মাউন্টব্যাটেন ইজ্‌মের হাতে যে প্রস্তাব পাঠিয়েছেন তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিলে, গান্ধী বলেন, তিনি এতে সম্মতি দিতে পারেন না। এতে তো ভারতীয়দের কোন হাত নেই। বস্তুত তাদের ওপর দেশ ভাগ চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আবার তিনি এপ্রিলের কথায় ফিরে গেলেন। মাউন্টব্যাটেনের ভাষায়—"he finally invited me to turn over power either to the Muslim League or, if they would not take it, to Congress for the whole of India, and give them immediate dominion status and then remain as Governor General for 13 months and then leave them to their own devices." বড়লাট বললেন, এতে গৃহযুদ্ধ ও রক্তস্নান অনিবার্য। গান্ধীর উত্তর—"Not if Mr. Jinnah means what he has signed with me." তিনি ১২ এপ্রিলের যৌথ বিবৃতির উল্লেখ করেছিলেন যাতে সব সম্প্রদায়কে হিংসা ও বিশৃঙ্খলার পথ কথায়, লেখায় ও কাজে পরিত্যাগ করার আবেদন জানান হয়েছিল। বড়লাট বললেন, কিন্তু জিন্না সই করেছেন এই আশায় যে তিনি একটা ন্যায়সঙ্গত সমাধান দেবেন। "In any case, I pointed out that H.M.G. would never allow me to hand over a colossal minority like the Muslims into the power of the Congress and I much regretted therefore that his plan was not acceptable."[৩৭৯ঞ] গান্ধীর প্রস্তাবের ওপর যবনিকা টেনে দিল জিন্নাব ৬ মে-র প্রতিবেদন—"He (Gandhi) thinks division is not inevitable, whereas, in my opinion, not only is Pakistan inevitable but this is the only practical solution of India's political problem."[৩৭৯ট] গান্ধী ঐদিন নিজে জিন্নার বাড়ি গিয়ে শেষ মিটমাটের চেষ্টা করেন। এটা কংগ্রেসের অনেক নেতা পছন্দ করেননি।

নানা দলিল পড়ে মনে হয় বড়লাট ইজ্‌মের হাতে যে খসড়া ২ মে বিলেত পাঠান, তা নেহরুকে পুরো দেখান হয়নি। হডসন অবশ্য বলেছেন, ৩০ এপ্রিল মিভিল নেহরু ও জিন্নাকে ঐ খসড়া দেখান।[৩৮০] কিন্তু সবটাই কি দেখান হয ? নেহরুর ১ মে-র চিঠি প্রমাণ করে যে তাঁকে বা তাঁর কোন সহকর্মীকে সবটা দেখান হয়নি। তিনি শুধু 'broad outlines' দেখেছেন মাত্র।

পরে তিনি আবার একথা বলেন।[৩৮১] এইচ এম প্যাটেল বলেছেন, নেহরুকে শুধু "the haziest sketch of what was in the wind" দেওয়া হয়।[৩৮২] এই নিয়ে প্রচণ্ড গোলমাল হবে।

কমনওয়েলথে থাকা নিয়েও মনান্তর হয়েছিল। বড়লাটের ধারণা ছিল দেশভাগের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষীয় নেতারা কমনওয়েলথে থাকতে চাইবেন। একজন ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি সৈন্যবাহিনীর কর্তৃত্ব নিয়ে থাকবেন।[৩৮৩] ১৯৪৮-এর জুনে বাহিনী ভাগ হবে। কিন্তু তারপর উভয় দেশের মধ্যে সংহতি রক্ষা করা প্রয়োজন হবে। কংগ্রেস কিন্তু ১৯৪৮-এর জুনের পর কি হবে বিবেচনা করেনি। আগে থেকে কমনওয়েলথ প্রশ্ন নিয়ে সিদ্ধান্তে আসার ইচ্ছা তাদের ছিল না। নেহরু বরং কমনওয়েলথ ছাড়ার ইঙ্গিতই দেন। মাউন্টব্যাটেনের চাল ছিল নির্বেদ থাকার ভান করা। ৮ এপ্রিল বলদেব সিংকে তিনি বলেছিলেন, এ ব্যাপারে কোন মাথাব্যথা ব্রিটেনের নেই। নেহরু বলদেবকে বলেছিলেন, প্রতিরক্ষা বিষয়ে স্বনির্ভর হওয়া বাঞ্ছনীয় আর ইংরেজদের বিশ্বব্যাপী স্বার্থের জালে জড়িয়ে

না পড়াই শ্রেয়। বড়লাট বলদেবকে সংখ্যালঘু প্রতিনিধি সদস্যদেব দলে আনতে বলেন। কিন্তু নেহরু জানান, এ বিষয়ে জেদ করার বিপদ রয়েছে। জনমত এর বিরুদ্ধে। তখন মাউন্টব্যাটেন আর এক চাল দেন। তিনি ইঙ্গিত দেন—জিন্না কমনওয়েলথে যোগ দেবার জন্য আগ্রহী। রাজাজীকে নেহরু বলেন, ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষরা যদি চলে যান, "এক রাত্রির ঘুম নষ্ট না করেও আমি তা মেনে নেব।" ব্যাপার স্যাপার দেখে বড়লাট ওড়িশাব লাট চন্দুলাল ত্রিবেদীর শরণ নিলেন। তাঁকে বোঝাতে বললেন, "কমনওয়েলথে থাকলে ভারতেরই লাভ, না থাকলে আমাদের ক্ষতি নেই।" আর ভাবত সদস্যপদের আবেদন করলেই যে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট তা গ্রহণ করবে তাতেও সন্দেহ রয়েছে। তবে কিনা তাঁব ও সম্রাট ষষ্ঠ জর্জের ভারতের প্রতি একটা ভালবাসা আছে, তিনি বলে কয়ে ক্যাবিনেটকে রাজি করাতে পারেন।[৩৮৪] এতেও সাড়া না পেয়ে মাউন্টব্যাটেন ধরে বসলেন কৃষ্ণ মেননকে। ১৭ এপ্রিল মেননকে তিনি বললেন, ভারত কমনওয়েলথেব সদস্য হলে ব্রিটিশ অফিসাররা থেকে যাবেন, অন্যথা তাঁরা থাকতে পারেন না। মেনন নাকি বলেন, "তবে তো সংবিধানে ভাবতকে 'স্বাধীন সার্বভৌম, সাধারণতন্ত্র' ঘোষণা কবা বড ভুল হয়ে গেছে।" বডলাট বুদ্ধি দেন—"তাতে কি? পাঁচ বছরের জন্য ঘোষণা কার্যকব করবেন না।" বড়লাট আরও বলেন, "আমি তাঁকে বললাম, কংগ্রেস যদি সত্যি কোন পদক্ষেপ নিতে চায় তাকেই প্রথম এগিয়ে আসতে হবে।" এতক্ষণ মাউন্টব্যাটেন ধূর্ত চাল দিচ্ছিলেন। এবাব মিথ্যা করে বললেন, তাঁর ওপব কড়া নির্দেশ আছে ভারতকে কমনওয়েলথে ঢোকানব জন্য কোন চেষ্টা না করতে।[৩৮৫] আবার ভয়ও দেখালেন, "ভারত যদি এখনই পদক্ষেপ না নেয তবে পড়ে থাকবে এক পচা সৈন্য বাহিনী।" কৃষ্ণ মেনন বললেন, যদি ১৯৪৮-এব জুনেব ঢের আগে ব্রিটেন ভারতকে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস দিয়ে দেয লোকে পবে এ নিয়ে মাথা ঘামাবে না। অবশ্য ভারতীযদের হাতে সৈন্যবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ দিতে হবে। ২২ এপ্রিল (বশম্বদ) কৃষ্ণ মেননের সঙ্গে বড়লাটের পুনরায আলোচনা হল। তিনি বললেন, পাকিস্তান যদি একা কমনওয়েলথের সদস্য হয় তবে তার সৈন্যবাহিনী হিন্দুস্তানেব চেয়ে ঢের বেশি শক্তিশালী হবে। করাচীতে তো কমনওয়েলথের বিরাট নৌঘাঁটি আছেই। ১ মে তিনি নিজে আমলাদের কাছে স্বীকাব করেছেন যে ইচ্ছা করেই পাকিস্তানের বিপদকে তিনি বাড়িয়ে বলছিলেন (using it as a lever)।[৩৮৬] মেনন ভয পেয়ে বলেন, দুটো ডোমিনিযান হোক আর মাউন্টব্যাটেন হন উভযের বডলাট। বডলাট ভি পি মেনন, ভাবা, আইনজ্ঞ মংকটন (Monckton) প্রভৃতি অনেককে কংগ্রেসকে রাজি করানর কাজে লাগান। মংকটন ভয় করছিলেন—নেহরু বলে বসবেন, "ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস ভারতীয় নাকে দুর্গন্ধ লাগবে।" তাই তিনি ভারতীয় সার্বভৌম সাধারণতন্ত্রের সঙ্গে কমনওয়েলথের সদস্য পদের একটা আইনগত সমন্বয়ের জন্য ইজ্‌মের মাধ্যমে ক্রিপস, (অ্যাটর্নী জেনারেল) শক্রশ (Shawcross) ইত্যাদির সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। শক্রশই ৯ মে ক্রিপস্‌কে জানান—Crown ও 'সম্রাট' সমার্থক বলে কংগ্রেস আনুগত্যের শপথ নিতে চাইছে না। ক্রাউনকে 'কমনওয়েলথের প্রধান' (Head of the Commonwealth) বললেই ল্যাঠা চুকে যায়।

২ মে যে পরিকল্পনা নিয়ে ইজ্‌মে বিলেত যান তাতে কংগ্রেসের মতের সঙ্গে কয়েকটা অমিল ছিল। (১) কংগ্রেসের মতে প্রাদেশিক আত্মনিয়ন্ত্রণের সময় আসবে সংবিধান রচিত হবার পর, আগে নয়, অথচ প্ল্যান বাক্কানে প্রদেশদের আগেই তা করতে দেওয়া হবে। (২) কংগ্রেস চেয়েছিল বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে এখনি ডোমিনিয়ান ভিত্তিতে ক্ষমতা

হস্তান্তর করা হোক। ভি পি মেনন চেয়েছিলেন বড় জোর দুটি ডোমিনিয়ানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর। কৃষ্ণ মেনন পরামর্শ দেন সিমলায় নেহরুকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে কমনওয়েলথের ব্যাপারটা ফয়শালা করা হোক। প্ল্যান বাল্কান সম্বন্ধে জিন্নার ৩০ এপ্রিলের প্রতিক্রিয়া বড়লাটকে ভাবিয়ে তুলেছিল। জিন্না বাংলা-পঞ্জাব ভাগের তীব্র প্রতিবাদ করেন। কংগ্রেসের সুরও বেশ চড়া ছিল। বড়লাটের সঙ্গে ৪ মে-র আলোচনার কথা বলেছি। গান্ধী প্রায় 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের মেজাজে ছিলেন। ৫ মে গান্ধী-নেহরু আলোচনার পর ৬ ও ৭ মে ওয়ার্কিং কমিটির এমার্জেন্সি অধিবেশন বসে। গান্ধী ৮ মে পাটনা রওনা হলেন। ট্রেনে বসে মাউন্টব্যাটেনকে লিখলেন, "If it (partition) has to come, let it come after the British withdrawal, as a result of understanding between the parties or of an armed conflict which to Quaid-e-Azam is taboo." রাজাদের ব্যাপারে লিখলেন, "the intransmissibility of paramountcy is a vicious doctrine, if it means that they can be Sovereign and a menace for independent India."[৩৮৬ক] এই পরিস্থিতিতে নেহরুকে হাত করা প্রয়োজন হয়ে পড়ল।

৮ মে বড়লাটের আমন্ত্রণে নেহরু ইন্দিরা ও কৃষ্ণ মেনন সহ সিমলা এলেন। তিনিও বললেন এখনি (১৯৪৭-এর জুনে) কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে যদি ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়, তাঁর আপত্তি নেই। শুধু যে ভারতীয়রা এখনি ক্ষমতা পেতে চায় তা নয়, উন্নয়নমূলক কাজে আর দেরি করা চলে না। কিন্তু ভারতভাগের ব্যাপারটা অত সোজা নয়। বিশেষত সংবিধান রচনার আগে কোন কোন প্রদেশের য়ুনিয়ান ত্যাগ ও সীমান্তে রেফারেণ্ডাম তো গ্রহণীয় নয়। প্রদেশ ভাগ তো হবে সকলের শেষে।[৩৮৬খ]

সিমলায় নেহরুর সঙ্গে ভি পি মেননের প্ল্যান নিয়ে কথা হল। এ নিয়ে মেনন আগেই প্যাটেলের সঙ্গে কথা বলেছিলেন, ওয়াভেলের আমলে বিলেতকেও জানান হয়েছিল। কিন্তু প্যাটেল খানিকটা রাজি হলেও বিলেতের মত মেলেনি। মেনন এতসব কথা নেহরুকে জানাননি।[৩৮৭] শুনে নেহরু রাজি হলেন না, বিরোধিতাও করলেন না। ১০ মে বড়লাট এক সভা ডাকলেন, তাতে নেহরু, মিভিল ও মেনন উপস্থিত ছিলেন। আবার মেনন প্ল্যান নিয়ে আলোচনা হল। মেনন জানালেন—(১) দুটো ডোমিনিয়ানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর হবে। (২) দুই গণপরিষদ যখন নিজ নিজ সংবিধান রচনা করবে তখন তাদের অন্তর্বর্তী সংবিধানের ভিত্তি হবে ১৯৩৫-এর শাসন সংস্কার—কিছু বদলে। বর্তমান আইনসভা বিলুপ্ত হবে। তার স্থান নেবে দুই গণপরিষদ। বড়লাট দুই উত্তরাধিকারী সরকার ও রাজাদের মধ্যে যোগসূত্র থাকবেন। বড়লাট বললেন, ভারতীয় য়ুনিয়ানের কাছে ক্ষমতা দেওয়া সহজ কিন্তু পাকিস্তানে তো কোন সরকার নেই।

ঠিক ঐদিন বিলেত থেকে পৌঁছল ক্যাবিনেট কর্তৃক অনুমোদিত (পরিবর্তিত) প্ল্যান বাল্কান। এরপর যা ঘটল তাকে "রীতিমত নাটক" বলা চলে। মাউন্টব্যাটেনের কেমন একটা সন্দেহ ('absolute hunch') হল যে প্ল্যানটা কি ঠিক আছে। তিনি স্থির করলেন প্রচারিত হবার আগে নেহরুকে দেখিয়ে নেওয়া ভাল। সেই রাত্রেই তিনি নেহরুকে তা দেখতে দিলেন। মধ্যরাত্রে কৃষ্ণ মেননকে জাগিয়ে তুললেন বিহ্বল নেহরু। মেনন পরে বড়লাটকে জানিয়েছিলেন—"He (Nehru) was almost beside himself and said that this plan was very far from what he had expected and was quite unacceptable."[৩৮৮] ভোর চারটে পর্যন্ত কৃষ্ণ মেননের সঙ্গে প্রস্তাবের চুলচেরা

বিশ্লেষণের পর তার ভয়াবহতা প্রতিপন্ন হল। ১১ মে সকালে এল নেহরুব কড়া উত্তর—মাউন্টব্যাটনের ভাষায় Nehru bombshell.তাতে ছিল

"The whole approach was completely different from what ours had been and the picture of India that emerged frightened me. In fact much that we had done so far was undermined and the Cabinet Mission's scheme and subsequent developments were set aside, and an entirely new picture presented—a picture of fragmentation and conflict and disorder, and unhappily also, of a worsening of relations between India and Britain."[৩৮৯] অ্যাটলি সবকাব দু-একটি প্রদেশের অংশ বিশেষকে আলাদা কবাব কথা ভাবছেন না, সাবা দেশটাকে টুকবো টুকরো করতে চাইছেন। প্রদেশ কিনা হবে ক্ষমতাব প্রথম উত্তরাধিকারী। আর তাবাই মিলিত হয়ে গডবে য়ুনিয়ান। তবে আব গণপবিষদ কি কববে? এতে কি লীগেব প্রস্তাবই মেনে নেওয়া হবে না? সীমান্ত ভাবতে যোগ দিতে চায়, তাকে সেকথা পুনর্বিবেচনা কবতে হবে? রাজারা স্বাধীন হযে যাবে? দেশ তাহলে আলস্টাব (Ulster)-এ ছেযে যাবে।[৩৮৯ক]

নেহরুর তীব্র প্রতিক্রিযাব কাহিনী অনেক বইতে পাওযা যায—তাব মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, মাউন্টব্যাটেনের (তৃতীয) জওহবলাল নেহরু স্মৃতি বক্তৃতা, জিগলাবেব মাউন্টব্যাটেন জীবনী, ইজমেব মেমযার্স, মুবেব এসকেপ ফ্রম এম্পাযাব ও মন্মথনাথ দাশ-এব Partition and Independence of India। হডসন, ক্যাম্বেল জনসন-বা তো আছেনই। অধ্যাপক টিঙ্কাব-এব একটি প্রবন্ধও উল্লেখযোগ্য। অধিকাংশই মাউন্টব্যাটেনের দিকে টেনে কথা বলেছেন—যেন নেহরুব উষ্মাব কাবণ 'প্ল্যান বাল্কান' নয়, ক্যাবিনেট কর্তৃক তাব পবিবর্তন। মাউন্টব্যাটেন নিজে এমনই ইঙ্গিত দিযেছেন কন্যাকে লেখা চিঠিতে।[৩৯০] ইজমে[৩৯১], হডসন[৩৯২], জনসন[৩৯৩] অবশ্যই কর্তাব পক্ষে। অধ্যাপক টিঙ্কাব বলছেন, অখণ্ড ভাবতপ্রীতি ও কঠোর বাস্তব পবিস্থিতিব মধ্যে দোটানায পড়েছিলেন নেহরু এবং বাস্তব মেনে নিলে আপন বিপ্লবী ভাবমূর্তি নষ্ট হবে বলে ফেটে পড়েছিলেন[৩৯৪]।

আমি এ সব সাফাই মানতে বাজি নই! প্রথমত মাউন্টব্যাটেন নেহরুকে সব প্ল্যানটা দেখাননি, এ কথা আগেই বলেছি। না দেখিযে ধবে নিযেছিলেন যে নেহরুর সম্মতি পাওযা গেছে। কোথাও একটা দোষী বিবেক কাজ কবছিল, না হলে এমন hunch তাঁব হল কেন? মুর লিখছেন, ১ মে মাউন্টব্যাটেন কিছু গুরুত্বপূর্ণ পবিবর্তন কবেছিলেন। কি সেই পবিবর্তন? আমাদের মনে বাখা দবকাব তাঁব সঙ্গে বাবোজেব সাক্ষাৎকাব হয় ঐদিন। এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ[৩৯৫] ও বাবোজকে লেখা বডলাটেব ২ মে-ব চিঠি[৩৯৬] পডলে জানা যাবে কি পরিবর্তন করা হয়েছিল। নেহরু আগেই বলে দিয়েছিলেন স্বতন্ত্র বাংলা তাঁব চান না, কারণ তা পাকিস্তানে যাবেই অথচ অনুমোদিত প্ল্যানে এমন ব্যবস্থা ছিল যাতে বাংলা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ডোমিনিয়ান হতে পারে।[৩৯৭]এটা নেহরুব রাগেব অন্যতম কাবণ। দ্বিতীয়ত অ্যাটলিব নির্দেশে এমন এক পদ্ধতির কথা ছিল যাতে (১) ভাবতেব বিভিন্ন অংশেব সংবিধান বর্তমান গণপরিষদেব সঙ্গে মিলিত ভাবে অথবা (২) অন্যান্য অংশেব সঙ্গে যৌথ ভাবে অথবা (৩) সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবে রচিত হবে। এই তিনটি বিকল্প দেশীয বাজ্য সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হতে পারে।[৩৯৮] মাউন্টব্যাটেনও তাদেব এতটা স্বাধীনতা দিতে রাজি ছিলেন না। কিন্তু ভারত-সচিব লিস্টওয়েল-এর ১০ মে-র চিঠিতে পরিষ্কাব তিনি সকলকেই স্বাধীন ভাবে আপন ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করার ক্ষমতা দিতে চান।[৩৯৯] এতদিন নেহরু ভেবেছিলেন

বড় জোর দুটো ডোমিনিয়ানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। ১০ মে সকালেই ভি পি মেননের এরকম প্ল্যান নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এখন রাত্রে দেখলেন—এ কি কাণ্ড! ভারতকে সতীদেহের মত খণ্ডবিখণ্ড করা হচ্ছে! পুরো বাল্কানাইজেশন! স্বাধীন বাংলা, স্বাধীন পাখতুনিস্তান, স্বাধীন ভূপাল, ত্রিবাঙ্কুর, হায়দ্রাবাদ এসব দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় য়ুনিয়ানের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে কি? মোটের ওপর মার্চ থেকে মে পর্যন্ত কংগ্রেস যা বলেছে এটা তার বিরোধী।

এর জন্য এক দিকে দায়ী নেহরুর অবিবেচক অতিবিশ্বাস—যাকে 'মাউন্টব্যাটেন চার্ম'ও বলা হয়েছে (দুষ্টজন বলবে 'লেডি মাউন্টব্যাটেন চার্ম')। অন্য দিকে মাউন্টব্যাটেনের অধৈর্য এবং পরিষ্কার চিন্তাশক্তির অভাব। ইজ্‌মে স্বীকার করেছেন—"Clarity of thought and writing is not his strong suit."তারওপেছনে রযেছে সুরাবর্দিব পৌনঃপুনিক তদ্বির এবং শেষে বারোজের আবেদন। সন্দেহ নেই, মাউন্টব্যাটেনের অভিসন্ধি ছিল, বাংলাকে ব্রিটিশ (এবং মার্কিন) ধনতন্ত্রের শেষ ঘাঁটিতে পবিণত করা। তৃতীয় এক কাবণ দেখিয়েছেন ওয়াই কৃষ্ণন। মাউন্টব্যাটেনের শয়তানী উদ্দেশ্য ছিল, চাপ দিয়ে ভাবতকে কমনওয়েলথে যোগ দিতে রাজি করান। প্ল্যান পড়ে নেহরু এমনি বিহ্বল ও বিভ্রান্ত হযে পডবেন যে মন্দের ভাল বলে কমনওয়েলথে ঢুকে পড়বেন।[৪০০] কৃষ্ণনেব ব্যাখ্যা কিঞ্চিৎ বেশি দূরাগত বলে বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু অন্য দুটি ব্যাখ্যা সঙ্গত।

মাউন্টব্যাটেন যুদ্ধকালে অনেক জাঁতাকলে পড়েছেন। কোনোদিন তাঁব ধৈর্যচ্যুতি ঘটেনি। ঠকে গেলে বা ভুল করলেও প্রশান্তি ফিবে পেতে তাঁব বেশি দেবি হযনি। তিনি বরং নেহরুকে প্ল্যানটা আগে দেখানর জন্য নিজেকেই অভিনন্দন জানালেন। বুদ্ধি দেবাব জন্য ভি পি মেনন তো সর্বদা প্রস্তুত। তিনি বোঝালেন—তাঁব প্ল্যানে ফিবে যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। ১১ মে নেহরুর প্রতিক্রিয়া আলোচনা কবার জন্য স্টাফ মিটিং বসল।

১১ এবং ১৪ মে-র মধ্যে ভারতভাগ ও ক্ষমতা হস্তান্তবের চূড়ান্ত রূপবেখা তৈবি হচ্ছিল তার প্রমাণ পাই রাধাকৃষ্ণনকে লেখা নেহরুর এক চিঠিতে—"We have to face very hard realities now and the time for vague resolutions is passed. Definite choices have to be made and the choice is often a very difficult one."[৪০১] ১৪ মে-র এই চিঠিতে আমবা শুনি নেহরুর cri de couer (অন্তরের আর্তনাদ)। এবার ভি পি মেনন হাল ধরলেন।

১২ মে-র স্টাফ মিটিং-এ বড়লাট জানালেন নেহরু কি চান—মোটামুটি লীগকে আশ্বাস ও রক্ষাকবচ সহ অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তব। মিভিল ইজ্‌মেকে এ ব্যাপারে অবহিত করলেন।[৪০২] ঐ দিনই বড়লাট ঠিক করেন বাংলা বা কোন প্রদেশকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে না। ইজ্‌মে হতবুদ্ধি। তিনি জানতে চাইলেন—দেশভাগের আগে ক্ষমতা হস্তান্তর কি ভাবে সম্ভব?[৪০৩]

তখন মেননকে একটা খসড়া তৈরি করতে বলা হল যাতে নেহরু, প্যাটেলেব আশা মেটে অথচ ইজ্‌মের বিবেক তৃপ্ত হয়।[৪০৪] ১৩ মে-র মেননের প্ল্যানে এর নাম দেওয়া হল 'প্ল্যান পার্টিশান'। দুটো ডোমিনিয়ানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা ছিল। 'প্ল্যান বাল্কানে'ব ভিত্তি ছিল চূড়ান্ত আত্মনিয়ন্ত্রণনীতি। এখন তা বদলে দেওয়া হল। বড়লাটের ভাষায়,

"The issues...are limited to joining existing Constituent Assembly or joining together in a new Constituent Assembly. I have omitted choice to provinces for standing out

independently...I do not like the idea of H. M. G. giving them that choice."[৪০৫] সীমান্ত ব্যতীত অন্য কংগ্রেস প্রদেশদের বর্তমান গণপরিষদে যোগ দেওয়া আবশ্যিক। সীমান্তে জনমত নেওয়া হবে তা কোন ডোমিনিয়ানে যোগ দেবে। বাংলার প্রধানমন্ত্রীকে বলা হবে—প্রাদেশিক স্বাধীনতাব স্থান নেই তবে যদি বাংলাব প্রাদেশিক আইন পরিষদ স্বতন্ত্র থাকবার জন্য প্রস্তাব নেয় তিনি ভেবে দেখবেন। দেশীয় রাজাদের ব্যাপাবে নেহরুর আপত্তি অমূলক নয়। কোন কোন রাজ্য তো বর্তমান গণপষিদে যোগ দিয়েইছে। অন্যান্যদের স্বাধীনতা দেওয়া হবে বর্তমান বা অন্য যে গণপরিষদ তৈরি হবে তাতে যোগ দেবার।[৪০৬] পাঠক লক্ষ্য করবেন লাট সাহেব এখনও বাংলাকে স্বাধীন ও সার্বভৌম দেখতে চাইছেন।

॥ ১৩ ॥

ক্যাবিনেটের ইন্ডিয়া কমিটি বসল ১৪ মে। স্থির হল বড়লাটকে ডেকে পাঠান হবে। তাঁর সঙ্গে আলোচনা না কবে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে না। মাউন্টব্যাটেনের নির্দেশে মেনন ১৬ মে একটা Heads of Agreement-এর খসড়া করে ফেলেছিলেন। তাতে ছিল— (১) যদি ভাবতেব জন্য একটি কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব হবে স্থির হয় তবে বর্তমান গণপবিষদকে ডোমিনিযান ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তর কবা হবে। (২) যদি ভারতের জন্য দুটি সার্বভৌম বাষ্ট্র হবে স্থিব হয়, প্রত্যেকেব কেন্দ্রীয় সরকার ডোমিনিয়ান ভিত্তিতে এবং তাদের গণপরিষদের প্রতি দাযিত্ববান হয়ে ক্ষমতা নেবে। (৩) যাই হোক না কেন, ক্ষমতা হস্তান্তর হবে ১৯৩৫-এর শাসনসংস্কার আইনেব কিছু অদলবদল করে। (৪) উভয় ডোমিনিয়ানেব গভর্নর জেনারেল হবেন একজন এবং বর্তমান গভর্নর জেনারেলকে পুনরায় নিয়োগ করা হবে। (৫) দেশ ভাগ স্থির হলে ভাগরেখা নির্ধারণের জন্য এক কমিশন গঠিত হবে। (৬) উভয় কেন্দ্রীয় সরকার স্থিব করবে স্ব স্ব অধীনস্থ গভর্নরদের। (৭) দেশ ভাগ স্থির হলে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীও ভাগ করা হবে। নিযোগের আঞ্চলিক ভিত্তিতে বাহিনীর রেজিমেন্ট ভাগ হবে। যেখানে সেগুলি মিশ্রিত, তাদের পৃথকীকরণ ও নিয়োগের ব্যবস্থা করতে ফিল্ড মার্শাল অকিনলেক ও দুই ডোমিনিয়ানের চীফস অব স্টাফ নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হবে। তাব ওপরে থাকবে দুই ডোমিনিয়ানের প্রতিবক্ষা মন্ত্রী সহ গভর্নর জেনারেল নিয়ে গঠিত কাউন্সিল। সৈন্যভাগ নিষ্পন্ন হলে উক্ত কাউন্সিলের বিলুপ্তি ঘটবে।

মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে ক্যাবিনেট কমিটির কথা চলল ১৯ মে থেকে ২৮ মে। মূল নীতি হল—পাকিস্তান জিন্নাকে দেওয়া হবে ভারতের পক্ষে যতটা সম্ভব ঐক্য বজায় রেখে। সেই নীতির ভিত্তিতে ভারতের স্বাধীনতা ও ভারত ভাগ বিষয়ে আইন রচিত হবে ১৯৪৭ শেষ হবার আগেই। মাউন্টব্যাটেন জানালেন কংগ্রেসের কাছ থেকে আশ্বাস পাওয়া গেছে যে একবার ডোমিনিয়ান স্বীকৃতি পেলে কমনওয়েলথ ছাড়ার ইচ্ছা তার নেই। কংগ্রেস মাউন্টব্যাটেনকে উভয় ডোমিনিয়ানের গভর্নর জেনারেল রূপে চায় কিন্তু জিন্না তাঁর মত জানাননি। জিন্না কি করবেন বোঝা যাচ্ছে না। এদিকে জিন্নার সম্মতির ওপব কংগ্রেসের সম্মতি নির্ভর করছে। ২২ মে অ্যাটলি জানালেন যে বিরোধী দলনেতারা দেশ ভাগের প্রস্তাব অনুমোদন করবে। চার্চিলের মত শর্তযুক্ত ছিল—ভারতকে কমনওয়েলথে থাকতেই হবে। ভারত সচিব লিস্টওয়েল কিছু গাঁই গুঁই করেন ক্রিপস প্রস্তাব,ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাব

ত্যাগ করে দুই ডোমিনিয়ানের ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তরে। তাঁর মনে হয় নেহরুই জিতলেন। বর্তমান গণপরিষদকে প্রাধান্য দেওয়া হল এবং দ্বিতীয় গণপরিষদ হবে দলছুটদের নিয়ে গঠিত। কিন্তু অ্যাটলি অত্যন্ত বাস্তববাদী রাজনীতিক ছিলেন। এসব চুলচেরা আলোচনা নিরর্থক মনে করেছিলেন তিনি। ২২ মে-র মিটিং-এ স্থির হল জিন্না যদি পঞ্জাব ও বাংলা ভাগে অরাজি হন কি করা হবে। তিনি আবার ইতিমধ্যে দুই পাকিস্তানের যোগসূত্ররূপে এক 'করিডর' চেয়ে বসেছেন। পুরো পঞ্জাব পাবার জন্য দাঙ্গার মাত্রা বাড়ান হয়েছে সেখানে। স্বয়ং জেনকিনসের মতে লীগ জোর করে পঞ্জাব কব্জা করতে চায়।[৪০৭] পাকিস্তান বাড়াবাড়ি করলে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে ভয় দেখান হবে স্থির হল। আরও ঠিক হল দেশীয় রাজ্যদের বলা হবে গভর্নর জেনারেলদের মাধ্যমে ব্রিটেনের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ স্থির করতে হবে। ২৮ মে বাংলার ভাগ্য নির্ধারিত হল। বারোজ চান স্বতন্ত্র স্বাধীন বঙ্গ, মাউন্টব্যাটেন দ্বিধান্বিত। কিন্তু তিনিও শেষ পর্যন্ত বোঝেন নিখিল ভারত ও কমনওয়েলথ রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে অবিভক্ত স্বাধীন বঙ্গ সম্ভব নয়। শরৎ বসু-সুরাবর্দি প্রস্তাব বানচাল হয়ে গেল নেহরুব ২৭ মে-ব প্রেস সাক্ষাৎকারে। তিনি জানালেন— "We can agree to Bengal remaining united only if it remains in the Union."-এর পর কিছু করতে বড়লাটের সাহস হল না। ক্যাবিনেট কমিটি বুঝলেন—পূর্ববঙ্গ একা চলতে পারবে না ("clearly not a viable Unit") এবং দুটো ডোমিনিয়ানের একটার সঙ্গে তাকে যোগ দিতেই হবে। এর দাম দিতে হল নেহরুকে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের জন্য স্বাতন্ত্র্য চেয়ে তিনি উত্তর পেলেন—"হবে না।" বিলেত থেকে ফিরে ক্যাবিনেটের সম্মতিপ্রাপ্ত প্ল্যান[৪০৮] সাতজন ভারতীয় নেতার সামনে ধরলেন মাউন্টব্যাটেন। দিনটা ১৯৪৭-এর ২ জুন। এই সাতজন হলেন—নেহরু, প্যাটেল, কৃপালনি, জিন্না, লিযাকৎ, নিস্তার ও বলদেব সিং। ইজ্‌মে লিখছেন, নাৎসী ইওরোপ অভিযানের দিন (D-Day) যেমন অনুভূতি হয়েছিল, ২ জুন তেমনই অনুভূতি হযেছিল তাঁর।

ঘটনার পারম্পর্যের দিকে আর একবার তাকানো যাক।

(১) ১৯৪৭-এর ২০ ফেব্রুয়ারি অ্যাটলি ঘোষণা করলেন• যদি কোন পূর্ণ প্রতিনিধিত্বমূলক (অর্থাৎ লীগ সহ) গণপরিষদ ১৯৪৮-এর জুনের আগে সংবিধান রচনা করতে অসমর্থ হয় তবে ব্রিটিশ সরকাব স্থির করবে সমস্ত ক্ষমতা কোন কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে না খণ্ড খণ্ড ভাবে বর্তমান প্রাদেশিক সরকারেব হাতে হস্তান্তর কববে।

(২) ক্ষমতা হস্তান্তরের নির্দিষ্ট দিন ঘোষণা ছাড়া তা কার্যকর করার জন্য নূতন বড়লাট মনোনীত হলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন। তিনি ডোমিনিক লাপিয়েরকে যাই বলুন ঘোষণাব খসড়া রচনায় তার কোন হাত ছিল না—শুধু দিনের ব্যাপার ছাড়া। '১৯৪৮-এর মাঝামাঝির' জায়গায় তিনি '১৯৪৮-এর ১ জুন' এই পরিবর্তনটুকুর জন্য দায়ী।[৪০৯]

(৩) এর মধ্যে সুধীর ঘোষ ভি পি মেননের এক স্মারকলিপি পেথিক-লরেন্সের হাতে দেন। তাব মর্ম—১৯৪৮-এর জুনের মধ্যে দলগুলির মতৈক্য হবে না, অতএব ১৯৩৫-এর সংস্কার পরিবর্তন কবে ভারতকে ডোমিনিযান ঘোষণা করা হোক।[৪১০] এতে মুসলিম লীগের দাবি উপেক্ষিত হওয়ায় ইন্ডিয়া অফিস আপত্তি জানায। উক্ত স্মারকলিপিটি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ৬-৮ মার্চের আলোচনা ও প্রস্তাবানুযায়ী রচিত হয়েছিল। ইন্ডিয়া অফিস তবু ১৯৩৫-এর শাসনসংস্কারের প্রয়োজনীয় অদলবদল নিয়ে আলোচনা করে এবং নতুন ভারতসচিব লিস্টওয়েলের মতে একাধিক ডোমিনিয়ানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তাব

দেয়। মাউন্টব্যাটেনকে বলা হয় ভারতকে কমনওয়েলথে রাখতেই হবে। নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে মাউন্টব্যাটেনকে ১ অক্টোবর ১৯৪৭-এর মধ্যে প্রতিবেদন পাঠাতে বলা হয়।

(৪) ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের মুখে পড়ে বড়লাট ও ইজমে আসন্ন গৃহযুদ্ধ এড়াতে দ্রুত ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা ভাবেন। নেহরু জানান কমনওয়েলথে থাকা সম্ভব নাও হতে পারে। মনে রাখতে হবে ২২ জানুয়ারি গণপরিষদ ঘোষণা করেছিল ভাবতের লক্ষ্য—স্বাধীন সার্বভৌম সাধারণতন্ত্র।

(৫) বড়লাট শীঘ্রই বুঝতে পারেন ক্যাবিনেট মিশনের 'প্ল্যান য়ুনিয়ান' কার্যকর করা যাবে না। তাঁর প্রথম ধারণা হয় ভারতকে অন্তত তিন (হয়তো অধিক) ডোমিনিয়ানে ভাগ করতে হবে। তবে প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক, অর্থ, খাদ্য, সংযোগ ইত্যাদির জন্য এক কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজন।[৪১১]

(৬) কিন্তু ডোমিনিয়ান হলে বড়লাটের ক্ষমতা চলে যাবে বলে ৮ এপ্রিল ইজমে যে প্ল্যান তৈরি করতে শুরু কবেন তাতে ডোমিনিয়ানের কথা ছিল না। এই প্ল্যানে দেশভাগের নীতি স্বীকৃত হয়—প্রাদেশিক এবং পঞ্জাব, বাংলা ও আসামে প্রদেশেব বিশেষ অংশেব স্বনিযন্ত্রণাধিকাবেব ভিত্তিতে। ৫-১০ এপ্রিল জিন্নার সঙ্গে বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে তাঁকে ঐক্যের ব্যাপাবে বাজি করান যায়নি। অন্যদিকে নেহরু ৮ এপ্রিল বলেন— "it would not be right to impose any form of constitutional conditions on any community that had a majority in any specific area." প্রদেশ ও প্রদেশাংশের অধিকার থাকবে হিন্দুস্তান বা পাকিস্তান জোটে যোগ দেবার, এমন কি স্বাধীন থাকাব। কিন্তু মনে রাখতে হবে নেহরু ১৯৪৮-এব জুন অবধি শক্তিশালী কেন্দ্রের ওপর জোব দিয়েছিলেন। এইজন্যই অন্তর্বর্তী সরকারকে এখনি ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস দেবার দাবি উঠেছিল। অর্থাৎ নেহরুর আশা ছিল যদি দেশের কোন কোন অংশ বেরিয়েও যায় তার আযোজন করবে এক কেন্দ্রীয় ডোমিনিয়ান। ১০ এপ্রিলের স্টাফ মিটিং-এ 'পাকিস্তান' কথাটা তোলা হয়নি। মাউন্টব্যাটেন বলেন, ভাগের দায়িত্ব ভাবতীয়দের ওপর বর্তালে ভাল হয। তাহলে ব্রিটেনকে দোষ দেওয়া চলবে না। ভি পি মেননেব কাছে ১১ এপ্রিল আদ্‌রাটা পাঠিয়ে দেওয়া হয়—যাতে তিনি এব পূর্ণাঙ্গ রূপ দেন।[৪১২] লক্ষ্য বাখতে হবে নেহরু যে শেষ পর্যন্ত এক শক্তিশালী কেন্দ্র চান তা বডলাট উল্লেখ করেননি। ১৪ এপ্রিলের মধ্যে মেননের সাহায্যে অ্যাবেল, মিভিল ও ইজমে একটা প্ল্যান তৈরি করেন, যাকে 'প্ল্যান বাল্কান' আখ্যা দেওয়া হয়েছে।[৪১৩] ১৫ এপ্রিল ছোটলাটরা এই প্ল্যান অনুমোদন করেন। মাউন্টব্যাটেন স্বীকার করেন যে এতে ভারত বাল্কানের মত খণ্ড খণ্ড হযে যেতে পারে, যাতে কংগ্রেস চিরকালই আপত্তি জানিয়েছে।[৪১৪] আর সত্যসত্যই ১০ মে-র রাত্রে নেহরু সিমলায় তাই করেছিলেন। "প্ল্যান বাল্কান"-এ কমনওয়েলথের কথাও ছিল না। শুধু বড়লাট আশা করেছিলেন ভারতীয় নেতারা বড়লাটকে বিশেষ ক্ষমতা সহ থেকে যেতে বলবেন সৈন্যবাহিনী নিয়ন্ত্রণের জন্য। ১৯৪৮-এর জুনের মধ্যে সৈন্যভাগ সম্ভব হবে না এবং তার পরেও প্রতিরক্ষা ব্যাপারে সংহতি সাধনের প্রয়োজন হবে এই ছিল তাঁর আশার ভিত্তি। ৮ এপ্রিল নেহরু কিন্তু স্পষ্টই বলে দেন কিছু কিছু প্রদেশ বেরিয়ে গেলেও বাকী ভাবতের ক্ষমতা পাবে এক শক্তিশালী কেন্দ্র এবং জুনের পর তা কমনওয়েলথ ত্যাগ করবে। অর্থাৎ কি ক্ষমতা হস্তান্তরের পদ্ধতি কি কমনওয়েলথে থাকার ব্যাপারে নেহরু ও বডলাটের মধ্যে একটা বড় ভুল বোঝাবুঝি (কম্যুনিকেশন গ্যাপ) ছিল। যার বহিঃপ্রকাশ

নেহরুর ১০/১১ মে-র বিস্ফোরণ ('নেহরু বোমা')।[৪১৫]

(৭) বলদেব সিং, চান্দুলাল ত্রিবেদী ও কৃষ্ণ মেননের মাধ্যমে কংগ্রেসকে কমনওয়েলথের সদস্য থাকবার জন্য চাপ দেওয়া হয়। এ জন্য ২২ এপ্রিলের স্টাফ মিটিং-এ হয় সমগ্রভাবে না হয় ভাগে ভাগে ভারতকে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস দেবার তাগিদ নিয়ে আলোচনা হয়। বড়লাট বলেন, ভারত ও পাকিস্তানের এক প্রতিরক্ষা পর্ষদের সভাপতি থাকতে পারেন তিনি, অবশ্যই ব্রিটিশ বাহিনীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ সহ। স্টাফকে বলা হয় ১৯৪৮-এর জানুয়ারির মধ্যে প্ল্যান বাল্কান কার্যকর করার বন্দোবস্ত করতে।[৪১৬] ক্রিস্টি যে প্ল্যান করেন তার ভিত্তি নাকি ছিল ভি পি মেননের প্ল্যান। এটা ঠিক প্ল্যান বাল্কানের বিকল্প নয়, বরং তার করোলারী। এর মূল নীতি ছিল বহু উত্তরাধিকারীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর নয়—দুই উত্তরাধিকারীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর। প্রথমে হবে দেশ ভাগ, পরে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস দান।

(৮) মাউন্টব্যাটেন বোঝেন ১৯৪৮ জুন-এর কয়েক মাস আগেই দুই ডোমিনিয়ানেব হাতে ক্ষমতা দেওয়া সম্ভব। কংগ্রেস যদি এ ফাঁদে না পড়ে, তবে বলা চলবে—"তোমরাই তো অন্তর্বর্তী সরকারের জন্য ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস চেয়েছিলে, তাই দেওয়া হচ্ছে।"[৪১৭] মেননের প্ল্যান আপাতত ধামাচাপা দিয়ে রাখা হয়। ইজমে ২ মে 'প্ল্যান বাল্কান' নিয়ে বিলেত যান। কৃষ্ণ মেননের পরামর্শে বড়লাট নেহরুকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করানোর জন্য সিমলায় আমন্ত্রণ জানান। তাছাড়াও বড়লাট সংখ্যালঘু প্রতিনিধিদের দিয়ে কংগ্রেসকে ভয় দেখাচ্ছিলেন—"পাকিস্তান তো কমনওয়েলথে থাকতে রাজি এবং এর ফলে ব্রিটিশ আমলা, সৈন্যাধ্যক্ষ, সৈন্য, সমর সম্ভার পেয়ে যাবে। কংগ্রেসেরও অবশ্য তাই করা উচিত।" বড়লাট নিজেই এ কথা ১ মে স্টাফের সামনে স্বীকার করেন।[৪১৮] এতে প্যাটেল রাজি—এমন ভাব দেখান ভি পি মেনন। তা সত্য নয়। কংগ্রেসের মার্চ প্রস্তাবে স্পষ্টই পরপর কি হবে বলা হয়েছিল—(১) অন্তর্বর্তী সরকারের হাতে এখুনি ডোমিনিয়ান ক্ষমতা দান, (২) শাসনতন্ত্র প্রণয়ন, (৩) শেষে যারা রাজি হবে না তাদের চলে যাবার অনুমতি দান এবং (৪) উত্তরাধিকারী রূপে ক্ষমতাগ্রহণ। মেননের প্রস্তাবে তা ছিল না—ছিল প্রথমে দেশভাগ, পরে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস দান।

(৯) এর পর হয় নেহরু-মংকটন আলাপ। অ্যাটর্নি জেনারেল শক্রসের পরামর্শ পাওয়া যায় যে রিপাবলিক হলেও ভারত কমনওয়েলথে থাকতে পারবে রাজাকে 'কমনওয়েলথের প্রধান' রূপে স্বীকাব করে নিয়ে।

(১০) ইতিমধ্যে প্ল্যান বাল্কানে জিন্না ঘোর প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কংগ্রেসও কিছু মত বদলেছে। জিন্না পঞ্জাব ও বাংলা ভাগ অর্থাৎ "a truncated or mutilated, moth-eaten Pakistan" নেবেন না।[৪১৯] পুরো ছটা প্রদেশ (অসম সহ) তাঁর চাই। জিন্নার ক্ষুরধার বুদ্ধি বুঝেছিল একবার যখন পাকিস্তান নীতি মেনে নেওয়া হয়েছে, পাকিস্তানকে ডোমিনিয়ান পদ দেওয়া হবে বলা হয়েছে, জোরে ঘা মারলে ছটা প্রদেশই মিলবে। কিন্তু এই দম্ভ কংগ্রেসকে চেতিয়ে দিল। সে তার অবস্থান পরিষ্কার করে জানিয়ে দিল। নেহরুকে প্ল্যানটা ভালো করে দেখান হয়নি। তিনি ধরেই নিয়েছিলেন বড়ো জোর দুটো উত্তরাধিকারীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। তিনি শুধু সীমান্তে নতুন নির্বাচন বা বালুচিস্তানে সীমিত প্রতিনিধিত্ব নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন। ওয়ার্কিং কমিটি ১ মে যে প্রস্তাব নেয় তাতেও আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতির ভিত্তিতে দেশভাগ স্বীকৃত হয়েছিল কিন্তু পঞ্জাব ও বাংলা ভাগও চাওয়া হয়েছিল। অবশ্যই তাতে লীগের "brutal and terroistic

methods"-এ আপত্তি জানানো হয় এবং সীমান্তে নতুন নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করা হয়।

'প্ল্যান বাল্কানে'র খসড়া ও কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া হিন্দুস্থান টাইমস্ পত্রিকায় প্রকাশিত হলে বড়লাট মনে করেন তাঁকে ব্ল্যাকমেইল করা হচ্ছে। তিনি নেহরু ও কৃপালনিব কাছে আপত্তি জানান। সীমান্তের রেফারেন্ডামে নেহরু রাজি হন যদি লীগ আইন অমান্য তুলে নেয়। জিন্না প্রায় রাজি হন কিন্তু গভর্নব ওলাফ ক্যারোর পদত্যাগের দাবি তাঁকে ক্ষেপিযে দেয়। ৪ মে গান্ধী ও মাউন্টব্যাটেনের সাক্ষাৎকাব হয়। গান্ধী দেশভাগে আপত্তি জানান এবং বলেন, হয় কংগ্রেস বা লীগকে ক্ষমতা দেওয়া হোক এবং মাউন্টব্যাটেন জুন অবধি বড়লাট থাকুন। কয়েকবার ওয়ার্কিং কমিটির জরুবী অধিবেশন বসে এবং ৭ তারিখে সবাই দাবি করেন সমগ্র ভারতকে এখুনি ডোমিনিযান ঘোষণা করা হোক। গণপবিষদ শাসনতন্ত্র রচনা করুক। যারা তাতে আপত্তি জানাবে অন্তর্বর্তী সরকার তাদেব আলাদা করে দিক। ততদিন সংখ্যালঘুদের বিশেষ রক্ষাকবচ দেওয়া হবে৷ এই প্রস্তাব নিযে নেহরু সিমলা যান।

(১১) ৮ মে সিমলায় আলোচনা শুরু হয়। নেহরু যে প্রস্তাব দেন তা নিম্নরূপ—

(ক) ১৯৪৭-এব জুনে কেন্দ্রীয় সরকারকে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হোক,

(খ) সরকার হয় গণপরিষদ না হয় কেন্দ্রীয় আইনসভার কাছে দায়ী থাকবে,

(গ) এখুনি পাকিস্তান করা হবে এমন কথা শোনা হবে না,

(ঘ) ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানমত প্রদেশদের জোট বাঁধার অধিকার দেওয়া হোক,

(ঙ) জোট বাঁধাই পবে য়ুনিয়ান থেকে স্বতন্ত্র হবাব অধিকারে পরিণত হবে কিন্তু তা সংবিধান রচিত হবার আগে নয়। আশা করা যায় তিন মাসের মধ্যে সংবিধান রচিত হয়ে যাবে।

(চ) এই সময় প্রদেশ ভাগের কথা উঠবে, আগে নয়।[৪২০]

ভি পি মেনন বললেন, এব ফলে প্রদেশ ভাগ ও য়ুনিযানের বহির্ভূত এলাকায় প্রশাসন সংগঠনের কাজ বড বিলম্বিত হবে। নেহরু বলেন, যদি অন্তর্বর্তী সবকারকে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে দেওয়া হয় তবে বাস্তবের সম্মুখীন হয়ে মুসলিমরা য়ুনিয়ানে থেকে যেতেও পারে। মাউন্টব্যাটেন বললেন—বর্তমান গণপরিষদে যে সব প্রদেশ যোগ দিয়েছে তাদের 'ভারতীয় য়ুনিয়ান' বলা যাবে আর যারা দেবে না তাদের বলা হবে 'Contracting out of India". কিন্তু যতক্ষণ না দ্বিতীয় দল আলাদা হচ্ছে ব্রিটেন তো ভারতীয় য়ুনিয়ানের হাতে ক্ষমতা দেবে না। তাছাড়া এখুনি ক্ষমতা চাইলে সীমান্তে গণভোট নিতে হবে। সেই রাত্রে নেহরু ও মেননের মধ্যে আলোচনা মত একটা প্ল্যান তৈরি হল। মেননের মতে নেহরু বলেন, যদি যুক্ত ডোমিনিয়ান নিতান্ত সম্ভব না হয়, তবে হিন্দুস্তান গণপরিষদ নির্বাচিত হিন্দুস্তান শাসন পরিষদের হাতে ও অন্যান্য অংশ যে গণপরিষদ স্থাপন করবে তৎ নির্বাচিত অন্য শাসন পরিষদের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হোক। অর্থাৎ dual authorities—দুই পরিষদের বেশি ভাগীদার না হয়। উভয়ের গভর্নর জেনারেল এক হবেন এবং যৌথ বিষয় বিবেচনা করবে একটা যুক্ত কাউন্সিল।[৪২১] যদি পঞ্জাব পূর্ণ বা খণ্ডরূপে ভারতীয় য়ুনিয়ানে থাকতে না চায় তবে, সীমান্ত সরকারের সম্মতি নিয়ে ও স্বয়ং বড়লাটের হেফাজতে, সীমান্তে গণভোট হতে পারে।

অর্থাৎ ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে নেহরু দেশভাগ চাননি। তাই ঠিক হল ১০ ও ১১ মে তিনি ও বড়লাট আরো কথা বলবেন ও প্যাটেলের সম্মতি নেবেন। ৯ মে প্যাটেলের বিবৃতি ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসেব ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তর চেয়েছিল। মেননের প্ল্যান না জেনেও কেন নেহরু ও প্যাটেল সেদিকে ঝুঁকেছিলেন বোঝা কঠিন নয়। লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম

নীতির ভয়ঙ্কর পরিণাম তাঁদের অসহ্য লাগছিল। পঞ্জাবের য়ুনিয়ানিস্ট মন্ত্রীসভার পতন ও সীমান্তের কংগ্রেস মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে জেহাদ বিচলিত করেছিল তাঁদের। তাঁদেৰ (এমনকি গান্ধীরও) মনে হয়েছিল এখনি যদি স্থায়ী কোন কেন্দ্রীয় সরকাবের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা না হয় তবে জাতীয় সংহতি বিপন্ন হবে। ১৯৩৫-এর আইন অনুসারে দ্রুত হস্তান্তর এবং বড়লাট নিজে থেকে দেশীয় রাজন্যবর্গ, আদিবাসী, সৈন্যবাহিনীব সমস্যা সমাধান করবেন—এটাই মনে হয়েছিল শ্রেয় : দেশীয় রাজাদেব ওপর বড়লাটের প্রভাব নেহরুর কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়।[৪২২]

(১২) ১০ মে-র সভায় ভি পি মেনন তাঁর নিজস্ব প্ল্যান—ভারতীয় ও পাকিস্তান ভিত্তিক ক্ষমতা হস্তান্তব-এব কথা পাড়লেন। নেহরু আবার জোর দিলেন সংবিধান বচনার প্রাক্কালে দেশ ভাগ কবা ঠিক হবে না। মাউন্টব্যাটেন বললেন—তা সম্ভব নয। যদি বিখণ্ডিত পাকিস্তান এখনি দেওয়া হয তবে গোলমাল বন্ধ হবে, হয়তো পাকিস্তান একদিন ফিরেও আসবে। বড়লাট জানালেন, ক্যাবিনেট 'প্ল্যান বাল্কান' বদলাতে সম্মত হয়েছে। সেই সন্ধ্যায় বিলেত থেকে কিঞ্চিৎ পবিবর্তিত প্ল্যান বাল্কান' এল এবং মাউন্টব্যাটেন তাঁর আকস্মিক 'hunch' বশত তা নেহরুকে দেখালেন।[৪২৩] 'নেহরু বোমা' ফাটল। এ প্ল্যান শুধু কংগ্রেসের এক ডোমিনিযানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিবোধী নয, দুই ডোমিনিয়ানেব হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরেরও বিবোধী। ৩০ এপ্রিলের প্ল্যান-এব থেকে ১০ মে-ব প্ল্যান আলাদা ; কংগ্রেসের মার্চ প্রস্তাব, নেহরুব ৮ মে-র প্রস্তাব, গান্ধীব ৮ মে-ব চিঠি ও প্যাটেলেব ৯ মে-র প্রতিবেদন—সব কিছুরই বিরোধী। সব চেয়ে বড পরিবর্তনের জন্য মাউন্টব্যাটেন দাযী। তিনি সংযুক্ত, সার্বভৌম বঙ্গেব কথা ঢুকিয়ে দিযেছিলেন। নেহরু ৩০ এপ্রিল দেখেছেন—বাংলাব এম এল এ-রা প্রথমে ঐক্য বা ভাগেব ওপব ভোট দেবেন, এবং পবে, ঐক্য স্থিব হলে, স্বাতন্ত্র্য বা হিন্দুস্তান বা পাকিস্তানেব সঙ্গে যোগ দেবাব ওপব ভোট দেবেন। মাউন্টব্যাটেন সুরাবর্দি – বাবোজ-দেব কথা শুনে এমন বদল আনলেন যাতে ঐক্য স্থিব হলে এম এল এ-রা প্রথমে স্বাতন্ত্র্য বা হিন্দুস্তান বা পাকিস্তানের ওপর ভোট দেবেন, ঐক্য বা ভাগের ওপর ভোট আনবেন পরে। নেহরুব ধারণা ছিল বাংলাকে আলাদা বাষ্ট্র কবলে তা পাকিস্তানে যোগ দেবেই।[৪২৪] তা ছাড়াও, অ্যাটলির নির্দেশে, ক্ষমতা হস্তান্তবেব পদ্ধতিও বদলে দেওয়া হয়। এর ফলে সমস্ত প্রদেশকে নতুন কবে আত্মনিযন্ত্রণেব অধিকাব দেওয়া হল। যারা গণপবিষদে এতদিন যোগ দিয়েছে, তাদেবও।[৪২৫] রাজন্যদেব তো বটেই। তারা ইচ্ছে করলে যে কোন গণপাবিষদে যোগ দেবে, অথবা একক বা যুক্তভাবে স্বাধীন থাকবে। এ যেন স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের হবির লুট।[৪২৬]

(১৩) ১১ মে রাত্রে নেহরুর সঙ্গে বড়লাটের কথা হল এবং তিনি প্রস্তাব দিলেন যে এখুনি ক্ষমতা হস্তান্তর করলে লীগকে যত রক্ষাকবচ দেওয়া সম্ভব তিনি দেবেন। ১২ মে মিভিল একথা বিলেতে ইজমেকে জানালেন। ইজমেব স্পষ্ট উত্তব দেশভাগেব আগে অন্তর্বর্তী সরকারের হাতে ক্ষমতা দেওয়া সম্ভব নয়। বিশেষ করে তিনি প্যাটেলের ৯ মে-র বিবৃতিতে আপত্তি জানান।

১২ মে নেহরুর চাহিদা মনে রেখে ও টেলিফোনে প্যাটেলের সঙ্গে পরামর্শ করে মেনন এক প্ল্যান রচনা করলেন যা প্ল্যান বাল্কান ও তাঁর নিজস্ব প্ল্যানের সমাহার। মুরের ভাষায়, **"It might truly be called the Mountbatten-Nehru deal for two Dominions, or, more conveniently, Plan Partition."**[৪২৮] মাউন্টব্যাটেন বলছেন—**"The issues... are limited to joining existing Constituent**

Assembly or joining together in a new Consutuent Assembly. I have omitted choice to Provinces of standing out independently...I do not now like·the idea of HMG giving them that choice."[৪২৯] যে সব কংগ্রেস প্রদেশ বর্তমান গণপরিষদে যোগ দিয়েছে তাদের সামনে সীমান্ত ছাডা কারুব বিকল্প নেই। সীমান্তে হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানে যোগ দেবার জন্য গণভোট নেওয়া হবে। বাংলাব মুখ্যমন্ত্রীকে বলা হবে স্বাধীন বঙ্গ সম্ভব নয় তবে বাংলা আইনপরিষদ যদি স্বাধীনতাব জন্য প্রস্তাব নেয়, তিনি তা বিবেচনা কববেন (treat it on its merits)। দেশীয় রাজন্যবর্গকে একটু পথ দেখাতে হবে। তাদেব কেউ কেউ বর্তমান গণপরিষদে যোগ দিয়েছে। বাকীদের দুই গণপরিষদের একটা বেছে নিতে হবে।

(১৪) এর জট ছাড়াতে ক্যাবিনেট কমিটি বডলাটকে ডেকে পাঠাল এবং ১৯ থেকে ২৮ মে চূডান্ত পরিকল্পনা রচিত হল। ২৯ মে মাউন্টব্যাটেন বিলেত থেকে বাবোজকে জানালেন—স্বাধীন ও সার্বভৌম বঙ্গদেশ কংগ্রেস মেনে নেবে না এবং ক্যাবিনেট তাব যৌক্তিকতা স্বীকাব কবে। নেহরু আগেই তাঁর মনোভাব কিবণশঙ্কব বাযকে জানিয়ে দিয়েছেন ও ২৭ মে-র প্রেস বিবৃতিতে প্রকাশ কবেছেন।

(১৫) জিন্না তখনও বাজি হননি। কিন্তু চার্চিল তাঁকে সাবধান কবে দিযে বলেন, এ প্রস্তাব না গ্রহণ করলে পাকিস্তানেব ভাল হবে না।[৪৩১] সব চেযে বড়ো পৃষ্ঠপোষক সরে দাঁড়ানোর ফলে জিন্নার রাজি না হযে উপায় ছিল না। তবুও জনসমক্ষে আপন ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য কোন লিখিত সম্মতি দেননি তিনি।

ব্রিটিশ সরকারের ৩ জুনের যে ঘোষণা সব দল গ্রহণ কবল তা পাওয়া যাবে ভি পি মেননের 'দ্য ট্রান্সফার অব পাওয়াব ইন ইন্ডিয়া' গ্রন্থে।[৪৩২] এতে দ্বিতীয় এক গণপবিষদ গঠনের ব্যবস্থা ছিল ও পঞ্জাব-বাংলা ভাগেব পদ্ধতি বর্ণিত হযেছিল।

বাংলা পঞ্জাবেব বর্তমান আইন পরিযদ ইউরোপীয় সদস্য বাদ দিয়ে দু ভাগে আলাদা হয়ে যাবে—এক ভাগে থাকবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাব প্রতিনিধিবা, অন্যভাগে বাকী জেলাব প্রতিনিধিরা। প্রত্যেক ভাগের প্রতিনিধিরা যদি ঐক্যের পক্ষে মত দেয় তবে প্রথম স্থির করবে কোন গণপরিষদে যোগ দেবে। তখন অবশ্য সবাই একত্র হযে ভোট দেবে। যদি প্রত্যেক ভাগের প্রতিনিধিরা দেশভাগ স্থির কবে তবে তাদেব প্রত্যেকে কে কোন গণপরিষদে যোগ দেবে স্থির করবে। ভোট সব সময় হবে সাধারণ সংখ্যাগবিষ্ঠতার ভিত্তিতে। দেশ ভাগ স্থির হলে এক সীমানা কমিশন গঠন করা হবে। কমিশন স্থিব করবে সংলগ্ন (Contiguous) সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অঞ্চল ও সংলগ্ন সংখ্যাগরিষ্ঠ অমুসলিম অঞ্চল। সীমান্তের সমস্যা জটিল, কারণ তার কিছু প্রতিনিধি বর্তমানে গণপরিষদে যোগ দিয়েছে। কিন্তু সমগ্র বা আংশিকভাবে পঞ্জাব যদি বর্তমান গণপরিষদে যোগ না দেয় তবে সীমান্তের ব্যাপার পুনর্বিবেচনা করতে হবে। তখন প্রাদেশিক সরকাবের সঙ্গে পরামর্শ কবে, বড়লাটের অধীনে জনমত যাচাই করতে হবে। বাংলা ভাগ স্থির হলে সিলেটেও একই পন্থা নেওয়া হবে। সিলেট পূর্ববঙ্গের সঙ্গে যোগ চাইলে সীমানা কমিশন বসবে। বাংলা ও পঞ্জাব ভাগ হলে গণপরিষদে তাদের প্রতিনিধি পুনবায় নির্বাচন করতে হবে নিম্নহারে :—

সারণী-১				
প্রদেশ	সাধারণ	মুসলিম	শিখ	মোট
সিলেট	১	২	×	৩
পশ্চিমবঙ্গ	১৫	৪	×	১৯
পূর্ববঙ্গ	১২	২৯	×	৪১
পশ্চিম পঞ্জাব	৩	১২	২	১৭
পূর্ব পঞ্জাব	৬	৪	২	১২

উত্তরাধিকাবী বাষ্ট্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেব আদিবাসীদেব সঙ্গে চুক্তি কববে। দেশীয বাজ্যেব ব্যাপারে ক্যাবিনেট মিশনেব ১২ মে-র প্রস্তাব বহাল রইল।

১৯৪৮-এব জুনের পূর্বেই ক্ষমতা হস্তান্তব কবা হবে। এক বা দুই উত্তবাধিকাবীব হাতে ডোমিনিযানের ভিত্তিতে তা করা হবে। বর্তমান গণপবিষদ কমনওযেলথে থাক বা না থাক তা বাধা হবে না। উত্তবাধিকারীদেব হাতে প্রতিবক্ষা, অর্থ, যোগাযোগ সমেত সব ক্ষমতাই বিভক্ত হবে। হস্তান্তব সংক্রান্ত ব্যাপাবে তাবাই ব্রিটেনেব সঙ্গে চুক্তি কববে।

দৃশ্যপট দিল্লীতে সবিযে আনলে দেখব ২৬ মে পর্যন্ত গান্ধী সব দেশপ্রেমিকদেব দেশভাগ এডাবাব জন্য অনুবোধ কবে চলেছেন। এ সমযকাব 'হবিজন' পত্রিকা ও প্রার্থনান্তিক সভায তাঁর ভাষণগুলি ধবে বেখেছে তাঁব অসহায় আর্ত স্বব। ২৫ মে তিনি 'হরিজনে' লিখছেন— "If Pakistan is wrong, partition of Bengal and the Panjab will not make it right. Two wrongs will not make one right."[৪৩৩] আব প্রার্থনা সভায বলছেন—সব পক্ষই দোষী। বিহাবে নোয়াখালিব প্রতিশোধের চেয়ে কিছু বেশি করা হয়েছে। আর প্রতিক্রিয়া হয়েছে ডেবা ইসমাইল খানে। কিন্তু লন্ডনের দিকে সমাধানেব জন্য তাকিযে কি লাভ? মাউন্টব্যাটেন সেখান থেকে কি আনবেন? মুসলিমবা হয়তো সেদিকে তাকিয়ে রযেছে। তাই কি কববে হিন্দু ও শিখবা? অন্যান্য ভারতীয়দের কি হবে?[৪৩৪] পবের দিনেব ভাষণে তিনি বলছেন— "The British cannot give us our freedom. They can only get off our backs...It is not for the British Government to change the map of India. All it has to do is to withdraw from India, if possible in an orderly manner, may be even in chaos, but withdraw in any case on or before the date it has itself fixed."[৪৩৫] গান্ধীজি ফিরে যেতে চাইলেন ক্যাবিনেট মিশনেব ১৬ মে-র প্রস্তাবে। ২৭ মে তাঁব সঙ্গে জযপ্রকাশ নাবায়ণ ও কিছু সমাজতন্ত্রীর সাক্ষাৎ হল। তিনি বললেন, দেশ ভাগও সহ্য হবে কিন্তু ইংরেজ কর্তৃক নয়। এখনও তাঁর বিশ্বাস ছিল মাউন্টব্যাটেন তাঁর কথা শুনবেন। আর সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদীদের সমাধান—সাধারণ ধর্মঘট—মেনে নিতে রাজি ছিলেন না তিনি। "Before the people take to the path of destruction (class war) see that they are given constructive life-giving training" তবে তিনি অর্থনৈতিক অসাম্যের কথা অস্বীকার করেননি। "There can be no Ramarajya in the present state of inequitous inequalities in which a few roll in riches and the masses do not get enough to eat." কিন্তু সমাজতন্ত্রীরা

অহিংসার পথে বৈষম্য দূর করতে চায় না। আর তাঁর অশামত যদি রাজা, জমিদার, ধনিকরা জনগণের অছি হিসাবে কাজ করতে না চায়, "Force of circumstances will compel the reform unless they court utter destruction." যদি জনগণ অসহযোগ করে রাজা, জমিদাব, ধনিক করবে কি ? গান্ধীর সমাধান ছিল— পঞ্চায়েৎ রাজ।[৪৩৬]

অর্থাৎ বাজনীতিব ব্যাপাবে—ভারতীয় সমস্যা ভাবতীয় দ্বারা সমাধান ও অর্থনীতির ব্যাপারে পঞ্চাযেতী বাজ—এই ছিল গান্ধীব বক্তব্য। দুটোকে মেলাতে হবে, তবে প্রথমটার প্রাগাধিকাব। আবার এও জানতেন এসব—অর্থাৎ পঞ্চায়েতী রাজ, স্বনির্ভর গ্রাম সমাজ, হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি—তাঁব অলীক স্বপ্ন। হিন্দুদের দায়িত্ব বেশি। যদি সব মুসলিম উন্মাদ হয়ে যায়, এক জন হিন্দুও যেন তাদেব অনুসবণ না করে। আব শিখবা যেন বোঝে তলোয়াবের দিন শেষ হয়েছে। "This is the age of the atom bomb."[৪৩৭] তখন থেকেই হিন্দু মৌলবাদীবা তাঁকে প্রার্থনা সভায কোবান পাঠ না কবতে বলছিল ও ভয় দেখাচ্ছিল। আব ২৮ মে, অদ্ভুত দূবদৃষ্টিব সঙ্গে, তিনি বলেছিলেন, "আমি যদি বামনাম বলতে বলতে মাবাও যাই, কি ক্ষতি তাতে ?" তবু উদ্যত অস্ত্র পাকিস্তানপন্থীদের তিনি বলবেন—"They cannot have Pakistan at the point of the sword. They must first cut me to pieces before they vivisect the country...if theirs is a true Pakistan, it would have to be the entire Hindustan." অন্তর্বর্তী সরকাবকে প্রশ্ন করেন তিনি, ভাবতে কি হিন্দু, মুসলিম, শিখ ছাড়া সম্প্রদায নেই ? পার্সী ও খ্রীস্টানবা কোথায় গেল ? জওহরলাল, সর্দাব, রাজেন্দ্র প্রসাদ একমাত্র কংগ্রেস নেতা নন। সবাই কংগ্রেস সমর্থক এবং তাদেব সোচ্চাব হতে হবে।[৪৩৮] কিন্তু তিনি জানেন, কেউ তাঁব কথা শুনবে না। নেতাবা নয, সাধাবণ মানুষও নয। নেতাদেব সম্বন্ধে বলেন, "The prospect of power has demoralized us." আব জনসাধারণ তো প্রতিশোধেব জন্য উন্মাদ, যা 'sheer negation of humanity.' হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে পশুতে পবিণত হযেছে। মৃত্যুভয় ও প্রতিশোধস্পৃহা তাব জন্য দাযী। ব্রিটেনের কাছে তাঁর দাবি—১৬ মে-ব প্রস্তাব মানতেই হবে। "The government of free Indians formed under the constitution worked out by the Constituent Assembly can do anything afterwards—keep India one or divide it into two or more parts." মাউন্টব্যাটেনেব কাছে মে-র শেষ পর্যন্ত তিনি ন্যায়বিচার প্রত্যাশা করছিলেন, জিন্নাব কাছে আবেদন করছিলেন এক সঙ্গে ভারত ঘুরে সর্বনাশা ভ্রাতৃঘাত বন্ধ করতে।

২ জুনের নাটকীয় ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন অ্যালান ক্যাম্বেল জনসন— Mission With Mountbatten গ্রন্থে।[৪৩৯] আগের রাতে মাকে লিখছেন তিনি—নেহরু ও প্যাটেল দেশভাগ মেনে নিচ্ছেন এই আশায যে জিন্নাকে পাকিস্তান দেবাব পর তাঁব 'nuisance value' চলে যাবে। নেহরু বলছিলেন, "এ যেন মাথা কেটে আমবা মাথাব্যথা ভাল করব।" জনসন অতটা আশাবাদী ছিলেন না। জিন্নার দাবি বাডছিল, আর গান্ধী তখনও পেছন থেকে লডাই করে যাচ্ছিলেন।

এল ২ জুন—সোমবার। সব নেতারা একে একে জমাযেত হলেন। জিন্না এলেন সব শেষে। কৃপালনি কংগ্রেসের সভাপতিরূপে যোগ দিচ্ছেন তাই জিন্না নিযে এলেন নিস্তারকে। একবার ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবের কথা তুলে (বোধ হয গান্ধীব উদ্দেশেই),

জিন্নার আপত্তি শুনে, বড়লাট দেশভাগের সমস্যা প্রসঙ্গে চলে গেলেন। কংগ্রেস দেশভাগ চায় না, কিন্তু, হলে, প্রদেশভাগও চায়। জিন্না প্রথমটা চান, দ্বিতীয়টা নয়। শিখদেব সম্বন্ধে তাঁর সহানুভূতি উল্লেখ করে—তিনি বলেন, কলকাতাকে স্বাধীন বন্দর করা চলবে না। ডোমিনিয়ান সমাধান সমর্থন কবলেন তিনি। ব্রিটেন স্বার্থরক্ষার জন্য তা চাপাচ্ছে না, স্বাধীনোত্তর উপমহাদেশকে সাহায্য করার জন্যই চাইছে। তারপর তিনি সবাইকে একটা করে প্ল্যান দিলেন এবং বললেন—ভারতীয় নেতাদের পূর্ণ সম্মতি তিনি চাইছেন না—"He was merely asking them to accept the plan in a peaceful spirit." নেহরু বললেন, এ প্রস্তাবে কংগ্রেসের পূর্ণ সমর্থন নেই কিন্তু নেহরু মন্দেব ভাল বলে মেনে নেবেন— ("On balance they accepted it.") নিস্তার বললেন, প্ল্যান গ্রহণ মানেই তা কার্যে পরিণত করার সম্মতি। জিন্না বললেন, তাঁকে ও লীগ ওয়ার্কিং কমিটিকে মুসলিম জনসাধারণেব মত নিতে হবে। বড়লাট চেপে ধরায় তিনি বললেন, তিনি প্ল্যান ভেস্তে দিতে চান না, মুসলিমদের রাজি করাতেই চান। তিনি তাঁর যথাসাধ্য করবেন। বড়লাট অনুবোধ জানালেন যেন মধ্যরাতের আগেই কংগ্রেস, লীগ ও শিখরা তাঁদের প্রতিক্রিয়া জানান। কৃপালনি ও বলদেব সিং লিখিতভাবে জানাবার প্রতিশ্রুতি দিলেন, জিন্না মৌখিকভাবে জানাবার। পবেব দিন বেতার ঘোষণায় সব নেতাকে রাজি কবালেন বড়লাট। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়—"কত দিন আপনি গভর্নর জেনারেল থাকবেন?" চকিত বড়লাট উত্তর দেন, "মনে হয় ১৫ আগস্টেব মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্ভব।" লন্ডনেব সঙ্গে পবামর্শ না কবেই তিনি দিন ঘোষণা করলেন।[৪৩৯ক] জনসনের মন্তব্য— "Never Mountbatten's genius for informal chairmanship and exposition more signally displayed...Not even Mr. Jinnah's formality and stuffiness could resist Mountbatten's urgent will to succeed."

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বসল। গান্ধী বললেন, "যদিও তিনি ভাবত ভাগ ব্যাপাবে কমিটির সিদ্ধান্তেব সঙ্গে একমত নন তবু পূর্ব গৃহীত প্রস্তাব কার্যকব কবাব পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এমন কোন পদক্ষেপ তিনি নিতে চান না।" বড়লাটেব প্রস্তাবেব ২০ ধাবায় ভাবতেব অংশগুলিব কমনওয়েলথে থাকবাব বা না থাকবাব অধিকাব বর্ণিত হয়েছে. গান্ধী তাব পবিষ্কাব ব্যাখ্যা চান। তিনি চান যে অংশ বাইবে যাচ্ছে তাব সম্বন্ধে কোন আলাদা ব্যবস্থা না নেওয়া হয। তাছাড়া তিনি লীগেব কাছ থেকে স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি চান যে এই হল চূড়ান্ত নিষ্পত্তি এবং দাবি বাড়ানো চলবে না।[৪৪০] নেহরু বড়লাটকে ২ জুন জানিয়ে দিলেন কমিটিব মতামত। কমিটিব মতে দেশ ভাগেব কথা চিন্তা কবাই দুঃখবহ এবং সকলেব পক্ষে তা হবে ক্ষতিকব। শেষ সিদ্ধান্ত নেবে এ আই সি সি অথবা কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশন। কালহানি তথা ব্যাপক অশান্তি ও হিংসা এড়াতে কমিটি বড়লাটের প্রস্তাবগুলি আগেই আলোচনা কবেছে এবং তা নেহরু তাঁব ১ মে-র চিঠিতে জানিযেও দিয়েছেন। কংগ্রেস ক্যাবিনেট মিশনের ১৬ মে-ব প্রতিবেদন ও তাব ৬ ডিসেম্ববের ব্যাখ্যা মেনে নিয়েছে। তদনুসারে গণপবিষদ কাজ কবছে গত ছ মাস ধরে। কংগ্রেস এখনও সে প্রতিবেদন মেনে চলতে চায়। "In view, however, of subsequent events and the situation to-day, we are willing to accept as a variation of that plan the proposals now being made." ওয়ার্কিং কমিটি বড়লাটের প্রস্তাব গ্রহণ কবতে সম্মত হয়েছে এবং এ আই সি সি-র কাছে তা সুপারিশ করবে। "We do so in the earnest hope that this will mean a settlement." দেশের রাজনৈতিক,

অর্থনৈতিক এবং সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি বুঝে শান্তিপূর্ণ সমাধানই শ্রেষ্ঠ মনে হয়েছে। হিংসার পথে এ সমস্যা সমাধান হবে না এবং সে পথের কাছে নতি স্বীকারও অনুচিত। গান্ধীর বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করে নেহরু বললেন, আর কোনো দাবি উত্থাপন করা চলবে না। তাঁরা সবাই ভারতের সংহতি চান কিন্তু তা বলপ্রয়োগ দ্বারা নয়, বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার পথে। বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন না করলে পঞ্জাবে শিখদের স্বার্থহানি ঘটতে পারে। এ ব্যাপারে সীমানা কমিশনকে জনসংখ্যা ছাড়া আরো অনেক কথা ভাবতে হবে। শিখরা পঞ্জাবের এক বিস্তীর্ণ অংশের উন্নয়ন সাধন করেছে। খালসেবিত অঞ্চলে তাদেরই শ্রম মরুতে ফলিয়েছে সোনা। বর্তমানে যা সীমানা হোক সীমানা কমিশনকে এ সব কথা বিবেচনা করতে হবে। বর্তমানে যে 'notional division' বা আনুমানিক সীমানার কথা বলা হচ্ছে তা যদি প্রশাসন বা অন্য ব্যাপারে প্রয়োগ করা হয় তবে চূড়ান্ত সীমানাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। "We would, therefore, urge you not to apply that notional division for any administrative purpose during the interim period." সীমান্তে জনমত যাচাইয়ের কথা উল্লিখতি হয়েছে। তাতে যেন সীমান্ত স্বতন্ত্র থাকতে চায় কিনা এবং অবশিষ্ট ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চায় কিনা সে মতও যাচাই করা হয়। আবার গান্ধীর প্রতিধ্বনি করে নেহরু বললেন, কমনওয়েলথে যোগদানের ব্যাপারে প্রত্যেক গণপরিষদের সিদ্ধান্ত নেবার কথা উল্লিখিত হয়েছে। "It seems to us extremely undesirable and likely to lead to friction if the relations of Britain with the Indian union and the seceding parts of it are on differential basis. We should, therefore, like to make it clear that we cannot be consenting parties to any such development অর্থাৎ ভারত কমনওয়েলথ ছাড়লে পাকিস্তানকে তার সদস্য রাখা হবে এমন ব্যবস্থা মেনে নেওয়া হবে না।[৪৪১]

বড়লাটের সব চেয়ে ভয় ছিল গান্ধীকে। তিনি যে কোন মুহূর্তে সব কিছু ভেস্তে দিতে পারতেন। তাই ২ জুন মহাত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎকার কালে বড়লাট উদ্বিগ্ন বোধ করছিলেন। দেখা হয় বেলা ১২-৩০মিঃ-এ-ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনের আগে। গান্ধী সব প্রশ্নের উত্তর কাগজে লিখে জানাচ্ছিলেন। একটা কথা উদ্ধৃত করছি "Have I said one word against you during my speeches? If you admit that I have not, your warning is superfluous. There are one or two things I must talk about but not to-day. But if we meet each other again I shall speak."[৪৪২] আবার দেখা হয়— ৪ জুন প্রার্থনা সভার আগে। পরে সেকথা বলব। ২ জুনই বিকেলের স্টাফ মিটিং-এ 'The Administrative Consequences of Partition' উপস্থাপিত হয়। রাত্রে দেখা করেন জিন্না। আবার তিনি বলেন, লীগ কাউন্সিলের অধিবেশনের পূর্বে তিনি কোন প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারেন না। বড়লাট উত্তর দেন— এই কৌশলের জন্যই তো কংগ্রেস জিন্নাকে বিশ্বাস করেন না। জিন্নার চিরাচরিত কৌশল ছিল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কি বলে দেখে তবে ইতিকর্তব্য নির্ধারণ করা। বড়লাট বলেন, নেহরু, কৃপালনি এবং প্যাটেল বিশেষ ভাবে সতর্ক করে দিয়েছেন যে লীগ সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ না করলে তাঁরা প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবেন। তাছাড়া একমাত্র চূড়ান্ত বোঝাপড়া রূপেই গ্রহণ করবে কংগ্রেস। পরে কোনো ফ্যাকড়া তোলা যাবে না। জিন্না কোনো কথাতেই বিচলিত হলেন না। বললেন—লীগ কাউন্সিলের অধিবেশনের পূর্বে সিদ্ধান্ত

নেওয়া তাঁর পক্ষে শাসনতন্ত্র বিরোধী হবে। কাউন্সিল ডাকতেও কদিন সময় লাগবে। অর্থাৎ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তিনি পিছিয়ে দিতে চাইছিলেন, আরও কিছু সুবিধা আদায় করা যায় কিনা বুঝতে। বড়লাট বলেন, "তবে তো আগামীকাল (৩ জুন) কংগ্রেস দল ও শিখরা শেষ সম্মতি দেবে না, নৈরাজ্য দেখা দেবে এবং আপনি হয়তো চিরতরে পাকিস্তান হারাবেন।"

বড়লাটের সাবধানবাণীর উত্তরে জিন্না বললেন, "যা হয় হবে।" বড়লাট কিছু উষ্ণ কণ্ঠে বললেন, "মিঃ জিন্না, এই আপোস রচনা করতে যে কাজ করতে হয়েছে, আপনাকে তা ভেস্তে দিতে দেওয়া হবে না। আপনি যদি লীগের হয়ে কথা না বলতে চান, আমিই বলব। আমি ঝুঁকি নিয়ে বলব, আপনার সম্মতি নিয়েই কথা বলছি। আপনার কাউন্সিল সমর্থন না জানালে আমাকে দোষ দিতে পারেন। আমার একটাই শর্ত, কাল সকালের সভায় আমি বলব "Mr. Jinnah has given me assurances which I have accepted and which satisfy me." আপনি কিছুতেই আপত্তি জানাবেন না এবং যখন আপনার দিকে তাকাব, "You will nod your head in acquiescence." জিন্না অগত্যা রাজি হলেন। শেষবারের মত বড়লাট জানতে চাইলেন, অ্যাটলি কি এই মর্মে ঘোষণা করতে পারেন? ক্লিষ্ট উত্তর এল—হাঁ। জিন্না চলে যাবার পরই কংগ্রেস সভাপতির উত্তর এল যা নেহরুর ঐ দিনের চিঠি (পূঃ উঃ)-র পুনরুক্তি। তখুনি ভি পি মেননকে ডেকে বলা হল প্যাটেলকে বোঝাতে যে কংগ্রেস কমনওয়েলথ ছাড়লে পাকিস্তানকে তার থেকে তাড়ানো হবে এমন দাবি শুধু অযৌক্তিক নয়, স্ট্যাটুট্ অব ওয়েস্টমিনস্টার বিরোধী। বড়লাট নেহরুকে একই কথা বললেন পরের দিন। সীমান্তে হিন্দুস্তান, পাকিস্তান কিংবা পাখতুনিস্তানের যে কোন একটাতে যোগ দেবাব প্রশ্নে গণভোট হোক দাবি কবছিলেন নেহরু। বড়লাট বললেন, স্বাতন্ত্র্যের ব্যাপাবে নেহরু নিজেই আপত্তি জানিয়েছেন। অতএব ঠিক হল এই দুই প্রশ্ন তিনি ৩ জুনের মিটিং-এ তুলবেন না।[৪৪৩]

৩ জুনের ঘটনা জনসনের গ্রন্থে পাওয়া যাবে, মসলেরও।[৪৪৪] ঐদিন আকস্মিকভাবে মাউন্টব্যাটেন ঘোষণা করলেন ১৫ আগস্ট ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। তিনি লন্ডন, এমনকি, পারিষদদেরও জানাননি। মে-র মাঝামাঝি জিন্নাকে নাকি বলেছেন, ১ অক্টোবরের আগে নয়। নেতাদের সঙ্গে আলাপের কথা ঠিক নয়, অন্তত প্রমাণ নেই। ৩ জুনই ভারত সচিবকে লেখা চিঠিতে দিনটা উল্লিখিত হয়েছে।[৪৪৬] দিন ঘোষণার চেয়ে বড়ো আঘাত এল জন ক্রিস্টি রচিত The Administrative Consequences of Pakistan থেকে। এত অল্প সময়ের মধ্যে এত ব্যাপক সমস্যার সমাধান করতে হবে তার খসড়া দেখে, মসলের ভাষায়, "They all suddenly looked like goldfish out of water."

৩ জুন সন্ধ্যা। বেতার তরঙ্গে প্রথম ভাষণ দিলেন বড়লাট। তারপর নেহরুর হাহাকার মিশ্রিত আত্মস্তুতি— "We are little men serving great causes,...It is with no joy in my heart that I commend these proposals though I have no doubt in my mind that it is the best course." জিন্না শুষ্ক কণ্ঠে বললেন, "আমাদের ভাবতে হবে বড়লাটের প্রস্তাব আপোস না মীমাংসা কি ভাবে নোব" তার পর কিছু না বলেই তিনি ধ্বনি দিলেন— "পাকিস্তান জিন্দাবাদ।" খণ্ডিত হলেও তাঁর এত দিনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা আজ পূর্ণ।

সেদিনের বেতার ভাষণ ইউরিপিদেসের 'অ্যালসেস্টিস'-নাটকের শেষ কোরাস স্মরণে আনে—

Many are the forms of what is unknown.
Much that the gods achieve is surprise.
What we look for does not come to pass;
God finds a way for that none foresaw.
(transl. Richmond Lattimore)

॥ ১৪ ॥

১লা জুনের ভোর রাত্রে গান্ধীব ঘুম ভেঙে গেল সময়ের আগে। শুয়ে শুয়ে তিনি নিম্নস্বরে মানুকে যা বললেন তার বেদনা আজও হৃদয়কে স্পর্শ করে। "সর্দাব ও জওহরলাল মনে করে আমার পবিস্থিতি বুঝতে ভুল হচ্ছে দেশ ভাগ হলে শান্তি নাকি ফিরবে ওরা মনে করে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভীমরতি ধরছে আমাব। কিন্তু আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি সমস্যা সমাধানে আমরা ভুল ভাবে এগুচ্ছি। We may not feel the full effect immediately, but I can see clearly that the future of independence gained at this price is going to be dark." বাদশা খাঁর দুঃখ তিনি সইতে পারছিলেন না। "আমি হয়তো ততদিন বাঁচবো না। তবু ভাবী প্রজন্ম জানুক এই বৃদ্ধ কি যন্ত্রণা সয়েছে। Let not the coming generations curse Gandhi for being a party to India's vivisection."[৪৪৭]

তিনি এমন স্বাধীনতা মানতে পারছিলেন না। ৪ জুন বডলাটের সঙ্গে সাক্ষাৎকার কালে প্রস্তাবের বিশ ধারায় বর্ণিত উত্তবাধিকারী বাষ্ট্রগুলিব কমনওযেলথে থাকাব স্বাধীনতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাঁর মতে এ ব্যাপারে ব্রিটেন ও দুই উত্তরাধিকাবীর মধ্যে ত্রিপাক্ষিক বা উভয় উত্তরাধিকারীর প্রত্যেকের সঙ্গে ব্রিটেনের দ্বিপাক্ষিক চুক্তি হওযা উচিত। বড়লাটকে তখন তিনি বলেছিলেন, "তুমি ও তোমার যাদু (you and your magic tricks) এই অসম্ভব সম্ভব করেছে।"[৪৪৮] বডলাট প্রশংসার্থে নিয়েছেন। ব্যঙ্গ হলে বিস্মিত হবো না। তবে ঐ দিনের প্রার্থনা সভায় তিনি বড়লাটকে কোন দোষাবোপ করেননি। পাকিস্তানের দাবি তিনি সমর্থন করেন না। পাকিস্তান হলেও পরস্পরের মধ্যে জন হস্তান্তব, আন্তর্দেশিক চলাচল ইত্যাদি নিয়ে বোঝাপড়া করতেই হবে। কংগ্রেস (ও নেহরু) নীতিগত ভাবে দেশভাগ মানে না। কিন্তু অবস্থা বিবেচনা করে মেনে নিয়েছে। হিন্দু ও শিখরা বলছে তারা মুসলিম দেশে থাকবে না। তিনি কংগ্রেসকে ১৬ মে-র প্রস্তাব নিতে বলেছিলেন। তা হয়নি। যা ঘটেছে তার চারা নেই। সবাই দায়ী। অতএব দোষী খোঁজার চেষ্টা করে লাভ কি? তবু যদি সকলে চায় এখনও ভরাডুবি বাঁচাতে পারে।

৬ জুন কৃষ্ণ মেনন বড়লাটকে জানান, গান্ধী এখনও আবেগে আপ্লুত। প্রার্থনা সভায় ঘোষণার বিরোধিতা করে বসবেন, এমন ভয় রয়েছে। চতুর মাউন্টব্যাটেন তখনি দেখা করলেন। তাঁরই জবানিতে— "He (Gandhi) was indeed in a very upset mood and began by saying how unhappy he was." বড়লাট বোঝালেন, অন্য পথ ছিল না। আর একে 'মাউন্টব্যাটেন প্ল্যান' না বলে, 'গান্ধী প্ল্যান' বলাই বেশি সঙ্গত। (১) গান্ধীই তাঁকে বলেছিলেন ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবে সকলের সম্মতি আদায় করতে, কিন্তু জোর করতে বলেছিলেন কি? (২) গান্ধী বলেছিলেন ভারতীয়রাই নিজেদের

ভাগ্য স্থির করবে। এব মানে কি এই নয় যে গান্ধী প্রদেশদের আপন ভাগ্যনির্ধাবণ করাব ক্ষমতা দানের ভাবনা বডলাটের মাথায় ঢোকান ? (৩) গান্ধী কি বলেননি যত দ্রুত সম্ভব এবং ১৯৪৭ শেষ হবার আগেই ব্রিটিশদেব ভাবত ছাড়তে হবে ? (৪) আগে গান্ধী ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস বিবোধী ছিলেন না—এখন কেন হচ্ছেন ?"[৪৪৯]

ঐদিন ইজমের সঙ্গেও গান্ধীর কথা হয়। তাতেও বডলাট উদ্বিগ্ন হন। গান্ধী চান বডলাট জিন্নাকে বলুন, "এখন তো আপনি পাকিস্তান পেয়েছেন, দয়া কবে সীমান্তে যান ও তাব অধিবাসীদের বোঝান পাকিস্তান কত ভাল জিনিষ।" তা হলে গণভোটেব প্রযোজন হবে না। গণভোট ব্যাপক হিংসা ও হানাহানি ডেকে আনবে। গফ্ফব খানও এই নিযে চিন্তিত। হিংসা এডাতে তিনি যতদূব সম্ভব যাবেন, এমনকি খান সাহেবকে পদত্যাগ কবতেও বলবেন। আব জিন্না শুধু সীমান্ত নয়, পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পঞ্জাবকেও পাকিস্তানেব সুবিধা কি বোঝাতে পারেন।[৪৫০] জওহরলালকে লেখা ৭ জুনের চিঠি ও বডলাটকে লেখা ১০/১১ জুনেব চিঠিতে সীমান্ত সম্বন্ধে নানা সংশয পবিস্ফুট। নেহরুকে তিনি লিখছেন, "জিন্না সীমান্তে না গেলে মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করবে—গণভোট হলে হিংসা অনিবার্য। অমৃত কাউব তাঁকে বলছেন, নেহরু এমন কথা ভাবেন না। নেহরু এখনি গণভোট চান, মনে কবেন তাব জন্য রক্তপাত হবে না। ববং গান্ধীব কথা শুনলেই হবে। I do not share this view. I had told the Badshah that if I do not carry you with me, I shall retire at least from the Frontier consultation and let you guide him. যতবার তাঁদের দেখা হচ্ছে ততবাবই মনে হচ্ছে তাঁদেব মধ্যকাব ব্যবধান বেড়ে যাচ্ছে।"[৪৫১]

ব্যবধান বাড়ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। নেহরু গণভোটেব জন্য জেদ বজায় বাখলেন।

৮ জুন নেহরু এক প্রতিবেদন পাঠালেন যাতে সীমান্তে গণভোটেব ব্যাপাবে বিস্তৃত ব্যাখ্যা ছিল। "The present position is that the British Government and the Viceroy are definitely committed to this referendum. Some of us are also more or less committed...Any change in the plan...may even lead to conflict on a big scale. We may therefore, take it as a settled fact, that a referendum will take place."স্বাতন্ত্র্যেব ওপব ভোট নেওয়াও চলবে না। বডলাটের পক্ষে তা গ্রহণ কবা সম্ভব নয, এবং তাতে ভোটারবাও বিভ্রান্ত হতে পারে। উপরন্তু সীমান্ত কংগ্রেসের এই গণভোট বর্জন করা ঠিক হবে না—তাতে লীগের আন্দোলনের কাছে নতি স্বীকার করা হবে। অন্তত তাদের বলার সুবিধে হবে যে অধিকাংশ লোকই কংগ্রেস মন্ত্রিসভা চায়নি। আর গণভোট বিরুদ্ধে গেলে নির্বাচন তো করতেই হবে। অতএব গণতান্ত্রিক মতে লড়াই করে হারাও শ্রেয়, লড়াই না-করা পরিণামের সম্বন্ধে ভয়ই প্রমাণ করে। তাতে কংগ্রেসের ক্ষতি। নেহরুর ধারণা ছিল—জেতবার সম্ভাবনা ভালই। শেষে তিনি বললেন, বড়লাট লীগকে এমন কথা দিয়েছেন, যে গণভোট না হলে হয়তো তাঁকে পদত্যাগ করতে হবে।[৪৫২]

গান্ধী এ নোট পাঠিয়ে দিলেন গফ্ফর খাঁকে। লিখলেন— তাঁর সঙ্গে নেহরুর মতদ্বৈধের ফলেই এই নোট। আর নেহরুকে লিখলেন, "The more I contemplate the differences in outlook and opinion between the W.C. and me I feel that my presence is unnecessary even if it is not detrimental to the

cause we all have at heart."[৪৫৩] পাকিস্তান ব্যাপারটা কি ভাল করে বুঝিয়ে তবে গণভোট করাতে চাইছিলেন গান্ধী। তা না করলে সীমান্তেব অধিবাসীদেব প্রতি অন্যায় কবা হবে। অন্যদিকে নেহরু ঝামেলা বাড়াতে চাইছিলেন না, বড়লাটকে বিব্রত করতে চাইছিলেন না। বডলাটকে ১০/১১ জুন লেখা গান্ধীব চিঠিতে পড়ি—তবু তিনি চান গণভোটের আগে জিন্না পাঠানদেব পাকিস্তান কি বুঝিয়ে বলুন। পাঠানদেব জানবাব অধিকার আছে কোথায তাবা বেশি সুখী ও সুরক্ষিত হবে।

বাংলাভাগ নিয়েও তাঁব কাছে বহু ক্রুদ্ধ চিঠিপত্র আসতে থাকে। তার উল্লেখ পাই প্রার্থনান্তিক ভাষণে। বাংলা ভাগ হোক কেউ চায না। কিন্তু কি কবে তা এক থাকবে যদি বাঙালীরা তা না চায়? "I therefore tell the Bengalis that if Bengal is to be divided it will be through their own decision and if Bengal is to remain united it will also be through them." ভাগ যদি হয়ও তবু কেন হিন্দুরা পূর্ববঙ্গ ত্যাগ কববে বা শিখবা ক্যাম্বেলপুর বা মুসলমানবা হিন্দুস্তান? তিনি শুধু বলতে পাবেন—অভীঃ। কংগ্রেস বলছে—দেশভাগ ছাড়া গতি নেই ; জিন্না বলছেন, ভাবতভাগ না কবে তিনি থামবেন না। "I say that nobody can cut me into pieces. Therefore nobody can cut India into pieces." জিন্না বলছেন, সংখ্যালঘুদেব প্রতি কোন অত্যাচার করা হবে না, তাদেব বিরুদ্ধে কোন পক্ষপাত দেখান হবে না—সবাই সমান ন্যায় পাবে। কিন্তু কেন তিনি পাঠানদেব বুঝিযে বলছেন না যে খুদাই খিদমদগাব, খান ভ্রাতৃদ্বয, হিন্দু, শিখ সবাই সুব্যবস্থা পাবে? "I shall only say that Mr. Jinnah carries a great responsibility...he has to reassure those who are in Pakistan and those whom he wants to be in Pakistan."[৪৫৪] সুরাবর্দির ক্রুদ্ধ চিঠিব উত্তবে তিনি লেখেন, তাঁর মতই দেশভাগেব বিরোধী তিনি, কিন্তু তা নাকচ করার ক্ষমতা তো সুবাবর্দিব হাতে—যদি সব মুসলিমবা তাঁব পেছনে থাকে আব হিন্দুদের তিনি জয় করতে পাবেন ("stoop to conquer the Hindus")[৪৫৫] অর্থাৎ পাকিস্তান হতে পাবে. বঙ্গও অবিভক্ত থাকতে পাবে কিন্তু সংখ্যালঘুদের বোঝানো এখন জিন্না-সুরাবর্দিদেব দায়িত্ব। ম্যাপে ভাগ হতে পারে কিন্তু হৃদয়ে যদি ভাগ না হয়, তবে দুঃখ কি? আর আমবা যদি সত্যি ন্যাযসঙ্গত মানবিক ব্যবহাব দেখাতে পারি, ভাঙা দেশ জোড়া লাগতে কতক্ষণ? চিবদিনেব ভগবদ্বিশ্বাসী ভেবেছিলেন, এ একরকমের পরীক্ষা—"He (God) wants to test us both to see what Pakistan will do and how generous India can be." এ পরীক্ষায় আমাদেব উত্তীর্ণ হতেই হবে।

হায়! জিন্না সীমান্তে যেতে রাজি হলেন,—পাঠানহৃদয় জয় করতে নয়, প্রচাব করতে, এবং শর্ত ছিল কংগ্রেস যেন কোনমতেই না বাধা দেয়। ভাবী পাকিস্তান থেকে নানা দুঃসংবাদ আসতে লাগল। ১৪ জুন, এই পশ্চাৎপটে, বসল এ. আই. সি সি-ব ঐতিহাসিক অধিবেশন। এখন তার একটা বড় দল নেতাদের সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করছে। মহাত্মাব উভয় সংকট। কি ভাবে, আপন বিচার ও বিবেকের আপত্তি ও নানা প্রতিশ্রুতিব পরিপ্রেক্ষিতে, ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুমোদন করবেন তিনি? আবাব কি ভাবেই বা, নেহরু-প্যাটেলের বিরোধিতা করে, দলের সংহতি রক্ষা করবেন? প্রথমটা তিনি বেছে নিলেন। ক্ষমতা হস্তান্তর দশমাস এগিয়ে এনে মাউন্টব্যাটেন তাঁর সামনে কোন বিকল্প রাখেন নি। ওয়ার্কিং কমিটির বিরুদ্ধে গেলে (১) নেতৃবর্গের পদত্যাগ কি সংকট ডেকে

আনত না ? (২) তাতে কি হিংসাত্মক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেয়ে গৃহযুদ্ধ শুরু হত না ? (৩) পাল্টা আন্দোলন চালাতে গেলে কি রকম সমর্থন পেতেন তিনি ? বাংলা,পঞ্জাব ও সীমান্তে গৃহযুদ্ধ তো চলছিলই, তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিত অন্য প্রদেশে। তাব সুযোগ নিত রাজন্যবর্গ। আর লীগ কাউন্সিলের ১০ জুনের প্রস্তাব পডলে মনে হয লীগ জিন্নাকে আরো দাবি তোলবার ক্ষমতা দিয়েছে।

এ. আই. সি. সি. ওযার্কিং কমিটিব বিরুদ্ধে গেলে তখনি লীগ জিন্নাকে দিযে গোলমাল পাকাত। ক্যাবিনেট মিশনের ক্ষেত্রে নেহরুর এক অসতর্ক উক্তিকে কি কাজে জিন্না লাগিয়েছিলেন তা তখনও সবাইকার মনে আছে। যা পাওয়া গেছে যথেষ্ট খারাপ, তা আবও খারাপ হবে। কম্যুনিস্টদের মতিগতিও তিনি বুঝতে পারছিলেন না। এতদিন পাকিস্তান দাবি সমর্থন করে হঠাৎ বলছে দেশভাগ ও ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস ব্রিটেনকে ভারত শোষণেব অধিকতর সুযোগ দেবে।[৪৫৬]

এ. আই. সি. সি. অধিবেশন বসল ১৪ জুন। গোবিন্দবল্লভ পন্থ ওযার্কিং কমিটি গৃহীত দেশভাগের প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। বললেন, আর কোনও উপায়ে যুনিযানেব ঐক্য ও শক্তিশালী কেন্দ্র রাখা যেত না। না গেলে অর্থনৈতিক উন্নয়নেব পথও রুদ্ধ হয়ে যেত। ক্যাবিনেট মিশনের পবিকল্পনার চেয়ে এ মীমাংসা শ্রেয়। তাতে কেন্দ্র হত দুর্বল এবং গ্রুপিং নিয়ে বাদবিসংবাদের ফলে কোনও গঠনমূলক কাজ করা সম্ভব হত না। আজাদ লিখছেন, এই হীন 'আত্মসমর্পণ' নীতির তিনি তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। বস্তুত তাঁব 'আত্মজীবনী' পড়লে মনে হবে গান্ধীজি সর্দার প্যাটেলেব পাল্লায পডে ২ এপ্রিল থেকে মাউন্টব্যাটেনের দিকে ঝোঁকেন।[৪৫৭] এবং সর্দারের বক্তব্যই প্রকাশ কবেছেন পন্থ। আজাদ তো আগেই সকলেব কাছে, বিশেষত মাউন্টব্যাটেনের কাছে, ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাবেব ওকালতি কবতে করতে ক্লান্ত হয়েছিলেন। তিনি গান্ধীজিকে পাটনা যাবাব আগে বলেছিলেন—ব্যাপারটা বেশ কিছুদিন পিছিযে দিলে হয়তো ভালো সমাধান বেরুবে। গান্ধী বিশেষ উৎসাহ দেখাননি। মাউন্টব্যাটেনের কাছেও একই আবেদন তিনি কবেন ১৪ মে, তাঁব বিলেত বওনা হওয়ার আগে। মাউন্টব্যাটেন বলেছিলেন, ক্যাবিনেটকে সব জানাবেন। আজাদ শঙ্কাপ্রকাশ করেছিলেন—দেশভাগ ব্যতিরেকে যেমন মারামাবি চলছে, একবার তা বাস্তবে পবিণত হলে রক্তপাতের সীমা থাকবে না। তখন নাকি বডলাট তাঁকে আশ্বস্ত কবেন "I am a soldier, not a civilian. Once partition is accepted in principle, I shall issue orders to see that there are no communal disturbances anywhere in the country...I shall order the Army and the Air Force to act and use tanks and aeroplanes to suppress anybody who wants to create trouble."[৪৫৮]

যাই হোক, আজাদ পন্থ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করলেন কিন্তু বিকল্প দেখাতে পারলেন না। "Partition was a tragedy for India and the only thing that could be said in its favour was that we had done our best to avoid division but we have failed. Now there was no alternative and if we wanted freedom here and now, we must submit to the demand for dividing India. We must not however forget that the nation is one and its cultural life is and will remain one." 'ভাগ হয়েছে মানচিত্রে,মানুষবে হৃদযে নয়'—এ তো গান্ধীর কথারই প্রতিধ্বনি। অর্থাৎ তিনিও আশা করছিলেন ভাগ হবে

সমর্থনে নেহরু বলেন, এ প্রস্তাব লীগের কাছে নতি স্বীকাব নয়। বহুদিন ধরে কংগ্রেস বলছে কোনও অঞ্চলকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর কবে য়ুনিয়ানে ধরে রাখা হবে না। প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ কবছে ব্রিটিশ সরকার, লীগ মন্ত্রীরা সব ব্যবস্থা ভেঙে ফেলছে, দেশ চলেছে মাৎস্যন্যায়ের দিকে। এখন দেশভাগ মেনে না নিলে এমন ব্যবস্থা ব্রিটেন চাপিযে দেবে যা সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামাব পৌনঃপুনিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে জাতীয প্রগতির পথ চিবতবে বন্ধ করে দেবে। প্যাটেল বলেন—অন্তর্বর্তী সবকারের তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে তাঁর দৃঢ় ধারণা ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান বাতিল হয়ে ভালই হয়েছে। এখন কংগ্রেসেব হাতে দেশেব ৭৫ থেকে ৮০% এসেছে। আগেকাব প্ল্যানে সব টুকবো হয়ে যেত, যা পাওয়া গেছে তাব উন্নয়ন তো সম্ভবই হত না। গান্ধীর এ মিটিং-এ আসাব ইচ্ছা ছিল না, কৃপালনিব বিশেষ অনুরোধে আর নেহরুর প্রতি অকৃত্রিম স্নেহবশত তিনি যোগ দেন।[৪৫৯] তিনি বললেন, ওয়ার্কিং কমিটি যা গ্রহণ করেছে তা এ. আই. সি. সি. প্রত্যাখ্যান কবতে পারে, কিন্তু পবিবর্তন করতে পাবে না। সিদ্ধান্ত ওযার্কিং কমিটি একা নেয়নি—কংগ্রেস, লীগ ও ব্রিটিশ সরকাবের ত্রিপাক্ষিক সিদ্ধান্ত এটা। পুবোপুবি প্রস্তাব সমর্থন না কবলেও ওযার্কিং কমিটির হাত বয়েছে এতে। তা প্রত্যাখ্যান কবা চরম দাযিত্বজ্ঞানহীনতাব পবিচাযক হবে। "If you are sure that your rejecting the scheme will not lead to further breach of the peace and further disorders you can do so." কংগ্রেসেব সংগঠন পদ্ধতি অনুযাযী এ. আই. সি. সি. ওয়ার্কিং কমিটিকে সবিয়ে দিযে আপন হাতে ক্ষমতা নিতে পাবে। কিন্তু তা প্রযোগ কবতে পাববে কি? "If you had it I would also be with you and if I felt strong enough myself I would alone, take up the flag of revolt. But to-day I do not see the conditions for doing so." অর্থাৎ যদি এ. আই. সি. সি.-ব বিদ্রোহ কবার ইচ্ছা ও শক্তি থাকত, এমন কি গান্ধীর একাব সে শক্তি থাকত, তিনি বিদ্রোহ কবতেন। দুর্ভাগ্য, উভয়েব কারুর তা দেখা যাচ্ছে না। যদি আজ কংগ্রেসী মন্ত্রীবা পদত্যাগ কবেন সবকাব চালাবে কে? "Shall I become a Nehru or a Sardar or a Rajendra Prasad?" যদি তাঁকেও ক্ষমতা দেওয়া হয়, কি কববেন তিনি? এই দুঃসমযে নীরবে অসহনীয দুঃখ সহ্য কবতে হবে। আব প্রচণ্ড মন্দেব মধ্য থেকে যেটুকু ভাল তা ছেঁকে নিতে হবে। সমস্ত পৃথিবী তাকিযে বযেছে। যদি ভাবতেব হিন্দুবা প্রকৃত উদাবতা দেখাতে পারে, তবে পৃথিবী তাদেব বাহবা দেবে। যদি না পারে, তবে তো জিন্নার বক্তব্যই প্রমাণিত হবে—যে হিন্দু-মুসলমান দুই আলাদা জাতি, যে হিন্দুবা চিবদিন হিন্দু থাকবে, মুসলিমবা মুসলিম, কোনও দিন তাবা মিলবে না, তাদেব ঈশ্বব আলাদা। যদি বর্তমান সভায় উপস্থিত হিন্দুবা মনে করে ভারত তাদের দেশ, এবং সেখানে হিন্দুবা উচ্চতব স্তবেব সুবিধা ভোগ কববে, তবে তো ওযার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত ভুল হয়নি, সকলেই তো মনে মনে তা চেযেছিল।[৪৬০]

এ. আই. সি. সি. প্রস্তাবে তাঁব আশাহীন আশা প্রকাশ পেল · "The AICC earnestly trusts that when the present passions have subsided, India's problems will be viewed in their proper perspective and the false doctrine of two nations in India will be discredited and discarded by all."

তবু আপত্তি উঠেছিল জাতীয়তাবাদী মুসলিম ও ভাবী পাকিস্তানের সংখ্যালঘু হিন্দু

প্রতিনিধিদের কাছ থেকে। পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন ছিলেন সবচেয়ে উচ্চকণ্ঠ হিন্দু প্রতিবাদী। ট্যাণ্ডন বলেন, এ সিদ্ধান্ত দুর্বলতা ও হতাশার প্রকাশ। এতে পাকিস্তানের হিন্দু ও ভারতের মুসলিম—কারুর ভাল হবে না। কংগ্রেস সভাপতি কৃপালনির ভাষণ হৃদয়-বিদারক। ভয়ের অপবাদ মেনে নিয়ে তিনি বললেন, "কিন্তু সে ভয় জীবনহানি বা বিধবার ক্রন্দন বা অনাথের আর্তনাদ বা ব্যাপক গৃহদাহ লুঠপাটের ভয় নয়। ভয় এই যে যদি এভাবে আমরা চলি, পরস্পরের অন্যায়ের বদলা নিই, অহোরাত্র গঞ্জনার ওতোর চাপান চলে, তবে ক্রমশ আমরা নরখাদক কি তার চেয়েও ভয়াবহ পর্যায়ে পৌঁছব। প্রত্যেক নতুন সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে পূর্বেকার সংঘর্ষের সর্বাধিক ঘৃণ্য কাজ স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়াবে। মনুষ্যত্বের এই সার্বিক অবমূল্যায়ন কি আমাদের অভিপ্রেত?" আজো এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। যাঁরা সেদিনের রক্তপিচ্ছিল পথে চলেননি, আত্মার সেই ঘনান্ধকারে দিন কাটাননি, তাঁরা সহজে কংগ্রেসকে, গান্ধীকে, অভিযুক্ত করতে পারেন। কিন্তু সেটাই ইতিহাস হবে না। ১৫ জুন পন্থ প্রস্তাবের ওপর ভোট হল—পক্ষে পড়ল ১৫৭ ভোট, বিপক্ষে ২৯। ৩২ জন থাকলেন নিরপেক্ষ। বর্তমান লেখকের জিজ্ঞাস্য, যাঁরা গান্ধীকে বিদ্রোহের নেতারূপে দেখতে না পেয়ে তাঁকে অপবাদ দেন, তাঁরা কি বলতে চান, এই ২৯ জনকে নিয়ে তিনি বিদ্রোহ সফল করতে পারতেন? ৩২ জন নিরপেক্ষকে যোগ দিলেও তো ৬১ জনের বেশি সমর্থক তাঁর জুটত না।

১৫ জুন প্রার্থনান্তিক সভায় তিনি যেন নিজেকেই প্রশ্ন করেন, "যদি আমার মনে হয় ভারত ভ্রান্ত পথ অনুসরণ করছে, তা হলে কেন আমি ভ্রান্ত লোকদের সহযোগিতা করছি? কেন আমি নিজের পথে এই বিশ্বাস নিয়ে চলছি না যে একদিন সহকর্মীরা আমার পথেই ফিরে আসবে?" যেন নিজেকেই উত্তর দেন তিনি "আমার বিশ্বাস ও ধর্ম আগের মতই রয়েছে। দুর্বল হয়নি তা। হয়তো আমার উপায়ে কোন ভুল ছিল।" পরের দিন যখন ট্যাণ্ডন বললেন, সকলের অস্ত্র নিয়ে চলাফেরা করা উচিত, তিনি বলেন, "একদিন ছিল যখন গান্ধীর কথা সবাই শুনত, কারণ গান্ধী ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করার পথ বাতলে দিতে পেরেছিলেন। সে পথ অহিংসার। আজ বলছে সবাই, গান্ধী পথ দেখাতে পারছেন না—অস্ত্র হাতে নিতে হবে আত্মরক্ষার জন্য। তা হলে বলতে হয় গত ত্রিশ বছরের অহিংস আন্দোলন বৃথা হয়েছে। কিন্তু আমাদের অহিংসা ছিল ক্লীবের অহিংসা। বীরের অহিংসার বাণী যদি হিন্দুরা শোনে তা হলে সব অস্ত্র সমুদ্রে ফেলে দেবে। যদি প্রতিহিংসার পথ নেওয়া হয় ইসলামের সঙ্গে হিন্দুধর্মও বিনষ্ট হবে।"

একহাতে তিনি হিন্দুদের প্রতিশোধস্পৃহা প্রশমন করছিলেন অন্য হাতে সীমান্তে গণভোট নিয়ে লড়াই। ১৭ জুন বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে আবার তিনি জিন্নাকে সীমান্তে যেতে অনুরোধ করেছিলেন। বড়লাট তখনি জিন্নাকে ডেকে আনেন। গান্ধী গফফর খানের উপস্থিতিও চান। পরের দিন তিনি জিন্নার সঙ্গে দেখা করেন। বাদশা খানরা চাইছিলেন গণভোট বন্ধ করতে। কিছুকাল পাঠানদের স্বাধীন থাকতে দেওয়া হোক। ভারত বা পাকিস্তানে যোগদানের সিদ্ধান্ত পরে নিলে ভাল হয়। না হলে প্রচণ্ড রক্তপাত অনিবার্য। গান্ধীর সমাধান ছিল—ভারত ও পাকিস্তান যদি অন্তর্ভুক্ত প্রদেশদের পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনাধিকার দেয় তবে গণভোট নেবার প্রয়োজন হবে না। যদি গণভোট নিতেই হয় তবে পাখতুনিস্তানকেও তৃতীয় বিকল্প রাখা হোক। জিন্না অবশ্যই রাজি হন না।

সীমান্ত কংগ্রেসের আপত্তির দুটো কারণ (১) পঞ্জাব থেকে বহু লীগপন্থী সীমান্তে ঢুকে পড়েছে, (২) অমুসলিম শরণার্থীদের ভোট দেবার অধিকার দেওয়া হচ্ছে না। ওলাফ

ক্যারোর উপস্থিতিও একটা আপত্তির কারণ। গান্ধীর সঙ্গে বড়লাটের আবার মতদ্বৈধ হয়।[৪৬১] বড়লাট বলেন,'fair play'র চেয়েও 'sheer expediency-র জন্য গণভোট নিতে হবে। কংগ্রেস যদি সহায়তা না করে জিন্না বিশ্বকে জানাবেন যে ৩ জুনের ঘোষণা কংগ্রেস আন্তরিকভাবে মেনে নেয়নি। **"He had told Gandhi that it would be foolish of Congress to give Jinnah any excuse for not being ready to take over power on 15th August."**[৪৬২] শেষ পর্যন্ত বড়লাট ক্যারোকে সরিয়ে নেন ও লকহার্টের সামরিক শাসন প্রবর্তন করেন। তবু সীমান্ত কংগ্রেস গণভোট বর্জন করে। বড়লাট কংগ্রেসের প্রচারে আপত্তি জানালে গান্ধী ৫ জুলাই বাদশা খাঁকে লেখেন, ভোটের সময় **"There should be no fuss, no procession, no disobedience of any orders from authority."** অর্থাৎ অন্যের ভোটদানে বাধা দেওয়া চলবে না।[৪৬৩]

ওয়ালি খান বলছেন ভোটে প্রচণ্ড রিগিং হয়।[৪৬৪]

ভোটের ফলাফল নিম্নরূপ

মোট ভোটদাতা	৫,৭২,৭৯৯
গৃহীত ভোট	২,৯২,১১৮
পাকিস্তানের পক্ষে	২,৮৯,২৪৪
ভারতের পক্ষে	২,৮৭৪

আমার ধারণা সীমান্ত কংগ্রেসের গণভোটে অংশ গ্রহণ করা উচিত ছিল। এত প্রচার, ভীতিপ্রদর্শন, রিগিং সত্ত্বেও পাকিস্তানী দল মোট ভোটের ৫০.৫%-এর বেশি পায়নি। ইংরেজদের কারসাজি ভোলাও ঠিক হবে না। গণভোট নেওয়া হয় মাত্র ৬টি জেলায় ও সীমান্ত সংলগ্ন ৬টি এজেন্সি অঞ্চলে। সোয়াট, দির, চিত্রল ও ছাম্ব এলাকা বাদ পড়ে। ওল্যাফ ক্যারোকেও শেষ মুহূর্তে সরান হয়েছিল। জিন্না তখনি বড়লাটকে বলেন খানসাহেবের মন্ত্রীসভা বরখাস্ত করতে। বড়লাট অতদূর যাননি। ওয়ালি খান স্বীকার করেছেন, তাঁদের এক চাল চালা উচিত ছিল। তাঁরা যদি সীমান্ত আইন পরিষদে পাখতুনিস্তান প্রস্তাব পাশ করে ভারতীয় গণপরিষদে যোগদানের জন্য আবেদন জানাতেন এবং ভারত তা গ্রহণ করত তাহলে অভিনব পরিস্থিতি সৃষ্টি হত।

সীমান্ত ও পঞ্জাব থেকে শরণার্থীর দল আসতে শুরু করেছিল। কিন্তু তার চেয়েও [illegible] বড়ো সমস্যা—দেশীয় রাজ্য। ১৯৪৭-এর ২ মার্চ কংগ্রেস রাজাদের গণপরিষদে যোগদানের জন্য আপোস করেছিলেন—রাজাদের অর্ধেক সদস্য মনোনয়নের অধিকার দিয়ে। জয়প্রকাশ আপত্তি করেন। ২ মে ইজমে যে প্ল্যান নিয়ে যান তাতে ছিল প্যারামাউন্টসির অবসানের পর সব ক্ষমতা রাজ্যে ফিরে যাবে এবং তারা উভয় উত্তরাধিকারীর সঙ্গে ইচ্ছামত চুক্তি করবে। ২৪ মে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট স্থির করে ক্রাউনের সঙ্গে রাজাদের সম্পর্ক চলবে দুই রাষ্ট্রের গভর্নর জেনারেলের মাধ্যমে। ৪ জুনের সাংবাদিক সম্মেলনে বড়লাট শুধু একটি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন—তারা কমনওয়েলথের সদস্য হতে পারবে না। কিন্তু ঐদিনই ভোপালের নবাব জানান তিনি স্বাধীন থাকতে চান। অন্যরাও যদি তাই চায় ও ইচ্ছামত ভারত বা পাকিস্তানে যোগ দেয়? গান্ধী ৪ এপ্রিল বলেছেন, দেশীয় রাজ্য ইংরেজদের সৃষ্টি। অতএব তারা চলে গেলে প্যারামাউন্টসি বর্তাবে কেন্দ্রীয় সরকারে। আমরা দেখেছি ১০ মে বাল্কানাইজেশনের সম্ভাবনা নেহরুকে কিরূপ উত্তেজিত করেছিল। ২৪ মে-র

ক্যাবিনেট সিদ্ধান্তে ও ৩ জুনের ঘোষণায় দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে ব্যাপারটা পবিষ্কার না হওয়ায় কংগ্রেসের উদ্বেগ বেড়েছিল। নেহরু ও গান্ধী বিশেষ চিন্তিত হয়েছিলেন কাশ্মীরের মহারাজা হরি সিং-এর আচরণে। আগেব বছর নেহরু কাশ্মীর গেলে তাঁকে বন্দী করা হয। কাশ্মীর প্রজা পরিষদের নেতা, শেখ আবদুল্লা তো এখনও কাবারুদ্ধ। অন্যদিকে ভোপাল স্বাধীন হবে বলছে। হায়দ্রাবাদের নিজাম তার জন্য তৈবি হচ্ছেন। ১৩ জুন শোনা গেল ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান (রামস্বামী আযার) প্রজা পরিষদের সভা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন এবং স্বাধীনতা অপছন্দ হলে প্রজাদের দেশ ত্যাগ করতে বলেছেন। ১৪ জুন গান্ধী দেওয়ানের তাব পেলেন যে ত্রিবাঙ্কুর স্বাধীন হবে।[৪৬৫] উত্তেজিত গান্ধী বললেন, "বাজাবা ব্রিটিশদের দাস ছিল। এখন যখন ব্রিটিশ বাজত্বের অবসান ঘটছে, জনসাধাবণেব হাতে ক্ষমতা আসছে, কোন রাজা যদি বলে সে চিবদিন স্বাধীন ছিল ও ভবিষ্যতে থাকবে—তবে সেটা অত্যন্ত ভুল হবে, অশোভন হবে।"[৪৬৬] রাজাবা থাকবে প্রজাব সেবকরূপে। আব তাদেব উচিত এখনি গণপরিষদে নির্বাচিত প্রতিনিধি পাঠানো। ১৫ জুন এ আই সি সি প্রস্তাব নিল—"The AICC cannot admit the right of any State in India to declare its independence to live in isolation from the rest of India."

এর আগেই ৯ জুন নেহরুপলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্ট তুলে দিতে চেযেছিলেন। ১০ জুন নেহরু, প্যাটেল, কৃপালনিব সঙ্গে বড়লাটেব কথা হয। বড়লাট বলেন, নতুন প্ল্যান তো ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান থেকে আলাদা, এতে কেন্দ্র শক্তিশালী হচ্ছে—সেজন্য বাজাবা ভয পাচ্ছেন। প্যাটেল বলেন, বাজাদের সম্মতিক্রমেই কেন্দ্র শক্তিশালী হতে পাবে। বাজ্যে কোন গণতান্ত্রিক সরকাব স্থাপিত হযনি এই মন্তব্যে বড়লাট আপত্তি কবলে, নেহরু তীব্র ভাষায বলেন, "প্রজাদেব অনুমতি না নিযে গণপবিষদে যোগ দেবার বা না দেবাব ক্ষমতা রাজাদের নেই। যে সব বাজা আমাদেব বিরোধিতা কববে, তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হলে, আমি উৎসাহ দেব।"[৪৬৭] নেহরুব ধারণা ছিল ভাবত সবকাবের রাজনৈতিক দফতব ও বড়লাটেব রাজনৈতিক উপদেষ্টা, কবফিল্ড, বাজাদেব নানা কথা বোঝাচ্ছেন। তিনি তাঁর (Corfield-এর) বিরুদ্ধে বিচারবিভাগীয় তদন্ত দাবি কবলেন। অন্যদিকে করফিল্ডেব সমর্থনে এগিযে এলেন জিন্না। তাঁর মতে রাজাবা যে কোন গণপবিষদে যোগ দিতে পারেন, না-ও পারেন। তিনি জানতেন অধিকাংশ বাজ্যই ভাবত সংলগ্ন এবং তাবা স্বাধীনতা ঘোষণা করলে ভাবত বিপদে পড়বে। হায়দ্রাবাদ ও ভোপাল স্বাধীন থাকলে তাবাই হবে পাকিস্তানের Trojan horse. ভি পি মেননের মতে করফিল্ড ভোপালকে উস্কাচ্ছিলেন।

বড়লাট বোঝেন কংগ্রেস এ ব্যাপারে অনমনীয় থাকবে। তাই তিনি নেহরুব দাবি অনুযাযী রাজনৈতিক দফতর তুলে দিয়ে তার স্থানে বাজ্য দফতর স্থাপন কবলেন। প্যাটেল এই দফতরের মন্ত্রী হলে বড়লাট খুশি হন। আবও খুশি হন ভি পি মেনন তাঁব সচিব হলে।[৪৬৮] বড়লাট অবশ্য তার আগেই নিজামের পরামর্শদাতা (মংকটন) ও ভোপালের পরামর্শদাতা (জাফরুল্লা খান)-এব সঙ্গে আলোচনা করে নিয়েছিলেন। তিনি সদ্য ফিরে এসেছেন কাশ্মীব থেকে। আসল আলোচনাব সময় পেট ব্যথা বলে হরি সিং শুয়ে থাকলেন, দেখা কবলেন না।

অল্পবিস্তর ৫৬২টি দেশীয় বাজ্য ভারতীয় যুনিয়ানের অন্তর্ভুক্ত করার কৃতিত্ব প্রধানত সর্দার প্যাটেলের। এ নিয়ে ভি পি মেননের The Integration of the Princely States গ্রন্থটি আত্মস্তুতিতে পূর্ণ হলেও প্রামাণ্য। লেনার্ড মসলের The Last Days of the British Rajও পড়া উচিত। সবশেষ আলোচনা করেছেন জে ম্যানর, The

Demise of the Princely Order প্রবন্ধে।[৪৬৮ক] মেননের পবামর্শে, খুঁটিনাটিতে জড়িয়ে না পড়ে, প্যাটেল বাজাদের তিনটি বিষয়ে—প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ—য়ুনিয়ানে যোগ দিতে আহ্বান জানান।[৪৬৯] তিনি বাজাদেব ভালো কবে বুঝিয়ে দেন যে প্রজাবিদ্রোহ শুরু হলে ভাবত সরকাবেব ওপব নির্ভব কবা ছাড়া তাদেব গত্যন্তব নেই। প্যাবামাউন্টসি অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাদের নানা সুবিধে (privilege) চলে যাবে। আরও কৌশলে মেনন বড়লাটকে বাজি কবান ভাবতেব হয়ে বাজাদেব সঙ্গে আলোচনা চালাতে। ক্যাম্বেল জনসন লিখছেন, "As with his diplomacy prior to June 3 plan, he (Viceroy) took a calculated risk and is personally sponsoring the Instrument of Accesion and undertaking to get all the Princes into this particular bag, while V.P. (Menon) sold the project to the Congress. He embarked with the assurance of Patel's decisive support." ব্যাপাবটা কবফিল্ডেব আদৌ পছন্দ হযনি।

২৫ জুলাই রাজাদেব সঙ্গে বডলাটেব সভা হল এবং তাতে তিনি সবটুকু মোহিনী মাযা প্রয়োগ করলেন। ১৬ জুলাই লর্ডস সভায বক্তৃতায ভাবত সচিব লিস্টোয়েল বাজাদেব বলেছিলেন, তারা যে কোন ডোমিনিয়ানে যোগ দিতে পারে বা আলাদা থাকতে পাবে। পেছনে ছিল হোবেব চাপ। মাউন্টব্যাটেন কিন্তু বাজাদেব বোঝালেন যে কংগ্রেস এখন যে প্রস্তাব দিচ্ছে আব তা দেবে না। যদি তাঁরা গ্রহণ কবেন তবে খেতাব, সম্মান, সুবিধা সবই বজায় থাকবে। তিনটি বিষযে ছাড়া কোন বিষযে শাসনাধিকাব ছাডতে হবে না। কোন আর্থিক দায়িত্বও চাপানো হবে না।[৪৭০]

একে একে বাজারা যোগ দিলেন। দিল না শুধু কাশ্মীব, হায়দ্রাবাদ, ত্রিবাঙ্কুব, মহীশূর, ভোপাল, যোধপুর, জুনাগড প্রভৃতি কিছু বড রাজ্য। ত্রিবাঙ্কুরের দেওযানকে মেনন বললেন, "যোগ তো দিচ্ছেন না, যদি আপনাব রাজ্যেব কম্যুনিস্টবা বিদ্রোহ কবে?" বামস্বামী আয়ার এক অজ্ঞাত আততায়ী দ্বাবা ছুরিকাহত হযে ব্যাপাবটাব গুরুত্ব বুঝলেন। সই কবল ত্রিবাঙ্কুব। যোধপুব আগে জিন্নাব সঙ্গে দহবম মহবম কবছিলেন। তাঁকে যেভাবে মেনন ভারতে আনেন তা রোমাঞ্চকব। বডলাট সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষেব ভয দেখালে মহারাজা বলেন, "জিন্না আমাকে সাদা চেক দিযেছেন, আপনি কি দেবেন?" মেনন বলেন, "আমিও দেব। কিন্তু ওটার মতই তাতে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি থাকবে।" বডলাট চলে গেলে হঠাৎ মহারাজা বিভলভার তাক কবলেন মেননের দিকে। মেনন বললেন, "এব দ্বারা বেশি পাবার আশা করবেন না, ছেলেমানুষী থিযেটাবী ঢং ছাড়ুন।" বডলাট শুনে বললেন, "পরিহাসের সময় নয়। সই দেবার কি হল?" এরপব অনেক মজাব ঘটনা ঘটল কিন্তু অবশেষে মিলল যোধপুরের সই।[৪৭১] সব দেখে ভোপালেব নবাব ভদ্র ভাবেই যোগদান করেন। জুনাগড়ের প্রায় ৯০% প্রজা হিন্দু। তার অবস্থান পাকিস্তান থেকে ২৪০ মাইল দূরে। অথচ তিনি পাকিস্তানে যোগ দিতে চাইলেন, শুধু বিকৃতমস্তিষ্ক বলে। স্বাধীনতার পরও মাউন্টব্যাটেন নিজামের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছিলেন। কবফিল্ডেব অনুগামীদেব পরামর্শে, ব্রিটিশ বন্ধুদেব সাহায্য প্রত্যাশা কবে সই দেননি নিজাম। জিন্না বডলাটকে ভয় দেখিয়েছিলেন যে চাপ দিলে ভাবতেব প্রতিটি মুসলমান বিদ্রোহ কববে।[৪৭২] মংকটন নিজামকে নানা ছুট আইনের কৌশল দেখাচ্ছিলেন।[৪৭৩] তিনি মেনন-প্যাটেলের চাপকে হিটলারের চাপের সঙ্গে তুলনাও করেছেন। শেষে দু মাসের জন্য আলোচনা পেছনো হয়। তাতেও কাজ হয়নি। মাউন্টব্যাটেন দেশে রওনা হবার দুদিন পবে নিজাম বলেন, তিনি

মাউন্টব্যাটেন প্ল্যান নিতে রাজি।

হরি সিং-এর সঙ্গে দেখা না হওয়ায় কাশ্মীরের ব্যাপারে ব্যর্থ হয়ে ফিরেছিলেন বড়লাট। এর ফল বিষময় হয়েছিল এবং আজও তা আমরা ভোগ করছি। ১৯৪৭-এর অক্টোবরের শেষে উত্যক্ত জিন্না পাঠান উপজাতিদের কাশ্মীরের ওপর লেলিয়ে দেন। মহারাজার ভারতের কাছে আবেদন ব্যতীত উপায় ছিল না। মাউন্টব্যাটেন মনে করতেন কাশ্মীরের পাকিস্তানে যোগদান করা উচিত (যেমন হায়দ্রাবাদ ভারতে)। না হয় ভাগাভাগি হওয়া উচিত। ভারতে থাকবে জম্মুর হিন্দুরা, পাকিস্তানে যাবে কাশ্মীর উপত্যকার মুসলিমরা। মুশকিল হল নেহরুকে নিয়ে। সমস্ত কাশ্মীরি আবেগ দিয়ে তিনি কাশ্মীরকে ভারতে রাখতে চেয়েছিলেন। তাঁর বন্ধু শেখ আবদুল্লা জেলে, দেশময় বিভ্রান্তি, মহারাজার মতিগতি ভাল নয়। নেহরু চাইলেন কাশ্মীর যেতে। প্যাটেল জানতেন এর পরিণতি হবে কাশ্মীরের জেলে। তাই চেষ্টা করলেন নেহরুকে বাধা দিতে। বড়লাটের রিপোর্টে পাচ্ছি—"নেহরু ভেঙে পড়লেন, কেঁদে ফেললেন, বললেন— Kashmir meant more to him at the moment than anywhere else."[৪৭৪] এরপরই বড়লাট ঠিক করলেন নিজে যাবেন। প্যাটেল বলেন, মহারাজ যদি পাকিস্তানে যোগ দেন তিনি আপত্তি করবেন না।[৪৭৫] মহারাজ তো আসলে পাকিস্তানেও যোগ দিতে চাননি। তাই এড়িয়ে যান পেটের ব্যথা হচ্ছে বলে।[৪৭৬] মন্দের ভাল—স্বাধীনতার পূর্বে তিনি কোন ডোমিনিয়ানে যোগ দেননি। যদি মাউন্টব্যাটেন জানতেন অক্টোবরে কি ঘটবে হয়তো বেশি জোর প্রয়োগ করতেন। যাই হোক, হডসনের একথা সত্য যে "Against all the probabilities the overwhelming majority of States had joined the new dominions and the constitutional chaos and insurrectionary violence that might have followed the total lapse of paramountcy had been averted."[৪৭৭] চৌধুরী মহম্মদ আলি বড়লাটকে দোষ দিয়েছেন এতগুলি মেষকে কসাইখানায় নিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু রাজা ষষ্ঠ জর্জ অনেক বেশি সাধারণ বুদ্ধি ধরতেন। ১৩ আগস্ট তিনি মন্তব্য করেছিলেন, "আমি খুশি হয়েছি যে (প্রায়) সব রাজা দুটোর একটা ডোমিনিয়ানে যোগ দিয়েছে। They could never have stood alone in the world"[৪৭৮] প্রায় সব—তিন রাজ্য ছাড়া। জুনাগড়, হায়দ্রাবাদ ও কাশ্মীর। ১৯৪৭-এর ১ নভেম্বরে ভারতীয় সৈন্য জুনাগড়ে প্রবেশ করল। ১৯৪৮-এর ১৩ সেপ্টেম্বর হায়দ্রাবাদে। ১৯৪৭ অক্টোবরের শেষে পাঠান উপজাতির আক্রমণের ভীত হরি সিং ভারতে যোগদান করলেন।[৪৭৯] প্রথম দুটো রাজ্য নিয়ে বেশি কিছু গোলমাল হল না। শেষেরটা আজও উপমহাদেশের শান্তি বিঘ্নিত করছে।

॥ ১৫ ॥

বাজপথে ছিন্ন শব, ভগ্নদ্বাব প্রাসাদে-কুটিবে
নির্জন বীভৎস শান্তি। দলভ্রষ্ট আহত অশ্বেব
চকিত খুবেব শব্দ, মুমূর্ষুর আর্তকণ্ঠ, ফেব
ভৌতিক স্বব্ধতা। শূন্য মসজিদেব গম্বুজে খিলানে
বাত্রিব নিঃসঙ্গ ছায়া নামে। প্রাণ-যমুনাব তীবে
মৃত্যুব উৎসব সাঙ্গ, বিহঙ্গ-হৃদয ছিন্নপাখা।
নগবে গ্রামে ও গঞ্জে মস্‌জিদে মন্দিবে সর্বখানে
দুবন্ত তাতাব দস্যু তৈমুবেব পদচিহ্ন আঁকা।
(নীবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, তৈমুব)

সন্ধ্যায স্বাধীনতার দীপ জ্বালাবাব জন্য সকালেব সলতে পাকানো চলছিল। একদিকে পার্লামেন্টে পেশ কবাব জন্য বচিত হচ্ছিল 'ভাবতেব স্বাধীনতা বিল', অন্যদিকে বাংলা ও পঞ্জাব ভাগ, সিলেট ও সীমান্তে গণভোট, প্রশাসনিক ও সৈন্যবাহিনী ভাগেব আযোজন।

২০ জুন বাংলাব প্রাদেশিক আইনসভা ১২৬-৯০ ভোটে স্থিব কবল নতুন গণপবিষদে যোগ দেবে। তাবপব অমুসলিম এলাকাব সদস্যবা মিলিত হযে ৫৮-২১ ভোটে দেশভাগ এবং বর্তমান গণপরিষদে যোগদানেব সিদ্ধান্ত নিলেন। তেমনি মুসলিম এলাকাব সদস্যগণ ১০৬-৩৫ ভোটে দেশভাগেব বিরুদ্ধে এবং নতুন গণপবিষদে যোগদানেব সিদ্ধান্ত নিলেন। জুলাই মাসে সিলেটেব জনমত যাচাই হল এবং ২,৩৯,৬১৯-১,৮৪,০৪১ ভোটে তা পূর্ব পাকিস্তানে যোগ দিতে চাইল। পঞ্জাবেব আইন পবিষদ ৯১-৭৭ ভোটে নতুন গণপবিষদে যোগদান স্থির করে। পবে মুসলিম এলাকাব সদস্যগণ ৬৯-২৭ ভোটে দেশভাগেব বিবোধিতা কবেন ও অমুসলিম এলাকাব সদস্যগণ ৫০-২২ ভোটে দেশভাগেব পক্ষে ও বর্তমান গণপবিষদে যোগদানেব সিদ্ধান্ত নেন। সিন্ধুব আইন পরিষদ ৩০-২০ ভোটে নতুন গণপরিষদে যোগ দিতে চায়। বালুচিস্তানের সাহী জিবগা ও কোযেটা মিউনিসিপ্যালিটিব সদস্যগণ তাই চান। সীমান্তে কি হল আগেই দেখেছি। মোটেব ওপব পূর্ববঙ্গ, সিলেট, পশ্চিম পঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত পাকিস্তানেব পক্ষে গেল।

অ্যাটলি ৪ জুলাই ভাবতীয স্বাধীনতা বিল কমন্স সভায় পেশ কবলেন। দুই ডোমিনিয়ানেব একটির নাম হল ইণ্ডিযা, অন্যটির পাকিস্তান। লর্ডস সভায় যখন উক্ত বিল এল তখন লর্ড স্যামুয়েল ম্যাকবেথ থেকে আবৃত্তি করলেন—

Nothing in his life became
him like the leaving of it...

আর ভারতবর্ষে সর্দাব বল্লভভাই যেন প্রতিধ্বনি তুললেন, "it is one of the greatest acts done in history by any power." ১৮ জুলাই বাজা ষষ্ঠ জর্জেব স্বাক্ষর করার সঙ্গে সঙ্গে বিল আইনে পবিণত হল। পরের দিন ভাবত ও পাকিস্তানেব দুই অস্থাযী সরকারও ঘোষিত হল। নেহরু মাউণ্টব্যাটেনকে গভর্নব জেনাবেল হিসাবে থেকে যাবার অনুরোধ করেছিলেন আগেই। বডলাট খুব আশা কবেছিলেন জিন্নাও অনুরূপ অনুরোধ জানাবেন। ব্রিটিশ সরকারও তাই। ক্যাম্বেল জনসন স্বীকাব কবেছেন,

"Farthest from our thoughts was what has in fact happened—Jinnah's self-selection..." এক গভর্নব জেনাবেল ও যুক্ত প্রতিরক্ষা পরিষদ হলে ক্ষমতা হস্তান্তব, বাজন্যদেব যোগদান, বাহিনী ভাগ, সম্পদ ভাগ—অনেক ব্যাপাবে সুবিধা হত। কিন্তু মুসলমানদেব ভয় ছিল যে বৃহত্তর প্রতিবেশীব কথা বেশি শুনবেন এক বডলাট। প্রথমাবধি জিন্নাব ধারণা ছিল বড়লাটকে পকেটে পুরেছেন পণ্ডিত নেহরু। আব জিন্নাব অহংবোধও এতে তৃপ্ত হত না। ২৩ জুন কথাটা জিন্নার কাছে পাডা হয়। উত্তর আসে ২ জুলাই যে জিন্না নিজে পাকিস্তানেব গভর্নব জেনাবেল হবেন। এরপবও বডলাটেব স্টাফ মিটিং-এ আলোচনা হয়েছিল কি ভাবে তিনি দুই ডোমিনিযানেব গভর্নব জেনাবেল থাকতে পারেন অথচ জিন্নাব অহমিকা তৃপ্ত হয়। ভোপালেব নবাবকে পাঠান হয দূতরূপে। ৫ জুলাই লিযাকতের উত্তব সকল প্রশ্নেব ওপব যবনিকা টেনে দেয। আবাব স্টাফ মিটিং বসে। কিন্তু ইজমে বলেন, মাউণ্টব্যাটেন যদি ভাবতেব উপহাব প্রত্যাখ্যান কবেন—"The one stable element in India, namely the Indian army, will disintegrate. Riot and appalling bloodshed would result." তাছাডা এব ফলে নতুন ডোমিনিযানদের সম্প্রীতি ক্ষুণ্ণ হবে, ভাবতেব শান্তি বিঘ্নিত হবে, রাজন্যবর্গেব সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনে বাধা আসবে, বিলেতে টোবী প্রতিপক্ষ সোচ্চাব হবে। প্যাট্রিসিয়াকে লেখা চিঠি বডলাটেব দ্বিধাব নিদর্শন।[৪৮০] ৭ জুলাই প্রস্তাব নিযে বিলেত যান ইজমে এবং স্বযং চার্চিল মাউণ্টব্যাটেনকে ভাবতেব গভর্নব জেনাবেল রূপে থেকে যেতে বলেন।[৪৮১]

অন্তর্বর্তীকালে লীগ মন্ত্রীদেব দফতব প্রত্যাহার কবে নিযে কংগ্রেসেব মন্ত্রীদেব হাতে দেওযা হল এবং পাকিস্তান সংক্রান্ত অনুরূপ মন্ত্রক গেল লীগ মন্ত্রীদেব হাতে। যেগুলিতে উভযেব স্বার্থজডিত তা যৌথভাবে নির্ধাবিত হতে লাগল মাউণ্টব্যাটেনেব সভাপতিত্বে। আমলাদেব মধ্যে ভাগ হল। বিভক্ত বাংলা ও পঞ্জাবেও তাই। তদাবকির জন্য একটা পার্টিশন কাউন্সিল গঠিত হল। তাতে কংগ্রেসেব পক্ষে বইলেন প্যাটেল ও বাজেন্দ্র প্রসাদ (অন্যথায বাজাজি), লীগেব পক্ষে জিন্না ও লিযাকৎ (অন্যথায নিস্তাব)। উক্ত কাউন্সিল এইচ এম প্যাটেল ও চৌধুবী মোহম্মদ আলিকে নিযে গঠিত এক স্টীযাবিং কমিটিব মাধ্যমে কাজ কবত। মতবিবোধ এডাতে এক সালিশী ট্রাইব্যুনাল গঠিত হল—যাব সভাপতি হলেন ভাবতেব প্রাক্তন প্রধান বিচাবপতি প্যাট্রিক স্পেন্স, সদস্য—উভয দেশেব এক একজন।

ভাবত ও পাকিস্তান ১৫ আগস্টের পূর্বেই সৈন্যবাহিনীব বিভাজন চাইল। প্রথম প্রশ্ন—ভাগ হবে কোন ভিত্তিতে—সাম্প্রদাযিক না ভৌগোলিক? মোটামুটি প্রথমটাই গৃহীত হল। যুগ্ম প্রতিবক্ষা কাউন্সিলেব সভাপতি—মাউণ্টব্যাটেনেব নির্দেশে, প্রধান সেনাপতি—অকিনলেকেব তত্ত্বাবধানে, তাব কাজ চলতে থাকে। প্রধানত প্যাটেলের বিরোধিতাব ফলে বছবেব শেষে অকিনলেককে বিদায নিতে হয। ১৯৪৮-এব ১ এপ্রিল পর্যন্ত সৈন্যভাগ চলেছিল। ব্রিটিশ সৈন্য অপসাবণ শুরু হয ১৯৪৭-এব ১৭ আগস্ট, সমাপ্ত হয় ১৯৪৮-এব ২৮ ফেব্রুযাবি। অধিকাংশ অসামবিক ব্রিটিশ কর্মচাবী ভাবতে কাজ চালিযে যেতে অরাজি হন। আজাদ বলছেন—বাহিনী বিভাজন তখুনি না হলে স্বাধীনতা-পরবর্তী সাম্প্রদাযিক সংঘর্ষ অনেকাংশে রোখা যেত। কিন্তু বাজেন্দ্র প্রসাদেব মত অহিংসাপন্থী নেতাও ভাগ চাইছিলেন। তবে সাম্প্রদায়িক-ভিত্তিতে ভাগ কবা হয়তো ঠিক হয়নি! কযেক ক্ষেত্রে সীমান্ত-সংঘর্ষে সৈনাবা অংশ নেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিবপেক্ষ থাকে। আজাদ চেয়েছিলেন সম্প্রদায় নির্বিশেষে যে যে প্রদেশে চাকুবি কবত, সে-প্রদেশ যে-ডোমিনিযানে

পড়েছে সেই ডোমিনিয়ানে চাকুরি করতে থাকুক। কিন্তু কার্যত তা হয়নি। হিন্দু ও শিখদের ভারতে ও মুসলিমদের পাকিস্তানে স্থায়ী বা অস্থায়ী চাকুরি নেবার বিকল্প (option) দেওয়া হয়। যারা অস্থায়ী চাকুরি নিয়েছিল তাদের মতপরিবর্তনেব সুযোগও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু লীগ রীতিমত ভয় দেখিয়ে বড় বড় মুসলিম আমলাদের পাকিস্তান পছন্দ করতে বাধ্য করে।[৪৮২]

পূর্ব ও পশ্চিমে ভারত-পাকিস্তানের সীমানা নির্ধারণেব জন্য স্যাব সিবিল র‍্যাডক্লিফেব সভাপতিত্বে দুটি সীমানা কমিশন গঠিত হয়েছিল। তিনি রক্ষণশীল বলে কংগ্রেস প্রথমে আপত্তি জানিয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধেব সময তথ্যমন্ত্রকের মুখ্য আধিকারিকরূপে তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতায় মুগ্ধ বডলাট তাঁকে সমর্থন কবেন। ৮ জুলাই তিনি ভারতে আসেন ও এক অতি কঠিন ও অপ্রিয় কাজ শুরু করেন। তাঁকে যে সময দেওযা হয়েছিল তাতে সুবিচারের আশা কবা ছিল বাতুলতা।

জিগলাব দাবি কবছেন—বডলাট তাঁকে কোনও রূপে প্রভাবিত করাব চেষ্টা করেননি। ৯ আগস্ট নেহরু নাকি বড়লাটকে পঞ্জাবেব সেচ ব্যবস্থার এক রূপরেখা পাঠিযে ব্যাডক্লিফকে দিতে বলেন। মাউন্টব্যাটেনেব উত্তব—"...it is most important that I should not do anything to prejudice the independence of the Boundary Commission, and that, therefore, it would be wrong for me even to forward any memorandum, especially at this stage."[৪৮৩] দুদিন পব লিযাকৎ আলি গুরুদাসপুব পূর্ব পঞ্জাবকে দেওয়া হযেছে গুজব শুনে প্রবল প্রতিবাদ জানান। ইজমে জানিযেছেন এসব কথা বডলাটেব বিবেচ্য নয়।

সীমানা নিয়ে বিতর্কেব ঝড় উঠেছিল। এতো পবস্পববিরোধী তথ্য উপস্থাপিত হয ও কমিশনেব সদস্যদেব নিজেদের মধ্যেও বিসম্বাদ দেখা দেয যে ব্যাডক্লিফকে শেষ পর্যন্ত কাজীর বিচার করতে হযেছিল।[৪৮৩ক] এ যেন কুশলী শল্যবিদেব অস্ত্রোপচাব নয়, নির্বিবেক কশাই-এর কাজ। কোন পক্ষই সন্তুষ্ট হবে না বলে পঞ্জাবের ছোটলাট জেনকিনস্ পঞ্জাব ভাগ চাননি।[৪৮৪] তিনি দেখেছিলেন পুলিশ, এমনকি সৈন্যবাহিনীও, সাম্প্রদাযিকতাব শিকাব হচ্ছে।[৪৮৫] তিনি জানতেন কোন পক্ষই লাহোর ছাডতে চাইবে না। ১০ জুলাই বডলাটকে তিনি লেখেন, "জ্ঞানী কর্তাব সিং-এব সঙ্গে এইমাত্র কথা হল। জ্ঞানী শিখদের মতলব খোলাখুলি বললেন। তিনি আমার মত সমর্থন করেন যে বাউণ্ডাবী কমিশনের রায় পছন্দ না হলে শিখরা গোলমাল কববেই..." এই সঙ্গে জেনকিনস্ এক গোপন রিপোর্ট পাঠালেন—"জ্ঞানী বলছেন, 'পঞ্জাবে খুব ব্যাপক জনবিনিময় (transfer of population) প্রযোজন। ইংবেজরা কি এ জন্য প্রস্তুত আছে? জ্ঞানীব সন্দেহ—নেই। কিন্তু শিখ সংহতি ক্ষুণ্ণ হলে যুদ্ধ অনিবার্য। ব্রিটিশবা এতদিন সংখ্যালঘু স্বার্থরক্ষা করবে বলে এসেছে। আসলে কি হযেছে? বর্তমান পবিস্থিতি তো ব্রিটিশদের বিশ্বাসঘাতকতাব প্রমাণ।' আমি (জেনকিনস্) বললাম, 'বর্তমান অবস্থার জন্য শিখবা নিজেবাই দায়ী। জ্ঞানী নিজে দেশভাগ স্বীকার করেছেন আর বলদেব সিং প্ল্যানে সম্মতি দিয়েছেন।' জ্ঞানী বললেন, 'তাঁরা ভাবেননি জনসংখ্যার ভিত্তিতে দেশভাগ হচ্ছে। শিখ সম্পত্তি, জলসেচ ব্যবস্থা, নানকানা সাহেব—এ সবের কি হবে?' জ্ঞানী ভয় দেখাচ্ছেন—শিখরা কর্মচাবী হত্যা, বেল ও ক্যানালে নাশকতা ইত্যাদিতে নামবে। জেনকিনস বলেন, 'এটা নির্বোধেব কাজ হবে।' জ্ঞানীর উত্তর—'ব্রিটেন আক্রান্ত হলে তাঁর মনোভাব কি অনুরূপ হত না?' There would be tears and bloodshed here if the boundary problem was

not suitably solved. The Giani was matter of fact and quiet throughout our conversation but wept when he made his final appeal."[৪৮৬]

১৩ জুলাই তিনি আবাব লেখেন, শিখরা ভয় পাচ্ছে পশ্চিম পঞ্জাবে গণহত্যা হবে, আর পূর্ব পঞ্জাবে হিন্দুরা তাদেব টিপে মাববে।

যাঁরা লেঃ জেঃ স্যার ফ্রান্সিস টাকারের While Memory Serves পডবেন তারা দেখবেন ১৯৪৫/৪৬-এই (অর্থাৎ দেশভাগের সিদ্ধান্ত নেবাব আগেই) সৈন্যবাহিনীকে ভাগ করার এবং শান্তিবক্ষার্থ এক কেন্দ্রীয় নিবপেক্ষ বাহিনী (C. R. P. F.-এর মত) গঠনেব পরামর্শ দেন তিনি। অথচ সর্বাধিনায়ক অকিনলেক তা করেননি। ১৯৪৭-এব জুলাই মাসের পূর্বে Armed Forces Raconstruction Committee-ব বিচার্য বিষয় ঠিক হয়নি। তখন আব ক্ষমতা হস্তান্তবেব ছ সপ্তাহও বাকী নেই। ২২ জুলাই পার্টিশন কাউন্সিল আইন ও শৃঙ্খলাবক্ষায়, বিশেষত সংখ্যালঘু স্বার্থবক্ষায়, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ঘোষণা কবা সত্ত্বেও এবং সকলকে সীমানা কমিশনেব বোযেদাদ শান্তিতে মেনে নিতে অনুরোধ জানালেও, সংঘর্ষেব আশঙ্কা ছিল। তাই ১ আগস্ট মেজব জেনাবেল রীসেব (Rees) অধীনে সীমান্তবক্ষীবাহিনী গঠিত হয। বডলাট ভেবেছিলেন ৫০,০০০ সৈন্য ও ব্রিটিশ-অধ্যক্ষ (বীস) অবস্থাব সামাল দিতে পারবে। তাঁব মত এতদিনের অভিজ্ঞ সেনাপতির এত বড ভুল মার্জনা কবা যায না। জনসন ও মেনন পার্টিশান কাউন্সিলেব ঘোষণাকে 'Charter of Liberties for all communities' আখ্যা দিলেও, যত ক্ষমতা হস্তান্তবেব দিন এগিয়ে এল, ততই পশ্চিম সীমান্তে সংঘর্ষ বাডতে লাগল। জেনকিনসেব আশঙ্কা ফলল অক্ষবে অক্ষবে।

এই ক্রমবর্ধমান উন্মত্ততাব পবিবেশে এক ক্ষীণ কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠ বেজে উঠল সকলকে শেষ বাবেব মত সচেতন কবতে, প্রকৃতিস্থ কবতে। তা মহাত্মাব। তিনি জিন্নাকে প্রশ্ন কবছিলেন, কেন সিন্ধিবা পালিয়ে আসছে সিন্ধু থেকে তাঁব প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও? প্রশ্ন কবছিলেন ইউ পি ও বিহারকে--কেন মুসলিমবা চলে যেতে চাইছে? কেন সবাই মিলে তাকিয়ে বযেছে সৈন্যবাহিনীর দিকে? "He (Jinnah) wants to show to the world what Islam is. Let us see whether he makes of himself a master or a servant. If even a single Sindhi flees, then the responsibility for it will rest on the Governor General of Pakistan. He will have to be just to all, like Abubaker or Omar or Ali." কেন ভয় পাচ্ছে জাতীযতাবাদী মুসলিমরা—ভাবছে তাদেব Quisling বা বিশ্বাসঘাতক মনে কবা হবে পাকিস্তানে? এ কি বকম স্বাধীনতা? আসফ আলিকে (১৪ জুলাই-এব পব) তিনি লিখছেন, "Freedom has come but it leaves me cold. So far as I can see, I am a back number." "আমাদের পথ বাহ্যত অহিংস ছিল কিন্তু হৃদয় ছিল সহিংস। কোথায আমবা যাচ্ছি ঈশ্বরই জানেন।"

২১ জুলাই লিখছেন কিশোবলাল মশরুওয়ালাকে—"হতাশাই বল, দুঃখই বল, একই কথা। কি করে অহিংসা এই হিংসাকে দমন করবে? এই অশান্তির মধ্যে যেতে যেতে আমার প্রতীতি হয়েছে, যদিও গত ত্রিশ বছবের সংগ্রামকে অহিংস বলা চলে, তা অহিংসার ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল না। যদি তা অহিংস মনে না করতাম আমার উদ্যম এত ব্যয় করতাম না।" "That is why God made me blind and allowed me to be used...Isn't it all wrong training? How can one have the right

training now, i.e. in true non-violence, after having had 30 years of wrong training ?" তাঁর মনের অবস্থা অনুমেয়।

আরো তিনি পীড়িত হচ্ছিলেন মতলববাজ কংগ্রেসীদের পদের জন্য, প্রভাবের জন্য কাড়াকাড়ি দেখে। ১৯ জুলাই-এর প্রার্থনা সভায় না বলে পারলেন না—"**It is something very dirty.**" যদি মুষ্টিমেয় একটা দল কংগ্রেস সভ্য হত তো বোঝা যেত, কিন্তু কংগ্রেসের সভ্য তো কোটি কোটি। তারা সবাই যদি এক সঙ্গে ওপরে উঠতে চায়—"**The Congress rule will be killed.**" সম্ভব হলে কেঁদে তিনি অন্তরযন্ত্রণার লাঘব করতেন। কিন্তু "**I have been a rebel all my life. How can a rebel cry ?**" এ যেন যীশু খ্রিস্টের '**Agony in the garden**'। মানবপুত্রের মত নিদারুণ দুঃখে তিনি বলছেন পিতাকে—

এ পানপাত্র নিদারুণ বিষে ভরা
দূরে ফেলে দাও, দূরে ফেলে দাও ত্বরা।

সিলেট থেকে খবর এল, গণভোটের সময় জাতীয়তাবাদী মুসলিমদের হত্যা করা হয়েছে। করাচি থেকে খবর এল—হিন্দুদের গৃহচ্যুত করা হচ্ছে। এই সময় কৃষ্ণদাস সংখ্যালঘু হস্তান্তরের কথা তোলেন। গান্ধী বলেন, যদিও তা সুকঠিন, তবু ভেবে দেখবার মত। জিন্না বারবার অমুসলিমদের আশ্বাস দিচ্ছেন, তাঁকে বিশ্বাস করতে চাইছিলেন গান্ধী। একবার মনে হল উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে এই নিয়ে গ্যারাণ্টি-বিনিময় করলে হয়। পাকিস্তানের হিন্দুরা যদি আশ্রয় চায় তবে তাদের গ্রহণ করতে প্রস্তুত হচ্ছিলেন তিনি। তাদের যে সব সম্পত্তি ফেলে আসতে হবেপাকিস্তানেরসরকারকে তার বাজার মূল্য দিতে হবে। "**It will be the duty of the Government of Pakistan to pay the price of such land and houses to the owners.**" যে সব সমালোচক ভাবেন গান্ধী পাকিস্তানভুক্ত হিন্দুদের কথা চিন্তা করেননি তাঁদের মত বদলাতে হবে।

কিন্তু দিল্লীর বিষাক্ত বাতাসে তিনি নিঃশ্বাস নিতে পারছিলেন না। দিল্লী ছেড়ে প্রথমে কাশ্মীর (পঞ্জাবের পথে), পরে বিহার, শেষে নোয়াখালি যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। আশ্রম জীবনের কথা আর ভাবছিলেন না তিনি। হরিপ্রসাদ দেশাইকে লিখছেন, "**For me Sabarmati is far off, Noakhali is near.**" 'হরিজন' পত্রিকা বন্ধ করে দেবেন ভাবছিলেন। প্রায়ই মনে হচ্ছিল, কংগ্রেসকেও তুলে দেওয়া উচিত। স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য যে প্রতিষ্ঠানের জন্ম, তার কাজ শেষ হয়েছে। যদি তা থাকেও তাকে নিতে হবে নবজন্ম। কংগ্রেসীদের রাজনীতি ছেড়ে গঠনমূলক কর্মে নামা উচিত। তাঁর একটি উক্তি আজকের প্রত্যেক কংগ্রেস কর্মীর অনুধ্যান হওয়ার যোগ্য—"**without the backing of constructive work and penetrating the villages, their legislators would prctically be idle and the voters would be exposed to the machinations of vote-catchers.**" তিনি বুঝেছিলেন এই সংঘাতদীর্ণ সমাজে শান্তিবাদীর স্থান নেই। তবু তাঁকে সমাজেই থাকতে হবে, শান্তির জন্য কাজ করে যেতে হবে। 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' নতুন এক ব্যঞ্জনা নিচ্ছিল।

১৪ আগস্ট মধ্যরাত্রে ভারত স্বাধীন হল। গণপরিষদে তাঁর বিখ্যাত ভাষণে নেহরু বললেন, "বহুদিন আগে আমরা অদৃষ্টের সঙ্গে অভিসারের শপথ নিয়েছিলাম। এখন তা রক্ষা করার সময় এসেছে…হয়তো তা পুরোপুরি রক্ষা করা যাবে না, কিন্তু অনেকখানি

যাবে। ঠিক মধ্যরাত্রির ঘণ্টা যখন বাজবে, যখন সারা পৃথিবী নিদ্রামগ্ন, তখন ভারত জেগে উঠবে স্বাধীন জীবনের মর্যাদায়। ইতিহাসে এক এক দুর্লভ মুহূর্ত আসে যখন পুরাতন বাস ছেড়ে আমরা নূতনের মধ্যে বেরিয়ে আসি, যখন একটা যুগান্ত হয়, যখন বহুদিনেব অবদমিত জাতির আত্মা বাঙ্ময় হয়ে ওঠে।" কথা ছিল—স্বাধীনতা ঘোষণা ও মাউন্টব্যাটেনকে প্রথম বড়লাট হবার অনুরোধমূলক প্রস্তাব গৃহীত হলে গণপরিষদের সভাপতি—রাজেন্দ্র প্রসাদ ও প্রধানমন্ত্রী নেহরু বড়লাটের প্রাসাদে গিয়ে তাঁকে কার্যভার গ্রহণের অনুরোধ জানাবেন। সে রাত্রির বর্ণনা পাওয়া যাবে ক্যাম্বেল জনসনের রোজনামচায়। রাজেন্দ্র প্রসাদ নাকি সাংবাদিক, ফোটোগ্রাফারের প্রচণ্ড ভিড়-এ তাঁর বক্তব্য ভুলে গিয়েছিলেন। নেহরুকে কথা জোগাতে হয়েছিল। স্থির ধীর বড়লাট ধন্যবাদসহ সম্মতি জানালে নেহরু তাঁর হাতে তুলে দিলেন মন্ত্রকের বর্ণনাসহ মন্ত্রিসভার তালিকা। সকলে চলে গেলে বড়লাট খুলে দেখেন—খাম খালি, তালিকা নেই। নেহরু আবেগের জোয়ারে ভেসে তা ঢোকাতে ভুলে গেছেন।

এমনই যখন নেহরুর মনেব অবস্থা, পরের দিন কি উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা দেবে তাব কথা না বলাই ভাল। ক্যাম্বেল জনসনের ডায়েবি তো আছেই, সেদিনেব প্রতি সংবাদপত্রেব প্রথম পৃষ্ঠায় রযেছে তার ওজস্বী বর্ণনা। মাউন্টব্যাটেনেব বক্তৃতায় নেহরু ও প্যাটেলের ভূমিকাব উচ্চ প্রশংসা ছিল, কিন্তু যখন তিনি গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছিলেন, প্রচণ্ড হর্ষধ্বনিতে সভাকক্ষ ফেটে পড়ল।

ইণ্ডিয়া গেটে স্বাধীন ভারতেব পতাকা উত্তোলন করে নেহরু বললেন, "আজ আমাদের প্রথম চিন্তা যাচ্ছে এই স্বাধীনতার স্থপতিব দিকে, জাতির জনকের দিকে..." কি করছিলেন সেদিন তিনি? করাচি ও নিউদিল্লী যা পাবার সবটা না হলেও খানিকটা পেয়ে আনন্দ করছে। কি পেলেন জাতির জনক? বেলেঘাটাব পোড়োবাড়িতে সারা জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার ভস্মস্তূপের পানে তিনি তাকিয়ে ছিলেন শূন্যদৃষ্টিতে—যেন শরশয্যায় পিতামহ ভীষ্ম নিজের ভুলভ্রান্তির কথা ভাবছিলেন।

কোনোদিন তুমি বওনি রাজ্যভার
হৃদয় রেখেছ শুচি
কৌটিল্যের মদান্ধ সত্তার
নিঃশেষ করে দেয়নি তোমার করুণা, স্বচ্ছরুচি
প্রজ্ঞা তোমার সিংহাসনের কুহকে অন্ধকার
হয়নি একটিবার।

তবু পিতামহ তবু পিতামহ কেন
দশটি দিনের দশবছরের দুঃস্বপ্নের কারা
গড়ে দিলে তুমি সারা
ভারতের প্রাণে সে কোন ন্যায়ের বলে
কোন আধিয়ার ছলে
মুদ্রিত বামপানির আড়ালে পেয়ে গেল—ঐ তারা
পক্ষপাত এ হেন
দাক্ষিণ্যের সর্পিল কৌশলে?

শরশয্যায় নক্ষত্রের গানে
বিভীষণ বুঝি দেয় আবো হাতছানি ?
কিম্বা হয়তো মরাগঙ্গার জলে মদ্যপ পল্বলে
বিষাক্ত মাটি ধুয়ে দেবে বানে চবম আত্মদানে ?
এ কোন দ্বন্দ্বে স্বেচ্ছামৃত্যু জানি !

(বিষ্ণু দে, যুযুৎসুর খেদ, অন্বিষ্ট)

কোনওদিন রাজ্যভার তিনি নেননি। কৌটিল্যের রাজনীতি আশ্রয় করেননি—তার স্থানে বসাতে চেয়েছেন চিরন্তন ধর্মনীতিকে। হিন্দু মুসলমান তাঁর কাছে পাণ্ডব ও কৌরব—এক কুরুবংশের সন্তান, এক অখণ্ড ভারতেব উত্তরাধিকারী। মুসলিমদের অন্যায় দাবি, হিন্দু-তপসিলী-হরিজনের কৃত্রিম বিভেদ, উভয় সম্প্রদায়ের সন্দেহ, ঘৃণা, হিংসা, ধৃতরাষ্ট্র-ব্রিটেনের অন্ধ মুসলিমপ্রীতি, দরিদ্র, মূর্খ ভারতবাসীর সহস্র সমস্যা অবহেলা কবে ক্ষুদ্র বৃহৎ ক্ষমতার লড়াই তাঁকে প্রথমে বিব্রত করেছিল, পরে ব্যথিত করেছিল, শেষে বৈরাগী করেছিল। ১৫ আগস্ট অনশনের মাধ্যমে স্বেচ্ছামৃত্যুব পথ তিনি বেছে নিয়েছিলেন। ১৯৪৮-এর ৩০ জানুয়ারি গড্‌সের গুলি তা বাস্তবায়িত কবে মাত্র।

সেদিন হিন্দু মুসলমানের যে সম্প্রীতি আমবা লক্ষ্য করেছি তা অকল্পনীয। তারপর ঘটল দু-একটা বিক্ষিপ্ত ছুরিকাঘাত। মহাত্মা অনশন শুরু কবলেন। সোমবাব করলেন—সমস্ত সম্প্রদায়ের নেতা, দলে দলে হিন্দু মুসলমান, এমন অভূতপূর্ব সাড়া দিল যে বৃহস্পতিবারেই তিনি অনশন ভঙ্গ করলেন। মাউণ্টব্যাটেনের ভাষায় সেদিন বাংলায় তিনি ছিলেন 'একক সীমান্তরক্ষী'। অন্যদিকে ২৭ আগস্ট খবর এল পঞ্জাবের এক কোটি মানুষ দিশাহারার মত বেরিয়ে পড়েছে নিরাপত্তার খোঁজে। এই গণ-হিস্টিবিয়ার সামনে প্রশাসন, পুলিশ, সৈন্য (তাও স্বল্প) কি করবে ? ৩০ আগস্ট লাহোরে বসল যুক্ত প্রতিরক্ষা কাউন্সিল। জিন্নার উপস্থিতিতে ঠিক হল রীসের সীমান্তরক্ষী বাহিনীও ভেঙে দেওয়া হবে। দিল্লীর দিকে, লাহোরের দিকে, দুই বিপরীত মুখে, ধেয়ে চলল লাখ লাখ উদ্বাস্তুর প্রবাহ। সেদিন বাংলায় গান্ধী ছিলেন— তাই এমন সর্বনাশ ঘটেনি। **"In the Punjab we have 55,000 soldiers and large scale rioting on our hands. In Bengal our forces consist of one man, and there is no rioting . May I be allowed to pay my tribute to the oneman Boundary Force?"**[৪৮৬ক]

এখানে ১৬ আগস্ট প্রকাশিত র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের কথা সেরে নেওয়া যাক। বাংলায় মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, হুগলি, হাওড়া, বর্ধমান নিয়ে গোলমাল ছিল না। এগুলি প্রায় সম্পূর্ণ হিন্দু এলাকা। অন্যদিকে ঢাকা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর, বরিশাল, রাজশাহী, মৈমনসিং, পাবনা ও বগুড়া নিয়েও গোলমাল ছিল না, কারণ সেগুলি প্রায় সম্পূর্ণ মুসলিম অঞ্চল। কিন্তু কি হবে দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও খুলনার ? কলকাতা সহ অন্য জেলাগুলি নিয়ে মতদ্বৈধ হয় তীব্র। পঞ্জাবে হয় লাহোর, মুলতান, জলন্ধর বিভাগ ও আম্বালার কিয়দংশ নিয়ে। কংগ্রেস বাংলার ৫৯% এলাকা ও ৪৬% অধিবাসী দাবি করেছিল। র‍্যাডক্লিফের রায়ে পশ্চিমবঙ্গে এল ৩৬% এলাকা ও ৩৫% অধিবাসী। মুসলমানদের ১৬% পড়ে পশ্চিমবঙ্গে আর হিন্দুদের ৪২% পড়ে পূর্ববঙ্গে। খুলনা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম পূর্ববঙ্গকে দেওয়ায় প্রতিবাদ ওঠে। তাছাড়া দার্জিলিং-এর সঙ্গে কি ভাবে বাকী

পশ্চিমবঙ্গ যোগাযোগ রাখবে ? মুসলমানরা বলল কলকাতা তাদের দিতে হবে। অন্তত ভাগ করতে হবে। তাছাড়া মুর্শিদাবাদ ও নদীয়ার কিয়দংশ নিয়ে আপত্তি তোলে। পঞ্জাবে কংগ্রেস চেয়েছিল চন্দ্রভাগার পূর্বতীবভুক্ত ভূখণ্ড। শিখবা তদুপবি চেয়েছিল মণ্টগোমারি, লিয়ালপুরের কয়েকটি জেলা ও মুলতান বিভাগের কিছু মহকুমা। ব্যাডক্লিফের রোয়েদাদে পূর্ব পঞ্জাব পায সমগ্র পঞ্জাবেব ৩৮% এলাকা ও জনসংখ্যাব ৪৫% ভাগ। পুবো জলন্ধর ও আম্বালা বিভাগ, লাহোবেব অমৃতসর জেলা, গুরুদাসপুব ও লাহোবেব কয়েকটি তহশিল—সবসুদ্ধ প্রায় তেরটি জেলা। বিপাশা, শতদ্রু ও ইরাবতীব উচ্চাংশেব জল নিযন্ত্রণ আসে পূর্ব পঞ্জাবের হাতে। লক্ষণীয় যে পশ্চিম পঞ্জাবে পড়ে ৬২% ভূভাগ ও ৫৫% অধিবাসী এবং অধিকাংশ উন্নতমানের গমেব জমি। শিখরা লাহোরের বাকী অংশ এবং শেখপুরা, লিযালপুর ও মণ্টগোমারি (ক্যানাল কলোনি) হাবিয়ে দারুণ বিক্ষুব্ধ হয। অন্যদিকে লীগ বলে ৩বা জুন ঘোষিত আনুমানিক (notional) সীমানাকেই প্রকৃত সীমানা ধরতে হবে। গুরুদাসপুব তাবা ছাড়বে না। র‍্যাডক্লিফ তাদের নাকি গুরুদাসপুর দিয়েছিলেন কিন্তু কংগ্রেসেব চাপে বড়লাট তা প্রত্যাহাব করেন। এ সংবাদ অসত্য কিন্তু বটনা উত্তেজনা বাড়ায়।

যত ক্ষমতা হস্তান্তবেব দিন এগিযে এল ততই পশ্চিম সীমান্তে সংঘর্ষ বাড়ল, আগেই বলেছি। এ জন্য মাস্টার তারা সিং কিছুটা দাযী। স্বর্ণমন্দিব থেকে তিনি সমানে উত্তেজিত করছিলেন শিখদেব। ৫ আগস্ট পার্টিশান কাউন্সিলের অধিবেশনেব পর গোয়েন্দ বিভাগেব রিপোর্ট দেখালেন বড়লাট। তাতে প্রমাণ পাওযা যাচ্ছে জিন্না-হত্যার ষড়যন্ত্র সহ ব্যাপক নাশকতার আযোজন চলছিল। জিন্না ও লিযাকৎ তাবা সিং ও সহযোগীদেব গ্রেফতার চাইলেন।[৪৮৭] কিন্তু প্যাটেল বাবণ কবলেন। ঠিকই কবেছিলেন, তাতে উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণেব বাইরে চলে যেত। পূর্ব ও পশ্চিম পঞ্জাবের ভাবী গর্ভনর ত্রিবেদী ও মুডি প্যাটেলকেই সমর্থন করেন। ব্যাডক্লিফ ঘোষণা দিতে দেবি কবছিলেন। তাঁব দোষ নেই। ৮ জুলাই থেকে ১৫ আগস্টেব আগে সময কতটুকু ? তবু জনসনেব লেখায পড়ি বড়লাট বাবংবার তাগাদা দিচ্ছেন। ততদিন অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে সংখ্যাগুরুর দল। জিগিব উঠেছে সংখ্যালঘুদেব পঞ্জাব থেকে তাড়াও।

জিন্নাকে এ জন্য প্রত্যক্ষত দায়ী করা চলে না। নিযন্ত্রণ তাঁর হাতে ছিল না। ৬ই জুলাই যে সব মুসলমান ভারতে থেকে যাবে তাদের উদ্দেশে জিন্না বললেন, "সংখ্যালঘুবা যে রাষ্ট্রের অধিবাসী তার প্রতি অনুগত হবেন।" ১৩ জুলাই সাংবাদিক সম্মেলনে পাকিস্তানেব সংখ্যালঘুদের তিনি আশ্বাস দিলেন—তাদের ধর্ম, বিশ্বাস, জীবন, সম্পত্তি এবং সংস্কৃতি সুরক্ষিত হবে। সব বিষয়ে তারা হবে পাকিস্তানের নাগবিক।[৪৮৮] দ্বিজাতিতত্ত্বেব কথা ভুলে গিয়ে পঞ্জাব ও সিন্ধুর পার্শ্ববর্তী হিন্দু রাজ্যগুলিকে তিনি পাকিস্তানে যোগ দিতে বলেছিলেন। পাতিয়ালার শিখ রাজা বলেন জিন্না শিখ সমর্থন চান।[৪৮৯] বারবাব শিখদেব আশ্বাস দেওয়া হয় যে তাদেব স্বার্থ পুবোপুবি নিরাপদ এবং তাদের দাবি উদারভাবে বিচাব করা হবে।[৪৯০]। শিখদের কাছ থেকে তেমন প্রতিক্রিয়া আসেনি বটে তবু তাবা সিং ও পশ্চিম পঞ্জাবের অমুসলিমদের দেশে থেকে যেতে বলেছিলেন। নেহরুর অসাম্প্রদায়িকতা সুবিদিত, যদিও প্যাটেলের প্রশ্নাতীত নয়। কিন্তু অসাধারণ বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন এই নেতা বিহারে বা পঞ্জাবে সাম্প্রদায়িকতায় ইন্ধন জুগিয়েছেন তার প্রমাণ মেলেনি। গান্ধী তো বারবার বলেছেন ভীরুর মত পলায়নেব চেয়ে ধর্মের জন্য প্রাণত্যাগ শ্রেয়ঃ। তবু ঘটল ভয়াবহ হিংসা, প্রতিহিংসা, বাস্তুহারার বিপরীতমুখী স্রোত—খালিকুজ্জমানও যাকে



Government House
~~The Viceroy's House~~
New Delhi

26th August, 1947.

My dear Gandhiji,

In the Punjab we have 55 thousand soldiers and large scale rioting on our hands. In Bengal our forces consist of one man, and there is no rioting.

As a serving officer, as well as an administrator may I be allowed to pay my tribute to the One Man Boundary Force, not forgetting his Second in Command, Mr Suhrawardy.

You should have heard the enthusiastic applause which greeted the mention of your name in the Constituent Assembly on the 15th of August when all of us were thinking so much of you.

Edwina has gone off today on a courageous mission to the Punjab with Rajkumari Amrit Kaur, to see what they can do to help relieve the suffering and distress among the refugees.

Yours very sincerely,

Mountbatten of Burma

Mr Gandhi.

বলেছেন, 'the blackest period in Indian history.' হেক্টর বলিথো সাফাই গেয়েছেন, জিন্না "অসহায, কথাব দীর্ঘ লড়াই-এ পরিশ্রান্ত, রোগের সন্তর্পণ আক্রমণে অতিশয কৃশ—নিদারুণ যন্ত্রণা নিবাবণে অসমর্থ।"[৪৯১] কিন্তু প্যাটেলও কি জানতেন কোনদিকে রোয়েদাদ ঝুঁকছে ? ম্যাউন্টব্যাটেনও তা জানতেন না। জানলেও সৈন্যবাহিনী প্যাটেলের হাতে ছিল না।

১২ আগস্ট খবব বেরোল পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানে পডেছে। পরেব দিন প্যাটেল লিখলেন—"Monstrous...a blatant breach of the terms of reference." মাউন্টব্যাটেন র‍্যাডক্লিফকে তাঁর বোযেদাদ ক্ষমতা হস্তান্তব পর্যন্ত পিছিযে দিতে বললেন। তিনি ১৩ আগস্ট রোযেদাদ বডলাটেব হাতে তুলে দেন। ১৬ আগস্ট তা নেতাদেব সামনে ঘোষিত হয। কিন্তু এই বিলম্বেব জন্য বটনা হল বাজা। বটনাব ফলে ভয ও ক্রোধ—আবার তার পবিণাম নাবকীয হযে দাঁডাল। ১৪ আগস্ট লাহোব এযাবপোর্টে অকিনলেকেব সঙ্গে যখন জেনকিনস ও বীস কথা বলছেন, তখন লাহোর বেলস্টেশনে শিখযাত্রীদের ওপর হামলা হচ্ছে। ১৫ই অমৃতসবেব বাজাবে মুসলিম মহিলাবা গণধর্ষিত হল বা নিহত হল। লাহোবেব গুরুদ্বাবে যে সব শিখ আশ্রয নিযেছিল তাদেব পুডিযে মাবা হল। ব্যাডক্লিফেব বোযেদাদেব পব আর সামলান গেল না। তা ছডিযে পডলে শেখুপুবা, শিযালকোট, গুজবানওযালায়। শেখুপুবাব গণহত্যাব প্রতিশোধ নিল অমৃতসবেব শিখ জাঠা।

জেনাবেল বীসেব মতে শিখবাই প্রথম আক্রমণ কবে। কিন্তু কে প্রথম ছুবিকা হানে তাব চেযে বডো কথা গোলমাল থামবাব মত সৈন্য তাঁব হাতে ছিল না।[৪৯২] শুরু হল দেশত্যাগেব হিডিক। নাবোযাল থেকে ডেরা বাবা নানক, লাহোব থেকে অমৃতসব, কাসুব থেকে ফিবোজপুর, মণ্টগোমাবি থেকে ফাজিলকা। কেউ যে এব জন্য আগে থেকে তৈবি ছিল তা নয়। কোনও বকমে প্রাণ নিযে, অনেক সময পবিজন ও সর্বস্ব হাবিযে, তাবা পালাল। স্বাধীনতার পব কোন স্বর্গবাজ্য নেমে আসবে এ স্বপ্ন ছিল না তাদেব চোখে—ছিল মা, বোন, স্ত্রী, সম্পত্তি, পেছনে পডে থাকা আবাল্য পবিচিত গ্রাম, শহব হাবানোব জ্বালা। কিছু শোক ধবেছেন ভীষ্ম সাহানি—'তমস' গ্রন্থে। প্রাণ যাবাব চেযেও বড শোক হযেছিল ইকবাল সিং-এর যখন জোব করে তাকে গোমাংস খাইযে কলমা পডান হল। আব যখন ধর্ষণকাবীদেব হাত এড়াতে জনবীব কাউরের সঙ্গে কুযোয ঝাঁপিযে পডল শিখ মেযেবা।

হিন্দু-শিখ উদ্বাস্তুব স্রোত বয়ে চলল পূবে। তাব আগে চলল নৃশংস নির্যাতনেব পল্লবিত গুজব। অতএব বদলা নেওয়া শুরু হল পূর্ব পঞ্জাবে, পাতিযালায, মীবাটে, সাহাবানপুবে, ভবতপুবে, আলোযারে, শেযে দিল্লীতে। দিল্লীর বিববণ দিযেছেন মেনন।[৪৯৩] পাল্টা উদ্বাস্তু স্রোত চলল পশ্চিম সীমান্ত পানে। বোঝা গেল মানুষ ও পশুব ভেদসীমা কত ক্ষীণ। উদ্বাস্তু-বোঝাই যানবাহন, ট্রেন, বৃদ্ধ, নাবী, শিশু, কিছুই বাদ বইল না। মনুষ্যত্বেব চিতা-ভস্ম সীমান্তকে ঘনান্ধকাবে আবৃত কবল।

মনুষ্যত্ব যে সব সময়ই পরাজিত হযেছিল তা নয়। স্মবণ করুন 'তমসে'ব সেই দৃশ্য যেখানে হবনাম সিং ও তাব স্ত্রী বাটোকে আশ্রয দিয়েছে বৃদ্ধা বাজো, যাব স্বামী এশান ও ছেলে মজান বেবিয়েছে শিখদের দোকান লুটতে, মাথা কাটতে। বাধা দিচ্ছে পুত্রবধূ আক্রান। কিন্তু আশ্রয়প্রার্থীকে ত্যাগ করল না রাজো, শুধু বন্দুকটা নিয়ে নিল। স্বামী হরনামের পোশাক বোঝাই সিন্দুক লুট করে আনল কিন্তু সেও মারতে পাবল না পড়শীকে। সরিয়ে দিল পাশের আস্তাবলে। পুত্রবধূ, স্বামী আসামাত্রই সব ফাঁস কবে দিল। রমজানেব

দল ভেঙে ফেলল আস্তাবলের দরজা। এগিয়ে এল হবনাম—মাথা পেতে দিল উদ্যত খড়্গের সামনে। কিন্তু বমজানও তো মাবতে পাবল না। গভীব বাত্রে শিখদম্পতিকে বিপদের সীমানা পাব করে দিল বাজো—অন্ধকাবে তার আবছামূর্তি যেন বিলীয়মান মনুষ্যত্বের প্রতীক।

কিন্তু তবু গ্রন্থ শেষে মুন্সীবাম বলছে—"From now on no Hindu will live in Muslim mohallas and no Muslim in Hindu mohallas. Pakistan or no Pakistan, it is very clear that each community is going to live in watertight mohallas." মহল্লা আলাদা হয়ে গেছে মনে। শেখ নূব ইলাহী মুসলিম মৌলবাদীদেব নেতা। লালা লক্ষ্মী নারাযণ হিন্দুদেব। তাবা পবস্পবকে জড়িয়ে ধরল, ঠাট্টা করল। কিন্তু স্বার্থ তাদেব এক কবলেও স্মৃতি কি তাদেব আলাদা কবে দিল না ?

॥ ১৬ ॥

মহাজন্মেব লগ্ন এল কিন্তু অমাবাত্রির সব দুর্গতোবণ ভেঙে পড়ল না। ১৪/১৫ আগস্ট কলকাতাব হিন্দু-মুসলিম মহামিলনেব দৃশ্য দেখে কে ভাবতে পেবেছিল ৩১ আগস্ট আবাব বিক্ষিপ্ত আক্রমণ প্রত্যাক্রমণ শুরু হবে এবং জনৈক আহত হিন্দুকে নিযে একদল উত্তেজিত হিন্দু বেলিযাঘাটাব বাড়িতে গভীব বাত্রে গান্ধীব ওপব চড়াও হবে ? গান্ধী জোড়হস্তে তাদেব নিক্ষিপ্ত ইট, পাথব, লাঠিব আঘাতেব সামনে দাঁড়ালেন। পুলিশ কোনওবকমে জনতা হটাল। ১ সেপ্টেম্বব থেকে গান্ধীব পঞ্চদশ অনশন আবম্ভ হল। শান্তি, না হয মৃত্যু।

৪ সেপ্টেম্ববেব মধ্যে গান্ধী 'মিব্যাকল' দেখালেন কলকাতায।[৪৯৪] তথাকথিত গুণ্ডাদের অস্ত্র সমর্পণ না দেখলে বিশ্বাস হবে না। কিন্তু ৫ই ভি· পি মেননেব জরুবী আহ্বানে সিমলা থেকে দিল্লী পৌঁছে বড়লাট দেখেন তিনি দুঃসংবাদ নিয়ে বসে আছেন। নেহরু ও প্যাটেল এলেন পবপব। পঞ্জাবেব অবস্থা আযত্তেব বাইবে চলে গেছে। দিল্লীও বিপন্ন। মাউন্টব্যাটেন হাল না ধবলে উপায় নেই।[৪৯৫] ৬ সেপ্টেম্বব এমার্জেন্সি কমিটি সেই সিদ্ধান্ত নিল।

বিপদেব আপতিক কারণ ২৯ আগস্ট যুক্তপ্রতিবক্ষা কাউন্সিল, জিন্নাব চাপে, বীসেব বাউণ্ডাবি ফোর্স ভেঙে দিতে বাধ্য হযেছিল। জেফ্রিব মতে সৈন্যদেব বেশ কিছু পক্ষ নিয়েছিল।[৪৯৫ক] ফলে বাঁধভাঙা বন্যার মত জনস্রোত দুই সীমান্ত ছাপিয়ে বইছিল এবং পূর্বগামী স্রোতেব প্রচণ্ড আঘাত লেগেছিল দিল্লীতে। পুবানা কিল্লায়, জুম্মা মসজিদে আশ্রয় নিযেছিল হাজার হাজাব মুসলিম শরণার্থী। বাকীবা নিজ নিজ মহল্লায় অবরুদ্ধ। অন্যদিকে আসছে পশ্চিম পঞ্জাবেব হিন্দু ও শিখ উদ্বাস্তু। চোখে তাদেব উন্মত্ত জিঘাংসাব আগুন। শোনা যাচ্ছে ৮ লাখ লোক ভাবতের পথে বওনা হযেছে। দাঙ্গা, লুটপাট, অগ্নিদাহ চলছে নয়া সরকারেব চোখের সামনে। ৪ সেপ্টেম্বর নেহরু ইজ্‌মেকে লিখছেন—"People have lost their reason completely and are behaving worse than brutes." অসাম্প্রদায়িক, আবেগপ্রবণ নেহরুর কাছে দিল্লী সেদিন দান্তেব নরক। বাববার তিনি ঝাঁপিয়ে পড়ছিলেন দাঙ্গাবাজ, লুঠেরার মধ্যে—মাঝে মাঝে প্রাণসংশয় কবে। প্রথমে

বিহ্বল হলেও পরে তিনি এটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিয়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। সেপ্টেম্বরে শ্রীপ্রকাশকে বলেছিলেন,এ তো বহিঃশত্রুর সঙ্গে লড়াই নয়, নিজেব সঙ্গে লড়াই। জিততেই হবে। যদি ধর্মনিরপেক্ষতার মূল শুকিয়ে যায়, তবে পাতা বা ফুল ধরবে কি করে ? এ-সব কথা তাঁকে তর্ক করে বোঝাতে হচ্ছিল প্যাটেল ও রাজেন্দ্র প্রসাদের মত দীর্ঘদিনের গান্ধীশিষ্যদের।

১১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে দিল্লীর অবস্থার কিছু উন্নতি হল। জনসনেব ভাষায়, "It (the Emergency Committee) has requisitioned civilian transport, dispatched to provinces and states ready to receive them tens of thousands of non–Muslim refugees who had come to Delhi, arranged for special trains for Moslems to go to Pakistan, provided guards, called for volunteer constables, arranged for saving and harvesting of crops from deserted lands..."[৪৯৬]

৬ লক্ষ মৃত, ১ কোটি ৪০ লক্ষ গৃহচ্যুত, অন্তত এক লক্ষ নারী অপহৃত, অথচ বড়লাটেব পরিজনবা বলছেন, "ভাবতকে স্বাধীনতা দেওযায যা লাভ হল, তাব তুলনায এই ত্যাগ খুব বেশি নয়।"[৪৯৭] জি ডি খোসলার মতে মৃতেব সংখ্যা ৪ থেকে ৫ লক্ষ,[৪৯৮] ইয়ান স্টিফেন্সের মতে—৫ লক্ষ,[৪৯৯] ত্রিবেদীর মতে—২ লক্ষ ২৫ হাজাবের মত,[৫০০] পেণ্ডেবেল মুনের মতে—দু লাখের বেশি নয।[৫০১] ইণ্ডিযা হাউসেব এক বক্তৃতায বড়লাট বলছেন—"Only a hundred thousand people had died..." শুনে ইজ্‌মে স্ত্রীকে লিখেছেন, "It seems to me immaterial whether one hundred thousand or a million (তাই জুডিথ ব্রাউনেব শেষ গণনা) have actually died or whether only 3% of the country is in turmoil. The essential facts are that there is human misery on a colossal scale all around,one and millions are bereaved, destitute, homeless, hungry, thirsty worst of all desperately anxious and almost hopeless about their future."[৫০২] ইজ্‌মেব মত কঠিনহৃদয়, বহুযুদ্ধেব পোড়খাওযা সেনাপতি যা সহ্য কবতে পারেননি—তা হল সংখ্যাতত্ত্বের কাবসাজি দ্বাবা মানবদেহ ও আত্মাব চবম অপমানকে লঘু করা।

এই ভয়ঙ্কব কাণ্ডের জন্য কে বা কাবা দাযী ? আব ক্ষমতা হস্তান্তবেব জন্য দেশভাগ কি অনিবার্য ছিল ? বারবাব এই প্রশ্ন উঠেছে, উঠবে। এখন তো এসব প্রশ্নের সঙ্গে নানা রাজনৈতিক দলের শুধু নির্বাচনী লাভক্ষতিব উদ্দেশ্য নয়, অস্তিত্বও জড়িত হযে পড়ছে। আমরা যতটা সম্ভব নির্মোহভাবে আলোচনা করব।

প্রথমেই উঠবে স্বাধীনতার প্রাক্কালের ও অব্যবহিত পরের নৃশংস ঘটনাবলীব দায়িত্বের কথা। মাউন্টব্যাটেন বলছেন, এমন দলবদ্ধ অভিনিষ্ক্রমণের (mass exodus) সম্ভাবনা তাঁর মাথায় আসেনি। ৪ জুন প্রেস কনফারেন্সে সাংবাদিকরা কিন্তু প্রশ্নটা তুলেছিলেন। উত্তরে বড়লাট বলেন, এমন দলবদ্ধ অভিনিষ্ক্রমণের কথা তিনি ভাবছেন না—"because of the physical difficulty involved."[৫০৩] তবে স্বাভাবিকভাবেই কিছু লোক সীমান্ত অতিক্রম করবে, অথবা সীমিতভাবে সবকার কিছু জনহস্তান্তর কবতে পারে। কলিনস্ ও লাপিয়েরকে পবে তিনি বলেছিলেন, "We foresaw people on the boundaries making small adjustments. It never occured to us that

people in Lahore would try to go across or viceversa. That no one foresaw."[৫০৪]

জনহস্তান্তরেব কথা ১৫ আগস্টের আগে আবাব উঠেছিল। বড়লাট বলছেন, নেহরু ও জিন্না তাতে আমল দেননি। কিন্তু এ মন্তব্য তিনি কবছেন স্মৃতি থেকে—কোন সরকারী রেকর্ডের ভিত্তিতে নয। নেহরু ও জিন্নাব প্রতিক্রিয়া ছিল একই—"আমাদেব দুই রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু-স্বার্থবক্ষার শক্তি আছে। আমাদেব ভিত্তিও তাই।" জিন্না নেহরুব মতই এ বিষয়ে দৃঢসংকল্প ছিলেন।[৫০৫] ভি পি মেনন আরও একটু এগিয়ে লিখছেন : **"But could there be any question of an exchange of population between two sides which had agreed and publicly announced that they would retain their respective minorities? Indeed, the Congress was definitely against any exchange of population."[৫০৬]**

নেহরুদের কথা পবে বিবেচনা করা যাবে। মাউন্টব্যাটনের মত সমবাভিজ্ঞ ব্যক্তিব দূবদৃষ্টিব অভাব অমার্জনীয। ১৯৪৫ সালে জার্মেনীতে কি হয়েছিল তিনি কি জানতেন না? সন্দেহ নেই, সেখানে সীমান্ত এত দীর্ঘ ছিল না, গণ অভিনিষ্ক্রমণেব ভিত্তিও ছিল না জাতিবৈর। পূর্ব জার্মেনীর কম্যুনিস্ট শাসনে যারা বাস কবতে চায়নি তাবাই চলে এসেছে পশ্চিম জার্মেনীতে। ভারতের সমস্যা ছিল জটিলতব। শুধু পঞ্জাবসীমান্তই প্রায ২০০ মাইল লম্বা। তারপব একদিক থেকে যাচ্ছে মুসলমান, অন্য দিক থেকে আসছে হিন্দু ও শিখ। আবাব শিখ ও মুসলমানেব বৈরিতাব পেছনে শুধু ধর্মীয় মতপার্থক্য নেই, বযেছে কযেক শত বছবেব ক্ষমতাব লডাইযেব ঐতিহ্য। কোরান ও গ্রন্থসাহেবেব চেযেও কারুব কারুব কাছে ভাল গমেব বা সেচসেবিত ক্ষেত বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সমগ্র পঞ্জাবে শিখবা যে ভাবে ছডিয়েছিল তাতে সমস্যা আবও ঘনীভূত হয। ব্যাডক্লিফেব কাছে বৈজ্ঞানিক বিভাজন আশা করাই অন্যায—বিশেষত ৮ জুলাই থেকে ১৩ আগস্টেব মধ্যে (ওই দিন তিনি বড়লাটকে বোযেদাদ দেন)। বীস ভাল সৈন্যাধ্যক্ষ হতে পারেন কিন্তু মাত্র ৫৫,০০০ সৈন্য নিয়ে তিনি কি কবে সামাল দেবেন? তাদেব মধ্যেও অনেকে যেখানে সাম্প্রদাযিকতা রোগে আক্রান্ত? অনেক আমলা যেখানে নির্লজ্জেব মত উসকানি দিচ্ছে? আবার জিন্নাব চাপে সেই বাউন্ডাবী ফোর্সও ২৯ আগস্ট ভেঙে দেওয়া হল। কেন বড়লাট মানলেন সে কথা?

আমার ধারণা আসল ভুল হযেছে ক্ষমতা হস্তান্তব এক বছর এগিয়ে আনাতে। ভারতে পদার্পণ করে যে পরিস্থিতি তিনি ও ইজমে দেখেছিলেন আগেই তাব বর্ণনা দিয়েছি। তাদেব মনে হয়েছিল অবস্থা এমনই অগ্নিগর্ভ যে দ্রুততব ক্ষমতা হস্তান্তব ছাড়া তা সামাল দেওযা যাবে না। কংগ্রেস চাপ দিচ্ছিল তখনই অন্তর্বর্তী সবকাবকে ডোমিনিযান স্বীকাব করা হোক, অথচ অ্যাটলিব ২০ ডিসেম্ববেব ঘোষণা ও জিন্নাব সংকল্প তাব বিরোধী। জিন্না শুধু সংকল্প জানিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন না, তাব ন্যাশনাল গার্ড ও জেহাদী অনুচবরা পঞ্জাবে ও সীমান্তে প্রত্যক্ষ সংগ্রামেব মাধ্যমে তার প্রমাণও দিচ্ছিল। পঞ্জাবেব লাট ইভান জেনকিন্সেব পত্র থেকে তা আমি দেখিয়েছি। 'প্ল্যান বালকান' অনুসরণ কবতে গিয়ে আরো সংকট বাড়ালেন মাউন্টব্যাটন। শেষ পর্যন্ত ভি পি মেনন-বচিত 'প্ল্যান পার্টিশনে' উভয পক্ষকে রাজি করাতে ও ক্যাবিনেটেব সম্মতি নিতে আবো দেবি হল। তাব মূলমর্ম ছিল ১৯৪৭-এর মাঝামাঝি ক্ষমতা হস্তান্তর। কিন্তু দুই ডোমিনিযানের কাছে। আব তার জন্য চাই সঠিক সীমানা নির্ধাবণ। তাব সময় কই?

এখানেই উচিত ছিল তাঁর কংগ্রেসকে বুঝিযে বলা যে, সীমানা নির্ধাবণে সময লাগবে।

হিন্দু, মুসলিম, শিখ সবাইকে বুঝিয়ে তবে দেশভাগ করা সম্ভব। যদি না বোঝে, তবে জনহস্তান্তরের ব্যবস্থা করতে হবে। অতএব ১৯৪৮-এর জুন পর্যন্ত কিছু করা যাবে না। ততদিন, ভাল না লাগলেও, ব্রিটিশ কর্তৃত্ব ওপর ওপর মানতে হবে। তিনি কি তা করেছিলেন ? না। এর কারণ কি রয়্যাল নেভিতে ফিরবার জন্য অত্যন্ত উদগ্রীব ছিলেন তিনি ? অর্থাৎ তাঁর উচ্চাকাঙক্ষাও কাজ করছিল ? সেই উচ্চাকাঙক্ষার যূপে যদি লক্ষ লক্ষ ভারতীয় বলি হয়, কি যায় আসে ? জিগলার এ ধরনের সিদ্ধান্ত মানতে রাজি নন।[৫০৭] দেরি হলেও বড়লাটের ভবিষ্যৎ উন্নতি নাকি ব্যাহত হত না। কিন্তু এটাই যদি সত্য হয়, তবে তো আরো সাবধানে সীমানা নির্ধারণ, প্রয়োজনে জনহস্তান্তর—এসব ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। যিনি S.E.A.C.-এর সর্বাধ্যক্ষ রূপে লক্ষ লক্ষ সৈন্য, শত শত যুদ্ধজাহাজ ও প্লেন ভাবত মহাসাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগর এবং ভারতসীমান্ত থেকে মালয় পর্যন্ত অবলীলাক্রমে সরিয়েছিলেন, তাঁর পক্ষে কয়েক লক্ষ জনহস্তান্তর কি একেবারে অসম্ভব ছিল ? হয়তো কিছু বিশৃঙ্খলা ও বিক্ষিপ্ত দাঙ্গা এড়ানো যেত না কিন্তু গণহত্যা ও গণধর্ষণেব মত নারকীয় ঘটনা এড়ান যেত। তাঁর পক্ষের যুক্তি—তাঁর মোকাবেলা কবাব শক্তি অবসিত হয়ে আসছিল, সৈন্যবাহিনীর ব্রিটিশ অংশ কমে গিয়েছিল, আমলা ও পুলিশেব একটা বড দল সাম্প্রদায়িকতা-বিষে জর্জরিত হযেছিল, ইত্যাদি। দেশভাগের নীতি একবাব নির্ধাবিত হয়ে যাবার পর সাম্প্রদায়িকতা বাডতই। বরং ক্ষমতা হস্তান্তরে আরো দেরি হলে, আরো বাডত। যেখানে ২ লাখ লোক মারা গেছে, সেখানে মারা যেত ২০ লাখ বা ২ কোটি।[৫০৮] ইজ্‌মে ক্ষমতার দ্রুত হস্তান্তরে মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে একমত ছিলেন।[৫০৯] মাউণ্টব্যাটেনের শত্রু, কনরাড করফিল্ডও এতে সায় দিয়েছেন। মুনের ধারণা : "...by lack of decision and dilly-dallying it might easily have been made far worse than it actually was. The vigour and speed with which Lord Mountbatten acted had atleast the merit of confining it to the Punjab."[৫১০] এমনকি মাউণ্টব্যাটেনেব উত্তবাধিকারী, কংগ্রেস নেতা রাজাগোপালাচারি লিখেছেন, "If the Viceroy had not transferred power when he did, there could well have been no power to...transfer."[৫১১]

কিন্তু এরকম ওতর-চাপান নিরর্থক। কে বলতে পাবে কি হলে কি হত ? মানুষের উত্তেজনা বাডে আবার প্রশমিতও হয়। গান্ধী যদি নোয়াখালি, বিহার, কলকাতায় (বিশেষত ১৪/১৫ আগস্ট ও ১-৪ সেপ্টেম্বর) তাঁব 'মিব্যাকল' দেখাতে পাবেন, তবে সময় পেলে, তিনি কেন তা পারতেন না পঞ্জাবে ? তিনি ব্যস্ত ছিলেন পূর্ব সীমান্তে, কিন্তু নেহরু কেন যাননি পঞ্জাবে ? নেহরু না হয় ব্যস্ত ছিলেন প্রশাসনে—কি করছিলেন কংগ্রেসের অন্য নেতারা ? গান্ধীর অন্যান্য শিষ্যেরা ? বড়লাট কি জিন্নাকে অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনে চাপ দিতে পারতেন না ? প্রয়োজনে তিনি কি ব্রিটিশসৈন্য আমদানি করতে পারতেন না ? আরো উড়োজাহাজ ? 'তমস' যাঁরা পড়বেন, দেখবেন—একটি উড়োজাহাজ গ্রামের ওপব দিয়ে উড়ে গেলে মানুষের মনে কি সাহস ফিরে আসে। ব্রিগেডিয়ার ব্রিসটো বলছেন, দেশভাগ একবছর পেছোলে পঞ্জাবে এ ঘটনা ঘটত না। ভারতীয় সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষ লকহার্টের মন্তব্য—স্বাধীনতা দিবসের আগে সৈন্যদের স্ব-স্ব দেশে ঠিকমত স্থাপিত করলে এমন ব্যাপক ট্রাজেডি ঘটত না। আমি কিছুতেই মাউণ্টব্যাটেনকে দায়মুক্ত করতে পারছি না। আর জনহস্তান্তর অনেক বেশি শৃঙ্খলার সঙ্গে করা যেত না—মানতে রাজি নই। অবশ্য যদি তার জন্য বড়লাট, কংগ্রেস ও লীগের মানসিক প্রস্তুতি থাকত।

সেই মানসিক প্রস্তুতি ছিল না। কংগ্রেস ক্ষমতা পাবাব আগ্রহে ও 'দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগ হচ্ছে না'—এই আওযাজেব আডালে একটা ভযঙ্কর সম্ভাবনাকে জোব করে ভুলতে চাইছিল। ইতিহাস কোন আত্মপ্রতাবণা প্রশ্রয় দেয় না। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায়—"অন্ধ হলে কি প্রলয বন্ধ থাকে ?" কংগ্রেস/লীগ যে-মুহূর্তে দেশভাগেব প্রস্তাব মেনে নিল এবং মোটামুটি একটা সীমা (notional line of division) ঠিক হল, সেই মুহূর্তে উভয সীমান্তপাবেব সংখ্যালঘুদের বুঝিযে বলা উচিত ছিল—হয তাদেব প্রাণ ও সম্পত্তির জন্য রাষ্ট্রীয গ্যাবাণ্টি আদায করা হবে, না হয তাদেব সুশৃঙ্খলভাবে ভাবত বা পাকিস্তানে নিয়ে যাওযা হবে। ৪ জুনই বডলাট নেহরু ও জিন্নাব কাছ থেকে সে গ্যাবান্টি দাবি করতে পাবতেন। তাবপবই, সে গ্যাবাণ্টি অবহেলিত হলে, কি হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত ছিল—অর্থাৎ সংখ্যালঘুদের যানবাহনেব সুব্যবস্থা ও তাদেব সম্পত্তি বাবদ ক্ষতিপূরণের দায ভাগ। দুই ডোমিনিযানেব মধ্যে টেবিল, চেযাব, লাইব্রেবীব বই, টাইপরাইটার ভাগ হতে স্বচক্ষে দেখেছি। তা হল, আব এত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপাবটা হল না ?

আব একটা সম্ভাবনা ছিল। বডলাটকে মহাত্মা বলতে পারতেন—"দেশভাগ এডাতে আপনাকে আমি লীগেব হাতে সব ক্ষমতা দিয়ে আম্পাযার হিসাবে থেকে যেতে অনুরোধ কবেছিলাম। আপনি সে পথে গেলেন না। এখন আপনি যা তা কবে দেশভাগ করে, সংখ্যালঘুর কোন ব্যবস্থা না কবে, এক বছর আগেই ক্ষমতা দিতে চাইছেন। তা আমি মানব না। আমি আমৃত্যু অনশন শুরু করলাম। হয় আপনি ১৯৪৮-এব জুন পর্যন্ত থেকে সব কিছু শৃঙ্খলার সঙ্গে সম্পন্ন করবেন, না হয় আমাব মৃত্যু হবে।" গান্ধী তাও করলেন না। জনহস্তান্তবের কথা তিনি ভাবছিলেন তার প্রমাণ পাওযা যায কিন্তু তাঁর সমাধান ছিল—ব্রিটিশদেব অবিলম্বে দেশত্যাগ ও হিন্দু-মুসলিম, যে যেখানে আছে, সেখানে, অহিংস পথ অবলম্বন কবে বীবের মত থাকা। ব্রিটেনেব দেশত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই যেন মন্ত্রবলে হিন্দু-মুসলিম-শিখ মিলন সম্পন্ন হত ! যেন জিন্নাব প্রতিশ্রুতি বিশ্বাসযোগ্য ! আব 'বীবেব মত থাক, তোমরা অহিংস থাকলে বিপক্ষ হিংসাব আশ্রয় নেবে না', বললেই যেন তা সত্য হয়। অতিরিক্ত আদর্শবাদীদের এ ধবনের 'অবসেসন' থাকে। এও তাই। স্বাধীনতাব প্রাক্কালে বহু প্রার্থনান্তিক ভাষণে গান্ধী বলছিলেন, কংগ্রেস এতদিন অহিংস সংগ্রাম কবেনি, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ করেছে। সে শিক্ষা কি তাঁব এত দিনে হল ? ১৯৪২-এর আন্দোলনতো মাত্র পাঁচ বছর আগেকার ব্যাপার। তাঁর হিংসা (যতই সরকারেব 'সিংহসুলভ হিংসার' প্রতিক্রিয়া হোক)-র স্মৃতি মুছে গেল ? আর যেখানে বাতাবরণ হিংসায সম্পূর্ণ কলুষিত, সেখানে একপক্ষের অহিংসা তো নিশ্চেষ্ট মৃত্যুবরণ। নিজেই তিনি কাপুরুষতার চেয়ে হিংসাশ্রয়ী প্রতিরোধকে মহত্তর বলেছেন। কে বলে দেবে কখন কোনটা ঠিক? গান্ধীর কাছে শান্তি ও অহিংসা সবচেয়ে বড় মূল্য (value)। মানুষের প্রাণ তার কাছে তুচ্ছ। তিনি নিজে তা বিসর্জন দিতে প্রস্তুত বার বার দেখিযেওছেন। কিন্তু মনুষ্যত্বের কতখানি উত্তরণ ঘটলে তা সম্ভব হয় ? প্রাণ ভয়ে ভীত, স্ত্রীকন্যার ইজ্জতেব জন্য ভীত, সম্পত্তির জন্য উদ্বিগ্ন, বহু পুরুষের বাস্তু ভিটার জন্য ব্যাকুল মানুষের কাছে তিনি এত বড় আশা করেন কি করে ? সে শিক্ষা এতদিন ধরে তিনি বা তাঁর মন্ত্রশিষ্যরা তাদের দিতে পারেননি, সে কি তাদেব দোষ ? গীতায় তাঁর মত দখল আমার নেই, তবু সেখানেও দেখি এই উচ্চস্তর "অনেক জন্ম সংসিদ্ধ"—বহু জন্মের বহু সাধনার ফল। তিনি ১৯২০ থেকে ১৯৪৭—এই ২৮ বছরে—এত কোটি লোককে এত বড়ো শিক্ষা দিতে পারেন ? আর তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্যরা—প্রফুল্ল ঘোষ, সুরেশ ব্যানার্জীরা যাঁদের অন্যতম—কেন তাঁরা পূর্ববঙ্গ ত্যাগ

কবলেন ? সাধুবাদ দিতে হবে সতীন সেনের মত কিছু পুরোন বিপ্লবীকে, যাঁবা ভীত মানুষকে অভয় দেবাব জন্য থেকে গেলেন। গান্ধীর বলা উচিত ছিল হয় সুশৃঙ্খল দেশভাগ—না হয় আমৃত্যু অনশন। ব্রিটিশ কর্মচারী ও সৈনিকদের, ধনিক ও বণিকদের স্বার্থরক্ষাব যদি সুব্যবস্থা হয়, তবে হিন্দু, মুসলিম, শিখদের জন্যও ব্যবস্থা করে যেতে হবে। স্বাধীনতা পেছোয তো পেছোক। ১৯২৯-এ পূর্ণ স্বরাজের শপথ নিয়ে ১৯৪৭-এ যদি ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস পেতে হয, তবে সত্যিকাবেব স্বাধীনতা জন্য না হয় আব কিছু দেরি হল। আর অনশনে যদি তিনি মৃত্যুবরণ করতেন তা কি কয়েক মাস পরে নাথুরাম গড্সের গুলিতে মৃত্যুব চেযে মহত্তর অর্থবহ হত না ? আমার ধাবণা—তিনি বেঁকে দাঁড়ালে অ্যাটলি সবকারের টনক নড়ত, মাউন্টব্যাটেন কর্মসূচি বদলাতে বাধ্য হতেন।

সাধাবণ বাজনৈতিক বিচাবে নেহরু ও প্যাটেল ভেবেছিলেন, এত বৃহৎ সংখ্যক মুসলিম ভাবতে বয়ে যাবে যে তাদেব নিরাপত্তাব স্বার্থে পাকিস্তান সংখ্যালঘুদেব গাযে হাত দেবে না। তাঁদেব বোঝা উচিত ছিল স্বজাতীয় সংখ্যালঘুদেব জন্য জিন্নাব বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা ছিল না। তাঁদেব তিনি সেভাবেব মত ব্যবহার কবতে চেয়েছিলেন। তাদেব প্রতি সামান্য অত্যাচাব হলেই তিনি ভাবতবিবোধী প্রচাবে নামবাব সুবর্ণসুযোগ পাবেন। আব পাকিস্তানেব হিন্দু-শিখ তো 'হস্টেজ'। মাঝে মাঝে তাদের ভয দেখিযে বিতাড়ন কবা ও তাদেব সম্পত্তি স্বল্প বা বিনামূল্যে অধিগ্রহণ করার কৌশল নেয লীগ নেতৃবৃন্দ। তাবা জানত গান্ধী ও নেহরু এ কৌশল কোনও দিন নেবেন না।

কংগ্রেসেব কি কোন পালটা কৌশল ছিল ? মুসলিমদেব অভেদ্যবর্ম ছিলেন স্বযং গান্ধী। ১-৪ সেপ্টেম্বব কলকাতায কি ঘটেছিল বলেছি। দিল্লীতে গান্ধীব অনশন (১২ জানুযারি ১৯৪৮) এর কথাও সুবিদিত। সেই অনশন ভঙ্গেব শর্ত ছিল—যে সব মুসলমান দিল্লী ছেড়ে গেছে তাদেব ফিরিযে এনে তাদেবই পবিত্যক্ত ঘববাড়িতে পুনর্বাসন কবাতে হবে। আজাদেব মত সহানুভূতিশীল ব্যক্তিও বলছেন, এ দাবি অপূবণীয ও অবাস্তব। তা হলে ওই সব স্থানে আশ্রয়প্রাপ্ত হিন্দু ও শিখ উদ্বাস্তুদের তাড়াতে হয। বহু সাধ্যসাধনাব পব আজাদেব চেষ্টায় এবং ছটি শর্তে তিনি অনশন ভঙ্গ কবেছিলেন—যাব অন্যতম ছিল ভাঙা দবগা সাবিযে দিতে হবে এবং তাব কাছাকাছি যে সব মুসলিম বসবাস কবত তাদেব সেখানেই পুনর্বাসন দিতে হবে. মুসলিম উদ্বাস্তুবাহী ট্রেনেব ওপব আক্রমণ কবা চলবে না, এমন হৃদয়ের পবিবর্তন চাই যাতে একজন মুসলমানও ভাবত ত্যাগ না করে।[৫১২]

এই প্রসঙ্গে গান্ধী ও প্যাটেলেব মতপার্থক্য, যা প্রায মনোমালিন্যে পবিণত হতে বসেছিল, তার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন মৌলানা। দিল্লীর ডেপুটি পুলিশ কমিশনার রণধাওয়া ছিলেন মুসলিমদেব বিশ্বাসভাজন। কিন্তু পঞ্জাবে শিখদেব প্রতি অত্যাচার তাঁকেও সাম্প্রদাযিক করে তোলে। রণধাওয়াব বিরুদ্ধে মুসলিমদেব অভিযোগ প্যাটেল শোনেননি। নেহরু চেয়েছিলেন দিল্লীতে কিছু অঞ্চল মুসলিমদের জন্য সংবক্ষিত হোক, আর মুসলিম শবণার্থীর ভাব নিক মুসলিমরা। প্যাটেল তাতে আপত্তি জানান। গান্ধী অবস্থার অবনতি দেখে প্যাটেলকে ডেকে পাঠান। কিন্তু প্যাটেল বলেন—সব ঘটনা বাড়িয়ে বলা হচ্ছে, মুসলিমদের ভয়ের কাবণ নেই। গান্ধী বলেন—এদের রক্ষা করতে পাবছেন না বলে তিনি অপমানিত এবং অসহায় বোধ করছেন। নেহরু বলেন—পবিস্থিতি অসহনীয় এবং তাঁর বিবেক তাঁকে পীড়িত করছে। প্যাটেল নাকি উত্তর দেন—নেহরুর অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। হয়তো কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটছে কিন্তু সরকার মুসলিম-প্রাণ ও সম্পত্তিরক্ষা করতে সদা তৎপর। প্যাটেল পক্ষপাতিত্ব ঢাকতে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে মুসলিমরা

প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করেছিল এবং হিন্দু ও শিখবা প্রথমে আক্রমণ না করলে তাবাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। কাবোলবাগ ও সবজিমণ্ডী থেকে সংগৃহীত অস্ত্র দেখে আজাদরা অবাক—তাতে ছিল কযেক ডজন মর্চেপড়া বান্নাব ছুরি, কিছু লোহাব বেলিং ও জলেব পাইপ !! মাউন্টব্যাটেন নাকি হেসেই ফেলেছিলেন। ইতিমধ্যে পুবানা কিল্লাব মুসলিম আশ্রয়প্রার্থীদেব অবস্থা আবও খাবাপ হয়েছে। সহ্য কবতে না পেরে গান্ধী অনশনেব সংকল্প নিলেন। "It hurt Gandhiji deeply that Patel should now be following a policy which was quite contrary to everything for which Gandhiji stood." অনশনেব প্রথম দিন সন্ধ্যায প্যাটেল অনশনেব প্রতিবাদ কবে বললেন, "এতো আমাবই বিরুদ্ধে যাবে, যেন আমিই মুসলিমদেব হত্যাব জন্য দায়ী।" গান্ধী শান্তকণ্ঠে বললেন, "আমি চীনে নেই, এখন দিল্লীতে আছি। আমি চোখ কানও হাবাইনি। তুমি যদি বল মুসলিমদেব অভিযোগের কারণ নেই, তাহলে তুমি আমাকে বিশ্বাস করাতে পারবে না।....আমার আশা অনশন দ্বাবা হিন্দু-শিখ ভাইদের চোখ খোলাবো।" সর্দাব নাকি খুব বিবক্ত হলেন এবং গান্ধীব সঙ্গে কর্কশভাবে কথা বলতে লাগলেন। জওহ্বলাল ও আজাদ তাঁব আচবণে মর্মাহত হলেন এবং নীবব থাকতে পাবলেন না। আজাদ বললেন, "বল্লভভাই, আপনি হয়তো বুঝতে পারছেন না, কিন্তু আমবা অনুভব কবছি, গান্ধীজিব প্রতি আপনার ব্যবহাব কতটা অপমানজনক এবং আপনি তাঁকে কতটা আঘাত দিচ্ছেন।" সর্দার চলে যাবাব জন্য উঠে দাঁড়ালেন। আজাদ অনুবোধ কবলেন, "এখন দিল্লীব বাইবে যাবেন না।" প্যাটেল নাকি উচ্চৈঃস্বরে বললেন, "আমার থেকে কি লাভ? গান্ধীজি তো আমার কথা শুনবেন না। তিনি সারা বিশ্বেব সামনে হিন্দুদের নামে কালিমা লেপন কবতে চান। এই যদি তাঁব মনেব ভাব হয, তাঁকে আমাব দরকার নেই। ...আমি বোম্বাই যাবই।" আজাদ অবাক হযে ভাবলেন, যে প্যাটেল গান্ধীব হাতে তৈবি তিনি কিভাবে এ সুরে কথা বললেন?[৫১৩]

আজাদ এব অনেকখানি অংশ প্রথম সংস্করণে প্রকাশ কবেননি। যদি সত্যও হয়, তবে এটাকে অত্যন্ত গুরুত্ব না দিয়ে প্যাটেলেব উত্তেজনার প্রমাণ হিসেবে নিলে ক্ষতি কি? মনে রাখতে হবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীরূপে তাঁব কাছে পঞ্জাবী মুসলিমদেব অত্যাচারেব যে খবর আসছিল তা আজাদেব জানাব কথা নয়। শান্তিবক্ষার দাযিত্বের ওপর গান্ধীজির প্রাণের দায়িত্ব চাপলে প্যাটেলেব উত্তেজনা বেড়ে যাওযা আশ্চর্য নয। ক্যাম্বেল জনসনের ডায়েরিতে শিখদের কৃপাণ নিয়ে ঘোরবাব অধিকার নিয়ে নেহরু ও প্যাটেলেব বিরোধেব উল্লেখ পাচ্ছি। প্রথমে প্যাটেল তা নিষিদ্ধ করেন কিন্তু শান্তি ফিরে এলে, আবার তা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য রাজি হন। বাজেন্দ্র প্রসাদের সঙ্গেও নেহরুর মতান্তর হয়। ভারতীয়দের সভ্য মানুষেব মত আচরণ কবতে বিভিন্ন বক্তৃতায উদ্বুদ্ধ করছিলেন নেহরু। রাজেন্দ্র প্রসাদ তাতে আপত্তি জানিয়ে বলেন—বিশ্বজনমত এতে ভারতের বিরুদ্ধে যাবে।[৫১৩ক]

যাই হোক, হতে পাবে বাস্তববাদী প্যাটেল দিল্লীব মুসলিম 'ঝি'দের মেরে পঞ্জাবেব মুসলিম 'বৌ'দের শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। তিনি ইহুদীদের মত 'চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত'-এর নীতি কোনও দিন নেননি। কিন্তু এটাও তো কোন দীর্ঘস্থায়ী কৌশল হতে পারে না। বড়লাটের কাছে জনহস্তান্তরের কথা তিনি তুলেছিলেন ১৩ জানুয়াবি। কিন্তু কেন এগোননি বুঝতে পারি না। তিনি কি ভেবেছিলেন দেশভাগ সাময়িক? ব্রিটিশ সৈন্য চলে গেলে লড়াই করে ঢাকা ও করাচী নিয়ে নেবেন—যেমন নিলেন জুনাগড় ও হায়দ্রাবাদ? যদি তা ভেবে থাকেন, মহা ভুল তিনি করেছিলেন। মধ্যপ্রাচ্য থেকে মালয

পর্যন্ত বিস্তৃত মুসলিম সম্প্রদায় ছিল ঠাণ্ডা লড়াই-এর অন্যতম হাতিয়ার। কেন্দ্র ছিল পাকিস্তান। তাকে সাহায্য করতে ব্রিটিশতো বটেই, আমেরিকাও এগিয়ে আসবে—এটা তাঁর বোঝা উচিত ছিল। কাশ্মীরে ঠেকে শেখার আগেই। নেহরুরও কোন কৌশল ছিল না। তাঁর মত ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তির কাছে এমন হানাহানি মধ্যযুগীয় বর্বরতার সমতুল্য, অতএব সর্বশক্তি প্রয়োগে বিনাশযোগ্য, মনে হয়েছিল। দিল্লীর দাঙ্গা (তার আগে বিহারে) থামাতে কয়েকবার প্রাণ সংশয় করেছিলেন তিনি। কিন্তু তিনিও ভেবেছিলেন পাকিস্তানের অর্থনীতি এত দুর্বল যে শীঘ্রই তা ভেঙে পড়বে এবং সে ভারতের সঙ্গে যোগ দেবে। কারিয়াপ্পাকে তিনি লিখেছিলেন, "Ultimately there will be a united and strong India. We have often to go through the valley of the shadow before we reach the sun-lit mountain tops." যদি পাকিস্তানের অর্থনৈতিক দৌর্বল্যের ওপর তিনি নির্ভর করে থাকেন, তবে ভুল করেছিলেন। পাকিস্তানেব ভৌগোলিক ও সামবিক গুরুত্বের জন্য কোটি কোটি ডলার ও পাউণ্ড ঋণরূপে বা দানরূপে বর্ষিত হবে—এটা তাঁর বোঝা উচিত ছিল। কাশ্মীর প্রসঙ্গ রাষ্ট্রপুঞ্জে ওঠার পব এ-বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না। গান্ধীব কথা আগেই বলেছি। জনহস্তান্তর কবার অর্থ দ্বিজাতিতত্ত্বেব ভিত্তিতে দেশভাগ হচ্ছে স্বীকার কবে নেওয়া। তা তিনি কবতে পারেন না। তাঁব বিশ্বাস ছিল—মনুষ্যত্বেব জয় হবেই। মনের মধ্যে ভাগ না হলে ম্যাপে ভাগ হলেই বা কি? আর বাকি জীবনটা শান্তিব দূত হয়ে তিনি পাকিস্তানে কাটাবেন স্থির কবেছিলেন। তিনি পাকিস্তানে থাকলে সেখানকাব সংখ্যালঘুবা নিশ্চিন্ত হবে। ভাবত থেকে নেহরু সংখ্যালঘুদের স্বার্থবক্ষা করবেন। তবে আর জনহস্তান্তরের মত জটিল ব্যাপাবে জড়িয়ে পড়া কেন? ইংবেজবা দেশত্যাগ করলে এ সব সমস্যার গুরুত্ব থাকবে না, এই ছিল তাঁব দৃঢ় ধাবণা।

যাই হোক জনহস্তান্তরেব কথা নিয়ে কেউই বেশি এগোননি। এব বিষময় ফল ফলেছে প্রথমে পশ্চিমে, পরে পূর্বে। প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রীদেব কাছে লেখা নেহরুব চিঠিপত্রের প্রথম দুই খণ্ডে তার বহুল প্রমাণ মিলবে।

এবাব আসছি প্রথম প্রশ্নে—দেশভাগ কি অনিবার্য ছিল? কোনও রকমে তা প্রতিহত করা যেত না? শুধু বামপন্থীদের নয় অনেকেরই ধাবণা—কবা যেত। যদি সমস্ত সাম্রাজ্যবাদবিবোধী শক্তি সংহত করে কংগ্রেস (অর্থাৎ গান্ধী) এক ব্যাপক গণ-আন্দোলন শুরু করতেন ১৯৪৬ সালে। ১৯২২-এর বারদোলি প্রস্তাবের পব রজনী পাম দত্ত কংগ্রেসকে 'বিশ্বাসঘাতক' আখ্যা দিয়েছিলেন। আজ দেশভাগের চল্লিশ বছর পর অধ্যাপক হীরেন মুখার্জী (এবং আরো অনেকে) ১৯৪৬ সালে কংগ্রেসের নিষ্ক্রিয়তাকে প্রায় সেই আখ্যাই দিচ্ছেন।[৫১৪] তাঁদেব মতে, ১৯৪৫-৪৬ সালে দেশের পরিস্থিতি এ ধরনের বৈপ্লবিক সংগ্রামের অনুকূল ছিল। কিন্তু কৃষক-মজুর শ্রেণীর নানা ন্যায্য দাবি মেটাতে অসম্মত বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনায় জড়িয়ে পড়ে অযথা কালক্ষেপ করে ও শেষে তাব চক্রান্তের শিকার হয়, দেশভাগের বিনিময়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করে। স্বাধীনতার পরেও বহু বৎসর বামপন্থীদের আওয়াজ শোনা যেত—"এ আজাদী ঝুটা হ্যায়।"

॥ ১৭ ॥

এসব অভিযোগ কি সত্য ? সত্য হলেও কতটা সত্য ? তার পূর্বে কয়েকটা কথা মনে রাখতে হবে। (১) ১৯৪২-এর ভারতব্যাপী কুইট-ইন্ডিয়া আন্দোলন বামপন্থীরা পরিহার কবেছিল তাত্ত্বিক কারণে। ব্রিটেন কি সাম্রাজ্যবাদী ছিল না ? সংগ্রামের অনুকূল পরিস্থিতি কি ছিল না ? ছিল, কিন্তু সাম্যবাদী বিপ্লবের পিতৃভূমি রাশিয়ার ওপর ফাসিস্ত বাহিনীর আক্রমণের ও রাশিয়া-ব্রিটেনের মৈত্রীর পরিপ্রেক্ষিতে সংগ্রামটা বৈপ্লবিক হত না। বরং প্রতি-বৈপ্লবিক হত। বলা বাহুল্য, কংগ্রেস ভিন্নমত পোষণ করত এবং তারপর থেকে কংগ্রেস , বিশেষত কংগ্রেস সোশালিস্ট পার্টি ও কম্যুনিস্ট পার্টিব মধ্যে কোন মনেব বা মতের মিল দেখা দেয়নি। সেই মরণপণ সংগ্রামে যে কম্যুনিস্ট পার্টি কংগ্রেসের পাশে না দাঁডিযে ব্রিটেনের সমরায়োজনে সাহায্য কবার ডাক দিয়েছিল, তার কি নৈতিক অধিকার রযেছে ১৯৪৫-৪৬ সালে কংগ্রেসকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে ডাক দেবার ? যদি চৌরিচৌরার পর রজনী পাম দত্ত কংগ্রেসকে বিশ্বাসঘাতক মনে করতে পারেন, তবে ১৯৪২-এব পর কংগ্রেসী নেতারাও কম্যুনিস্টদের বিশ্বাসঘাতক মনে করতে পারেন। ১৯৪২-এর আন্দোলনের কঠোব সমালোচক হলেও আমি এ মনস্তত্ত্ব অস্বীকার কবতে পারি না। আসলে ঠাণ্ডা লডাইয়ের পরিস্থিতিতে স্তালিন পুনবায় সাম্রাজ্যবাদ-বিবোধী লাইন নিয়েছিলেন এবং ভারতীয কম্যুনিস্ট পার্টি তা অনুসরণ কবছিল। 'Zhdanov line'-এর নানা তাত্ত্বিক সমর্থন আমবা শুনেছি কিন্তু দেশবাসীর অধিকাংশ তাতে অভিভূত হত না। তাকে এক কৌশল (এবং সুবিধাবাদী কৌশল) বলে ধরে নিত।

(২) যখন কংগ্রেস প্রচণ্ডভাবে 'পাকিস্তান' নীতিব বিবোধিতা কবছিল, গান্ধী ক্রিপস্-প্রস্তাবে উল্লিখিত 'provincial option'-এব মধ্যে পাকিস্তানেব গন্ধ পেযে তা প্রত্যাখ্যান কবাব সংকল্প নিযেছিলেন, ঠিক সেই সময় অধিকাবী-থিসিসে 'পাকিস্তান'কে সমর্থন জানান হযেছিল। ১৯৪৬ পর্যন্ত জাতীযতা প্রশ্নেব স্তালিনীয সমাধান আঁকডে ধরে থেকে, সহসা তারই অনিবার্য পবিণাম—দেশভাগ—অস্বীকার কবলে চলবে কেন ? অধিকাবী-থিসিস কংগ্রেস ও কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে ব্যবধান বাড়িয়ে দিয়েছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

(৩) ১৯৪৫-৪৬ সালে দেশেব পবিস্থিতি কতটা বিপ্লবের অনুকূল ছিল ? সংঘটিত হলেও কি তা সফল হত ? অধ্যাপক হীবেন মুখার্জী লিখছেন, "From Nuvember 1945 to July 1946, especially, was a period of time when one could feel the truth of Karl Marx's observation;'sometimes twenty years are but as one day and then there come days that are the concentrated essence of twenty years.' This truth the Congress leaders chose to froget." গান্ধীর 'ideological fixation' তিনি ক্ষমা করতে পারেন কিন্তু আজাদ ও নেহরুকে কদাপি নয়। সে সব দিনের গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রামকে কংগ্রেস সভাপতি আজাদ 'incidents' বলে তুচ্ছ করেছেন, তার জন্য বিরাগ প্রকাশ করেছেন, 'গুণ্ডা'দের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা রক্ষা করতে কংগ্রেসীদেব আহ্বান জানিয়েছেন,সমস্ত হরতাল, ধর্মঘটের প্রতিবাদ করেছেন। এমন কথা বলতে শোনা গেছে যে "ইংরেজরা দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে, আমাদের কাজ তাদের তল্পিতল্পা গুছিয়ে দেওয়া।" মুখার্জী একে

'tomfoolery' আখ্যা দিয়ে বলছেন—হিন্দু-মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ কবার এমন সুযোগ আব দেখা দেয়নি। অহিংসা ও উপায ও লক্ষ্যের পরস্পব-নির্ভবতা প্রভৃতি কিছু "পবিত্রতার ভাণ" বর্জন কবলে "there could then have taken place a luminous upsurge to cleanse our body politic of communal poison and foreign subjection"। অরুণা আসফ আলিব ভাষায় ব্যারিকেডেই সম্পন্ন হত হিন্দু-মুসলিমেব চিবমিলন। উলটে ১৯৪৫-এর ডিসেম্ববে সব কম্যুনিস্টদের এ আই সি সি থেকে বহিষ্কৃত কবা হয়েছিল। এমনকি বোম্বাই-এ অবস্থিত পার্টিব প্রধান অফিসে ১৯৪৬-এব ২৩ জানুযারি হামলা চালনা হযেছিল। প্রতিক্রিয়া আব কাকে বলে?

সুমিত সবকাবেব মতে দেশেব বিদ্রোহী মনোভাবেব প্রথম বড়ো প্রমাণ—আই এন এ প্রশ্নে ২১-২৩ নভেম্বব (১৯৪৫)-এব গণবিক্ষোবণ। তাবপব থেকে মাঝে মাঝে তা দেখা গেছে। তার সঙ্গে নাকি ফরাসী বিপ্লবেব 'journee'ব তুলনা কবা চলে। প্যাটেল পুলিশের সঙ্গে এ ধবনের মাবামাবি পছন্দ করেননি : ওযার্কিং কমিটি (৭-১১ ডিসেম্বর) অহিংসার পক্ষে মুখব হযেছিল। ক্যাবিনেট সাব কমিটি এই অবস্থায প্রথমে পার্লামেন্টাবী ডেলিগেশন ও পবে ক্যাবিনেট মিশন পাঠানব সিদ্ধান্ত নেয। ওযাভেলেব 'ব্রেকডাউন প্ল্যান'ও সাক্ষ্য দেয যে তিনি গণআন্দোলনকে ভয পাচ্ছিলেন। দ্বিতীয সংকট দেখা দেয ফেব্রুয়াবি (১৯৪৬)-তে। প্রথম (নভেম্বব) সংকটেব মত দ্বিতীয সংকটেও কম্যুনিস্ট ছাত্র সংগঠন বড়ো ভূমিকা নিয়েছিল। আর ফেব্রুযাবিতে (বসিদ আলিব ৭ বছব জেলের প্রতিবাদে) তো লীগ ছাত্র সংস্থাই ধর্মঘটেব ডাক দিযেছিল। এব ফলে ছাত্র ও শ্রমিক, হিন্দু ও মুসলিম, কংগ্রেস, লীগ ও কম্যুনিস্ট এমন এক সম্প্রীতি ও সহযোগিতা দেখিযেছিল যাকে, ঠিকমত নেতৃত্ব দিলে, সুদূব প্রসাবী সম্ভাবনা দেখা দিত। ইতিমধ্যে দেশব্যাপী বেল ও ডাক-তাব কর্মী, পবে সবকাবী কর্মী, ধর্মঘটেব হুমকি দিচ্ছিল। গৌতম চট্টোপাধ্যায একে 'The Almost Revolution' আখ্যা দিযেছেন। আজাদ অথচ এ সব ধর্মঘটকে 'বর্তমান যুগে অচল' বললেন—কাবণ ইংবেজবা তো 'কেয়ারটেকাব' মাত্র। তৃতীয এবং সবচেয়ে বড়ো সংকট হল বাজকীয নৌবহবে বিদ্রোহ (১২-২৩ ফেব্রুয়াবি ১৯৪৬)। আবেগেব বশে ডঃ সবকাব একে ১৯০৫-এব কৃষ্ণসাগব নৌবাহিনীব বিদ্রোহেব সঙ্গে তুলনা কবেছেন, এমনকি আইজেনস্টাইনেব বিখ্যাত ছবি—'ব্যাটলশিপ পোটেমকিন'-এব উল্লেখও কবেছেন। ধর্মঘট যুদ্ধে পবিণত হল। আবাব দেখা গেল হিন্দু ও মুসলিম, ছাত্র-শ্রমিকেব সহযোগিতা। সি পি আই-এব সাধাবণ ধর্মঘটকে সমর্থন জানালেন অরুণা আসফ আলি। কিন্তু আবাব দেখা দিল প্রতিক্রিয়া কংগ্রেস শিবিবে, প্যাটেলেব ও লীগ শিবিরে, চুন্দ্রিগড়েব মূর্তিতে। বোম্বাই-এব (২২ ফেব্রুযাবি) শ্রমিক ছাত্র মোর্চা হটাতে দুই ব্যাটেলিযান সৈন্য লেগেছিল। সবকাবী হিসাব মত ২২৮ জনেব মৃত্যু ও ১০৪৬ জন আহত হয়েছিল। প্যাটেল ও জিন্না একযোগে বিদ্রোহীদেব আত্মসমর্পণ করতে বলেন ও বৈপ্লবিক সম্ভাবনা অঙ্কুবে বিনষ্ট হয। ডঃ সবকাবের মতে বয়্যাল ইন্ডিয়ান নেভির বিদ্রোহীদের ঐতিহাসিক ভূমিকা আই এন এ বন্দীদেব ভূমিকাব চেযেও বড়ো।[৫১৬] আব হীবেন মুখার্জীব মতে—"it was this that forced from the British Government steps intended to modify and then overcome it." এর অব্যবহিত ফল—ক্যাবিনেট মিশন।

অনেকটা একই ধরনেব বিশ্লেষণ করেছেন সবোজ মুখোপাধ্যায়। তিনি শুধু যোগ কবেছেন ১৯৪৬ সালেব প্রথমে নির্বাচন উপলক্ষে বিভিন্ন কম্যুনিস্ট অফিস ও কর্মীদেব ওপব কংগ্রেসী হামলাব কথা।[৫১৭] কম্যুনিস্ট নির্বাচনী ইস্তাহাবে ছিল অখণ্ড বাংলাব দাবি,

ছিল ব্যাপকতর ভিত্তিতে গণপরিষদ গঠনের আহ্বান। এ আই সি সি-তে কে এম আস্রাফের এই মর্মের সংশোধনী প্রস্তাব বাতিল হলে কম্যুনিস্টরা কংগ্রেস ত্যাগ করে। সরোজবাবুও নভেম্বর (১৯৪৫) ও ফেব্রুয়ারি (১৯৪৬)-এর গৌরবময় দিনগুলির কথা স্মরণ করেছেন।[৫১৮]

এই প্রসঙ্গে বেশি কিছু না বলে সদ্যপ্রকাশিত বিপান চন্দ্র ও অন্যান্য রচিত India's Struggle for Independence 1857-1947 (Viking, 1988) থেকে উদ্ধার করছি কিছু মন্তব্য। তার আগেই বলা ভাল বিপান চন্দ্রও একজন বামপন্থী ঐতিহাসিক। উক্ত ঘটনাবলী বর্ণনা করে তিনি (বা তাঁরা) লিখছেন—"The Congress lauded the spirit of the people and condemned the repression by the Government. It did not officially support these struggles as it felt their tactics and timing were wrong." তিনি (বা তাঁরা) আরও লিখছেন—"Communists joined hands with Congressmen in advising the people of Calcutta in November 1945 and February 1946 to return to their homes. Communist and Congress peace vans did the rounds of Karachi during the RIN revolt." জনগণের উত্থানের ভয় পেয়ে কংগ্রেস আলোচনার পথ নেয়নি। ২২ সেপ্টেম্বর এ আই সি সি যে নীতি নেয় তাতে প্রথমে আলোচনার পথে যত দূর অগ্রসর হওয়া যায় ততদূর যাবার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল—তা চিরাচরিত কংগ্রেসী সংগ্রামের কৌশল বলে। "...the card of negotiation was to be played first, that of mass movement was to be held in reserve."[৫১৮ক] এই প্রসঙ্গে হরিজন (৩ মার্চ ১৯৪৬)-এ প্রকাশিত গান্ধীজির মন্তব্য আমি আগেই উদ্ধৃত করেছি। অরুণার উদ্দেশে তিনি বলেছিলেন, "Fighters do not always live at the barricade .what would be lost by waiting? Let the official delegation prove for the last time that British declarations are unreliable. But the nation too has to play the game If it does, the barricade must be left aside, atleast for the time being." গণআন্দোলন চিরতরে পরিহার করেননি তিনি, শুধু অবস্থা বুঝে আলোচনাপথ পরখ করতে চাইছিলেন, এই কথা মনে রেখে বিষয়টা বিচার করতে হবে। তাছাড়া বিপ্লবের জন্য বাস্তব অবস্থা অনুকূল ছিল কিনা তা সরকার, মুখার্জী, চ্যাটার্জীদের বিশ্লেষণে রুশ বিশ্ববীক্ষার আলোকে নির্ধারিত হয়েছে। ১৯৪২-এ মনে হয়েছে তা অনুকূল নয়, ১৯৪৬-এ মনে হয়েছে অনুকূল। এই বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ কোন সময়ই 'অবজেকটিভ' ছিল না, তার মধ্যে 'সাবজেকটিভ' বা মন্ময়ত্বের ছাপ পরিষ্কার।

বস্তুত একথা নাম্বুদ্রিপাদও স্বীকার করেছেন; তিনি বলছেন—কম্যুনিস্ট নীতির ভিত্তি ছিল বিশ্ব রাজনীতিতে বিভিন্ন শক্তির বিন্যাস বিষয়ে প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিক বিচার। ভারতের মুক্তি সংগ্রাম আলাদা নয়, তা ফাসিজিমের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী সংগ্রামের অঙ্গ। অন্যদিকে কংগ্রেস তাকে দেখেছিল একপক্ষে ব্রিটেন অন্যপক্ষে লীগের সঙ্গে আলোচনাপ্রসূত সমঝোতার দৃষ্টিতে। বিরোধটা বেধেছিল দৃষ্টিভঙ্গির মৌল পার্থক্যের জন্য এবং কম্যুনিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গি ভ্রান্ত ছিল।

"Apart from the general question of people's war and the attitude to the Quit India struggle, our isolation from the

anti-imperialist masses was stengthened by our stand on the Muslim League's demand for the formation of a separate Muslim majority state (Pakistan)."[৫১৯]

আবার, "In trying to chart a course of action independent of and opposed to the courageous politics of bargaining for a peaceful transfer of power from the British rulers of the national leaders, we tended to equate the bourgeois nationalist Congress with the separatist communal Muslim League." বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস ও বিভেদকামী মুসলিম লীগকে সমীকরণ কবা কম্যুনিস্টদেব গর্হিত ভুল হয়েছিল।[৫২০] অধিকারী থিসিসের পেছনে যে বিচার কাজ করছিল তা হল দেশভাগের জন্য লীগের দাবি ও কংগ্রেসের বিরোধিতা একইরূপ ন্যায্য। সি. পি. আই ভুলে গিয়েছিল প্রথমাবধি সাম্রাজ্যবাদ লীগকে সমর্থন করছে। ১৯২০-২২-এ খিলাফৎ আন্দোলন ও স্বরাজ আন্দোলনেব সহযোগিতা রিডিং নষ্ট করেন লীগের একদল নেতাকে হাত করে। ১৯২৮ সালে আরুইন একই খেলা খেলেন। তাতে পূর্ণাহুতি দেন লিনলিথগো ও ওয়াভেল। কংগ্রেস হয়তো সাম্রাজ্যবাদের চালে হেবে গেছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেশভাগের বিরোধিতা করে গেছে।

কম্যুনিস্টদের ভুলটা হল কেন? নাম্বুদ্রিপাদ বলছেন, "The essence of the mistake committed by the party was that, as opposed to the Marxist-Leninst stand that the question of nationalities should be dealt with not abstractly but as part of the class political question (Indian freedom struggle in this case), the C.P.I failed to take due account of the real class and national situation in the country. Equating the League demand for the division of India with the Congress opposition to it, meant putting on par an avowedly pro-imperialist section of the bourgeoisie with its oppositional, though compromising, rival in the same class—a stand which is clearly impermissible for Marxists-Leninists." ১৯৪৮-এ দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসেএ নীতি সংশোধন করতে হয়েছিল। তার আগেই কম্যুনিস্টরা লীগের মধ্যে, এমনকি কেরলে, বিভিন্ন জাত ও সাম্প্রদায়িক দলের মধ্যে, প্রগতিশীলদের খুঁজতে বেরিয়েছিল। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে তার ছাপ পড়েনি। কিছু শ্রমিক কেন্দ্রে জয়লাভ করলেও (যেমন জ্যোতি বসু) সাধারণ আসন তারা একটিও পায়নি। তার কারণ, নাম্বুদ্রিপাদের মতে, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক আদর্শে দীক্ষিত, বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস ও ধর্মান্ধ লীগকে সমাসন দান। এতে জনসাধারণ খুশি হয়নি। পার্টির গণভিত্তি দৃঢ়তর হয়েছিল তার সামাজিক-অর্থনৈতিক কর্মসূচির জন্য। কংগ্রেস ও লীগ উভয়পক্ষই স্ব-স্ব এলাকায় নির্বাচন জিততে সমঝোতার নীতি নেয়। উভয়েই নৌ-বিদ্রোহের বিরোধিতা করেছিল কারণ একদা তারাই হবে দেশের কর্তা; অথচ বিদ্রোহীদের (এবং আই. এন. এ. বন্দীদের) একেবারে ত্যাগও করতে পারছিল না। ব্রিটেন মালয় ও ব্রহ্মে পর্যুদস্ত হবার পর ভারতে আর একবার হার মানতে প্রস্তুত ছিল না। তাই সমঝোতা ছাড়া তাদেরও পথ ছিল না। কংগ্রেসের নীতির একমাত্র সোচ্চার প্রতিবাদ এসেছিল গান্ধীর কাছ

থেকে।

মাউন্টব্যাটেন প্ল্যান নিযে সি. পি. আই-এর মধ্যে মতভেদ ভুললেও চলবে না। একদল নেতা বলেন, প্ল্যানকে মোটামুটি স্বাগত জানান উচিত এবং স্বাধীনতা খণ্ডিত হলেও তাকে জনগণের অস্ত্ররূপে ব্যবহার করা উচিত। আর একদল বলেন— "The plan was a cunning manoeuvre of the British to retain India as their colony in fact, while formally transferring power." ছ' মাস ধবে বিতর্ক চলাব পর, শেষ মতই জেতে এবং কলকাতায় দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত হয়। ফলে জেনারেল সেক্রেটারী পি. সি. যোশী বিদায় নেন।[৫২১]

শেষে, পরিবেশ যদি এতই অনুকূল ছিল, সি. পি. আই নেতৃত্ব না নিযে কেন বারবাব গান্ধীজির কাছে নেতৃত্ব ভিক্ষা করছিল এবং না পেয়ে তাঁকে ও কংগ্রেসকে বিশ্বাসঘাতক বলে আত্মতুষ্টি লাভ করছিল ? সেই পুরাতন ফ্যালাসি। দেশ প্রস্তুত, জনগণ বিপ্লবের জন্য তৈরি, কিন্তু কংগ্রেসী নেতারা পিছুপা। কম্যুনিস্টরা কি করতে পাবে ?

শ্রীপান্নালাল দাশগুপ্তও তাঁর গান্ধী-গবেষণা গ্রন্থে সি. পি. আই-সহ বামপন্থীদের এই অদ্ভুত আবদারের সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি অবশ্য বিশ্বাস করেন যে ১৯৪৫-৪৬-এ "একটা বিরাট বিদ্রোহ ও বিপ্লবের পটভূমিকা তৈবি হয়ে উঠেছিল।" "কিন্তু যাঁবা গান্ধীবিরোধী বামপন্থী, তাঁরাও অর্থাৎ সোশ্যালিস্ট, কমিউনিস্ট, ফরোয়ার্ড ব্লক, আই. এন. এ থেকে অবসরপ্রাপ্ত জেনাবেল ও নেতারা, চরমপন্থী অন্যান্য বামপন্থী দল—তাঁরাও কিছু করেননি, সেই দুর্বাব স্রোতে সর্বস্ব পণ করে ঝাঁপিয়ে পড়েননি, কোন নেতৃত্ব দেননি, তাঁরাও গান্ধীজির কাছেই নেতৃত্ব ভিক্ষা করে ক্ষান্ত রয়েছেন। কাজেই তাঁদেব হাতে কোন বিকল্প ছিল না। তাঁরাও বিপ্লবেব ঝুঁকি নেয়নি বা বিপ্লবের ডাক দেয়নি, এ কথা অস্বীকার করাব কারো সাধ্য নেই। গান্ধীজিকে বিশ্বাসঘাতক বলা, অথবা গান্ধীজির কর্তব্য বাৎলে দেওয়া ছাড়া আব যেন তাঁদেব কোন দায়িত্ব ছিল না।"[৫২২] তিনি আরও বলেছেন, "নেতৃত্ব থাকবে অহিংস গান্ধীর হাতে, আর জনতা হবে সশস্ত্র বিপ্লবী, এমন চমৎকার যোগাযোগের স্বপ্ন যাবা দেখেন, তাদের কি বলা যায় ?"

দেশ ও জনগণ প্রস্তুত—একথাব সরল অর্থ, তাদের বৈপ্লবিক চেতনা জাগ্রত হযেছে, সংগঠন তৈবি, নিজস্ব নেতৃত্ব ছাড়াও সর্বোচ্চ স্তবে রয়েছে লেনিন বা মাও-এর মত তত্ত্ব ও প্রয়োগে সমান নিপুণ নেতা, সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনীর একটা বড দল. তাদের সংগঠন/চালনা করাব জন্য ট্রটস্কি বা চু তে-র মত অধিনায়ক। কাব দিকে তাকান হচ্ছে ? একজন সাতাত্তর বৎসরের অসুস্থ বৃদ্ধ—যিনি গোলাবারুদে বিশ্বাস তো করেনই না, সামান্য হিংসার প্রকাশে যিনি বারংবার আন্দোলন প্রত্যাহাব করেছেন।

কিন্তু আর একটা প্রশ্ন তুলেছেন শ্রীদাশগুপ্ত। "সেই গুমবে ওঠা বিদ্রোহী ভারতের পটভূমিকাকে কি এক সর্বব্যাপী শেষ অহিংস সংগ্রামের ও গণসংগ্রামের লড়াইতে পরিণত করা যেত না ?" একদিকে বিপ্লববাদীরা অহিংস বিপ্লবের দায়িত্ব নেবেন না, অন্যদিকে গান্ধীও 'a non-violent substitute for a revolution' দেবেন না। ফলে সাম্প্রদায়িক শক্তি সুযোগ পেল। সাম্রাজ্যবাদীরা তা ব্যবহার করল। ক্ষমতা হস্তান্তরের সঙ্গে দেশভাগও হল।[৫২৩]

গান্ধী কেন বিকল্প বিপ্লব করেননি তার কিছু জবাব আছে। প্রথমত পান্নালাল দাশগুপ্ত (এবং অন্যান্যরা) ভেবে দেখেননি যে ১৯৪৫-৪৬ সালে অনুকূল পবিস্থিতি ছিল এটা তাঁদের perception হতে পারে, কিন্তু গান্ধীর নাও হতে পারে। ১৯৩৯-৪০-এ এই প্রশ্নে গান্ধীজি

ও সুভাষবাবুর মতবিরোধ হয়। ১৯৪৫-৪৬-এ সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি এমন ভয়াবহ হয়েছিল যে গান্ধীর পক্ষে কোন ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয়ত ১৯৪২-৪৩-এ দীর্ঘ বিদ্রোহে শক্তি অপচয় করে ১৯৪৫-৪৬-এ গণ আন্দোলন করার মত শক্তি ছিল না কংগ্রেসের। অনেকের বিশ্লেষণে 'কুইট ইন্ডিয়া' সঠিক পদক্ষেপ। আমার মতে নয়, তা আগেই দেখিয়েছি। কিন্তু তা ব্যর্থ হয়েছিল বলে এ মন্তব্য আমি করছি না। একে তো ব্যর্থতা বা সাফল্য কোন আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতার মাপকাঠি নয় বরং ব্যর্থতাই বহুক্ষেত্রে সাফল্যের সোপান হয়েছে। বারংবার ধাক্কা দিয়েই দরজা খুলতে হয়। আর কর্তৃপক্ষের ওপর তা কোন চাপ সৃষ্টি করতে পারেনি তাও নয়। আমার বক্তব্য—শক্তি সঞ্চয় ও সংগঠন মজবুত করতে সময় লাগে, বিশেষত সরকারী 'সিংহসুলভ হিংসা' যেখানে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারির নেতাদের জেলে পুরে এবং স্থানীয় নেতাদের অনেককে হত্যা করে আন্দোলনের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছিল। রাশিয়ায় ১৯০৫ সালের বিপ্লব ব্যর্থ হবার পর এক যুগ লেগেছিল আর একটা বিপ্লবের আয়োজন করতে। তাও প্রথম মহাযুদ্ধে জারতন্ত্রের শোচনীয় অক্ষমতা, রুশবাহিনীর ক্রমিক পরাজয় এবং রুশ আর্থিক সংকট লেনিনকে অনেকখানি সাহায্য করেছিল। বলশেভিক দলের প্রস্তুতির সঙ্গে প্রতিপক্ষের ক্লৈব্য ও অপদার্থতা মিলেছিল বলে ১৯১৭ সালের বিপ্লব সফল হয়।

এখানে কি তাই দেখছি? অনেকে ১৯৪৫-৪৬ সালের ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের দুর্বলতার কথা বড়ো করে দেখেন। বলা হয়—বন্দী আই এন. এ, বিদ্রোহী নৌ সেনা, কৃষক মজুর ছাত্র ধর্মঘট—কোন সমস্যাই তা সামাল দিতে পারছিল না। যেন ১৯১৭-র জারতন্ত্র ও ১৯৪৬-এর ব্রিটিশ রাজ সমতুল। মাঝে মাঝে ওয়াভেলের মুখে বা কর্তৃপক্ষের কণ্ঠে এক ধরনের উক্তি শোনা গেছে যা পশ্চাদ্‌পর সাম্রাজ্যের অসহায়তা দ্যোতিত করে। কিন্তু বাস্তব অবস্থাটা কি এতখানি খারাপ ছিল? ১৯৪২ সালের মত ভয়াবহ? তখন যদি বিদ্রোহ দমন সম্ভব হয়ে থাকে, ১৯৪৬-এই বা হত না কেন? ১৯৪৫-এর নির্বাচনে অ্যাটলির বদলে চার্চিল জিতলে আমরা হতাশাব্যঞ্জক কথা শুনতেই পেতাম না। পারমাণবিক শক্তির মাহাত্ম্য তিনি জানতেন, তারই ওপর নির্ভর করে ফুলটন (Fulton)-এ রাশিয়ার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন তিনি। ট্রুম্যানের সাহায্য তিনি পেতেন না মনে করার কারণ নেই। মনে রাখতে হবে স্বল্পকালের জন্য হলেও ভিয়েতনামে ফরাসী ও ইন্দোনেশিয়ায় ডাচ শক্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। কংগ্রেস জানত অ্যাটলি সরকার—তাদের শেষ সুযোগ। সেই ১৯৩৮ সাল থেকে নেহরু, ক্রিপস, অ্যাটলির বোঝাপড়া এবং তার পরিণতিতে, নেহরুর অনুরোধ, মাউন্টব্যাটেনের নিয়োগ। মাউন্টব্যাটেনের 'প্ল্যান বালকান' নেহরুর চাপেই পরিত্যক্ত হয়। নেহরুর চাপেই অখণ্ড বঙ্গের অস্বাভাবিক দাবি পরিত্যক্ত হয়। নেহরুর কথা শুনেই অ্যাটলি সরকার দেশীয় রাজ্যগুলিকে যে কোন একটা ডোমিনিয়নে যোগ দিতে বলে। চার্চিল থাকলে এর কোনটাই হত না। 'প্ল্যান বালকান' গৃহীত হত। ভারত দু'টুকরো নয়—শত শত টুকরো হয়ে যেত। তখন শুধু লীগের সঙ্গে লড়াই করলে চলত না, বড়ো বড়ো দেশীয় রাজ্যগুলির সঙ্গেও লড়াই করতে হত। এক কাশ্মীর সমস্যা আজো মিটল না, তখন কি নৈরাজ্য দেখা দিত ভাবা যায় না। নেহরু ও প্যাটেল শ্রান্ত, ক্লান্ত, বিদ্রোহবিমুখ, ক্ষমতা অধিগ্রহণে উৎসুক—এসব কথা বলা সহজ, কিন্তু ধীর স্থির মস্তিষ্কে তাঁরা ভেবেছিলেন 'প্ল্যান পার্টিশান' মন্দের ভাল। (১) তাতে পঞ্জাব ও বাংলার অর্ধেক পাওয়া যাবে, (২) সীমান্ত হাত ছাড়া হলেও সিলেট বাদে আসাম পাওয়া যাবে, (৩) প্রায় সব প্রধান দেশীয় রাজ্য ভারত ডোমিনিয়নে আসবে, (৪) বাদ পড়বে

অত্যন্ত মুসলিমপ্রধান সিন্ধু, বালুচিস্তান, পশ্চিম পঞ্জাব, পূর্ববঙ্গ, সিলেট, সম্ভবত সীমান্ত। এটা জিন্নার বৃহত্তব পাকিস্তান নয়। সত্যই month-eaten Pakistan. এর দুটো অংশেব মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। ভারত যে কোন মুহূর্তে যোগসূত্র ছিন্ন করতে পারবে। এব আর্থিক দুর্বলতা সকলের জানা। এব দুই অংশের ভাষা ও সংস্কৃতিগত প্রভেদ দুস্তব (যা প্রমাণ হল ১৯৭১-এর যুদ্ধে)। সর্বোপরি পশ্চিম পাকিস্তানেও সিন্ধু জাতীয়তাবাদ ও পঞ্জাবী আগ্রাসনবাদেব লডাই অনিবায। সীমান্ত যুক্ত হতে পাবে কিন্তু নিয়ে আসবে পাখতুনিস্তানেব দাবি। অতএব নেহরু-প্যাটেলদেব মতে, এমন পাকিস্তান বেশিদিন টিকবে না। শুধু ধর্মীয় ঐক্যের দোহাই দিয়ে এব আন্তঃরাজ্য ও অন্তর্দ্বন্দ্ব কতদিন চাপা পড়বে? আশা কবতে ক্ষতি কি, ব্রিটিশবা বিদায় নিলে, আবাব সর্বভাবতীয় ঐক্য ফিবে আসবে?

এব বিকল্প—যুদ্ধ· একই সঙ্গে, লীগেব সঙ্গে, বাজাদেব সঙ্গে, হয়তো বা ব্রিটেনেব সঙ্গে। যুদ্ধ শুধু কলকাতা, ঢাকা, নোয়াখালি, বিহাব, লাহোব, অমৃতসবে নয়, দেশেব সর্বত্র—গাঁযে, গঞ্জে, শহরেব অলিগলিতে। হিন্দু ও মুসলমানে, শিখ ও মুসলমানে। তাব পরিণতি কি হত ভাবা যায না। ঠাণ্ডা লডাই-এব পবিপ্রেক্ষিতে ভাবতে রুশ-মার্কিন অবতবণও অসম্ভব ছিল না। আব তা না হলেও, কি হত অর্থনৈতিক পবিকল্পনাব? এই নিদারুণ দাবিদ্র্য মোচনেব? স্বাধীনতা বা স্ববাজ-এব অর্থ যদি শুধু বিদেশী মন্ত্রী ও আমলাব হাত থেকে ভাবতীয মন্ত্রী ও আমলাব হাতে ক্ষমতাব হস্তান্তর হয, বিদেশী শিল্পপতিব হাত থেকে দেশী শিল্পপতিব হাতে শোষণেব যন্ত্র হস্তান্তব, তা হলে তো শত বৎসরেব লক্ষ শহীদেব আত্মদান সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যেত। নেহরু ও প্যাটেলেব কাছে কাজটা ছিল 'Salvage operation'. ঘব সম্পূর্ণ পুডে যাবাব আগে যতটুকু পাব বাঁচাও।

গান্ধীজীর কাছে (নেহরুর কাছেও) এ সব বাস্তব প্রশ্ন ছাডাও মানবতার অবমাননা অসহ্য হয়ে উঠেছিল। মানুষ যদি পশু হয়ে যায তবে কাব জন্য স্বাধীনতা? ববীন্দ্রনাথ 'সভ্যতাব সংকট'-এ বলেছিলেন, "সভ্য শাসনেব চালনায ভাবতবর্ষের সকলেব চেয়ে যে দুর্গতি আজ মাথা তুলে উঠেছে সে কেবল অন্ন বস্ত্র শিক্ষা এবং আবোগ্যেব শোকাবহ অভাব মাত্র নয়, সে হচ্ছে ভারতবাসীর মধ্যে অতিনৃশংস আত্মবিচ্ছেদ, যাব কোন তুলনা দেখতে পাইনি ভাবতবর্ষেব বাইরে মুসলমান স্বাযত্তশাসন চালিত দেশে। কিন্তু এই দুর্গতির রূপ যে প্রত্যহই ক্রমশ উৎকট হয়ে উঠছে, সে যদি ভাবত শাসনযন্ত্রেব ঊর্ধ্বস্তবেব কোনো-এক গোপন কেন্দ্রে প্রশ্রয়ের দ্বাবা পোষিত না হত তা হলে কখনোই ভাবত ইতিহাসেব এত বডো অপমানকব অসভ্য পবিণাম ঘটতে পারত না।" ভাগ্যচক্রের পবিবর্তনে ইংরেজ ভাবত ছাডতে চাইছে ১৯৪৮-এব জুনে, এমন কি তারও আগে। কিন্তু কোন ভাবতবর্ষ সে ছাড়ছে? "কী লক্ষ্মীছাডা দীনতার আবর্জনাকে। একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে তখন এ কি বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে।" 'ইতিহাসের এই অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানেব পরিকীর্ণ ধ্বংসস্তূপেব" দিকে তাকিয়ে গান্ধী ও নেহরু, ববীন্দ্রনাথেব মতই বলছিলেন—"কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত বক্ষা করব।" নিত্য মনুষ্যত্বেব প্রতিকাবহীন পরাভব দেখা অপরাধ। তা এড়াবার জন্য দেশভাগেব প্রচণ্ড মূল্য দিতে হবে।

গান্ধী শুভবুদ্ধির জয় আশা করেছিলেন, তার জন্য পাকিস্তানে বসবাস কবাব সংকল্পও নিয়েছিলেন—কিন্তু গণ আন্দোলনেব নয়। সে কি শুধু নেহরু, প্যাটেলের ও কংগ্রেসেব প্রতি ভালবাসার জন্য? কুরুক্ষেত্রের পরিণামের আশঙ্কায বিহ্বল অর্জুনেব মত আকস্মিক ক্লৈব্যে? না কি তিনি বুঝেছিলেন তাঁর পিছনে কেউ নেই? তিনি নিঃসঙ্গ—নিঃসীম

নিঃসঙ্গ ? নাকি সে সংগ্রাম আর অহিংস থাকত না ? প্যারেলালের কথা যদি মানতে হয় তবে সেই কল্পিত সংগ্রামে কংগ্রেস রাজি ছিল না। ওয়ার্কিং কমিটিতে তাঁর সঙ্গে ছিলেন শুধু গফ্ফর খাঁ আর ১৪/১৫ জুনের এ·আই. সি. সি-তে দেশভাগেব পক্ষে (অর্থাৎ তাঁর বিপক্ষে) বেশি ভোটই পডেছিল ।হযতো তখন জয়প্রকাশ নাবায়ণ তাঁব পেছনে দাঁড়াতেন। হয়তো সি. পি. আই,, আর. এস. পি., ফরোয়ার্ড ব্লক, পুরোনো বিপ্লবীরা। কিন্তু অহিংস আন্দোলন তাঁদের কৌশল মাত্র হত। গান্ধী যদি স্বরাজেব চেয়েও কোনো কিছুকে বেশি মূল্য দিয়ে থাকেন তা হল সত্য ও অহিংসা। আন্দোলন আবম্ভ হয়ে যেত, যে হিংসা ঠেকাবার জন্য আন্দোলন তার চেয়েও বড়ো হিংসা শুরু হত। তিনি নামে মাত্র নেতা, সামলাবার ক্ষমতা নেই। গান্ধী এর মধ্যে যাননি, সম্ভাব্য কোনো সাফল্যের জন্য সার সত্যকে বিসর্জন দেননি। একাই পথ চলতে চেয়েছিলেন। গলগথাব পথ। তার শেষে মৃত্যু। কিন্তু পুনরুত্থানও। সেই মহৎ মৃত্যু দেশকে প্রচণ্ড আঘাত দিয়ে মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে দিয়েছিল। ঐক্য তিনি দিতে পাবেননি কিন্তু ধর্মনিবপেক্ষতাব মহান্ ধর্ম প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

ব্রিটেনের সঙ্গে বারংবার আলোচনায জডিযে পডে ও জিন্নাকে অযথা বাডিযে কংগ্রেস ভুল কবেছিল, গান্ধী কবেছিলেন—একথা অনেকেই বলে থাকেন। কিন্তু সত্যাগ্রহেব প্রথম শর্ত—সত্যাগ্রহী আলোচনাব পথে যতদূব যাওযা সম্ভব যাবেন, বিপক্ষেব হৃদয জয কবতে না পাবলে তবে সত্যাগ্রহে নামবেন। ব্রিটেনেব সম্পর্কে গান্ধী এই নীতি চিবদিন অনুসবণ করেছেন। ১৯২১ সালে বিডিং-এব সঙ্গে, ১৯২৯-৩১ সাল আরুইনেব সঙ্গে, ১৯৩৯ থেকে বারবার লিনলিথগো ও ওযাভেলেব সঙ্গে আলোচনায বসেছিলেন তিনি। তা ছাডা বযেছে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে ম্যাকডোনাল্ড ও হোবেব সঙ্গে, ১৯৪২ সালে ক্রিপসেব সঙ্গে, ১৯৪৬ সালে ক্যাবিনেট মিশনেব সঙ্গে, একেবাবে শেষে মাউন্টব্যাটেনেব সঙ্গে—আলোচনা। মৌখিক আলাপ ছাডাও পত্র বিনিময কম হযনি। সব সমযই তিনি নিজের উদ্দেশ্য পবিষ্কার কবে বুঝিযে দিয়েছেন, বিপক্ষেব উদ্দেশ্য বুঝবাব চেষ্টা কবেছেন, তার মধ্যে ফাঁক বা ফাঁকি থাকলে ধরেও দিযেছেন। এই একটা ব্যাপাবে তিনি সাধুসন্তেব মত নালায়েক ছিলেন না—ইংবেজদেব মধ্যেও নামকবা আইনজ্ঞ বিডিং ও ক্রিপসকে কোণঠাসা করেছিলেন তিনি। ১৯৩৫-এর আইন গভর্নবদেব বিশেষ ক্ষমতা যে কি মাবাত্মক হতে পারে তিনিই ধরেছিলেন। ক্রিপসের provincial option -এব মধ্যে অন্তর্নিহিত পাকিস্তানেব সম্ভাবনা এবং ক্যাবিনেট মিশনেব ১৯ ধাবার বিভিন্ন উপধাবাব মধ্যে যে বিসঙ্গতি রয়েছে তাঁব চোখ এড়ায়নি। কিন্তু তিনি শুধু একজন বিচক্ষণ উকিলেব ভূমিকায নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি, বিবেকের মূর্তি ধবে ইংবেজকে আপন প্রতিশ্রুতি বাখতে বলছিলেন। হৃদয জয় তিনি করতে পারেননি ঠিকই, কিন্তু ইংবেজকে সত্যের ক্ষুবধাব দুর্গম পথে বেঁধে রাখতে চেয়েছেন তিনি। আর এইভাবে একটু একটু করে কংগ্রেসের দাবি মানিয়েছেন। যখন তা পাবেননি, তখন গণ আন্দোলনের পথে যেতেও তিনি দ্বিধা করেননি। এ. আই. সি. সি. (২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫) এক প্রস্তাব নেয়—তাতে এই দ্বৈত নীতি সুন্দর ফুটে উঠেছে—

"The method of negotiation andconciliation which is keynote of peaceful policy can never be abandoned by the Congress, no matter how grave may be the provocation, any more can that of noncooperation, complete or modified. Hence the guiding maxim

of the Congress must remain negotiation and settlement when possible and noncooperation and direct action when necessary."

১৯২৪-এ স্বরাজ দলের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে গান্ধী বুঝেছিলেন, এলিটের একটা বড অংশ প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতি করতে চায়। আইন পবিষদের মধ্য থেকেও ঔপনিবেশিকতাবাদেব সঙ্গে লডাই চালান যায় এবং নির্বাচন যে গণসমর্থন সংগ্রহেব একটা সুবর্ণ সুযোগ এ শিক্ষা দিয়ে গিয়েছিলেন দেশবন্ধু। নেহরুর মত কাউন্সিল বিবোধীও ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে নেমেছিলেন দুটি উদ্দেশ্যে— (১) গণসংযোগ, (২) প্রতিক্রিয়াশীলদেব আইনসভা দখল করতে না দেওয়া। গান্ধী আব একটু এগিয়ে ভেবেছিলেন—কংগ্রেস যদি ক্ষমতা পায়, যত সীমিতই হোক, তা দিযে দেশের লোকেব কিছু উপকার তো কবতে পাববে। তবে গণ আন্দোলনেব প্রযোজন হলে পরিষদীয় রাজনীতি ও মন্ত্রিত্বেব মোহ ত্যাগ কবতে কংগ্রেস দ্বিধা কবত না।

কিন্তু গণ আন্দোলন যখন ইচ্ছা শুরু বা শেষ কবা যায না। ১৯৩৪ সালে নবীম্যানকে গান্ধী বলেছিলেন, "a leadership should not put on undue strain on the energy (of the nation)." তেমনি নৌ সৈন্য বিদ্রোহেব সময় বলেছিলেন অরুণাকে—"People cannot continue at the barricades." গণদেবতাব মর্জি বুঝে চলতে হয। কখনো তাব উদ্দীপনায় বাঁধভাঙা জোযার আসে, কখনো পড়ে ভাটার টান। এই টান বেশি হলে প্রতিবিপ্লব দেখা দেয, যেমন দিযেছিল ফ্রান্সে। স্বাধীনতা সংগ্রাম তো একটা আন্দোলনেই সম্পূর্ণ হয না—পর্ব থেকে পর্বে তাব উত্তরণ। মধ্যে জনগণকে দম নিতে দিতে হবে। তাদেব ঘবদোব গুছিয়ে নেবাব সময না দিলে পববর্তী সংগ্রামে যোগ দিতে তারা দ্বিধা কববে। সে সময তাদেব সাহায্য কবতে গঠনমূলক কার্যসূচি প্রযোজন। খাদি,জাতীয শিক্ষা, হিন্দু-মসলিম ঐক্য, বিদেশী বস্ত্র ও মাদক বর্জন, অস্পৃশ্যতা মোচন, হবিজন উন্নযন—প্রাতিষ্ঠানিক বাজনীতি ও গণ আন্দোলনেব পবিপূবক।

এইখানে গান্ধীব রাজনীতি বুর্জোযা বাজনীতি থেকে আলাদা। বস্তুত কি সপ্তদশ শতাব্দীব ইংবেজ বিপ্লব,কি অষ্টাদশ শতাব্দীব ফবাসী বিপ্লব, কি ইতালি ও জার্মেনীব জাতীয় আন্দোলনে এ ধবনেব গঠনমূলক কর্মসূচিব কোন প্রমাণ পাই না। স্বনির্ভব গ্রামসমাজ, স্বাবলম্বী কৃষক মজুরই তো সমান্তবাল সবকাবেব ভিত্তি। তা ছাডাও এব আব একটা দিক ছিল। গঠনমূলক কাজ শ্রেণী ও জাতপাতেব সংগ্রামেব প্রবণতা বোধ কবে অথচ শুধু পরিষদীয় বাজনীতিতে শ্রেণী,জাতপাত, সম্প্রদাযের অন্তর্দ্বন্দ্ব মাথাচাডা দেবেই। আজ তাব ভয়াবহ প্রমাণ দিকে দিকে। একদিকে গঠনমূলক কাজ অন্যদিকে গণ আন্দোলন—এই দুই দিক দিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদকে রুখতে চেযেছিলেন গান্ধীজী। প্রবণতাটাকে অস্বীকার কবেননি তিনি, বাস্তব শোষণ বা অত্যাচারকেও নয। অছিতত্ত্ব ও হবিজন আন্দোলন প্রভৃতির মাধ্যমে তাকে সীমাবদ্ধ রাখতে চেযেছিলেন। প্রাগাধিকাব দেননি—কাবণ তাতে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আসল লডাই দুর্বল হযে পডত। তাঁর আবেদন ছিল—দেশের সামগ্রিক স্বার্থে সব প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেণী বা জাতকে কিছু স্বার্থ বিসর্জন দিযে একটা মোটামুটি সমঝোতায় আসতেই হবে। ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে এ নীতি পলাযনী মনোবৃত্তি প্রসূত নয, আদর্শবাদ প্রসূতও নয—কঠিন বাস্তববুদ্ধিপ্রসূত।

এ ভাবে দেখলে ১৯৪৭-এব ক্ষমতা হস্তান্তরকে শ্রান্ত নেতৃত্বের আত্মসমর্পণ মনে কবা চলে না। ভাবতীয সংগ্রামেব ধাবা এই পবিণতির দিকেই চলেছিল। গ্রামসচি (Gramsci) যাকে war of position বলেছেন—এটাই তার অন্তিম পর্ব। ব্রিটিশ শক্তি বুঝল যে তাবা

এই war of position-এ হেরে গেছে, পশ্চাদপসরণই শ্রেয়।

বামশক্তি যথেষ্ট জোরদার হয়নি, তাই সমাজতান্ত্রিক ভাবনা প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। কিন্তু তাদের দানকে উপেক্ষা করা চলে না। ১৯২০ ও ১৯৩০-এর দশকে, নেহরু, সুভাষ বসু ও জয়প্রকাশকে কেন্দ্র করে কংগ্রস এবং কংগ্রেসের বাইরে কম্যুনিস্টরা সে চেষ্টা করেছিলেন। বস্তুত ১৯২৮ থেকে ১৯৩৩-এর পাঁচ বছর বাদ দিলে কম্যুনিস্টরা কংগ্রেসের ছত্রছায়ায় কাজ করতেন। ১৯৪৫-এর শেষে তাঁরা কংগ্রেস ত্যাগ করেন। নেহরু, সুভাষ,জয়প্রকাশ, অনুশীলন, যুগান্তর, বি ভি প্রভৃতি বিপ্লবী দল, কম্যুনিস্ট—সবাইকার চেষ্টা ছিল কংগ্রেসী নীতিকে একটা বামপন্থী মাত্রা দান—তাকে ধীরে ধীরে সোশ্যালিজমের দিকে নিয়ে যাওয়া। দক্ষিণপন্থীদের প্রবল প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তাঁরা গান্ধীকে মোটামুটি কেন্দ্রবিন্দুতে রাখতে পেরেছিলেন। গান্ধীর নিজস্ব অর্থনৈতিক পবিকল্পনা মার্ক্সবাদী না হলেও দক্ষিণপন্থী ছিল না। তাঁর রামরাজ্য সামন্ততান্ত্রিক অত্যাচার বা ধনতান্ত্রিক শোষণ প্রশ্রয় দিত না। তদুপরি পড়েছিল বামপন্থী চাপ—প্রধানত নেহরুর মাধ্যমে। বামপন্থী হিংসার প্রশ্রয় দিতে পারে এই আশঙ্কা ছিল বলে গান্ধী তাদের পথ পুরো মেনে নিতে পারেননি, ১৯৪৭-এর আগস্ট মাসেও জয়প্রকাশজীব সঙ্গে সাক্ষাৎকাবে তাব প্রমাণ পাওযা যায়। কিন্তু টাটা বিড়লাকেও তিনি আমল দেননি। লুই ফিসারের সঙ্গে তাঁর কথোপকথনে দেখিয়েছি ক্ষতিপূরণ ছাড়া জমিদারী উচ্ছেদেও তাঁর অনীহা আগেকাব মত প্রবল ছিল না।

১৯৪৭ পর্যন্ত কংগ্রেস কোন দল ছিল না, ছিল নানা দলেব প্ল্যাটফর্ম। ১৯০৭ সালে সুরাটের তিক্ত অভিজ্ঞতাব পব কোনো বড়ো ধরনের নরম ও চবমপন্থী বিভেদ দেখা দেযনি। কংগ্রেসকে বলা যেতে পাবে জাতীয়তাব মূলস্রোত। কিন্তু যে সব শাখানদী তার জলরাশিকে স্ফীততব ও প্রবলতব করেছিল, তাদেব ভুললে ইতিহাসেব অপলাপ হবে। বিপ্লবীদের কার্যকলাপ গান্ধীবাদী ও কম্যুনিস্ট উভয পক্ষ দ্বাবা নিন্দিত হলেও তাদেব বিশিষ্ট দান অনস্বীকার্য। সব বিপ্লবী নেতাই 'ঘরে বাইরে'র সন্দীপের মত লোভী, বা 'চাব অধ্যায়'-এর অতীনেব মত স্বধর্মচ্যুত কবি ছিলেন না। একেবাবে প্রথমপর্বের আবেগপ্রবণ আত্মদানের মোহ কাটিয়ে উঠে নবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, যতীন মুখার্জি, যাদুগোপাল মুখার্জি, বিপিনবিহাবী গাঙ্গুলী, সূর্য সেন, হেম ঘোষ, ভগৎ সিং ও ত্রৈলোক্য মহারাজবাএকটা নতুন সমাজ গড়ার কথা ভাবতে থাকেন। সুভাষচন্দ্র বসুকে এঁবা অনেকেই অকৃত্রিম ও অকুণ্ঠ সাহায্য করেছিলেন বলেই এত দ্রুত তিনি কংগ্রেসেব উচ্চতম নেতৃত্বে স্থান পেয়েছিলেন। ১৯৪২-এব আন্দোলনে এঁদেব অনেকেই সক্রিয় ভূমিকা নিযেছিলেন। গোযেন্দা দফতব এঁদেব কখনো ভোলেনি। কংগ্রেসের সঙ্গে এঁদের সম্পর্ক সব সময় মধুব ছিল না, গান্ধীর সঙ্গে চলত হিংসা-অহিংসাব দর্শন নিয়ে তুমুল বিতর্ক। কিন্তু গান্ধীব মনেও এঁদেব প্রতি স্নেহ ছিল। এঁদেব মৃত্যুঞ্জযী বীর্যকে কখনো তিনি অবজ্ঞা কবেননি বলে বাববাব এঁদেব বন্দীত্ব মোচনের জন্য সরকাবকে চাপ দিযেছেন। ওযার্ধা ও আন্দামানেব মানসিক দূরত্ব অনেক কিন্তু তাঁরা সহযোদ্ধা ছিলেন, সব সময় প্রতিদ্বন্দ্বী নয। এঁদেব অধিকাংশই স্বদেশী আন্দোলনেব আর্যামি অতিক্রম কবেছিলেন। কি গান্ধীবাদী, কি পববর্তী বিপ্লবী, কি সাম্যবাদী—কেউ গণসংগঠনকালে ধর্মেব বা জাতপাতেব দোহাই দেননি, এটা আমাদেব অভিশপ্ত বর্তমানে ভুললে চলবে না। গান্ধী ও কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের প্রতি বাঙালীদেব একটা অভিমান ছিল, সেটা ভিত্তিহীনও নয়, তবু তাঁবা বাংলাকে কোনদিন ভাবতেব ওপব স্থান দেননি। সবচেয়ে বড়ো গান্ধী-বিরোধী বাঙালী সুভাষচন্দ্র, গান্ধীকে 'জাতিব জনক' আখ্যা দিয়েছিলেন, বাহিনীব নাম দিয়েছিলেন ইন্ডিয়ান ন্যাশানাল আর্মি, আর 'বন্দেমাতরম' বড়ো

বেশি বাঙালী সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য দ্যোতক বলে তিনি বেছে নেন 'জয় হিন্দ'। জাতীয় সংগ্রামে বিচ্ছিন্নতাবাদের স্থান ছিল না।

নারীমুক্তি, হরিজন উন্নয়ন, অস্পৃশ্যতা মোচন, আদিবাসী পরিসেবা—কংগ্রেস ছিল বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। এখানে চরমপন্থীদের ওপর জয় হয়েছিল নরমপন্থীর-তিলকের ওপর রানাডের। কংগ্রেসই "মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসীর" প্রতি বিবেকানন্দের উদাত্ত আহ্বান বহন করেছিল, নারীকে নরকের দ্বার বা স্বর্গের দেবী না বলে তাকে সংগ্রামের সঙ্গী করে নিয়েছিল।

বামপন্থীরা অনেকে ভুলে যান হরিজন আন্দোলন শ্রেণীসংগ্রামেরই একটা পদ্ধতি। বস্তুত হরিজন কারা? হরিজনরা হচ্ছে আমাদের দেশের সবচেয়ে শোষিত ও নিপীড়িত শ্রেণী—subalternদের সর্বনিম্ন ধাপ। আমাদের দেশে মার্ক্স-কথিত প্রোলেতারিয়াতের সংখ্যা নগণ্য কিন্তু জনমজুর, ক্ষেতমজুর, প্রান্তিক চাষীদের সংখ্যা ঢের বেশি। আর এরাই নীচু জাতের লোক—গান্ধীর হরিজন। লেনিন বলেছিলেন, "Only the 'economists' of sad memory believed that worker's party slogans are advanced only for the workers These slogans are advanced for the whole working population, for the whole people." এদের সামাজিক মুক্তি (মন্দিরে প্রবেশ যার অন্যতম) আন্দোলনে রয়েছে অর্থনৈতিক আন্দোলনের প্রতিশ্রুতি। গান্ধীজি যদি এদের মর্ম কোথাও না স্পর্শ করতে পারতেন তবে হরিজনরা সবাই তফসিলী শ্রেণীর ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেত—জাতীয় সংগ্রাম থেকে লীগের মত দূরে সরে যেত। 'ম্যয় ভাঙ্গী হুঁ' এই কথার মধ্যে তারা একটা বিরাট আশার বাণী শুনেছিল। সে আশা পূর্ণ হয়নি। তা গান্ধীর দোষ নয়।

সংগ্রামের একটা স্তরে পুঁজিপতিদের মধ্যে যারা সাম্রাজ্যবিরোধী তাদের সাময়িক সাহায্য তিনি নিয়েছিলেন একথা সত্য, কিন্তু অনুচিত হয়নি। অন্তত চীনে মাও তা নিয়েছিলেন। তা ছাড়া এই সহযোগিতা নিয়ে কিছু প্রশ্ন উঠেছে। প্রথমত ভারতীয় বুর্জোয়ার প্রকৃতি নিয়ে বাদানুবাদ রয়েছে। বিপান চন্দ্ররা মনে করেন ভারতীয় ধনিকরা প্রগতিশীল ও সাম্রাজ্য-বিরোধী ছিলেন, মার্ক্সীয় ভাষায় 'national bourgeoisie' গান্ধীবাদী কংগ্রেসের সঙ্গে তার যোগ সদর্থক।[৫২৪] আর একদল মনে করেন এরা 'Compradore' বা ঔপনিবেশিক ধনতন্ত্রের সহযোগী নয়, তবে নানা সীমাবদ্ধতার জন্য এরা জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ওপর সীমিত hegemony প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল। এরা গ্রামসচি থেকে 'নিষ্ক্রিয় বিপ্লব' (passive revolution)-এর ভাবনা ধার করেছেন। অর্থাৎ ভারতীয় মুক্তি সংগ্রামে কি জনগণ কি বুর্জোয়াশ্রেণী কেউই স্ব স্ব অন্তর্নিহিত দুর্বলতার জন্য সংগ্রামকে একটা স্থির, নির্দিষ্ট পথে নিয়ে যেতে পারেনি। বুর্জোয়ারা পারেনি নেওয়াতে ধনতন্ত্রের পথ, জনগণ পারেনি নেওয়াতে সমাজতন্ত্রের পথ।[৫২৫] ক্লদ মার্কোভিৎস এই মতে আপত্তি জানিয়ে বলছেন, ১৯৪৭ সালের পূর্বে ভারতে বুর্জোয়া দল বা নিদানের অস্তিত্ব থাকলেও ঠিক বুর্জোয়াশ্রেণী ছিল বলা চলে না। তাদের স্বার্থে আঘাত লাগলে অনেক ক্ষেত্রে তারা একযোগে কাজ করত, যেমন বামদলগুলির বিরুদ্ধে, কিন্তু কখনও তারা দূরপ্রসারী কোন সদর্থক লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারেনি।[৫২৬] আর একটা আপত্তি তিনি তুলেছেন—ইতালীর ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামসচির ভাবনা গড়ে উঠেছিল, তা কতটা ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োগযোগ্য? ভারতের পশ্চিমী মনোভাবাপন্ন নেতারা অর্থনীতিকে কোনদিন স্বতন্ত্র ও স্বনির্ভর (autonomous) মনে করেননি। ভারতীয়

নেতারা রাজনীতিকে অর্থনীতির ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন, স্বাধীন ভারতে কি ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু হবে তা নিয়ে অধিক মাথা কেউই ঘামাননি। বিদেশী শাসনের জগদ্দল নেমে গেলে ভারতীয় অর্থনীতি কোনও না কোন রূপে চাঙ্গা হয়ে উঠবে। একমাত্র নেহরু এ ধরনের চিন্তার শরিক ছিলেন না। আর গান্ধীর চিন্তা ছিল সব থেকে আলাদা।

॥ ১৮ ॥

ভারতীয় বুর্জোয়ারা এঁদের সঙ্গে সমঝোতা করে চলায় কোন অসুবিধা বোধ করেনি। বরং মার্কোভিৎসের ভাষায়—পরবর্তীকালে, **"They benefited by the political leaders' general ignorance of economic problems that allowed the capitalists to easily bend the emerging 'socialistic' structure to their own advantage."** কিন্তু তিনি এও স্বীকার করছেন, **"At the same time, however, they had to accept that power was a kind of superior entity situated beyond them and that ultimately imposed its choices on them."**

কংগ্রেস (ও অন্যান্য দল) যখন থেকে তাদের কাছে নির্বাচন বা অন্যান্য ব্যয় বাবদ চাঁদা আদায় করতে লাগল, তখন তাদের শক্তি ও প্রভাব অনেকটা বাড়ল। অনেক ক্ষেত্রে তাদেব ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানও কাজে লাগাতে চাইল সরকার। বেইলিব ধারণা সরকাব ও বণিক ধনিক শ্রেণীর যে সম্পর্ক অষ্টাদশ শতকে লক্ষ্য করা যায় তা ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতেও প্রবহমান লক্ষ্য কবা যায়। আমার ব্যক্তিগত ধারণা—বামপন্থী ঐতিহাসিকদের ধনিক-শ্রেণী বুর্জোয়া পার্টি মডেল (**paradigm**) ও বেইলিদের বণিক-শাসক শ্রেণীর মডেল—দুটোই আংশিক ভাবে গ্রহণযোগ্য। কংগ্রেসকে ঠিক শ্রেণীহীন সংগঠন বলা চলে না, আবার জোগলেকাব, নিম্বকার (১৯২৭)-এর মত **"of benefit only to an insignificant section of the people, the big capitalists and their allies, the intellectual and professional upper classes..."** বলা চলে না। ১৯৩১-এ কম্যুনিস্ট ইন্টারন্যাশানাল লিখছে—"কংগ্রেস জনসাধারণকে ধোঁকা দিচ্ছে, নিজেদের জাতীয়, শ্রেণীহীন (**national, non-class**) প্রতিষ্ঠান বলতে চাইছে, শ্রমিকদের জাতীয় বুর্জোয়াদের তাঁবেদার করতে চাইছে।" এ কথা সত্য নয়। আসলে বুঝতে হবে জনগণ কি ভাবে কংগ্রেসকে দেখছে। তারা প্রায় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাকে বন্ধু হিসেবেই দেখেছে। নেহরু আশা করেছিলেন ঘটনাচক্র ও জনসাধারণের বারংবার কংগ্রেস আন্দোলনে যোগদান তাকে একটা 'র‍্যাডিক্যাল ইডিওলজি' দেবে।

কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে কংগ্রেসের সম্পর্ক নিয়ে নানা আলোচনা চলছে। ১৯২০-২২ ও ১৯৩০-৩২-এর আন্দোলনের পরও গুজরাটের এবং ইউ. পি.-র কোন কোন অঞ্চলের বাইরে কৃষক সমাজের সঙ্গে কংগ্রেসের যোগাযোগ ছিল সীমিত, কোথাও বেশি, কোথাও কম।[৫২৭] কিন্তু বছর দুই তিন পর গোয়েন্দা বিভাগই বলছে গান্ধীর গ্রাম (কুটীর) শিল্প ও হরিজন আন্দোলন অবস্থার অনেক উন্নতি করে ফেলেছে।[৫২৮] তবু জওহরলাল তাঁর লখনৌ ভাষণে সন্তুষ্টি দেখাননি এবং তৃণমূল থেকে কংগ্রেস আন্দোলন গড়ে তুলতে

জনগণের মধ্যে কংগ্রেসীদের কাজ করতে আহ্বান জানাচ্ছেন। কিন্তু বাধাটা শুধু কংগ্রেসী নেতাদের দিক থেকেই আসেনি। ডেভিড হার্ডিম্যান দেখিয়েছেন কৃষক নেতারাই অনেক ক্ষেত্রে আন্দোলনকে তৃণমূলে নামতে দেয়নি। রণজিৎ গুহ বলছেন, "the initiative which originated from the domain of subaltern politics were not, on their part, powerful enough to develop the nationalist movement into a fullfledged struggle for national liberation on their own."[৫২৯] সরকার, এমন কি উইলিংডনের মত জাঁদরেল বড়লাটও, কৃষক সম্প্রদায়কে খুশি রাখতে চাইছিলেন যাতে তারা কংগ্রেসের দলে চলে না যায়। ইউ. পি.-র লাট হ্যালেটের ৫ মে ১৯৩৬-এর নোট ও সপার্ষদ বড়লাটের 'Appreciation', ক্রেইক সব ছোটলাটদের পাঠিয়ে দেন। তাতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের প্রতি নির্দেশ ছিল বার বার জেলা ঘুরে চাষী প্রজাদের দুঃখ দুর্দশা অভিযোগের খবর নিতে এবং যা টাকা আছে তা উন্নয়নের জন্য ব্যয় করতে।[৫৩০] কংগ্রেস ও রাজের মধ্যে চাষী ও কৃষকদের আনুগত্য নিয়ে লড়াই জমে উঠেছিল ১৯৩৬-এর পর। কিন্তু কংগ্রেসের যে অংশ লড়াই দিচ্ছিল (কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি) তাদের সঙ্গে দক্ষিণপন্থীদের লড়াই তাকে দুর্বল করে।[৫৩১] মোটের ওপর কংগ্রেস যে গণসংযোগ আন্দোলন শুরু করে তার পেছনে নেহরু ও সমাজতন্ত্রীদের চাপ ছিল। এর সভাপতি ছিলেন জয়রামদাস দৌলতরাম, যিনি কংগ্রেসকে শ্রেণী সংগ্রামের ওপরে রাখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু অন্যতম সভ্য ছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ। এর কাজ খুব একটা হয়নি। কিন্তু ১৯৩৭-এর নির্বাচনে কৃষকরা দেখিয়ে দিয়েছিল তারা কার পক্ষে। কংগ্রেস গণ-বিক্ষোরণ চায়নি, চেয়েছিল গণ-সমর্থন। তা পেয়েছিল তারা। মরিস-জোনস্ লিখছেন[৫৩২], এই নির্বাচনের ফলাফল কংগ্রেসকে আশ্বস্ত করে যে তার গণ-বিপ্লব করার প্রয়োজন নেই—নির্বাচনী রাজনীতি জোরদার করলেই চলবে। তবে গান্ধীর অছিতত্ত্বে বিশ্বাস শিথিল হচ্ছিল সন্দেহ নেই। রাউন্ড টেবল কনফারেন্সেই তিনি বলেছিলেন, সবরকমের দৃঢ়মূল কিন্তু অসামাজিক স্বার্থ প্রয়োজনে অধিগ্রহণ করতে হবে। যদি সহজে না হয় অহিংস সত্যাগ্রহ করতে হবে জমিদারদের বিরুদ্ধে। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের আগে লুই ফিসারকে তিনি বলেছিলেন, জমিদাররা নিজেরা যদি না সরে যায় তবে তাদের পালাতে হবে। একেবারে শেষে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়,

"Is trusteeship then a substitute for the abolition of individual ownership? "No", said Gandhiji, "it is the means for the attainment of that goal. More, it anticipates the goal,"[৫৩৩]

১৯৪৫ সালের ইউ·পি. নির্বাচনে নেহরু বারংবার জমিদারী প্রথা বিলোপের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলেন। তবে অনেক জমিদার তা ভোট পাবার জন্য ভুয়ো প্রতিশ্রুতি ভেবেছিল। নবাব স্যার মহম্মদ ইউসুফ, মুবাশির হুসেন কিদওয়াই, মহেশ্বর দয়াল শেঠ বার বার সাফাই গাইছিলেন যে জমিদারী আর সামন্ততান্ত্রিক নেই। অন্যরা অর্থ বা অন্য সাহায্য করে কংগ্রেসকে তুষ্ট রাখার চেষ্টায় রত ছিল। এদের নেতা ছিলেন রামনগরের রাজা রায় গোবিন্দচন্দ্র ও গুরু নারায়ণ।[৫৩৪]

কংগ্রেস প্রায় সকল স্বার্থ ও মতকে আপন জাতীয়তাবাদী ছত্রতলে আনতে সক্ষম হলেও মুসলিমদের ব্যাপারে ব্যর্থ হয়েছিল এবং হয়েছিল বলেই দেশ ভাগ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। ১৯০৯-এর 'স্বতন্ত্র ভোটদান প্রথা' অশ্বত্থের বীজের মত ভারতীয় ঐক্যের সৌধতলে গুপ্ত থেকে ধীরে ধীরে বেড়ে তাকে চৌচির করে দেয়। লক্ষ্ণৌ-এর কংগ্রেস-লীগ

চুক্তি ছিল হিন্দু ও মুসলিম এলিটদেব চুক্তি। তাছাড়া তাতে ইউ. পি.-র মুসলমানদের সুবিধে হলেও অন্য প্রদেশেব মুসলমানবা সবাই খুশি হয়নি। বিশেষত বাংলা ও পঞ্জাবের। গান্ধীজি স্বরাজ আন্দোলনেব সঙ্গে খিলাফৎ আন্দোলনকে যুক্ত করে সাময়িক ঐক্য সাধন কবলেও পবে তাব পশ্চাদপুচ্ছ তাডনে হিন্দু-মুসলিম বিরোধ বেড়েছিল বই কমেনি। ১৯২৩-২৭ কতবাব যে সাম্প্রদাযিক সংঘর্ষ বেধেছে তাব সীমা নেই। বার বাব সর্বদলীয় সম্মেলন কবেও তাব কিনাবা হয়নি। মতিলাল নেহরু রিপোর্টে সাম্প্রদায়িক সমস্যার যে সমাধান ছিল তা মুসলিমবা মেনে নেযনি। এখানে মাদ্রাজ কংগ্রেসে গৃহীত পঞ্জাব ও বাংলাব আইন পবিষদে মুসলিম সংখ্যাগবিষ্ঠের জন্য সংবক্ষণ নীতি পবিত্যাগ করা ঠিক হযনি। গান্ধীর এতে সায় ছিল না। কিন্তু মতিলাল, সাপ্রু, মালব্য প্রভৃতি হিন্দু নেতাদেব চাপেব কাছে নতি স্বীকার করেন। জিন্না বাধ্য হন সাফি, ফজল-ই-হোসেন প্রভৃতি লীগ নেতাদের সঙ্গে যোগ দিতে—কিন্তু তিনিও মন থেকে সমাধানটা মানতে পাবেননি। গান্ধী যদি রুখে দাঁড়াতেন কি হত বলা যায না। কিন্তু সাম্প্রদাযিক সমস্যাব সমাধানে হৃদযের পবিবর্তনেব ওপব বেশি জোব দিযে তিনি বাস্তব বুদ্ধিব পবিচয দেননি। গোল টেবিল বৈঠকে তিনি মুসলিমদেব দাবি মেটাবাব জন্য অনেক দূর যেতে চেযেছিলেন কিন্তু একদিকে জাতীয়তাবাদী মুসলিমদেব চাপ অন্য দিকে স্যামুযেল হোব প্রমুখ বক্ষণশীলদেব প্রলোভনেব মুখে মুসলিম হৃদয তিনি জয করতে পাবেননি। নেহরুব মতে জাতপাত ধর্ম ভাষা নির্বিশেযে সমস্ত ভাবতীযকে স্বাধীনতা সংগ্রামে সামিল কবতে পাবলে ওসব মধ্যযুগীয মৌলবাদেব গুরুত্ব কমে যাবে। গান্ধীজিব মত গভীব ভগবদ্বিশ্বাস তাঁব কোন দিন ছিল না, বরং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, দর্শন ও মার্ক্সবাদেব প্রভাবে যেটুকু মনেব গোপন কোণে লুকিয়ে ছিল তাও অবলুপ্ত হতে চলেছিল। বাজনীতিব সঙ্গে ধর্মকে জড়ালে বিষম আপদ দেখা দিতে পারে তার প্রমাণ ইউবোপেব ইতিহাসে পড়েছিলেন, ভারতেব ইতিহাসে দেখেছিলেন। তাই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ধর্মনিবপেক্ষ। লীগ, মহাসভা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানকে তিনি সামন্ততন্ত্রেরই একটা বিভূতি বলে ভেবেছিলেন। তাঁব ১৯৩৬-এব সভাপতিব ভাষণে এই দৃষ্টিভঙ্গি দ্ব্যর্থহীন ভাষায প্রকাশ পেয়েছিল। সাম্প্রদায়িক দাবি, তাঁব মতে, জনগণ বা নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে ওঠেনি। এসব নবাব, তালুকদাব, উচ্চবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থ বক্ষার্থে অস্ত্রেব মত ব্যবহৃত হচ্ছে। হিন্দু ও মুসলিম সাম্প্রদায়িক নেতাবা আসলে বাজনীতিব দিক থেকে প্রতিক্রিয়াশীল, সাম্রাজ্যবাদেব সহযোগী। জিন্নাও যে এদের পছন্দ করতেন তা নয। কিন্তু গান্ধী নেতৃত্বের বিকল্প বচনাব জন্য তাঁর একটা শক্তিশালী মুসলিম প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন হল। উভয়ের মধ্যে বাধা হযে দাঁড়াল দেশের সর্বত্র ছড়ানো জাতীয়তাবাদী মুসলিমরা। একদিকে জিন্না চাইলেন মুসলিমদেব একত্র করতে, অন্য দিকে নেহরু জাতীযতাবাদী মুসলিম সংখ্যা বাড়াতে চাইলেন, জনসংযোগ নীতি দ্বারা। ১৯৩৬-৩৭-এর নির্বাচন এতে ইন্ধন জোগাল। জিন্না বললেন, **"There is a third party in this country and this is Muslim India"**, তাদেব ব্যাপারে কংগ্রেস যেন কথা না বলে। নেহরু বললেন, **"Communialism raised to the nth power."**

ইউ পি., বিহার, বাংলা ও পঞ্জাব কংগ্রেসের গণসংযোগ আন্দোলন কিছু ফল দেখাল। তবে গ্রামাঞ্চলে নয়। শহরের বৃত্তিভোগী, উচ্চ শিক্ষিত, এবং প্রায়শ মার্ক্সবাদী, এক দল মুসলিম নেতা ছিলেন অগ্রণী। এঁদের মধ্যে ছাত্র, শিক্ষক, লেখক ও সাংবাদিক ছিলেন বেশি। প্রাক্তন খিলাফতী ও আনসারির মত প্রথম প্রজন্মের জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে পার্থক্য ছিল এদের। কে. এম. আশ্রফ, জেড. এ. আহ্‌মদ, ফরিদুল হক আনসারি, হায়াতুল্লা

আনসারি, আনসার হারবানি, হুসেন জহীব ও সাজ্জাদ জহীব, লেখক আজমি, খাজা আহ্‌মদ আব্বাস, আলি সর্দার জাফরির নাম কবতে হয়। এদেব সহযোগিতা কবে দেওবন্দেব উলেমার দল ও জমিযাৎ-উল-উলামা। জমিযাতেব সভাপতি হুসেন আহ্‌মদ মদ্‌নির নাম উল্লেখযোগ্য। 'মুতাহিদা কৌমিযাৎ আওব ইসলাম' গ্রন্থে ইনি ইকবালেব সঙ্গে বিতর্কে নামেন। দার-উল-উলুম (দেওবন্দ) ও মদনিব সঙ্গে তর্ক যুদ্ধে নামেন যাঁবা, তাঁদেব মধ্যে আক্রমণেব লক্ষ্য ছিল কংগ্রেসী ধর্মনিবপেক্ষতা ও ভাবতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। মাওদুদি বারবার এদেব মার্ক্সবাদী প্রবণতাকে কটাক্ষ করেন।[৫৩৫] জিন্না ও লীগ এই আন্দোলনকে মুসলিম সম্প্রদাযেব পক্ষে বিভেদকামী বলে আক্রমণ করেছিলেন। পীবপুব বিপোর্টে তার বহুল উল্লেখ বযেছে।[৫৩৬] স্বীকাব করতে হবে কংগ্রেসেব জনসংযোগ নীতিব ফলে অন্তত লক্ষাধিক মুসলিম কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্য হয়েছিল। সব চেযে বেশি হয় বিহাবে, পঞ্জাব ও তামিলনাড়ুতে ।ইউ·পি., বাংলা ও সীমান্তে তো হযই।[৫৩৭] তবু ১৯৩৮-এ আশ্রফ বলছেন, "no substantialeffort was made to come in direct contact with the Muslim masses in large numbers."[৫৩৮]

১৯৩৭ সালে হিন্দু-মুসলিম বা কংগ্রেস-লীগেব মতে ব্যবধান দুস্তব ছিল না। অথচ ঠিক দশ বছর পরে তাই ঘটল। মন্ত্রিত্ব নিযে জড়িয়ে পড়ে প্রাদেশিক কংগ্রেস নেতাবা এদিকে মন দেননি, আব কেন্দ্রীয় নেতাবা সাম্প্রদাযিকতাব চেযেও সুভাষচন্দ্রেব বিদ্রোহকে বেশি গুরুত্ব দিযেছিলেন। শুধু বাংলাব ক্ষেত্রে তিনটি ভুলেব উল্লেখ করছি। ১৯২৩ সালে চিত্তবঞ্জন যে হিন্দু-মুসলিম প্যাক্টেব ফলে একটা বড়ো সংখ্যক মুসলমানকে পক্ষে এনেছিলেন, কেন্দ্রীয় কংগ্রেস তা গ্রহণ কবেনি। দ্বিতীয়ত ১৯৩৭ সালে বাংলা কংগ্রেসকে ফজলল হকের সঙ্গে কোযালিশন গঠন কবতে না দেওয়ায় তিনি লীগে ভেড়েন। তৃতীয়ত সুবাবর্দি ও কিবণশঙ্কবের মিলনের আশাও অনেকাংশে কেন্দ্রীয় অনীহাব জন্য বিফল হয়েছিল। ইউ. পি.-ব টেনান্সি বিল নিযে হিন্দু ও মুসলিম ভূম্যাধিকাবীদেব সমঝোতা হয়। কিন্তু কংগ্রেস সরকাব কৃষকেব স্বার্থবক্ষা কবতে গিযে মুসলিম তালুকদাবদেব জিন্নার দলে ঠেলে দেন। এটা অবশ্য ভুল নয। এ ছাড়া ইউ. পি. কংগ্রেসেব কোন উপায ছিল না—এবং মুসলিম চাষী প্রজারা অখুশি হযনি। ১৯৪৩ সালেব এপ্রিলে জমিযৎ যে সর্বভারতীয় মুসলিম মজলিস আহ্বান কবে তা পাকিস্তান দাবিব প্রতিবাদ কবেছিল। সভাপতি, সিন্ধুর মুখ্যমন্ত্রী আল্লা বক্স, বলেন, "ধর্মেব ভিত্তিতে ভাবতীয মুসলিমদেব আলাদা জাতি মনে করা ইসলাম বিরোধী।" অনেকে জানেন না যে তিবিশেব দশকে আলিগড আব আগের মত বিচ্ছিন্নতাবাদী ছিল না। এই প্রসঙ্গে শেবওযানি, খলিকুজ্জমান, শোয়াইব কুরেসি ও এ. এম. খাজাব নাম উল্লেখযোগ্য।[৫৩৯] কিন্তু মন্ত্রিসভা গঠন নিয়ে খুশি না হযে খলিকুজ্জমান জিন্নাব দলে ভিড়লেন। ১৯৩৯-এব মধ্যে কংগ্রেসের মুসলিম গণসংযোগ অভিযানে ভাটা পড়ল। আসলে কথা হল বেশি, কাজ হল কম। ফলে মুসলিম ধনীবা হল ভীত, মুসলিম জনগণও পক্ষে এল না। যাঁবা দক্ষিণপন্থী এবং নেহরুর সমাজতন্ত্রী আবেদনে বিরক্ত হযেছিলেন তাঁবা মনে করলেন এটা নেহরুর ব্যক্তিগত প্রচাব অভিযান। এটা বাড়তে দিলে তাঁদের প্রভাব কমে যাবে। গোবিন্দবল্লভ পন্থও আপত্তি জানালেন। কি হবে গণসংযোগে, তিনি দুজন মুসলিম মন্ত্রী, তিনজন মুসলিম পার্লামেন্টাবী সেক্রেটাবী নিযেছেন যেখানে? স্বয়ং কৃপালনি ইউ. পি. কংগ্রেস কমিটিকে গণসংযোগ কমিটিগুলি ভেঙে দিতে নির্দেশ দিলেন। মোরারজি বললেন, গুজবাটে এ ধরনেব কাজ করার মত মুসলিম পাওযা যাচ্ছে না। কংগ্রেসের জাতীয় সংহতির বাণী মুসলিম জনসাধাবণেব কানে পৌঁছল না,

তাদের জমিজমা বেকারীর সমস্যাও কর্তৃপক্ষের কানে পৌঁছল না। পারস্পরিক দ্বন্দ্বই বাড়ল, ব্যবধান ক্রমে দুস্তর হল। বোম্বাই-এর ইউসুফ মেহেরালি কংগ্রেস কমিটির কাজে হতাশ হলেন, কলকাতার মুসলিম নেতারা বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেসের অনীহার কথা নেহরুকে জানালেন। ইউ. পি.-তে প্রাদেশিক ও জেলা কংগ্রেস কমিটিতে মুসলিমদের ঢুকতে দেওয়া হল না। শেষে বুন্দেলখণ্ড ও অমৃতসর উপ-নির্বাচনে দক্ষিণপন্থীরা বহু দিনের পুরাতন কংগ্রেসী শেরওয়ানি ও কিচলুকে হারিয়ে দিল। ১৯৩৮ সালে (১১-১৬ ডিসেম্বর) ওয়ার্কিং কমিটি প্রস্তাব নেয় যে হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লীগ সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান বলে কংগ্রেস কমিটিসমূহের নির্বাচিত সদস্যরা মহাসভা ও লীগের কমিটিতে থাকতে পারবেন না। দুঃখের বিষয়, বাংলা কংগ্রেসের আশ্রফউদ্দিন চৌধুরীর প্রতিবাদ সত্ত্বেও কৃপালনি এমন ব্যাখ্যা দিলেন যাতে ঐ সব সাম্প্রদায়িক দলের প্রাথমিক সদস্য কংগ্রেসের কর্মকর্তা হতে পারে।[৫৪০] আশ্রফ বহু দুঃখ করে পরে বলেছিলেন, লীগ হঠাৎ এত বড হয়ে উঠল কাবণ কংগ্রেস মুসলিম-গণসংযোগ ছেড়ে মন্ত্রীত্ব নিয়ে মেতে উঠল।[৫৪১]

কিন্তু নীচের থেকে হিন্দু-মুসলিম সংহতির ভিত না গাঁথলে ওপরের সৌধ কি কবে গড়া হবে? কংগ্রেস ১৯১৬ সালে ভেবেছিল ওপরের তলার হিন্দু ও ওপরের তলার মুসলমানদের মধ্যে চুক্তি হলেই সাম্প্রদায়িক সমস্যার নিরসন হবে। সেটা ভুল হয়েছিল। গান্ধী খিলাফৎ আন্দোলন সমর্থন করে নীচু তলার মুসলিমদের সঙ্গে একটা যোগ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। তাও সফল হয়নি। বরং উলেমা, মৌলভিদের রাজনীতির পাদপ্রদীপের সামনে নিযে এসে তা পরবর্তী মৌলবাদকে জোরদার করে। চিত্তরঞ্জনের সমাধান নেওয়া হয়নি। ১৯৩৭ সাল থেকে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির যে চেষ্টা চলে তা ১৯১৬ সালের ভুলের পুনরাবৃত্তি। যেন শুধু জিন্নাকে পক্ষে আনতে পারলেই সমস্যার সমাধান হবে। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪২, ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৭ কত বার যে কংগ্রেস নেতারা জিন্নার সঙ্গে আলোচনায় বসেছেন তা গোনা যায় না। গান্ধী তো বটেই, নেহরু, সুভাষ, রাজেন্দ্র প্রসাদ যিনি যখন সভাপতি, তখনই একবার করে জিন্নার দ্বারস্থ হন। রাজাগোপালাচারি ও ভুলাভাই দেশাই ভাল করতে গিয়ে অনেক জটিলতাব ও ভুল বোঝাবুঝিব সৃষ্টি করেছিলেন। প্রত্যেকবার জিন্না দ্বিজাতিতত্ত্বের ওপর জোর দিযেছেন, কংগ্রেসকে দিয়ে মানিয়ে নিতে চেয়েছেন তা হিন্দু সংগঠন, এবং জিন্নাই সকল মুসলমানের মুখপাত্র। ১৯৪৪ সালে জিন্নার সঙ্গে আলোচনায় গান্ধী যেদিন শর্ত সাপেক্ষে মুসলিম অঞ্চলের আত্মনিয়ন্ত্রণেব অধিকার মেনে নিলেন সেদিন থেকে একটু একটু করে কংগ্রেস পাকিস্তানের দিকে এগোল। পাকিস্তানের পুরো ব্যাখ্যা না দিয়ে জিন্না দাবি বাড়িয়ে গেলেন। তাঁকে প্রচণ্ড সমর্থন জানালেন ওয়াভেল ও ব্রিটিশ রক্ষণশীল দল। ক্যাবিনেট মিশন গ্রুপিংকে আবশ্যিক ঘোষণা করে ও ক্যাবিনেট (৬ ডিসেম্বর ১৯৪৬) তা সমর্থন করে পরোক্ষ পাকিস্তান দাবি মেনে নিল। প্রথমাবধি গান্ধী আবশ্যিক গ্রুপিং-এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন যেমন তিনি জানিয়েছিলেন ক্রিপস্ প্রস্তাবের provincial option-এ। ১৯৪৭ সালের মার্চে পঞ্জাব (এবং বাংলা) ভাগের কথা মেনে নিল ওয়ার্কিং কমিটি। মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে আলোচনায় গান্ধী ও গফফর খাঁ ছাড়া সবাই দেশভাগ মেনে নিলেন। তিনিও এ. আই. সি. সি.-তে কংগ্রেস সংহতির দোহাই দিয়ে ও দেশব্যাপী হিংসা দমনের স্বার্থে দেশভাগ মেনে নিতে বললেন।

এ হিংসার জন্য জিন্নাকে মূলত দায়ী করতেই হয়। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলি জিন্নাকে সমর্থন করছিল কারণ তারা কংগ্রেস কর্তৃত্বাধীন, শক্তিশালী কেন্দ্রের বিবোধী ছিল।

কংগ্রেসের আবশ্যিক গ্রুপিং বিরোধিতা ও নেহরুর কিছু উক্তি তাদের মনে ভয় জাগাল যে গণপরিষদ তাদের স্থানীয় কর্তৃত্বের অবসান ঘটাবে। লীগের উদীয়মান বণিক ও শিল্পপতিরা টাটা-বিড়লার আধিপত্য মানতে রাজি ছিল না। তাই জিন্নার ওপর চাপ পড়ল কিছুতেই অন্তর্বর্তী সরকারে parity-র দাবি থেকে এক চুলও সরা চলবে না। জিন্না চিরদিনই তুরুপের তাসটা খেলতে চেয়েছেন, শেষ সিদ্ধান্ত নিতে চেয়েছেন। তাঁর সে স্বাধীনতা ক্রমশ সীমিত হয়ে আসছিল। তবু তিনি যে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিযেছিলেন তা নিঃশর্ত ছিল না। আয়েষা জালাল লীগ কাউন্সিলেব (২৯ জুলাই ১৯৪৬) প্রস্তাব বিশ্লেষণ করে দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে "Direct action, the 'pistol' pointed at Congress in response to its threat to launch civil disobedience,was played as a metaphor not proposed as a fact." কিন্তু আগুন নিয়ে খেলছিলেন তিনি। ১৯৪৬-এর ১৫ আগস্ট জিন্নাকে নেহরু এত দূরও বলেছিলেন যে গণপবিষদে উভয পক্ষের সম্মতি ব্যতীত কোন মুখ্য সাম্প্রদাযিক প্রশ্ন তোলা হবে না, সব ফেডারেল কোর্টে পাঠানো হবে, এবং কংগ্রেস, প্রদেশের সম্মতি সাপেক্ষে, গ্রুপিং মানতে প্রস্তুত। এই দাক্ষিণ্যের হাত জিন্না গ্রহণ করলেন না। কারণ পাকিস্তান গঠনে ও তাব সর্বময় কর্তৃত্ব পেতে তিনি তখন বদ্ধপরিকর। ঠিক তার পরের দিন প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু হল কলকাতার হত্যালীলা দিয়ে। সেই হিংসা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার শৃঙ্খল ক্রমে সারা দেশে রক্তবীজেব মত ছড়িয়ে পড়ল। অতএব দায়িত্ব তাঁকে নিতে হবে। হিন্দু মহাসভা, আকালি প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান প্রতিহিংসাব মাধ্যমে হিংসার অগ্নিতে ঘৃতাহুতি জোগাল। তাবাও দাযিত্ব এড়াতে পাবে না। কবিগুরুর কথায়,

ওবে ভাই, কার নিন্দা করো তুমি। মাথা কর নত।
এ আমার এ তোমার পাপ।

টীকা

১। জওহরলাল নেহরু, ডিসকভারি অব ইণ্ডিয়া, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৪৮৭
২। তদেব, পৃঃ ৪৭৫
৩। লিনলিথগোকে গান্ধী, ১৪ আগস্ট ১৯৪২, গান্ধীজিজ করেসপণ্ডেন্স উইথ দ্য গভর্মেন্ট, ১৯৪২-৪৪ (আহমেদাবাদ, ১৯৪৫), পৃঃ ১৫-৫৫
৪। ঐ, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৪২, তদেব
৫। গান্ধীকে লিনলিথগো, ১৩ জানুযারি ১৯৪৩, তদেব
৬। লিনলিথগোকে গান্ধী, ১৯ জানুযারি ১৯৪৩, তদেব
৭। গান্ধীকে লিনলিথগো, ২৫ জানুয়ারি ১৯৪৩, তদেব
৮। লিনলিথগোকে গান্ধী, ২৯ জানুযারি ১৯৪৩, তদেব
৯। গান্ধীকে লিনলিথগো, ৫ ফেব্রুযারি ১৯৪৩ তদেব
১০। লিনলিথগোকে গান্ধী, ৭ ফেব্রুযারি ১৯৪৩ তদেব
১১। এমেরিকে লিনলিথগো, ১ অক্টোবর ১৯৪৩, ম্যানসারগ (সং), দ্য ট্রানসফার অব পাওয়ার, ৪ খণ্ড, পৃঃ ৩৪৯-৫০।
১২। Directive to the Viceroy Designate by P M & Minister of Defence, War Cabinet Papers তদেব, ডক্যুমেন্ট নং ১৭২
১৩। পেণ্ডেরেল মুন (সং), দ্য ভাইসরয়জ জার্নাল (লণ্ডন, ১৯৭৩), পৃঃ ১-২৬
১৪। ব্রডল্যাণ্ডসে রক্ষিত মাউন্টব্যাটেনের ব্যক্তিগত কাগজপত্র K 261
১৫। লিও এমেরির ডায়েরি, ৩১ মে ১৯৪৩
১৬। ফিলিপ জিগলার, মাউন্টব্যাটেন, দ্য অফিসিয়াল বায়োগ্রাফি (লণ্ডন, ১৯৮৫), পৃঃ ২১৫ ও পরবর্তী
১৭। এমেরিকে ওয়াভেল, ৮ জানুযারি ১৯৪৪, ম্যানসারগ (সং), ট্রানসফার অব পাওয়ার, ৪ খণ্ড, ডক্যুমেন্ট ৩১০। রাজাগোপালাচারি, ভুলাভাই দেশাই, সাপ্রু ও জয়াকর প্রমুখ ৩৫ জন নামকরা ভারতীয় নেতা গান্ধীমুক্তি সমর্থনে এক বিবৃতি দেন ৯ মার্চ, ১৯৪৩। কৃষ্ণমাচারি, যোশী, আহমদ কাজমি প্রভৃতি আইনপরিষদের সদস্য মাঝে মাঝেই বন্দীমুক্তির প্রস্তাব তুলেছিলেন। শেষ প্রস্তাব তোলেন নবলরাই ৮ ফেব্রুযারি ১৯৪৪। কৃষ্ণমাচারি সমর্থনে বলেন, "Don't keep these men in prison in the name of war effort, because your war effort means nothing really You are not fighting the war properly and we have a right to ask that you cannot go on keeping these people in prison indefinitely You have to release them " পরের দিন আহমদ কাজমি ভারত প্রতিরক্ষা আইন বিষয়ে এক মুলতুবি প্রস্তাব তোলেন। তাঁর মতে এর দ্বারা আদালতের অধিকার খর্ব করা হচ্ছে। জাফর আলি খাঁ, এমনকি লিয়াকৎ আলি খাঁ, সমর্থন করলে কাজমির প্রস্তাব ৪৩—৪২ ভোটে গৃহীত হয়। বহুদিন পরে সরকার হেরে গেলে ওয়াভেল বুঝতে পারেন হাওয়া কোনদিকে বইছে। লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি ডিবেটস্, ১ খণ্ড, ১৯৪৪, পৃঃ ১০৮-১০, ১১৫-১৮, ১৭৯।
১৮। গভর্মেন্ট অব ইণ্ডিয়া হোম টু সেক্রেটারী অব স্টেট, ১৯ ফেব্রুযারি, ১৯৪৪, ম্যানসারগ (সং), দ্য ট্রানসফার অব পাওয়ার, ৪ খণ্ড, ডক্যুমেন্ট নং ৩৯২।
১৯। এমেরিকে ওয়াভেল, ১৬ এপ্রিল ১৯৪৪, তদেব, পৃঃ ৮৮৩-৯৩
২০। যুদ্ধের বর্ণনা নেওয়া হল লেঃ কর্নেল ই. বাওয়ার (Bauer) লিখিত The History of World War II মোনাকোতে প্রকাশিত (১৯৬৬) ইতিহাসের ১৯৮৪ সংস্করণ থেকে। লেখক এ ডি বাওয়ার একজন সুইস ঐতিহাসিক। তিনি সুইস বাহিনীর একজন অধিনায়ক ছাড়াও ন্যু চ্যাটেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। শেষতম সংস্করণ মার্কিন ও ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞরা পরিবর্ধিত করেছেন নূতন তথ্যের আলোকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এমন ভালো ও অপক্ষপাতী ইতিহাস আমি দেখিনি। তবে ফিল্ড মার্শাল স্যর উইলিয়াম স্লিমের Defeat into Victory আজও অবশ্য-পাঠ্য।
২১। তোসিকাজু কাসে, এক্লিপ্স অব দ্য রাইজিং সান, পৃঃ ৯২
২২। ওয়াভেলকে গান্ধী, ১৭ জুন, ১৯৪৪, মহাত্মা গান্ধী করেসপণ্ডেন্স উইথ দ্য গভর্মেন্ট ১৯৪৪-৪৭ (নবজীবন, ১৯৫৯), পৃঃ ৩। এই পত্রাবলী ও ১৯৪২-৪৪ সালে জেল থেকে লিখিত পত্রাবলী সংকলন করেছিলেন গান্ধীর ব্যক্তিগত সচিব প্যারেলাল।
২৩। ঐ, ২৭ জুলাই, ১৯৪৪, তদেব, পৃঃ ৬
২৪। গান্ধীকে ওয়াভেল, ১৫ আগস্ট ১৯৪৪, তদেব, পৃঃ ৮। ওয়াভেল যে খসড়া করেছিলেন তা অনেক নরম। মুন, দ্য ভাইসরয়জ জার্নাল, পৃঃ ৮৪-৮৫। ক্যাবিনেট তা কাটছাট করে অনেক কড়া করে দেয়।
২৫। প্যারেলাল, মহাত্মা গান্ধী দ্য লাস্ট ফেজ, ১ খণ্ড, পৃঃ ৩৫
২৬। গান্ধী-সাপ্রুর পত্রালাপ, গান্ধী স্মারক নিধি ৭৫৭০। এ বিষয়ে আর. জে. মুরের ব্যাখ্যা বিভ্রান্তিকর। মুর, এসকেপ ফ্রম এম্পায়ার, পৃঃ ৫৬
২৭। মুন, দ্য ভাইসরয়জ জার্নাল, পৃঃ, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৪৪, পৃঃ ৯১

২৮। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম (পূর্ণাঙ্গ সং, ১৯৮৮), পৃঃ ৯৭

২৮ক। এমেরিকে ওয়াভেল, ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪, ম্যানসারগ ইত্যাদি (সং), ট্রানসফার অব পাওয়ার, ৪ খণ্ড, ডক্যুমেন্ট নং ৩৫২

২৯। বদরুদ্দিন উমর, পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (ঢাকা, ১৯৭০), পৃঃ ২১৪-১৫

৩০। আবুল মনসুর আহমদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর (২য় সং ঢাকা, ১৯৭০), পৃঃ ১৯৪-৯৮

৩১। আবুল কালাম সামসুদ্দিন, অতীত দিনের স্মৃতি (ঢাকা, ১৯৬৮), পৃঃ ২২৫-৩৪

৩২। মোহম্মদি, শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩৫১

৩৩। ওয়াভেলকে কেসি, ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৪, ম্যানসারগ ইত্যাদি (সং), দ্য ট্রান্সফার অব পাওয়ার, ৫ খণ্ড, পৃঃ ২৯-৩০

৩৪। লীগ সেক্রেটারীকে আবুল হাশেম, ৩০ জুলাই ১৯৪৪, সৈয়দ সামসুল হাসান কলেকশন/৩/ফাইল নং ২৩, বেঙ্গল ভল্যুম ১

৩৫। আয়েষা জালাল, দ্য সোল স্পোকসম্যান, পৃঃ উঃ, পৃঃ ১০৮

৩৬। স্যার জে কলভিল (অস্থায়ী বড়লাট)-কে কেসি, ৩০ মার্চ ১৯৪৫, ম্যানসারগ ইত্যাদি (সং), ট্রানসফার অব পাওয়ার, ৫ খণ্ড, পৃঃ ৮৮৫-৬

৩৭। পীরজাদা (সং), ফাউণ্ডেসনস অব পাকিস্তান, ২ খণ্ড, পৃঃ ৪৪৯ ৫২, ৪৮৭-৮৮

৩৮। ওয়াভেলকে গ্ল্যান্সি, ১৬ এপ্রিল ১৯৪৪, ম্যানসারগ ইত্যাদি (সং), ট্রানসফার অব পাওয়ার, ৪ খণ্ড, পৃঃ ৮৮০-৮১

৩৯। গ্ল্যান্সিকে ওয়াভেল, ১৫ এপ্রিল ১৯৪৪, তদেব, পৃঃ ৮৮২

৪০। চার্চিলকে ওয়াভেল, ২৪ অক্টোবর ১৯৪৪, মুন (সং), ভাইসরয়জ জার্নাল, পৃঃ উঃ,পৃঃ ৯৪-৯৯

৪১। প্যারেলাল, মহাত্মা গান্ধী—দ্য লাস্ট ফেজ, ১ খণ্ড, বুক ১, পৃঃ ১১৭-১৯

৪২। এ আর প্রেস্ট, ওয়ার ইকনমিক্স,পৃঃ ৩৪, টেবল ৫

৪৩। তদেব, পৃঃ ৩৭, টেবল ৭

৪৪। কমার্স (পত্রিকা), ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪

৪৫। জি ডি বিড়লা, ইণ্ডিয়াজ ওয়ার প্রসপেরিটি

৪৬। Floke Hilgerdt Industrialization and Foreign Trade, pp 130-1 শিবসুব্রহ্মনিয়মের National Income of India'তে ভারতবর্ষের উন্নয়ন হার ১৯১৩তে ১০০ থেকে ১৯৩৬ ৮ ২৫০ ৭-এ দাঁড়ায়।

৪৭। শিবসুব্রহ্মনিয়ম, National Income of India, টেবল ৪ ১৬

৪৭ক। Manifesto of the 21, The Tribune, 20 May 1936

৪৮। ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদকে বিড়লা, ২৬ মে ১৯৩৬, ঠাকুরদাস পেপার্স, ফাইল নং ১৭৭, ঠাকুরদাসকে বিড়লা, ১ জুন, ১৯৩৬, তদেব

৪৯। পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস ও অন্যান্য, এ ব্রিফ মেমোর্যাণ্ডাম আউটলাইনিং আ প্ল্যান অব ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট ফর ইণ্ডিয়া (বোম্বে, ১৯৪৪)

৫০। পেণ্ডেরেল মুন, ভাইসরয়জ জার্নাল, পৃঃ উঃ,পৃঃ ১২৯

৫১। ম্যানসারগ ইত্যাদি (সং), ট্রানসফার অব পাওয়ার, ৪ খণ্ড, ডক্যুমেন্ট নং ৪০৪, পৃঃ ৭৬৫—৭২

৫২। পেণ্ডেরেল মুন (সং), ভাইসরয়জ জার্নাল, পৃঃ উঃ,পৃঃ ১২৯-৩০

৫৩। ওয়ার ক্যাবিনেট এর ইণ্ডিয়া কমিটির রিপোর্ট ১৯ মে, ১৯৪৫।

ম্যানসারগ ইত্যাদি (সং), ট্রানসফার অব পাওয়ার, ৫ খণ্ড, ডক্যুমেন্ট নং ৪৫৬, পৃঃ ১০৫২

৫৪। ওয়াভেলকে এমেরি, ২৫ জানুয়ারি ১৯৪৫, তদেব, ডক্যুমেন্ট নং ২৩২ ও তার অন্তর্ভুক্ত দলিলপত্র, পৃঃ ৪৬৬ ও পররর্তী

৫৫। পেণ্ডেরেল মুন (সং), ভাইসরয়জ জার্নাল, পৃঃ উঃ,পৃঃ ১৩২

৫৫ক। এ আই সি সি ফাইল নং ১৪৩৯, ১৯৪৫

৫৬। ওয়াভেলকে গান্ধী, তারবার্তা, ১৫ জুন ১৯৪৫, গান্ধী, সম্পূর্ণ বচনাবলী, ৮০ খণ্ড, পৃঃ ৩২৯

৫৭। তদেব, পৃঃ ৩৩১-৩৩, দেশাই-লিয়াকৎ প্যাক্টের জন্য এ আই সি সি ফাইল নং ১৮১৪, ১৯৪৫ দ্রষ্টব্য।

৫৮। ওয়াভেলকে গান্ধী, ১৬ জুন ১৯৪৫, তদেব, পৃঃ ৩৩৫—৩৬

৫৯। ওয়াভেলকে গান্ধী, তারবার্তা, ১৭ জুন, ১৯৪৫, তদেব, পৃঃ ৩৪১

৬০। পেণ্ডেরেল মুন (সং), ভাইসরয়জ জার্নাল, পৃঃ উঃ,পৃঃ ১৪৫-৪৭

৬১। উপস্থিত সদস্যদের তালিকা, তদেব, পাদটীকা ২, পৃঃ ১৪৭-৪৮

৬২। তদেব, পৃঃ ১৪৯-৫০

৬৩। তদেব, পৃঃ ১৫২-৫৩

৬৩ক। আজাদ কিন্তু বলেছেন তাতে খিজিরের নিজের নামই ছিল আর লীগের বাইরের দুজন মুসলমানের নাম (আজাদ ও খিজির,) দেখে জিন্না রেগে যান।India Wins Freedom, (Cal, 1988), পৃঃ ১২১

৬৪। তদেব, পৃঃ ১৫৪
৬৫। এমেবিকে ওয়াভেল, ৩ অক্টোবব ১৯৪৪, ম্যানসাবগ (সং), ট্রানসফার অব পাওয়ার ৫ খণ্ড পৃঃ ৩৭
৬৬। এইচ· ভি হড্‌সন, দ্য গ্রেট ডিভাইড (লণ্ডন, ১৯৬৯), পৃঃ ১২৬
৬৭। ওয়াভেলকে গান্ধী, ১৫ জুলাই ১৯৪৫, গান্ধী, সম্পূর্ণ বচনাবলী, ৮০ খণ্ড, পৃঃ ৪২৬
৬৮। শা নওয়াজ, মাই মেমবিজ অব দ্য আই এন এ অ্যাণ্ড ইটস্ নেতাজি, পৃঃ ১৭৯
৬৯। এস এ আযাব, আনটু হিম আ উইটনেস, পৃঃ ৫১-৫২
৬৯ক। এ আই সি সি ফাইল নং ১৪৫১-A, ১৯৪৫-৪৬
৭০। ওযাভেলেব ডাযেবি, ৬ আগস্ট ১৯৪৫, পেণ্ডেবেল মুন (সং), ভাইসবযজ জার্নাল, পৃঃ ১৬১
৭১। ঐ ডায়েবি, ২৯ আগস্ট, ১৯৪৫, তদেব, পৃঃ ১৬৭
৭২। তদেব, পৃঃ ১৭০-৭১
৭৩। প্যাটেলকে গান্ধী, ১২ আগস্ট ১৯৪৫, গান্ধী, সম্পূর্ণ বচনাবলী, ৮১ খণ্ড, পৃঃ ১০৯-১০
৭৪। মূল হিন্দী থেকে অনুবাদ, তদেব, পৃঃ ৩১৯-২১
৭৫। নেহক, সিলেক্টেড ওযার্কস, ১৪ খণ্ড, পৃঃ ১৯
৭৬। ভুলাভাই দেশাইকে গান্ধী, ২১ অক্টোবব ১৯৪৫, গান্ধী, সম্পূর্ণ বচনাবলী, ৮১ খণ্ড, পৃঃ ৩৯৯-৪০০
৭৭। সোদপুব প্রার্থনা সভায ভাষণ, ১ ডিসেম্বব ১৯৪৫
৭৮। আই বি নোট, ম্যানসাবগ (সং), ট্রানসফাব অব পাওযাব, ৬ খণ্ড, পৃঃ ৫০৭, ৫১২-১৪ , নেহক, সিলেক্টেড ওযার্কস, ১৪ খণ্ড, পৃঃ ২৭৯-৮০
৭৯। ওযাভেলকে গান্ধী, ২৫ জুলাই, ১৯৪৫, কবেসপণ্ডেন্স উইথ দ্য গভর্নমেন্ট ১৯৪৪-৪৭, পৃঃ ৩৯-৪০
৮০। ঐ, ২৯ অক্টোবব, পৃঃ ৪০-৪১
৮০ক। কেসিব জার্নাল, ২২-২৩ নভেম্বব ১৯৪৫, Eur Mss. 48/1-48/4 I O, পৃঃ ২৫৫
৮০খ। তদেব, পৃঃ ২৫৬
৮১। ওযাভেলেব ডায়েরি, ২৫ নভেম্বব ১৯৪৫, পেণ্ডেবেল মুন (সং), ভাইসবযজ জার্নাল, পৃঃ ১৮৯
৮২। ওযাভেলকে কানিংহ্যাম, ২৭ নভেম্বব, ১৯৪৫, তদেব, পৃঃ ১৮৮
৮৩। কানিংহ্যামকে ওযাভেল, ৩০ নভেম্বব ১৯৪৫, তদেব, পৃঃ ১৮৯
৮৪। পেথিক-লবেন্সকে ওযাভেল, ২৭ নভেম্বব ১৯৪৫, ম্যানসাবগ (সং), ট্রানসফাব অব পাওযাব, ৬ খণ্ড, পৃঃ ৫৫২
৮৫। ডি আই বি-ব নোট, তদেব, পৃঃ ৫১২
৮৬। ওয়াভেলেব ডায়েবি, ১৫ ডিসেম্বব ১৯৪৫, পেণ্ডেবেল মুন (সং), ভাইসবযজ জার্নাল, পৃঃ ১৯৩
৮৭। কেসিব জার্নাল, ২ জানুয়াবি ১৯৪৬, Eur Mss 48/1-48/4, পৃঃ ৩০০
৮৮। তদেব, ২৭ জানুয়াবি ১৯৪৬ পৃঃ ৩২১
৮৯। (অমলেশ) ত্রিপাঠীকে গান্ধী, ২৩ ডিসেম্বব ১৯৪৫, গান্ধী সম্পূর্ণ রচনাবলী, ৮২ খণ্ড, পৃঃ ২৬৪
৯০। তদেব, পৃঃ ২৭৭-৭৯
৯০ক। ওয়াভেলের নোট, ম্যানসাবগ (সং) ট্রানসফার অব পাওয়াব, ৫ খণ্ড, পৃঃ ১০৬০, মুন (সং) ভাইসবয়জ জার্নাল পৃঃ ৩২.
৯১। পেণ্ডেরেল মুন (সং), ভাইসবযজ জার্নাল, পৃঃ ১৯৬-২০০
৯১ক। বজবজের শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র 'দেশ' পত্রিকায় নানা চিঠিতে আমাব নামে মিথ্যে অভিযোগ এনেছেন যে আমি লিখেছি, ক্যাবিনেট মিশন পাঠাবাব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয ১৭ই ফেব্রুয়ারি (নৌবিদ্রোহেব একদিন আগে)। এমন কথা কোন সময় আমি বলিনি। অনেকেব মত তিনি বলতে চান নৌবিদ্রোহের চাপে ক্যাবিনেট মিশন পাঠান স্থিব হয়। তা সত্য নয়। জানুয়ারি মাসেই তা পাঠান স্থির হয়। ভাইসরয়জ জর্নাল, ২৪ জানুয়ারি, পৃঃ ২০৬।
৯২। ওয়াভেলকে অকিনলেক, ১২ জানুয়ারি, ১৯৪৬, অকিনলেককে ওয়াভেল, ২৩ জানুয়াবি ১৯৪৬
৯৩। কেসিব জার্নাল, পৃঃ উঃ, ১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬, পৃঃ ৩৩৮ , ঐ ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬, পৃঃ ৩৩৯ , ঐ ১৩ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬, পৃঃ ৩৩৯-৪০
৯৪। সুব্রত ব্যানার্জি, দ্য আব আই এন স্ট্রাইক (নি. দি ১৯৮১), ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), ট্রানসফাব অব পাওযাব, ৬ খণ্ড, পৃঃ ১০৮২-৮৩
৯৫। জওহরলাল নেহরুব চিঠিপত্র, পার্ট ১, ৮১ খণ্ড, নেহরু মেমোবিয়াল লাইব্রেবী। সর্দাব আজাদেব সঙ্গেও পবামর্শ করেন। আজাদ অকিনলেকের সঙ্গে দেখা করে কোনো নাবিককে শাস্তি দেওয়া হবে না এই প্রতিশ্রুতি আদায় করেন এবং নাবিকদের আত্মসমর্পণ করতে বলেন। আজাদ, ইণ্ডিয়া উইনস ফ্রিডম (১৯৮৮), পৃঃ ১৪১-৪২
৯৫ক। ২৩ ফেব্রুয়ারি গান্ধী বলেন, "A combination between Hindus and Muslims and others for the purpose of violent action is unholy and will lead to and is a preparation for mutual violence—bad for India and the world." গান্ধী, সম্পূর্ণ বচনাবলী, ৮৩ খণ্ড, পৃঃ ১৭১। ২৪-এ এর তীব্র প্রতিবাদ করেন অরুণা আসফ আলি। তিনি বলেন, সাধারণ মানুষ "are not interested in the ehtics of violence or non-violence." আরও বলেন, হিন্দু মুসলমানেব সংস্কার বিষয়ে সংহতি হওয়ার চেয়ে ব্যারিকেডে

সংহতি হওয়া শ্রেয। ২৬শে গান্ধী তাঁকে তীব্রতর ভৎসনা করেন। "I do not read the 1942 events as does the brave lady It was good that people rose spontaneously It was bad that some or many resorted to violence Fighters do not always live at the barricade They are too wise to commit suicide. Emphatically it betrays want of foresight to disbelieve British declarations and precipitate a quarrel in anticipation সর্দার প্যাটেলের কাজে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন এবং যারা বিদ্রোহীদের তাতিয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ। "They were thoughtless and ignorant if they believed that by their might they would deliver India from foreign domination Aruna is right when she says that the fighters this time showed grit as never before. But grit becomes foolhardiness when it is untimely and suicidal as this was" 'ভারতের দ্রৌপদী' এমন কঠোর ভর্ৎসনা কোনদিন শোনেননি। তদেব, পৃঃ ১৮২-৮৪। আজাদও অরুণাকে সমর্থন জানাননি। ইণ্ডিয়া উইনস ফ্রিডম (১৯৮৮), পৃঃ ১৪১

৯৬। সুমিত সরকার, মডার্ন ইণ্ডিয়া, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৪২৫, 'Popular movements and National Leadership, 1945-47,' Economic and Political Weekly, vol XVII, nos 14 16, April 1982

৯৭। পেণ্ডেরেল মুন (সং), ভাইসরযজ জার্নাল, পৃঃ ২১৫-১৬

৯৮। ভারতসচিবকে বড়লাট, ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬, ম্যানসারগ ইত্যাদি (সং), ট্রানসফার অব পাওয়ার, ৬ খণ্ড, পৃঃ ১০৭৬

৯৯। জিন্নাকে ইসপাহানি, ১ অক্টোবর ১৯৪৫, জইদি, করেসপণ্ডেন্স, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৪৫৬-৫৯

১০০। ইসপাহানিকে জিন্না, ৯ অক্টোবর ১৯৪৫, তদেব, পৃঃ ৪৬২

১০১। ওযাভেলকে বারোজ (বাংলার লাট), ১১ এপ্রিল ১৯৪৬, L/P and J/4/153, I O L

১০২। পেন্ডেরেল মুন (সং), ভাইসরযজ জার্নাল, পৃঃ ২৩৯

১০৩। ওযাভেলকে বারোজ, ২৫ এপ্রিল ১৯৪৬, L/P and J/4/153, I O L

১০৪। 1945-46 Election Returns

১০৪ক। মৌলানা আজাদ, ইণ্ডিয়া উইনস ফ্রিডম (১৯৮৮), পৃঃ ১৩৭। আজাদ দুঃখ করেছেন যে কম্যুনিস্টরা কান পাৎলা নেহরুকে বোঝান পঞ্জাবে যুনিযনিস্ট দলের সঙ্গে কংগ্রেসের জোট বাঁধা ভুল হয়েছে, লীগের সঙ্গেই জোট বাঁধা উচিত ছিল। তিনি আরও বলেছেন, এই কৃতিত্বের জন্য তাঁর খুব প্রশংসা হয়েছিল আর অহংকারী নেহরু ঈর্ষান্বিত হয়েছিলেন। বোম্বাই ওয়ার্কিং কমিটিতে নেহরু প্রতিবাদ করেছিলেন। গান্ধী কিন্তু আজাদকেই সমর্থন করেন। নেহরু তখন বলেন, ক্যাবিনেট মিশনের সঙ্গে একা আজাদ কথা বলবেন না। একটা কমিটি বলবে। গান্ধী আবার আজাদকে সমর্থন করেন। তদেব, পৃঃ ১৩৭-৪০

১০৫। বল্লভভাই প্যাটেলকে আর কে সিদ্ধ, ৪ জানুয়ারি ১৯৪৬, দুর্গাদাস (সং), সর্দার প্যাটেলস করেসপণ্ডেন্স ১৯৪৫-৫০, ২ খণ্ড, পৃঃ ৩১৭

১০৬। ওযাভেলকে কানিংহাম (সীমান্তের লাট), ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫, R/3/1/105, I O L

১০৭। চৌধুরী খলিকুজ্জমান, পাথওয়ে টু পাকিস্তান, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৩৩৪-৩৭

১০৮। ডি সি পটার, 'Manpower Shortage and the End of Colonialism, the Case of the Indian Civil Service, Modern Asian Studies, 7-1, (1973), pp 47-73

১০৯। ওযাভেলকে কেসি, ১ মার্চ ১৯৪৫, ম্যানসারগ ইত্যাদি (সং), ট্রান্সফার অব পাওয়ার, ৫ খণ্ড, পৃঃ ২৯২

১১০। ফিলিপ মেসন, আ ম্যাটার অব অনার আন অ্যাকাউন্ট অব দ্য ইন্ডিয়ান আর্মি, ইটস অফিসারস্ অ্যান্ড মেন (১৯৭৪)

১১১। ক্যাপল্যান্ড কলকাতাস্থ ব্রিটিশ শিল্পপতিদের পূর্ণ স্বরাজে সম্মত দেখেছিলেন। ক্যাপল্যান্ড ডায়েরি, পৃঃ ২৭, ৫২

১১২। পেথিক-লরেন্সকে ওযাভেল, ১৩ জুলাই ১৯৪৬, ম্যানসারগ ইত্যাদি (সং), ট্রানসফার অব পাওয়ার, ৮ খণ্ড, পৃঃ ২৬

১১৩। এইসব প্রশ্ন বিশদ আলোচনা করেছেন বি আর টমলিনসন তাঁর দ্যা পলিটিক্যাল ইকনমি অব দ্য রাজ, ১৯১৪-১৯৪৭, দ্যা ইকনমিক্স অব ডিকলোনাইজেশন ইন ইন্ডিয়া (১৯৭৯) গ্রন্থে।

১১৪। ওযাভেলকে গ্লান্সি, ২৬ অক্টোবর ১৯৪৪, ম্যানসারগ ইত্যাদি (সং), ট্রান্সফার অব পাওয়ার, ৫ খণ্ড, পৃঃ ১৪১-৪৩

১১৫। ওযাভেলকে কেসি, ১৭ ডিসেম্বর ১৯৪৪, R/3/1/105, I O L.

১১৬। প্যাটেলকে আজাদ, ১৩ আগস্ট ১৯৪৫, জি এম নান্দুরকর (সং), সর্দারস লেটার্স—মোস্টলি আননোন (আহমেদাবাদ, ১৯৭২) ১ খণ্ড, পৃঃ ১৭১-৭২

১১৭। প্যাটেলকে বিড়লা, ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ তদেব, পৃঃ ১৭৪-৭৫

১১৮। ডি গিলমার্টিন, 'বিলিজাস লিডারশিপ অ্যান্ড দ্য পাকিস্তান মুভমেন্ট ইন দা পাঞ্জাব', মডার্ন এশিয়ান স্টাডিজ ১৩, ৩ (১৯৭৯), পৃঃ ৪৮৫-৫১৭

১১৯। মুন (সং), ভাইসরযজ জার্নাল, পৃঃ উঃ, পৃঃ ২৩২

১২০ । ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), ট্রান্সফার অব পাওযাব, ৬ খণ্ড, পৃঃ ৫২১ , টমলিনসন, দ্য পলিটিক্যাল ইকনমি অব দ্য বাজ ১৯১৪-১৯৪৭ (কেমব্রিজ, ১৯৭৯), পৃঃ ১৪৭-৪৮

১২১ । পার্থসাবথি গুপ্ত তাঁব Imperialism and British Labour Movement 1914-1964 (London, 1975)-এ এই প্রসঙ্গ বিশদ আলোচনা কবেছেন ।

১২২ । ম্যানসারগ ইত্যাদি (সং), ট্রান্সফাব অব পাওয়ার, ৭ খণ্ড, পৃঃ ১৭, ৩০, ৪৫, ৩১

১২৩ । আজাদকে প্যাটেল, ১৯ মার্চ ১৯৪৬, এর অন্তর্ভুক্ত নেহরুর খসড়া ১৫ মার্চ ১৯৪৬, দুর্গা দাস(সং), সর্দাব প্যাটলেস্ করেসপণ্ডেন্স (আহমেদাবাদ, ১৯৭২), ৩ খণ্ড, পৃঃ ২৪২-৪৫

১২৪ । আজাদেব সাক্ষাৎকাব, ৩ এপ্রিল, ১৯৪৬, ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), ট্রান্সফাব অব পাওয়ার, ৭ খণ্ড, পৃঃ ৪৬ , মুন (সং), ভাইসবয়জ জার্নাল পৃঃ ২৩৫-৩৬ । আজাদ আত্মজীবনীতে বলছেন তাঁব সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয় ৬ এপ্রিল । এ তথ্য ভুল । পেথিক-লরেন্স' নাকি উচ্ছ্বসিত হযে বলেন—"you are suggesting a new solution of the communal problem" এ কথাও মানা কঠিন । যে কোন যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো এই বকমই হয় । তাছাড়া নেহরুব ১৫ই মার্চ এ ধবনের প্রস্তাব দেন । Indian Wins Freedom (1988), pp 147-48

১২৫ । ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), ট্রান্সফাব অব পাওযাব, পৃঃ ৩৮ ও ৪৭

১২৬ । তদেব, পৃঃ ৪৮

১২৭ । হোম পল (ইন্টাবন্যাল) ব্রাঞ্চ, ১৯৪৬, ফাইল নং ৫১-২/৪৬ পল (১)

১২৮ । পেথিক-লবেন্সকে জিন্না, ২৯ এপ্রিল ১৯৪৬-এব অন্তর্ভুক্ত

১২৯ । ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), ট্রান্সফাব অব পাওয়াব ৭ খণ্ড, পৃঃ ৭১ , মুন (সং), ভাইসবযজ জার্নাল, পৃঃ ২৪২

১৩০ । তদেব, পৃঃ ১০৫

১৩১ । তদেব, পৃঃ ১১৬-২৭

১৩২ । অ্যালেকজাণ্ডাবেব ডায়েবি, চার্চিল কলেজ (কেমব্রিজ), ১৬ এপ্রিল, ১৯৪৬

১৩৩ । ওযাভেলেব ডায়েবি, ১৬ এপ্রিল, ১৯৪৬, মুন (সং), ভাইসবয়জ জার্নাল, পৃঃ ২৪৬

১৩৪ । ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), ট্রান্সফাব অব পাওযাব, ৭ খণ্ড, পৃঃ ৮২

১৩৫ । তদেব, পৃঃ ১২৬

১৩৬ । মুন (সং), ভাইসবযজ জার্নাল, ২৪ এপ্রিল, ১৯৪৬, পৃঃ ২৫১

১৩৭ । ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), ট্রান্সফাব অব পাওযাব , ৭ খণ্ড, পৃঃ ১৪৫

১৩৮ । আজাদ, ইণ্ডিয়া' উইনস ফ্রিডম (১৯৮৮), পৃঃ ১৫৩

১৩৯ । সুধীব ঘোষ, গান্ধীজ এমিসাবি, পৃঃ ১০৫-১০ , প্যাবেলাল, পৃঃ ১৯৪-৬ , আলেকজাণ্ডাবেব ডায়েবি, পৃঃ ৪৭-৮ , মুন (সং), ভাইসবয়জ জার্নাল, পৃঃ ২৫৪

১৪০ । ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং) ট্রান্সফাব অব পাওযাব, ৭ খণ্ড, পৃঃ ১৫০

১৪১ । পেথিক-লবেন্সকে আজাদ, ২৮ এপ্রিল, ১৯৪৬, তদেব, পৃঃ ১৫৩

১৪২ । অ্যালেকজাণ্ডাবেব ডায়েরি, ২৯ এপ্রিল ১৯৪৬, পৃঃ ৪৮

১৪৩ । পেথিক-লরেন্সকে আজাদ, ৬ মে, ১৯৪৬, ম্যানসাবগ ইত্যাদি(সং) ট্রানসফার অব পাওযাব,৭ খণ্ড,পৃঃ ১৯৪

১৪৪ । মুন (সং), ভাইসবযজ জার্নাল, পৃঃ ২৫৯

১৪৫ । তদেব, পৃঃ ২৬০

১৪৫ক । মহাত্মা গান্ধী, সম্পূর্ণ বচনাবলী, ৮৪ খণ্ড, পৃঃ ৪৬৩-৬৪

১৪৬ । মুন (সং), ভাইসবযজ জার্নাল, পৃঃ ২৬১

১৪৭ । ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), ট্রান্সফাব অব পাওয়াব, ৭ খণ্ড, পৃঃ ২১৭-২২২

১৪৮ । তদেব, পৃঃ ২৩০ , মুন (সং), ভাইসরয়জ জার্নাল, পৃঃ ২৬২-৬৩

১৪৯ । ম্যানসারগ (সং), পূঃ উঃ, পৃঃ ২৫৩

১৫০ । তদেব, পৃঃ ২৫৯

১৫১ । তদেব, পৃঃ ২৬০

১৫২ । তদেব, পৃঃ ২৮৪, ২৮৮

১৫৩ । মুন (সং), ভাইসবযজ জার্নাল, পৃঃ ২৬৭-৬৮

১৫৪ । মুন (সং) ভাইসবযজ জার্নাল, পৃঃ ২৭১

১৫৫ । ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং) ট্রান্সফাব অব পাওযাব, ৭ খণ্ড. পৃঃ ৩১৭

১৫৬ । পেথিক-লরেন্সেব প্রেস বিবৃতি । তদেব, পৃঃ ৩২১

১৫৭ । তদেব, পৃঃ ৩২০

১৫৮ । তদেব, পৃঃ ৩২৭

১৫৯ । মুন (সং), ভাইসবয়জ জার্নাল, পৃঃ ২৭৩-৭৪

১৬০ । তদেব, পৃঃ ২৭৪ । গান্ধীব ২০ মেব চিঠি এই গ্রন্থেব ৩ পরিশিষ্ট-এ দেওযা হয়েছে । তদেব, পৃঃ ৪৮১-৮২

১৬১ । অ্যালেকজাণ্ডারের ডায়েরি, পৃঃ ৬৯

১৬২। ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), ট্রানসফাব অব পাওয়াব, ৭ খণ্ড, পৃঃ ৩৫৬

১৬৩। হবিজন-এ এই প্রবন্ধ ২৬ মে ১৯৪৬ প্রকাশিত হয়।

১৬৪। মুন (সং), ভাইসবযজ জার্নাল, পৃঃ ২৭৫/২৫ মে এ বিষয়ে মিশন ও বড়লাট এক বিবৃতি দিলেন। ভি পি মেনন, দ্য ট্রানসফাব অব পাওযাব ইন ইণ্ডিযা (১৯৫৭), পৃঃ ২৭১

১৬৫। তদেব, পৃঃ ২৭৬

১৬৬। ম্যানসাবগ (সং), ট্রানসফাব অব পাওযাব, ৭ খণ্ড, পৃঃ ৩৭০

১৬৭। তদেব, পৃঃ ৩১৮

১৬৮। তদেব, পৃঃ ৩৭৭-৭৮

১৬৯। মুন (সং), ভাইসবযজ জার্নাল, পৃঃ ২৭৮-৭৯

১৭০। তদেব, পবিশিষ্ট IV, পৃঃ ৪৮৩-৮৬

১৭১। আজাদকে ওয়াভেল, ৩০ মে ১৯৪৬, তদেব, পৃঃ ২৮০-৮১

১৭২। তদেব, পৃঃ ২৮৩-৮৫

১৭৩। ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), ট্রান্সফাব অব পাওযাব, ৭ খণ্ড, পৃঃ ৪৪২ ,

১৭৪। নিচলদাস ভজিবাণিকে প্যাটেল, ১২ জুন ১৯৪৬, দুর্গা দাস, পূঃ উঃ, ৩ খণ্ড পৃঃ ১০৮-৯

১৭৫। আর জে মুব, এসকেপ ফ্রম এম্পাযাব, পৃঃ ১২২-২৪

১৭৬। ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), ট্রানসফাব অব পাওযাব, ৭ খণ্ড, পৃঃ ৪৭৩

১৭৭। তদেব, পৃঃ ৪৭৮, মুন (সং) ভাইসবযজ জার্নাল, পৃঃ ২৮৮। ১৩ মেব আলোচনাব জন্য তদেব, পৃঃ ২৬৭-৬৮

১৭৮। ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), ট্রান্সফাব অব পাওযাব, ৭ খণ্ড, পৃঃ ৪৮০

১৭৯। আব জে মুব, পূঃ উঃ, পৃঃ ১২৬

১৮০। ওযাভেলকে গান্ধী, ১২ জুন ১৯৪৬, Mahatma Gandhi's correspondence with goverment 1944-47, পৃঃ ২০৪-৫

১৮১। মুন (সং), ভাইসবযজ জার্নাল, পৃঃ ২৯১

১৮২। তদেব, পৃঃ ২৯৩, গান্ধী, সম্পূর্ণ বচনাবলী ৮৪ খণ্ড, পৃঃ ৩২৮

১৮৩। গান্ধী, সম্পূর্ণ বচনাবলী, ৮৪ খণ্ড, পৃঃ ৩২৪

১৮৪। তদেব, পৃঃ ৩৩০

১৮৫। মুন (সং), ভাইসবযজ জার্নাল, পবিশিষ্ট VI, পৃঃ ৪৮৯-৯০

১৮৬। প্যাবেলালেব ডাযেবি, ২০ জুন ১৯৪৬, প্যাবেলাল, গান্ধী, লাস্ট ফেজ, ১ খণ্ড ১ অংশ, পৃঃ ২২২

১৮৭। ওযাভেলকে জিন্না, ১৯ জুন ১৯৪৬। আগেব দিন সাক্ষাৎকাবে তিনি বলেন, কোন Quisling-এব সঙ্গে তিনি এক পবিষদে বসবেন না।

১৮৮। ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), ট্রান্সফাব অব পাওযাব ৭ খণ্ড, পৃ ৫৭৩

১৮৯। তদেব, পৃঃ ৫৮৫-৮৬

১৯০। সুধীব ঘোষ, গান্ধীজ এমিসাবি, পৃঃ ১৬৭

১৯১। অ্যালেকজাণ্ডাবেব ডাযেবি, পবিশিষ্ট LXXIV

১৯২। মুন (সং), ভাইসবযজ জার্নাল, পৃঃ ৩০২-৩ ও পৃঃ ৩০৫

১৯৩। তদেব, পবিশিষ্ট VII, পৃঃ ৪৯১-৯২

১৯৪। তদেব, পৃঃ ৩০৫

১৯৫। আজাদকে ওযাভেল, ২৭ জুন ১৯৪৬ ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), ট্রান্সফাব অব পাওযাব, ৭ খণ্ড, পৃঃ ৬২৫

১৯৬। অ্যালেকজাণ্ডাবেব ডাযেবি, পৃঃ ১০৮-৯

১৯৬ক। জিন্নাব প্রতিবেদন, ২৭ জুন, ওযাভেলকে জিন্না, ২৮ জুন ১৯৪৬, মুন (সং), ভাইসবযজ জার্নাল, পৃঃ ৩০৮

১৯৭। তদেব, পৃঃ ৩০৯-১৫

১৯৮। ওযাভেলকে অ্যাটলি, ২২ জুলাই, ১৯৪৬, ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), ট্রান্সফাব অব পাওযাব, ৮ খণ্ড, পৃঃ ৬৪

১৯৮ক। ওযাভেলকে অ্যাটলি, ৩১ জানুযাবি ১৯৪৭ মুন (সং), ভাইসবযজ জার্নাল, পৃঃ ৪৯৭-৯৮

১৯৯। তদেব, পৃঃ ৩০৯

২০০। ওযাভেল-জিন্না সাক্ষাৎকাব, ৯ জুলাই ১৯৪৫, তদেব, পৃঃ ১৫২-৫৩

২০১। তদেব, পৃঃ ৩১৩

২০২। বাজা ষষ্ঠ জর্জকে ওযাভেল, ৮ জুলাই ১৯৪৬, তদেব, পবিশিষ্ট VIII, পৃঃ ৪৯৩-৯৬

২০৩। বোম্বে ক্রনিকল, ৮ জুলাই, ১৯৪৬

২০৩ক। জওহবলাল নেহরুব প্রেস বিবৃতি, ১০ জুলাই, ১৯৪৬, স্যাব মবিস গযাব ও এ আপ্পাডোবাই, স্পীচেস অ্যান্ড ডকুমেন্টস অন দ্য ইন্ডিযান কনস্টিট্যুশন, ১৯২১-৪৭ (অক্সফোর্ড, ১৯৫৭), ২ খণ্ড, পৃঃ ৬১২-১৫

২০৪। মৌলানা আজাদ, ইন্ডিযা উইনস ফ্রিডম (পূর্ণাঙ্গ সংস্কবণ, ১৯৮৮), পৃঃ ১৬২। গান্ধী নাকি প্যাটেলেব অনুকূলে ছিলেন। তদেব, পৃঃ ১৬৩

২০৫। ডি পি মিশ্রকে প্যাটেল, ২৯ জুলাই ১৯৪৬, দুর্গা দাস, সবদাব প্যাটেলস কবেসপণ্ডেন্স, ৩ খণ্ড, পৃঃ ১৫৩-৫৪

২০৬। নেহরুকে গান্ধী, ১৭ জুলাই ১৯৪৬, কে এম মুন্সী, ইন্ডিয়ান কনস্টিটুশনাল ডকুমেন্টস, ১ খণ্ড, পৃঃ ৪৬৬

২০৭। অব্যবহিত পূর্বের অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২০৮। জওহরলাল নেহরুর প্রেস বিবৃতি, ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৯, দ্য হিন্দু, ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৯

২০৯। জিন্নার প্রেস বিবৃতি, ২৭ জুন ১৯৪৬, ম্যানসারগ ইত্যাদি (সং) ট্রান্সফার অব পাওযাব, ৭ খণ্ড, পৃঃ ৬২৭

২১০। তদেব, ৮ খণ্ড, পৃঃ ৬৮

২১১। তদেব, পৃঃ ৩১৭, পবিশিষ্ট ১

২১২। বোম্বাই কাউন্সিলে জিন্নার ভাষণ, পিবজাদা (সং), ফাউন্ডেশন অব পাকিস্তান, ২ খণ্ড, পৃঃ ৫৫৩

২১৩। কাউন্সিলের প্রস্তাব, তদেব, পৃঃ ৫৫৮

২১৪। আয়েষা জালাল, দ্য সোল স্পোকসম্যান, পৃঃ উঃ, পৃঃ ২১৩

২১৫। সিন্ধুর লাট মুডির মন্তব্য, ম্যানসারগ ইত্যাদি (সং), ট্রান্সফাব অব পাওযাব, ৮ খণ্ড, পৃঃ ২১৩

২১৬। মুন (সং), ভাইসবয়জ জার্নাল, পৃঃ ৩২৯

২১৭। তদেব। ডাক তার, ব্যাঙ্ক ও রেল ধর্মঘটেব পরিপ্রেক্ষিতে প্যাটেলেব উদ্বেগ ব্যাখ্যা কবা যায়। ২৯ জুলাই শ্রমিকদের সাধাবণ ধর্মঘট ডাকা হয়েছিল।

২১৮। পেথিক-লবেন্সকে ওযাভেল, ৫ আগস্ট ১৯৪৬, ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), ট্রান্সফাব অব পাওয়াব, ৮ খণ্ড, পৃঃ ১৯০-১

২১৯। ঐ, ১৮ আগস্ট ১৯৪৬, তদেব, পৃঃ ২৪৮

২২০। অমলেশ ত্রিপাঠী, দ্যা একস্ট্রিমিস্ট চ্যালেঞ্জ, পৃঃ উঃ, সুমিত সবকাব, দ্য স্বদেশী মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল ১৯০৩-৮ পৃঃ উঃ, সুবঞ্জন দাশ, 'The Complexities of Communal violence in Twentieth Century Bengal, The Mynensingh Experience, 1906-1907, The Calcutta Historical Journal, vol XII nos 1-2, July 1987 June 1988, pp 32-60

২২১। পার্থ চট্টোপাধ্যায়, বেঙ্গল ১৯২০-১৯৪৭ দা ল্যাণ্ড কোয়েশ্চেন (১৯৮৪), ১১ অধ্যায়

২২২। আজিজুল হক, দ্য ম্যান বীহাইন্ড দ্য প্লাও (কলকাতা ১৯৩৯), ৮১ সাবণি, পৃঃ ৩১১

২২৩। বিনয়ভূষণ চৌধুবী, 'দ্য প্রসেস অব ডিপেজেন্টাইজেশন—ইন বেঙ্গল অ্যান্ড বিহাব ১৮৮৫-১৯৪৭, ইন্ডিযান হিস্টবিক্যাল রিভ্যু, ২, ১ (জুলাই ১৯৭৫) পৃঃ ১৩৮; পার্থ চট্টোপাধ্যায়; পৃঃ উঃ, পৃঃ ৪ ১২ সাবণি, পৃঃ ১৪৬-৪৭

২২৪। বিনয় চৌধুবী বলছেন ১৯৩৮ ও ১৯৪২-এব মধ্যে বন্ধকীব সংখ্যা ৬৫% কমে যায় ও বিক্রীব সংখ্যা বাড়ে। কেমব্রিজ ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইন্ডিযা, ২ খণ্ড, পৃঃ ১৫৪

২২৫। ল্যান্ড বেভিন্যু কমিশনেব কাছে বেঙ্গল প্রভিন্সিযাল কিষান সভাব প্রতিবেদন, ৬ খণ্ড, পৃঃ ৪৬

২২৬। বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি প্রোসিডিংস, LI নং ৪, পৃঃ ১৩১৯-১৪০৩, ২২৭৪-২৩১৫

২২৬ক। ভাবত সবকাব হোম ডিপার্টমেন্ট ৫/৭/৪২-এ ঢাকা বাযট এনকোযাবি কমিটি, ১৯৪২ বিপোর্টটি পাওযা যাবে।

২২৭। গর্ভমেন্ট অব বেঙ্গল, পল কনফিডেন্সিযাল, ফাইল ৩৯৬/৪২

২২৭ক। পি সি মহলানবিশ, বামকুমাব মুখার্জী ও অম্বিকা ঘোষ, A Sample Survey of After-effects of Bengal Famine of 1943, Samkhya, 7 (1946)

২২৮। আবুল মনসুব আহমেদ, আমাব দেখা বাজনীতিব পঞ্চাশ বছব, পৃঃ ১৯৪-৯৮, যতীন্দ্রনাথ দে, 'The History of the Krishak Praja Party of Bengal 1929-1947 etc', Delhi thesis, 1977 দ্রষ্টব্য।

২২৮ক। আবুল হাশেম, ইন বেট্রসপেকশন (ঢাকা, ১৯৭৫); শীলা সেন, পৃঃ উঃ, ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়। আবুল হাশেমেব ১৯৪৫-এ লেখা Let us go to war অবশ্য দ্বিজাতিতত্ত্ব পুবো মেনে নেয়নি। বাংলাকে তিনি nation মনে কবতেন, অর্থাৎ স্বতন্ত্র বাষ্ট্র হবাব হকদাব। কিন্তু ধর্ম তাব ভিত্তি নয়। ভাষা ও সংস্কৃতিই ভিত্তি

২২৯। বড়লাটেব কাছে বাংলা সবকাব ৭ জানুযাবি, ১৯৪৬, L/P and G/5/152, I.O.L.

২৩০। ঐ, ১১ এপ্রিল, ১৯৪৬, L/P and G/5/153, I.O.L

২৩১। অমৃতবাজাব পত্রিকা, ১২ ২৪ এপ্রিল, ১৯৪৬ এ সুববর্দি ও কিবণশঙ্কব বাযেব পত্রাবলী প্রকাশিত হযেছে। কিবণশঙ্কব যে পাঁচ দফা শর্ত দেন, সুবাবর্দি তাব সব মানতে পাবেন নি। ওযাভেলেব মতে জিন্নাই বাগড়া দেন। মুন (সং), ভাইসরযজ জার্নাল, পৃঃ ৩৪৮

২৩১ক। তেভাগা আন্দোলন বিষয়ে সুগত বসু, পৃঃ উঃ, পৃঃ ২৫২-২৭৩

২৩২। রোনাল্ডশে, (Essayez), পৃঃ ১০৮-১১৬, ব্রুমফিল্ড, পৃঃ ১১৯-২৪

২৩৩। গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গল, পল ১২ সি-১৩, বি ৪৮৪-৪৮৫, ডিসেম্বব ১৯২৬, লীটন, Pundits and Elephants পৃঃ ১৬৫-১৭৪

২৩৪। রবীন্দ্রনাথকে অ্যান্ড্রুজ, ১৭ আগস্ট ১৯২৬, অ্যান্ড্রুজ কল. বিশ্বভাবতী

২৩৫। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৫ মে ১৯২৬

২৩৬। এম এস গোলওযালকব, We or Our Nationhood Defined (Second ed, Nagpur 1947) পৃঃ ৫৫-৫৬,

২৩৬ক। ১৯৩১-এ প্রতিবাদ করেন প্রফুল্ল ঠাকুব, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, নলিনী সবকাব, তুলসী গোস্বামী, বি সি চ্যাটার্জী ও বি পি সিংহরায়, সপ্রু পেপার্স। পববর্তীকালে নেতৃত্ব দেন স্যাব এন এন সবকাব। এন এন সবকাব, Bengal under Communal Award and Poona Pact (Cal 1933), বসুমতী, অমৃতবাজাব পত্রিকা, আনন্দবাজাব পত্রিকা, অ্যাডভান্স—প্রায় সব বাঙালী কাগজ সাম্প্রদায়িক বাঁটোযাবাব ব্যাপাবে হিন্দু মহাসভাকে সমর্থন কবেছিল। শেষ প্রতিবাদে ববীন্দ্রনাথও স্বাক্ষর দেন। মার্কেস অব জেটল্যান্ডকে বর্ধমানেব মহাবাজা, ৪ জুন ১৯৩৬-এব অন্তর্ভুক্ত মেমোবেন্ডাম দ্রষ্টব্য।

২৩৭। বাজেন্দ্র প্রসাদকে হিন্দু মহাসভাব তাব, ১৬ ফেব্রুযাবি ১৯৩৫, বাজেন্দ্র প্রসাদ পেপার্স, XI/35/1/21

২৩৮। মহাদেব দেশাইকে ঘনশ্যামদাস বিড়লা, ২৮ ফেব্রুযাবি ১৯৩৫, ইন দ্য স্যাডো অব দা মহাত্মা, পৃঃ উঃ, পৃঃ ১৫০

২৩৮ক। নেহরুকে শবৎ বসু, ১৯ সেপ্টেম্বব ১৯৩৬-এব অন্তর্ভুক্ত। এ আই সি সি ফাইল g 24/710 of 1936

২৩৮খ। শরৎ বসুকে নেহেরু, ৪ অক্টোবব ১৯৩৬, তদেব

২৩৮গ। বি সি বাযকে বল্লভভাই প্যাটেল, ৯ অক্টোবব ১৯৩৬, তদেব

২৩৮ঘ। বি সি বাযকে নেহরু, ৩ ডিসেম্বব ১৯৩৬, এ আই সি সি ফাইল P 6/707 of 1936

২৩৮ঙ। নেহরুকে জে সি গুপ্ত, ১৪ আগস্ট ১৯৩৭, এ আই সি সি ফাইল P 5/868 of 1937

২৩৮চ। মুন (সং), ভাইসবযজ জার্নাল, পৃঃ ৪২৯, হোম পল ৩১/১/৪৬

২৩৯। জিন্নাকে ইস্পাহানি, ২০ আগস্ট ১৯৪৬, জাইদি (সং), এম এ ইসপাহানি—জিন্না কবেসপন্ডেন্স (কবাচী, ১৯৭৬), পৃঃ ৪৯০

২৪০। বড়লাটকে বাবোজ, ২২ আগস্ট ১৯৪৬, ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), ট্রান্সফব অব পাওয়াব, ৮ খণ্ড, পৃঃ ১৯৭

২৪১। বেঙ্গল ফর্টনাইটলি বিপোর্ট ফব দ্য সেকেন্ড হাফ অব আগস্ট ১৯৪৬, হোম পল (1) ফাইল নং ১৮-৮-৪৬। বাবোজেব মতে ষোল হাজাব ছিল আহতেব সংখ্যা।

২৪২। ওযাভেলেব কাছে বাবোজেব গোপন প্রতিবেদন, ২২ আগস্ট ১৯৪৬, ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), ট্রান্সফাব অব পাওযাব ৮ খণ্ড, পৃঃ ১৯৭

২৪৩। আজাদ, ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম (১৯৮৮), পৃঃ ১৬৯

২৪৪। নেহরুকে বুচাব, ১৩ নভেম্বব, ১৯৫৪, নেহরু পেপার্স, জে এন এম এল

২৪৪ক। স্যাব ফ্রান্সিস টাকাব, While Memory Serves

২৪৫। শীলা সেন, মুসলিম পলিটিক্স ইন বেঙ্গল, পৃঃ উঃ, পৃঃ ২১২-১৩/সুবাবর্দি সমান্তবাল সবকাব গড়াব ভয দেখান, কেন্দ্রকে দেয় কব বন্ধ কবে দেবেন বলেন। আগে এপ্রিলে তিনি দিল্লিতে বলেছিলেন, "Let me honestly declare that every Muslim of Bengal is ready and prepared to lay down his life" পিবজাদা, পৃঃ উঃ

২৪৬। মুন (সং), ভাইসবযজ জার্নাল, পৃঃ ৩৩৮-৪১

২৪৭। ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), ট্রান্সফাব অব পাওযাব, ৮ খণ্ড, পৃঃ ১৮৭

২৪৮। ক্রিপসকে নেহরু, ১৮ আগস্ট ১৯৪৬, ওযাভেলকে নেহরু, ১৯ ও ২২ আগস্ট ১৯৪৬

২৪৯। মুন (সং), ভাইসবযজ জার্নাল, পৃঃ ৩৪১ ও পাদটীকা

২৫০। গান্ধী, সম্পূর্ণ বচনাবলী, ৮৫ খণ্ড, পৃঃ ২১৫-১৬

২৫১। ওয়াভেলকে নেহরু ২২ আগস্ট ১৯৪৬, নেহরু পেপার্স, ওযাভেলকে নেহরু, ২৮ আগস্ট ১৯৪৬, প্যাবেলাল, পৃঃ উঃ, পৃঃ ২৫৬

২৫২। নেহরুকে ওযাভেল, ২৯ আগস্ট, ১৯৪৬, তদেব, পৃঃ ২৫৭

২৫৩। সুধীব ঘোষ, গান্ধীজ এমিসাবি, পৃঃ উঃ, পৃঃ ১৯

২৫৪। ক্রিপসকে সুধীব ঘোষ, ২৮ আগস্ট ১৯৪৬, তদেব, পৃঃ ২১

২৫৫। ওযাভেলকে পেথিক-লবেন্স, ২৮ আগস্ট ১৯৪৬, ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), ট্রান্সফাব অব পাওযাব, ৮ খণ্ড, পৃঃ ২১৩

২৫৬। আজাদ, ইন্ডিযা উইনস ফ্রিডম, পৃঃ ১৭৪

২৫৭। মুন (সং), ভাইসবযজ জার্নাল, পৃঃ ৩৪৭

২৫৮। ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), ট্রান্সফাব অব পাওযাব, ৮ খণ্ড, পৃঃ ৩৮৫

২৫৯। ভি পি মেনন, দ্য ট্রান্সফাব অব পাওযাব ইন ইন্ডিযা পৃঃ উঃ, পৃঃ ৩০৭

২৬০। পেথিক লবেন্সকে ওযাভেল, ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), ট্রান্সফাব অব পাওযাব ৮ খণ্ড, পৃঃ ৯১

২৬১। মুন (সং), ভাইসবযজ জার্নাল, পৃঃ ৩৫৬

২৬২। ওযাভেলকে পেথিক-লবেন্স ২৫ সেপ্টেম্বব, ১৯৪৬, ম্যানসাবগ ইত্যাদি, (সং), ট্রান্সফাব অব পাওযাব, ৮ খণ্ড, পৃঃ ৬১-৬২

২৬৩। ভূপালেব নবাবেব সঙ্গে গান্ধীব আলোচনা, ১ অক্টোবব, ১৯৪৬, প্যাবেলাল, পৃঃ উঃ, পৃঃ ২৬৭

২৬৪। জিন্নাকে নেহরু, ৬ অক্টোবব ১৯৪৬

২৬৫। মুন, (সং), ভাইসবযজ জার্নাল, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৩৫৬-৫৭

২৬৬। নেহরু ও একই সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। ওয়াভেলকে নেহরু, ১৫ অক্টোবর ১৯৪৬
২৬৭। ওয়াভেলকে নেহরু, ২৪ অক্টোবর ১৯৪৬, মুন (সং), ভাইসরয়জ জার্নাল, পৃঃ ৩৬২-৬৩
২৬৮। Bengal Press Advisory Committee release, tel. 16 October 1946
২৬৯। স্টেটসম্যান ১৮, ২০, ২৪, ২৭ অক্টোবর, হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড, ৮ নভেম্বর, ১৯৪৬
২৭০। হরিজন, ২ জুন, ১৯৪৬
২৭১। ঐ, ১৪ এপ্রিল, ১৯৪৬
২৭২। ঐ, ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬
২৭৩। ঐ, ৬ অক্টোবর, ১৯৪৬
২৭৪। সুরাবর্দিকে গান্ধী, ৩ ডিসেম্বর ১৯৪৬
২৭৫। গান্ধীকে সুরাবর্দি, ২ ডিসেম্বর ১৯৪৬
২৭৬। সুরাবর্দিকে গান্ধী, ৫ ডিসেম্বর ১৯৪৬
২৭৭। প্যারেলালকে প্যাটেল, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৪৬
২৭৮। প্যারেলাল, লাস্ট ফেজ, ২ খণ্ড, ২ অংশ, পৃঃ ২৪৯
২৭৯। 'Trouble in 1946', M. O. Carter papers (Centre for South Asian Studies, Cambridge University), 10 ff
২৮০। I. M G. Bell papers, ঐ, file 3, item 4
২৮১। সুধীর ঘোষ, গান্ধীজ এমিসারি, পৃঃ ৩২-৪৩
২৮২। কলভিলকে ডাও, ১০/১১ ডিসেম্বর ১৯৪৬
২৮৩। ম্যানসারগ ইত্যাদি (সং) ট্রান্সফার অব পাওয়ার, ৮ খণ্ড, পৃঃ ৪৯৪, নোট নং ৪
২৮৪। পেথিক-লরেন্সকে ওয়াভেল, ২৩ নভেম্বর ১৯৪৬, তদেব, ৯ খণ্ড পৃঃ ৮০, মুন (সং), ভাইসবয়জ জার্নাল, পৃঃ ৩৮১-৮২
২৮৫। অমৃত কাউকরে প্যাটেল, ২৮ নভেম্বর ১৯৪৬, দুর্গা দাস, পৃঃ উঃ, ৩ খণ্ড, পৃঃ ২৯০-৯১
২৮৬। মুন (সং), ভাইসরয়জ জার্নাল, পৃঃ ৩৮৭
২৮৭। তদেব, পৃঃ ৩৮৯
২৮৭ক। ৬ ডিসেম্বরের ঘোষণা, ভি পি মেনন, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৩২৯-৩০
২৮৮। এ আই সি সি সভাপতিকে গোপীনাথ বরদলৈ, ১৫ ডিসেম্বব ১৯৪৬, এ আই সি সি পেপার্স, ১৯৪৭, ফাইল নং ৭১
২৮৯। হরিজন, ২৯ ডিসেম্বর ১৯৪৬
২৯০। গান্ধীব নোট, ওয়ার্কিং কমিটিকে, ১৭ ডিসেম্বব ১৯৪৬
২৯১। ক্রিপসকে প্যাটেল, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৪৬, দুর্গা দাস, পৃঃ উঃ, ৩ খণ্ড, পৃঃ ৩১৩-১৫
২৯২। প্যারেলাল, পৃঃ উঃ
২৯৩। তদেব, ১ খণ্ড, দ্বিতীয় অংশ, পৃঃ ১২৭
২৯৪। জেনারেল স্মাটস্‌কে অ্যাটলি, ১৯ ফেব্রুযাবি ১৯৪৭, ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং) ট্রানসফাব অব পাওযাব, ৯ খণ্ড, নং পৃঃ ৪২৮
২৯৫। মুন (সং), ভাইসরয়জ জার্নাল, পৃঃ ৪১৭
২৯৬। তদেব, অ্যাপেনডিক্স IX, পৃঃ ৪৯৭-৯৮
২৯৭। বেভারিজের প্রতিবেদন, ৮ নভেম্বর ১৯৪৬, হোম পল ফাইল নং 28/4 of 1946
২৯৮। পেথিক-লরেন্সকে ছোটলাট জেনকিনস্‌, ২৬ জানুযাবি ১৯৪৭, L/P & G/5/263 পৃঃ ৫৫৬-৭
২৯৯। ওয়াভেলকে জেনকিনস্‌ ৮, ১৫ ও ২৮ ফেব্রুয়াবি ১৯৪৭, L/P & G/5/250
৩০০। মামদোতকে জিন্না, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭, সৈয়দ জাফবি (সং),কোয়ায়েদ-এ-আজম কবেসপণ্ডেন্স ইত্যাদি, পৃঃ ২৩৩-৩৭
৩০১। ওয়াভেলকে জেনকিনস্‌, ১৫ ও ২৮ ফেব্রুয়াবি পৃঃ উঃ। বিহাব থেকে পঞ্জাবে মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড আনা হচ্ছিল, হোম পল ফাইল নং ৩৩/৯/৪৭
৩০২। ঐ, ৫ মার্চ ১৯৪৭, T 28-G R/3/1/176 পৃঃ ২১-২২
৩০৩। মেসারভির নোট, ম্যানসারগ ইত্যাদি (সং), ট্রানসফাব অব পাওযাব, ৯ খণ্ড, পৃঃ ১০০৬
৩০৪। ওয়াভেলকে জেনকিনস্‌, ১৭ মার্চ ১৯৪৭, R/3/1/89
৩০৫। পেণ্ডেরেল মুন, ডিভাইড অ্যাণ্ড কুইট, পৃঃ ৭৮-৮১। জেনকিনসের ১৭ মার্চেব চিঠিও দ্রষ্টব্য।
৩০৬। মুন (সং), ভাইসরয়জ জার্নাল, পৃঃ ৪২৪-২৫
৩০৭। তদেব, পৃঃ ৪২৯
৩০৮। ওয়াভেলকে ক্যারো, ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭, L/P & G/5/224
৩০৯। বেঙ্গল ফর্টনাইটলি রিপোর্ট ফব ফার্স্ট হাফ অব মার্চ ১৯৪৭, হোম পল ফাইল নং ১৮/৩/৪৭, আসাম ফর্টনাইটলি

রিপোর্ট ফব ফাস্ট হাফ অব মার্চ, ১৯৪৭ একই তথ্য দিচ্ছে। ওয়াভেলকে ক্লো (আসামের ছোটলাট), ৩ এপ্রিল ১৯৪৭, L/P & G/5/140 তা সমর্থন করে।

৩০৯ক। ওয়ালি খান, ফ্যাক্টস আর ফ্যাক্টস ইত্যাদি (১৯৮৭), পৃঃ ১০৮-৯

৩০৯খ। এরল্যাণ্ড জ্যানসন, ইণ্ডিয়া, পাকিস্তান অব পাখতুনিস্তান, পৃঃ ১৬৯

৩১০। মুর, এসকেপ ফ্রম এম্পায়ার, পূঃ উঃ, পৃঃ ২০২-৪

৩১১। জিন্নাকে চার্চিল, ১১ ডিসেম্বর ১৯৪৬, কোযায়েদ-ই-আজম পেপার্স (করাচী), ফাইল নং ২১

৩১২। জিন্নাকে সাইমন, ১১ ডিসেম্বর ১৯৪৬, তদেব।

৩১৩। ওয়াভেলকে অ্যাটলি, ৮ জানুয়ারি ১৯৪৭, ম্যানসারগ ইত্যাদি (সং), ট্রানসফার অব পাওয়ার, ৯ খণ্ড, পৃঃ ২৬৬

৩১৪। প্যাটেলকে সুধীর ঘোষ, ১৪ মার্চ ১৯৪৭, ঘোষ পেপার্স, জাতীয় অভিলেখাগার, নিউ দিল্লী।

৩১৪ক। ওয়াভেলকে নেহরু, ৯ মার্চ ১৯৪৭ পৃঃ ৮৯৮-৯০০, ম্যানসারগ ইত্যাদি (সং), ট্রানসফার অব পাওয়ার, ৯ খণ্ড

৩১৫। পরস্পরবিরোধী ব্যাখ্যার জন্য, তদেব, পৃঃ ৪৩৯-৪০, ৪৬২, ৫১১

৩১৬। তদেব, পৃঃ ৩৮৫ , হডসন, দ্য গ্রেট ডিভাইড, পৃঃ ১৯৯। ২০ ফেব্রুয়ারি ঘোষণার খসড়া মাউন্টব্যাটেনকে ৮ ফেব্রুয়ারি জানান অ্যাটলি।

৩১৭। মুন (সং), ভাইসরয়জ জার্নাল, পৃঃ ৪৩২

৩১৭ক। ম্যানসারগ ইত্যাদি (সং), ট্রানসফার অব পাওয়ার, ৮ খণ্ড, পৃঃ ৩৩৯, ৪০৮

৩১৮। গান্ধীকে নেহরু, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭, প্যারেলাল, ১ খণ্ড ২ অংশ, পৃঃ ৪-৫ , ওয়াভেল এ ধরনের কথা শুনে ভারত সচিবকে জানান ২২ ফেব্রুয়ারি। ম্যানসারগ ইত্যাদি (সং), ট্রানসফার অব পাওয়ার, ৯ খণ্ড, পৃঃ ৭৮৫

৩১৯। দ্বারকাদাসকে প্যাটেল, ৪ মার্চ ১৯৪৭, নান্দুরকার, পৃঃ ২০৯

৩২০। গান্ধীকে নেহরু, ২৫ মার্চ ১৯৪৭, গান্ধী, সম্পূর্ণ রচনাবলী, ৮৭ খণ্ড, পৃঃ ১২৫ , গান্ধীকে প্যাটেল, ২৪ মার্চ ১৯৪৭, তদেব, পৃঃ ১৩৮ (উভয় পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য)।

৩২১। "গান্ধীর ভূমিকা অক্সব্রিজ কলেজের অধ্যক্ষের মতো—সবাই সম্মান করে কিন্তু গভর্নিং বডির ওপর কোন প্রভাব নেই।" গোপাল, জওহরলাল নেহরু আ বায়োগ্রাফি, ১ খণ্ড, পৃঃ ৩৪৩

৩২২। আজাদ, ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম (১ সংস্করণ), পৃঃ ১৮৩

৩২৩। ক্রিপসকে মাউন্টব্যাটেন, ২৪ এপ্রিল ১৯৪৭, ক্যাবিনেট পেপার্স (পাবলিক রেকর্ড অফিস, লন্ডন) ২৭/১৩৯

৩২৪। ইজমে, নোট অন ইন্ডিয়া, ১৮ মার্চ-১৮ জুলাই ১৯৪৭, Mss Eur D 718/2, ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী

৩২৫। এ মসলে, দ্য লাস্ট ডেজ অব দা ব্রিটিশ রাজ, পৃঃ ১১০

৩২৬। সি পি স্কট, 'Volunteer organizations of Private Armies in India', ১২ এপ্রিল ১৯৪৭, মাউন্টব্যাটেন পেপার্স, ১১৭

৩২৭। মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে নেহরুর আলোচনা, ২৪ মার্চ ১৯৪৭, মাউন্টব্যাটেন পেপার্স, ১৯১, নং ৩ , প্যাটেলের সঙ্গে আলোচনা, ২৫ মার্চ ১৯৪৭, তদেব, নং ৭

৩২৮। প্যাটেলের সঙ্গে আলোচনা, ১২ এপ্রিল ১৯৪৭, ম্যানসারগ ইত্যাদি (সং), ট্রানসফার অব পাওয়ার, পূঃ উঃ, ১০ খণ্ড পৃঃ ১৩২

৩২৯। ওয়াভেলকে কেসি, ১১ সেপ্টেম্বর ও ৩০ অক্টোবর ১৯৪৪-এর চিঠিতে এই কথা জানান। তদেব ৫ খণ্ড, পৃঃ ১৩, ৭৯

৩৩০। গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা, ১ এপ্রিল ১৯৪৭, মাউন্টব্যাটেন পেপার্স, ১৯১, নং ১৯

৩৩১। প্যারেলাল, পূঃ উঃ, ১ খণ্ড, ২ অংশ, পৃঃ ৭৯-৮০

৩৩২। ইজমেকে গান্ধী, ৫ এপ্রিল ১৯৪৭ মহাত্মা গান্ধীজ করেসপন্ডেন্স উইথ গভর্মেন্ট, ১৯৪৪-৪৭, পৃঃ ২৩৭ ৩৯

৩৩৩। অ্যালান ক্যাম্বেল জনসন, মিশন উইথ মাউন্টব্যাটেন (লন্ডন ১৯৫১), পৃঃ ৬০

৩৩৪। মাউন্টব্যাটেনকে গান্ধী, ১১ এপ্রিল ১৯৪৭, মহাত্মা গান্ধীজ করেসপন্ডেন্স ইত্যাদি, পূঃ উঃ, পৃঃ ৩৫৫

৩৩৫। লেনার্ড মসলে, দ্য লাস্ট ডেজ অব দ্য ব্রিটিশ রাজ (১৯৬১), পৃঃ ৯৫

৩৩৬। জিন্নার সঙ্গে আলোচনা, ৮ এপ্রিল ১৯৪৭, ম্যানসারগ ইত্যাদি (সং), ট্রান্সফার অব পাওয়ার, ১০ খণ্ড, পৃঃ ১৬০

৩৩৭। নেহরুর সঙ্গে আলোচনা, ১১ এপ্রিল ১৯৪৭, মাউন্টব্যাটেন পেপার্স, ১৯২, নং ৫১। ছোটলাট ক্লো'র মতে অসমিয়াদের ভয় অমূলক ছিল না।

৩৩৮। ম্যানসারগ ইত্যাদি (সং), ট্রান্সফার অব পাওয়ার, ১০ খণ্ড, পৃঃ ১৯০

৩৩৯। অ্যালান ক্যাম্বেল জনসন, মিশন উইথ মাউন্টব্যাটেন, পৃঃ ৫৬

৩৪০। ভাইসরয়জ পার্সোনাল রিপোর্ট নং ৩, ১৭ এপ্রিল ১৯৪৭, L/P/PJ-10-79, pp. 48-49

৩৪১। ভাইসরয়ের স্টাফ মিটিং, ১৪ এপ্রিল ১৯৪৭, ম্যানসারগ ইত্যাদি (সং), ট্রান্সফার অব পাওয়ার, ১০ খণ্ড, পৃঃ ১৩৯

৩৪২। আর জে. মুর, এসকেপ ফ্রম এম্পায়ার, পৃঃ ২৪৭-৪৮

৩৪৩। মাউন্টব্যাটেনকে বারোজ, ১১ এপ্রিল ১৯৪৭, মাউন্টব্যাটেন পেপার্স ১৭, রিপোর্ট নং ৭৯৮-৮২২

৩৪৪ । অমৃতবাজার পত্রিকা, ৮ এপ্রিল ১৯৪৭

৩৪৫ । ঐ, ২৩ মার্চ ও ২৩ এপ্রিল ১৯৪৭

৩৪৬ । সুরাবর্দি-মাউন্টব্যাটেন সাক্ষাৎকার, ২৬ এপ্রিল ১৯৪৭, মাউন্টব্যাটেন পেপার্স, ১৯২, নং ৯৮ এবং নং ১০০

৩৪৭ । অমলেন্দু দে, স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনের পরিকল্পনা প্রয়াস ও পরিণতি (কলকাতা ১৯৭৫), তৃতীয় অধ্যায়

৩৪৮ । দ্য স্টেট্‌সম্যান, ৪ মে ১৯৪৭

৩৪৯ । ঐ, ১১ মে ১৯৪৭

৩৫০ । প্যারেলাল, পূঃ উঃ, পৃঃ ১৮১-৮২, নোট ৭৪

৩৫১ । দ্য স্টেটসম্যান, ১৩ মে ১৯৪৭

৩৫২ । তদেব, ১৫ মে ১৯৪৭

৩৫৩ । তদেব, ২৩ এপ্রিল ১৯৪৭

৩৫৪ । তদেব, ২০ মে ১৯৪৭

৩৫৫ । তদেব, ২৮ এপ্রিল ১৯৪৭

৩৫৬ । তদেব, ১ মে ১৯৪৭

৩৫৭ । তদেব, ৮ মে ১৯৪৭

৩৫৮ । বাংলার লাটকে বড়লাট, ২৮ এপ্রিল ১৯৪৭, মাউন্টব্যাটেন পেপার্স, ১৭, নং ৯১৪-এস

৩৫৯ । দুর্গা দাস (সং), সর্দার প্যাটেলস করেসপন্ডেন্স ১৯৪৫-৫০, ৪ খণ্ড, পৃঃ ৩৯

৩৬০ । তদেব, পৃঃ ৩৯-৪০

৩৬১ । তদেব, পৃঃ ৪০

৩৬২ । তদেব, পৃঃ ৪১

৩৬৩ । তদেব, পৃঃ ৪৩-৪৬

৩৬৪ । তদেব, পৃঃ ৪৬-৪৭

৩৬৫ । কিরণশঙ্কর রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ৩ মে ১৯৪৭ মাউন্টব্যাটেন পেপার্স, ১৯৩, নং ১১৩

৩৬৬ । এরিক মিভিলকে সুরাবর্দি, ১৫ মে ১৯৪৭ ; তদেব, ১৮

৩৬৭ । ভবানী সেন, বঙ্গভঙ্গ ও পাকিস্তান, পরিশিষ্ট

৩৬৮ । কে পি. এস মেননকে নেহরু, ২৯ এপ্রিল ১৯৪৭, নেহরু পেপার্স

৩৬৯ । অকিনলেকের সঙ্গে বড়লাটের সাক্ষাৎকার, ১৪ এপ্রিল ১৯৪৭, মাউন্টব্যাটেন পেপার্স, ১৯২, নং ৬৪

৩৭০ । মাউন্টব্যাটেনকে জেনকিনস্, ৩০ এপ্রিল ১৯৪৭ L/P 9 J/51/ পৃঃ ২৫০

৩৭১ । বড়লাটকে ভারত সচিব, ৯ মে ১৯৪৭, মাউন্টব্যাটেন পেপার্স, ১৭৬

৩৭২ । তদেব ১৯১, নং ৩০

৩৭৩ ; তদেব, নং ৪৯

৩৭৪ । হডসন, দ্য গ্রেট ডিভাইড, পূঃ উঃ, পৃঃ ২৮৩ , ওয়ালি খান, পূঃ উঃ, পৃঃ ১১৬-১৭

৩৭৫ । 8th Misc metting, 25 April 1947, Mountbatten Papers/ ১৯৬

৩৭৬ । এরল্যান্ড জ্যানসন, পূঃ উঃ, পৃঃ ১৭৫, ১৮৬

৩৭৭ । গোপাল, নেহরু আ বায়োগ্রাফি, ১ খণ্ড, পৃঃ ৩৫৭

৩৭৮ । ভারত সচিবকে বড়লাট, ৮ মে ১৯৪৭ ফাইল নং ১৪৪৬ (৩) জি জি/৪৩, নং ২৬-এস সি

৩৭৮ক । ভাইসরয়েজ পার্সোনাল রিপোর্ট, ৩, ৯ ও ১৭ এপ্রিল ১৯৪৭ L/P & J/10/79, pp 486 ff

৩৭৮খ । পঞ্জাবের দাঙ্গার জন্য জেনকিনসের নোট, ২৯ মার্চ ১৯৪৭, R/3/1/176, p 165 বলপূর্বক বিবাহ ও ধর্মান্তরের জন্য মেসারভির নোট, ম্যানসারগ ইত্যাদি (সং), ট্রান্সফার অব পাওয়ার, ৯ খণ্ড, পৃঃ ১০০৬ , লুঠপাট ও অগ্নিসংযোগের জন্য মুন, ডিভাইড অ্যাণ্ড কুইট পৃঃ ৭৮-৮১ , গজনফর আলি ও ফিরোজ খান নূনের সামনে জেনকিনস লীগকে স্পষ্ট অভিযুক্ত করেন, R/3/1/176 নোয়াখালির জন্য—বারোজকে প্যাটেল, ১৯ অক্টোবর ১৯৪৬, ম্যানসারগ, ইত্যাদি (সং), ট্রানসফার অব পাওয়ার, ৮ খণ্ড পৃঃ ৭৫০ ও এম ও কার্টার, Trouble in 1946, কার্টার পেপার্স, পৃঃ ১০ ।

৩৭৯ । প্ল্যান বাল্কানের জন্য ১ মে'র তার, ম্যানসারগ ইত্যাদি (সং), ট্রানসফার অব পাওয়ার, ১০ খণ্ড, পৃঃ ৫৫০-৫৩, গভর্নরদের কনফারেন্সের জন্য L/P & J/10/79 পৃঃ ৪৭৩-৭৪ ।

৩৭৯ক । ভি. পি মেনন, দ্য ট্রানসফার অব পাওয়ার ইন ইণ্ডিয়া, পূঃ উঃ, পৃঃ ৩৫৭-৫৯

৩৭৯খ । ম্যানসারগ ইত্যাদি (সং), ট্রানসফার অব পাওয়ার ১০ খণ্ড, পৃঃ ৩৫৮

৩৭৯গ । ভি. পি. মেনন, পূঃ উঃ, পৃঃ ৩৫৯

৩৭৯ঘ । CW 11020 Mountbatten Papers (ফোটোস্ট্যাট)

৩৭৯ঙ । তদেব, 11021 (ফোটোস্ট্যাট)

৩৭৯চ । তদেব, 11022 (ফোটোস্ট্যাট)

৩৭৯ছ । তদেব, 11023 (ফোটোস্ট্যাট)

৩৭৯জ । তদেব, 11024 (ফোটোস্ট্যাট)

৩৭৯ঞ। তদেব, 11025 (ফোটোস্ট্যাট)

৩৭৯ট। হিন্দু, ৭ মে ১৯৪৭

৩৮০। হডসন, দ্য গ্রেট ডিভাইড, পূঃ উঃ, পৃঃ ২৯৩ . মাউন্টব্যাটেনকে মিভিল, ৩০ এপ্রিল ১৯৪৭, ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং) ট্রানসফাব অব পাওযাব, ১০ খণ্ড, পৃঃ ৪৮৮

৩৮১। Viceroy's 14th Misc meeting 11 May 1947, তদেব, পৃঃ ৭৬২

৩৮২। জিগলার, মাউন্টব্যাটেন, পূঃ উঃ, পৃঃ ৩৮০

৩৮৩। Viceroy's staff meeting, 10 April 1947 ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), পূঃ উঃ ১০ খণ্ড, পৃঃ ১১০

৩৮৪। তদেব, পৃঃ ১৫০

৩৮৫। তদেব, পৃঃ ৩১২-১৩

৩৮৬। তদেব, পৃঃ ২৭২

৩৮৬ক। মাউন্টব্যাটেনকে গান্ধী, ৮ মে, ১৯৪৭, Mahatma Gandhi's correspondence with Government, 1944-47 পৃঃ ২৪৭-৪৯

৩৮৬খ। ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), ট্রানসফাব অব পাওযাব, ১০ খণ্ড, পূঃ উঃ, পৃঃ ৩৫০

৩৮৭। ভি পি মেননেব পবিকল্পনা ও আনুষঙ্গিকেব জন্য তাঁব The Transfer of Power in India গ্রন্থের পৃঃ ৩৫৮-৬০ দ্রষ্টব্য।

৩৮৮। ভাবতসচিবকে ভাইসবয, ১১ মে ১৯৪৭, ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং) ট্রানসফাব অব পাওয়াব, ১০ খণ্ড, পৃঃ ৪১০।

৩৮৯। তদেব, পৃ. ৪০২ , মুব, এসকেপ ফ্রম এম্পাযাব, পৃঃ ২৭৫-৭৬

৩৮৯ক। পণ্ডিত নেহরুব মন্তব্য, ১১ মে ১৯৪৭, তদেব, পৃঃ ৪০৬।

৩৯০। প্যাট্রিসিযা মাউন্টব্যাটেনকে লর্ড মাউন্টব্যাটেন, ১৩ মে ১৯৪৭, জিগলাবে উল্লিখিত।

৩৯১। লর্ড ইজ্‌মে, মেমযার্স (লণ্ডন, ১৯৬০), পৃঃ ৪২১

৩৯২। হডসন, দ্য গ্রেট ডিভাইড, পূঃ উঃ, পৃঃ ২৯৭

৩৯৩। ক্যাম্বল জনসন, মিশন উইথ মাউন্টব্যাটেন, পৃঃ ৯০

৩৯৪। হিউ টিঙ্কাব, 'Jawarharlal Nehru at Simla, May 1947,' Modern Asian Studies/4 4 (1970), pp 349-58, তাঁব Experiment with Freedom (Oxford, 1967) গ্রন্থে টিঙ্কাব বলছেন বাগটা ছিল ভানমাত্র "a pageant that was not real life" তিনি হডসনেব কথা বিশ্বাস কবেন যে বিলেত প্রেবণেব আগে কোন পবিবর্তন কবা হয়নি।

৩৯৫। বাবোজ-মাউন্টব্যাটেন সাক্ষাৎকাব, মাউন্টব্যাটেন পেপার্স, ১৯৬

৩৯৬। বাবোজকে মাউন্টব্যাটেন, ২ মে ১৯৪৭ ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), ট্রানসফাব অব পাওযাব, ১০ খণ্ড, পৃঃ ২৮০

৩৯৭। তদেব, পৃঃ ২৬৪

৩৯৮। L/P & J/10/79

৩৯৯। ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), ট্রানসফাব অব পাওযাব ১০ খণ্ড, পৃঃ ৩৯৪

৪০০। ওযাই কৃষ্ণন, 'Mountbatten and the Partition of India', History, Vol 68, no 222 (Feb 1983), p 33

৪০১। গোপাল, পূঃ উঃ

৪০২। ইজমেকে মিভিল, ১২ মে ১৯৪৭, ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), ট্রানসফাব অব পাওয়ার, ১০ খণ্ড, পৃঃ ৪১৩

৪০৩। মিভিলকে ইজমে, ১২ মে ১৯৪৭, তদেব, পৃঃ ৪২১

৪০৪। মাউন্টব্যাটেন পেপার্স, ১৯৬

৪০৫। ভারত সচিবকে ভাইসবয়, ১৩ মে, ১৯৪৭, ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), ট্রানসফাব অব পাওয়াব, ১০, খণ্ড, পৃঃ ৪২৯

৪০৬। তদেব, পৃঃ ৪৩০

৪০৭। বড়লাটকে পঞ্জাব গভর্নর, ১৫ মে ১৯৪৭ R/3/1/89, p 205

৪০৮। ভি পি মেনন, ট্রান্সফাব অব পাওযাব ইন ইণ্ডিযা। অ্যাপেনডিক্স X, পৃঃ ৫১০-৫১৫

৪০৯। অ্যাটলি, মাউন্টব্যাটেন ও ইজমেব ১১ ফেব্রুযাবি ১৯৪৭-এর সাক্ষাৎকাব, মাউন্টব্যাটেন পেপ্যার্স, ১০৯

৪১০। সুধীর ঘোষ, পূঃ উঃ, পৃঃ ২০৪

৪১১। মাউন্টব্যাটেন পেপার্স, ২০৪

৪১২। তদেব, ১০৮

৪১৩। ভাইসরয়জ কনফাবেন্স পেপাব, নং ২৮, ১৪ এপ্রিল, ১৯৪৭, তদেব, ১৫১

৪১৪। গভর্নরদেব মিটিং-এব মিনিটস, ১৫ এপ্রিল ১৯৪৭, L/P and J/10/79

৪১৫। মাউন্টব্যাটেন পেপার্স, ২০৪-এ কথা পবিষ্কাব।

৪১৬। তদেব, ৪০

৪১৭ । মাউন্টব্যাটেনের নোট, ২৮ এপ্রিল ১৯৪৭, তদেব, ১০৮

৪১৮ । তদেব, ৪০

৪১৯ । জিন্নার পূর্ণ বয়ান, ৩০ এপ্রিল ১৯৪৭, L/P and J/10/79

৪২০ । মাউন্টব্যাটেন পেপার্স, ১৯৬

৪২১ । প্যাটেলকে মেনন ৯ মে ১৯৪৭, দুর্গা দাস, পূঃ উঃ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১১১

৪২২ । ভাইসরয়জ স্টাফ মিটিং ১০ মে, ১৯৪৭, মাউন্টব্যাটেন পেপার্স, ৪০

৪২৩ । ভারত সচিবকে ভাইসরয়, ১২ মে ১৯৪৭, L/P and J/10/79

৪২৪ । মিসেলেনিয়াস মিটিং, ২২ এপ্রিল ১৯৪৭ । মাউন্টব্যাটেন পেপার্স, ১৯৬

৪২৫ । L/P and G/10/79

৪২৬ । ভারতসচিবকে ভাইসরয় ১১ মে, ১৯৪৭, তদেব । এবই সঙ্গে নেহরুর ১১ মে-র চিঠি অন্তর্ভুক্ত ।

৪২৭ । মিভিলকে ইজমে ১২ মে ১৯৪৭, R/3/1/153

৪২৮ । আর জে মুর, Endgames of Empire, Studies of Britain's Indian Problem, (Oxford Delhi, 1988), p 167

৪২৯ । ভারতসচিবকে ভাইসরয় ১৩ মে ১৯৪৭ L/P and J/10/79

৪৩০ । মাউন্টব্যাটেন পেপার্স, ১৯৬

৪৩১ । জিগলার, মাউন্টব্যাটেন, পৃঃ ৩৮৫

৪৩২ । ভি পি মেনন, দ্য ট্রান্সফার অব পাওয়ার ইন ইন্ডিয়া, অ্যাপেনডিক্স ৪, পৃঃ ৫১০ ১৭

৪৩৩ । গান্ধী সম্পূর্ণ রচনাবলী, ৮৮ খণ্ড, পৃঃ ১

৪৩৪ । তদেব, পৃঃ ৮

৪৩৫ । তদেব পৃঃ ১৩

৪৩৬ । হরিজন, ১ জুন ১৯৪৭ তদেব, পৃঃ ২

৪৩৭ । তদেব, পৃঃ ২০

৪৩৮ । তদেব পৃঃ ৩০ ৩১

৪৩৯ । অ্যালান ক্যাম্বেল জনসন, মিশন উইথ মাউন্টব্যাটেন (জয়কো, ১৯৫১) পৃঃ ১১৪-১৮

৪৩৯ক । মাউন্টব্যাটেন, Time only to look forward, speeches of Mountbatten (Lond, 1949), পৃঃ ১৯-৪৮

৪৪০ । এ আই সি সি ফাইল নং ১৮৯৯-- P ১৯৪৬-৪৮ ।

৪৪১ । এ আই সি সি ফাইল নং ১৮৯৯— I, 1947

৪৪২ । অ্যালান ক্যাম্বেল জনসন, পূঃ উঃ, পৃঃ ১১৮

৪৪৩ । লেনার্ড মসলে, পূঃ উঃ, পৃঃ ১৩১-৩২

৪৪৪ । তদেব, পৃঃ ১৩২ ও পরবর্তী জনসন, পূঃ উঃ, পৃঃ ১২০ ও পরবর্তী

৪৪৫ । Time only to Look forward, পূঃ উঃ p 43

৪৪৬ । ভারতসচিবকে ভাইসরয়, T 1284-5. ৩ জুন, ১৯৪৭

৪৪৭ । গান্ধী, সম্পূর্ণ রচনাবলী, ৮৮ খণ্ড, পৃঃ ৫০-৫২

৪৪৮ । C W 11027, Mountbatten Papers

৪৪৯ । C W 11029, তদেব

৪৫০ । গান্ধীজি করেস্পন্ডেন্স উইথ গভর্নমেন্ট ১৯৪৪-৪৭, পৃঃ ২৫৪-৫৬

৪৫১ । প্যারেলাল, ২ খণ্ড, পৃঃ ২৬৮-৬৯

৪৫২ । তদেব পৃঃ ২৬৯-৭২

৪৫৩ । নেহরুকে গান্ধী, ৯ জুন ১৯৪৭, খসড়া, গান্ধী, সম্পূর্ণ রচনাবলী, ৮৮ খণ্ড, পৃঃ ১১৩

৪৫৪ । প্রার্থনান্তিক ভাষণ, ৮ জুন ১৯৪৭, তদেব পৃঃ ১০৯, ১১ জুন ১৯৪৭, তদেব, পৃঃ ১৩৩

৪৫৫ । সুরাবর্দিকে গান্ধী, ১২ জুন ১৯৪৭ প্যারেলাল, ২ খণ্ড, ১৯০

৪৫৬ । কম্যুনিস্ট কর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ৮ জুন ১৯৪৭,, মানু গান্ধীর সঙ্গে কথোপকথন, ১১ জুন, ১৯৪৭

৪৫৭ । আজাদ, ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম (১৯৮৮ সং), পৃঃ ২০৩-৪

৪৫৮ । তদেব, পৃঃ ২০৭

৪৫৯ । গান্ধী, সম্পূর্ণ রচনাবলী, ৮৮ খণ্ড, পৃঃ ১৫০

৪৬০ । এ আই সি সি-তে গান্ধীর বক্তৃতা, ১৪ জুন ১৯৪৭, তদেব পৃঃ ১৫৩-৫৭

৪৬১ । মাউন্টব্যাটেনকে গান্ধী, ২৭/২৮ জুন ১৯৪৭, I O L

৪৬২ । ভাইসরয়ের ৪৮তম স্টাফ মিটিং ২৮ জুন ১৯৪৭, তদেব

৪৬৩ । মাউন্টব্যাটেনকে গান্ধী, গান্ধীকে মাউন্টব্যাটেন বাদশা খাঁকে গান্ধী, ৫ জুলাই, ১৯৪৭, সম্পূর্ণ রচনাবলী, ৮৮ খণ্ড, পৃঃ ২৭৫

৪৬৪। ওয়ালি খান, ফ্যাক্টস আব ফ্যাক্টস, পৃঃ উঃ, পৃঃ ১৩০-৩২

৪৬৫। বামস্বামী আযাবেব তাব, ১৪ জুন ১৯৪৭, গান্ধী, সম্পূর্ণ বচনাবলী, ৮৮ খণ্ড, অ্যাপেনডিক্স VI

৪৬৬। গান্ধীব প্রার্থনান্তিক ভাষণ, তদেব, পৃঃ ১৪৬-৪৭, পৃঃ ১৫১-৫২

৪৬৭। মাউন্টব্যাটেন পেপার্স, ১৯৩, নং ১৪৬

৪৬৮। ভাইসবযজ পার্সোনাল বিপোর্ট ১০, ২৭ জুন ১৯৪৭, ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং) ট্রান্সফাব অব পাওযাব, ১১ খণ্ড, পৃঃ ৬৮৭

৪৬৮ক। আব জেফ্রি (সং), পিপল, প্রিন্সেস অ্যান্ড প্যাবামাউন্ট পাওযাব (দিল্লী, ১৯৭৮), পৃঃ ৩০৬-২৮

৪৬৯। প্যাটেল প্রতিবেদন, ৫ জুলাই, ১৯৪৭, ম্যানসাবগ ইত্যাদি, (সং) ট্রান্সফাব অব পাওযাব পৃঃ ৯২৮-৩০। ৯ মে নেহরু এ ধবনেব কথা মেননকে বলেন ও মেনন প্যাটেলকে জানান পবেব দিন। অতএব এ বিষযে মেননেব কৃতিত্ব কতখানি, তা সন্দেহেব। দুর্গা দাস, পৃঃ উঃ, ৪ খণ্ড, পৃঃ ১১১-১৬

৪৭০। টাইম ওনলি টু লুক ফবওযার্ড স্পীচেস অফ আর্ল মাউন্টব্যাটেন পৃঃ উঃ, পৃঃ ৫১-৫৬।

৪৭১। ভাইসবযজ পার্সোনাল বিপোর্ট ১৭, ১৬ আগস্ট ১৯৪৭, ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), ট্রান্সফাব অব পাওযাব, ১২ খণ্ড, পৃঃ ৭৬৭

৪৭২। জিন্নাব সঙ্গে সাক্ষাৎকাব ১২ জুলাই তদেব, পৃঃ ১২১

৪৭৩। লর্ড বার্কেনহেড, ওযাল্টাব মংকটন (লন্ডন, ১৯৬৯), পৃঃ ২২৬ , আব জে মুব এণ্ড গেমস অব এম্পাযাব, পৃঃ উঃ, পৃঃ ১৯২ ও পববর্তী

৪৭৪। ভাইসবযজ পার্সোনাল বিপোর্ট ১৫, ১ আগস্ট ১৯৪৭, ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং) ট্রান্সফাব অব পাওযাব ১২ খণ্ড, পৃঃ ৪৫০

৪৭৫। লর্ড বার্ডউড, 'কাশ্মীব', ইন্টাবন্যাশনাল অ্যাফেযার্স, ২৮ খণ্ড, ৩ সংখ্যা, জুলাই, ১৯৫২

৪৭৬। কবণ সিং, এযাব অ্যাপেব্যান্ট (নিউ দিল্লী ১৯৮২), পৃঃ ৪৭

৪৭৭। এইচ ভি হডসন, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৩৮৪

৪৭৮। মাউন্টব্যাটেন পেপার্স S95

৪৭৯। তাব আগে মাউন্টব্যাটেন ভাবতীয় সৈন্য পাঠাতে দেননি, এবং এক শর্তে তিনি বাজী হন যে পাঠান উপজাতিবা বিতাডিত হলে নেহরু কাশ্মীরে গণভোট নেবেন। তিনি স্বীকাব কবেছেন যে তাঁব ইচ্ছা ছিল কাশ্মীব পাকিস্তানে যোগ দিক। ব্যাডক্লিফেব বোযেদাদ গুরুদাসপুব ও দুটো তহসিল ভাবতকে দিযে কাশ্মীবেব যোগদান সহজ কবে দেয়। কলিন্স ও দোমিনিক লাপিযেব মাউন্টব্যাটেন অ্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিযা, ১৬ আগস্ট ১৯৪৭, ১৮ জুন ১৯৪৮, (তবঙ্গ পেপাববাক, ১৯৮৫), পৃঃ ৫৫ ও পববর্তী

৪৮০। প্যাট্রিসিযাকে মাউন্টব্যাটেন, ৫ জুলাই ১৯৪৭, জিগলাব, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৩৯৮-৯৯

৪৮১। ক্যাম্বেল জনসন, পৃঃ উঃ, পৃঃ ১৫৪ ও পববর্তী

৪৮২। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, ইণ্ডিযা উইনস ফ্রিডম (১৯৮৮ সং), পৃঃ ২১৯ ও পববর্তী

৪৮৩। নেহরুকে মাউন্টব্যাটেন, ১০ আগস্ট ১৯৪৭, IOR/3/1/157,

৪৮৩ক। ব্যাডক্লিফেব অবস্থাব মনোজ্ঞ বর্ণনা দিযেছেন লেনার্ড মসলে, পৃঃ ১৯৭-২০০

৪৮৪। মাউন্টব্যাটেনকে জেনকিনস, ৩০ এপ্রিল ১৯৪৭, ম্যানসাবগ ইত্যাদি (সং), ট্রানসফাব অব পাওযাব, ১১ খণ্ড, পৃঃ ৫০৬

৪৮৫। ঐ, ২৫ জুন ১৯৪৭, তদেব, পৃঃ ৬২৩-২৭

৪৮৬। ঐ, ১০ জুলাই, ১৯৪৭ ও জেনকিনসেব বিপোর্ট, ১০ জুলাই, ১৯৪৭, মসলে, পৃঃ উঃ, পৃঃ ২০৫-৭

৪৮৬ক। গান্ধীকে মাউন্টব্যাটেন, ২৬ আগস্ট ১৯৪৭

৪৮৭। ক্যাম্বেল জনসন, পৃঃ উঃ, পৃঃ ১৭২

৪৮৮। স্ট্যানলি ওলপার্ট, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৩৩৪

৪৮৯। জে আহমদ, ক্রিযেশান অব পাকিস্তান (লাহোব, ১৯৭৬), পৃঃ ৩৩৯

৪৯০। চৌধুবী মুহম্মদ আলি, এমার্জেন্স অব পাকিস্তান, পৃঃ ৭৩

৪৯১। হেক্টব বলিথো, জিন্না, পৃঃ উঃ, পৃঃ ১৮৯

৪৯২। পেণ্ডেবেল মুন, ডিভাইড অ্যাণ্ড কুইট (লণ্ডন ১৯৬১), পৃঃ ৯৫

৪৯৩। ভি পি মেনন, দ্য ট্রানসফাব অব পাওযাব ইন ইণ্ডিযা, পৃঃ ৪১৯-৩১

৪৯৪। কলিনস ও লাপিযেবকে বডলাট বলেছেন, তিনিই শান্তিবক্ষার্থ গান্ধীকে বাংলায পাঠিযেছেন। এ-কথা বিশ্বাসযোগ্য নয। ৬ আগস্ট গান্ধী ঘোষণা কবেন বাকী জীবনটা তিনি পূর্ববঙ্গে বা পশ্চিম পঞ্জাবে কাটাবেন, হযতো বা সীমান্তে। বর্তমানে তিনি পাটনা হয়ে কলকাতা, তারপব নোযাখালি, তাবপব পঞ্জাব যাচ্ছেন। কলিনস ও লাপিয়েব, মাউন্টব্যাটেন অ্যাণ্ড ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট ইণ্ডিয়া (তবঙ্গ পেপারব্যাক, ১৯৮৫) পৃঃ ৩৮-৪২

৪৯৫। ভি পি মেনন লিখেছেন— তিনি প্যাটেল বা নেহরুব মত না নিয়েই বডলাটকে তলব কবেছিলেন তাঁদেব নামে। বডলাট দিল্লীতে পৌছেই তাঁকে দেখতে পান। মেনন বলেন, তাঁব হয়ে তিনি নেহরু ও প্যাটেলকে ডেকে পাঠাবেন। কলিন্স ও লাপিয়েবেব কাছে বডলাট স্বীকাব কবেছেন, "they (Nehru and Patel) had been out

manoeuvred into Government House by V P ", তদেব, পৃঃ ৪৫। এখানে বলে রাখা ভাল যে নেহরু ও প্যাটেল ত্রস্ত মেষশাবকের মত মাউন্টব্যাটেনের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন—এ ধারণা মাউন্টব্যাটেনের মেগালোম্যানিয়া-প্রসূত। তদেব, পৃঃ ৪৫-৪৭। সেদিনের ঘটনাবলীর কোন প্রমাণ রাখা হয়নি। জনসনের ধারণা ব্যাপারটা প্রশাসনিক এবং সামরিক গুরুত্বপূর্ণ বলে অভিজ্ঞ বড়লাটকে হস্তক্ষেপ করতে তাঁরা অনুরোধ করেন। ক্যাম্বেল জনসন, পৃঃ উঃ, পৃঃ ২০৬। গোপাল, মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পরও, ব্যাপারটা পুরো বিশ্বাস করেননি। গোপাল, পৃঃ উঃ, ২ খণ্ড, পৃঃ ১৮।

৪৯৫ক। আর জেফ্রি, 'দ্য পাঞ্জাব বাউণ্ডারী ফোর্স অ্যাণ্ড দ্য প্রবলেম অব অর্ডার, আগস্ট ১৯৪৭।' M.A S (1974), পৃঃ ৪৯১-৫২০।

৪৯৬। ক্যাম্বেল জনসন, পৃঃ উঃ, পৃঃ ২১৮-১৯

৪৯৭। লেনার্ড মস্‌লে, পৃঃ উঃ, পৃঃ ২৪৫

৪৯৮। জি ডি খোসলা, স্টার্ন রেকনিং (দিল্লী, তারিখহীন) পৃঃ ২৯৯

৪৯৯। ইয়ান স্টিফেন্স, পাকিস্তান (লণ্ডন, ১৯৬৩), পৃঃ ৮৩

৫০০। কলিন্‌স্ ও লাপিয়েরে, ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট, পৃঃ ৩৪২

৫০১। পেণ্ডেরেল মুন, ডিভাইড অ্যাণ্ড কুইট, পৃঃ ২৮৩

৫০২। লেডি ইজ্‌মেকে ইজ্‌মে, ১৭ নভেম্বর ১৯৪৭, জিগলার, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৪৩৭

৫০৩। টাইম ওনলি টু লুক ফরওয়ার্ড, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৩০

৫০৪। কলিন্‌স্ ও লাপিয়েরে, মাউন্টব্যাটেন অ্যাণ্ড ইণ্ডেপেণ্ডেন্ট ইণ্ডিয়া, পৃঃ ৩০

৫০৫। তদেব, পৃঃ ৩১

৫০৬। ভি পি মেনন, দ্য ট্রান্সফার অব পাওয়ার ইন ইণ্ডিয়া, পৃঃ ৪৩৫, গোপাল, পৃঃ উঃ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫৫

৫০৭। জিগলার, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৪৩৮

৫০৮। আই এ ট্যালবট, 'মাউন্টব্যাটেন অ্যাণ্ড দ্য পার্টিশান অব ইণ্ডিয়া', History, LXIX, no 225, Feb 1984, পৃঃ ২৯-৩৫

৫০৯। মাউন্টব্যাটেনকে ইজ্‌মে, ৬ মার্চ ১৯৬২

৫১০। পেণ্ডেরেল মুন, পৃঃ উঃ, পৃঃ ২৭৭-৮৩

৫১১। ভি বি কুলকার্নি, ব্রিটিশ ডোমিনিয়ান ইন ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড আফটার (বম্বে, ১৯৬৪), পৃঃ ২৫৫

৫১২। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, ইণ্ডিয়া উইনস ফ্রিডম (১৯৮৮ সং), পৃঃ ২৩৬ ও পরবর্তী

৫১৩। তদেব, পৃঃ ২৩৫-৩৬

৫১৩ক। নেহরুকে রাজেন্দ্র প্রসাদ, ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭

৫১৪। হীরেন মুখার্জী, ওয়াজ ইণ্ডিয়াজ পার্টিশান আন-অ্যাভয়েডেবল? (কলকাতা, ১৯৮৭)।

৫১৫। তদেব, পৃঃ ৭২

৫১৬। সুমিত সরকার, মডার্ন ইণ্ডিয়া, পৃঃ ৪১৮-২৫

৫১৭। সরোজ মুখোপাধ্যায়, ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি ও আমরা, ২ খণ্ড, পৃঃ ৩৫১-৫২, ৩৬৮-৬৯। কংগ্রেসী হামলার জন্য তিনি প্যাটেলকে দোষী করেছেন।

৫১৮। তদেব, পৃঃ ৩৭৬-৮৩

৫১৮ক। বিপান চন্দ্র ও অন্যান্য, ইণ্ডিয়াজ স্ট্রাগল ফর ইণ্ডেপেণ্ডেন্স ১৮৫৭-১৯৪৭ (ভাইকিং ১৯৮৮), পৃঃ ৪৮৪-৮৬

৫১৯। ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ, রেমেনিসেন্সেস অব অ্যান ইণ্ডিয়ান কম্যুনিস্ট (নিউ দিল্লী, ১৯৮৭), পৃঃ ১০২

৫২০। তদেব, পৃঃ ১০৩

৫২১। তদেব, পৃঃ ১২৩-২৪

৫২২। পান্নালাল দাশগুপ্ত, গান্ধী-গবেষণা (কলকাতা, ১৯৮৬), পৃঃ ৩৫৪

৫২৩। তদেব, পৃঃ ৩৫৫

৫২৪। বিপান চন্দ্র, ইম্পিরিয়ালিজম অ্যাণ্ড ন্যাশানালিজম ইন ইণ্ডিয়া (দিল্লী, ১৯৭৯)

৫২৫। সুমিত সরকার, পপুলার মুভমেন্টস অ্যান্ড মিডল ক্লাস লিডারশিপ ইন লেট কলোনিয়াল ইণ্ডিয়া পার্সপেকটিভস আন্ড প্রবলেমস অব এ 'হিস্টরি ফ্রম বিলো' (কলকাতা ১৯৮৩), রণজিৎ গুহ, সাবঅলটার্ন স্টাডিজ, ১ ও ২ খণ্ড।

৫২৬। ক্লদ মার্কোভিৎস, ইণ্ডিয়ান বিজনেস অ্যান্ড ন্যাশনালিস্ট পলিটিক্স ১৯৩১-৩৯ ইত্যাদি (কেমব্রিজ, ১৯৮৫) ৪র্থ অধ্যায়, 'কংগ্রেস পলিসি টুওয়ার্ডস বিজনেস ইন দ্য প্রি-ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এরা', রিচার্ড সিসন ও স্ট্যানলি ওলপার্ট (সং), কংগ্রেস অ্যান্ড ইণ্ডিয়ান ন্যাশানালিজম্ দ্য প্রি-ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ফেজ (দিল্লী, ১৯৮৮), পৃঃ ২৬২-৬৬

৫২৭। হোম পল ১৪/২৮/৩২

৫২৮। স্থানীয় সরকারদের কেন্দ্রীয় সরকার, ২১ জানুয়ারি, ১৯৫০, হোম পল ৩/১৬/৩৪

৫২৯। রণজিৎ গুহ, সাবঅলটার্ন স্টাডিজ, ১ খণ্ড (নিউ দিল্লি, ১৯৮২), পৃঃ ৬

৫৩০ । ছোটলাটদের ক্রেইক, ১২ জুন ১৯৩৬, হোম পল ৪/৮/৩৬

৫৩১ । বি আব টমলিনসন, দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস্ অ্যান্ড দা বাজ, ১৯২৯-১৯৪২ দা পেনালটিমেট ফেজ (লন্ডন ১৯৭৬), পৃঃ ৪৫-৫৭

৫৩২ । ডব্লু এইচ মরিস-জোনস, পার্লামেন্ট ইন ইন্ডিয়া (১৯৫৭) , ডেভিড লো, 'কংগ্রেস অ্যান্ড ম্যাস কন্টাকটস, ১৯৩৬-১৯৩৭ ইত্যাদি, সিমন ও ওলপার্ট (সং), কংগ্রেস অ্যান্ড ইন্ডিযান ন্যাশালিজম, পৃঃ উঃ পৃঃ ১৩৪-৫৮

৫৩৩ । প্যাবেলাল, মহাত্মা লাস্ট ফেজ, ২ খণ্ড, পৃঃ ৬২৫

৫৩৪ । পিটাব বীভস্, অ্যাডজাস্টিং টু কংগ্রেস ডমিন্যান্স , দ্য য়ু পি ল্যান্ডসর্ডস ১৯৩৭-১৯৪৭, সিমন ও ওলপার্ট (সং) পৃঃ উঃ, পৃঃ ১৫৯-১৮১

৫৩৫ । আই এইচ কুরেশি, উলেমা ইন পলিটিক্স ইত্যাদি (কবাচী, ১৯৭৪) পৃঃ ৩৩৫-৩৮

৫৩৬ । কে বি সঈদ, পাকিস্তান দ্য ফরমেটিভ ফেজ ১৮৫৭-১৯৪৮ (লন্ডন, ১৯৬৮), পৃঃ ৮৯-৯০

৫৩৭ । এ আই সি সি পেপার্স, ফাইল নং ভ-২২/১৯৩৮

৫৩৮ । তদেব

৫৩৯ । মুশিরুল হাসান, 'ন্যাশনালিস্ট অ্যান্ড সেপাবেটিস্ট ট্রেন্ডস্ ইন আলিগড ১৯১৫-১৯৪৭', I E S H R 22 (1985), pp 1-33

৫৪০ । কৃপালানিকে আস্রাফউদ্দিন চৌধুবী, ১৬ আগস্ট, ২০ সেপ্টেম্বব ১৯৩৮, চৌধুবীকে কৃপালনি, ৬ অক্টোবব, ১৯৩৮, এ আই সি সি পেপার্স, ফাইল নং P-5, 1938

৫৪১ । হর্স্ট ক্রুজাব, কানওযাব মহম্মদ আশ্রফ অ্যান ইন্ডিযান স্কলার অ্যান্ড বেভল্যুশনাবী ১৯০৩-১৯৬২ (বার্লিন, ১৯৬৬), পৃঃ ৪১৩-১৪

উপাদানপঞ্জী

অপ্রকাশিত অভিলেখ

(ক) ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী, লন্ডন

চার্লস উড	— Mss. Eur. F78
জন লরেন্স	— „ F90
নর্থব্রুক	— „ C144
লিটন (বড়লাট)	— „ E 2/8
ডাফরিন	— মাইক্রোফিল্ম রীল ৫১৬-১৮
ক্রস	— Mss. Eur. E243
ল্যান্সডাউন	— „ D558
এলগিন (নবম আর্ল)	— „ F84, D509
হ্যামিল্টন	— „ C125-26, D510
কার্জন	— „ F111
মর্লে	— „ D573
চেম্‌সফোর্ড	— „ E264
মন্টেগু	— „ D523
রিডিং	— „ E238
জেটল্যান্ড	— „ D609
লিটন (বাংলার ছোটলাট)	— „ F160
বার্কেনহেড	— „ D703
হ্যালিফ্যাক্স (আরুইন)	— „ C152
উইলিংডন	— „ F93
টেম্পলউড (হোর)	— „ E240
লিনলিথগো	— „ F125
কেসি ডায়েরি	— „ 48/1-48/4
ডিষ্ট্রিক্ট অফিসারস কলেকশন	— „ F/80/17-21
চার্লস টেগার্টের জীবনী	— „ C235/1
স্যাব হ্যারি হেইগ	— „ F115
স্যার মরিস হ্যালেট	— „ E251
স্যার জন আরসকাইন	— Mss. Eur. D596
স্যার জর্জ কানিংহ্যাম	— „ D670

ইহা ব্যতীত বড়লাট ও ছোটলাটদের চিঠিপত্র L/P and J/5 & 10 ; বড়লাটের ব্যক্তিগত সচিবের সংগ্রহ—R/3/1 and 2 শিরোনামে পাওয়া যাবে।

(খ) **কেম্‌ব্রিজ, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার**
হার্ডিঞ্জ ও ক্রু পেপাবস

(গ) **চার্চিল কলেজ, কেম্‌ব্রিজ**
এ ভি অ্যালেকজাণ্ডাবেব ডাযেবি

(ঘ) **সেন্টার ফর সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ, কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয**
এম ও কার্টাবি ও আই এম জি বেল পেপাবস্‌

(ঙ) **রোড্‌স হাউস, অক্সফোর্ড**
আব জি ক্যুপল্যান্ডেব ইন্ডিযান ডাযেবি ১৯৪১-৪২

(চ) **ব্রডল্যান্ডস অভিলেখাগাব**
মাউন্টব্যাটেন কলেকশন (যেখানে ফাইলেব উল্লেখ আছে তা ইন্ডিযা অফিস বেকর্ডেব নম্বব)

(ছ) **জাতীয় অভিলেখাগার, নিউ দিল্লী**
ফিবোজশা মেহতা পেপার্স (মাইক্রোফিল্ম) , গোখলে পেপাবস্‌ , খাপার্ডে ডাযেবি , শ্রীনিবাস শাস্ত্রী , জযাকব ও বাজেন্দ্র প্রসাদ পেপার্স , হোম পলিটিক্যাল ও অন্যান্য সবকাবী দফতবেব কাগজপত্র ।

(জ) **জওহরলাল নেহরু মেমোরিয়াল ম্যুজিযাম ও লাইব্রেবী, নিউ দিল্লী**
এ আই সি সি পেপাবস , মতিলাল নেহরু, মহম্মদ আলি (মাইক্রোফিল্ম), আনসাবি (মাইক্রোফিল্ম), জওহবলাল নেহরু, পুরুষোত্তমদাস ঠাকুবদাস ও ভুলাভাই দেশাই পেপাবস , মুঞ্জে ডাযেবি (মাইক্রোফিল্ম) ।

(ঝ) **পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য অভিলেখাগার, কলকাতা**
জি বি অ্যাপযেন্টমেন্ট, জি বি হোম পলিটিক্যাল/কনফিডেন্সিযাল ।

(ঞ) **পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুলিশ দফতর**
সি আই ডি (আই বি) বিপোর্টস ।

(ট) **জাতীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা**
তেজবাহাদুব সাপ্রু পেপাবস ।

(ঠ) **গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়, নিউ দিল্লী**
মহাত্মা গান্ধীব ও গান্ধীকে লেখা পত্রাবলী—হস্তলিখিত ও ফোটোস্ট্যাট অনুলিপি ।

(ড) **রবীন্দ্রসদন, বিশ্বভারতী**
সি· এফ· অ্যাণ্ড্রুজ পেপারস।

(ঢ) **পাকিস্তান জাতীয় অভিলেখাগার, ইসলামাবাদ**
কোয়ায়েদ-ই-আজম (জিন্না) পেপারস ; অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ পেপারস।

প্রকাশিত অভিলেখ

(ক) মহাত্মা গান্ধী, কলেকটেড ওয়ার্কস (ভারত সরকাব, নিউ দিল্লী ১৯৫৮—)
(খ) গান্ধীজ করেসপন্ডেস উইথ দ্য গভর্নমেন্ট ১৯৪২-৪৪ (আমেদাবাদ, ১৯৪৫)
(গ) ঐ ১৯৪৫-৪৭ (আমেদাবাদ, ১৯৪৯)
(ঘ) মহাদেব দেশাই, ডায়েরি (আমেদাবাদ, ১৯৫৩)
(ঙ) মতিলাল নেহরু, সিলেক্টেড ওয়ার্কস, ১-৪ খন্ড (রবীন্দ্রকুমার সং)
(চ) জওহরলাল নেহরু, সিলেক্টেড ওয়ার্কস, প্রথম সিরিজ, ১৪ খণ্ড (এস· গোপাল সং)
(ছ) ঐ, আ বাঞ্চ অব ওল্ড লেটার্স (১ম সং, ১৯৫৮, শতবার্ষিকী সংস্করণ, ১৯৮৮)
(জ) দুর্গা দাস (সং), সর্দার প্যাটেলস করেসপন্ডেন্স ১৯৪৫-৫০, ১০ খণ্ড (আমেদাবাদ, ১৯৭১-৭৪)
(ঝ) নান্দুরকার জি এম· (সং), সর্দাবস লেটার্স মোস্টলি আননোন, ২ খণ্ড (ঐ, ১৯৭৭-৭৮)
(ঞ) ম্যানসারগ, লাম্বি ও মুন (সং), দ্য ট্রানসফাব অব পাওয়ার, ১২ খণ্ড (লন্ডন, ১৯৭০-৮৩)
(ট) সি· এইচ· ফিলিপস ও বি· এন· পাণ্ডে (সং), এভোল্যুশন অব ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান ১৮৫৮-১৯৪৭ (লন্ডন, ১৯৬২)
(ঠ) মরিস গইয়ার ও আপ্পাডোরাই (সং), স্পীচেজ অ্যান্ড ডক্যুমেন্টস অব দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিট্যুশান ১৯২১-১৯৪৭ (অক্সফোর্ড, ১৯৫৭)
(ড) এস· এস· পীরজাদা (সং), (১) ফাউন্ডেশনস্ অব পাকিস্তান : অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ ডক্যুমেন্টস ১৯০৬-৪৭, দুই খণ্ড (করাচী, ১৯৬৯-৭০), (২) লীডার্স করেসপণ্ডেন্স উইথ মিঃ জিন্না (বম্বে, ১৯৪৪), (৩) কোয়ায়েদ-ই-আজমস করেসপডেন্স (করাচী, ১৯৭৭)
(ঢ) এ· ডব্লু আহমেদ (সং), জিন্না-আরুইন করেসপন্ডেস ১৯২৭-৩০
(ণ) জেড· এইচ· জইদি (সং), এম· এ· জিন্না—ইসপাহানি করেসপন্ডেন্স ১৯৩৩-১৯৪৮ (করাচী, ১৯৭৬)
(ত) জেমস ক্যাম্বেল কের (Ker), পলিটিক্যাল ট্রাবল ইন ইন্ডিয়া ১৯০৭-১৯১৭ (মহাদেব সাহা সংকলিত, ১৯৭৩)
(থ) এইচ· ডব্লু· হেল, টেররিজম্ ইন ইন্ডিয়া ১৯১৭-৩৬ (ভারত সরকার, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৭৪)
(দ) পি· সি· ব্যামফোর্ড, হিস্টরি অব নন-কোঅপারেশন অ্যান্ড খিলাফৎ মুভমেন্টস্ (দিল্লী, ১৯২৫)
(ধ) স্যার ডেভিড পেট্রি, কম্যুনিজম্ ইন ইন্ডিয়া ১৯২৪-১৯২৭ (কলকাতা, ১৯২৭,

পুনর্মুদ্রণ, ১৯৭২)

(ন) স্যার সেসিল কে (Kaye), কম্যুনিজম ইন ইন্ডিয়া (ভারত সরকাব, পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা, ১৯৭১)

(প) সুবোধ রায় (সং), কম্যুনিজম ইন ইন্ডিয়া : আন-পাবলিশড ডক্যুমেন্টস ১৯৩৫-১৯৪৫ (কলকাতা, ১৯৭৬)

(ফ) পি· এন· চোপরা (সং), কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট ব্রিটিশ সিক্রেট ডক্যুমেন্টস (নিউ দিল্লী, ১৯৮৬)

(ব) এ· এম· জইদি ও এস· জইদি (সং), দ্য এনসাইক্লোপেডিয়া অব দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস (নিউ দিল্লী, ১৯৭৬—)

(ভ) জি· অধিকারী (সং), ডক্যুমেন্টস অব দ্য হিস্টরি অব দ্য কম্যুনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (নি· দি·) বিশেষত প্রথম তিন খণ্ড গুরুত্বপূর্ণ।

(ম) অমৃত শ্রীপাদ ডাঙ্গে (সং), এ· আই· টি· ইউ· সি·—ফিফটি ইয়ার্স ডক্যুমেন্টস (নিউ দিল্লী, ১৯৭৩)

(য) ম্যাবেল রিমুন্ড, টাইগার অ্যান্ড জ্যাকল জার্মান-ইন্ডিয়া পলিটিক্স ১৯৪১-৪৩ আ ডক্যুমেন্টারি রিপোর্ট (ভিয়েনা, ১৯৬৮), সত্যানন্দ সিংহ কর্তৃক অনূদিত সুভাষ বসুর কার্যকলাপের ওপর অমূল্য সংগ্রহ।

নির্বাচিত সরকারী রিপোর্ট

সেন্সাস ১৮৮২-১৯৪১ ; সেডিশান কমিটি রিপোর্ট (কলকাতা, ১৯১৮), রিপোর্ট অব ইন্ডিয়ান কনস্টিট্যুশনাল রিফর্মস জুলাই ১৯১৮ (কলকাতা, ১৯২২) ; রিপোর্ট অব দ্য জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটি অন দ্য গভর্মেন্ট অব ইন্ডিয়া বিল, ৩ খণ্ড (লন্ডন, ১৯১৯), অল পার্টিজ কনফারেন্স, নেহরু রিপোর্ট (এলাহাবাদ, ১৯২৮), রিপোর্ট অব দ্য ইন্ডিযান স্ট্যাটুটারী (সাইমন) কমিশন, ৮ খণ্ড (সিমলা, ১৯৩০); প্রোসিডিংস অব ইন্ডিয়ান রাউন্ড টেবল কনফারেন্স, ২য় সেসন (cmd. 3778 of 1932) ; কম্যুনাল ডিসিসন (cmd. 4149 of 1931-32) ; রিপোর্ট অব দ্য জয়েন্ট কমিটি অন দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিট্যুশনাল রিফর্মস (১৯৩৩-৩৪) ; বিভিন্ন লেজিসলেটিভ কাউন্সিল ও অ্যাসেম্বলি ডিবেটস ; বিভিন্ন নির্বাচনী ফলাফল ; বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের অ্যাডমিনস্ট্রেটিভ রিপোর্ট, বিশেষত স্ট্যাস্টিসটিক্যাল অ্যাবস্ট্রাক্ট ফর ব্রিটিশ ইন্ডিয়া ও কে· এল· দত্ত, রিপোর্ট অন দ্য এনকোয়ারি ইনটু রাইজ অব প্রাইসেস ইন ইন্ডিয়া (কলকাতা, ১৯১৪) দ্রষ্টব্য।

বেসরকারী প্রকাশনার মধ্যে বিভিন্ন সালের ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের রিপোর্ট (ইন্ডিয়া অফিস, মাইক্রোফিল্ম) এবং সোর্স মেটিরিয়েল ফর আ হিস্টরি অব দ্য ফ্রিডম মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া (বাংলা ও বোম্বাই) দ্রষ্টব্য।

চরমপন্থী পর্বের জন্য অমলেশ ত্রিপাঠী, ভারতের মুক্তি সংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব (কলকাতা, ১৯৮৭)-এর পরিশিষ্ট ও গ্রন্থপঞ্জী অপরিহার্য।

নির্বাচিত গ্রন্থতালিকা

বই-এর নাম ইংরেজীতে দেওয়া হল।
সাধারণত পরিচিত বই-এর নাম নেই।

Adhikari, G. (ed.),Pakistan and National Unity (3 edn., Boambay, 1944)
Afzal, M.R. (ed.), Speeches and Statements of Quaid-e-Azam M.A. Jinnah 1911-34 and 1947-48 (Lahore, 1966)
Ahmad, A.M., *Amar dekha Rajnitir Panchas Bachar* (2 edn. Dacca, 1970)
Ahmad, J. (ed.), Speeches and Writings of Mr. Jinnah (Lahore, 1947) ; Middle Phase of the Muslim Political Movement (Lahore, 1969) ; Creation of Pakistan (Lahore, 1976)
Ahmad, Mujaffar, Communist Party of India Years of Formation (1921-1933) ; *Nirbachita Rachana Sankalan.*
Ali, Imran, The Punjab under Imperialism 1885-1947 (Delhi, 1989)
Ali, Mohamed, My Life : A Fragment (Lahore, 1966)
Ali, Chaudhuri Muhammad, The Emergence of Pakistan (N. Y., 1967)
Andrews, C. F., The Indian Problem (Madras, 1921) ; Indian Independence : The Immediate Need (Madras, 1922)
Arnold, David, The Congress in Tamilnadu Nationalist Politics in South India 1919-1937 (Monohar, 1977)
Ashton, S., British Policy Towards the Indian States 1905-1939 (London, 1982)
Azad, A. K., India Wins Freedom (Cal.,1959 and 1988)
Bagchi, A. K., Private Investment in India 1900-1939 (Cambridge, 1972) ; The Evolution of the State Bank of India The Roots 1806-1876 2 parts (O. U. P., 1987)
Baker, C. J., The Politics of South India (Delhi, 1976)
Baker, D. E. U., Changing Political Leadership in an Indian Province : The Central Provinces and Berar 1919-1939 (Delhi, 1979)
Baker, C., Johnson, G., and Seal, A. (eds), Power, Profit and Politics : Essays on Imperialism, Nationalism and Change In Twentieth Century India (Cambridge, 1981)
Bandyopadhyaya, Gitasree, Constraints in Bengal Politics 1921-41 Gandhian Leadership (Cal., 1984)
Banerjee, Hasi, Political Activity of the Liberal Party in India (Cal., 1987)
Banerjee, S., The R. I. N. Strike (N. D., 1981)
Banerjee, S. N., A Nation in Making (London, 1925)
Basu, Jyoti, *Janaganer Sange* (Cal., 1986)
Bayly, C.A., The Local Roots of Indian Politics. Allahabad, 1880-1920 (Oxford, 1975) ; Rulers, Townsmen and Bazaars etc. (Cambridge, 1983)

Besant, Annie, How India Wrought for Freedom etc. (Madras, 1915)
Bhattacharya, S., *Aupanibesik Bharater Arthaniti* 1850-1947, (Cal., 1396 B.S.).
Bhattacharjea, Ajit, Jaiprakash Narain. A Political Biography (N.D, 1978)
Birkenhead, Second Earl of, Life of F.E. Smith, First Earl (London, 1960); Halifax, The Life of Lord Halifax (London, 1966)
Birla, G.D., In the Shadow of the Mahatma—a Personal Memoir (Cal.,1953)
Blyn, G., Agricultural Trends in India 1891-1949 etc. (Phila., 1966)
Bolitho, Hector, Jinnah Creator of Pakistan (London, 1954)
Bondurant, J.V., Conquest of Violence The Gandhian Philosophy of Conflict (Revd. edn., Berkeley, 1969)
Bose, A.C., Indian Revolutionaries Abroad 1905-1922 (Patna, 1971)
Bose, N.K., My days with Gandhi (Bombay, 1943)
Bose, Subhas Ch., The Indian Struggle 1920-42 (N.Y.,1964). One edition for 1920-1934 was published in Calcutta in 1948.
Bose, Sugata, Economy, Social Structure and Politics 1919-1947 (Orient Longmans, 1986)
Bower, Lt. Col. E., The History of World War II (Monaco, 1966, 1985 edn. used)
Brecher, M.,Nehru: A Political Biography (London, 1959)
Bridge, Carl, Holding India to Empire (Delhi, 1986)
Broomfield, J.H., Elite Conflict in a Plural Society: Twentieth century Bengal (Bombay, 1968)
Brown, Judith, Gandhi's Rise to Power Indian Politics 1915-1922 (Cambridge, 1972); Gandhi and Civil Disobedience The Mahatma in Indian Politics 1928-34 (Cambridge, 1977); Modern India The Origins of an Asian Democracy (Delhi, 1984)

Carmichael, Mary, Lord Carmichael of Skirling A Memoir (London, 1929)
Catanach, I.J., Rural Credit in India Western India 1875-1930, etc. (Bombay, 1970)
Chakrabarty, Dipesh, Rethinking Working Class History Bengal 1890-1940 (Delhi, 1989)
Chakravartty, Gargi, Gandhi A Challenge to Communalism etc. (N.D., 1987)
Chandra, Bipan, The Rise and Growth of Economic Nationalism in India, etc. (N.D., 1966); Imperialism and Nationalism in India (Delhi, 1979); Chandra Bipan et al, India's Struggle for Independence (Viking, 1988)
Charlesworth, Neil, Peasants and Imperial Rule Agriculture and Agrarian Society in the Bombay Presidency, 1850-1935 (Cambridge, 1985)
Chattopadhyaya, Partha, Bengal 1920-1947 The Land Question (Cal., 1984)

Chaudhuri, K.N. and Dewey, Clive (eds.), Economy and Society. Essays in Indian Economic and Social History (Delhi, 1979)
Chaudhuri, Nirad C., Thy Hand Great Anarch (London, 1987)
Chirol, V., Indian Unrest (London, 1910); India (London, 1926)
Collins, L. and Lapierre, D., Freedom at Midnight (London,1975); Mountbatten and Independent India, etc. (Tarang paperback, 1985).
Corfield, C., The Princely India I Knew (Madras, 1975)
Coupland, R., The Cripps Mission (Oxford, 1942); A Report on the Constitutional Problem in India (London, 1942-43); India: A Restatement (London, 1945)

Dani, A.H. (ed.), World Scholars on Quaid-e-Azam M.A. Jinnah (Islamabad, 1979)
Das, M.N., Partition and Independence of India (N.D., 1982)
Dasgupta Pannalal, *Gandhi Gabeshana* (Cal., 1986)
Datta, Bhupendra Kumar, *Biplaber Padachinha* (Cal.,1973)
Datta, Bhupendra Nath, *Aprakasita Rajnaitik Itihasa* (Cal.,1333 B.S.)
Dewey, C. and Hopkins, A.G. (eds.), The Imperial Impact Studies in Ecnomic History of Africa and India (London, 1978)
Dhanagare, D.N., Peasant Movements in India 1920-1950 (Oxford, 1983)
Dobbin, Christine, Urban Leadership in Western India Politics and Communities in Bombay City 1840-85 (London, 1972)
Dove, M., Forfeited Future: The Conflict over Congress ministries in British India 1933-1937 (Delhi, 1987)
Dutt, R.C., The Economic History of India in the Victorian Age, etc (first edn., London, 1903)
Dwarkadas, K., Gandhiji through My Diary Leaves 1915-1948 (Bombay, 1950)

Faruqui Z.H., The Deoband School and the Demand for Pakistan (1963)
Fuchs, S., Rebellious Prophets: A Study of Messianic Movements in Indian Religions (Bombay, 1965)

Gallagher. J, Johnson, G. and Seal, A. (eds.), Locality, Province and Nation Essays on Indian Politics 1870-1940 (Camb., 1973)
Gandhi, Rajmohan, Understanding the Muslim Mind (Penguin, 1987)
Ganguli, P.C., *Biplabi Jibandarshan* (Cal.,1383 B.S.)
Ghosh, P.C., The Development of the Indian National Congress 1892-1900 (Cal.,1960)
Ghosh, S., Gandhi's Emissary (Cal., 1967)
Gillion, K.L., Ahmedabad, A Study in Indian History (Berkeley, 1968)

Glendoren, J., The Viceroy at Bay: Lord Linlithgow in India 1936-1943 (London, 1971)
Golwalkar M.S., We or Our Nationhood Defined (1st edn. 1939, Nagpur, 1947)
Gopal S., Jawaharlal Nehru A Biography, Vol I (Oxford, 1975); British Policy in India 1858-1905 (Camb, 1965); The Viceroyalty of Lord Ripon 1880-1884 (Oxford, 1953); The Viceroyalty of Lord Irwin 1926-1931 (Oxford, 1957)
Gordon, A.D., Businessmen and Politics: Rising Nationalism and a Modernising economy in Bombay 1918-1933 (N.D., 1978)
Gordon, L.A., Bengal: The Nationalist Movement 1876-1940 (Columbia, 1974)
Greenough, P., Prosperity and Misery in Modern Bengal The Famine of 1943-44 (Oxford, 1982)
Guha, Amalendu, Planter Raj to Swaraj (Delhi, 1977)
Guha, Arun Chandra, The First Spark of Revolution 1900-1920 (Delhi, 1971); Aurobindo and Yugantar (Cal., 1975)
Guha, Ranajit, Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India (Oxford, 1983)
Guha, R. (ed.) Subaltern Studies, Vols I-VI, (Oxford, 1982-89)
Gupta, Manmatha Nath, Bhagat Singh His Times (Delhi, 1977)
Gupta, P.S., Imperialism and British Labour Movement 1914-1964 (London, 1975)

Haithcox, J.P., Communism and Nationalism in India: M.N. Roy and Comintern Policy, 1920-39 (Princeton & Bombay, 1971)
Hardiman, David, Peasant Nationalism of Gujrat, Kheda District 1917-34 (Delhi, 1981)
Hardinge of Penshurst, Lord, My Indian Years 1910-1916 (London, 1948)
Hardy, P., The Muslems of British India (Cambridge, 1972)
Hasan, Mushirul, Nationalism and Communal Politics in India 1916-1928 (Delhi, 1979); Do (ed.), Communal and Pan-Islamic Trends in Colonial India (Delhi, 1985); Muslims and the Congress: Select correspondence of Dr. M.A. Ansari 1921-1935 (Delhi, 1979)
Henningham, S., Peasant movements in Colonial India: North Bihar, 1917-42 (Canberra, 1982)
Hodson, H.V., The Great Divide Britain—India—Pakistan (London, 1969)
Huq, Azizul, The Man Behind the Plough (Cal., 1939)
Hutchins, F., Spontaneons Revolution The Quit India Movement (Delhi, 1951)
Hutchins, F. G., The Illusion of Permanence British Imperialism in India (Princeton, 1967)
Hyndman, H.M., The Awakening of Asia (London, 1919)

Ikram, Shaikh M., Modern Muslim India and the Birth of Pakistan (Lahore)

Iqbal, Afzal, Mohamed Ali., Idarah-i-Adabiyat (Delhi, 1978)
Irschik, E.F., Politics and Social Conflict in South India: The Non-Brahmin Movement and Tamil Separatism 1916-1929 (Berkeley, 1969)
Islam, M., Bengal Agriculture, 1920-46 (Camb., 1978)
Ismay, Lord, Memoirs (London, 1960)
Ispahani, M.A.H., Quaid-e-Azam as I Knew Him (Karachi, 1967)

Jalal, Ayesha, The Sole Spokesman Jinnah The Muslim League and the Demand for Pakistan (Longmans, 1985)
Jansen, Erland, India, Pakistan or Pakhtoonistan
Jayakar, M.R., The Story of My Life, 2 vols. (Bombay, 1958-59)
Jeffrey, R. (ed.), People, Princes and Paramount Power. Society and Politics in the Indian Princely States (Delhi, 1978)
Jog, N.G., In Freedom's Quest (Orient Longmans, 1969)
Johnson, A.C., Mission with Mountbatten (Jaico, 1951)
Johnson, Gordon, Provincial Politics and Indian Nationalism, Bombay and the Indian National Congress 1880-1915 (Cambridge, 1973)
Josh, Sohan Singh, Hindusthan Gadar Party A Short History (N.D., 1977)
Joshi, V.C. (ed.), Lajpat Rai Writings and Speches., 2 vols.

Kabir, Humayan, Muslim Politics in Bengal 1906-1942 (Cal., 1943)
Kanungo, Hemchandra, Banglay Biplab Prachesta (Cal., 1928)
Keddy, N., An Islamic Response to Imperialism (Berkeley, 1968)
Kedourie, E., Afghani and Abdu: An Essay on Religious Unbelief and Political Activism in Modern Islam (London, 1966)
Kennedy, Paul, The Rise and Fall of the Great Powers (Fontana, 1989)
Khaliquzzaman, Chaudhry, Pathway to Pakistan (Lahore, 1961)
Khan, Rahmat, Pakistan: The Fatherland of the Pak Nation (rev. edn., Lahore, 1978)
Khan, Wali, Facts are Facts The Untold Story of India's Partition (N.D., 1987)
Kiernan, V.G., The Lord of Human Kind: European Attitudes Towards the Outside World in the Imperial Age (London, 1969)
Kochanek, S.A., Business and Politics in India (Berkeley, 1974)
Kruezer, H., Kanwar M. Ashraf. An Indian Scholar and Revalutionary 1903-1962 (Berlin, 1966)
Kumar D. (ed), Cambridge Economic History of India, Vol 2 (N.D., 1982)
Kumar, R. (ed.), Essays on Gandhian Politics. The Rowlatt Satyagraha of 1919 (Oxford, 1971)

Leach, E. and Mukherjee, S.N. (eds), Elites in South Asia (Cambridge, 1970)
Lelyveld, D., Aligarh's First Generation (Princeton, 1977)

Lovett, Sir Verrey, A History of the Indian Nationalist Movement (London, 1920)
Low, D. (ed.), Soundings in Modern South Asian History (Calif., 1968); Congress and the Raj. Facets of the Indian Struggle 1917-47 (London, 1977)
Lytton, Earl of, Pundits and Elephants (London, 1942)

Macpherson, K, The Muslim Microcosm Calcutta 1918-35 (Weisbaden, 1974)
Malik, Hafeez, Moslem Nationalism in India and Pakistan (Washington, 1963) ; Do (ed.), Iqbal : Poet Philosopher of Pakistan (Columbia, 1971)
Markovitz, C., Indian Business and Nationalist Politics 1931-39, etc. (Cambridge, 1985)
Martin, Briton, New India 1885 British Official Policy and the Emergence of Indian National Congress (Bombay, 1970)
Masani, Minoo, The Communist Party of India (London, 1954)
McCully, B. T., English Education and the Origin of Indian Nationalism (Columbia, 1940)
McLane, J. R., Indian Nationalism and the Early Congress (Princeton, 1977)
Mehrotra, S. R., Emergence of Indian National Congress (Delhi, 1971)
Menon, V. P., The Tranfer of Power in India (O. Longmans, 1957) ; The Integration of Indian States (O. Longmans, 1956).
Minault, G., The Khilafat Movement Religious Symbolism and Political Mobilization in India (Oxford, 1982)
Misra, B. B., The Indian Middle Classes Their Growth in Modern Times (London, 1961)
Do (ed.), Selected Documents On Mahatma Gandhi's Movement in Champaran 1917-18 (Patna, 1963)
Mitchell and Deane, Abstract of British Historical Statistics.
Montagu, Edwin, An Indian Diary (London, 1930)
Moon, Penderell (ed.), Wavell The Viceroy's Journal (London, 1973) ; Divide and Quit (Berkeley, 1962)
Moore, R. J., The Crisis of Indian Unity 1917-1940 (Oxford, 1974) ; Churchill, Cripps and India 1939-45 (Do, 1979) ; Escape from Empire The Attlee Government and the Indian Problem (Clarendon, 1983) and Endgames of Empire Studies of Britain's Indian Problem (Delhi, 1988)
Mosley, L., The Last Days of the British Raj (London, 1961)
Mountbatten, Earl , Time only to Look Forward Speeches of Rear Admiral the Earl Mountbatten of Burma etc. (London, 1949) ; Reflections on the Transfer of Power and Jawaharlal Nehru (Cambridge, 1968)
Mujeeb, M., The Indian Muslims (London)
Mukherjee, Hiren, Was India's Partition Unavoidable ? (Cal., 1987)

Muhkopadhyaya Jadugopal, *Biplabi Jibaner Smriti* (first edn. Cal., 1956 ; third edn. 1983)
Mukhopadhyaya Saroj, *Bharater Cummunist Party O Amra*, 2 Vols. (Cal.,1985)
Munshi, K. M. (ed.), Indian Constitutional Documents (Bombay, 1967)

Naim, C. M., (ed.), Iqbal, Jinnah and Pakistan (Syracuse, 1979)
Nambudiripad, E. M. S., Reminiscences of an Indian Communist (Delhi, 1987)
Narain, Jaiprakash, Socialist Unity and the Congress Socialist Party (1941)
Nehru, Jawaharlal, Autobiography (1st edn. London, 1936) ; Eighteen Months in India (Allahabad, 1938)
Novinson, H. W., The New Spirit in India (London, 1908)
Niblett, R. H., Congress Rebellion in Azamgarh, August-September 1942 (Allahabad, 1957)
Niemejer, A. C., The Khilafat Movement in India 1919-1924 (Leiden, 1972)

O'Hanlon, R., Caste, Conflict and Ideology (Cambridge, 1985)
Overstreet, G. D. and Windmiller, M., Communism in India (Berkeley, 1959)

Page, David, Prelude to Partition The Indian Muslims and the Imperial System of Control 1920-32 (Oxford, 1982)
Pande, B. N. (ed.), A Centenary History of the Indian National Congress, 4 Vols. (N. D., 1985)
Pandey, B. N. (ed.), Leadership in South Asia (Delhi, 1977) ; The Indian Nationalist Movement, 1885-1947, Select Documents (London, 1979)
Pandey, Gyanendra, The Ascendancy of the Congress in Uttar Pradesh 1926-34 etc. (Delhi, 1978)
Do (ed.), The Indian Nation in 1942 (Calcutta, 1988)
Parekh, N., Sardar Vallabhbhai Patel, 2 Vols.
Philips, C. H. and Wainwright, M. D. (eds.), The Partition of India. Policies and Perspectives 1935-47 (London, 1970) ;
Do (eds.), Indian Society and the Beginnings of Modernisation C. 1830-1850 (London, 1976)
Prakash, Indra, A Review of the History and Work of the Hindu Mahasabha etc. (N. D. 1938)
Prasad Rajendra, An Autobiography (Bombay, 1957) ; India Divided (Bombay, 1946)
Pyarelal, Mahatma Gandhi : The Last Phase 2 Vols., (Ahmedabad, 1956-58)

Qureshi, I. H., Ulema in Politics (Karachi, 1974)

Ramusack, B. N., The Princes of India in The Twilight of Empire etc. (Columbus, 1978)
Ray, R. K., Social Conflict and Political Unrest in Bengal 1875-1927 (Oxford, 1984); Urban Roots of Indian Nationalism Pressure Groups and Conflict of Interests in Calcutta City Politics, 1875-1939 (N. D., 1979)
Reading, Second Marquess, Rufus Isaacs, First Marquess of Reading (London, 1945)
Robb, P. G., The Government of India and Reform etc. (Oxford, 1976)
Robb, Peter *et al* eds.), Rule, Protest and Identity (London, 1978).
Robinson, Francis, Separatism among Indian Muslims: The Politics of the U. P. Muslims 1860-1923 (Cambridge, 1974)
Rothermund, Dietmar, Government, Landlord and Peasant in India Agrarian Relations Under British Rule 1865-1935 (Wiesbaden, 1978)
Roy, M. N., India in Transition (Geneva, 1922); Memoirs (Delhi, 1964)

Sahay, G., Forty two Rebellion (Delhi, 1947)
Samanta, S. *et al* (eds.), August Revolution and Two Year's National Governments in Midnapur (Cal., 1946)
Sankrityan, Rahul, *Meri Jibna Yatra*. 2 Vol. (Allahabad, 1950)
Sanyal, Sachin, *Bandijiban* (Delhi, 1963)
Sarkar, N. N., Bengal Under Communal Award and Poona Pact. (Cal., 1933)
Sarkar, Sumit, The Swadeshi Movement in Bengal 1903-1908 (N. D., 1973); Modern India 1885-1947 (Delhi, 1983)
Sarkar, Tanika, Bengal 1928-1934 The Politics of Protest (Oxford, 1987)
Saul, S. B., Studies in British Overseas Trade 1870-1914 (Liverpool, 1960)
Sayeed, K. B., Pakistan The Formative Phase 1857-1948 (London, 1968)
Seal, Anil, The Emergence of Indian Nationalism Competition and Collaboration in the Later Nineteenth Century (Cambridge, 1968)
Sen, Amartya, Poverty and Famines : An Essay on Entitlement and Deprivation (Oxford, 1981)
Sen, Sheila, Muslim Politics in Bengal 1937-1947 (N. D., 1976)
Sen, Sunil, Agrarian Struggle in Bengal 1946-47 (Cal., 1972)
Shankardass, R. D., Vallabhbhai Patel, Power and Organization in Indian Politics (Orient Longman, 1988)
Siddiqui, N. M, Agrarian Unrest in Northern India, V. P. 1918-1922 (N. D., 1978)
Singh, Ananta, *Agnigarbha Chattagram* (Cal., 1968)
Singh, A. Inder, The Origins of the Partition of India 1936-1947 (Delhi, 1987)
Singh, Karan, Heir Apparent (N. D., 1982)

Sinha, N. K., The Economic History ot Bengal Vols. 1 and 2 (Cal., 1965), Vol. 3 (Cal, 1970) Do (ed.), The History of Bengal 1757-1905 (Cal., 1967)
Sisson, R. and Wolpert, (eds.), Congress and Indian Nationalism The Pre-Independence Phase (Delhi, 1988)
Sitaramayya, .B. P., History of the Indian National Congress (1885-1935) (Madras, 1935)
Smith, Cantwell, Modern Islam in India (2nd edition, Lahore, 1947)
Stephens, Ian, Pakistan (London, 1963)
Stokes, Eric, The English Utilitarians and India (Oxford, 1959) ; The Peasant and the Raj (Cambridge, 1978)

Templewood, Viscount (Hoare), Nine Troubled Years (London, 1954)
Tendulkar, D. G., Mahatma, 8 Vols. (Bombay, 1951-1954)
Thakurdas, P. *et al.*, A Brief Memorandum Outlining Plan of Economic Development for India (Bombay, 1944)
Tomlinson, B. R., The Indian National Congress and the Raj 1929-1942 The Penultimate Phase (London, 1976) ; The Political Economy of the Raj 1914-1947. The Economics of Decolonization in India (Cambridge, 1979)
Tripathi, Amales, chapters in Majumdar R. C. (eds.), British Paramountcy and Indian Renaissance, Part I ; The Extremist Challenge : India between 1890-1910 (Cal., 1967), *Bharater Mukti Sangrame Charampanthi Parva* (Calcutta, 1987) and Freedom Struggle (with Bipan Chandra and Barun De)(N.D., 1972)
Tuker, Sir F., While Memory Serves (London, 1950)

Venkatasubbiah, H., Enterprise and Economic Change, 50 yers of FICCI (N. D., 1977)

Washbrook, D. A., The Emergence of Provincial Politics The Madras Presidency 1870-1920 (Cambridge, 1976)
Wedderbrun, W., A. O. Hume, Father of the Indian National Congress 1829 to 1912 (London, 1913)
Wolpert, S., Tilak and Gokhale, Revolution and Reform in the Making of Modern India (Berkeley, 1962) ; Jinnah of Pakistan (N. Y. & N. D., 1984)

Zeigler, P., Mountbatten The Official Biography (London, 1985)
Zetland, Marquess of, Essayez (London, 1956) ; The Heart of Aryavarta (London, 1925)

নির্ঘণ্ট

নির্ঘণ্ট